23905

ভারতের সাধনা



ভারতীয় সাধনামূলক ভাব-ধারার বাহক সময়োপযোগী

মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ, সম্পাদিত

বিষয়

	পৃষ্ঠা
সাধনার পথে	১
জাতীয়তার কুসংস্কার	
গোল টেবিলের কথা	
... নূতন ব্যবস্থা	
ভারতের সাধনা কোন্ পথে ...	৯
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	
পুরাণ ও মিথলজি	১৫
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সাহা এম-এ	
যুক্তনী	২৩
শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্ম্মা	
কবীরের দোঁহা	২৮
শিব প্রসাদ	
প্রার্থনা সঙ্গীত	২৯
ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার	
ভিক্ষুকের ঝুলি	৩৩
শ্রীভৃগু ভার্গব	
আয়ুর্ব্বেদ-নিন্দা—বিজ্ঞানের নামে ধৃষ্টতা	
ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত এম ডি	৩৮
বিচার-মালা	৪৩
সোণার লঙ্কা	
সাধনার লক্ষ্য	
ইতিহাসের ইঙ্গিত	৪৬
হেম চন্দ্র বসু মল্লিক অনুবেশনাধ্যাপক	
দিগ্ দর্শন	৪৮
স্বকীয়তা	
সাইমন কমিশন ও ভাইসরয়ের ডেস্‌পাস্	৪৯
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ কাব্যতীর্থ	
আলোচনা	৫৭
হিন্দু শবদাহ—	
পণ্ডিত বলাই চাঁদ মল্লিক	
মাস-পঞ্জি, কার্ত্তিক ১৩৩৭ ...	৬৩

দ্বিতীয় বর্ষ] কার্ত্তিক—১৩৩৭ [প্রথম সংখ্যা

ভারতের সাধনা

সাধারণ নিয়ম

প্রতি বাঙ্গলা মাসে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয়— কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ও বৈশাখ হইতে আশ্বিন, এই দুই ষাণ্মাষিক হিসাবে বৎসর গণনা হইয়া থাকে; গ্রাহকগণ প্রতি ষণ্মাসের প্রথম হইতে অথবা বৎসরের যে কোনও সময় হইতে পত্রিকা গ্রহণ করিতে পারেন—মূল্য বার্ষিক ৪৲, ষাণ্মাষিক ২৷৹, প্রতিসংখ্যা ।৵৹, ডাক খরচ স্বতন্ত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়।

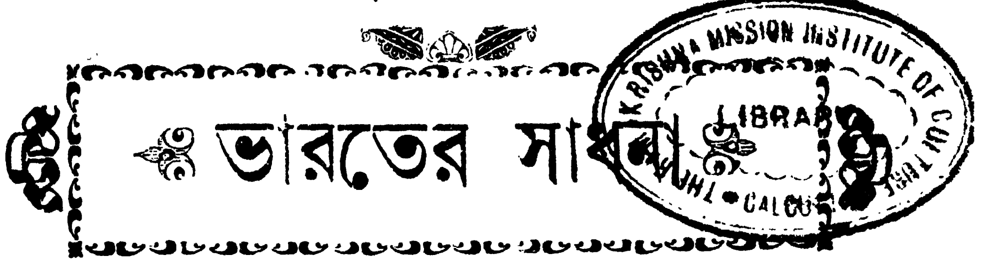
ভারতীয় সাধনার স্বরূপ, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ ও মানব জীবনের উৎকর্ষলাভে তাহার উপযোগিতা প্রভৃতি, এবং জাগতিক কল্যাণ, দেশের প্রকৃতি ও লোকের প্রয়োজনাদ লক্ষ্যে—প্রবন্ধ, আলোচনা, বিচারাদি সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

প্রবন্ধাদি প্রেরণ ও পত্রিকার মৌলিক নীতি বিষয়ে পত্রাদি ব্যবহার সম্পাদকের সহিত করিবেন; টাকা কড়ি ও কার্য্য পরিচালন বিষয়ে চিঠি পত্র ম্যানেজার বা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন।

দেশের ধর্ম্ম অর্থ জ্ঞান ও স্বাস্থ্য সাধনার নির্দ্দেশক সমুদয় বিষয়ে বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে গৃহীত হয়।

উপযুক্ত কমিশনে সর্ব্বত্র পত্রিকার এজেণ্ট (বিক্রেতা বা প্রচারক) থাকিতে পারেন।

কার্য্যালয়	কার্য্যাধ্যক্ষ
৮৪নং বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রিট্ কলিকাতা।	ভারতের সাধনা



অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

দ্বিতীয় বর্ষ] কার্ত্তিক—১৩৩৭ [প্রথম সংখ্যা

সাধনার পথে

আজ একবৎসর কাল অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষের যাত্রাপথে পদার্পণ করিলে, প্রথমেই ভারতের সাধনার মূল আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা মনে আইসে। সে আদর্শ কতখানি পূর্ণ হইল—সে পথে কত দূর অগ্রসর হওয়া গেল—এ বিষয় মনে আসা যত স্বাভাবিক, আবশ্যকতা তার তাহা অপেক্ষাও অধিক। সে বিচারের দ্বারাই আজ ভবিষ্যতের পথ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য লইয়াই 'ভারতের সাধনার' প্রবর্ত্তন হইয়াছে। হয়ত সে লক্ষ্য সম্যক পরিস্ফুট হয় নাই, সে আদর্শ স্পষ্ট দেখান যায় নাই, তার প্রাপ্তি বা পূর্ণতার কথা ত উঠিতেই পারে না। এজন্য কেহ কেহ বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে পারেন; আমরা তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইব না—সতর্ক হইবার অবকাশ পাইব।

ভারতের সাধনা কোনও অভিনব পদার্থ নহে; দুর্ভাগ্যবশেই আজ উহাকে নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ভারতের সাধনা মানবীয়তার চরম প্রকর্ষের পথ। মানবের প্রকৃতি ও জাগতিক নিয়মের সার তত্ত্বের উপলব্ধি করিয়া ভারতের ঋষিগণ যে সত্যের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই উহার ভিত্তি। ভারতভূমির অসাধারণ নানা বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির সহিত উহার নিত্য সম্বন্ধ। এজন্য ভারত আপন সাধনার যে বিকাশ দেখাইয়া আসিতেছে, তাহা অন্যত্র বিরল।

আত্ম-নিরীক্ষণ

ভারতের এই সাধনার স্বরূপ কি, তাহা আজ সত্য সত্যই এক গুরুতর প্রশ্নে দাঁড়াইয়াছে—জীব দেহ যতদিন সুস্থ ও সবল থাকে ততদিন যেমন কেহ ঐ দেহ সম্বন্ধে কিছু ভাবে না, জাতীয় সাধনা সম্বন্ধেও সেইরূপ। যতদিন উহা সুস্থ বা

স্বাভাবিক অবস্থাতে থাকে ততদিন তাহার চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয় না, চিন্তা আসেও না। কিন্তু যখন তাহাতে কোনও দোষ ঘটে বা অনিষ্ট আসিয়া পৌঁছে, তখন তাহার যাতনা সকলকেই ভুগিতে হয়, জাতির মর্ম্মবেদনা প্রকাশ পায়, জাতীয় সাধনার স্বরূপ বোধের প্রবৃত্তিও জাগিয়া থাকে। আজ ভারতীয় সাধনার উপর কত খানি বিপদ্ পাত—কত প্রচণ্ড আঘাত পড়িয়াছে তাহাই ভাবিতে হইতেছে।

এক বৎসর পূর্ব্বে এ ক্ষীণ প্রচেষ্টার প্রারম্ভে যাহা বলা হইয়াছিল, আজও তাহাই বলিতে হইতেছে—লোকের সাধনার বল ও জাতীয় বল একই বস্তু। আজ জগতের জাতিতে জাতিতে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পরিণাম স্থির হইবে বিভিন্ন জাতির জাতীয় বল বা সাধনার শক্তির দ্বারা। তাহাতে ভারতের স্থান আজ কত শোচনীয়, কত বিপদসঙ্কুল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। কোন জাতিকে কোনও কালে এক সময়ে এত গুলি সাংঘাতিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে কি না সন্দেহ। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এদেশ এখন সকল প্রকারেই অধঃপতিত; ইহার প্রতিকারের আর কোনও উপায় আছে বলিয়াই মনে হয় না: তাহাতে এই নষ্ট-কল্প দেহের উপর আজ বাহির ও ভিতর হইতে অভাবনীয় পীড়ন ও আঘাত আসিয়া পৃথিবী হইতে উহার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। দেশের অধিকাংশ লোক ইহাতে নিস্পন্দ অসাড় জড়বৎ অবস্থান করিতেছে; কেহ কেহ হতাশায় অধীর হইয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ ও পরকীয় জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এ ঘোর অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টার ছলে আপন জাতির সর্ব্বস্ব হারাইতে যাইতেছে। এমন অবস্থায় ভারতের নিজস্ব সাধনার বল আছে কি না এবং তাহাকে স্বরূপে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত দেখা যাইতে পারে কি না, তাহার জন্য স্বতই আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে; অন্ততঃ তাহার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। এজন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রকার প্রচেষ্টার প্রয়োজন। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট ইহাই আবেদন।

এই একবৎসরে দেশের অবস্থা আরও কত যে শোচনীয় হইয়াছে তাহা অর্থ, রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতি সকল দিকেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এ সকলের ভিতর দিয়া প্রধানতঃ দেশের জাতীয় সাধনার মূলেই কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। জাতীয় সাধনার উচ্ছেদ সাধন করিয়াই, অথবা তদুদ্দেশ্যেই, ইহাদেরে এই নানা বিকৃত রূপে পরিণত করা হইতেছে। কারণ ভারতের সাধনার বল, যাহারা ইহার স্বভাবসিদ্ধ অধিকারী তাহারা ভুলিয়া গিয়া থাকিলেও, যাহাদের স্বার্থ ইহার বিরোধী, তাহারা ভুলিতে পারে নাই—সদা সতর্ক দৃষ্টিতে উহারা তাহার হনন চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং নিজ করায়ত্তগত বিভিন্ন শক্তি ও উপায় দ্বারা তাহার উৎপাটন করিয়া আনিয়াছে। ভারতের সাধনার বলই যে ভারতের প্রকৃত বল প্রতিদ্বন্দ্বী দিগের নিকট, একথা বিলক্ষণ জানা আছে।

প্রথমে এই সাধনার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহাই বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। পরে উহার অবলম্বনে বর্ত্তমান জাতীয় সমস্যা সমূহের সমাধান করা যায় কিনা, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহার উপস্থিত বিপদ্ ও প্রতিবন্ধকগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

লোকের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চরিত্রে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা প্রাপ্তির যে চেষ্টা তাহাই সাধনা। সাধনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি (culture) ও সভ্যতা (civilisation) ইহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ-

ভাবে সম্পর্কিত—একই মানবীয়তার প্রকর্ষের ইহারা বিভিন্ন অঙ্গ। এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত বলিয়াই ইহাদের একটিকে ছাড়িয়া অপরটি বৃদ্ধি পায় না, কোন একটির কিছুমাত্র লাঘব ঘটিলে অপর গুলির ক্ষতি হয়। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বোধ রাখা কঠিন হয়; একটী অপরের বাচ্য হয় এবং সকলেই একক ভাবে অপর সকলকে বুঝাইয়া থাকে।*

সাধনা মানবের সাধারণ সম্পদ হইলেও বিভিন্ন জাতি বিভিন্নরূপে ইহার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। সৃষ্ট জীব মাত্রেরই প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে; সমষ্টিগত ভাবে এ বৈষম্য তাহারই ফল। এজন্য মানুষে মানুষে যেমন যুদ্ধ বা বিবাদ হয়, জাতির সাধনা বা সংস্কৃতির মধ্যেও সেরূপ বিরোধ বা লড়াই বাধিয়া যায়। এই সাধনার সমরেই জগতের প্রাচীন জাতি সমূহের জীবনাদর্শ ও সংস্কৃতি (culture) ভূপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়াছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সকল জাতির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সাধনা এবং উহার প্রধান উত্তরাধিকারী হিন্দু জাতি যুগযুগান্তর অতিক্রম করিয়া এযাবত কাল চলিয়া আসিতেছে। জগতের ইতিহাসে ইহাদের চিরন্তন অস্তিত্ব এক অবিসংবাদিত সত্য।*

এত কথার পুনরুল্লেখ করা হইতেছে এই জন্য যে ভারতের সাধনা বা ধর্ম্মের উপর আজ সত্য সত্যই লোকে বিশ্বাস হারাইয়াছে। যতদিন লোক উহার অনুসরণ করিয়া চলিত ততদিন এদেশের সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় নীতি সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছিল, দেশের উচ্চ নীচ সকলেই এই সাধনার প্রভাবে সহজে সুখ সচ্ছন্দতায় দিন কাটাইত। এদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পর্য্যন্তও তাহা কতক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রাজনীতির প্রভাবে তাহা বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। সমাজের সকল স্তরের লোকই ইহাদ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত; আর ইহা হইতে উদ্ধারের কোনও উপায় হইতে পারে একথা কেহ বিশ্বাস করিয়াও উঠিতে পারে না। মনোবৃত্তির এমনই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, যাঁহারা ভারতের সভ্যতা বা সংস্কার নামে গৌরব বোধ করেন, ভারতকে স্বপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন, আর দেশের নামে ও দশের কাজে অনেক কিছু বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত আছেন, তাহারাও এই দিকে দৃষ্টিহীন; এবং অনেক সময় এমন সকল কাজ করিয়া যাইতেছেন, যাহাতে প্রকৃত দেশের মঙ্গলের স্থানে অনিষ্টই অধিক সংঘটিত হয়। এরূপ আত্ম-হননের কার্য্য আজ কাল—বিশেষ করিয়া অদ্যকার এই উত্তেজনাময় কার্য্যাকারিতার মধ্যে—পদে পদে দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে দেশের প্রকৃত

* শিক্ষা সাধনার ভিত্তি বা হেতু, তাহাতে সাক্ষাৎ কৃতার্থতা সংস্কৃতি, পরোক্ষ ফল সভ্যতা। সাধনা বীজ, শিক্ষা উহার পুষ্টসাধন, সংস্কৃতি পরিপূর্ণ বৃক্ষ ও সভ্যতা তাহার ফলফুলাদি সুশোভন উৎপন্ন দ্রব্য সকল—সাহিত্য-কলা বিজ্ঞান ধর্ম্ম আচার ব্যবহার ইত্যাদি)—ভারতের সাধনা, প্রথম খণ্ড ৯—১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় সাধনা বলিতে প্রধানতঃ হিন্দু সাধনাই বুঝিতে হইবে। অন্ততঃ হিন্দু সাধনাতেই উহার প্রকৃষ্ট বিকাশ লাভ হইয়াছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের মত মানিতে হইলেও আদিম মানব ইতিহাসে এই সাধনার মৌলিক বিকাশ হইয়াছিল আর্য্যজাতির জাতীয়ত্ব বা আর্য্যত্বে—আচার ব্যবহার সমাজনীতি, গৃহনীতি, এবং সর্ব্বোপরি জাগতিক ব্যাপারের অন্তরালে ঐশীশক্তির উপলব্ধিতে আর্য্যজাতি এক বিশেষ প্রকার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাহাই ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থাও ভারতীয় ঋষিদিগের মনীষাবলে পরম সত্যের উপলব্ধিতে আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়া, বাস্তবিক ভারতীয় সাধনার প্রকৃষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। উহাই বৈদিক সাধনা বা বৈদিক ধর্ম্ম, উহাকে আশ্রয় করিয়া ভারতের ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞানাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া অপর জাতির সাধনা ইহার বিরুদ্ধ নহে বরং ইহার প্রকৃতি এবং মহাত্ত্ব এত বিশাল যে অপর অনেক জাতির সাধনা সহজেই ইহার অন্তর্বর্ত্তী হইয়াছে ও আরও হইতে পারে। ভা, সা, প্রথম খণ্ড ১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রাণের স্পন্দন এবং লোকের অভাব বা আবশ্যকতা কি তাহার দিকে ইহাদের কোনও লক্ষ্য নাই। সুতরাং এরূপ পরকীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, পরকীয় ভাবে প্রভাবিত, লোকের দ্বারা যাহা কিছু হইতেছে, তাহাতে দেশের প্রকৃত অভাব মিটিতেছে না, বরং তাহা বাড়িয়াই যাইতেছে—শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা, ঐক্য মিলনের প্রচেষ্টায় অনৈক্য ও বিদ্বেষের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ;—বর্ত্তমান জগতের নানা দিকে এই বিকৃত ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া, প্রায় সর্ব্বত্র সমাজ শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্র সংস্থার বিনাশ সাধন করিতে উঠিয়াছে।

সকল কালেই জগতের নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি, এবং সেই সঙ্গে লোকের ভয়, ত্রাস, দুঃখ এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে অবশ্যম্ভাবী। সেই ভয় ও বিস্ময়ের মধ্য দিয়াই মানুষ দুর্দ্দশার প্রতিকার ও অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া লইয়াছে ও তাহাতেই মানবীয় সভ্যতার বিকাশ-লাভ হইয়াছে, কিন্তু এ কথা সত্য। আর ইহাতে বিভিন্ন লোকে যেরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহাদ্বারাই তাহাদের সাধনার পরীক্ষা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কালের উন্নতিশীল জাতি-সমূহের ন্যায় বিভিন্ন কালে আরও অনেক জাতিই বিভিন্ন প্রকারের উন্নতি দেখাইয়া গিয়াছে। তাহাদের সাধনার ধারাও বিভিন্ন প্রকারের ছিল ; ইতিহাসের গাত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতের আর্য্য সাধনার ধারার তাহাতে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। আজ জগতে জাতিতে জাতিতে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, অথবা প্রত্যেক জাতির নিজ স্বতন্ত্র ভাবে যে সকল সমস্যা উপস্থিত তাহার সমুচিত সমাধান করিতে হইবে, মানবীয় সাধনার সাধারণ ধারা ও তৎসঙ্গে অতীত ও বর্ত্তমান বিভিন্ন জাতির বিশিষ্ট ধারার সম্যক রূপে পরীক্ষা ও উহাদের তুলনাত্মক বিচার দ্বারা। এ পরীক্ষা প্রধানতঃতিন প্রকারে হইতে পারে —(১) ইতিহাসের দৃষ্টিতে, বিভিন্ন জাতির সাধনা ও তৎফল সভ্যতার পরিণাম বা ফলের পরীক্ষা ; (২) দর্শনের দৃষ্টিতে, ইহাদের অন্তঃপ্রকৃতির বিচার ; আর (৩) ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইহাদের ব্যবহারিক উপযোগিতা। এ সকল দিক দিয়াই ভারতের সাধনার শ্রেষ্ঠতার দাবী স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমান মানব জীবনের জটিল সমস্যা সমূহের সমাধান করিতে ইহার বিশেষ অধিকার রহিয়াছে, এ ভরসাও আমাদের আছে। অতীত যুগের অনেক জাতি আপন আপন সভ্যতা ও সাধনা-বল সহ ইতিহাসের পৃষ্ঠ হইতে বিলীন হইয়া গিয়াছে ; বর্ত্তমান উন্নতিশীল জাতিসকলেরও তেমনই যাইতে হইবে। ইহারা আপনাদের উন্নতির ছলে, প্রকৃতপক্ষে আপন ও পরের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে—ইহাদের যান্ত্রিক উন্নতিমূলক সভ্যতা ও অন্যান্য আধুনিক নানা উন্নতির ফলে, এক দিকে যেমন সমাজ শৃঙ্খলাতে বিষম বৈষম্য উপস্থিত করিয়া, নানা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে দ্বেষ, হিংসা ও পরস্বাপহরণ প্রভৃতি অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াতে, প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব ও সমরায়োজন তেমনই পরস্পর ধ্বংসের আতঙ্ক দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। সুখ ও উন্নতির নামে আধুনিক সমাজ বিভিন্ন প্রকার দুঃখ ডাকিয়া আনিতেছে। তাহাই অদ্যকার সমাজনীতিজ্ঞ ও রাষ্ট্রপরিচালকদিগের ও প্রধান সমস্যা বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর ইহাদের পার্শ্বেই ভারতীয় হিন্দুজাতির সাধনা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া নানা ভাবে আপন প্রতিষ্ঠা বলবৎ রাখিয়া চলিতেছে। সর্ব্বোপরি এই সাধনার মধ্যে যে সকল অতি মহৎ নীতি নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনায় মানবীয় সাধনার

চূড়ান্ত ফল রহিয়াছে, এবং তাহারই অন্তর্নিহিত শক্তিবলে হিন্দুর জাতি ও ধর্ম্ম জগতের এক স্থায়ী সম্পদরূপে বাঁচিয়া রহিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে এই ভরসা করা যায়! ভারতের ঐতিহাসিক পরম্পরায় দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতের এই বিশিষ্ট সাধনা প্রাচীন ঋষিদিগের দিব্য দৃষ্টি বা পরম সত্যের উপলব্ধির ভিত্তিতে সম্বর্দ্ধিত; এবং উহার সহিত ঘনিষ্টভাবে চির সম্পর্কিত। এজন্য উহার ধারা সনাতন। ঘোর দুর্দ্দিনেও লোকে উহার অমৃতরস ভোগ করিতে পারে ও ভোগ করিয়াছে। এবং বিশ্বাস করা যায় সেই ধারাকে অবলম্বন করিয়াই লোক চিরকাল সত্যের সন্ধান লাভে অমৃতরসের আস্বাদন পাইয়াছে। ভারতের মহাপুরুষগণ যুগে যুগে সেই বার্ত্তা বহন করিয়া চলিয়াছেন।

দুরবস্থার অধীরতা, আতঙ্ক, বিহ্বলতা বা উত্তেজনার বশে আজ দেশের একভাগ লোকের মধ্যে একটা কর্ম্মপ্রমুখতার ভাব দেখা যাইতেছে। কিন্তু উহা যে একান্তই নিরুদ্দেশ লক্ষ্যে চলিয়াছে—অতি অস্পষ্ট ধারণা লইয়া, অন্তরের কোনও বিশেষ শক্তি না ধরিয়াই উহার প্রগতি, একটু নাড়া দিলেই তাহা ধরা পড়ে। সত্য বটে বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন আর সমুদয় আন্দোলনের পুরোভাগে, এবং এক প্রকার স্বরাজ্য সাধনার ব্রতে এক শ্রেণীর লোক আপন প্রাণ মন নিয়োজিত করিয়াছেন—ইহাতে ত্যাগ এবং কষ্টসহিষ্ণুতার অভাব নাই। কিন্তু এক্ষেত্রেও যাঁহারা কিছুমাত্র কৃতকার্য্যতা বা চরিত্রের বল দেখাইতেছেন, তাহাদের চরিত্র কেবলমাত্র রাজনৈতিক নহে —তাহারা অপর সাধনাবলে বলীয়ান। কেবলমাত্র রাজনৈতিক চরিত্র বা রাজনৈতিক দৃষ্টি লইয়া যাহারা বর্ত্তমান এই স্বরাজ-সাধনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের দ্বারা কার্য্য পণ্ড ছাড়া সিদ্ধ হইতেছে না—বিরোধ, দ্বন্দ্ব, দলভেদ সৃজন ও কর্ম্মনাশ তাহাদের কৃতকৃত্যতা। এস্থলে ইহাও বলিতে হইতেছে যে, আজ যদি এদেশের কোনও আন্দোলনের মধ্যে কিছুমাত্র সুস্থ ও সবল ভাব থাকিয়া থাকে, তবে তাহাকে এদেশের সেই সনাতন সাধনার সহিত কোনও না কোনও প্রকারে সম্বন্ধ রাখিয়া চলিতে নিশ্চয়ই দেখা যাইবে। এক হিসাবে বলিতে গেলে এদেশে যে যে আন্দোলন কিছুমাত্র স্থায়িত্বলাভ করিয়াছে তাহার সমুদয়গুলিই অল্পাধিক পরিমাণে এদেশের চিরন্তন সাধনা-মূলক। ইহাদের সিদ্ধিলাভে বিঘ্ন হয় এইজন্য যে, ইহারা একালের বিজাতীয় ভাবে প্রধানতঃ প্রভাবিত হইয়া পড়ে; পূর্ণ ভারতীয় ভাবকে আয়ত্ত করিয়া চলে না বা চলিতে পারে না!

এই কথা গুলি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আজ উপস্থিত এই নানা দিগুন্মুখী বিভ্রম-সম্ভব অবস্থার মধ্যে, আমাদের কর্ত্তব্য এই যে আমরা আমাদের জাতিগত ও ব্যক্তিগত কর্ম্মধারা কোনও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করি। ভারতীয় সাধনার লক্ষ্যেই সেই স্থির দৃষ্টি মিলিবার সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এজন্য সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক সে সাধনার প্রকৃতি সম্যকরূপে অবধারণ করা এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিষয়—শিক্ষানীতি, সমাজনীতি, পারিবারিক জীবন প্রভৃতি সমুদয় বিষয় তদনুসারে গঠিত করিয়া চলা।

জাতীয়তার কুসংস্কার

মানুষে মানুষে মিল যেমন সুন্দর ও স্বাভাবিক, অমিলও তেমনই অশোভন ও নানা দুঃখের কারণ; কিন্তু সচরাচর উহা দৃষ্ট হয়। বোধ হয় মানুষ মানুষকে যতটা ঘৃণা করে, এমন আর কিছুকে নয়—অবশ্য মানুষে মানুষে প্রীতি-প্রেম দুর্ল্লভ নহে, এবং তাহাই জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু।

এরূপ একটা বিদ্বেষের কুসংস্কার লইয়া, একজাতি অপর জাতির নিন্দা করে। নিন্দা করে অবশ্যই কোনও ব্যক্তি—জাতির হইয়া ; আর অপরের নিন্দাতে তার আপনার গৌরববোধই সে প্রধানতঃ করিয়া থাকে। কোন জাতির দোষ গুণ বলিয়া আমরা যাহা ধরিয়া লই, ব্যক্তি হিসাবে কোনও লোকের মধ্যে বা সকলের মধ্যে ঠিক্‌ঠাক্ রূপে তাহা নাই বা থাকে না।

জাতির বিদ্বেষ আবার দেশের নামে চলে। নিকটবর্ত্তী দেশ বা প্রদেশস্থ লোকের মধ্যে পরস্পর এই নিন্দা ও বিদ্বেষের ভাব অধিক। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গের বিরোধ, বাঙ্গালীতে উড়িয়ায় এবং বাঙ্গালী বেহারীর বিদ্বেষ—'বাঙ্গাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্তু' ইত্যাদি বাক্যের প্রচলন। বাঙ্গালীর নিকটে পশ্চিমে লোক ছাতুখোর, পাঞ্জাবীর কাছে ইউ পি-ওয়ালা মেরুদণ্ড-বিহীন, গুজরাটী সিন্ধী অসভ্য অসামাজিক, ইত্যাদি। এ সমস্ত অতিনৈকট্যজনিত দোষ। এ সকল মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই ইহাদের প্রত্যেক লোকই আপন আপন জাতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে যখন ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতিগুলি আপন আপন প্রতিষ্ঠা স্থাপনে অতিমাত্র ব্যস্ত ছিল, তখন এই জাতীয়তার কুসংস্কার তাহাদের মধ্যে প্রবল ছিল—আজও তাহার বিরাম হয় নাই। তখন একজন সাধারণ ইংরেজ মনে করিত যে ওলন্দাজেরা অতিমাত্র লোভী (avaricious) দুর্ব্বৃত্তের দল, ফরাসী জাতি তোষামুদে চাটুকার (sycophant), জারম্যানেরা বদ্ধমাতাল (druken sots) ও পশুর ন্যায় আহারী (beastly gluttons) আর স্পেনীয়েরা উদ্ধত গর্ব্বিত উগ্র ও পরপীড়ক জাতি। আর ইংরেজেরা সাহসী, সদাশয়, করুণ এবং জগতের যাবতীয় গুণের অধিকারী। ইংরেজী সাহিত্যে এরূপ পরগুণ বাচক অনেক শব্দের প্রয়োগ আছে ও তাহা বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে—অবশ্য জারম্যান ও ফরাসী ভাষাতেও ইংরেজের ঐরূপ গুণব্যাখ্যা রহিয়াছে। এ সকল কাণ্ড দেখিয়া ইংরেজ কবি গোল্ডস্মিথ্ (যাঁহার সরলচিত্ত ও স্বাভাবিক সামাজিক দৃষ্টিপটুতার ভূয়সী প্রশংসা আছে) বলিয়া গিয়াছেন,—নিরপেক্ষ বিচারে হয়ত দেখা যাইবে যে, 'ওলন্দাজেরা ইংরেজের চেয়েও অধিক মিতব্যয়ী, ফরাসীরা ইংরেজের চেয়েও অধিক পরিমিতব্যবহারী ও ভদ্র, জারম্যানেরা অধিক কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী, স্পেনীয়েরা অধিকতর স্থির ও গম্ভীর, আর ইংরেজজাতি সাহসিক বা উদার প্রকৃতি হইলেও, বড় গোঁয়ার (rash), অবাধ্য মাথাপাগল (head strong) উগ্র (impetuous), সমৃদ্ধিতে অতিমাত্র স্পর্দ্ধিত ও বিপদ পাতে তেমনই নিরাস ও উৎসাহহীন—'Too apt to be elated with prosperity, and to despond in adversity' ; ইত্যাদি।

মানুষের এ কুসংস্কার আইসে প্রধানতঃ আত্মদৃষ্টির অভাবে। যতখানি উৎসাহ লইয়া অপরের দোষ দেখিতে চাহে, তাহার কিছুমাত্র অংশে যদি কেউ নিজ চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে যায়, তবে এ সকল কুসংস্কার আপনিই কাটিয়া যায়। যাঁহারা তাহা বিশেষ করিয়া করিয়াছিলেন ও মানবচরিত্র ও জগতের নীতির প্রকৃত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বলিয়া জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে সমান দেখিবার ও এ সকল কুসংস্কারের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় করিয়া গিয়াছেন।

গোল-টেবিলের কথা

এ যাবত গোল-টেবিলের বৈঠক সম্বন্ধে অনেক কথা বলা ও শুনা হইয়াছে। ব্রিটিশ ও

ভারতীয় লোকেরা এক পর্য্যায়ে বসিয়া ভারতের শাসনব্যবস্থার কোনও মীমাংসা করিয়া লইতে পারে, এই জন্য এই বৈঠকের সৃষ্টি হয়। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে রাউলেট্‌বিল ও জালিয়ানওয়ালবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমুদ্‌ভাবিত অসহযোগ আন্দোলন যখন এদেশের রাজনৈতিক-ক্ষেত্রকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তোলে, তখন তাহাতে শান্তিকামনায় কতিপয় ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম এই গোল-টেবিলের কথা তোলেন। যতদূর মনে হয়, কংগ্রেসমণ্ডল হইতেই প্রথমে এই কথা শুনা গিয়াছিল—কিন্তু বিধিচক্রে কংগ্রেসই আজ এই বৈঠক হইতে অপসারিত রহিয়াছে! আর যে শাসনকর্ত্তৃপক্ষ তখন এই কথা কিছুমাত্র আমলে আনিতে পারেন নাই, তাহারাই এক্ষণে উহার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ততা দেখাইতেছেন। প্রধানতঃ সাইমন কমিশন রিপোর্টে ভারতবাসী মাত্রেরই বিক্ষোভ দেখিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট বা আশ্বস্ত করিবার জন্যই ভাইসরয় ও ষ্টেট্ সেক্রেটারী (যাহাদের সহিত ভারতীয়দিগের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঘনিষ্টতর) গোল-টেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ বৈঠকের অন্তর্গঠন ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কেবল মাত্র যাহাদের হাতে এ সমুদয় ব্যাপার খেলার পুতুলের মত চলিতেছে, তাহাদের প্রকৃত মনোভাবটা কি তাহাই একবার দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে—

গোল টেবিলের গোল দেখাইতে গিয়া ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত অধিবাসী (লর্ড আইসলিঙ্গটন্) বলিতেছেন (Empire Review) যে, "It must always be borne in mind that the Simon Commission rests on the authority of the Imperial Parliament and that the Conference rests on that of the Secretary of State and the Viceroy, amittedly authorities, but not comparable especially in constitutionl question to the authority of Parliament Can any convincing reason be given for the irregularity of the change of procedure. etc. অর্থাৎ সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে যে কনফারেন্সই বসুক্ না কেন পরিণামে কমিশনের কথাই বলবৎ থাকিবে—কারণ কমিশন পার্লেমেণ্টের নিয়োজিত জিনিষ; আর তাহাতে ইংলণ্ডের জনসাধারণের বিচারের বিষয়ই গুরুতর—তাই বলিতেছেন, "When the issue comes before the electorate in this country it will not be so clearcut and simple as to leave the effective decision to be made. On the one side Indian Independence, on the other India's continuance within the Empire. শেষ মীমাংসা হইবে ইহার বিচারেই।

শবদাহে নূতন ব্যবস্থা

লোকের মন এখন অভিনব চাহে। তরুণ বা যুবা জাগরণের নামে তার সুখ্যাতিও শুনিতে পাওয়া যায়। তরুণের কাছে সকলই নূতন; তাহার মনের গতিও নূতনত্বের দিকে। কিন্তু আজ কাল অনেক প্রাচীনেও তরুণের ভাব দেখা যায়; নিয়ম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ দায়িত্ব সম্পন্ন বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে চপলতা দেখা দিতেছে। একটা নূতন কিছু করিতে হইবে, যাহাতে যশ ও কীর্ত্তি থাকে। এরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তি আজ-কাল সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান জগতের অপরীক্ষিত উন্নতির নামে, অর্দ্ধভুক্ত বিজ্ঞান-জ্ঞানের দোহাই দিয়া, আপন মনঃকল্পিত শিষ্টতা ও ও সভ্যতা বলিয়া, ঔদ্ধত্যের নামে, লোকে ইহার প্রসার করিতে চায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও বায়ুমণ্ডল এখন উদ্দাম-ভাবে পরিপূর্ণ। এমন ভাবে চলিয়া লোকের জীবনে এখন যে অতিরিক্ত

কৃত্রিমতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, অদ্যকার এই ছায়াচিত্রের ন্যায় জীবন তাহার প্রমাণ দিতেছে; আর ইহার গুরুতর অনিষ্টকারী আত্মঘাতী ফল সমাজ ও রাষ্ট্রে দেখা দিতেছে।

লোক চরিত্রে নূতন ভাবের মূল্য আছে যদি তা সংযত ভাবে চলে। কিন্তু অনেক বিষয় আছে, তাহাতে সহসা হস্তক্ষেপ করিতে নাই। মানবের চির আচরিত নিয়ম বলিয়া ইহারা চলিয়া আসিতেছে—বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত এই সকল নিয়মের পরস্পর তুলনা ও বিচার দ্বারা তাহাদের সভ্যতার তারতম্য হয়। মৃতের সংকার ঐরূপ একটী বিষয়।

হিন্দুর শবদাহ ব্যবস্থা যে উচ্চ সভ্যতার নিদর্শক, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু ব্যতীত আর সকল জাতি মৃতদেহ মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া তার সংকারের ব্যবস্থা করে। এ প্রথা অতি সহজ ও সরল আদিম কালের জনোচিত; ইহাতে মৃতদেহ গলিত হইয়া মৃত্তিকাতে পরিণত হয়; জড়জগতের অতি সাধারণ অবস্থায় উহার পরিণতি লোকের দৃষ্টির গোচরে আইসে। আর মৃতের আত্মীয় ও পরিজন এবং অন্যান্য লোকেরা তাহার স্থূল কবর স্থানের উপরে স্নেহ, শোক বা অনুরাগের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। স্থান বিশেষে লোকের ভয় ত্রাসাদির কারণ হয়। লোকাতীত কোনও উচ্চ ভাবের পরিচয় ইহাতে নাই। কিন্তু তবুও মুসলমান বা খৃষ্টানের সমাধি-সংকার-বিধির কোন পরিবর্ত্তন করিতে কেহ সাহসী হয় নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, মৃতদেহের সংকারের মত এমন গম্ভীর ও হৃদয়-ভেদী ব্যাপার আর নাই—এজন্য অন্য সকল ব্যাপারে লোকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা ক্ষমতা ও পদবী অনুসারে নানাবিধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকিলেও মৃতের সমাধি লইয়া কেহ কখনও খামখেয়ালী পরিবর্ত্তন করিতে যায় নাই—রাজা-প্রজা উচ্চ-নীচ সকলের এক ভাবেই সমাধি হইয়া থাকে। ইহা লইয়া কোনও আইন-কানুন কেহ কখনও করে নাই, যেমন ভাবে স্মরণাতীত কাল হইতে উহা চলিয়া আসিতেছে, সেভাবেই চলিতেছে। হিন্দু-ইতর অপর জাতি মনে করে জীবদেহ মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত; সুতরাং মরণের পর উহাকে মৃত্তিকাতেই প্রোথিত করিতে হইবে।

হিন্দুর জন্মমৃত্যুর ধারণা ও বিশ্বাস অন্যরূপ। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমুদয় লোক ও জীব সহ মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত; তাহা আবার পরব্রহ্ম নারায়ণ হইতে সম্ভূত—'ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্। 'অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী'—(শঙ্কর ভাষ্য গীতানুক্রমণিকা।) এজন্য হিন্দু-জীবনের সমুদয় কার্য্য—সংস্কারাদি অধ্যাত্মতত্ত্বের দৃষ্টিতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। সেই ভাবেই শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়; হিন্দুর শবদাহ এক যজ্ঞ বিশেষ—পরম পবিত্র অগ্নির সাহায্যে (যাহার স্থান প্রাচীন যজ্ঞ পদ্ধতিতে অতি উচ্চ) দাহ করিতে হয়। শবদাহেরও বৈদিক বিধি আছে। সে বিধির সাক্ষাৎ সম্বন্ধও অধ্যাত্ম তত্ত্বের সহিত। এতদ্ভিন্ন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান বিধিতে মৃতের প্রতি তাহার আত্মীয় ও পরিজন গণ তাৎকালীন যে মনোভাবের পোষণ করে, তাহাতে একদিকে যেমন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকারীদিগের মনোবৃত্তির সংস্কার সাধন হয়, মনোশক্তির প্রভাবে মৃতাত্মার কল্যাণও তাহাতে সেইরূপ সাধিত হইয়া থাকে—এ সকল কারণে হিন্দুর মৃতদেহের সংস্কার প্রণালীতে যে বিস্তারিত বিধি আছে তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে বিশেষরূপ বিবেচনা করা আবশ্যক।

ভারতের সাধনা কোন্ পথে ?

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ

প্রত্যেক ব্যক্তিরই অভীষ্টলাভের জন্য একটা সংস্কারগত যত্ন বা চেষ্টা দেখা যায়। এই যত্ন বা চেষ্টা প্রত্যেক মানবেরই পৃথক্। যেমন দুইটী মানব একরূপ দেখা যায় না, এই যত্ন বা চেষ্টাও ঠিক একরূপ কোন দুইটী মানবে দেখা যায় না। এই যত্ন বা চেষ্টা যেমন সেই ব্যক্তির সাধনা নামে অভিহিত করা যায়, তদ্রূপ প্রত্যেক মানব জাতিরও নিজ নিজ স্বাভীষ্ট লাভের জন্য একটা না একটা চেষ্টা বা যত্ন দেখা যায়, তাহাই সেই জাতির সাধনা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। দেশভেদে জাতিভেদ ধরিয়া আমরা এক্ষণে ভারতবাসীর সাধনা কোন্ পথে তাহারই আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

অবশ্য ভারতবাসী বলিতে আমরা বেদপ্রামাণ্যবাদী হিন্দু জাতিকেই গ্রহণ করিতেছি। ইহার কারণ, ভারতের ইতিহাসে তাহারাই ভারতের আদিম অধিবাসী এবং তাহারাই আজও পর্য্যন্ত নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ এত প্রাচীন সভ্য জাতি জগতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণায় আমরা বাল্যকালে ভারতের আদিম অধিবাসী বলিতে সাঁওতাল কোল ও ভীল প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্য জাতি শিখিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, উহা আমরা ভুল শিখিয়াছিলাম। তাঁহারা নিজেরা যেমন দুই হাজার বৎসর অগ্রে আমমাংসভোজী অসভ্য বর্ব্বর ছিলেন, নিজের মাপকাটীর দ্বারা আমাদিগকেও তাহাই ধরিয়া লইয়া মানব ইতিহাসের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ-গণকেও, অথবা এই আদিম ভারতবাসিগণকে অসভ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" এ সত্য এস্থলে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমাদিগকে অসভ্যজাতিসম্ভূত বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারিলে যে আমাদের উপর তাঁহাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সুতরাং তাঁহাদের নানারূপ সুবিধাই হইবে—এ উদ্দেশ্যও যে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রধান কারণ, তাহাও আজ আমাদের বুঝিতে ইচ্ছা হইতেছে। পাশ্চাত্যগণের এই স্বভাবপ্রভাব এবং এই অভিসন্ধির কথার সহিত যখন আমরা আমাদের বেদাদি শাস্ত্রের স্বরূপ উৎপত্তি ও বিস্তারতত্ত্ব আলোচনা করিলাম, তখন বুঝিলাম, আমরা বাল্যে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা ভুলই শিখিয়াছিলাম। অতএব ভারতবাসী বলিতে গেলে আমরা ভারতের আদিম অধিবাসী বেদপ্রামাণ্যবাদী এই হিন্দু জাতিই বুঝিব; আর সেই ভারতবাসীর সাধনা কোন্ পথে এক্ষণে তাহাই চিন্তা করিব।

ভারতবাসী আমাদের সাধনা কোন্ দিকে এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আমাদের সাধনার লক্ষ্য অনাদি অনন্ত নিত্যাবস্থালাভের দিকে। নিত্যাবস্থালাভ আর দুঃখশূন্য নিত্যসুখ লাভ একই কথা; কারণ, অনিত্যেই দুঃখ, অধিক কি অনিত্য সুখেও দুঃখ, আর কেবল দুঃখকেও নিত্যাবস্থা বলা যায় না, যে হেতু অবস্থান্তরেই দুঃখের উৎপত্তি। অতএব নিত্যাবস্থালাভ ও নিত্য সুখলাভ এক কথা, আর এই নিত্যাবস্থালাভই ভারতবাসীর সাধনার চরম লক্ষ্য।

এখন ভারতের সাধনা যদি এই নিত্যাবস্থালাভের দিকেই হইল, ইহার সাধনার লক্ষ্য যদি এই নিত্য সুখলাভই হইল, তবে এই লক্ষ্যলাভ হয় কিসে, তাহাও ইহার লক্ষ্যান্তর্গত হইবে। কারণ, লক্ষ্যলাভের উপায়ও কতকটা লক্ষ্যই হয়। যেহেতু বিশেষ বিশেষ উপায় সাহায্যেই বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যলাভ হয়। সকল উপায়ে সকল লক্ষ্য লাভ হয় না। প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ বিভিন্নই হয়। কার্য্যভেদ থাকায় কারণভেদ অবশ্যম্ভাবী। অতএব ভারতের সাধনাও ভারতের লক্ষ্য বটে।

এখন ভারতের সাধনা যদি ভারতের লক্ষ্য হইল, তবে সেই সাধনাটী কি, নির্ণয় করা আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাই, এই সাধনানির্দ্দেশ করিতে যাইয়া নানা মনীষী নানা পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। স্থূলভাবে বলিতে গেলে তাহা কেহ বলেন—ভক্তি, কেহ বলেন—কর্ম্ম, কেহ বলেন—জ্ঞান, কেহ বলেন—ভক্তিমিশ্রিত কর্ম্ম, কেহ বলেন—ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞান, কেহ বলেন—কর্ম্মমিশ্রিত জ্ঞান এবং কেহ বলেন—কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনের মিশ্রণই সেই পথ।

বস্তুতঃ, বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, সকল মতেই সত্য আছে; কেহই একেবারে ভুল নহে। তবে সত্যের অল্পাধিক্যই যে এস্থলে বর্ত্তমান, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আবার মুখ্য ও গৌণ ভেদ করিয়া এবং স্বরূপসমুচ্চয় ও ক্রমসমুচ্চয় ভেদ করিয়া আবার নানা মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। যাউক এই মতভেদের কথা। কিন্তু যাহাই কেন উপায় বা পথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক না, তাহাই যে বেদোক্ত উপায় বা পথ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ ভারতের যে পথ, সে পথে জ্ঞানই হউক বা ভক্তিই হউক, বা কর্ম্মই হউক অথবা ইহাদের কোনরূপ সংমিশ্রণই হউক, ইহা যে বেদোক্ত বা বেদসম্মত হওয়া আবশ্যক, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়। ভারতের সাধনার পথের ইহাই বিশেষত্ব। অন্য দেশবাসীর বা অবৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীর সাধনা কোন মহাত্মা বা অবতার পুরুষবিশেষের নির্দ্দিষ্ট পথ, অথবা প্রয়োজন বুঝিয়া জনসাধারণকর্ত্তৃক কোন নির্দ্দিষ্ট পথই হইয়া থাকে, কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীর সাধনার পথ তাহা নহে, উহা বেদোক্ত পথই হইয়া রহিয়াছে। ইহাই ভারতের সাধনার বিশেষত্ব।

এখন কিন্তু মনে হইতে পারে—ভারতের সাধনায় এই বিশেষত্ব কেন? কেন ভারত বেদোক্ত পথই তাহার সাধন পথ বলিয়া গ্রহণ করিল। ইহার এক কথায় উত্তর এই যে, লৌকিক উপায়ের অতীত বা অপ্রাপ্ত বিষয়ে অথবা অলৌকিক বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞের বাক্যই প্রমাণ হয়, চির অভ্রান্ত ব্যক্তির উপদেশই গ্রাহ্য হয়। অল্পজ্ঞের বাক্য বা উপদেশ প্রমাণ বা গ্রাহ্য হয় না।

কারণ, প্রথমতঃ মানব যাহা প্রাণে প্রাণে চায়, যাহা সে একান্তভাবে অন্তরে অন্তরে চায়, তাহা বাস্তবিক পক্ষে দুঃখশূন্য সুখ। মানবের চরমাভীষ্টের বিষয় উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, মানব চায় অমিশ্র সুখ, নিত্য তারতম্যরহিত সুখ। কিন্তু এরূপ সুখ যে হইতে পারে,

এরূপ সুখের যে সম্ভাবনা আছে, তাহা ত যুক্তিবিচারদ্বারা পাওয়া যায় না। যুক্তি বিচারে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে সুখ দুঃখশূন্য হয় না। দুঃখশূন্য নিত্য সুখ কল্পনারই কথা। তবু মানব তাহাই চায়, তথাপি মানবপ্রকৃতি তাহারই অভিলাষী। অতএব এরূপ সুখ অলৌকিক বস্তু, ইহা লৌকিক বস্তুই হইতে পারে না। যুক্তি বিচারে এরূপ সুখ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় আজ কাল স্বাধীনচিন্তক বহু ধুরন্ধর দার্শনিকগণও দুঃখশূন্য সুখ কল্পনারই কথা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ক্রমোন্নতিবাদেরই শরণাপন্ন হইয়াছেন। ক্রমোন্নতির সুখ দুঃখশূন্য সুখ হয় না।

তাহার পর অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ মানব এরূপ অলৌকিক বস্তুর সন্ধান কিরূপে পাইতে পারে? একেত এরূপ বস্তুই অসম্ভব, কেবল তাহার প্রাণ চায় বলিয়া তাহা সম্ভব মনে করিয়া অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ কি করিয়া তাহার লাভের উপায় আবিষ্কার করিতে পারে? যে ব্যক্তি এরূপ সুখ পাইয়াছে সে ব্যক্তি যদি ইহার পথ না দেখাইয়া দেয়, তবে সে কি করিয়া ইহার পথ আবিষ্কার করিতে পারে? অকূল পাথারে পতিত ব্যক্তি কি কোন দিকে সন্তরণ করিবার চেষ্টা করে? কিন্তু যদি সে জানে যে, এই দিকে কূল পাইব, তবে সে সেই দিকে ভাসিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে। নচেৎ সেই ব্যক্তি হতাশ হৃদয়ে ডুবিয়াই মরে। এই জন্য অলৌকিক বস্তু লাভের উপায়—সর্ব্বজ্ঞের উপদেশ, চির অভ্রান্তের নির্দ্দেশ, বা অলৌকিক ব্যক্তির কথাই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, মানব প্রকৃতির আলোচনা করিলেও দেখা যায়, মানব কোনরূপ অলৌকিক বিষয়ের জন্য অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরই শরণাপন্ন হয়। চিকিৎসা, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, অবস্থোন্নতি প্রভৃতির জন্য মানব নিজ চেষ্টা ব্যতীত মণি মন্ত্র মহৌষধির জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তির আনুগত্য করে। আর এ ক্ষেত্রে প্রার্থী ব্যক্তির তুলনায় এরূপ মণিমন্ত্রমহৌষধিজ্ঞ ব্যক্তি যে কতকটা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন তাহা সহজেই বুঝা যায়, ইহা সকলেই স্বীকারও করিয়া থাকেন। অতএব দেখা গেল, অলৌকিক বিষয়লাভের জন্য অলৌকিক উপদেশই আবশ্যক।

বস্তুতঃ, ঠিক এই জন্যই ভারতবাসী বেদের শরণাপন্ন হইয়াছে। বেদোপদিষ্ট পথেই ভারতবাসী তাহার সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার কারণ গুরুপরম্পরাক্রমে অবগত হওয়া যাইতেছে এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিদ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, বেদই অলৌকিক বস্তুলাভের জন্য অলৌকিক উপায়, বেদই সর্ব্বজ্ঞের বাক্য, বেদই চির অভ্রান্তের উপদেশ। কেবল তাহাই নহে, সর্ব্বজ্ঞের বাক্য বলিয়া, চির অভ্রান্তের উপদেশ বলিয়া বেদ নিত্য, বেদ অপৌরুষেয় অর্থবদ্ধশব্দরাশি।

কিন্তু একথাটা শুনিবামাত্র আজ কাল আমাদের শরীর যেন শিহরিয়া উঠে। এ্যা বেদ মনুষ্য রচিত নহে! বেদ আবার নিত্য শব্দরাশি!! বেদ অভ্রান্ত সত্য!!! কি সর্ব্বনাশ, অর্থযুক্ত বর্ণাত্মক ভাষা কি মনুষ্য ভিন্ন উচ্চারিত হয়? যে শব্দ উচ্চারণমাত্রই বিনষ্ট হয়, তাহা আবার নিত্য হয় না কি? আর বেদেই যদি সত্য থাকে, তবে বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাভেস্তা ও মহাত্মাগণের উপদেশে কি সত্য থাকিবে না? আর ইহারা যদি অভ্রান্ত না হয় তবে বেদই বা অভ্রান্ত বলা যায় কি করিয়া? এরূপ কল্পনা সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে কতকগুলা গোঁড়া অজ্ঞেরই কল্পনা; ইত্যাদি।

বাস্তবিক আজ বর্ত্তমানের শিক্ষায় আমাদের এইরূপই মনে হয় বটে, কিন্তু বিচারদৃষ্টিতেই ইহা অন্যথা প্রতিভাত হইবে। সেই সহস্র বৎসরে পূর্ব্বের গোঁড়া ব্যক্তিদের কথাই ঠিক বলিয়া

বুঝিতে পারা যাইবে। আর এই জন্যই "ভারতের সাধনা কোন পথে" এ প্রশ্নের উত্তর—"বেদোপদিষ্ট পথে" বলা হয়।

এখন তাহা হইলে আমাদের প্রথম দেখিতে হইবে বেদ বলিতে কি বুঝায়? দ্বিতীয়তঃ বেদের শব্দরাশি নিত্য অপৌরুষেয় কেন? তৃতীয়তঃ বেদ অভ্রান্ত কেন?

প্রথমতঃ, বেদ বলিতে অর্থবদ্ধ নিত্য শব্দরাশি বুঝায়। অনেকে বলেন, বেদ বলিতে সত্য জ্ঞানরাশি। যে কোন শব্দের দ্বারা তাহার প্রকাশ সম্ভবপর। কিন্তু ইহা বেদজ্ঞগণের কথা নহে। যে জ্ঞানের আদানপ্রদান হয়; তাহা শব্দসাহায্যেই হয়। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য। আর প্রত্যেক শব্দের অর্থও ভিন্ন ভিন্ন। একার্থক শব্দের মধ্যেও অর্থের সূক্ষ্ম ভেদ আছে। ব্যবহারে উহা গ্রাহ্য হয় না এই মাত্র। অতএব যাহারা বেদ বহন করায় আজ বেদ পাওয়া যাইতেছে, তাঁহাদের কথায় বেদ উক্তরূপ শব্দরাশি। জ্ঞানরাশি নহে। বেদের সত্য অন্য ভাষায় ঠিক্ বেদের মত করিয়া বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ—বেদের শব্দরাশি নিত্য, ও অপৌরুষেয়। ইহার কারণ, আমরা দেখিতে পাই, আমাদের ভাষা দুই প্রকার, যথা—ধ্বন্যাত্মক ভাষা ও বর্ণাত্মক ভাষা। হাসি কান্নার ভাষা ধ্বন্যাত্মক এবং সংস্কৃতাদি ভাষা বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক ভাষা আমাদের স্বাভাবিক, না শিখিলেও আপনা আপনি বিকশিত হয়; কিন্তু বর্ণাত্মক ভাষা না শিখিলে বিকশিত হয় না।

বর্ণাত্মক ভাষা যে না শিখাইলে আপনা আপনি বিকশিত হয় না তাহার কারণ, প্রথম দেখা গিয়াছে, মানবসন্তান পিতামাতার ভাষাই ব্যবহার করে। বাঙ্গালী শিশুর ইংরাজী ভাষা আপনা আপনি প্রকাশ হয় না।

২য়—ইতিহাসও ইহাই সাক্ষ্য দেয়। যথা- (ক) ইটালির রোমনগরের প্রতিষ্ঠাতা রমিউলাস্ ও তাহার ভাই রুমাস্‌কে রাজ্যলাভাশায় শত্রুপক্ষ কর্তৃক জন্মমাত্র একটী হাড়ির ভিতর করিয়া টাইবার নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। নদীতীরবর্ত্তী গভীর অরণ্যমাঝে হাড়িটী আটকাইয়া গেলে এক বাঘিনী হাড়িটী উঠায় ও শিশু দুইটীকে দুগ্ধ দিতে থাকে। কারণ, বাঘিনীদের সন্তান নষ্ট হইলে তাহারা দুগ্ধ খাওয়াইবার জন্য ব্যাকুল হয়। এই শিশু দুইটী বালক অবস্থায় পদার্পণ করিলে ব্যাধগণ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। ইহাদের আচরণ ব্যাঘ্রের ন্যায় হইয়াছিল। কোন মানবীয় বর্ণাত্মক ভাষার বিকাশ ইহাদের হয় নাই। পরে শিক্ষা পাইলে বর্ণাত্মক ভাষার বিকাশ হয়।

(খ) সম্রাট আক্‌বর বাদশাহ, মানবের কোন্ ভাষা আদি বা স্বাভাবিক জানিবার জন্য দুইটী শিশুকে মাতৃক্রোড় হইতে নিভৃতে এমন ভাবে পালন করেন যে, তাহারা একদিনও মানবের ভাষা শুনিতে পায় নাই। দেখা গিয়াছিল, তাহাদের কোনও ভাষার বিকাশ হয় নাই, পরে শিখাইলে তাহা শিখে।

(গ) মেদিনীপুরে কমলা নাম্নী একটী বালিকা শিশু অবস্থায় নেক্‌ড়ে বাঘ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। পরে বালিকা অবস্থায় ধৃত হইলে দেখা গেল, তাহার কোন ভাষার বিকাশ হয় নাই। শিখাইলে সে ভাষার ব্যবহার করে।

(ঘ) আগ্রাতেও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

(ঙ) টাইফয়েড জ্বরে মানব ভাষা ভুলিয়া গেলে যে ভাষা শিখান যায় সেই ভাষাই বিকাশ

হয়, পূর্ব্বের ভাষার বিকাশ হয় না। তাহার পর এ নিয়মের ব্যভিচারও কোথাও দেখা যায় না। ইতিহাসে ইহার সাক্ষ্য নাই। অতএব দেখা গেল—বর্ণাত্মক ভাষা না শিখিলে শিখা যায় না, বা আপনাআপনি বিকশিত হয় না। এখন অতি সুসভ্য মানব সন্তানের যদি এই দশা, তখন বহুকাল পূর্ব্বে বনমানুষযুগে ভাষা আপনা আপনি বিকশিত হইতে হইতে ক্রমে এই ব্যবহ্রীয়মান ভাষায় পরিণত হইয়াছে –একল্পনার কোন মূল্য নাই।

তারপর দেখা অবশ্যক শব্দ নিত্য কি অনিত্য? শব্দ উচ্চারণমাত্রই নষ্ট হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করেন, অতএব শব্দ নিত্য নহে, ইহা কেহ কেহ বলেন। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, "ইহা সেই শব্দ" এইরূপ যখন আমাদের প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তখন শব্দের অভিব্যক্ত রূপ নষ্ট হইলেও তাঁহার একটী অব্যক্ত নিত্যরূপ অবশ্যই আছে, বলিতে হয়। ইহা দর্শন শাস্ত্রে স্ফোটবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপে দেখা যায় শব্দ উচ্চারণ মাত্র নষ্ট হইলেও ইহার নিত্যরূপ আছে।

এখন শব্দ যদি নিত্যও হয় এবং না শিখাইলে তাহার ব্যবহার জানা যায় না, তবে মানবকে ইহা প্রথমে কে শিখাইলেন? যিনি প্রথমে শিখাইলেন, তাঁহারও উহা আপনা আপনি বিকশিত হয় নাই। অতএব তাঁহাকেই বা কে শিখাইলেন? এইরূপ দেখা যাইবে, যেহেতু ইহা না শিখাইলে আপনা আপনি জানা যায় না, এবং পৃথিবী ও মানবের উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য, সেই হেতু মানবের যিনি আদি শিক্ষক তিনি এই ভাষা জানিতেন। আর ভাষা নিত্য বলিয়া তিনিও নিত্য। সুতরাং জন্মমৃত্যুর অতীত কোন নিত্য ব্যক্তি এই নিত্য ভাষা মানবকে প্রথমে শিখাইয়াছেন বলিতে হইবে। আর ইহা যদি হয়, তবে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞও বলিতে হইবে। জন্মমৃত্যুহীন স্বতঃজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন আর কি হইতে পারেন?

এখন যদি বলা যায়—এই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিই বেদের ভাষা রচনা করিয়াছেন। বেদ নিত্য নহে। তাহাও কিন্তু বিচারসহ হয় না। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ যদি উহা রচনা করেন, তাহা হইলে রচনার পূর্ব্বে তিনি উহা জানিতেন কিনা? যদি বলা যায়–জানিতেন, তাহা হইলে আর রচনা সম্ভবপর হয় না। যেমন যে গানটি আমি জানি, তাহার কখন কখনও আমার রচনা হয় না। যাহা আমি জানি না, ভাবিয়া ভাবিয়া বিন্যাস করি, তাহাই আমার রচনা হয়। আর যদি বলা যায়, তিনি উহা জানিতেন না, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বই সিদ্ধ হয় না। অতএব সর্ব্বজ্ঞ বেদ রচনা করেন নাই। বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। তাহার পর সৃষ্টি যে অনাদি এবং চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল, তাহাও অনায়াসে বুঝা যায়। ইহা না স্বীকার করিলে জগৎতত্ত্ব ব্যাখ্যাই করা যায় না। ইহা দার্শনিকগণেরই সিদ্ধান্ত। ঐজন্য এস্থলে আর ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করা হইল না। ইহা করিতে হইলে পৃথক্ প্রবন্ধের আবশ্যকতা হয়। সুতরাং অনাদি সৃষ্টি বলিয়া এবং নিত্য পুরুষের ভাষাও নিত্য বলিয়া সেই ভাষার মধ্যে এই অনাদি সৃষ্টির কথা, এই অনাদি নিত্য ভাষার কথা, এই অনাদি নিত্য পুরুষের কথা সবই থাকা আবশ্যক। বস্তুতঃ, এই সব কথা বেদের মধ্যেই আছে। বেদই বিধাতা ব্রহ্মা প্রথমে তাঁহার পুত্রকে দান করেন। পরে দেবতা ও ঋষিগণ মানবগণকে দান করেন। প্রতি সৃষ্টিতে এইরূপ হয়—ইত্যাদি সকল কথাই বেদের মধ্যে উক্ত হইয়াছে। আর সেই বেদেই উক্ত হইয়াছে দুঃখশূন্য নিত্য-সুখলাভ হয়, সেই বেদেই উহার উপায়ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বেদ এইরূপে যেমন অলৌকিক বস্তু

বেদের উপদিষ্ট বিষয়ও তদ্রূপ অলৌকিক বস্তু। আর এই জন্যই ভারত তাহার সাধনা বেদোক্ত পথেই করিয়া আসিতেছে।

এখন দেখিতে হইবে বেদ অভ্রান্ত কেন? কিন্তু এই কথাটী বুঝিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে—আমাদের জ্ঞান কিরূপে হয়, আর সেই জ্ঞান মধ্যে ভ্রমই বা হয় কেন?

আমরা দেখিতে পাই, আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয় মনঃ প্রভৃতি বিষয়ের সাহায্যেই হয়। আর যদি সেই ইন্দ্রিয়াদির কোন দোষ থাকে, মনের যদি কোন দুরাগ্রহ বা ক্ষোভাদি থাকে, তবে আমাদের জ্ঞান ঠিক্ ঠিক্ উৎপন্ন হয় না। আর তাহা না হইলেই আমাদের ভ্রম হয়। আচ্ছা, বেদবক্তা পুরুষ যদি জন্মমৃত্যু হীন হয়, তবে তাঁহার যে জ্ঞান তাহা ইন্দ্রিয়াদিসাপেক্ষ হয় না। আর ইন্দ্রিয়াদি সাপেক্ষ যদি জ্ঞান না হয়, তবে তাহার ভ্রম হইবার আর সম্ভাবনাই বা কোথায়? অতএব দেখা যাইতেছে, যেহেতু বেদ নিত্য, সেই হেতু অপৌরুষেয়, আর সেই হেতু অভ্রান্ত।

আর বেদ যদি অভ্রান্ত হয় তবে তাহা যে উপদেশ দিবে, তদনুসারে চলিলে যে আমরা আমাদের চরমাভীষ্ট লাভ করিব, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বস্তুতঃ এই জন্যই ভারত আজ বেদোক্ত পথেই সাধনে প্রবৃত্ত, ভারতের সাধনা বেদোক্ত পথে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বেদ আজ চাষার গান, প্রাচীন সমাজের ইতিহাস, অতীত বর্ব্বরতার স্মৃতি চিহ্ন প্রভৃতি বলিয়া আমরা আশৈশব শিক্ষা করিতে বসিয়াছি। যে বেদের জন্য স্মরণাতীত কাল হইতে কোটি কোটি ব্যক্তি প্রাণ দান করিয়াছেন, যে বেদরক্ষার জন্য ভগবান কতবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, যে বেদরক্ষার জন্য কতরূপ প্রকারেই তাহাকে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা হইত, যে বেদ নিত্য পাঠ্য, যে বেদপাঠের ফলেই মানবের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া চরমাভীষ্টলাভের যোগ্যতা লাভ করিত, যে বেদমূলক আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই, যে বেদকে অমিত বুদ্ধি মহর্ষি দেবর্ষি মনীষী ও আর্য্যবৃন্দ অবনত মস্তকে পূজা করিয়া আসিয়াছেন, আর যে সমস্ত মনীষীবৃন্দের ভাষ্য লেখা এবং যুক্তিজাল আজ অতি বুদ্ধিমানও আজীবন বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, আর সেই বেদ আজ আমাদের নিকট চাষার গান, সেই সমস্ত আর্য্যাচার্য্য ও মনীষীবৃন্দ আজ আমাদের নিকট অজ্ঞ—এতদপেক্ষা অধঃপতন, এতদপেক্ষা বুদ্ধিদৈন্য, এতদপেক্ষা আত্মপ্রবঞ্চনা আর কি হইতে পারে?

পুরাণ ও মিথলজি

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র লাল সাহা, এম-এ

বিষয়জগতের কথা আমরা জানি। বিষয়জগৎ এবং ব্যবহারজগৎ। ইহার নাম জগৎ—সংসার। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। পদার্থ ও মন। বিষয় এবং ইন্দ্রিয়। বহিঃ প্রকৃতি ও অন্তঃ প্রকৃতি, এই দুই এর সংস্পর্শপথে ব্যবহারিক জগৎ চলিতেছে। 'মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ। ইহা প্রকৃত পক্ষে দুইটী জগৎ। এতদতিরিক্ত একটী তৃতীয় জগৎ আছে। একটী অতীন্দ্রিয় জগৎ। ইহাকে অনেক নামে অভিহিত করা যায়। দৈব বা দিব্য। আধ্যাত্মিক। অতিপ্রাকৃতিক। স্বর্গীয় ও স্বাপ্নিক। ইহা সীমাহীন। সুতরাং সর্ব্বব্যাপী। এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা এই দৈব জগতের কোন অনুভূতি হয় না। স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি ইহার কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে না।

এই অতীন্দ্রিয় জগতের অনেক স্তর, অনেক প্লেন, অনেক বিভাগ আছে। অতীন্দ্রিয় ও অতিপ্রাকৃতিক কথার এক অর্থ হইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা জানা যায় না তাহাই অতীন্দ্রিয়, কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের উপরিতন স্তরগুলি সমস্তই ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত; হিন্দু শাস্ত্রে যে চতুর্দ্দশ ভুবনের বর্ণনা আছে তাহা সমস্তই প্রকৃতিরাজ্যের অন্তর্গত। সপ্ত পাতাল এবং ভূলোক হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, সমস্ত লোকই প্রকৃতির অধীন। চতুর্দ্দশ ভুবনের শুধু পৃথিবী বা ভূর্লোকই স্বাভাবিক মানবেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আর সমস্তই অতীন্দ্রিয়। অতীন্দ্রিয় প্রাকৃতিক জগতের যৎকিঞ্চিত বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে। যন্ত্র সহকারে কতক কতক প্রমাণিত করিয়াছে। অধিকাংশ বিজ্ঞানের জ্ঞানশক্তির অতীত। গ্রহনক্ষত্র-জ্যোতিষাদির বিষয়ে অনেক তত্ত্ব বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিশ্বের যাহা জানিবার আছে তাহার কতটুকু ?

পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নাদি অন্যান্য বিজ্ঞানের আলোচনীয় যে সমস্ত অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম, **Immutable laws of Nature** তাহার অধীন যে বিশাল বিশ্বমণ্ডল, তদতিরিক্ত যে অতীন্দ্রিয় ও অতিপ্রাকৃতিক অনন্ত ভুবন, তাহারি বিষয় লইয়া এবং সেই বিষয় বিদিত হইবার চেষ্টা লইয়া পুরাণ ও মিথলজির ব্যাপার। প্রাকৃত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্বভাব-যুক্ত আর একটী জগৎ আছে। সেখানে প্রাকৃত জগতের কোন নিয়মের কোন প্রয়োগ নাই। সেখানকার জীবনের বিধিবিধানের গবেষণামূলক কোন বিশেষ বিজ্ঞান গড়িয়া উঠে নাই। এই মূল কথাগুলি মনে রাখিয়া পুরাণাদির আলোচনা করিতে হইবে। আমাদের চিত্ত ও চিন্তা-প্রণালী প্রাকৃতকর্ত্তৃক পরিপূরিত ও পরিচালিত। প্রাকৃত সংস্কারসমূহ হইতে মন ও বুদ্ধি মুক্ত করিয়া লইতে হইবে। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এই দুইটী ভিন্ন করিয়া চিন্তা করিতে হইবে। প্রশ্ন উঠিবে তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হয় ? সম্ভব হওয়ার কারণ এই যে অপ্রাকৃত স্বতন্ত্র হইলেও প্রাকৃতের বিরুদ্ধ নয়, প্রাকৃতের মতনই। উপাদান সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু নাম রূপের সাদৃশ্য আছে।

মানব মনের দুইটী উপাদান আর দুইটী গতি। একটী প্রাকৃত। একটী অপ্রাকৃত। একটী প্রাকৃতের অভিমুখে। একটী অপ্রাকৃতের অভিমুখে। সাধারণতঃ বাহ্যবিষয়সম্পর্ক লইয়াই অন্তঃকরণ ব্যাপ্রিয়মান রহিয়াছে। তবু কাহারো ঘন ঘন, কাহারো বা কদাচিৎ, দূরের দেশের আলোকলোকের আলোকাভাস আসিয়া মানসিক ব্যাপারের উপর পতিত হয়। ধরণীবক্ষ ভেদ করিয়া যেমন উৎস সলিল উৎসলিত হইয়া উঠে, কখন কখন তেমনি করিয়া আমাদের পরিস্ফুট জ্ঞান-চৈতন্য ভেদ করিয়া উচ্ছলিত হইয়া উঠে। অপূর্ব্ব অলৌকিক ভাবরসের উর্দ্ধ প্রবাহ। যাহার কোনো কারণও আমরা এদেশে খুঁজিয়া পাই না। এবং যাহা এ রাজ্যের বিষয়াবলীর সহিত আমরা মিলাইয়াও লইতে পারি না। বাহ্যজগতে সর্ব্বদাই আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। অপ্রাকৃতের জ্যোতি দেখিবার জন্য এবং অপ্রাকৃতের ধ্বনি শুনিবার জন্য চিত্তের অবসর নাই। চিত্ত ভৌতিক বস্তু লইয়া ব্যস্ত। অবিরত ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে বাহিরের পানে। স্থূল বিষয়ের পানে। বিপরীত দিকেও যে পথ আছে, মন সে কথাটী ভুলিয়াই থাকে। বাহিরের দিক্ যেমন আছে, অন্তরের দিকও তেমনি আছে। স্থূল বিষয় যেমন আছে, সূক্ষ্ম বিষয় বা দিব্য বিষয় তেমনি আছে। কিন্তু সে কথা ভাবিবার জন্য মনের অবকাশ নাই। মর্ত্ত্যজীবনের ইহাই অভিশাপ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,

পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ।
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন।

ইন্দ্রিয় সকল বাহিরের বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত। অন্তরের প্রতি তাহাদের বিশেষ কোনো প্রবৃত্তি দেখায় না। ইহাদিগকে বার্থাভিমুখী করিয়া সৃজন করিয়া বিধাতা যেন ইহাদের প্রতি হিংসাই প্রকাশ করিয়াছেন।

অন্তরের মধ্যে আমরা সময়ে সময়ে যেমন দিব্য-দেশের ছায়ালোকের ক্ষণিক খেলা দেখিতে পাই, বাহ্য প্রকৃতির মুখে বুকেও তেমনি খেলা কখনো কখনো নয়নগোচর হয়। আমাদের মনো-বুদ্ধির উপর কতকগুলি সাধারণ জ্ঞান-সংস্কারের আচ্ছাদন পড়িয়া রহিয়াছে। এইগুলিই প্রকৃত কুসংস্কার। এই অচ্ছাদনের কারণেই আমরা প্রকৃতির সত্যকার রূপ এবং প্রকৃতির মুখের অলৌকিক ভাবাভাসগুলি দেখিতে পারি না। আমরা যাহা দেখি তাহা প্রকৃত প্রকৃতি নহে। আমাদের বিকৃত জ্ঞান ও কল্পনার রচনা। অকর্ম্মণ্য চিত্রকরের হাতে রূপসী রমণীর মনোরমা প্রতিমূর্ত্তিখানি যেমন বিকৃত হইয়া প্রকাশ পায়, আমরা যে প্রকৃতিকে দেখি, তাহা প্রকৃত প্রকৃতির সেই প্রকার শ্রীহীন প্রতিমূর্ত্তি—রূপ নাই, ভাব নাই, প্রাণ নাই, আনন্দ-রস নাই। সত্যকার প্রকৃতিকে যদি আমরা দেখিতে পারিতাম তবে তাঁহার কাছে আমরা অনেক আলৌকিকের সংবাদ পাইতাম। দিব্য লোকের অনেক দৃশ্য প্রতিভাত দেখিতে পাইতাম। বুঝিতাম প্রকৃতি প্রাকৃত নহে। অপ্রাকৃত। প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের সম্বন্ধের সন্ধান পাইতাম। দৈব ও মানুষের মিলন সন্ধি কোথায় তাহাও অনুমান করিতে পারিতাম। মানবের জড়প্রবণতা ও জড়াসক্তি, মানুষের ইন্দ্রিয়পরতা এবং তজ্জনিত গভীর মনোমলিনিমা, এবং এই প্রকারে সঞ্জাত তমোভাব হইতে অর্থাৎ মনোবৃত্তির নিদ্রালস্য ও ভ্রান্তিভাব হইতে অপ্রাকৃতের প্রতি অবিশ্বাস—ইত্যাদি কারণে অমরা দিব্য লোকের

সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাই, অসুরেরা সময়ে সময়ে স্বর্গ অধিকার করিয়া দেবতা দিগকে স্বর্গ হইতে দূর করিয়া দেয়, ইহা সত্য কথা

স্বর্গান্নিরাকৃতঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভূবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা।

মনুষ্যজীবনেও স্বর্গ মর্ত্ত্য আছে, ইন্দ্রিয়রূপী অসুরেরা সর্ব্বদাই আমাদিগকে দিব্য চেতনার স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিতেছে জড়ানুশীলনের মর্ত্ত্যলোকে। এই আলোক-বিহীন জড়-সত্তা-সর্ব্বস্ব মর্ত্ত্য-লোকেই আমরা চিরতরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছি। এবং শ্রবণ করিতেছি আলৌকিক সমস্তই মিথ্যা। দিব্যজগৎ কেবলি কল্পনা, ইহা মানবজীবনের শোচনীয় অধঃপতন।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।

আমরা চিররজনীকেই চির দিন দিন মনে করিতেছি। জ্ঞানিগণ বুঝিতে পারেন সাধারণ মানুষের রজনীর প্রভাত নাই। প্রভাতের আলো তাহারা সহ্য করিতে পারে না। অন্ধকারে ইহারা শুধু অভ্যস্ত নহে, আসক্ত হইয়া গিয়াছে—আলোকের আবশ্যক নাই। আঁধারের কীটানু আমরা দুদণ্ড নয়, নিয়ত আঁধারে করি খেলা।

প্রাচীনকালে মানুষের মন সরল স্বস্থ ও নির্ম্মল ছিল। ইহা কল্পনা নহে সত্য। বর্ত্তমান যুগ কৃত্রিম সংস্কারের যুগ। চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অনুভব, ভাব, চিন্তা, ধারণা, কল্পনা, সমস্তই এখন রচিত হইয়া আসিয়া মনের উপর আরোপিত হয়। স্বাধীন চিন্তা একটা কথার কথা। পল্লবগ্রাহী জ্ঞানবিদ্যার অন্তহীন জটিল জালে প্রত্যেকেরই মন আচ্ছন্ন ও আবেষ্টিত। স্বাধীনতা কোথা হইতে আসিবে? বর্ত্তমান যুগের স্বাধীন চিন্তা মানে, জটিল হইতে জটিলতর করিয়া জাল বুনাইয়া তদ্দ্বারা অধিকতর জড়িত হওয়া। অনাত্মের করে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বাধীনতার অহংকার-করা। মতিচ্ছন্নের লক্ষণ। স্বাধীনতা নামক এই নিদারুণ পরাধীনতায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াই কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ বলিয়াছেন :—

The world is too much with us!
Little we see in nature that is ours;
We have given our hearts away, a sordid boon!
Great God! I'd rather be
A Pagan suckled in a creed outworn!
So I might, standing on this pleasant lea,
Have glimpses that would make me less forlorn?

অতি গভীর অর্থযুক্ত এই কথাগুলি। প্রাচীন কালের ভাব চৈতন্যে ফিরিয়া যাইবার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা। নির্ম্মল হৃদয় খৃষ্টান কবির দেবতা-বাদী হইবার বাসনা। বর্ত্তমান অসৎ শিক্ষার বিকৃতি পরিহার করিয়া প্রকৃতিস্থ হইবার প্রয়াস। ইংরাজীতে একটা সুন্দর কথা আছে—Sophistication. কুটিল তর্কযুক্তির দ্বারা চিত্তবৃত্তি কুটিল ও কলুষিত করিয়া তোলা। শুদ্ধ চিত্তকে অশুদ্ধ করা। বর্ত্তমান যুগে মানুষের চিত্তবৃত্তি অত্যন্ত sophisticated অর্থাৎ জটিলীকৃত, বিকৃত

এবং কলুষিত। মানুষ কুতর্ক ও কুবুদ্ধির বশ। সহজকে সহজভাবে দেখিতে পারেনা। অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় চিন্তাপ্রণালী গড়িয়া উঠে। এ অবস্থায় সত্যকল্পনা যাহা প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার দিব্যদৃষ্টি, তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। মিথ্যা ব্যবসায়িনী অলীক জল্পনাময়ী কল্পনার অধিকার হয়। ইহার ফলে দিব্য জগতের সহিত মানুষের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। জড় জগতের ব্যাপার পরম্পরা ব্যতীত আর সমস্তই মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান যুগের ইহাই মনস্তত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণ কবিকল্পনার ভাষায় যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি সত্য কথা।

হায় কবি হায়! সে হ'তে প্রকৃতি হ'য়ে গেছে সাবধানী।
মাথাটী ঘিরিয়া বুকের উপর অঞ্চল দিয়াছে টানি।
যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু,
কোনো দিন কোনো গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু।
শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে ;
লুকানো কথার হাওয়া বয়ে' যায় বন হ'তে উপবনে।
মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কি ভাব ভরা।
হায় কবি হায়! হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা।

এখন প্রকৃতি কেবলি পার্থিব। পাঞ্চভৌতিক। পদার্থবিদ্যাধিগম্য। পূর্ব্বে প্রকৃতি ছিল পার্থিব এবং দিব্য দুইই। অধ্যাত্মবিদ্যাবিচার্য্য। আমরা দেখি বনে বনে বনচরেরা বিচরণ করিতেছে। অসংখ্য প্রকারের জীব। অনন্তবিধ বিহঙ্গ। কল কূজন করে। উড়িয়া বেড়ায়। কীট পতঙ্গ প্রজাপতি। সংখ্যা নাই। পথে ঘাটে বনে জঙ্গলে। নদ নদী হ্রদ তড়াগে সাগর সলীলে মৎস্য সাম্রাজ্য, নিরন্তর সন্তরণ করিতেছে। মাটীর তলে অন্ধকার গর্ত্তে সর্পাদি সরীসৃপ বাস করে। আমরা জানি। দেখি। আমাদের জ্ঞান এই পর্য্যন্ত। আমাদের দৃষ্টি এই সীমার মধ্যে। কিন্তু ইহা অনন্ত প্রকৃতি-সৃষ্টির একাংশ মাত্র। ইন্দ্রিয়ের অগম্য দেশে ইহার শতগুণ জীবন ব্যাপার চলিতেছে। তার পর অপ্রাকৃত অসীম। অনন্ত। দর্ভতৃণ গাছটী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা পর্য্যন্ত। এবং ব্রহ্মা হইতে সর্ব্বকারণ-কারণ পরব্রহ্ম পরমপুরুষ গোবিন্দ পর্য্যন্ত—দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্তয়া। দেবগণও অন্ত পায় না। কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ বলিয়াছেন

Paradise and groves
Elysian, Fortunate Fieldslike those of old
Sought in the Atlantic main, why woud they be
A mere fiction of what never was ?
For the discerning intellect of man,
When wedded to this goodly universe
In love and holy passion, shall find those
A simple produce of the Common day.

সহজ আনন্দ ও প্রীতি-রসে পরিপূর্ণ কৃত্রিম জ্ঞানের কুসংস্কারশূন্য হৃদয়ে বিশ্ব প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিলেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। যোগ শাস্ত্রে স্বরূপে অবস্থানের কথা আছে।

মনের এই ভাব সেই প্রকারের অবস্থা। মনের এই আনন্দালোকিত, এই কুবিদ্যাবিকারবিহীন অবস্থায় সূক্ষ্ম প্রকৃতির, এবং অপ্রাকৃতের অনুভব হইলেই **মিথলজি ও পুরাণের** দিব্য দেশের দীর্ঘ তীর্থ যাত্রা আরম্ভ হয়। প্রাচীন কালের মানব সমাজে এই অপ্রাকৃতের পথাতিবাহন খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল।

এই যে অপ্রাকৃতের অনন্ত ইতিহাস মানব জগতে প্রচলিত আছে, ইহার তত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা পরমার্থ লাভ করা যায়। ভগবৎ তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। গুরুগভীর দর্শন শাস্ত্র ক্যাণ্টহেগেলাদির অধ্যয়নের চেয়েও এই মিথলজির অধ্যয়নে অধিকতর অধ্যাত্মফল লাভ করা যায়। পৃথিবীর অপ্রাকৃতের ইতিহাস আমরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে পারি।

১। লৌকিক রূপ কথা ও সাধারণ পরী-কাহিনী (Folk-Tales and Fairy-Tales.) ২। দেশ প্রচলিত অতি প্রাচীন অর্দ্ধৈতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক উপাখ্যানাবলী। ৩। রূপকোপাখ্যান। ৪। মিথলজি। ৫। পুরাণ।

[১]

অপ্রাকৃত সত্যের * সাক্ষাৎ দর্শন শ্রবণাদি অনুভব হইতেই এই সমস্ত অলৌলিক কাহিণীর আরম্ভ। সর্ব্বত্র মানুষ প্রথমে কিছু দেখে। তারপর হয় দৃষ্ট সত্যের বর্ণনা করে, নতুবা তদনুসারে রচনা করে। প্রথম অতীন্দ্রিয় সত্য-দর্শন। অনন্তর সেই সত্যানুগামিনী বা তৎসত্ত্বাভাসিণী কল্পনা। তারপরে তদনুসরণে মুক্ত কল্পনার অবাধ নর্ম্মলীলা। যেখানেই সত্যের আলোক সেখানেই মিথ্যার ছায়া। ছায়া থাকিলেই আলোকের অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয় না। বরং প্রমাণিত হয়। প্রকৃতির পশ্চাতে একটী অপ্রাকৃত ব্যাপার থাকে। অবিকল প্রকৃতির অনুরূপ। সূক্ষ্ম দিব্য প্রকৃতি। প্রাণময়ী জ্ঞানময়ী। ছান্দোগ্যোপনিষদের ২য় ও ৩য় অধ্যায়ের মন্ত্রগুলির ইহাই অর্থ।

অথ যচ্চতুর্থমমৃতং তন্মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন
নবৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি। ৩।৯।

ইত্যাদি। গীতার পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ—ইত্যাদি কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। প্লেটো যে প্রত্যেক পদার্থকেই একটী করিয়া আইডিয়া বা সূক্ষ্ম ভাব-রূপে পরিণত করিতে চাহিয়াছেন এই সম্পর্কে তাহারও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। বৃক্ষের ভিতর আর একটী দিব্য চৈতন্যময় বৃক্ষ আছে। প্রত্যেক বিহঙ্গের মধ্যে একটী করিয়া জ্যোতির্বিহঙ্গ আছে। শেলী স্কাইলার্কের মধ্যে তাহাই দেখিয়াছেন। এই দিকের অনুভব হইতেই কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ কোকিলকে A hope, a Voice, a Mystery বলিয়াছেন। যোগতন্ত্রাদি শাস্ত্রে ইহাদিগের উদ্বোধনের বিধান আছে। প্রাকৃত আবরণ ভেদ করিয়া অপ্রাকৃতস্বরূপ প্রকাশিত হইয়া আসিতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা আছে।

বনলতা স্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ

* সূক্ষ্ম প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত সমস্ত আমরা অপ্রাকৃত বা অতীন্দ্রিয় নামে উল্লেখ করিব।

প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃতুঃ স্ম।

মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের গভীর বন পথে শ্রীবৃন্দাবন-গমন-কালে

ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া
সঙ্গে চলে কৃষ্ণ বলে নাচে মত্ত হইয়া।
হরিবোল বলি প্রভুকরে উচ্চ ধ্বনি
বৃক্ষ লতাপ্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনে।

এই প্রকার বর্ণনা সমস্ত কাল্পনিক নহে।

প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এই অপ্রাকৃত সত্য ব্যতীতও এই জাতীয় আরও অনন্তবিধ দিব্য প্রাণী থাকে। ইহারা সকলেই প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার নিম্নস্তরের দেবতা। ইংরেজীতে যাহাদিগকে ফেয়ারী বলা হয় তাহারা এই দেবতাসমাজভুক্ত। ফেয়ারী মিথ্যা নহে। কিন্তু তথা কথিত পরী-কাহিনীর অধিকাংশই কাল্পনিক। এই সকল বিষয়ে কল্পনা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ক্রিয়া করিতে থাকে। কারণ এই সব সূক্ষ্ম সত্যসমূহ পূর্ণরূপে বা স্পষ্টরূপে পাওয়া যায় না। ইহারা আভাস দিয়া ঝলক দিয়া মিলাইয়া যায়। চিত্ত চঞ্চলিত হয়। ইহাদিগকে বুঝিবার জন্য কৌতূহলী কল্পনা ইহাদের আলোকরেখা অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া চলে। শত শত বিচিত্র কাহিনী রচিত হইয়া যায়। ইহারা যতখানি সৌন্দর্য্যতত্ত্বানুসরণে সুষমা-সঙ্গত, ততখানি সুন্দরতর ভাবে সত্য। যাহা সুন্দর নয় তাহা নিতান্ত মিথ্যা, নীম্ফ, নিরীড্, নহিয়াড্, সীলফ, সালামাণ্ডার, হামাড্রায়েড, ফেয়রী, এলফ, গবলীন, বানশী—বিশ্ব জগতের প্রকৃত অধিবাসী। ইহাদিগকে মানুষ সত্য সত্যই দেখিয়াছে। এবং এখনো সময় সময় কেহ কেহ দেখিয়া থাকে। মানুষের জীবন লইয়া যেমন উপন্যাস হয়, ইহাদেরও জীবন লইয়া তেমনি অলৌকিক কাহিনী হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পর্য্যবেক্ষণ নামমাত্র। প্রায় সমস্তই কল্পনা। সর্ব্বদেশেই এই নিম্ন দেবতা-সমাজের কাহিনী প্রচলিত। গ্রীমভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত জার্ম্মণীর গ্রাম্যোপন্যাসগুলি সর্ব্বজনবিদিত। ফরাসী পেরোর সংকলিত পরী-কাহিনী পরী-সাহিত্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া পরী-সাহিত্য উৎসাহিত করিয়াছে। হান্স্ এণ্ডার্সানের অপূর্ব্ব উপাখ্যানগুলি অত্যন্ত উপাদেয়। রেজিনাল্ড স্কটের ডিস্কভারি-অব্ উইচ-ক্রাফ্ট্ ষোড়শ শতকের শেষভাগে ইংলণ্ডে পরী-জীবনের এবং সাধারণ ভূতযোনি বিষয়ক অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রকাশ করিয়াছিল। সেক্স্পীয়ার মিড্-সামার নাইট স্-ড্রীমে পরী-জীবনের মনোহর লীলাখেলা অতি মনোহররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা কাল্পনিক হইলেও সত্যের কল্পনা। মাইকেল-ড্রেটন নীম্ফিডিয়া-কাব্যে সেক্স্পীয়ারের পথানুসরণে অতি সুকোমল ভাষায় এবং সুললিত ভাবে পরী-কাহিনী লিখিয়াছেন। টমাস্-হুডের বসন্তের পরী-কন্যাগণের আবেদন অতি সুচারু একং সুখপাঠ্য কবিতা।

এখানে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, এই অতীন্দ্রিয় সত্তা-সমূহের অনুশীলন দুই প্রকার মনোভাব লইয়া করা যাইতে পারে। এক ভগবদ্ ভক্তিপথে—ভগবৎ-তত্ত্বানুচিন্তন পথে। আর কল্পনাবিলাসের কৌতুক-পথে। ভগবচ্চিন্তা-পথে অতীন্দ্রিয়-সত্তা-সমূহ ভগবানের বিবিধ প্রকাশচ্ছটা রূপে কিংবা ভগবানের সেবা-পরায়ণ প্রাকৃতিক দেবদেবী বা দিব্য নরনারী-রূপে প্রতীয়মান হয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে এবং সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থেই দেখা যায় তরু-লতা পশু-পক্ষী নদ-নদী সকলেই ভগবানের প্রীতি সাধনের জন্য ব্যস্ত।

পুষ্পৈর্হাস্যং ভ্রমরৈর্গানং পর্ণৈর্নাস্যং মধুভিঃ পানং।
দধতস্তরবঃ স্বফলৈঃ খানং কুর্ব্বন্ত্যভ্যাগত হরিমানং।
গোবিন্দলীলামৃতং। ৬।১৮

ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাব্য গ্রন্থে সর্ব্বত্র অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে—প্রকৃতি নন্দিনিগণ প্রাণময়ী এবং প্রেমময়ী। সর্ব্বদা আনন্দ উৎসব করিতেছ। পরমেশ্বরের সেবা সাধনা করিতেছে।

Every form of nature looked
Towards the uncreated with a countenance
Of adoration with an eye of dove
One song they sang, and it was most audible.

ভগবদ্ ভাব বিরহিত কল্পনাকৌতুকের নর্ম্মপথে প্রকৃতিগত অতীন্দ্রিয় স্বত্বাসমূহের অনুসন্ধান হইতেই পরী-কাহিনীর উদ্ভব হয় প্রকৃতির গতি বিধির পর্য্যবেক্ষণ হইতে আরম্ভ হইয়া এই অনুসন্ধান প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া মুক্ত কল্পনা আকাশে ছড়াইয়া যায়। রূপ-কথা, কার্য্য-কথা, মিথলজি ও পুরাণের পৃথক পৃথক প্রকৃতি হইলেও কখনো কখনো পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া যায়। ইংরাজী **mythopoic** কথাটিতে সেই আভাস পায়।

নাইটিংগেল ও সোয়ালো পাখী এক রাজার দুই মেয়ে ছিল। নাম ফিনোমেলা ও প্রক্‌নী, তারা পাখী হইল কেমন করিয়া সেই কাহিনী শুদ্ধ প্রাকৃতিক রূপ-কথা। আরাক্‌নী রাজার মেয়ে। সীবনাদি শিল্প বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শিনী। এথিনা-দেবীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অপরাধে মাকড়সা হইল। আরাক্‌নী একখানি মনোরম বসন বয়ন করিয়া তাহাতে দেবদেবীগণের প্রেম-কাহিনী অঙ্কিত করিয়া এথিলকে দেখাইল। এথিল দেখিল কারুকার্য্য একেবারে নিখুঁত। দেবী হিংসা বশে উহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আরাক্‌নী অসহ্য দুঃখে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল। দেবী দয়া করিয়া রাজকন্যাকে প্রাণদান করিয়া মাকড়সা করিয়া দিলেন। উদ্বন্ধনের সূতা গুলি মাকড়সার জাল হইল। ইহা সুন্দর কবিতা। প্রকৃতির রূপ-কথা, আবার মিথলজিও। যেহেতু দেবতার লীলা কথা আছে।

ইহার উপরকার স্তরে হায়েসিন্থাসের উপাখ্যানের মত উপখ্যানাবলী। হায়েসিন্থাস্ একটী সুচারু পুষ্প। পূর্ব্বে ছিল রাজপুত্র। একটী মনোহর রূপলাবণ্যবান্ বালক। দেবতা এপলোর প্রাণের প্রাণ জেফীরাস্ অর্থাৎ বসন্ত বায়ু দেবতাও ঐ বালকের রূপমুগ্ধ। কুমার কিন্তু ভালবাসে এপলোকে। জোপীরাসের সুতরাং হিংসা। এপলো একদিন কুমারের সাথে ছোট ছোট রূপার চক্রাকার থালা শূন্যে ছুড়িয়া ছুড়িয়া খেলা করিতেছে, জেফীরাস্ একখানি থালা এমন করিয়া উড়াইয়া কুমারের মাথায় লাগাইল যে তৎক্ষণাৎ সে ভূমিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। এপলো হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু উপায় কি? দেবতা কুমারের রক্তাক্ত কুসুম-সুকুমার অঙ্গখানি একটী রক্তবর্ণ পুষ্পে পরিণত করিয়া দিল। বালক ফুল হইয়া অমর হইল। গ্রীসে হায়েসিন্থাস্ দেবতারূপে পূজিত হইত। প্রতিবৎসর উৎসব ও মেলা হইত।

এখানে দেখিতেছি প্রকৃতির রূপ কথা, কাব্য, ও মিথলজি মিলিত হইয়াছে। একটী সুন্দর উজ্জ্বল লোহিত পুষ্প। কবি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইল। তাহার প্রাণে রূপের ছবি জাগিল। সে প্রেমের মহোমোহন স্বপ্ন দেখিল। গীতি কবিতা রচনা করিল। আখ্যায়িকা উদ্ভাবন করিল। তবু প্রাণের আনন্দ আবেগ মিটিল না। ধ্যানস্থ হইয়া রূপরাজ্যের অনেক গভীর দেশে চলিয়া গেল। সে দেবতার দেশ। কবি বুঝিল মানুষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে দেবতার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। জ্যোতির দেবতা, রূপের দেবতা এপলো। তাহার পিপাসু হৃদয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটী কোমল কিশোর রাজ নন্দনের প্রতিবিম্ব। কবি কিশোরী রাজনন্দিনী দেখিলেন না। কিশোরীর আনন্দের চেয়ে কিশোরের আনন্দ আরও নির্ম্মল। শুদ্ধ সুন্দর। কুসুম যে। এপলো সমস্ত ভুলিয়া রাজকুমারকে লইয়া দিবানিশি খেলা করে। উভয় প্রাণে আনন্দতরঙ্গিনী। অনিন্দ্য রূপচ্ছবি। অনন্ত আহ্লাদ। কবির ধ্যানমূর্ত্তিখানি ভাষায় সঙ্গীতে বর্ণে প্রকাশিত হইল। প্রাণে প্রাণে অঙ্কিত হইল। সকলেই দেখিল ইহা রসের ছবি। ভাবনার যোগ্য। উপাসনার যোগ্য। কাব্য হইতে গাথা। গাথা হইতে ললিত রূপকথা। ক্রমশঃ ধর্ম্মে পরিণত হইয়া গেল। এই জিনিষ অবহেলার নহে। সৌন্দর্য্যসাধনা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই প্রকারের অনেক মনোহর উপাখ্যান প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। হোমারের কাব্যে এই সমস্ত উপাখ্যান ওতঃপ্রোত ভাবে রহিয়াছে।

সেক্‌স্‌পিয়ার মিড্ সামার নাইট্‌স্ ড্রীমে যে পরী সমাজের সুচারু জীবনচিত্র দিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহা প্রকৃতির অন্তরস্থ অপ্রাকৃত সত্ত্বার অতি শুদ্ধ ও অতি সুন্দর বিবরণ। মহাকবি প্রকৃতির প্রাণশক্তিনিবহ পরী-সমাজরূপে ধ্যান করিয়াছেন। অন্তরালে অদৃশ্য অতীন্দ্রিয় প্রাণিগণের চিরন্তন জীবন ব্যাপার চলিতেছে। তাহাদের সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু, নৃত্য গীত, ক্রীড়া কৌতুক, আনন্দ উল্লাস, প্রেম প্রীতি, হিংসা দ্বেষ—নিরন্তর নির্ব্বাহিত হইতেছে। আমরা তাহা জানিনা। দেখি না। এই সকলের একটী স্থূল প্রতিবিম্ব প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সমূহের মধ্যে আমাদের নয়নগোচর হয়। প্রকৃতির মধ্যে যাহা মনোহর এবং প্রীতিদায়ক অবেরণ তাহারি অধিপতি। আর টিটানিয়া প্রকৃতির মনোরম বিকাশ বিলাসাদির অধিশ্বরী। টিটানিয়া ফুল্লকুসুমকুঞ্জে কোমল কুসুম শয্যায় শয়ন করে। কুসুম কুমারীরা তাহার চরণ সেবা করে। মধুর গীতস্বরে সুখস্বপ্নে মগ্ন করে। চন্দ্র সূর্য্য মেঘ বায়ু এই পরীদেবতাগণের মুখপানে চাহিয়া থাকে। ইহাদের আজ্ঞাকারী। ইহারা যখন প্রসন্ন থাকে জগতে তখন শান্তি সুখ সৌন্দর্য্য। ইহাদের অপ্রসন্নতার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র অনিয়ম। ঝড় দুর্য্যোগ বন্যা। ব্যাধি মহামারি দুঃখ দুর্দ্দশা। গীতায় যে আছে

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।

তাহা অনেক উপরকার কথা। দিব্য-দর্শনের কথা। তবু এই প্রসঙ্গে তাহা আনয়ন করা যাইতে পারে। সেক্‌স্‌পীয়রের কল্পনা সত্যের কেন্দ্রানুসরণ করিয়া চলে। ড্রেটন, হুড্ প্রভৃতির কল্পনা সত্যের বিচিত্র চঞ্চল ছায়া পথে গমন করে। গ্রীক উপাখ্যানের পথ রূপ সাধনার পথ। সেকসপীয়রের পথ ভাববিজ্ঞানের পথ। ড্রেইন প্রভৃতি অন্য সকলের স্বপ্নময়ী কল্পনার পথ।

ক্রমশঃ

সনাতনী

শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্ম্মা

সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। পশ্চিমাকাশ রক্তবর্ণ। সমুদ্রের অশ্রান্ত কল্লোল ধ্বনিতে কি এক অব্যক্ত বাণী রণিত হইতেছে। এক বর্ষীয়ান তপঃকৃশতনু ব্রাহ্মণ সিন্ধুতীরে সেই অস্তাচলগামী সূর্য্যের পানে চাহিয়া আছেন। আর তাঁহারই সম্মুখে অপরূপ লাবণ্যযুতা, নানালঙ্কারভূষিতা মদির-প্রেক্ষণা তন্বী।

তন্বী—সনাতন! মিথ্যা তোমার প্রতীক্ষা! প্রভাত সবিতার রক্তদীপ্তি, মধ্যাহ্ণ সূর্য্যের জলজ্জ্যোতি সন্ধ্যার অগাধ আঁধারে ডুবিয়া যাইবে। তুমি বৃথাই চাহিয়া আছ সনাতন! আমি আসিয়াছি, আমি তোমার সম্মুখে! দেখ কে আমি! কি অপরূপ আমি! দেখ দেখ সনাতন! দৃষ্টিতে আমার কি বিহ্বলতা! আগমনে আমার কি উৎসব! স্পর্শে আমার কি মধুর চাঞ্চল্য, কি অদম্য উৎসাহ! আমার অনুরাগে কি উৎসব, কি গৌরব। কোথায় অন্ধ অতীতের প্রতি চাহিয়া আছ স্থবির।

সনাতন—মোহিনি! সিন্ধুর তরঙ্গভঙ্গে কোন সঙ্গীত বাজিয়া উঠিতেছে না! কিছু কি শুনিতে পাইতেছ না! কোনও আশার গান! কোনও উদ্বোধন মন্ত্র—কিছু কোন কিছু?

তন্বী—কিছু না সনাতন। যাহা শুনিতেছ, তাহা ব্যর্থ প্রলাপ। তাহা বিগত বিলীনের জন্য অনর্থক রোদন।

সনাতন—আর কিছু? ঊষার কলকাকলী! ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের আত্ম অনুভূতির সামস্তোত্র! নব জাগরিতের আনন্দ সঙ্গীত! কিছু কি শুনিতেছ না তরুণি!

তন্বী—আমি অনর্থকের দিকে চাহি না বৃদ্ধ! প্রাণে আমার অদম্য উৎসাহ, আশায় আমার উদ্বেল অধীরতা, দৃষ্টি আমার অস্ত আকাশের দিকে নহে। দৃষ্টি আমার জগৎ জুড়িয়া। প্রেয়ঃ আমার চির তরুণ। শান্তি আমার মহা সংগ্রাম। পিছনে আমি চাহি না। পুরাতনকে দূর করিয়া, সেই বিগতের আবর্জ্জনাকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার উপর বিজয় স্তম্ভ গঠন করিয়া তুলি। স্মৃতি? সেতো কাপুরুষের অবলম্বন! ফিরিয়া এস মোহমুগ্ধ! আমি অভ্যুদয়! আমি উন্নতি! তোমার আশা আমি পরিপূর্ণ করিব।

সনাতন—ধ্যান ভাঙিওনা বালিকা! সনাতনের কাছে শিশু ক্রীড়নক আনিয়া তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিও না চঞ্চলা! কাল যাহার দৃষ্টির মধ্যে প্রতিভাত, সত্য যাহার ধ্যানের মাঝে সমুদ্ভাসিত, শ্রেয়ঃ যাহার জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যক্ষ স্পষ্ট, চৈতন্যের যে উপাসক, ভূমার যে প্রত্যাশী, তাহাকে ক্ষণিকের প্রলোভনে ভুলাইও না। আমি ত নূতন নহি; আমি যে চির পুরাতন! আমি শাশ্বত কালের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়কে অবগত আছি।

তন্বী—তুমি প্রলাপ বকিতেছ জীর্ণ। কঙ্কাল লইয়া বৃথা দম্ভ করিতেছ, শ্মশানে স্বর্গের স্বপ্ন দেখিতেছ। ব্যর্থ অহঙ্কারী সত্য ও শুভ তোমার কোথায়? সত্যই যদি লাভ করিতে, তবে

আজ জীর্ণ জরাগ্রস্ত, পরাজিত পতিত শ্মশান ভূমির ধূলিমুষ্টি সংগ্রহ করিয়া সবার পিছনে এমন অবজ্ঞাত আতুর কাঙ্গালের মত অস্ত-রবির ম্লান রশ্মির প্রতি তাকাইয়া থাকিতে না।

সনাতন—নবীনা! হে ক্ষণিকা! তোমার দৃষ্টি শুধু চক্ষে—জড়ের পাষাণ প্রাচীরের মধ্যেই নিবদ্ধ। অতীত তোমার অনধিগম্য, অনবগত তোমার সুদূরবর্ত্তী,—বর্ত্তমান তোমার কাছে বিদ্যমান—তাও কতটুকু?

তন্বী—প্রাচীন! মরীচিকার পিপাসু! কল্পনা লইয়া আমি থাকি না। দেখ সনাতন! তোমার ঐ অস্ত-রবির দিকে চাহিয়া! দেখ ঐ মুখরিত সমুদ্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া। তোমার চরণতলবর্ত্তী মেদিনীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া;—কি স্থূল নয়, কি জড় নহে? তুমি জড়, তোমার ধ্যানের আলম্ব জড়। ভবিষ্যৎও আসিবে জড় মূর্ত্তিতে। তবে বর্ত্তমানের প্রতি এত আক্রোশ কেন বৃদ্ধ।

সনাতন—আক্রোশ কিছু নাই তরুণী! আমি যে সনাতন, ত্রিকালের সাক্ষী। এই কাল বারিধীর উপকূলে বসিয়া অনন্তকাল ধরিয়া দেখিতেছি যে জড়ের পরিণাম। দেখ ঐ তটবালুকায় শঙ্খের বিচূর্ণিত অস্থি কঙ্কাল! ঐ ত তোমার জড়? ঐ বিচূর্ণ মৃত, ঐ আবর্জ্জনা উপেক্ষিত; ঐ ব্যর্থ বিগলিত; ঐ অনন্তের মাঝে নগণ্য হেয়, ঐ অমৃতের অনধিকারী।

তন্বী—কিন্তু?

সনাতন—কিন্তু কিছু নহে। কিন্তু কিছু নাই। কোন দ্বিধা নাই। আমি সনাতন। আমি আদি অন্ত জানি। সব যে দেখিয়াছি। আজ নয়; তোমার মত কত জনাই আমাকে দোষারোপ করিয়াছে। ইতিহাসও জানি না সেই আদিকাল হইতেই এই অবজ্ঞায় স্পর্দ্ধিত বাক্য শুনিতেছি। উপদেশ দিয়াছি—আমার সনাতনী সভ্যতাকে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে বলিয়াছি। তোমার মত এমনই স্পর্দ্ধায় সুবর্ণময়ী লঙ্কা আমায় উপহাস করিয়াছে। দুর্য্যোধনের ইন্দ্রপ্রস্থ আমায় উপেক্ষা করিয়াছে। গ্রীক রোম এমনই উদ্ধত গৌরবে আমাকে অতিক্রম করিতে চাহিয়াছে। কত ঐশ্বর্য্য, কত শক্তির উচ্ছ্বাস দেখাইয়াছে। অধীর আনন্দে কত বিজয়সঙ্গীত গাহিয়াছে। কিন্তু কোথায় তাহারা?

তন্বী—কিন্তু তুমিই বা কোথায় কল্যাণ-দম্ভী। তুমিও ত আমার বিজয়ী সৈন্যের পদতলে।

সনাতন—আমিই আছি আমিই থাকিব। প্রাণের পরশমণি যে আমার হাতেই। তোমরা আছ ধূলায়, প্রস্তরে, নানা বস্তু সম্ভারে জড়কে আশ্রয় করিয়া। আর আমি যে নিত্য প্রদীপ্ত। আমায় দলিত করে কে?

তন্বী—কে করে নাই? গ্রীক্, শক, হুন, পারস্য; তুরস্ক; আর আজও আমার সন্তান সন্ততিগণ কে না করিতেছে!

সনাতন—মূঢ়ে! আমাকে চেন নাই! আমি কোথায়? আমি কণক সিংহাসনে কিরিটী-শীর্ষ নৃপতি নহি; আমি একটা সাম্রাজ্য নহি; মানবের অহংকার আবিষ্কৃত সভ্যতা নহি। আমি আছি ভারতের হৃদয় সিংহাসনে

অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ম্।

তোমার হয় ত মনে নাই; বলদৃপ্ত মদগর্ব্বিত গ্রীক্ একদিন সিন্ধুতীরে আমায় চিনিয়া

গিয়াছিল। সেই আদিম অনুদ্যোগী আমি! আমি আজিও বাঁচিয়া আছি। সৃষ্টির অস্তিত্ব যতদিন, ততদিন মর্ম্মের মণিকোঠায় প্রাণের হোমাগ্নি শিখা জ্বালাইয়া—অগ্নিহোত্রী আমি—অজর অমর আমি,—চিরপুরাতন আবার চিরনূতন আমি—আমিই বাঁচিয়া আছি। কিন্তু সে গ্রীক্, সে অদ্ভুতকর্ম্মা রোমক কোথায়?

তন্বী—কিন্তু জয়? তুমি ত চির-পরাজিত সনাতন! সকলের পদপীড়ন-পীড়িত।

সনাতন—বলগর্ব্বিতা! জয় কাহাকে বলে তাও জান না। পশু-শক্তির অধীরতা, তাহাতেই কে আমাকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে? কত সহস্রবার কত পশু-শক্তি আমার ব্রহ্মতেজে শাসিত হইয়াছে। ঘটনার অপলাপ করিব না, আমার ক্ষাত্রবীর্য্য কখন কখন পরাভূত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পিছনে কত হীন হেয় চৌর্য্য চাতুরী আছে, তাহার পরিচয় রাখ কি? আমি শৌর্য্যবান। কৃমির মত প্লুতভাব আমার ঘৃণ্য। তাই কখন কখন আমার রাষ্ট্রশক্তির নিষ্প্রভতা লক্ষ্য করিয়াছ।

তন্বী—যেমন করিয়াই হউক, তুমি অবনমিত, অবমানিত। বিশ্বের রাজপথমাঝে দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া বিচূর্ণীকৃত।

সনাতন—একটু ভাল করিয়া চাহিও। এই সিন্ধু বুকে উচ্ছ্বসিতা তটিনীর আক্রমণের মত ঐ জয়—আত্ম বিলোপেরই নামান্তর। সেই দুর্দ্দম মদক্ষিপ্ত শক্তি সমূহ—কোথায় তাহারা? কই তাহাদের সদম্ভ পদক্ষেপ? দেখিও তাহারা আমাতেই বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহাই ত পরাজয়। আর আমার বিশিষ্টতা আজিও সমুদ্ভাসিত।

তন্বী—সনাতন! তোমার বৃথা আত্মম্ভরিতা শুনিবার সময় আমার নাই। তুমি আমার কুক্ষিগত। কে জয়ী তাহা লইয়া বিতণ্ডা করিতে চাহি না। আমার জয়গরিমার বিপুলোচ্ছ্বাস তোমায় ভাসাইয়া দিয়াছে। কিন্তু স্থবির! তুমি কি বাঁচিতেও চাহ না? নব জীবনের অমৃত পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া তোমার সম্মুখে আনিয়াছি। বিশুষ্ক—বিশীর্ণ! গ্রহণ কর! মুঞ্জরিত হইয়া উঠ! এ যুগের জীবন রস যে আমা হইতেই উৎসরিত।

সনাতন—জীবনের কি লক্ষণ তুমি দেখাইয়াছ মোহিনী।

তন্বী—কি দেখাই নাই? আমার শক্তি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত বিশ্ব-নিখিলের সর্ব্বত্রই বিভাসিত। আকাশে, সাগরে, গিরিশীর্ষে, মরুবুকে—সর্ব্বত্র আমার বীর্য্য বিভূতির অচল প্রতিষ্ঠা। আমি জগতে উৎসাহ-পরিপূর্ণ, সৌন্দর্য্য-অলঙ্কৃত জীবন আনিয়াছি। ঐ দেখ, দেখ সনাতন! কি বজ্রবেগে অকূল সাগরের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অর্ণবপোতগুলিকে দিক্ দিগন্তে বাহিত করিয়াছি। শোন, ঐ বিজয়-সঙ্গীত; ঐ আমার অভ্যুদয় উন্মদ সৈনিকগণের বীর পদক্ষেপ। আমি কোথায় নাই? —সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রে—সভ্যতার সকল বিভাগেই প্রস্ফুট, প্রদীপ্ত, প্রভান্বিত!

সনাতন—কিন্তু তাহার পরিণাম?

তন্বী—ঐশ্বর্য্য, অভ্যুদয়, উন্নতি।

সনাতন—উন্নত? কিসের উন্নতি ক্ষণিকা!

তন্বী—মানব সভ্যতার—মানব শক্তির।

সনাতন—মানবত্বার? না, জিঘাংসু পাশবত্বার?

তন্বী—পাশবতার ? বৃদ্ধ, তোমার মতিভ্রংশ হইয়াছে।

সনাতন—পাশবিকতার নহে তো কি ? মনুষ্যত্বের চিহ্ন কোথায় রহিয়াছে ? সভ্যতার কোন্ স্তরে মানুষকে আর মনুষ্যরূপে দেখা যায় ? ধরণীর ঘনারণ্যে মানুষ ত হিংস্র জন্তুর মত ছুটাছুটি করিতেছে। পরস্পর পরস্পরের বক্ষ রক্ত পান করিতে সমুদ্যত হইয়াছে।

তন্বী- কি ভুল বকিতেছ, বৃদ্ধ !

সনাতন—কিছু নহে ! সবই সত্য—বিকট সত্য। মানুষকে পশু কর নাই ত কি ? দেখ, তোমার সভ্যতা-লক্ষ্মীর রক্তভূষিত বিকট দংষ্ট্রকরাল—মানুষকে কি নির্ম্মমভাবে চর্ব্বণ করিতেছে। সাম্রাজ্য-রাক্ষসীর পূজার জন্য ঐ যে সমর-যজ্ঞ ! উহা ত পৈশাচিক তৃষ্ণার তৃপ্তির জন্য লক্ষ লক্ষ নিরীহ জীবনকে যূপকাষ্ঠে অনর্থক বলিদান। সভ্যতার উপহার- সাম্রাজ্য ! সাম্রাজ্য আনিয়াছে- বস্তু-লোলুপতা। ঐ বস্তুলোলুপতার একটা ভৈরব নরমেধ যজ্ঞ চলিয়াছে।

তন্বী—কিন্তু তাহাই যে উন্নতির পন্থা, সনাতন।

সনাতন- উন্নতিই বটে ! কাহার উন্নতি, তরুণি ! তোমার উন্নতির ক্ষিপ্তবেগ দুর্নিবার রথচক্রের নির্ম্মম নিষ্পেষণে সারা জগতের হৃদয়খানি যে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল, তন্বী ! এ যে রক্ত-লোলুপা করালিণীর রক্ত-তৃষ্ণায় কোটী জীবনের নিত্য বলিদান। এ যে একের স্ফীতি,—লক্ষের ধ্বংস। বহুকে বিধ্বস্ত করিয়া মুষ্টিমেয়ের সমৃদ্ধিকে উন্নতি বলিতে হয় বল, কিন্তু তাহা মানবতার উন্নতি নহে, পাশবতার পুষ্টি হইতে পারে।

তন্বী—মানবের - উন্নতি নহে ? তুমি কি অভ্যুদয়ের উদ্বোধন সঙ্গীত শুনিতে পাইতেছ না ?

সনাতন শুনিতেছি; কিন্তু তাহার উপরে যে লক্ষ বক্ষ বিদীর্ণ মর্ম্মন্তুদ হাহাকার শুনিতেছি। যে নির্য্যাতিতের দীর্ঘশ্বাস - বুভুক্ষিতের আর্ত্তনাদ শুনিতেছি। তোমার সমস্ত জয়ধ্বনিকে ছাপাইয়া উৎসব ধ্বনিকে স্তব্ধ করিয়া একটা কাতর আর্ত্তস্বর যে বিশ্ব ভুবনকে ছাইয়া ফেলিল, তন্বী।

তন্বী - উহা তোমার দুর্ব্বল মনের ক্লীব কল্পনা, বৃদ্ধ।

সনাতন- সত্যকে মিথ্যার যবনিকায় সমাধি দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিও না। চক্ষু দিয়া দেখ ! তোমার ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মীর স্বর্ণ সিংহাসন গঠন করিতে দেখ ঐ সহস্র সহস্র মানব মানবী পশু-তুল্য জীবন যাপন করিতেছে। দেখ দেখ, গর্ব্বিতা ! হৃদয়হীনা ! তোমার উন্নতিতে কি হইয়াছে কোটী কোটী মানবের ! দেখ, ঐ চীর-পরিহিত, অন্নহীন, গৃহহীন—মনুষ্যত্বের চিহ্নমাত্র শূন্য মনুষ্য-গুলিকে। আশাহীন, উদ্যমহীন—তোমার উপেক্ষিত ঐ নর-সন্ততিগুলি;—ঐ ত তোমার উন্নতির পরিণাম ! যাহাদের জীবন-পুষ্পগুলি অঞ্জলি দিয়া তোমার অভিচার-যজ্ঞে সিদ্ধি লাভ করিতেছ, কই কোথায় তাহারা ! তোমার এই ঐশ্বর্য্য-বিলাসের মধ্যে কই কোথায় কৃষক-শ্রমিক, মুটে মজুর; কই নাবিক খনি-কর্ত্তক ? তোমার এই সভ্যতা-সমৃদ্ধির মাঝে—এই উৎসব অনুষ্ঠানে কই লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত ? কই তাহারা - যাহারা দিনান্ত পরিশ্রম করিয়া অন্নমুষ্টি উপার্জ্জন করে এবং সেই এক মুঠাতেই খুসি ! কোথায় তাহারা—যাহারা আড়ম্বরহীন, শান্ত, পর্ণকুটীরে বাস করে ? যাহারা নিঃশেষে নিজদেরে উৎসর্গ করিয়া তোমাকে পুষ্ট করে ? কোথায় তাহারা রাক্ষসি ! আমি দেখিতেছি, তোমার বিনাশ-যজ্ঞের মহাশ্মশানে লক্ষ কোটী মানব ছিন্ন-মুণ্ড, দীর্ণ-বক্ষ, নিষ্পিষ্ট, নিষ্পেষিত—মৃত্যু যন্ত্রণায় অন্তিম শ্বাস ফেলিতেছে !

তন্বী—কিন্তু এযে অপরিহার্য্য। একটা সৃষ্টি করিতে আর একটা ধ্বংসই করিতে হয়।

সনাতন—এই জন্যই তোমার দিকে চাহি না। জানি, তুমি নিজে ধ্বংসের কবলীভূতা, আবার সারা জগতেরও মৃত্যুর কারণ।

তন্বী—বিনাশ ব্যতীত কি গঠন হয় সনাতন! কখনও কি দেখিয়াছ?

সনাতন—এই জন্যই আমি অস্ত রবির দিকে চাহিয়া আছি, সুন্দরি। কি শান্ত, কি স্নিগ্ধ, কি মমতা-মনোরম, কি প্রীতি উদ্ভাসিত অনাবিল জীবনই আমি সৃষ্টি করিয়াছি। আমার ধ্যান ও জ্ঞানের মাঝে তাহা চির দীপ্যমান। রাক্ষসী তোমার দানবীয়তা তাহার মাঝে এক উপদ্রব সৃষ্টি করিয়াছে।

তন্বী—কি করিয়াছিলে?

সনাতন—প্রীতির উদ্বোধন। হৃদয়বত্তার অপরিসীম বিস্তার। সকলকে নিরুদ্বিগ্নে বাঁচিবার সুবিধা। সকলের মানবতার উদ্বোধন। হৃদয়তার প্রস্ফুটন। ইহা অপেক্ষা শুভতম কল্পনা, শিবতম রচনা আর কি হইতে পারে, আধুনিকা! আমি নৃপতিকে সিংহাসনে বসাইয়াছি। কিন্তু দণ্ডধারী রাজা মানবের রক্ষক ও সেবক—ভক্ষক নহেন; রাজা প্রজার আজ্ঞায় বনবাসী। আমি কুটীরবাসীকে শান্তি ও সন্তোষ দিয়াছি; বীর্য্যবানকে ক্ষমায় ভূষিত করিয়াছি; শক্তকে মৈত্রি মমতা দিয়াছি। ঐশ্বর্য্যবানকে ত্যাগের ক্ষমতা দান করিয়াছি; সমগ্র জাতির মর্ম্মে এই মন্ত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি—অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ। সমগ্র জাতিকে এই অমৃতমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছি—নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রীকরণ এবচ। মানব জাতির যাহা শ্রেয়ঃতম, তাহা যে সবই দিয়াছি, কল্যাণী। আমার তপঃ সিদ্ধির এ মহামহিম বিকাশ যে অতুলনীয়! নহে কি?

তন্বী—কিন্তু তোমার এই বাচাইয়া রাখিবার চেষ্টায় মানব শক্তিকে কি পঙ্গু করা হয় নাই, সনাতন?

সনাতন—পঙ্গু করা হয় নাই, সংযত করা হইয়াছে। শক্তির অন্তরে যে পশুত্ব আছে তাহাকে দমন করা হইয়াছে। যে হিংস্রকতা যে জিঘাংসু লোলুপতা, যে বর্ব্বরোচিত দর্প-দম্ভ শক্তির সহিত ওতপ্রোত আছে, তাহাকে শুদ্ধ করিয়া, প্রীতিপ্রসব করিয়া নবজীবন দান করিরাছি। পশুকে দেবতা করিয়াছি। বিষের পাত্র অমৃতে ভরাইয়া দিয়াছি। শক্তির আর কি কল্যাণকর প্রকাশ হইতে পারে, বালিকা।

তন্বী—ইহা নিদ্রার আবেশের মত সুপ্তির অলসতা। মানবের অধঃপাতের তীব্র গরল। সেই জন্যই তুমি অনুদ্যমী, তেজ-বীর্য্যপরিশূন্য, ম্রিয়মাণ, কদর্য্য, জীর্ণ।

সনাতন—তেজ-বীর্য্যশূন্য! উপহাসের কথা বটে। জাননা অর্ব্বাচীন রঘুর দিগ্বিজয়, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়, নচিকেতার মৃত্যু-জয়, ধ্রুবের তপস্যা, ভীষ্মের অচপল দার্ঢ্য, সাবিত্রীর মৃত্যুকে পরাজয় বিশ্বনীতিকে টলাইয়া দেওয়া!

তন্বী—আমি ইঁহাকে শক্তির অভাবই বুঝিয়া থাকি। ইহা অশক্তের ছলনা!

সনাতন—বুদ্ধিহীনা! শিশু-চাঞ্চল্যকেই উৎসাহ বলিতে চাও। বর্ষাপুষ্ট তড়াগের অস্থিরতাই প্রবল! বারিধির প্রশান্তি কিছুই নহে!

তন্বী—দৃষ্টান্ত চাহি না। উহা উপমার চাতুরী মাত্র।

সনাতন—বেশ! অশোকের ধর্ম্মপ্রচার! চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য! প্রতাপের একটা উদ্ধত শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার অপরাজেয় পণ! ইহাকে কি বলিবে? ষড়্‌দর্শন, সহস্র কাব্যকলা; সঙ্গীত বিজ্ঞান, ভুবনেশ্বর কাণারক প্রভৃতির ভাস্কর্য্য। বারাণসী নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় অনুপম কারুকলা! কত বলিব। কত দেখাইব!

তন্বী—কিন্তু সে তো পুরাতন। মলিন। প্রভাশূন্য—সমাধির পাষাণস্তূপ।

সনাতন—তাহার মধ্যেই নবপ্রাণের নবীনতার বীজ নিহিত রহিয়াছে। আকস্মিক যাহা, তাহা অন্তঃসারশূন্য।

তন্বী—সনাতন! দুর্ভাগ্য, তোমায় ফিরাইতে পারিলাম না। চলিলাম, স্থবিরের সহিত তর্ক করিবার সময় আমার নাই।

সনাতন—আজ যাও উদ্ভ্রান্ত উন্মার্গগামিনি। একদিন কিন্তু ফিরিবে! আমার কাছেই জীবনের সর্ব্বসার্থকতা লাভ করিবে! আমিই অমর অমৃতায়মান! আমি সনাতন! ঐ শোন আমার মর্ম্মবাণী:—

—অজো নিত্যং শাশ্বতোঽয়ম্।

কবীরের দোঁহা

অষ্টবিকার—কাম

কামী কা গুরু কামিনী, লোভীকা গুরু দাম।
কবীরকা গুরু সন্ত হৈ, সন্তন কা গুরু নাম।

কামীর গুরু কামিনী আর, লোভীর গুরু দাম।
সন্ত কবীরের গুরু, সন্তের গুরু নাম। ১॥

সহকামী দীপকদসা, সোখৈ তেল নিবাস।
কবীর হীরা সন্ত জন সহজৈ সদা প্রকাশ॥

সকাম যারা প্রদীপ সমান, তেল শোষে বা নিজের প্রাণ।
কবীর, সন্ত হীরা যেমন, স্বতঃই সদা প্রকাশমান। ২॥

কামী কুত্তা তীস দিন, অন্তর হোয় উদাস।
কামী নর কুত্তা সদা, ছঃ ঋতু বারহ মাস॥

কুকুর কামী তিরিশ দিবস, তাহার পরে হয় উদাস।
কামুক মানুষ কুকুর সদা, ছ ঋতু আর বার মাস। ৩॥

কামী ক্রোধী লালচী, ইন সে ভক্তি না হোয়।
ভক্তি করে কোই সূরমা, জাতি বরণ কুল খোয়।

কামী ক্রোধী লোভী যারা, ভক্তি না হয় তাদের দিয়ে।
ভক্তি করে বীর কোন জন, জাতি বর্ণ কুল খোয়ায়ে। ৪॥

ক্রমশঃ

আর্য্য-সঙ্গীত

ব্রহ্মচারি প্রাণেশকুমার

সঙ্গীতের উদ্দেশ্য

সঙ্গীত বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করা দুরূহ হইলেও অসাধ্য নহে। কিন্তু ইহা সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনাসাপেক্ষ। এই সমস্ত জীবন যে বিদ্যা-লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে, তাহার পরিণাম ফল কি তাহা স্বতঃই মনে উদিত হইয়া থাকে। আর্য্যঋষিগণ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াই কলা-বিদ্যার বিস্তার করত সমাজে উহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এই ভারতীয় সভ্যতা-সমাজ-শৃঙ্খলতা বা ব্যক্তিগত জীবনযাপনপদ্ধতি আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই প্রশ্ন উদিত না হইবারই কথা। কেন না, আর্য্যগণের যাবৎ ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে একই ব্রহ্ম-মন্ত্র জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অনাহত প্রণবের ন্যায় প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে, তাঁহারা দেখিতে পান। কলা অর্থে অংশ বা খণ্ড বুঝা যায়। সমস্ত চৌষট্টি কলা-বিদ্যা খণ্ড বিদ্যা; বেদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যাই সম্পূর্ণ বিদ্যা। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পবিত্র দেবভাবে এই কলা-বিদ্যা অনুষ্ঠিত হইলে জীবন পূর্ণানন্দময় ব্রহ্ম-বারিধিবাহীই হইয়া থাকে। কলা-বিদ্যার পরিসমাপ্তি ব্রহ্মই, অন্য কিছুই নহে। অতএব, সঙ্গীত সম্যক্ আরাধিত হইলে অনুষ্ঠানকারীর জীবনব্যাপী স্বর-সাধনা হিমাচলস্থ নিভৃত গুহাবাসী ও কৃশ্রব্রত, ধারী যোগীর যোগসাধনা অপেক্ষা ন্যূন নহে। উভয়ের তপশ্চর্য্যাই ত্রিবিধ দুঃখতাপের অনধিগত আত্ম-জ্ঞানরূপ চির শান্তিময় রাজ্যে সাধককে লইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত ভারতময়ই যুগে যুগে পাওয়া যায়। যাঁহার রচিত সঙ্গীত এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে, যাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরা সঙ্গীত মহার্ণবের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তিনিই ইহার বর্ত্তমান কালের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তানসেন গুরু হরিদাস গোস্বামী প্রভৃতি বহু সিদ্ধ সাধক সঙ্গীত সাধনার দ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বহুলোক সঙ্গীত সাধনাদ্বারা সিদ্ধিলাভ না করিতে পারিলেও নশ্বরজীবনে অমৃতের কথঞ্চিৎ আস্বাদন পাইয়া যে কৃতার্থ হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।*

সঙ্গীতের উৎপত্তি ও লক্ষণ।

আত্মা হইতে সর্ব্বপ্রথমে ব্যোম বা আকাশ সম্ভূত। "এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ"। সর্ব্ব প্রথমে ব্যোম বা আকাশ সম্ভূত হয়। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী—ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ শাস্ত্রে সৃষ্টির ক্রম এই ভাবেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ সূক্ষ্মরূপে অনন্ত আকাশের তরঙ্গ মাত্র। এই তরঙ্গের স্থূল অবস্থা বায়ু। বায়ুর স্থূল সংঘর্ষণ হইতে অগ্নির উৎপত্তি। অগ্নির স্থূল শিথিলাবস্থাই জল। জল ঘনীভূত হইয়াই ক্ষিতি আকার ধারণ করিয়াছে। তাহা হইতে উদ্ভিদাদি জীব জন্তু উদ্ভূত হইয়াছে। অতএব, এই বিশ্বময় যাবৎ পদার্থই ব্যোমের স্পন্দন শব্দাশ্রিত। সকলেই শব্দদ্বারা আপন অস্তিত্বের ঘোষণা করিতেছে। বৃক্ষ ও প্রস্তরাদির মধ্যেও প্রতিনিয়ত ধ্বনি হইতেছে। ইহা অধুনা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

---

* কলিকাতা,পাথুরিয়া ঘাটা নিবাসী ৺হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীবজগতের ধ্বনি আমরা কর্ণদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা বলে কি জড়, কি জীব জগতের উপর মনুষ্য আপন প্রাধান্য বিস্তার করিতে সতত প্রয়াস পাইতেছে। এই প্রয়াসের ফলে মনুষ্যজগতে প্রকৃতিদেবী এক অভিনব আকার ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। মনীষী সাধকগণ বুদ্ধি ও কৌশলবলে এই প্রকৃতি দেবীর বিধির সম্ভারের তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ ও সমাযোজনারূপ উপাসনা দ্বারা পুনরায় সেই ব্যোমে পৌছিয়া, লীলাময়ীর লীলানাটের পূর্ণতার পরিসমাপ্তি উপলব্ধি করেন। প্রকৃতিদেবীর আদি উপকরণ যে আকাশ ও তাহার যে শব্দ, তাহারই উপর মানব বুদ্ধির বিশদ বিস্তারের ফল সঙ্গীত। সঙ্গীত মানুষের কোন রচিত পদার্থ নহে। জ্ঞানের উৎকর্ষতার পারিতোষিক মাত্র। অনন্ত স্বররাশির মধ্যে সুষমার অভিজ্ঞানই সঙ্গীত সম্ভোগ।

শব্দ নিত্য। শব্দাশ্রিত সকলই নিত্য—ঈশ্বর জ্ঞানের বিষয়রূপে চির বিরাজিত। মানুষ যতই ঈশ্বর অভিমুখী হয়, ঐশ্বরিক জ্ঞানাশ্রিত বিষয়—সঙ্গীত ততই প্রকটিত হইতে থাকে। বিভিন্ন স্বর ও তাহার সূক্ষ্মাংশ ছন্দোবন্দে বিভিন্নাকারে গ্রথিত করিয়াই রাগরাগিণী উৎপন্ন হইয়াছে। বাদ্য-যন্ত্রাদির সহিত সেই সমুদয় তান-লয়-যুক্ত রাগরাগিণী মনুষ্য কণ্ঠে গীত হইলে তাহাকে সমাজে সঙ্গীত বলা হয়। কণ্ঠ-গীত ব্যতীত তার-যন্ত্রের সাহায্যেও সঙ্গীত প্রকাশিত হইতে পারে। অঙ্গভঙ্গি-যুক্ত নৃত্যও সঙ্গীতের প্রকারান্তর। এই সমুদয়ই আবার সূক্ষ্ম স্পন্দনের অভিব্যক্তি। আন্তর বস্তুই আন্দের, আনন্দঘনই ব্রহ্ম। ২৩,৭০৫

সঙ্গীতের অধিকারী

সকল বস্তু শব্দাশ্রিত হইলেও, মনুষ্যই উক্ত সঙ্গীতের অধিকারী। অধিকারী অর্থে আমরা সঙ্গীত কণ্ঠে প্রকাশ করিবার শক্তিকে বুঝি। সঙ্গীত অনুভব করিবার শক্তি জীব-মাত্রেরই আছে। কিংবদন্তী বিশ্বাস করিলে পাষাণেরও রহিয়াছে, নহিলে দ্রব হইবে কেন? কথা বলিতে পারে এমন মনুষ্য মাত্রই সঙ্গীতের অধিকারী। কেহ কেহ সঙ্গীতের উপযোগী সংস্কার লইয়া জন্মিয়া থাকেন, কেহ কেহ এই জীবনেই সেই সংস্কার জন্মাইয়া সঙ্গীতের অধিকারী হন। যেমন বিভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত ভাণ্ডজাত বা একই উপাদানের বিভিন্ন পরিমাণে নির্ম্মিত ভাণ্ডজাত শব্দের তারতম্য লক্ষিত লহইয়া থাকে, তদ্রূপ মনুষ্যের শারীর উপাদানের তারত্যানুসারে স্বরের মিষ্টতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সঙ্গীত বলিতে যে স্বর-তান-লয়-সংযুক্ত রাগরাগিণীর বিস্তার তাহা যথাযথ শিক্ষার ফলে মনুষ্য মাত্রই অধিকার করিতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি। স্বর-সাধনা যোগবিশেষ। যোগ সাধকের যেমন দৈহিক ও মানসিক সংযম ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না, সঙ্গীত সাধকেরও তদ্রূপ দেহ ও চিত্ত বিশুদ্ধ না থাকিলে সিদ্ধিলাভ দুর্ল্লভ। অসংযত ব্যক্তির স্বরের মাধুর্য্য থাকিলে তদ্দ্বার অজ্ঞ লোকের চিত্তরঞ্জন সম্পাদন করিতে পারে মাত্র, কিন্তু মনুষ্য জীবনের উৎকর্ষতা বা মোক্ষলাভ কখনই করিতে পারে না। সেই হেতু মনুষ্যমাত্রই সঙ্গীতের অধিকারী হইয়াও সংযমের অভাব বশতঃ সঙ্গীত-সাধনায় ব্যর্থতা প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বোপরি অনন্যচিত্ত ও অক্লান্ত তপস্যা বা পরিশ্রম করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না বলিয়া, সঙ্গীত-গগনে নক্ষত্র অতি বিরল, রবি শশীও মাত্র এক একটী করিয়াইদেখিতে পাওয়া যায়।

তথাপি মনুষ্যমাত্রই আপন সামর্থ্যানুযায়ী সুখের সময়, দুঃখের সময়, কায়িক পরিশ্রম বা আয়াসের সময় গান করিয়া নিজের সুখ বৃদ্ধি বা দুঃখের লাঘব করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালের শিক্ষা-পদ্ধতির প্রথম অঙ্গই স্বরসাধনা ছিল। বেদমন্ত্র ও স্তোত্রাদি স্বরযোজনাসহ ছন্দোবন্দে উচ্চারণ করিতে প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে শিক্ষা করিতে হইত। সঙ্গীত ব্যতীত যে শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না ইহা আধুনিক কথা নহে। উচ্চাভিলাষী মাত্রেরই এই স্বভাবজাত অধিকার অনুশীলনীয়।

সঙ্গীতের ফল

সঙ্গীত সিদ্ধির ফল পূর্ণতা। পূর্ণতার পরিণাম আকাঙ্ক্ষাশূন্যতা। সঙ্গীতস্নাতঃচিত্ত আপন পরিতৃপ্তিদ্বারা সততই সঙ্গীত-পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঘনীভূত পরিতৃপ্তির সমষ্টিই শিবত্ব। জীবের শিবত্বই পরিসমাপ্তি। সঙ্গীতদ্বারা এই চরম লক্ষ্য সাধিত হয় বলিয়াই সঙ্গীত-শাস্ত্র মোক্ষ শাস্ত্র। কাব্য ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের অনুশীলনের ন্যায় পাঠাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ মাত্র লাভ সঙ্গীতের উদ্দেশ্য নহে। সঙ্গীত স্বরের ব্যায়াম সাপেক্ষ। শ্বাসযন্ত্রের দ্বারা নিয়মিত হইয়া কণ্ঠদেশস্থ তন্ত্রী সমুদয়ের স্পন্দনের পরিণাম স্বর। শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ না থাকিলে উক্ত যন্ত্রের এবং তৎসমুদয়ের ক্রিয়া উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে না বলিয়া, স্বর ও সঙ্গীত-বিদ্যা নিতান্তই শরীর-পর। অতএব সঙ্গীত সাধকের শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। ইহার ফলে নীরোগ দীর্ঘায়ু-লাভ অবশ্যম্ভাবী। ইহাই হইল সঙ্গীত সাধনার প্রথম ফল।

দ্বিতীয় ফল চিত্তবৃত্তির বিকাশ। সপ্তস্বরের ও তৎসংলগ্ন অনুস্বর বা শ্রুতির উচ্চাবচ বেদানুযায়ী কণ্ঠচালনা মনের নিবিষ্ট নিবেশ ব্যতীত অসম্ভব। একমাত্র শ্রবণই তাহার বিচারক বা নির্দ্দেশক। সুরে কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হইবামাত্রই মন শ্রবণেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া স্বর-রাজ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। তৎপরে রাগরাগিণীর আপন আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ছন্দোবন্দে তানমূর্চ্ছণাদির তাল-লয়ের বন্ধনীর মধ্যে বিস্তার করা এই একাগ্র মনের অসীম শক্তিমত্তার পরিচায়ক। সঙ্গীত-কালীন বাদকদিগের সহিত ঐক্য সম্পাদনপূর্ব্বক মথিত আনন্দে শ্রোতৃবর্গের অন্তররাজ্য স্বর্গীয়ভাবে আপ্লুত করা, আর কাব্যকুশল বাগ্মী মহাত্মাগণের ওজস্বী ভাষায় প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা কি একই পূর্ণ বিকশিত চিত্তবৃত্তি নিচয়ের অভিব্যঞ্জক নহে? আর তাহা হইলে সঙ্গীত সাধক কি নিরক্ষর হইয়াও মেধাবী বিদ্বান্ ধর্ম্মযাজক আচার্য্যগণের সহিত সমাসীন হইতে পারেন না?

তবে সঙ্গীত-সাধক সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর সুকঠিন নহে। আপন মর্য্যাদা রক্ষা করেন না বলিয়াই সঙ্গীতজ্ঞেরা সমাজে নিম্ন স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। বর্ত্তমানে যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞের সম্মানে সম্মানিত তাঁহারা সকল সময়ই যে শুধু সঙ্গীত-বিদ্যার গুণে বিভূষিত বলিয়া তাদৃশ অবস্থা লাভ করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহাদের আদৃত হইবার আরও কিছু আছে, যাহা সরস্বতীর বর পুত্রদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদ্যা বিদ্যাই। সঙ্গীতবিদ্যাবান্ বিজ্ঞান, কাব্য, ব্যাকরণ বা অর্থ শাস্ত্রাদিতে অনভিজ্ঞ হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার স্থান যে উচ্চে তাহাতে সন্দেহ কি? নির্লোভ সংযত শুদ্ধচিত্ত গায়ক বা বাদক সাধনবলে একাগ্র চিত্তে পরমাত্মার সান্নিধ্য উপলব্ধি করত ব্রহ্মোদ্ভাষিত জ্ঞানে মানব জীবনের পরমপুরুষার্থতা লাভ করেন। ঈদৃশ লোকের জন্মে বংশ পবিত্র, সমাজ পবিত্র, দেশ পবিত্র। ইহাই সঙ্গীতের তৃতীয় ফল।

এখানেই মনুষ্য জীবনের যবনিকাপতন। আর সঙ্গীতসিদ্ধকে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয় না। গন্ধর্ব্বলোকবাসী দেবশরীরধারীর ন্যায় সর্ব্বদা জাগতিক ব্যাপারে আর তিনি লিপ্ত থাকিতে পারেন না ; সংসারীর হিসাবে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ অনেক সময়ে উন্মাদ বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার অনেক সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি তাঁহাদের চরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া পরাতত্ত্ব লাভ করিয়া জীবন ধন্য মনে করেন। সঙ্গীতজ্ঞ পুরাকালে ঋষি ও আচার্য্যের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন, সম্রাটগণ তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেন।

সঙ্গীতের অবনতি

যাঁহারা হিমালয়ে বা নিবিড় অরণ্যে পশুপক্ষীর স্বাধীন বিচরণ বা নদী তড়াগাদিতে জল-জীবের বিচরণ দেখিয়া রাজধানীর জুলোজিকেল উদ্যান পরিদর্শনান্তে পিঞ্জরাবদ্ধ জীবের দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন, তাঁহারা রাজসভায়, ধনাঢ্যের প্রমোদভবনে, অথবা সাধারণ লোকের পরিতোষ জন্মাইয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত গীত সঙ্গীতের অবস্থা কতকটা কল্পনা করিতে পারিবেন। কেন না, কুসুমিত লতালিঙ্গিত দ্রুমরাজি পরিশোভিত নিবিড় নিস্তব্ধ অরণ্যশোভা-বিমুগ্ধ বিহঙ্গমের স্বভাবজাত কলতান সেইখানে নাই। সেখানে উচ্চ-পর্ব্বত-শিখর-বিহারী মৃগেন্দ্র লৌহপিঞ্জরে লাঙ্গুল বিস্তারে অক্ষম! যেখানে সানুদেশে যথেচ্ছা দলবদ্ধ বিচরণশীল গজেন্দ্র একাকী চরণশৃঙ্খলে বৃক্ষমূলে আবদ্ধ, যেখানে কবির লীলাবিলাসের পুত্তলিকা অভিরাম নৃত্যকারী ময়ূর ও হরিণ পদপ্রসারণে শততব্যথিত, সেখানে পশুরাজের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লম্ফ ও মেঘমন্দ্রে গর্জ্জন, মদস্রাবী হস্তীর বৃংহতি, শিখণ্ডীর কেকাধ্বনিযুত পুচ্ছবিস্তার বা মৃগযূথের নৃত্য অসম্ভব। সামাজিক সঙ্গীত বর্ত্তমানে শতধা পরিণত হইয়া আপন মর্য্যাদাচ্যুত হইয়াছে। লোকরঞ্জনার্থ উহা তাদৃশ

শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব আত্মা আনন্দময়; তাহার নির্ঘোষ কাব্য, আর তূর্য্যধ্বনি সঙ্গীত বিশুদ্ধতা বা স্বাধীনতার অভাব কখনই সেই আনন্দোচ্ছ্বাসের উদ্দীপক হইতে পারে না। জগতের সকলের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে এমন সঙ্গীত, সকলের প্রাণ যিনি নিয়ত স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন তাঁহারই পৃষ্টধ্বনি ভিন্ন আর কাহার থাকিতে পারে? তদিতর সঙ্গীত হইতে শারীরিক স্পন্দনসুখ ও ইন্দ্রিয়গণের বা মনের উল্লাস সম্পাদিত হইতে পারে মাত্র। কিন্তু প্রাণিমাত্রের মূল কারণ আত্মার নিগূঢ় কেন্দ্রস্থল স্পর্শ করিয়া আপন অমৃতত্ত্বের আস্বাদনে কখনই পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। নির্ব্বাত দীপ শিখার ন্যায় একতন্ত্রীগত সমাহিত চিত্ত সঙ্গীত সাহায্যে ঝঙ্কৃত হইলেই জগৎ সমাহিত হয়—যমুনা উজান বহিতে থাকে, বনের হরিণ ও সর্প আকৃষ্ট হয়, দিল্লীশ্বরও সাষ্টাঙ্গে প্রণত হন। জীব অজীব আত্মদর্শনে ধান্তমোহ হয়। এই প্রাণস্পৃষ্ট ধ্বনিই আর্য্য সঙ্গীতের প্রাণ। ব্যবহারিক সঙ্গীতেরও ইহাই প্রাণ। সঙ্গীতের এই দৈবসম্পদের অভাবই অবনতির কারণ।

যে দিন মানুষ আপন অন্তরদেবতার সান্নিধ্যজ্ঞাপক সঙ্গীত পার্থিব স্বার্থ বিনিময়ে উচ্চারণ করিল, যেদিন রাজাধিরাজ বিশ্বপতির পূজোপকরণ নাদধ্বনি নরপতির সন্তোষ বিধানার্থ তদীয় আদেশক্রমে অহরহ নিয়োজিত হইতে লাগিল, আর যে দিন সঙ্গীত আপন কুলমর্য্যাদা ভুলিয়া, ইতর অপবিত্র দৈহিক ভোগবিলাসের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ হইয়া, কুলভ্রষ্টা পতিতার ন্যায়

সহজগম্য হইল, সেই দিন হইতে আর্য্য-সঙ্গীত সুনীলগগনে আপন আলয়ে চিরতরে বিলীন হইয়া গেল! তথাপি, নিরাশার কুয়াসা ভেদ করিয়া উষার অরুণছটা মাঝে মাঝে নয়নগোচর হয়; মহাপুরুষগণ ভারতের সঙ্গীতের দৈন্যদশা দর্শনে দয়াপরবশ হইয়া ক্বচিৎ কখনও আর্য্যসঙ্গীত-গগনে উদিত হন। আমরা তাঁহাদের চরণ প্রান্তে বসিয়া, তদীয় আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া আর্য্য-সঙ্গীত আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ক্রমশঃ

ভিক্ষুকের ঝুলি।

ত্রিদণ্ডী ভার্গব

মুখোপাধ্যায়।—Dr. Boxton বলিয়াছেন—In an enquiry which I made some time ago, I found that about every 10th case of deaf-ness resulted from the marriage of causins." (আমি অনুসন্ধানের ফলে জানিয়াছি যে প্রায় প্রত্যেক দশটি মূক ও বধিরের মধ্যে ১টি খুড়তুতো পিসতুতো সম্বন্ধে বিবাহ করার ফলে।) The Irish Commissioner's has—"too close consanguinity in the inter-marriage of relatives and also hereditory pre-dispositions have long been supposed to be causes of congenital deaf-ness and mutism" (report for 1871)—অতিনিকট আত্মীয় বিবাহ করার ফলেই অপত্য মূক ও বধির হয়; তিনি ইহা আইরিস statistics দ্বারা প্রমাণিতও করিয়াছেন। প্যারীস একডেমীর এক সভাতে ডাক্তার বাউডেন বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন, "Two brothers in perfect health and well constituted persons had married two sisters—their Causins German. The elder brother has had several children one of whom is deaf and dumb. The other brother has had six children the firsh third & the fifth of whom can hear while the 2nd, 4th and probably the 6th (an infant) are deaf and dumb." প্যারীসের ডাক্তার বলিয়াছেন যে, স্বাস্থ্যবান দুই ভ্রাতা দুই খুড়তুতো ভগ্নীকে বিবাহ করেন—বড় ভাইর অনেকগুলি সন্তানসন্ততি হয় তাহার মধ্যে একজন মূক ও বধির। দ্বিতীয় ভাইর ছয়টি সন্তান হয় তার মধ্যে ১ম, ৩য় ও ৪র্থ বধির ও ২য়, ৪র্থ ও সম্ভবতঃ ৬ষ্ঠ (এখনও শিশু) মূক ও বধির। লুই ভিলা ফেটাকীর ডাক্তার বেমিশ, আমেরিকার মেডিকেল এসোসিয়সনে যে রিপোর্ট দেন তাহাতে ৮৩৩টি বিবাহের ফল দেখাইয়াছেন। ঐ সকল বিবাহে ৩৯৪২টি সন্তান উৎপন্ন হয়। এবং তাহাদের মধ্যে ১১৩৪টির অঙ্গহানি ছিল; যথা—

মূক ও বধির—১৪৫; অন্ধ—৮৫; বুদ্ধিহীন (Idiot)—৩০৮; পাগল ৩৮; মূর্চ্ছারোগী—৬০; গলগণ্ড গ্রস্ত—৩০০; অন্য অঙ্গহীন—১৯৮; মোট ১১৩৪; ৮৮৩টি শিশু অবস্থায় মারা যায়। উক্ত ডাক্তার তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন—"I feel satisfied, however, that my research

has given me authority to assume that over 10 percent of the deaf and dumb and over 5 percent of the blind and nearly 15 percent of the idiotic in our State institution for subjects of those defects, and throughout the country at large, are the offspring of kindred parents or of parents themselvs the descendants of blood-marriage"—অর্থাৎ শতকরা ১০ জনেরও অধিক মূক ও বধির, শতকরা পাঁচজনের অধিক অন্ধ এবং শতকরা প্রায় ১৫ জন মূর্খ নিকট আত্মীয় বা জ্ঞাতি-বিবাহের ফলে জন্মিয়া থাকে। এই ত গেল সভ্য জাতির নিজদের কথা। আমাদের দেশেও দেখা যায়, যে জাতি বা শ্রেণী ঐরূপ blood-marriageর পক্ষপাতি তাদের মধ্যে মূক, বধির, কাণা, খঞ্জ ও বিকলাঙ্গ সন্তান পরিমাণে অধিক। আমি জানি এক গৌতম গোত্রের পুরুষ গৌতম গোত্রের মাতার গর্ব্ভজাত এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া অনেকগুলি মূক ও বধির সন্তান লইয়া নিজ কর্ম্মফল খুঁজিতেছেন। অন্য এক জন মুদ্গল গোত্রীয় পাত্র মুদ্গল গোত্রীয়া মাতার কন্যাকে বিবাহ করিয়া মূক ও বধির সন্তান লাভ করিয়া ঈশ্বরকে দোষ দিতেছেন। তোমরা একটু যত্ন করিলেই kindred marrigeএর যে মন্দ ফল তাহা অনেক স্থলে দেখিতে পাইবে। আর্য্যগণ এই বিপদগুলি দিব্য চক্ষে দেখিয়া বিবাহ সম্বন্ধ নির্ণয়ে এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই ব্যবস্থা এত কঠোর ছিল যে সমাজ পুত্রের মত—অধীনস্থ সৈন্যের মত—তাঁহাদের সে বিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য হইত। সে বিষয়ে "কেন" বা "কি" ইত্যাদি প্রশ্নের সুযোগ ছিল না। কিন্তু আধুনিক সভ্য সমাজ উপযুক্ত ডাক্তারগণের মতামত জানিয়াও আজ পর্য্যন্ত বিবাহ পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। এর নাম সভ্যতা ও শিক্ষা—হা অদৃষ্ট!

শ্রীশঙ্কর।—আমাদের ধারণা ছিল বিবাহাদি বিধি-নিষেধের মধ্যে কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ নাই। কেননা, প্রায় দেখা যায় উচ্চ বংশের সহিত অপেক্ষাকৃত নীচবংশ রক্ত-বিনিময় করিয়া উচ্চস্তরে উঠিয়া থাকেন। এরূপ বিবাহের ফল অবশ্যই সামাজিক মঙ্গলের জন্য।

মু।—In an interview published in Paris Dr. Berillon French expert on Eugenics declared that his investigations have shown that normal health of husband and wife cannot alone assure perfect progeny, but that on the contrary, two perfectly healthy persons free from inherited traits or acquired disqualifications may have malformed or defective children. Heterogenious inter-mixture of bloods are not sympathetic and should not be adopted. The Dr. thinks that habits and customs ingrained in different peoples may have much with the quality of their bloods and he disapproves of inter-race marriages. প্যারিসের ডাক্তার বেরিলন বলিয়াছেন যে পতিপত্নীর স্বাস্থ্যই বাঞ্ছিত অপত্য লাভের কারণ নহে। তাঁহার বহুদর্শিতার ফলে তিনি দেখিয়াছেন যে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবান্ পিতামাতার অপত্য (যাঁহারা বংশগত বা নিজেদের কর্ম্মের ফলে রক্তে কোন দোষ বহন করেন না) বিকলাঙ্গ বা অঙ্গহীন হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে রক্তের অবাধ মিশ্রণ কখন শুভফল প্রসব করে না এবং এরূপ মিশ্রণ করা উচিত নহে। পূর্ব্বোক্ত বর্ব্বর ও নিগ্রো সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা স্মরণ কর। একটি উন্নত মনুষ্য একটা বিষম জটিল পদার্থ। এমন ক্ষেত্রে তুমি যে বিবাহের উল্লেখ করিলে

তাহাতে আপাততঃ ভাল ফল হইলেও তাহার পরিণাম বিষয়ে চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত। pre-potency of seed না থাকিলে ঐরূপ বিবাহে উন্নতির কথা দূরে থাক—উচ্চ বংশের অবতরণ অনিবার্য্য। এখনকার কালে ব্রহ্মচর্য্যাদি লোপ পাওয়ায় pre-potency আর প্রায় দেখা যায় না। কাজেই উক্ত রক্ত বিনিময়ে কতকগুলি অদ্ভুত জীব জন্মগ্রহণ করে এবং জাতির পরাধীনতার ফলে সেই বংশধরগণের সমাজে স্থানের ঠিক থাকে না। একটা বিষম সামাজিক খেচড়ি তৈরী হয় মাত্র। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার দরকার নাই—তা হলে তেতো বোধ হইবে। বিবাহ পদ্ধতির অবনতি হওয়ার ফলেই আর্য্য সমাজ আজ ধ্বংসপ্রায়। বিবাহ সমাজ গঠনের মূল। আবার সংযম শিক্ষার অভাবে বিবাহ পদ্ধতি এমন কপট সংস্কারে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই অপত্যাদিও কাপট্য ও শাঠ্যে পরিপূর্ণ হইয়া নিজেদের পূর্ব্ব গৌরব ভুলিয়া যাইতেছে।

শ্রী। আর্য্যের বিবাহ প্রথার যত সুখ্যাতি করুন তাহাতে অনেক অশ্লীলতা পূর্ণ ভাব ও আচরণ রহিয়াছে। আমাদের রুচির বিরোধী।

মু। শ্লীলতা ও অশ্লীলতা তোমার শিক্ষার উপর নির্ভর করে। তোমাদের মত ক্ষুদ্রাধিকারীর পক্ষে ব্যাসদেবের কুরুবংশ রক্ষা করার কথা অতিশয় অশ্লীল বলিয়া জ্ঞান হইবে। আর্য্যগণ অল্পাধিকারী ছিলেন না। তাঁহারা কোন জিনিষের অল্পলাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়েন নাই। যখন সভ্যতার বিষয় বলিব তখন এ বিষয়ে বিস্তারিত বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এখন চেষ্টা করিয়া সংযত হও; সৃষ্টিতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম কর; তার পর কামশাস্ত্র পড়িও। তাহাতে যে অপূর্ব্ব ভাব বর্ণিত হইয়াছে তাহা বুঝিলে তোমার জীবন সার্থক হইবে। তোমাদের রতিক্রীড়া এবং আর্য্যের রতিক্রীড়া বস্তুতঃ এক হইলেও ফলতঃ দুইর মধ্যে অন্ধকার ও আলোর মত তফাৎ বর্ত্তমান। এক শারীরিক ও মানসিক অবনতির প্রধান হেতু হয়; অন্য শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সহায় হয়। আর্য্যকামশাস্ত্র বংশোজ্জ্বল অপত্য দিবার ব্যবস্থা দিয়া সমাজের গঠনে প্রথম শ্রেণীর ইষ্টক প্রদান করে। তোমাদের ফরাসী কামশাস্ত্র সমাজ গঠনে ধ্বংসের বীজ রোপণ করিয়া ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র অপত্য দান করে। এক সহজাত প্রবল ইন্দ্রিয়কে ইন্ধন দেয়। অন্য সেই সহজাত প্রবলকে ক্রমে দুর্ব্বল করিয়া স্বাস্থ্য, মানসিক বল দেয়। এক নিজ ধনে কাঙ্গালী করে, অন্য নিজ ধনকে বর্দ্ধিত করিয়া দীর্ঘকাল সুখী করে। কত জড় বিজ্ঞান কত মানসতত্ত্ব আলোচনা করিয়া তোমরা পাগল হইতেছ, কিন্তু বিজ্ঞানের বিজ্ঞান—তত্ত্বের তত্ত্ব—সৃষ্টির বীজতত্ত্ব; তাহা তোমরা আলোচনা করিতে বিমুখ। কি অপ্রাকৃত মানসিক অবনতি ভাবিয়া দেখ। যে জিনিষের এক বিন্দু ৪০ বিন্দু বিশুদ্ধ রক্তে উৎপন্ন হয় তাহার তত্ত্ব বিষয় আলোচনা অশ্লীল; আর যাহা তাহাতে ক্ষয় হইয়া অচিরে সব নষ্ট করে তাহাই শ্লীল! যাহার এক বিন্দুতে শ্রীশঙ্করের মত মস্তিষ্ক দিয়াছে তাহার তত্ত্ব তোমাদের কি আলোচনা করা দরকার নহে; বেদে একটা কথা আছে—শুক্র বলিতেছেন—"আমার জন্ম সুখে,আমার দেহ সুখময়, আমার ধর্ম্ম সুখ দেওয়া, আমি সুখ ছাড়া কিছু জানি না। কাজেই মানুষ যখন আমোকে অগ্রাহ্য করে তাড়াইয়া দিতে চাহে—আমি যাবো না তবু সে তাড়াবে—তখন অগত্যা যাবার সময়ও তাকে সুখ দিয়া যাই। যদি সে আমাকে থাকিতে দিত আমি তাহাকে অমর করিয়া সুখী করিতাম।"

শ্রী। তাই শাস্ত্রকার গণ কামিনীকে এত হেয় জ্ঞান করিতেন। তাই সন্ন্যাসীদের এত আদর ও এত পূজা।

মু। ঐ একটি মস্ত ভুল। ঋষি প্রণীত আর্য্যশাস্ত্রের কোথাও তুমি দেখাতে পারিবে না যে কামিনী, যিনি জগজ্জননী, তাঁহাকে অবহেলা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে জাতি ব্রহ্ম-চর্য্যের আচরণে সংযতেন্দ্রিয় তাহার নিকট "কনকঞ্চ কান্তা" আদরেয়। সন্ন্যাস চতুরাশ্রমের শেষ আশ্রম.; তাহার সহিত তুমি যে সন্ন্যাসীর কথা উল্লেখ করিলে তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। মানুষ অর্দ্ধ জীব—তাহার পূর্ণত্ব রমণী মিলনে হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীর শেষ আদর্শ যোগেশ্বর মহাদেব—যিনি কামকে ধ্বংস করেন, তিনিও কামিনীকে ক্রোড়ে করেন। সভ্যতাও ধর্ম্ম আলোচনার সময় এ সকল কথা আপনা হইতে আসিবে।

শ্রী। কি বলিতেছেন—শাস্ত্রে সন্ন্যাসীর আদর ও 'কামিনী সর্পিণী' ইহা বার বার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

মু। তোমাকে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিতেছি। চিন্তা করিতে উপদেশ দিতেছি। মানস পুত্রগণের মধ্যে নারদ প্রভৃতি কয়জন ছাড়া সকলেই বিবাহিত হইয়া সৃষ্টির উন্নতি করিয়াছিলেন। যে দিন ইইতে ব্রহ্মচর্য্য ক্ষীণ হইল, সংযম শিক্ষার অভাব হইল, সেই দিন হইতেই জগজ্জননী ভয়ের আকার ধারণ করিলেন। পুরুষ ও প্রকৃতি অচ্ছেদ্য। এককে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে চিন্তা করা যায় না। জীবনের সদ্ব্যবহার ও তাহার উৎকর্ষ রমণীসাহায্য ভিন্ন হওয়া অসম্ভব। মূল হারাইয়া আজ আমরা contra-ception লইয়া মাথা ঘামাইতেছি। হা অদৃষ্ট !

শ্রী। যাঁহারা যুদ্ধ করেন তাঁহাদের কি বিবাহ করা আপনার মতে উচিত ?

মু। ক্ষত্রিয় বীর গণের সকলেই বিবাহিত। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিলাম যে বিবাহ না করিলে পূর্ণ জীবন লাভ করা যায় না। রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণ সকলেই বিবাহিত। অর্জ্জুন বিবাহিত। যুবক অভিমন্যুও বিবাহিত ছিলেন। অধুনাতন কালেও পৃথ্বীরাজ, প্রতাপসিংহ প্রভৃতি প্রতঃস্মরণীয় ক্ষত্রিয় বীরগণ বিবাহিত ছিলেন। বিবাহের সহিত তোমাদের এই ঘোরতর যুদ্ধ একমাত্র সংযমের অভাবে। রাজপুতনার ইতিহাস পড়িলে দেখিতে পাইবে ক্ষত্রিয় পুরুষ নিধনে তাহাদের পত্নীগণ জহর ব্রত করিতেন বা সহমরণে যাইতেন। ক্ষত্রিয় তোমাদের মত সন্ন্যাসী ছিলেন না। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত জগৎকে প্রচুর শিক্ষা দিতে পারে।

শ্রী। তবে সন্ন্যাসীর আদর কোথা হইতে আসিল ?

মু। সে কথা এই বিবাহ আলোচনার বিষয় নহে। ধর্ম্ম আলোচনার সময় তাহার কথা আমাকে বলিতেই হইবে। ভারতবর্ষ এক অপূর্ব্ব স্থান ; এইখানে মানবমনের এবং সমাজধর্ম্মের উত্থান ও পতন কিরূপে হইয়াছে তাহার ইতিবৃত্ত একটু ক্লেশ স্বীকার করিলেই পাওয়া যায়। ভারতে যাহা হয় নাই তাহা আর পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এ অপূর্ব্ব স্থান মানব জাতির পৈতৃক মূলধন। তাদের পিতৃরাজ্য।

শ্রী। ঐ এক গোড়ামী—ঐ জন্যই আমরা আজ অধঃপতিত।

মু। সমাজের stability (সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থিতি) যদি সভ্যতা শ্রীবৃদ্ধির একমাত্র উপায় হয়, তবে তুমি আমাকে দেখাতে পার আর্য্য-প্রণীত সমাজ ও সভ্যতা ছাড়া আর কোন জাতি ঐরূপ সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ! আজও সভ্যজাতিগণ আর্য্যসমাজ ও আর্য্যসভ্যতার বিষয় অবগত হইয়া অবাক্ হইয়া পড়িতেছেন ! তোমাকে পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্ডিতদের মত পড়িতে বলি।

"পুরাণ চাউল ভাতে বাড়ে" একটা চলিত কথা আছে ! সেই কথাটার মূল্য আছে তাহা অবহেলা করিও না, যত অবহেলা করিবে তত ভিত্তিহীন হইয়া ছুটো ছুটি করিতে থাকিবে। আর্য্য ঋষিগণ জন্ম মৃত্যু ও বিবাহকে অনিবার্য্য বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রী। আপনার মতে সকলকেই বিবাহ করিতে হইবে—কেমন নয় ?

মু। অবশ্য তাহাই বটে। যতক্ষণ তুমি পুরুষ ও অপর নারী—এই লিঙ্গভেদজ্ঞান তোমাতে বর্ত্তমান, ততক্ষণ তুমি যদি বিবাহ না কর, সেটা মূর্খের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের সহজ পন্থা হইলেও বুদ্ধিমানের নিকট আত্মবঞ্চনা মাত্র। তবে অক্ষম বিকলাঙ্গ প্রভৃতি দোষে দূষিত পুরুষ বা নারীর বিবাহ না করারই ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। এই বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটু অবসর গ্রহণ করিলে শ্রীশঙ্কর, পরিমল ও বিনয়ের মধ্যে এইরূপ তর্ক বিতর্ক হইল।

পরিমল। হিন্দুরা স্ত্রীজাতির প্রতি যে ব্যবহার করেন তাহা ত বেশ দেখিতে পাইতেছি। যদি এইরূপ ব্যবহার ভাল হয় তবে জানি না মন্দ ব্যবহার কাকে বলে।

শ্রীশঙ্কর। মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত সময়ের কথা বলিতেছেন না। তিনি আর্য্য জাতির কি আদর্শ ছিল তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আজ কালের অধঃপতন দেখিয়াই পুরাতন আদর্শ কি ছিল ও তাহা কিরূপে ক্রমে অধঃপতনে আসিয়াছে তাহাই দেখান তাঁহার উদ্দেশ্য।

বিনয়। এখন দেখা যায় আমরা ত স্ত্রীলোককে গৃহের দাসী ভাবি। স্ত্রী মরুক বা বাঁচুক তাকে জলের গেলাসটিও মুখে ধরে দিতে হবে। নিজে গল্প করিব, স্ত্রী জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে আমায় চা তৈরী করে দিবে। তাহারা কি খায় কি পরে আমরা কিছুই দেখি না। এসব দেখে মনে হয় না আমরা কখন স্ত্রীজাতিকে মান্যের চক্ষে দেখিয়াছি। নিজেদের "রেষ্টোরেণ্টে" যথেষ্ট ব্যয় হইলেও বাড়ীতে রমণীগণ ডাঁটা চচ্চড়ীতে তৃপ্ত থাকেন—শিশুদের বার্লি বা সাগুদানা।

শ্রী। যে জাতি স্ত্রীলোকের পূজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিয়াছিল—যে জাতি কালী দুর্গা সরস্বতী ষষ্ঠী প্রভৃতি রমণী-মূর্ত্তির পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিল—যে জাতি কুমারী ও গৌরী পূজার প্রশংসা করিয়াছিল—যে জাতির দীক্ষামন্ত্র "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"—"উনষোড়শ বর্ষায়াম্ প্রাপ্তপঞ্চবিংশতিং। যদাধত্তে পুমান্ গর্ভ কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥ জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়॥ তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥ (সুশ্রুত)—কার্য্যেষু মন্ত্রী, করণেষু দাসী, ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া ধরিত্রী, স্নেহেষু মাতা, শয়নেষু রামা, রঙ্গে সখী—যে জাতি নিজ পত্নীকে এইরূপ দেখিত," যে জাতির উপদেশ "সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভত্রা ভার্য্যা তথৈবচ—যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং" এই শিক্ষা দিয়াছে—যে জাতি "নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধুঃ নাস্তি ভার্য্যা সমা গতিঃ। নাস্তি ভার্য্যা সমো লোকঃ সহায়ো ধর্ম্ম সংগ্রহে" এই উপদেশ দিয়াছে—যে জাতি "প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা জায়া ছায়া স্বরূপিণী। স্বষা মূর্ত্তিমতী প্রীতিঃ দুহিতা চিত্তপুত্তলিঃ॥—বলিয়া জানিত—যে জাতির প্রাতঃস্মরণীয় মন্ত্র—'অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী'—যে জাতি জানিয়াছিল যে 'বেদৈশ্চ সতীভিঃ সত্যবাদিভিঃ' এই মহী ধৃত হইয়া রহিয়াছে—যে জাতি মৈত্রেয়ী, গার্গী, লোপামুদ্রা, খনা, লীলাবতী, বিশ্ববারা প্রভৃতি লোকপূজ্যার আজও আরাধনা করিয়া থাকে—যে জাতি নারীকেও ঋষিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—সে জাতির কি নমুনা আমরা ?

পরিমল। তবে ভাই, শাস্ত্রে কেন বলে, অষ্টমে গৌরী-দান, নবমে রোহিণী, দশমে কন্যকা, তার পর হলেই রজস্বলা। এই মহাদানের ফলেই এগার বৎসরে ছেলের মাতা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতির বৈকুণ্ঠবাসের যোগাড়।

বিনয়। আর লিবার, থাইসিস্, দৃষ্টিহীনতা ইত্যাদি রোগের প্রাবল্য।

শ্রীশঙ্কর। ভারতের অদৃষ্ট! নতুবা যে জাতি সংযমের জন্য জগতে বিখ্যাত—যে জাতি "ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবঃ নতু মানুষঃ" এই মন্ত্র দিয়াছিল—যে জাতি মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ লিপিবদ্ধ করিয়াছিল, সে জাতির কি অধঃপতন তাহা আমাদের ঘরে ঘরে দেখিতে পাও না কি! পূর্ব্ব আদর্শ অতল জলে ডুবাইয়া দিয়া আমরা আজ নিজ ধনে কাঙ্গালী। মহামতি বার্ক বলিয়াছেন, **By respecting our fore-fathers we learn to respect ourselves.** পূর্ব্ব পুরুষের প্রতি সম্মান করিলে আমাদের পুত্রগণও আমাদের সম্মান করে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি সম্মান হারাইয়া আমরা দ্রুতবেগে নিম্নদিকে চলিতেছি। ঈশ্বর দয়া করুন আমরা পূর্ব্বপুরুষের ছেঁড়া পুঁথিতে কি আছে তাহা দেখিতে শিখি। প্রাত্যহিক পাঠ্য স্তবাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়, উত্তম পুত্র লাভ আর্য্যদের একটি প্রধান প্রার্থনা ছিল।

বিনয়। শঙ্কর ক্রমে বেয়াড়া হয়ে গেলে যে হে। এত শিক্ষা এত পাণ্ডিত্য ভুলে মেরে দিলে দেখ্‌ছি।

পরিমল। যা বল ভাই, ভাবিবার বিষয় আছে। সেই জন্যই বলা হয়েছে—**There are more things in heaven and earth than are dreamt of in philosophy.** দর্শন বা বিজ্ঞান যা দেখে তার চেয়ে ঢের জিনিষ সংসারে বর্ত্তমান।

ইতিমধ্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজ আসনে আসিয়া বসিলেন।

ক্রমশঃ

আয়ুর্ব্বেদ-নিন্দা—বিজ্ঞানের নামে ধৃষ্টতা

ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত, এম-ডি

কিছুদিন হইল ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটের (Indian Medical Gazette) এপ্রিল সংখ্যা আমার হস্তগত হয়। তাহাতে লেখা হইয়াছে আয়ুর্ব্বেদকে চিকিৎসা-শাস্ত্র (science) বলা যায় না; অতএব আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সাহায্যপ্রার্থনা নিতান্ত অন্যায় এবং তাহাতে প্রকৃত চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির পথ অবরোধ করা হয়। আজকাল অধিকাংশ পাশ্চাত্য চিকিৎসকই আয়ুর্ব্বেদকে অজ্ঞানের আকর ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া থাকেন, অতএব তথ্য অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমরা এই বিষয়টী সংক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যদি আয়ুর্ব্বেদের মূলে কিছুই সত্য না থাকে এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানই সত্যের একমাত্র অধিকারী হয়, তাহা হইলে একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য, গবর্ণমেণ্টের পাশ্চাত্য চিকিৎসা-

বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পেই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত ও অমূলক আয়ুর্ব্বেদের প্রচার জন্য অনর্থক অর্থ ব্যয় করা উচিত নহে।

অতএব সর্ব্বপ্রথমেই বিচার্য্য, এই উভয়ের মধ্যে কাহার মূলে কতটুকু সত্য আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ যাহাকে বিজ্ঞান আখ্যা দিয়াছেন সেই চিকিৎসা বিজ্ঞানে আজ অবধি স্থায়িত্বের রেখাপাত হয় নাই। বিজ্ঞান বলিতে বিশিষ্ট জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞানের স্বরূপই এই, যে সম্যক্‌জ্ঞাত বস্তু চিরকালই একভাব থাকে। দিন আসে দিন যায়। বৎসর আসে বৎসর যায়। যুগ আসে যুগ যায়। সত্য একবার যেরূপে দেখা দেয়, চিরকালই সেইরূপে বিরাজমান থাকে। কালবশে জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। কেবল সত্যেরই পরিবর্ত্তন নাই। সত্য সনাতন। পরিবর্ত্তন বিরহই তাহার বীজ। চঞ্চল বস্তু কখনই সত্য হইতে পারে না। একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। উন্নতির দোহাই দিয়া সনাতন সত্যে পরিবর্ত্তনের ছায়াপাত করা যায় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যে বিজ্ঞানের গন্ধমাত্র নাই, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে আজ যাহা বলে কাল তাহা উল্‌টায়। যাঁহাদের কথার একদিনেরও স্থিরতা নাই তাহারা কি করিয়া যে বিজ্ঞানের ও সত্যের অভিমান করেন তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। যাঁহারা নবীন উন্নতির মোহে সত্যের স্বরূপ বিস্মৃত হন নাই, তাঁহারা ইঁহাদের বৃথা আস্ফালনে আত্মবিস্মৃত হন না।

পাশ্চাত্যবিজ্ঞান যেমনই পরিবর্ত্তনশীল আয়ুর্ব্বেদ তেমনই পরিবর্ত্তন-রহিত। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদে যাহা বলা হইতেছে আজও তাহাই অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজমান। উন্নতি মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান যদ্রূপ সর্ব্বদাই বাদ প্রতিবাদ শ্রান্ত, ত্রিকালদর্শিজ্ঞান প্রসূত আয়ুর্ব্বেদ তদ্রূপই উন্নতির বৃথাভিমান পরিত্যাগ করিয়া বাদপ্রতিবাদরূপ ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে হিমালয়ের ন্যায় অচল অটল নির্দ্বন্দ। অধিকন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আত্মাভিমানে অন্ধীভূত হইয়া যে সব শাস্ত্রীয় সত্যের উপর অজস্র বিদ্রূপ বর্ষণ করিত, কালক্রমে সেই সকল সত্যের মধ্যে অনেক গুলিকেই একে একে স্বাভিমান চূর্ণ করিয়া মানিতে বাধ্য হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের উদ্দেশ্য, অতি মহৎ, লক্ষ্য অতি উচ্চ, আর্ত্তজনের দুঃখ প্রশমন ও যথাসম্ভব রোগ শান্তিই আয়ুর্ব্বেদের একমাত্র লক্ষ্য।

তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।
স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ ॥

যে ঔষধে রোগীর রোগদূর হয় তাহাই প্রকৃত ঔষধ। যিনি রোগীকে রোগমুক্ত করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক।

ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ।
এতৎ বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ ॥

ব্যাধির নিদানজ্ঞান এবং রোগীর দুঃখ শান্তি করাই বৈদ্যের বৈদ্যত্ব। আয়ু না থাকিলে আয়ুদান করা বৈদ্যের কার্য্য নহে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য একেবারে ভিন্ন। আয়ুর্ব্বেদে চিকিৎসার যে মহান্ উদ্দেশ্যের কথা বর্ণন করা হইল, পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রমতে সেই উদ্দেশ্য দুষ্ট। পাশ্চাত্য চিকিৎসার একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁহাদের তাৎকালিক ভ্রান্তমতের অনুসরণ। রোগী বাঁচে কি মরে তাহাতে তাঁদের ক্ষতিবৃদ্ধি ত নাইই। বরং তাঁহাদের ভ্রান্ত মত ত্যাগ করিয়া রোগীর প্রাণ দিলে বিষম দোষভাগী

হইতে হয়। যাহারা পাশ্চাত্য নেশায় জ্ঞানহারা হন নাই তাঁহাদের একথা বুঝাও কঠিন, ভাবিতেও কষ্ট হয়। কিন্তু ইহা আসলেই অতিরঞ্জিত নহে।

বিলাতের ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েসন নামক সভা বিলাতের পণ্ডিত ও কৃতী চিকিৎসকগণে সুশোভিত। সেই সভার কথা, সকলেরই নিকট পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা বলিয়া গ্রাহ্য হইবে, সংশয় নাই। ডাক্তার একস্‌হ্যামের প্রতি (Dr. Axham) তাঁহাদের আচরণ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের মত তাঁহাদের সাময়িক প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া রোগীর আরোগ্যের কারণ হইলে তাঁহার আর নিষ্কৃতি নাই! ইংলণ্ডে বার্কার নামে একব্যক্তি (এখন তিনি সার্ হারবার্ট বার্কার) পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান না শিখিয়া, চিকিৎসা করিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হন। ডাক্তার একস্‌হ্যাম Axham তাঁহাকে সাহায্য করেন। আনাড়ী ডাক্তারকে সাহায্য করিয়া ভূরি ভূরি মনুষ্যের দুঃখ দূরীকরণ রূপ দুরপনেয় অপরাধে তিনি ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। চিকিৎসকদল হইতে তিনি বহিষ্কৃত হইলেন। কিন্তু সত্যের অপলাপ করা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাধ্যাতীত হইল। ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের ক্ষমতা অতিক্রম করিল। গৌণ দোষী অপরাধীর অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইল বটে, কিন্তু মুখ্য অপরাধীর অপরাধ দোষ না হইয়া গুণে পরিণত হইল। একযাত্রায় পৃথক্ ফল। ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়ানের উদার চেষ্টা সত্ত্বেও বার্কার জনসাধারণের অকুণ্ঠ সম্মানে সম্মানিত হইয়া নাইট্ উপাধিতে বিভূষিত হইলেন। সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় যে বার্কারের উপাধিপ্রাপ্তিতে একস্‌হ্যামের (Axham) অপরাধের মার্জ্জনা হইল। কিন্তু সত্যপ্রিয় ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েসনের কাছে তাহা হইবার নহে। Axham এর দণ্ড অক্ষুণ্ণ রহিল। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সত্যপরায়ণতার পরিচয় ও অক্ষুণ্ণ রহিল।

পাশ্চাত্য চিকিৎসার মাসিক পত্রগুলি পড়িলে একেবারেই আত্মহারা হইতে হয়। প্রত্যেক কাগজেই অক্ষুণ্ণ সত্যের অচল প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রমাণগুলি সর্ব্বদাই পরস্পর বিরোধী। কেহ কাহারও সহিত মিলে না। ইহাতেও তাহাদের হেয়ত্বের জ্ঞান হয় না, ইহাই বড় বিস্ময়ের বিষয়। রোগের নিদান কি - অদ্যাবধি তাহার প্রকৃত উত্তর পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে পাওয়া গেল না। কালচক্রের আবর্ত্তনে যেমন দিনের পর দিন আসে তেমনই পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবর্ত্তনে উত্তরের পর উত্তর আসে। বিরাম নাই, অন্তও নাই। বলাবাহুল্য নিষ্পত্তি সুদূর পরাহত। তবে একটা জিনিষ আছে—যখন যেটা বলা হয় তখন সেইটাই খাঁটি একমাত্র সনাতন সত্য। আজকার সত্য কালকার সত্যের বিরুদ্ধ। তথাপি উভয়ই সত্য নামে অভিহিত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে মিথ্যার গন্ধমাত্রও নাই। কেবল সনাতন সত্যে প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদাদিই মিথ্যার আকর। দুদিন আগে জীবাণুগনই (bacilli) রোগের একমাত্র কারণ ছিল। এখন কিন্তু তাহারা উচ্চাসন হইতে বিতাড়িত হইয়া দেহান্তরস্থ গ্রন্থি সমূহের (endocrine system) বশ্যত্ব স্বীকার করিতেছে। আবার হয়ত অতি অল্পদিনেই এই সদ্যোজাত শিশুর অন্তিম সময় উপস্থিত হইবে এবং রক্তের ক্ষারত্ব ও অম্লত্ব ব্যঞ্জক P H-ionএর ন্যূনাধিক্যই রোগের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। এই চক্রবৎ আবর্ত্তনশীল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা কে বলিতে পারে? তবে একটী জিনিষ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তন প্রবাহ, অভিমানের তমোরাশি ভেদ করিয়া

ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে মহর্ষি চরক প্রদর্শিত—মিথ্যাহার-বিহারভ্যাং—নিদানের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই জীবাণুতত্ত্বের (Bacteriology) মোহে মুগ্ধ। জর্ম্মণদেশীয় চিকিৎসক কক্ (Koch) প্রণীত কতকগুলি সূত্রকে অবলম্বন করিয়া এই জীবাণুতত্ত্ব প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে! অথচ কোন ক্ষেত্রেই এই সূত্রগুলি সম্যক্ প্রযোজ্য হয় না। ও মাত্র পাঁচ ছয়টী রোগে আংশিক প্রযোজ্য হয়। এমন কি প্রসিদ্ধ টাইফয়েড জ্বরেও দেখা যায় যে টাইফয়েড জীবাণু ভিন্ন ষ্ট্রেপ্‌টোককাস্ (Streptococcus) পাওয়া যায় এবং সেই ষ্ট্রেপ্‌টোককাস্‌গুলিই টাইফয়েড্ জ্বরের প্রধান প্রধান লক্ষণ সৃষ্টি করে, যথা রক্তস্রাব প্রভৃতি। অতএব টাইফয়েড জ্বর যে টাইফয়েড জীবাণুকৃত এই মত ভ্রান্ত। জীবাণুতত্ত্বের (bacteriology) আইন এই যে রোগীর রক্তে যে প্রকার জীবাণু পাওয়া যায় তাহারই Vaccine দ্বারা সে রোগী নিঃসংশয় আরোগ্যলাভ করিবে। যদি না করে, তাহা হইলে দোষ সে হতভাগ্য রোগীর, নবাবিষ্কৃত মিথ্যাতত্ত্বের নহে। কিন্তু তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাই যে, ষ্ট্রেপটোককাস্ সেরাম (Serum) ও ভ্যাকসিন (Vaccine) দিয়া অথবা কোলাই ভ্যাক্‌সিন দ্বারা টাইফয়েড সারে, টাইফয়েড ভেক্‌সিন্ দ্বারা ফাইলেরিয়ার জ্বর দূর হয় এবং উন্মত্তরোগীর ভীষণ পক্ষাঘাত রোগ (General paralysis of the insane) ম্যালেরিয়ার জীবাণু দিলে সারে। তথাপি দারুণ পাশ্চাত্যমোহে বলিতে হইবে ব্যাক্‌টিরিওলজি (bacteriology) সত্য ও উহার বিরুদ্ধে বলিলে অতিপাতক হয়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসক সমাজে আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা নিত্য নৈমিত্তিক হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে কেহই কুণ্ঠা বোধ ত করেনই না বরং যিনি যে পরিমাণে নিন্দা করিতে পারেন তিনি পাশ্চাত্য শাস্ত্রে সেই পরিমাণে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দেখিয়াও দেখে না, শিখিয়াও শিখে না। দুই একবার ভুল করিলেই লোকে যা তা বলিতে পশ্চাৎপদ হয়, পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্‌গণের নিকট এই সনাতন নিয়ম খাটে না। উন্নতির দোহাই দিয়া তাঁহারা ভুল করিতে লজ্জা বোধ করেন না, মনুষ্যজীবন লইয়া খেলা করিতে কুণ্ঠিত হন না। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্বেষানল সকল অবস্থাতেই সমভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে জ্বলিতে থাকে।

শোথ রোগে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে লবণ নিষিদ্ধ। লবণে প্রস্রাব বৃদ্ধি হয়, অতএব জলক্ষয় দ্বারা শোথের শান্তি করে—এই অন্ধ অভিমানে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপকগণ (৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে) আয়ুর্ব্বেদকে সদাই উপহাস করিতেন। ছাত্রগণও বিলাতী মোহে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে যোগ দিত। পাশ্চাত্য ক্ষণভঙ্গুর সত্যের প্রভাবে শোথ রোগীকে অম্লানচিত্তে লবণ দেওয়া হইত এবং তাহার ফলে অনেক রোগীই দুঃখময় সংসার হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে অচিরেই বিশ্রাম লাভ করিতেন। অহঙ্কার-বিজড়িত মিথ্যা সত্যের দোহাই দিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মনুষ্যবধে কখনও কুণ্ঠা উপস্থিত হইল না। অপ্রতিহত কালবেগে কিছুদিন পরে ইউরোপে উইডাল (Widal) এবং জাবাল (Javal) আবিষ্কৃত করেন যে ক্লোরাইডের দ্বারা শোথ উপস্থিত হয়, অতএব শোথ রোগে লবণ একেবারে বর্জ্জনীয়! সোডিয়াম-ক্লোরাইড্‌কেই লবণ বলে। এই সংবাদ পৌঁছিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকদিগের সুর ফিরিল। যাঁহারা এতদিন শোথ রোগে লবণ দিয়া প্রাণবধ করিবার জন্যই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহারা সেই

মুখেই লবণ বর্জ্জনের মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। পাশ্চাত্য ক্ষণিক মিথ্যা সত্যের মোহে যে এত কাল হত্যা করিলেন তাহার জন্য কাহারও মনে অনুতাপের ছায়ামাত্রও স্পর্শ করিল না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অভিমান ও আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্বেষ তাঁহাদের হৃদয়ে সমভাবে অধিকার করিয়া রহিল। যে আয়ুর্ব্বেদ যুগ যুগান্তর হইতে লবণবর্জ্জন ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে তাহা পূর্ব্ববৎ সমভাবে অজ্ঞানের আধারই রহিল! আর যে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান শোথ রোগে লবণের উপকারিতা শতমুখে ঘোষণা করিয়াছিল সেই পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানই জ্ঞানের অপরিসীম ভাণ্ডার, সত্যের অবিনাশী হেতু বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

"ধন্যো বৈদিশিকো মোহঃ" (বিদেশীয় মোহকে ধন্য)।

ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়া জ্বর যে অমাবস্যা পূর্ণিমা ও একাদশীতে বৃদ্ধি পায়, একথা জানিতে বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। ইচ্ছা করিয়া চক্ষু না বুঁজিলে সকলেই দেখিতে পায়। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঘনান্ধকারে নষ্টদৃষ্টি অধ্যাপকগণ এই বিস্পষ্ট সত্যকেও উপহাস ও বিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। মেডিকেল কলেজের কোনও খ্যাতনামা অধ্যাপক তাঁহার অধীনস্থ হাউজ্ ফিজিসিয়ান্‌কে কথায় কথায় বলেন "তোমরা বল ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়া পূর্ণিমায় বৃদ্ধি হয়। উহাদের জীবাণুগণ কি পূর্ণিমার রাত্রে প্রেমিক প্রেমিকার অভিনয় করে! এ সকল কথা একেবারে অন্যায়।" তিনচারিবৎসর অতীত হইতে না হইতেই সেই অধ্যাপক নিজেই এমন কুসংস্কার জালে জড়িত হইয়া পড়িলেন যে কোনও রোগীর অমাবস্যা পূর্ণিমাতে জ্বর হইতেছে শুনিলেই তাহার ফাইলেরিয়া হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত করিতেন। তথাপি সেই অধ্যাপকের আত্মাভিমান ও আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্বেষ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সত্যের আদরের এই আর এক জলন্ত দৃষ্টান্ত।

শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শিশুপরিচর্য্যায় যে সকল বিধি আয়ুর্ব্বেদ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই সুদীর্ঘকাল পরে আজ তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে কথঞ্চিৎ প্রবৃত্ত। পাশ্চাত্য চিকিৎসক সকল বলিতেছেন যে সূর্য্যের আলো নরশোণিতের ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফেট্ বৃদ্ধি করাইয়া দেহকে সবল করে। আমাদের দেশে একথা বহুকাল হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানেন। শিশুকে উত্তমরূপে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে দেওয়া এদেশের সনাতন প্রথা। এজন্য ভারতবর্ষে এত দারিদ্র্যসত্ত্বেও Rickets কখনও হইত না। দুঃখের বিষয় যে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের গরমে ঐ প্রথাও গলিয়া যাইতে বসিয়াছিল।

আমাদের দেশে সকলেই জানেন "আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ"। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা আচারের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ছাড়া কিছুই নাই। ইউরোপের মলমূত্র পরিত্যাগের পর জলশৌচ না করার প্রথার কথা মনের কোনেও উদয় হইলে ভারতবাসিমাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। এই সুদীর্ঘ কালেও ইউরোপ ধারণা করিতে পারে নাই যে এই জলশৌচ সকল রকমেই কিরূপ প্রয়োজন। এতদিনে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এইমাত্র বুঝিয়াছে যে, মলত্যাগের পর শৌচ না করিলে গুহ্যদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে জীবাণু জন্মে এবং প্রস্রাব করিয়া শৌচ না করিলে ইউরিক্ এসিডদ্বারা প্রস্রাবদ্বারে ক্ষত হইতে পারে।

ভারতবাসীমাত্রেই প্রত্যূষে উঠিয়া মুখ ধুইয়া দাঁত মাজিয়া থাকেন। তাহার পর প্রয়োজন

মত কিছু আহার করেন। দাঁত না মাজিয়া মুখ না ধুইয়া খাইতে নাই একথা কি ইংরাজগণ জানেন? তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইলেই বিছানায় বসিয়া বাসি মুখে চা খাওয়ার প্রথা মনে পড়িলে ভারতবাসীর বমি উপস্থিত হয়। হাত ধুইয়া খাইতে বসিতে হয় এবং ভোজনান্তর হাত মুখ ধুইতে হয় একথা কোনও ভারতবাসীকে শিখাইতে হয় না। ভারতে আবালবৃদ্ধবনিতা, নিরক্ষর চাষী পর্য্যন্ত যাহা জানে ও যাহা নিয়ত করিয়া থাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাভিমানী স্বাস্থ্যতত্ত্বের নিয়মানভিজ্ঞ ইউরোপীয়-দিগকে সেইগুলি শিখাইবার জন্য আজও বায়স্কোপ প্রদর্শনীতে ছবি দেখাইতে হইতেছে। আহারান্তে হস্তমুখ প্রক্ষালনের প্রয়োজন ইউরোপে এখনও স্বীকার করে না।

সংক্ষেপে যাহা বলা হইল তাহাতেই স্পষ্ট অনুমিত হইবে যে সনাতন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সনাতন সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও তাহাতে যে সকল চির সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহার আভাসমাত্র এতকাল পরে কদাচিৎ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্বিষ্ট পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপথে উদিত হয়। আয়ুর্ব্বেদের সত্য ঘোষণা করিয়া কত কথাই যে বলা যাইতে পারে তাহার আর সীমা নাই। কিন্তু সে সকল কথা উত্থাপন করা এখানে অনাবশ্যক। যাঁহারা বিজ্ঞানচ্ছলে পুঞ্জীভূত অসত্য কালিমায় আপনাদের আবৃত করিতে উৎসুক, যাঁহাদের কাছে সত্যের মর্য্যাদা ঘোষণা করিলে উপহাসাস্পদ এমন কি দণ্ডনীয় হইতে হয়, যাঁহাদের মিথ্যার ভয় নাই সত্যে অনুরাগ নাই, যাঁহাদের রুচির অনুকূল সত্যই সত্য নামে অভিহিত ও যাঁহারা রুচির প্রতিকূল সত্যকে মিথ্যা বলিয়া পদাঘাত দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিতে তৎপর, যাঁহাদের কাছে অজ্ঞানই জ্ঞানের উচ্চাসন অধিকার করিয়াছে, যাঁহারা উন্নতিলিপ্সায় পরিবর্ত্তনশীল মিথ্যা সত্যকেই সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করেন ও সনাতন অপরিবর্ত্তনীয় সত্যকে উন্নতিপথের কণ্টক বলিয়া ঘৃণা করেন, যাঁহারা জটিল ও গভীর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের পরিচয়ের সম্যক্ অভাবকেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের গুণাগুণ বিচার যোগ্যতার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এক কথায় যাঁহারা আধুনিক প্রচলিত প্রণালীর অন্ধানুসরণকেই চিকিৎসা বলিয়া গণ্য করেন ও সেই প্রণালী বর্জ্জন করিয়া রোগ শান্তি ও দুঃখ দূর করাকে হেয় ও দণ্ডনীয় মনে করেন, তাঁহারা মনের সাধে আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা করিতে থাকুন। তাহাতে আয়ুর্ব্বেদের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই; হইবেও না। পর্ব্বতে ঝড়বৃষ্টি হইলে পর্ব্বত কাতর হয় না। আয়ুর্ব্বেদ হিমালয় হইতেও অচল। মূর্খের বাকবিতণ্ডা আয়ুর্ব্বেদ চিরকালই অকাতরে সহ্য করিয়াছে ও সহ্য করিতে সক্ষম।

বিচার-মালা

সোণার লঙ্কা

জাতীয় পাপের ঔষধ জাতীয় অনুতাপ এবং জাতীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। এক দিকে যেমন আমরা আমাদের দেশের পূর্ব্বতন পাপের ফলভোগ করিতেছি, আর একদিকে তেমনি আমাদের দেশের পূর্ব্বতন তপস্যা এবং সুকৃতির ফল লোকসমাজে তলে তলে কার্য্য করিতেছে। এখনো যদি আমরা বেদ উপনিষদ গীতা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্র সকলের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া

আমাদের দেশের সেই অন্তর্নিগূঢ় পুণ্যফল জাগাইয়া তুলি, আর তাহারই উপরে জাতীয় ঐক্যের গোড়াপত্তন করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের সে চেষ্টা কখনই বিফল হইবে না। আমাদের জানা উচিত যে, অন্তরের স্বাধীনতা বাহিরের স্বাধীনতার সোপান। তেমি অন্তরের পরাধীনতাই বাহিরের পরাধীনতার সোপান। আমরা যদি ঔদ্ধত্যের সভা না করিয়া অনুতাপের সভা করি; আর জাতীয় ভ্রাতারা মিলিয়া অনুতপ্ত চিত্তে ঈশ্বরের নিকটে আমাদের মর্ম্মবেদনা জানাই তাহা হইলেও অকূল পাথারে আমরা কতকটা কূল কিনারা পাই; কিন্তু আমরা বলিতে শিখিয়াছি—"ধর্ম্ম চাহি না ঈশ্বর চাহি না," ইহাতে আর আমাদের কত ভাল হইবে?

স্বাধীনতা কাহাকে বলে এবং ধর্ম্ম কাহাকে বলে, এটা যদি আমরা স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে দুয়ের মধ্যে মূলেই প্রভেদ নাই। কিন্তু স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মের মধ্যে একটী মনঃকল্পিত ব্যবধানের প্রাচীর দাঁড় করাইয়া লোকে যখন স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া নাচিয়া উঠে—সে স্বাধীনতা সোণার হরিণ, তাহাকে বিশ্বাস করিওনা, তাহা ফরাসীস বিপ্লবকারী দিগের "Equality, Fraternity, Liberty" বই আর কিছুই নহে। ভারত=রামচন্দ্র; ভারতের স্বাধীনতা=সীতাদেবী; দানবী স্বাধীনতা=মায়ামৃগ। ঐ মায়ামৃগটা সীতাদেবীকে রাবণের হস্তে সমর্পণ করিবার পন্থায় ফিরিতেছে অহোরাত্র। আমাদের দেশের সভাপতিরাও তেমি! তাঁহারা দেশসুদ্ধ লোককে মায়াবিনী সভ্যতায় দীক্ষিত করিবার জন্য মহা সভা আহ্বান করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্পষ্ট বলেন যে, আমরা অযোধ্যাপুরীকে সোণার লঙ্কাপুরী করিতে চাই এ বিষয়ে কর্ত্তারা আমাদিগকে সাহায্য প্রদান করুন। যদি সাহায্য প্রদান না করেন, তবে আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিব।" বিরুদ্ধাচরণের কথা শুনিয়া লঙ্কেশ্বর মনে মনে হাসিতেছেন। তিনি বেশ জানেন যে,"এদের না আছে ঐন্দ্রজালিক ব্রহ্মাস্ত্র, না আছে তিরস্করণী মন্ত্রবিদ্যা, না আছে কিছু। এরা ফণাধারী ঢোঁড়া বিষধর—গর্জ্জনকারী শরতের মেঘ। তবে এরা যদি সত্য সত্যই অযোধ্যা পুরীকে লঙ্কাপুরী করিয়া গড়িয়া তোলে, আমাদের তাহাতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই; কেননা অযোধ্যাপুরী লঙ্কাপুরী হইলে তাহা আমাদের পুরী হইবে। ফল কথা এই যে আমরা দানবী সভ্যতার উপরে আমাদারে জাতীয় স্বাধীনতার গোড়া পত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছি। মনে কর যেন তাহাতে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। মনে কর যেন দানবী সভ্যতা আমাদের স্কন্ধের ভার লাঘব করিয়া সাতসমুদ্র পারে প্রস্থান করিল। তাহা হইলে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা দাঁড়াইবে কিসের উপরে! আমাদের স্বদেশীয় মানবী সভ্যতার উপরেতো দাঁড়াইবে?

কিন্তু হায়! দেশীয় ভাণ্ডারের জ্ঞানরত্ন ভক্তিসুধা সাধনসম্পদ্ প্রভৃতি যত কিছু সার পদার্থ এযাবৎ কাল পর্য্যন্ত বহুযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল স্বদেশের সেই মহামূল্য পৈতৃক মূলধন আমরা অনেককাল যাবত খোয়াইয়া বসিয়া আছি। তবে কি ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ব্যতিরেকে এক্ষণে আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই? দানবী সভ্যতা ছাড়া কি আর সভ্যতা নাই? প্রকৃত সভ্যতা বলিয়া কি একটী পদার্থ নাই? আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, আমাদের দেশের অন্তরে অন্তরে—হাড়ে হাড়ে বলিলেও হয়—প্রকৃত সত্যের ভাব, প্রকৃত ধর্ম্মের ভাব, প্রকৃত মঙ্গলের ভাব জাগিতেছে; যদিচ বাহিরে বাহিরে ঠিক তাহার বিপরীত। আমার মন তাই বলে যে, সেই অন্তর্নিগূঢ় অধ্যাত্মশক্তিকে ধৈর্য্য বীর্য্যে পরহিতৈষিতায় ন্যায় সত্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা জাগাইয়া

তুলিয়া তাহারই উপরে জাতীয় ঐক্যের গোড়াপত্তন সর্ব্বথা বিধেয় ; কেননা অধ্যাত্মশক্তির একটা ঈশ্বর-দত্ত বল আছে—সেই বলের সাম্‌নে অপর কোনো বলই মাথা উচা করিয়া দাঁড়াইতে পারে না—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাধনা-লক্ষ্যে

ভারতের মূর্ত্তি সাধকের মূর্ত্তি ; ভারতের ভাষা সাধকের ভাষা ; ভারতের শিক্ষা দীক্ষা সবই সাধকের ! ভারত চির দিনই সাধক, স্মরণাতীত কাল হইতেই তাহার সাধনার ক্ষেত্র উর্ব্বর ; কখনও তাহা মরুতে পরিণত হয় নাই।

মরণের বিরুদ্ধে অভিযান ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনা, ভারত মরণের প্রতিকূলে অভিযান করিয়া দেখিয়াছে মৃত্যু এক নহে, মৃত্যু দশবিধ। সংসারে নিত্য তাহা ঘটিতেছে। এই নিত্য মরণের বিরুদ্ধেই ভারতের বীরত্ব প্রকাশ—ভারতের ধর্ম্ম ! তাই ভারত ধর্ম্মবীরকেই বীর বলিয়া বরণ করিয়াছে।

ভারতের সাধক জীবন তৈয়ার করে, মরণ-যজ্ঞে আহুতি দেয় না। মরণকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া জীবনকে সৌন্দর্য্যে ভূষিত করাই ভারতীয় সাধকের জীবন-পণ।

মরণকে পদাঘাতে নির্য্যাতিত করিয়া পদতলে রাখিতে না পারিলে অমৃতের সন্ধান কেহ পায় কি ? মৃত্যু ত অমৃতের পথ রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। তাই ভারতের সাধনা মরণ-বিনাশিনী ভারতের সাধক মৃত্যু-জয়ী !

সত্যজীবনই মানুষকে অমৃতের সন্ধান দেয় ; তাই ভারতে জীবন অমূল্য। অমূল্য জীবন দিয়া ভারতের সাধক 'কাণা কড়ি' ক্রয় করে না। ক্রয় করে মুক্তির স্পর্শমণি।

ভারতের সাধকসন্তান অমৃতের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া, প্রথমেই চিনিতে পারিয়াছিল যে তাহারা অমৃতের পুত্র। তাই তাহার আত্মজ্ঞানে আত্মাহুতি। আত্মাতে পরমাত্মার অনুভূতি। যে অমৃতের পুত্র—মৃত্যুর দাসত্ব তাহার পক্ষে মহাব্যাধি হইতেও ভীষণ।

ভারতের ধর্ম্ম সমুদ্রের ন্যায় গভীর, আকাশের ন্যায় বিশাল। তাহাতে বিন্দুমাত্র সঙ্কীর্ণতা নাই। তাই ভারতের সাধক দেখিয়াছে, আমরা সকলেই মানুষ, সকলেই ভাই ভাই। সমদর্শিতা শিক্ষা ভারতের সাধনার প্রধান অঙ্গ। ভারতের মহোপদেশ "কঃ পর সমদর্শিনঃ।

দৃষ্টির অর্ব্বাচীনতা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত ভারতের সাধনায় আত্মনিগ্রহ শিক্ষা দেয়। পরনিগ্রহ-প্রবৃত্তিকে নিগৃহিত করিবার জন্যই আত্ম-নিগ্রহ। অমৃতের সন্ধান দেয় ঐ অনন্ত সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্যময় আত্মনিগ্রহ, তাই ভারতে আত্মনিগ্রহের বড় গৌরব। আত্ম-নিগ্রহকারী সাধক ভারতে স্বর্গের দেবতা।

জগতে মানবতারই জয়। বীর্য্য-ঐশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে মানবতাই অতুলনীয় ; ভারতের সাধনা সেই মানবতারই জননী। তাই সাধন-সমরে ভারতের আহ্বান। ভারত ডাকিতেছে, বিশ্বমানবকে মানবতা লাভের জন্য। সেই লাভই মনুষ্যের পরম লাভ—চরম সৌভাগ্য।

ভারতের মানবতার বীর সাধক তাই দৃঢ়তার সহিত প্রাণস্পর্শী ভাষায় জগজ্জনকে বলিয়াছিলেন—"সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়।" সাধ্যবস্তু সাধনাধীন সাধনা প্রাণের ধর্ম্ম। সাধ্য-ধন প্রাণপ্রিয় ; যার প্রাণ আছে সেই সাধনার জন্য অসাধ্যসাধন করে ; প্রিয়তম সাধ্যবস্তুকে প্রাণে যুক্ত করিয়া যোগী হয় ; ভোগের মস্তকে পদস্থাপন করিয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্য এক করে। যোগই ভারতের স্বরূপ। বিয়োগ পূরণ ভাগের দ্বারা লাভের অঙ্ক ভারতের সাধক কষে না। তাই ভারতের সাধনায় কর্ম্মযোগ, জ্ঞান যোগ ও ভক্তিযোগ। আর সাধক কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তিতে মহাযোগী হন। হায় ! আমরা সেই মহামানবতায় যোগৈশ্বর্য্য হারাইয়া বসিয়াছি ! আবার পাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর।

ইতিহাসের ইঙ্গিত

হেমচন্দ্র বসুমল্লিক-অনুবেশনাধ্যাপক—জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্

ভারতবর্ষ যে আজ নিতান্তই অধঃপতিত তাহা অস্বীকার করা চলে না। আজ আমরা দেশের বাস্তব অবস্থার উন্নতি (material progress), আর্থিক প্রসারলাভ, সুশাসন, শান্তি, রাস্তাঘাট, রেলপথ, টেলিগ্রাফ, পোষ্টাফিস প্রভৃতি এবং সর্ব্বশেষ 'জাতীয় উন্মেষ' প্রভৃতি যতপ্রকার উন্নতির কথাই শুনিতে পাই না কেন, বাস্তবিক যে এ উন্নতি ভিত্তিহীন তাহাতে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। প্রকৃত উন্নতি আনিতে হইলে ইহার কারণ খোঁজা আবশ্যক এবং উন্নতিকামীদিগের মনে তাহা সর্ব্বদা বদ্ধমূল রাখার প্রয়োজন।

ভারতের অধঃপতনের কারণ ইতিহাসের গায়ে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। কয়েকটী স্থূল ঘটনা তাহা দেখাইয়া দিতে পারে।

ভারতেতিহাসের একটী মোটা ঘটনা, আলেকজেণ্ডারের আক্রমণ। আলেকজেণ্ডার ভারতের একটা অংশের উপর আপন বিজয়-প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। কি কারণে, ও কি অবস্থায়, এই বৈদেশিক বিজয় প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহার ইঙ্গিত ইতিহাস হইতেই পাওয়া যায়। ভারতের যে যে অংশে সেকেন্দরের বিজয় অভিযান প্রসার লাভ করে সেই সেই স্থানের লোকের মধ্যে অনৈক্য, এবং কোথাও বা বিদেশীয় শত্রুর পক্ষে দেশীয় লোকের পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করাতে সেই বিদেশীয়ের বিজয়ের পথ সুগম হইয়াছিল *।

বৈদেশিক আক্রমণও পর-পীড়নের ভীতি যখনই ভারতকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, তখনই ভারতের বীর ও স্বদেশ-বৎসল সন্তানের অভাব হয় নাই। মুসলমান আক্রমণের সময়ে আজমীর-রাজ পৃথ্বী যে বীরত্ব ও মহান্ চরিতবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা জগতে বিরল। তিনি একাধিক বার ঘোরের সুলতানকে পরাস্ত করিয়া ছিলেন §। রাজপুতনাতে একটী চলিত কথা আছে যে, একবার আক্রমকারী সাহাবুদ্দীন যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিলেন ; পৃথ্বীরাজ তাহাকে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ পরাইয়া সহরের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া আনিবার আদেশ দেন ও পরে তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন।

কিন্তু পৃথ্বীরাজের এ সমুদয় বীরত্ব ভারতের ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের পথ আটকায় নাই—তাহার কারণ ইতিহাসে বিশেষরূপেই প্রসিদ্ধ আছে—তাহাই ভারতের কলঙ্ক-কালিমার কাহিনী ও দুর্দ্দশার চিরন্তন হেতু। তখন কনৌজ-রাজ জয়চাঁদের আত্মকলহ, হিংসা ও বিদ্বেষ এবং আনহলয়ারার পাতুন ও হাওলী-রাজ হাম্মীরের বিশ্বাস-ঘাতকতা না হইলে হিন্দুস্থানের এ দুর্দ্দশা আজ হইত না! ভারত তাহার দুর্দ্দশার কাহিনী তেমন অন্তরে গাঁথিয়া রাখে নাই—নিজ দুঃখ

---

* What essentially tended to make the attack easier was the discord among the states and tribes of the land of Indus.—History of Antiquity : Max Dunker.

The Hindu King Mophis of Taxsila joined Alexander with 5000 men against Porus.—Sir William Hunter : India.

The Kshudraks and the Malavas forgetting their ancient hostility now combined against a common foe (Alexander), but the Kshudraks turned false and retired. The Malavas continued their resistance, and at last succeeded in lodging an arrow into the heart of Alexandar and his commander, Albereos.'—Max Dunker.

§. "Even the Moslem writers acknowledge that Shahabuddin was often ignominously defeated before he finally succeeded in making a conquest of Northern India." Tod's Rajsthan Vol. II. P. 452.

"In the reign of Raja Pithowra, Sultan Moozeddin Sam made several incursions from Ghazni into Hindusthan but never gained any victory.........It is said that the Raja gained from the Sultan several pitched battles."—Ayeen Akbari (Gladwin p. 97)

ভুলিয়া চিরকাল চলিয়াছে। সেজন্যই বুঝি আত্মবিস্মৃতির দুর্ব্বলতা তাহাকে চির আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। নতুবা পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদের কথা আজ ভারতের ঘরে ঘরে জ্বলন্ত বহ্নির ইন্ধন যোগাইত এবং তাহাতে জাতির অন্তরের অনেক ক্লেদ ও মলিনতা পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইত। হেলেনের শোচনীয় বৃত্তান্ত উপযুক্ত কবির হাতে পড়িয়া, গ্রীকজাতির অন্তরে যে মর্ম্ম-পীড়ার সৃজন করিয়াছিল, তাহাই অচিরে গ্রীসের উষর ভূমিতেও পাশ্চাত্যের ভাবী শৌর্য্য-বীর্য্যের বীজ বপন করিয়াছিল। কনৌজরাজ-দুহিতা সংযুক্তার স্বয়ম্বর-কাহিনী ও তাহার শোচনীয় পরিণাম হেলেন-সীতার বৃত্তান্ত অপেক্ষা কোনও ক্রমে হীন নহে; বরং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাহার গুরুত্ব অধিকতর; ভাব-সমৃদ্ধিতে উহা উজ্জ্বলতর এবং পরিণামে তাহা আরও মর্ম্মদাহ-কারক। অশেষ ধনের অধিপতি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত কনৌজ রাজ জয়চন্দ্র অতুলনীয় রূপলাবণ্যবতী কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বরের আয়োজন করিয়া, রাজপুতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী বজায় রাখিতে গেলেন। ইতিপূর্ব্বে আজমীরাধিপতি চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজ বিজাতীয় আক্রমণকারী শত্রুকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া স্বজাতির সংরক্ষক বলিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শৌর্য্য বীর্য্য ও সাহসিকতায় তাহার তুলনা ছিলনা। কিন্তু এমন অবস্থাতেও ভারতে গৃহবিদ্বেষের অভাব ছিল না। কনৌজরাজ জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের ঈর্ষা করিতেন; তাহার বিদ্বেষ-বহ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর সভায়। ইংরাজীতে একটী কথা আছে, 'সাহসিক যে জন, সুন্দরী তাহার প্রাপ্য।" সে কালে পৃথ্বীরাজের ন্যায় সাহসিক আর দ্বিতীয় কেহ ছিল না। কিন্তু জয়চাঁদ শিবহীন যজ্ঞের ন্যায় সেই স্বয়ম্বর সভাতে পৃথ্বীরাজ ব্যতীত আর সকল নৃপতি ও বীরগণকেই নিমন্ত্রণ করিলেন; আর পৃথ্বীরাজকে অপমান করিবার জন্য দ্বারবানের বেশে তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি সভা-মণ্ডপের দ্বারদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিলেন। রাজ-কন্যা সংযুক্তা তুল্যরূপেই সাহসিকা; তিনি সমুদয় সমবেত রাজন্যবর্গকে তুচ্ছ করিয়া পৃথ্বীর মূর্ত্তির গলদেশে গিয়া বরমালা প্রদান করিলেন। ঠিক সেই সময়েই আজমীর রাজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সমবেত সমুদয় রাজগণের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া সংযুক্তার উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। জয়চাঁদ এ অপমান ভুলিতে পারেন নাই; তিনি হিন্দু জাতির কালান্তক শত্রু সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘোরীর সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। ফল যাহা হইল, তাহা ইতিহাসজ্ঞকে নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষেত্রে জয়চন্দ্রের সহায়ক রাজপুতগণেরও অভাব ছিল না। *।

আকবর-দরবারের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখিয়া গিয়াছেন—"Shahab uddin formed an alliance with Raja Jaichand, and having raised a large army, came to attack the dominions of Pithowra...... . Jaichand, who had been his (Prithi raj's) ally, was now in league with his enemy.

ভারতের সেই জীবন-মরণের সংগ্রামে আরও গৃহ-শত্রু দাঁড়াইয়াছিল। তাহার একজন হামির। কর্ণেল টডের মতে হামির নামে অনেক রাজপুত সর্দ্দার ছিলেন, এই হামিরের নাম ছিল হাওলী রাও; ইনি সীথিয় জাতীয় ঘিকার বংশের লোক †।

আত্ম-প্রতারক জয়চাঁদের দল বিতাড়িত বহিঃশত্রুকে ডাকিয়া আনিল; এবং হিন্দুর শেষ গৌরবরবি পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে সমরায়োজনের গুপ্ত সন্ধান বলিয়া দিল—হিন্দুর তেজ-গরিমা চিরকালের জন্য নিষ্প্রভ হইয়া রহিল। পৃথ্বীরাজ শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া গজনীতে নীত হইলেন। সংযুক্তা রাজপুত রমণীর চিরগৌরবের জহরব্রতের পথ প্রদর্শন করিয়া গেলেন।

ভারতের সুসন্তানের কখনও অনটন হয় নাই। কিন্তু মাতৃহন্তা বিশ্বাসঘাতক কুপুত্রেরও অভাব নাই। কালক্রমে পাঠান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও বিনষ্ট হইল—মোগল আসিয়া পাঠানকে গিলিয়া

* "The princes of Kananj and Patan, dreeding the influence of such sinews of war, invited Shahabuddin to aid their design of humiliating the Chauhan."—Tod's Rajsthan Vol. 1. q. 250.

† Rajsthan, Vol. 1. p. 560.

বসিল। কিন্তু রাজপুতের নির্মীলিত গৌরব তখন আর একবার আপন প্রভা বিস্তার করিতে যাইতেছিল। মোগলবীর বাবর সহজেই পাঠানরাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ছিলেন, কিন্তু হিন্দু-নেতা রাজপুতবীর রাণা সঙ্গের নিকট তখন তিনি যে বাধা পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে ভারতে ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বাবর তাঁহার আত্মকাহিনীতে সে আতঙ্ক ও ত্রাসের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজপুতের বিশ্বাসঘাতকতাই তখনও রাজপুতের বিরুদ্ধে ভারতে বৈদিশিকের রক্ষা ও বিজাতীয়ের প্রতিষ্ঠা-সাধন করিয়াছিল। যখন ঘোর সংগ্রামে বাবর ব্যতিব্যস্ত—জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত, তখন রাজপুত সেনা-বাহিনীর অগ্রগামী সেনানায়ক বিদ্বেষ-দুষ্ট তুয়ার বংশীয় রয়সীন-সর্দার শিলেদ গিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিল এবং তাহাতেই ভারতের দুরদৃষ্ট-লিপি আর একবার নির্দ্ধারিত হইল।

ভারত চিরদিন তাহার আপন সন্তানের হাতে প্রতারিত ও পরাস্ত—বিদেশীয় শত্রুর হাতে নহে। পুরু, পৃথ্বী ও সঙ্গের কাহিনী তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। বিভিন্ন স্তরের পরবর্ত্তী ইতিহাসও এ কলঙ্ক হইতে মুক্ত নয়।

*আইন্-আকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে,—পৃথ্বীরাজের সভাকবি সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ প্রভুর অনুসরণ করিয়া গজনীতে গমন করেন ও সেখানে নিজ গুণপণা দ্বারা সুলতান শাহাবুদ্দীনের প্রিয়পাত্র হন, তাহার নিকট পৃথ্বীরাজের অদ্ভুত শর-চালনা শক্তির কথা শুনিয়া সুলতান তাহা দেখিতে চাহেন। সেই শর পরীক্ষায় বন্দীরাজার হস্তে সুলতানের মৃত্যু হয় ও ঘোরী বংশের অধঃপতন ঘটে—'রাজস্থান দ্রষ্টব্য প্রথম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠ।

দিগ্ দর্শন

স্বকীয়তা

ইংরেজি ইস্কুলে এত দীর্ঘকাল দাগা বুলিয়েও কেন আমরা কোনো বিষয়ে জোরের সহিত স্বকীয়তা প্রকাশ করতে পারলাম না, এ প্রশ্ন আমাদের মনে উঠেচে। এর কারণ, বিদ্যেটাও যেখান হ'তে ধার ক'রে নিচ্ছি, বুদ্ধিটাও সেখান হ'তে ধার করা। কাজেই নিজের বিচার খাটিয়ে এবিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করতে ভরসা পাইনে। বিদ্যা এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইংরেজের ছেলে পরস্পর্শ নয়, তার চারি দিকেই স্বাধীন সৃষ্টি ও স্বাধীন বিচারের হাওয়া বইচে। একজন ফরাসী বিদ্বান নির্ভয়ে ইংরেজি বিদ্যার বিচার করতে পারে; তার কারণ, সে ফরাসী বিদ্যা তার নিজের, সেই বিদ্যার মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রয়েছে; এই জন্যে মাল যেখান হতেই আসুক, যাচাই করবার ভার তার নিজের হাতে। এই জন্য নিজের হিসাব মত সে মূল্য দেয় এবং কোনটা নেবে কোন্‌টা ছাড়বে সে সম্বন্ধে নিজের রুচি ও মতই তার পক্ষে প্রামাণ্য। কাজেই জ্ঞানের ও ভাবের কারবারে নিজের পরেই এদের ভরসা। এই ভরসা না থাকলে স্বকীয়তা কিছুতেই থাকতে পারে না।

আমাদের মুস্কিল এই যে, আগা গোড়া সমস্ত বিদ্যেটাই আমরা পরের কাছ হ'তে পাই—সে বিদ্যা মেলাব কিসের সঙ্গে, বিচার করব কি দিয়ে? নিজের যে বাটখারা দিয়ে পরিমাণ করতে হয়, সে বাটখারাই নেই। কাজেই আমদানি মালের ওপরে ওজনের ও দামের যে টিকিট মারা থাকে, সেই টিকিটটাকেই ষোল আনা মেনে নিতে হয়। এই জন্যই আমাদের ইস্কুল মাষ্টার এবং মাসিক পত্র লেখকদের মধ্যে এই টিকিটে লিখিত মালের পরিচয় ও অঙ্ক যে যতটা ঠিক্‌মত মুখস্থ রাখতে ও আওড়াতে পারে, তার ততই পসরা বাড়ে। এত কাল ধরে কেবল্ এম্‌নি করেই কাটল, কিন্তু চিরকাল ধরেই কি এম্‌নি ক'রে কাটবে?—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিচিত্রা—কার্ত্তিক)

সাইমন্ কমিশন্ ও ভারত সরকারের ডেস্‌প্যাচ্

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ

ভারতভাগ্য নিরূপণের জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে যে সাতজন বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী ভারতের জনমতকে পদদলিত করিয়া "সাইমন চলিয়া যাও" এই গগনভেদী চীৎকারের মধ্যেও ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, গত ১০ই ও ২৪শে জুন যথাক্রমে তাঁহাদের রিপোর্টের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। সাইমন-সপ্তক ভারতের যে অংশে যখন কার্য্যোপলক্ষে গমন করিয়াছেন, তখনই সেই স্থান হইতে মুষ্টিমেয় নরমপন্থিদল এবং মুসলমানসমাজের বিশিষ্টাংশ ব্যতীত, বালক বৃদ্ধ যুবা কৃষ্ণপতাকাহস্তে শোভাযাত্রা করিয়া এই কমিশনকে অস্বীকার করে। তাহাদের অস্বীকারের কারণ এই যে ভারতবাসিদিগকে তাহাদের চিরবাঞ্ছিত-স্বাধীনতার পথে সাহায্য করিবার কোন শক্তি সাইমন কমিশনের সদস্য-দিগের থাকিতে পারে না, থাকিলেও তাঁহারা সেইজন্য ভারতে প্রেরিত হন নাই। রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর কমিশনসম্বন্ধে তাহাদের পূর্ব্ব ধারণার যাথার্থ্য অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইয়াছে।

উক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর কমিশন-বিবরণীর লাভালাভের প্রতি উপেক্ষা-কারী পূর্ণস্বাধীনতা-কামী নেতৃবর্গের কথা ছাড়িয়া দিলেও, জমিদার, মডারেট, রাজভক্ত, খৃষ্টান, শিখ এবং মুসলমানসমাজের বিশিষ্টাংশ ভিন্ন অন্য সকলেই তীব্রভাবে তাহার নিন্দা করিতেছেন। শ্রীমতী আনিবেশান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলার স্যার আবদার রহিম পর্য্যন্ত একই মনোবৃত্তি পোষণ করিয়াছেন। ভারতের কোন প্রদেশে এক জনতা গাধার উপর দুইখণ্ড সাইমন রিপোর্ট রাখিয়া শোভাযাত্রা করিবার পর তাহা পোড়াইয়াছে। কোন প্রদেশে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক একত্র সাইমন সপ্তকের প্রতিমূর্ত্তি লইয়া নগর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া সাইমন রিপোর্টের দুইখণ্ড সমেত উক্ত প্রতিমূর্ত্তি অগ্নিতে সমর্পণ করিয়াছে। মডারেট শিরোমণি স্যার শিবস্বামী আয়ার এমন অসার দলিলকে জঞ্জালের স্তূপে ফেলিয়া দিতে বলিয়াছেন। বিলাতের শ্রমিক সদস্যগণের মধ্যে অনেকে স্পষ্টভাষায় ইহার অসারতা ঘোষণা করিয়াছেন। মিষ্টার স্কোয়ার নামক জনৈক বিলাতের সমালোচক রিপোর্টের প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, 'এরূপ প্রাণহীন নীরস গ্রন্থ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা পাঠ করিলে ভারতের করসংস্থাপন বা শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না, তবে যে সকল লোকের উপর এই করাবধারণ করা এবং শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারা যাইতে পারে।' স্বয়ং বড় লাট লর্ড আর-উইন রিপোর্টের প্রতি জন-সাধারণের অনাস্থার ভাব দেখিয়া তাহাতে বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে শিমলার ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের বৈঠকে বলিয়াছেন, 'গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের সকল সমস্যা এইরূপ ভাবে মীমাংসিত হইবে যে বিভিন্ন সম্প্রদায়

ও বিভিন্ন দলের লোক তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে এবং উক্ত বৈঠকে যাহা নির্দ্ধারিত হইবে তাহার ভিত্তিতেই ভারতের শাসন সংক্রান্ত প্রস্তাব পার্লামেণ্ট সভায় উপস্থাপিত হইবে। তথায় ভারত সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে আলোচনা হইবে। কেবলমাত্র সাইমন রিপোর্ট বৈঠকের একমাত্র আলোচ্য বিষয় বা শাসন সংস্কারের ভিত্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে না।' অতএব মোটামুটি ইহা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হয় যে ভারতবাসীকর্ত্তৃক কমিশন বর্জ্জনের সার্থকতা এই রিপোর্ট প্রমাণ করিয়াছে।

রিপোর্টখানির কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই মনে হয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট বৃটিশ সরকার যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই ঘোষণাটি কার্য্যতঃ রদ করিবার জন্যই যেন সাম্রাজ্যবাদী লর্ড বার্কেনহেড এই কমিশনটির রচনা করিয়াছিলেন। এই রিপোর্টে যে ভারতবাসীর কোন উপকার হয় নাই তাহা বলা যায় না। ইহার ফলে আমাদের দেশের জনসাধারণ কূট-রাজনীতির স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছে। রিপোর্ট লেখকগণ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যে পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা, ও কৌশলজ্ঞানের পরিচয়প্রদান পূর্ব্বক রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠে মনে হয় কিছুদিন পূর্ব্বে য়ুরোপীয় 'এসোসিয়েটেড্ চেম্বার অব্ কমার্স' ও কলিকাতার 'য়ুরোপীয়ান এসোসিয়েসন্' যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। যদিও সাইমন কমিশন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই, তথাপি মনে হয়, ভারতে এযাবৎ যত কমিশন বসিয়াছে, কোন কমিশনই এমন ভাবে মুক্তিকামী জাতিকে মুক্তি দিবার অছিলায় এমন বিরাট ও নিষ্ঠুর প্রহসন রচনা করে নাই। একদিকে তাঁহারা বলিয়াছেন দ্বৈতশাসন ভারতে থাকিতে পারে না, বিলাতের মত ক্যাবিনেটের প্রণালীতে রাজ্যশাসন চালাইতে হইবে, এবং এখন হইতে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে স্বভাবতই ঔপনিবেশ স্বায়ত্ত শাসন গড়িয়া উঠিতে পারে: কিন্তু তৎসঙ্গে যখন তাঁহারা বলিয়াছেন 'আমরা ভাবিয়া পাই না কোন সুদূর ভবিষ্যতে ভারতের সীমান্তরক্ষী সেনার ব্যবস্থা ব্রিটনের সাম্রাজ্যিক কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে এবং সঙ্কটকালে গভর্ণর ক্যাবিনেট ব্যতীত শাসনকার্য্য চালাইতে পারিবেন', তখন ভারতের শাসনযন্ত্রকে কৌশলে সম্পূর্ণ স্বৈর শাসনে পরিণত করিবার জন্য যে তাহাদের প্রকৃত অভিসন্ধি তাহা বোধ হয় বুঝিতে বাকী থাকে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাইমন রিপোর্ট দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডকে ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। ভারত সচিবও আদর করিয়া ইহাকে Historical State Document বলিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের দিক্ দিয়া উহার কতটা প্রামাণিকতা ও সম্পূর্ণতা আছে তাহা ভাবিবার বিষয়। প্রথমতঃ, যে সাতজন সদস্য লইয়া কমিশন গঠিত হইয়াছে তাহাদিগকে ভারতীয় জটিল সমস্যা ও ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কমিশন ভারতীয় কংগ্রেসকর্ত্তৃক ও জমিয়ৎ-উলেমাহিন্দ কর্ত্তৃক অসহযোগ প্রাপ্ত হইয়া ভারতের শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মতামত গ্রহণে সমর্থ হয় নাই। তৃতীয়তঃ, বিদেশী ভ্রমণকারীর মত ভারতে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া ভারতের ন্যায় বিরাট দেশের ও বিভিন্ন জাতির মতামত সংগ্রহ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। চতুর্থতঃ, কমিশন ভারত হইতে যাইবার পর অল্পকাল মধ্যে ভারতের যে আকস্মিক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তাহা

রিপোর্টে স্থান পায় নাই। সুতরাং উহা যে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের দিক দিয়া অসম্পূর্ণ তাহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

যাহা হউক প্রথম পুস্তিকাখানিতে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র হওয়ায় যে কত রকম বাধা আছে তাহার অনুসন্ধান ও প্রচারই উদ্দেশ্য। এইজন্য ইহাতে দেশের পূর্ব্বকার অবস্থা ও বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক ও শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ আছে। ভারতের সমাজনীতি এতই দূষিত ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ উন্নতির এতই পরিপন্থী যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতে স্ব-শাসনের অধিকার বেশী দূর বিস্তৃত করা ন্যায়সঙ্গত নহে। ইহা প্রথমভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাষার ভেদ, জাতির ভেদ, ধর্ম্মের ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, এই বিরাট দেশের ভিতর পর্ব্বতপ্রমাণ বলিয়া তাঁহাদের ধারণার বিষয়ীভূত হওয়ায় ভারতের প্রতিনিধিগণের একটা রাজতন্ত্র গড়িয়া তোলা যে অতিমানুষিক ব্যাপার, তদ্বিষয়ে তাঁহারা অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। সমস্ত রিপোর্টখানিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করার মধ্যে যে একটা উদ্দেশ্য আছে তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রথমখণ্ডে যে সমস্ত ঘটনা সাজান হইয়াছে সেইগুলিই হইতেছে সাইমন রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডের ভিত্তি।

রিপোর্টের প্রথম খণ্ড প্রধানতঃ সাতভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভারত ও ভারতের বিভিন্ন সমস্যাগুলির বর্ণনা, দ্বিতীয় ভাগে বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর স্বরূপ উল্লেখ, তৃতীয় ভাগে শাসন পদ্ধতির সংস্কারের পর কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা, চতুর্থ ভাগে বর্ত্তমান শাসন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, পঞ্চম ভাগে রাজস্ব বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা, ষষ্ঠভাগে শিক্ষা বিষয়ে ও সপ্ত ভাগে ভারতের জন সাধারণের মতামত সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা রহিয়াছে।

রিপোর্টের প্রথম অংশে ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় কমিশন দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বৃটিশ আগমনের পূর্ব্বে ভারতে কখনও শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিলনা। ইহাতে কিছু নূতনত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। বৃটিশ ঐতিহাসিকগণ ভারতের ইতিহাসকে যে রং দিয়া আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় তথ্য ব্যাপারে কমিশনও সেই একই রংএর ব্যবহার করিয়াছেন। কমিশন শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন ইংরাজী শিক্ষাই আমাদের দেশে মহা একতা আনিয়া দিয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে বিবিধ কারণে ভারতীয় জাতীয়তার উদ্ভব হইয়াছে—একটি হইল ইংরাজি ভাষার প্রচলনে আর একটি হইল বর্ত্তমান রাজনীতি শিক্ষিত লোকের মতিগতিতে জগতে ভারতবর্ষকে একটা জাতি বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার আগ্রহ। ইংরাজী শিক্ষিত সমাজ দেশের বর্ত্তমান রাজনীতি আন্দোলনের নেতা বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাহারাই যে রাজনীতিক উন্নতির ভিত্তি তাহাদের জাতীয় ভাবই যে একমাত্র জাতিগঠনের উপাদান, ইংরাজীভাষাই যে জাতীয় বাহন-সাইমন সপ্তকের এই সকল উক্তি যে সাম্রাজ্যতন্ত্রের দম্ভমাত্র, এই সমস্ত মনোভাবের পশ্চাতে যে ভারতের প্রতি অবজ্ঞার ভাব সূচিত হইতেছে তাহা বোধ হয় অনেকেই বুঝেন। কমিশন হয়ত জানেন না যে মুষ্টিমেয় ইংরাজিশিক্ষিত লোক পরস্পর ইংরাজীতে ভাবের আদান প্রদান করিতে পারিলেও নিরক্ষর বিরাট জনগণ তাহাদের ভাবগ্রহণে অসমর্থ এবং তাহাদের মূলগত ঐক্য ইংরাজী ভাষার প্রভাবের সম্পূর্ণ বাহিরে। ইংরাজীশিক্ষার ফলে ভারতে এমন এক জাতির সৃষ্টি হইয়াছে যে সেই জাতি ভারতের জাতীয়তার অন্তরায় হইয়া দাড়াই

য়াছে। সাইমন-সপ্তক স্বমতসমর্থনের জন্য স্যার ভালেণ্টাইন চিরোলের মতের পুনরুক্তি করিয়াছেন বটে; কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের ফলে ভারতের যে ক্ষতি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে Sir George Birdwoodএর ন্যায় মনস্বীগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা বোধ হয় স্বমতবিরুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা সমীচীন মনে করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "And the worst of all is the undermining of the religious belief of the Hindus through the atheistical or indeed the anti-theistical influence of Public instruction in India. That would probably be to our exceeding gain; but it would certainly be utter and irremedial ruination for India." অর্থাৎ আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে তাহা নাস্তিক্য-মূলক অথবা প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম বিরোধী। উক্ত শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুদিগের যে ধর্ম্মবিশ্বাস ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরু ক্ষতি। ইহাতে সম্ভবতঃ আমাদের (শাসক দিগের) অতিশয় লাভ হইতে পারে, কিন্তু ইহার ফলে ভারতবাসীর যে চরম ও অপ্রতিবিধেয় ধ্বংশ ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।" ভারতের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, ইংরাজী ভাষা জাতিভেদপ্রপীড়িত ভারতে আর একটি অভিনব জাতির সৃষ্টি করিয়াছে এবং সে জাতি ভারতের প্রাণ-সমুদ্র হইতে ইংরাজী ভাষা ও ভাবের ভেলায় বহুদূরে সরিয়া যাইতেছে।

সাইমন কমিশন রিপোর্টের প্রথম ভাগের ঐতিহাসিক সমালোচনায় মণ্টেগু সাহেবের ১৯১৭ সালের ঘোষণা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, ভারত সম্বন্ধে বৃটিশ পার্লামেণ্টের মনোভাব এই যে ধীরে ধীরে ভারতে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেওয়া হইবে। কমিশনও মণ্টেগু চেমস্ফোর্ড ঘোষণাকে ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ ঘোষণা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কথাগুলি এই, "আমাদের নিশ্চিত ধারণা হইয়াছে যে, ভারতশাসনের লক্ষ্য বা আদর্শ কি তাহার যথার্থ পরিচয় দেওয়ার সময় আসিয়াছে। বৃটিশ ইতিহাসের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে, ভারতের জনগণ আমাদের সাহায্যে ও পথপ্রদর্শনে নিজেদের শাসন কার্য্য নিজেরা করিতে শিখিবে—; এই আদর্শ ছাড়া আর কোনও লক্ষ্যের কল্পনা আমরা করিতে পারিনা।" কিন্তু সাইমন কমিশন উক্ত ঘোষণার যে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা কদর্থ। সেই অর্থ এই যে 'ঐ ঘোষণার দ্বারা দায়িত্বসূচক শাসন-আংশিক ভাবে প্রবর্ত্তিত করার উদ্দেশ্য ছিল না; কেবল মাত্র দায়িত্বসূচক শাসন কি করিয়া ক্রমিক ভাবে হইতে পারে সেই লক্ষ্য রাখিয়া স্বায়ত্ব শাসন-অনুষ্ঠানের ক্রমোন্নতিই উদ্দেশ্য ছিল।

কমিশন পনর পাতায় বিগত দশবৎসরের রাজনীতিক ঘটনা এবং দ্বৈতশাসনের কার্য্য-কারিতা সুচতুর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মণ্ট-ফোর্ড শাসনসংস্কারের ফলে প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাদিগের হাতে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ও যে ভাবে তাঁহারা ঐ সকল ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্যবস্থাপক সভার ও মন্ত্রীসভার সদস্যগণের মতাধিক্যের কোন মূল্য নাই। আরও দেখাগিয়াছে যে হস্তান্তর-বিভাগের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রিগণ গভর্ণরের হস্তে ক্রীড়নক ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, যদিও হস্তান্তর বিভাগকে

অধিকতর দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাশালী করিবার জন্য ১৯১৯ সালের অ্যাক্টের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সার জন সাইমন ঐ সমস্ত অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় একেবারে চাপিয়া গিয়া বলিয়াছেন, "There is universal testimony all over India as to the skill and patience with which the Governors have discharged their duty." অর্থাৎ "ভারতে সর্ব্বত্র সর্ব্ববাদি সম্মত ভাবে গভর্ণরদের কার্য্যকুশলতা ও ধৈর্য্য সম্বন্ধে প্রমাণ আছে।"

কেন্দ্রীয় শাসন-তন্ত্র-বিষয়ক আলোচনা-প্রসঙ্গে সাইমন কমিশন ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি প্যাটেল মহোদয় সভাপতির পদমর্য্যাদা রক্ষা বিষয়ে যে নিয়মানুগ স্বতন্ত্রতা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অন্যায় বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু মনোনীত সদস্যগণ স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করিলে হোম মেম্বর যে তাহাদিগকে ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করিয়াছেন—এই সকল ব্যাপার কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ করেন নাই এবং যে ভাবে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের উদ্ভবে বিরুদ্ধ দলের সদস্যদিগের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হয় তাহাও কমিশন লক্ষ্য করেন নাই। এতদর্থে কমিশন বলিয়াছেন "Nominated members have, as a rule, exercised a free vote." আকালীদের বিষয় উল্লেখ প্রসঙ্গে কমিশন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইহা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উদ্দেশ্যের একটা উত্থান মাত্র। রাউলাট অ্যাক্টের পর জালিয়ানওয়ালা বাগে ডায়ার-ওডায়ারের আচরণের ফলে যে একটা বিষমকাণ্ড ঘটিয়াছিল সেই সম্পর্কে কমিশন বলিতেছেন যে, জনতার উত্তেজনাই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কারণ। জেনারেল্ ডায়ারের সহিত ইহার বিশেষ সংশ্রব নাই। তাহাদের এতদ্বিষয়ক উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"The movement developed in March 1919 into a wide-spread out-burst of mob-violence principally in the Punjab and Guzerat and culminated in the tragedy of Jalianwala Bagh in Amritsar."

এক্ষণে দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। দ্বিতীয় খণ্ডে কমিশন প্রস্তাবিত শাসন-বিধির এক পরিকল্পনা দিয়াছেন। এবং যে উদ্দেশ্যে সাইমন কমিশনকে ভারতবর্ষে পাঠান হয় তাহার পরিচয় ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ৩১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ণ এবং দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে কমিশনের প্রস্তাবিত মূল বিষয়গুলি সাধারণ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে প্রদেশ সম্বন্ধে, তৃতীয় ভাগে ভারতের বিশেষ বিশেষ স্থান সম্বন্ধে—যথা উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ; চতুর্থভাগে কেন্দ্রীয় শাসন সম্পর্কে, পঞ্চম ভাগে ভারতরক্ষা বিষয়ে, ষষ্ঠ ভাগে বর্ম্মাপ্রদেশ সম্পর্কে, সপ্তম ভাগে দেশীয় রাজন্য বর্গের সহিত ভারতসরকারের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক বিষয়ে, অষ্টম ভাগে রাজস্ব সম্বন্ধে, নবম ভাগে চাকুরী সম্পর্কে, দশম ভাগে হাইকোর্ট সম্বন্ধে, একাদশ ভাগে ভারত সরকারের সহিত হোম গভর্ণমেণ্টের সম্পর্ক বিষয়ে কমিশন বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। দ্বাদশ ভাগে তাঁহারা মূল বিষয়গুলি সাধারণভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাদের বক্তব্যের উপসংহার করিয়াছেন। রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডের উল্লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করিলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইবে ভাবিয়া, বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করাই এস্থলে সমীচীন মনে করিতেছি।

প্রথম খণ্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরই সাধারণের মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে দ্বিতীয় খণ্ডে কমিশন যে পরামর্শ দিবেন, তাহা মুক্তিকামী ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুকূল হইবে না। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর দেখা গেল যে তদ্বিষয়ে তাহাদের ধারণা ঠিকই হইয়াছে। বস্তুতঃ উহাতে ইহাই দেখান হইয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের উপর তাহার প্রভুত্বের কণামাত্র অধিকার বিসর্জন করিতে রাজী নহেন। বর্ত্তমান যে শাসন যন্ত্র আছে তাহারই দুই একটি পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের দ্বারা ভারতের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যাধিপত্য দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করার ভাবই যেন ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ইহাই বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে বড় লাট যেমন ভাবে ভারত শাসনের অধিকার ভোগ করিতেছেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ অধিকার থাকিবে। প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা সকল বিষয়ে এমন কি মন্ত্রিনির্ব্বাচন বিষয়েও তাঁহার উপদেশ বা আদেশ মত চলিতে বাধ্য হইবেন এবং বড়লাট বিলাতের ভারত সচিব ব্যতীত কাহাকেও বা কোন ব্যবস্থা-মণ্ডলীর নিকট কোনও ভাবে দায়ী থাকিবেন না। প্রত্যেক প্রদেশের গোয়েন্দা বিভাগের উপর বড় লাটের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিকার থাকিবে। মণ্টেগো-চেমস্‌ফোর্ড স্কীমে প্রাদেশিক গভর্ণরদিগের হাতে যে সামান্য অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইয়াছিল, "provincial fund" সৃষ্টি করিয়া তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান মণ্ট-ফোর্ড স্কীমে প্রাদেশিক শাসকগণ ঋণ সংগ্রহ করিতে পারেন, কিন্তু সাইমনস্কীমে তাঁহারা ঋণ সংগ্রহ-ত করিতেই পারিবে না, অধিকন্তু সুদের হার নির্দ্ধারণের ভার বড় লাটের উপর থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ে বড় লাটের কার্য্যকারী সংসদের সভ্যগণ স্বয়ং সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন; কিন্তু সাইমন স্কীমে বড়লাট নিজেই তাঁহার মনোমত সদস্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন। রিপোর্টকারিগণ আরও পরামর্শ দিয়াছেন যে, এখন হইতে দেশীয় রাজ্য সমূহের ও ভারতের সৈন্যমণ্ডলীর উপর ভারত সরকার কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন না। উক্ত সৈন্যমণ্ডলী "Imperi l army" বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং রাজপ্রতিনিধি রাজার প্রতিনিধিরূপে উহার শাসন ও ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিবেন, আর ভারত সরকার বিলাতের Imperial Govermentকে ভারতের শান্তি বিধানার্থ উক্ত 'Imperial army'র ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বাৎসরিক ৫৫ কোটি টাকা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

ভারতসরকার বৃটিশসেনার উপর কেন কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন না তৎসম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বৃটিশসেনা বা 'Imperial army' ভারত সরকারের তথা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভাড়াটিয়া সেনারূপে কার্য্য করিতে কখনও রাজী হইবেনা ; সেই জন্য বৃটিশ সেনাকে ভারত রক্ষার্থে নিযুক্ত করিতে হইলে 'Imperial Government' এর উপর তাহাদের কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। উক্ত সৈন্যমণ্ডলী ব্যবস্থার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাঁহারা তিনটি কারণ দেখাইয়াছেন :—(১) সীমান্ত রক্ষা, (২) আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা (৩) সৈন্য সংগ্রহ। সীমান্তরক্ষা সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, ভারতের সীমান্ত রুষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ বহিঃ শত্রু দ্বারা সর্ব্বদা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। সেই আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য বৃটিশসেনা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুমুসলমানের বিবাদ ও শ্রেণীগত বা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দমনার্থ ভারতের সৈন্যশ্রেণী আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ ভারতের সকল প্রদেশের লোক সমরপ্রিয় নহে, সকল প্রদেশ হইতে সৈন্যও সংগৃহীত হয় না। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় সেনা দলের মধ্যে সৌভ্রাত্র্য ভাব গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা অল্প; সুতরাং ভারতে সেনাদল গঠন করা দুরূহ ও সময় সাপেক্ষ।

এদেশে 'Imperial army' ব্যবস্থার অনুকূলে কমিশন যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ জার্ম্মান যুদ্ধকালে যখন বৃটিশসৈন্য (পঞ্চদশ সহস্র ব্যতীত) ভারত হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, তখন ভারতীয় সৈন্যই সীমান্ত রক্ষা করিয়াছিল, আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করিয়াছিল, এবং তখন তাহাদের মধ্যে সৌভ্রাত্রের অভাবও পরিলক্ষিত হয় নাই। এখন যদি ভারতীয় সেনাদ্বারা ভারতরক্ষার ব্যবস্থা হয়, তবে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ভাব গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা বেশী বলিয়াই মনে হয়, কারণ তাহারা ভাবিবে ও গৌরব অনুভব করিবে যে তাহারা স্বজাতি ও স্বদেশের জন্য অস্ত্রধারণ করিতেছে।

আভ্যন্তরীণ শান্তি এদেশে বহুকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমান শাসনকালেও গ্রামে গ্রামে হিন্দুমুসলমান সদ্ভাবে বাস করিত। দেশীয় রাজ্যেও হিন্দুমুসলমান সুখে ও শান্তিতে বসবাস করিতেছে। তবে এক্ষণে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধিতা দেখা যায় তাহা স্বার্থের প্ররোচনায়ই হইয়া থাকে। স্বাধীনতা পাইলে যখন তাহাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি হইবে তখন তাহাদের এই ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যাইবে।

সত্য বটে সকল প্রদেশের লোক সমরপ্রিয় নহে। কিন্তু তাই বলিয়া সমর প্রবৃত্তি-হীন জাতি যে ভারতবর্ষে থাকিতে পারে নাই তাহার প্রমাণ ভারতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আর যাহাদিগকে অসামরিক জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, শিক্ষা পাইলে তাহারাও সামরিক জাতিতে পরিণত হইতে পারে। জার্ম্মান যুদ্ধের সময় যখন ইংরাজ নিরস্ত্র দুর্ব্বল বলিয়া কলঙ্কিত বাঙ্গালীকে অস্ত্রদিয়া সৈন্য শ্রেণীতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালী যে শৃঙ্খলা, সাহস, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিল, তাহা ইংরাজ সৈন্যেরাও দেখাইতে পারে কিনা সন্দেহ।

১৯১৭ সালে যখন মহাযুদ্ধ চলিতে ছিল,—যখন ভারতবর্ষের রক্ত ও অর্থ ফ্রান্সের ক্ষেত্রে বৃটিশ সম্মানকে বাঁচাইবার জন্য মুক্তভাবে ব্যয়িত হইতেছিল, তখন ভারতীয় সৈন্যকে ভারতীয় ভাবে গড়িয়া তুলিবার একটা আশ্বাস দেওয়া হয়। কিভাবে তাহা হইতে পারে নেহেরুরিপোর্টে ভারতীয়দের পক্ষ হইতে তাহারও একটা ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কমিশন স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে মণ্ট-ফোর্ডস্কীম অনুযায়ী ভারতীয় সৈন্য গড়িয়া তুলিবার প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বৃটিশ পার্লামেণ্ট অক্ষম এবং নেহেরু-রিপোর্টে যে ভাবে ভারতীয় সৈন্যমণ্ডলীর ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাও অসম্ভব।

ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্পর্কে ও বৈদেশিক ব্যাপারে, সৈন্যমণ্ডলীর ন্যায়, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের বা ভারত সরকারের সপরিষদ বড়লাট বা Governor-General এর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবেনা। এই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা বা কর্ত্তৃত্ব করিবার ভার রাজপ্রতিনিধি বা Viceroy-এর উপর থাকিবে। এমন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ও সাইমন রিপোর্টে দেখা যায় না, যাহা দ্বারা আশা করা যায় একদিন না একদিন বড়লাটেরা ঐ সকল বিষয়ে আপনাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার জনমতের অতীত করিয়া রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। যিনি বড়লাট হইবেন তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন, ভারতের জনমত বা সামবায়িক সমিতি (Federal Assembly) তাঁহার উপর কোন দিক দিয়া কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। মোটের উপর সামবায়িক সমিতিকে একটা নখদন্তহীন দর্শনধারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য সাইমন কমিশন চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার কারণ ইতঃপূর্ব্বে এসেম্লিতে (Assembly) দৃঢ়তার সহিত লোকমত প্রতিবিম্বিত হওয়াতে সরকারকে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। সেইজন্য কমিশন যে এই প্রকার অপূর্ব্ব সামবায়িক সমিতির প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা বোধ হয় ভারতবাসীর বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের ভোটদাতৃগণ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ভোটদাতৃগণ অপেক্ষা সাধারণতঃ অধিকতর শিক্ষিত এবং বিচক্ষণ, এইজন্য ব্যবস্থা পরিষদে দেশের অগ্রবর্ত্তী লোকদিগের নির্ব্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। এই কারণেই দেখা গিয়াছে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সদস্যদিগের মধ্যে নানা স্তরের লোক থাকার দরুণ সেখানে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সুবিধা গ্রহণ করা সহজ বলিয়া সরকার সেখানে যে ভাবে আপনার প্রভাব প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছেন, ব্যবস্থাপরিষদে তাহা পারেন নাই। ব্যবস্থাপরিষদে সরকারের এই অবস্থার উন্নতি কল্পেই স্যর জন সাইমন বোধ হয় উক্ত পরিষদের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ‘সামবায়িক সমিতি’ করিয়াছেন এবং যাহাতে ভবিষ্যতে এই সমিতিতে দেশের শিক্ষিত লোকদিগের আসিবার সুবিধা না হয় সেইজন্য ইহার নির্ব্বাচন-পদ্ধতিও পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। ইহার সদস্যেরা Direct election বা সরাসরি ভোটে নির্ব্বাচিত না হইয়া প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের মারফতে নিযুক্ত হইবেন অর্থাৎ গভর্ণর ও মন্ত্রিগণ চালিত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা হইতে সদস্য বাছাই হইয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে যাইবেন। তাহার উপর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে দেশীয় রাজ্য সমূহকে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে অধিকাংশই যে স্বৈরাচারের পক্ষপাতী তাহা বোধ হয় তাহাদিগের শাসনপদ্ধতি হইতে বুঝিতে বাকী থাকেনা। সুতরাং এই পরামর্শে একদিকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক মণ্ডলীতে স্বাধীন নির্ব্বাচনের অধিকারে যেমন আঘাত দেওয়া হইয়াছে, অন্যদিকেও বুঝাযায় যে প্রলয়ান্ত কালের মধ্যে ভারতের ভাগ্যে স্বায়ত্তশাসন লাভ হইবে কিনা সন্দেহ।

এই প্রকার নির্ব্বাচনের ফলে প্রাদেশিক সভাগুলির ক্ষুদ্রতা ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির সুবিধা পাইবার একটি পথ রহিল। কারণ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা হইতে যাঁহারা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব প্রদেশের স্বার্থের কথাই ভাবিবেন। তাঁহারা সমগ্র ভারতের জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করিবার প্রবৃত্তি পোষণ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

আলোচনা

হিন্দুর শবদাহ ঃ—হিন্দুর শবদাহ পারত্রিক ধর্ম্মকার্য্যের একটী অপরিহার্য্য প্রাথমিক প্রধান অঙ্গ। সুতরাং এই কার্য্য যাহাতে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হয়, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুমাত্রেরই মতদ্বৈধ থাকা উচিত নয়। হিন্দুগণ ঐহিকসর্ব্বস্ব নয়; তাহাদের পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাসের জন্যই তাহারা ঐহিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া পারত্রিক মঙ্গলের জন্য নানাবিধ বৈধকর্ম্ম করিয়া থাকে। এই বিশ্বাসের মূল আর্য্যশাস্ত্র, যাহা যৌগিকদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন সমাধিপূতচেতা জীবকল্যাণনিরত মহর্ষিগণ প্রণীত। তজ্জন্য বর্ণাশ্রমাচারসম্পন্ন হিন্দু নির্ব্বিচারে ভগবদ্‌বাণী বোধে ঋষিবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার মোহে আচ্ছন্ন পথভ্রষ্ট অপরিণামদর্শী হিন্দুনামধারী কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহারা পরলোকে আস্থা-সম্পন্ন নহেন, অথবা শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস করেন না, তাহারা সুবিধানুযায়ী আপাতমনোহর পথ অবলম্বন করেন। এবং পরে তাহা ভ্রমসঙ্কুল বোধ হইলে, পরিত্যাগ করিয়া অন্যপথে ধাবিত হন। কিন্তু শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুগণের কথা স্বতন্ত্র, তাহারা ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণপরিচালিত, তাহাদের মার্গ যুগযুগান্তর-পরীক্ষিত, সুতরাং প্রমাদদুষ্ট নহে॥

বর্ত্তমান সময়ে যন্ত্রসাহায্যে শব দাহের যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়। উহা দ্বারা মৃতের কোনরূপ কল্যাণ সাধিত হয় না। উহাতে বিজাতীয় লোকের স্পর্শ সম্ভাবনা, মন্ত্রপাঠাদির অভাব, গঙ্গায় অস্থিপ্রক্ষেপরাহিত্য, নিয়মিত ভাবে শবস্থাপনের অভাব প্রভৃতি থাকায় বৈধদাহ সিদ্ধ হয় না। অতএব দাহ সিদ্ধ না হইলে, তৎপরবর্ত্তী মৃতের ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াগুলিও অসিদ্ধ হয়। এই কারণ যান্ত্রিক দাহে কাষ্ঠব্যয় ও শ্রমের লাঘব হইলেও এই সুবিধার নামে অশাস্ত্রীয় কার্য্যদ্বারা মৃতের পারত্রিক কার্য্যে বিঘ্ন সম্পাদন কখনও সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণের সমর্থনীয় হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত হিন্দুমাত্রেরই যান্ত্রিক দাহে অনাস্থা ও তীব্র প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। কিছুকাল পূর্ব্বে যন্ত্রসাহায্যে শবদাহের ব্যবস্থা হয় এবং উহার প্রতিকূলে তুমুল আন্দোলন হয়, এইরূপ জন শ্রুতি আছে তৎকালে প্রাতঃস্মরণীয় মহানুভব ৺রামগোপাল ঘোষ মহাশয় তাহার স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর আদেশে উক্ত অবৈধ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন, ও নিমতলা ঘাটে শবদাহের জন্য প্রচুর মুদ্রা দান করিয়া অতুলনীয়-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে তাদৃশ মহানুভব ব্যক্তির কি একে বারে অভাব ঘটিয়াছে? যিনি চিরাচরিত সনাতন ধর্ম্মপদ্ধতির রক্ষাকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হন্। এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বৈধত্ব স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্র হইতে প্রদর্শন পূর্ব্বক, যান্ত্রিক দাহ যে সম্পূর্ণ অবৈধ ও মৃতের অনিষ্টকারক, তাহা প্রতিপাদন করাও আবশ্যক। তাহা হইলে বিবেচক পাঠকমাত্রেই এই অবৈধদাহ ব্যবস্থা যে কতদূর সর্ব্বনাশকারী তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন॥

শবের দাহার্থে চিতানির্ম্মাণ তৃণ কাষ্ঠদ্বারা পবিত্র ভূমিতে করা কর্ত্তব্য, এবং স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে দক্ষিণ শিরা করিয়া উত্তানমুখে এবং অধোমুখে স্থাপন পূর্ব্বক পুত্রাদি, সপিণ্ড সগোত্র ও সজাতীয় ব্যক্তি প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নি প্রদান করিবেন এ বিষয়ে বিধি এই :—

"অথ পুত্রাদিরাপ্লুত্য কুর্য্যাদ্দারুচয়ং মহৎ।
ভূপ্রদেশে শুচৌ যুক্তে পশ্চাচ্চিত্যাদি লক্ষণম্।
তত্রোত্তানং নিপাত্যৈনং দক্ষিণা শিরসং মুখে।
আজ্যপূর্ণাং স্রুচং দদ্যাৎ দক্ষিণাগ্রাংনসিস্রুবম্॥ (ছন্দোগ পরিশিষ্টম্)

অস্যার্থ :—অনন্তর পুত্রাদি অগ্নিদাতা প্রভৃতকাষ্ঠ সঞ্চয় পূর্ব্বক চিতার যোগ্য পবিত্র স্থানের সংস্কার করিবে, ঐ চিতার উপর মৃতদেহ দক্ষিণ শিরা করিয়া স্থাপন পূর্ব্বক উহার মুখে ঘৃত পূর্ণ দক্ষিণাগ্র্য স্রুক্ এবং নাসায় স্রুব প্রদান করিবে॥

চিতায় শবস্থাপনের পূর্ব্বে শবকে ঘৃত মাখাইয়া স্নান বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া মুখস্থিত সপ্তছিদ্রে সাত খণ্ড স্বর্ণ প্রদান পূর্ব্বক শ্মশানপিণ্ড দিবে, তাহার পর চিতায় স্থাপন করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করিবে। এবিষয়ে প্রমাণ যথা—

"দক্ষিণাশিরসং কৃত্বা সচেলন্তু শবং তথা।
তীর্থস্যাবাহনং কৃত্বা স্নপনং তত্র কারয়েৎ॥
গয়াদীণি চ তীর্থানি.........
ধ্যাত্বাতু মনসা সর্ব্বে কৃতস্নানং গতায়ুষম্।
দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ সর্ব্বে গৃহীত্বাতু হুতাশনম্।
গৃহীত্বা পানিনা চৈব মন্ত্রমেত দুদীরয়েৎ॥
কৃত্বা তু দুষ্করং কর্ম্ম জনতা বাপ্য জানতা।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সমাযুক্তং লোভ মোহ সমাবৃতম্।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু।
এবমুক্ত্বা ততঃ শীঘ্রং কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্।
জ্বলমানং তথা বহ্নিং শিরঃ স্থানে প্রদাপয়েৎ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যেষু সংস্থাপন মেবং ভবতি পুত্রিকে॥ (বরাহ পুরাণম্)

অস্যার্থ :—বস্ত্রের সহিত শবদেহ দক্ষিণশিরা করিয়া তীর্থের আবাহনপূর্ব্বক স্নান করাইবে, গয়াদি তীর্থ সকলকে মনে ধ্যান করিয়া শবদেহের স্নান সমাপন পূর্ব্বক চিতায় স্থাপন করিয়া অগ্নিমুখ দেবগণ অগ্নি গ্রহণ করিয়া এই শবদেহ দহন করুন, এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া হস্তে অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক বক্ষ্যমান মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, "এই মৃত মনুষ্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সংযুক্ত এবং লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া জ্ঞানতই হউক বা অজ্ঞানতই হউক, যে দুষ্কৃত কর্ম্ম সকল করিয়াছে, এই ব্যক্তি অদ্য মৃত্যুকালবশে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তাহারই প্রভাবে আমি ইহার সকল গাত্র দহন করিতেছি। এই ব্যক্তি এক্ষণে দিব্যলোকে গমন করুক"। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া

শীঘ্র প্রদক্ষিণ করিবে, এবং হস্তস্থিত প্রজ্বলিত বহ্নি শবদেহের মস্তকস্থানে স্থাপন করিবে, হে পুত্রি! ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের পক্ষে স্নানাদি কার্য্যের এই একরূপই ব্যবস্থা।

অন্যত্রও এই শবস্থাপনের ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া কথিত আছে; যথা—

"স্বগোত্রজৈর্গৃহীত্বাতু চিতামারোপ্যতে শবঃ।
অধোমুখো দক্ষিণাদি চরণস্তু পুমানিতি।
উত্তানদেহা নারীতু সপিণ্ডৈরপি বন্ধুভিঃ॥" (আদি পুরাণম্)

অস্যার্থ:—সগোত্রজ ব্যক্তিগণ শবদেহ উত্তোলন পূর্ব্বক চিতার উপর স্থাপন করিবে, এবং পুরুষের দেহ দক্ষিণাদি চরণ করিয়া অধোমুখে স্থাপন করিবে, স্ত্রীদেহ সপিণ্ড ও বন্ধুগণ চিতার উপর চিৎকরাইয়া শোয়াইবে!

এই আদিপুরাণেই শবদেহ নিঃশেষে দগ্ধ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, যথা—

"নিঃশেষস্তুন দগ্ধব্যঃ শেষং কিঞ্চিৎত্যজেদ্বুধঃ"॥

অস্যার্থ:—এই শবদেহ একেবারে নিঃশেষ করিয়া দগ্ধ করিবে না, কিঞ্চিৎ অবশিষ্টাংশ রাখিবে।

এই দগ্ধাবশেষ গঙ্গায় প্রক্ষেপ করা হয়; এবিষয়ে প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"যাবস্ত্যস্থীনি গঙ্গায়াং তিষ্ঠন্তি পুরুষস্যচ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥—(কূর্ম্ম পুরাণম্)॥

অস্যার্থ:—যতক্ষণ পর্য্যন্ত গঙ্গা সলিলে মনুষ্যের অস্থি অবস্থিত থাকে তত সহস্র বৎসর অস্থির অধিকারী পুরুষ স্বর্গলোকে সমাদরের সহিত বাস করে॥

অশৌচ কালমধ্যে যাহার অস্থি গঙ্গাজলে নিঃক্ষেপ করা হয়, সেই মৃত ব্যক্তির গঙ্গামৃত্যুফল লাভ হইয়া থাকে। তাহার পর জ্বলচ্চিতায় কুঠারের দ্বারা সাতটি আঘাত করিতে হয়, এবং এই আঘাতের পূর্ব্বে উক্তচিতায় প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সাতটী কাষ্ঠ খণ্ড নিঃক্ষেপ করিতে হয়, পরে চিতাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দাহকারিগণ স্নান ও প্রেতোদ্দেশ্যে তর্পণ করিবে, এই চিতাগ্নিকে শ্রুতিতে "ক্রব্যাদ" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। বাহুল্য নিবন্ধন উক্ত বিষয়ে প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রমাণ পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে দাহ সম্পন্ন হয়, তাহাই বৈধ দাহ। উহার অন্যথা হইলে শাস্ত্রোক্ত দাহই সম্পন্ন হয় না। এই জন্য বৈধদাহ কোন মৃত ব্যক্তির সম্পন্ন না হইলে পর্ণ-নর প্রস্তুত করিয়া দাহ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

সূর্য্যবংশাবতংস মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলে, তৎকালে ভরতাদির মাতামহালয়ে অবস্থিতিনিবন্ধন মৃতদেহ তৈল পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া রাখা হইয়াছিল। এবং ভরত অযোধ্যায় আগমন করিয়া উক্ত মৃতদেহের যথাশাস্ত্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এইরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহারাজ পৃথুর মৃতদেহ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। এই মহারাজ পৃথু স্বায়ম্ভুবমনুর পুত্র উত্তানপাদ রাজার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। এবং সস্ত্রীক বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থান কালে দেহত্যাগ করেন। তৎপত্নী অর্চ্চি মহারাজ পৃথুর মৃত দেহ গিরিসানুতে দারুময় চিতা রচনা করিয়া তদুপরি স্থাপন করেন ও সহমৃতা হন। এই পৃথু পুরাণে প্রথম ক্ষিতীশ্বর বলিয়া বর্ণিত আছেন "পৃথুরাদ্যঃ ক্ষিতীশ্বরঃ।" এইরূপ অনেক বিবরণ পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতে বৈধ শবদাহের ব্যবস্থা আছে।

দাহ যথোক্তভাবে সম্পন্ন না হইলে তৎপরবর্ত্তী ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হইতে পারে না। কারণ প্রেতের ক্রিয়াগুলি তিনভাগে বিভক্ত, যথা—প্রথমক্রিয়া, মধ্যমক্রিয়া ও উত্তরক্রিয়া। তন্মধ্যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইতে পূরক পিণ্ডদান পর্য্যন্ত প্রথম ক্রিয়া। আদ্যশ্রাদ্ধ হইতে সপিণ্ডকরণ পর্য্যন্ত মধ্যম ক্রিয়া। এবং তৎপরবর্ত্তী সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধাদি উত্তরক্রিয়া। এই জন্য যে ব্যক্তি শ্মশান পিণ্ডদান হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কার্য্যগুলি সম্পন্ন করেন, তাহাকেই পূরকপিণ্ড প্রদান করিতে হয়। কারণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইতে পূরক পিণ্ডদান পর্য্যন্ত প্রথমক্রিয়ার অন্তর্গত। এবিষয়ে প্রমাণ যথা—

"অসগোত্রঃ সগোত্রো বা যদি স্ত্রী যদি বা পুমান্।
যশ্চাগ্নিদাতা প্রেতস্য পিণ্ডং দদ্যাৎ স এব হি॥"

(কর্ম্মোপদেশিনী ধৃত-বায়ু পুরাণ বচম্)

অস্যার্থঃ—স্ত্রী বা পুরুষ অসগোত্র বা সগোত্র হউন, যে অগ্নি প্রদান করিবে, তাহাকেই পূরক পিণ্ডদান করিতে হইবে।

এই পিণ্ডদান না করা হইলে কল্পাবসান পর্য্যন্ত প্রেতের মুক্তি হয় না। এবিষয়ে প্রমান

"প্রেত-পিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণম্।
শ্মশানিকেভ্যো দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যতে॥"

(বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর বচনম্)

অস্যার্থঃ—যে প্রেতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডপ্রদান না করা হয়, শ্মাশানিক দেবতাগণের নিকট কল্পাবসান পর্য্যন্ত তাহার মুক্তি হয় না।

অতএব বৈধ দাহ না হইলে তৎপরবর্ত্তী কোন ক্রিয়াই সম্পন্ন হইতে পারেনা। যে হেতু প্রেতের ক্রিয়া সমূহ পরস্পর পৌর্ব্বাপর্য্যভাবসম্পন্ন, এবং প্রেতের ক্রিয়া সম্পন্ন না হইলে তাহার পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রেতের প্রেতত্ব পরিহারই হয় না। একণে বক্তব্য :—গ্যাসাগ্নি বা বৈদ্যুতাগ্নি শাস্ত্রে অবৈধাগ্নি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অবৈধাগ্নি দৈব বা পৈত্র কর্ম্মে একেবারে নিষিদ্ধ। সুতরাং শবদাহ বিষয়ে একেবারে বর্জ্জনীয়। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে. হিন্দুগণের মধ্যে এমন কে আছেন, যে তাহার মৃত পিতা বা মাতা অথবা বন্ধুবর্গ সদ্গতি লাভ না করিয়া অনন্তকাল দারুণ ক্লেশ ভোগ করুক, তদ্বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া, নিজের সুবিধার জন্য যান্ত্রিকদাহের ব্যবস্থা করিয়া পিতামাতার নরকভোগের পথ উন্মুক্ত করিবেন, কেহ কেহ যে এবিষয়ে অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞতা নিবন্ধন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। আর যান্ত্রিক দাহের উদ্যোক্তৃগণ সর্ব্বজন সমাদৃত সংবাদ পত্রাদির দ্বারায় জন সাধারণকে বিশেষ ভাবে জ্ঞাপন করিবার ব্যবস্থাও করেন নাই।

উপসংহারে আমার নিবেদন—বিজাতীয় ভাষা, বিজাতীয় পরিচ্ছদ, বিজাতীয় আহার ও বিজাতীয় সভ্যতায় বিকৃত মস্তিষ্ক। জননায়ক নামে পরিচিত পারত্রিক ধর্ম্মে অবিশ্বাসী কতকগুলি হিন্দু ভারতবর্ষের সাময়িক বিপ্লবে সহযোগ দিয়া হিন্দুদের বংশ পরম্পরাগত চিরাচরিত ধর্ম্মকার্য্যের বহু অনুষ্ঠান লুপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহা তাহার অন্যতম। এক্ষণে সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণের প্রতি সানুরোধ সবিনয় নিবেদন, তাহারা যেন সকলে সমবেত হইয়া এই অশাস্ত্রীয় দাহের প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ করিলেও যদি এইরূপ দাহ যন্ত্র নিমতলা ঘাটে বা অন্যত্র স্থাপিত হয়, তাহা হইলে হিন্দুমাত্রেই যেন তাহাতে দাহ করিতে স্বীকৃত না হন্। আর সময় নাই, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুভ্রাতৃগণ, আসুন সকলে তারস্বরে ধর্ম্মরক্ষক ভগবানের নাম করিয়া এইরূপ অশাস্ত্রীয় দাহযন্ত্র যাহাতে স্থাপিত না হয়, তদ্বিষয়ে বদ্ধ পরিকর হইয়া চেষ্টা করি। ইহার জন্য যদি প্রাণ দিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। ভগবান্ শ্রীমদ্-ভগবদ্ গীতায় বলিয়াছেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ॥" ভ্রাতৃগণ তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না যে, ধর্ম্মদ্রোহিগণ পারত্রিক কার্য্যের প্রথম কার্য্যটী লোপ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না। পর পর কার্য্যগুলি ও নষ্ট করিবে। হিন্দু ধর্ম্মের বিরোধী হিন্দুনামধারী অনেক সভ্য ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান সংস্কার বিবাহ বিষয়ে অনেক প্রকার শাস্ত্র বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করিতে-ছেন। এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লোপের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে ধর্ম্ম প্রাণ হিন্দুগণের ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ যত্ন আবশ্যক, অধিক বলাবাহুল্য, যাহাতে ঐরূপ দাহযন্ত্র সংস্থাপিত না হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন্॥—

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মা কাব্য স্মৃতিতীর্থ সিদ্ধান্ত ভূষণ
কলিকাতা, সিমলা ৮২।১নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, ভারতী চতুষ্পাঠী

পণ্ডিত বলাই চাঁদ মল্লিক।—

"ভারতের সাধনা" বাহির হইবার পূর্ব্ব হইতেই পণ্ডিত বলাই চাঁদ মল্লিক মহাশয় এইরূপ এক খানি মাসিক পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিতেন। এই "পত্রিকা" বাহির হইবার পর হইতেই তিনি এই পত্রিকার গ্রাহক হইয়া ইহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হন। তাঁহার সহসা মৃত্যুতে আমরা বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছি। ১৭ই কার্ত্তিক সোমবার রাত্রি ৫॥টায় তিনি সুদীর্ঘ ৭৬ বৎসর বয়সে বিনা ক্লেশে হঠাৎ এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ধীর, নিরহঙ্কারী, গুণজ্ঞ, প্রাচীন, বিজ্ঞ, পরোপকারী ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি আজ কাল দুর্ল্লভ। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের ঘটনাগুলি আজ কাল অনেকেরই স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাঁহার পিতা ৺রসিক কৃষ্ণ মল্লিক সুপ্রসিদ্ধ ডিরোজিওর এক জন বিখ্যাত ছাত্র এবং হিন্দু কলেজের পাঁচজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের মধ্যে অন্যতম। তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ডেপুটী কালেক্টর হইয়া বর্দ্ধমান বিভাগে নিযুক্ত হন। তিনি সমাজসংস্কার ধর্ম্মপ্রচার ও দুর্নীতিনিবারণাদির জন্য সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়া যান। তাঁহার সমগ্র সদ্গুণ তঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বলাই চান্দে সংক্রামিত হইয়াছিল। বলাই ১২৬২ সালের ৪ঠা ভাদ্র রবিবার [ইং ১৯শে আগষ্ট ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে] বীরভূমিতে কলিকাতার তদানীন্তন বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেব মহাশয়ের (ছাতুবাবু) বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন।

কলিকাতায় তিনি ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিলেও শৈশবাবধি **"বৈদিক আর্য্য ধর্ম্মের"** প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। প্রথম শিক্ষা লাভ করিয়াই তিনি "ধর্ম্মহীন" শিক্ষার উপর বীতশ্রদ্ধ হন। বাল্যকাল হইতে সকলেই যাহাতে ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিতে পারে, এই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল।

Metropolitan Callege হইতে F A. পরীক্ষা পাশ করিবার পর, তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে উদারতার জন্য প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ, তৎপরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে Colonel Olcott ও Madame Blavatskey কলিকাতায় আসিয়া Theosophical societyর শাখাসভা স্থাপন করিবার পর

তিনি অল্‌কট্‌ ও ব্লাভাট্‌স্কীর সহিত মান্দ্রাজে চলিয়া যান। সেখানে মাদাম ব্লাভাটস্কীর আদেশে তিনি সিংহল গমন করিয়া বৌদ্ধগণের নিকট পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুভাবে প্রায় দেড় বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। তৎপরে অগ্রজগণের বিশেষ আগ্রহে, সিংহল ও মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী মহারাজের নিকট দীক্ষিত হইয়া, সার্ব্বভৌম ধর্ম্মমতের প্রচারে ব্রতী হন। বালকগণের জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্ত তিনি "জ্ঞান কথা" প্রণয়ন করেন। বিদ্যালয়ে ও কলেজে ধর্ম্মহীন শিক্ষার প্রতিবিধান কল্পে তিনি "God in the universities" প্রচার করিয়া দেখাইয়া দেন---খৃষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই জ্যোতিঃ স্বরূপ ভগবানের উপাসনা বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা দেওয়া হইত, এক্ষণেও তাহা প্রচলন করা সকলের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এই সময়ে তিনি বৈদিক শিক্ষা প্রচলন জন্ত ডাক্তার রাখাল চন্দ্র সেন মহাশয়ের সহায়তায় Anglo-vedic Institution নামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাঙ্গালা ভাষায় বেদের অর্থ বুঝাইবার জন্ত "কল্প" নামক একখানি বৈদিক মাসিক পত্রও প্রকাশ করেন।

বেদের আলোচনা দ্বারা আর্য্যশাস্ত্রের যথার্থ সারধর্ম্ম উদ্ধার হইবে—এই স্থির করিয়া যে স্থানে বেদের কোন না কোন ভাবে চর্চ্চা হইতেছে, সেই স্থানেই তিনি সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। আর্য্য সমাজের সহিত হিন্দু সমাজের পূর্ণ ভাবে সদ্ভাব থাকিলেও এবং সাধারণ হিন্দুগণের সহানুভূতি না থাকিলেও, আর্য্য সমাজ যে ভারতে পুনঃ বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্ত বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে ও সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে তাহার শাখা কেন্দ্র স্থাপন করিতেছে, ইহার দ্বারা ভারতের বিশেষ উপকার হইবে, এই স্থির করিরা তিনি আর্য্য সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিসিতে আরম্ভ করিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন হবনের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। বর্ষা, গ্রীষ্ম, কোন সময়ের মধ্যে তাঁহার হবনের কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে তিনি বিখ্যাত বেদান্তবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদার নাথ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং অন্যান্ত দর্শন শাস্ত্রেরও আলোচনা করেন। পণ্ডিত জয় চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় তাঁহাকে এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। এই সময়েই তিনি "উপদেশ সাহস্রী, "সাংখ্য কারিকা" সটীক ও সানুবাদ প্রকাশ করেন।

ইহার পরে তিনি বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্রাদি হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম সমন্বয় বা পন্থা নামক অপূর্ব্ব সমন্বয় গ্রন্থ চারিভাগে প্রকাশ করেন। ভগবান্ ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ তুরীয়, চরাচর স্ত্রী পুরুষ লইয়া জ্যোতিঃ স্বরূপ একমাত্র ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন—এই তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্তই তিনি পরবর্ত্তী কালে ক্রমান্বয়ে, "চাণক্য শ্লোক" "দৈব ও পুরুষকার" শ্রীকৃষ্ণ ও জীব" "শ্রীকৃষ্ণলীলা" "প্রেম ধর্ম্ম" "প্রভু পাদ প্রসাদ" বৈদিক "নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি" "গীতা সার" "ভাগবত সার" "শিবকালী" "তত্ত্ববিদ্যা ও সাধন" "The Five daily Sacrifices" "Universal Religion" "সদাচার"প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করেন। তিনি সকল ধর্ম্মের মধ্যে **একই সত্য** নিহিত আছে ইহা সাধারণকে জানাইবার জন্ত"ধর্ম্ম সমন্বয় সঙ্ঘ" স্থাপন করেন। ইহাই তাঁহার প্রধান কার্য্য। বলাই চাঁদ মল্লিকের জীবনের বিশেষত্ব এই যে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি এবং ভোগ বিলাসের যথেষ্ট সুবিধা সত্ত্বেও তিনি সাংসারিক সকল সুখ ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভগবৎ প্রসঙ্গে কাল যাপন করিতেন। তাঁহার গুরুভক্তি অতুলনীয়। সময়ের অবিরাম গতির সহিত মানুষের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কত মত পরিবর্ত্তন ঘটে; কিন্তু বিগত চল্লিশ বৎসরের ভিতর পণ্ডিত বলাই চাঁদ স্বীয় গুরুর নিকট যে সার সত্য বুঝিয়া ছিলেন, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, তিনি সেই একই ভূমিতে থাকিয়া গুরুদত্ত সত্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে জগৎকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার শিশু সুলভ সরলতা ও অকপট দেশ ও সমাজ সেবা ও সর্ব্বোপরি তাঁহায় উজ্জ্বল ধর্ম্ম বিশ্বাস তাঁহাকে সর্ব্বাংশে তাঁহার পিতৃদেবের উপযুক্ত পুত্র নামে অভিহিত করিয়াছে।

আমরা তাঁহার আত্মার চির শান্তি কামনা করিতেছি। শ্রীকানাই লাল পাল; ৮৯১ কির্ত্তি মিত্র লেন শ্যাম বাজার—

মাসপঞ্জি—কার্ত্তিক, ১৩৩৭।

ভারতের বয়কট-আন্দোলন বিলাতের বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করিয়াছে বলিয়া তথাকার সংবাদ পত্র সমূহে বিক্ষোভ দেখা যাইতেছে—ভাইস-রয় লর্ড আরউইনের কার্য্যকাল শেষ হইলে তাহা বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবে তিনি অমত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ—পুণার নিকটবর্ত্তী কোলি জাতীয় জঙ্গলীলোকেরা কর দিতে অস্বীকার করাতে পুলিস-সৈন্যের অভিযান চলিয়াছে—গোল-টেবিলে আমন্ত্রিত ভারতীয় সভ্যগণ লণ্ডন সহরে পৌছিলে স্বয়ং ভারত-সচিব ওয়েজউড-বেন্ তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিবেন। পাটের বাজার মন্দা হওয়াতে দেশের অর্থ-সঙ্কটে আতঙ্কিত হইয়া বাঙ্গলার জমিদারগণ গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিকারপ্রার্থী হইয়াছেন —কংগ্রেসাধ্যক্ষ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু পুনঃ গ্রেপ্তার হইলেন। পাঞ্জাবে 'ন্যাশন্যাল লিবারেল-পার্টি" নামে একটী নূতন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হইল—পণ্ডিত জহরলালের গ্রেপ্তারের ফলে বোম্বাই সহরে জাতীয় 'ওয়ার কৌন্সীল' এর পক্ষে বিশেষ আন্দোলন ঘটে, পুলিশ অনেককে গ্রেপ্তার করিয়াছে—লাহোরে বিলাতী-বস্ত্র পরিহিত লোকদিগের বস্ত্র-ছেদন ও পকেট-কর্ত্তন হইতেছে—কানপুরের জেলা কংগ্রেস-কমিটীগুলি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল—মিঃ বল্লভ ভাই পেটেলের মুক্তি পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত জে-এম-সেনগুপ্ত কংগ্রেস-সভাপতি নিযুক্ত হইলেন—বাঙ্গলায় প্রাথমিকশিক্ষা-বিল প্রযুক্ত হইলে মুসলমানী পাঠশালা মক্তভ্‌গুলির কি অবস্থা হইবে তাহা লইয়া বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এক ঘোষণা করিয়াছেন—প্যালেষ্টাইনের শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট জাতি সঙ্ঘের (League) মন্তব্য মানিয়া লইবেন বলিয়া স্বীকারোক্তি হইয়াছে—লণ্ডনে সাম্রাজ্য-বৈঠকের অধিবেশন চলিতেছে—বোম্বাইতে 'দেওয়ালী' অনুষ্ঠান অতিশয় শান্তভাবে নির্ব্বাহিত হইয়াছে; স্মরণ-কাল-মধ্যে এমন মিলের ভাব দেখা যায় নাই-হাবড়াতে পুলিশ ও জনমণ্ডলে এক সংঘর্ষ হইয়া গেল—বিলাতী বিমান পোত ১০১-এর ধ্বংসব্যাপার লইয়া বিলক্ষণ অনুসন্ধান হইতেছে; প্রকাশ বিমান বিভাগের অধ্যক্ষদিগের ভারতে আগমন পরীক্ষায় অতিমাত্র ব্যগ্রতাই উহার বিনাশের কারণ—চলন্ত রেল-ইঞ্জিনকে ইচ্ছামতে স্থগিত করা যায় এই প্রণালী ইংলণ্ডের জি, ডবলু, আর রেল পথে এই প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে পুনঃ আফ্রিদী উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে—দক্ষিণ ভারতে ভয়ানক ঝড় ও বন্যা হইয়া গেল—বিগত ছয় মাস কাল সময় মধ্যে ব্রিটেনের ২৭৭১৬ জন নরনারী স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে বসতি বিস্তার করিয়াছে;—পরলোকগত লর্ড বার্কেন-হেডের পুস্তকালয়ের ১০ হাজার বহি বিক্রীত হইয়াছে-জেলাম্যাজিষ্টের আদেশ অমান্য করিয়া অমৃতসর জালিওয়ালানা বাগে বক্তৃতা করাতে শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার হইলেন—বোম্বাইতে 'পিপ্‌লস্‌ব্যাটেলিয়ান্' নামক প্রজা পক্ষের দুই ব্যক্তি গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারিয়েট আক্রমণ করে—ইংলণ্ড-ইয়র্ক সহরের প্রধান ধর্ম্ম-যাজক আর্ক-বিশপ "The destructive influence of Western civilisation upon Indian Life বা পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতীয় জীবনের উপর সর্ব্বনাশজনক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া এক অভিব্যক্তি করিয়াছেন—রেঙ্গুণের করপরেশন্ বর্ম্মাবাসী শ্রমিকব্যতীত আর কাহাকেও কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না বলিয়া

সিদ্ধান্ত করিয়াছে—লক্ষাতে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে—গোলটেবিলের বৈঠকে রাজার বক্তৃতা বিনাতার বার্ত্তায় প্রচারিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে—ভারতীয় 'রাউণ্ডটেবিলকনফারেন্সের সফলতা কামনা করিয়া ব্রিটেনের প্রধান ধর্ম্ম-যাজক ক্যাণ্টারবেরীর আর্চ্চ বিশাল ও তত্রত্য অন্য সকল গীর্জ্জার পাদরীগণ বিশেষ এক প্রার্থনা করিয়াছেন—বিলাতে রক্ষণশীল দল মিঃ বলডুইনকে পুনঃ দলপতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন—রাউণ্ড টেবিলে সমাগত ভারতীয়গণ সকলেই 'ডমিনিয়ান ষ্টেটাসের' উপর জোর দিতে কৃতসঙ্কল্প—উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের গোলযোগের কারণ খাইবারপাশ অঞ্চলে বিদেশীয় যাত্রীদিগের যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে—যে সকল লোকদিগের ভারতের ভাইসরয় হওয়ার সম্ভাবনা তাহাদের মধ্যে স্বনামখ্যাত জেনারেল স্মাট অন্যতম—শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত দীল্লিতে রাজদ্রোহ বিচারে এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন—শ্রীমতী জে, এম, সেনগুপ্তও ঐ অপরোধে চারিমাসের জন্য ঐ দণ্ড পাইলেন—বাকিংহাম বাজপ্রসাদে গোল-টেবিলে নিমন্ত্রিত ভারতীয় রাজন্য বর্গ এক ভোজে আহুত হইয়াছেন, স্পেনের রাণী তাহাতে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু ও মুসলমানের অনৈক্য লইয়া বিলাতেব সংবাদপত্র সমূহ তীব্র উক্তি করিতেছে, ভারতীয় সভ্যগণ তাহার প্রতিবাদ জানাইতেছেন—বিলাতে লিবারেল ও লেবার দলেব মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা—কলিকাতা করপরেশন সহরের আলোক বর্ত্তিকার উন্নতি কল্পে একজন জারমেন বিশেষজ্ঞ কে নিযুক্ত করিয়াছেন—লাহোরে ও বোম্বাই সহবে পুলিশ ও জনমণ্ডলের মধ্যে সংঘর্ষ চলিয়াছে—কলিকাতাতে একটী চলন্ত দোতালা বাস ভাঙ্গিয়া পড়িয়া অনেক যাত্রী আহত হইয়াছে—ইতালীয় অধ্যাপক টাচী তিব্বত ভ্রমণ কালে কতকগুলি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহাতে তির্ব্বতের প্রাচীন বৃত্তান্ত সম্বন্ধ অনেক নূতন কথা আছে—দীল্লি—বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রথম ভাইস-চেন্সলার ব্যবহাবজীবি মতি সাগরের মৃত্যু হইয়াছে—দুইজন ফরাসী বিমান কারী ৩½ দিন সময়ে প্যারিস হইতে কলিকাতাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—ভাবতে সিভিল ডিস-অবিডিয়েন্স ব্যাপাবে ভারতীয় সৈনিকগণ ঠাণ্ডা আছে বলিয়া বঙ্গের গভর্ণব আর্ম্মিষ্টিস্ দিবস উপলক্ষে বিস্তর প্রশংসা কবিয়াছেন—অদ্য ২৬শে কার্ত্তিক লণ্ডনে পার্লেমেন্টের লর্ড সভার রয়েল-গ্যালারীতে গোল টেবিল বৈঠকেব প্রথম অধিবেশন হইলে; ঐ দিন লণ্ডন সহরে 'লর্ড মেয়র শো' বলিয়া এক বিবাট মিশিল বাহির হয়, তাহাতে ৪টি ভারতীয় হস্তী ক্ষেপিয়া গিয়া ভয়ানক ভীতি উৎপাদন করে ও অনেক লোককে আহত করিয়া দেয় টেবিলের সভায় রাজা ও প্রধান মন্ত্রী প্রথম বক্তৃতা কবেন—রাউণ্ডটেবিলের প্রতিবাদ করিতে গিয়া বোম্বাই সহরে একদল লোক গিয়া গভর্ণমেণ্ট হাউস্ অবরোধ করে, পুলিশ লাঠিচার্জ্জ করিয়া তাহাদিগকে তাডাইয়া দেয়—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইংরেজ বণিক স্যার ডেভিড ইউল্ ৭০ লক্ষ পাউণ্ডের বিত্ত রাখিয়াগিয়াছেন্—টোকিও সহরে জাপানের প্রধান মন্ত্রী আততায়ীর হাতে গুরুতর রূপে আহত হইয়াছেন—শাসন সংস্কার বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রেরিত ডেস্‌পাচ অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া বিলাতের টাইমস্ পত্রে ব্যাখাত হইয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক স্যর সি, ভি, রমান্ এবার 'নোবেল' পুরস্কারের অধিকারী হইলেন।

ভারতের সাধনা

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

দ্বিতীয় বর্ষ] অগ্রহায়ণ—১৩৩৭ [দ্বিতীয় সংখ্যা

সাধনারপথে

ভ'বর্ষ। ভারত

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ভবিষ্যৎ ভারত গড়িয়া তুলিতে আজ সকল দিকেই চেষ্টা চলিতেছে। ভারতের অস্তিত্বে, ভারতের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধিতে, বিভিন্ন লোক, বিভিন্ন জাতি এক্ষণে নানা প্রকারে স্বার্থ বোধ করিয়া থাকে—সাম্রাজ্যের মুকুটমণি বলিয়া ইংরেজ জাতি ত এক্ষণে ভারতের উপরে এক ন্যস্ত স্বার্থের (vested interest) দাবী করিয়া থাকেনই। অতীতকালে জগতের শক্তিমন্ত সকল জাতিরও লোলুপ দৃষ্টি ভারতের উপরে ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিয়া থাকে ; এ কালেও তাহা আছে এবং অনেকে তাহার সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে—জারম্যান সমরের উদ্বোধন মন্ত্রে সে কথা প্রকাশ পাইয়াছিল ; রুশ-বল-শেভিক ভীতি, পীত-আতঙ্ক প্রভৃতি ভারতের শাসক ও সংরক্ষকদিগকে সর্ব্বদাই বিব্রত করিয়া রাখিতেছে।

রাষ্ট্র ও বাণিজ্য-গত খণ্ড স্বার্থের কথা ছাড়িয়া দিয়া সমষ্টিগত জাতির স্বার্থের দিকে চাহিলেও ভারতের সমস্যা আজ বহুজাতি ও অনেক স্থানের স্বার্থের সহিত সাক্ষাত ভাবেই সম্পর্কিত —উদীয়মান প্রাচ্যের কোনও আদর্শই নাকি পূর্ণ হইতে পারে না, ভারতীয় সমস্যার সমাধান না হইলে, সংহত মুসলমান শক্তিও নাকি ব্যাহত হইয়া যাইতেছে. ভারতকে স্বস্থ, সুস্থ ও বলবত্তর দেখিতে না পাইয়া। স্বার্থ-বিদ্বিষ্ট ও পরপীড়ন-রত মানব সমাজের অনেক উদ্বেগ ও যাতনার অবসানেই ভারতীয় সমস্যার কোনও সুমীমাংসার প্রতীক্ষা করিতেছে। কোন বৃহত্তর মানবীয়তার

আদর্শ বা প্রকর্ষের কথা এখানে হইতেছে না, দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ, ঐহিক ও লৌকিক জীবনে সমাজের সুখ ও স্বার্থের জন্যই ইহার প্রয়োজন আছে।

বাহিরের লোকের কথা ছাড়িয়া, ভারতের—অন্ধকার এই দৈন্য ও দুঃখের ভারত, নিঃস্ব দুর্ব্বল ও পঙ্গু ভারত, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভারত, সাম্প্রদায়িকতা-বিদ্বিষ্ট ভারত, ক্ষুদ্র স্বার্থ-বিলুব্ধ হীন ও ক্ষীণ ভারতের—দিকে চাহিলে, তার এই বিকৃত বিরূপের পরিবর্ত্তন সাধনে সকলেরই ইচ্ছা কাহার না হইবে?

বাহির ও ভিতর হইতে ভারত-সংস্কারের যে সকল প্রচেষ্টা আজ চলিতেছে, তাহাতে সকলেই তাঁর বিভিন্ন রূপের পরিকল্পনা করিতেছেন। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভাবে এজন্য আজ নানা পরিকল্পনা ও উদ্যোগ হইতেছে। ইহাতে প্রকৃত সমস্যার সমাধান কত দূর হইবে, তাহাই ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। যতদূর দেখা যায় তাহাতে সমস্যা বাড়িয়াই যাইতেছে, বিকৃতির প্রসার লাভ হইতেছে মাত্র। ভেদ ও বিবাদের নিষ্কৃতির জন্য গোল টেবিলের বৈঠক বসিল, নূতন ভেদ সৃষ্টি করিয়াই তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর তাহাতে যে সকল আয়োজন ও উপক্রম হইতেছে, তাহাতে সকলেই নিজ নিজ কথা বলিবার জন্য ব্যস্ত; প্রকৃত ভারতের কথা—ভারতের প্রাণ স্পর্শ করিয়া ভারতের অন্তঃ প্রকৃতির কথা—ভারতের চিরন্তন প্রবহমান সভ্যতা ও সাধনার কথা—ভারতের কোটি কোটি নরনারীর অভাবনীয় অভাব ও দৈন্য ঘুচাইবার কথা, এবং সর্ব্বোপরি ভারতের নিজ বৈশিষ্ট্য ও প্রকর্ষকে এ কালের সকল আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ অলোকসামান্য জ্যোতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কথা—কোনও স্থানে শুনা যাইতেছে না। অবশ্যই আধুনিক মনোবৃত্তিতে এই কথা উপহাসজনক বলিয়াই মনে হইবে এবং যাহারা ভারতের ভবিষ্যৎ রূপ-পরিকল্পনায় নিযুক্ত হইয়াছেন ও ভারতের ভাগ্যবিধাতা বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে চাহেন, তাহাদের নিকট ইহা একান্ত অগ্রাহ্য হইবারই কথা। কিন্তু জগতের কাছে—বিবর্দ্ধমান নানা জাতির কাছে, ভারতের এই রূপ নির্ণয়ের সমস্যা নূতন উঠে নাই। ইতিহাসের স্তরে স্তরে তাহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; দেখা যায় যে, যে সকল লোক বা জাতি ভারতকে ভুলিয়া—ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তি (genius of the soil) ও ভারতীয়ের অভাব ও আবশ্যকতা (needs of the people) কে তুচ্ছ করিয়া, কেবল আপন স্বার্থের মাপে ভারতের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়াছেন, তাহারা সকলেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারত আপন সাধনাবলে যুগ যুগান্তরের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সময় আসিয়াছে পারিপার্শ্বিক সমুদয় অবস্থাকে ভারতের সেই সাধনা-মূলক জাতীয়তার সেবাতে নিয়োজিত করিতে হইবে; তবেই ভারতের প্রকৃত ভবিষ্যৎ রূপ ফুটিয়া উঠিবে; বাহ্যিক সমুদয় প্রচেষ্টা ও উদ্যোগও তাহাতে সার্থক হইবে।

সাধনা-মূলক সংগঠন

ভারতীয় সাধনার ভিত্তিমূলে জাতীয় কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রিত ও সম্বর্দ্ধিত করা যায় কি না, ইহার সমুচিত বিচার ও প্রচার করা ভারতের সাধনার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যেই সর্ব্বপ্রথম ইহার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। এই মহান্ কার্য্যে সমুচিত কৃতকার্য্যতার দাবী 'ভারতের সাধনা' এখনও

করিতে পারে না। কিন্তু দেশের পূজ্য এবং কল্যাণ কামী, এমন অনেকের আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার উপর বর্ষিত হইয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, বিচার-পতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীণ অসহযোগব্রতী ব্যবহারজীবি শ্রীযুক্ত কুমার কৃষ্ণ দত্ত মহাশয় প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে আপনিই আসিয়া পড়ে। সম্প্রতি ভারতীয় সাধনার অকৃত্রিম অনুরাগী প্রবীণ দেশকর্ম্মী ও চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয় যে আশ্বাসবাণী দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিগত ২৮শে অগ্রহায়ণ রবিবার তিনি সুদূর রাঁচির প্রবাস হইতে আসিয়া 'ভারতীয় সাধনা মূলক শিক্ষা পরিষদে'র তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এক সভায় অতি সারগর্ভ একটী অভি-ভাষণ করিয়া গিয়াছেন। তাহার সবিশেষ আলোচনা সময়ান্তরে করিবার বাসনা রহিল। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতীয় সাধনার সম্যক প্রসার কল্পে একটী সুসম্বদ্ধ সঙ্ঘ বা সমিতি সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। আজ জগতের বিভিন্ন জাতির সাধনার মধ্যে যে হ্রেষাহ্রেষি চলিতেছে, তাহাতে ভারতের সাধনার একটী বিশেষ স্থান ও সার্থকতা আছে, ভারতের সকল সমস্যা সেই সাধনার বলে মীমাংসিত হইতে পারে—In the conflict of culture which has been going on for some time past, the forces on the side of Indian culture have, of late, been gathering strength But being scattered, isolated and comparatively inarticulate, they are as yet too disorganised to combat the much more vocal and much better marshalled forces of western culture. A central organisation would enable the protagonists of Indian culture to meet, exchange views, discuss programmes of works, settle plan of operations and present a united and bold front to the disrupting and disintegrating forces of western civilisation. The revival of Indian culture would show how very insecure is the foundation of the new structure and how very illusory is the prospect of its affording a happier home than the old one. While setting its face against the disrupting methods of westernised reforms, the suggested society would consolidate and co-ordinate movement for social reform on indigenous lines."

আবার বলিতেছেন, "A society called "Bharatiya Sadhanamulak Siksha Parishad" (Society for the Promotion of Education based upon Indian Culture) has been started in Calcutta with an excellent monthly organ entitled "Bharater Sadhana." What I propose is to raise it to the status of an all-India society so that it may afford a platform where workers on the same lines from other parts of India may meet and exchange views." আমরা এই শুভ আকাঙ্খাকে আশীর্ব্বাদ বা কল্যাণকর নির্দ্দেশ রূপেই গ্রহণ করিতেছি; এবং ইহার পরিপূরণার্থে দেশবাসীগণের সহানুভূতি প্রার্থনা ও ভগবানের করুণা ভিক্ষা করি।

জড় বিজ্ঞানে কৃতিত্ব

সুইডেনের "একাডেমী অব সাইন্স" নামক সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞান পরিষদ্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণকে এবার ১৯৩০ সনের বিজ্ঞানের জন্ম নির্দ্দিষ্ট 'নোবেল প্রাইজ' নামক সুপ্রসিদ্ধ পুরস্কারটী দান করিয়া আধুনিক ভারতকে সম্মানিত করিয়াছেন। ভারতের এ দুরবস্থার দুর্দ্দিনেও যে ভারতীয় কেহ জগতের নিকট প্রকৃত কোনও সম্মানের অধিকারী হইতে পারে, তাহা একদিকে যেমন আশ্চর্য্যজনক, অপর দিকে তেমনই ভারতের অন্তর্নিহিত কোনও শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। নিতান্ত অধঃপতনের অবস্থায়ও এদেশে প্রতিভাবান ব্যক্তির অভাব হয় না ; ভারতীয় সাধনার চিরাগত শক্তির ইহা এক নিদর্শন।

'নোবেল প্রাইজ' জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষার পরীক্ষণে নিয়োজিত। সাহিত্য, কলা, দর্শন বিজ্ঞানাদি সকল বিষয়ে ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া এই পুরস্কার প্রতি বৎসর দেওয়া হয়। অবশ্যই পাশ্চাত্যের বিদ্বন্মণ্ডলী হইতেই বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এই পুরস্কার প্রায় এ যাবত দেওয়া হইয়া আসিতেছে। আর মানুষের বাছুনী যে সকল সময় সম্পূর্ণ সমীচীন হয়, তাহাও নয়। পাশ্চাত্যের চোক্ষে ভারতবর্ষ যে এক্ষণে নিতান্ত হেয় বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার কারণ। তত্রত্য সাধারণ লোকেরা ত জানিত ভারতবর্ষ আফ্রিকা বা আমেরিকার মতনই সর্প ও শ্বাপদ-সঙ্কুল জঙ্গলময় ভয়াবহ একটা দেশ ; বেশী কিছু থাকে ত সেখানে মন্দির এবং সাধু, সন্ন্যাসী ও অর্দ্ধনগ্ন ব্রাহ্মণ। আধুনিক জগতের বিষয়-নিপুণ পাশ্চাত্যের কাছে, ভারত এক বিপুল বাণিজ্য দ্রব্যের বাজার এবং বাণিজ্যের সূত্রেই ভারতের সহিত তাহাদের বর্ত্তমান এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ সম্পর্কে আসিয়া পাশ্চাত্যের পুরাতত্ত্ববিদ্ ও ভারততত্ত্ববিদগণ (Indologists ?) ভারতের তত্ত্ব কিছু উদ্ঘাটন করিতে না গিয়াছেন তাহা নহে। কিন্তু জানিয়া হউক্ বা না জানিয়াই হউক্, ইহারা সাধারণতঃ এই ভাবই প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, ভারত এক কাল্পনিকের স্থান, প্রাচীন ভারতের লোক কেবল দর্শন ও ধর্ম্মের কল্পনা লইয়া সময় কর্ত্তন করিয়া গিয়াছে, আর তাহারই ছাপ বর্ত্তমান ভারতবাসীর মনোবৃত্তির উপরে রহিয়া গিয়াছে। প্রকৃত কাজের বিষয়, বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্য নিরূপণ ইহাদের দ্বারা হইবার নয়। আর তাঁহাদের মুখে শিখিয়াই এদেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজও সাধারণতঃ তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া আসিতেছেন। তবুও ইউরোপীয় বিদ্বৎ মণ্ডলীর অনেকে ভারতের প্রতি এক প্রকার শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। যদিও ইংরেজ জাতি তাহাতে প্রায় নিরপেক্ষ। সমুদয় ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে এশিয়ার নূতন জাগ্রতি দেখা দিয়াছে ; ভারতেরও তাহাতে এক বিশেষ ভাগ আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্যের মনোবৃত্তিতে এক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে ; পুরাতত্ত্বের দৃষ্টিতে ইউরোপ এখন আর এশিয়ার কোনও তেমন শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না ; আর্য্য সভ্যতার শিশু-শয্যা আর ভারত ভূমি বা মধ্য এশিয়ার প্রান্তর নহে, স্কাণ্ডিনেভিয়া বা ডেনুয়ুবের তীরবর্ত্তী ভূমিতে তাঁহারা উহা খুঁজিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশে লোকের মনোবৃত্তিতে নিদারুণ বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। ফলে পরস্পরের সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবহারের প্রতিনানারূপ বিদ্বেষ-সূচক 'প্রপেগেণ্ডা'

বা প্রচার ও প্ররোচনার কার্য্য চলিতেছে। স্মিথ-লিখিত ভারতেতিহাসের অকস্‌ফোর্ডসংস্করণ ও মেয়ো-লিখিত 'মাদার ইণ্ডিয়া'কে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। ভারতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সৃষ্টি ও তাহার প্রসার ইহার রূপান্তর মাত্র। জগতের মানব প্রকর্ষের ইতিহাসে এ সকল কথার অর্থ আছে।

এইরূপ অবস্থাতেও যে ভারতের একজন বিজ্ঞানবিদ্ জগতে পদার্থবিদ্যার শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিলেন, তাহা এদেশবাসীর পক্ষে কেবল আনন্দ ও উৎসাহের কারণ না হইয়া শিক্ষারও বিষয় হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়। আধুনিক সভ্যতার পরিস্থিতিতে ইহার নানা দিকই দেখিবার যোগ্য থাকিতে পারে। ভারতের আর এক জন মনীষী কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৪ সনে প্রাচ্যবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই 'নোবেল পুরস্কারের অধিকারী হন। ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্বমূলক আদর্শবাদ তখন ইউরোপের এক শ্রেণী সাহিত্যিকের অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তদবধি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনের এক অভিনব সুর শুনা যাইতেছে; কবিবর তাহাতে প্রধানতঃ নিয়োজিত রহিয়াছেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই তখন ইউরোপের মহাসমর বাধে; পরে তাহাতে শান্তি আনিবার জন্য জাতি-সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়। অধ্যাত্মভাব-সম্মিলনের অপেক্ষা রাষ্ট্রিক সম্মিলনের দিকেই লোক দৃষ্টির অধিক ঝোক পড়ে। এদিকে মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিকে অধ্যাত্মের সংস্পর্শ দিয়া লোক চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠেন। জগতের শান্তি ও কল্যাণ কামনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠাতা বলিয়া মহাত্মাকে একবার এই নোবেল পুরস্কার দিবার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই। আজ ষোল বৎসর পরে একজন ভারতীয় জড় বিজ্ঞানবিদ্‌কে পুনঃ এই পুরস্কার দেওয়াতে, বিদ্বৎ সমাজে ভারতের বাস্তবজ্ঞানবত্তার প্রতিষ্ঠাও বাড়িল।

ভারতের সাধনার ক্ষেত্রে অধ্যাত্মতত্ত্ব ও জড়তত্ত্বে, পারমার্থিক ও ঐহিকে, অথবা আদর্শবাদ ও বাস্তবতার মধ্যে কোনও বিপরীত ভাব বা সম্বন্ধ নাই। বরং এতদুভয়ের এক অসাধারণ সামঞ্জস্যে এই সাধনার সিদ্ধি। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ উহার লক্ষ্য। যাহারা ভারতবাসীকে কেবল আদর্শবাদী বলিয়া থাকেন, তাহারা ইহাতে উহাদের প্রশংসা করেন, কি নিন্দা করেন তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন; আর তাঁহাদের মুখে এক্ষণে এদেশের উচ্চ দার্শনিক বিচার বা প্রবল ধর্ম্মপরায়ণতার কথা শুনিলে আমাদের কোনও গৌরব বোধ আসা উচিত কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ যে কেবল আদর্শের কথা বা ধর্ম্ম এবং দার্শনিক তত্ত্ব লইয়াই ব্যস্ত থাকিত না, তাহা বুঝিয়া লওয়া কঠিন নহে। ভারতের পুরাবৃত্তে উচ্চ আদর্শ বা ধর্ম্ম-মূলক চিন্তাধারার যত পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞান এবং যুদ্ধবিদ্যা ও বস্তুজ্ঞানের পরিচয় তাহা হইতে আরও অধিক পাওয়া যায়। পদার্থজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতিষাদিতে তাহাদের অসাধারণ জ্ঞানের কথা আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকগণের গবেষণায় দিন দিন অধিক প্রকাশ পাইতেছে।

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যদেশবাসীগণ যে জড়বিদ্যায় অসাধারণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না; আর ইহাদের এই কৃতবিদ্যতা যে একদেশদর্শিতার দোষে দূষিত তাহাও দিন দিন ধরা পড়িতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসা অবধি, বর্ত্তমান এই জড়বিদ্যাকেও অধিগত করিবার জন্য ভারতবাসী পশ্চাৎপদ রহিয়া যায় নাই। এতদুদ্দেশ্যে যে সকল

প্রচেষ্টা এদেশে এ যাবত হইয়া আসিতেছ তাহার মধ্যে কলিকাতার বিজ্ঞান পরিষদ্ (Association for the cultivation of Sciencee) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৭৬ সালে উহার প্রতিষ্ঠা করেন। মৌলিক গবেষণার কার্য্যে বিদ্যার্থীদিগকে সুযোগ প্রদান ও উৎসাহ দান করাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল; কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছে। এই বিজ্ঞান পরিষদ্ সৃষ্টির কাল হইতে কলিকাতাতে যে পদার্থ বিজ্ঞান চর্চ্চার আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, ডাঃ রমণ ও তাহারই সম্ভূত ফল।

ডাঃ রমণ মাদ্রাজবাসী। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে এম-এ ডিগ্রীলাভ করিয়া, গভর্ণমেণ্টের অর্থপরীক্ষণ বিভাগে চাকুরীতে প্রবেশ করেন। এবং এই চাকুরীর অবস্থাতেই বিজ্ঞান পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট হন ও বিভিন্ন প্রকারের গবেষণার কার্য্যে কৃতবিদ্যতা প্রদর্শন করেন। ১৯১৩ অব্দে স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষ এই দুই দানবীরের প্রদত্ত অর্থ ও সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অসধারণ কর্ম্মকুশলতার সংযোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং ১৯১৭ খৃ অব্দে শ্রীযুক্ত রমণ গভর্ণমেণ্টের উচ্চতর বেতনের চাকুরী ছাড়িয়া সার আশুতোষের আমন্ত্রণে বিজ্ঞান কলেজে জড়বিজ্ঞানের অধ্যাপনা গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পর তিনি উপরি উক্ত বিজ্ঞান পরিষদের সম্পাদক নিযুক্ত হন। এবং বিবিধ গবেষণার কার্য্যে মৌলিকতা দেখাইয়া বিজ্ঞান সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকেন ১৯২১ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-এস্-সি উপাধিতে ভূষিত করেন, ১৯২৪ সনে তিনি এফ্-আর-এস্ (রয়েল সোসাইটীর সদস্য) হন; ১৯২৯ সনে তিনি জারমনীর ফ্রিবার্গের পি-এস্-ডি উপাধি পান, এবং ১৯৩০ সনে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এল্-এল্-ডি, উপাধি, রোমের ইটালিয়ান বিজ্ঞান-পরিষদ হইতে মেটেন্‌সি পদক, লণ্ডন রয়েল সোসাইটী হইতে হোগেস্ পদক এবং সুইডিন্ বিজ্ঞান-পরিষদের এই নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন।

ডাক্তার রমনের গবেষণার কার্য্যাবলী এযাবত প্রায় শতাধিক নিবন্ধে নানা ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সমুদ্রজলের বর্ণনির্ণয় সম্বন্ধে তিনি যে মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা এবং বাদ্য যন্ত্রের সুর উৎপাদন বিষয়ে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা, এবং আলোকের আণবিক প্রক্ষেপ লাভ (Molecular scattering of Light) বিষয়ে গবেষণা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শেষোক্ত বিষয়টী রমণের বিশেষ কার্য্য (Raman Effect) বলিয়া জড় বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ স্থান লাভ করিয়াছে; এবং উহাই তাঁহার নোবেল পুরস্কারের আধার।

মহাত্মা ও কবি।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী উভয়ে লোকচক্ষে মহান্। অদ্যকার এই অধঃপতিত ভারতের বিজয়ের প্রতীক, এজন্য ইঁহারা আমাদের আরও নমস্য। মহৎ লোকের চরিত্র-সমালোচনা ও কার্য্য কলাপের বিশ্লেষণ জগতের পক্ষে পরম উপকারী ও মঙ্গলদায়ক। জীবদ্দশায় তাহা হইতে পারিলে, সে উপকারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু সকল সময় তাহা হইয়া উঠে না। মহতের চরিত্র বিশ্লেষণ বা কার্য্যের সমালোচনা মহতের হাত হইতে দেখিলে তাহার মূল্য যে আরও বৃদ্ধি পায় ও সাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে তাহা বলাই বাহুল্য। সমসাময়িক মহান ব্যক্তি বিশেষের

পরস্পরের প্রতি এরূপ অনেক উক্তি অমর বাক্য হইয়া রহিয়াছে। "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহে নমস্কার" এ বাক্য অসাধারণ না হইলেও অমর পদবীর। মহাত্মা গান্ধী ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ—খুব বেশী না হইলেও পরস্পরের লক্ষ্যে কখন কখন দুই একটী উক্তি করিয়াছেন (আরও করিলে জগৎ উপকৃত হইত, সন্দেহ নাই)। তাহা অনেকের মনে থাকিতে পারে। মহাত্মার চরকাকে লক্ষ্য করিয়া কবিবর অনেক সময় প্রবন্ধও লিখিয়াছেন, অনেকের মনে থাকিয়া থাকিবে। মহাত্মা তাহা কবির উক্তি বলিয়া তখন কবিবরের কথার সমালোচনা করিয়াছেন—কবির উক্তি ও ব্যবহারিক রাজনীতির কথা স্বতন্ত্র, এইরূপ বলিবার উদ্দেশ্য। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবীয়তার সফরে বাহিরে বেড়াইতেছেন, মহাত্মা ভারতীয় রাজনীতির সূত্র-ধর বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত এবং কারাগারে আবদ্ধ। লণ্ডন সহরে গোল টেবিলের যে বৈঠক বসিয়াছে, মহাত্মা তাহাতে যোগদান না করিয়া ঠিক কার্য্য করেন নাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ এক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মার নিকট হইতে ইহার কোন উত্তর শুনিতে পাইলে সকলের প্রীতিপ্রদ হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা নাই। তদ্‌ভাবে জনসাধারণের মধ্যে ইহার আলোচনা হইতেছে ও হইবে। মানব সমাজের তাহাতে লাভ আছে।

সন্ধ্যোপাসনা

স্বায়ংভুব মন্বন্তরে ভৃগুদেব ব্রহ্মার হৃদয় হইতে উৎপন্ন হয়েন। আবার বৈবস্বত মন্বন্তরে তিনি প্রদীপ্ত অগ্নিজ্বালা হইতে উৎপন্ন হয়েন। যথা নিরুক্তে :—"অর্চিষি ভৃগুঃ সম্বভূব ভৃগুর্ভৃজ্যমানো ন দেহে।" গোপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, যিনি ভৃগুকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন তিনিও ভৃগুর ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইবেন, যথা :—যদভৃজ্যত তস্মাদ্ ভৃগুঃ সমভবৎ তদ্ ভৃগো ভৃগুত্বং ভৃগুরিব বৈ স সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ।" ঐতরেয়ও বলেন, "যদ্ দ্বিতীয়মাসীত্তদ্ ভৃগুরভবত্তং বরুণো ন্যগৃহ্ণীত তস্মাৎ স ভৃগুর্বারুণিঃ।" মহাভারত ইহাই বলিয়াছেন, যথা—"ব্রহ্মাণো হৃদয়ং ভিত্ত্বা নিঃসৃতো ভগবান্ ভৃগুঃ।"

বসিষ্ঠও স্বায়ংভুব মনুর অযোনিজ পুত্র। বসিষ্ঠের কৃপা না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বামিত্রের মত তপস্বীও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। এই বিশ্বামিত্রই গায়ত্রীর ঋষি। মহাভারত তার স্বরে শিক্ষা দিয়াছেন—"ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতি ভৃগো পরিকীর্ত্তনেন বীর্য্যং বিবর্দ্ধতি বসিষ্ঠোনমোনতেন।" সুতরাং ভৃগু বসিষ্ঠাদি প্রজাপতি ব্রাহ্মণের কৃপা না হইলেও তাঁহাদের স্বরূপ বুঝিয়া তাঁহাদের প্রতি ভক্তিমান হইতে না পারিলে দ্বিজ-জাতির উপাসনা পদ্ধতি বুঝিতে পারা যায় না।

উপাসনা না করিলে হৃদয়াসন পবিত্র হয় না। সন্ধ্যা, পূজা, জপ, হোম প্রভৃতি যাহা কিছু আচরণ সকলেরই উদ্দেশ্য মনকে পবিত্র করা। মন পবিত্র না হইলে সে মনে ভগবানের অধিষ্ঠান হয় না। গৃহের মধ্যে যদি ছেলেরা বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া রাখে এবং সেই অবস্থায় কোন ভদ্রলোক সেইখানে আগমন করেন তবে যেরূপ আমরা সেই ভদ্রলোককে সে গৃহে বসিতে বলিতে পারি না—তিনি বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান, তদ্রূপ হৃদয় পবিত্র না হইলে ভগবান সেখানে আসন গ্রহণ করেন না, বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া চলিয়া যান। সন্ধ্যা বন্দনাদির উদ্দেশ্যই হৃদয়ের পবিত্রতা আনয়ন চেষ্টা। উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইলে—কার্য্যের কোন ফল হয় না।

যাবতীয় হিন্দুশাস্ত্র বেদ হইতে উদ্ভূত। বেদের জননী গায়ত্রী। আবার গায়ত্রীই সন্ধ্যার প্রাণ; গায়ত্রীই সন্ধ্যার সার। সুতরাং গায়ত্রীতে বেদ বীজরূপে নিহিত। উপন্যাস ও অনুক্রমণিকা সহ তত্ত্বনিচয় যেরূপে হিন্দুশাস্ত্রে গ্রথিত তদ্রূপ এই গায়ত্রীর উপাসনা কতকগুলি অনুবন্ধ ও পরিশিষ্টের সহিত সন্ধ্যাতে গ্রথিত। প্রত্যেক জিনিষেরই মোটা গঠন ভেদ করিয়া তবে সার পদার্থে উপনীত হওয়া যায়। সন্ধ্যা কার্য্যেও গায়ত্রীতে উপনীত হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি খোলস অতিক্রম করিতে হয়। সন্ধ্যার প্রক্রিয়া ঠিক এই সনাতন প্রণালীতে ব্যবস্থিত। সমস্ত বিশ্বের সমষ্টি ব্যাপার চিন্তা করিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর পর্য্যায়ে মনকে নীত করিবার ব্যবস্থা এই সন্ধ্যোপসনায় উপদিষ্ট হইয়াছে। তার পর ব্যষ্টি বিশ্বে আসিয়া গায়ত্রীতে উপনীত হইতে হয়। আবার পরিশিষ্টের ন্যায়—অনন্ত বিশ্বে মিশিয়া যাইতে হয়। হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্যই অধিরোহণ ও অবরোহণ প্রথায় অনিবার্য্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সেই চেষ্টাতেই হিন্দু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকর্ম্মে দৃঢ়রূপে বদ্ধ-পরিকর। তাই তার ধর্ম্ম তার কর্ম্ম—তার তত্ত্ব ভেঙ্গেও ভাঙ্গে না—যেয়েও যায় না। কি যে শক্ত বাঁধন তাহা ব্রহ্মচর্য্যহীন ও ক্ষীণ মেধাবান মানবের চিন্তার অতীত।

শাস্ত্রে কথিত আছে—“নিত্যং নিত্যং ত্রিসন্ধ্যাঞ্চ করিষ্যতি দিনে দিনে। মধ্যাহ্নে চাপি সায়াহ্নে প্রাতরেব শুচি সদা। সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু। যদহনা কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফল ভাগ্ ভবেৎ।” শুচি হইতে হইবে, সন্ধ্যা করিতে হইবে। শুচি না হইলে কিছুই ফল হইবে না। আচার এই জন্য ধর্ম্মের মূল—এ কথা হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন। আচার রক্ষাই ধর্ম্ম রক্ষা। আচার রক্ষায় ক্লেশ আছে বটে, কিন্তু ক্লেশ বিনা সামান্য জিনিষও লাভ করা যায় না। তবে হৃদয়ের বা মনের পবিত্রতা লাভ করিতে অবশ্যই ক্লেশ স্বীকার করিতেই হইবে। লোকে না বুঝিয়া ধৈর্য্যের অভাবে উপাসনাকে মনগড়া একটা আয়োজন মনে করেন। মনীবের উপাসনায় আমরা কত পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করি, কত সাবান লাগাই, কত পাউডার মাখি, কত রকমে চুল গোঁফ কাটি,—কিন্তু মনীবের মনীবকে, রাজার রাজাকে, সম্রাটের সম্রাটকে উপাসনা করিবার জন্য মনকে বা হৃদয়কে একটুও পরিচ্ছদ দিই না—তাতে একটু সাবান লাগাই না। কাজেই শুধু মালা জপিয়া বা কোসাকুসী নাড়িয়া তাঁহার প্রসাদ প্রাপ্ত হইল না। দোষ তাঁহার না আমাদের।

ভেঁজাল জিনিষ সেখানে চলে না। সেখানে কেন, হিন্দুর কোন কার্য্যে, কোন সদনুষ্ঠানে, কোন উপাসনা পদ্ধতিতেই ভেঁজাল নাই। ভেঁজাল জুটিয়াই ত আর্য্যের ধর্ম্ম আজ কণ্ঠগতপ্রাণ হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মের মেরুদণ্ড আজ ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়াছে। ভূভারহারীর দয়া ভিন্ন এই রোগের বৈদ্য নাই। সেই বৈদ্যনাথ ভারতকে দয়া করুন।

এখন ঘোর কলিকাল। এ কালে অব্যভিচারিণী বর্ণাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রমত আচরিত হইতে পারে না। সে একনিষ্ঠতা সে পবিত্রাচার এখন লাভ করা অসম্ভব। অহংকার-লব্ধ সংকীর্ণ দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া যদি আমরা শাস্ত্র ব্যবস্থার সদর্থ লাভে যত্নবান হই, তবে পূর্ব্বোক্ত কথা গুলির সত্যতা উপলব্ধি হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—“অশ্রদ্ধালোরবিশ্বাসো নোদাহরণ-মর্হতি। শ্রদ্ধালোরেব সর্ব্বত্র বৈদিকেষ্বধিকারতঃ। আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রঃ ন বেদফলমশ্নুতে।” অবিশ্বাসের সহিত অশ্রদ্ধার সহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যদি ফল না পাওয়া যায়, তবে তাহাই দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কেন না বেদোক্ত কার্য্যে প্রথম প্রয়োজন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া বিধিমত সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া যদি ফল না পান, তখন এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিলে শুনা যাইতে পারে। বেদ, স্মৃতি, ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য, এসব মানিব না, এসব কল্পিত আখ্যায়িকা ভাবিব,—আর প্রমাণ ভাবিব আমার মত অনানুষ্ঠানিক রামা ও শ্যামার মুখের কথা। বেশ যুক্তি বটে। মুনি ঋষিগুলি কল্পিত—এ না ভাবিয়া রামা ও শ্যামাকে কল্পিত জীব ভাবিলে বোধ হয় সহজেই এই কচকচির শেষ হইয়া পড়ে।—ভার্গব।

মানব সাধনার ভিত্তি ও জাতীয় শিক্ষা

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, এটর্ণী কলিকাতা হাইকোর্ট

আজ কতক বৎসর ধরিয়া এদেশের বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষা ও তাহার পরিণাম দেখিয়া অনেকের মনে অসন্তোষের সঞ্চার হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষার নৈতিক দুর্গতি দেখিয়াই প্রধানতঃ এই অসন্তোষের উৎপত্তি এবং সেই জন্যই এ শিক্ষাপদ্ধতির স্থানে কোন জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু তারও কোনও স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে না। যত দূর বুঝা যায় তাহাতে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় প্রকর্ষ (culture)এর মৌলিক নীতির যে পার্থক্য তাহার কোনও সুস্পষ্ট ধারণা না থাকাই এই গোলযোগের প্রধান কারণ। পাশ্চাত্য—ইউরোপ—নিজেই এক্ষণে আপন প্রকর্ষের উপর বীতারাগ হইয়া উঠিয়াছে; বিগত মহাসমরের পর হইতে এই অসন্তোষ আরও তীব্ররূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সময় আসিয়াছে যখন আমাদের দেখিতে হইবে কোন্ স্থানে ভারতের প্রকর্ষ ও সাধনা পাশ্চাত্যের আদর্শ হইতে পৃথক; এবং জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাদের কোন্ আদর্শের উপযোগ এক্ষণে অধিক।

শিক্ষার কার্য্য দুইটী:—(১) লোকের বিভিন্ন শক্তি ও প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধন; (২) জগতের বিভিন্ন তথ্য ও ঘটনা—যাহা লোকের জীবনে উপকারে আসিতে পারে—তাহার জ্ঞান দান। এ দুই উদ্দেশ্যই সুসাধিত হওয়া একান্ত আবশ্যক; এবিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কিন্তু কি প্রণালী বা পদ্ধতিতে এই মানব-বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে, এবং কোন্ শ্রেণীর বা প্রকৃতির ঘটনার তথ্য অর্জ্জন করিতে হইবে,, এ বিষয়ে বিস্তর মত-ভেদ আছে। কেন এই মতভেদ হয়, তাহারও অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমতঃ ইংরেজী 'শিক্ষা' বা education কথাটীর দিকেই মন দেওয়া যাউক; ইহার মৌলিক অর্থ দুইটা ল্যাটিন কথা হইতে উদ্ভূত—(e = *out* + ducere = *to lead to*), যাহার সাধারণ অর্থ—'কোনও দিকে লইয়া যাওয়া।' প্রাচীনেরা ইহার অর্থে যাহা বুঝিতেন তাহা বোধ হয় এই:—মানব প্রকৃতির যে উৎকর্ষ সাধনে ভগবদ্‌সান্নিধ্যে নীত হওয়া যায়—Drawing out one's faculties that they might lead to God—তাহাই শিক্ষা; এজন্য দেখা যায় যে পূর্ব্বকালে সর্ব্বত্র ধর্ম্মগত শিক্ষা ও অধ্যয়নের উপরই গুরুত্ব স্থাপন করা হইত। ভারতবর্ষে কার্য্যতঃ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য উহাই ছিল। ভারতের লোকেরা শিক্ষার দ্বারা সর্ব্বকালের জন্য আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি বা সকল অসুখের অবসান চাহিতেন; আর তাহার উপায় ভগবানে আত্মনিমজ্জন—তাহাই বেদান্তমতে ব্রহ্মতত্ত্বে আপন একত্ববোধ। ইউরোপে লোকের ব্যক্তিগত জীবন ও সাধারণ চিন্তাধারায় যেদিন হইতে ধর্ম্ম-যাজক দিগের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে, সেদিন হইতে শিক্ষার সেই আদর্শও (যাহা ছিল ভগবতুন্মুখীন করা) অলক্ষিতভাবে ক্রমে গৌণ স্থান অধিকার করিয়াছে। পাশ্চাত্যের বর্ত্তমান শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে—লোকের বৃত্তিসমূহকে এমন ভাবে বাড়াইয়া তোলা যাহাতে সে ঐহিক জীবনে উপযুক্ত

রূপে সুখ-লাভের অধিকারী হইতে পারে। ভারতবর্ষের বিদ্যালয় সমূহে এক্ষণে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, দেশে বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম্ম পদ্ধতি বিদ্যমান বলিয়া, তাহা আর ধর্ম্মের লক্ষ্যে পরিচালিত হইতেছে না। কাজেই বর্ত্তমান নব্য যুবকদিগের জীবন বা চিন্তাধারার মধ্যে ধর্ম্মের প্রভাব সম্পূর্ণরূপেই তিরোহিত হইয়াছে। ইউরোপের অবস্থা কিন্তু ঠিক্ এইরূপ নহে। সেখানে খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রভাব এখনও সমাজের উপর অল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়—যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা তাহা অনেক পরিমাণে কম। প্রাচীনেরা মনে করেন, আধুনিক যুবকসম্প্রদায়ের নৈতিক অবনতি তাহাদের শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে ধর্ম্মভাবকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা হইয়াছে বলিয়াই উৎপন্ন হইতেছে। বর্ত্তমান যুবক সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তিও অন্যরূপ। তাহারা মনে করে, এইরূপে ধর্ম্মভাব বর্জ্জন করা সুবিজ্ঞতারই কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষার এইরূপ বিপরীত অর্থ মানিয়া লইলেও (যাহার উদ্দেশ্য লোককে এই জীবনসংগ্রামের জন্য উপযুক্ত করিয়া তোলা মাত্র), এই তর্ক উঠা স্বাভাবিক যে,—এই জীবনই বা কতদিন স্থায়ী থাকে—মৃত্যুর সঙ্গে সমাধি ক্ষেত্রেই কি উহার অবসান? এই প্রশ্নের পরিষ্কাররূপে সমাধান হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রচলিত জড়বাদের মতে যদি মনে করা হয় যে, মৃত্যু বা সমাধির সঙ্গে সঙ্গেই এ জীবনের অবসান হয়, তাহা হইলে শিক্ষার সমস্যা যাহা উঠে, তাহা পরজন্মবাদমূলক মত হইতে অবশ্যই বিভিন্ন হইবে—এতদুভয়ের আসল দৃষ্টি সম্পূর্ণ রূপেই বদলাইয়া যাইবে। সৎ অসৎ—পাপ পুণ্য—মঙ্গলামঙ্গলের মৌলিক ভাবও বদলাইয়া যায়। মানব জীবনের ভবিষ্যত যাহা কিছু তাহা যদি কেবল এই ইহ জগতেই নিবদ্ধ থাকে—এবং এতদতিরিক্ত পরজীবনের কোনও কথা না ধরা যায়, তবে তাহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র দৃষ্টিশক্তিরই পরিচয় দেয়। জাগতিক অনেক ব্যাপারই পূর্ব্বে ঐশ্বরীয় শক্তিতে আরোপ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইত; আধুনিক জড়-বিজ্ঞান তাহার অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়া আসিতেছে; বুঝিয়া হউক্ বা না বুঝিয়া হউক্, তাহাতেই প্রণোদিত হইয়া আজ কাল অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরজন্মে বিশ্বাস হারাইয়াছে এবং এই আশাতে উৎফুল্ল হইতেছেন যে, এই জড়-বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হইলে, তাহারা জাগতিক প্রত্যেক বিষয় এই জড় বিজ্ঞানদৃষ্টিতে ব্যাখাত করিতে পারিবেন—পর জীবনের বিশ্বাস রাখিবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নাই এ কথা প্রমাণ করিতে পারিবেন; এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম মতে সৃষ্টিতত্ত্ব ও মনুষ্যের জন্মগত পাপ সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা আছে তাহারও দূরীকরণ করিবেন। মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপের নবীন যুক্তিমূলক চিন্তাধারায় এইরূপ জড়বাদমূলক বিচারের প্রসার সাধন হইয়াছিল। ভারতীয় সাধনায় পাপপুণ্যের যে সমাধান করা হইয়াছে, অনন্তকালব্যাপী জীবনও পরজন্ম-পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত আছে—তাহাতে কর্ম্মবাদের দ্বারা সেই সকল প্রশ্নের অতি উৎকৃষ্ট মীমাংসা রহিয়াছে। আর আজ পর্য্যন্ত জড়বিজ্ঞানের যে উন্নতি সাধন হইয়াছে, তাহাতে এই সকল ভারতীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু ত প্রমাণিত হয়ই নাই, বরং তাহাতে উহার সমর্থন ও শক্তিবৃদ্ধিই হইতে পারে—জড়বিজ্ঞান জীবনী-শক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনও কারণ দর্শাইতে পারে নাই; এবং কেমন করিয়া এক দেহ হইতে অপর দেহে প্রাণের সঞ্চার হয় তাহা বলিতে পারে নাই; বিজ্ঞানকে স্বীকার করিতেই হয় যে জীবন আপনি আপনি উৎপন্ন হয়—উহা বিজ্ঞানের জড় (matter) বা জড়-শক্তি (energy) হইতে স্বতন্ত্র। জড়শক্তিতে কোনও নব-প্রেরণা বা আত্মানুভূতি নাই; এক কথায় জড়ের কোনও ইচ্ছাশক্তি নাই। কিন্তু জীবন এই প্রেরণা বা ইচ্ছা-শক্তির আধার—জীবন জড় ও জড়-শক্তিকে চালায়; উহার আশা আছে, ভালবাসা আছে,

সর্ব্বদা পূর্ণতার দিকে উহার লক্ষ্য। দেহের অবসান হইলে জীবন-শক্তি তাহার সহিত লয় পায়—এ ধারণা প্রকৃত বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। কারণ জীবন দেহের পরিচালক মাত্র এবং উহার স্রষ্টা। সমুদয় জীবন ভরিয়াই দেহের পরিবর্ত্তন ঘটে,—আজ যে উপাদানে দেহ গঠিত, কাল আর তাহা থাকে না; কিন্তু জীবনের অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব সারা জীবন ভরিয়া একরূপই অনুভব করা যায়; ইহাই প্রমাণ যে, জড়-দেহ হইতে জীবন স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান এখন আবিষ্কার করিয়াছে যে, জড়শক্তি (energy) অবিনাশী; জড় অবিনাশী (indestructible); সাধারণ চক্ষে ইহাদের বিনাশ পাইতে দেখা গেলেও, বাস্তবিক উহা এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিবর্ত্তন মাত্র। এরূপ ধরা যাইতে পারে যে,জড়ের এই অবস্থার সমান্তরালে জীবনও তুল্যরূপেই অবিনাশী। বাহ্যতঃ উহার বিনাশ দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তাহার বিনাশ নাই—অন্য কোনও ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। বিজ্ঞান একথা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না যে, কোনও দেহের সহিত যে জীবন কতক কালের জন্য একত্র সিম্মিলিত আছে, সেই দেহে তাহার ক্রিয়া দেখা না গেলেই ঐ জীবনীশক্তির অস্তিত্ব একবারে লোপ পাইল। পক্ষান্তরে আজ অনেক সুধী সমাজে এই তথা-কথিত মৃত্যুর পরে, কাহারও কাহারও জীবনের সেই আকাঙ্ক্ষা, সেই প্রেরণা ও সেই জড়-শক্তিকে নিজ প্রয়োজনে লাগাইবার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমেরিকা ও ইউরোপের "সাইকিক্যাল রিসার্চ্চ সোসাইটী" বা মনস্তত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা-সমিতিগুলির প্রচেষ্টাতে আজ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে স্যর উইলিয়ম ক্রুকস্, ক্যামিল ফ্লাম্‌মেরিয়ান, ডাঃ ল-ব্রসো প্রভৃতি অতি বড় খ্যাতনামা সন্দিগ্ধচেতা বিজ্ঞানবিদেরও মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে; তাহারা এক্ষণে মরণের পর জীবনসত্তায় বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এতদতিরিক্ত পাশ্চাত্যদেশে আর একটী জ্ঞানানুসন্ধানের আভাস পাওয়া যাইতেছে, যাহা উহাদের পক্ষে সম্পূর্ণই নূতন—উহা যোগের দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের পথ, যে জ্ঞান সংস্কার-বর্জ্জিত মন বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত অন্য একটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পাওয়া যায়।

হিন্দুরা পরজন্ম ও পূর্ব্বজন্মে চিরকাল বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। জড়শক্তি যদি অবিনশ্বর (indestructible) হয়, জড়বিজ্ঞানবাদীগণ যখন ইহা মানিয়া লইতেছেন—তখন জীবনশক্তিকে কেনই বা অবিনশ্বর বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইবে না? কিন্তু হিন্দুদিগের এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংস্থাপিত—তাহারা মনে করেন যে, জড়জগত যেমন নিয়মের দ্বারা পরিচালিত—অনিয়মে কিছুই চলে না,—সেইরূপ মনুষ্য জীবনের সকল ঘটনাই কর্ম্মের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হিন্দুগণ বিশ্বাস করে না (এবং এরূপ বিশ্বাস করা অবৈজ্ঞানিক বলিয়া মনে করে) যে, জীবনের কোনও ঘটনা বিনা নিয়মে ও বিনা কারণে ঘটিতে পারে—সংসারে দেখা যায় কেহ জন্ম হইতে অন্ধ বা কুষ্ঠরোগগ্রস্থ, কেহ দীনহীন ভিক্ষুক, কেহ বা লক্ষপতি অপার ধনের অধিপতি; ইহা কোনও অদৃষ্ট দেবতার খাম খেয়ালী নয়। অথবা পিতার দোষ নির্দ্দোষ পুত্রে আসিয়া বর্ত্তে এ ধারণাও হিন্দুর নাই। এ সমুদয়ই কর্ম্মফল—জড় জগতের প্রত্যেক ঘটনা যেমন জড় নিয়মের অধীন, মানব জীবনের সকল ঘটনা তেমনই কর্ম্মের নিয়মে পরিচালিত। এই কর্ম্ম-নিয়মের আবিষ্কারে ভারতের সাধনা সমগ্র মানবের চিন্তা ধারায় যে বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছে, তাহা অতুলনীয়। আর ভারতের সাধন-ধারার সকল বিষয় ও ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণই এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংস্থাপিত। হিন্দুর-জীবন,হিন্দুর চিন্তা ও হিন্দুর সাধনা এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সংগঠিত। সমুদয় হিন্দু-জীবনের চির-প্রসিদ্ধ

বিশ্বাসশীলতা, সততা, বদান্যতা, সর্ব্বভূতে দয়া, পিতৃঋণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ঋণ-পরিশোধের ঐকান্তিক ব্যগ্রতা—প্রভৃতি গুণ গুলি যাহা প্রাচীন হিন্দুচরিত্রে বদ্ধমূল ছিল এবং যাহা দেখিয়া প্রাচীন গ্রীক, চীনীয় প্রভৃতি বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ প্রভূত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোনও রাষ্ট্রনিয়ম বা রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থাপ্রসূত ছিল না। পরন্তু এ সমুদয় এই পুনর্জন্মবাদ ও কর্ম্মফল বাদেরই সুফল। প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারায় বরং নিরীশ্বর বাদের স্থান আছে—বৌদ্ধ ও অন্য অনেক মতবাদে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরজন্ম-পূর্ব্বজন্ম এবং কর্ম্মবাদে বিশ্বাস ব্যতীত এখানে কেহ কখনও কোনও মত পোষণ করেন নাই। হিন্দুভারতে আচার ব্যবহার বিভিন্ন, বিভিন্নস্থানে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরও বিদ্যমান; অন্য বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যেরও সীমা নাই; কিন্তু এ সকল বিভিন্নতা ও পার্থক্যের অন্তরালে যে ঐক্যের বন্ধন রহিয়াছে, তাহার মূলসূত্র এই কর্ম্মবাদ ও পুনর্জন্ম বাদে। আজ চতুর্দ্দিকে যে দুর্নীতির প্রসার বাড়িয়াছে, যে অশ্রদ্ধার ভাব ও অধর্ম্ম সর্ব্বত্র মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করে, এ সমুদয়ই, একালে যে ভারতীয় সাধনার এই মৌলিক ভিত্তির উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে তাহারই বিষময় ফল। বিবাহকালে এখনও আমরা পিতৃপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি,—পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিতে আমরা শাস্ত্রানুসারে বাধ্য—এ সমুদয় বিষয় আমাদের আত্মার অমরত্ব জ্ঞাপন করে। লোকের বিশ্বাস যখন এ সকল বিষয়ে অটল ছিল—আজও যেমন আমাদের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তাহা অনেকটা আছে—তখন তাহাদের ব্যবহারের সততা আপনিই রক্ষা পাইত—লিখিত চুক্তিপত্র বা সাক্ষী সাবুদের প্রয়োজন হইত না। তখন লোকে বিশ্বাস করিত যে, যদি তাহাদের কর্ম্ম ও ব্যবহার নিখুঁত ভাবে সৎ ও সঙ্গত না হয়, যদি তাহারা কোনও অন্যায় করে, তবে তাহার প্রত্যেক অপকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; কি মানুষ কি ইতর জন্তু কাহারও প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার কেহ করিত না; কারণ তাহারা জানিত যে, এরূপ করিলে তাহাদের ভবিষ্যতে বিপদ আছে, ভবিষ্যৎ জীবন এ জীবন হইতে দীর্ঘতর; ইহ জীবন পরজীবনের তুলনাতে ক্ষণকাল স্থায়ী মাত্র। যাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিবে, তাহাদের নিকট সেই অন্যায়ের প্রতিকার স্বরূপ অনেক কিছু করিতে হইবে। এইরূপ প্রতিকারের কার্য্য ঋণ বলিয়া কথিত হইত,—সে ঋণ চক্রবৃদ্ধি হিসাবে সুদ সহ পরে পরিশোধ করিতে হইবে—তাহা হইতে কিছুতেই অব্যাহতি নাই, তাহা এড়াইবার উপায় নাই, তাহাতে কোনও সময়ের মেয়াদ নাই। লোক ব্যবহারের এই ন্যায়পরতা, সততা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা যে কেবল মাত্র আইনকানুন, ধর্ম্ম ও লোক মতের অনুকূল ছিল তাহা নহে, যুক্তি বিচার ও বুদ্ধিকৌশলেও তাহা সমর্থন পাইত—যে বুদ্ধিকৌশল আজ আইন আদালতে সর্ব্বদাই লোকের দায়িত্ব এড়াইবার নানা ওজুহত খুঁজিয়া বেড়াইতেই ব্যস্ত। এ সকল দ্বারা তখন ধর্ম্ম ও উচ্চনীতির পরিপোষণ হইত।

দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন আত্মানুরাগ ও বিশ্ব প্রেম পরিণামে একই বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। দুর্নীতি নির্ব্বোধেরই কাজ। অপরকে দুঃখদুর্দ্দশায় ফেলিয়া নিজের যে মহত্ত্ব লাভ বা বড় হওয়া—কলে বলে কৌশলে অপরের উপরে আধিপত্য করা (অদ্য যাহা প্রতিনিয়ত হইতেছে ও যাহার প্রশংসাও শুনিতে পাওয়া যায়)—এ সকল আরও গভীরতর অধঃপতনের সূচনা করে মাত্র; এজন্য অনেক দুঃখ ভোগ ও অনুতাপ করিতে হইবে। আজ যে লোকে অপরের বিষয়ে কিছুমাত্র না ভাবিয়া কেবল আত্মসুখ ও আত্মক্ষমতা লাভের নিমিত্ত উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়াছে, সম্মুখে যাহা কিছু

মাত্র স্থান আছে বা থাকিতে পারে, তাহাকে ঠেলিয়া বা পদদলিত করিয়া চলিয়াছে, এবং যে সকলকে মারাইয়া আগুয়ান হইয়া যাইতেছে তাহার উন্মাদনা পূর্ণ জয়োল্লাস ধ্বনিতে জগৎ পরিপূরিত হইয়া যাইতেছে, এবং যাহাতে সংসারের দুঃখ যাতনা শত গুণ বৃদ্ধি পাইয়া যাইতেছে —কর্ম্মবাদে বিশ্বাসবান ব্যক্তির নিকট এসমুদয়ই বন্ধ হইয়া যায়। তাহার নিকট অপরকে কষ্ট দিয়া নিজের বড় হওয়া, আর আপনাকে সুদৃঢ় ঋণ-জালে আবদ্ধ করা একই কথা—সে ঋণ মৃত্যুর পরে আপন কর্ম্ম ও যাতনার কড়িতে পরিশোধ করিতে হইবে। এই ভাবে প্রত্যেক লোকে ইহ জীবনে একটা জমাখরচের হিসাব রাখিয়া যাইতেছে—চিত্রগুপ্তের ব্যাঙ্কের খাতায় সে হিসাব থাকিয়া যাইতেছে। প্রত্যেক অন্যায় কার্য্য, প্রতি নির্দ্দয়তার কর্ম্ম, প্রতি ঔদ্ধত্য ও আধিপত্যের কর্ম্ম, ছলে বলে কৌশলে পরস্বাপহরণের কর্ম্ম প্রভৃতি প্রত্যেকের খরচের ঘরে লেখা থাকে—আর প্রতি পরোপকারের কার্য্য, দয়া দাক্ষিণ্যের ও অপরের প্রতি বদান্যতার কার্য্যসকল জমার হিসাবে লিখিত হয়। এ সকলেরই দেনা-পাওনা ঠিক্ ঠাক্ রূপে করিতে হইবে। ফলে স্বার্থ ত্যাগ, আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা প্রভৃতি অতি উচ্চ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্বার্থেতেই পরিণত হয়। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য নীতি-শাস্ত্রে গরিষ্ঠ সংখ্যক লোকের অধিকতম সুখ (greatest good of the greatest number) বলিয়া যে জনহিতবাদ, স্বদেশপ্রেম, (patriotism) সমাজ-সেবা (social service) জনমতপ্রাধান্য, good opinion) প্রভৃতি কথা প্রচলিত আছে, তাহাতে লোকের স্বার্থপরতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির রোধ করিতে পারে নাই। কারণ মতবাদ যতই সুন্দর ও সুশ্রাব্য হউক্ না কেন, ইহাদের মূলে যে জড়বাদের ভিত্তি রহিয়াছে, তাহাতে সকলেই মনে করিবে—যেমন ফরাসী রাজ ১৪শ লুই বলিয়াছিলেন—"আমার পরেই জগতে প্রলয় আসিবে"—সুতরাং ভবিষ্যতের চিন্তার প্রয়োজন নাই। জীবনের যদি ইহলোকেই পরিসমাপ্তি হইল, তবে আর অপরের জন্য চিন্তা করিব কেন ?—যদি অনায়াসে অপরের স্বার্থ পদদলিত করিয়া নিজে কিছু লাভ করিয়া লইতে পারি তবে তাহাই বা করিব না কেন ? অপরের জন্য কিছুমাত্র স্বার্থ ত্যাগেরই বা প্রয়োজন কি ? যদি ক্ষমতা থাকে ও নিজের ইচ্ছা হয়, তবে রোমক সম্রাট নিরোর মত গর্ভবতী স্ত্রীর উদর বিদীর্ণ করিয়া দেখিয়াই বা লইলাম, গর্ভাবস্থায় শিশু কিরূপ ভাবে থাকে !— বর্ত্তমান জড়বাদে এসব কিছু আটকায় না। আর এ অবস্থায়ই আমরা এক্ষণে ক্রমে পরিচালিত হইতেছি। চতুর্দ্দিকে কি দেখা যাইতেছে না যে, কূটনীতিজ্ঞ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রপরিচালকগণ রাজনীতির নামে, মিথ্যা চাতুরী প্রবঞ্চনার জালে পরস্পর পরস্পরকে আবদ্ধ রাখিতে বা একে অপরকে অতিক্রম করিয়া যাইতে ব্যস্ত— আপন দেশ বা আপন দলের স্বার্থ ও সুবিধা মাত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে ! আর এ সকল কার্য্যে যাহারা বেশী চতুরতা ও কৌশল দেখাইতে পারে তাহাদেরই গগণভেদী প্রশংসা উঠে ! বিজ্ঞান-বিদেরা মাথা ঘামাইয়া কেমন করিয়া মনুষ্যের ধ্বংস সাধনের কল কব্জা তৈয়ারী করিবেন তাহাতে ব্যস্ত ! যে সেনানায়কগণ কৌশল করিয়া নিজপক্ষের অল্প সৈনিকের বিনাশ দ্বারা অপর পক্ষের অধিকাংশ সৈন্যের বিনাশ সাধন করিতে পারেন, তিনিই বড় বীর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ! বণিক ও দোকানদারগণ ভেজাল জিনিষ খাঁটি বলিয়া চালাইয়া কেমনে অধিক লাভে লাভবান হইবে, তাহাতে ব্যস্ত, ভেজালে সহস্র সহস্র লোকের জীবন ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, তাহাও তাহারা গ্রাহ্য করিবে না ! বিজ্ঞাপনের চাক্‌চিক্যে অতি কদর্য্য ও নিকৃষ্ট জিনিষও বাজারে চলিতেছে ! ধনপতি

ও কলকারখানার অধিপতিগণ গরীব শ্রমিকদিগের দ্বারা যথেষ্ট কাজ করাইয়া ও তাহাদের পশুর ন্যায় অধম অবস্থাতে রাখিয়া নিজেরা লাভের চূড়ান্ত করিয়া লইতেছে এবং ঐশ্বর্য্যমদের প্রতিযোগিতায় মত্ত হইয়া চলিয়াছে ! প্রকৃত হিন্দুর দৃষ্টিতে এ সকল বিষবৎ লাগে।

এ সমুদয়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, যদি লোকের পরজন্ম ও কর্ম্মবাদে জাগ্রত বিশ্বাস থাকে। এবং প্রাচীন ভারতে যেমন সর্ব্বত্র লোকে সহাস্য ভাবে পরস্পর সন্তুষ্টভাবে চলিত—পরসেবা দ্বারা লোকের মহত্বের পরিচয় হইত, সেরূপ ভাবে জগত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কঙ্গো রাজ্যে বেলজিয়ানেরা যে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা করিয়াছে, তাহা এবং অপর আরও অনেক সভ্যতাভিমানী রাষ্ট্র পরিচালকগণের কার্য্যকারিতা বা বিষ-বাষ্পের আবিষ্কারক বিজ্ঞ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ মনুষ্য জীবন বিনাশের যে কল-কৌশল করিতেছেন তাহা—এ সমুদয়ই সে বিচারের কাছে ঠাঁই পায় না।

কর্ম্ম ও পরজন্মবাদের প্রসার লাভ করিলে, পৃথিবীর অপর স্থানে কি হইত না হইত, সে কল্পনা ছাড়িয়া, এক্ষণে ভারতে ইহার উপযোগিতা কি ছিল, তাহাই বিবেচনা করা আবশ্যক। এ কথা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায় যে, এই সকল মতবাদ যাহা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারত-ভূমিতে চলিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়া ভারতীয় জীবন প্রণালী সংগঠন করিয়া আসিয়াছে, উহা ভারতের পক্ষে অতি স্বাভাবিক—উহাই ভারতের প্রাণের পরিপোষণ করিয়াছে ও লোকের চিত্তে শান্তি দান করিতে পারিয়াছে। উহাই ভারতীয় উচ্চ নৈতিক জীবনের পক্ষে ভাইটেমিনের কাজ করিয়াছে—তাহা না পাইলে হিন্দুর জীবন ছট্‌ফট্‌ করে ও পীড়িত বোধ করে। আজ কিন্তু তাহাতে বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে !

অতি অল্প লোকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজে ভাবিয়া কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া চলিতে পারে—অধিকাংশ লোকেই গতানুগতিক পন্থা ধরিয়া চলে, আর চতুষ্পার্শ্বের যে সকল লোককে অধিকতর জ্ঞানী বা ক্ষমতাশালী বলিয়া দেখে, তাহাদিগকে অনুকরণ করিয়া চলে। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য লোকেরা আমাদের উপর আধিপত্য করিয়া বসিয়াছে। তাহারা আমাদের জাতীয় সংস্কারগত এ সকল ভাব বা সিদ্ধান্তে বিশ্বাস রাখে না। আর তাহাদের দেখাদেখি আমাদের তরুণ ও যুবকেরাও এই সকল জাতীয় ভাব ও সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করিতে শিখিয়াছে—মনে করে এ সকল পুরাকালের নির্ব্বোধদের কুসংস্কার। ইহারা পাশ্চাত্য বাসীর ঐহিক সর্ব্বস্ব জীবনের সমৃদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ ও তাহাদের কৃতকৃত্যতা দেখিয়া তাহাদিগের মোহজালে বিজড়িত হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে ভারতীয় সাধনার চিরাগত আশ্রয়ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অথচ ইউরোপীয় জীবন ও ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃত ভাব জানিবার ও বুঝিবার কোন সুযোগ না পাইয়া—এই তরুণ সম্প্রদায় এরূপ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চলিয়াছে। এজন্য এই নবীন সম্প্রদায়কে দোষ দেওয়া যায় না। এজন্য দায়ী তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষের লোকেরা। তাহারাই ভবিষ্যত বংশীয় দিগের নিকট ভারতীয় সাধনার মর্ম্ম যথোচিত রূপে বুঝাইয়া দেন নাই। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র—যাহাকে ভারতের প্রাচীন ঋষি দিগের জ্ঞানরাশির অপূর্ব্ব ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে ও যাহার উচ্চ প্রশংসা সমুদয় সভ্যজগতের লোকেরা একবাক্যে করিয়া থাকেন,—দুর্ভাগ্যবশে তাহাও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে দর্শনশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য-লিপিতে বহুদিন স্থান পায় নাই। অবশেষে একজন ইংরেজ শাসন কর্ত্তা (Lord Ronaldsay) ঐ বিষয়ে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। হিন্দুর জাতীয় শিক্ষা-

পদ্ধতি এই সমুদয় উচ্চ এবং সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, অথবা শিক্ষাপদ্ধতি এই সমুদয় তত্ত্ব স্বীকার করিয়া না লইলে, তাহা এ দেশের জাতীয় শিক্ষার নামের উপযুক্ত হইতে পারে না।

ক্রমশঃ

পুরাণ ও মিথলজি

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সাহা, এম-এ

(২)

প্রাকৃতের বুকে অপ্রাকৃতের বা অতীন্দ্রিয়ের খেলা, প্রাকৃতিক রূপকথা গুলিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। দেশ-প্রচলিত অর্দ্ধৈতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক উপাখ্যানাবলীতে মানব-জীবনে অপ্রাকৃতের ছায়াপাত, মানব-শক্তির ঈশ্বরাভিমুখে অভিযানের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। উচ্চতর প্রাণিপ্রকৃতি আর মানব প্রকৃতির সীমা নির্দ্দেশ করা যেমন কঠিন, মানব-প্রকৃতি আর দেব প্রকৃতির ভেদ-স্থাপন করাও তেমনি কঠিন। মানবের বুকে ঈশ্বরের বাস। ঈশ্বরের বুকে মানবের বাস। পরস্পর পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া থাকে। Deification এবং apotheosis প্রভৃতি কথার প্রকৃতমর্ম্ম আমরা অনুধাবন করি না। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং। মনুষ্য জীবনে ঈশ্বর ক্রীড়া করিতেছেন। আমরা মানুষ দেখি, ঈশ্বর দেখি না। বন দেখি, বনদেবতা দেখি না। মানুষ যখন অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও শক্তিলাভ করিয়া সংসারে অতি মহৎকার্য্য সম্পাদন করে, সাধারণের বিচারে অসাধ্য সাধন করে, তখন আমরা বিস্মিত হইয়া নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা করি। কেহ বলে অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে, কেহ বলে অনুকূল অবস্থার সুযোগ-সংযোগে, কেহ বলে দৈব-বলে, এই ব্যক্তি এই আশ্চর্য্য কার্য্য, এই বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছে।

অতি সত্য কথা এবং অতি মিথ্যা কথা। নিউটনের জ্ঞান, নেপোলীয়ানের দিগ্‌বিজয়, গেটের কবিত্ব, রামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্ম কার্য্য-কারণের অঙ্ক কসিয়া হিসাব করিয়া আমরা বুঝিতে চাই। তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু জড়-জগদ্‌যন্ত্র যে বিধানে চলিতেছে, শুধু সেই বিধানে সকল সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা অনুচিত। পাশব-শক্তি, মানব-শক্তি, দেবশক্তি সীমাহীন সমুদ্রের মত সর্ব্বত্র প্রবাহিয়া চলিয়াছে। জাগতিক অবস্থার বাধাবন্ধনের পরিবেষ্টন, এবং মানসিক সংশয় সন্দেহ সংস্কারাদি এবং নানাপ্রকার তামসিক দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিয়া এই শক্তি-সিন্ধু যে যে পরিমানে আত্মসাৎ করিতে পারে, সে সেই পরিমানে শক্তির অধিকারী হয়। কোনো নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত শক্তিকে আমরা মানব-শক্তি বলি। সেই শক্তিসীমা যে অতিক্রম করে তাহাকে অতিমানুষ কিংবা দেবতাদি নামে অভিহিত করিবার ইচ্ছা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে মানুষ যখন বিশেষ সচৈতন্য ছিল তখন কোনো ব্যক্তির জীবনে অসাধারণ শক্তির প্রকাশ দৃষ্ট হইলেই সুমহান্ সমুজ্জ্বল ও সর্ব্বজন বিস্ময়কর কার্য্যকলাপ সম্পাদিত হইলেই, তাহাকে লোকে দেব-শক্তি

সম্পন্ন বা দেবতাই মনে করিত। এই দেবতুল্য জন-গণের গৌরবান্বিত কর্ম্মসমূহ সর্ব্বসাধারণে জাতীয় স্মৃতি-মন্দিরে সাজাইয়া রাখে, আলোচনা করে, অনুশীলন করে, গাথা রচনা করিয়া গান করে। এই সমস্ত-কীর্ত্তিকথা লইয়া উপন্যাস রচনা করে। জাতির পারমার্থিক ধনভাণ্ডারে সঞ্চিত হইবার জন্য এই সকল অতি উৎকৃষ্ট অবদান। ইহা মানব-দেবতাগণের পার্থিব স্বর্গের ইতিহাস। ভারতীয় কাব্য ইতিহাস পুরাণাদিতে এই নরশ্রেষ্ঠ-নরোত্তম ব্যক্তিবর্গের শতসহস্র কাহিনী আছে। পুরাণের উপাখ্যানাবলী হইতে নিম্নস্তরে প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এই প্রকার শত শত কাহিনী প্রচলিত ছিল। এখন তাহা তৎতদ্দেশের মিথলজির অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে।

ইউলিসিস্ আগামেম্নন্ প্রভৃতির কথা কোনো প্রকারে বুঝিয়া উঠা যায়। কিন্তু হারকিউলিস্, একিলিস্, থিসিউস্, পারসিউস্, জেসন্ কাষ্টর পোলক্স্ প্রভৃতির কথা অতি বিচিত্র রহস্যে বিজড়িত। ইহারা মানুষ এবং দেবতা দুইই। মানব-সমাজে মানবের মতনই বাস করিয়া দেবতার মত মানবের অসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়াছে। দেবগণের সঙ্গে ইহাদের নানাপ্রকার সম্বন্ধ। হারকিউলিসের পিতা জিউস্ দেবেন্দ্র। মাতা আল্ক্মিনী মানবী! একিলিসের পিতা পিলিউস্ মানুষ। মাতা থেটিস জলদেবতার কন্যা। হারমিস্ এথিনা প্রভৃতি দেবদেবীগণের সহিত পারসিউসের জীবনে অনেক আদান-প্রদানের ব্যবহার হইয়াছিল। এথিনার নিকট হইতে পারসিউস্ একখানি স্বর্গীয় দর্পণ লাভ করিয়াছিল। এই দর্পণের সাহায্যে সে রাক্ষসী মেডুসার মস্তক ছেদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। হারকিউলিস প্রভৃতির বিস্তৃত উপাখ্যান গ্রীক উপন্যাস-সাহিত্যে অতি উজ্জ্বলভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সমস্ত উপাখ্যান আগাগোড়াই কল্পনা এই প্রকার মনে করা অসঙ্গত। ইহারা সত্যকার মানুষই ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করা অনুচিত। দেবোপম মানুষ। যুগ যুগ ধরিয়া ইহাদের বিস্ময়কর ইতিহাসের উপর নানাবর্ণালোকময়ী কল্পনার খেলা চলিয়াছে। ইতিহাস মিথলজিতে পরিণত হইয়াছে। মিথলজি হইতে লৌকিক উপন্যাস রচিত হইয়াছে।

এই সমস্ত কাহিনী প্রকৃতপক্ষেও উজ্জ্বল মানব-জীবনের মধ্য দিয়া দেবলোকের দৃশ্য দেখিবার চেষ্টার ইতিহাস। নর-জীবনে নারায়ণের প্রতিবিম্ব। সংসার-সংস্কারের কলঙ্কযুক্ত অবশ্য! কিন্তু তবু পার্থিবের অপার্থিব-পথে বিজয়-যাত্রা। ইহা অবহেলার বিষয় নয়। বালকের পাঠযোগ্য নয়। জ্ঞানিগণের অনুশীলনের যোগ্য। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই প্রকারেরর যত উপাখ্যান আছে, পরবর্ত্তীযুগের হইলেও, প্রাচীন ব্রিটনের রাজা আর্থারের উপাখ্যানাবলী তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সব উপাখ্যানের একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল। আর্থার ব্রিটিশ বীর। স্যাক্সনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইয়াছিলেন। এবং দেশের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ৫২০ খৃষ্টাব্দে বেডেন নামক স্থানে ইনি দুর্দ্দান্ত স্যাক্সন বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া সুমহান গৌরবলাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টানবীরের পেগান বর্ব্বরদিগের সহিত সংগ্রাম ও বিজয়—এইটুকু ইতিহাস। কালে কালে এই আর্থার ব্রিটেনবাসিগণের ভক্তিশ্রদ্ধাত্মিকা কল্পনায় একজন ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনকারী অবতার পুরুষের পদে উন্নীত হইয়াছেন। আর্থারের প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধনীতিধর্ম্মে দীক্ষিত বীর-প্রতিষ্ঠানের বীরগণের যে সমস্ত কাহিনী, তাহার অধিকাংশই উপন্যাস। কিন্তু আর্থারের সুমহতী প্রতিভার আলোকে এই কাহিনীগুলি আলোকিত। আর্থারেরই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। স্ফুট কিংবা অস্ফুটভাবে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে যে ঈশ্বরের মহিমা জাগিয়া থাকে সেই মহিমার জ্যোতি

একটী বীর চরিত্রের উপর পতিত হইয়াই আর্থার নামক দেবতুল্য নৃপতি-জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে। সত্যকার আর্থারের জীবনেও কিছু কিছু অলৌকিক ব্যাপার ছিল। আর্থার একজন অনন্তসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। ইহা নিশ্চিত। দেবশক্তির প্রকাশ আর্থারে কিছু ছিল। তাহাই শ্রদ্ধাবান লোকসকলের কল্পনায় প্রস্ফুটিত হইয়া এতবড় একটী ব্যাপার সৃজন করিয়াছে।

(৩)

মানবের জ্ঞান-রাজ্যে রূপকোপাখ্যানের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। রূপকথা, সাহিত্য, নীতিধর্ম্ম, মিথলজি-পুরাণ এবং সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বত্র রূপকের ব্যাপার। কখনো অভিব্যক্ত, কখনো ব্যঞ্জিত, কখনো আভাসিত, কখনো গুপ্ত। মানুষের ভাষা রূপক। সাহিত্য রূপক। মানব-জীবন রূপক প্রবাহ। ঈশ্বরের সৃষ্টিলীলা প্রকৃত পক্ষে রূপকাখ্যান। বিশ্ব-সংসার একটী প্রকাণ্ড মেটাফর। রূপকের উদ্দেশ্যেই জ্ঞানপূর্ব্বক রচিত যে রূপকোপাখ্যান এখানে তাহারি কথা বলিতেছি। মিথলজিতে সর্ব্বত্রই প্রচ্ছন্ন রূপকের ব্যাপার সে কথা এখানে বলিব না। মিথলজির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে বিগুমান যে পরিস্ফুট রূপক তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিবার আছে। রূপক কথাটীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। রূপক মিথ্যা কল্পনা নহে। 'সুন্দর' এই কথাটীতে একটী ভাব বা আইডিয়া অভি-ব্যঞ্জিত হইতেছে। তাহা যে কি ধরিতে পারিতেছি না। একজন বলিল শতদল। অমনি সেই ভাব রূপ হইল। সুচারু রূপক হইল। একজন বলিল ময়ূর। দেখিলাম অন্যরূপ। আবার ইন্দ্রধনু। এও রূপ। রমণীয়া রমণী। গিরি তরঙ্গিণী! সমস্তই সুন্দর। একটী ভাব নানারূপে প্রকাশিত হইল। শুধু তাই নয়। ঐ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শতদলটীর ও একটী ভাব-রূপ, একটী নিত্যরূপ আছে। ময়ূরটী মরিয়া যাইবে। একটী নিত্য অদৃশ্য ময়ূর থাকিবে। এই ময়ূরের জন্মের পূর্ব্বেও তাহা ছিল। ডিমের মধ্যে কি একটী ময়ূর ছিল না? যাহা নাই তাহা হয় না। 'না সতো বিদ্যতে ভাবঃ'। প্রত্যেক কার্য্য-বস্তুরই কারণ তত্ত্ব আছে। ভাব মাত্রই, তত্ত্বমাত্রই কোনো রূপের মানস-ছায়া কিংবা কোনো নিত্যরূপমূর্ত্তির অঙ্গবিশেষ। বিশ্ব রূপময়। বিশ্ব-কারণও রূপময়। আছে বলিয়াই আসে এবং যায় এবং আসে। রূপের সাধনাই প্রকৃত সাধনা। রূপ দর্শনই সত্য দর্শন। অনিত্য রূপে মুগ্ধ না হইয়া নিত্য রূপের সন্ধান করিতে হইবে। বাহিরে রূপ আছে, অন্তরে রূপ নাই; অনিত্যে রূপ আছে, নিত্যে রূপ নাই—এই সাংঘাতিক কুসংস্কার পৃথিবীর অনেক অকল্যাণ সাধন করিয়াছে।

মানুষের যে আত্মা তাহার কি কোনো মূর্ত্তি নাই? আত্মা একটী ভাব। একটী শক্তি। ইহা অবিনশ্বর। এই আত্মার রূপমূর্ত্তির দর্শনই মানবের সকল জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচেষ্টার সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। কিন্তু সে বড় দুরূহ ব্যাপার। গ্রীকরা আত্মার একটী রূপকমূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিল। তাহার নাম সাইকী (Psyche) ঈশ্বরের সহিত আত্মার একটি কিছু প্রীতি-সম্বন্ধ আছে। এই অস্ফুট কল্পনা প্রকাশ কবিবার জন্য তাহারা কিউপিড (কাম) ও সাইকীর কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর জীবকে ভালবাসেন, জীবকে সর্ব্বদাই প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতেছেন। কিন্তু জীব ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। সেইজন্য তাহার চিত্তে অবিশ্বাসের উদয় হইল। ঈশ্বর অন্তর্হিত হইলেন। জীবের দুঃখদুর্দ্দশার আরম্ভ হইল। ঈশ্বরের অভাবানুভূতি হইতে ঈশ্বরের চিন্তা আরম্ভ হইল। ঈশ্বরের

স্মরণ মনন হইতে চিত্ত নির্ম্মল হইল। প্রেম হইল। ঈশ্বরের সঙ্গে চির মিলন সংঘটিত হইল। সাইকীর উপাখ্যানের এই সমস্ত অধ্যাত্ম বিষয় অতি মনোহর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের "রাজা" নাটকের উপর, এই উপাখ্যানের ছায়া আছে, এই প্রকার অনুমান্ করা যায়। সাইকীর উপাখ্যান রূপকোপাখ্যানের একটী শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

এক রাজার তিন মেয়ে। সাইকী সকলের ছোট। কিন্তু সাইকীর এতরূপ যে আর দুইটী ভগিনী সাইকীর পাশে দাঁড়াইলে একেবারে ম্লান হইয়া যায়। রূপের রাণী প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে ভিনাস সেও সাইকীর সৌন্দর্য্যে পরাজিতা। ভিনাসের মনে খুব হিংসা। ভিনাসের পুত্র কিউপিড্। একদিন সে কিউপিডকে বলিল, 'বৎস, সংসারে যে সব চেয়ে কুৎসিত মানুষ, তুমি সাইকীকে তাহার জন্য উন্মত্ত করিয়া দাও।' কিউপিড সাইকীকে দেখিয়া নিজেই মুগ্ধ হইল। সাইকীকে লইয়া এক কুসুমিত কুঞ্জ-কাননে রাখিল। :প্রতিদিন রাত্রে অন্ধকারে কিউপিড সাইকীকে প্রেম সম্ভাষণ করে। দিনের বেলা সাইকী ফুল তুলিয়া, মালা গাঁথিয়া, হরিণ-শিশুর সঙ্গে খেলা করিয়া, পাখীর গান শুনিয়া আনন্দে থাকে। রজনীতে অমৃত উৎসব। সাইকীর ভগিনীরা অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত জানিল। তাহাদের অত্যন্ত হিংসা হইল। সাইকীকে কহিল, তোমার সহিত যে প্রেম করিতেছে সে একটী দানব। অতি কুৎসিত চেহারা তার। সেই জন্যই দিবালোকে দেখা দেয় না। পরদিন রাত্রে সাইকীর কুসুম শয্যায় কিউপিড যখন নিদ্রিত তখন সাইকী একটী প্রদীপ লইয়া আসিয়া দেখিল, অনিন্দ্য সুন্দর রূপ কুসুম-সুকুমার কমনীয় কিশোর কান্তি। আনন্দে সাইকীর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। উচ্ছ্বাসে হাত কাঁপিয়া প্রদীপ হইতে একবিন্দু তপ্ত তৈল কিউপিডের গায়ে পড়িল। কিউপিড জাগিয়া উঠিয়া সমস্ত বুঝিয়া সাইকীকে পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। তখন সাইকী হতাশ হইয়া কিউপিডের সন্ধানে দেশে দেশে মন্দিরে মন্দিরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অসহ্য দুঃখ পাইতে লাগিল। দিবানিশি স্বপনে জাগরণে কিউপিডের কথা ভাবিতে লাগিল। দেখিয়া ভিনাসের দয়া হইল। কিউপিড গোপনে গোপনে সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। উভয়ের মিলন হইল।

মানুষের সঙ্গে দেবাধিপতি জিউসের খুব বিরোধ চলিতেছে। জিউস মানুষকে শাস্তি দিবার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একটী মনমোহিনী রমণী মূর্ত্তি সৃজন করিলেন। দেবতারা সকলেই তাহাকে একটু একটু করিয়া রূপ ও গুণ উপহার দিল। রমণীর নাম হইল প্যাণ্ডোরা অর্থাৎ সর্ব্বদানময়ী বা তিলোত্তমা। জিউস প্যাণ্ডোরার সঙ্গে একটী কলসী দিলেন। মুখ-বন্ধ করা। মানুষের জীবনের যত দুঃখদৈন্য পাপ-তাপ সমস্ত উহাতে ভরা থাকিল। এপিমিথিউস নামক একজন শক্তিশালী মানুষের সঙ্গে দেবতা এই প্যাণ্ডোরার বিবাহ দিলেন। কথা থাকিল কলসীটী কেহ যেন খোলে না। কিছুদিন পরে প্যাণ্ডোরার কৌতূহল অসহ্য হইল। কলসীতে কি আছে না জানিলে তাহার আহার নিদ্রা হয় না। একদিন সে ভয়কম্পিত হস্তে কলসীর মুখের ঢাকনি তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র অকল্যাণ মাছির মত উড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কেহ কেহ বলেন, কলসীতে সুখশান্তি ভরা ছিল। সমস্ত উড়িয়া চলিয়া গেল! তাড়াতাড়ি কলসীর মুখ বন্ধ করায় থাকিল কেবল আশা।

কি সুন্দর অর্থপূর্ণ আখ্যায়িকা। মনুষ্য জীবনের দুঃখদুর্দ্দশার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

নারী। অথচ নারী দেবতার দান। সকল রূপগুণের অধিকারিণী। তত্ত্বটী প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এই ক্ষুদ্র কাহিনীতে। রূপকোপাখ্যানের একটী অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ। ডিওনিসাসের কাহিনী আর একটী সুন্দর রূপক। ডিওনিসাসের খুব নয়নমনোহর রূপ। কিন্তু সে প্রকৃতিস্থ নয়। দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যেখানে যায় সেইখানেই সমাদৃত। নর-নারী সকলের প্রিয়। তাহাকে পাইয়া তাহারা আর সমস্ত ভুলিয়া যায়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সকলের মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ দেখা যায়। চারিদিকে ভয়ানক অশান্তির প্রাদুর্ভাব হয়। দেবতা অন্য দেশে চলিয়া যান। সেখানেও ঐ ব্যাপার, সর্ব্বত্র দ্রাক্ষালতার আবাদ প্রচলন করা ইঁহার প্রধান চেষ্টা। ইত্যাদি অতি দীর্ঘ অগণিত ঘটনাময়ী কাহিনী। ডিউনিসাসের উপাখ্যান পৃথিবীতে সুরার ব্যবসায় ও ব্যবহার এবং তাহার ফলাফলের ইতিহাস।

সাহিত্যে, নীতিশাস্ত্রে, ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বত্র রূপকের প্রভাব। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে রোমান-ডি-লা-রোজ নামক একখানি সুবৃহৎ প্রেমবিষয়ক রূপককাব্য লেখা হয়। ইহার প্রভাব ইউরোপে সর্ব্বত্র, এবং কবি চসারের অনুবাদে, ইংলণ্ডে বিস্তার লাভ করে। চতুর্দ্দশশতকে ল্যাংল্যাণ্ড্ নামক একজন ইংরেজ-কবি এক প্রকাণ্ড রূপককাব্য লিখিয়া দেশের শোচনীয় নৈতিক অধঃপতনের বর্ণনা করিয়াছিলেন। 'কৃষকের স্বপ্নদর্শন' এই কাব্যের নাম। রাণী এলিজাবেথের যুগে স্পেন্সার অতি সুললিত ভাষাচ্ছন্দে 'ফেয়ারী-কুইন' নামক এক সুদীর্ঘ অপূর্ব্বসুন্দর রূপক-কাব্য লিখিয়াছিলেন। বানিয়ানের 'তীর্থযাত্রী' ও রূপক পদ্যে নহে গদ্যে। বাংলার কবি হেমচন্দ্র 'আশাকানন' নামক একখানি উপাদেয় রূপক কাব্য লিখিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে একটী সুদীর্ঘ রূপকোপাখ্যান আছে। চতুর্থ স্কন্দের ২৪শ হইতে ২৮শ পর্য্যন্ত অধ্যায়। পুরঞ্জনের কাহিনী। এর চেয়ে সুন্দরতর, উজ্জ্বলতর, এবং গভীরতর রূপক বোধ করি কোনো কালে কোনো দেশে রচিত হয় নাই।

আধুনিক জীবন-যাত্রায় জ্যোতিষের স্থান।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

দেশের মধ্যে আজি আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষুস্বরূপ জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আসিয়াছে এবং বহুলোকের আন্তরিক অনুসন্ধিৎসা জাগিয়াছে। ইহার মধ্যে সত্য আছে কিনা এবং যদি থাকে, তাহা কতটুকু, ধীরমতি ও জ্ঞানপিপাসু জনসমাজ বারবার এই প্রশ্ন করিয়া থাকেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে practical man অর্থাৎ কর্ম্মশীল ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নও করেন যে, জ্যোতিষ যদি সত্যই হয় তবে তাহা জানিয়া লাভ কি? অর্থাৎ যদি কাহারও ভাগ্যফল জ্যোতিষ মতে মন্দ বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে অগ্রিম দুর্ভাবনার বোঝা স্কন্ধে চাপাইয়া বিশেষ কোন উপকার দেখা যায় না। শেষোক্ত মতের প্রতিবাদ করা খুব শক্ত নহে; কারণ মনে করুন না— কোন ব্যক্তির নাড়ীর পরীক্ষা করিয়া যদি ডাক্তারে বলেন যে, সেই ব্যক্তির দেহে যক্ষ্মারোগের সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহা হইলে কেহ কি সেই বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের নিন্দা করিয়া থাকেন না প্রশংসা করিয়া

থাকেন ? ব্যাধির পূর্ব্ব-সূচনা ধরা পড়িলে তাহার প্রতিকার যত সোজা, পরে তত নহে। সুতরাং বিশেষজ্ঞের এই বিদ্যা (যদ্দ্বারা রোগের diognosis ঠিক হইল) অতীব প্রশংসনীয় ও প্রয়োজনীয়। সেইরূপ যদি স্বীকার করা যায় যে, মানবের শুভাশুভ ফল জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে জানা সম্ভব তাহা হইলে তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। একটু তফাৎ এই যে ব্যাধি বিষয়ে চিকিৎসাদি দ্বারা প্রতিকার লোকে আশা করেন ও তদ্বিষয়ে খুব যত্নবান হইয়া থাকেন এবং সাধ্যাতীত ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু ভাগ্যফলের প্রতিকার বিষয়ে শাস্ত্রবিহিত শান্তি প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়া গুলির ব্যবস্থা আছে তৎপ্রতি সকলে আস্থাবান হয়েন না। অবিশ্বাসের কারণ এই যে, বহু ক্ষেত্রে যথাশাস্ত্র ক্রিয়া করাইয়াও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। তর্কের খাতিরে ইহা মানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করি যে ব্যাধি-প্রতিকার বিষয়ে সর্ব্বত্র এবং সকলের পক্ষে ঔষধাদি বা চিকিৎসাদি নিশ্চিত ফল-প্রদ হয় কি ? কে না জানেন যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, অনেকানেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা বৈদ্যের অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টা স্বত্বেও রোগের অকুণ্ঠিত গতিরোধ করা যায় না এবং অবশেষে ব্যাধির জয় হয় ও রোগীরও প্রাণবায়ু বাহির হয়। সুতরাং কেহ কি বলিবেন যে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিবার কোন প্রয়োজন নাই বা রোগের চিকিৎসারও আবশ্যকতা নাই ? এক্ষণে যদি বলা যায় যে জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের নিকট ইহাপেক্ষা বেশী আশা করা সঙ্গত নহে তবে কি অন্যায় বলা হইবে ? জ্যোতিষ-শাস্ত্র (অর্থাৎ আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে যতটা জ্ঞান লিপিবদ্ধ হইয়াছে) অভ্রান্ত বলিয়া যাঁহাদের ধারণা আছে, তাঁহাদের মতের খণ্ডন করিবার বাসনা আমার নাই। তবে practical জ্যোতিষী মাত্রের অভিজ্ঞতা আমার অনুকূলে এ কথা বলিতে পারি। কিন্তু অভ্রান্ত না হইলেও এই শাস্ত্র সাহায্যে জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত মানব-জীবনের শুভাশুভ ফল যতটুকু মিলাইতে পারা যায় তাহার মূলে যে সত্যনিহিত আছে তাহা অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কেন ? সুতরাং যাঁহারা সত্যের মন্দিরে পূজারী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি সমাদরের অভাব হয় কেন ? বহু ব্যয়-সাধ্য চিকিৎসা বিদ্যা যে স্থলে নিস্ফল হয়, সে স্থলে জ্যোতিষী মহাশয় চেষ্টা করিলে অপরাপর বিদ্যার অগম্য অনেক বিষয় জানিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্র অনেক দেখা যায় যে বৈদ্য মহাশয় যে ব্যাধি নির্ণয় করিয়াছেন তাহা গ্রহ-সূচিত নহেবলিয়াই উপকার হয় নাই, অথবা যে সকল ঔষধাদি ব্যবস্থা করিয়াছেন হয়ত সেগুলি গ্রহ নির্দ্দিষ্ট নহে। ফলে রোগের উপশম হয় নাই—অথবা যে অঙ্গে পীড়া সূচিত বৈদ্য মহাশয় তাহা ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই উপকার হয় নাই। আবার এমনও দেখা যায় যে জ্যোতিষ-মতে যে যে দিন রোগের সঙ্কট-কাল (crisis) সেই সেই দিনে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করার ফলে রোগীর প্রাণরক্ষা হইয়াছে। এই সকল কথা মোটেই অতিরঞ্জিত নহে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা নিয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সুতরাং আমরা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আবশ্যকতা বাস্তবজীবনে কিরূপে অস্বীকার করিতে পারি ?

আর একটী ক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে জ্যোতিষ গণনা নিরর্থক নহে। সকলেই জানেন যে বর্ত্তমান কালে বিচারালয়ে যাঁহারা আসামী হইয়া গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হন তাঁহাদের কি দুর্ভাগ্য ঘটে। প্রথমতঃ উকীল ব্যারিষ্টার এবং অন্যান্য বাবদে জলের মত অর্থব্যয় তাঁহাদের করিতে হয়। এ সকল করিয়াও, শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টারের যথাসাধ্য পক্ষসমর্থনের চেষ্টা স্বত্বেও, আসামী দণ্ডিত হইলেন এরূপ ঘটনা বিরল নহে। তথাপি লোকে প্রতিদিনই উকীল

ব্যারিষ্টারের শরণাগত হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের হাতে টাকা গুঁজিয়া দিয়া কার্য্যসিদ্ধির জন্য বহু অনুনয় বিনয় করিয়া থাকেন। যেন তাঁহারাই মুক্তিদাতা ও ভয়ত্রাতা। এরূপ ক্ষেত্রে জ্যোতিষী মহাশয়ের কি কিছু করিবার নাই ? আছে বৈ কি ? যে গ্রহ চক্রের ফলে ঐ সকল দুর্ঘটনা আসিয়া থাকে তাহা জ্যোতিষীর অজ্ঞাত নহে। গ্রহগণ নিয়তঃ পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং বিচারাধীন মোকদ্দমার কোন দিন আসামীর পক্ষে বিশেষ অনুকূল নির্ণয় করিয়া দেওয়া যায় এবং সেই দিন বিচারশেষ যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা যদি করা যায়, তাহা হইলে আসামীর মুক্তি অথবা লঘু শাস্তি ভাগ্যফল হইতে পারে। ইহা কম সুবিধার বিষয় নহে। যে জ্যোতিষী এইরূপ ফলাদেশ করিতে পারেন তাঁহার বিদ্যা অনাবশ্যক একথা বলিতে কাহার ইচ্ছা হইবে ? অথবা এই জন্য যাহা ব্যয় হয় তাহা অনর্থক নহে। তথাপি এ কথা আমি বলিতে সাহসী নহি যে শতকরা একশো case মিলিয়া যাইবে। যদি ২৫টাও মিলিয়া যায় তাহাও কি অগ্রাহ্য করিবার বিষয় ?—কারণ আজ যদি ২৫টা মিলিতে পারে ভূয়োদর্শন ও জ্ঞানের পরিণতি বশতঃ কালে যে আরও ২৫টা মিলিবে না এ কথা কে বলিতে পারে ?

এক্ষণে আর একটী স্থলের কল্পনা করা থাক্। আজকাল অর্থোপার্জ্জনের পথ অনেক হইয়াছে। কেহ বা চিকিৎসা বিদ্যা দ্বারা, কেহ বা ইঞ্জিনিয়ার হইয়া, কেহ বা ওকালতিব্যবসা লইয়া, কেহ বা ব্যবসা ক্ষেত্রে থাকিয়া, কেহ বা সাহিত্য-চর্চ্চা বা শিক্ষকতা দ্বারা ধনলাভ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে হইলে যে সকল গুণসমন্বয় আবশ্যক হয়, তাহারা বিভিন্ন এবং কোন এক ব্যক্তিতে সম্ভবে না। অভিজ্ঞ জ্যোতিষী মহাশয় প্রত্যেকের জন্ম-কুণ্ডলী আলোচনা করিয়া প্রকৃতিগত ঐ সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারেন, এবং জাতকের শৈশবাবস্থা হইতেই ঐরূপ ফলাদেশ করিতে সমর্থ। যদি আমার এই উক্তি আপনারা সত্য বলিয়া মানিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে জ্যোতিষীর কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ সুপ্রশস্ত এবং জন-সমাজে তাঁহার আসন কত উচ্চে তাহা আপনারাই স্থির করিতে পারেন। এই উক্তির সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে হইলে যথেষ্ট পরীক্ষা (experiment) ও অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। পাশ্চাত্য দেশীয় দুই জন শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী ও মনস্বী পণ্ডিত (Maurice Wemyss and Alfred H. Barley) বহু গবেষণা করিয়া এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—

(১) "One of the most important uses of Astrology is the aid it gives to the parent who is considering to what end his son's education should be directed and to the grown man who is still undecided as to the occupation in life he is best fitted to pursue. Fitness or the reverse for many occupations may be determined with a high degree of accuracy with the aid of genethliacal astrology." The Wheel of Life vol. II. PP. 2—3.

(২) "The claims of Astrology then are, that it offers first and foremost a means of general character-study entirely surpassing the combined advantages of ordinary anthropological methods, being at once more comprehensive and more subtle.

Secondly, and this is pre-eminently its greatest, its divine use, a means for the unbiassed examination of one's own character, and the most effective means of strengthening it" The Rationale of Astrology by Alfred H. Barley p. 13.

এদেশে অনেক বহুদর্শী সুপণ্ডিত Pratical জ্যোতিষী বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাদের নিয়তঃ অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আমার মতের পোষকতা করিবেন। সুতরাং মানুষ তৈয়ারী করিবার জন্য যেমন পুত্রাদিকে স্কুল কলেজে শিক্ষকের হাতে সমর্পণ করা হয়, তেমনি তাহাদের বিশুদ্ধ জন্মকুণ্ডলী করাইয়া উপযুক্ত জ্যোতিষীর দ্বারা তাহারা কোন পথের পথিক হইবার উপযুক্ত নির্ণয় করাও উচিত। তাহা করিলে অনর্থক অর্থব্যয় করার প্রয়োজন হইবে না এবং বিফলতার মনস্তাপও পাইতে হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে মানুষের শিক্ষাদীক্ষারূপ অতীব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্রের মন্তব্যগুলি অপরিহার্য্য।

সন্তানের শিক্ষা দীক্ষা উপযুক্ত ভাবে দেওয়ার আবশ্যকতা যেমন সর্ব্ববাদী সম্মত, তেমনি আর একটী সমস্যার দিক আছে যেখানে গ্রহরাশির সাহায্যে ধাঁধা দূর করা যাইতে পারে। মনে করুন কোন বালকের প্রকৃতি অতি চঞ্চল এবং সে ঠিক বেণীর ন্যায় জেদীও দুরন্ত বালক। সম্ভবতঃ তাহার জননী তাহাকে সোজা করিবার একমাত্র উপায়, যখন তখন সুমিষ্ট ভৎর্সনা এবং তাড়না ও বেত্রাঘাত করিয়া থাকেন। ফল কি হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই বালকের জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহাবস্থান দেখিলেই জানা যাইতে পারে যে তাহার জীবনে মঙ্গল গ্রহের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তাহাকে বশীভূত করিবার নিকৃষ্ট উপায় তাহার জননী অবলম্বন করিয়া তাহার সমূহ অনিষ্ট করিয়াছেন। তাহাকে desk work এ আবদ্ধ না করিয়া active work বা manual work এ নিযুক্ত করিলে তাহার বিশেষ উন্নতি হইতে পারিত এবং পরে সে কর্ম্মদক্ষ সাহসী ও শূরবীর হইতে পারিত। আবার অনেক ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় যে জননীর সহিত কোন কোন পুত্র বা কন্যার কিছুতেই মিল হয় না, প্রায়ই মনান্তর কলহাদি হইয়া শান্তিভঙ্গ হয়। সন্তানের রাশিচক্রে মাতৃকারক চন্দ্রের সহিত শনির অথবা ভৌমের শত্রুদৃষ্টি-যোগ বশতঃ অথবা সন্তানের ও জননীর লগ্নপতি বা রাশিপতি দ্বয়ের শত্রুতা থাকায় এইরূপ অসুবিধা ঘটিতে পারে। সুতরাং অদৃষ্ট ফল এইরূপ জানিয়া জননী যদি সাবধানতার সহিত সন্তানের প্রতি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে শান্তিভঙ্গের কারণ হয় না। Miss Evangeline Adams সুসভ্য মার্কিন দেশের লোক এবং স্বয়ং জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা বহু অর্থ ও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুস্তকে (The Bowl of Heaven P214) একটী ঘটনার কথা লিখিয়াছেন। "A boy born with a club foot. His horoscope indicated the form of his affliction—his Saturn was badly afflicted in Pisces, but it also indicated most favourable conditions so far as his moon was concerned. A specialist advised the parents to massage the foot every day for as many years as might be necessary to restore it to health. The family could not afford a nurse. But the mother gave up her life to the boy, nursing and treating him everyday for six consecutive years. The boy can now ride a bicycle. All his life, he should give thanks to his mother and his moon

যে সকল ব্যক্তি কর্কট লগ্নে জন্মগ্রহণ করেন অথবা কর্কট রাশির প্রভাব যাহাদের জন্মচক্রে অতিশয় বেশী তাঁহাদের ancient history, architecture, arithmetic ইত্যাদিতে খুব ঝোঁক থাকে, তদ্রূপ সিংহ রাশি বা লগ্নের প্রভাব বশতঃ জাতক ভাল organise করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু details তাঁহার ভাল লাগে না, কেবল broad factsএর উপর লক্ষ্য থাকে। যদি কেহ এই বিভিন্ন প্রকৃতি বালকদ্বয়কে বিপরীত ভাবে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করেন, তবে ফল কি হয়?

এক্ষণে সংসারে সকল লোকে যাহার জন্য পাগল তাহার কতটা সুবিধা জ্যোতিষ গণনা দ্বারা করা যায় তাহাই বলিব। আপনারা অনেকেই মার্কিণ ধন কুবের J. Pierpont Morgan সাহেবের নাম শুনিয়া থাকিবেন। ইনি প্রতি বৎসরের বর্ষফল সূক্ষ্মভাবে গণনার জন্য Miss Evangeline Adamsএর শরণাগত হইতেন। এই বিদুষী মহিলার ভাষায় বলিতেছি—"I read his horoscope many times,and furnished him during the last years of his life a regular service,explaining the changing position of the planets and their probable effect on politics, business and the stock market." (Ch VIII. P. 127). যে সকল বিশিষ্ট যোগাবলী কুষ্ঠীতে থাকিলে ধনকুবের হওয়া যায় তাহা শাস্ত্রে বিবৃত আছে ; সুতরাং এখানে তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু financial magnateদেরও সর্ব্বনাশের যোগ আছে। ধনগর্ব্বে প্রমত্ত ব্যক্তিগণ অনেক সময় ভুলিয়া যান যে গ্রহশক্তি প্রভাবে যেমন ঐশ্বর্য্য লাভও হয় তেমনি বিরুদ্ধ গ্রহগণের আক্রমণও সহজ হয় না। প্রায়শঃ দেখা যায় যে যখন হার্শেল গ্রহ রবি এবং বৃহস্পতির প্রতি শত্রু দৃষ্টি যোগে থাকেন (directional aspects) তখন financial disaster আরম্ভ হইতে থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলার অবসর নাই। Miss Evangeline Adams "Money makers" নামক অধ্যায়ে অনেক গুলি case এই সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অনেকে চমৎকৃত হইবেন। পরলোকগত ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী Sepharial সাহেব Stock Exchange সম্বন্ধীয় গণনায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে মানুষের অনুকূল দশান্তর্দ্দশাদি গোচরফল এবং directional শুভ aspects উপস্থিত হইলেই সংসারে সুখ সৌভাগ্য মান সম্ভ্রম এবং ধনাদি প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। কবে সেই রূপ গ্রহ সংযোগ হইতে পারে তাহা বিজ্ঞ জ্যোতিষী মাত্রেই বলিতে পারেন। সুতরাং এই সকল ব্যাপারে তাঁহাদের সদাসর্ব্বদা consult করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। অবশ্য অনেকে একথা বলিতে পারেন যে সুখসৌভাগ্য যখন ভাগ্যলিপি তখন তাহার জন্য জ্যোতিষগণনা নিরর্থক। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে সৌভাগ্যও চিরস্থায়ী হয় না। জোয়ারের জল যখন ভাটায় নামিয়া যায় তখন যে অবস্থা আসে সকলেই অবগত আছেন। মানবের ভাগ্যচক্রের কখন পরিবর্ত্তন হইতে পারে তাহা জ্যোতিষী ভিন্ন অপরের পক্ষে জানা সম্ভবপর নহে। আবার দুরবস্থায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকিলে জ্যোতিষীর ন্যায় পরমবন্ধু কেহই নাই, যেহেতু তিনি সুবিচার করিয়া দুর্দ্দশার অবসান কাল নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন। এস্থলে এই কয়টী মূল্যবান কথা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

"I have come to regard the material side of life as a picture puzzle, into

which with astrology's help we must fit the scattered pieces. Or a moving picture : Fate turns the crank. The picture comes on mathematically. But we in the audience can see the picture through the blue goggles of ignorance or the rosy lens of knowledge, Astrology's job is to furnish this knowledge. The Astrologer's to furnish the rosy lens !

"The most useful thing which Astrology does for men and women is to help them when they are discouraged. If they know that some situation which is bothering them will clear up as soon as their Stars change, they are bound to take courage and fight on until more auspicious times." (P. 141)

ইহার উপর একটু টীকা এই করিতে চাই।—সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য ব্যক্তি বিশেষের ঠিক নির্ণয় করিতে হইলে তাৎকালিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার (দেশকাল ইত্যাদি ভেদে) প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা আবশ্যক। মনে করুন কোন ব্যবসায়ী ব্যক্তির গণনায় দেখা গেল যে এই বৎসরে তাঁহার লাভবান হইবার যোগ আছে। কিন্তু তৎকালে সমসাময়িক ব্যক্তিগণের কারবারে খুব লোকসান অথবা মন্দা যাইতেছে। ফলে দেখা গেল যে কল্পিত ব্যক্তি মোটেই লোকসান গ্রস্থ না হইয়া কিছু লাভবান হইলেন। এখানে তাঁহার লাভের পরিমাণ (extent) নিতান্ত কম মনে করা সঙ্গত নহে। ওকালতী ব্যবসা অনেকে করিয়া থাকেন। সম্প্রতি রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক কারণে বাজার খারাপ চলিতেছে। কিন্তু আমার কোন বন্ধু অন্যান্য বৎসরের ন্যায় অর্থলাভ না করিলেও মোটের উপর ভাল আছেন। যদি তাঁহার সৌভাগ্য না থাকিয়া বিরুদ্ধ দশা থাকিত তাহা হইলে তাঁহাকে অপরের ন্যায় কষ্টে দিনাতিপাত করিতে হইত সন্দেহ নাই।

পরিণয় ব্যাপার (Marriage and Love)

এই বার দাম্পত্য-জীবন ও যোটক মিলন সম্বন্ধে এবং পরিণয়ের পূর্ব্বে যুবকযুবতীর প্রেমের পরিণতি (courtship) কি হইতে পারে এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এস্থলে কিছু আছে কিনা বলা আবশ্যক। হিন্দুমাত্রেই জানেন যে পাত্র-পাত্রীর জন্মচক্র লইয়া মিলন বিচার করা হয়। সাধারণতঃ রাশি বর্ণ নাড়ী গণ ইত্যাদির মিল দেখা হয়, কিন্তু ইহা অতি স্থূল বিচার। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে আকর্ষণের কয়েকটী মূল সূত্র আছে। উভয়ের প্রকৃতি বিসদৃশ অর্থাৎ antagonistic না হইয়া Complementary বা Similar হইলে স্থায়ী মিলনের সম্ভাবনা। এই ধাতুগত চরিত্র জ্ঞান বা temperamental study জ্যোতিষ-শাস্ত্রে যেরূপ সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে, এইরূপ আর কোন শাস্ত্রে আছে বলিয়া আমার জানা নাই। "The Horoscope is but the expression of the Real Man. The Real Man is only in the making. Just as you would not say in reality the face was the man, but rather the expression of the man and gradually changes in expression and contour during the course of time, so the Horoscope expresses the man." (Frankland's Astrological investigation P. 14). যে সকল তথ্য পাত্রপাত্রীর সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন হয় আমি সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি।

(১) উভয়ের জন্মচক্র বিচারে hereditary disease (যেমন যক্ষ্মাদি পীড়া) অথবা insanityর কোন সূচনা পাওয়া যায় কি না?—দ্ব্যাত্মক রাশি ও নবাংশাগত পাপগ্রহযোগ দৃষ্টি বশতঃ প্রায়ই যক্ষ্মা রোগের সূচনা হয়, বিশেষতঃ যদি জন্ম লগ্নাপেক্ষা উক্ত স্থান বক্ষদেশ সূচনা করে। আরও অন্যান্য যোগও আছে। আবার লগ্ন চন্দ্র ও বুধ বিশেষরূপে পাপগ্রহ দ্বারা পীড়িত হইলে Insanityর সূচনা থাকে।

(২) দারহানিযোগ বা বৈধব্যযোগ।—সকলেই জানেন যে ভৌম দোষ ইহার একটী প্রধান কারণ। অবশ্য অন্যান্য যোগও বিচার্য্য এবং অল্পায়ু যোগ আছে কিনা দ্রষ্টব্য।

(৩) দম্পতির মধ্যে কলহ বা বিচ্ছেদ এবং অশান্তি নিতান্ত বিরল নহে। তাহার প্রধান কারণ incompatibility অর্থাৎ উভয়ের মনোবৃত্তির অসামঞ্জস্যতা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উভয়ের চরিত্রের বিশ্লেষণ জ্যোতিষ মতে করিলে ইহা জানা যায়। ইহা ছাড়া আর একটী লক্ষ্যের বিষয় আছে। দম্পতির মধ্যে মিল থাকিলেও সাময়িক গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ পরস্পরের মধ্যে বিপ্রকর্ষণ ঘটিয়া থাকে। বহুতর ক্ষেত্রে কোন্ সময়ে এইরূপ অবস্থা আসিবে জ্যোতিষের সাহায্যে তাহা জানা থাকিলে দম্পতি গুরুতর অশান্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। শাস্ত্রে প্রমাণ আছে "লগ্নাদস্ত বিলগ্ননায়কযুত ক্ষেত্রাংশকে সম্ভবা যা সা ভর্ত্তৃমনঃ প্রসাদকরিণী ভর্ত্তা তথৈব স্ত্রীয়ঃ।"

(৪) স্ত্রীপুরুষের বিবাহ কাল নির্ণয় জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা সহজে করা যাইতে পারে। অতএব বিবাহক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর জন্মচক্র লইয়া বিশেষ ভাবে পরীক্ষা না করিয়া বিবাহ স্থির করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এই বিষয়ে যাঁহারা specialist তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক।

সন্তানজন্ম ও গর্ভনিরোধ (Issues and Birth-Control)

বিবাহ হইলে জননী হইবার বিষয় চিন্তনীয় হয়। গর্ভধারণে কোন বিপত্তি হইতে পারে কি না বা কোন সময়ে নিরাপদে সন্তান লাভের সম্ভাবনা, এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর বিজ্ঞ জ্যোতিষীর নিকট আশা করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে এ দেশেও সন্ততি-সংখ্যা কমাইবার অনুষ্ঠান সকল অনেকে পরীক্ষা করিতেছেন। ইহা ভাল কি মন্দ বিচার করিতে চাহি না। জ্যোতিষ মতে দেখা যায় যে স্ত্রীপুরুষের মিলনের মুহূর্ত্তে গ্রহ সমাবেশ লক্ষ্য করিয়া গর্ভসম্ভাবনা কি না নির্ণয় করা যায় এবং সেই সকল সময় ব্যতীত অন্য সময়ে নিষ্ফল হয়। সংযম সহকারে এই স্বাভাবিক নিয়মের অনুবর্ত্তন করিলে গর্ভনিরোধ সহজ এবং স্বভাব-সুলভ হইতে পারে। অনুসন্ধিৎসুগণ Bailey সাহেবের Birth-control নামক পুস্তক পাঠ করিতে পারেন। এক্ষণে মনে করুন শিশুর জন্ম হইল। শাস্ত্র বলেন যে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর আয়ু নিশ্চয় বলা যায় না। শৈশবে রোগের শীঘ্র প্রতিকার না হইলে শিশুর প্রাণহানি ঘটিয়া থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া বিশেষভাবে কোন্ কোন্ সময়ে রোগপ্রবণতা আছে বিচার করিয়া দেখা উচিত এবং তদনুসারে সাবধান হওয়া উচিত। বঙ্গজননীগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে তাঁহারা সকলেই একটু যত্নবতী হইলে নিজ নিজ সন্তানের কোষ্ঠী গণনা করিতে পারেন এবং শিশুর লালন-পালন বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারেন। আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান গণপতি সরকারের জ্যোতিষযোগতত্ত্বের দ্বিতীয় খণ্ডে রোগাদি বিচারের বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এ সকল প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে।—

রিষ্টকাল ও আয়ুর্দ্দায়-নির্ণয় করা যদিও সহজ নহে তথাপি জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা ইহা যেরূপ সম্ভব অন্যান্য (যেমন statistical tables) উপায়ে তাহা তত নহে, পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা আমাকে সতত উৎকণ্ঠিত করিতেছে বলিয়া আমি জাতক-গণনা (calculation of Nativities) সম্বন্ধে যতটা বিস্তারিত আলোচনা করিলাম, অন্যান্য গণনার বিষয়ে তাহা করিব না। সংক্ষেপে বলিতেছি সমগ্র জ্যোতিষ শাস্ত্রের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বহু শাখা আছে। যথা প্রশ্নগণনা দ্বারা অনেকানেক বিষয়ের তথ্যনির্ণয়; ইহাতে জন্মকালীন সময়াদি জানার প্রয়োজন নাই। রিষ্ট-গণনা (Mundane Astrology) দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী স্থির করা যাইতে পারে। মদীয় জাতক চন্দ্রিকায় এতৎ সম্পর্কে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ১৪—১৮ দ্রষ্টব্য)। দুর্দ্দৈব গণনা (accidents)স্বাস্থ্য ও রোগ (যেমন Epidemic disease) গণনা (Medical Astrology) civic এবং police administrationর অনেক সাহায্য করিতে পারে। ঝড়বৃষ্ট্যাদি গণনা (Astro-meteorology) দ্বারা দেশমধ্যে নৈসর্গিক বিপত্তির সংবাদ অবগত হইয়া সাবধান হওয়া যাইতে পারে।

আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিব। প্রতিদিনই গ্রহগতিবশতঃ এবং বিভিন্ন লগ্নাদির উদয় জনিত শুভাশুভ ক্ষণ পাওয়া যায়। কোন বিশিষ্ট অনুষ্ঠান (যেমন Company বা দোকান বা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ বা যাত্রাদি কর্ম্ম ইত্যাদি) আরম্ভকালীন মুহূর্ত্ত লইয়া তাহার স্থায়ীত্ব ও ভালমন্দ বিচার করা যায়। Miss Adams লিখিয়া গিয়াছেন, "Businessmen consult me not only in regard to their individual prospects but as to the astrological indications for the Companies with which they are connected. Even if Corporations have no souls, they do have birthdays, and therefore are subject to planetary influences" (P. 263).

'Astrology is the bridge over which humanity must pass about its appointed business. The horoscope is the plan by which that business should be conducted. Astrology is not the end of the road; the horoscope is not arrival. Astrology provides the method of transportation; the horoscope provides the map. Astrology shows the rules of the road; the horoscope is the traveller's blue book. I can not take the journey; I can only point the way. I am a guide not a chauffeur. But in my capacity of guide, I try also to be a philosopher and friend.

'I give my client the key to unlock the doors of knowledge. I am not content with alleviating the present failure; I try to give the foundation for permanent success." P. 269.

সুসভ্য মার্কিণ দেশে দোকান খুলিয়া প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত এবং সুবিখ্যাত নরনারীর ভাগ্যফল বর্ণনা করিয়া বিদুষী জ্যোতির্জ্ঞান প্রদীপ্তা Miss Evangeline Adams যাহা বলিয়াছেন তাহা আপনাদের অবগতির জন্য বলিলাম। জ্যোতিষের বহু-শাখা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্রতিদিন অনুভব করিতেছি যে, ত্যাগশীল উৎসাহী এবং কর্ম্মী লোকের প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহারা প্রত্যেক শাখা অবলম্বন করিয়া নিয়তঃ গবেষণা করিবেন এবং classifi d statistics প্রস্তুত করিবেন। তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন জ্যোতিষ-শাস্ত্রের লুপ্ত গরিমা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সত্য-মন্দিরের একনিষ্ঠ পূজারী উচ্চশির করিয়া সমগ্র মানবের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন। এই বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমরা জ্যোতি পরিষদে মিলিত হইয়াছি এবং নিয়তঃ অনুভব করিতেছি প্রাচীন ঋষিগণ কেন এই কথা বলিয়াছিলেন, "শশ্বদ্বিশ্ব প্রকাশং গ্রহচরিতবিদাং নির্ম্মলং জ্ঞানচক্ষুঃ"। "অধ্যেতব্যং ব্রাহ্মণৈরেব তস্মাৎ জ্যোতিঃ শাস্ত্রং পুণ্যমেতৎ রহস্যং। এতদ্বুদ্ধ্যা সম্যগাপ্নোতি যস্মাক্ষ্ং ধর্ম্মং মোক্ষমগ্র্যং যশশ্চ।" সুদীর্ঘ শতাব্দী সহস্র পূর্ব্বে যাহা উদ্গীত হইয়াছিল, আজ দেখিতেছি প্রতীচীর বহুমনস্বী ব্যক্তিগণও সেই চির পুরাতনকে নবীন ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন এবং Los Angelos প্রভৃতি নানাস্থানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের শিক্ষাদীক্ষার জন্য স্কুল কলেজও স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী এই কলিকাতায় জ্যোতিষবিদ্যার বৈজ্ঞানিক রীতিমত অনুশীলনের জন্য তাই এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং দেশবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহচর্য্য আমাদের কল্যাণ কল্পে নিয়োজিত হউক এই আমার সর্ব্বশেষ প্রার্থনা। *

* জ্যোতিষ পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কবীরের দোঁহা

অষ্ট বিকার—কাম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভক্তি বিগারী কামিয়াঁ, ইন্দ্রী ফেরে স্বাদ।
হীরা খোয়া হাথসে, জনম গঁবায়া বাদ ॥ ৫ ॥
কামীর ভক্তি পণ্ড সবই, ইন্দ্রিয় ভোগ শুধু খোঁজে।
রত্ন হারায় আপন দোষে, জন্ম খোয়ায় অসার কাজে ॥ ৫

কামী লজ্জা না করে, মন মাহীঁ অহলাদ।
নীঁদ না মাঙ্গে সাথরা, ভূখ না মাঙ্গে স্বাদ ॥ ৬ ॥
কামী যারা নাহিক লাজ, আনন্দ তার মনের মাঝে।
স্বাদ নাহি চায় ক্ষুধা দারুণ, নিদ্রা নাহি শয্যা যাচে ॥ ৬ ॥

কামী কবহুঁ না গুরু ভজৈ, মিটৈ ন সংসয় মূল।
ঔর শুনহ সব বক্সি হোঁ, কামী ডার না সূল ॥ ৭ ॥
কামী কভু না গুরু ভজে, সংশয় না যায় তার।
চাহে না কাম শাখা কি মূল, দাও অপরাধ আর ॥ ৭ ॥

কাম ক্রোধ সূতক সদা, সূতক লোভ সমায়।
সীল সরোবর নহাইয়ে, তব য়হ সূতক জায় ॥ ৮ ॥
চির অশুচি কাম আর ক্রোধ, লোভে হয় তা পরিণত।
স্নান কর শীল সরোবরে, অশৌচ হবে অপগত ॥ ৮ ॥
জঁহা কাম তহঁ নাম নহিঁ, জহাঁ নাম নহিঁ কাম।
দোনোঁ কবহুঁ না মিলৈঁ, রবি রজনী ইক ঠাম ॥ ৯ ॥
কাম থাকে না নাম যেখানে, নাম নাহি রয় কামনাতে।
মিল নাহি হয় দুয়ে কভু, তপন রাতি এক স্থানেতে ॥ ৯ ॥
নারি পুরুষ সবহী সুনো, য়হ সতগুরুকী সাখি।
বিষ ফল ফলে অনেক হৈঁ, মত কোই দেখো চাখি ॥ ১০ ॥
নারী পুরুষ সবাই শুন, সৎ গুরু এই কহেন সাখি।
কতই ফলে বিষ ভরা ফল, দেখে না কেউ যেন চাখি ॥ ১০ ॥
জিন খায়া সোই মুআ, গন গন্ধর্ব্ব বড় ভূপ।
সত গুরু কহৈঁ কবীর সে, জগমেঁ জুগতি অনূপ ॥ ১১ ॥
যে খেয়েছে সেই মরেছে, গন্ধর্ব্বগণ আর মহাভূপ।
কবীর প্রতি সৎ গুরু কন, জগত মাঝে উপায় অনুপ ॥ ১১ ॥
কামী তো নির্ভয় ভয়া, করৈ না কাহূ সঙ্ক।
ইন্দ্রী ফেরে বস পরা, ভুগতৈ নরক নিসঙ্ক ॥ ১২ ॥
শঙ্কা বিহীন কামীরা সব, ডর প্রাণে নাই কারো প্রতি।
রিপুর বশে আত্মহারা, নিঃশঙ্ক নরকে গতি ॥ ১২ ॥
কবীর কামী পুরুষকা, সংসয় কবহুঁ ন জায়।
সাহিব সে অলগা রহৈ, বা কে হিরদে পায় ॥ ১৩ ॥
কবীর, কামী পুরুষ যারা, সংশয় ঘোর তার না যায়।
আগুন জলে হৃদয় মাঝে, বিভুর চরণ কভু না পায় ॥ ১৩ ॥
কহতা হুঁ কহ জাত হুঁ, সমঝৈ নহীঁ গঁবার।
বৈরাগী গিরহী কহা, কামী বার ন পার ॥ ১৪ ॥
বল্‌তে হবে যাচ্ছি ব'লে, বুঝে নাক' মূর্খ যত।
কিবা গৃহী কি উদাসী, কামীর মুক্তি দূরগত ॥ ১৪ ॥
কামী কর্ম্ম কী কেঁচলী, পহিরী হুয়া নর নাগ।
সির কোরৈ সুঝৈ নহীঁ, কোই পুরবলা ভাগ ॥ ১৫ ॥
কর্ম্মরূপী খোলস পরে, নাগ হয়েছে কামী নর।
জীবন গেলেও নাহি বুঝে, ভাগ্য এমন প্রবলতর ॥ ১৫ ॥

কাম কহর আসবার হৈ, সবকো মারৈ ধায়।
কোইক হরিজন উবরা, জাকে নাম সহায় ॥ ১৬ ॥
কাম ক্রোধ আরোহী থাকে, সকলেরে মারতে ধায়।
ত্রাণ শুধু পায় ভক্ত বিরল, আছে যাহার নাম সহায় ॥ ১৬ ॥
কেতা বহতা বহি গয়া, কেতা বহি বহি জায়।
ঐসা ভেদ বিচারি কৈ, তূ মতি গোতা খায় ॥ ১৭ ॥
কতই গেল ব'য়ে ভেসে, আরো ব'য়ে যাচ্ছে কত।
এসব মনে বিচার ক'রে, তুই হ'সনি যেন প্রবঞ্চিত ॥ ১৭ ॥
কাম ক্রোধ মদ লোভকী, জব লগি ঘট মেঁ খান।
কহা মুরখ কহা পণ্ডিতা, দোনোঁ এক সমান ॥ ১৮ ॥
কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কারের, দেহে থাকা যত দিন।
কি পণ্ডিত আর মূর্খ কিবা, সমান দোঁহে ততদিন ॥ ১৮ ॥
কাম কাম সব কোই কহৈ, কাম না চিন্হৈ কোয়।
জেতী মন কী কল্পনা, কাম কহাবৈ সোয় ॥ ১৯ ॥
কাম কামত সবাই বলে, কাম চিনে না কোন জন।
যা কিছু মন খেয়াল তোলে, কাম তারে কয় জ্ঞানীগণ ॥ ১৯ ॥

—শিবপ্রসাদ

প্রতিধ্বনি

উন্নতির অনল প্রবাহ

"আজ মানব-প্রচেষ্টার যে দিকই পরীক্ষা করা যাউক্ না কেন, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়—মানুষ এক্ষণে সম্পূর্ণই মনুষ্যেতর অপর একটা শক্তির কবলে। উন্নতি বলিয়া যে মায়াবী ডাকিনী (jinn) কে আমরা এত আপন বলিয়া ভাবিতেছি, সে আজ আমাদের সকলকেই তার বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বসিয়াছে—ইচ্ছায় হউক্, অনিচ্ছায় হউক্, আজ আমরা তার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে বাধ্য। .. এই যে বর্ত্তমান সভ্যতা, তার গতির উপর কি আমাদের কোন হাত আছে? সে যে বিশাল অনলপ্রবাহ সন্মুখে বহন করিয়া চলিয়াছে, তাহা যে বাস্তবিকই অপ্রতিহত ও ভীষণ! .....স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে আমরা এই যে পথে চলিতেছি, তাহা বিপদসঙ্কুল—সে বিপদ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা বা ভোগলালসার উচ্ছৃঙ্খলা তার আশঙ্কা এই যে এ সকল প্রবৃত্তি, উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি মানবেরবিবেকশক্তিকে সম্পূর্ণই অবরোধ করিয়া ফেলিতে পারে এবং তাহাতে আমাদের ইচ্ছাশক্তির মূল উৎপাটিত হইয়া যাইতে পারে। যখন আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের এই উন্নতি কেবল মাত্র মানব প্রকৃতির হীন প্রবৃত্তির সেবায় মাত্র নিয়োজিত হইতেছে—উচ্চতর ভাবের কোনও প্রকর্ষ সাধন ইহা দ্বারা হয় না, তখন (মানবের) ভবিষ্যত ভাবিয়া সত্যই একটা উদ্বেগ আইসে।"—সার আর্থার কীথ (দি নিউ ইয়র্ক টাইমস্ ম্যাগাজিন)।

সতীত্ব

(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য

The word chastity connotes either the absence of any sexual relation or the permanent sexual relation of one man with one woman. (H. Spencer).

প্রথম অধ্যায়।

"সতীত্ব অমূল্যনিধি বিধিদত্ত ধন" এই পদ্যাংশ আবৃত্তি করিতে করিতে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা মাধুরী তাহার পিতা প্রমথনাথের নিকট দৌড়াইয়া আসিল। প্রমথনাথ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তখন ফুল গাছে জল দিতে ছিলেন। কন্যা আসিয়া বলিল "আচ্ছা বাবা! তুমি এত ফুলগাছে জল দাও কেন বল দেখি? এ বাগানে ত ক্রোটন নাই, কলমের গোলাপ নাই, আরও কত কি নাই।" প্রমথনাথ আন মনে উত্তর দিলেন "বাছা! গাছ পালাতেও এক চৈতন্য-শক্তি বিদ্যমান; গাছে জল দেওয়াও আত্মার সেবা। আর দেখ সব ফুলে দেবতার পূজা হয় না। কোনরূপ কৃত্রিম দ্রব্যে দেবপূজা প্রশস্ত নহে; তাই যাহা দেবারাধনায় লাগে তার গাছই বাগানে আছে।" মাধুরী বলিতে লাগিল "বাবার এক কথা! সকল কাজেই দেবতা, আর ঠাকুর। তবে আমি কি নিয়ে পুতুল খেলা করি! ও ফুলের মালা দিয়েত আর পুতুল সাজান হয় না!" পিতা তখন উত্তর করিলেন "ব্রাহ্মণের সকল কাজেই দেবতা বা ঠাকুর। ব্রাহ্মণের এইটিই বিশেষত্ব। ফুল দিয়ে আগে ঠাকুর পূজা করে, তার পর পুতুলকে পরিও; বা তুমি যাঁর পুতুল তাঁর তৃপ্তির জন্য নিজের গলায় পরিও।" আমরা বোধ করি এ সব কথা মাধুরীর ভাল লাগিল না। সে আর কোন কথা না বলিয়া বাবার সঙ্গে ফুল গাছে জল দিতে লাগিল। প্রমথনাথ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কাল-ধর্ম্মে সবই বিগড়ে গিয়েছে। পাঠশালে যাওয়াতে যেমন কিছু লাভ হয়, তেমনি আবার ক্ষতিও হয়। ছেলেমেয়েদের মানুষ করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যা করেন ভগবান!

এমন সময় হঠাৎ মাধুরী চীৎকার করিয়া উঠিল "বাবা গো! পায়ে কিসে কামড়াইল—বড় জালা।" প্রমথনাথ তাড়াতাড়ি মাধুরীর নিকট আসিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন মাধুরীকে সাপে কামড়াইয়াছে। তাড়াতাড়ি ক্ষতের উর্দ্ধে তিন জায়গায় খুব জোরে তাগা বাঁধিয়া দিয়া কন্যাকে টোলের দাওয়াতে তুলিয়া লইয়া গেলেন। সাপটা দেখা না গেলেও উহা যে অতি বিষাক্ত জাতীয় তাহা অল্পক্ষণের মধ্যেই জানা গেল! মাধুরী ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে লাগিল, কোন ঔষধেই কোন ফল দিল না। শেষে কন্যার জীবনাশা ত্যাগ করিয়া, প্রমথনাথ কাতর হইয়া পড়িলেন। মাধুরীর শৈশবাস্থায় তাহার মাতৃবিয়োগ ও মাধুরীকে আট বৎসর পর্য্যন্ত যত্নে প্রতিপালন ইত্যাদি বিষয় ভাবিয়া প্রমথনাথ একেবারে পাগলের মত হইলেন। হঠাৎ এক ব্রাহ্মণ আসিয়া টোলে উপস্থিত হইলেন। বালিকার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইতেছে ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আশ্বাস বাক্যে বলিলেন "ভয় নাই, বালিকা মরিবে না।" এই বলিয়া তিনি নিজ সঙ্গের ঝোলা হইতে এক কৌটা বাহির করিয়া তাহা হইতে একটি কাল পদার্থ বাহির করিলেন। এই দ্রব্যটি জলে গুলিয়া বালিকার চক্ষের

পাতার ভিতরে লাগাইয়া দিলেন। এইরূপে দুই চক্ষে দুইবার প্রলেপ লাগাইয়া দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে মাধুরী একবারে উঠিয়া বসিল যেন ইতিপূর্ব্বে তাহার কিছুই হয় নাই।* সেই পূর্ব্বোল্লিখিত "সতীত্ব অমূল্য নিধি" পদ্যটি আবৃত্তি করিতে করিতে কি এক ভাবে ভাবিত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ অতি স্নেহভরে বলিলেন "সমস্ত পদ্যটি একবার আবৃত্তি কর ত; অনেক দিন উহা শুনি নাই।" মাধুরী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই প্রমথ নাথ উত্তর করিলেন "ওটা কি পদ্য তাও জানি না—ঐ একটু খানি মাত্র মেয়েটা মাঝে মাঝে বলে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "মাধুরী নিশ্চয় সবটা জানে; বল ত, তুমি পারবে বলত।" আশ্চর্য্য সেই অষ্টম বর্ষের বালিকা সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া তখন অতি সুস্বরে নিম্নলিখিত পদ্যটি আবৃত্তি করিল। যেন উহা তাহার কত পরিচিত।—

"সতীত্ব অমূল্য নিধি বিধিদত্ত ধন
ভিখারিণী হয় রাণী পেলে এ রতন।
সতীত্ব অমূল্য নিধি বিধিদত্ত ধন
মহেশ্বর মহাদেব মস্তক ভূষণ।
সতীত্ব অমূল্য নিধি বিধিদত্ত ধন
বিধি বিষ্ণু শিব নারে করিতে বর্ণন।
সতীত্ব অমূল্য নিধি বিধিদত্ত ধন
সতীত্বের অভাবেতে আঁধার ভুবন।
সতী দশ মহাবিদ্যা বেদতন্ত্র ময়ী
পদতলে মহাদেব কামদেব জয়ী।
মহাবিদ্যা রূপে সতী অনন্ত মহিমা
আগম পুরাণ বেদে দিতে নারে সীমা।
অব্যক্ত রূপেতে সৃষ্টি প্রহেলিকা ময়
সতীত্বের এ রহস্য বুঝিবার নয়।
পতিব্রতা আর সতী প্রভেদ বিস্তর
কি হয় তুলনা যেন গোষ্পদ সাগর।
জোনাকী তপনে, বল্মীক পর্ব্বতে,
না হয় তুলনা যেন কথাতে তপেতে।
স্বখাদ সলিল এক, অন্য মন্দাকিনী
শান্তি বিন্দু এক, অন্য শান্তি প্রবাহিণী
নিষ্কাম নিঃস্বার্থ কথা বড়ই কঠিন
ধারণা নাহিক হয় প্রবৃত্তি মলিন।

* সত্য সত্যই "গাঁজার কাট" অর্থাৎ যে কলিকাতে গাঁজা খাওয়া যায় তাহার গায়ে এক রকম কাল পদার্থ লাগে সেই কাল পদার্থ জলে গুলে; কোন রূপে সর্প দংষ্ট ব্যক্তির রক্তের সহিত মিলাইয়া দিতে পারিলে রোগীর জীবন হানি হয় না। ইহা পরীক্ষিত মহৌষধ।

উপমা নাহিক তার জগত মাঝারে
আছে একমাত্র সতী বিশ্বচরাচরে।
নিষ্কাম বসন তাঁর, নিষ্কাম ভূষণ
মাতৃরূপে সর্ব্বভূতে স্নেহ বিতরণ॥

প্রমথনাথ যেন ধ্যানস্থ হইয়া শুনিতেছিলেন এবং তাঁহার মনে হইতেছিল যেন কি পুরাতন তন্ত্রীতে গিয়া পদ্যটি আঘাত করিতেছিল। যেন তাঁহার কি হারাণ জিনিসে মাধুরী আঘাত দিতেছিল। কি যেন কি এক চির পরিচিত ভাবে মন বিভোর হইয়া ভাসিয়া যাইতেছিল! প্রমথনাথের এই অবস্থায় ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন "আমি চলিলাম; সময় হইলে পুনরায় আসিব। মাধুরীর মঙ্গল হউক।" দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ কোথায় চলিয়া গেলেন। সকলে চিত্রার্পিতের মত ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বীরভূম জেলার তারাপীঠের নাম অনেকেই জানেন। কথিত আছে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন। শিমূল বৃক্ষের নিম্নে আসন করিয়া তারাদেবীর সাধনা করেন বলিয়া এই স্থানের নাম তারাপীঠ। তারাদেবীর এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি এই পীঠস্থানের এখন অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যে শিমূল তলায় বশিষ্ঠের আসন ছিল তাহা আর নাই। তবে শিমূলতলা বলিয়া একটি স্থান এখনও আছে। উহা অতি গম্ভীর ভাব ব্যঞ্জক। নির্জ্জন শ্মশান ক্ষেত্র। বীরভূমের মধ্যে যত পীঠ স্থান আছে তারাপীঠের এই শ্মশানের মত নির্জ্জন ও সাধন-সহায় স্থান আর নাই। এই স্থানেই তারাদেবীর প্রিয় পুত্র "বামাক্ষেপা" বাস করিতেন। শুনা যায় বামাচরণের সহিত তারা কথা কহিতেন এবং বামার খাওয়া না হলে তারা ভোগ গ্রহণ করিতেন না। কাল সর্ব্বনাশী; বামাচরণ দেহরক্ষা করিয়াছেন। পাষাণময়ী তারা বর্ত্তমান। যদি তারাই সেই বিশ্বজননী তবে তিনি কেন আর কথা বলেন না! তাঁহার ত বামাক্ষেপা ছাড়া তারাপুরে অনেক ছেলে রহিয়াছে। তবে কেন পাথরে আর কথা বলে না; তবে কেন অনাহারে পূজারী ব্রাহ্মণরা মরিয়া গেলেও তারার খোঁজ পাওয়া যায় না। তবে কি পাথরকে কথা কহাইবার বামাই কারণ ছিল। যদি তাহাই হয় তবে বামাচরণ বড় না তারাদেবী বড়;—মানুষ বড় না তারা বড় এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

এই তারাপুরে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। অতি শৈশবে নীলাম্বরের পিতা সংসার ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া যান। নীলাম্বরের মাতা নীলাম্বরকে মানুষ করেন। নীলাম্বর সংস্কৃত ভাষায় বেশ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া তারাপুরে পিতামহের প্রতিষ্ঠিত টোলে বিদ্যার্থীগণকে বিদ্যা দান করিতে আরম্ভ করেন। নীলাম্বরের বিবাহাদি দিয়া মাতা স্বর্গারোহণ করেন। প্রায় ৩৬ বৎসর বয়সের সময় নীলাম্বরের একটি পুত্র হয়। পুত্র জন্মিবার ছয় দিন পরেই প্রসূতির মৃত্যু হয়। নীলাম্বর পুত্রটিকে বহু কষ্টে লালন পালন করেন। জন্ম সংস্কার গুলি সমস্তই সম্পন্ন করিয়া পুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দেন। নিজ টোলেই পড়াইতেন। পুত্রটি অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান থাকায় অতি অল্প বয়সেই সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েন। যথা সময়ে পুত্রের বিবাহাদি দিয়া নীলাম্বর সংসার চিন্তা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় নিরত হয়েন।

পুত্র অতিশয় যত্ন সহকারে অধ্যাপনা করিয়া তারাপুরের টোলের সুনাম বৃদ্ধি করিতে থাকেন। অবশেষে অশীতিবর্ষ বয়সে নীলাম্বরের স্বর্গারোহণ হয়। মৃত্যুর সাত কি আট বৎসর পূর্ব্বে বৃদ্ধের একটি পৌত্রী হয়। পৌত্রের মুখ দেখিতে না পাইয়া নীলাম্বর বড়ই মনের কষ্টে দিন কাটাইয়া ছিলেন।

পাঠককে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে এই পুত্রই আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রমথনাথ ও পৌত্রীই আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিতা মাধুরী। পঞ্চম বর্ষ বয়সের সময় মাধুরী মাতৃহীনা হয়। কাজেই প্রমথনাথকে কন্যা লইয়া একটু বিব্রত থাকিতে হয়। যাহাই হৌক, ফলে মাধুরী পিতার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা হইয়া পড়ে। যেখানে প্রমথনাথ যাইতেন বাধা হইয়া মাধুরীও সঙ্গে সঙ্গে যাইত। ছাত্রদের পাঠ দিবার সময়ও মাধুরী পিতার নিকট বসিয়া থাকিত। প্রমথনাথ গল্পচ্ছলেই সুকুমার মতি বালকগণকে শিক্ষা দিতেন। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে উপাখ্যান বলিয়া ছাত্রদের কোমল বৃত্তি গুলি পরিপুষ্ট করিতেন। কখন হরিশ্চন্দ্রের সত্যরক্ষার্থ সর্ব্বস্বদান, স্ত্রী পুত্রবিক্রয়, নিজের চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার; কখন সেই কর্ণের দানশীলতার বিষয়, তাঁহার পুত্রের শিরশ্ছেদনের কথা, কখন উশীনরের বাক্য পালনার্থ সেই অদ্ভুত মাংসচ্ছেদন; কখন দধিচীর অস্থিদান; কখন অগস্ত্যের জীবোদ্ধারে দাক্ষিণাত্যে গমন ইত্যাদি বিষয়ে গল্প করিতেন। প্রমথনাথ পিতার নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন যে পুস্তকের জ্ঞান বহুপরে; প্রথমে গল্পচ্ছলে সরলভাবে কিশোর ও যুবক গণকে যে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই পরে গ্রন্থ পাঠে বৃদ্ধি পায় মাত্র। মাধুরীও প্রমথনাথের স্নেহ পাইয়া অতি উৎসাহের সহিত পিতাকে প্রশ্ন দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। কখন প্রশ্ন করিত আকাশের মেঘ উড়িয়া কোথায় যায়? কখন বা জানিতে চাহিত আকাশের তারা গুলো কি ও কেন উঠে? বাগানের ফুল দেখে বলিত, ফুলগুলি ফুটিয়া আপনিই আবার শুকাইয়া যায় কেন? বাতাস দেখা যায় না, তবু বাতাস আছে বলি কেন? স্ত্রী ও পুরুষ বিভিন্ন কেন? এক রকমের হলে কি হ'তো? সবগাছ সমান হয় না কেন? গাছ হয়, ফল হয়, আবার বীজে অঙ্কুর হয়; মানুষ ছোট থাকে, বড় হয়, মরে যায়, তার পর মানুষের বীজ থাকে না কেন? ইত্যাদি। প্রমথনাথ যথাসাধ্য সোজা ভাবে উত্তর দিতেন। কখনই উত্তর দিতে বিরক্ত হইতেন না। যে দিন প্রাতে মাধুরীকে সাপে কামড়ায় তাহার পূর্ব্ব দিন প্রমথনাথ মাধুরীকে সাবিত্রী ও সত্যবানের কথা বলিয়াছিলেন। পরদিন অর্থাৎ যে দিন সর্পাঘাত হয় সেই দিন দক্ষযজ্ঞের গল্প বলিবার কথা ছিল। কিন্তু দুর্দৈব বশে সে গল্প বলা হয় নাই।

আজ প্রায় ১৫ দিন হইল মাধুরী পুনর্জীবন পাইয়াছে। কিন্তু সেই দিন হইতে প্রমথনাথের মানসিক কি একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছিল। আর সে উদ্যমে তিনি ছাত্রদের পাঠ দিতে পারেন না। মাধুরী প্রশ্ন করিলে কোনরূপে একটা উত্তর দিয়া তাহাকে থামাইয়া দেন। পাণ্ডিত্য বিষয়ে তর্ক উঠিলে আর তিনি তর্ক করেন না। কিন্তু তিনি মাধুরীকে কিছুতেই পারিয়া উঠেন না। এক দিন মাধুরী জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল "গাছে ত প্রাণ আছে তবে চলে না কেন?" মাছি, মশা, পাখী, গরু এরা চলিতে পারে, কিন্তু এরা কেও ত হাসে না, বাবা! কেবল আমরাই ত হাসি—এর মানে কি?" প্রমথনাথ এবার মহা গোলমালে পড়িলেন। ৮।৯ বৎসরের বালিকার এ প্রশ্ন কেন এবং তাহাকে বেদান্তের পঞ্চকোষ কিরূপে বুঝাইবেন এই ভাবিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া

থাকিলেন। পরে বলিলেন মানুষই পূর্ণ আর সব অপূর্ণ। আনন্দ বলে যে জিনিষ তাহা যাহা-দ্বারা বোধ করা যায় তাহা মানুষে ছাড়া অন্য কোন জীবে ভগবান দেন নাই। মানুষের এই বিশেষত্ব। মাধুরী বলিল "তবে কি মানুষ সকলের উপর? প্রমথনাথ বলিলেন "হ্যাঁ মানুষ জীবরাজ।" মনে মনে ভাবিলেন তাই শ্রুতি "আনন্দ ব্রহ্ম" বলিয়াছেন। পল্লীস্থ প্রবীণ মহোদয়েরা প্রমথনাথের মানসিক পরিবর্ত্তনের হেতু ঠিক করিতে না পারিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে প্রমথের দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার মনের এই উদাসীন ভাব, অন্য আর কিছুতেই যাইতে পারে না। সকলে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন প্রমথের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হউক। এক দিন সন্ধ্যার পর পাড়ার শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণগণ প্রমথের টোলে বসিয়া প্রমথকে দ্বিতীয়বার দার গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে একটু তর্ক আরম্ভ হইল।

প্রথম প্রবীণ। তোমার এখন পঞ্চাশ পার হয় নাই। বিবাহ করা একান্ত উচিত। বিশেষ পুত্র নাই।

প্রমথ। পিতা বর্ত্তমানে পত্নী বিয়োগ ঘটে। পিতা পুত্র হয় নাই দেখিয়া গিয়াছেন। কই, তিনি ত দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে বলেন নাই। করা বিহিত হইলে তিনি নিশ্চয়ই কিছু বলিতেন।

২য় ব্যক্তি। কি কষ্ট দেখ দেখি; নিজে পাক করিয়া খাওয়া; কন্যাকে পালন করা; অধ্যাপনা করা। এখন শক্ত আছ তাই চলে যাচ্ছে—এর পর যখন অশক্ত হবে তখন কে করিবে!

প্রমথ। নিজের সেবার জন্য আর একটি জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সমস্ত নষ্ট করিতে প্রবৃত্তি নাই। বিশেষ স্ত্রীলোক কেবল সেবা করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। মাধুরী বড় হয়ে এ'লো; এখনি সে সংসারের প্রায় সকল কাজে আমার সহায়তা করে।

প্রথম ব্যক্তি। বড় জোর আর বৎসর দুএক মাধুরী তোমার সংসারে আছে। তাহার বিবাহ হলেই সে চলে যাবে। প্রমথ! তখন তোমার বড় কষ্ট হবে, তুমি বিবাহ কর।

প্রমথ। মাধুরী ত যাবে—এ জানা কথা। তাহা বলিয়া আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া এই শান্তিপূর্ণ সংসারটিকে অশান্তিতে ডুবাইতে পারিব না। নিজের জীবনকে বিষময় করিয়া আমার পরম স্নেহের মাধুরীর হৃদয়ে বিদ্বেষ বহ্নি জ্বালাইয়া দিতে পারিব না।

২য় ব্যক্তি। তোমার পরিণাম ভাবিয়া আমরা একথা গুলি বলিতেছি। দ্বিতীয়বার বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ। একটি সৎ পুত্র রাখিয়া যাইতে পারিলে বাঘাম্বর তর্কালঙ্কারের বংশটা থাকে। (বাঘাম্বর, প্রমথের পিতামহের নাম)।

প্রমথনাথ। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অনেক কুকার্য্য আজ কাল সমাজে চলিতেছে। বাবার মত শাস্ত্রজ্ঞ তারাপুরে কেও ছিলেন না। শাস্ত্রের অভিমত থাকিলে, বাবা পুনরায় বিবাহ দিতেন। বংশ রক্ষা—এখন বাজে কথা। মাধুরী আমার অপত্য। ভগবানের ইচ্ছা থাকিলে ঐ আমার পুত্র হইত। কিংবা উহার গর্ব্ভধারিণী অকালে ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া যাইত না। পিতামহের বংশ, আমার পিতা রক্ষা করিয়াছেন। কেন না বাবাতে পিতামহের সর্ব্বগুণ উজ্জলভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। আমাতে বাবার কোন গুণই আইসে নাই। বোধ হয় আমার পুত্র হইলে, আমা অপেক্ষা হীন হইত, তাই ভগবান পুত্র দেন নাই। বোধ হয় মাধুরী

বংশান্তরে সংযুক্তা হইয়া নূতন বংশ শক্তির বিস্তার করিবে। অতএব সমাজ চক্ষে বাবাম্বরের বংশ গেলেও বিধির বিধানে একটা কিছু ভালই ঘটিবে। অপত্য সত্বে বিবাহ করার কোন যুক্তিই দেশ কাল পাত্র হিসাবে হৃদয়ঙ্গম হয় না। যুক্তির আবরণে ঘোরতর স্বার্থপরতা ঢাকা।

প্রথম ব্যক্তি। তুমি দেখ্‌ছি সকল অপেক্ষা বেশি শাস্ত্র বুঝ! নাস্তিক! বল কি, পিণ্ড লোপ পাবে? শাস্ত্র পড়া তোমার বৃথা হইয়াছে।

প্রমথনাথ। আপনারা বয়োবৃদ্ধ আমার মাননীয়। এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন না। শাস্ত্র মর্ম্ম বোঝা অতিশয় কঠিন এবং পিণ্ডলোপাদির ভয় দেখাইয়া নির্ব্বোধ লোকদের ঘোরতর পাপ পথে প্ররোচনা দেওয়া কালধর্ম্মে দাঁড়াইয়াছে। তিল দিয়ে ভাতের ঢেলা দিলেই পিণ্ড দেওয়া হয় না। যে পুত্র মন্ত্রশক্তি চালনা করিতে সক্ষম নহে—সে পুত্র পুত্রই নহে এবং তাহার দত্ত পিণ্ড পিতৃলোককে তৃপ্তি দিতে পারে না। সেরূপ পুত্র এক যে থাকে ছেলের মত। এমন বংশ না থাকাই ভাল। বৃদ্ধগণ আর কথা না বলিয়া একে একে টোল হইতে উঠিয়া নিজ নিজ বাটীতে গমন করিলেন। প্রমথনাথও মাধুরীকে ডাকিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। (ক্রমশঃ)

ভিক্ষুকের ঝুলি (৫)

ত্রিদণ্ডী ভার্গব

মুখোপাধ্যায়। আমরা সংক্ষেপে সৃষ্টিতত্ত্ব ও সমাজগঠন বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন গুরুতর ও জটিল তত্ত্ব সভ্যতার বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে তোমাদের ধৈর্য্য ও সহানুভূতির দরকার হইবে।

তোমরা সভ্যতার স্বরূপ কি ও কি জন্য উহার প্রয়োজন তাহা বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ ও আমাকে বল।

শ্রীশঙ্কর। সভ্যতার পূর্ণ অবয়ব স্থির করা বোধ হয় অসম্ভব। আজ পর্য্যন্ত তাহা স্থির হইয়াছে কিনা খুব সন্দেহ। মানব জীবনের উদ্দেশ্য লইয়া সমাজ ও সভ্যতার ধারণা পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। মানব জীবনের উদ্দেশ্য এখনও স্থিরীকৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

পরিমল। হার্বার্ট স্পেনসার বলিয়াছেন—Complete life in a complete society is but another name for complete equilibrium between th co-ordinated activities of each social unit and those of the aggregate units অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ মানব জীবন একটি উচ্চস্তরের সমাজের অংশ মাত্র। এইরূপ একটি মানব ও মানব সমাজ লাভ করিতে হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সমষ্টি জীবনের (সমাজের) কার্য্য পরম্পরায় একটা বিশিষ্টরূপ শান্তি বর্ত্তমান থাকার একান্ত প্রয়োজন। আমার বোধ হয় সভ্যতার উদ্দেশ্য এইরূপ মানুষ ও সমাজ প্রস্তুত করা।

বিনয়। উক্ত দার্শনিক পণ্ডিত আরও বলিয়াছেন যে Life is said to be the continuous adjustment of internal relations to external relations. The production of the highest type of man can go on only *pari-pasu* with the production of the highest type of society—অন্তঃকরণের সহিত বাহ্যকরণের ইন্দ্রিয় বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষাই জীবনের উদ্দেশ্য। আবার ঐরূপ সামঞ্জস্যলব্ধ একটা জীবন উচ্চতর সমাজ ব্যতীত প্রস্তুত হইতে পারে না। কাজেই সভ্যতা সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রস্তুত হইতে পারে না। সমাজের সামঞ্জস্যই সভ্যতার উদ্দেশ্য।

বিনয়। "Harmonious co-operation by which alone, the greater happiness can be attained is made possible only by respect for one another's claims; there must be neither these direct aggressions which we class as crimes against person and property nor must there be those indirect aggressions constituted by breach of contracts" আমরা যখন প্রত্যেকে প্রত্যেকের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সহানুভূতির সহিত কার্য্য করিতে শিক্ষা করি তখনি আমরা সকলে উচ্চ ও উচ্চতর সুখ শান্তি ভোগের অধিকারী হই! তাহা হইলে একজন সামাজিক মানব আর জনের শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতি করিতে পারে না। এবং অজ্ঞাতসারেও অন্যের কোনরূপ ক্ষতি আচরিত হইলে সেরূপ আচরণ অসামাজিক ও সমাজ বন্ধনের মূল সূত্রের বিরোধী। সুখ ও শান্তি লাভই সভ্যতার উদ্দেশ্য।

মুখোপাধ্যায়। সকলেরই মত শুনিলাম, কিন্তু কই তোমরা ত কেহই বলিলে না—তোমাদের স্থিরীকৃত সমাজ ও সমাজ অঙ্গকে (ব্যক্তিকে) কোন্ জিনিস শাসন করিবে, সমাজের ও ব্যক্তির শিক্ষক বা গুরু কে থাকিবে?

শ্রীশঙ্কর। তাহাকেই "Moral standard' নৈতিক Ideal বা দৃষ্টান্ত বলা হয়। নীতি পরিচালিত না হইলে সমাজের সুশৃঙ্খলা থাকিতে পারে না।

বিনয়। "আবার 'with complete adaptation to social state, the element of moral consciousness disappears" অর্থাৎ সমাজের উন্নত অবস্থায় নৈতিক নিয়মের বাধ্য বাধকতার ভাব অপসারিত হইয়া যায়। তখন ব্যক্তিটির সকল কাজ সকল চিন্তাই নৈতিক নিয়মে আচরিত হইতে থাকে অর্থাৎ যেন কলে চলে। সে ব্যক্তির দ্বারা অনৈতিক কার্য্য ঘটে না, কাজেই শাসকের দরকার হয় না—কুমরের চাকা না ঘুরালেও ঘুরিতে থাকে।

মুখোপাধ্যায়। কোন্টা ন্যায় আর কোন্টা অন্যায়—কোন্টা ঠিক বা কোন্টা অঠিক—কোন্টা ভাল বা কোন্টা মন্দ—ইহা কোন্ মাপকাট দিয়া স্থির করিবে, বল দেখি।

শ্রীশঙ্কর। নীতি জ্ঞান (moral standard) সকলের সমান নহে। সমাজ ও শিক্ষার ফলে সে জ্ঞানের তারতম্য দৃষ্ট হয়। কাজেই নীতিজ্ঞানের একটা নির্দ্দিষ্ট মাপ কাটি হইতে পারে না।

মু। তবেই তুমি যে Harmonious equilibrium এর কথা বলিলে তাহা শুধু moral Ideal দ্বারা পরিচালিত হইলে, লাভ করা যায় না। নীতি সার্ব্বজনীন হওয়া দরকার। এখন ভাবিয়া দেখ এইরূপ সার্ব্বজনীন নৈতিক আদর্শ কোথাও পাও কিনা।

শ্রীশঙ্কর। ইহার উত্তরে এই বলতে পারি যে নীতি যখন ধর্ম্মের দ্বারা শাসিত হয়েন তখন বোধ হয় অল্প বিস্তর ভাবে তিনি সার্ব্বজনীন হইতে পারেন।

মু। ধর্ম্ম মানে তোমরা যাহা বুঝিয়া থাক তাহা ত নানা প্রকারের ; যেমন খৃষ্ট, মাহম্মদীয়, পারসিক, বৌদ্ধ ইত্যাদি। তাহা হইলে এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মের শাসিত নীতিও বিভিন্ন হইয়া পড়ে। আর কি হইতে পারে বল দেখি।

শ্রীশ। যাঁহাকে লইয়া বিভিন্ন ধর্ম্ম তিনি ত এক সুতরাং নীতি যখন সেই একমেবাদ্বিতীয়ং দ্বারা শাসিত হয়েন, তখনি ধর্ম্মও এক হয় এবং নীতিও এক হয়। তখন আর Harmonyর ব্যাঘাত হয় না।

মু। সুন্দর কথা। কিন্তু সেই পরমেশ্বরকে যদি বিভিন্ন ভাবে দেখা যায় তাহা হইলে ত বিভিন্ন Ideal দ্বারা নীতি শাসিত হইবে। সেই গোলমাল থাকিয়া যাইবে। মানবের মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকিয়া যাইবে। সমাজ সাম্যাবস্থা লাভ করিতে পারিবে না।

শ্রী। সকল মানুষ, জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহা একই ভাবে চিন্তা করিতে পারে না। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে যেমন সিদ্ধান্ত করে তাহার ধর্ম্ম ও ঈশ্বর তদনুরূপ ভাবে চিত্রিত হয়েন। সে মানব শ্রেণীর সেই দৃষ্টান্ত লাভেই তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। যখন সকলে সমান নহে—সকল দেশ সমান নহে—সকল সুযোগ সর্ব্বত্র মিলে না, তখন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নরূপ নীতিশাসকের দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইতে বাধ্য।

মু। কিন্তু তুমি স্বীকার কর যে ঈশ্বর এক এবং তাঁহার অনুগ্রহ সকল মানবে সমান ভাবে বিতরিত হইয়া থাকে। যদি তাহাই হয় তবে মানব জাতির পক্ষে তাঁহার সেই সার্ব্বজনীন চিত্র কেন দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, তাহার কি কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাইতে পার ?

শ্রীশঙ্কর। আমার বোধ হয় যখন সকল সমাজ সভ্যতার উৎকর্ষে জীবনের উদ্দেশ্য এক বস্তু ইহা ঠিক করে, তখন বিভিন্নতার অভাব হইয়া যায়। সে যেখানে যে সমাজে থাকুক—এক স্থানে দৃষ্টি স্থির হওয়ায় "পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।" পরস্পরের সহানুভূতির দ্বারা এক দৃষ্টান্তে উপস্থিত হয়।

মুখো। তা হলে এখন বুঝিতে পারা গেল যে সভ্যতার মূলে নীতি, নীতির শাসক ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের পরিচালক ঈশ্বর। অবশ্য তোমাকে বলিতে হইবে না যে শিক্ষা বিনা সভ্যতার সম্ভাবনা নাই। এখন বল দেখি ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝ।

শ্রী। ধর্ম্ম ধৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ধৃ মানে ধরা। যে জিনিষ যাকে ধরে বাঁধে তাহাই সে দ্রব্যের ধর্ম্ম।

মু। তবে সমাজেরও একটা ধরে থাকা ধর্ম্ম আছে।

শ্রী। আছে বৈ কি—তাহাকেই ত সভ্যতা বলে। সভ্যতা, নীতি এবং ধর্ম্মকে পৃথক ভাবে চিন্তা করা যায় না। তিনটি ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত। আবার ঈশ্বরকে ছেড়ে দিলে ধরে থাকার মূল যেখানে তাকে ছাড়া হয়ে পড়ে।

মু। এখন পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টির কথা মনে কর। ঈশ্বর সৃষ্টিকে ধরে আছেন—সুতরাং তাঁহারও ত একটা ধর্ম্ম আছে—সেটা কি বল দেখি।

শ্রী। সৃষ্টি করা, সৃষ্টি রক্ষা করা ও সৃষ্টি লয় করা—এই তিন প্রকার ধর্ম্ম লইয়া ঈশ্বর-ধর্ম্ম মনে হয়। সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই এই তিন ধর্ম্মের পরিচয় দিয়া থাকে।

মু। আচ্ছা, এই তিন কার্য্যের জন্য কি কোন নীতি বা আইন (Legislation) দরকার হয় না ?

শ্রী। অবশ্যই নীতি আছে বৈ কি—নতুবা এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এক সূত্রে এক অব্যাহত গতিতে এক অদ্ভূত সামঞ্জস্যময় ভাবে কিরূপে রক্ষা হইতেছে। সেই গুলিকে "Natural laws" বলে। এবং এই আইন কানুনগুলির অনুসরণ করিবার চেষ্টাতেই শিক্ষা বিস্তার। যে জাতির সভ্যতা যত উন্নত ও স্থিতিবান সে জাতি তত এই Natural law গুলি মানিয়া চলেন।

মু। এই আইনগুলিই বেদে ঋত, সত্য, তপস্যা ইত্যাদি অর্থাৎ নিয়মে স্থিতি নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং বেদ চাষার গান নহে। সমাজ এক একটি মানুষ লইয়া গঠিত হয় কাজেই সমাজ দেহ ব্যক্তিগত উপাদানের উপর নির্ভর করে। আমরা এবার ব্যক্তিগত ধর্ম্ম নীতি ও সভ্যতার বিষয়ে আসিয়া পড়িলাম।

এখন বল দেখি একটি মানুষ কি কি লইয়া বর্ত্তমান ?

শ্রী। শরীর ও মন।

মু। তা হলে শরীর ও মনকে ধরে রাখার একটা ধর্ম্ম আছে।

শ্রী। নিশ্চয় আছে সেই ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি কি তাহার প্রচার জন্যই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও মনো বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

মু। বেশ কথা, মনের আশ্রয় যদি শরীর হয় তবে "শরীরং আদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" একথার বেশ মুল্য আছে। তাহা অস্বীকার করা যায় না। এখন স্বাস্থ্য রক্ষার আইন বুঝিতে গেলে আগে দেখিতে হয় শরীর কি নিয়মে গঠিত হয়েছে। বল দেখি শরীরে কি কি আছে ?

শ্রী। রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, মেধ, শুক্র ও ওজ এই কয়টি শরীরে আছে।

মু। তা হলে শরীরেও একটা সমাজ আছে। সে সমাজেও Harmony দরকার, কেমন নয় ? তার উপর আবার মন আছে। মনের কথা পরে বলিব। এখন ভাবিয়া বল শারীরিক এই সমাজে কি করে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়।

শ্রী। বায়লজিষ্ট বলিয়া থাকেন, নানা জাতির মানুষ বিভিন্ন প্রকারে শরীর রক্ষার ব্যবস্থা করেন। মোটামুটি (১) আহার, (২) বিহার, (৩) জলবায়ু, (৪) অভ্যাস, (৫) সংসর্গ ও (৬) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এই কয়টি জিনিষের উপর শরীর-সমাজ নির্ভর করে।

মু। তা হলে একটা সভ্য মানুষ ভাবিতে গেলে আগে তোমার কথিত ছয়টা জিনিষও দেখা দরকার। কাজেই এক এক করিয়া উহাদের বিষয়ে চিন্তা করা যাক। আচ্ছা আগে ভাব আহারের দরকার কি।

শ্রী। বায়লজিষ্টগণ আহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন না। আমার বোধ হয় ক্ষুন্নিবৃত্তি, শরীররক্ষা ও শক্তিসংগ্রহের জন্যই আহার।

মু। তুমি যাহা বলিলে তাহাত বটেই, তাহা ছাড়া "বংশত্ব" রক্ষা অর্থাৎ আহারের উপর Breed of the race নির্ভর করে। বংশত্বের রক্ষা কত গুরুতর তাহা সংক্ষেপে পূর্ব্বে বলিয়াছি

তাহা হইলে শরীর সমাজে Equilibrium রাখিতে গেলে আহার্য্যের বিচার বিশেষ প্রয়োজনীয়। শরীরের মধ্যে বিবাদ বেধে গেলে অচিরে শরীর ধ্বংস ও বংশত্ব নষ্ট হইয়া যায়। তাহারই নাম অকাল মৃত্যু বা অপমৃত্যু ও কুলপাংশুলত্ব বা কুলাঙ্গারত্ব।

শ্রী। সকল সময় কি এক Dietatics সকল মানুষের পক্ষে প্রয়োজ্য হইতে পারে, কখনই না।

মু। আমি ত তাহা বলিতেছি না। তবে দেখিতে চেষ্টা করিব মানুষের আহার্য্য কি হইলে শরীরে যুদ্ধ উপস্থিত হয় না, শরীরসমাজে দীর্ঘকাল স্থায়ী একটা Equilibrium প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এখন তোমাকে গুণ কর্ম্মবিভাগে যে চারি জাতি মানবের কথা বলিয়াছি তাহা স্মরণ করিতে বলি। ব্রাহ্মণের আহার ক্ষত্রিয়ের নয়—আবার ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের আহার অন্য দুই জাতির হইতে পারে না। আবার জলবায়ুর তারতম্যে আহার্য্যের তারতম্য হইতে বাধ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির শরীর সমাজে তাহাদের বৃত্তি হিসাবে সামঞ্জস্য রক্ষা কল্পে আহার্য্যের ব্যবস্থা না করিলে শরীরে যুদ্ধ হইবে। শরীরে যুদ্ধ হইলে সমাজেও যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। কাজেই আর্য্যগণ চারিজাতির সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া তৎসঙ্গে আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

এখন বল দেখি আহার্য্যের কোনটা ভাল কোনটা মন্দ হঠাৎ কি করে মানুষ বুঝিবে।

শ্রী। ইহা বলা বড় কঠিন, আমার এবিষয়ে কিছুই জ্ঞান নাই। তবে ইন্দ্রিয় গণের দ্বারা বা বহুদর্শিতার ফলে অনেকে অনেক কথা বলেন। অভ্যাস ও শিক্ষার ফলে প্রকৃত পদার্থকে বেশ করে ঢাকা দিতে পারা যায়। পচা মাছ খুব ঝাল ও তৈল দিলে সুখাদ্যে পরিণত হয়, একজন হয় ত পচা মাংস উপাদেয় জ্ঞানে ভোজন করে আর এক জন হয়ত তাহা দেখিলে চমকিয়া উঠেন। কেহ বা সাপ ব্যাঙ, তেলাপোকা প্রভৃতিকে উপাদেয় আহার্য্য ভাবে আবার অন্যে তাহা দেখিয়া ঘৃণায় পলাইয়া যায়। মানুষ খায় না এমন জিনিস নাই বলিলেও চলে। আমার বোধ হয় মানুষ নিজের প্রকৃত খাদ্য কি তাহা জানে না।

মু। এবং তজ্জন্যই মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ হইয়াও সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে রোগ ইত্যাদি বেশী ভোগ করে। অবিচারে আহারের ফলে—সেই ব্যক্তিই যে কষ্ট পায় তাহা নয়—তাহার সন্তান সন্ততি প্রভৃতি তাহার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। ফলে তাহার বংশের মধ্যে একটা গোলমাল চিরদিনের জন্য ঢুকিয়া যায়। এমন কি সেই ব্যক্তির গৃহ পালিত পশু পক্ষীও কষ্ট পায়। কিন্তু বিবেচনা করিলে দেখা যায় মানুষের খাদ্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং মানুষ কি লইয়া তাহা চিনিবে তাহারও সেই পরম দয়ালু আয়োজন করিয়াছেন। মেডিকেল জুড়িসপ্রুডেন্স জানাইয়া দিয়াছে যে কতকগুলি খাদ্য বিষাক্ত—যেমন উদ্ভিদের মধ্যে ব্যাঙের ছাতা, মাংসের মধ্যে অনেক প্রকার Hems, মৎস্যের মধ্যে অনেক Shellfish ও মাংসাসী মৎস্য। Ichthylogist বলিয়া থাকেন কতক মৎস্য গর্ভধারণ কালে ভীষণ বিষাক্ত হয়। আবার আমেরিকার নিরামীষ ভোজী দল কত প্রমাণ দ্বারা দেখাইতেছেন যে মানুষ তাহার শরীর গঠন অনুসারে ফলমূলাশী। মানুষের চুয়াল ও পাকস্থলী গঠনে বুঝা যায় ইহারা ফলমূলাসী। বাঘ ও কুকুর ইহারা মাংসাসী জীব। ইহাদের দন্তাদির গঠন এবং পাকস্থলীর পরিমাণ মানুষের সঙ্গে তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষের

পাকস্থলী গরু ছাগল প্রভৃতি জীবের ন্যায় অত্যন্ত দীর্ঘ; কিন্তু কুকুরের বা বাঘের পাকস্থলী অতি ক্ষুদ্র।। মাংসাদি পরিপাক করা অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং উহা শীঘ্রই পচিয়া উঠে; কাজেই যদি দীর্ঘ পাকস্থলীতে দীর্ঘ কাল আবদ্ধ থাকে তবে শরীরকে রুগ্ন করিয়া ফেলে। মানুষের পাকস্থলী লম্বা হওয়ায় মাংসাদি খাদ্যকে দীর্ঘকাল শরীরাভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকিতে হয়। কিন্তু বাঘ প্রভৃতির ক্ষুদ্রতর পাকস্থলী হওয়ায় শীঘ্রই মাংসাদি বাহিরের পথ খুঁজিয়া লয়। ইহাও দেখা যায় যে মাংসাসী জীব তরল পদার্থ (জল ইত্যাদি) চাটিয়া খায় (বাঘ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি); আর উদ্ভিজ্জাসী জীব (গরু, ছাগল, হরিণ) প্রভৃতি তরল পদার্থ টেনে সেবন করে। মানুষ জল চমুক দিয়ে খায়, আর চেটেও খেতে পারে। ইহাতে মানুষ যে কতকটা পরিমাণে মাংসাসী তাহা দেখা যায়। তাহা হইলে এখন বিচার্য্য বিষয়—কোন্ ফল মূল এবং কোন্ কোন্ মাংসই বা মানুষের খাদ্য হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিও জীব মাংস মাত্রে Secondary Product গো, মেষ, ছাগ, হরিণ প্রভৃতির মাংস উদ্ভিজ্জের Secondary Product. কুক্কুট, পায়রা, হাঁস, হড়িয়াল, ঘুঘু প্রভৃতি পক্ষীর মাংস জীবদেহের Secondary Product. এই জন্য মেয়েলী কথাতেও আছে পাখীর মাংস খাইতে নাই। জীবদেহ মাত্রেই একটি অপূর্ব্ব যন্ত্র। উদ্ভিজ্জের যে পরিবর্ত্তন ছাগাদির যন্ত্রে হয় ঠিক সেইরূপ পরিবর্ত্তন মানুষের যন্ত্রাদিতে হয় না। পরমেশ্বরের সৃষ্টির এইটিই মহত্ত্ব যে একটি যন্ত্র বা একটি রেণু অপরটির মত নহে। ছাগের ভিতর যে কেমিকেল কার্য্য বলে ছাগ মাংস হয় মানুষের শরীরে ঠিক সেই কার্য্য হয় না। সেই পূর্ব্বোক্ত নীমের ও আমের গুঁড়ি দিয়া জলশোষণ চিন্তা কর। ভাস্করানন্দ স্বামী বা বিশুদ্ধানন্দ স্বামী শাক বা ঘাস খেয়ে যে মাংস লাভ করিয়া ছিলেন—ছাগল বা মেষ সেই শাক বা ঘাস খাইয়া ঠিক সেই মাংস দেয় না। তবে যতটা সম্ভব এদের মাংস allied মাংস—মানুষে খেতে পারে। পক্ষান্তরে পক্ষীগণ অন্য জীবদেহ খাইয়া জীবিত থাকে; সে জীব কি খায় তাহার ঠিকানা নাই। কেও কেঁচো খায়, কেও মাটীর পোকা খায়—কাজেই কি ভীষণ অন্ধকারে থাকিয়া আমরা পক্ষীমাংস ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা সহজেই অনুমেয়। পূর্ব্বোক্ত inter-marrying race যেরূপে ধ্বংস পায় দেখিয়াছি, সেইরূপ মানুষের দেহে পক্ষী মাংস বা জীবাহারী জীবের মাংস ক্রমে ক্রমে একটা ধ্বংস ব্যাপার আনিয়া দিয়া "ব্রীড"টাকে একবারে নষ্ট করিয়া দেয়—যদিও এর ফল আপাততঃ দেখা যায় না। কিন্তু একটা Race যেমন একদিনে হয় না, সেইরূপ একশ দুশ বছর এ বিষয়ে অল্প কাল মাত্র।

তোমাকে বোধ হয় বলিতে হইবে না যে মানুষ বা অন্য জীব যাহা আহার করে তাহার সারাংশ শরীর পুষ্টিতে গৃহীত হইয়া বাকিটা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু এইরূপ পরিত্যক্ত পদার্থতেও যবক্ষার, জিলটিন্, প্রভৃতি কতক অংশে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু তাহা বলিয়া সেইগুলি আর সেই মানব শরীরে গৃহীত হইতে পারে না। তুমি বিজ্ঞান সাহায্যে সেই সকল পদার্থের যতই আকারান্তর কর—তাহা মানুষের শরীরগঠনে আর কাজে আসে না। কেঁননা সে জিনিষ ঠিক খাদ্য দ্রব্যের প্রথমাবস্থার গুণ আর পায় না—বিজ্ঞান দ্বারা তাহা প্রমাণ হউক বা না হউক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যাক—একটি অহিফেন-সেবী মনুষ্যের পরিত্যক্ত দ্রব্যে নিশ্চয়ই অহিফেনের অংশ থাকে; সেই পরিত্যক্ত দ্রব্য যে কাক খায় সে অহিফেনের বিষ শরীরে প্রাপ্ত হয়। সেই কাক যদি অন্য জন্তুতে আহার করে তবে তাহার শরীরে ঐ অহিফেন প্রবেশ করে। রোগের বীজাণু যেরূপ অন্যের শরীরে প্রবেশ করে—ইহাও ঠিক সেই নিয়মের বশবর্ত্তী। [শেষাংশ ১১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কাজের গোড়া

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ শেঠ

রামপ্রসাদের বিখ্যাত গান—"মন হারালি কাজের গোড়া"। ঐ গানেই আছে—"মিছে এ দেশ ও দেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল যোড়া"। ঐ গানেই আবার কাজের গোড়া ধরাইয়া দিয়াছে—"শ্যামা মা তোর হেমের ঘড়া।" রামপ্রসাদের এ গান মানবতার কোন ভূমির সত্যোপলব্ধি তাহা লইয়া মত ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু আজ পৃথিবীর ইতিহাসের যে যুগ চলিতেছে, তাহাতে সভ্য অসভ্য কেহই যদিও অত বড় দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের অদৃষ্ট বিশ্বাসকে একেবারে উড়াইয়া দিবার সাহস রাখে না, তবে বিধির লিপির সহিত মানুষের চেষ্টার সামঞ্জস্য খুঁজিবার জন্য একটা বিরাট চেষ্টা আজ কাল বর্ত্তমান। রামপ্রসাদের অদৃষ্টবাদ কর্ম্মত্যাগ শিক্ষা দেয় নাই, "কাজের গোড়া"র সন্ধানেই তাহা সুপরিস্ফুট। তবে রামপ্রসাদ এদেশ সেদেশ করিয়া বেড়াইবার ব্যর্থতাই শিখাইয়াছেন—এদেশ সেদেশ যাহাতে বাহিরের প্রকৃতি তোমায় ভূতের মত ভ্রাম্যমাণ করিয়া লইয়া বেড়ায়, আজ এটা কাল ওটা আশ্রয় বা অবলম্বন ধরিবার প্রলোভন যোগাইয়া দেয়, সেইটার মরীচিকায় মগ্ন হওয়া যে একেবারে বৃথাই তাহাই তিনি শিখাইয়াছেন। আবার সেই শিখাইবার ধারা একেবারে ভারতের যুগযুগান্তের ধারা—

কাল করেছে হৃদয়ে বাস
বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া
ওরে সেই কালের কর বিনাশ
ন্যাস ধররে মন্ত্র সোড়া।

যে কাল হৃদয়ে বাস করে, যাহা শালের কোঁড়ার মত বাড়িয়া হৃদয়কে ব্যথিত করে, আচ্ছন্ন করে, সেই কালের বিনাশ করিতে হইবে ইহাই তোমার আমার কেন সকল মানবেরই কাজ। সেই কাজের ধারা হইল যে মন্ত্র সহনশীল হয়, যে মন্ত্রকে সহ্য করা যায়, যে মন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, অধিকার ও পারম্পর্য্য ধারার অনুকূল, যে মন্ত্র বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে গুল্ম, গুল্ম হইতে ডাল পল্লব ফুল ফলে সুশোভিত হইয়া ক্রমে ছায়া সুশীতলদায়ী, নানা দিগ্দেশচারী পক্ষীকুলের কুলায়ধারী মহা মহীরুহে পরিণত হইবার শক্তি ধরে, সেই মন্ত্র ন্যাস কর, আকণ্ঠ আকাশে তাহা লইয়া পরিপূর্ণ কর। ইহাই হইল তোমার কাজ, কেননা "শ্যামা মা তোর হেমের ঘড়া"। কাল জয় করিতে হইবে, মানুষ জনম লয় ঐ কাল জয় করিবার জন্যই। কাল অনন্ত, অনাদি কিন্তু কালের অনন্তত্ব, অনাদিত্ব শ্যামা মায়ের চরণ তলেই পড়িয়া থাকে। মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে রাখিয়ে চরণ তলে, আয় মা নেচে তালে তালে, দেখব তোরে নয়ন মুদি—ইহাই হইল ভারতের ধারা।

কিন্তু এইখানেই আজ গোল বাধিয়াছে। সবাই আজ কাল যুগ ধর্ম্ম, কালের ভেরী, বর্ত্তমানের দুন্দুভি, তালে তালে পা ফেলা বলিতেছে, আর শিখাইতেছে তোমায় এই যুগধর্ম্ম মানিতে হইবে। কিন্তু মানুষ যে কি চায়, চাহিবার বস্তু যে কি, কাম্য যে কি, তাহার কোনও খোঁজ রাখে

না। কালের ভেলকীতে ভুলিয়া গেলে নিত্য, সত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, শাশ্বত, সনাতন, অবিনাশী, অজর, অমর, বস্তু যাহা লাভ করিলে অপর কোন লাভের আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত থাকে না, সেই বস্তুকে হারাইয়া ফেলিতে হয়। তখন ঐ কালই যে শালের কোঁড়ার মত বাড়িয়া বাড়িয়া হৃদয়কে আতুর ও মোহগ্রস্ত করে সেটা ভুলাইয়া দেয়। ফলে, আকাশভরা আক্ষেপ ও হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠে—

তুই কাচ মূলে কাঞ্চন বিকালি
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া।

আজ আমরা এ তত্ত্ব হারাইতে বসিয়াছি বলিয়াই মনে হয়। মিছামিছি এদেশ ওদেশ করিয়া বেড়াইতেছি, তাই কাচমূলে কাঞ্চন বিকাইয়া দিতেছি।

কথাটা প্রত্যেক মানুষের, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের, প্রত্যেক ব্যক্তিগত ঘটনার ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া কথাটা পাড়িয়াছি। অথচ আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য ও চিন্তা ধারার ভিতর এমন কতকগুলি লক্ষণ পরিস্ফুট যাহা এই সত্যকে ভুলাইবার জন্য নিযুক্ত। একে একে বলিতেছি।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসুলভ যাদুকরী ভাষায় গোল টেবিল বৈঠকের যুক্তিযুক্ততা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। একই প্রবন্ধের ভিতরে তাঁহার প্রথম ও প্রধান বক্তব্য এই যে ঐ বৈঠকে মহাত্মা গান্ধি না গিয়া ভাল করিলেন না, ও শেষ ও গৌণ কথা এই যে মহাত্মাজীর দৃঢ়তার উপর আস্থা রাখি। একই প্রবন্ধে দুইটী বিরোধী মত যে নিজের সংশয় এবং ভারতের চিরন্তন সত্য যে "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" তাহা জানিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার। বাঙ্গলার আধুনিক সংবাদপত্র সেবী, সংবাদপত্র পাঠক, সংবাদবাহী আন্দোলনকারী অধিকাংশই এই প্রবন্ধের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। বিলাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মুখপত্র স্পেক্টেটর এই প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া ক্ষুদ্র একটী মন্তব্য লিখিয়াছেন—"আমরা রবীন্দ্রনাথের সহিত একমত নহি, তবে এই স্পষ্টবাদী চিঠিতে ভারতের সুবিস্তৃত জনমত পাই। এই মুহূর্ত্তে ইহা জানা আমাদের অত্যন্ত মহার্ঘ এবং আমাদের অর্থাৎ ইংরাজের সততার প্রতি ভারতবাসীর আস্থা লাভের জন্য এক মহৎ প্রচেষ্টার আবশ্যকতা স্বীকার করি।"

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মূল বক্তব্যটী সংক্ষেপতঃ এই :—

"জাতি বিশেষের স্বার্থ আজ জাতি সাধারণের নৈতিক বিচারের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতির বা দেশের বেড়া অতিক্রম করিয়া, মানব সাধারণ খুব সূক্ষ্ম ভাবে নিখিল বিশ্বের শব্দ শুনিবার ইন্দ্রিয় লাভ করিয়াছে। গত যুদ্ধে আমরা দেখিয়াছি যে একপক্ষে যেমন বিষবাষ্পে শত্রু নিধন করা যায়, প্রপাগাণ্ডা বা মিথ্যা প্রচারের দ্বারা নিখিল মানব-সমাজকে প্রতারিত করা যায়। ইহা দ্বারা একটা অর্থ প্রকট হয় যে পৃথিবীর নৈতিক তৌল দ্বারা নিজের ওজনটাকে গুরু রাখা দরকার—এমন কি সত্য লুকাইয়াও যদি তাহা সম্পন্ন করিতে হয় তাহাও ভাল। বিলাতী প্রবাদ আছে যে কুকুরকে ফাঁসি দিবার পূর্ব্বে, কুকুরটাকে বদনাম দেওয়া চাই—ইহা একটা উচ্চতর নৈতিক ভাবের কথা।

গোল টেবিল বৈঠক ডাকিতে হইতেছে - ইহা সেই নৈতিক তৌলে ওজন রাখিবার চেষ্টা। সমগ্র পৃথিবীর আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত সহযোগিতা করিবার সুযোগ এই বৈঠক দিতেছে।

যত ক্ষুদ্রই সুযোগ হউক, ভগবানের অনেক মহৎ বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারান্তরাল দিয়া লাভ হয়। ত্যাগ ও বিশ্বাস বজায় রাখিয়া ক্ষুদ্র সুযোগও কাজে লাগান উচিত। মহাত্মা গান্ধিই আধুনিক যুগের একমাত্র নেতা যিনি এই বৈঠকের মঞ্চ হইতে রাজনীতির ক্ষেত্রে ভাব বিনিময়ে প্রকৃত সহযোগের ও সভ্যতা সৃষ্টির কালোপযোগী ভাবধারা ফটাইয়া তুলিতে পারিতেন।

তবে ঢাকা ও পেসোয়ারের ব্যথার ব্যথা বোধ করিয়াছি। আমার ভুক্তভোগী দেশবাসী যদি বলে—রাখ, ও সব কথা। নিরস্ত্র ও সহায়হীন আমরা পৃথিবীর কাছে নিবেদন করিতে চাই না। আমরা আর ভয় করি না—প্রতিকার চাহি না—আমরা ছাড়া আমাদের আত্ম সম্মান আর কে রাখিবে? তবে আমার কোন জবাব নাই। আমার দেশের লোক যুগের পর যুগ মানুষের আত্ম-শক্তিতে অনাস্থা পোষণ করিয়া আসিয়াছে। আজ সেই মূক জনগণের হৃদয়ে মহাত্মাজীর সাহস সঞ্চরণ করা একটা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার। কাজেই তাহার সমীচীনতায় সন্দেহ করিতে আমার সাহস হয় না। তাহাই হউক, তাঁহার দৃঢ়তার উপরই আমার আস্থা থাকুক, নিজের সংশয়ের উপর নহে।"

দুইটা প্রসঙ্গ এই ব্যাপারে তুলিলে চলিবে না। প্রথমতঃ গোলটেবিল বৈঠক বসিবার সময় রবীন্দ্রনাথের মতের সংগ্রহ করার লাভ কাহার? পৃথিবীর নৈতিক তৌলদণ্ড কাহার হাতে আছে আমরা জানি না; কিন্তু নৈতিক তৌলদণ্ডে ঐ বৈঠক ওজন হইতে পারে—ইহা ইংরাজ ছাড়া জর্ম্মন বা রুস বা মার্কিন যাহাদের সহিত রবীন্দ্রনাথ কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে ঘনিষ্ঠভাবে ভাব বিনিময় করিতে ছিলেন তাহারা কেহ কি তাঁহাকে জানাইয়াছিল? আর যদি জানাইয়া থাকে, তবে তাহা মহাত্মাজীকে অবগত করান বা অবগত করাইবার সুযোগ অন্বেষণ জাতি সাধারণ বা মানব সাধারণের কাছে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অতীব গুরু দায়িত্ব ছিল কি না? সম্ভবতঃ কেহই তদ্রূপ কিছু জানায় নাই। তাহা হইলে বৈঠক বসিবার সময় মহাত্মাজী যে একটা সুযোগ হারাইলেন তাহা বিশ্বকবির দ্বারা প্রপাগাণ্ডা করাইয়া লাভ কাহার? আমরা জাতি সাধারণও জানি না মানব সাধারণও জানি না; জানি ভারতবাসীর ব্যথিত আতুর জনসাধারণ। তাহাদের হইয়া এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার আমরা দাবি করি।

দ্বিতীয়তঃ মহাত্মাজীর ভুলটা হইল যুক্তির সিদ্ধান্ত। তাহার সমীচীনতায় আস্থা হইল ভাবের উচ্ছ্বাস, ব্যথার ক্রন্দন, পদ্মিনীর জহরব্রত! কাজেই কবিবরের আস্থাকে জাতি সাধারণ বা মানব সাধারণ আত্মীয়তার আকুলতা বলিয়া ক্ষমা করিবে, নাটকীয় অবস্থানের উৎকর্ষ বলিয়া বাহবাও হয়ত দিতে পারে, করতালির প্রলোভনে উৎসাহিতও হয়ত করিতে পারে, কিন্তু যে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি মানুষের আদান প্রদানের খতিয়ানের কৈফিয়তে প্রকাশ পায়, সেই অভিব্যক্তিতে যে যুক্তির সিদ্ধান্তই পাকা খাতার জমা। তথায় ভাবের ঠাঁই অন্ততঃ কবিবরের জাতি সাধারণ বা মানব সাধারণ এখনও কেহই দিতে শিখেনও নাই, ইচ্ছুকও নহেন। কাজেই তাঁহার যৌক্তিক অযৌক্তিকতার সিদ্ধান্তই টিকিয়া যাইবার কথা। কবিবর ইহা বুঝিয়া ও তাঁহার যুক্তি ধারার প্রতি আস্থা রাখিয়া পৃথিবার নৈতিক তৌলে ওজন রাখিবার জন্য এবং মানব সমাজের আধ্যাত্মিক সহযোগিতা লাভের জন্য নিজে ঐ বৈঠকে স্থান লভিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিনা ও সেই চেষ্টার বিফলতা কেন হইয়াছে, আমরা তাহা জানিবার ও বুঝিবার আশা রাখি।

কিন্তু দাবি পেশ করিয়া বা আশা জানাইয়া আমরা ক্ষান্ত হইতে পারি না। তাঁহার প্রবন্ধ আমরা তিনবার পড়িয়াছি তিন বারই বলিয়াছি—চমৎকার। দুই দিক রক্ষা করিবার অমোঘ উপায়। বৈঠকের উদ্দেশ্যের প্রতি একটা সশ্রদ্ধ সহানুভূতি ও তাহার অনুকূলে আধুনিক সভ্যতার চিন্তাধারার সামঞ্জস্য রক্ষা—অপরদিকে ভারতবাসীর হৃদয়ের ব্যথার নির্ভীক প্রতিধ্বনি আর সঙ্গে সঙ্গে এতদুভয়ের উপরে নিজের নিরাসক্ত বিচার ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা। ইহাকে যদি চমৎকার না বলিব, তবে যে নিজেকেই ঠকিতে হয়। কাজেই বলি চমৎকার!

এখন রবীন্দ্রনাথের যুক্তিটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক্। গোলটেবিল বৈঠকের যুক্তিযুক্ততা সমর্থন করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে কুকুরকে ফাঁসি দিবার পূর্ব্বে কুকুরটার বদনাম করার আবশ্যকতা স্বীকার করাই হইল একটা উচ্চতর নৈতিক আদর্শকে মানা। এই যুক্তির পূর্ব্বেই অথচ তিনি ধরিয়াছেন যে আধুনিক রাজনীতিতে সত্যকে বেচিয়াও নৈতিক শক্তিকে নিজের পক্ষে টানিয়া লওয়ার চেষ্টা চলে। তবে কি ভণ্ডামির ভিতর গভীরতর সামাজিক ক্ষতি নাই? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সমাজ সংস্কারকের দল হিং টিং ছট্ হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্র তন্ত্র জপপূজার বিরুদ্ধে কত না অসম্ভব নিন্দা প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, হরিনামের ঝুলির ভিতর কত না সুদ কষার অঙ্ক খুজিয়া লইয়াছেন, নামাবলীর অন্তরালে কত না ভোগের লালসার গন্ধ পাইয়াছেন! অথচ এ ক্ষেত্রে তাহা খুজিয়া না পাইয়া উচ্চতর নৈতিক আদর্শ পাইলেন কি করিয়া? কুকুরকে ফাঁসিই যদি দেওয়া হয়, তবে ব্যবহারিক জগতে তাহার বদনাম থাকুক আর নাই থাকুক তাহাতে আসে যায় কি? বরং বদনাম দেওয়ার আবশ্যকতা যুক্তিযুক্ত স্বীকার করাই মানব সাধারণকে ঠকাইবার প্রবৃত্তির প্রশ্রয়-দেওয়া ও লোকের ঠকিবার সুযোগ সৃষ্টি করা নহে কি? ইহা যদি উচ্চতর নৈতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা হয় বা শ্রদ্ধা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ব্যক্তি বিশেষের বা জাতি বিশেষের পক্ষে নৈতিক আদর্শের সুবিধাবাদের বিশেষত্বও স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলেই সেটা আর নীতি-রাজ্যের কোনও সার্ব্বজনীন সত্যভূমিতে অবস্থিত থাকিতে পারে না। সুবিধাবাদের কালোপযোগী মায়ারূপ মাত্র দাঁড়ায়। সুতরাং যে নীতির দোহাই দিয়া তিনি গোলটেবিল বৈঠকের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করিতে চান, সে নীতির কিছুই টেঁকে না।

তাহার পর—মহাত্মাজী এই বৈঠকের মঞ্চ হইতে রাজনীতির ভাববিনিময়ে নূতন যুগের অধ্যাত্ম (spirit of the age) ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন। এই যুক্তির মৌলিক ভিত্তি হইল আধুনিক যুগের মানব সাধারণের বিশ্বপ্রসারিণী ভাষণশক্তি ও শ্রবণশক্তির কল্পনা। ভাব বিনিময় করিতে হইলেই বিনিময়ের বাহন চাই। সে বাহনও ইংলণ্ডবাসী জনসাধারণ। যে 'স্পেক্টেটর' পত্র রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ ছাপাইয়াছে সেই পত্রেরই সম্পাদক তাঁহার মতের সহিত ঐকমত্য অস্বীকার করিয়াছেন! উক্তি মাত্র করা ভাববিনিময় নহে—একথা বলা বাহুল্য। কেন অস্বীকার করিয়াছেন তাহা যদি ঠিক রবীন্দ্রনাথের মতন সুবিস্তারে বলিতেন তবেই ভাব বিনিময়ের সুবিধা হইত। তাহা তাহারা করিতে পারে না। সুদূর সাগর পারে যে মনোভাব চাপা থাকিয়া গেল, কলিকাতা সহরে আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিকের মুখে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনকয়েক পণ্ডিত যখন ব্রেলস্‌ফোর্ডকে লইয়া আদর আপ্যায়ন কালে বলেন যে ভারতের জাতীয় ভাব দ্বারাই পৃথিবীতে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন সেই উক্তির

প্রত্যুত্তরে ঐ সাংবাদিক বলেন, হাঁ এই বাঙ্গলার লোকেরা চিন্তাও করে আর কল্পনার দৌড়ও মারে (thinking and giving play to imagination)। 'স্পেক্টেটরে'র সম্পাদক বলুন আর নাই বলুন তাঁহারও অব্যক্ত মনোভাবও উহাই। তাহার প্রমাণ তাঁহার শেষ উক্তি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়িয়া ইংরাজের সততার প্রতি ভারতবাসীর আস্থা লাভের চেষ্টাই একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহার ভিতর লুক্কায়িত কথাটা এই যে বিশ্বনীতির কল্পনা কল্পনা মাত্র, গোলটেবিল বৈঠকে ভারত ইংলণ্ড এই দুই দেশের সম্বন্ধ বজায় রাখা চাই—তবে ভালভাবে চাই। ঐ বৈঠকের অন্য কোনও যুক্তি যুক্ততা তাঁহাদের কাছে বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয় কথা নহে, যদিও কবি সেই কথাই পাঁচ কাহন করিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি বলিব রবীন্দ্রনাথের পত্র "স্পেক্টেটর" লুফিয়া লইয়াছে। একজন বিশ্ববিশ্রুত-কীর্ত্তি ভারতবাসীর লেখনী হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার এত বড় প্রপাগাণ্ডা তাহারা ছাড়িবে কেন? ইংরাজের সাম্রাজ্যতন্ত্রই হউক, জর্ম্মাণির বা মার্কিনের গণতন্ত্রই হউক, ফরাসীর প্রজাতন্ত্রই হউক, বা রুসিয়ার কর্ম্মিতন্ত্রই হউক, ইহারা সকলেই বিশ্বাস করে যে প্রপাগাণ্ডা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন যে গত যুদ্ধে এই প্রপাগাণ্ডা কিরূপ করিয়া মিথ্যার বিষ প্রচার করিয়াছে। তাহার মূলে যে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ সেই বিশ্বাসকেই শ্রুতির মত অবলম্বন করিয়াছেন—জাতি বিশেষের স্বার্থ আজ জাতি সাধারণের নৈতিক বিচারের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র আধুনিক সভ্যতার পাণ্ডাদের এত বড় দম্ভকে যিনি প্রশ্রয় দেন তাঁহার কথা আদর করিয়া গ্রহণ করিবে বৈকি?

ইংলণ্ড, ফরাসি, জর্ম্মাণি ও মার্কিণের কথা বিখ্যাত। যে রুসিয়ায় প্রকৃত স্বাধীনতা ও জীবনীশক্তির বন্ধনমুক্তি হইয়াছে বলিয়া একটা প্রপাগাণ্ডা চলিতেছে ও আমাদের তথা-কথিত রাজনীতিকরা যাহার কথা কহিতে গদগদ হইয়া উঠেন, সেই রুসিয়ায় প্রপাগাণ্ডার জন্য যে মৌলিক তথ্য রুসের আধুনিক চিন্তার ভিত্তি তাহা জানিলে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে:—

লেনিন বলেন—"যাহা দ্বারা শ্রেণিতে শ্রেণিতে সমর বাড়িয়া যায় তাহাই সন্নীতি।" "যদি কোনও ব্যক্তি বিপ্লবের যুদ্ধ চলিবার বিপক্ষে ক্ষতিজনক কিছু করেন, তবে তাঁহাকে সাবাড় করিবার অধিকার তোমার আছে।"

ল্যাটজি বলেন—"আমরা ব্যক্তি বিশেষকে কেবল সাবাড় করি তাহা নহে, বুর্জোয়া বা যাহারা অবসর ভোগীর শ্রেণী, সেই শ্রেণীকে শ্রেণীকেই আমরা সাবাড় করিতে চাই।" ট্রজকি এই যুক্তির চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বলিয়াছেন—'একটী নিরপরাধ লোককে খুন করিয়া রাষ্ট্র হাজার হাজার লোককে সার্থক ভয় দেখানর কাজ করে'।

এই প্রপাগাণ্ডা প্রবৃত্তি হইতে ফলও ফলিতেছে। গত জুলাই মাসের কোয়াটারলি রিভিউ পত্রিকায় যথার্থই লেখা হইয়াছে Moscow is nothing but a den of coiners where little men are turned out stamped with the image of Lenin—মস্কো মুদ্রাকরের আড্ডামাত্র যেখান হইতে লেনিনের ছাপ লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবককে তৈয়ার করিয়া ছাড়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ যে এ সকল কথা জানেন না তাহা মনে করিতে হইলে তাঁহার খরদৃষ্টিশক্তির অবমানন। করা হয়। রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনিকেও জানেন; তথায়ও ইহাপেক্ষা কোনও উচ্চতর

আদর্শ নাই। তবে তিনি কোন বাস্তবের পরিচয়ে আজ শ্রুতি হিসাবে বিশ্বাস করিতে চাহেন যে—জাতি বিশেষের স্বার্থ আজ জাতি সাধারণের নৈতিক বিচারের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে?

কথাটা অনুসন্ধেয়। রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পূর্ব্বে "গোরা" উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো দিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।" আজ অবশ্য তিনি সেই দেবতাকে শুধু ভারতবর্ষের দেবতা বলিবেন না, সমগ্র পৃথিবীর দেবতাই বলিবেন।

যেদিন "গোরা"র পৃষ্ঠে এই মত প্রচার হয় সেইদিন হইতে এই মতবাদ উদারতার অভিব্যঞ্জনা বলিয়া আমাদের দেশের তথা-কথিত শিক্ষিতের কাছে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। গত মাসের কোনো একখানি মাসিকপত্রে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি বাহির হইয়াছে—

"আমাদের দেশ ধর্ম্মকে ঠিক অধিকার করতে পারেনি। * * * ধর্ম্ম বলতে যদি মোক্ষ বাদই একমাত্র বুঝায়, জীবনকে বাদ দিয়াই ধর্ম্ম হয়, তবে ধর্ম্মবস্তু খুব অসার হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। * * * হিন্দু আজ ধর্ম্ম বলতে (জীবনকে বাদ দিয়ে?) আত্ম প্রতারণা করিতেছে। এত বড় insincerity হিন্দুর মত আর কোথাও নেই। অক্ষমতা যার মূল ভিত্তি, সে জাতি কখনও প্রতিষ্ঠা পায় না"।

ইহার সবটাই রবীন্দ্রনাথের মত বলিয়া ধরিতে পারি। "গোরা"র উদ্ধৃত অংশ—তাঁহার উক্তি—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" আর "স্পেক্টেটরে"র "dumb multitude of India suffering for ages from the diffidence of their own human power" অর্থাৎ ভারতের মূক কোটী লোক যুগের পর যুগ মানবীয় শক্তির প্রতি অনাস্থায় ভুগিতেছে। এই তিনটী উক্তির পুনরুক্তি ঐ মাসিক পত্রের উদ্ধৃত অংশের ভিতর আছে।

কথা উঠিতে পারে আপত্তি করিবার কি আছে? আপত্তির কথা আছে বৈকি? ইহা মতের প্রাধান্যের প্রপাগাণ্ডা মাত্র। বাস্তবের ব্যথা বোধ হইলে কেবল মাত্র নিন্দাবাদে পর্য্যবসিত হইত না। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণমার্গের দিগদর্শন থাকিত। একটা জাতির যুগ যুগান্তের ইতিহাসে তাচ্ছিল্য থাকিত না, জাতি নিন্দার রুচিবিকার থাকিত না, নূতন কিছু করিবার "প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা" বিকট ভাবে দেখা দিত না।

ইহার কারণ কি? বর্ত্তমান ১৯২৯ সালের এক চিন্তাশীল লেখক লিখিয়াছেন—Ibsen understood the sick paradox of the age when he wrote. Suppres individuality and you have no life; assert it and you have war and chaos" বিখ্যাত নাট্যকার ইবসেন বর্ত্তমান যুগের অসঙ্গত সত্যকে বুঝিয়াই লিখিয়াছেন—"ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদকে দমন কর, জীবনকে হারাইয়া ফেলিবে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা কর, যুদ্ধ ও প্রলয়"।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মোহই হিন্দু নিন্দা কাজেই ভারত নিন্দা প্রচারে রত। ফলে দিন দিন দেশে অশান্তি ও বিপ্লব। সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতাই ঐ মোহেই দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, যুদ্ধ, অশান্তি দিন দিন পুঞ্জীভূত করিতেছে। উভয় ক্ষেত্রেই সংশয়, দ্বিধা, সংকোচ আর প্রবৃত্তির তাড়নায় "মিছে এ দেশ ও দেশ করা"। এই অন্ধতমের দিগভ্রমের জন্যই জার্ম্মানির এক

বিখ্যাত দার্শনিক স্বীকার করেন—আমরা এক গভীর গহ্বরের ধারে হাতড়াইতেছি, ওগো ভারত, আলো দাও, আলো দাও।

কিন্তু প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। প্রকৃতির তাড়নায় অহমিকা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অনুকূলে আধুনিকতম বিজ্ঞানের যোগ্যতমেয় উদ্বর্ত্তনবাদ ইন্ধন যোগাইতেছে। আজ ইউরোপ বলিতে চায়—আজ আমরা যখন জয়ী, আমরা যখন নেতা, আমরা যখন কর্ম্মকুশলী তখন জগতের যুগ যুগান্তের ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানবতার যে অভিব্যক্তি হইয়া আসিয়াছে সেই অভিব্যক্তিতে আমরাই যোগ্যতম। ইউরোপের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি সমস্তর মধ্য দিয়া এই অহংতত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হক্সলি মানবসাধারণের নৈতিক লোকে এই যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন মতবাদের অপ্রতিষ্ঠতাই সিদ্ধান্ত করেন। ইহার বিরুদ্ধে পৃথিবীতে আর একটী মাত্র সভ্যতা, একটী মাত্র সাধনা, একটী মাত্র ধর্ম্ম বর্ত্তমান—স্বীকার কর আর নাই কর কিছুই যায় আসে না—আজও তাহা অত্যন্ত কঠোর সত্য ভাবে বর্ত্তমান—তাহা হিন্দুত্ব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুচররা তাহা স্বীকার করিতে চান না। কাজেই তাঁহারা আজ প্রচার করিতে ব্যস্ত—জাতি বিশেষের স্বার্থ আজ জাতি সাধারণের নৈতিক বিচারের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছেন—

কাচ মূলে কাঞ্চন বিকালি
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া।

আমাদের শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায় আমাদের কথায় বিশ্বাস করিবেন না জানি। তাই তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত কোয়াটারলি রিভিউ পত্রিকায় লিখিত সন্দর্ভের খানিকটা উপহার দিতেছি—"Through India, Egypt, China and Persia to Greece 'Logos' represents the idea of divine reason immanent in the world. But nearer it comes to the West the more it loses its original purity and power. • • • The difference between East and West is fundamentally a difference of outlook on human personality. The barrier between us is the barrier of personality. For the sense of personality begets self-consciousness, and self-consciousness begets pride, and pride begets the desire of interference with others, other nations, other creeds, other classes, other men. * • * Ours is the vanity of preacher and politician alike, to whom man is dough to be kneaded in the trough, grass to be trodden in the silo. We are too engrossed in building the follies of our fame, in reading our own undying epitaphs before we go, to pay heed to the sound of threshing and the eternal vintaging of God. "The words that I speak unto you I speak not of myself, but of the Father that dwelleth in me, he doeth the works"—"the words are mine, and the works are mine" is the answer of the West. But the words will die in space and the works will crumble in time, and the memorials of boastful achievements are no

more than the grass-grown graves of common folk. * * * For generations the self-conscious spirit which is also the spirit of possession has prevailed among us. Yet me and mine are but poor ephemeral substitutes for He and His. * * * There is no communion save within the spirit of community, and no community save within the self-obliterating unity of God.

ইহার মর্ম্মার্থ এই :—"ভারতবর্ষ, মিশর, পারস্য হইতে গ্রীস পরমাত্মা এই জগতের অণুতে অণুতে অনুস্যূত দৈবী চিৎশক্তি। এই ভাব পাশ্চাত্য দেশে যতই আগাইয়া গিয়াছে ততই ইহার পবিত্রতা ও শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। * * * মানুষের ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে ধারণা লইয়াই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রভেদ বর্ত্তমান। ব্যক্তির ভেদই ব্যক্তিত্বের বাধা। ব্যক্তিত্ব হইতে অহমিকা জন্মায়, অহমিকা হইতে দম্ভ জন্মায়, দম্ভ হইতে অন্য জাতি, অন্য ধর্ম্ম, অন্য শ্রেণী ও অন্য লোকের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার প্রবৃত্তি জন্মায়। * ° ° আমরা একাধারে ধর্ম্ম-প্রচারক ও রাজনীতিক সাজিয়া মানুষকে লইয়া ময়দা ঠাসিতেছি, চত্বরে ঘাসের আঁটি বাঁধিবার খাস দলিতেছি। আমরা আমাদের যশের খেলানা লইয়া আর নিজেদের স্মৃতিচিহ্ন লইয়া এতই উন্মত্ত যে ভগবান যে স্বয়ং শস্য সম্ভার আছড়াইয়া সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে মনোযোগই দিই না। * * * "তোমাদিগকে যাহা বলিলাম, তাহা আমার হৃদয়েশ পিতার কথা, আমার নয়, আর কর্ম্ম তিনিই করেন" ইহার বদলে পাশ্চাত্য বলে 'কথাও আমারা, কর্ম্ম ও আমার' কিন্তু কথা অনন্ত আকাশে মিলাইয়া যায়, কর্ম্ম কালে ধূলি হইয়া উড়িয়া যায়, আর অহং কর্ত্তার কার্য্যের স্মৃতিচিহ্ন জনসাধারণের ঘাসের কবর হইয়া যায়। * * * পুরুষানুক্রমে আমাদের অহমিকার ভাব দখলি স্বত্বের ভাব পরিগ্রহ করিয়া আমাদের ভিতরে বলবান্। কিন্তু আমি বা আমার তিনি ও তাঁহারের চাঁদের কাছে জোনাকি মাত্র। * * * একটা স্বাজাত্য ছাড়া মিলনের যোগসূত্র নাই। আর অহংডুবান ভগবৎ সত্তা ছাড়া কোনও স্বাজাত্য নাই।" আমাদের ভারতের সাধনার কথা এরূপভাবে ফুটাইয়া বলিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত করিতেছি। আজ গোলটেবিলবৈঠক উপলক্ষে পাশ্চাত্যের যে দম্ভ প্রশ্রয় পাইল, ও ভারতের যে নিজস্বকে অবহেলা প্রকাশ পাইল, তাহার পরিস্ফুট চেতনার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। আজ পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতার সহিত ভারতের সাধনার ও সভ্যতার একটা বিরোধ বর্ত্তমান। আমরা সেই বিরোধকে বিভিন্নতা বলিতে কুণ্ঠিত নহি। কিন্তু তাহাকে অস্বীকার করিয়া যদি বলা হয় যে ভারতের সাধনা ভারতের স্বার্থ মাত্র এবং তাহা জাতি সাধারণের নৈতিক বিচারের বিষয়ীভূত, তবে আমরা রামপ্রসাদের গানে বলি—

শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।

আর সে কথা ভুলিয়া গিয়া যে অন্য কথার পসরা সাজায় তাহাকে স্মরণ রাখিতে বলি

মন হারালি কাজের গোড়া।

[১০৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ] বর্ডিংটনের ডাক্তার হেনরী মণ্টী বলিয়াছেন যে মানুষের পরিত্যক্ত জিনিষে অনেক সার পদার্থ থাকে কিন্তু তাহা বলিয়া উহাকে প্রথম আহার্য্য পদার্থের সহিত তুলনা করা অবৈজ্ঞানিক। যদি আমাদের শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে চাই, যদি আমাদের অপত্যগণের স্বাস্থ্য চাই, যদি বংশত্বকে অবিকৃত রাখিতে চাই তবে এইরূপ ভীষণ economyকে মানুষ মাত্রেরই ঘৃণা করা উচিত। এই জন্যই আর্য্যগণ অখাদ্য ভোজনের প্রতি এত তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন যে অখাদ্য ভোজনকে পারলৌকিক পাপ মধ্যে গণনা করিয়াছেন।

শ্রী। কিন্তু বাস্তব জগতে ত দেখা যায় আমরা অখাদ্য বলিয়া যাহা ছাড়িয়া দিই তাহা আহার করিয়া বহুলোক উন্নত স্বাস্থ্যে বিচরণ করে।

মু। মানুষের প্রস্রাবে অনেক চিনি থাকে কিন্তু তা বলিয়া কি সেই চিনি সদ্য প্রস্তুত ইক্ষু রস হইতে যে চিনি হয় তাহার সমান? অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কিছু তফাৎ দেখা না গেলেও বুদ্ধি দ্বারা বেশ বুঝা যায় উক্তরূপ চিনি ইক্ষুর চিনির সমান হইতে পারে না। আপাততঃ কোন ক্ষতি না করিলেও ইহার পরিণাম নিশ্চয় মন্দ। এর কিছু হ'ল না বা ওর কিছু হ'ল না এটা একটা সাধারণ নিয়ম মধ্যে ধরা যাইতে পারে না। কোন জাতি অহিফেন সেবন করে, কেহবা সেঁকো বিষ খায়, আবার কেহ বা সুরা সেবন করে কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে উহা বিষ। আর্য্যগণ খাদ্য সম্বন্ধেও অত্যন্ত সাবধান হইয়াছিলেন। চরকে আছে যে গোমাংস ভক্ষণেই রক্তামাশয়ের সৃষ্টি হয় এবং এজন্যই গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। গোহত্যা নিষেধ করার যদিও অন্যান্য বহুতর হেতু আছে। তাহা আমাদের এক্ষেত্রে আলোচ্য নহে। চারি জাতির আহার্য্যের বিধি ব্যবস্থা অতি সুচারুরূপে শাস্ত্রকারগণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সংহিতা ও গীতা পড়িলে তাহা দেখিতে পাইবে। ব্রাহ্মণ সাত্বিক আহার না করিলে তাহার গৃহীত বৃত্তিটি উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে না, আবার ক্ষত্রিয় তাহার রাজসিক আহার না করিলে তাহার গৃহীত স্ববৃত্তি যে ক্ষত্রিয়ত্ব তাহা রক্ষা করিতে পারে না। কি বাঁধন যে দিয়াছে ছিঁড়েও ছিড়ে না ভেঙ্গেও ভাঙ্গে না। মিশর, আরব, গ্রীস, রোম প্রভৃতির সভ্যতা সব চলে গেছে, ভারতের সভ্যতা আজও আছে যদিও তাহা ছিন্ন ভিন্ন। একবার ভাবিয়া দেখ একটা profoundest regard না আসিয়া থাকিতে পারে না।

শ্রী। তবেই ত আহার্য্যের পার্থক্যে মানুষের পার্থক্য এবং তার ফলে সমাজের পার্থক্য ঘটিল—সামঞ্জস্য কি করে হবে!

মু। কি করে সামঞ্জস্য হইতে পারে ও হইয়াছিল তাহা বুঝিবার জন্যই এত বকাবকি। সেই মহান সভ্যতা বুঝিবার জন্যই আজ তোমার অনুরোধে ভিক্ষার ঝুলি খুলিতেছি। আহারের বিষয় মোটামুটি আভাষ পাইলে; এখন অন্য বিষয়গুলি দেখা যাক্।

বিহার সম্বন্ধে পৃথক ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই, উহা জল বায়ু ও সংসর্গের মধ্যে আপনি আসিয়া যাইবে। এখন জল বায়ুর কথা দেখা যাক—"Naturalists are aware of the difficulty of acclimatisation, that plants and animals (man beeing no exception) have to encounter when transferred from one country to another"—বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বিশেষভাবে অবগত আছেন যে কি কষ্টে ও কি যত্নে একটি গাছ বা জন্তুতে তাহার

জন্মদেশ পরিত্যাগ করাইয়া অন্য দেশে তাহার নিজ সত্ত্বা রক্ষা করা যায়। তিব্বতীয় চমরী গরু বা নিউফাণ্ডলণ্ডের কুকুর ভারতের সমতল দেশে বেশী দিন বাঁচে না। স্পেন দেশীয় পক্ষী ইংলণ্ডে বাঁচে না। সার রেনল্ড মার্টিন ইউরোপ বাসীর ভারতে বসবাস জন্য যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা দেখিয়া বলিয়াছেন যে, acclimatisation বলে কোন জিনিষ নাই। ডাক্তার হণ্ট ১৮৬১ খৃঃ অঃ ব্রিটিশ এসোসিয়েসনে যে লিখিত পত্র প্রদান করেন তাহাতে বলিয়াছেন যে কাল (time) কখনই acclimatise করিতে পারে না। যদি একপুরুষে acclimatise না হয় তবে তাহা শতপুরুষেও হয় না। বায়লজিষ্টগণ এ বিষযে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন যে হঠাৎ extreme climate (উৎকট জলবায়ু) পরিবর্ত্তনে স্বাস্থ্যের ও বংশত্বের প্রচুর পরিমাণ ক্ষতি হয়।

শ্রী। Herbert Spencer বলিয়াছেন under new conditions every organ, every function of living things undergoes modification to some extent—অর্থাৎ নূতন দেশে নূতন জলবায়ুতে জীবের প্রত্যেক যন্ত্রের, প্রত্যেক যন্ত্রশক্তির পরিবর্ত্তন ঘটে।

মু। আমি স্বীকার করি ধীরে ধীরে acclimatisation সম্ভবপর। ইহা বুঝিবার জন্য আর্য্য জাতির ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন এবং উদ্ভিদাদির পরিবর্ত্তনের বিষয় তোমাকে চিন্তা করিতে বলি। কিন্তু ইহাও সত্য যে হঠাৎ পরিবর্ত্তনে মানুষ বা অন্য জীব বিশেষ কষ্ট পাইয়া থাকে এবং প্রায় নিজ সত্ত্বা হারাইয়া ফেলে। হিমালয়ের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ যদি আর্য্য পিতামহগণের আদি বাসভূমি হয়, তবে তাঁহাদের শারীরিক ও আভ্যন্তরিক গঠন গুলি সেই প্রদেশের প্রাকৃতিক নিয়মে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাজেই তাঁহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন climatic conditionএর দেশে যাইতে সততই ভয় পাইতেন। ক্রমে ক্রমে জন্মভূমির গুণে তাঁহাদের বংশে সেই দেশের প্রাকৃতিক নিয়মে একটি বিশেষত্বের উৎপত্তি হয়। বংশের বিস্তারে জাতির সৃষ্টি হয়। বাহ্যকরণের গঠন অন্তঃকরণের গঠন দ্বারা গঠিত হয়, আবার অন্তঃকরণের গঠন দ্বারা বাহ্যকরণ পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপ ভাঙ্গা গড়া ও পরিবর্ত্তনের ফলে স্বদেশে নিজ মাতার কোলে তাঁহার স্নেহে ও কৃপায় প্রতিপালিত হইয়া আর্য্যজাতি প্রস্তুত হইয়াছিল।

প্রকৃতির আইন তীব্র না হইলেও তাহার প্রভাব অক্ষুন্ন। মানুষ প্রকৃতির আইনের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করিতে পারে এবং করিয়া দেখাইয়া দিতেছে। মানুষ একটি বন্য গোলাপকে রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে অতি অল্প কালের মধ্যে, অথবা বুদ্ধি কৌশলে কিছুকালের মধ্যে, সুন্দর বৃহদায়তন পুষ্প করিতে পারে। মানুষ ঘোড়াকে নাচাইতে পারে এমন কি একটা "নাচন" গুণ সম্পন্ন ঘোড়ার race তৈরী করিতে পারে। মানুষ একটি নিগ্রোকে সভ্য করিতে পারে এবং তাহাতে নানা সভ্য গুণ আনিয়া ফেলিতে পারে। হয়ত এইরূপ কোন একটা পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে প্রকৃতি দেবীর বহু বিলম্ব লাগিবে। কিন্তু ইহাও অতি সত্য যে যদি উক্তরূপ উন্নতি প্রকৃতির অক্ষুন্ন আইনের বিরোধী হয় তবে সেই মহাকালী ধীরে ধীরে তাঁহার নিজ শক্তির কবলে তাহাকে আনিবেনই। হয় সেই গোলাপ যত্ন বিনা original breed এ ফিরিয়া যাইবে নতুবা একেবারে ধ্বংস পাইবে। প্রকৃতি সর্ব্বজয়ী। এই জন্যই মহাকাল বক্ষে তিনি অসি হস্তে উন্মাদিনী। মানুষ যা এক মুহূর্ত্তে করিতে পারে, মা তা হয়ত সহ্য করিয়া ১ বৎসরে ভাঙ্গা গড়া করেন। কিন্তু তাঁহার আইনের বিরোধী কোন জিনিষ তিনি স্থায়ী হইতে দেন না। কাজেই বুদ্ধিমান মানুষ মার আইন খুঁজিয়া তাহাই মানিয়া চলিতে চেষ্টা করেন।

আর্য্য পিতামহগণ কাশ্মীর ও তৎ তৎ সান্নিধ্যস্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রকৃতির ঋত, সত্য ও তপস্যা দিব্য চক্ষে দেখিয়া লইয়াছিলেন। প্রকৃতির আইনের সহযোগে মায়ের বরাভয় লাভ করিয়াছিলেন। মা মাতৃভক্ত সন্তানগণকে হাত ধরে মানুষ করিয়াছিলেন। "আমি কি তোবে ডরাই শমন" এরূপ কোনও অসহানুভূতি ভাবের অস্তিত্বাভাবে ধ্বংসের মূর্ত্তি আর্য্য পিতামহগণের নিকট আবির্ভূত হইতে সুযোগ পায় নাই। তোমরা ইংরাজীনবীস; ইংরাজীতে বলিলে সহজে বুঝিবে —"Guesses of majority of scholars point to the conclusion that Central Asia beyond Kashmere has no claim to be the original home of the ancient aryans, It was in this valley of crystaliser, nature educated man and man educated, helped Nature to perfect his education. Thus the external circumstances moulded his external and internal nature. Internal nature re-moulded his external feature. Man's external features and internal nature, by their mutual up-keep encouraged external circumstances & produced a powerful race. This race when sufficiently educated brought to play, as we shall gradually see, its subjective force in securing a perfect and permanent breed of their own, in their own land in obedience to Nature. To them Nature revealed her *Vedas*, (knowledge, from *wit* to know) transcendental science—the highest of human knowledge and their kernal—the উপনিষদবর্গ (Shoupenhaur কথা)—The devotion of the ancient Aryans consisted in their gratitude to nature and not to a "Being" beyond it and governing it and protecting man from its fury. It was nature as a whole and nature in its units making up the whole (দেবতাগণ) that is the friendly natural elements, which they paid their homage to." প্রকৃত তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সকলেই প্রায় একবাক্যে বলিয়াছেন যে কাশ্মীর ও তৎপ্রদেশ ভিন্ন অন্যস্থানে আর্য্যজাতি উৎপন্ন হয়েন নাই। তথায় বসবাস করিয়া তাঁহারা বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি লাভ করেন। প্রকৃতি তাঁদের নিজ কোলে মানুষ করেন এবং আর্য্যগণও প্রকৃতির পূজা করেন। তাঁহাদের নিকট প্রকৃতি ও ঈশ্বর পৃথক ছিল না। একটি অচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য সমষ্টি-বিশ্বকে আর্য্যগণ অতুল্য শক্তিদ্বারা আকড়ে ধরিয়াছিলেন।

শ্রীশ। সেই পূর্ব্ব কথিত তেত্রিশ কোটী দেবতার উৎপত্তি এখানেও তাহা হইলে দেখা গেল। এবং বেদে কেন ঈশ্বরের নাম নাই তাহারও আভাষ পাওয়া গেল।

মুখো। এই ছিন্ন ঝুলিতে সে বিষয়ে কোন পুঁথীর পাতা আছে কিনা মনে হইতেছে না। তবে আগামী কল্য এবিষয় আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। এই বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিদায় লইলেন। যুবকত্রয়ও নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। পথে পরস্পরের মধ্যে কিছু তর্ক বিতর্ক হইল।

পরিমল। বেদে কি ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না? তবে কি আর্য্যগণ নাস্তিক ছিলেন?

শ্রী। বুঝিতে পার নাই। বেদে ঈশ্বরের নাম না থাকায় তাঁহার অস্তিত্ব নাই এরূপ

ভাবিবার কোন কারণ নাই। বেদের সার গায়ত্রী তাহার প্রমাণ দিতেছে। স্বামীর নাম যেমন স্ত্রীর করিবার দরকার হয় না তদ্রূপ বেদে ঈশ্বরের নাম করা হয় নাই। বেদ শব্দরূপী ব্রহ্মপদার্থ নিজে কিরূপে নিজের নাম দিবে! প্রয়োজনাভাব।

বিনয়। তবে কিরূপে ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া লক্ষ লক্ষ নাম ঈশ্বরে অর্পিত হইল?

শ্রী। কি করে বেদ ধর্ম্ম কিরূপে পুরাণ ধর্ম্মে আইসে—কিরূপে আর্য্য পিতামহগণ জন্মভূমি পরিত্যাগে বাধ্য হইয়া দেশ কালের প্রভাবে নিজ দিগকে গঠিত করিতে বাধ্য হয়েন তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ বোধ হয় আমরা ক্রমে ক্রমে পাইব। আমাদের কর্ত্তব্য এখন ধৈর্য্যের সাহায্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলেন তাহা শোনা। তর্কের শেষ নাই তর্ক করিবার অনেক সময় পাওয়া যাইবে।

তর্কে আসল জিনিষ হারাইয়া যায়; তর্ক অজ্ঞানে আসে, যে চিন্তা করে তার তর্কের দরকার নাই—সে নিজ প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্র সূত্রে পাইয়া থাকে। টিকা টিপ্পণীতে সম্প্রদায় সৃষ্টি, তর্কে বড় ভয় করি। হিমালয়স্থ পবিত্র গঙ্গোত্তরীতে দল বা গাঁজ জমে না। সমতল ভূমির চড়াপড়া গঙ্গায় শুধু "দল" কেন, অনেক শেওলা অনেক মানুষের ও কাকের গু পাওয়া যায় এবং তাই নিয়ে ছেঁড়া ছিঁড়ি দেখিয়া তীরস্থ নিরীহ গঙ্গা স্নানার্থী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ মুখ ফিরাইয়া 'রাম' 'রাম' করিতে করিতে গৃহে আসেন (অন্তরমুখী হয়েন); এবং বাহির দুয়ারের কপাট লাগাইয়া ভিতর দুয়ার খুলিয়া বসেন।

যক্ষের ধন

কশ্চিৎ সাহিত্য-কুবেরের ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত

(সংবাদ প্রভাকর—১ অগ্রহায়ণ, ১২৬২)

৺রামকান্ত ভাদুড়ী, রস–সাগরের জীবন চরিত।

[সংক্ষেপ বৃত্তান্ত]

জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার তাৎকালিক সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রেরিত।

৺ রামকান্ত ভাদুড়ী মহাশয় বাঙ্গালা ১১৯৮ সালে জিলা নবদ্বীপের অন্তঃপাতী বাগয়ানের সান্নিধ্য "বাঁড়ী বাঁকা" গ্রামে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ৫৩ বৎসর জীবিত থাকিয়া জগতীপুরে বিচরণ করতঃ নানা প্রকার সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়া ১২৫১ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীয় কুলীন ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপাধিপতি মহামতি মৃত মহারাজ গিরিশচন্দ্র রায় বাহাদুরের সভাসদ ছিলেন।

কবিতা রচনা বিষয়ে ইঁহার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, যে ব্যক্তি যে সময়ে যে কোন বিষয়ের প্রস্তাব করিতেন ইনি তৎক্ষণাৎ পাদ পূরণ পুরঃসর কবিতা দ্বারা সেই প্রস্তাব পূরণ করিয়া দিতেন। যথা

প্রশ্ন—ষাঁড়েতে আহার করে সিংহের শরীর।

তথা পূরণ—কৃষ্ণের নগর ধাম, নগর বাহির। বারোএয়ারি মা ফেটে, হলেন চৌচির ॥
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি, হইল বাহির। ষাঁড়েতে আহার করে, সিংহের শরীর ॥

প্রশ্ন—তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দরবারে।

পূরণ—করি হরি হরিণী, মরাল সুধাকর। পিক আদি তোর নামে, ফরিদি বিস্তর ॥
এই কথা দূতি গে, জানায় শ্রীরাধারে। তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দরবারে ॥

একজন ডেপুটী কালেক্টর উক্ত রসসাগরকে এই প্রস্তাব দিয়াছিলেন।

যথা—"ওরে আমার ভূমি।" তৎক্ষণাৎ পূরণ করিলেন।

যথা—কোম্পানীর কৃপাবলে, পদ পাইয়াছ। অন্যায় আইন জারি, করে বসিয়াছ ॥
বাজেয়াপ্ত কোরে নিলে, ব্রহ্মোত্তর ভূমি। ডেপুটি কালেক্টর, ওরে আমার ভূমি ॥

এই ক্ষমতাকে অসাধারণ ক্ষমতা কহিতে হইবে। যদিও ইহার রচনায় ছন্দ ও মিলের কিছু কিছু দোষ দেখা যায়, তথাচ আশু বর্ণনা ব্যাপারে অশেষ প্রকারেই প্রশংসা করিতে হইবে, কারণ এই শক্তি দৈব শক্তি, করুণাময় পরমেশ্বরের বিশেষ করুণা ব্যতীত কখনই এরূপ হইতে পারে না, সুতরাং অত্যাশ্চর্য্য বলিয়াই ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। ইনি এই প্রকারে কত স্থানে কতরূপ চরণ পূরণ করিয়াছিলেন তাহা নিরূপণ আমরা কি করিব? বহুকষ্টে, বহু যত্নে, বহু লোকের আনুকূল্য দ্বারা অত্যল্প যাহা সংগ্রহ করিয়াছি সম্প্রতি তাহা নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, কাব্যানুরাগি সুরসিক পাঠক মহাশয়েরা অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অতিশয় তুষ্ট হইবেন, এবং কবিকে যথাযোগ্য সাধুবাদ প্রদান না করিয়া কদাচ নীরব থাকিতে পারিবেন না। প্রশ্ন করিবামাত্রই কাগজ কলম অবলম্বন না করিয়া বিনা চিন্তায় তখনি মুখে মুখে রচিয়া তাহা পূরণ করিয়া দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে, অত্যন্তই কঠিন কহিতে হইবে। ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত কখনই এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা হইতে পারে না। অতএব এই কবি ব্যক্তিকে অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়াই উল্লেখ করিতে হইল। রাজা ইঁহার রসিকতা ও যথার্থ গুণ দেখিয়া "রসসাগর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা এই রসসাগরের রচিত আর আর কবিতা পরে যত সংগ্রহ করিব তাহা সর্ব্বসাধারণের-সুগোচর করিতে ত্রুটি করিব না।

রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের প্রণীত পাদ পূরণ।

প্রশ্ন—যাও যাও যাও হে।

পূরণ—পরশিয়ে রাঙ্গাপায়, কি বোলে ছিলে উমায়, স্নেহে লোমাঞ্চিত কায়, ভূমিতে লোটাও হে।
মেনকার হতভাগ্যে, ভুলে গেলে সে প্রতিজ্ঞে, পাষাণের নাহি সগ্যে, তাই কি জানাও হে ॥
মনস্তাপ খণ্ডি চণ্ডী, মণ্ডপে বসিবে চণ্ডী, চণ্ডীকে শুনাও চণ্ডী, কত নাচ গাও হে।
সম্বৎসর গেল বোয়ে, উমা আছে পথ চেয়ে, আন মাহেশ্বরী মেয়ে, যাও যাও যাও হে ॥

প্রশ্ন—হরিবোল হরি।

পূরণ—নবীন কিশোর কালে, তাড়কা বধিলা হেলে, মুনিগণ যজ্ঞস্থলে, রাক্ষসী সংহারি।
পরশি চরণ রেণু, পাষাণী মানবী তনু, নাবিকেরে দিলা পুনু, স্বর্ণময়ী তরী ॥
জনক রাজার পণ, ভগ্ন শম্ভু শরাসন, রাম সীতা সুমিলন, মিথিলা নগরী।
তেজে রাজ্য আধিপত্য, সঙ্গি সহ আনুগত্য, পালিতে পিতার সত্য হোলে বনচারী ॥

সেতুবন্ধ জলধি, সবংশে রাবণ বধি। বিভীষণ গুণনিধি, দিলা লঙ্কাপুরী ॥
জানকী হেন কি পাপি, জলন্ত অনলে ক্ষেপি। কোমলাঙ্গ পুনরপি, দিলা দগ্ধ করি ॥
গর্ভবতী সতী সীতা, নাহি যার মাতা পিতা। বনে দিলা হেন সীতা, কি ধর্ম্ম বিচারি ॥
এ রসসাগরে উক্তি; এবেতো পাইলা যুক্তি। যদি বল হবে মুক্তি, হরিবোল হরি ॥
ধন ধান্য জাতি প্রাণ, প্রায় রসাতল যান। দেব দ্বিজ অপমান, অবিচার পুরী ॥
সার্ব্বভৌম নৃপ যিনি, মহা ম্লেচ্ছ কোম্পানি। কলিকাতা রাজধানী, কলি অবতারি ॥
দেশে ভায্য নাহি আর, রাজা প্রজা হাহাকার। কহিতে শকতি কার, প্রাণে যদি মরি ॥
এ রসসাগরে স্থল, সাজাইয়া ভূমণ্ডল। শেষে দিলা দাবানল, হরি বোল হরি ॥

প্রশ্ন—গজের উপরে গজ তদুপরি অশ্ব।

পূরণ—হু হু হু হুহুঙ্কার, পদাঘাতে দেখ কার। হয় বুঝি ছার খার, রসাতল বিশ্ব ॥
হি হি হি অট্ট হাসি, অষ্ট দিকে অষ্ট দাসী। বিশেষ হৃদয়ে বসি, না করিল দৃশ্য ॥
কিং কিং কিং কিমাভাষে, অনায়াসে দৈত্যনাশে। শোণিত সাগরে ভাসে, শিবের সম্পশ্য ॥
হা হা হা হাহাকার, গ্রাস করে চমৎকার। গজের উপরে গজ, তদুপরি অশ্ব ॥

প্রশ্ন—কলঙ্ক ঘুচাতে এসে হইল কলঙ্ক।

পূরণ—লম্পট কপট রোগ, অবলার কর্ম্মভোগ। নন্দালয়ে কীর্ত্তিযোগ, গোকুলে আতঙ্ক ॥
কেন্দে কন যশোমতী, জটিলা কুটিলা সতী। আন জল শীঘ্রগতি, উভয়ে নিঃশঙ্ক ॥
মায়ে ঝিয়ে একি লাজ পড়িল কলঙ্ক বাজ। ক্ষিতিতলে বৈদ্যরাজ, পাতিলেন অঙ্ক ॥
ব্রজে মাত্র সতী রাই, হরেরাম ঘরে যাই। কলঙ্ক ঘুচাতে এসে, হইল কলঙ্ক ॥

প্রশ্ন—বাহ্বা বাহ্বা বাহ্বা জী।

পূরণ—রাধা কলঙ্কিনী, ব্রজপুরে ধ্বনি, জানি বৈদ্যরাজ কহিল কি।
আজ্ঞা শিরে ধরি, পূরিলা শ্রীহরি, ভানুর ঝি তায় ভানুর ঝি ॥
তব কৃপা হরি, এ কুম্ভ ঝাঝরি, পূরিয়া সে বারি আনিয়াছি।
বদন তুলিয়া, চাও হে কালিয়া, বাহ্বা বাহ্বা বাহ্বা জী ॥

প্রশ্ন—গগন মণ্ডলে শিবে ডাকে হোয়া হোয়া।

পূরণ—শক্তিশেলে ম্রিয়মাণ, লক্ষ্মণের হতজ্ঞান, রাম আজ্ঞে হনুমান, গন্ধমাদনে যায়।
ঔষধ সহিত গিরি, অম্বরীক্ষে শিরে ধরি, নন্দীগ্রামে বিভাবরী, গত দিন পোয়ায় ॥
জাগ্রত ভরত রায়, শ্রীরাম চরিত গায়, হৃদে ভাসিয়া যায়, নেত্র জলে ধোয়া।
শত্রুঘন দেখে ভাবে, বিধির আশ্চর্য্য কিবে, গগন মণ্ডলে শিবে ডাকে হোয়া হোয়া ॥

প্রশ্ন—কোন্ ছার পতঙ্গ।

পূরণ—আপনি বলেন বাণী, যাঁহার বদনে, হেন কালিদাস হত, বেশ্যার ভবনে।
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম, ভীমরণে ভঙ্গ, এ রস সাগর হব, কোন্ ছার পতঙ্গ।

প্রশ্ন—হায় হায় হায় রে।

পূরণ—দ্বৈত বনে দৈবদশা, দুর্জ্জয় মুনি দুর্ব্বাশা, দুর্যোধনে পূর্ণ আশা, করিবারে যায় রে।
দ্রৌপদীর দেখি ক্লেশ, ব্যস্ত হোয়ে হৃষীকেশ, স্বহস্তে বান্ধিয়া কেশ, আপনি জাগায় রে ॥

উঠ উঠ প্রিয় সখি, পাকস্থলী দেখ দেখি, মেলিতে না পারি আঁখি, বিষণ্ণ ক্ষুধায় রে।
পাকস্থলী করে ধরি, ভাসিল নয়ন বারি, দায়ের উপরে হরি, ঘটাইলা দায় রে ॥
নিজ পদ্ম করাঙ্গুলি, তপসিয়া পাকস্থলী, তৃপ্তোস্মি জগৎ বলি, ভুঞ্জে শ্যামরায় রে।
অখিল ভুবন তৃপ্ত, উদ্গারে বিস্ময় প্রাপ্ত, ঋষিগণ ভয়ে ব্যাস্ত, পলাইয়া যায় রে ॥
গদাহস্তে ভীমরায়, বাহুড়িয়াপুনরায়, পঞ্চভেয়ে গুণ গায়, ধরি রাঙ্গা পায় রে।
যে ছিল মনের বক্রী, এরাঙ্গা চরণে বিক্রী, কত চক্র জান চক্রী, হায় হায় হায় রে ॥

প্রশ্ন—দণ্ডভয়ে দণ্ডধর দণ্ডবৎ করে।

পূরণ—মৃত্যুকালে পাতকি, পড়িয়া খাবি খায়। সন্নিকটে শ্মশানে ঘেরিল ধর্ম্মরায় ॥
আকার ইঙ্গিতে ভাসে হেন লয় চিত্তে। শি-কার বি-কার কিম্বা ব্র-কারের দিত্তে ॥
যদি ব্যক্তি, করে উক্তি, কার শক্তি ধরে। দণ্ডভয়ে দণ্ডধর দণ্ডবৎ করে ॥

প্রশ্ন—নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমুদিনী দিনে।

পূরণ—জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা পলো মনে। চক্রান্ত করিলে চক্রী চক্র আচ্ছাদনে ॥
অকালাতে কাল নিশি উভয়ে না জানে। নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমুদিনী দিনে ॥

প্রশ্ন—বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চন্দ্র দেখ্‌তে পায়।

পূরণ—যামিনী কামিনী বন্ধ্যা সুমেরুর ছায়। উপজিল তম পুত্র অন্ধকার প্রায় ॥
ক্রমে ক্রমে উগরায়, ক্রমে ক্ষয় পায়। বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চন্দ্র দেখ্‌তে পায় ॥

প্রশ্ন—সেই তো যেতে হলো।

পূরণ—চন্দ্রাবলী সহ কেলি যদি বাঞ্ছা ছিল। সঙ্কেৎ করিতে তোমায় কেবা নিষেধিল ॥
সুখের যামিনী জানি দুঃখে পোহাইল। প্রভাতে রাধার কুঞ্জে সেইতো যেতে হোলো ॥

প্রশ্ন—বদর বদর।

পূরণ—প্রকোষ্ঠ ভাঙ্গিলে হয় সকলি সদর। টাকা কড়ি না থাকিলে না থাকে কদর ॥
শাল পট্ট ঘুচে গেলে চাদরে আদর। পাথারে পড়িলে তরি বদর বদর ॥

প্রশ্ন—আস্‌তে আজ্ঞা হোক্।

পূরণ—পেটে খেলে পিটে সয় গোবর্দ্ধন কি শোক। গোবৎস লয়ে গোপ নিরুদ্বেগে রোক ॥
কাছের মানুষ চিন্তে নার সর্ব্বাঙ্গে চোক্। মতিভ্রম পরিশ্রম আস্‌তে আজ্ঞা হোক্ ॥

প্রশ্ন—রহ রহ রহ।

পূরণ—আর কেন বাক্যবাণে দহ দহ দহ। শ্যাম কলঙ্কিনী বাণী কহ কহ কহ ॥
মনোরম্য বোধগম্য নহ নহ নহ। রমণে রমণ করে রহ রহ রহ ॥

প্রশ্ন—ছি ছি অমৃত পান কোরে ছিলাম কেন।

পূরণ—জলে কিম্বা স্থলে মৃত্যু জ্ঞানে কি অজ্ঞানে। মহামন্ত্র মহেশ আপনি দেন কাণে।
মরে জীব হয় শিব যৎক্ষণে তৎক্ষণে। দেবগণ আর্ত্তনাদে আত্ম অভিমানে ॥
ক্ষিতি মুক্তি বারাণসী মহিমা কে জানে। অমর মরিতে চায় আসি কাশী স্থানে ॥
মরে হোতেম দেব দেব আনন্দ কাননে। ছি ছি অমৃত পান কোরে ছিলাম কেনে ॥

ক্রমশঃ

দিগ্‌দর্শন

স্বাস্থ্য সমস্যায়

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়, এল্‌, এম্‌, এস্‌

ক্ষয়কাশ — দ্রুতবৃদ্ধির কারণনিচয়

খাদ্য বা পেয়ের সহিত
চায়ের দোকানে
চপ্‌ কাট্‌লেটের দোকানে
"ভদ্রলোকদিগের আহারের স্থানে।"
এক হুঁকায় তামাক খাওয়ায়

অপরীক্ষিত ও কাঁচা দুধ
মাঠা তোলা দুধ
অপরীক্ষিত মাংস
ভেজাল দেওয়া ঘৃত

"কর্পোরেশনের" ত্রুটিতে
ডাষ্ট্‌ বিন্‌ (খোলা)
রেফিউজ্‌ প্ল্যাটফরম্‌ (খোলা)
খোলা ময়লার গাড়ী
ধূলাকীর্ণ রাস্তা ও মোটরের দ্রুতগতি
কয়লার ও কলের চিম্‌নির ধোঁয়ার আধিক্য
মড়ার বিছানা ইত্যাদি ডোমদের দেওয়া
লোকদেখান আলমারীর মধ্যে খাবার সাজাইয়া রাখা

পুরাতন বই, পুরাতন কাপড় চোপড়
সাধারণ পাঠাগার

সমস্ত বাড়ীময় ঘোরা ফেরা
যেখানে সেখানে থুথু ফেলা
পান-ভোজনের পাত্র স্বতন্ত্র না থাকা
কচি ছেলেদিগকে মুখ হইতে খাদ্য দেওয়া
একই সঙ্গে নিজ বাসন ও কাপড় পরিষ্কার করিতে দেওয়া
কাসিবার সময় মুখের সম্মুখে রুমাল আড়াল না দেওয়া

গোয়াল ঘর ও পীড়িত গরু,
ধোপা (রোগীর কাপড় লইয়া বাড়ী বাড়ী বেড়ায়)

বড় রাস্তার ঠিক বুকের উপের হাঁসপাতাল (মাড়োয়ারিদের)

খারাপ বাড়ী ও ভীড়ের দ্বারা
স্কুল বাটী, আফিস ঘর,
থিয়েটার, বায়স্কোপ সার্কাস,
ছাপাখানা, কারখানা

বৈঠকখানার বিছানা (ফরাস)

যান—বিশেষ করিয়া রিক্সাগাড়ী

পক্ষী ও কীট পতঙ্গ দ্বারা
গয়রে ও ডাষ্টবিনের খাদ্য ভোজন করিয়া আসিয়া কাক জল ও কাপড়ে ঠোঁট মোছে ও ধোয়
মাছি, আরসুলা, পিপড়া দ্বারা খাদ্য দ্রব্য দূষিত

পাঁচজনের বই পড়িতে পড়িতে কাসা
এক ঘরে, এক বিছানায় বা এক মসারিতে কাহারো সঙ্গে শোওয়া
কচি ছেলেদিগকে চুম্বন করা
ব্যারামকে সূতিকা বা ডিস্‌পেপসিয়া প্রভৃতি মিথ্যা নামে চাপিয়া
সকলের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা ও যে সে যানে চড়া

ইতুর কথা

অগ্রহায়ণ মাসে ইতুর ব্রতকথার প্রচলন আছে। অনেকেই তাহা জানেন। ইতু সূর্য্যদেবের নাম। স্থান বিশেষে এই ব্রতকে সূর্য্যেরব্রতও বলে। অগ্রহায়ণের প্রতি রবিবারে (সূর্য্যদেবের বার বলিয়া) উপবাসী হইয়া ইতুর কথা শুনিতে হয়; কোন কোন স্থানে পূর্ণিমা তিথিতে ও সংক্রান্তিতে সূর্য্যদেবের বিশেষ পূজা উপলক্ষে এই কথা হইয়া থাকে। ব্রত-কথার নানা মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে—শুনিলে অঘটন ঘটন হয়, অসম্ভব সম্ভব হইয়া থাকে, ইহজীবনে ও পরকালে পরম মঙ্গল হয়—হিন্দুসাধনার উচ্চ অঙ্গে যে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভের কথা আছে, ব্রতকথা গুলিতে অতি চলিত ভাষা ও চলিত ভাবে সাধারণের নিমিত্ত তাহারই ব্যাখ্যান হইয়া থাকে। প্রাকৃতের ভিতর দিয়া অপ্রাকৃতের কথা বলিতে যাওয়ায় ব্রতকথাগুলিতে অসম্ভব বলিয়া অনেক কথার অবতারণা রহিয়াছে; এজন্য তাহার গুণাগুণ ফলাফল ইত্যাদির কথা আধুনিক পাঠকের নিকট অতি নগণ্য বলিয়াই মনে হইয়া থাকে। কিন্তু আজ কাল সিনেমা বা বায়স্কোপের চিত্রে অসম্ভব ঘটনাবলীর ছবি দেখিয়া ও নানা উচ্ছ্বাসপূর্ণ নাটক নভেলাদি পড়িয়া অতি অসম্ভব ও কাল্পনিক ব্যাপারের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া লোকের মানসিক ভাব ও প্রকৃতির যে অনিষ্ট সাধন হইতেছে, (ব্রতকথাগুলির নানা উপকারের কথা ছাড়িয়া দিলেও) ইহাদের দ্বারা যে তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি সাধিত হয় না, তাহা নিশ্চিত।

আখ্যান

এক গরীব ব্রাহ্মণ। এক স্ত্রী ও দুই কন্যা লইয়া তাহার সংসার। অতি দরিদ্র, ভিক্ষা দ্বারাও উদরান্নের সংস্থান হইত না। কিন্তু দরিদ্র হইলে কি হয়—ঘরে তাহার অতুল প্রতাপ। আর অতি জঘন্যও বটে—দারিদ্র্য অনেক সময় লোকের প্রকৃতিতে অমৃত সঞ্চার করে, কিন্তু এ বামুন তার বিপরীত।

(১) হৈমন্তিক ধান্য উঠিলে দেশে পিঠে পুলির ধূম পড়ে। সকলের ঘরে তাহার উদ্যোগ দেখিয়া বামনের পিঠে খাইবার লোভ হইল। বাড়ী আসিয়া বামনীকে বলি—"পিঠে ক'রে দিতে পারিস্?" বামনী বলিল—'তা কেন পারবো না? সব জিনিষ যদি তুমি যোগার ক'রে এনে দাও আমি ক'রে দেবো।" তখন বামুন ভিক্ষায় বাহির হইল। অন্য দিন ভিক্ষায় খুদ মিলাই কঠিন হয়, সেদিন কিন্তু তৎক্ষণাৎ পিঠে পুলির যোগাড় হইয়া গেল। বামুন বাড়ী আসিয়া সেই সব জিনিষ দিয়া বলিল, "সব এনেছি এই নে। দেখিস্ তুই যেন খাস্‌নে; আর পাপিষ্ঠ মেয়ে দুটোকে দিস্‌নে। তা হ'লে ওদের বনে বিসর্জ্জন দিব।" কথায় যেমন, কাজেও তাহাই।

সন্ধ্যার পর বাম্‌নী মেয়ে দুইটীকে শুয়ে রাখিয়া পিঠে তৈয়ারী করিতে লাগিল। বামন আড়াল থেকে পিঠা গণিতে লাগিল; পাছে আর কেও একখানিও খাইয়া ফেলে। দৈবাৎ ব্রাহ্মণী মেয়ে দুটীকে একখানি পিঠে দিয়া ফেলিয়াছে। "সেৎ সেৎ তের পাতে কেন বার" ব্রাহ্মণ পিঠে খাইতে গিয়া, এই কথা বলিয়া ক্রোধে অন্ধ হইলেন—এবং মাসীর বাড়ী লইয়া যাইবে এই কথা বলিয়া মেয়ে দুটীকে বনে দিয়া আসিল। তের খানা পিঠে তৈয়ারী হইয়াছে, সে শব্দ শুনিয়া গণিয়া লইয়াছিল, খাইতে গিয়া দেখে একখানা কম; এজন্য এত কাণ্ড ঘটিল।

গল্পে বাস্তবতার ব্যাঘাত ঘটিল, এই কথা বলিয়া কেহ কেহ সন্তানবাৎসল্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে যাইবেন—বলিবেন, একখানা পিঠার জন্ম এত কি কেহ কখন করে? কিন্তু মানুষ বাস্তবিকই এইরূপ করিয়া থাকে—একটু সামান্য স্বার্থ সামান্য লাভ ও সামান্য লোভের জন্যে মানুষের দ্বারা অহরহ কি বিভৎস অনিষ্ট সকলই হইয়া যাইতেছে! একটী নীতিবাক্যে আছে, মানুষ লোভ বশতঃই নিজ সন্তানকে ভালবাসে—'মানুষা মনুজব্যাঘ্রা সাভিলাষা সুতান প্রতি। লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতান্ কিং ন পশ্যসি॥" যতক্ষণ নিজ স্বার্থ, নিজ লাভ না প্রতিহত হয়, ততক্ষণ আত্মীয়তা, ভালবাসা, স্নেহ মমতা। আবার সময় সময় নিজের দেহটাও আপনার মনে থাকে না—দুঃখে, রাগে, অভিমানে আত্মহত্যা করিয়া বসে; আর খুব কম করেত হাত পা আছড়ায়, মাথার চুল উপরাইতে যায়, উপবাস করে থাকে! মানব প্রকৃতির ইহা বাস্তবতা; মানুষ কখন আপন হয় না বা পরের হয় না, যত দিন এই প্রকৃতির বশে থাকে। এই বশ লোকের চরিত্রের—সংস্কারগত পাপ বা অধর্ম্মের। যতক্ষণ না লোক এই পাপ-রাজ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে, এই প্রাকৃতকে ছাড়িয়া অপ্রাকৃতে গিয়া না পৌছে, ততদিন কেহ কাহারও আপন হয় না—নিজের সন্ধান মিলে না, অপরকেও আত্ম-বলিয়া জ্ঞান জন্মে না। আর এই পাপের গণ্ডী কাটিলে সকলেই আপন হয়। ভগবৎ রাজ্যের সন্ধান মিলে। জগতে প্রকৃত আপনার জন আছেন একজন, আর আপনার তাঁহারা যাঁহারা তাঁহাকে আপন করিতে পারিয়াছেন—ভগবান ও ভগবানের ভক্ত সাধু মহাপুরুষেরা। "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব। ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব॥ ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব। ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব॥" তিনিই প্রকৃত আপন। তাঁহাকে আপন বলিয়া ধরিয়া চলিলে সকল দুঃখ মোচন হয়; সকল বিপদে রক্ষা পাওয়া যায়; দৈব অনুকূল হয়; অসম্ভব সম্ভব হয়, সৎসঙ্গতি মিলে, এবং সংসারের সকল প্রকার জটিল ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া চলিয়াও নানা ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া যায় ও পরিণামে পরম কল্যাণ পাওয়া যায়। আর তাঁহাকে ভুলিলে পদে পদে বিপদ ঘটে—ইতুর ব্রত কথায় ইহাই অতি চলিত ভাব ও ভাষাতে কথিত হইয়াছে।

(২) বামুন মেয়ে দুটীকে ঘুমন্ত অবস্থাতে বনে রাখিয়া আসিল—সংসারের বাপের হাত হইতে আসল বাপের কাছে উহারা রহিয়া গেল। এদিকে সন্ধ্যা উপস্থিত, চারিদিকে ব্যাঘ্রভল্লুক গজ্জন করিতে লাগিল, মেয়ে দুটী ঘুম হইতে জাগিয়া ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু "ঘোরারণ্যে সুখং শেতে যো হি কৃষ্ণেণ রক্ষিতঃ"—পথিচ্যুতং তিষ্ঠতদিষ্টরক্ষিতং গৃহে স্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি। "জীবত্যনাথোপি তদীক্ষিতো বনে গৃহে স্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি॥" দুটি বোন প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়াছে, এমন সময় দেখিল একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের গুড়ি ফাঁক হইয়া আছে। তাহারা সেই গুঁড়ির মধ্যে ঢুকিল, আর অমনি উহা বন্ধ হইয়া গেল। রাত্রিকালে তাহার এই ভাবে নিরাপদে রহিল। সকাল হইলে গাছ আবার ফাঁক হইল এবং তাহারা বাহির হইয়া বনের ফল মূল খাইয়া কোন রকমে দিন কাটাইল। সন্ধ্যার সময় পুনরায় গাছের মধ্যে ঢুকিত ও গাছ পূর্ব্বের মত বন্ধ হইয়া যাইত। এইভাবে কতক দিন কাটিলে, একদিন তাহারা সেই বন ছাড়িয়া চলিল। কতক দূর আসিয়া দেখিল এক নদী তীরে (অগ্রহায়ণ মাস রবিবারে) বনদেবীরা ইতুঠাকুরের পূজা করিতেছে। মেয়ে দুটীর পাপস্পর্শ এখনও কাটিয়া যায় নাই; ইহাদের দর্শনে পূজায় নানা ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দেবীরা দয়াবশে তাহাদিগকে গঙ্গা

স্নান করিয়া আসিবে বলিলেন। কিন্তু উহারা গঙ্গায় নামিতেই গঙ্গার জল শুকাইয়া গেল—এমনই উহাদের পাপ—জন্ম জন্মান্তরের পাপ কি সহজে কাটে? ভয়ে উহারা দেবীদের নিকট নিজেদের সকল দুরদৃষ্টের কথা বলিল। তখন তাঁহাদের আরও দয়া হইল—বলিলেন "উঃ তোদের এত পাপ। যা, এই বালা গাছটী ফেলে দেগে, তারপর জল এলে স্নান করিস্।" তাহাই হইল। গঙ্গাস্নানে উহাদের পাপ রাশি ধুইয়াগেল। অপরূপ রূপ হইল। দেবীরা উহাদিগকে ইতু পূজায় দীক্ষা দিলেন এবং পূজার প্রসাদ ও একটী করিয়া ঘট দিয়া বাড়ী যাইতে বলিলেন। এবং সর্ব্বদা ইতুর পূজা করিয়া ঘটটী সযত্নে রক্ষা করিতে বলিয়া দিলেন।

এদিকে বামুনেরও মতি ফিরিয়াছে—সুসময়ে এমনই হয়। মেয়ে দুটীকে বাঘে খাইয়াছে ভাবিয়া তার মনে মনে অনুতাপ হইতেছে—কাতর হইয়া সে বনের দিকে চলিয়াছে, পথেই মেয়ে দুইটীর সহিত দেখা, তাহাদের বেশ ভূষা চেহারা পরম রমণীয়। পরিচয় পাইয়া বামন আত্মহারা হইল ও উহাদের লইয়া গৃহে ফিরিল।

(৩) অতঃপর ব্রাহ্মণের সংসারে নানা অভ্যুদয়ের কথা, অতুল ঐশ্বর্য্যের লাভ—মেয়ে দুইটীর বড় ঘরে বিবাহ—একের ইতুদেবে অব্যাহত ভক্তি, অপরের তাহাতে অবহেলা ও সেজন্য দুর্গতি—এবং পরে সৎসঙ্গ লাভে তার দুর্গতির হ্রাস ও সকলের পরমপদ প্রাপ্তি। ইত্যাদি কথা সকলে অবগত আছেন।

সমুদয় কথাতে কতকগুলি অতি মাত্র মূল্যবানতত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে—যেমন, (১) সুখে দুঃখে একজন আছেন। তিনিই প্রকৃত আত্মীয়; (২) রাখে কৃষ্ণ মারে কে; (৩) যতই কষ্ট পাবে ততই ভাল; (৪) মঙ্গল কার্য্যে সাধুজনের সঙ্গ ও কৃপা মিলে; (৫) ভগবদ্ কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়; (৬) অকৃতজ্ঞের দুঃখ অনিবার্য্য; (৭) একবার ভগবানের কৃপা লাভ হইলে তাহাকে মঙ্গলঘট রূপে চিরকাল মনে পোষণ ও পূজা করিতে হয়; (৮) বিপদে সাধুসঙ্গ এক মাত্র উপায় (৯) ভক্তি পথে চরমে নিঃশ্রেয়শ লাভ হয়।

এদেশের প্রচলিত সকল ব্রত কথাগুলিরই মর্ম্মার্থ এইরূপ গভীর অথচ সরল—ব্রতী।

সাইমন্ কমিশন্ ও ভারত সরকারের ডেস্প্যাচ (২)

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ

Federal Assembly বা সামবায়িক সমিতির কথা উল্লেখ করিবার সময় সাইমন কমিশন আমেরিকাযুক্তরাজ্যের নজির দেখাইয়াছেন। ভারতবর্ষ এত বৃহৎ দেশ এবং উহার লোক সংখ্যা এত অধিক, যদি সাধারণভাবে সমগ্র দেশের ভোটদাতাদিগের দ্বারা ব্যবস্থাপরিষদে সদস্য নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে constituency গুলি আকারে অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়ে। সাইমন কমিশনের উক্ত যুক্তির বিরুদ্ধে ইহা বলা যায় যে, মার্কিন যুক্ত প্রদেশের আয়তন ৩৭ লক্ষ ৩৮ হাজার বর্গ মাইল এবং ইহার লোক সংখ্যা ১১ কোটিরও অধিক, অথচ সেখানে জাতীয় মহাসভায় সরাসরি সমগ্রদেশের নির্ব্বাচন মণ্ডলী দ্বারা মহাসভার সদস্তবর্গ নির্ব্বাচিত হয়। সুতরাং ভারতে Direct representation দ্বারা নির্ব্বাচন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অধিকন্তু মার্কিন

যুক্ত প্রদেশের প্রায় সকলের ভোটের অধিকার আছে ; কিন্তু সাইমন কমিশন ভারতে শতকরা দশ জনের অধিক লোককে ভোটাধিকার দেন নাই।

সাইমন রিপোর্টে বর্ত্তমান Legislative Assembly অর্থাৎ ব্যবস্থাপক পরিষদ তুলিয়া দেওয়া হইলেও Council of State বা সরকারের কার্য্যকরী পরামর্শ সভাটিকে বজায় রাখা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি এপর্য্যন্ত জন সাধারণের নিকট উহার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। কারণ যে সকল সরকারী প্রস্তাব বা কার্য্য জনমতের বিরোধী ছিল এবং এপর্য্যন্ত এসেম্ব্লি যে সকল সরকারী প্রস্তাব বা কার্য্যের অনুমোদন করেন নাই, এই সভাটি তাহার অনেকগুলির সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। সরকার পক্ষের অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক ভাবিয়াই বোধ হয় এই প্রতিষ্ঠানটী বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সাইমন কমিশন পরামর্শ দিয়াছেন।

বড় লাটের শাসনপরিষদের সদস্য নিয়োগ এপর্য্যন্ত বিলাতের ভারতসচিবই করিয়া আসিতেছেন। কমিশন পরামর্শ দিতেছেন যে বড়লাট স্বয়ংই সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন, অর্থাৎ বড় লাট অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার মনের মত লোক নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। ইহাতে ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহা বলা বড় কঠিন। কারণ বড় লাট যদি ভাল হয়েন, ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা নির্ব্বাচিত সদস্য ভালই হইবে। আর যদি তিনি ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থ সাধনের প্রতিকূল মতাবলম্বী হন, তাহা হইলে তাঁহার নির্ব্বাচিত সদস্য যে কিরূপে হইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। তৎসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে মানুষ যদি অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী ও প্রভুত্বসম্পন্ন হয় এবং যদি তাহার ইচ্ছায় কেহ বাধা দিবার না থাকে, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধি স্বতঃই কলুষিত হইতে থাকে এবং দেশের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের দিকে তাঁহার প্রকৃতি স্বতঃ প্রধাবিত হয়। সেই জন্যই স্বৈর-শাসনকে লোকে নিন্দা করে।

কেবল তাহাই নহে। বড় লাটের সার্টিফিকেট করিবার, অর্ডিনান্স জারি করিবার, কোন একটা প্রস্তাব নাকচ করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি সমস্ত অক্ষুন্ন রাখা হইয়াছে। সুতরাং সাইমন কমিশন আমাদিগকে ক্রমশঃ স্বায়ত্ত শাসনের পথে কিরূপ অগ্রসর করিয়া দিতে চাহিতেছেন তাহা বোধ হয় কাহারও বুঝিতে কষ্ট ও বিলম্ব হয় না।

এইবার প্রাদেশিক সরকার সমূহের বিষয়ে সাইমন কমিশন কি পরামর্শ দিয়াছেন তাহা আলোচনা করা যাউক্। মণ্ট-ফোর্ড স্কীমে প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তার উপর যে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহা শুধু খাস (Reserved) বিভাগের প্রস্তাবের বেলাই খাটিত। কিন্তু সাইমন-স্কীমে গভর্ণরেব ক্ষমতা হস্তান্তরিত (Transferred) ও খাস (Reserved) এই দুই বিভাগেই খাটিবে। কারণ সাইমন স্কীম অনুযায়ী এই দুই বিভাগের ভেদ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গভর্ণরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অনেকবার দেখা গিয়াছে যে কোন কোন প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডলের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ উক্ত সভার কার্য্যকে প্রকৃত পক্ষে অচল করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং গভর্ণরকে মন্ত্রিসংগ্রহে রীতিমত সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে।

সাইমন কমিশন গভর্ণরের এই সমস্যা সমাধান করিয়াছেন এবং নির্ব্বাচন প্রথার ভিত্তির

উপর, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থামণ্ডলীর মূল নীতির উপর আঘাত করিয়া তাহাতে গভর্ণরের বিশেষ অধিকার প্রদান করিয়াছেন। মন্ত্রি-মণ্ডলী রক্ষা না হইলে এবং অত্যাবশ্যক মনে করিলে, তিনি (গভর্ণর) অতিরিক্ত ক্ষমতা বলে ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, যতদিন অবস্থার উপশম না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মন্ত্রিমণ্ডলীর সমস্ত ক্ষমতা তাঁহারই উপর বর্ত্তিবে।

মণ্ট-ফোর্ডস্কীমে মন্ত্রীদিগকে যে দুরবস্থায় রাখা হইয়াছিল, সাইমন স্কীমে তাহার চরম ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাইমন স্কীমে সাধারণতঃ গভর্ণর একজন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত মন্ত্রীর সহযোগী নির্ব্বাচনে তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকিবেনা। এই মন্ত্রীমণ্ডলীর যিনি সেক্রেটারী হইবেন তাঁহার মনোনয়ন-ব্যাপারেও মন্ত্রীমণ্ডলীর কোন হাত থাকিবেনা। এই সেক্রেটারী একজন সিভিল সার্ভিসের লোক হইবেন। তিনি গভর্ণরের অনুপস্থিতিতে সভায় সমস্ত আলোচনা ও মন্ত্রীদিগের কার্য্য কলাপ গবর্ণরের নিকট পরে জ্ঞাপন করিবেন। এই সেক্রেটারীর কথায় যদি গভর্ণর বোঝেন যে মন্ত্রীদিগের কোনও কার্য্য অন্যায় হইতেছে, তাহা তিনি বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

উপরি উক্ত মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে দুইজন সহকারী কর্ম্মচারী থাকিবেন। মন্ত্রীমণ্ডল বরখাস্ত হইতে পারেন, কিন্তু সরকারীকর্ম্মচারী শ্রেণী হইতে নিযুক্ত দুইটি মন্ত্রী (Service-ministers) বরখাস্ত হইবেন না। তাঁহাদের বরখাস্ত ব্যাপার ব্যবস্থাপক সভার সীমার অতীত থাকিবে। যদি এই দুই মন্ত্রী কার্য্যে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে সরকারী তহবিল হইতে তাঁহাদের পেন্সন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। গভর্ণর ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীমণ্ডলের সকলকেই নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা প্রতি দশবৎসর অন্তর এমন একটী নিয়মানুগ মন্তব্য গ্রহণ করিতে পারিবেন, যাহার দ্বারা দেশবাসীর নির্ব্বাচনাধিকার বৃদ্ধি করিতে, নির্ব্বাচন মণ্ডলী গঠনের প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে অথবা সম্প্রদায় হিসাবে নির্ব্বাচনের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, যদি ১ অংশ সদস্যগণ উক্ত মন্তব্য বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহাদের অভিমতের উপরও গভর্ণরের হাত থাকিবে। গভর্ণর যদি বুঝেন যে এই মন্তব্যে প্রদেশের লোকের মত আছে তাহা হইলে তিনি সেই মন্তব্য বড়লাটের অনুমতির জন্য পাঠাইবেন। বর্ত্তমানের মত প্রাদেশিক আইন গঠনেও বড়লাটের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারেও এই ভাবের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্বন্ধে যেমন ইস্পাতের কাঠামো (Steel Frame) পূর্ণ রূপে বজায় রাখা হইয়াছে, প্রাদেশিক সরকারেরও তাহাই।

সাইমন সপ্তক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন এবং স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়াছেন, যদিও তাহারা একদিকে উহার নিন্দা করিয়াছেন। নিন্দা প্রসঙ্গে তাহারা বলিয়াছেন যে, "Division by creeds and classes means the creation of political camps organised against each other and teaches men to think as partisans and not as citizens." ভারতের আটটি প্রদেশের মধ্যে ছয়টিতে তাঁহারা মুসলমানদের জন্য বিশেষ নির্ব্বাচনাধিকারের পরামর্শ দিয়াছেন। পাঞ্জাবে ও বাঙ্গালায় যেখানে হিন্দুর সংখ্যা অল্প সেখানেও তাঁহারা সংখ্যাধিক

মুসলমানগণকে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে মিশ্র-নির্ব্বাচনের স্বাধীন মতের অধিকার দিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে কমিশন স্বতন্ত্রনির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। অথচ ইহাও অবিদিত নহে যে, নির্ব্বাচন প্রথার ব্যাপারেই হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে বাদ বিসম্বাদের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই গুরু সমস্যা সমাধানের জন্যই Lucknow pact এর সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়াই মুসলমানগণ নেহেরু রিপোর্টে আপত্তি করিয়াছিল। এই সকল ব্যাপার জানিয়া শুনিয়াও কমিশন উক্ত সমস্যার কোন সমাধানের চেষ্টা না করিয়া রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে হিন্দুমুসলমানের একটা আপোষ হইলেই ভাল হয়। কমিশনের এতদ্বিষয়ে উদাসীন, উদারতার কারণ সহজেই লোকে বুঝিতে পারে।

শিখদিগের সম্বন্ধে কমিশন সামবায়িক সমিতিতে শতকরা দুইটি সদস্য পদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, অথচ মুষ্টিমেয় য়ুরোপীয়দিগের জন্য সমিতিকে কমপক্ষে শতকরা দশটি স্থান দেওয়া হইয়াছে।

উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে কোন শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ করেন নাই। তাহাতে সীমান্তের জাতিদের মধ্যে অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্ব সীমান্তে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশবিচ্ছেদের ব্যবস্থার কারণ সম্বন্ধে অনেকে মনে করেন যে ব্রহ্মদেশকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিলে তথায় বৃটিশ বাণিজ্যের ও ব্রিটিশ সিভিলিয়ান (British Civilian) ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের অনেক সুবিধা হইবে এবং বিলাতের বেকার সমস্যার কতকটা সমাধান হইবে। ইহাতে ব্রহ্মদেশের উপকার হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ ধীরে ধীরে ভারতের বিরাট আন্দোলনের সহিত নিজেকে যেরূপ ভাবে সংযুক্ত করিয়া ফেলিতেছে, তাহাতে এক্ষণে উহাকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে উহার স্বরাজপ্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত। ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থাপক সভায় ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রস্তাব সংক্ষেপে একটু আলোচিত হইয়া গিয়াছে। মিষ্টার ইউভিন্ মোঙ্গগাই এতৎসম্পর্কে বলেন যে, সাইমন কমিশন ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু ব্রহ্মদেশে কিরূপ শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে সে সম্বন্ধে একটা কথাও কমিশন বলেন নাই। য়ুরোপীয় সওদাগরগণ ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মদেশের অধিবাসীগণকে স্বায়ত্তশাসন দিবার কথা মুখেও আনেন না। উপনিবেশ স্বায়ত্ত শাসন ব্যতীত এই বিচ্ছেদের কথা মূল্যহীন। রিপোর্টের উপসংহারে কমিশন যাহা বলিয়াছে, তাহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"We submit our report in the hope that it may furnish materials and suggest a plan by means of which the Indian constitutional reconstruction may be peacefully and surely promoted." অর্থাৎ কমিশন আশা করেন যে রিপোর্টের মধ্যে এমন উপাদান ও কার্য্যপদ্ধতির নির্দ্ধারণ পাওয়া যাইবে যে, তদ্দ্বারা ভারতীয় শাসন বিধির সংস্কার উন্নতভাবে সাধন করা সম্ভবপর হইবে।

সাইমন কমিশন দুই খণ্ডে তাহাদের দীর্ঘ নয়শত পৃষ্ঠা ব্যাপী, রিপোর্টে নানাবিধ যুক্তি ও কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক উন্নত প্রণালীতে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনবিধির সংস্কারের পক্ষপাতী

হইলেও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রধান সমস্যাগুলির কোনও সমাধান করেন নাই। শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথক করার আভাসের উল্লেখ কমিশনের রিপোর্টে নাই এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধেও তাঁহারা রিপোর্টে বিশেষ কিছু বলেন নাই। তাঁহারা রিপোর্টের কোন অংশে ইহাও বলেন নাই যে গভর্ণরকে কে নিযুক্ত করিবে এবং তিনি কি ভাবে নিযুক্ত হইবেন। যে দুইজন মন্ত্রী সরকারী কর্ম্মচারী হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহারা ভবিষ্যতে গভর্ণরের পদ অলঙ্কৃত করিতে পারিবেন কিনা তাহাও রিপোর্টে উল্লিখিত হয় নাই।

সাইমন রিপোর্টের দুইখণ্ড পড়িলে ভারতের জন সাধারণের মনে এই কথাই উদিত হয় যে ১৮১.৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ও এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষে না আসিয়া লণ্ডনে বসিয়া স্যার জন সাইমন উক্ত রিপোর্ট প্রণয়ন করিলে ভাল করিতেন। রিপোর্ট পাঠ করিলে মনে হয় সাইমন কমিশনে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ না করার দরুণ ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না ভাবিয়া ভারতবাসিগণ যে উহাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা ভালই হইয়াছিল। এক্ষণে এই রিপোর্টখানিকেও কর্ম্মনাশার জলে ভাসাইয়া দেওয়া ভারতবাসীর পক্ষে উচিত বলিয়াই মনে হয়।

এতক্ষণ সাইমন কমিশন সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। এক্ষণে ভারতসরকারের ডেস্প্যাচ্ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ভারত সরকার গোল টেবিল বৈঠকের নিকট যে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ১৬ই নভেম্বর তারিখে ডেস্প্যাচ্খানি সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত প্রদেশ সমূহের সমবায়ে একটি সম্মিলিত শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ভারত সরকার সাইমন কমিশনের সহিত মোটের উপর একমত। কেন্দ্রীয় শাসন সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রস্তাব সাইমন কমিশনের প্রদত্ত ব্যবস্থা পত্রের একখণ্ড বর্দ্ধিত সংস্করণ হইলেও সরকার ভারতবর্ষকে পার্লিমেণ্টের অধীন না রাখিয়া অংশীদার করিতে চাহেন। দায়িত্বমূলক শাসনের অধিকার লাভ করিতে হইলে বড়লাটই তাঁহার সভায় সদস্য নিয়োগ করিবেন এবং যতদিন না ভারত যোগ্যতা লাভ করিতে পারে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের বৈদেশিক নীতি এবং আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে স্ব স্ব নির্ব্বাচক মণ্ডলীকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হওয়াই ভারত সরকারের অভিমত; তবে সদস্যসংখ্যা বর্ত্তমানের ১৪৫ হইতে বর্দ্ধিত করিয়া ২০০ করার প্রস্তাব সরকার করিয়াছেন। কিন্তু সংখ্যাল্প সম্প্রদায়সমূহের অধিকার সুরক্ষিত থাকিবার প্রতিশ্রুতি পাইলে সরকার অপ্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনে গড়রাজী নহেন।

ভারতরক্ষা সম্বন্ধে ভারতসরকারের সম্পূর্ণ অধিকার থাকা সমীচীন, ভারত সরকার ইহা মনে করেন। যুদ্ধ বিগ্রহাদির আলোচনা ব্যাপারে প্রধান সেনাপতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে সভাপতি থাকিবেন এবং সেনা বিভাগের ব্যবস্থার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইবে। ভারত রক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহার দায়িত্ব পার্লিয়ামেণ্টের থাকিবে এবং তজ্জন্য যদি ঋণের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহা তৎকালিক ভারত সরকারের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ভারতীয়

রাজস্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সামরিক ব্যয়ের জন্য দেওয়া হইবে যদিও উহার পরিমাণ প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার আয়ুকাল ভারত সরকারের মতে তিন বৎসর স্থলে পাঁচ বৎসর করিতে হইবে, কিন্তু মহিলাসদস্যগণের নির্ব্বাচনের জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা থাকিবে না। বাঙ্গলা, প্রদেশ ও বিহার উড়িষ্যাপ্রদেশের জন্য সেকেণ্ড চেম্বার্সের প্রতিষ্ঠার অনুকূলে এবং মান্দ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশের সেকেণ্ড চেম্বার্সের প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলে ভারত সরকার মত দিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ভারত সরকারের অভিমত এই যে, বাঙ্গালাদেশের জন সংখ্যা-মূলক ভিত্তির উপর নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং পাঞ্জাবে শিখ ও হিন্দুগণের মোট প্রতিনিধি হইতে মুসলমানগণের দুইজন অতিরিক্তি প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকিবে। ব্রহ্মদেশের স্বতন্ত্রীকরণ সম্বন্ধে সাইমন কমিশনের প্রস্তাবই ভারত সরকার সমর্থন করিয়াছেন। মোটামুটি হিসাবে দেখিতে গেলে ইহাই মনে হয় যে ভারত সরকারের ডেস্‌প্যাচ্ সাইমনী প্রস্তাবের একখানি খাসা নকল এবং তাহাতে ভারতশাসনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও সবুরে মেওয়া ফলিবার আশ্বাস দান করা হইয়াছে মাত্র।

মাস-পঞ্জি—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭।

ভারতের প্রাদেশিক রাজসরকার সমূহ সাইমন কমিশন রিপোর্ট সম্বন্ধে আপন আপন মত প্রকাশ করিয়াছেন, বঙ্গীয় রাজ সরকার মোটের উপর কমিশন রিপোর্টের অনুমোদন করেন—মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট রাজস্বের ঘাটতি দেখিয়া উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন—বিলাতের সংবাদে প্রকাশ গোলটেবিলের সভায় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য হওয়া সুদূরপরাহত—কনফারেন্সের সভ্যবৃন্দগণ প্রারম্ভিক বক্তৃতাদি দান করিতেছেন - মিসরের সহিত ইংরেজের নূতন সন্ধিতে কতিপয় সামরিক বিধান সংযোজন হইল—খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ সেণ্ট বারনার্ড নামক সন্ন্যাসীগণ হিমালয়ের তিব্বত প্রান্তে একটী মঠ স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন—একদল ইংরেজ যাত্রী আগামী গ্রীষ্মকালে হিমালয়ের কেমাট শৃঙ্গ আরোহণ করিতে যাইবে বলিয়া আয়োজন করিতেছে—লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত তিন দিনে ডাক যাইতে পারে এরূপ একটী পরিকল্পনা আমেরিকার নৌ-বিভাগ করিতেছেন—বিলাতের রক্ষণশীল রাজনৈতিকেরা বেকার সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন বলিয়া বড়াই করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের নিন্দা করিতেও ছাড়িতেছেন না—কোয়েটার সৈনিক ছাউনী হইতে একটী ম্যাসিন্‌-গান অপহৃত হইয়াছে—লর্ড রিডিং স্বীকার করিয়াছেন যে ১৯১৭ সালের সরকারী ঘোষণার স্বাভাবিক অর্থ ভারতবর্ষে ডমিনিয়ান ষ্টেটাস দান করা. কিন্তু ভারতবাসীই কেবল অন্যান্য ডমিনিয়নের সমকক্ষ হইতে পারে নাই—গোলটেবিলে সমবেত মুসলমানগণ সকলে এক দলবদ্ধ হইয়া চলিতেছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সমিতি অভিমত দিয়াছেন যে ভাইস-চেন্সেলার [illegible] ব্যাপী বেতন ভোগী কর্ম্মচারী হওয়া উচিত—জাপানে আবার এক ভূমিকম্প হইয়া প্রায় ১০০ লোকের প্রাণ হানি ঘটিয়াছে—

ভারতের সাধনা

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

দ্বিতীয় বর্ষ] পৌষ—১৩৩৭ [তৃতীয় সংখ্যা

সাধনারপথে

আজ মানুষে মানুষে যে অপূর্ব্ব মিলন-সম্ভাবনা চতুর্দ্দিকে দেখা দিয়াছে, তাহাতে কতকগুলি অসাধারণ সমস্যারও উদ্রেক হইয়াছে। সে সমস্যার সমাধানেই এই মহামিলনের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে।

মানুষ চিরকাল—ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগত জাতীয় জীবনে—কতকগুলি প্রশ্ন তুলিয়া চলিয়াছে; সে প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধানে কে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছে বা হইবে, তাহাদ্বারাই তার ব্যক্তিগত চরিত্র বা জাতীয় সাধনার পরীক্ষা হয়। এই যে নানা প্রশ্ন ও জটিল সমস্যার বহর লইয়া মানুষ আবহমান কাল চলিয়াছে, তাহাকে মোটামুটি কতকগুলি ভাগে বিভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে—অন্তরিক প্রকৃতি বা আধ্যাত্মিক জগতের প্রশ্ন, বহির্জগত বা জড় প্রকৃতির প্রশ্ন ও জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী কোনও পরম শক্তির ও তাহার সহিত সম্বন্ধ লইয়া প্রশ্ন। ইহাদেরই মধ্যে আসিয়া পড়ে—মানুষের আত্মতত্ত্ব ও পরমার্থতার প্রশ্ন, বিবিধ বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রশ্ন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যবহারের প্রশ্ন, রাষ্ট্রের প্রশ্ন ও ধর্ম্মের প্রশ্ন।

মিলন সমস্যার

এ সমুদয় প্রশ্নের মধ্যে অনেক প্রশ্নই চিরন্তন কাল ধরিয়া মানবসমাজে চলিয়া আসিতেছে। সামাজিক ব্যবহারের প্রশ্ন আজ পৃথিবীতে একটী বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। জাতিতে জাতিতে সংমিশ্রণ, বিভিন্নস্থানে লোকের গমনাগমন, রাষ্ট্রীক, আর্থিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধে তাহাদের অসাধারণ

রূপে মিলন—এ সমুদয় বিষয়ে মানবসমাজ আজ যে উন্নতির সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে কোনও এক চরম ফলের আশা বা আশঙ্কা করা যায়—হয় এই সংমিশ্রণকে প্রেম ও উচ্চ মানব গুণের বন্ধনে সংবদ্ধ করিয়া বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব রূপ উচ্চ মানবধর্ম্মের সৃষ্টি করিবে, অথবা মানব চিত্তের কলুষময় ভাগে যে স্বার্থ-দ্বেষ-হিংসাদি কুপ্রবৃত্তি সমূহ নিহিত রহিয়াছে, তাহাই এই মিলন-ক্ষেত্রে আপনাদিগকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আরও নূতন সুযোগ ও হেতু পাইবে। একটী ভূলোককে স্বর্গ ও মানুষকে দেবতা করিতে চাহে; অপর এই পৃথিবীকে অশেষ দুঃখ যন্ত্রনার আগার ও তদপেক্ষাও অধম নরক করিয়া রাখে, এবং মানুষকে পশুত্বের পদবীতে অথবা তদপেক্ষাও হীন নরকের কীট করিয়া রাখিতে চাহে। এই দুই সম্ভাবনীয়ের মধ্যে কোন্‌টী বাস্তবের আকার গ্রহণ করিবে, তাহাই আজ সমাজ-বিচারের প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উচ্চ মনীষীগণ আজ ইহার অনুধাবন করিতেছেন, রাজনীতিজ্ঞেরা এই প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত, অর্থ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইহার প্রভাব বিদ্যমান।

শিক্ষায় সম্মেলন

বিগত ১০ই পৌষ হইতে ১৪ই পৌষ পর্য্যন্ত পাঁচদিবস বারানসীতে নিখিল এশিয়া শিক্ষা-সম্মিলন নামে এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রতিবৎসর এই সময়ে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেসের অধিবেশন হয়; সমুদয় ভারত এবং পৃথিবীরও অনেক স্থানের লোক দিগের দৃষ্টি তাহাতে আকৃষ্ট হয়। এইবার জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রায় সকল কর্ম্মীই কারারুদ্ধ; কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বে-আইনী বলিয়া রাজদ্বারে নিন্দিত। এজন্য কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে পারিতেছে না। সময়ান্তরে দেশের অবস্থা ফিরিলে করাচীতে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট কংগ্রেস-অধিবেশন হইবার কথা হইয়া রহিয়াছে। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক আবহওয়া হইতে মুক্ত ব্যক্তিদিগের সভাসমিতি করিতে এই বড়দিনের ছুটিতে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে।

উক্ত সম্মিলনের উদ্দেশ্য কি তাহা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। সমুদয় এশিয়াখণ্ডের বিভিন্ন জাতীর লোকদিগের একস্থানে বা কোনও এক আদর্শে সম্মিলন অভিনব হইলেও অনেকেরই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন জাতির—বিশেষতঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘর্ষে, নির্য্যাতিত এশিয়ার মধ্যে যে নূতন উন্মেষ বা জাগরণের সূচনা দেখা দিয়াছে, তাহাতেও এই সম্মিলনের গুরুত্ব এবং আবশ্যকতা অনুভূত হয়। কিন্তু কি ভাবে ও কি সূত্রে এই সম্মিলন হইতে পারে, তাহাই অনুভূত হয় দেখিতে হইবে। শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া এক প্রকার সমন্বয় বা সম্মিলন হইতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে জন্য সকল জাতির মধ্যে উচ্চ কোনও এক মানবীয়তার প্রকর্ষের আদর্শ (**ideal of human culture**) প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তাহা হইলেই শিক্ষাকে তাহার সাধারণ সাধন বা উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়া এক সম্মিলনের সূত্র স্থাপন করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান জগতে সেরূপ কোনও আদর্শের নিতান্ত অভাব। মানব সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সম্মিলন-সমূহ এযাবৎ হইয়াছে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে। কিন্তু ধর্ম্ম আজ মানবের বিচার-ভূমি হইতে অপসৃত। রাজনৈতিক

ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সময় সময় বিভিন্ন জাতির মধ্যে সঙ্ঘ (league), দল (pact) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বটে, কিন্তু কেবলমাত্র স্বার্থের ও লাভালাভের দৃষ্টিতে যেমন ইহাদের সৃষ্টি হইতেছে, স্বার্থ ও লাভ লোকসানের বিচারেই আবার ইহাদের ধ্বংস সাধনও হইয়া থাকে। একালের মানুষের কার্য্যকারিতার মধ্যে মানব প্রকৃতির এমন কোনও আভ্যন্তরীণ-তত্ত্ব বা মানবজীবনের উচ্চ স্থির লক্ষ্যের ভাব নিহিত নাই যে, তাহাদ্বারা পরিচালিত হইয়া, মানুষ মানুষের সহিত প্রকৃত ঐক্য বা মিলনের সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে লোকের মনোবৃত্তিতে ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের এবং তজ্জনিত পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তিই প্রবল রহিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইহা অবিসংবাদিত দান। প্রতীচ্যও আজ পাশ্চাত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত এশিয়ার নব উদীয়মান জাতিসকল সকলেই এই আদর্শে চলিয়াছে। ইহাদের নিজ নিজ শিক্ষানীতিও এইরূপ জাতীয় শক্তি এবং জাতীয় আদর্শ বৃদ্ধি করিবার পক্ষে নিয়োজিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় বাস্তবিক কোনও ঐক্য বা সম্মিলনের কথা সুদূরপরাহত এবং এই আদর্শে অগ্রসর হইলে, ইউরোপ যেমন নানা বিষয়ে উন্নত হইলেও, বহুদিন হইতে বিভিন্ন জাতির এক মহা সংঘর্ষ বা মহারণের কুরুক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে, উন্নতিশীল এশিয়াও কালে তাহাই হইবে। শিক্ষা বা ধর্ম্মের কোনও বৈকল্পিক কথা তাহাতে ঠাই পাইবে না—যেমন ইউরোপের যাবতীয় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও উন্নতি সে ধ্বংসের মুখ রোধ করিতে পারে নাই।

এশিয়া চিরন্তন কাল পৃথিবীর ঐক্য মিলন ও শান্তির মৌলিক সূত্র বহন করিয়াছে ও বিশ্বমানবকে তাহা দান করিয়া গিয়াছে। জগতের প্রেম, শান্তি ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠাতৃগণ সকলেই এশিয়াতে আবির্ভূত। আজ তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রত্যাখ্যাত হইতেছেন। পাশ্চাত্যের প্রভাবে এশিয়াও তাহার আপন মহাজনগণকে ভুলিতে বসিয়াছে।

আজ জগতে বাস্তবিক কোনও সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে মানবীয়তার কোনও উচ্চ প্রকর্ষের (cultureএর) আদর্শেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—কোনও জাতি বিশেষের রাজনীতি বা সমাজনীতির বশে নহে। এজন্য বিভিন্ন জাতির সাধনার ইতিবৃত্ত ও প্রকৃতি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়া যেস্থানে তাহার সম্যক উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, তাহাকেই আদর্শ ও অনুকরণীয় মনে করিয়া শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। এইরূপ কোনও উচ্চনীতি প্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত মিলন বা ঐক্যের প্রযত্ন সার্থক হইতে পারে—অন্যথা মিলনের চেষ্টা ব্যর্থতারই নামান্তর মাত্র।

যে দেশে বা যে জাতির মধ্যেই মানবের এ সাধনা উৎকর্ষলাভ করুক না কেন, কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে উহা আর কোন স্থান বা জাতি বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না; তখন উহা মানবের সাধারণ সম্পদ হইয়া দাঁড়ায়, সাধনার সে উৎকর্ষ সনাতন সত্যেরই নামান্তর মাত্র। প্রকৃত মানবীয় প্রকর্ষ বা সাধনা, সে সত্যের অভিব্যক্তি মাত্র। সত্যের পথ মিলনের পথ, শান্তির পথ, মঙ্গল ও আনন্দের পথ; আর মিথ্যার পথ পাপের পথ, অমঙ্গলের পথ, পার্থক্য ও বিরোধের পথ। মানবীয় সাধনার প্রকৃত পরীক্ষার স্থান এইখানে। প্রকৃত সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে তাহাতে মিলন অবশ্যম্ভাবী হয়; সেইরূপ ঐক্য বা মিলন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, মানবের সেই সত্য ও সুন্দর সাধনার ভূমি খুঁজিতে হইবে।

ভারতের ঐক্য ও নিরবচ্ছিন্নতা কেবল মাত্র তাহার সাধনার ভূমিতে। অন্যথা ভারতে ভেদাভেদ ও অনৈক্যের পরিসীমা নাই। ভারতের এই সাধনার মিলনভূমি সমগ্র জগতের মিলন ভূমি হইতে পারে। কারণ ভারতীয় সাধনার মৌলিক সূত্র পরম সত্যের মঙ্গলময় ভিত্তিতে গ্রথিত। আজ সমাজে কোনওরূপ মিলন প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করিতে হইলে, ভারতের সাধনার ভিত্তিতে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এজন্য ভারতীয় সাধনার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা চাই, একনিষ্ঠ ভাবে তাহার সেবায় রত হওয়া চাই। মানবের সকল প্রকার মিলন প্রচেষ্টায় উহা আদর্শস্থানীয়।

'নিখিল এসিয়ার শিক্ষা সম্মিলনে' ওরূপ কোনও মৌলিক নীতি বা আদর্শের সন্ধান নাই। যদিও সম্মিলনের অনেক অধিবেশনে বক্তাগণ ভারতীয় সাধনা বা কলচারের গুণ বর্ণন করিয়াছেন এবং এদেশের শিক্ষা যে উহার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি, এরূপ সম্মিলনেরও যে ভিত্তি এই সাধনার ভূমিতে দৃঢ় সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক ও তাহাতেই সম্মিলনের স্থায়িত্ব ও সার্থকতা হইতে পারে একথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ফলে ইহা অন্যান্য সভাসমিতির ন্যায় নানা বাহ্যিক অবয়ব ও আড়ম্বরে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। যাঁহারা এই সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদের অনেকেই ইহার বাহিরের নানা কার্য্যকলাপ ছাড়া অন্তরেই বিশেষ কিছু লাভ করিয়াছেন বলিয়া বলেন না।

'অল-এশিয়া এডুকেশন কনফারেন্স' নামে নিখিল এসিয়া বা সমগ্র প্রতীচ্য জগতের শিক্ষা সম্মিলন হইলেও, কার্য্যত ভারতের বাহিরে অন্য কোনও স্থানের শিক্ষাদি সম্বন্ধে কোনও কথাই বড় ইহাতে হয় নাই। সম্মেলনে নিখিল ভারতীয় শিক্ষক সম্মেলনের (All India Federation of Teachers Association) একটী বৈঠক হইয়াছিল, এবং তাহাতে ভারতীয় শিক্ষা ও শিক্ষক সমাজের বিষয়েই আলোচনা হইয়াছিল। যুক্ত প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্মিলন ও শিক্ষা-বিভাগের নন-গেজেটেড্ কর্ম্মচারীগণের সমিতির এক পৃথক সভাও হয়। শিক্ষকগণের নানা অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা তাহাতে হয়; উক্ত দুই সম্মিলনের বৈঠক সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না। আর একটী বিশেষ ভেদ বা পার্থক্য দেখা যায়—মুসলমানদিগের এক স্বতন্ত্র সভা—All India Muslim Educationel Conference বা নিখিল ভারতীয় মুসলেম শিক্ষা সম্মিলনের বৈঠকে। স্থানীয় জয় নারায়ণ হাই স্কুলে ইহার বৈঠক বসিয়াছিল, অন্যান্য সভাগুলি সেণ্ট্রাল হিন্দু স্কুলের সুপ্রসস্ত বাটীতে বসিয়াছিল। নিখিল এশিয়ার এক অখণ্ড বৈঠকের অবসরেও এরূপ ভেদ লুকাইয়া যায় নাই। আমোদ আহ্লাদ খেলা ক্রীড়া প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থায় সম্মিলনকে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা হইয়াছিল। আধুনিক কালের সভাসমিতিতে লোক-সমাগমদ্বারা সাফল্য আনিবার জন্য সকল ব্যবস্থাই হইয়াছিল। কেবল সম্মিলনে বাস্তবিক কোন মৌলিক উদ্দেশ্যের প্রাণস্পর্শ কতখানি হইয়াছিল, তাহাই জানিবার বিষয় রহিয়াছে।

আইনে উন্নতি—পিতাপুত্র-সম্বন্ধ

বিলাতের শিক্ষা-বিভাগের নিয়মানুসারে দ্বাদশবর্ষের নিম্ন বয়স্ক সন্তানকে পিতামাতা কোনও কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন না—আইনে বাধা আছে (Education Act section 32) বার বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে, চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া অনুমতি দিলে পর ছেলেরা সকালে ৭টা হইতে ৮টা ও বৈকালে ৫॥০ টা হইতে ৬॥০ টা পর্য্যন্ত সময় কিছু গৃহকর্ম্ম খামখেয়াল বা খুসীমত করিতে পারে—এবং তাহাও বিদ্যালয় বন্ধ থাকিলে। পাঠশালা যখন খোলা থাকে, তখন সপ্তাহে তিন দিন মাত্র—বিকাল বেলা ৫॥০টা হইতে ৬॥০ টা পর্য্যন্ত ছেলেদের কোনও গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু সকল সময়ই তাহারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বা ইয়ারকী করিয়া বেড়াইতে পারে—তাহাতে কোনও বাধা নাই। প্রতি বৎসর হাজার হাজার পিতামাতা এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয় এবং তাহাদিগকে ১০ শিলিং হইতে ১ পাউণ্ড পর্য্যন্ত জরিমানা দিতে হয়। এক দরিদ্র স্ত্রীলোক সায়ংকালীন সংবাদপত্র বিলির ব্যবসায় দ্বারা কষ্টে দিন যাপন করে; সে তাহার ১১শ বর্ষীয় পুত্রদ্বারা খরিদ-দারের বাড়ীতে একখানি সংবাদপত্র পৌছাইয়া দিয়াছিল, সেজন্য তাহাকে তীব্র ভর্ৎসনা সহিতে হয়, এবং ১০ শিলিং অর্থদণ্ড দিতে হয়। একটী ক্ষুদ্র দুগ্ধের কারখানার মালিক তাহার শিশুপুত্রের দ্বারা রাস্তার ধারে কারখানা হইতে তিনখানি বাড়ী অন্তর এক বাড়ীতে এক বোতল দুগ্ধ পাঠাইয়া দিয়াছিল। এই অপরাধে তাহার জরিমানা দিতে হইয়াছিল। এই অলঙ্ঘনীয় নিয়মগুলি আবার এমন যে, যে পিতামাতার অবস্থা যত খারাপ, তাহার উপরই আইনের কড়াকড়ি তত অধিক। ইহার ফলে বার বৎসরের কম বয়সের ছেলেদের কেবল দুষ্টামি ব্যতীত অন্য কোনও কাজে আবদ্ধ রাখা চলে না। উহারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুড়িয়া বা সিনেমা দেখিয়া বেড়ায়। স্বাস্থ্যজনক কোনও খেলার সামগ্রী ইহাদের মিলে না। খেলার অভ্যাস ইহারা ভুলিয়া যায়—কেবল দুষ্টামির দিকে ইহাদের কর্ম্মপটুতা প্রকাশ পায়। এই সকল ছেলেদের শিক্ষা দীক্ষা এমন হইতেছে যে বড় হইলে ইহারা ঠিক রূপেই (বর্ত্তমান সময়ের বেকার দিগের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত) ভিক্ষার দ্বারা জীবন ধারণ করিতে থাকিবে। এইরূপে ভিক্ষার সন্তান (Dole child) সকল আজ তৈয়ার করা হইতেছে—জন-বুলের সমাচার।

সাধনায় শ্রদ্ধা

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে চার্লস্ উইলকিন্স ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন—পাশ্চাত্য দেশ বাসীগণ তখন সবে মাত্র ভারতীয় ধর্ম্ম-সাহিত্যের রস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ তখন বারাণসীতে অবস্থান করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নব-অর্জ্জিত ব্রিটিশসাম্রাজ্যের বুনিয়াদ গড়িতেছিলেন। উইলকিন্সের অনুদিত গীতার মুখ-বন্ধ লিখিবার ভার তিনিই গ্রহণ করেন এবং লিখেন—'Their writings will servive

when the British dominion in India shall have long ceased to exist, and when the sources which it once yielded of wealth and power are lost to remembrance : অর্থাৎ ভারতে বৃটিশ রাজত্বের অবসান হইবে, কিন্তু ইহাদের এই সাহিত্যসম্পদ তাহারও বহুকাল পর পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে ; আর ভারতবর্ষ যে অতুলনীয় ধন ও শক্তির ভাণ্ডার তাহা হয়ত' লোকে ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু এ সম্পদ কখনও লুপ্ত হইবে না।" এ উক্তি আধুনিক সময়ের কোনও বিপ্লব-পন্থী সমাজ-বাদীর মুখেই অধিক শোভা পায়। ভাবী ব্রিটিশ ভারতের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্ব-প্রধান নির্ম্মাতার মুখেও ইহার গুরুত্ব কম নহে।

ইংরেজ কবি এড্‌ইন্ আরনল্ড ভগবদ্‌গীতার একখানি অনুবাদ পদ্যে করিয়াছিলেন—তাহার নাম Song Celestial বা স্বর্গ-সঙ্গীত, ইংরেজী সাহিত্যের পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। আমেরিকা বাসীর উপরে ঐ পুস্তকের প্রভাবে অত্যধিক। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে থরিও নামক একজন পরিব্রাজক আমেরিকার কন্‌কর্ড ও মেরিম্যাক্ নদ-প্রদেশের অনুসন্ধানে যান। উপরি উক্ত দুইখানি গীতানুবাদ তাহার যাত্রার সঙ্গী ছিল। সম্প্রতি চার্লস জনষ্টোন নামক এক জন লেখক আমেরিকার আটল্যান্টীক মন্‌থলী নামক পত্রিকাতে এ সকল বিষয়ের এক বিবৃতি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—'This volume was among the score of oriental books which Thoreau left at his death to Emerson in 1861. And Emerson's debt to the Bhagabad Gita is racorded in more than a dozen entries in the thoughtful study by Frederic Ives Carpenter's Emerson and Asia...The Sanskrit Poem, and with it certain of the Upanishads, colored the literature of that fruitful period in New England as sunshine illumined the meadows and river-valleys about Concord for Thoreau."—পরিব্রাজক থরিও ১৮৬১ খৃঃ অব্দে তাহার মৃত্যুকালে তাহার পুস্তক রাজি আমেরিকার চিন্তাক্ষেত্রের দিক্‌পাল স্বরূপ মনীষী ইমার সনকে দিয়া যান ; আর ইমারসন যে ভগবদ্ গীতার নিকট কতদূর ঋণী তাহার জীবনচরিতকার ফ্রেডারিক কার্পেনটার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উপরি উক্ত লেখকের মতে—ভারতীয় ধর্ম্ম পুস্তকের প্রভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াই চলিয়াছে ; এবং তাহাতেই বর্ত্তমান যুগের জড়বাদমূলক ভাবের বিরুদ্ধে একটী অধ্যাত্ম চিন্তার প্রবাহ উঠিয়াছে। এক্ষণে দেখা যায় যে, জড়বাদের প্রবাহ-বেগ ক্রমশঃ হ্রাসের দিকে চলিতেছে, মানব জীবনের আত্মিক দিকটা দেখিবার জন্য লোকের নজর পড়িতেছে—সার আর্থার এডিংটন প্রভৃতি অনেকের লেখা হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। এই আধুনিকতম চিন্তা ধারার প্রগতি প্রাচীন ভারতের আদর্শের দিকে।*

---

* "The influence of these scriptures of India grew with the years setting in motion a tide of spiritnal thought which flowed against the materialism of modern age. And now that materialism is once more ebbing—giving way as in the recent writings of sir Arther Edington, to a more philosophical concept of life—the newest current of thought flows once more towards the ideals and ideas of ancient India."

গোলটেবিলের কথা

লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের যে কার্য্য-ক্রম চলিতেছে, তাহাতে ইহার পরিণাম সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা চলে না। যে সমুদয় বিভিন্ন স্বার্থের লোক ইহাতে সমবেত হইয়াছেন, এ পর্য্যন্ত প্রধানত তাহাদিগের কথাই অধিকতর প্রকাশিত হইতেছে। মুসলমান সভ্যগণ তাহাদিগের মনোবৃত্তি আরও কঠোরভাবে দেখাইবার অবসর পাইয়াছেন—১৪ দফা দাবী করিয়া বসিয়া ভারতে মুসলমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। হিন্দু সভ্যগণ সাধারণতঃ উপায়-হীন বলিয়া মনে হইতেছে। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা শক্তিশালী তাহারা 'উচ্চ' রাজনীতি লইয়া ব্যস্ত—'ডোমিনীয়ন-ষ্টেটাস' পাইবার লোভে মোহিত। অনেকেই মুসলমান দাবীর দফার সহিত রফা করিয়া লইতে সম্মত। কেবল ডাঃ মুঞ্জে মধ্যে মধ্যে দুই একটী শক্ত কথা শুনাইতেছেন মাত্র। ডমিনীয়নত্বের কথা উঠিয়া গিয়া এক্ষণে 'ফেডারেশনের' কথা চলিতেছে। দেশীয় রাজন্যবর্গও তাহার সমর্থন করিতেছেন—একটী অস্পষ্ট ও অসমঞ্জস কথার স্থানে আর একটী ঐরূপ শব্দের ব্যবহার! ফেডারেশন অর্থে সমুদয় ভারতের সাম্য ও একীকরণ মূলক কোনও ব্যবস্থাই বুঝায়। কিন্তু দেশীয় রাজগণ তাহাদের নিজ নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নিজেদের ক্ষমতা ও একাধিপত্য অক্ষুন্ন রাখিতে চাহেন—উপরন্তু ব্রিটিশ ভারতের শাসন ব্যবস্থায় তাহাদের কিছু হস্তক্ষেপ থাকিবে। কিন্তু তাঁহাদের উপর-ওয়ালা থাকিবেন ইংলণ্ডের রাজ-সরকার। অন্য সংখ্যা-লঘিষ্ঠদিগের কথা বড় শুনা যায় না। তবে এ সকল কথার মূল্য এখনও কিছু দেওয়া চলে না। যাহাদের কথার মূল্য আছে, তাহারা এখানে কিছু বলিবার অবসর পান নাই, অথবা এখনও কিছু বলেন নাই—প্রথমত ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিষ্ঠ রাজনৈতিকদল উক্ত টেবিলে উপস্থিত নাই। তাহার অভাবেই বিভিন্ন সম্প্রদায় বা দলের লোক নানা অসঙ্গত ও অসংলগ্ন কথা বলিতে অবসর পাইতেছে। দ্বিতীয়ত ভারতের নিজ সাধনার কথা, ভারতের প্রকৃতি লক্ষ্য ও কৃষ্টি-পরম্পরায় কথা, তাহার অগণিত জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও অভাবের কথা বলিবার কেহ নাই। আর সর্ব্বশেষ ইংরেজ জাতির প্রকৃত অন্তরের কথা এখনও জানিবার ও বুঝিবার বাকী রহিয়াছে। ইংরেজ তার রাজনীতির শেষ কথা কোথাও লিখিয়া রাখে নাই। রাজ-নীতি-পরম্পরায় সিদ্ধপুরুষ ইংরেজ তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াই সকল কাজ করিবেন। গোল-টেবিল পরিচ্ছেদের শেষ না হইলে তাহার কিছু বুঝা যাইবে না।

অহিংস সংগ্রাম

ভারতের অহিংস রাজনৈতিক সংগ্রাম সভ্য-জগতে কিরূপ ভাবে পর্য্যবেক্ষিত হইতেছে, তাহা বিদেশীয় পত্রিকাদির মন্তব্য হইতে সময় সময় কিছু ধরিতে পারা যায়। সম্প্রতি ভারতের বিশ্ব-বিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য জগতের প্রধান প্রধান স্থানসমূহ পর্য্যটন করিয়া আসিতেছেন। তিনি যে সমস্ত মত সম্প্রতি সংবাদ পত্রাদির মধ্যদিয়া প্রচার করিতেছেন, তাহার মধ্যেও ঐ বিশ্ব-মানবের অভিমত পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। লিখিতেছেন—"I am proud that my country men

to-day under their great leader Mahatma Gandhi have disdained to imitate the violent methods of the modern military nations in their struggle for freedom, but have made moral integrity and the spirit of sacrifice the directive power of their non-violent movement. By accepting spiritual force as their chief weapon, they have already proved their superiority to the primitive mentality of unashamed pillage and man-slaughter which persists in most countries to-day, and I have no doubt that if our country men can keep fast to this heroism of non-violence inspite of violent provocation they will have no difficulty in establishing freedom, which is already theirs in so far as they are true to their central idea." আবার..........."the whole world to day has to recognise the greatness of India's spiritual struggle for liberty. India has proved that human history has come to a stage when moral force has to be acknowledged even by polities." গোলটেবিলের সভা সম্বন্ধে বলেন—"The invitation accorded to her by an imperial power which can easily coerce her to silence by a virulent maintenance of military law and order is itself a sign of the time undreamt of even a century ago. The real importance of the Conference is not in the opportunity it may offer of a co-operation with the British politicians but with the soul force of the whole world. We must know that this Conference is going to hold its sittings before the worldtribunal whose approbation it is eager to win." কবিবর আজ ভারতে তাঁহার দেশবাসীগণ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বর্ত্তমান জগতের হিংস্র-নীতির বিরুদ্ধে যে অহিংস সংগ্রামের দ্বারা স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতেছেন এবং যে নৈতিক শক্তিও ত্যাগের বলকে এই:আন্দোলনের পরিচালক শক্তিরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে গৌরব বোধ করিতেছেন। ভারতের এই আত্মিক-শক্তি ইহার মধ্যেই অন্যকার জগতের বহু জাতির অবলম্বিত হিংসাত্মক পশুশক্তির উপরে আপন শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছে।

ভারতের এই আত্মিক শক্তিকে আর বিশ্বজগৎ স্বীকার না করিয়া পারিতেছে না; ব্রিটিশ-রাজনীতিও আর ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না; কারণ বিশ্ব-মানবের সম্মতি ও সদিচ্ছার অনুসরণ করিয়া তাহাকে চলিতে হইতেছে; সেজন্যই ভারতীয়দিগের বৈঠকে আমন্ত্রণ করিবার মতন আয়োজনও হইয়াছে।

বাহিরে ব্রিটিশের নীতি যাহাই থাকুক না কেন, ভারতের ভিতরে এই অহিংস সংগ্রাম রাজশক্তির নিকট যে ব্যবহার পাইতেছে, তাহাতে এই আত্মিক বলের কোনও রূপ স্বীকৃতি বা অনুবোধ এপর্য্যন্ত জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কবিবর বলিতেছেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-শক্তির বল এত অধিক যে সামরিক বিধান দ্বারা এখনই ভারতের সমুদয় আন্দোলনকে বন্ধ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে পুলিসের উৎপীড়ন চলিতেছে তাহাকে সামরিক বিধান ব্যতীত আর কি বলা চলে? আত্মিক শক্তির বল যদি সত্য সত্যই ব্রিটিশ রাষ্ট্র পরিচালকগণ উপলব্ধি করিতে পারেন, তবেই উহার বিজয় প্রতিষ্ঠিত হইল বলা চলে।

সন্ধ্যোপাসনা

ত্রিবেদে সন্ধ্যা

বেদ এক। কিন্তু কর্ম্ম ও পারায়ণ ভেদে মহর্ষি বেদব্যাস ইহাকে চারি ভাগে গ্রথিত করেন। যথা ঋগ্বেদ সংহিতা, যজুর্ব্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা ও অথর্ব্ববেদ সংহিতা। আবার বেদ বলিতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ স্বরূপ শব্দগুলি বুঝিতে হয়। তাহা হইলে বেদ মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ এই দুইয়ে বিভক্ত। এই মন্ত্র আবার চারি ভাগে বিভক্ত, যথা—যে মন্ত্রগুলিতে ছন্দঃ ও পাদব্যবস্থা আছে তাহা ঋক্ নামে অভিহিত, যে মন্ত্রগুলি গান করা যায় তাহা সাম, বাকি মন্ত্রগুলি যজু নামে অভিহিত। এতদ্ ভিন্ন শান্তি পৌষ্টিকাদি কর্ম্মের মন্ত্রগুলিকে অথর্ব্ব বলে। অথর্ব্বাঙ্গিরস ঋষি সেইগুলি সংগ্রহ করেন তাই তার নাম অথর্ব্ব সংহিতা। দ্বিজ জাতির সন্ধ্যাও ঋক্, যজু ও সামবেদে আবদ্ধ। এবং পূর্ব্বোক্ত তিন বেদের তিন প্রকার সন্ধ্যার প্রচলন হিন্দু সমাজে আছে। যদিও তিনের মধ্যে পার্থক্য কম।

পুরুষ সূক্তে ঋগ্বেদের নাম প্রথমে উক্ত হইয়াছে, যথা—

ঋগ্বেদ প্রথম

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে। তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদ জায়ত।

অর্থাৎ সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞময় পুরুষ হইতে প্রথমে ঋক্ ও সাম প্রকাশ পাইয়াছিল পরে তাঁহা হইতে ছন্দঃ ও তাঁহা হইতে যজুঃ জন্মিয়াছিল। ছান্দোগ্যেও আছে—

ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমথর্ব্বাণাঞ্চতুর্থমিতি।

সনৎকুমারকে নারদ বলিতেছেন—আমি ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি। অতএব আমরা প্রথমে ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যার বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। পরে অপর দুই বেদের সন্ধ্যার যেখানে বিশেষত্ব তাহা দেখান হইবে। সন্ধ্যার বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অধিকারীর সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলিতে বাধ্য হইতেছি। সন্ধ্যার বিষয়,—পরমার্থের উপাসনা, প্রয়োজন,—সন্ধ্যা মন্ত্রের অর্থ জ্ঞান; সম্বন্ধ—উপাসক ও উপাস্যের ভাব এবং সন্ধ্যার মন্ত্রার্থী পুরুষই ইহার অধিকারী। সন্ধ্যা বেদ মন্ত্র। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় ধর্ম্ম এবং জ্ঞানকাণ্ডের বিষয় ব্রহ্ম। সন্ধ্যোপাসনাতে ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের উপায় লিপিবদ্ধ। সুতরাং সন্ধ্যোপাসনাটি ছেলেদের ঘেঁটু পূজা বা বালিকাদের ইতু পূজার ছড়া নহে। সন্ধ্যা বেদের চুম্বক ; সন্ধ্যা পাঠে সংক্ষেপে স্ব স্ব বেদ পাঠ হয়।

সন্ধ্যার বিষয় প্রয়োজন ও অধিকার

"ধর্ম্ম ব্রহ্মাণী বেদৈক বেদ্যে" অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম একমাত্র বেদগম্য—বেদ ছাড়া ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না। এই সন্ধ্যাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সমানাধিকার। ইহা এই ত্রিবর্ণের নিত্য কর্ম্ম, কাম্য কর্ম্ম নহে। "বেদ স্বাধ্যয়নং নিত্যমনধ্যয়নে পাতাৎ" যাহা না করিলে প্রত্যবায় হয় বা পাপ হয় তাহাই নিত্যকর্ম্ম; বিহিত কর্ম্ম নহে। এই "নিত্য" কথার সাম্প্রদায়িক কদর্থের প্রয়োজনাভাব। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—হে ত্রিবর্ণ। আপনারা সন্ধ্যা

সন্ধ্যা নিত্যকর্ম্ম বিহিত কর্ম্ম নহে।

পরিত্যাগ করিয়া বাজে কাজে পরিশ্রম করিবেন না। জীবিতাবস্থায় আর শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন না। যদি বলেন—অর্থ জ্ঞান হয় না, সুতরাং শুধু মন্ত্রগুলি পাখীর মত উচ্চারণ করিয়া কোন ফল নাই; ইহা অতি সত্য কথা, তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু বেদ মন্ত্রের এমনি শক্তি যে উহা বারংবার অভ্যাস করিতে করিতে মন্ত্র নিজেই উহার অর্থবোধ আনিয়া দেন। সখার ন্যায় পালন করেন বলিয়া বেদের এক নাম 'সচিবিৎ'। যেমন ছেলেরা যখন কিছু মুখস্থ করে তখন তাহারা মুখস্থ বস্তুটির কিছুই অর্থবোধ করে না। কিন্তু পরিণামে সে বস্তুতে সেই ছেলেই পণ্ডিত হয়। উড্রফ সাহেব বিধর্ম্মী, তিনিও এ তত্ত্বটি এমন সুন্দর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে তাঁহার বাক্যটি এই স্থানে উদ্ধৃত করিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে পারিলাম না :—

বেদ মন্ত্রের প্রভাব

"That man is a poor psychologist who does not know the effect of repetition when done with faith and devotion. It is a fact that the inner kingdom yields to violence and can be taken by assault." সে মানুষ নিশ্চয়ই অল্পবুদ্ধি যে জানে না যে সূক্ষ্ম জগৎ, বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত বারম্বার আক্রান্ত হইলে সাধকের করতলস্থ হইয়া পড়ে। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত সন্ধ্যা আবৃত্তি করিলে অর্থবোধ হইয়া থাকে—ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে। মূল কথা—শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন

পিতামহ ব্রহ্মা এই কথাটিই আশ্বলায়নকে বলিয়াছিলেন, যথা :—

"শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যান যোগাদবেহি।" অর্থাৎ শাস্ত্রে ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিতে বা আচার্য্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিলে এবং ভক্তি ও ধ্যানের সাহায্যে তাঁহাকে পাওয়া যায়।

সন্ধ্যার কাল

'যদাত্মা প্রজ্ঞয়াত্মানং সংধত্তে পরমাত্মনি।
তেন সন্ধ্যা ধ্যানমেব তস্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্' ॥ (ব্রহ্মোপঃ)

এখন আমরা সন্ধ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যার কথা আগে বলা হইতেছে।

ত্রয়াণাঞ্চেব বেদানাং ব্রহ্মাদীনাং সমাগমঃ।
সন্ধিঃ সর্ব্ব পুরাণাঞ্চ তেন সন্ধ্যা প্রকীর্ত্তিতা ॥

অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত যে সন্ধ্যার সময় সেই কালে বেদত্রয় ও ব্রহ্মাদি দেবতার একত্রে সমাগম হয় এবং তৎকালে সকল সুরগণেরও একত্র সমাবেশ হয়, এই জন্যই ঐ কালটিকে সন্ধ্যা নামে অভিহিত করা হয়। দক্ষ, বরাহ, ব্যাস, ও সম্বর্ত্ত প্রভৃতি শাস্ত্রকার ঋষিগণ এই কাল নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এই যে সনক্ষত্র সময়ে প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা করিতে হয় এবং সূর্য্যের সাম্যাবস্থায় অর্থাৎ অষ্টম মুহূর্ত্তে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার আচরণ করিবে।

যেমন সমষ্টি বিশ্বে এক মাত্র শক্তি বর্ত্তমান তদ্রূপ এই মানব দেহের মধ্যেও সেই পরমেশ্বর বর্ত্তমান। কিন্তু তাঁহার উপাসনা না করিলে তিনি প্রকাশিত হ'য়েন না। গাভীর দুগ্ধে ঘৃত বর্ত্তমান, কিন্তু দুগ্ধের উপাসনা না করিলে ঘৃত বহির্গত হইয়া

অনুষ্ঠান কেন আবশ্যক

সেই গাভীরই ঔষধ রূপে উপকারে আইসে না। গিরিতে সোণা আছে, কিন্তু সোণা বাহির করিতে উপাসনা বা কার্য্যানুষ্ঠান করিতেই হয়। সর্ব্বত্রই অনুষ্ঠান প্রয়োজন, তবে অভীপ্সিত ফল লাভ হয়। সুতরাং কি যুক্তিতে আমরা উপাসনা না করিয়া পরম শ্রেয়ঃ বস্তুলাভ করিব তাহা বুঝিতে পারি না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—"অথ কেন ব্রহ্মত্বং ক্রিয়তে ত্রয্যা বিদ্যয়া" অর্থাৎ প্রশ্ন হইল—কি প্রকারে ব্রহ্মকর্ম্ম সম্পাদন হয়। উত্তরে বলিতেছেন—ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা উহা সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ ত্রিবেদীয় কর্ম্মাচরণ দ্বারা পরমার্থ লাভ হয়।

প্রাতঃস্নানের প্রয়োজনীয়তা

রাত্রিতে জীব সুস্থ ভাবে নিদ্রাভোগের পর, যখন পুনরায় জাগরিত হ'য়েন, তখন ব্যষ্টি বিশ্বের সকল জিনিষই সাম্যাবস্থায় অবস্থিত থাকে। আমি বৈদ্য শাস্ত্রজ্ঞ না হইলেও, শুনিয়াছি প্রাতঃকালে কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি প্রায় সাম্যাবস্থায় থাকে। মোটা মুটি আমরা যা দেখি তাহাতে, স্নায়ু মণ্ডলী, মাংসপেশী ও মস্তিষ্ক প্রভৃতি সবই যেন প্রত্যুষে সুনিদ্রার পর নব জীবন প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যদেবের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সত্ব, রজঃ ও তমগুণের এবং কফ, পিত্ত ও বায়ুর বৈষম্য আরম্ভ হয়। এই মহান সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই এখনও বঙ্গদেশ ছাড়া সর্ব্বত্রেই হিন্দুগণ প্রাতঃস্নানের আচরণ করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে একজন সাধারণ লোককেও যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সে কেন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করে, সে তৎক্ষণাৎ বলে যে—তাপ উঠলে স্নানের ফল হয় না। শরীরের স্নিগ্ধতা রক্ষিত হয় না। ইহারা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না জানিলেও শরীরের সঙ্গে সূর্য্যদেবের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা অজ্ঞাতে উপলব্ধি করিয়া থাকে। অতএব প্রত্যুষে নিদ্রোত্থিত হইয়া যখন ত্রিগুণ বা ত্রিধাতুগুলি প্রায় সাম্যাবস্থায় অবস্থিত তখন স্নানান্তে পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলে সকল শক্তিগুলির এক মুখী গতি অতি সহজেই করা যায়। স্নানান্তে শোণিতপ্রবাহ জীবন্ত হওয়ায় পূর্ণ মানসিক শক্তি শক্তির শক্তি মূলশক্তিকে আঁকড়ে ধরিতে চেষ্টা করে। যে মূল শক্তির বিস্তৃতিতে সমূহ কর্ম্ম চেষ্টা সাধিত হয়, সেই মূল শক্তিকে ছুঁয়ে নিয়ে অবশ্যই জীবের কর্ম্মচেষ্টা শুধু পবিত্র হয় তাহা নহে পরন্তু শক্তিশালীও হয়।

নির্দ্দিষ্ট কালে কেন সন্ধ্যা করিত হয়

কাণে ময়লা থাকিলে আমরা কাটী দিয়া এক দিন বাহির করিলে পুনরায় যদি ময়লা হয় তবে আবার কাটি দিই। এইরূপ দুই চারি দিন করিবার পর কাণে ময়লা না হলেও মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করে; পরিণামে কাণে কাটি দেওয়া একটা অভ্যাসে পরিণত হয়। তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিছুদিন সন্ধ্যার উপাসনা করিলে মন ও শরীর যন্ত্রে ঐরূপ একটা অভ্যাস হয়। তখন ইচ্ছা না করিলেও যথা সময়ে মন ও শরীরে সেই উপাসনা কণ্ডুয়ন উপস্থিত হয়। কি সৌভাগ্য ভাবুন দেখি যদি ঠিক সেই কণ্ডুতির সময় আমরা উপাসনা আচরণ করি। চুলকাণি নিবৃত্ত হইলে আমরা সহজেই আত্মস্থ হইয়া যাই। খাইবার নিয়মটি ঠিক থাকা চাই, নচেৎ পাকস্থলীর কণ্ডুয়ন আরম্ভ হয়। ঠিক সময়ে খাদ্য দ্রব্য পাইলে তৎক্ষণাৎ শরীর পুষ্টিতে লাগিয়া যায়। আর সন্ধ্যার সময় কেন নির্দ্দিষ্ট হইবে ইহার উত্তর খুঁজিবার জন্য আমরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। একই নিয়মে জড় ও মানসিক জগৎ নিয়ন্ত্রিত। এই জন্যই সন্ধ্যার কাল উত্তীর্ণ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ক্ষিদের সময় পার হইলে পিত্ত পড়ে। পিত্ত রুষ্ট হইলে রোগ হয়। রোগ মানে ত্রিধাতুর বিকার। উপাসনার সময় পার হইলেও মনের রোগ হয়। মন স্থির না হইলে—সকল উপাসনাই অসিদ্ধ। সুতরাং সন্ধ্যার কাল নির্দ্দেশ সন্ধ্যোপসনায় একটি প্রধান অঙ্গ।

প্রাতঃসন্ধ্যা আচরিত হইবার পর যখন ক্রমশঃ "ঘাম" বা সূর্য্য তেজস্বী" হইতে থাকেন তখন সমস্ত কার্য্যচেষ্টাই ক্রমে ক্রমে তেজবান হয়। পরে যখন সূর্য্য পূর্ণ তেজে অধিষ্ঠিত হইলেন তখনই মধ্যাহ্নে সন্ধ্যার ব্যবস্থা। স্নায়ু ও মাংসপেসীগুলি যতদূর সম্ভব তেজের সহিত কাজ করিবার পূর্ণত্ব পাইলে তখন আবার সেই মূল শক্তিকে ছুঁইবার চেষ্টা। প্রাতে উদ্বুদ্ধ শক্তিকে ছুঁইয়া কর্ম্মারম্ভ, মধ্যাহ্নে পূর্ণতেজে অধিষ্ঠিত শক্তিকে ছুঁইয়া আবার অবসাদের দিকে গমন। সায়াহ্নে যখন সকল শক্তি আবার নিজ সাম্যাবস্থায় ফেরৎ যাইতেছেন তখন তাঁহাকে স্পর্শ করা।

মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে সন্ধ্যা

"রাত্রিং প্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূত নিবেশনীং।
ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাম্॥

সর্ব্বভূত নিবেশনী সেই মূল শক্তিতে সব ফিরিয়া যায়। আমরা বিজ্ঞান বিজ্ঞান করিয়া পরের মুখে ঝাল খাইতেছি। কিন্তু হিন্দুর নিত্য কর্ম্ম পদ্ধতির মধ্যে যে সকল পরম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহা দেখিবার অবসর পাই না। এইটিই কালপ্রভাব এবং এই জন্যই ইহাকে ঘোর কলিকাল বলা হইয়াছে।

কেন যে সন্ধ্যার সময় বেদত্রয় ও সর্ব্বদেবতা একত্র হয়েন তাহার কথঞ্চিৎ আভাস আমরা এই আলোচনায় বোধ হয় পাইয়া থাকি। মন্ত্রই দেবতার দেহ, মন্ত্রদ্বারাই দেবতা দীপ্ত হয়েন। দেবতা এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই।

"একং সদ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্য গ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুরিতি"

শ্রুতিতে, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই নানা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

আচমন

ওঁ তৎ সৎ। ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয় দিবীব চক্ষুরাততম্।

"ওঁ তৎ সতের" বিষয় ক্রমে আলোচনা হইবে। এখানে বাকি মন্ত্রের অর্থ বলা হইতেছে। বিষ্ণুর যে পরম পদ অন্তরীক্ষে বিস্তৃত এবং যাহা সর্ব্বত্র অপ্রতিহত গতি—দেবগণ সেই বিষ্ণুপদ নিরীক্ষণ করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া আচমন করিতে হয়।

মন্ত্র ও অর্থ

যিনি বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন বা যিনি বিশ্বকে সিঞ্চিত (পালন) করিতেছেন তিনিই বিষ্ণু। অর্থাৎ ঈশ্বরের সেই বিরাট মূর্ত্তির স্মরণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। আর সেই সঙ্গে কোন্ ব্যক্তি সেই পরম পদ লাভ করে তাহার বিষয়ও ভাবনা হইল। সাধ্য ও সিদ্ধের কথা মানস চক্ষের সম্মুখে ধরা হইল!

বিষ্ণু কে? ও কে বিষ্ণুকে দেখিতে পায়।

আসনশুদ্ধির মন্ত্রটির উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। যেমন অন্তঃরীক্ষের কথা বলা হইল তদ্রূপ "পৃথ্বীত্বয়া ধৃতা লোকাঃ দেবিত্বং বিষ্ণুনাধৃতং" পৃথিবীর কথাও স্মরণ করা হয়। সেই পৃথিবীকেও বিষ্ণু ধরিয়া আছেন। অর্থাৎ উর্দ্ধে ও অধঃ সর্ব্বত্রই সেই বিশ্বেশ্বর ব্রহ্মের অবস্থান ইহা স্মরণ করা হয়। আর বামে গুরু বা আচার্য্য দক্ষিণে গণেশ—ব্রহ্মের সিদ্ধিদাতৃত্ব শক্তি; উর্দ্ধে ব্রহ্মা ও অধোদেশে অনন্ত দেব—ক্রমে ক্রমে ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডে নিবদ্ধ হইবার চেষ্টা।

আসন শুদ্ধির মন্ত্র ও অর্থ

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচিঃ
সতু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়োনজায়তে।
বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

যে বিজ্ঞানবান্, সংযতমন ও সর্ব্বদা শুচি তিনিই সেই পদ বা স্থান প্রাপ্ত হয়েন। সে স্থানে গেলে আর স্থানচ্যুতি হয় না অর্থাৎ জন্ম হয় না। এই বিজ্ঞানবান্ সারথি ও সংযত মনই সেই বিষ্ণুর স্থান প্রাপ্ত হয়েন। কাজেই বিষ্ণুই সেই বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম পদার্থ। কিন্তু আমাদের সাবধান হইতে হইবে যে এখানে বিষ্ণু শব্দটি ব্যাপ্তি অর্থে ব্যবহৃত। ইহা ভাবা উচিত নহে যে বিষ্ণুই তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর অন্য নামধেয় দেবতাগণ বিষ্ণুর নিম্নে। সৃষ্টির পূর্ব্বও অদৃষ্ট এবং সৃষ্টির পরভাগও অদৃষ্ট। আমরা কেবল মধ্য স্থানটি দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা বলিয়া যেমন অদৃষ্ট, পূর্ব্ব ও উত্তরভাগ পরিত্যাগ করিলে সৃষ্টির সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করা যায় না, তদ্রূপ ত্রিগুণের কেবলমাত্র একটি গুণ ধরিলে সেই গুণত্রয়ময় পদার্থটির সর্ব্বত্ব—একত্ব-অদ্বিতীয়ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। বিরাটরূপী সেই ব্রহ্ম পদার্থটির অঙ্গচ্ছেদ হয় না, সেটি তিনটি গুণে—একটি আবার একটিতেই তিনটি। তিনটির উত্তরে যাহা আছে তাহাই গুণাতীত তুরীয়।—সুতরাং আচমনের 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' সেই ত্রিদেবময় বিরাট ব্রহ্ম পদার্থটিকে লক্ষ্য করিতেছে। যদিও আমরা এই তত্ত্বে গায়ত্রীর শাপোদ্ধার মন্ত্রের আলোলোচনায় আসিব তথাপি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বুদ্ধি নিরাশ কল্পে এইখানে একটু সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল।

বিষ্ণুর সাম্প্রদায়িক অর্থ

ত্রিসত্যের মত এই আচমন তিনবার করিতে হয়। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলে সংস্কার দৃঢ় হয়। তাহা ছাড়া তেজ, মরুৎ, ব্যোম,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং ভূর্ভুবস্ব লইয়াই এই উপাসনা এবং গণ্ডূষের জলহস্তের ব্রাহ্মতীর্থে গ্রহণ বিধি আছে। এখানেও সেই ব্রহ্মের সম্বন্ধ। আচমনে বসিবার পূর্ব্বে হাত পা ধুইতে হয়, তার পর উত্তর বা পূর্ব্বমুখে আসনে বসিয়া গণ্ডূষ করিতে হয়। জলপানান্তে অঙ্গুষ্ঠের মূল দ্বারা দুইবার মুখটি মুছিতে হয়। তার পর তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা মুখমণ্ডল স্পর্শ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকাদ্বয় স্পর্শ, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা দুই দুই বার করিয়া দুই চক্ষু ও দুই কাণ স্পর্শ, কনিষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভিদেশ স্পর্শ করতল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ, সর্ব্বাঙ্গুলি- যোগে শিরোদেশ স্পর্শ ও সর্ব্বাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়। এই আচরণগুলি আপাততঃ অর্থহীন বলিয়াই আমরা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু ইহার সহিত অঙ্গন্যাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যেরূপ আচমনের মূল মন্ত্রটিতে বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে তদ্রূপ এই প্রক্রিয়াগুলি অঙ্গন্যাসের প্রধান প্রধান স্থান গুলির ইঙ্গিত দিতেছে। সমষ্টি ছাড়িয়া আমাদিগকে ব্যষ্টিতে আসিতেই হইবে এবং ব্যষ্টিতে আসিলেই দেহতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। সার্জারি করিয়া দেহের মধ্যস্থ সকল মোটা জিনিষ গুলিরও সকল সময় সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি পরিস্ফুট হইলে 'একস্‌রের' সাহায্য বিনাও ভিতরটা দেখা যায়। সেটা অতিশয় সূক্ষ্ম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানবিৎ না হইলে সে তত্ত্ব বুঝা

প্রক্রিয়া ও তাহার মন্ত্রার্থের ইঙ্গিত

অসম্ভব। আমরা এ সম্বন্ধে যতটুকু সম্ভব উপযুক্ত সময়ে বলিতে চেষ্টিত হইব। তবে আনুষ্ঠানিক জনগণ ব্যতীত যে সে তত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে ইহা ভরসা করি না!

জলগণ্ডূষের পরিমাণ সম্বন্ধে ও কিরূপ জল আচমনে ব্যবহার করিতে হইবে তাহারও

জলের পরিমাণ ও কিরূপ জল ব্যবহার্য্য

উপদেশ দিতে ভুল হয় নাই। মাষ-কলাই নিমজ্জিত হইবে জলের এই পরিমাণ এবং জলটি প্রকৃতস্থ ও ফেন বুদ্‌ বুদ্‌ রহিত হইবে। কোন অপরিষ্কার ও অপবিত্র বা রিফাইন করা বা সিদ্ধ করা জলে আচমণ সিদ্ধ হয় না। প্রকৃতিজাত স্বপ্রকৃতিস্থ জলই আচমণে প্রশস্ত। এই জন্যই এখনও হিন্দুগণ ময়লা পূর্ণ হইলেও হাবড়ার "গঙ্গা জল" "গঙ্গা জল" করিয়া মরে। তবু পাইপ জলে পূজা কার্য্যাদি করিতে রাজি হয় না।

আবার জল রাখিবার আধারটিরও ব্যবস্থা আছে। যে সে পাত্রে জল রাখিয়া সন্ধ্যা করা

জলের আধার পাত্র

প্রশস্ত নহে। জলাশয় ছাড়িয়া সন্ধ্যা করিতে হইলে পঞ্চ পাত্রে সন্ধ্যার জল রাখিতে হয়। পঞ্চ পাত্রের আচমনের দাঁটিটি কুসীর মত বড় নহে। বৈদিক সন্ধ্যার বাসন তাই পঞ্চ পাত্র। কোষা কুসী তান্ত্রিকের। কেন না, বেদ পথ কষ্টের, তান্ত্রিক পথ ভোগের। এই পাত্র নির্দ্দেশেও বেদ ও তন্ত্র পথের-পুরুষ ও স্ত্রী মূর্ত্তির উপসনা পদ্ধতির সনাতন নীতি নিবদ্ধ। আমরা এখন চক্ষুহীন হইয়া তাহা দেখিতে পাই না এবং তার ফলে দুই পথ লইয়া কতই না বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া থাকি। বেদ পুরুষ ব্রহ্মার কমণ্ডলু-আদ্যাশক্তি মহামায়ার কোষাকুসী। এ বিষয়

দিক নির্দ্দেশ

এস্থানের আলোচ্য নহে। পূর্ব্ব বা উত্তর আস্যে কেন বসিতে হয় তাহারও বিশেষ কারণ বর্ত্তমান। প্রত্যেক বিধিরই সূক্ষ্ম কারণ আছে। সাধন পথে কিছু অগ্রসর হইলেই যে সকল কারণের ইঙ্গিত পাওনা যায়।

সাধকের মন, দেহ ও স্নায়ুগুলি 'অয়ের লেশের' যন্ত্র অপেক্ষা অতিশয় "ডেলিকেট" যন্ত্রে পরিণত হর। তাহাতে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সংবাদ আসিয়া থাকে।

আপো মার্জ্জন

সন্ধ্যায় বসিবার পূর্ব্বে যদি স্নান না করা হইয়া থাকে তবে নিম্নলিখিত কয়টি স্নানের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেহে জলের ছিটা দিতে হয়।

স্নান মন্ত্র **ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নুপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ।** ১

ওঁ দ্রুপদাদিব। মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণে বাজ্য **মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ।** ২

ওঁ অপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে। ওঁ যোবঃ শিব-তমো রসস্তস্য ভাজয়তেহন। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ। ৩

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত। ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরো অজায়ত। অহো রাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষ মথো স্বঃ। ৪

অর্থ —ধন্বন্য আপ (মরুদেশ জাতজল) আমাদের শং অর্থাৎ কল্যাণ করুক। তথাচ নূপ্যা জলময় দেশ জাত জল আমাদের মঙ্গল বিধায়িনী হউক। সমুদ্রবারি ও কূপোদক আমাদের মঙ্গলদায়ী হউক। ১ .

—আপ আমাকে এনস (পাপ) হইতে শুদ্ধ করুক। কিরূপ ভাবে না, দ্রুপদ (বৃক্ষমূল) হইতে স্বিন্ন (ঘর্ম্মাক্ত) ব্যক্তি যেরূপ শান্তি পায় তদ্রূপভাবে। অথবা স্নান করিলে যেমন লোক পবিত্র হয় তদ্রূপ ভাবে। অথবা যেরূপ মন্ত্র দ্বারা হোমের আজ্য পবিত্র হয় তদ্রূপ ভাবে। ২

—হে জলগণ! তোমরা অতিশয় সুখদায়ক। ইহলোকে আমাদের অন্ন বিধান করিয়া যাও। পরলোকেও তোমরা আমাদিগকে পরম মনোহর পরব্রহ্মের সহিত মিলিত করিয়া দাও। স্নেহময়ী মাতা যেমন স্তন পান করাইয়া সন্তানের কল্যাণ বিধান করেন, তদ্রূপ হে জল সকল! তোমরা আমাদিগকে কল্যাণময় রস দ্বারা তৃপ্ত কর। হে জলগণ! যে রস দ্বারা তোমরা আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বের তৃপ্তি সাধন করিতেছ, সেই রস দ্বারা যেন আমাদের তৃপ্তি জন্মে। তোমরা আমাদিগকে সেই রসের অংশীদার কর। ৩

—মহাপ্রলয় কালে কেবল মাত্র ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। তখন সমস্ত অন্ধকার ছিল। তার পর অদৃষ্ট কারণ বশে কারণবারিপূর্ণ সাগর উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই কারণ সলিল হইতে বিধাতা বা ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। সেই বিধাতাই দিবা প্রকাশক সূর্য্য ও নিশা প্রকাশক চন্দ্রমার সৃষ্টি করিয়া সংবৎসরের কল্পনা করেন। অর্থাৎ সেই সময় হইতেই দিবারাত্রি ঋতু অয়ন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ব্রহ্মা বা বিধাতা সপ্তলোক (মহ, জন, তপ ও সত্য উর্দ্ধ চারিলোক, এবং ভূ ভুব ও স্বর্গ এই ত্রিলোক) সৃষ্টি করেন। ৪

সৃষ্টি কর্ত্তা ও সৃষ্টির সম্বন্ধ

সৃষ্টিতত্ত্ব ছাড়িয়া সৃষ্টি-কর্ত্তার উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। চিত্র বা কারুকার্য্য দেখিলে তবে চিত্রকর বা কারিকরের বিষয় অনুসন্ধানের বস্তু হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব ওত প্রোত ভাবে বিজড়িত। সৃষ্টিকে ছাড়িয়া ধর্ম্মের আলোচনা আকাশ কুসুমের ন্যায়। এই জন্যই প্রত্যেক প্রাচীন জাতির 'মাইথলজি' আছে। যে জাতির মাইথলজি নাই সে জাতির ধর্ম্মতত্ত্ব অসম্পূর্ণ।

দেবতা ও ধর্ম্ম।

তুমি যে কোন জাতি হও—তুমি যে কোনও ধর্ম্মমতের বিশ্বাসী হও একবার পবিত্রচিত্তে ভাবিয়া দেখ উপর্য্যুক্ত মন্ত্রগুলিতে কি বিশ্বব্যাপী—কি মহান্ কি উদার প্রার্থনা সম্বদ্ধ। সন্ধ্যোপাসনায় বসিয়া দ্বিজ কি মহান অথচ কি সংক্ষেপে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই তত্ত্বের সংস্কার গ্রহণ করিতেছেন! এ চিন্তা কোন সীমাবদ্ধ

সন্ধ্যার বিশ্বব্যাপী উদারতা

জিনিষে আবদ্ধ নহে। কোন ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ প্রতীকে সাধকের মন এখানে নিবদ্ধ নহে। ইহাতে স্বার্থ চিন্তার লেশ নাই। এ প্রার্থনা সকলের জন্য। সকলের মধ্যে আমিও আছি, কাজেই সকলে কল্যাণ পাইলে আমিও কল্যাণ পাইব। এখানে কেবল আমার ভাল হউক এভাবের লেশ নাই। দ্বিজ জাতি যে আমিটাকে বিস্তৃত করিয়া সমস্ত

দেখিতেন। সুখ বা শান্তিটাকে ক্ষুদ্র আমিতে বেঁধে রাখিতে শিক্ষা পান নাই। তাই তাঁহাদের সুখ বা শান্তি সকলের সুখ ও শান্তির অন্তর্গত ছিল। হিন্দু বিশ্বকে আমার ভাবে—তার নিকট "আমার" কথা একটি পুত্রে একটি সংসারে, একটি সমাজে, একটি দেশে, একটি মহাদেশে, একটি পৃথিবীতে বা একটি লোকে আবদ্ধ নহে। তাহার "আমার" সেই তূরীয় ব্রহ্ম হইতেসমস্ত বস্তুতে ছড়ান। পাছে এই মহাসত্য ভুল হইয়া যায়, তাই উপাসনার প্রারম্ভে সেই সত্য স্মরণ করিয়া লয়!

জল ব্যবহার কেন

জল আপাত দৃষ্টিতে পার্থিব পদার্থ। সেই পার্থিব জল বিনা জীব প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। তাই জলের নাম জীবন। জীবনের সেই স্থূল অবয়ব ধরিয়া জীবনের জীবনের অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া জলকে ধরিয়াই তাঁহার নিকট যাইতে চাহে। জলের তন্মাত্রই রস। আবার তিনি "রসোবৈসঃ" পরম রসের আকর। বৈদিক উপাসনার এই বিশ্বব্যাপী মঙ্গলভাবটী ভাষা দ্বারা কি করিয়া বুঝাইব তাহার পথ পাওয়া যায় না। আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা উপলব্ধি করুন ইহাই নিবেদন।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান

বিদ্যমান বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হইলে তাহার বিষয় গ্রহণে যে জ্ঞান হয় তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান নামে অভিহিত। ধর্ম্মের আপাত কোন রূপ বা মূর্ত্তি নাই। কাজেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই পারে না। যথা বিধি কর্ম্মানুষ্ঠানের পর ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকেন। কর্ম্ম না করিলে ধর্ম্মের রূপ ধরা যায় না। অতএব অনুষ্ঠান আবশ্যক। বেদবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া মন্ত্রার্থ প্রার্থী হইয়া সন্ধ্যা আচরণ করিলে দেখা

কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ

যায় হিন্দুর এই সন্ধ্যা মন্ত্রগুলি কি মহান ও কি শান্তি প্রদ। "না বেদবিন্ মনুতে তং বৃহন্তং" যে বেদ জানে না সে বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মকে মনন করিতে পারে না। সন্ধ্যার মত সর্ব্বব্যাপী উপাসনা পদ্ধতি আর দেখা যায় না। অথচ আমরা তাহাকে "মামারি" "গিবারী" প্রভৃতি ভাষায় নিন্দা করিয়া নিজেদের বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় দিয়া থাকি। এই সন্ধ্যাচরণ না করার ফলেই-এই সন্ধ্যার অর্থ বোধের অভাবেই আমাদের নানা অধঃপতন আসিয়াছে। আমরা এক্ষণে সন্ধ্যা ছাড়িয়া তাই হুড়কো দিয়া প্রাণায়াম করিতে ছুটি—তাই শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে চক্রে চক্রে প্রণব জপি বা নমো বাসুদেবায় জপ করি ও যোনি মুদ্রায় আলো দেখি। —তাই আজ্ঞা চক্রে মন নিবদ্ধ করিয়া ওঁ জপ করি, তাই রাধাশ্যাম, গোপী জন বল্লভ প্রভৃতি

সন্ধ্যায় সাধন প্রণালী

সন্ধ্যার অংশ বিশেষ

মন্ত্র শ্বাস প্রশ্বাসে গাঁথিয়া জপ করি—তাই ওঁ ক্রীং ইত্যাদি চক্রে চক্র জপি, তাই উক্তরূপ একটা বুজরুকী সহজ সাধ্য কর্ম্মের ইঙ্গিত পাইলেই তথায় ছুটিয়া গিয়া দীক্ষিত হইয়া পড়ি। সব তত্ত্বপথই এই সন্ধ্যোপসনার অন্তর্গত; এবং আশা করি এই সন্ধ্যার আলোচনায় তাহা ক্রমে পরিস্ফুট হইবে। ভৃগু ও বসিষ্ঠ আমাদের কৃপা করুন।

সন্ধ্যার উপাসক বলবান

বৈদিক সাধক "নার্ভাস রেক্" নহে। তার সাধনা বা উপাসনা যথাবিধি আচরিত হইলে তাহার ফলে বলবান জাতি তৈরী হয়। বৈদিক সাধক স্বেদ অশ্রুকম্পনের ধার ধারে না। বসিষ্ঠ ভৃগু নারদের স্বেদ অশ্রু কম্পনের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় নাই। অশ্বত্থামা দ্রোণের, ভীষ্ম কর্ণের, রঘু ও দশরথের অশ্রু কম্পে ভক্তি? গ্রথিত হয় নাই। পরশুরাম কেঁদে কেঁদে পিতৃতর্পণ করেন নাই। কর্ণ কেঁদে কেঁদে পুত্রের শিরশ্ছেদন করেন নাই,

এবং কাঁদিলে দান অসিদ্ধ হয় একথা আগে বলা হইয়াছিল। ভগবৎ প্রেম মহাবলবান—বলের সেবা করিলে দুর্ব্বলতা আসে না। বৈদিকের মন ও প্রাণ ক্ষুদ্রত্বে বা সীমাবদ্ধ বস্তুতে নিবদ্ধ নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে দেখিয়াছিলাম, এক জন মুসলমান ধার্ম্মিক ব্যক্তি বক্তৃতা কালে বলিয়াছিলেন যে হিন্দুগণ যে দিন হইতে বেদের উপদেশ ও আচরণ ভুলিয়া গিয়া অন্য শাস্ত্রের কথা অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই দিন হইতেই তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থার সূত্রপাত। সেই মহাজন অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মুসলমান ধার্ম্মিকের উপদেশ

বৈদিক নারায়ণকে চক্র ও গদাধারী, ইন্দ্রকে বজ্রধারী এবং সাধ্য দেবতা মাত্রকেই অস্ত্রধারী করিয়া ধ্যান করিয়াছেন; আবার প্রহ্লাদ যে বিষ্ণুকে বিশ্বব্যাপী দেখিয়া শত্রুতাভাবের অভাব দেখিয়াছিলেন, সেই বিষ্ণুই যখন নরসিংহ রূপে অতি নৃশংস ভাবে হিরণ্যকসিপুকে হত্যা করিয়াছিলেন তখন প্রহ্লাদ নির্ব্বিকারে তাহা দেখিয়াছিলেন। সে বৈদিক হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব কি রমণীজনোচিত? নারদ ঋষির বীণা বাদ্যের ও নাম গানের বিরাম নাই, কিন্তু পুরাণে বা ইতিহাসে কোথাও দেখি নাই যে নারদ জল দেখে ভয় পেয়েছেন, গাছ দেখে ছুটে গেছেন বা কৃষ্ণের বা নারায়ণের চরণে প্রণত হইয়াছেন; পরন্তু সাধ্য দেবগণ মনুষ্যরূপে নারদ বসিষ্ঠ ভরদ্বাজ গৌতমাদি ঋষিদের চরণ বন্দনা করিয়াছেন।

দেবতা অস্ত্রধারী

সন্ধ্যার উপাসক রমণী নহেন।

সাগর পারের সংবাদ বাহক "কেবেল" ক্ষুদ্র সহরের টেলিফোনের ক্ষণ ভঙ্গুর তার নহে। সেই কেবেলের একটুকুরা নিয়ে ইন্দ্রের বজ্র তৈরী হয়। তার একটা নিয়ে—দাক্ষিণাত্য মালয় যাবা প্রভৃতি দেশে আলো জ্বলে। ভগবৎ প্রেমটা আদিরসের কবিতায় নিবদ্ধ নহে। সেটা শত শত বর্ষের ও বংশত্ব পর্য্যায়ের শুক্র রক্ষায় প্রবল শক্তি সম্পন্ন স্নায়ু যন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। প্রেমটা তাতে, "কেবেলে" এ বিদ্যুতের মত মিশিয়ে ও লুকিয়ে থেকে যায়। কেবল অতীন্দ্রিয় লোকের সংবাদ দিয়া জগতের অপার মঙ্গলবিধান করে। মহানুভব উড্রফের আর একটি কথার উল্লেখ এখানে করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন :—

শক্তিশালী স্নায়ুযন্ত্র ও মেধা

The Hindoo Sastras present a complete answer to the ignorant assertion made—that India has never evolved during the whole course of its history any spiritual concept capable of up-lifting a nation. What a capacity for failure! But what can stir and lift a man if the doctrine that He is power cannot do so.

অর্থাৎ নির্ব্বুদ্ধি মানবগণ বলিয়া থাকে যে হিন্দুগণ তাদের ইতিহাসে কখন এমন কোন ধর্ম্মতত্ত্ব লিপিবদ্ধ বা প্রচার করে নাই যদ্বারা একটা জাতি উন্নত হইতে পারে। উড্রফ্ বলিতেছেন যে, এই মিথ্যাপবাদের উত্তর হিন্দু শাস্ত্র সম্পূর্ণ ভাবে দিয়াছে, কেননা তার প্রত্যেক স্থানে বলা হইয়াছে যে মানুষই সেই সর্ব্বশক্তির আধার। যদি এই বাক্য জাতিকে শক্তিমান ও উন্নত করিতে না পারে তবে কিসে পারে তা মিথ্যাবাদী নিন্দুকগণই জানেন। সন্ধ্যামন্ত্রের অধিদৈবত গায়ত্রী—এই শক্তির বীজ। ইতি—ভার্গব কথিত।

———

আদর্শের সন্ধানে

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-ই-ই

(অধ্যাপক লাহোর ম্যাকলাউয়েড্ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ)

ধীর ভাবে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় সকল বিষয়েই আজ আমরা দ্রুত পরিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছি। কিন্তু দুখের বিষয় এই পরিবর্ত্তনের মুখে কোন বিষয়েই আমাদের আদর্শের ঐক্য পরিলক্ষিত হইতেছে না। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের আদর্শ বিভিন্ন ; কি বেশে কি ভূষণে, কি আচার ব্যবহারে,—কোন বিষয়েই আমাদের আদর্শ যে এক নহে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

বেশ হইতেই আরম্ভ করা যাক। বাঙ্গালীদের বেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, কেহ চাদর ব্যবহার করেন, কেহ মাত্র একটা পিরাণ পরিধান করেন, কেহ পাঞ্জাবী আস্তিন এবং কেহ বা চুড়িদার আস্তিনের জামা পরিয়া থাকেন, কেহ বা পিরাণের উপর কোট,—সে কোট আবার কাহারও গলা বন্ধ এবং কাহারও বা গলা খোলা ছাঁটের। কেহ পিরাণটাকে কাপড়ের নীচে পরেন, কাহারও বা পিরাণ অথবা চুড়িদারটা কোটের নীচে দিয়া ঝলঝল করিয়া ঝুলে। কাহারও কাহারও এসকলের উপর আবার পায়ে মোজা থাকে,—অনেকের থাকে না। পিরাণের উপর কাহারও বা আবার শক্ত কিম্বা নরম কলার থাকে। যাঁহারা ইউরোপ আমেরিকা, এমন কি জাপানও একবার ঘুরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কাপড় পরাটাকে যেন কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন ; তাই বাড়ীর বাহির হইতে হইলে ত কথাই নাই, কাপড় চলেই না, এমন কি রাত্রিবাসের জন্যও পায়জামা না হইলে তাঁহাদের হয় না। আবার দেখাদেখি, যাঁহারা এমন কি সমুদ্র পর্য্যন্তও দেখেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই চাল ধরিয়াছেন। এই গেল মোটামুটি বাঙ্গালীদের পোষাকের কথা ! মাদ্রাজীদের কথা বলিতে গেলে তাঁহারা আবার এ সকলের উপর কাপড়ের সঙ্গেই একটা করিয়া নেকটাই বাধেন,—তা পায়ে মোজা, এমন কি জুতা পর্য্যন্ত থাকুক আর না থাকুক। তাঁহাদের কাহারও মাথায় পাগড়ী থাকে, কাহারও টুপী থাকে, কাহারও বা মাথায় কিছুই থাকে না। উত্তর পশ্চিম ও পাঞ্জাবের লোকেরা অনেক সময় ঢলঢলে পায়জামার সঙ্গেও নেকটাই পরিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বরং দেখিতে পাওয়া যায় সকল প্রদেশের মুসলমানেরা তাঁহাদের পোষাকের ঐক্য কতকটা বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও পাশ্চাত্য শিক্ষার তারতম্য অনুসারে বেশের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের পরিচ্ছদে প্রদেশগত কিছু কিছু তারতম্য পরিলক্ষিত হইলেও, সকলের মধ্যেই এই এক প্রধান সত্য স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে যে, আমরা যতই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হইতেছি, আমাদের বেশও ততই তাহাদেরই অনুকরণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আমাদের মধ্যে যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও ভাবে যত অধিক অনুপ্রাণিত, তাঁহার বেশও তত অধিক পরিমাণে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে।

কেবল যে পরিচ্ছদে তাহা নহে,—ভূষণে, আচার ব্যবহারে, মতিগতিতে,—অর্থাৎ কি ব্যক্তিগত বা কি সামাজিক জীবন, সকলের মধ্যেই এই পরিবর্ত্তন কেহই লক্ষ্য না করিয়া থাকিতে পারেন না। এমন কি ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারেও পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবেশলাভ করিয়াছে। আমাদের গৃহ সাজ ও কেশ সজ্জায়, আমাদের অঙ্গরাগে, চলনে বচনে ও অঙ্গভঙ্গিতে, মতবাদে, রাজনীতি সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতিতে, চা ধূম প্রভৃতি যতকিছু পানীয় আছে সে সমস্ত পানে, এমন কি আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণের বাঁকাসিঁথি সিন্দুরবিন্দুবর্জ্জন ও মাত্র একগাছি চুড়ি সার করিয়া তাহার সঙ্গে হাতব্যাগ গ্রহণে, সর্ব্বশেষে ও সর্ব্বোপরি সুকেশিনীগণের "শিরোশোভা কেশের ছেদন" কাবুলীসুলভ bobbing ও shinglingয়ের প্রতি বিকট অনুরাগ প্রদর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাতেও এই একই সত্যের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, আমাদের সকল বিষয়ের আদর্শ দিন দিন দ্রুত পরিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছে।

এদেশ যখন মুসলমানদিগের শাসনাধীন ছিল তখন সকলে সকল বিষয়ে তাহাদেরই অনুকরণ করিতেন, এখন আমরা সকলে ইউরোপের অনুকরণ করিতেছি।

কিন্তু যদি আমরা সকলে বিচার করিয়া শ্রেয় বলিয়া একযোগে একাজ করিতাম, তবে তাহাতে কোন কথা বলিবার থাকিত না। তখন আমাদের আদর্শ একমুখী হইত। কিন্তু ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে অনুকরণ প্রথার এই অনুসরণ করায় ইহা প্রমাণ হয় যে, সর্ব্ববাদী সম্মত রূপে শ্রেয় বলিয়া ইহা গৃহিত হয় নাই। এখনও বিচারের অবকাশ আছে। কেন না দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ইহারই ফলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন উচ্ছৃঙ্খল হইতে আরম্ভ করিয়াছে. সমাজবন্ধন বহু পরিমাণে শিথিল, ধর্ম্মজীবন লুপ্তপ্রায়, অশান্তি বিকাশপ্রাপ্ত এবং সর্ব্বোপরি জীবনের আদর্শ বিশেষরূপে ক্ষুন্ন ও ম্লান হইয়াছে। এই আদর্শ লইয়াই কথা। জীবনে আদর্শই সার। অনুকরণ করিবার প্রকৃষ্ট ও উচ্চ আদর্শ যাহার এ জীবনে কিছু নাই, তাহার জীবন যে বৃথা, একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। তাই প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠে,—"আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার আদর্শ কি?" এ সম্বন্ধে বঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছিলেন—

"We Indians to day hanker after a Tomorrow which would be a facsimile copy of Europe's Today…situated as we are we cannot conceive of any other futûre. In the result we fail to realise that Europ's To-day will be its Yesterday by the time we reach the desired goal." (১) ইহার ভাবার্থ এই যে—

আজ ইউরোপ যে অবস্থায় আছে, কাল তাহার অবিকল নকলটী পাইবার প্রত্যাশায় ভারতবাসী আমরা লালায়িত। আমাদের এমনই অবস্থা যে, ইহা ছাড়া অন্য কোন ভবিষ্যতের কথা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ফলে আমরা বুঝিতে পারি না যে, যে সময় আমরা আমাদের অভিলষিত লক্ষ্যে পৌছিব, তখন ইউরোপের বর্ত্তমান তাহার অতীতে পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে।

কিন্তু ইহা হয় ত ব্যক্তিবিশেষের অভিমত বলিয়া কেহ কেহ উপেক্ষা করিতে পারেন। তাই এ বিষয়ে যদি এমন আরও সর্ব্বমান্য বা গণ্য ব্যক্তিগণের উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়,

(১) প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬, ২৫২ পৃষ্ঠা।

তবে তাহা যে সাধারণের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহা নিঃ সন্দেহ।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ যে একজন সর্ব্বমান্য ব্যক্তি, তাহা সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণে আধুনিক সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা দেখা যাক। তিনি বলিয়াছেন,—

"আধুনিক সভ্যতায় দেখি আত্মহনন কারীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহারা আধ্যাত্মিক আত্মঘাতক। এই সভ্যতায় অনিয়ন্ত্রিত বাসনা ও 'অহম্'কে অতিস্ফীত করিয়া তুলিবার অন্তহীন প্রবৃত্তি সীমাবদ্ধ করিবার শক্তি চলিয়া গিয়াছে। জীবনের ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমরা আমরা জীবনের সৌন্দর্য্য-সংস্কৃতিও হারাইতেছি। অলীক কবির মত আমরা বাক্‌চাতুর্য্যকেই শক্তি বলিয়া, বাস্তববাদকে সত্যবস্তু বলিয়া, ভ্রম করিতেছি। মধ্যযুগে যখন ইউরোপ স্বর্গরাজ্যে আস্থাবান্ ছিল, তখন জীবনের বিচিত্র শক্তিকে ছন্দোবদ্ধ করিতে ও সেই আদর্শের সঙ্গে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রবৃত্তির রুদ্র সংঘাতের মধ্যে সেই আদর্শজীবন ডাক দিয়াছে এবং ইউরোপের কর্ম্মচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই প্রয়াসের মূল ছিল একটী সৃষ্টির প্রেরণা—একটী গভীর আস্তিক্যবোধ যাহা আদেশ করিয়া বলিত—লোভ করিও না, আপনার সীমা চিনিয়া লও। সুসঙ্গত সৌধের স্থান জুড়িয়া আজ অসংখ্য ইটের পাজা গড়িয়া তুলিবার প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা দিয়াছে, এবং চূর্ণ ইটের গুঁড়ায় সুদক্ষ স্থপতির আদর্শটী চাপা পড়িয়াছে। ইহাতে বিদ্যার সহিত অবিদ্যার বিচ্ছেদ সূচিত হইতেছে। সেই জন্যই এক ছন্দহীন শক্তি সমস্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া এক প্রচ্ছন্ন অগ্নিদাহের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে দীপ্তি নাই, শুধু তাপ আছে।"

উপরে উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে এই তিনটী জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে,—"জীবনের ধর্ম্মচ্যুতি" "আধ্যাত্মিক আত্মহনন," ও "অনিয়ন্ত্রিত বাসনা"। জীবনের ধর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছে বলিয়াই বাসনা নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ রাখিবার শক্তি চলিয়া গিয়াছে। এখন প্রশ্ন উঠিবে;—"জীবনের ধর্ম্ম কি?" আমাদের ভারতীয় জীবন, ভারতীয় সভ্যতা কাহাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে?" তাহার উত্তরে এককথায় বলিতে পারা যায়,—"আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করিয়া, ধর্ম্মভাব বা পরমার্থ বুদ্ধিকে ঘেরিয়া। ভারতীয় সভ্যতা যে এই পরমার্থতাকেই ঘেরিয়া সহস্র বৎসরে গড়িয়া উঠিয়াছে, এ কথা বহুলোকের অবিদিত না থাকিলেও যাঁহারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার সুযোগ বা অবসর পান নাই, তাঁহাদের জন্য পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা সমূহে খ্যাতনামা কতিপয় ব্যক্তিগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে। যে অধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করে—পরমার্থকে বিসর্জ্জন দেয়—তাহার একমাত্র অবলম্বন জড়োপসনা—mateiialisim. কেন না এই বিশ্বে জড় ও চৈতন্য ছাড়া তৃতীয় পদার্থ নাই। এখন দেখা যাক, এ হেন জড়ের উপসনায় কি ফল পাওয়া গিয়া থাকে।

উপরে ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের অধিবেশনের যে অভিভাষণের কথার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জড়োপসনার দোষগুণ বিচার করিয়াছেন। তাহার মতে—

"—জড়বস্তুর উপাসনায় অসীল অতৃপ্তি। তাহা ক্রমবর্দ্ধমান আতিশয্যের পথে শুধু ছুটায়, কিছু প্রকাশ করে না; তাহার কোন রূপ নাই। এই লোক চির অন্ধকারে আবৃত, অন্ধের তমসাবৃত এখানে আছে শুধু মূক বস্তুপিণ্ডের বোঝা, মানুষের সত্য প্রার্থনা বৃহৎকেচায় না; সত্যকে চায়,

আলোককে চায়। তাহা অগ্নিকাণ্ড নয়, জ্যোতিরউন্মেষ। মানুষ অমৃতকে চায় কালের ব্যাপ্তিতে নয়, পূর্ণের শাশ্বত গৌরবে।

"মুক্তির অন্তর্লোকের পথরুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আমাদের নিকট বহির্জগতের দাবী এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সে লোকে বস্তু আছে কিন্তু তাহার অর্থ-সিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ। সে বাঁচিয়া থাকা দাসত্ব। জীবনের সত্য যাহাতে নিহিত, অন্ধতার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া মানুষের পক্ষে জীবনকে পাপ বলা সম্ভব হইয়াছে।" (১)

এই অতি যথার্থ উক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত বাক্যটী অতি নিগূঢ় সত্য প্রকাশ করিতেছে ;—"মুক্তির অন্তর্লোকের পথরুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আমাদের নিকট বহির্জগতের দাবী এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।" আজ যে আমরা "জীবিকার্থ সংঘর্ষ" (struggle for existence) প্রভৃতি কথা সাধারণের মুখে অনবরত শুনিতেছি, মনীষিরা বলেন, তাহা আমাদের জড়োপাসনারই ফল।

এই জড়োপসনা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ হইতে আসিয়াছে। এ সম্বন্ধে বঙ্গবাসী পত্রিকায় 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর বেকার সমস্যা' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ মহাশয় বলেন,—

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকেই বলেন যে, অভাবের প্রসারই সভ্যতার ভিত্তি। কথাটা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না যে, সুস্থ, সবল ও কার্য্যক্ষম থাকিবার জন্য আবশ্যকীয় অভাবগুলি পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কৃত্রিম ও লৌকিক অভাবের প্রসার আত্মবিনাশের পথ মাত্র। ইহাকে কিছুতেই সভ্যতার বিকাশ বলা যাইতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই অযথা অনুকরণের চেষ্টায় আমরা নানাদিকে এই আত্মবিকাশের পথে ছুটিতেছি।"

অতএব পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ যে আত্মবিনাশের পথ, তাহা বোধগম্য হইতে আর বাকী থাকে না। দুঃখের বিষয়; এই পাশ্চাত্য সভ্যতার পথে নিজেরা ত চলিয়াছিই, কিন্তু শুধু যে নিজেরাই চলিয়াছি, তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুরনারীগণকেও টানিয়া লইয়া চলিয়াছি।

জীবন যাত্রার সকল পথেই আজকাল ভারতমহিলা পা দিয়াছেন। ভারতীয় মহিলাগণের মধ্যে উকিল আছেন, ব্যারিষ্টার আছেন, ডাক্তার অগণিত আছেন ; কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আছেন, প্রফেসার আছেন, মাষ্টর ত যথেষ্ট আছেন। সাহিত্যিক কবি প্রভৃতিরও অভাব নাই। এঞ্জিনিয়ার আছেন কিনা ঠিক মনে করিতে পারিতেছি না,—তবে বিমানচালক আছেন! সাইকেল চালাইতে পারেন এমন মহিলা কে কত চান ? মোটর চালনাপটীয়সীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতেছে,—যাঁহারা মাথার কাপড় চুলের সঙ্গে সেফটি পিন দিয়া আঁটিয়া, অথবা কপালের উপর একটা জরির কিম্বা জাঁকাল একটা রেশমের ফোটা বাঁধিয়া কমনীয় হাতে steering wheel ধরিয়া অনির্ব্বচনীয় লালিত্যপূর্ণ ভঙ্গীতে আপন আপন স্বামী কিম্বা আত্মীয় গণকে সান্ধ্য বায়ু সেবন করাইয়া আনেন—এরূপ মহিলার সংখ্যাও কম নহে। মোটর সাইক্লিষ্ট বোধ হয় দেখি নাই,—কিন্তু তজ্জন্য দুশ্চিন্তার কোন কারণ দেখি না, এই দ্রুত অগ্রগমনের দিনে তাহাও যে অতি

(১)—ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্বর দেখিতে পাইব, এ আশা বোধ হয় করিতে পারা যায়। লেডী টাইপিষ্টের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় জানি না ভারতীয় মহিলা কোন টাইপিষ্টের চাকুরী করেন কিনা, কিন্তু সখের টাইপিষ্ট যে আছেন, এবং বিবাহের বাজারে পাত্রীর অন্যান্য গুণাগুণের সঙ্গে "টাইপ করিতে জানেন কিনা" এ প্রশ্ন যে কোথাও কোথাও আজকাল করা হইয়া থাকে, এ সংবাদ কাণে আসিয়াছে। যদি কেহ লেডী টাইপিষ্ট থাকেন, তবে আশ্চর্য্যের বিষয় নাই; কেন না, লেডী টিকিট বিক্রেতা যখন ভারতীয় হইয়াছেন, তখন লেডী টাইপিষ্ট বা shop girl হইতে বোধহয় কোন ক্ষতি হইবে না,—বিশেষতঃ যখন আবার "ভদ্রমহিলার নটীবৃত্তি" গ্রহণের কল্পনার কথাও কাণে আসিতেছে (১)। অবশ্য এসব কথা বলিবার সময় এতদ্দেশীয় এংগ্লোইণ্ডিয়ান (ফিরিঙ্গী) স্ত্রীলোকদিগের কথা ধরিতেছি না।

রাজনীতিক্ষেত্রেত আজকাল মহিলার অভাব নাইই।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা ভারতীয় মহিলার মনোভাবও যে কতদূর পাশ্চাত্যের অনুসরণ করিয়াছে, নিম্ন উদ্ধৃত অংশ হইতেই তাহার সম্যক্ প্রমাণ পাওয়া যাইবে;—

"দিল্লীতে ব্যবস্থা সভায় শারদা বিলের আলোচনার সময় বহুসংখ্যক মহিলা পতাকা হস্তে দল বাঁধিয়া সভ্যদিগকে ঐ আইনের সমর্থন করিতে অনুরোধ করিতেছিলেন।" (২)

এ সকলের উপরে আবার কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ কৌশলও ধীরে ধীরে আমাদের সমাজে স্থানলাভ করিতেছে। ইহার পরে বোধ হয় কিছু বলিতে হইবে না—কি স্ত্রী, কি পুরুষ, পাশ্চাত্য সভ্যতার পথে আমরা কতদূর অগ্রসর হইতেছি। (ক্রমশঃ)

পুরাণ ও মিথলজি

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেবললাল সাহা, এম্-এ

(৪)

যে সমস্ত কথা ও কাহিনীর বিষয় বলা হইয়াছে প্রকৃত মিথলজি সে সমস্ত হইতে অনেক উপরকার ভাবভূমির বিষয়। প্রাচীনকালে সর্ব্বদেশে মিথলজির ব্যাপার ছিল। তন্মধ্যে গ্রীক মিথলজি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহা ইয়ুরোপের সাহিত্য সমূহের মধ্যে লুকাইয়া এখনো বাঁচিয়া রহিয়াছে। রোমের মিথলজি গ্রীক মিথলজির আলোকেই পরিপুষ্ট ও পরিচালিত। মিশর দেশে একটী সুবিশাল মিথলজি গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাবিলোনিয়া, আসিরিয়া, ফিনিশিয়া প্রভৃতি দেশেও পরস্পর ভাবসম্বন্ধ-যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন মিথলজি ছিল। স্কন্দনেভীয় মিথলজি এখনো ইয়ুরোপে বিশেষ পরিচিত।

(১) প্রবর্ত্তক, জ্যৈ ১৩৩৬; প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৬।

(২)—প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৬।

Asgard (দেবোদ্যান) **Valhalla** (যুদ্ধে হত বীরগণের সুখনিকেতন), **Wednesday, Friday,** প্রভৃতি শব্দ স্কন্দনেভীয় মিথলজির সাক্ষ্য বহন করে। আমরা যাহাকে মিথলজি বলিতেছি তাহা ঐ সমস্ত প্রাচীন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল। গভীর বিশ্বাসের বিষয় ছিল। জীবনে সাধন করিবার বিষয় ছিল। মিথলজি নহে। ধর্ম্মের ছোটবড় কথা বলা থাকিত। কিন্তু এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে কেহ যদি সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম-সংস্কার-শূন্য শুদ্ধ ও মুক্তচিত্তে অধ্যয়ন করে তবে এই সমস্ত মিথলজি, বিশেষ গ্রীক মিথলজি—হইতে অধ্যাত্ম তত্ত্ব-রাজ্যের যে সংবাদ পাইবেন, বিশ্বপ্রতিষ্ঠানে ঈশ্বরের নিগূঢ় লীলাখেলার যে সন্ধান পাইবেন, এই সমস্ত দেশে বর্ত্তমান প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে তাহা পাইবেন না। মানব-জাতির অধ্যাত্ম সাধনার সীমাহীন ইতিহাস অনুশীলন করিতে হইলে প্রধানতঃ হিন্দুর পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্র সমুদ্রে ডুবিতে হইবে। তার পর দেশ বিদেশের প্রাচীন মিথলজি। তারপর বৌদ্ধ জৈনাদি পরবর্ত্তী কালের ধর্ম্মশাস্ত্র। তারপর বাইবেল কোরাণ।

মিথলজির উৎপত্তি কেমন করিয়া হয় সে কথা কেহই নিশ্চয় করিয়া প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারে না। মিথলজির আদি কথা গভীর রহস্যজালে সমাবৃত। তবু কিছু কিছু আভাস গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই একটু ব্যঞ্জনা করা হইয়াছে। মানুষ কুতর্ক কলুষপরিশূন্য চিত্তে জগতের দিকে চাহিয়া দেখে—সর্ব্বত্র একটী সুজটিল শক্তি প্রবাহ। কার্য্য দেখা যায়। কারণ দেখা যায় না। কর্ম্ম দেখা যায়। কর্ত্তা দেখা যায় না। আবার দেখাও যায়। কিন্তু বড় অস্পষ্ট। কি যেন ক্রীড়াশীল শক্তি ঝলক দিয়া মিলাইয়া যায়। ইতস্ততঃ অলৌকিক জ্যোতির ছটা। কি যেন অস্ফুট ধ্বনি সহসা শোনা যায়। শুনিতে চেষ্টা করিলে সমস্ত নীরব। শুধু বাহিরে নয়। অন্তরেও তাই। আমার অজানাও কি যেন শক্তি স্বতন্ত্রভাবে আমার জীবনে ক্রিয়া করিতেছে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে ঘুরাইয়া চলিতেছে। ইহা মানবচিত্তের একটা স্বাভাবিক অবস্থা। এই প্রকার অধ্যাত্ম চেতনা হইতেই মিথলজির উৎপত্তি অর্থাৎ গতিশীল এবং ক্রিয়াশীল বস্তুর চির-চঞ্চল ছায়ার অনুসরণ। সেই বস্তু ধরিবার বুঝিবার চেষ্টা হইতেই মিথলজি হয়। ইহা মানব-জীবনের প্রধান সাধনা। এই সাধনার সিদ্ধি হইতেই পুরাণ আদি হিন্দু-শাস্ত্রের প্রকাশ।

মিথলজিতে আমরা যে দেবদেবীর কাহিনী পাই তাহারে অন্তরে সুমহান সত্য নিহিত আছে। কিন্তু সমস্তই অলীক কল্পনার আবরণে সমাদৃত। কাহিনীতে বর্ণিত দেবদেবীগণের কথা কখনো কখনো সত্যই। কিন্তু অধিকাংশ সময় তাহারা কল্পনার ক্রীড়াপুত্তলিকা। ব্যক্তিগত বা জাতিগত বাসনার সূতার টানে নাচিতেছে। কখনো কখনো নিরবচ্ছিন্ন রূপকের লহরী। গ্রীক মিথলজির প্রারম্ভে পাইতেছি দুইটী দেবতা। ইয়ুরেনাস্ (বরুণ) আর গীয়া (পৃথিবী)। আকাশ-তত্ত্ব আর পৃথ্বী-তত্ত্ব। ইহাদের বহু সন্তান হইল। আটটী প্রধান। ক্রোনস্ (কাল), ওশেনাস্ (অপ-তত্ত্ব), হাইপিরিয়ান—এই তিনটী পুত্র। আর থীয়া, রীয়া টেথিস, ম্নেমোসীন, ফিবী—এই পাচটী কন্যা। ক্রোনস বিবাহ করিল রীয়াকে। সন্তান হইল জিউস্, পসীডন, হেডীস, হীরা, ডেমেটর, হেষ্টিয়া। ওশেনাস বিবাহ করিল টেথিসকে। সিন্ধু সুন্দরীগণ এবং জগতের সমস্ত জলদেবীগণ ইহাদের কন্যা। হাইপিরিয়ানের সঙ্গে থীয়ার পরিণয় হইল। ইহাদের সন্তান

হইল হিলীয়স, সিলীনে, ইয়স্। অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্র, উষা। জিউস্, পসীডন আর হেডীস তিনভাই বিশ্বসংসার ভাগ করিয়া লইল। জিউস পাইল স্বর্গ আর পৃথিবীর স্থলভাগ। পসীডন হইল সিন্ধু-সাম্রাজ্যের অধিপতি। হেডীস মৃত্যুলোকের অধীশ্বর। জিউসের অনেক পরিণয় অর্থাৎ প্রণয়। প্রথমা পত্নী মেটিস ওশেনাস-দুহিতা। কন্যা হইল এথিনা। দ্বিতীয় বিবাহ থেমিসের সঙ্গে, সন্তান হোরি এবং মোএরি। তৃতীয়া পত্নী ইউরীনোম। লাবণ্যবতী কন্যা হইল তিনটী—ইউফ্রোসীন, আগ্লাহিয়া, থালীয়া। চতুর্থী পত্নী মেমোসীন। কন্যা নয়টী। নানাবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী। পঞ্চমী লোটা। সন্তান এপল্লো ও আর্টিমিস। হিরা পট্টমহিষী। দেবেন্দ্রাণী। জিরী, এরিস্ এবং ইলিথীয়ার জননী। গ্রীক মিথলজীতে অসংখ্য দেবতার নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বারো জন প্রধান। জিউস্, পসীডন, এপলো, এরিস্, হারমিস, হেফীষ্টাস্ - এই ছয় জন দেব শ্রেষ্ঠ। ডিমেটার, হীরা, এথিনা, আফ্রোডিটে এবং আর্টিমিস—সবচেয়ে প্রভাববতী এই ছয়জন দেবী। অলিম্পাস ইহাদের পার্থিব ধাম।

গ্রীক মিথলজি অনুসারে সৃষ্টির আদি কারণ কেয়স্ বা অনাদি জড়-সত্তা। অনন্ত কোটি পরমাণু সমষ্টি। এই কেয়স হইতে 'স্বভাবতই' গীয়া বা পৃথিবীর উৎপত্তি হইল। পৃথিবী হইতে কিংবা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গেই ইয়ুরেনাসের উদ্ভব হইল। ইয়ুরেনাস কিন্তু আকাশ তত্ত্ব। পৃথিবী হইতে আকাশের উৎপত্তি অবৈজ্ঞানিক। আকাশ হইতেই পৃথিবীর সম্ভব সঙ্গত। এ বিষয়ে গ্রীক-কল্পনার গতি পথ অনুসরণ করা যায় না। তারপর চৈতন্যসত্ত্বার উদ্ভবের কোনো ইঙ্গিত পাই না। জড় হইতে ধীরে ধীরে জ্ঞানের প্রকাশ দেখিতে পাই। কোনো জ্ঞানময় কারণ-তত্ত্বের সন্ধান কোথাও নাই। ইউরেনাসে কোনো প্রকার চৈতন্যশক্তির ক্রিয়া নাই বলিলেই হয়। সন্তানগণকে ঘৃণা করে এইমাত্র। ইহা তামসিক নিরোধ ভাব। তারপর ক্রোনস, নিজের সন্তান নিজেই ভক্ষণ করে। মাতার আদেশে পিতাকে খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটে। রূপকের ভাবে ইহার অর্থ বোঝা যায়। ক্রোনসের সন্তান জিউস, হিরা প্রভৃতিতে বুদ্ধি বৃত্তি খুব বিকশিত। কিন্তু কোনো প্রকার উত্তমা বুদ্ধির প্রসঙ্গ নাই। আর ইহার মধ্যে কোনো স্থানে ভগবৎ-তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। অর্থাৎ গ্রীকদের জ্ঞান এই সমস্ত দেব-কল্পনা প্রকাশের যুগে জড়জগৎ অতিক্রম করিতে পারে নাই। গুণাতীত বা অতিপ্রাকৃত কোনো সত্তার চেতনা লাভ করে নাই। দেব-বংশের একবার বিস্তার হওয়ার পর দেবদেবীর লীলাখেলা গ্রীকরা যে ভাবে বুঝিয়াছে এবং বর্ণনা করিতেছে, তাহাতে সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের অনুভূতি বা অনুমানের কোনো প্রমাণ না থাকিলেও অতি সূক্ষ্ম গুণাত্মক তত্ত্বসমূহের মার্জ্জিত বুদ্ধিবিচারের শত শত প্রমাণ আছে।

গ্রীকমিথলজির উৎপত্তি-সম্বন্ধে বাহ্যতঃ যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। স্থূল পৃথিবীর অনুধাবন হইতে এপলো এথিনার মত দেবদেবীর প্রকাশ হয় নাই। পৃথিবী বা গীয়া বলিতে তাহারা কোনো অপ্রাকৃত চেতনাময়-তত্ত্বই বুঝিত। বহুযুগ পর্য্যন্ত গ্রীকদের মধ্যে গুণাতীত শুদ্ধ চৈতন্য ব্যাপারের কোনো ধারণা জাগে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা জড়বাদী ছিল না। ভৌতিক পদার্থ সমস্তই তাহারা জ্ঞানানুভবশক্তিযুক্ত মনে করিত। অথবা জ্ঞানানুভবশক্তি সংযুক্ত দেবদেবীগণ কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত মনে করিত। মানুষের স্বাভাবিক যে মানস ব্যাপার—সুখদুঃখ প্রীতি স্নেহ হিংসাদ্বেষাদি বিকার প্রবাহ—তাহার অতিরিক্ত তাহারা আর কিছু কল্পনা করিতে পারিত,

মিথলজিতে তাহার কোনো প্রমাণ নাই। এই যে বিকারাত্মক অন্তঃকরণ ইহা প্রাচীনতম গ্রীকযুগে খুব শুদ্ধ সতেজ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। স্থূল জড়পদার্থের তামস চিন্তাজালে বদ্ধ ও রুদ্ধ ছিল না। বর্ত্তমান জগতের তথাকথিত বিজ্ঞান-শৃঙ্খলিত কুতর্ক কদাকার বিকৃত মানসিকতার সঙ্গে এই সহজ সুন্দর সতেজ গ্রীক মনোবৃত্তির কোনো তুলনা হয় না। প্রাচীন ভারতের নির্ম্মলোজ্জ্বল চিন্ময়াত্মচিন্তনপরায়ণ চিত্তবৃত্তি এক প্রান্তে। জ্যোতির লোকে। বর্ত্তমান ইয়ুরোপের জড়-বিজড়িত স্বার্থ-সুখ-শিক্ষা-প্রপীড়িত জাতিসমূহের ব্যর্থবিদ্যা-কুসংস্কারাপন্ন চিত্তবৃত্তি অন্য প্রান্তে। তমোলোকে। মধ্যদেশে অন্তরীক্ষে গ্রীক মনোবৃত্তি। গ্রীকরা ব্রহ্ম জানে না। "একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" "একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।" জানে না। ভগবান্ জানে না। কিন্তু তবু তাহাদের অনুভূতি সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ। তাহাদের দৃষ্টি প্রাকৃতিক পদার্থের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া দিব্য মূর্ত্ত প্রাণের দেশে প্রবেশ করিতে পারে। বিশ্বজগতে তাহারা গাছ পাথর নদ নদী দেখিত না। দেখিত লীলা-নর্ম্ম-পরায়ণ দেবদেবীবৃন্দ। তাহারা প্রাকৃত অপ্রাকৃতের ভেদ জানিত না। গুণাত্মক গুণাতীতের সম্বন্ধ জানিত না। কিন্তু অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান তাহারা জানিত। অতীন্দ্রিয়ের চঞ্চল আলোকাভাস অন্বেষণ করিবার জন্য তাহাদের ইন্দ্রিয় মন সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। একটা আলোকলোকের প্রকাণ্ড প্রকাশ, একটা বৃহৎ রেভেলেশন তাহারা পাইল। কিন্তু প্রাকৃত মনোবৃত্তির সীমা অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত চৈতন্যোদ্বোধনের কোনো উপায় তাহারা আবিষ্কার করিতে পারিল না। সে সাধনার চেষ্টা তাহারা করিল না। সুতরাং তাহাদের অতীন্দ্রিয়ের অভিমান অর্দ্ধ পথে থামিয়া গেল। আলোকের রেভেলেশনটা তাহারা পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহাদের স্বাভাবিক মনোবিকারবিক্ষিপ্ত চেতনায় যে আলোক পতিত হইল তাহা ছিন্ন পরিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। রিফ্র্যাক্শন হইল। বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল বর্ণরাশির উদ্ভব হইল। রশ্মিগুলিকে তাহারা সূত্রে-মণি-গণা-ইব গাঁথিতে পারিল না। বিবিধ বিভিন্ন দেবদেবীর প্রকাশ হইল। তাহারা ঐক্য-সম্বন্ধ শূন্য। তাহাদের মধ্যে নিত্য বিরোধ। নিত্য সংঘর্ষ। তাহাদের সংযোগ সামঞ্জস্য নাই।

দেবদেবী বাস্তবিক না কাল্পনিক—ইহা একটী গুরুতর প্রশ্ন। গভীর চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে। স্থানান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। ভবিষ্যতে আরো করা হইবে। এখানে দুই একটী কথা। দেবদেবী ধ্রুব সত্য। কিন্তু মানুষ সেই সত্যকার দেবতা দেখিল না কল্পনা করিয়া রচনা করিয়া তুলিল, ইহা সঙ্গত প্রশ্ন। মিথলজিতে যে সমস্ত দেবদেবীর ব্যাপার-ব্যবহার বর্ণনা আমরা পাই তাহা এক অতিবিমিশ্র বিষয়—সত্য-দর্শন, অর্দ্ধ দর্শন; আভাস-দর্শন, সত্যানুগামিনী কল্পনা, উচ্ছৃঙ্খল-কল্পনা, অলীক অসঙ্গত জল্পনা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া মানব-হৃদয়ের বিচিত্র কামনা বাসনাদির বিবিধ বর্ণচ্ছায়াও এই দেবদেবীগণের উপর পতিত হইয়া ইহাদিগকে নানা প্রকারে রঞ্জিত করিয়াছে। গ্রীকদেবদেবীর যে বিবরণ গ্রীক মিথলজিতে পাওয়া যায়—তাহার ভিতর দিয়া একটী আশ্চর্য্য মনস্তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে। সে এক বৃহৎ ব্যাপার। অনুসন্ধান করিলে তাহাতে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে। সর্ব্বত্র অধ্যাত্ম তত্ত্ব দর্শন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সঙ্গে নবযৌবনের উজ্জ্বল কল্পনা। তরুণ সৌন্দর্যানুভূতি, এবং উদ্দাম রাজসিক চিত্তবৃত্তি। সঙ্গে সঙ্গে একটী সতেজ সুস্থ শৈশব-স্বভাব। আত্ম-সংযম সাধন চেষ্টার সম্পূর্ণ অভাব।

হৃদয়-প্রাণ এবং বুদ্ধি-বিচার-বৃত্তি শুদ্ধ ও নির্ম্মল করিবার কোনো প্রয়াস নাই। জগতের সর্ব্বত্র তাহারা দিব্যসত্ত্বার আভাস পাইতেছে। কিন্তু তাহাদের চঞ্চলচিত্তে সেই জ্যোতিশ্ছায়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। তরঙ্গিত সরোবর বক্ষে অরুণ কিরণের মত। তাহারা সেই ছিন্ন-রশ্মি-জালে সমাবৃত। রশ্মিগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সাজাইতে পারিতেছে না। তাহাদের উৎপত্তিস্থানের কোনো অনুসন্ধান করিতে পারিতেছে না। তাহারা দেখিতেছে কতকগুলি রশ্মি একটী দিব্য শক্তি মূর্ত্তি হইতে আসিতেছে। কোনো দেব বা দেবী। তাহাদের দৃষ্টিশক্তি এমন সতেজ নয় যে সে রশ্মি কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত না হইয়া রশ্মি ভেদ করিয়া ঐ দিব্য মূর্ত্তিটাকে স্পষ্ট করিয়া তত্ত্বতঃ দর্শন করিতে পারে। এক মূর্ত্তির সহিত অন্য মূর্ত্তির সম্বন্ধ কি তাহা বুঝিতে পারে। তাহারা কোনো দিব্য জ্যোতির্মূর্ত্তি-বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে পারে নাই। কারণ তাহাদের যোগসাধনা ছিল না। অবিরাম বিকার-প্রবাহবতী স্ব-প্রকৃতিকে পশ্চাতে রাখিয়া দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী প্রকৃতিপ্রবাহ হৃদয়ে ধারণ করিবার, নয়নে দর্শন করিবার উপায় তাহারা জানিত না। গ্রীকরা যাহা যাহা জানিত না, এবং সাধিতে পারিত না, আর্য্য ঋষিরা তাহা সমস্তই জীবনে সাধন করিয়া গিয়াছেন। মিথলজি ও পুরাণের মধ্যে যে গুরুতর প্রভেদ তাহার কারণ দুই জাতির আধ্যাত্মিক অনুশীলনের এই গুরুতর প্রভেদ। গ্রীক মিথলজি হইতে দুই একটী উদাহরণ দিব। শত শত উদাহরণ দেওয়া যায়। এখানে স্থানাভাব।

গীয়ার কন্যা রীয়া। রীয়ার কন্যা ডিমেটের। ডিমেটেরের কন্যা হিকেটী ও পারসিফনী। গীয়া আদি জননী পৃথিবী দেবী। রীয়াও জননী পৃথিবী দেবমাতা। ডিমেটের মানেই পৃথিবী মাতা। হিকেটী প্রকারান্তরে পৃথিবীই। পারসিফনীও বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীরই প্রকাশমূর্ত্তি। সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। প্রথম কথা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতরাজ্যের ভেদবিধানের অক্ষমতা। ভূমণ্ডল মনের উপর চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছে। কখনো দিব্য-রূপ। কখনো পার্থিব রূপ। নানা প্রকার অপ্রাকৃত আলোক তত্ত্বের এবং চৈতন্য-তত্ত্বের আভাস আসিতেছে। আবার সমস্তই পৃথিবীর মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে। তত্ত্বগুলিকে তাহারা পৃথক পৃথক করিয়া ধরিতে পারিতেছে না। গ্রীকরা স্থূল-ভৌতিক পৃথিবী দেখিতেছে না। দেবী-প্রতিমাই দেখিতেছে। সত্যই দেখিতেছে। কল্পনা নয়। কল্পনার জন্য দেশময় মন্দির, উপাসনা, পূজা, বলি, উৎসবাদি হয় না। কিন্তু প্রতিমাগুলি যাহা তাহাদের নয়নগোচর হইতেছে তাহার রূপবর্ণাভাস পরিবর্ত্তনময়। এক এক সময় এক এক ভাবান্বিত বলিয়া মনে হয়। সেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের সামঞ্জস্য হইতেছে না। গ্রীকরা সেই তত্ত্ব ধরিতে পারিতেছে না। এদের দার্শনিক অঙ্গাঙ্গি-সম্মিলনবিধি বা সিন্থেসিস্ নাই। বৈজ্ঞানিক এনালিসিস্ বা বিষয়-বিশ্লেষণ নাই।

গীয়া প্রকৃত পক্ষে সাংখ্যের প্রকৃতি। সৃষ্টির আদি কারণ, গ্রীকরা ইহাকে ইয়ুরেনাসের সঙ্গে মিলাইয়াছে। কিন্তু ইয়ুরেনাসকেও ভাল করিয়া বোঝে নাই। আর ইয়ুরেনাসের সঙ্গে অর্থাৎ তন্নামক পুরুষের সঙ্গে গীয়ার সম্বন্ধ কি তাহাও জানে না। ইহারা চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষতত্ত্ব বিষয়ে কোনো কিছু কল্পনাই করিতে পারে নাই। গীয়া-নাম্নী প্রকৃতি লইয়া যথেষ্ট ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছে। অবশেষে তত্ত্বজ্ঞানের অক্ষমতার পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। তারপর রীয়া। রীয়াকে ইহারা প্রায় বিশ্বজীব-জননী রূপেই বুঝিয়াছিল। রীয়া প্রকৃতপক্ষে ভগবতী দুর্গার ছায়া। গ্রীকরা

ইহাকে সিংহবাহিনী বলিয়া বর্ণনা করিত এবং তদ্রূপেই তাঁহার প্রতিমা গড়িত। ইহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। রীয়ার চরণতলে সিংহ বসিয়া আছে। তিনি সিংহাসন-সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যাদি। এসিয়া-মাইনারের গ্রীকরা রীয়াকে এসিয়ার সর্ব্বজন পূজিত 'মহীয়সী মহাদেবী', 'মহিমান্বিতা মাতার' সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছিলেন—গ্রীকমিথলজির ঐতিহাসিকরা এই কথা বলেন। এসিয়ার এই মহীয়সী জননী ভারতবর্ষের ভগবতী দুর্গা ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন কল্পনা করিতে পারি না।* রীয়ার স্বামী ক্রোনস্। ক্রোনস মানে কাল। সুতরাং রীয়া কাল অর্থাৎ রুদ্রের রমণী রুদ্রাণী বা কালী। ডিমেটের জননী পৃথিবী। ইনি শস্য ও ফলমূলাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা হইতেন। ইনি স্বামী জিউসের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ওলীম্পাস পরিত্যাগ করিয়া গেলে পৃথিবী শস্যশূন্যা কন্দপুষ্পাশূন্যা হইয়াছিল। হিকেটী ইহার কন্যা। পারসিফ্‌নীও কন্যা। হিকেটীর বর্ণনায় গ্রীকতত্ত্ব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

হিকেটী প্রথমতঃ স্বর্গের অধিশ্বরী। মনুষ্যলোকে প্রভাববতী দেবী। আবার সমুদ্রেরও রাণী। সুতরাং ঐ রীয়া ডিমেটের অন্যরূপে আসিতেছেন। স্বর্গে ইনি রীয়া। হিরা প্রভৃতির সঙ্গে মিলিবেন। সমুদ্রে টেথিসের সঙ্গে। মর্ত্ত্যে পারসিফ্‌নীর সঙ্গে। ইনি সৌভাগ্য সম্পদদায়িনী। সুতরাং লক্ষ্মী। ইনি বিজয়দায়িনী। আবার বিদ্যাদায়িনী। সুতরাং সরস্বতী। ইনি সমস্ত দেবগণের মাননীয়া। ইহার ভগিনী পারসিফ্‌নী বসন্ত-কাননের রাণী। কুসুম চয়ন করিয়া গান করিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করেন। হঠাৎ একদিন অন্ধকার প্রেতলোকের রাজা প্লুটো বা যম তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। তাহার অনুসন্ধানের সময় হিকেটী ডিমেটেরকে খুব সাহায্য করিল। তারপর হইতে ধীরে ধীরে হিকেটী প্রেতলোকবাসিনী তমোময়ী দেবী হইয়া গেলেন। স্বর্গে মর্ত্তে সমুদ্রে যাহার মঙ্গলময়ী প্রতিভার আলোক। যিনি সম্পত্তি ও সৌভাগ্যদান করেন, জ্ঞানবিদ্যা দান করেন, তিনি অবশেষে অন্ধকারময় প্রেতপুরে অধিষ্ঠিতা হইলেন। যোগদৃষ্টিশূন্য তত্ত্বজ্ঞানহীন গ্রীক কল্পনার বিকৃত প্রভাবে দেবতার এই দুর্দ্দশা। ক্রমে ইনি বিকটাকৃতি ভূতপ্রেতের অধিনায়িকা। ডাকিনীগণের উপাসিতা। তারপর অতি ভয়ঙ্করী উৎকট মূর্ত্তিমতী হইলেন। তিনটী দেহ। তিনটী মাথা। একটী অশ্বের। একটী কুকুরের। একটী সিংহের। আবার তারি মধ্যে কখনো কখনো চাঁদেরও রাণী। বসন্তবনেরও দেবতা। কল্পনার উৎকট উন্মাদ। প্রকৃতি-দেবতা প্যানের বিবরণ আলোচনা করিলেও এই প্রকার অজ্ঞানাত্মিকা কল্পনার শোচনীয় অবরোহন দৃষ্ট হইবে। আর একটী উদাহরণ দেই।

অন্যান্য সকল দেবতা হইতে গ্রীকদের জাতীয় জীবনের উপর এপলো দেবের প্রভাবই সবচেয়ে প্রবল ছিল। এপলো সর্ব্বত্র পূজিত হইতেন। সকলেই এপলোকে মানিত। এপলোকে ভয় করিত। কিন্তু এই এপলো কি বস্তু, কোন তত্ত্ব, কোন দিব্যশক্তির প্রকাশ, গ্রীকদের সে সম্বন্ধে কোনই ধারণা ছিল না। (১) এপলো সকলের ভীতির আস্পদ ছিল। যাহারা তাঁহার অসম্মান করিত, কিংবা কোনো অমার্জ্জনীয় পাপাচরণ করিত, দেবতা তাহাদিগকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দিতেন। এপলো ধনুর্ব্বাণধারী দেবতা। কোনো স্থানে মহামারী উপস্থিত হইলে বুঝিতে হইবে সেখানে

* এ বিবরটি লইয়া গবেষণা করিলে দুর্গাপূজার প্রারম্ভের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার হইতে পারে।

এপলোর ভীষণ বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আকস্মিক মৃত্যু যত সমস্ত এপলো বা আর্টিমিসের শারাঘাতে সংঘটিত হয়। (২) এপোলোর মানত করিলে, তাঁহাকে পূজা দিয়া তাহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি অতি ভয়ানক ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষা করেন। এ পর্য্যন্ত বোঝা গেল। এপলো আবার (৩) উপাসকগণকে ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতেন। ইনি ভবিষ্যৎ প্রকাশের দেবতা। এবং ভবিষ্যদ্ বিজ্ঞানের শক্তিও ইনিই মানুষকে দান করেন। গ্রীকরা ডেল্‌ফীতে এপলোর আদেশ বা বাণী শুনিতে যাইত। (৪) এপলো সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীতের দেবতা। দেবতারা তাঁহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হন। বীণা-বেণু প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র এপলোর উদ্ভাবনা। (৫) এপলো গো-মহিষাদি রক্ষা করেন। (৬) নগর-দুর্গাদি নির্ম্মাণ এবং রাজ্য স্থাপনাদি ব্যাপার এপলোর সহায়তায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। তিনি রাজনীতির দেবতা। (৭) এপলো সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। স্বয়ং সূর্য্যদেব। মহামারী প্রেরণ করেন। বিপৎকালে রক্ষা করেন। রাজ্যস্থাপন করেন। সূর্য্য হইয়া কিরণ দেন। এই সমস্ত শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? গ্রীকদের দেব-তত্ত্ব-জ্ঞানহীনতার প্রমাণ। পুরাণে এই প্রকার বিশৃঙ্খল কল্পনার স্থান নাই।

গ্রীক মিথলজিতে দেবদেবীগণের জন্মবিবরণে অযথা অনেক অস্বাভাবিক উৎকট কল্পনার উদ্ভট কাণ্ডের অবতারণা করা হইয়াছে। এথিনা দেবী যখন মাতৃ-গর্ভে তখন পিতা জিউস মাতা মেটিসকে ইউরেনাসের আদেশে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। তারপর এথিনা জিউসের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া বর্ম্মাবৃতসর্ব্বশরীর হইয়া নির্গত হইলেন। মুখে তার ভয়ঙ্কর রণনিনাদ, ইত্যাদি। অথচ এই এথিনা গ্রীকদের সত্যদিব্য-সত্বানুভূতির উজ্জ্বলতম প্রমাণ। এথিনা যে সুমহতী শক্তির প্রকাশমূর্ত্তি তাহা অলীক কল্পনায় রঞ্জিত হয় নাই। গীয়া, রীয়া, ডিমেটের, হিকেটী প্রভৃতিতে ঐশী শক্তি বুঝিবার এবং প্রকাশ করিবার প্রয়াস হইয়াছে। এথিনায় সেই প্রয়াস সার্থক হইয়াছে। আদ্যা-শক্তির জ্যোতিশ্ছটা দূর হইতে দেখিয়া দেখিয়া অবশেষে গ্রীকরা এথিনাতে তাহা অন্তরিন্দ্রিয়ের অতি নিকটে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাইয়াছিল। এথিনা প্রকৃতপক্ষে দুর্গা ভগবতী। পূর্ণরূপে নহে। আংশিক ভাবে। লক্ষ্মী-সরস্বতী-ভাব-সমন্বিতা। ইনি অরাতিকুলনাশিনী রণরঙ্গিনী দুর্গা। সমর-প্রিয়া। আবার জ্ঞান-বিদ্যা-শিল্প-কলাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী। আবার রাজ্যরক্ষাকর্ত্রী রাজলক্ষ্মী। তেজোময়ী প্রতিভাময়ী। বর্ম্মচর্ম্ম-ধারিণী। কিন্তু তবু ভারতীয় আর্য্য-সাধনা যে মহামহীয়সী আদ্যাশক্তির প্রকাশ লাভ করিয়াছিল—বিশ্বব্যাপিনী বৈষ্ণবীশক্তির প্রত্যক্ষ দর্শন পাইয়াছিল—এথিনা তাহার শতাংশের একাংশেরও তুল্য নহে।

এথিনাতে জ্ঞান ও শক্তির প্রকাশ। আফ্রোডিটেতে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ। দেব-দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে গ্রীকরা অকারণে ব্যস্ত হইয়া জ্ঞানদৃষ্টির শোচনীয় অনিশ্চয়তার প্রমাণ দিয়াছে। আফ্রোডিটে জিউস ও ডিওনীর কন্যা। আবার ক্রোনস ও ইউনিমির কন্যা। আবার কারো কারো মতে ইউরেনাস ও হিমেরার দুহিতা। অনেকের মতে আফ্রোডিটে সিন্ধু-সম্ভবা। ফেনমণ্ডিত সিন্ধুতরঙ্গ হইতে পদ্মালয়া লক্ষ্মীর মত প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছিলেন। অতি মনোহর কল্পনা। কিন্তু এই রূপময়ী প্রেমময়ী দেবীর যে চরিত্রবর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা অতিশয় অপ্রীতিকর। আফ্রোডিটের চরিত্র দেখিয়া মনে হয় প্রাচীন গ্রীকরা প্রেম বলিতে ভোগবাসনাময়ী চিত্তবৃত্তি ব্যতীত আর বেশী কিছু বুঝিত না। আফ্রোডিটে হেফীষ্টাসের পত্নী। রণদেবতা এরিসের প্রতি আসক্তা এবং তাহার সঙ্গে বাস করেন। কিছুদিন ডিওনিসাসের প্রতি খুব অনুরাগ দেখাইলেন।

তারপর হারমিসের প্রতি যৎপরোনাস্তি পক্ষপাতিত্ব করিলেন। অনন্তর জলাধিপতির প্রেমে মজিলেন। আবার এদিকে মাঝে মাঝে রূপবান মানব যুবকগণের জন্য ব্যাকুলতার অন্ত নাই। এডোনিসের জন্য তো প্রেম-ময়ী ঠাকুরাণীটীর প্রাণ যায় যায়। এদের মধ্যে কাহারো কাহারো সন্তানের ধারণ করিলেন। ইনি প্রেমাধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই সব কল্পনার সঙ্গে পৌরাণিক দেবদেবীর তুলনা করিতে যাওয়া একেবারে অসঙ্গত। সিন্ধুতরঙ্গ হইতে আফ্রোডিটের আবির্ভাব যে দৃষ্টি দেখিয়াছিল তাহা শুদ্ধসাত্বিক দৃষ্টি। সেই দেবীকে এই প্রকার স্বেচ্ছাচারিণী ব্যভিচারিণী রূপে যে দৃষ্টি দেখিয়াছিল তাহা সাধারণ রাজসিক তামসিক দৃষ্টি। প্রাকৃত দৃষ্টি। আফ্রোডিটে মিথ্যা কল্পনা নহে। কিন্তু প্রাকৃত জন-গণের কলুষিত জীবনে প্রতিবিম্বিত হইয়া মিথ্যা হইয়া গিয়াছিল।

মানবের যে মানসিক প্রেমের উপর মিথলজির গতি বিধি, পুরাণ তাহার অনেক উপরকার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। মিথলজির কোনো দার্শনিক ভগবদ্ভিত্তি নাই। এই সমস্ত কাহিনী কোন বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের উপর স্থাপিত নহে। পরস্পর সংঘর্ষশীল শক্তিসমষ্টি। পুরাণের দেবদেবীগণ পরস্পর অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধযুক্ত। সর্ব্বত্র সামঞ্জস্যবান্। কোথাও বিরোধের লেশমাত্র নাই। দেবাসুরের ভেদস্বীকার না করিলে সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝা যায় না। পুরাণে দেব ও অসুরের পৃথক পৃথক সমাজ। পৃথক পৃথক স্থান। মিথলজিতে দেবাসুরের কোনো ভেদ কল্পিত হয় না। টাইটানদিগের সহিত বিশ্বের আধিপত্য লইয়া জিউস প্রমুখ দেবগণের যে প্রকাণ্ড সংগ্রাম হইল তাহাতে টাইটানরা অসুরস্থানীয়। অসুররা পরাজিত হইয়া অনন্ত রসাতলে নিক্ষিপ্ত হইল। অথচ দেবতারা সকলেই টাইটানগণের সন্তান। ইহার তাৎপর্য্য কোথায়? পুরাণের সৃষ্টিব্যাপার-বর্ণনা সর্ব্বত্র বৈজ্ঞানিক বিধানানুগামী। নির্গুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্ম। ঈশ্বর। মায়া। প্রকৃতি। গুণাবতার। বিষ্ণু। ব্রহ্মা। রুদ্র। প্রজাপতি-গণ। দেবতাগণ। অসুরগণ। চতুর্দ্দশ ভুবন। দৈবসৃষ্টি। প্রাকৃতসৃষ্টি।—কোথাও বিশৃঙ্খলা নাই। কোথাও অস্পষ্টতা নাই। অনিশ্চয়তা নাই। বৈজ্ঞানিক ইভলিউশন। পুনরায় সমস্ত সৃষ্টি ব্রহ্মে-লীন হইয়া যায়। প্রলয় হয়।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃসর্ব্বা প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত-সংজ্ঞকে। গীতা। ৮।১৮

মিথলজি সর্ব্বত্রই দার্শনিক ভিত্তিবিহীন। বিভিন্ন বিশৃঙ্খল আখ্যান-সমষ্টি। পুরাণ দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানালোকিত পরমার্থ সাধন বিষয়ক এক একখানি অধ্যাত্মজ্ঞান-বিজ্ঞান-মণ্ডল- এক একটী সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সীষ্টেম। সমস্ত সুবিশাল পুরাণগ্রন্থের পশ্চাতে রহিয়াছে একটী সুমহান দর্শন। একটী সুগভীর বিজ্ঞান। একটী সমুজ্জল ভাগবতধর্ম্মসাধনা। মিথলজি কোথাও পার্থিব সুখ-দুঃখের কামনা বাসনা যুক্ত প্রাকৃত মনুষ্য জীবনের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় না। মিথলজিতে কোনো প্রকার আধ্যাত্মিক সাধনার বিজ্ঞান বা আদর্শ নাই। মুক্তি বা অনন্ত অমৃতরাজ্যে প্রবেশাদি বিষয়ক কোনো ধারনা নাই। পরমার্থ জ্ঞানের সাধনা নাই। নিষ্কাম কর্ম্মের কোনো কল্পনা নাই। ভক্তি প্রেমাদির কোনো আদর্শ নাই। এ সব তো দূরের কথা।

উচ্চাঙ্গের নীতিধর্ম্মেরই কোনো বোধ মিথলজির কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। গ্রীক-দেবতারা মরণশীল নহে। সাংসারিক জীবনের অবস্থা সমূহের অধীন নহে। এইমাত্র। অন্যথা প্রাকৃত মানুষের মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন। তাহাদের জীবনে উচ্চ ভাবরসের কোনো স্থান নাই। মনুষ্য জীবনের সহিত পশুজীবনের যে পার্থক্য, পৌরাণিক দেবগণের জীবনের সহিত সাধারণ মনুষ্য-জীবনের তার চেয়ে অনেক বেশী পার্থক্য। কদাচিৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে উজ্জ্বল আদর্শ নিচয়ের উপর কোনো ছায়াপাত হয় না। পুরাণানুসারে এই মনুষ্যলোকের উপর উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর ছয়টী স্বর্গলোক আছে। তাহার উপরে ভগবদ্ধাম সমূহ। ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দেব-জাতি আছে। নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর। উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর। মহান্ হইতে মহত্তর। পৌরাণিক দেবজীবনের পাশে গ্রীকদের দেবতাখ্যান কত ক্ষুদ্র—কত তুচ্ছ। এই দেবতাদের জীবন হয় প্রাকৃত। না হয় উৎকট। অস্বাভাবিক। হয় তাহারা সাধারণ হিংসাদ্বেষ আদি বিকারবান্ মানুষ। না হয় প্রাকৃতিক রূপক মাত্র। মিথলজিতে যে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা আছে তাহা কখনো কখনো প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। অসম্ভব। অধ্যাত্ম-ভাবেও তাহার ব্যাখ্যা চলে না। অন্যথা প্রাকৃত উদ্দেশ্য-পরিচালিত। প্রতিহিংসা রূপমোহ, স্বার্থসিদ্ধি, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধন মূলক ঘটনা অতি বিরল।

মানুষ সাধারণতঃ দৃশ্যমান বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য দিয়াই অপ্রাকৃত দেবদেবীর প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। অন্তঃপ্রকৃতিগত ভক্তিজ্ঞানাদি পথে উচ্চতর দেব-শক্তির প্রকাশমূর্ত্তি বাহিরে প্রকটিত হয়। মিথলজি পাঠে মনে হয় জন-গণ দেবদেবীর প্রকাশের আভাসমাত্র দেখিয়া উল্লসিত হইয়া কল্পনার অসংযত ক্রীড়াসহযোগে নানা বিচিত্র ব্যাপার রচনা করিতেছে। ধ্যান ধারণা নাই। তন্ময়তা নাই। দেবতা যে দিব্য মানস-লোকে বাস করে, যোগপথে সেই লোকে প্রবেশ করিবার কোনো চেষ্টা নাই। প্রাকৃত-মনোভূমি হইতে দেবতার যে লীলা দেখা যায় তাহা তরঙ্গ-চঞ্চল সরোবর-বক্ষে প্রতিফলিত চন্দ্রদর্শনের মত। মিথলজির দেবদেবী অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবিক দিব্য-সত্ত্বার ছিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব। কল্পনার গাঁথিয়া গাঁথিয়া পূর্ণাবয়ব করিবার চেষ্টা হইয়াছে। পুরাণে ঋষিগণ নির্ম্মল যোগদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া, বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক হৃদয়ে অনুভব করিয়া, পরাচৈতন্যের উচ্চভূমিতে দাঁড়াইয়া, ভাগবতী বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া, দেবদেবীর আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রীকমিথলজির যতই দোষ থাকুক, তবু সকল মিথলজি হইতে গ্রীক মিথলজিই শ্রেষ্ঠ। ভারতের বাহিরে গ্রীসেই অতীন্দ্রিয় লোকের প্রকাশ সব চেয়ে বেশী হইয়াছে। রোমান মিথলজি ইহার তুলনায় নিম্ন স্তরের ব্যাপার। রোমান দেবদেবীগণ অনেক ক্ষেত্রে গ্রীক দেবদেবীর আদর্শে পরিবর্ত্তিত ও উন্নীত। রোমান মিনার্ভা পরিবর্ত্তী কালে গ্রীক এথিনায় পরিণত হইয়াছিল। জুপিটার ও জিউস একই দেবতা। দেবকুলাধিপতি। জুনো ও হিরার চরিত্র, ক্রিয়াকলাপ ও উপাসনাদিতে কিছু কিছু প্রভেদ থাকিলেও উভয়ে একই দেবতা। দেবেন্দ্রানী রোমান ভিনাস পরে গ্রীক আফ্রোডিটের সহিত অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। রোমান ভালকান্ ধীরে ধীরে গ্রীক হেফীষ্টাসের স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। রোমান মার্কারী গ্রীক হার্মিস্ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়াও পরে এক হইয়া গিয়াছিল। রোমান ডায়েনা গ্রীক আর্টিমিসের সহিত মিলিয়া গিয়াছিল। রোমান লুনা আর গ্রীক সিলেনী একই দেবতা। রোমান অপ্‌সের স্থানে

পরে জননী রীয়ার পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রোমান স্যাটানি আর গ্রীক ক্রোনস এক নয়। তবু রোমানেরা স্যাটানির উপর ক্রোনসের ব্যাপার আরোপ করিত। স্যাটানিকেই দেব-গণের জনক রূপে পূজা করিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্যাটানিদেবের সহিত ডেমেটের দেবীর সাদৃশ্য খুব বেশী। রোমান নেপচুন আর গ্রীক পসীডন অনুরূপ দেবতা। জলাধিপতি। গ্রীক আর রোমান মিথলজির পরে মিশরীয় ও স্কন্দনেভীয় মিথলজি ইয়রোপে পরিচিত। প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে গ্রীকধর্ম্মের পতন হইয়াছে। খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে গ্রীক ও রোমানদের দেবীগণকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়া তাহাদিগের আসনে খ্রীষ্টীয় ঈশ্বর-তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। রোমকদিগের অতি ভয়ানক নৈতিক অধঃপতন হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচলিত হইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিল। গ্রীক-রোমক ধর্ম্ম অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। তবু খ্রীষ্টধর্ম্মের কাছে তাহার পরাজয় হইল। দুইটী প্রধান কারণ। প্রথম তাহাদের দুর্নীতি-পরায়ণতা। ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা। তজ্জনিত আধ্যাত্মিক শক্তিহীনতা। দ্বিতীয় তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থাৎ মিথলজির ভগবৎকেন্দ্রহীনতা। তাহাদের দেবদেবী মিথ্যা ছিল বলিয়া তাহাদের ধর্ম্মের পতন হইয়াছে—একথা মিথ্যা। তাহাদের দেবদেবীগণ সত্য হইলেও এক অদ্বিতীয় অখণ্ড ঐশ্বর তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলিয়া তাহারা খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদের দুর্দ্দমনীয় আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মিলাইয়া গেল।

য়ীহুদীধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম প্রভৃতি সেমিটিক ধর্ম্ম ভারতবর্ষের বাহিরে দ্বিতীয় ঈশ্বর বাদের অবতারণা করিয়া বিশ্বময় যে প্রকাণ্ড ঐশ্বর প্রকাশ গ্রীকরা আবিষ্কার করিয়াছিল তাহা লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। সেমিটিক ধর্ম্মসমূহ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য দিয়া ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ প্রকাশ বুঝিতে পারে না। গ্রীকদের কোনো অদ্বিতীয় ঈশ্বর তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ছিল না। কিন্তু সর্ব্বত্র তাহারা ঈশ্বরের 'বাস্তবিক' প্রকাশ দর্শন করিত। দেবদেবীগণ ঈশ্বরেরই বিভিন্ন অপ্রাকৃত গুণাত্মিকা শক্তির বিকাশমূর্ত্তি। সেমিটিক ধর্ম্মসমূহে ঐশ্বর শক্তির দিব্যমূর্ত্ত প্রত্যক্ষ প্রকাশ নাই। অনন্ত অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব। তাহার সগুণ নির্গুণ ভাব। আর অগণিত দেবদেবীরূপে তাহার বিশাল বিচিত্র প্রকাশ—ইহা এক হিন্দু ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনো জাতি বুঝিতে পারে নাই। ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব আর্য্য ঋষিগণ যেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন তেমন করিয়া পৃথিবীতে কখনো কোনো জাতি করিতে পারে নাই। আবার এই এক ঈশ্বরের অনন্তরূপে প্রকাশ কেমন করিয়া সম্ভব হয় সেই গহন গভীর রহস্য হিন্দু ব্যতীত পৃথিবীতে আর কেহই জানে না। ঈশ্বর অদ্বিতীয় হইয়াও অনন্তরূপে কেমন করিয়া প্রকাশিত হন পুরাণ তাহারি অপূর্ব্ব ইতিহাস।

— ——

কবীরের দোঁহা

অষ্টবিকার—কাম

যহ জগ কোঠী কাঠকী, চহুঁ দিসি লাগী আগ।
ভীতর রহে যো জারি মুত্র, সাধ্ উবরে ভাগ ॥ ১ ॥

চারি দিকে আগুন লাগা কাঠের বাড়ী ধরাখান।
যে করে বাস মরে পুড়ে', পালিয়ে সাধু রাখে প্রাণ ॥ ১ ॥

ক্রোধ অগিন ঘর ঘর বঢ়ী, জরৈ সকল সংসার।
দীন লীন নিজ ভক্ত জো, তিন কে নিকট উবার ॥ ২ ॥

ঘরে ঘরে ক্রোধের অনল, বেড়ে ধরা করে ছার।
ধর্ম্ম রত ভক্ত যে জন, পারের দেরি নাহি তার ॥ ২ ॥

কোটি করম লাগে রহেঁ, এক ক্রোধ কী লার।
কিয়া করায়া সব গয়া, জব আয়া হঙ্কার ॥ ৩ ॥

কোটী করম শৃঙ্খলিত, রাখে শুধু ক্রোধের ধার।
ক্রিয়া কর্ম্ম সকল গেল, যেমনি এল অহঙ্কার ॥ ৩ ॥

জক্ত মাছিঁ ধোখা ঘন, অহং ক্রোধ উ কাল।
পার পহুঁচা মারিয়ে, ঐসা জম কা জাল ॥ ৪ ॥

নিয়তি ক্রোধ আর অহঙ্কার, জগত মাঝে বিষম ছল।
পেরি'য়ে গিয়ে তবু ডুবে, এমন যমের ভীষণ কল ॥ ৪ ॥

দসো দিসা সে ক্রোধকী, উঠী অপর বল আগি।
সীতল সঙ্গতি সাধকী, তহাঁ উপরিয়ে ভাগি ॥ ৫ ॥

ক্রোধের অনল দীপ্ত শিখা, উঠছে ছেয়ে সকল ধার।
শীতল সাধু জনের সমাজ, পলাও সেথা হবে পার ॥ ৫ ॥

গারি অঙ্গারা ক্রোধ ঝল নিন্দা ধূঁয়া হোয়।
ইন তীনো কো পরিহরৈ, সাধ কহাবৈ সোয় ॥ ৬ ॥

নিন্দা ধূম্র গালি আঙার, ক্রোধ যেন ঠিক অনল জ্বালা।
সাধু বলি তায় যেজন পারে, এ তিনটিরে করতে হেলা ॥ ৬ ॥

কুবুধি কমাণী চঢ়ি রহী, কুটিল বচন কা তীর।
ভারি ভরি মারৈ কান মেঁ, সালৈ সকল শরীর ॥ ৭ ॥

কুটীল বচন শর যোজিত, কুমতিরূপ শরাসনে।
দীর্ণ করে সকল শরীর, যখন তারা পশে কানে ॥ ৭ ॥ (ক্রমশঃ)

সমাজের বাস্তব চিত্র এবং তাহা হইতে শিক্ষা

ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার, সিভিল সার্জ্জন, নোয়াখালী

আজকাল সমাজের উন্নতির দিকে অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং অনেকে এ বিষয় লইয়া চিন্তা করিতেছেন। সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে ইহার বাস্তবিক অবস্থা জানিবার চেষ্টা করা উচিত। এবং সমাজ হইতে বাস্তব ঘটনা সংগ্রহ করিয়া তাহা লইয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আজকাল দেশবাসীরা রাজনীতি, উপন্যাস ও গল্প লইয়া ব্যস্ত; কিন্তু বাস্তব ঘটনার মধ্যে এমন সমস্ত চিত্র রহিয়াছে যাহা গল্প উপন্যাস অপেক্ষা অল্প চিত্তাকর্ষক নহে। শুধু গল্প উপন্যাস দিয়া চিত্ত-বিনোদনের চেষ্টা না করিয়া—যদি জীবনের বাস্তব ঘটনার দিকে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া রাখি, তাহা হইলে অনেক দেখিবার জানিবার ও ভাবিবার বিষয় চোখে পড়ে। দুঃখের বিষয় অনেকে এতটুকু কষ্ট স্বীকার করিয়া সাহিত্যের এই দিকটা আলোচনা করিতে নারাজ। হিন্দু জাতির বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতীর বাস্তবের দিকে দৃষ্টি বড়ই কম। ইহা একটি জাতিগত দোষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। হিন্দু আমলের ভারতবর্ষের বিশেষ কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাহার পরিবর্ত্তে বড় বড় মহাকাব্য (যথা রামায়ণ, মহাভারত) রচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইতিহাসের ন্যায় মহামূল্য সম্পত্তি (গ্রীক্ ও রোম জাতির মত) এদেশে পাওয়া যায় না, ইহা বাস্তবিক দুঃখের বিষয়।

হিন্দুদের সামাজিক আচার ব্যবহার, জাতিভেদ, বিবাহ-বন্ধন প্রভৃতি প্রথায় একটি বিশেষ রকম জটিলতা রহিয়াছে। এই জটিল সমাজের পরিবর্ত্তন অথবা সংস্কার সাধন করিতে হইলে, এই জটিলতা বিশ্লেষণ করিয়া ইহার ভিতর কিরূপ ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে, কোথায় ইহার গলদ এবং কোনখানে সামাজিক নিয়ম কানুনের ধারা যথার্থ জীবনশক্তিকে একটা সচ্ছন্দ গতি দিতেছে, আবার কোনখানে এই আইন কানুন জীবনশক্তির ধারার মধ্যে একটা অযথা বাধা উৎপন্ন করিয়া ইহাকে পঙ্গু করিতেছে, কোথায় ইহার প্রাণশক্তি এই সমুদয় বিষয় ভালভাবে বুঝিয়া জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন। এই পর্য্যবেক্ষণের ফলে জ্ঞান লাভ হইলে তখনই আমরা সামাজিক বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন বিষয়ে সমর্থ ও উপযুক্ত হইতে পারি।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "নারীর মূল্য" বলিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপন্যাসগুলি কোন আধুনিক বাঙ্গালী পড়েন নাই—এ দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু তাঁহার এই "নারীর মূল্য" পুস্তকের বিষয় খুব কম শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকই অবগত আছেন। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে "Social Psychology" সম্বন্ধে বোধ হয় এইখানি প্রথম পুস্তক। বাস্তবতা সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ অবস্থা!

বাস্তবিক ঘটনা সূত্র ধরিয়া যেরূপ সত্যে উপনীত হইতে পারা যায় আমাদের সাধারণ-বুদ্ধি-সংস্কার অথবা ধর্ম্ম-বুদ্ধি-সংস্কারের দ্বারা অনেক স্থলে আমরা সেরূপ সত্য জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। তাহার একটি দৃষ্টান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উপরোক্ত পুস্তকে দিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে। "এখনকার দিনের একটা দৃষ্টান্ত দিই। এক

সময়ে এদেশে যখন বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে বিপক্ষে ঘোরতর আন্দোলন উঠিয়াছিল, সে সময় যাহারা বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে, তাহারা নানাবিধ সুযুক্তি, কুযুক্তির মধ্যে এই একটা অভিনব যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন যে অল্প বয়স্কা বিধবাদের পুনর্বিবাহ না হওয়াতেই বঙ্গদেশে কুলত্যাগিনীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং বিধবা-বিবাহের অনুকূলে ইহাও একটি হেতু হওয়া উচিত। মোটের উপরে বিধবা বিবাহ উচিত কিম্বা উচিত নয়, এ লইয়া উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই চলিতে লাগিল, কিন্তু পুনর্বিবাহ না হওয়ার দরুণই যে বিধবারা কুলত্যাগ করে এ কথাটা বিধবা-বিবাহের শত্রুপক্ষীয়েরাও অস্বীকার করিল না। অর্থাৎ পুরুষ মাত্রেই মানিয়া লইল যে, হাঁ কথা বটে। কুলত্যাগিনীর সংখ্যা যখন বাড়িয়া চলিতেছে তখন, বিধবা ভিন্ন কে আর কুলত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে।"

"কিন্তু কথাটা কি সত্য ?"

পুরুষ নির্বিচারে মানিয়া লইয়াছে কিন্তু যাচাই করিয়া দেখিয়াছে কি, বিধবা বাহিরে আসিবার জন্য নিশিদিন উদ্যত হইয়া থাকে কিনা ? কথাটা প্রচার করিবার সময়, বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া লইবার সময়, একবারও সে মনে করিয়াছে কি, কি গভীর কলঙ্কের ছাপা সে নারীত্বের উপর বিনা দোষে ঢালিয়া দিতেছি।"

"এতবড় পাশবিকতাই কি নারীর স্বাভাবিক চিত্র ?" পুরুষ তাহার গায়ের জোর লইয়া বলিবে 'হাঁ'। নারী তাহার সঙ্কীর্ণ অভিমান লইয়া বলিবে, 'না'। বাস্তবিক যাচাই না করিয়া শুদ্ধ একটা কাল্পনিক উত্তর দিবার চেষ্টা করিলে, তর্কই চলিতে থাকিবে। কিন্তু যাচাই করিয়া দেখিলে কি জবাব পাওয়া যায় তাহাই দেখাইতেছি। বার তের বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ভদ্রলোক এই বাঙ্গালা দেশে কুলত্যাগিনী বঙ্গ-রমণীর ইতিহাস সংগ্রহ করিতে ছিলেন। তাহাতে বিভিন্ন জেলার বহু সহস্র হতভাগিনীর নাম, ধাম, বয়স, জাতি, পরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ লিপিবদ্ধ ছিল। বইখানি গৃহদাহে ভস্মীভূত হইয়াছে, বোধ করি, ভালই হইয়াছে ; সুতরাং কেহই সঠিক প্রমাণ চাহিলে দিতে পারিব না সত্য, কিন্তু আগাগোড়া কাহিনীই আমার মনে আছে। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম যে এই হতভাগিনীদের শতকরা ৭০ জন সধবা। বাকী ৩০টী মাত্র বিধবা। ইহাদের প্রায় সকলেরই হেতু লেখা ছিল, অত্যধিক দারিদ্র্য ও স্বামী প্রভৃতির অসহনীয় অত্যাচার উৎপীড়ন ; সধবাগুলির প্রায় সব নীচ জাতীয়া। নীচ জাতীয়া সধবারা এই বলিয়া জবাবদিহি করিয়াছিল যে তাহারা খাইতে পাইত না। দিনে উপবাস করিত, রাত্রে স্বামীর মারধোর খাইত। সংকুলের বিধবারাও কৈফিয়ৎ দিয়াছিল কেহ বা ভাই ও ভ্রাতৃজায়ার, কেহ বা শ্বশুর ভাসুরের অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া এই কাজ করিয়াছে। ইহাদের সকল কথাই যে সত্য তাহা নহে। তথাপি সমস্ত ব্যাপারটা একটু মনোযোগের সহিত দেখিলেই চোখে পড়ে এমনিই বটে।"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই সব কথায় বুঝা যায় যে বাস্তবিক ঘটনার আলোচনা সামাজিক সমস্যা বুঝিবার পক্ষে কতদূর প্রয়োজন। সকলেরই বোধ হয় জীবনের কোন না কোন সময়ে এইরূপ ঘটনা পর্য্যবেক্ষণের মধ্যে আসিয়া পড়ে যাহা দেখিয়া তাহাদের মনে হয় যে প্রচলিত বর্ত্তমান বিধি বিধান ঠিক সময়ের সঙ্গে খাপ খাইতেছে না। হয় ত কিছু পরিবর্ত্তন করিলে ভাল

হয়, তাহারা যদি তাহাদের স্বাধীন চিন্তা এইরূপ ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, হয় ত তাহাদেয় সমবেত চেষ্টার ফলে সমাজের পক্ষে কিছু উপকার হইতে পারে। লেখকের জীবনে অনেক ঘটনা দেখা গিয়াছে যাহা লইয়া সামাজিক নিয়ম কানুন বিষয়ে গবেষণা করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

এই ঘটনাটি অনেক দিন পূর্ব্বের। এতদিন পরে এই ঘটনা প্রকাশ করিলে ঘটনার লোকদিগের মধ্যে কাহারও মনে ব্যথা পাইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া এই ঘটনা প্রকাশ করিতেছি। এই ঘটনার মধ্যে যে কিছু সামান্য কথাবার্ত্তা আছে সেগুলি লেখক কর্ত্তৃক চরিত্র অঙ্কনের চেষ্টায় কোনরূপ কাল্পনিক কথাবার্ত্তার সৃষ্টি করা হয় নাই। যেরূপ সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে তাহারই আভাস দেওয়া গেল।

কোনও ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জেলায় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত একজন বিধবা ও তাহার বালিকা কন্যা জীবিত ছিল। এই বিধবার কিছু জমিজমা ছিল। তাহারই আয়ে পল্লীগ্রামে তাহাদের সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। তাহার কন্যার বয়স যখন আট নয় বৎসর, তখনই তিনি গৌরীদানের ফললাভ করিবার আশায় এক তরুণ যুবকের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হন। জামাতার বয়স বিবাহের সময় ১৬।১৭ বৎসরের অধিক ছিল না। কিন্তু সে অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট ছিল বলিয়া এই অল্প বয়সেই আবগারি বিভাগের একটি সামান্য চাকুরী পাইয়াছিল। এই চাকুরীতে মাহিয়ানা ভিন্ন উপরী আয়ও আশাতীত ছিল। যুবকটি এই বিভাগের সম্পর্কে থাকিয়া মদ খাওয়ায় অভ্যস্ত হইয়া গেল এবং শীঘ্রই তজ্জন্য রুগ্ন হইয়া যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইল। তাহার পর মাস ছয়েকের মধ্যেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। উপরন্তু জামাতার চিকিৎসা উপলক্ষ্যে বিধবার জমি জমাও প্রায় সব বিক্রয় হইয়া গেল। বিধবা অতিকষ্টে তাহার অল্প বয়স্কা কন্যাকে লইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

৫।৬ বৎসর পরে বালিকা যৌবনে পদার্পণ করিল। বালিকা সুন্দরী ছিল; যৌবন সমাগমে সেই শ্রী শতগুণ বর্দ্ধিত হইল।

সেই সময় সেই জেলায় জনৈক মুসলমান পুলিশ বিভাগের বড় পদ পাইয়া আসিলেন। তাহার দৃষ্টি সেই সুন্দরী হিন্দু বিধবা কন্যার উপরে পতিত হইল। আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া এই ব্যক্তি কন্যার মাতার নিকট প্রস্তাব পাঠাইলেন—যদি তাঁহার কন্যাটি দান করেন তাহা হইলে তাহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তিনি বিবাহ করিবেন। কন্যার মাতা এই প্রস্তাবে ভাবান্বিত হইলেন।

ইতিমধ্যে ঐ বিধবার জমিদার কোনও হাঙ্গামায় পতিত হওয়ায় ঐ পুলিশ কর্ম্মচারীর বশীভূত হইয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি জমিদারকে দিয়া পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব কন্যার বিধবা মাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। জমিদার বিধবা ব্রাহ্মণীকে বুঝাইয়া ঐ বিবাহে সম্মতি দান করাইলেন। সেই যুবতী কন্যার মনের ভাবে বুঝা গেল যে এ বিবাহে তাহার অমত নাই। সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে পুলিশ কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণ কন্যাকে তাহার নিজের লোক দিয়া এক মুসলমান বন্ধুর বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন।

তাহার বন্ধু কলিকাতায় কোনও সরকারী চাকুরী করিতেন। যুদ্ধের সময় সরকারী বিভাগে

লোকের প্রয়োজন হইলে তিনি এইখানে বদ্‌লি হইলেন। তাহার স্বভাব কোমল এবং মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে অনুরাগ ছিল। বোধ হয় এইজন্য তাহাকে টাকাকড়ি সংক্রান্ত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে বদ্‌লি করা হয়। তিনি এই নূতন চাকুরী পাইয়া তাহার সহযোগীগণের দলের মোহে পড়িয়া গেলেন। উপরি পয়সা গ্রহণের খুব সুবিধা ও প্রচলন ছিল। এই উপরি আয় সকল কর্ম্মচারী ভাগ করিয়া লইত। তাহার অংশেও মাহিয়ানা ব্যতীত প্রতিমাসে মোটা টাকা পড়িত। তিনি প্রথমে ভীত এবং উৎকোচ গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য সকলের প্ররোচনায় তাহাদের দলে আসিলেন। ইহার ফলে তাহার সুরাপানে অভ্যাস জন্মিল এবং তাহার গানের সখ থাকায় তাহার বাড়ীতে বড় বড় গায়িকা নর্ত্তকী নিত্য আনাগোনা করিতে লাগিল। সুতরাং মাসে মাসে উপরি আয় যথেষ্ট হইলেও তাহার দেনা হইতে লাগিল। তাহার স্ত্রী পতিপ্রাণা সাধ্বী ছিলেন বটে, কিন্তু চোখে দেখিয়াও কোনও উপায় করিতে পারিলেন না।

অবস্থা যখন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে তখন সেই বিধবা হিন্দু কন্যাটি এই বাটীতে উপস্থিত হইল। ইহাকে দেখিয়া ভদ্রলোকটি এই ভাবিয়া বিব্রত হইলেন যে কোথা হইতে তাহার পুলিশ বন্ধু এই কন্যাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। এখন তাহার ভার লইতে গিয়া তিনি বিপদগ্রস্থ না হয়েন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন সেইরূপ হাঙ্গামা হইবার কোনও আশঙ্কা নাই, মুসলমানী আচার ব্যবহারে দীক্ষিত হইলেই পুলিশবন্ধু এই যুবতীকে বিবাহ করিবেন, তখন তিনি দ্বিধা করিলেন না। এই হিন্দুবিধবা কন্যাকে মুসলমান ভদ্রলোকটীর স্ত্রী স্নেহভরে গ্রহণ করিয়া আপনার জনের মত দেখিতে লাগিলেন। তিনি এই যুবতীকে বলিলেন—পুলিশ কর্ম্মচারীটি যে বলিয়াছেন, তিনি অবিবাহিত ইহা সত্য নহে, তাহার স্ত্রী আছে। যদি তিনি তাহাকে সত্যই নিকা করেন, তাহা হইলে তাহার স্ত্রী ধর্ম্ম বজায় থাকে। কারণ মুসলমান ধর্ম্মে একাধিক বিবাহের নিয়ম আছে। কিন্তু তাহাকে নিকা না করিলে সে যেন সতীত্ব বিসর্জ্জন না দেয়। যাহা হউক কিছুদিন পরে সেই পুলিশ কর্ম্মচারীট কলিকাতায় আসিয়া তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেই সময় সেই যুবতীও তাহাকে এইরূপ কথাই বলিলেন। ইতিমধ্যে সেই পুলিশ কর্ম্মচারীর স্ত্রী কোনও সূত্রে সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া সেই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহার স্বামীকে কহিলেন—"নীচু জমিতে বাঁধ না বাঁধিলে বন্যার জল আসিয়া লোককে বিব্রত করে। কিন্তু তাই বলিয়া খাল কাটিয়া বন্যার জল আনিতে দিব না। আপনি ইহাকে বিবাহ করিলে আমি নিশ্চয় একটা কাণ্ড করিয়া বসিব।"

এই সমস্ত কথা শুনিয়া বালিকাটি গোপনে সেই বাড়ী ত্যাগ করিয়া পুনরায় সেই পুলিশ কর্ম্মচারীর বন্ধুর বাড়ীতে চলিয়া আসে। এবং সেইখানেই মনের দুঃখে বাস করিতে থাকে। সেখানে কিছুদিন বসবাস করিবার পর সেই গৃহকর্ত্তার পত্নী স্বামীর ভাব বৈলক্ষণ দেখিয়া স্বামীর নিকট প্রস্তাব করিলেন যে তিনি দেশে যাইয়া পুত্রকন্যা এবং জমিজমার তত্ত্বাবধান করিবেন। তাহার স্বামী এই যুবতীকে বিবাহ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে থাকুন। সেই মুসলমান গৃহকর্ত্তা এই প্রস্তাবে সম্মত হন। এবং যুবতীও তিনদিন ধরিয়া অনবরত ক্রন্দন করিবার পর এই বিবাহে স্বীকৃত হয়। যাহা হউক, বিবাহ হইবার পর সেই যুবতী পত্নীত্বের অধিকার পাইয়া সেখানে বাস করিতে থাকে। কিছুদিন পরে এই ভদ্রলোকটীর ঘুষ গ্রহণের কথা প্রকাশ হইবার পর

২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন,এই সময়টা অসহযোগ আন্দোলনের সময়। এই পদত্যাগের গুজবটা অন্যভাবে উঠিল। সংবাদপত্রে বাহির হইল অসহযোগ অবলম্বন করায় তিনি কার্য্যত্যাগ করিলেন। দেশে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িল। এই সুযোগে তিনি একটী স্বদেশী দোকান খুলিলেন। এবং সেই দোকানের নাম তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর মুসলমানী নামে হইয়াছিল।

একদিন এই ভদ্রলোকটী ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার দুই পত্নীকে শুনাইতেছিলেন। তিনি একটী বয়ৎ পড়িলেন। তাহার মর্ম্মটা এইরূপ—"তুমি মস্‌জিদ্ ধ্বংসের মত পাপ করিলেও ভগবান ক্ষমা করিতে পারেন, কোরান ভস্মীভূত করিলেও সে পাপের ক্ষমা ভগবানের নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু মানুষের মনে কষ্ট দিও না—কারণ মানুষের মনে কষ্ট দিলে ভগবান এ পাপ কখনও ক্ষমা করেন না।" তিনি এই বয়ৎ ব্যাখ্যা করিবার পর তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী কহিল—"তাহা হইলে আপনি একজন ভণ্ড দেখিতেছি।" স্বামী বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"কেন আপনি একথা বলিতেছেন ?"

দ্বিতীয়া পত্নী কহিল—"আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া কি আপনার প্রথমা পত্নীর মনে কষ্ট দেন নাই ?"

স্বামী বলিলেন—"কেন তিনি নিজেই তো এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন, আমি তাঁহার কথা মতই বিবাহ করিয়াছি।"

পত্নী কহিল—"তিনি আপনার মনের ভাব বুঝিয়া ছিলেন বলিয়াই এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি তাঁহার কষ্ট হয় নাই বলিতে চান ?" মুসলমান ভদ্রলোকটী স্ত্রীর এই স্পষ্টবাদিতায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রথমা পত্নীর সম্মুখেই তাহার মুখ চুম্বন করিলেন।

এই ঘটনাটী অনুসন্ধান উপলক্ষ্যে আমি মুসলমান সমাজের দুইএকটী নিয়ম অবগত হই। মুসলমান সমাজে আমাদের সমাজ অপেক্ষা আদবকায়দা প্রচলন অনেক বেশী, আমাদের সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে—"আমি", "তুমি" বলিয়া কথাবার্ত্তা চলে ; কিন্তু মুসলমান সমাজে "আপনি" বলিয়া কথাবার্ত্তা চালাইতে হয়।

যাহা হউক, ধর্ম্মসম্বন্ধে এই ভদ্রলোকটীর ক্রমশঃ অনেকটা উদার ভাব জন্মিয়াছিল। তিনি দ্বিতীয়া পত্নীর সাহচর্য্যে থাকিয়া অনেক হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন এবং সব ধর্ম্মের যে একই উদ্দেশ্য এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার মুখে অনেক সময় "আল্লা ও হরি" যে মূলতঃ এক—এই ধরণের অনেক গান শুনা যাইত।

এই বাস্তব ঘটনাটী গল্পের ছলে বর্ণনা করিয়া বোধ হয় কাল্পনিক গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক করা যায়। কিন্তু এইরূপ গল্পের মত সত্যঘটনার মধ্যে আমাদের শুধু রসগ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিৎ নহে। এই ঘটনাটী বাস্তবিক জগতের কি ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে সে বিষয়টী ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে সমাজ সম্বন্ধে অনেক ভাবিবার বিষয় পাওয়া যাইবে। তাহার কতকগুলি বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাউক্।

(১) কোন ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জেলায় এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সমস্ত লোক মরিয়া যাইবার পর মাত্র একজন বিধবা ও তাঁহার শিশুকন্যা রক্ষা পাইয়াছিল। এই করুণ ঘটনাটীর এইখানেই আরম্ভ। ম্যালেরিয়া preventable disease অর্থাৎ চেষ্টা করিলে এই ব্যাধি দেশ হইতে

দূর করা যাইতে পারে। এই ব্যাধির প্রকোপে আমাদের এই জাতি উৎসন্নের পথে চলিয়াছে। কিন্তু সমস্ত সভ্যজাতি এই ম্যালেরিয়া বিতাড়নের চেষ্টা করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছে। কত পরিবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া এইরূপ করুণাত্মক ঘটনার সৃষ্টি করিতেছে। তবু দেশের লোক এদিকে দৃষ্টি দিতেছে না। যতদিন পর্য্যন্ত সমবেত ভাবে চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালী ম্যালেরিয়া দূর না করিবে ততদিন এইরূপ করুণ ঘটনার মূলীভূত কারণ বর্ত্তমান থাকিবে।

(২) বিধবা মাতা তাহার শিশুকন্যার বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফললাভ করিয়াছিলেন। গৌরীদানের ফললাভ প্রলোভনটী লোকাচার বা দেশাচার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে সর্দ্দার আইনের জন্য এই কুপ্রথা দেশ হইতে নিবারিত হইয়াছে সত্য। কিন্তু সনাতনপন্থীরা এইরূপ প্রচলিত কুপ্রথার অনিষ্টকারিতা বুঝিতেছেন কি? যদি দেশের এইরূপ ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে শাস্ত্রীয় বিচার যুক্তিতর্কের মোহ বোধ হয় বাস্তব জগতের চিত্রের দ্বারা দরীভূত হইয়া যাইতে পারে।

(৩) বিধবার জামাতা আবগারি বিভাগে একটী সামান্য চাকুরী সংগ্রহ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল। এই চাকুরীর মাহিয়ানা বেশী ছিল না তবে উপরি কিছু আয় ছিল। এই বিধবার যে জমি ছিল সেই তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী এবং জামাতাটী অনায়াসে জমি চাষ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। এরূপ করিলে হয় ত তাহাকে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত না। কারণ পল্লী-গ্রামের মুক্তবায়ুতে যক্ষ্মারোগ হইবার আশঙ্কা কম। এবং কোন কোন চাকুরীর সংস্পর্শে আসিলে চরিত্র দোষ ঘটে। সেই বিপদ হইতেও সে রক্ষা পাইত। এই ঘটনার মূলদোষ বাঙ্গালীর চাকুরি-প্রিয়তা, হিন্দুজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উন্নত বর্ণের লোকের মধ্যে চাষ আবাদ কিংবা স্বাধীন ব্যবসার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবার উদ্যম মোটেই দেখা যায় না। তৎপরিবর্ত্তে চাকুরীতে প্রলুব্ধ হইয়া তাহাতে যোগ দেয় ও সেইজন্যই বোধ হয় বিশেষতঃ এই শ্রেণীর লোকগণ উৎসন্ন যাইয়া তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে এবং মুসলমানগণ যাহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

(৪) বাংলায় যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক হইতেছে। অথচ দেশের লোক অন্যান্য সভ্যদেশের মত এই রোগের জন্য হাঁসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করিয়া এই ব্যাধির সুচিকিৎসার কোন ব্যবস্থা এখনও করিতেছেন না। দরিদ্র যক্ষ্মারোগগ্রস্থ ব্যক্তিরা যাহাতে বিনা পয়সায় অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(৫) এই ঘটনা উপলক্ষ্যে এই বিধবার জমিদারের মেরুদণ্ড-হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ জমিদারগণের মধ্যে এইভাবের প্রাবল্য হয় কেন সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া তাহার কারণ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

(৬) এই ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় এই যে যাহারা কুমারী অবস্থায় বিবাহের ফলে অল্পবয়সেই বিধবা হইয়াছেন তাহাদিগকে কি পুনরায় বিবাহ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে? হিন্দু সমাজে যে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে একটী প্রবল লোকমত রহিয়াছে, তাহার পরিণাম কি সমাজের পক্ষে শুভ হইতেছে?

বর্ত্তমান ঘটনায় দেখিতে পাই, যে হিন্দুসমাজের একজন বালিকা যে অনাঘ্রাত পুষ্পের মতন পবিত্র এবং নির্ম্মল ছিল, গৃহের কল্যাণময়ী গৃহিণীর এবং স্নেহশীলা মাতার সদ্‌গুণাবলী যাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহাকে এইগুলি বিকশিত করিবার জন্য নিজ সমাজ এবং ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্যসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু হয় ত হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ এবং উদারতা তাহার মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। সে তাহার ধর্ম্মমতের জন্য হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করে নাই। যাহাহউক সর্দ্দার আইন পাশ হওয়ার দরুণ হিন্দুসমাজে এইরূপ বালবিধবার সংখ্যা বিশেষ পরিমাণে হ্রাস হইয়া যাইবে ইহা একটী বিশেষ আশার কথা। বালবিধবাদের ইচ্ছামত বিবাহ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া উচিৎ। কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এরূপ হওয়াও উচিত যাহাতে তাহাদের সমাজের মধ্যে থাকিয়া ব্রহ্মচারিণীর জীবনযাত্রা করিবার সুবিধা হয়।

এদেশের বালবিধবাদের ব্রহ্মচারিণী করিবার জন্য হিন্দু সমাজে কিরূপ নিষ্ঠুরতার ব্যবস্থা আছে তাহার সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"কিরূপ শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্মচর্চ্চার মধ্যে সদ্য বিধবাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে পারিলে, কিরূপে তাহার নাক চুল কাটিয়া বিশ্রী করিয়া দিতে পারিলে এবং কিরূপ খাটুনির মধ্যে ফেলিয়া তাহার অস্থি চর্ম্ম পিসিয়া লইতে পারিলে এই অমঙ্গলের হাত হইতে (অর্থাৎ যৌন প্রবৃত্তি) হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে, স্বপক্ষে বিপক্ষে উভয়েই তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে লাগিলেন।"

কিন্তু সমাজে ব্রহ্মচর্য্য সংস্থাপনের জন্য এই নিষ্ঠুরতার পথ যথার্থ পথ নহে। যৌন প্রবৃত্তি দমনের প্রধান উপায় হইতেছে জীবনের কোন উন্নততর বিকাশের পথে যাত্রা করিবার জন্য সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়োজিত করা। হিন্দু সমাজ হইতে হিন্দু বিধবা এবং কুমারীদিগের জন্য এই সমস্ত পথ উন্মুক্ত হওয়া দরকার। তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। তাহাদিগকে দেশের সমাজের এবং সাধারণের জন্য কাজ করিবার সুবিধা দেওয়া দরকার।

যদি কেহ মহৎ চরিত্রের সংস্পর্শে আসে এবং তাঁহার নিঃস্বার্থ স্নেহ এবং ভালবাসা লাভ করিবার সৌভাগ্য পায়, তাহা হইলে অনেকস্থলে তাহাদের চরিত্রের এরূপ একটী মহত্ত্বের বিকাশ হয়, যাহাতে তাহার যৌন প্রবৃত্তি অন্তর হইতে মুছিয়া যায়। ঐ বালবিধবাটী দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার পরিবারে কিম্বা তাহার সমাজের এইরূপ কোনও মহদন্তকরণা মহিলার সাক্ষাৎ পায় নাই। তাহার মাতাও তাহাকে লইয়া যেন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার নিজের সমাজে এরূপ কোন স্নেহের উৎস পাইলে ঐ বালবিধবাটী নিশ্চয়ই তাহার সমাজ ছাড়িয়া আসিত না, কিন্তু সমাজে সে স্বার্থের তাণ্ডবলীলা বরাবরই দেখিয়া আসিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ তাহার মধ্যে সে যেন একটা আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিতে পাইল, যে রমণী হৃদয়ের মধ্যে দেবীও থাকেন, তিনি কখনও কখনও প্রকাশিত হয়েন। যখন তাহার প্রতি অহেতুক স্নেহময়ী ঐ মুসলমান রমণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তাহার মনে এই ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। এই মহিলা যখন তাহার স্বামীর সহিত ইহার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এই সময় যদি কেহ বালবিধবাটীর ব্রহ্মচারিণী থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে হয় ত এই বালবিধবাটি চিরজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকিত।

দ্রষ্টব্য—স্বাধীন মতবাদ প্রচারের অবসর ভারতের সাধনায় আছে। সামাজিক সকল গুরুতর প্রশ্নের সমুচিত আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

সতীত্ব

(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে ছত্রপতি শিবাজী মহাবালেশ্বর প্রতাপগড় নামক দুর্গে মহামহেশ্বরী ভবানী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেন। ইতিহাসের সে অতীত কাহিনী, হিন্দুর পক্ষে অতিশয় উৎসাহ ও আশাপ্রদ কথা। কিন্তু এখন আর মহাবালেশ্বরের সে অবস্থা নাই। সিংহগড় এখন অতিশয় দুর্গম জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং শিবাজীর সে দেবভক্তি, গুরুভক্তি ও আত্ম-প্রত্যয় এখন উপন্যাসের কথা। কালচক্র একই নিয়মে ঘুরিতেছে। সে কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। সে নিয়ম—জন্ম, বৃদ্ধি ও পতন ; উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস ; প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা। সৃষ্টির একটি ক্ষুদ্র পরমাণুও এক মুহূর্ত্তের জন্য এক অবস্থায় অবস্থিত নহে। অবিশ্রান্ত গতিতে চক্রাকারে প্রধাবিত। ভারতবর্ষের আর্য্যগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। সভ্যতা সৃষ্ট পদার্থ, কাজেই স্থির থাকিতে পারে না। চক্র ঘুরিতেছে ; বিধাতার তুলাদণ্ডে ন্যায় বিচার সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে প্রচারিত হইতেছে। সেখানে পক্ষপাতিত্ব থাকিতে পারে না। যাহারা অসভ্য ছিল, তাহারা ক্রমোন্নতির পথে সভ্যতালোকে আসিতেছে। ভারতীয় মানবের বংশধরগণ এখন চক্রের নিম্নস্তরে যাইতে বাধ্য। ইহাই কালধর্ম্ম, ইহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। হে ভারতবাসি! বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে দোষ দিও না ; আর্য্য প্রতিষ্ঠিত সভ্যতাকে দোষ দিও না। তোমাকে কালচক্রের আবর্ত্তনে ঘুরিতেই হইবে। এই জন্যই প্রলয় ও মহাপ্রলয়।

প্রতাপগড় ভবানী মন্দিরে অনেক বৎসর হইতে একটি ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। মহাবালেশ্বরের লোকেরা তাঁহার বিশেষ কিছু পরিচয় জানে না। তবে ব্রাহ্মণকে তাহারা অতিশয় সদাশয় বলিয়া জানে ও ভালবাসে। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, তাঁহার নাম সদানন্দ চক্রবর্ত্তী ও বাড়ী বঙ্গদেশ বাঁকুড়া জেলাতে। ব্রাহ্মণের আচারাদি ব্রাহ্মণোপযুক্ত হইলেও, কেহ কখন তাঁহার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনে নাই এবং তাঁহাকে কেহ দেব দেবীর পূজাদি করিতেও দেখে নাই। মন্দিরের পাণ্ডারা যাহা দেন তাহাতেই ব্রাহ্মণের জীবিকা চলিয়া যায়। তিনি মধ্যে মধ্যে মন্দির ছাড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান এবং পুনরায় ফিরিয়া আসেন। কখন কখন দুই, তিন, হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সদানন্দ বাহিরে গিয়াছিলেন, আজ ফিরিয়াছেন। সঙ্গে একটি ২২।২৩ বৎসর বয়স্ক যুবক। যুবকের দিব্যকান্তি ও মুখখানি হাসিভরা। চক্ষু দুইটি ও ললাটদেশ অসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছে। কৌতূহলাক্রান্ত জনগণ জানিতে পারিল যে যুবকটির নাম সতীনাথ এবং তিনি সদানন্দের একটি অনুগত লোক। সদানন্দ ও সতীনাথ উভয়ে মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং লোকেও ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিল যে সতীনাথ চারিবেদে পণ্ডিত ও অদ্ভুত শ্রুতিধর। আবার সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাহার যথেষ্ট অধিকার আছে।

মন্দিরের লোকেরা প্রায়ই সন্দেহ করিত যে নিশীথ রাত্রে সদানন্দ ও সতীনাথের মধ্যে প্রায়ই কথাবার্ত্তা হয়। কিন্তু সে কথোপকথন এত সাবধানে হইত যে বাহির হইতে কিছুই বুঝা যাইত না। পরদিন জিজ্ঞাসা করিলে সদানন্দ হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তি কল্পে আমরা একরাত্রের কথাবার্ত্তার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

সদানন্দ। ব্রহ্মচর্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। স্নাতক অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকা যাইতে পারে না। দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিতেই হইবে। অগ্নি বিনা তোমার সকল ব্রতই ভঙ্গ হইতেছে। দারপরিগ্রহে তোমার আপত্তি কেন?

সতীনাথ। শঙ্করাদি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন সংসারের মধ্যে পরিত্যাগের বস্তুই কামিনী ও কনক। সংসারে আমার কেহই নাই। পিতামাতা শৈশবে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ভ্রাতা ভগ্নী নাই। আপনি পথের থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আমাকে মানুষ করিয়াছেন। এখন আপনার মহিমাপূর্ণ জীবন ভাবিয়া ভাবিয়া সংসারের মঙ্গল কাজে জীবন পাত করিয়া চলিয়া যাইতে চাহি। আর কামিনীর সম্বন্ধেআনিয়া আমাকে বিপদের পথে লইবেন না।

সদানন্দ। সম্বন্ধ লইয়া জগৎ। জন্মকালে মানুষ কতক প্রবৃত্তি লইয়া আইসে। অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুশীলন ফলে জীবাঙ্কুরে কতকগুলি সতেজ সংস্কার উন্মুখ হইয়া থাকে। জন্মকালের প্রবৃত্তিগুলি যতদূর বলবান থাকে, মানুষ ঠিক তদনুরূপ সম্বন্ধ-সূত্র পাতিতে বাধ্য হয়। এক একটি প্রবৃত্তির স্থায়ী জ্ঞানের নামই সম্বন্ধ। তুমি বেশ বুঝিয়াছ যে প্রবৃত্তিগুলির বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার চেষ্টা কখনই ফলদায়ক হয় না। সম্বন্ধের উৎকর্ষ সাধন না করিলে মনুষ্যত্ব লাভ করা অসম্ভব। পিতা, মাতা, জন্মভূমি, সখা, ভ্রাতা, পত্নী, অপত্য, মানুষ, পশু, পক্ষী, গাছ, নক্ষত্র, প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই সম্বন্ধ রহিয়াছে। পিতা, মাতা তোমার না থাকিলেও সে সম্বন্ধ বর্ত্তমান - নতুবা তোমার অস্তিত্বাভাব হইত। অতএব সম্বন্ধের উৎকর্ষ সাধনই তোমার একমাত্র আচরণীয় কর্ম্ম। গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ায় ফল হয় না। দার পরিগ্রহ করা ভিন্ন তোমার অন্য পথ নাই। তুমি দারপরিগ্রহ না করিলে আমার সেবা ত করিতে পারিবেই না, পরন্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কাহারো কোন কাজে আসিবে না।

সতী। এ বড় শক্ত কথা বলিতেছেন দেখছি। শঙ্করাদি আচার্য্যমণ্ডলী তবে গৃহী হয়েন নাই কেন? আপনার মতে তাঁহারা কি মনুষ্যত্ব লাভ করেন নাই? প্রত্যেককেই বিবাহ করিতে হইবে এ কথা ত জ্ঞান শাস্ত্রে পড়ি নাই! বিশেষতঃ যোগ শাস্ত্র মতে ত কামিনী সংসর্গ একেবারে পরিত্যজনীয়।

সদা। বুদ্ধির অভাবে শাস্ত্রবাক্য বুঝা শক্ত হয় এবং বুদ্ধি হইলেই শাস্ত্র বুঝা সহজ হয়। শাস্ত্র কখনই দুর্বোধ নহে। শাস্ত্র সাধারণ মানবের জন্য প্রস্তুত। শঙ্কর যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন বৌদ্ধ প্রভাবে পৃথিবী আচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণকৃত হিন্দুত্ব তখন ডুবিয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর দলে ভারত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সন্ন্যাসীর দলে ভারত ছাইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠান কল্পে শঙ্করের আবির্ভাব। বৈদিক ধর্ম্মের চূড়ান্ত অধঃপতনে বুদ্ধের সৃষ্টি; তদ্রূপ বুদ্ধের অধঃপতনে শঙ্করের সৃষ্টি। সকলেই সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী; কাজেই শঙ্করকেও সন্ন্যাসী হইতে হইয়াছিল। সম পন্থীদের মধ্যে আকর্ষণ স্বাভাবিক। হিন্দু ধর্ম্মের সন্ন্যাসের দিক ফুটাইয়া দিয়া শঙ্কর

হিন্দুর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া শঙ্করকে যদি ভাব যে তিনি হিন্দুত্বের আদর্শ তাহা হইলে মূলে ভুল হইয়া পড়িবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে গৃহস্থাশ্রম অনিবার্য্য এবং সন্ন্যাসীরা কখনই আদরণীয় নহেন। মহর্ষি বসিষ্ঠ 'অরণ' বা সন্ন্যাসীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এখনও যোগ শাস্ত্র বুঝ নাই ; বুঝিলে দেখিবে বিবাহ করা নিষিদ্ধ নহে। বরং সময়ে বিবাহ বিধিবদ্ধ।

সতী। যাহাই বলুন বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। কি যেন একটা ভয় জাগিয়া উঠিতেছে।

সদা। সবই পরে ঠিক হইবে। এখন যদি আমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে চাও, তবে গৃহী হইয়া অগ্নি গ্রহণ কর। দার পরিগ্রহে তোমার অনিষ্ট ত হইবেই না– কতদূর ভাল করিতে পারি তারই চেষ্টা করিতেছি। এখন অনেক রাত্রি হইয়াছে শয়ন করগে। কাল প্রাতে আমি বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইব।

সতীনাথ শয়ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সুনিদ্রা হইল না। রাত্রি শেষের দিকে নিম্নোদ্ধৃত স্বপ্নটি দর্শন করিলেন :—

"হিমালয়ের পাদদেশে কোনও পবিত্র স্থানে যেন এক মহতী জনসঙ্ঘের সমাবেশ হইয়াছে। সে জনতার বিশিষ্টতা এই যে তথায় রাজা জমিদার নাই। বেদজ্ঞ ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী তথায় সমবেত। সতীনাথও যেন সেই সভামণ্ডপের মধ্যে আছেন। শাস্ত্রালাপে সকলেই ব্যাপৃত। নানা বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইতেছে ও তাহার মীমাংসায় পণ্ডিতগণ ব্যাপৃত। এক পণ্ডিতের সহিত সতীনাথের যেন বিচার চলিতেছে। সতীনাথের কথা যে, দক্ষ যজ্ঞ একটা উপাখ্যান মাত্র এবং সতীর দশ মহাবিদ্যার রূপ ধারণ ইত্যাদি সবই অলৌকিক ; সুতরাং প্রকৃত নহে। পণ্ডিত মহাশয় নানা প্রমাণ দ্বারা যত বুঝাইতে চাহেন যে সতী ও দশ মহাবিদ্যা সত্য ঘটনা, ততই সতীনাথ তাঁহাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করেন। হঠাৎ ঘোরতর ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। সভাস্থ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণেকের জন্য কি একটা তুষ্ণিম্ভাব বিরাজ করিল। ক্রমে সভার একটি স্থান ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি পণ্ডিত কোথায় অদৃশ্য হইলেন। এইরূপে সমস্ত স্থানটিই ক্রমে ভূগর্ভে চলিয়া গেল এবং যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন সকলেই ভূগর্ভে সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। সে এক মহা হাহাকার ব্যাপার। অবশেষে সতীনাথ প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া নিজেই সদ্য উদ্ভূত এক গর্ত্তে লম্ফ প্রদান করিলেন। ঠিক সেই সময় একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। যখন ব্রাহ্মণ সতীনাথকে ধরিয়া ফেলিলেন, তখন সতীনাথ অজ্ঞান। ক্রমে জ্ঞান সঞ্চার হইলে সতীনাথ দেখিলেন সমস্ত স্থানটি জলময় হইয়া গিয়াছে। পার্শ্বের পর্ব্বত স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া ধ্বংস ব্যাপারের সাক্ষী দিতেছে। ব্রাহ্মণ তখন সতীনাথকে বলিলেন "সম্মুখে জলমগ্ন ক্ষেত্র দেখিয়া কি ভাবিতেছ ? ভয় কি, চেয়ে দেখ দেখি, জলের উপর কি ভাসিতেছে।" সীতানাথ ব্রাহ্মণের সেই গম্ভীর ও স্নেহব্যঞ্জক স্বর শুনিয়া কি যেন কি একটা সাহস পাইলেন এবং চাহিয়া দেখিলেন জলের ভিতর হইতে কি যেন বহির্গত হইতেছে। অগ্নি শিখা তরঙ্গে তরঙ্গে খেলা করিয়া আবার কোথায় মিশাইয়া যাইতেছে। একবার অগ্নিশিখার ভিতর হইতে শিব ও সতীর মূর্ত্তি দেখা দিয়া আবার কোথায় চলিয়া গেল। পরক্ষণে জলগর্ভ হইতে হরগৌরী মূর্ত্তি উঠিলেন। কিন্তু এখন আর অগ্নিশিখা নাই। সঙ্গে গণপতি

ও ষড়ানন। জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল। ক্রমে জল হইতে দুইটি দুইটি করিয়া মানুষ, বৃষ, ছাগ, মেষ, মহিষ উঠিয়া আবার কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রত্যেক যুগের একটি অবয়ব হিসাবে ও বলে অপরটি অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ। পরে এক জোড়া চড়ুই পক্ষী জলের উপর উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যেও একটী বেশ বলবান ও অঙ্গ হিসাবে দেখিতে সুন্দর। মন্ত্রমুগ্ধের মত এই সব দৃশ্য দেখিতেছেন, এমন সময় সতীনাথের দিকে এক প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা প্রধাবিত হইল। "বাপরে! পুড়িয়া মলেম" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের দিকে যেই ফিরিয়া দেখিতে গেল অমনি সে দেখিতে পাইল, ব্রাহ্মণ অন্তর্ধান, সেই স্থানে একটি রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। অগ্নিশিখা সেই রমণীমূর্ত্তিতে আসিয়া অন্তর্হর্ত হইয়া গেল।" এই সময় সতীনাথেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল—তিনি দেখিলেন পূর্ণিমার রাত্রি শেষ ও সূর্য্য উদয় হইতেছে।

পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত সদানন্দ স্থানান্তরে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সতীনাথের নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। সতীনাথ অদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্ত সদানন্দকে শুনাইলে, তিনি বলিলেন "পূর্ণিমার স্বপ্ন বিলম্বে সিদ্ধ হয়, কর্ম্ম ফলে জন্ম জন্মান্তর গাঁথা; মহাপুরুষগণ কর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন; দার পরিগ্রহ করিতে প্রস্তুত হও। আমি এখন চলিলাম।" এই বলিয়া সদানন্দ প্রতাপগড় ত্যাগ করিয়া বহির্গত হইয়া গেলেন। সতীনাথের চিন্তার শেষ নাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এ কিরূপ স্বপ্ন এবং ইহার কোন অর্থ আছে নাকি? অগ্নিশিখা কেন? রমণী মুর্ত্তিই বা কেন?

চতুর্থ অধ্যায়

যে দিন মাধুরীকে সর্পাঘাত করে ও অপবিচিত ব্রাহ্মণটি আসিয়া তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন, সেই দিন হইতে আজ চারিবৎসরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে। প্রমথনাথ ক্রমে অধিক মাত্রায় উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সেই অদ্ভুত ব্রাহ্মণের বিষয় চিন্তা করেন ও তিনি কবে পুনরায় আসিবেন এই আশায় দিন গণিতে থাকেন। অবশেষে ব্রাহ্মণের পুনর্দ্দর্শন লাভের আশায় নীরাশ হইয়া মাধুরীকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইবেন এই স্থির করিয়া তিনি তারাপুরের বাড়ী ঘর রক্ষা কল্পে ব্যবস্থা করিয়া তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইবার দিন স্থির করিলেন। নির্দ্দিষ্ট শুভ দিনের প্রাতঃকালে হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণ তারাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রমথনাথের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। তীর্থযাত্রার দিন বদলাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া প্রমথনাথ গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। আহারাদি সুসম্পন্ন হইয়া যাইলে পর সেই অপরাহ্নে টোলের নিভৃত কক্ষে বসিয়া প্রমথনাথও ব্রাহ্মণের মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে কথোপকথন হইয়াছিল।

প্রম। আপনি এই চারিবৎসরের মধ্যে আর আমাদের বিষয় বোধ হয় ভাবেন নাই।

সদা। আবহমান কালের সম্বন্ধ—তোমাদের বিষয় না ভেবে থাকিবার যো কি! বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় আসিতে পারি নাই। আরও দেখ, ইতিপূর্ব্বে আসিবার সময় হয় নাই।

প্রম। আপনার সহিত পরিচয় সেই এক মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। মাধুরীর পুনর্জ্জীবনের জন্য আমরা আপনার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ। সেই দিন হইতে মাধুরী যেন আমার সে পূর্ব্ব মাধুরী নহে, এই রূপ বোধ হইতেছে। তাহার প্রশ্ন করা ও জ্ঞানের অঙ্কুর দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িয়াছি।

সদা। মাধুরী সম্বন্ধে এখন আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। সময়ে আমি নিজেই সকল কথা বলিব। তুমি তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইতে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ কেন ?

প্রম। সেই দিন হইতে (অর্থাৎ যে দিন মাধুরী প্রায় মরিয়া গিয়াছিল) আমার মনে কি একটা অজ্ঞাত ভাবের উদ্দীপনা হইয়া আমাকে উন্মনা করিয়া ফেলিয়াছে। সতীন্দ্রের পদ্যটি শুনিয়া অবধি আমার মনে যেন কত দিনের কত পরিচিত এক চিন্তাস্রোত ভাসিয়া উঠিয়াছে। অথচ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার উপর বৃদ্ধদেব আপ্যায়িতের ফলে একটা প্রবল উদাসীনতা আসিয়া পড়িয়াছে। আমার মন কি ভাবে, কোথায় ভাসিযা যাইতেছে আর বৃদ্ধগণ কি ভাবে আমাকে দ্বিতীয়বার দার গ্রহণার্থ টানিতেছেন। উধাও হইযা মন বিরাট প্রকৃতি দর্শনে শান্তিলাভ করিতে ছুটিযাছে। আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।

সদা। বেশ কথা। কিন্তু মাধুরী ?

প্রম। মাধুরী সঙ্গে যাইবে। তাহার যেরূপ জ্ঞান তাহাতে তাহার উপযুক্ত পাত্র যে আমি খুঁজিয়া পাইব তাহার একটু আশা রাখি না। যা করেন ভগবান এই ভাবিযা গা ঢালিযা দিয়াছি।

সদা। হিন্দু মাত্রেই অদৃষ্টবাদী সত্য। কিন্তু তোমার শরীর রহিযাছে, ক্ষুধাতৃষ্ণা আছে। এমন অবস্থায় চেষ্টা পরিত্যাগ করা ভাবের ঘরে চুরি করা মাত্র। মাধুরীর বিবাহ দিতে না পারিলে তোমার তীর্থ যাত্রা নিষ্ফল। কর্ত্তব্য কার্য্য ফেলিযা কোন কাজেরই অধিকারী হওয়া যায় না।

প্রম। মাধুরীকে পুনর্জীবিতা করায় আপনিই এখন তাহার পিতার স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমি এখন মাধুরী সম্বন্ধে গচ্ছিত ধন রক্ষকের ন্যায়। অতএব আপনিই মাধুরীর পাত্র নির্ণয় করিয়া আমাকে মুক্তি দিন।

সদা। আমিও সে বিষযে উদাসীন নহি। আমার এ যাত্রা এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্যই মাধুরীর পাত্র স্থির করা। তুমি বোধহয় শুনিযাছ মুরশিদাবাদ জেলায় কীরিটেশ্বরীর এক মন্দির আছে। উক্ত স্থানটি একান্ন মহাপীঠের একটি। তথায় শ্যামাদাস মহাপাত্র নামক একজন পূজারী ছিলেন।

প্রম। সেই সিদ্ধ মহাপুরুষ, যাঁহার নাম প্রায় সকলেই করে।

সদা। হাঁ। তাঁহার বংশের সহিত তোমাদের পূর্ব্ব কুটুম্বিতা ছিল।

প্রম। পিতার নিকট শুনিযাছিলাম যে তাঁহারা আমাদের খুব আত্মীয় ছিলেন। বাবা বলিয়াছেন যে শ্যামাদাস ও তাঁহার একমাত্র নাবালক পুত্র জগন্নাথ দর্শনে গিযা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এখন নাকি শ্যামাদাসের বংশ নির্ব্বংশ।

সদা। শ্যামাদাস ভুবনেশ্বরের মন্দিরে অবস্থিতি কালে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হযেন। ঘটনা চক্রে আমি সেই সময় ভুবনেশ্বরে ছিলাম, বহু চেষ্টা করিযাও তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারি নাই। অন্তিম কালে তাঁহার নাবালক পুত্রটিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া শ্যামাদাস দেহত্যাগ করিয়া মহাদেবীর ক্রোড়ে চলিয়া যান। আমি তাঁহার দেহের সৎকার করিয়া ছেলেটিকে লইয়া আমার আশ্রমে চলিয়া যাই। তথায় পুত্রের রাখিয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়া এখন মানুষের মত করিয়াছি। তাহার যেরূপ গুণ ও শিক্ষা তাহাতে সেই ছেলেটিই মাধুরীর উপযুক্ত পাত্র মনে করি।

প্রম। শ্যামাদাসের পুত্র জীবিত—ইহাও এক দৈব ঘটনা দেখিতেছি। নাবালক অবস্থা হইতে সে ছেলে যখন আপনার নিকট শিক্ষা দীক্ষা পাইতেছে তখন সে নিশ্চয়ই উপযুক্ত পাত্র। মহাপাত্র বংশ আমাদের করণীয় ঘর—মাধুরীর বিবাহ সেই পাত্রেই দিবার ব্যবস্থা করুন। ছেলে-টির নাম ?

সদা। সতীনাথ। উদ্দেশ্য বিহীন অবস্থায় আমি তারাপুরে আগমন করি নাই। মাধুরী ও সতীনাথের পুনর্মিলনই আমার এই চেষ্টার মূলে নিহিত জানিবে।

প্রম। "পুনর্মিলন" কেন বলিলেন ?

সদা। বুঝিবে। বিবাহ এক জন্মের সম্বন্ধ নহে। তোমার মাধুরীর বয়স ১২ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সতীনাথের বয়স এই ২৩ বৎসর। যদিও আমার উপর তুমি সবই ভার দিয়াছ তথাপি তোমার নিজে একবার সতীনাথকে দেখা উচিত। তুমি তারাপুর হইতে রওনা হইয়া হরিদ্বার যাত্রা কর; আমি আমার আশ্রমে ফিরিয়া গিয়া সতীনাথকে লইয়া তোমার সহিত মিলিত হইব।

প্রম। আপনার আশ্রমটি কোথায় ?

সদা। মহাবালেশ্বর, প্রতাপগড়।

প্রম। আমরা উভয়ে ত আপনার সঙ্গে তথায় যাইতে পারি। এবং যদি আদেশ হয় তবে তথা হইতে চারিজনেই তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইতে পারি।

সদা। সে প্রস্তাবে বিশেষ বাধা আছে। এই বিবাহ কার্য্য এখনি সম্পন্ন হইবে না। সতীনাথকে এখন বিবাহে মত করাইতে পারি নাই। তবে সে বিবাহ করিতে বাধ্য।

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর সদানন্দ ও প্রমথনাথ উভয়েই সায়ংকৃত্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আহ্নিক-কৃত্য সমাপনান্তে রাত্রের আহার শেষ করিয়া উভয়ে নিজ নিজ শয্যায় গমন করিলেন। মাধুরী বরাবরই পিতার নিকটই শয়ন করিত। সেও বাপের কাছে শয়ন করিল। রাত্রে প্রমথনাথ ও মাধুরীর মধ্যে যেরূপ কথাবার্ত্তা হইল তাহার কিয়দংশ আমরা পাঠককে এইস্থানে উপহার দিতেছি।

প্রমথ। মাধুরি! এবার তোমার বিবাহ দিতে হইবে। সদানন্দ ঠাকুর এক পাত্র স্থির করিয়াছেন।

মাধু। বিবাহ হলে ত আমি পর হইয়া যাইব। তোমাকে কে দেখিবে! আমি যদি বিবাহ না করি তাহাতে ক্ষতি কি ?

প্রম। কন্যা গচ্ছিত ধনের ন্যায়। যাহার ধন তাহাকে ফেরৎ দিতে পারিলেই পিতার কর্ত্তব্য পালন করা হয়। তুমি ত আমার নও। তবে আর পর হইবার কথা উঠিতেছে কেন ? আর বিবাহ না করে তুমি কাহার কাছে থাকিবে। তোমাকে কে রক্ষা করিবে ?

মাধু। কন্যা গচ্ছিত ধন! কেন আমি কি মার স্তন্য পান করি নাই ? আমি কি তোমাদের রক্তমাংসে পুষ্টিলাভ করি নাই ? এরূপ হৃদয়হীনতার কথা কেন বলিতেছ, বাবা! বিবাহ করিব না। তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া এ জীবন কাটাইয়া দিব।

প্রম। কন্যা হইলেই পিতামাতা জ্ঞাত হয়েন যে উহা অন্যের ধন এবং তাই জানিয়াই

কন্যাকে লালন পালন করিয়া থাকেন। সেইজন্য কন্যার প্রতি পিতামাতার সাধারণতঃ বেশী টান হয়। যতক্ষণ না সেই ধনটি যাহার তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হয় ততক্ষণ পিতামাতার সুখশান্তি থাকে না। তবে হৃদয়হীনতার কথা কেন আনিতেছ? বরং বিবাহ না দিয়া নিজের সুখের জন্য কন্যাকে প্রতিপালন করাই হৃদয়হীনতা। আর আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমি কত দিন কষ্টে থাকিতে পারিবে। পুরুষ ও নারী এক উপাদানে সৃষ্ট নহে। পুরুষে যা আছে তাহা নারীতে নাই। পুরুষের বল ও বুদ্ধি নারী ধারণ করে না; নারীর স্নেহ ও কোমলতা পুরুষ কখনই লাভ করে না। পুরুষ সংসারের যত দুঃখ সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, নারী তাহা পারে না; আবার নারী সন্তান ধারণ করে, পুরুষ তাহা কখনই পারে না। পুরুষ ও নারী পৃথকভাবে দুই অসম্পূর্ণ সৃষ্টি। তারই জন্য নারীকে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া থাকে। ইংরাজীতে নারীকে আবার অধিক উত্তম অর্দ্ধাংশ বলে। নারী ও পুরুষ একত্র হইলে তবে বিধাতার পূর্ণ সৃষ্টি দেখা যায়। পরের ধন তুমি, তোমাকে আমি সঙ্গে রাখিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পাপে লিপ্ত হইতে পারিব না। তা ছাড়া তুমি কি আমার সঙ্গে থাকিতে পারিবে, কখনই না। সে কষ্টের জীবন তোমার নহে।

মাধু। ওসব বাজে কথা। নারীকে সুযোগ দিলে সেও পুরুষের মত সর্ব্ব বিষয়ে সমান হইতে পারে। দেখ না এখন কত নারী যুদ্ধে যাইতে চাহে; কত নারী বিদ্যা চর্চ্চায় পুরুষকে হারাইয়া দিতেছে, নারীর লিখিত নাটক নভেল আজকাল পুরুষের একমাত্র পাঠের বস্তু হইয়াছে। আমেরিকা দেশে স্ত্রীলোকের কৃতিত্বের বিষয় শুনিয়াছি—পুরুষ তাহাদের নিকট কোনও বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নহে।

প্রম। যখন বিকার ধরে তখন ওরূপ দুটা একটা সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া কোথাও কেহ যুদ্ধ করে নাই। বিদ্যাচর্চ্চা নারীদের মধ্যে চিরকাল আছে ও থাকিবে। তবে এখনকার নারীর লিখিত নাটক ও নবেলে বিদ্যার চিত্র ত নাই, আছে তার বিপরীত। আজকালের পুরুষগণ বিদ্যা ভালবাসেন না, তাই পুরুষের লেখা ভাল লাগে না। আমেরিকার সভ্যতার সঠিক খবর জানি না, তবে ইহা নিশ্চয় যে, বিকারজনিত যে বিষ স্ত্রীলোকগণ সে সমাজে তুলিবে তাহাতে আমেরিকার সুখশান্তি নষ্ট হইবে। সে বিষ হজম করা যায় না। যদি যেতো, তবে মানব জাতি সমাজ ও সভ্যতার জন্য হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এত চেষ্টা করিত না। যে সমাজে স্ত্রীলোক পুরুষের মুখাপেক্ষা করে না, সে সমাজে ও অসভ্য আদিম মনুষ্য সমাজে কোন পার্থক্য দেখি না।

মাধু। তবে কি তুমি বলিতে চাও নারীর পুস্তক পাঠ করা উচিত নহে? পুরুষগণই বা কি ভাল গ্রন্থ লিখিতেছেন?

প্রম। তুমি এখনও বালিকা এ বিষয়ে বিশেষ কি বলিব! বড় দুঃখে ও ক্ষোভে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এ প্রশ্ন আমাকে না জিজ্ঞাসা করিলেই ভাল হইত। কালধর্ম্মে সবই বিগড়াইয়া গিয়াছে। এখন উল্টো দিকে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ভাল জিনিষে পুরুষের অরুচি আসিয়াছে। অরুচি রোগের লক্ষণ। পুরুষ নারীর অনুকরণে ব্যস্ত এবং নারী পুরুষের অনুকরণে আনন্দিত। সৃষ্টিতত্ত্বে পুংজাতি স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অঙ্গ সৌষ্ঠবে পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ; কিন্তু মুখের সৌন্দর্য্যের জন্য ভগবদ্দত্ত জিনিষগুলি ফেলিয়া দিয়া পুরুষ নারী সাজিতেছে, আর নারীরা কামাইয়া

লোমাবলীর গোড়ায় সিগারেটের ধোমা দিয়া হাতে ছড়ি লইয়া বেড়াইতেছেন। পুরুষগণ বেশ সুন্দর কোঁকড়ান চুল ঝুলাইয়া কাছা খুলিয়া নারীর অনুকরণে ব্যাপৃত, আবার নারীরা চুল ছোট করিয়া বেঁকা সিথি কাটিয়া বেড়াইতেছেন। মনের গঠন দেহে ও হাবভাবে প্রকাশ পায় মাত্র। পুরুষ এখন নারীর লেখার অনুকরণে ব্যস্ত এবং নারী পুরুষের লেখার অনুকরণ করিতেছেন। বিশেষতঃ এ বিষয়ে পুরুষের অধঃপতন অতি শোচনীয় হইতেছে। নিজ পূর্ব্বতন পিতামহী বা মাতামহীর অদ্ভূত দেবতুল্য চরিত্রের বিষয় একেবারে ভুলিয়া গিয়া, কলঙ্কিত নারীর চরিত্র লইয়া গ্রন্থ লিখিয়া সেই বংশের বংশধর নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। সিংহশাবক শৃগালের বৃত্তি ধারণ করিতেছে! সেই পুংজনোচিত ভাষা ও উচ্চারণ ভুলিয়া গিয়া স্ত্রীজনোচিত তরল ভাষায় পুরুষগণ ডুবিয়া যাইতেছেন। মাধু! তুমি মানুষের লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিও। পুরুষাকারে ঢাকা তরলমতি লেখকের পুস্তক কখনও পড়িও না। পুরুষের লেখা পড়িলে বুঝিবে—বিবাহ মানুষের ইচ্ছায় হয় না। উহা বিধি নির্বন্ধ। তুমি স্ত্রীজাতি ও তুমি জানবে তুমি স্ত্রী; সুতরাং তোমার বিবাহ অনিবার্য্য। যার স্ত্রীপুরুষ বিভেদ জ্ঞান নাই, তার বিবাহ প্রয়োজন নাই। যেমন পরমহংস শুকদেব গোস্বামী। হিন্দুপুরাণে একমাত্র দৃষ্টান্ত। এখন ঘুমও। কাল প্রাতে সদানন্দ ঠাকুর যাহা বলেন তাহাই আমাদের আচরণীয় হইবে।

মাধু। আচ্ছা, বাবা! সদানন্দ ঠাকুর কে? ও আমার বিবাহ দিতে এত ব্যস্ত কেন? লোকটাকে দেখিলেই ভক্তি হয়—অথচ এইরূপে মানুষকে দুঃখ দেবার পথ খোঁজা তাঁহার ব্যবসা নাকি!

প্রম। ওর বিষয় আমিও বিশেষ কিছু এখনও জানিতে পারি নাই। তবে উনি ব্রাহ্মণ ও অতিশয় জ্ঞানবান। কি যে একটা শক্তি উহাতে রহিয়াছে আমি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ফেলিয়াছি। আমার মনে হয় উনি আমাদের পরম মঙ্গলকারী লোক। যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিবাহ দিতে ব্যস্ত। তুমি ত নারদ মুনির কথা অনেক শুনেছ, বাছা! তিনি ত মানস পুত্র ও নিত্যমুক্ত। অথচ তাঁহার প্রধান কার্য্যই দেবতাদের বিবাহের সম্বন্ধ করা। বিবাহ দুঃখের না, বিবাহ না করা দুঃখের তাহা বড় হয়ে বুঝিতে চেষ্টা করিবে।

মাধু। তবে নারদ নিজে কেন বে করেন নাই?

প্রম। নারদ দ্বাদশ মানসপুত্রের একজন। বার জনের কয় জন বিবাহ করিয়া সৃষ্টি বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত হয়েন এবং আর কয় জন ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার গুণ ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার আদেশ পালন করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। ব্রহ্মার এ আদেশ কেন—তাহা সময়ান্তরে জ্ঞান হইলে তোমাকে বুঝাইয়া দিব। এখন তাহা তোমার ধারণা হইবে না। এখন ঘুমাও, আর রাত্রি জাগরণ ভাল নহে।

প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সদানন্দ ঠাকুর দিন পঞ্জিকা লইয়া দিন স্থির করিলেন। সে দিন অষ্টমী ছিল। আগামী বুধবার ত্রয়োদশীতে প্রমথনাথের তীর্থ যাত্রার দিন স্থির করা হইল। সদানন্দ পর দিন তারাপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রমথনাথ ও মাধুরী নির্দ্দিষ্ট দিনে কাশীর দিকে রওনা হইয়া গেলেন। তারাপুরের লোকেরা অনেক চেষ্টা

করিয়াও প্রমথনাথকে তীর্থ যাত্রার সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না। এক দিন তারার মন্দিরের সম্মুখের বারাণ্ডায় বসিয়া কয় জন পূজরীর মধ্যে অপরাহ্নে যে সকল বিষয় আলোচনা হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ পাঠকের জানিয়া রাখা ভাল।

১ম পূজারী। কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখ! লোকটা এসেই প্রমথনাথকে যেন জুজু বানিয়ে দিয়েছিল। প্রমথর সে পাণ্ডিত্য যেন ডুবে গিয়াছিল।

২য় পূজারী। ওরে! কে কি ভাবে আসে যায় কিছু বুঝিবার যো নাই। এই তারা পীঠে কত রকমের লোক এল গেল। সদানন্দ ঠাকুর নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ।

১ম। ছেঁড়া কাপড়, গামছা হাতে এবং থেলো হুঁকোয় ২৪ ঘণ্টা টান। এতে যদি বাবা! মহাপুরুষ হয় তবে নাচার!

৩য়। নারে; তুই দেখিস্ নাই। লোকটার কপাল ও চক্ষু ঠিক যেন আমাদের বাঘাম্বর পণ্ডিতের মত। আমি ছেলেবেলায় তাকে দেখেছিলাম।

১ম। লোকটার ক্ষমতা খুব। কোন আড়ম্বর না করে কেমন দেখ প্রমথনাথকে হাতে করে নিল।

২য়। প্রমথটা বোকা কিনা, তাই সদানন্দের চালবাজিতে ভুলে গেল। আমাদের ভুলাতে পারিল!

৩য়। বাঘাম্বরের পৌত্র। বোকা ত নয়ই, তাহা ছাড়া প্রমথ একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তোমাদের বুঝিবার ভুল। সদানন্দ নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ।

২য়। আচ্ছা মানিলাম—সদানন্দ সাধু। তবে তীর্থ যাত্রা কেন বাপু! তারাপীঠ নিজে এক তীর্থ; তা ছাড়া, "মন চাঙ্গা ত কাদায় গঙ্গা"—মনেই সব।

১ম। ওরে স্থান মাহাত্ম্য আছে। সকল স্থানে সকল কাজ করা যায় না।

২য়। মাটির আবার মাহাত্ম্য! তোর মাথাটা খারাপ হ'ল নাকি। কাশীতে গেলেই মুক্তি! বা, কি সুন্দর তত্ত্ব!

৩য়। আচ্ছা! তোমাদের ম্যালেরিয়া ধরিলে জলবায়ু পরিবর্ত্তন করিতে ব্যবস্থা করা হয়। রক্তওঠার পীড়া হ'লে পুরীধামে যাইতে হয়। কেন বল দেখি? যদি স্থানের কোন গুণ না থাকিবে তবে মধুপুর, শিমুলতলা, দার্জ্জিলিং, শিলং, মারী, কাশ্মির প্রভৃতি যাওয়ার প্রয়োজন?

২য়। সে সব স্থানের জলবায়ু যে ভাল! তীর্থে ত জলবায়ুর জন্য যাওয়া হয় না ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে যাওয়া হয়! ধর্ম্ম ত মনের জিনিষ, মনটা ঠিক হলে তারাপুরেই সব আছে!

১ম। মনটার তিনটা গুণ আছে। তাকে সংস্কৃত কথায় সত্ত্ব, রজ ও তম নাম দিয়েছে। অর্থাৎ মন সময়ে কার্য্যে তৎপর থাকে; আমার সময়ে ঘোরতর আলস্যে যেন মচ্ড়ে পড়ে। এই-গুলো যখন সমান ভাবে উদয় হয় তখন তাকে ভাল মন বলে। যখন একটা ভাব বেশী হ'তে থাকে তখন তাকে বিকার বলে। বিকারের চিকিৎসাই সর্ব্বদা প্রয়োজন।

৩য়। সেই জন্যই পৃথক তীর্থে পৃথক ফল বলা আছে। পিতৃতীর্থে পিতৃভক্তি পাওয়া যায়, তথায় বৃন্দাবনের গোপীপ্রেম পাওয়া যায় না। যেমন রোগ তাহার জন্য তেমনি তীর্থ ব্যবস্থা।

২য়। তাই বুঝি কাশীতে যত চোর ডাকাত ও অসচ্চরিত্র নরনারীর বাসস্থান!

১ম। কাশীতে ভালও আছে, মন্দও আছে। তুমি যেমন অধিকারী তেমনি পাইবে। দার্জ্জিলিংএ ম্যালেরিয়া নষ্ট হয়, আবার ম্যালেরিয়া হইয়া লোক মারাও যায়। সাবধান হইয়া না থাকিলে শৈত্যের প্রভাবে মৃত্যু ঘটে। দার্জ্জিলিং এ ভাল আছে মন্দও আছে। যে যা চায়।

৩য়। তা ছাড়া তীর্থ যাত্রায় প্রকৃতির বিরাট আকার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে নিজের ক্ষুদ্রত্ব প্রতিভাত হইয়া মহানের ঐশ্বর্য্যে মন অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য মুগ্ধ হইয়া পড়ে। যে নীরাশায় পুড়িয়াছে সেই জানে তীর্থ যাত্রায় কি শান্তি পাওয়া যায়।

২য়। আচ্ছা! না হয় বুঝিলাম প্রমথের তীর্থ যাত্রায় লাভ আছে। ধেড়ে কেষ্ট মেয়েটাকে কি বলে সঙ্গে লইয়া গেল, বে না হলে যে জাত যাবে!

১ম। সেটা একটা কথা বটে! ও বিষয়ে তেনা কাকা যা বলেন তাই করা যাবে।

৩য়। তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় বড় কুটিল প্রকৃতির লোক। তিনি কেবল জাত মারামারি ও পৈতা নিয়ে টানাটানিতেই আছেন। প্রমথ অতি সজ্জন এবং তাহার কন্যাও এত বড় হয় নাই যে বিবাহ এখনি দিতে হবে!

২য়। তোমরা নাস্তিক হয়ে পড়েছ দেখিতেছি। তুমি বুড়ো হয়ে গেছ তবু এ কথা বলিলে! মেয়েটার ১২ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। দশমে কন্যকা বলে, তার উর্দ্ধে বিবাহ দেওয়া প্রচলন হইলেও শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

১ম। দেশ কাল পাত্র ভেদে সর্ব্ব কার্য্যই করিতে হয়। যে দিন কাল পড়েছে তাহাতে আর পুরাতন প্রথা চলে না হে! সে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যাদি যদি থাকিত তা হলে দশ বা এগার বৎসরে কন্যা সন্তান প্রসব করিয়া মাতা হইত না। সামাজিক অবস্থাই মানুষ তৈরী করে। সমাজের অধঃপতন হইয়া গিয়াছে, অথচ তুমি চাও ব্রহ্মচর্য্য কালের বিবাহ প্রথা। গোলাকুচীতে "পীড়ামিড" তৈরী করা যায় না।

২য়। ছি! তা হবে বইকি। উনি শাস্ত্র তৈরী করবেন?

৩য়। শাস্ত্র সবই তৈরী আছে। কতকগুলি আবর্জ্জনা আসিয়া প্রকৃত মর্ম্মার্থ একবারে চাপা দিয়াছে। এখন শাস্ত্রার্থ উদ্ধার করা অতীব দুরূহ হইয়াছে। তোমার যদি চক্ষু থাকিত দেখিতে পাইতে বালিকা পত্নীর উপর কি ঘোরতর অত্যাচার সমাজে চলিয়াছে। সমাজে সে দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে। কাল ক্রমে উহা উঠিয়া যাইবে ও যাইতেছে। দেখিলে তোমার হৃৎকম্প হইবে। আর এই ছাই মুখ দেখাইয়া বালিকাকে নর পশুদের হস্তে দিতে তোমার এ আগ্রহ থাকিবে না।

ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে দেবীর আরতির উদ্‌যোগে সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

ক্রমশঃ

যক্ষের ধন

কস্যচিৎ সাহিত্য-কুবেরের ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(সংবাদ প্রভাকর—১ অগ্রহায়ণ, ১২৬২)

৺রামকান্ত ভাদুড়ী, রস-সাগরের জীবন চরিত।

[সংক্ষেপ বৃত্তান্ত]

প্রশ্ন—অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল।

পূরণ—হাঁরে বিধি নিদারুণ কত খেলা খেল। সংসারের যন্ত্রণা যত হাবাতের ঘাড়ে ফেল ॥
কান্দিয়া কুরিন্দে কহে কোন দিন বা ভালো। অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল ॥

প্রশ্ন—জাঙ্গাল বোয়ে যান কৃষ্ণ পায়ে দিয়ে ছাতি।

পূরণ—সখের প্রাণ সদাই খান গাঁজা কিম্বা পাতি। যে নেশাতে কিন্তে চান নবাবের হাতি।
এক টানেতে অন্ধকার দিনে জ্বালান বাতি। জাঙ্গাল বোয়ে যান কৃষ্ণ পায়ে দিয়ে ছাতি ॥

প্রশ্ন—লাগে তীর না লাগে তুকা।

পূরণ—গোঁসাই গোবিন্দ প্রেমের তুকা। গ্রন্থ পাঠ গাঁজা হুঁকা ॥
ধরেন কাণ লাগান ফাঁকা। লাগে তীর না লাগে তুকা ॥

প্রশ্ন—বাছা বাছা বাছা।

পূরণ—কপি মেরে অদ্বৈত দেখাইলা পাছা। অবধৌত নিত্যানন্দ দিলেনাক কাছা ॥
ভারতী বেটা মুড়িয়া দিলে চাঁচরচুলের গোছা। তোরা তিন্ জনা বৈরাগি হলি বাছা বাছা২ ॥

প্রশ্ন—ধিস্তা ধিনা পাকা নোনা।

পূরণ—চৈত্রে শিবের আরাধনা। জিহ্বা ফোঁড়েন ঢেঁকির মোনা ॥
ছোলা কলা গুড় পানা। ধিস্তা ধিনা পাকা নোনা ॥

প্রশ্ন—মাতা যাঁর সধবা বিমাতা তাঁর রাঁড়ী।

পূরণ—সাধে দিলেন বাপের বিয়ে দাস রাজার বাড়ি। হেন পিতার পঞ্চত্ব পদ্মিনীরে ছাড়ি ॥
অভিমানে ভীষ্ম ভূমে যান্ গড়াগড়ি। মা যাঁর সধবা বিমাতা তাঁর রাঁড়ী ॥

প্রশ্ন—পিতার বৈমাত্র ভাই, নিজ সহোদর।

পূরণ—অদিতি নন্দন সেই দেব পুরন্দর। শিব আজ্ঞে পঞ্চ ইন্দ্র দ্রৌপদীর বর ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন প্রতি যে যে কন বৃকোদর। পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর ॥

প্রশ্ন—পিতার বৈমাত্র যে সে আমার বৈমাত্র।

পূরণ—উচ্চরবে কেঁদে কন মাদ্রীর দুই পুত্র। ষড়যন্ত্রে বধিলাম এহেন সুপুত্র ॥
তর্পণ কালেতে কুন্তী প্রকাশিলা মাত্র। পিতার বৈমাত্র যে সে আমার বৈমাত্র ॥

প্রশ্ন—গোলমালেতে রেস্ত ফলে হাটের নেড়া হুজক চায়।

পূরণ—উকিল খোজেন্ মোকদ্দমা, কোকিলে বসন্ত গায়।
সত্যবাদী সত্য খোজেন্, মিথ্যাবাদী মিছ্ কথায় ॥

সাধু খোজেন্ পরমার্গ, লোচ্চা খোজেন বাঁড়ের রায়।
গোলমালেতে রেস্ত ফলে, হাটের নেড়া হুজুক চায়॥
প্রশ্ন—যখন ছেলে জন্মাইল মা ছিলনা ঘরে।
পূরণ—পুত্রবতী সতী সীতা যান সরোবরে। ঋষি আসি প্রবেশিলা আশ্রম কুটীরে॥
কুশময় কুমার স্থাপিল শূন্যঘরে। জানি কি জানকী যদি মনস্তাপ করে॥
একে কৈল যুগল বাল্মীকি মুনিবরে। যখন ছেলে জন্মাইল মা ছিল না ঘরে॥
প্রশ্ন—ইঁদুর বড় সাঁতারু তার মার্গে খুদের পেরো।
পূরণ—হায়রে কলি বলিহারি দেবতা হলেন ঈশু। মজাইতে একেবারে যত হিঁদুর শিশু॥
সতী হোলেন অধোগামী স্বর্গে গেলেন জেরো। ইঁদুর বড় সাঁতারু তার মার্গে খুদের পেরো॥
প্রশ্ন—গোবিন্দ পরমানন্দ মুকুন্দ মুরারে।
পূরণ—পাপের পুলীন্দা ভারি মগ্ন হলো পারে। ঘাটে মাজি নাইকো বুঝি ডাকতো রসনারে॥
নিরূপিত ঘণ্টা মধ্যে যেতে হবে পারে। গোবিন্দ পরমানন্দ মুকুন্দ মুরারে॥
প্রশ্ন—শমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী।
পূরণ—শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পড়িয়া রণভূমি। কান্দেন ব্যাকুল হয়ে জগতের স্বামী॥
শিক্ষা দীক্ষা বিবাহ সবার আগে আমি। শমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী॥
প্রশ্ন—হাট শুদ্ধ এই তো।
পূরণ—দেহের গৌরব মন, পরভার্য্যা পরধন। বাঞ্ছা করে সর্ব্বক্ষণ, পুণ্যাঙ্কুর নাইতো॥
পশু পক্ষি কীটে খাবে, অথবা অনলে দিবে। দেহরত্ন কেড়ে লবে, আটকান সেইতো॥
এরস সাগরে মত্ত, সম্পদ গিরীশ দত্ত। থাকিলে কিঞ্চিৎ স্বত্ব, পরিচয় দেইতো॥
মন তুমি বড় মন্দ, তেজে কালী পাদপদ্ম। কাল পাশে হোলে বন্ধ, হাট শুদ্ধ এইতো॥
প্রশ্ন—ভূমিষ্ঠ হইয়া হরি হারালাম এইমাত্র।
পূরণ—বার বার যাতায়াত নিজ কর্ম্ম সূত্র। পূর্ব্ব কথা নাহি মনে কি নাম কি গোত্র॥
জঠরে পরমানন্দে ছিলাম পবিত্র। ভূমিষ্ঠ হইয়া হরি হারালাম এইমাত্র॥
প্রশ্ন—তৈল থাকিতে দীপ যেন গেল নিভাইয়ে।
পূরণ—কেকৈ বচনে রাজা রামে বনে দিয়ে। মনস্তাপে ব্রহ্মশাপে জর্জ্জরিত হোয়ে॥
দশরথ অযুত বৎসর আয়ু পেয়ে। তৈল থাকিতে দীপ যেন গেল নিভাইয়ে॥
প্রশ্ন—সতী বাক্য রক্ষা হেতু বেদ বাক্য নড়ে।
পূরণ—রুগ্ন পতি লয়ে সতী প্রবেশিলে ঘরে। রজনী প্রভাত আর কার সাধ্য করে॥
চন্দ্রসূর্য্য লুকাইল সুমেরুর আড়ে। সতী বাক্য রক্ষা হেতু বেদ বাক্য নড়ে॥
প্রশ্ন—হায় হায় হায় রে।
পূরণ—অক্রুর আসিয়া রথে, লয়ে যায় ব্রজনাথে। বলরাম তাঁর সাথে, মধুপুরে যায় রে॥
কান্দি গোপীগণ যত, প্রেম ধারা অবিরত। যমুনা তরঙ্গ মত, দুনয়নে বায় রে॥
শুনি রাণী যশোমতী কান্দিয়া লুটায় ক্ষিতি। বলেন রোহিণী সতী, একি হল দায় রে॥
দুপুরে ডাকাতি করি, প্রাণধন প্রাণ হরি। কে মোর নিলরে হরি হায় হায় হায় রে॥

ব্রজ কুলবধূ বলে, কামনা করিয়া ছলে। পেয়েছিনু তপো বলে, মনোময় তায় রে॥
এবে মোর মন হরি, শ্রীনন্দ নন্দন হরি। যান বুঝি মধুপুরী, বধি অবলায় রে॥
মুখে কুলে দিয়া কালী, না ভজিতে বনমালী। রসের কলঙ্ক ডালি, তুলিনু মাথায় রে॥
আরে নিদারুণ বিধি, মোর সঙ্গে বাদসাধি। দিয়ে নিলি হেন নিধি হায় হায় হায় রে॥
রাজ্য ত্যেজি রঘুপতি, পঞ্চবটি উপস্থিতি। অনুজ বনেতে দেখি, মৃগ পিছে ধায় রে॥
ভেকধারী নিশাচর, সীতার ধরিয়া কর। অন্তরীক্ষে রথ লয়ে, চোরা পথে যায় রে॥
জটাই শুনিয়া নাট, মারে বীর পাকশাট। রথ সহ রাবণেরে, গিলিবারে যায় রে॥
বজ্রবাণে কাটে পাক, পলাইয়া মারে ডাক। এসময় রাম নাই, হায় হায় হায় রে॥

প্রশ্ন—পায় পায় পায় না।

পূরণ—চিনিতে নারিনু আমি, আইল জগৎ স্বামী, মাগিল ত্রিপাদ ভূমি, আর কিছু চায় না।
খর্ব্ব দেখি উপহাস, শেষে দেখি সর্ব্বনাশ, স্বর্গমর্ত্ত্য দিয়ে আশ, পরিতোষ হয় না॥
ফুরাইল এ সম্পদ, আছে আর এক পদ, এক্ষণে পরম পদ, কলঙ্কত যায় না।
কি আর জিজ্ঞাস প্রিয়ে, বৃন্দাবলি দেখ গিয়ে, অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে, পায় পায় পায় না॥

প্রশ্ন—পায় পায় পায়।

পূরণ—কাঁদি কন বৃন্দাবলী, বলিরাজ শুন বলি। আসিয়াছে বনমালী, ছলিতে তোমায়॥
হেন ভাগ্য কবে হবে, যার বস্তু সেই লবে। জগতে ঘোষণা রবে, সুজন সভায়॥
একপদ আছে বক্রি, প্রকাশ করিল চক্রী। এদেহ করিয়া বিক্রি, ধরহে মাথায়॥
তুমি আমি দুজনের, ঘুচিল কর্ম্মের ফের। মিলাইব বামনের, পায় পায় পায়॥

প্রশ্ন—ললাটে নূপুরের ধ্বনি অপরূপ শুনি।

পূরণ—শ্রীরাধার প্রেমে বাঁধা শ্রীনন্দ নন্দন। দুর্জ্জয় মানেতে রাধে, মজেছে যখন॥
কৃষ্ণচন্দ্র সেই মান ভঞ্জন কারণ। পীতাম্বর গলে দিয়া ধরিলা চরণ॥
শেষে পদ মস্তকে নিলেন চক্রপাণি। ললাটে নূপুরের ধ্বনি অপরূপ শুনি॥

প্রশ্ন—ধরাতল স্বর্গস্থল, কিছুমাত্র ভেদ তার নাই।

পূরণ—সুরপুর শূন্য করি, কৃষ্ণ আজ্ঞা শিরে ধরি, ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ।
দণ্ডিনৃপ দণ্ডে দণ্ডি, ভাবিয়া সহিত চণ্ডী, অবনীতে উপনীত হন॥
উর্ব্বসীর শাপ খণ্ড, দণ্ডি নৃপতির দণ্ড, অষ্ট বজ্র মিলে এক ঠাঁই।
ভীম জন্যে এত হল, ধরাতল স্বর্গস্থল, কিছুমাত্র ভেদ তার নাই॥

প্রশ্ন—প্রাণেশ্বরে মন্মথ।

পূরণ—অশোক বনেতে সীতা শোকেতে ব্যাকুল। ভাবে কিসে শোকার্ণবে পাব আমি কুল॥
কে লবে রামের পাশে শূন্যে আনি রথ। প্রাণ জুড়ায় দেখে প্রাণেশ্বরে মন্মথ॥

প্রশ্ন—নিশি অবসান।

পূরণ—চন্দ্রাবলী বলে শুন হে বংশিবয়ান। শুকতারা আগমনে শশি ম্রিয়মান॥
লোকেতে দেখিলে মোর হবে অপমান। গাত্রোত্থান কর নাথ নিশি অবসান॥

অষ্টাদশশ্লোকী-গীতা।

শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ তীর্থ

(১)

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশের অধিকারী কে?'—এই প্রশ্নের উত্তর গীতার প্রথম অধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে। স্ব-কর্ত্তব্য কি, ইহা ভালভাবে না বুঝিয়াও যিনি জয়, রাজ্য, সুখ, সুবিধা ও সর্ব্বপ্রকারের ভোগ, এবং পরার্থে নিজ জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তিনিই গীতার মহান্ উপদেশের অধিকারী।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা॥

১ম অধ্যায়, ৩২ শ্লোক।

—হে কৃষ্ণ! আমি বিজয় কামনা করি না, এবং রাজ্যসুখভোগাদির আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই। হে গোবিন্দ! আর রাজ্যে প্রয়োজন নাই। জীবনধারণেই বা ফল কি?

(২)

'আত্মা নিত্য--এই সিদ্ধান্তই নীতি ও ধর্ম্মের আধার-স্থল। যদি আত্মা জড়েরই আবির্ভাব মাত্র হয়, তবে আমার কর্ত্তব্য ভাবনার প্রয়োজন ক্ষণিক ও নিঃসার হইয়া পড়ে। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে পরম গম্ভীর উপদেশ দিতেছেন:—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি—
ন্নায়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

২য় অধ্যায়, ২০ শ্লোক।

—আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত্যুমুখেও পতিত হন না, অথবা বারংবার উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধিলাভও করেন না। তিনি অজ (জন্মরহিত), নিত্য (হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য), শাশ্বত (বিকারহীন) এবং পুরাণ (পরিণাম বর্জ্জিত)। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ হয় না।

(৩)

যদি আত্মা নিত্য ও শাশ্বত হয়, তবে বিকার, মরণাদি যা আমার প্রতীত হয় সে সব কি? ইহার উত্তর এই যে ঐগুলি 'গুণ প্রকৃতির বিলাস মাত্র'। আত্মা প্রকৃতি হইতে পর এবং অসঙ্গ।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥

৩য় অধ্যায়, ২৮ শ্লোক।

—হে মহাবাহো! গুণ হইতে আত্মার বিভাগ এবং কর্ম্ম হইতে আত্মার বিভাগ,—এই দুইয়ের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি 'ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে আমি নহি' অর্থাৎ আত্মা নিঃসঙ্গ, এই মনে করিয়া কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হয়েন।

(৪)

'ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, আত্মা নহে'—ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে কি (১) আমি স্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব? অথবা (২) 'ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতির বিলাস' বুঝিয়া পাপাচরণে কোন প্রকার সঙ্কোচ করিব না?

উত্তর—উপরোক্ত দুটী বিষয়কে এক করিলে চলিবে না, কারণ, (১) আত্মা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নহে। অর্থাৎ আত্মা প্রকৃতিতে অবস্থিতি করিয়াও প্রকৃতি হইতে 'পর'। (২) প্রকৃতিকে আত্মাতে লয় করিতে হইবে, কিন্তু আত্মাকে প্রকৃতিতে প্রকট করিতে হইবে, কিন্তু প্রকৃতির দোষ দ্বারা আত্মাকে মলিন করিবে না। এইরূপ স্থিতিতে ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবনচর্চ্চা কিরূপ হয়, নিম্নোক্ত শ্লোকে তাহা ব্যক্ত হইতেছে :—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥
৪র্থ অধ্যায়, ২৪ শ্লোক।

(৫)

প্রশ্ন উঠিতে পারে 'ভাবনাপুরঃসর যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলে কি দূরবর্ত্তী ব্রহ্ম বশ হইবেন?'

উত্তর,—না। ব্রহ্ম দূরবর্ত্তী নহেন, কিন্তু দূরস্থিত ও নিকটস্থ তিনি। ব্রহ্ম কোন দৃশ্য পদার্থ হইতে ভিন্ন নহেন, উনি সমস্ত দৃশ্য পদার্থেও স্থিত। অর্থাৎ ব্রহ্মভাবনা এক দূরবর্ত্তী মহান চেতন পদার্থের ভাবনা নহে, পরন্তু আমার সম্মুখে যে যে পদার্থ আছে ঐ বিষয়ে পরম চেতনের ভাবনা করাই ব্রহ্মভাবনা। এই মীমাংসাই নিচের শ্লোকে উক্ত হইতেছে : -

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥
৫ম অধ্যায়, ১৮ শ্লোক।

—ব্রহ্মবিদ্যা জনিত নিরহঙ্কৃতিযুক্ত সত্ত্বগুণী ব্রাহ্মণ, সংস্কার বর্জ্জিত রজোগুণযুক্ত গো, এবং সর্ব্বনিকৃষ্ট তমোগুণী হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডাল অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস সকল প্রকার প্রাণীই তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে সমান। অর্থাৎ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সকল প্রকার প্রাণীতেই একই ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন; কুক্কুর বা যোগীর আত্মায় কোন তারতম্য দৃষ্টি করেন না।

(৬)

পূর্ব্বোক্ত 'সমদৃষ্টি' কি ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়? বিশ্ব প্রপঞ্চে এত ভেদভাব বর্ত্তমান যে সাধারণ দৃষ্টিতে সর্ব্বত্র অভেদ দৃষ্টি হওয়া সম্ভব মনে হয় না। কিন্তু ইহাই চরম কথা নহে। ভেদ চাপিয়া রাখিলে বা ভুলিয়া গেলে কিছুই হইবে না, পরন্তু ভেদ-বুদ্ধিকে সমতা জ্ঞানে লয় করিতে

হইবে। অর্থাৎ ভেদের মধ্যে যে সমভাব বর্ত্তমান সেই অভেদানুভব করিতে হইবে। এই অভেদানুভব কি প্রকারে সম্ভব, তাহার সদুত্তর নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ত্তমান :—

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥
৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক।

—বাহ্যব্যাপারবিমুখকারিণী বুদ্ধিদ্বারা যোগী ধীরে ধীরে মন নিরুদ্ধ করিবেন। মনকে আত্মাতে নিশ্চলভাবে স্থাপন করিয়া আর কোন প্রকার চিন্তা করিবেন না।

(৭)

'কোন প্রকার চিন্তা করিবেন না'—এই সিদ্ধান্তে প্রশ্ন হইতে পারে, 'তবে কি জড়তা-প্রাপ্তিই বেদান্তের পরম উপদেশ?' ইহার উত্তর এই যে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বিষয়ের চিন্তা করিবেন না; ইহাই পূর্ব্বোক্ত উপদেশের তাৎপর্য্য। অর্থাৎ সমস্ত পদার্থে ব্রহ্মরূপ দেখিতে হইবে, বৃত্তিমাত্রকেই ব্রহ্মবিষয়ী, ব্রহ্মরসপূর্ণ ও ব্রহ্মরূপী করিতে হইবে। মনকে চঞ্চল বৃত্তি হইতে সংযত করিয়া আত্মাভিমুখ আত্মসংস্থ করিতে হইবে। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে,—আত্মা কি প্রকার বৃত্তির বিষয় হইতে পারে? উত্তর—আত্মা বৃত্তির বিষয় হইতে পারে না, কারণ বৃত্তির বৃত্তিত্ব আত্মা ভিন্ন কিছুই নহে। আরো, চৈতন্যতে এরূপ বিলক্ষণতা প্রতীত হয় যে আত্মা স্বয়ং বিষয় ও বিষয়ী উভয়ই হইতে পারে। এইরূপ স্থিতিতে বৃত্তিগুলি ব্রহ্মরূপ হইয়া ব্রহ্মকে বিষয়রূপে দেখায়। যেমন সমুদ্রের একটী তরঙ্গ আর একটীর সংস্পর্শে উভয়ে মিলিয়া সমুদ্র-বারিতে পরিণত হয় সেইরূপ বৃত্তিগুলিও ব্রহ্মাকার হইয়া যায়।

অতএব, ব্রহ্মস্মরণ করিবার যোগ্য স্বরূপের বর্ণন নিচের শ্লোকে প্রকট হইতেছে :—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
৭ম অধ্যায়, ৪ শ্লোক।

(৮)

'এই অষ্টবিধ ভিন্ন প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন কি প্রকারে করিতে হয়?' ইহার উপায় বিষয়ে বলা হইতেছে,—অকার, উকার, মকার আর অর্দ্ধমাত্রা ও বিন্দু মিলিয়া যে প্রণবমন্ত্র হয়, তাহার উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগকারী দেহান্তকালে পরমগতিরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হয়। উচ্চারণ তোতা পাখীর ন্যায় করা নহে, পরন্তু অর্থের ভাবনা পুরঃসর অর্থাৎ সদাচরণ ও মন্ত্রোচ্চারণের সহিত আমাকে স্মরণ রাখিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। এই কথাই নিচের শ্লোকে বলিতেছেন :—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥
৮ম অধ্যায়, ১৩ শ্লোক।

(৯)

যিনি জগতের সমস্ত চিন্তা পরিহার করিয়া অহর্নিশ এইভাবে পরমাত্মার নামকীর্ত্তন আর

স্মরণ করেন তাঁহার সংসার-যাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে ?—যাঁহার পরমাত্মা দর্শন হইয়াছে, তাঁহার সাংসারিক চিন্তা হওয়া কোনরূপেই সম্ভব নয়। যে ভক্ত অনন্তভাবে তাঁহার চিন্তা করেন, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার উপাসনা করেন, আর নিরন্তর তাঁর প্রেমে ভরপূর থাকেন,—তিনি ত তখন অভেদাত্মা। অভেদাত্মার সমস্ত সব্যবস্থা ভগবান স্বয়ং করিয়া দেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবান্ ব্যতীত আর কোন বিষয়েরই—এমন কি, নিজ দেহযাত্রা নির্ব্বাহের ভাবনাও করেন না, ভগবান্ তাহার অপ্রাপ্ত অন্নবস্ত্রাদির সংস্থান, এবং তত্তাবৎ রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ ভক্তের কথাই গীতা বলিতেছেন :—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥
৯ম অধ্যায়, ২২ শ্লোক।

(১০)

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে অষ্টবিধ প্রকৃতিতে পরমাত্মার যে স্থিতি বা আবির্ভাব তাঁহার ধ্যান, উপাসনা আর ভজন করিতে হইবে ; পরমাত্মার অনন্তভাবের কোনও একটীতেও মনোনিবেশ করিতে পারিলে চিত্তচাঞ্চল্য সহজে বিদূরিত হয় ; আন্তর বা বাহ্য যে কোন ভাবেই মন নিরুদ্ধ হইয়া পরমাত্মভাবে আবিষ্ট হইতে পারে।—ইহাতে ত পরমাত্মার প্রকৃতিভাব প্রাপ্তি ঘটিতেছে, পরমাত্মা পরিচ্ছিন্ন হইতেছেন,—এই দোষ বাহির হইতেছে। এই শঙ্কা সমাধানে বক্তব্য এই যে পরমাত্মার প্রকৃতিভাব-প্রাপ্তি-বিষয়ে মনোযোগ করিতে নাই। প্রকৃতি পরমাত্মার রূপ আর উহাতেই জ্ঞানীর পরমাত্মাদর্শন হয়, অর্থাৎ এই প্রকৃতি প্রকৃতিরূপে নহে, কিন্তু পরমাত্মরূপে দর্শন হয়। যেমন বরফ জল হইতে ভিন্ন নহে, তরঙ্গ সমুদ্র হইতে অভিন্ন,—সেইরূপ প্রকৃতি পরমাত্মা অভেদ। যদি অভেদ হয়, তবে পরমাত্মা পরিচ্ছিন্ন হ'ন কি প্রকারে ? প্রকৃতিপরমাত্মা হইতে ভিন্নত নয়ই, কিন্তু পরমাত্মা প্রকৃতিমাত্র এই বুদ্ধি না হয়। প্রকৃতিত পরমাত্মার একদেশের প্রকাশ মাত্র। যেমন ঘট, মঠাদির দ্বারা নিরাকার আকাশের সীমা কল্পিত হয়, সেইরূপ সুখবোধার্থ অবিদ্যাবিকারসম্ভূত উপাধি যোগে ব্রহ্মের পাদ বা অংশ কল্পনা করা হইয়া থাকে, নতুবা ব্রহ্মস্বরূপের অংশাংশিভাব হইতে পারে না। অনন্ত অখণ্ড ব্রহ্মের অত্যল্পমাত্রই যে চরাচর বিশ্বরূপে জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতেছে, ইহা প্রকাশ করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। ইহা বুঝাইবার জন্যই ভগবান্ বলিতেছেন :—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥
১০ম অধ্যায়, ৪২ শ্লোক।

(১১)

পরমাত্মার দর্শন হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন ভাব কিরূপে উৎপন্ন হয়, পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে। ভগবান্ ব্যতীত বিচিত্রতাময় দৃশ্য জগতের যে আর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, সুতরাং বিশ্বের সমস্ত দৃশ্যই ভগবানের বিভূতি,—ইহা নিশ্চয় হইলে সাধকের সর্ব্বত্র—অন্তরে ও বাহিরে—ভগবদ্ভাবের ধারণা সুদৃঢ় হইয়া থাকে। তখন সর্ব্বভাবই তাঁহার ভাবরূপে দর্শন হয়,

সর্ব্বভাবই একৈক ভাব হইয়া দাঁড়ায়। দর্শনে কাহারো অত্যন্ত হর্ষ উৎপন্ন হয়, কেহ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পড়েন, রাক্ষস প্রকৃতি ভয়ে পলায়ন করে, সিদ্ধপুরুষ নমস্কার করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। অর্থাৎ জ্ঞানী হর্ষে উৎফুল্ল হন, ভক্ত প্রেমে দ্রবীভূত হন, দুষ্ট ভয়ে ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করে, সিদ্ধি-শক্তি-প্রাপ্ত পুরুষ মহিমা দর্শনে নতশির হইয়া পড়েন।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥
১১ শ অধ্যায়, ৩৬ শ্লোক।

(১২)

উপরোক্ত রীতি অনুসারে যিনি ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার স্থিতি কিরূপে হয় তাহা বলিতেছেন। ভগবদ্ভক্ত কোন বস্তুর অপেক্ষা করেন না। কোন বস্তু ত্যাগ অথবা গ্রহণ,—এই প্রকার দ্বৈতবুদ্ধি তাঁহার কখন হয় না। যিনি মায়াকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক দেখেন, তিনিই উহাকে ত্যাগ করা আবশ্যক মনে করেন। অদ্বৈতবাদী যিনি তিনি মায়াতেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন। উনি জ্ঞানী-সদৃশ উদাসীন অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত আর সংসারী বদ্ধ জীবের ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট তাঁর লেশমাত্রও নাই। উহার এই উত্তম দশার রহস্যময় কারণ এই যে তিনি নিজ কর্ত্তৃত্ব, অহমিকা পরমাত্মাকে সমর্পণ করিয়াছেন। এইরূপ ভক্ত পরমাত্মার অত্যন্ত প্রিয়।

অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
১২শ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক।

—যিনি বিনা যত্নে প্রাপ্ত বা অনায়াসলব্ধ বস্তুতেও ভোগস্পৃহা করেন না; যিনি শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতশূন্য, ব্যথাবর্জ্জিত ও সকামকর্ম্মানুষ্ঠানে স্পৃহাশূন্য, এতাদৃশ অনাসক্ত ভক্তই ভগবানের পরমপ্রিয় পাত্র॥ হরি ওঁ॥ ইতি—

ক্রমশঃ

আলোচনা

শাস্ত্র পাঠে ভ্রমাশঙ্কা—

গত কার্ত্তিক সংখ্যা ভারতের সাধনার ৩৭ পৃষ্ঠায় শ্রদ্ধাস্পদ লেখক সুশ্রুতের একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই—

ঊনষোড়শ বর্ষায়াম প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে।

জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ
তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥

এই পাঠটী ভ্রমাত্মক। লেখকের ভ্রম নহে। বাঙ্গলা দেশের সমস্ত মুদ্রিত সুশ্রুতে ঐ পাঠ বর্ত্তমান। কাজেই হঠাৎ দেখিতে গেলে মুদ্রিত পুস্তকে যে পাঠ আছে তাহা যে ভ্রমাত্মক তাহার কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। উহা যে ভ্রমাত্মক তাহা সুশ্রুতের সূত্রস্থান ও শারীর স্থানের কয়েকটী বচন পূর্ব্বাপর দেখা আবশ্যক। বোম্বাইএর নির্ণয়সাগর প্রেসের যে সুশ্রুত ইং ১৯১৫ সনে ছাপা হইয়াছে, সেই পুস্তকের ৩০৮ পৃষ্ঠার ফুটনোটে লিখিত আছে :—"ঊনদ্বাদশ বর্ষায়াম্" ইতি হস্ত লিখিত পুস্তকস্থঃ পাঠঃ।" এই পাঠ পড়িয়া আমার প্রথম জ্ঞান জন্মে যে পাঠটী ভ্রমাত্মক। তাহার পর বৎসরাধিক্ নানা অনুসন্ধানে জানিয়াছি কাশীধামে সুশ্রুতের হস্ত লিখিত পুঁথিতে "ঊনদ্বাদশ বর্ষায়াম্" এই পাঠ আছে। ইহার পর সুশ্রুতের বিখ্যাত টীকাকার ডল্বণাচার্য্যের সন্ধানে কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়ের সংস্করণ পাঠে পাইলাম "অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতেরূণ ষোড়শ বর্ষয়া সহ সংযোগে দোষং দর্শয়ন্নাহ—ঊনদ্বাদশ বর্ষায়ামিত্যাদি।" ইহা হইতে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। ডল্বণাচার্য্য পাঠ পাইয়াছেন "ঊনদ্বাদশবর্ষায়াম্" অথচ ছাপা পুস্তকে "ঊন-ষোড়শ বর্ষয়াসহ সংযোগে দোষং দর্শয়ন্নাহ"—ইহা হয় ছাপার ভুল, নয় সম্পাদক ছাপাপাঠে "ঊন-ষোড়শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য অসঙ্গত পরিবর্ত্তন করিয়া "ঊনদ্বাদশ বর্ষয়াসহ" স্থলে "ঊন-ষোড়শ বর্ষয়াসহ" ছাপাইয়াছেন, নয় ডল্বণাচার্য্য ধৃত পাঠ "ঊন দ্বাদশবর্ষায়াম্" ভ্রমাত্মক। ইহার মীমাংসার জন্য ডল্বণাচার্য্য টীকার কোনও পরিশুদ্ধ হস্ত লিখিত পুঁথি দেখা আবশ্যক। অনুসন্ধানে কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামদাস বাচস্পতির নিকট "শারীর স্থানের" ডল্বণাচার্য্যের টীকার হস্ত লিখিত একটী লেখা পাইলাম। তাহাতে স্পষ্টতঃ পাইলাম—"অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতেরূণ দ্বাদশ বর্ষয়া সহ সংযোগে দোষং দর্শয়ন্নাহ—ঊনদ্বাদশ বর্ষায়ামপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতি মিত্যাদি"। ইহার পর দেখিতে হয় যে ইহা পাঠান্তর মাত্র না ভ্রমাত্মক পাঠ। তাহা দেখিতে গেলেই সুশ্রুতের অন্যান্য স্থানের বক্তব্য বিষয়গুলি বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক।

সূত্রস্থানের ১৪শ অধ্যায়ে ৭ম ও ৮ম বচন দুইটী এইরূপ :—

রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃ সংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে
তদ্বর্ষাদ্ দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্। ৭
আর্ত্তবং শোণিতন্ত্বাগ্নেয়মগ্নীষোমীয়ত্বাদ্ গর্ভস্য
পাঞ্চভৌতিক ঞ্চাপরে জীবরক্ত মাহুরাচার্য্যাঃ। ৮

এ স্থলে ঋতুর সহিত দ্বাদশ বর্ষ ও গর্ভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সুশ্রুতের কোনও সঙ্কল্প বিকল্প উঠে নাই।

সূত্র স্থান ১৫ শ অধ্যায়ে ৮ম বচনে

রক্ত লক্ষণার্ত্তবং গর্ভকৃচ্চ। গর্ভো গর্ভলক্ষণম্।

এখানেও লক্ষণ বলিয়া কোনও প্রকার অবিধেয়তার কোনও উল্লেখ করিলেন না। ১২ বচনে আর্ত্তব ক্ষয় ও গর্ভক্ষয়ের লক্ষণাদি বিচার আছে। ১৬ বচনে আর্ত্তববৃদ্ধি ও গর্ভবৃদ্ধির লক্ষণাদি ও আনুসঙ্গিক উপসর্গাদির জন্য কর্ত্তব্য নির্ণয় আছে। অধ্যায়ের শেষে এই বচনটী আছে—

সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সম ধাতু মলক্রিয়ঃ
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয় মনাঃ স্বস্থা ইত্যভিধীয়তে।

কাজেই এই সমগ্র অধ্যায়ে সুস্থ ও অসুস্থ আর্ত্তব ও গর্ভ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে এবং আর্ত্তব ও গর্ভ যে আনুষঙ্গিক ভাবে সম্বন্ধ তাহা ধরিয়াই সমস্ত অধ্যায়টী লিখিত।

সূত্রস্থানের ৩৫ অধ্যায়টীর প্রসঙ্গ আতুরোপক্রমণীয়।

৭ ও ৮ম বচনে আয়ুর্বিজ্ঞানার্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গণের প্রমাণ আছে। ৯ম বচনটী এই

পঞ্চ বিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে
সমত্বা গত বীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক।

১০ম বচন এই—

দেহঃ স্বৈরঙ্গু লৈরেষ যথাবদনু কীর্ত্তিতঃ
উক্ত প্রমাণে বানেন পুমান্ বা যদি বাঙ্গনা
দীর্ঘমায়ুর বাপ্নোতি বিত্তঞ্চ মহদৃচ্ছতি
মধ্যমং মধ্যমৈ বায়ু বিত্তং হীনৈস্তথাবরম্।

১১ বচনে আ। সৌভাগ্যের শারীর লক্ষণাদি বিচার করা হইয়াছে। দ্বাদশবচনে বলা হইয়াছে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিগের পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ ও উক্ত সার সমূহ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা করিলে সিদ্ধ হওয়া যায়। ১৩ হইতে ২৫ বচনাবলী ব্যাধি লক্ষণাদিবিচার। ২৬ বচনে আছে—বয়স্তু ত্রিবিধং বালং মধ্যং বৃদ্ধমিতি। তত্রোন ষোড়শ বর্ষা বালাঃ। * * * * আবিংশতে বৃদ্ধিরাত্রিং শতো যৌবনমা চত্বারিংশতঃ সর্ব্বধাত্বিন্দ্রিয় বলবীর্য্য সম্পূর্ণতা। তাহার পর শেষ বয়স পর্য্যন্ত বলবীর্য্যের অবস্থা বিচার আছে। ৩৫।৩৬ বচনে ভিন্ন ভিন্নদেশে ভিন্নভিন্ন মনুষ্য প্রকৃতির বলবীর্য্য প্রভৃতির বিচার আছে। অধ্যায়ের শেষে সমস্ত অধ্যায় ভুক্ত প্রসঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে রোগ সাধ্য কি কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য এ সকল বিচার করিতে গেলে দেশ প্রকৃতি, সাত্ম্য (বয়সাদি ভেদে অনুকূল গুণাদির বিচার), ঋতু, বল, সত্ত্ব, আয়ু প্রভৃতি বিচার করিবার জন্যই ভিষককে এতগুলি বিষয় পরীক্ষা করিতে হইবে।

অনেকে মনে করেন যে "সমত্বাগত বীর্য্যৌ" হইতে গর্ভাধান-যোগ্যাযোগ্যতা অনুমেয়। কিন্তু সেই অর্থ সুশ্রুতের অভিপ্রেত হইলে পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ে স্পষ্টতঃ লিখিতেন। আতুরোপক্রমণীয় অধ্যায়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রমাণ মান বিচারে সে প্রকার অপ্রাসঙ্গিক অনুমানের কোনও অপেক্ষা রাখিতেন না। বলাবাহুল্য "সমত্ব" অর্থে প্রমাণ-পূর্ণতা মাত্র এখানে আর কোনও অর্থ কোনও টীকাকার ও ধরেন নাই, কোনও কোষেও নাই। বস্তুতঃ ৭ম ৮ম ৯ম ১০ম একসঙ্গে পড়িলে এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত হইতেই পারে না। আর অধ্যায়ের বিষয়টীর প্রতি অভিনিবেশ করিলে দেখা যায় যে ভিষকের সহিত রোগীর প্রথম পরিচয়ে বয়স বলবীর্য্য প্রামাণিক মানান্বিত কিনা তদ্বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্যই অধ্যায়টী লিখিত। ইহার পর শারীর স্থানের ২য় অধ্যায় শুক্রশোণিত ব্যাখ্যায় এই প্রসঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। আর্ত্তবের লক্ষণ ও নিয়মাদি বিবৃত করিয়া ২৫ বচনে ঋতু-চর্য্যার বিধান সুশ্রুত দিতেছেন

ঋতৌ প্রথম দিবসাৎ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণী * * ।২৪। দর্ভসংস্তর শায়িনীং করতল শরাব পর্ণান্যতম ভোজিনীং হবিষ্যং ত্র্যহঞ্চ ভর্ত্তুঃ সংরক্ষেৎ। ততঃ শুদ্ধস্নাতা চতুর্থেঽহন্য হত বাসা সমলঙ্কৃতা কৃত মঙ্গল স্বস্তি বাচনাং ভর্ত্তারং দর্শয়েৎ ।২৫

তৎ কস্য হেতো ?

পূর্ব্বং পশ্যেদৃতুস্নাতা যাদৃশং নরমঙ্গনা।
তাদৃশং জনয়েৎ পুত্রং ভর্ত্তারম্ দর্শয়েদতঃ ।২৬

প্রথম তিন দিবস গমনে কি কি দোষ হয় তাহা বিশদ ভাবে দেখাইয়া বলিতেছেন—

চতুর্থে তু সম্পূর্ণাঙ্গো দীর্ঘায়ু ভবতি। * * *। তস্মাৎ নিয়মবর্ত্তী ত্রিরাত্রং পরিহরেৎ অতঃপরং মাসাদুপেয়াৎ ।৩১।

ইহা হইতে কয়েকটী কথা প্রণিধান করা উচিত। অধ্যায়টী শুক্রশোণিত শুদ্ধি লইয়া লিখিত। আর্ত্তবের সাধারণ সদাচার বিধানের জন্য লিখিত। হেতু বিন্যাস করিয়া বিধান দেওয়া হইয়াছে। ২৬ বচনে যে বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহা জাবালি শ্রুতিরই পুনরুক্তি। জাবালি শ্রুতিতে আছে—"ঋতুস্নাতা ভার্য্যা যং পূর্ব্বং পশ্যেত্তা দৃশং পুত্রং জনয়তি তস্মাৎ সন্নিধৌ ভর্ত্তেব প্রথমামাত্মানং দর্শয়েৎ"। সুশ্রুত ভর্ত্তা শূন্য প্রথমার্ত্তবের কোনও বিধানের আবশ্যকতা কল্পনাও করেন নাই। উপরন্তু ৪৮ বচনে লিখিয়াছেন—

ঋতুস্নাতা তু যা নারী স্বপ্নে মৈথুন মাবহেৎ
আর্ত্তবং বায়ুরাদায় কুক্ষৌ গর্ভং করোতি হি।

আর প্রথম তিন দিন গমনের দোষোল্লেখ করিয়াছেন অথচ বয়সের কোনও দোষের উল্লেখও করেন নাই। বরং "উপেয়াৎ" বিধান দিয়াছেন।

অতঃপর শারীর স্থানের ৩য় অধ্যায়ে গর্ভাবক্রান্তি বর্ণিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ বচনে আর্ত্তবের বহিলক্ষণ ও ৭ম বচনে আর্ত্তবাতীতের লক্ষণ দিয়া ৮ম ও ৯ম বচন এই

তদ্বর্ষাৎ দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমানমসৃক্ পুনঃ
জরা পক্ব শরীরানাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্।
যুগ্মেষু তু পুমান্ প্রোক্তো দিবসে ষ্বন্যথা বলা
পুষ্পকালে শুচিস্তস্মাদপত্যার্থী স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ।

১১শ বচনে গৃহীত গর্ভার উত্তর কালীন লক্ষণ দিয়া দ্বাদশ বচনে গৃহীত গর্ভার পরিবর্জ্জনীয় ব্যবস্থা সুশ্রুত দিয়াছেন। ১৩শ বচনে লিখিত আছে—

দোষাভিঘাতৈ গর্ভিণ্যা যো যো ভাগঃ প্রপীড্যতে
সস ভাগঃ শিশোস্তস্য গর্ভস্থস্য প্রপীড্যতে।

১১শ বচন হইতে গর্ভ বিবৃদ্ধির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে প্রণিধানের বিষয় এই কয়টী। সূত্রস্থানে আর্ত্তবকাল একবার বলিয়াও যথা প্রসঙ্গে আবার পুনরুক্তি করা সুশ্রুত সঙ্গত মনে করিয়াছেন। দ্বাদশবর্ষে ঋতুর আরম্ভের পর বয়সের হিসাবে কোনও বিচারণীয় অবিধি থাকিলে "ব্রজেৎ" বিধিলিঙ্ ব্যবহার করিতেন না। ১৩শ

বচনে দোষ বিচার করিয়াছেন। বয়স জনিত কোনও দোষের সম্ভাবনাও করেন নাই এবং সমস্ত অধ্যায়ে ও সেরূপ কোনও দোষের উল্লেখ নাই;

অতঃপর শারীর স্থানের ১০ অধ্যায়ে গর্ভিণী ব্যাকরণে আছে। পুত্র ত জন্মাইল, জাত বালককে প্রতিপালন করিবে তাহার বিধান দেওয়া হইয়াছে—

৪২ বচনে বলা হইয়াছে সেই পুত্রকে শক্তিমন্ত জানিয়া যথাবর্ণ বিদ্যা শিক্ষা দিবে এবং সে পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স পাইলে দ্বাদশ বর্ষ পত্নীকে উদ্বাহ করিয়া আনিবে। কিসের জন্য? পিতৃলোকের শ্রাদ্ধদানাদি কর্ম্মের জন্য, শ্রুতি স্মৃতি বিহিত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের জন্য, অর্থোপার্জ্জনের জন্য, কাম প্রবৃত্তি ভোগের জন্য ও পুত্র পৌত্রাদি লাভের জন্য। ইহার পর ৪৩ বচন হইল—

উন দ্বাদশ বর্ষায়াম প্রাপ্ত পঞ্চবিংশতিং
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে।
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥

সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ও শারীরস্থানের বিষয়াদি বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই ধরা যায় যে "উনদ্বাদশ বর্ষায়াম্" স্থলে "উনষোড়শ বর্ষায়াম্" পাঠ একেবারেই অসম্ভব। সমস্ত আর্ত্তবচর্য্যের বিধান যে যে স্থলে ব্যাখ্যাত ও বিচারিত হইল তৎ তৎস্থলে সবজস্কার বয়স নিবন্ধন কোনও বিপত্তির উল্লেখ না করিয়া পুত্রের বিবাহ দিবার সময় হঠাৎ দ্বাদশের স্থলে ষোড়শের উল্লেখ একেবারেই অযৌক্তিক। ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে সুশ্রুত উনষোড়শী পর্য্যন্ত বালা বলেন, কাজেই "অত্যন্ত বালায়াম্" পদে ১১।১২ বয়স্কা অর্থ ছাড়া অন্য কোনও অর্থ হইতেই পারে না। পূর্ব্বোক্ত "সমত্বাগত বীর্য্যৌ" পদের "সমত্বের" সুশ্রুত-গৃহীত অর্থ ছাড়িয়া দিয়া অর্ব্বাচীন যুগের আধুনিকতম অর্থ ধরিয়া বিচার করিলে যে অসঙ্গতি হয় তাহার কোনও যুক্তিযুক্ত মীমাংসা একেবারেই সম্ভব নহে।

"সমত্বাগত বীর্য্যৌ" আধুনিক অর্থ ব্যবহার ধরিলে সুশ্রুতকে লিখিতে হইত একবিংশতি বর্ষায় দ্বাদশবর্ষাং পত্নীমা বহেৎ"। তবেই

উনষোড়শ বর্ষায়াম প্রাপ্ত পঞ্চবিংশতিম্

পাঠ ঐ সমত্বাগত বীর্য্যের কল্পিত অর্থানুকূল হইত। কিম্বা "উনষোড়শ বর্ষায়াম অপ্রাপ্তোন ত্রিংশন্তৈব" পাঠ থাকিলেও ষোড়শের বিবক্ষা ঐরূপ অর্থানুসারে কল্পনা করিতে পারা যাইত। এক পক্ষে দ্বাদশে পচিশেও সমত্ব কল্পনা করা যায় না; অপর পক্ষে চারি বৎসর অপেক্ষার জন্য কল্পনায় আনিতে হয় যে পাত্রের বয়স পঁচিশ রাখাই সুশ্রুতের মনে অপরিবর্ত্তনীয় আর পাত্রীর বয়স দ্বাদশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত যে কোনও বয়স হইতে পারে। তাহা হইলে সুশ্রুত পুত্র পৌত্রাদি লাভের জন্য "দ্বাদশবর্ষাং পত্নী মাবহেৎ" বিধান দিয়াছেন কোন কি আধুনিকতম আইন কর্ত্তার খেয়াল বশে? সুশ্রুতের মতন গভীর বিজ্ঞানবিদের সম্বন্ধে যিনি এরূপ কল্পনাও করিতে পারেন তিনি শ্রদ্ধাহীন। আর কিছু বলিতে চাহি না।

এই সকল কারণে আমি মনে করি "উনদ্বাদশ বর্ষায়াম্" পাঠই সুশ্রুতের মৌলিক পাঠ। পরে কোনও সংস্কারক আমলে বা বৌদ্ধপণ্ডিতের অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী হওয়াতে দ্বাদশ স্থলে ষোড়শ চালান হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, শ্রুতি, স্মৃতি, অর্থশাস্ত্র. কাম শাস্ত্র প্রভৃতি ভারতীয় শ্রেষ্ঠকল্প ব্যবস্থায় "দ্বাদশ" পাঠ সর্ব্ববাদী সম্মত এবং আধুনিকতম পাশ্চাত্য যৌনবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইহাই সমীচীন বলিতেছেন, তবে তাহা আচারে প্রবর্ত্তন করিতে এখনও সফল হয় নাই বটে।

শ্রী নরেন্দ্রনাথ শেঠ।

পুস্তক পরিচয়।—(১) কাল ও দিক বা অবকাশ।

কাপিল মঠ, মধুপুর হইতে লিখিত, বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীমনীন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। তিন আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে প্রদত্ত হয়।

সাংখ্যদর্শনের দৃষ্টিতে 'কাল' ও 'দিক' প্রকরণের সংক্ষিপ্ত বিচার করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনে কাল—Time ও স্থান বা দিক—space এর বিচার অনেকে করিয়াছেন। ইহারা পরিদৃশ্যমান জগতের স্থিতি বা আধার—forms ; একটী বাহ্য বস্তুর আধার অপর মানসিক ক্রিয়া অবলম্ব। পাশ্চাত্য দর্শনের এই দুইটী বিষয় এই গ্রন্থে সাংখ্য দর্শনের দৃষ্টিতে বিচার করা হইয়াছে। "যেখানে কোনও বাহ্য বস্তু নাই সেই স্থানমাত্রেই নাম অবকাশ"—space ; আর যে অবসরে কোন মানস ক্রিয়া বা মনোভাব নাই সেই অবসর মাত্রই কাল। এই কাল ও দিকে বা অবকাশের মূল প্রকৃতি কি তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ভাষা সরল ভাববিন্যাস কোনও দার্শনিক পুস্তকে যতদূর সহজ ও বোধগম্য হইতে পারে ; তাহাই। স্থানে স্থানে পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের সহিত তুলনাত্মক বিচার রহিয়াছে,—বিখ্যাত দার্শনিকগণের মতামতের উল্লেখ রহিয়াছে। পাশ্চাত্য মতবাদ বা ভাব বিশেষকে ভারতীয় তত্ত্ব সাধনার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করা লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে। এ প্রচেষ্টা সাধু ও সময়োপযোগী। লেখকের শান্ত চিন্তাধারায় ইহাতে সফলতার আভাস পাওয়া যায়। কাল ও দেশ বা দিক বা অবকাশ (Time and space) কে 'শুদ্ধ অবসর বা 'শুদ্ধ বিস্তার' বলিয়া উহাদের স্বরূপ নির্ণয় করিতে একালের পাশ্চাত্য মনীষীদিগের অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পরিণামে ইহারা বিকল্প জ্ঞান মাত্র বলিয়া প্রতীত হয়। মানুষের সাধারণ জ্ঞান বৈকল্পিক ও আপেক্ষিক—পদার্থ লইয়া ভাষা ব্যবহারে এই অপূর্ণ জ্ঞান বদ্ধমূল হইয়া চলে। গ্রন্থকার 'কাল ও দিক এই দুই পদার্থ জ্ঞানকে' 'শব্দ জ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্য বিকল্পজ্ঞান' বলিয়া প্রমাণিত করিতে চাহেন।

কিন্তু কাল ও দেশ জ্ঞান বৈকল্পিক হইলেও উহার ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে। বস্তুবাদী পাশ্চাত্য চিন্তা ধারায় কেহ কেহ (ক্যাণ্ট প্রমুখ) এজন্য উহাকে মনের স্থায়ী লক্ষণ বা অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ; কেহ কেহ (গণিতাচার্যগণ) উহাকে বাস্তব সত্ত্বা মানিয়া লইয়াছেন। ভারতীয় চিন্তার ধারায় এই বিকল্পকে উচ্চস্থান দেওয়া হয় নাই—সবিকল্প জ্ঞান মিথ্যা মিশ্রিত জ্ঞান ; তাহার সহিত আপোষ মীমাংসা চলে না প্রশ্রয় পাইলে উহা অজ্ঞান ও অবিদ্যায় রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া চলে। নির্ব্বিকল্প জ্ঞান হইলেই সত্যজ্ঞান হয় ; ভারতীয় যোগ শাস্ত্রে তাহার বিবৃতি আছে। লেখক তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে কালের স্থিতি—অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যত,—ও পরিমাণ দিকের বিস্তার জ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিচার রহিয়াছে। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির তুলনাত্মক বিচার। বিচারে মৌলিকত্ব ও গবেষণার গভীরতা আছে।

এ বিশ্ব শান্ত কি অনন্ত—এ প্রশ্নে বলিতেছেন 'একটী সকেন্দ্র অসীম বিশ্বজগৎ আছে এরূপ কল্পনা ন্যায় সঙ্গত নহে'। মাধ্যাকর্ষণের থিওরি অনুসারে দেখিলে ওরূপ সকেন্দ্র অসীম জগৎ যে অসম্ভব হয় তাহা গণিতজ্ঞেরা দেখান। দৃশ্যমান নাক্ষত্রিক জগৎ যে অসীম তাহাও স্বীকার্য্য হয়। শাস্ত্র মতে এই ভৌতিক জগৎ অসীম এবং ইহা অব্যক্তর দ্বারা আবৃত।' এই 'অব্যক্ত বলিয়া দার্শনিক ভাষায় সত্য ভাষণ' করা হইল মাত্র। বাস্তবিক 'ব্রহ্মাণ্ডের পরিধিং গেলে কোনও জ্ঞানই থাকিবে না'—তখন দিকেরও জ্ঞান থাকিবে না'। দিক্ ও দেশের ধারণা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, তাহার বাহিরে ইহাদের কল্পনা ন্যায়ানুসারে কর্ত্তব্য নাই।"

ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা সম্বন্ধেও ঐরূপ—'ব্রাহ্মাণ্ডেরপরিধির পরস্থ স্থানে কল্পনীয় নাই'। 'এই ব্রহ্মাণ্ড এক মহামনের রচনা'। 'অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য মহমন সকলে আছে।' শাস্ত্রও বলেন অসংখ্য ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড আছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড এক একটী স্বগত (unit) জগৎ। তাহা অন্য এক বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গভূত বলিয়া ন্যায়ানুসারে কল্পনীয় নহে।

কালিক ব্যাপ্তি সম্বন্ধেও ঐরূপ বিচার। 'কাল ব্যাপী পদার্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বা পর পর অবস্থা দেখিতে থাকিলে কখনও সে জানার শেষ হইবে না, মাত্র এই সত্যই ভাবণ করা যাইতে পারে'। নচেৎ অনাদি অনন্তকে এক বাস্তব নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধরিয়া চিন্তা করিলে নানা সমস্যা আসিয়া পরে।' এ সকলই বিকল্প জ্ঞানের পরিসরের মধ্যে।

এই কাল ও অবকাশ রূপ বিকল্প জ্ঞানের নিবৃত্তি কিরূপে হয় তাহাই বিচার্য্য। বলিতেছেন, 'সেই কালিক জ্ঞানেরও যাহা জ্ঞাতা তদভিমুখে লক্ষ্য করিয়া যদি সর্ব্বজ্ঞানকে নিরোধ করা যায়, তবে দিক্ কালাতীত বা দিক্ ও কালের দ্বারা ব্যপদিষ্ট হইবার অযোগ্য এরূপ যে পদার্থ তাহাতেই স্থিতি হয়। ইহাই সাংখ্য যোগের (এবং অন্য নির্ব্বাণ মোক্ষবাদীদের) লক্ষ। শ্রুতি বলেন "কাল পচতি ভূতানি সর্ব্বাণ্যেব মহাত্মনি। যস্মিংস্তু পচ্যতে কালো যস্তংবেদ স বেদ। বং" অর্থাৎ কাল সমস্ত সত্বকে মহান্ আত্মা বা মহত্তত্ত্বরূপ অস্মিমাত্র আত্মবোধে পাক করে, আর যাহাতে সেই কালও পাক হয় যিনি তাহাকে জানেন তিনিই বেদ বিং।"

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।—ভাষ্য ও টীকা প্রভৃতি তাৎপর্য্য সহ সরল বাঙ্গালা ভাষার পদ্যে অনুবাদিত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক অনুমোদিত। লেখকের শঙ্কর ও রামানুজ চরিত, ব্যাপ্তি পঞ্চা তর্কামৃত, বেদান্ত সার ও উপনিষদের অনুবাদ, ব্রহ্ম সূত্র, গীতা, চণ্ডী, অদ্বৈত-সিদ্ধি খণ্ডন-খণ্ড খাদ্য, চিৎসুখী ও সিদ্ধান্তলেশ প্রভৃতি গ্রন্থ এযুগে বঙ্গীয় সাহিত্যে একটী বিশিষ্ট ধারা নির্দ্দেশ করিয়াছে। প্রকৃত সমালোচনাত্মক বিচার এ যুগে দুর্লভ; সাধনা রত লেখক তাঁহার সকল গ্রন্থেই তাহা অসাধারণ রূপে দেখাইয়াছেন। উপস্থিত পুস্তকখানি তাহার পূর্ব্ব সংস্করণ গীতা হইতে অপেক্ষাকৃত সরল, সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ পাঠকের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু গীতার মৌলিক অংশের সহিত পূর্ব্বাচার্য্যগণ গীতার্থ বুঝাইবার জন্য যে ভাষ্য টীকাদি করিয়া গিয়াছেন, তাহা সরল পদ্য বাক্যে এমন যোজনা করিয়া গিয়াছেন যে তদ্দ্বারা অনায়াসেই গীতার গূঢ় রহস্য সমূহ সাধারণ পাঠকেরও মনে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে।

পারের চিন্তা।—শ্রীমিহিরমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত—একখানি অধ্যাত্মিক্ ভাবপূর্ণ নিবন্ধ-পুস্তিকা। পরিচয়ে জানা যায় গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের মৃত্যুশয্যায় রচনা। পরকালের

চিন্তায় প্রধানতঃ নিয়োজিত। কিন্তু মৃত্যুর দুশ্চিন্তা বা বিভীষিকাই ইহার দর্শনীয় বিষয় নয়; পরন্তু ইহাতে এক অনাড়ম্বর শান্ত ও সুন্দর বাস্তব জীবনের ছায়াই প্রতিফলিত; এবং ঐশীভাবের সংস্পর্শে মৃত্যুও যে মধুরতা দান করিতে পারে তাহার আভাস পাওয়া যায়। কয়েকটী সহজ ও সরল কথায় পুস্তকের মর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বকালে সকল অবস্থায় সকলের স্মরণীয় হইতে পারে—(১) ভগবান যখন সর্ব্বত্র আছেন তখন হৃদয়ের মধ্যেও আছেন সুতরাং চারিদিকে ছুটা ছুটী না করিয়া তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে খোঁজা ভাল ও সহজ। (২) মনের মধ্যে কোঁচকা থাকিতে ভগবানের দর্শন হয় না। (৩) ধরিব বলিয়া ধরিতে গেলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না; প্রাণ ঢালা ভালবাসা দিলে তিনি আপনিই ধরা দেন। (৪) যদি জ্ঞানকৃত কোন পাপ না কর তোমার কোন বিপদ নাই। (৫) পথ কেবল সদ্‌গুরুই জানেন, চাবি তাহার হাতে; তিনি যদি চাবি খুলিয়া দেন, তবেই জীব মুক্তি পায়। (৬) ব্যাকুলতা থাকিলে সমস্তই হইয়া যায়। (৭) ভগবান একদেশী অথচ সর্ব্বদেশী; যেমন সূর্য্য ও তাহার কিরণ। তিনি জগতের আধার ও আধেয় দুইই। (৮) সংসার ত করিতেই হইবে, মোহাচ্ছন্ন হওয়া দোষনীয়। তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসার করিবে। ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হইবে। (৯) যে কার্য্য দ্বারা আমরা ভগবানের নিকটবর্ত্তী হই, তাহাই পুণ্যকর্ম্ম ও তাহার বিপরীত কার্য্যই পাপ কর্ম্ম। পুস্তকের মূল্য ॥০ আট আনা; প্রাপ্তিস্থান:—শ্রী গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দিগসুই পোঃ, হুগলী জিঃ।

মাস পঞ্জি—পৌষ, ১৩৩৭

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত বি, এন সস্‌মলকে উক্ত জেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধাজ্ঞা করেন কলিকাতা হাইকোর্টের আদেশে তাহা বাতিল হইয়াছে—মাদ্রিদে সামরিক আইন জারি হইল—কাবুলে একটা নূতন সামরিক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য পুরুষসংখ্যা অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা ১৫০০০০০ অধিক—আলোয়ারের মহারাজ মহাসমারোহে লণ্ডন নগরে তাহার রাজত্বের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন—লণ্ডনে পারসীক শিল্পের একটী প্রদর্শনী বসিয়াছে—বর্ত্তমান ভাইসরয় লর্ড আরউইনের স্থানে লর্ড ওয়েলিংডন ভাবী ভাইসরয় নিযুক্ত হইলেন—বারানসীতে নিখিল এশিয়া খণ্ডের এক শিক্ষা সম্মিলন বসিয়াছে; কর্ম্মী নরেশ তাহার উদ্বোধন করিয়াছেন—ভারতের ভূতপূর্ব্ব খ্যাতনামা বড়লাট লর্ড হার্ডিং ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে কলিকাতা আসিয়াছেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব সভায় গভর্ণরের উপর গুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে—প্রেস সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স বা কঠোর আইন পন্থা পুন বহাল রহিল—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ভারত গভর্ণমেন্টের বিশেষ আদেশে কারাগার হইতে মুক্তি পাইলেন—ভারতীয় বিমানবীর মোরাদকেপ টাউনে গমন করিতেছেন পথে যোধপুরে অবতরণ করেন - লণ্ডনে রাউণ্ড টেবিল সভার সমাগত হিন্দু সভ্যগণ পৃথক নির্ব্বাচন প্রথার মুসলমান দিগের দাবীতে স্বীকৃত হইতেছেন বলিয়া জনরব—বোম্বাইতে কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগের মহলে একটী বিশেষ কর স্থাপন হইয়াছে—জাতীয় পতাকা উত্থান ব্যাপারে বোম্বাইতে এক দাঙ্গা হইয়াছে, প্রায় ২৫০ জন আহত—আগামী ১৭ই জানুয়ারী রাজপ্রতিনিধি এসেম্ব্লীতে অভিভাষণ করিবেন—অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণমেণ্ট কোনও বৈদেশিক উপনিবেশিক কে আর স্থান দিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন—ডুবে খনন কার্য্যের অনেকগুলি অতি মূল্যবান পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ভারতের সাধনা

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

[দ্বিতীয় বর্ষ]　　মাঘ—১৩৩৭　　[চতুর্থ সংখ্যা

সাধনারপথে

সংস্কার ও অশিক্ষা

সংস্কারের নামে দেশে এখন এক নূতন দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। দলাদলি একটা বড় কুসংস্কার—দলে পড়িয়া লোককে সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হইতে হয়। এখানে সংস্কারের নামে কুসংস্কারের প্রশ্রয় পাওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু তা বলিয়া সংস্কারের পথ কখনও অবরুদ্ধ হইয়া থাকে নাই। মানুষ উন্নতি চাহে, এজন্য সংস্কারও চাহিয়াছে।

সমাজ একটা চলন্ত বিষয়; আবার স্থিতিবন্তও বটে। এই স্থিতি ও চঞ্চলতার মধ্যে যে বিরোধ সমাজ-সংস্কারকে প্রধানতঃ তাহারই সম্মুখীন হইতে হয়। আবার সমাজে যাহারা রক্ষণশীল তাহারা ইহাতে বিপদ গণে।

সমাজের স্থিতি ও পরিবর্ত্তন জগতের স্থিতি ও বিকাশেরই অনুরূপ। স্থিতি জগতের আধার ভূত সংপদার্থ—মূল দ্রব্য, Being, Reality বা Noumenon—ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু। আর বিকাশ এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকার বিকার বা বিবিধ ব্যাপার,—appearance বা manifestation, phenomenon.

মানুষ জগতের চরম সৃষ্টি, মনুষ্য-সমাজ তাহারই পরিণতি। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি মনুষ্যে জগতের অপূর্ব্ব বিকাশ সংঘটিত হইয়াছে—সত ও অসতের, মূল ও বিকারের সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সৃষ্টির আর সমুদয় পদার্থ স্থিতিতে অবস্থিত; মনুষ্যই কেবল স্থিতিকে বিকাশের

সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে—এ বন্ধনের সাধন তাহার কর্ম্মশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও সুখ-দুঃখের অনুবোধ। স্থিতির সহিত যোগ রাখিয়া জগদ্ বিকাশে সহায়তা দান করিবে—ইহা মানবের বিশেষ অধিকার। এজন্য যে আত্মসমর্পণ তাহা মহাযজ্ঞ, যে প্রচেষ্টা তাহা মহা সাধনা, যে ফললাভ' তাহা পরম সিদ্ধি। আর এই মৌলিক স্থিতি বা সত্যে যে অনুরাগ তাহাই আস্তিক্যবুদ্ধি। এই আস্তিক্যই মানব জগতের মঙ্গলময় বিকাশের হেতু। মানবের সনাতন ধর্ম্ম বা বিকাশের ধারা এই আস্তিক্যের পথে চলিয়াছে। তদভাবে সমুদয় পরিবর্ত্তন, সংশোধন, সংস্কার বা উন্নতি সাধন বিনাশের নামান্তর মাত্র। আদি মানব এই আস্তিক্যের অখণ্ড ভাণ্ড লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন---আর তাহাদের সেই পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন যজ্ঞ-তপস্যা ও সাধনাতে জগতের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, ভারতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সৃষ্টি প্রকরণে (Genesis) তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আর সেই আস্তিক্যবোধই হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রকে চরম জ্ঞান বা বেদ নামের অধিকারী করিয়া রাখিয়াছে। যে তাহা মান্য করিয়া চলে সেই আস্তিক, যে তাহা মানে না সে নাস্তিক। এ আস্তিক্য ঈশ্বরতত্ত্বেরও উপরে অবস্থিত।

ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে---খণ্ড মনুষ্য ও অখণ্ড সমাজে—একটা বিরোধকল্পনা চিরকাল চলিয়াছে। পরিবর্ত্তন ও সংশোধনপ্রার্থী মানবের দৃষ্টি হইতে এ বিরোধ লুকাইয়া থাকে নাই। ব্যক্তির সংস্কার করিব কি সমাজের সংস্কার চাহিব---নিজের সংশোধন করিব কি পরের মার্জ্জন করিব—আত্মপ্রীতিতে মননিয়োগ করিব কি পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিব—ইহা লইয়া সমাজ শাস্ত্রকার গণের মধ্যে যেরূপ বিবাদ রহিয়াছে, জগতের পরিবর্ত্তন, উন্নতি বা বিবর্ত্ত বা ক্রম বিকাশের ধারাতে ব্যক্তির উন্নতি হয় কি জাতিই ক্রমোন্নতির পথে চলে, তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত সমাজে ইহা লইয়া তেমনই বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। তত্ত্বদর্শী ও কার্য্যতঃ ফলপ্রার্থী ভারতীয় সাধকের দৃষ্টিতে এস্থলেও একটী বিশিষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—তাত্ত্বিক জগতের ক্রমবিবর্ত্ত বা উন্নতির ধারায় ভারতীয় দৃষ্টি যেমন জাতিকে গৌণ বা বৈকল্পিক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তির উন্নতিকেই প্রধান ও প্রকৃত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া চলিয়াছে, ব্যবহারিক জীবনে তেমনই ব্যক্তির সংস্কারকেই প্রকৃত ও প্রধান বলিয়া জাতি বা সমাজের সংস্কারকে গৌণ স্থানে রাখিয়া দিয়াছে। একদিকে যেমন সৃষ্টি-স্থিত প্রত্যেক জীব অসংখ্য যোনির ভিতর দিয়া পরিশেষে চরম ও পরম অবস্থাতে গিয়া উপনীত হইয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সফল করে, ব্যবহারিক জীবনে তেমনই লোকের জন্মগত ও প্রাকৃতিক অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন মতে তাহার শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া উন্নতির পথ দৃঢ়তর করিতে হইবে—এজন্য ভারতীয় ব্যবহার শাস্ত্রের সমুদয় প্রচেষ্টা জন্মকাল হইতে সমাজে স্থিতি লাভ করা পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময় যে সম্মার্জ্জন বা সংশোধন ব্যাপারের অনুষ্ঠানবিধি আছে—গর্ভাধান, হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত—তাহাই সংস্কার বলিয়া অভিহিত। ব্যক্তির সংস্কার সাধিত হইলে জাতিরসংস্কার আপনিই হয়। ব্যক্তিই প্রকৃত স্থিতি, জাতি তার বৈকল্পিক সমষ্টি মাত্র। এই স্থিতিকে অবলম্বন করিয়া যে উন্নতির প্রয়াস ও বিধান, তাহাই আস্তিক্যবাদীর সংস্কার। এ সংস্কারে বিরোধ নাই, বিবাদ নাই, পরস্পরের স্বার্থে আঘাত নাই, সুতরাং দলাদলির অবসর নাই—সুতরাং সংস্কারের নামে যে কুসংস্কার জন সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহার আশঙ্কাও নাই।

সংস্কার বলিয়া একালে অনেক কার্য্যই চলিয়াছে—ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি—'এ এক সংস্কারের যুগ' এ ত নিত্য ব্যবহারের কথা। ধর্ম্মসংস্কারের ক্রমবিকাশে ধর্ম্ম আজ জগত হইতে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে—পরমেশ্বর বিষয়ে কোনও ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক বলিয়া প্রচারিত হইতেছে (১)।* সর্ব্বত্র রাষ্ট্রে যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহাতে শাসন সংস্কার সর্ব্বত্র আবশ্যক হইয়াছে ও তাহা যে ভীষণ বিকট আকার ধারণ করিতে যাইতেছে তাহাতে সমাজসংস্কার সর্ব্বত্র আবশ্যক হইয়াছে। যে সমাজ আস্তিক্যের মূল নীতিতে সংগঠিত নহে তাহার এ বিপ্লবে কিছু আইসে যায় না। কিন্তু ভারতীয় সমাজ প্রধানতঃ এই আস্তিক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এ জন্য বর্ত্তমান এই সংস্কারবাদী দলের সহিত ভারতীয় সমাজের বিরোধ ঘোরতম। সংস্কারের কুসংস্কার—আত্মমত প্রতিষ্ঠার অতিমাত্র আকাঙ্ক্ষা, পরমত-অসহিষ্ণুতা, জিঘাংসা প্রভৃতি ঐ সংস্কার-বাদীগণের মধ্যেই তীব্রতম।

অপর পক্ষে অবশ্যই লোকে সংস্কারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া অসার ও অলস ভাবে থাকিয়া নানা সমাজ-ব্যাধির কবলে পড়িয়া অন্যপ্রকার কুসংস্কার সমূহ পোষণ করিয়া চলিয়াছে—ভীরুতা, কাপুরুষতা, অতিমাত্র লোভলালসা-পরবশতা, আত্মপীড়ন অথচ পরপদসেবন প্রভৃতি অতি কদর্য্য জঞ্জাল সমূহ আসিয়া জুটিয়াছে। এক পক্ষ যেমন সংস্কারের নামে উন্মত্ত হইয়া চলিয়াছে, অপর দল সংস্কারের নামে তেমনই শিহরিয়া উঠে। মনে রাখিতে হইবে সংস্কার বা সংশোধন সৃষ্ট জীব মাত্রেরই একান্ত আবশ্যক—পরমার্থ লাভেরই উপায়—ভারতীয় সাধনার পরম মহার্ঘ্য ধন আস্তিক্যবোধকে অবলম্বনকরিয়া সে সংস্কার অবশ্যই সাধন করিতে হইবে।

পণ্ডিত মতিলাল

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর মৃত্যু হইয়াছে—এ ঘটনা দেশবাসী মাত্রকেই বিচলিত করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীকে কেন্দ্র করিয়া আজ ভারতের রাজনৈতিক আকাশে যাঁহারা বিচরণ করিতেছেন, পণ্ডিতজী ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের ন্যায়—স্বাধীন ভারত-যুদ্ধের প্রধান রথী, ভাবী বিজয়ী ভারতী পুত্রগণের সর্ব্বজন-মনোনীত প্রবীণ রাষ্ট্র-পতি। এজন্য গুণের অভাব তাঁহার কিছুই ছিল না; অবস্থা ও অবসর অনুকূল হওয়ার প্রতীক্ষা ছিল মাত্র। বয়স, বিচার, সাহস ও বিচক্ষণতা সকলই তাঁহার অসাধারণ ছিল।

সত্তর বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরিয় সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের এক বংশে মতিলালের জন্ম হয়। ব্রাহ্মণোচিত তেজ ও প্রতিভার সমুচিত অধিকার লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এদেশের মধ্যবিত্ত মেধাবিদ্ যুবকদিগের পক্ষে তখন যশ, অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভের অপূর্ব্ব ক্ষেত্র তখন প্রশস্ত হইয়া উন্মুক্ত হইতেছিল ইংরেজের বিচারাদালতের আইন-ব্যবসায়ে—বিদ্যা ও বুদ্ধির মল্ল-চাতুর্য্যে ধনীকে নিঃস্ব ও দরিদ্রকে হয়রাণ করিবার এমন সুন্দর ক্ষেত্র এ যাবত ভারতে আর কখনও সৃজিত হয় নাই। সেই সময়ে আইন ব্যবসায়ের জন্য কোনও উপাধি পরীক্ষার প্রয়োজন

(১) ইদানীং বঙ্গদেশের একটি বৃহৎ বিদ্বৎসভায় এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল যে—The conception of God is unscientific and illogical প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই বটে।

হইত না—উচ্চ বিচারাদালতের অনুমোদন পাইলেই কেহ উকীলের ব্যবসা করিতে পারিতেন। সে জন্য পণ্ডিত মতিলাল উপাধি পরীক্ষার পাঠ সমাপন না করিয়াই আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন—এবং প্রথমতঃ কাণপুর ও পরে এলাহাবাদের উচ্চতর আদালতে ব্যবসা করিতে থাকেন। প্রতিষ্ঠা ও যশের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর সমগ্র ভাণ্ডার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইল—বিলাস-বিভব অচিরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া লইল। রাজোচিত বাসভবন—'আনন্দ ভবন'—আহার বিহার পরিধান তাঁহার প্রাদেশিক গভর্ণরকেও হীনপ্রভ করিয়া তুলিয়াছিল; ফ্যাসনের পরীনগরী প্যারিস হইতে তাঁহার বস্ত্র ধৌত হইয়া আসিত, শৈলাবাস যাত্রা কালে শত শত চাকর চাকরাণী তাঁহার অনুগমন করিত। স্থানীয় ইংরেজশাসন কর্ত্তারা নিত্য তাহার বাড়ীতে অতিথি হইতেন—তাঁহাদের একজন বলিয়া গিয়াছেন, 'He earns like a prince and lives like a prince.'

কিন্তু এখানেই তাঁহার জীবনসাধনার পরিসমাপ্তি হয় নাই। একালের প্রতিষ্ঠিত ব্যবহার জীবিগণের মধ্যে অনেকে রাজনীতিতে যোগদান করিয়াছেন—এ জন্য যে সুবিধা, সুযোগ ও স্বাধীনতা আবশ্যক, তাহা এই ব্যবসায়ে হইত। মতিলালও রাজনীতিতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধাপে অধিরোহণ করিয়া প্রত্যেক স্থানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন—প্রথমতঃ নরম পন্থী বা ইংরেজের শাসন ও ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাসবান থাকিয়া একজন প্রধান রাজনৈতিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। পরে হোমরুল আন্দোলনেরএকজন নেতা হন; এ পর্য্যন্ত মতিলালের রাজনৈতিক কার্য্যপরতা কেবল যুক্তপ্রদেশেই নিবদ্ধ ছিল; এবং বৃটিশ গণতন্ত্রের মধ্য দিয়াই সমুদয় রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার নির্বৃত্তি করিবেন এই তাঁহার ভরসা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী নির্দ্দেশিত অসহযোগ আন্দোলন ঘোষিত হয়। পণ্ডিত মতিলালের জীবনে তখন অসাধারণ পরিবর্ত্তন ঘটে। তাঁহার মত ভোগী বিলাসী পদস্থ ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অসহযোগে বিশ্বাস স্থাপন ও তদনুকূল সমরায়োজন যে আত্মনিয়োগ করা এ কালের ভারতীয় রাজনীতির সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। এজন্য বিগত দশ বৎসর ধরিয়া তিনি অসাধারণ ত্যাগ দেখাইয়াছেন। একাধিক বার কারাবরণ করিয়াছিলেন; এবং ইহার মধ্যে একাধিকবার জাতীয় মহাসমিতির অধ্যক্ষপদে বরিত হইয়াছিলেন, ব্যবস্থাপরিষদে জাতীয় দলের নেতৃত্বে অসাধারণ শক্তি দেখাইয়াছেন এবং সাইমন কমিশন রিপোর্টের প্রতিপক্ষে ভারতীয় শাসন তন্ত্রের এক সংগঠন বিধির (নেহেরু রিপোর্ট) প্রকাশ করেন, এবং সর্ব্বশেষে জাতীয় কর্ম্মনীতিতে যখন লবণআইনভঙ্গ অনুসৃত হইল, তখন তাহাতেও যোগদান করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

আজ ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এক ঘোরতর সন্ধিস্থলে উপস্থিত। এক বিরাট উদ্যোগ সমাহিত হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধ ও কর্ম্মবৃদ্ধ মহাবীর মতিলাল তাঁহার কর্ম্ম-ভাগ সম্পূর্ণ গৌরবে সমাপন করিয়া পরের অংশ ভবিষ্যতের অনির্দ্দিষ্ট ক্রোড়ে রাখিয়া গেলেন!

সঙ্কটে সন্ধান

এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না—আর এক্ষণে ইহা বলিবার আবশ্যকতাও আছে—যে ভারতবর্ষের যা বৈশিষ্ট্য, তার সাধনার ধারা, সংস্কৃতি বা সভ্যতা, এ যাবত কাল বিদেশীয়

লোকদিগের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বৃটনের সন্তানগণই তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা কম অভিভূত হইয়াছে! অতীত যুগে ভারতের প্রভাব বিদেশে কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল সে কথা এখানে হইতেছে না; যে সকল লোক বিদেশ হইতে আসিয়া এদেশে রাজনৈতিক বা অন্য প্রকারের প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল, তাহাদিগকে ভারত আপনার সভ্যতায় অভিভূত করিয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষী প্রদান করে। মুসলমানের অধিকার বা শাসনকালের পূর্ব্বে যে সকল জাতি ভারতে আসিয়া রাজ্য স্থাপনাদি করিয়াছিল, তাহারা সকলেই ভারতীয় ধর্ম্ম ভারতীয় ভাষা ও ভারতীয় আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সভ্যতার শিল্প সাহিত্যাদির পুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান আক্রমণের প্রথম ভাগে ভারতের স্থানে স্থানে বিবিধ প্রকার উৎপীড়ন ও অত্যাচার হইয়াছিল সত্য; কিন্তু ইহার মধ্যেও সুদীর্ঘ কাল ভারত তাহার সভ্যতা ও সাধনার ভিত্তি অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছিল; এবং তাহাতেই সকল প্রকার বিজাতীয় প্রভাব অতিক্রম করিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম সাহিত্য, শিল্প ও বাণিজ্যের অসাধারণ বিকাশলাভ হইয়াছিল। মুসলমানগণ ক্রমে তাহার প্রভাবে আসিয়া ভারতীয়ই হইয়া গিয়াছিলেন। মুসলমানের রাষ্ট্রসাধনার চরম ফল স্বরূপ সম্রাট আকবর যে সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান তাহা বৌদ্ধযুগের অশোক ও হিন্দুযুগের বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্যের ন্যায় এক অখণ্ড ভারতীয় ভাবমণ্ডিত ছিল। কালক্রমে আওরঙ্গজীব তাহার ব্যতিক্রম করিতে গিয়া ভারতে মুসলমান শক্তির অবসানের সূত্রপাত করেন; তখন তাঁহার সেই রাজ-নীতির বিপক্ষবাদী মুসলমান দিগের সংখ্যাও কম ছিল না—ঐতিহাসিক খাফি খাঁ বলিয়া গিয়াছেন যে আওরঙ্গজেবের সেই হিন্দু-বিদ্বেষী জিজিয়া করের বিরুদ্ধে যে তীব্র বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহাতে মুসলমান ফৌজদারগণও প্রতি জেলাতে হিন্দুদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এই যে ঐক্য তখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার মূল ভিত্তি ছিল এতদুভয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এক ভারতীয় ভাবের জাতীয়তায়। আর একজন মুসলমান ঐতিহাসিক বাদৌনী যেমন বলিয়াছেন যে "বাদশাহ্ আকবর রাজ্যমধ্যে গোবধ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলন ও নিজে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান হোম (যজ্ঞ) করিতেন এবং রাজদরবারে হিন্দু আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন" উত্তর কালের পাশ্চাত্য পর্য্যবেক্ষকদিগের অনেকে সেই হিন্দু প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন বৃটিশ শাসন ভারতের অনেক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন হ্যামিল্টন নামক একজন ইংরেজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—For almost a century past, the Mahomedans have evinced much deference to the prejudices of their Hindu neighbours and strong predilection towards many of their ceremonies. যে হিন্দুভাব তখন বিদেশীয় মুসলমান দিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, অন্তপ্রকৃতি অনুসন্ধান করিলে আজও ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে তাহা দেখা যাইবে। কারণ এভাব হিন্দুর নহে, উহা ভারত ভূমির—দেশেরপ্রভাব ও মানবপ্রকৃতির প্রয়োজন-সম্বন্ধের। হিন্দু যুগযুগান্তর ধরিয়া সে ভাব আয়ত্ত করিয়া লইয়া ছিল; মুসলমান এক যুগে তাহারই অনেকটা অধিকৃত করিয়া লইয়াছিল। আধুনিক যুগের আগন্তুক ইংরেজের পক্ষে তাহা এখনও সম্ভবপর হয় নাই।

ইংরেজ ভারতীয় ভাবকে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে নাই—তাহার প্রধান কারণ সে ভারতকে আপন করিয়া লইতে পারে নাই বলিয়া। মুসলমানের পক্ষে সে অসুবিধা ছিল না। মুসলমানেরও দম্ভ ছিল, ক্ষমতা-প্রিয়তা ছিল, রাজৈশ্বর্য্য-ভোগলিপ্সা ছিল; কিন্তু তাহাকে ভারতে বাস করিতে হইত—ভারতীয়ের সহিত এক সমাজে থাকিতে হইত, ভারতের প্রকৃতির সহিত অন্তর মিশাইয়া চলিতে হইত। আর মুসলমান ভারত শাসন করিত কেবল মাত্র তাহার শূরত্ব বলে, আধুনিক জগতের রাজনীতির তাহাতে স্থান খুব কম ছিল। ইংরেজ এ সকল বিষয়ের বিপরীত পথে চলে—তাহার শিক্ষা দীক্ষা প্রোপেগেণ্ডা প্রভৃতি সকল বিষয়ে ভারতীয় ভাবের প্রতিকূলতা চলিয়া আসিতেছে। এবং যদিও কোন কোন ইংরেজ লেখক ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং এমন কথাও বলিয়াছেন যে,—"if civilization is to become an article of trade between England and India, I am convinced that England will gain by the import cargo—অর্থাৎ ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে যদি 'সভ্যতা' বলিয়া কোনও পণ্যের আমদানী রপ্তানির ব্যবসায় চালান যায়, তবে ইংলণ্ড তাহার আমদানী বা গ্রহণে অধিকতর লাভবান হইবে, রপ্তানি বা দানে নহে" (১)—তবুও কার্য্যতঃ দৃষ্টান্ত কিছুই দেখা যায় নাই। এবং এরূপ স্বীকারোক্তি অন্যান্য বিদেশীয়গণ একালে যেমন করিয়াছেন, ইংরেজের দ্বারা তেমন হয় নাই। বরং রাজনীতি বশে হউক বা অনভিজ্ঞতার জন্য হউক, উহার নিন্দাবাদ অনেক হইয়াছে ও হইতেছে।

আজ এ সকল কথা একটু নূতন করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তাহাতে ইংলণ্ড ও ভারত উভয়েরই কল্যাণ সম্ভাবনা। আজ ভারত লইয়া ইংরেজকে যে সকল কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে,—এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে অসম্ভব বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়াছে—তাহাতে শাসকের পক্ষে শাসিতের সভ্যতা বা সংস্কৃতির, অভাব ও আবশ্যকতার এবং এ সকলের আধারভূত দেশেরই প্রকৃতির সহিত সম্যক পরিচিত না থাকা প্রধান কারণ। সত্যের সহিত সম্বন্ধ না থাকাতে—প্রকৃতের আস্বাদন না মিলাতে—সহানুভূতি স্থান পায় নাই; বিকৃতি ও কৃত্রিমতার প্রসার বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহাতেই অদ্যকার এই বিপদসঙ্কুল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এত শীঘ্রই ইহা উৎপন্ন হইয়াছে যে তাহাতেই এই বিকৃতির পরিমাপ বুঝা যায়।

সংখ্যায় অল্প হইলেও কোনও কোনও ইংরেজ মনীষীর নিকট আজ এ অবস্থা ঈষৎ ধরা পড়িতেছে। 'England and India both think that they have a mission from God. But this does not mean that either one or the other must be wrong. Both may be right They may clash at times; but the clash will only result in a purification of motive and a higher aspiration. Both may have a mission from God. And they may unite. British purposes in India may combine with Indian purposes in India And both my be harmonised with the Divine purpose which is actualising the universe Both may be making towards the Kingdom of God' (Sir Francis Young Husband—Dawn In India)—অর্থাৎ ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়েই ভগবদুদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে

(১) Sir Thomas Munro.

পারে ; কিন্তু সে সংঘর্ষ উপস্থিত মতলবকে পরিমার্জ্জিত করিয়া কোনও উচ্চতর আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করিবে। এতদুভয়ের মিলন অসম্ভব নহে। ভারতে ইংরেজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভাবতে ভারতীয় দিগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সহিত মিলিয়া এক হইতে পারে—আর এই দুই উদ্দেশ্য আবার ভগবদুদ্দেশ্যের সহিত মিলিয়া যাইতে পারে—যাহাতে জগতের ক্রিয়া চলিতেছে। এবং এই ভাবে উভয়ে মিলিয়া জগতে ভগবদ্ রাজ্য সংস্থাপনে অগ্রসর হইতে পারে।

কিন্তু ভগবদুদ্দেশ্যে কোনও জাতির উদ্দেশ্য মিলাইয়া দেওয়া একদিনে হয় না—এজন্য বিস্তর সাধনা আবশ্যক। এবং সে সাধনাতে কোন জাতি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাদ্বারাই তাহার সভ্যতার প্রকৃত পরীক্ষা হয়। ভারতীয় সাধনাতে তাহা কত খানি অধিগত হইয়াছে, সে বিচার করিবার ধৈর্য্য আজ যে সকল ইংরেজের নিকট বা ইংরেজ-শিষ্য ভারতবাসীর নিকট আশা করা যায় তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে। অদ্যকার এই রাজনৈতিক বানচালে অনেকেই অনেক উপায় খুঁজিতেছেন সন্দেহ নাই—কিন্তু সভ্যতার বাণিজ্যে ইংরেজ ভারতীয় পণ্য লইয়া প্রকৃত লাভবান হইতে পারেন বলিয়া আর একজন ইংরেজ মনস্বী যে বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন তাহাতে রাজনৈতিক 'বারগেন' বা দরদস্তরীর কোনও স্থান নাই। উপরিউক্ত উক্তির সমর্থনে আর একজন মনস্বী আরও স্পষ্টতর ভাবে বলিতেছেন—

"The hard and indeed brutal facts of which we hear so much can only be mitigated if Britain and India jontly determine neither to evade nor to be mastered by them, but to ubdue them to a common purpose. If once the spirit of comradeship which still to-day fortunately unites so many individual Indians and Britons, can be extended from the sphere of private relation ship into the realm of public life, it is certain that difficulties now apparently insoluble can be attacked in a manner which will reveal them for what they are—elements and formidable clemeants in the problem, but not the problem it self"—L E Rushbrook Williams.) —অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট দেখিয়াই লেখক বলিতেছেন যে কেহ যেন এ সঙ্কটকে এড়াইতে না যান এবং ইহাতে অভিভূতও না হন। ইহাকে সকলের এক সাধারণ কাজে বা উপকারে লাগাইতে হইবে। আজ ভারতবাসী ও বৃটনবাসীর অনেকের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে সখ্য ভাব বিদ্যমান, উহাকেই আরও বাড়াইয়া এতদুভয়ের জাতিগত সখ্যে পরিণত করিতে হইবে। সে পথে অবশ্যই বিঘ্ন অনেক আছে ; কিন্তু তাহাকে এমন ভাবে অতিক্রম করিতে হইবে যেন তাহার রূপ প্রকাশ পায়। উহাই উপস্থিত সমস্যার প্রধান ভয়ের বিষয় ; সমস্যাটা তেমন ভীষণ নয়।"—এ উদ্দেশ্য অতি সাধু ; উক্তিও অতিশয় প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহার রাজনৈতিক ভাব আরও উৎকট। অদ্যকার এই কঠিন (hard) ও পশুজনোচিত (brutal) ঘটনা গুলিকে উভয় জাতির সাধারণ মঙ্গল উদ্দেশ্যে আনিয়া ফেলিতে অথবা উভয় জাতির মধ্যে কোনও সার্ব্বজনীন বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার জন্য, উভয় জাতিকে যে উচ্চ মানবীয়তার প্রকর্ষের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে তাহা কোন্ জাতির সাধনা সংস্কৃতি বা ভাবপরম্পরার মধ্যে কতখানি বিদ্যমান আছে, অথবা তাহা কোথা হইতে কত খানি পাইবার আশা করা যায়, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

এজন্য মানব প্রকর্ষের যে সত্যসত্যই নূতন বাণিজ্যক্ষেত্র খুলিবার প্রয়োজন—যে পণ্য বিনিময়ের আবশ্যকতা হইয়াছে, তাহা বুঝিবার কি বাস্তবিকই সময় আসিয়াছে ?

বৈঠকের এক পর্ব্ব

গোল টেবিলের প্রথম পর্ব্ব শেষ হইল। প্রকৃত ফল এখনও অনিশ্চিতের গর্ভে ; ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞেরা বলিয়া দিয়াছেন যে "ভারতবর্ষকে স্বশাসনের ক্ষমতাই দেওয়া হইল ; কেবল ভারতকে নিরাপদ রাখিবার নিমিত্ত কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা ইংরেজ রাজপুরুষের হাতে থাকিবে—A constitution for India with responsibility with safeguards." এই পর্ব্বে এখন ইহাই শেষ কথা বা final verdict. কি হইল বা হইবে, তাহা বলা কঠিন। নিরপেক্ষ অনেকেই বলিতে পারেন—'After all the conference has ended not with a settlement but with the plan of a settlement ; for its outlines are general and in its nature it is provisional—বৈঠকে স্থির সিদ্ধান্ত কিছু হয় নাই, সিদ্ধান্তের একটী প্রণালী বাতলান হইয়াছে মাত্র, সাধারণ একটা নক্সা দিয়াছে মাত্র, ইহার প্রকৃতিই অস্থির বা অস্থায়ী রকমের।' ভারতীয় সদস্যগণ মোটামোটি তুষ্ট হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহারা তুষ্ট হইয়াই গিয়াছিলেন এবং তুষ্ট হইয়া আসিতে বাধ্য। কিন্তু এই সন্তোষের কথা তাহারা নিজে বহন করিয়া আনিতে অক্ষম ! কারণ তাহারা জানেন যে দেশে তাহাদিগের কথা লোকে শুনিবে না ; যাহাদিগের কথা শুনিবে তাহারা হাজার হাজার দলে জেলে আবদ্ধ ; আর তাহারা যাহাকে মানিবে তিনি তখনও কারাগারে চরকা কাটিতেছেন !

ইতিমধ্যে কতকগুলি আকস্মিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে—যাহাকে কোন কোন ব্রিটিশ সাংবাদিকও একান্ত নাটকীয় বা Dramatic exhibitions বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—প্রধান মন্ত্রী মহোদয় বৈঠকের অন্তিম অধিবেশনে যে অভিভাষণ করিয়াছেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় প্রজা-শক্তির ক্ষমতা বলবৎ থাকিবে বলিয়া কিঞ্চিৎ ভরসা পাওয়া গিয়াছে। এ দিকে গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর অনুসৃত রাজনীতিতে কিছু পরিবর্ত্তন দেখাইতেছেন—মহাত্মা গান্ধী সহ তাহার গুপ্ত সাক্ষাৎকার ও পরামর্শ হইবে—ভারতীয় রাজবন্দীগণকে বিশেষতঃ কংগ্রেস কার্য্যকারী সমিতিকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। এ সমুদয়ই বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনের সূচনা করিতেছে সন্দেহ নাই। একজন পাশ্চত্য সংবাদসেবীর ভাষায় বলিতে হয়—"About India all is still uncertain. Mr. Gandhi and his leading colleagues in revolt have been let out. There was no other way. They have their freedom and must use it. How far Mr. Gandhi is really free to give a lead only his closest colleagues can know. He and Lord Irwin have already met ; One cannot easily imagine anything more dramatic or less theatrical than such an interview. If between them they save India from experiences of which what we suffered in Ireland were only a small foretaste, a faint premonition, it will not be by the weight of power in either man's hand. Very extraordinary virtues are needed to win through such a crisis to anything like safety"—(Fortnightly Review.)

সন্ধ্যোপাসনা

প্রাণায়াম

প্রাণায়ামের প্রশংসা সর্ব্বত্র। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু না বলিলেও আগ্রহের অভাব হইবে না বলিয়া বোধ হয়। তথাপি ইহা যখন সন্ধ্যার অঙ্গ তখন এখানে কিছু না বলিলে আলোচনার অঙ্গ হানি হয়।

বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া প্রাণায়াম কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং পরে শিরোবেষ্টন করিয়া জল দিতে হয়; ওঁ কারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্ত-ব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্র ভৃগু ভরদ্বাজ বশিষ্ঠ গৌতম কাশ্যপাঙ্গিরসঃ ঋষয়ঃ অগ্নি-বায়াদিত্য-বৃহস্পতীন্দ্র বরুণ বিশ্বদেবা দেবতাঃ গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতী পঙ্‌ক্তি ত্রিষ্টুব্ জগত্যশ্ছন্দাংসি প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতাদেবতা গায়ত্রীশ্ছন্দঃ প্রানায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রী-শিরস প্রজাপতিঋষি ব্রহ্মা-বায়্বগ্নি সূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্রের ঋষি ও ছন্দাদি

প্রত্যেক বেদমন্ত্রই কোন না কোন ঋষিদ্বারা ধৃত বা প্রাপ্ত, এবং প্রত্যেকেরই ছন্দঃ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। প্রাণায়ামের মন্ত্রটি কে কোন অংশের ঋষি ও কে কোন অংশের দেবতা এবং কোন অংশের কি ছন্দঃ তাহাই এই মন্ত্রের উচ্চারণে স্মরণ করা হইয়া থাকে। এখানে প্রাণায়ামের মন্ত্রটি উদ্ধৃত না করিলে বঝিবার সুবিধা হইবে না বলিয়া তাহাও বলিতেছি :—

অর্থ

প্রণায়াম মন্ত্র

(১) ওঁ ভূঃ (২) ওঁ ভুবঃ (৩) ওঁ স্বঃ (৪) ওঁ মহঃ (৫) ওঁ জনঃ (৬) ওঁ তপঃ (৭) ওঁ সত্যং (৮) ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। (৯) ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

(১) ওঁকার বা প্রণবের ঋষি ব্রহ্ম, দেবতা অগ্নি-ছন্দঃ গায়ত্রী এবং ইহার প্রয়োগ সর্ব্বকর্ম্মের আরম্ভেই করিতে হয়।

(১) হইতে (৭)—ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ ও সত্য এই সাতটিকে ব্যাহৃতি বলে। যথা—

অর্থ

ভূর্ভুবঃস্বর্মহর্জনস্তপঃ সত্যমিতীরিতা।
যথাক্রমেণ সপ্তৈতা মহাব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

এই সপ্ত মহাব্যাহৃতির ঋষি হইতেছেন (১) বিশ্বামিত্র (২) ভৃগু (৩) ভরদ্বাজ (৪) বশিষ্ঠ (৫) গৌতম (৬) কাশ্যপ ও (৭) আঙ্গিরস। ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন (১) অগ্নি (২) বায়ু (৩) আদিত্য (৪) বৃহস্পতি (৫) ইন্দ্র (৬) বরুণ ও (৭) বিশ্বদেবা। ইহাদের ছন্দঃ (১) গায়ত্রী (২) উষ্ণিক (৪) অনুষ্টুপ্ (৪) বৃহতী (৫) পঙ্‌ক্তি (৬) ত্রিষ্টুপ্ ও (৭) জগতী। এই মন্ত্র সকলের বিনিয়োগ প্রাণায়াম কার্য্যে হয়।

(৮) এই অংশটি গায়ত্রী মন্ত্র। ইহার ঋষি বিশ্বামিত্র, দেবতা সবিতা, ছন্দঃ গায়ত্রী এবং ইহার বিনিয়োগ প্রাণায়াম কার্য্যে।

(৯) এইটি গায়ত্রী-শির। ইহার ঋষি প্রজাপতি, ব্রহ্ম, বায়ু, অগ্নি ও সূর্য্য এই চারি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং ইহার ছন্দঃ গায়ত্রী। ইহাও প্রাণায়াম কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

মন্ত্র-দ্রষ্টার উল্লেখ কেন

স্থূল বুদ্ধিতে হঠাৎ প্রশ্ন উঠিবে উপাসনা করিতে বসিয়া এরূপ চৌদ্দ পুরুষের নাম আওড়াইবার কি প্রয়োজন। উত্তরে জিজ্ঞাসা করা বোধ হয় দোষের হইবে না—উইলিয়াম কে ছিলেন, তাঁহাকে কঙ্করার কেন বলা হয় এবং কি কর্ম্ম করিয়া তিনি উইলিয়াম দি কঙ্করার হইয়াছিলেন—ইহা জানিবার কি দরকার? ইংলণ্ড বুঝিতে হইলে যেমন উলিয়ামের অস্তিত্ব, তাঁহার ইতিহাস ও যুদ্ধাদি জানিতে হয় তদ্রূপ মন্ত্র বুঝিতে হইলে কে মন্ত্র পাইয়াছিল, মন্ত্রের লক্ষ্যবস্তু কি, ও তাহা কেমন করিয়া উচ্চারণ করিতে হয় এবং কোন কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা না জানিলে লক্ষ্য-বস্তু লাভ হয় না। কালিদাসকে ছাড়িয়াদিয়া যেমন শকুন্তলা নাটকের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন হয়, বিখ্যাত চিত্রকর র‍্যাফেলকে মুছিয়াদিয়া কামদেবের চিত্র-জ্ঞান যেরূপ অঙ্গহীন হয়, তদ্রূপ মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষিকে ছাড়িয়াদিলে, মন্ত্রের অভিন্নদেহ দেবতাকে ভুলিয়াগেলে ও মন্ত্রের উচ্চারণ প্রণালী অবহেলা করিলে উপাসনা হয় না। হিন্দুর কোন কর্ম্মই জোড়া তাড়া দিয়া করিবার ব্যবস্থা নাই। তার সকলটিই পূর্ণাঙ্গ আগাগোড়া বাঁধা। বাঁধন রুচিভেদে ভাল না লাগিতে পারে, বেড়াগুলি তুলিয়া দেওয়া ভাল হইতে পারে কিন্তু গাছগুলি ছাগলে ও গরুতে খাইয়া ফেলে। শেষে মনস্তাপ। ফলে ছুটা ছুটি। **Hurry and worry.**

শব্দের অভিধেয় এক

বেদমন্ত্রের প্রত্যেক অংশ এরূপভাবে গঠিত যে তাহার লক্ষ্য বস্তু এক একটি নির্দ্দিষ্ট দেবতা * তাহার উচ্চারণ ও অর্থজ্ঞান এত প্রয়োজন যে উচ্চারণ শাস্ত্রের মত না হইলে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। যে কোন কাজই করা যায় তাহার নিয়ম বিধান না থাকিলে তাহা সম্পূর্ণ ফলদায়ী ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না এবং তৎকালে অভিষ্ট লাভ ও ঘটে না।

অবিদ্বাংসঃ প্রত্যাভিবাদে নাম্নো

যে ন প্লুতিং বিদুঃ।

কামং তেষু তু বিপ্রোষ্য

স্ত্রীষ্বি বায়মহং বদেৎ।

অর্থাৎ যে মূর্খ ব্যক্তিগণ নাম কথনে প্লুতি (প্লুত উচ্চারণ) জানে না, তাহাদের মধ্যে একজন বেদ উচ্চারণজ্ঞ ব্যক্তি থাকিলে তিনি বলিয়া উঠেন "আমি স্ত্রীলোকের মধ্যে আছি।" (১)

---

* মহেন্দ্র ও ইন্দ্র এক নহেন। বহু দুগ্ধীন্দ্রায় দেবেভ্যঃ। বহুদুগ্ধী মহেন্দ্রায় দেবেভ্যঃ। এরূপ অনেক প্রমাণ আছে।

(১) ইংরাজী বা অন্যান্য ভাষাতেও "accent" এর আদর সর্ব্বত্র। প্রাচীন ভাষা মাত্রেই এই উচ্চারণ-প্রথার আদর বর্ত্তমান।

বেদের ভাষাটি "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো" "তুমি পূর্ণ করিয়া ভরি দিবে তাই রিক্ত হৃদয় বহিগো" ইত্যাদি রূপ স্ত্রীলিঙ্গ সূচক ভাষা নহে। যা তা করে সে ভাষাটি উচ্চারণ করা যায় না। বেদমন্ত্র পাঠে পুরুষত্ব চাই। স্নায়ু ও মাংসপেশীর পূর্ণবল দরকার। পাঠশালে যখন পড়ি তখন "কালি, কাঠা, কুরাণী" বলিয়া কতই না আমোদ করিতাম। এখন দেখিতে পাই সেটা "কালিকা ঠাকুরাণী।" উচ্চারণের দোষে কি উদ্ভট পদ বিন্যাশ হয় ও তাহার কি অর্থ-বিভ্রাট ঘটে তাহার ক্ষুদ্র নমুনা ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার দেখা যায় যখন পুরুষার্থ প্রকাশ প্রয়োজন হয় (যথা ক্রোধোদ্দীপ্ত অবস্থায়) আমরা স্ত্রীজনোচিত ভাষাটি আপনা আপনিই ভুলিয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত পুংজনোচিত অন্য (ইংরেজী বা হিন্দী) ভাষার শব্দগুলির আশ্রয় লই।

বেদমন্ত্রের ভাষা তরল নহে

"দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতোবর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি।"

স্বরদোষ যুক্ত, বর্ণদোষ যুক্ত, মিথ্যা প্রযুক্ত শব্দ, তাহার লক্ষিত অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না পরন্তু অনেক স্থলে বিপরীত অর্থ আনিয়া ফেলে। ফলে যজমানের অনিষ্টই ঘটে।

বেদ দেবভাষায় গ্রথিত। তার সকল দিক বাঁধা ; মন্ত্র আপ্ত ঋষির তপস্যালব্ধ জিনিষ। মন্ত্রের অভিন্ন দেহ তার দেবতা, উচ্চারণ তার প্রধান সাধন। কাজেই প্রত্যেক মন্ত্রের কুলজীটি এবং ছন্দটী স্মরণ করিয়া তবে মন্ত্রটি প্রয়োগ করিতে হয়। ঋষিটি আগে মন্ত্রটি বিশেষ ছন্দে প্রয়োগ করে সিদ্ধ হয়েছেন তজ্জন্য তাঁহার শ্রবণ ও স্মরণ অনিবার্য্য। এই খানেই মধ্যস্থ গুরু তত্ত্ব বা আচার্য্য-তত্ত্ব সূচিত হইয়া পড়ে। সে এক মহা জটিল বিষয়!

মন্ত্র ও উচ্চারণ

ঋষি যে সে নয়। "সর্ব্বে গত্যর্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থা জ্ঞাতার্থা বা" অর্থাৎ বেদ প্রাপ্তি ও তৎ তৎ মন্ত্র প্রতিপাদ্য দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করার জন্য তপোনিষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষকেই ঋষি বলে। অজান্ হ বৈ পৃশ্নীং তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষত দৃষয়োऽভবন্। অতীন্দ্রিয় বেদ-মন্ত্রের প্রথম দর্শন হেতু ঋষিত্ব সিদ্ধ। তাই ভারত ঋষি ঋষি করিয়া, ঋষি প্রণীত শাস্ত্র শাস্ত্র করিয়া আজও গোঁড়া বলিয়া নিন্দিত। সন্ধ্যার সাধক সে নিন্দা মস্তকে বহন করিতে আজও উত্ত্যক্ত হইয়া শ্রদ্ধাবান সুধীগণের দ্বারে ভিখারী।

ঋষি কে

অতিরঞ্জিত, কল্পিত, কদর্থপূর্ণ ও হীন সংকীর্ণতাপূর্ণ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ, উদার ধর্ম্মকে অতিশয় অনুদার ধর্ম্মে টানিয়া আনিয়াছে। সত্যকে অসত্যে ও অসত্যকে সত্যে প্রতিভাত করিতেছে। ইহাই কালের প্রভাব।

"প্রাণাপান নিরোধস্তু প্রাণায়াম উদাহৃতঃ।" অর্থাৎ প্রাণ ও অপান বায়ুর স্তম্ভনকেই প্রাণায়াম বলে। আমাদের শরীরস্থ প্রাণবায়ুকে কার্য্যভেদে হিন্দুগণ পাঁচভাগে ভাগ করিয়াছেন। যথা—(১) প্রাণ, (২) অপান, (৩) সমান, (৪) উদান ও (৫) ব্যান। প্রাণের স্থান হৃদয়, অপানের স্থান গুহ্যে, সমান নাভিদেশে, উদান কণ্ঠে এবং ব্যান সর্ব্বশরীরে। প্রাণের কাজ অন্ন গ্রহণ, অপানের কাজ মূত্র পুরীষাদি উৎক্ষেপন, সমানের কাজ অন্ন পাক করা, উদানের কাজ স্বরাদি উচ্চারণ এবং ব্যানের কাজ নিমেষ কল্পনাদি। আমরা প্রাণায়াম কর্ম্মে

প্রাণায়াম কি

পঞ্চ প্রাণ

প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রাণের কার্য্য অন্ন গ্রহণ অর্থাৎ শরীর রক্ষার জন্য অদন সংগ্রহ করা। ইনি উচ্ছাসের সহিত মুখ ও নাসিকাদ্বারা বাহিরে চলিয়া যান। আর অপান বায়ু নিঃশ্বাসের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিয়া কেমিকেল বা রাসায়নিক কাজ করতঃ ভিতর পরিষ্কার করেন। কাজেই যখন আমরা অপানকে ভিতরে টেনে নিয়ে বন্ধ করি তখন ভিতরে একটা বায়ুস্তম্ভন হয়, (সমান বায়ু) রসায়ন কার্য্যের ফলে অগ্নি বা তাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাপ বৃদ্ধির ফলে রস উৎপন্ন হয়। যথা—

"নিরোধা জ্জায়তে বায়ু স্তস্মাদগ্নি স্ততো জলম্। ত্রিভিঃ শরীরং সকলং প্রাণায়ামেন শুধ্যতি।"

প্রাণায়ামে ফল

প্রাণায়ামের ফলে সর্ব্বশরীর পরিশুদ্ধ হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে যে যেরূপ পোষা সিংহ তাহার প্রতিপালকের অনিষ্ট করে না তদ্রূপ সংযত প্রাণ ও অপানবায়ু যত পাপ সমস্তই নষ্ট করিয়া মানবের দেহটি সুস্থ ভাবে রক্ষা করে। (১) অগ্নিস্পর্শে যেমন ধাতুগণ নির্ম্মল হয় তদ্রূপ ইন্দ্রিয়কৃত পাপদোষাদি সবই প্রাণায়ামে দগ্ধ হইয়া যায়।

পঞ্চভূত ও তাহার স্থান

হিন্দু শাস্ত্রমতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ বায়ু ও আকাশ এই পাচটি মহাভূত। এই পাচের মিশ্রণেই আমাদের দেহের উৎপত্তি আবার পাচের পার্থক্যেই দেহের নাশ হয়। পায়ের তলা হইতে জানুদেশ পর্য্যন্ত পৃথ্বীর স্থান, জানু হইতে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত জলের স্থান, গুহ্য হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত বহ্নির স্থান, হৃদয় হইতে কপাল পর্য্যন্ত বায়ুর স্থান ও ভ্রূর মধ্য হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত আকাশের স্থান।

পঞ্চ তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়

আবার এই পঞ্চ মহাভূতের গন্ধ, রস, রূপ স্পর্শ ও শব্দ ক্রমান্বয়ে এই পাচ তন্মাত্র বা সূক্ষ্মাংশ। ইহাদের গ্রহণ জন্য পাচ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ। হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু বা গুহ্যদেশ ও উপস্থ এই পাচটি দ্বারা আমরা যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করি। পাচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে সকল গুলিই নাভির উর্দ্ধে অবস্থিত যদিও ত্বক্ সর্ব্বদেহ ব্যাপী। পাচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে তিনটি নাভির নিম্নে অবস্থিত বাকি দুইটি নাভির উর্দ্ধে। পৃথিবী বা গন্ধের এবং জল বা রসের স্থান দেহের নাভিদেশের নিম্নে আবদ্ধ। কিন্তু গন্ধ ও রস তন্মাত্র গ্রহণের জ্ঞানেন্দ্রিয় দুইটি (নাসিকা ও জিহ্বা) উত্তমাঙ্গে অবস্থিত।

আসনের ফল

শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ মত আসনে উপবিষ্ট হইলে ক্ষিতি ও আপের যে স্থান তাহার উপর আধিপত্য ক্রমে উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ প্রাণ ও অপানের সংযমনে নাভির নিম্নস্থ সর্ব্বাঙ্গই সংযত হইয়া যায়। তাই এই প্রাণায়ামে তেজ বা বহ্নি স্থান, বায়ু স্থান ও আকাশ স্থান লইয়া চিন্তা।

প্রাণই শ্রেষ্ঠ

যদিও প্রাণটিকে পাচ নামে অভিহিত করা হয় কিন্তু প্রাণটিই মূল অপর চারিটি কার্য্য ভেদে নামভেদ মাত্র। তবে অপান উদান ও প্রাণই প্রধান। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে যখন প্রাণগণের মধ্যে বিবাদ হয় তখন সকলে পরাজিত হইয়া মূল প্রাণকে প্রভু ও শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিয়া বলেন "ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি।" প্রাণোঽগ্নিঃ

---

(১) রসে বৃদ্ধিং গতে নিত্যাং বৰ্দ্ধন্তে ধাতবস্তথা। ধাতুনাং বর্দ্ধনেনৈব প্রবোধো বর্দ্ধতে তনৌ। দহ্যন্তে সর্ব্ব পাপানি জন্মকোট্যৰ্জ্জিতানিচ।

পরমাত্মা পঞ্চবায়ুভিরাবৃতঃ। প্রাণই অগ্নি পরমাত্মা পঞ্চবায়ুদ্বারা আবৃত হইয়া শরীরে বর্ত্তমান। প্রাণকে ও অগ্নিকে পৃথক করা যায় না ইহা সহজেই বুঝা যায়। যখন প্রাণ চলে যান তখন দেহে তাপ থাকে না। কাজেই প্রাণটি তেজোময় ব্রহ্মপদার্থ। এই জন্যই তেজটির নাম অগ্নি অর্থাৎ সকলের অগ্রগামী। দ্বিজ তাই সন্ধ্যায় বসিয়া প্রাণায়াম মন্ত্রে প্রথমেই বহ্নিস্থান নাভি মণ্ডলে সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধাতা ব্রহ্মার চিন্তা করেন। পূরক কালে এই চিন্তা—পূরনে অপানের কার্য্য। প্রাণায়ামে অধোগামী অপান আসন প্রক্রিয়ার ফলে পায়ুর পীড়নে ঊর্দ্ধগামী হইতে বাধ্য হয়েন। এই অপান বাধ্য হইয়া বহ্নির সহিত প্রাণস্থানে মিলিত হয়। (১) তখন মূল প্রাণশক্তি সন্তপ্তা ও আলোড়িতা হইয়া সুষুম্না নাড়ীতে প্রধাবিত হয়েন। এই সুষুম্না নাড়ী হৃদয় হইতে উর্দ্ধে গমন করিয়া মস্তকে প্রবেশ করিয়াছেন। বোধহয় প্রাণায়ামের এই মূল তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণবগণের নিম্নোদ্ধৃত পয়ারটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—

প্রাণই অগ্নি বা তেজ

কেন নাভিতে প্রথম ধ্যান

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥ মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপন। শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেবন॥ উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়। বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥ তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহন॥ তাহা বিস্তারিত হইয়া ফলে প্রেমফল। ইহা মালী সেবে নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জল॥" চৈ চঃ মৃ মধ্য। ১৯।

চৈতন্য চরিতামৃতের ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব

দ্বিজ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া বাম নাসা রন্ধ্র দ্বারা বাতাস টানিয়া লয়েন ও নাভি মণ্ডলে ব্রহ্মার ধ্যান করেন যথা :

ওঁ ব্রহ্মাণং রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্র কমণ্ডলুকরং হংসাসন সমারূঢ়ং ঋগ্বেদমুদাহরন্তং।"

অর্থাৎ ব্রহ্মা রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, দ্বিহস্ত, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধারী, হংসাসনে আসীন ও ঋগ্বেদ উদাহরণকারী। ধ্যানান্তে পূরকের সঙ্গে সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত প্রাণায়ামের মন্ত্রটি (১) ধ্যান করেন। মন্ত্রটির অর্থ এই :-

প্রক্রিয়া পূরক

ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহলোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক এই সপ্তলোকব্যাপী বা সপ্তলোকের প্রেরক যে দেবতা বা পরমেশ্বর তাঁহার যে বরণীয় বা শ্রেষ্ঠ তেজ তাহার ধ্যান করি। ইনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করিয়া থাকেন সুতরাং তাঁহার সেই তেজকে ধ্যান করিতেছি। যা কিছু জল, যা কিছু জ্যোতি বা তেজ,

---

(১) অধোগতিমপানং বৈ উর্দ্ধগং কুরুতে বলাৎ আকুঞ্চনেন তং

অপানে চোর্দ্ধগে যাতে সম্প্রাপ্তে বহ্নিমণ্ডলে ততোঽনিল শিখা দীর্ঘাবর্দ্ধতে বায়ুনাহতা। যতুচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসাবেতাবাভ্যৌ সমং নয়ন্তীতি স সমানঃ

(১) ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ।

যা কিছু রস (মধুরাদি) বা যাহাকে অমৃত বলে এতৎ সমস্তেরই তিনি আদি বাসস্থান এবং ভূ ভুব ও স্ব এই তিন লোকও তিনি। সেই পদার্থই ব্রহ্ম ও প্রণব তার বাচক।

তার পর বাম নাসা-রন্ধ্র অনামিকা ও মধ্যমা দ্বারা বন্ধ করিয়া বায়ু-স্তম্ভন (কুম্ভক) করতঃ হৃদয়ে কেশবের ধ্যান করেন, যথা :—

কুম্ভক

ওঁ কেশবং নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-হস্তং গরুড়াসনসমারূঢ়ং যজুর্ব্বেদমুদাহরন্তং ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রটি।

কেশব নীলোৎপলদল প্রভাযুক্ত, চতুর্হস্ত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, গরুড়াসনে আসীন ও যজুর্ব্বেদ উদাহরণ করিতেছেন।

তারপর দ্বিজ দক্ষিণ নাসা ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে বায়ু রেচনের সঙ্গে সঙ্গে ললাটে শম্ভুর ধ্যান করতঃ মন্ত্রটি স্মরণ করেন। শম্ভুর ধ্যান-মন্ত্রটি এই :—

ওঁ শম্ভুং শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূল ডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভস্থং সামবেদ মুদাহরন্তং। ওঁ ভূ ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি।

শম্ভুর বর্ণ শ্বেত, দ্বিভুজ, ত্রিশূল, ও ডমরুহস্ত, অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিত, ত্রিনেত্র, বৃষভে আসীন ও সামবেদ উদাহরণ করিতেছেন।

প্রানায়াম সবীজ ও অবীজ দুই রকম। সন্ধ্যার প্রাণায়াম সবীজ বা সগর্ভ। পুরক কুম্ভক

প্রকার ভেদ

ও রেচকের স্থিতিপরিমান উপাসকের সাধ্যানুসারে ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে ব্যবস্থিত হয়। আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি ১৬, ৬৪, ও ৩২। অর্থাৎ পুরকে ১৬, কুম্ভকে ৬৪ ও রেচকে ৩২। কিন্তু ব্রহ্ম-মন্ত্রে ইহার পরিমান পুরকে ৮ কুম্ভকে ৩২ ও রেচকে ১৬। সন্ধ্যার প্রাণায়ামে এই নিয়ম পালন করা প্রথমতঃ অতিশয় কঠিন। তাই সচরাচর পুরকে কুম্ভকে ও রেচকে প্রায় একবার করিয়াই প্রাণায়াম মন্ত্র ধ্যান করা হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা ক্রমোন্নত তাঁহারা পুরকে ১ কুম্ভকে ৪ ও রেচকে ২ বার করেন। আরও অভ্যস্ত উপাসক ২,৪, ৮ ; ৪,১৬, ৮; ৮, ৩২ ও ১৬ এইরূপ ধ্যান করিয়া থাকেন। এইরূপ একবার পুরক কুম্ভক ও রেচকের নাম একটি প্রাণায়াম। সন্ধ্যার সময় এই প্রকার অবিরাম ভাবে তিনটি প্রাণায়াম করিতে হয়। দ্বিতীয়বারে দক্ষিণ নাসা রন্ধ্রদ্বারে পূরক ও বাম নাসায় রেচক করিতে হয়।

সমষ্টি বিশ্বে যেরূপ ভূর্ভুবাদি সাতটি লোক আছে তদ্রূপ এই দেহে বা ব্যষ্টি বিশ্বেও সাতটি লোক বা স্থান আছে। যোগাচার্য্যগন তাহা বিশেষভাবে জানিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ষট্‌চক্র ও চক্রাতীত সহস্রার বা মস্তিষ্ক সেই সাতটি লোকের অবস্থিতিকে ব্যক্ত করে। ভূ—মূলাধার

দেহ তত্ত্ব

বা গুহ্যচক্র, ভুব—স্বাধিষ্ঠান বা লিঙ্গমূল-চক্র, স্ব—মণিপুর বা নাভি-মণ্ডল-চক্র, মহ - অনাহত বা হৃদয়-চক্র, জন—বিশুদ্ধাক্ষ বা কণ্ঠদেশ-চক্র এবং তপ—আজ্ঞা বা ভ্রূর-মধ্য-চক্র। সত্য—সহস্রার বা নিরালম্ব পুরী। যোগীগণ তালুতে অর্থাৎ কণ্ঠ ও ভ্রূর মধ্যে ললনা-চক্র, আজ্ঞা চক্রের ঊর্দ্ধে মনশ্চক্র ও সোমচক্র এই তিনটি উপলব্ধি করেন এবং

তারপর নিরালম্ব-পুরী বা অমৃত নিকেতন ইহাই প্রকাশ করেন। আমরা সন্ধ্যার প্রাণায়ামে সাতটি লোক লইয়াই সংশ্লিষ্ট। আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে যাহা আছে তাহা সত্য বা ব্রহ্মলোক তাহার তত্ত্ব গুরুর আজ্ঞা না হইলে জানা যায় না। সেইজন্যই ভ্রূর মধ্যস্থ চক্রের নামই আজ্ঞা-চক্র। এই সপ্তলোক-তত্ত্ব এত গভীর ও দৃঢ় সত্যে প্রতিষ্ঠিত যে হিন্দুর প্রায় সমস্তই এই সপ্তে বিধিবদ্ধ। সাধক প্রাণীকে সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, সূর্য্যরশ্মিকে সাত ভাগে দেখিয়াছেন, শিখাকে সাত প্রকারে দেখিয়াছেন, প্রাণায়াম সাত প্রকার করিয়াছেন, আম্নায় সাতটি, সপ্তস্বর, সপ্ত-ঋষি, সাতটিবার, সপ্ত-পাতাল, সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা, সাত সমুদ্র সাত কুলাচল, সপ্ত পুণ্য নদী, সমুদ্রের জল সাত রকম, পৃথ্বী-গর্ভে সাতটি স্তর, বায়ুর ভিতর সাতটি সার্কেল, গাছের ছালে সপ্তপরদা, কাঠে সাত স্তর, হাড়ের ভিতর সাত পরদা, চর্ম্মে সাত স্তর, মাংসে সাত পরদা, এবং আগুনটিতেও তাই সাতটি শিখা। এবং সাধক সম্প্রদায় বিশেষ সাতটি সিদ্ধাবস্থার পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

আজ্ঞাচক্র নাম কেন

সপ্ততত্ত্ব

ওঁকারই শব্দ ব্রহ্ম। এই সৃষ্টিমধ্যে শব্দ-ব্রহ্ম ছাড়া কোন বস্তু নাই। এই শব্দ ব্রহ্মই অনুপহিত চৈতন্য। কিন্তু ইনি শব্দটি বা তাহার বাচ্যার্থ বস্তুটি নহেন। শব্দটি ও তাহার অর্থটি জড়-পদার্থ। প্রণবটি চৈতন্য পদার্থ। এক অনুপহিত অপর উপহিত। এই দুইকে একত্র করিলে বা সম্বন্ধিত করিলে যে একটি মহানের মহান্ ও ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র বা অণুর অণু পদার্থ হয় তাহাই এই প্রাণায়াম মন্ত্রের অভিধেয় বস্তু।

ওঁকার কি

ব্রাহ্মণঃ "কোশোঽসি" হে প্রণবঃ! তুমি ব্রহ্মের কোশ অর্থাৎ আবরণ স্বরূপ। এই ওঁকার শালগ্রাম শিলার ন্যায় ব্রহ্মের প্রতীক মাত্র।

সত্ত্ব, রজ ও তমের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ব্রহ্ম ছাড়িয়া প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই, আবার প্রকৃতি ছাড়িয়া ব্রহ্ম নাই। উভয়ের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। প্রকৃতি কর্ম্মের মূল, ব্রহ্ম বা চৈতন্য দ্রষ্টা। প্রকৃতি কর্ত্রী চৈতন্য অকর্ত্তা। উভয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিধায় কর্ম্মটি ও কর্তৃত্বটি অব্যাহত। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই "একমেবাদ্বিতয়ং" পুরুষবাদ, আদ্যাশক্তি স্ত্রী বাদ, স্ত্রীপুরুষ একত্ববাদ, স্ত্রীপুরুষ অতীত বা নির্গুণবাদ প্রচারিত। এই পদার্থটীই বৈষ্ণবের বিষ্ণু ও কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণ, শৈবের শিব, শাক্তের দক্ষিণা কালী, সৌরের সূর্য্য, গাণপত্যের গণেশ, আর নিরাকারবাদীর ব্রহ্ম। যোগীর পরমাত্মা। আমাদের নিকট ইনি আপজ্যোতি রস ও অমৃত ভূর্ভুবস্বঃ এই সপ্ত বস্তুর মূলাধার—পরব্যোমে তুরীয়। সন্ধ্যার উপাসক ক্ষুদ্রত্বের ও মহত্বের সমাবেশক। অণুরণীয়ান মহতো মহীয়ান্। ক্ষুদ্র না হইলে যে কোন কাজই হয় না। কাণটি না ধরিলে কণ্ঠটি স্ব অঙ্গে বর্ত্তমান সত্বেও দেখা যায় না। হিন্দু ক্ষুদ্রের উপাসক হিন্দু মহানের উপাসক। হিন্দু ক্ষুদ্র শালগ্রামশিলায় বিশ্বব্যাপী ভগবানকে দেখেন। ক্ষুদ্র ওঁকারটিতে কোটি কোটী সূর্য্য লয় করেন। ক্ষুদ্র মন দ্বারা বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরকে কেনা গোলাম করেন। এরূপ ক্ষুদ্র ও মহতের একত্ব সমাবেশের দৃষ্টান্ত খুঁজিলে তত্ত্বপিপাসুগণ হিন্দুরপূজাপদ্ধতির মধ্যে অনেক পাইবেন।

প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধ

নানা মতের একত্ব

বৃহৎ ও অণু

জীব মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চের দ্বারা কোন কাজ করে না। তার রস

নাভিটি আগে কেন

গ্রহণ ও পুষ্টি নাভি নাড়ী দ্বারা সম্পাদিত হয়। আবার যে দিন প্রাণান্ত হয় সে দিন শবের নাভি অংশটি শেষ থাকে। সকল অংশ ভস্মসাৎ করা যায় কিন্তু নাই-কুণ্ডটিকে ভস্মে পরিণত করা বহু কষ্ট সাধ্য এমন,কি অনেক সময় তাহার শেষ আমরা গঙ্গায় ফেলিয়া দিই। তাহা হইলে জীব জন্মিলে নাভি ধরে পুষ্টি পায়, আবার চলে যাবার পরও নাভিটি প্রধান থাকে। এই তত্ত্বের মূল দেখিতে হইলে আমাদের সেই অনন্ত শয্যায় নারায়ণের চিত্র স্মরণ করিতে হয়। নারায়ণের সর্ব্ব অঙ্গ ছাড়িয়া নাভি কমল হইতে বিধাতা বা ব্রহ্মার জন্ম। ব্রহ্মা রজোগুণের মূর্ত্তি। রজোগুণেই সৃষ্টি কর্ম্ম। অন্ন বিনা প্রাণ থাকে না। অন্নই ব্রহ্ম। যে কোষ্ঠাগ্নি আমাদের এ চতুর্ব্বিধ অন্ন বা আহার্য্য দ্রব্য পরিপাক করেন তাঁহার স্থান নাভিদেশে। এই অগ্নিকে গার্হপত্য নাম দেওয়া হয়; কেন না ইনিই গৃহ-পত্তনের বা সৃষ্টির মূল। শাস্ত্রে কথিত আছে যে নাভির অধোদেশে ব্যাপ্ত এই অগ্নির অংশ বিশেষ (প্রায়শ্চিত্তীয়) ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক তিন পত্নীর সাহায্যে সন্তান উৎপত্তিরূপ কার্য্য সম্পাদন করেন। কাজেই নাভিই রজোগুণের বা সৃষ্টির মূল। তাই সন্ধ্যার উপাসক নাভিদেশে ব্রহ্মার ধ্যান করেন। ব্রহ্মার মূর্ত্তিটি আপাততঃ

মূর্ত্তি কল্পিত নহে

কল্পিত বোধ হইলেও উহা প্রকৃত প্রস্তাবে জল্পিত নহে। যোগীগণ ঐ মূর্ত্তি নাভিপদ্মে প্রত্যক্ষ করেন। ঐ রূপ কেন এবং উহার বর্ণ লাল কেন তাহার তত্ত্ববিষয় সন্ধ্যার আলোচ্য নহে। যোগাচরণ বা প্রাণায়াম আচরণ না করিলে সে তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। হংস বা অজপা তত্ত্বের সহিত এই প্রাণায়াম তত্ত্বের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। প্রবন্ধ সমাপন কালে পরিশিষ্টে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করিবার ইচ্ছা রহিল।

সত্ত্বগুণে পালন বা স্থিতির কার্য্য সম্পাদিত হয়। তজ্জন্যই কেশব কে পালন কর্ত্তা বলা হয়। অধুনাতন বিজ্ঞানবিদ্ গণের নিকট জানা যায় যে শ্বাস গ্রহণে বাহিরের অক্সিজান বায়ু

হৃদয় দ্বিতীয় স্থান কেন

ভিতরে গিয়া রসায়ন কার্য্য করিয়া শরীরাভ্যন্তরে কারবন উৎপাদন করে ও সেই কারবন বায়ু প্রশ্বাসের সহিত বাহিরে আইসে। শরীরের ক্ষয়িত অংশ প্রচুর পরিমাণে প্রশ্বাসের সঙ্গে বহির্গত হইয়া যায়। অতএব শ্বাস ও প্রশ্বাস যত কম হইবে ততই শারীরির ক্ষতি কম হইয়া থাকে। আবার ক্ষয় হইবা মাত্রই অব্যাহত প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার পূরণ চেষ্টা তৎক্ষণাৎ আরম্ভ হয়। চেষ্টা মানেই চঞ্চলতা। শরীরাভ্যন্তরে চঞ্চলতা আসিলেই মনটি চঞ্চল হইয়া পড়ে। মন চঞ্চল হইলেই বুদ্ধিটিও চঞ্চল হইতে বাধ্য। অথচ এই বুদ্ধিটিতেই চৈতন্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। কাজেই চঞ্চল বুদ্ধিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হইবার সুযোগ পায় না। যেমন ঢেউ পূর্ণ সলিলে সূর্য্য-বিম্ব পড়ে না। যা পড়ে তা শতধা বিচ্ছিন্ন। সূর্য্যটি ঠিক দেখা যায় না।

শাস্ত্রমতে জীব ট চিচ্ছায়া। এই জীবের স্থান হৃদয়ে। এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। "তস্মিতদেব নিরুক্তং হৃদায়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়ং" হৃদি অয়ং আত্মা ইতি। আত্মা-হৃদয়ে আছেন বলিয়াই ইহার নাম হৃদয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে "ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি" এই আত্মা ও প্রাণটি একই বস্তু। কণ্ঠ দেশের নিম্নে যে সকল যন্ত্র ভগবান স্থাপনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে হৃদয় ও ফস্ ফুস্ সর্ব্বপ্রধান। হাত, পা, জননেন্দ্রিয় ও পায়ু প্রভৃতি যদি না থাকে বা ইহাদের কার্য্য বন্ধ থাকে তাহা হইলেও জীব বেঁচে থাকে। কিন্তু ফুসফুসের কার্য্য বন্ধ হইলে বা হৃদয়টি কাজ না করিলে তৎক্ষণাৎ জীবন যায়।

যদিও ফুস্‌ফুস্‌ কাজ না করিলে জীবন তৎক্ষণাৎ যায় না। পরন্তু হৃদয়টি বিকল হইলেই মৃত্যু। এভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় হৃদয়ই জীবন রক্ষার প্রধান যন্ত্র। এই হৃদয়ই জীবকে প্রতিপালন করিতেছে। তাই যোগীগণ এই হৃদয়চক্রে জীবত্মাকে নির্ব্বাত দীপ কলিকার ভাবে পরিদর্শন করেন। এই স্থান বায়ুদ্বারা আহত হয় না বলিয়া এর নাম অনাহত চক্র। ইনি প্রাণকে পালন করেন বলিয়া এই স্থানে কেশবের ধ্যান সন্ধ্যার উপাসক করিয়া থাকেন। পাঠক মহোদয়গণ লক্ষ্য করিবেন এখানে সাম্প্রদায়িক—"বিষ্ণু" নামটি নাই বিষ্ণু শব্দটিই সমষ্টি বাচক। ছোট বস্তুর কথা তাতে নাই।

কুম্ভকে বায়ু বন্ধ থাকায়, ক্ষয়ের অবকাশ কম হয় এবং এই বায়ুস্তম্ভনের যত প্রসরণ ঘটে ততই ক্ষতিপূরণ জন্য যে চাঞ্চল্য বা কর্ম্ম চেষ্টা তাহার হ্রাস প্রাপ্তি হয়। বায়ু সমতা পাইলে মন ও বুদ্ধি স্থির হয়। ধীপয়োধি জলে প্রাণস্থ প্রাণের পূর্ণ বিম্বটি প্রতিভাত হয়। তজ্জন্যই মেধার এত প্রশংসা হিন্দুগণ করিয়া থাকেন। "সমেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু" "ধিয়ো য়োনঃ" প্রচোদয়াৎ" এখন বুঝা যায় কুম্ভকে কেন পালনমূর্ত্তি কেশবের ধ্যান করিতে হয়। ধী শক্তিই জীবের প্রধান প্রাপ্তব্য বিষয় ও তাহাই প্রেষিতব্য; কেশবের নীলবর্ণ মূর্ত্তিটীও কল্পিত নহে। উহা কুম্ভক যোগী হৃদয়ে দেখিয়া থাকেন। এই সূত্রে তিব্বতীয় লামাদের কথা একটু বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

তিব্বতীয় লামার আচরণ ও সিদ্ধি

তিব্বতীয়গণ যাহাকে লামা বা মঠের প্রধান আচার্য্য করিব বলিয়া উপদেশ পায় তাহাকে কিশোর বয়স হইতে গঠিত করে। কিশোরকে প্রথমে তাহারা একটি গৃহে বন্ধ করে। প্রথম প্রথম ৫।৬ মাস সেই ঘরের একটি দরজা বা জানালা রাখে। কিশোরকে উক্ত কয়মাস কিছু কিছু আহার ও পানীয় দেয়। ক্রমে তাহার পরিমাণ হ্রাস হয় ও তৎফলে মলমূত্রও কমিয়া আইসে। যখন আর আহারের দরকার হয় না তখন দরজা বা জানালাটি একবারে বন্ধ করিয়া দেয়। সেই অবস্থায় সেই ব্যক্তি আহার ইত্যাদি বিনা দীর্ঘ কাল থাকিয়া যায়। তার পর সিদ্ধ হইলে নির্দ্দিষ্ট কাল পরে সেই ব্যক্তিকে বাহিরে আনে ও সেই পুরুষ জাতি স্মরত্ব লাভ করিয়াছেন ইহা প্রমাণ হইলে তাঁহাকে লামা বলিয়া প্রচার করে; যদিও এখন এরূপ ঘটনা কমই হয় তবুও এরূপ আছে। এখানেও সবইন্দ্রিয় বিষয় হইতে বিরত হইলেও জীবন থাকে ও সাধন বলে লামা দীর্ঘজীবী হয়েন। এ সব প্রত্যক্ষ জিনিস পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান মাটি কাদা লইয়া উন্নত আর মনোবিজ্ঞান সূক্ষ্মতর দ্রব্য লইয়া মোটা চক্ষের বাহিরে কাজ করিয়া প্রায় মৃত্যুজয় করে। মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবারে হরিদাস সাধুর ইতিবৃত্তও স্মরণ করা উচিত।

তমোগুণে লয় বা বিনাশ শম্ভু বা শিব তজ্জন্যই লয়ের দেবতা। সৃষ্টিতত্ত্বে দেখা যায়

লয় তত্ত্ব

কোনও জিনিসই এক অবস্থায় স্থির থাকে না। জন্মে বাড়ে ও ধ্বংস হয়। কুম্ভক বা পালনের পরই রেচক বা ধ্বংসের আরম্ভ। যে বালকপ্রাণ সকালে ছুটাছুটি করিয়া যৌবনে পূর্ণ কুম্ভকে সুখভোগ করে সে পরিণামে সমস্ত গুটাইয়া নিদ্রার কোলে যাইতে চায়। তাই কণ্ঠস্থ উদান বায়ুর সাহায্যে প্রাণ উর্দ্ধে উর্দ্ধে যায় ও ভ্রূর মধ্যে শম্ভুর শ্রীচরণে মিলিত হয়। "উদানমূর্দ্ধগং কৃত্বা প্রাণেন সহবেগতঃ উর্দ্ধংযাতি।" শব্দই তন্মাত্রের শেষ বস্তু। এই শব্দ বিশুদ্ধের উপরে যায় না। এই জন্যই যোগশাস্ত্র এই বিশুদ্ধাখ্যকে

নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়জ, মধ্যম ধৈবত ও পঞ্চম এই সপ্তস্বরের আদি বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বিশুদ্ধের উপেরে যাহা পাওয়া যায় তাহার সহিত তন্মাত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। তন্মাত্রের বীজ বা রজ ও সত্ত্বের ভস্মটুকু লইয়া আজ্ঞাচক্রে শম্ভুর পায়ে মাথাইয়া দেওয়া হয়। "আভ্রূমধ্যাত্তু মূর্দ্ধান্তমাকাশ স্থানমুচ্যতে" ভ্রূবর মধ্য হইতে মস্তক পর্য্যন্ত আকাশ বা পরব্যোম। এই স্থানটিতে সেই সর্ব্বভূষণ ভূষিত ও সর্ব্বকারণ কারণ সদাশিব অবস্থান করেন। তাই ভ্রূর মধ্যে তাঁর পদ চিন্তা—। কিন্তু সন্ধ্যার উপাসক সে চরণে পোঁছেও তৃপ্তি নহেন। তিনি "ভ্রুবোর্মধ্যং তু সংভিদ্য যাতি শীতাংশু মণ্ডলং" শ্রীচরণ ছাড়িয়া তিনি উত্তমাঙ্গে চলিয়া যান—সেখানে আপ, জ্যোতি, রস ও অমৃত প্রভৃতি সকলের মূলকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রুত্যোক্ত "ব্রাহ্মণা যে মণীষিণঃ" হইতে চাহেন। নাদ, বিন্দু, কলা, ও কলাতীত প্রণবের এই শেষ চারি অংশও তিনি দেখে নিতে যান। এক পাদ (নাদটুকু) নিয়ে ক্ষুদ্র ধনীর মত ক্ষুদ্রাধিকারীর মত তিনি তৃপ্ত নহেন। মহৎ অধিকারী হয় শ্রেষ্ঠ হইতে চাহে না হয় ক্ষুদ্রই থাকিতে ভালবাসে। সে মধ্য স্থানে তৃপ্ত হইতে পারে না। "ব্রাহ্মণাঃ যে মণীষিণঃ" ক্ষুদ্রাধিকারী ছিলেন না। সন্ধ্যার এই প্রাণায়াম মন্ত্র ও তাহার সাধনা এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। সন্ধ্যায় উপাসকের নিকট বিশ্ব একেরই বিকাশ—। আবার সেই বিরাটই অনুর অনু। তার উপাসনার পদ্ধতি তাই সমষ্টি ও ব্যষ্টি বিশ্বকে ব্যাপিয়া করার নিয়মে আবদ্ধ। সে বেশ জানে—

(১) যৎইহাস্তি তদন্যত্র যৎ নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।

(২) অথাস্য পুরুষস্য চত্বারি স্থানানি ভবন্তি নাভির্হৃদয়ং কণ্ঠং মূর্দ্ধেতি
তত্র চতুষ্পাপাদং ব্রহ্ম বিভাতি।

(৩) য দেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥

(৪) স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥

যা বিশ্বে আছে তাহাই দেহে আছে যা দেহে নাই তা বিশ্বেও নাই। যা এখানে তাহা অমূত্র বা পরলোকেও তাহা। পরলোকে যাহা ইহলোকেও তাহা। যে এরূপ জানে না তার জন্ম-মরন অনিবার্য্য। দৃষ্ট বিশ্ব, অতীত বিশ্ব ও ভবিষ্যৎ বিশ্ব সবই তিনি। এইটিই যে জানে সেই নিঃশ্রেয়স পায় অন্যপথ নাই। ইহা বাহ্মণ বাক্য ইহা ঋষি বাক্য। নির্বীর্য্যকারী গতিপণ্ড ধর্ম্মপথের জন্য লালায়িত অধম অধিকারীর ইহা বোধগম্য নহে। বেদের তত্ত্ব জানিতে হইলে পুরুষ হইতে হয় পুরুষার্থ কান্না নহে। কম্পন নহে। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, ভৃগু ও ওর্ব্ব, জমদগ্নি ও জামদগ্নি, দ্রোণ ও অশ্বথামা প্রভৃতি তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

ইতিহাসে আছে যে যখন সৌভূতির প্রতারণায় পুরুরাজ বন্দী হয়েন তখন মহাবীর অলিকসন্দর প্রথমে সৌভূতিকে বলেন "তুমি কি চাও" সৌভূতি কুকুরের ন্যায় তোষামুদী করিয়া কৃপা চায়। আর পুরুরাজ বলেন "তিনি রাজার মত ক্ষত্রিয়ের মত সম্মান চাহেন।" মহানের চরিত্রই পৃথক—অলিকসন্দর সৌভূতিকে পদাঘাত করিতে বাকী রাখেন আর পুরুকে কোলে করেন।

সেই অলিক্সন্দর আবার ভিখারী দণ্ডির নিকট হুকুম পাঠান দণ্ডী গর্ব্বের সহিত বলিয়া পাঠান অলিক্সন্দর ভিখারী—দণ্ডী কৃপার্থী নহে। প্রয়োজন হয় অলিক্সন্দর দণ্ডির নিকট আসিতে পারেন। এখানেও মহত্ত্ব-অলিক্সন্দর উপঢৌকন লইয়া দণ্ডীর নিকট বৃক্ষতলে উপনীত হয়েন। দণ্ডী উপঢৌকনের মধ্যে ঘৃতটুকু গ্রহণ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে অলিক্সন্দরের সম্মুখেই ঢালিয়া দেন। বাকী সব ফেরৎ লইয়া যাইতে আদেশ করেন। এ সব কথা তথাকথিত 'ভগবৎ-প্রেমের" ভাষায় মুগ্ধ লোকের বোধগম্য নহে। এটা বুঝিতে ব্রহ্মচর্য্য পুষ্ট স্নায়ুর প্রয়োজন। প্রেম কেবল রোদনে নিবদ্ধ নহে। এরূপ নিবদ্ধতায় পরমার্থ প্রাপ্তির পক্ষে সুবিধা হয় না। হিমালয়ের একটা শৃঙ্গে উঠিলে দেখা যায় আরও উচ্চতর অনেক শৃঙ্গ আছে। প্রেমটা একটা কিম্ভূত কিমাকার অশ্ব ডিম্ব নহে! সেটা মেঘের মধ্যে যেমন বজ্র—প্ল্যাটিনাম ধাতু নির্ম্মিত নলের মধ্যে যেমন যতদূর সম্ভব "কম্প্রেষ্ট বায়ু" এ তদ্রূপ মেধা নাড়ীর মধ্যে নিবদ্ধ অমিত তেজা একটা পদার্থ। তার "পাওয়ার" অনন্ত "ভোল্ট"। একটু আধটু ভোল্ট নিয়ে জগতকে বিদ্যুত বা রসময় করে দেওয়া যায়। (ক) জল গড়িয়ে কেবল পায়ের নীচের মাটি ভিজিয়ে দেয় না। সূর্য্যটা কেঁদে কেঁদে ব্রহ্মাণ্ডকে প্রেম করে না—আগুনটা কেঁদে কেঁদে সকল পদার্থকে আপনার আকারে মিশিয়ে নেয় না। সূর্য্য জ্যোতিতে জ্বালায় আগুণ তাপে পোড়ায়। জল ও তাপে বিরুদ্ধ সম্বন্ধ। প্রেমতত্ত্বটি কান্ত প্রেমে—কামের ছায়ায় নিবদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণ—বশিষ্ট, ব্রাহ্মণ—ভৃগু, বিশ্বামিত্র—নারদ এদের প্রেম সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র লইয়া। তাই ব্রাহ্মণ এত বড় এত মহান্। দেবচিত্রে বা মহাত্মাদের চিত্রে জ্যোতি প্রকাশক যে মণ্ডল দেখায় সে জ্যোতি প্রেমের বা আকর্ষনের। মহাত্মাদের সে মণ্ডলের মধ্যে পড়িলে জলটা থাকে না। জলের মণ্ডল না দেখিয়ে তাই দেবচিত্রে জ্যোতির "মণ্ডল" দেখান হয়। মহাত্মাদের কাছে গেলে তাই গাটা জলে ভেসে যায় না, তবে যদি রোদন কখন দেখা যায় তাহা নিজ দুঃখে বা ক্ষুদ্র স্বার্থের যাজ্ঞায়। ভিতরে কি একটা ধপ করে জলিয়া উঠে যেটা আঁধারে ঢেকেছিল সেটা আলোকিত হয়। শক্তিমান গুরু "জল" সঞ্চার করিয়া দীক্ষা দেন না পরন্তু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরাইয়া ও ভ্রূর মধ্যে শিষ্যের নেত্র আবদ্ধ করাইয়া "তেজ" সঞ্চার করেন। মহাদেব চক্ষের জলে কাম ধ্বংস

ভগবৎ প্রেম কি

(ক) এই সূত্রে দু একটি ঘটনার সংক্ষেপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিব্বতের লিংমোথাং নামক স্থানের অনতিদূরে এক পর্ব্বতের উপরে এক মঠ আছে তথায় কোন সময় এক ধনী যক্ষ্মারোগী কৃপা প্রার্থী হইয়া গমন করেন। মঠস্থ মহাত্মা আদেশ করেন যে মঠে উক্ত রোগী কিছু বেশি অর্থ দান করিলেই তার জ্বালার শেষ হইবে। রোগী অর্থ আনিয়া দান করিবার পর মহাত্মা তাহার মস্তকে নিজ হস্ত অর্পণ করিবা মাত্র রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং সে আর দেহে ফিরিয়া আইসে নাই।

এক ব্রাহ্মণ একটি নিরাশ্রয় ব্রাহ্মন বালককে আশ্রয় দেন। সেই বালক ঐ ব্রাহ্মণের শক্তিতে এত আক্রান্ত হয় যে দেখা গিয়াছে পুতুল নাচের পুতুলের মত সেই ব্রাহ্মণ তর্জ্জনী ক্ষেপণে সেই বালককে নাচাইতেন।

আর এক সময় এক মহাজন একটি স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা করিবার কালে সেই স্ত্রীলোককে ইচ্ছা- মাত্র পাগল করিয়াদেন এবং কার্য্য সাধনা হইয়া গেলে আবার তাহাকে সুস্থ করেন। সে পরে আবার গৃহস্থের আদরের বধূ হয়।

সিদ্ধমহাপুরুষগণ দীক্ষা দেবার পর শিষ্য প্রায় জ্ঞান হারাইয়া অভিভূত অবস্থায় দুই হইতে ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবস্থান করে।

করেন নাই তাহার ভ্রূর মধ্য হইতে তেজোশিখা বহির্গত হইয়া কাম বা সৃষ্টিবীজকে ধ্বংস করিয়াছিল। আমরা ক্রোধদীপ্ত হইয়া কেঁদে কেঁদে জল ঢেলে রাগের প্রকাশ করি না পরন্তু ভ্রূকুটী কুটীল নয়নে তেজ প্রকাশ করি। চণ্ডী ভ্রূকুটী ভীষণাননা হইয়াই শুম্ভ ও নিশুম্ভাদির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কান্না ক্ষিতি ও অপে নিবদ্ধ—ক্ষিতি ও অপ নাভি বা তেজ স্থানের নিম্নে অবস্থিত। ব্রাহ্মণ নাভি হইতে সাধনা করেন। কাজেই কান্না নাই।

হিন্দুর উপাসনা উপন্যাস নহে। শাস্ত্রবাক্য কল্পিত নহে। ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষ করিলে তবে এর সত্য প্রতিভাত হইবে। ব্রাহ্মণ অমর তাঁহারাই দিক্‌পাল তাঁহারাই পিতৃলোক—তাঁহারাই ইদাননীন্তন কালের "স্পিরিচুয়াল" জগতের বাসীন্দা মহাত্মা। পবিত্রতা ও শ্রদ্ধার সহিত বিধি ও নিষেধ মানিয়া সন্ধ্যার আচরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাঁহারা কে "কি চাও" "কি চাও" বলিয়া সর্ব্বদাই জীবের অন্তঃকরণে কথা বলিয়া যাইতেছেন। অতীন্দ্রদেশের খবর অন্তঃকরণের কলে "সিগনেল" হইতেছে। ইহাতে অবিশ্বাস না করিয়া আচরণ করিলে ভিতরের কলকব্জা পরিষ্কার হয় এবং তখন কলে খবর গুলি ধরা যায়। সে সংবাদ অভ্রান্ত সত্য প্রকাশ করে।

শিক্ষা ও স্বধর্ম্ম

শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়, এম্, এ

প্রাকৃত জগতের ক্রমবিকাশে পশুর স্তর হইতে যে মানুষের বিকাশ হইয়াছে, ইউরোপ এই মানুষকেই সৃষ্টির চরম কথা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। মানুষের মধ্যে পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয় ভোগের শক্তি আছে, আবার মানুষের মধ্যে মনবুদ্ধির যে ক্রিয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহাতে মানুষ পশুদিগের উপরে। অতএব, মানুষ অর্দ্ধেক পশু অর্দ্ধেক মানব। মানুষ যে আর ইহার উপরে উঠিতে পারে ইউরোপের সে ধারণা নাই *। এই অর্দ্ধমানব অর্দ্ধপশু মানুষের যে সব শক্তি আছে, দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এই সবের যথাসম্ভব বিকাশ ও ভোগই ইউরোপীয় আদর্শ এবং ইহাই তাহাদের শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু, ভারত দেখিয়াছে যে মানুষ বর্ত্তমানে যে মানবতা ও পাশবিকতার সংমিশ্রণ ইহাই তাহার চরম সত্য নহে, মানুষ এই অবস্থা ছাড়াইয়া অর্দ্ধমানুষ, অর্দ্ধদেব হইতে পারে, দেবত্ব লাভ করিতে পারে, এমন কি ভগবানের সহিত এক হইতে পারে। কারণ মানুষের যে মূল সত্তা তাহা কোন জড় শক্তি নহে, তাহা ভগবানেরই অংশ, ভগবানেরই আধ্যাত্মশক্তি। ভারতীয় মতে প্রাকৃত জগৎ জড় নহে, উহা আধ্যাত্ম শক্তির সৃষ্টি। জড়জগৎ বলিয়া যাহা প্রতিভাত হয় তাহা কেবল সেই আধ্যাত্মশক্তির একটা নীচের খেলা, বাহিরের রূপ মাত্র। মানুষও জড়প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত দেহ, প্রাণ মনের সমষ্টিমাত্র নহে এবং চিরকাল জড়প্রকৃতির অধীন থাকিতে বাধ্য

* ইউরোপে নীট্‌শে প্রভৃতি যে অতিমানবের Superman) কথা বলিয়াছেন, তাহা মানবত্বকে ছাড়াইয়া যাওয়া নহে, পরন্তু মানুষেরই শক্তির উচ্চতম বিকাশ করা।

নহে, মানুষ আত্মা। মানুষ দেহ, প্রাণ মনকে আত্মার আত্মপ্রকাশের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছে, আত্মবিকাশ করিয়া মানুষ জড়প্রকৃতিকে জড় করিতে পারে, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে, অর্দ্ধপশু অর্দ্ধমানব জীবনকে রূপান্তরিত করিয়া দিব্য জ্যোতির্ম্ময় আনন্দময় দিব্যজীবন লাভ করিতে পারে। ইহাই ভারতীয় সাধনার আদর্শ এবং মানুষ যাহাতে ক্রমশঃ এই আদর্শ জীবন লাভ করিতে পারে সেই অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করাই ভারতের জাতীয় প্রকৃতির উপযোগী শিক্ষা।

সেই শিক্ষার স্বরূপ কি? কি ভাবে শিক্ষা দিলে মানুষ ক্রমশঃ এই অর্দ্ধপাশবিক মানব-জীবন ছাড়াইয়া দিব্য ভাগবত-জীবন লাভ করিতে পারিবে?

প্রাচীন ভারতে কিরূপ শিক্ষা প্রচলিত ছিল তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় শিক্ষা বলিতে শুধু একপ্রকার পদ্ধতিই বুঝায় না। যুগে যুগে জাতীর জীবন বিকাশের প্রয়োজনের যেমন বিভিন্নতা হইয়াছে, শিক্ষার পদ্ধতিও সেই অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে শিক্ষাপদ্ধতি সকল সময়েই এক রকম ছিল না। বৈদিক যুগে যখন ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হইতেছিল, ভারতবাসী আধ্যাত্মজীবনকে মানবজাতির পরমপুরুষার্থ বলিয়া দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিতেছিল, তখন আধ্যাত্মিকতার বিকাশ করা এবং নৈতিক চরিত্র গঠন করাই ছিল শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য এবং বেদকে কেন্দ্র করিয়াই এই শিক্ষা দেওয়া হইত। গুরু ছিলেন আধ্যাত্মসাধনাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাঁহার ব্যক্তিগত সংস্পর্শে শিষ্যের আধ্যাত্মজীবন গড়িয়া উঠিত। আমরা উপনিষদে এইরূপ শিক্ষা প্রণালীর পরিচয় পাই।

কিন্তু, কালিদাসের যুগে শিক্ষা শুধু আধ্যাত্মসাধনা ও বেদেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতে শিক্ষা বলিতে যেমন জীবনের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, কালি-দাসের যুগেও শিক্ষা ছিল তেমনি বহুমুখী। সে-যুগে স্ত্রীলোকদের শিক্ষার যে বিরাট ব্যবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঐ যুগে ৬৪ চৌষট্টি কলার অনুশীলন হইত।

আবার নালান্দা ও তক্ষশীলায়, কাশী ও বিক্রমশীলায় অন্যরকম শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সেগুলি ছিল ইউরোপের মধ্যযুগের Schoolsএর ন্যায়। নানারূপ দর্শনশাস্ত্রের পাঠ ও আলো-চনাকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাপ্রচার করা হইত। তাহার পর টোলের আবির্ভাব হয়, যে ধরণের শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

ভারতের সেই সব প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি এখন আর সম্পূর্ণভাবে প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব নহে। উপনিষদের যুগে গুরু শিষ্যকে গরুচরাইতে পাঠাইয়া দিতেন, এখন কি আর সেই ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনা সম্ভব? আর টোলের প্রবর্ত্তন করিয়া বৎসরের পর বৎসর ব্যাকরণের সূত্র বা ষড়দর্শনের কূটতর্ক মুখস্থ ও আলোচনা করিলেও বর্ত্তমান কালোপযোগী শিক্ষা দেওয়া হইবে না। প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির যেমন গুণ ছিল, তেমনি দোষও ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি হইতেও আমরা অনেক জিনিষ গ্রহণ করিতে পারি। মোটকথা, প্রাচ্য হউক, পাশ্চাত্য হউক পুরাতন হউক নূতন হউক আমরা এমন পদ্ধতি চাই যাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে শিক্ষা হয়। অতএব, অন্ধভাবে কোনও কিছু গ্রহণ বা বর্জ্জন না করিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে উৎকৃষ্ট শিক্ষার মূলসূত্র কি এবং

বর্ত্তমানে কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করিলে, ভারতের যে জাতীয় আদর্শ, জাতীয় সাধনা তাহারই প্রয়োজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবে সিদ্ধ হইবে।

উৎকৃষ্টভাবে শিক্ষা দিতে হইলে তাহার পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশের শিক্ষা কিরূপে আমাদের জাতীয় সাধনার অনুযায়ী হইবে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। কারণ, জাতীয় সাধনা ও আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কোনও শিক্ষা পদ্ধতি উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, আধ্যাত্মজীবন লাভই ভারতের জাতীয় আদর্শ। এই আদর্শ শুধু কয়েকজন অসাধারণ ব্যক্তির জন্য নহে, ভারত সমস্ত মানুষের জন্যই এই আদর্শ জীবনের সম্ভাবনা ঘোষণা করিয়াছে এবং শুধু ব্যক্তিগত মানবজীবন নহে, সমাজকেও আধ্যাত্মভাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে। এতদিন এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া ভারতীয় জাতি আধ্যাত্মজীবনের দিকে যতখানি অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, অতঃপর তাহাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী আরও আগাইয়া দেওয়াই হইবে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য, ইহার জন্য প্রাচীন ভারতে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি হইতেও যেমন আমাদিগকে সারবস্তু উদ্ধার করিয়া বর্ত্তমান কালোপযোগী করিয়া লইতে হইবে, তেমনিই পাশ্চাত্য জাতি তাহাদের নিজস্ব সাধনার দ্বারা শিক্ষা সম্বন্ধে যে সব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহারও সারগ্রহণ করিয়া ভারতীয় সাধনার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে এবং কেবল এইভাবেই এদেশে বর্ত্তমান শিক্ষা সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে।

বিভিন্ন যুগে ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও দুইটি মূল-সত্য সকল সময়েই স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ মানুষ একেবারে অত্যুচ্চ আধ্যাত্ম-জীবন লাভ করিতে পারে না, স্তরে স্তরে ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়াই তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ জীবন অতিশয় জটিল, মানুষের প্রকৃতিও জটিল, প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিতে নানা শক্তি, নানা ধারার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এক এক জন্মে মানুষ তাহার জটিল প্রকৃতির এক এক দিকের বিকাশ করিতেছে। এইভাবে প্রত্যেক মানুষের আছে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট স্বভাব ও স্বধর্ম্ম। প্রত্যেকে আপন আপন বিশিষ্ট প্রকৃতি বা স্বভাব অনুসারে কর্ম্ম করিলেই, মানুষ ঠিকভাবে আধ্যাত্মজীবনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। স্বভাব অনুসারে কর্ম্ম করাই স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম পালন করাই প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য এবং যাহাতে প্রত্যেক মানুষ আপন আপন স্বভাবের সুচারু বিকাশ করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

ভারতীয় সাধনার এই যে সারতত্ত্ব, গীতাতে ইহা স্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে দিব্য আত্মজীবনলাভই গীতোক্ত সাধনার উদ্দেশ্য। ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই ভগবান নিজে মানুষের সমস্ত অপূর্ণতা দূর করিয়া তাহার প্রকৃতিকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, রূপান্তরিত করিয়া দিব্যজীবন প্রদান করেন—অহং ত্বাম্ মোক্ষয়িষ্যামি। বস্তুতঃ মানুষ নিজের চেষ্টায় কখনই মানবত্ব ছাড়াইয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারে না। একমাত্র ভগবদ্‌কৃপার শক্তিতেই মানুষ এই পরমগতি লাভ করিতে পারে। ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ ভগবদ্‌কৃপালাভের উপায়। কিন্তু, এই ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ সহজ ব্যাপার নহে। স্বভাবানুযায়ী স্বধর্ম্মপালন করিয়া যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহারাই ঠিকভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারে।

স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।

বর্ত্তমানে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত তাহাতে মানুষের স্বভাবের বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান লওয়া হয় না, বাহির হইতে কতকগুলা শিক্ষনীয় বিষয় ঠিক করিয়া শিক্ষার্থীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়, শিক্ষার্থী কি কার্য্য করিবে না করিবে তাহা বাহির হইতে অপরে নির্ণয় করিয়া দেয়। গীতার মতে ইহা পর-ধর্ম্ম, ইহাতে কখনই মানুষের কল্যাণ হয় না। যাহার যেমন প্রকৃতি, তাহাকে সেই অনুসারে চলিতে দিতে হইবে, আর একজন আর একভাবে ভালরকম চলিতেছে বলিয়া নিজের স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিলে মানুষের জীবনবিকাশে বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। তাই গীতা স্পষ্ট বলিয়াছে,

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

গীতার এই উপদেশকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষাপদ্ধতি গঠন করিলেই তাহা হইবে ভারতের সাধনামূলক জাতীয় শিক্ষা। কাহার মধ্যে কি শক্তি আছে, কাহার প্রকৃতি কোন পথে বিকাশ খুঁজিতেছে, কাহার স্বধর্ম্ম কি তাহা কেহই আগে হইতে বলিয়া দিতে পারে না। তাই ছাত্রগণকে অভিভাবক বা শিক্ষকদের মংলবমত গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া তাহারা যাহাতে নিজেরাই নিজেদের স্বাভাবিক বিকাশ সাধন করিতে পারে, সেই বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। ইহাই জাতীয় শিক্ষার মূল নীতি। *

মানুষকে নিজ নিজ প্রকৃতি বা স্বভাব অনুসারে চলিতে দিলেই তাহার স্বাভাবিক শক্তিসমূহের সুচারু বিকাশ হয়। প্রথমে অহং লইয়াই আরম্ভ করিতে হয়, অহংয়ের ভোগবাসনার তৃপ্তি করিতে হয়, এই ভাবে অহংয়ের পুষ্টি হইলে তবে মানুষ অহংকে ছাড়াইয়া আত্মাকে লাভ করিতে পারে—কাঁচা আমি হইতে পাকা আমিতে উঠিতে পারে। তাই ভারতীয় সাধনায় কাম ও অর্থের প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু, আবার ভোগবাসনার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেও মানুষ উপর দিকে উঠিতে পারে না, দেবত্বলাভের পরিবর্ত্তে অসুরত্বই লাভ করে। সেইজন্য ভোগবাসনাকে ধর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত করিতে হয়। কিন্তু এই ধর্ম্ম অর্থে কোন রিলিজিনের মতবাদ (creed or dogma) নহে। জীবনের প্রত্যেক অংশের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও শক্তির, যথার্থ খেলা

* বর্ত্তমানে ইউরোপেও এই নীতি স্বীকৃত হইতেছে। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ মনীষী Bernard Shaw শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"What is a child? An experiment. A fresh attempt to produce the just man made perfect: that is, to make humanity divine. And you will vitiate the experiment if you make the slightest attempt to abort it into some fancy figure of your own: for example, your notion of a good man or a womanly woman. The people against whom children are wholly unprotected are those who devote themselves to the very mischievous and cruel sort of abortion which is called bringing up a child in the way it should go. Now nobody knows the way a child should go. All the ways discovered so far lead to the horrors of our existing civilizations, described by Ruskin as heaps of agonizing human, maggots struggling with one another for scraps of food... You had much better let the child's character alone. The child feels the drive of the Life Force (often called the will of God) you cannot feel it for him."

আছে, স্বধর্ম্ম আছে, সত্যনীতি আছে. সেই নীতির সন্ধান করিতে হইবে, অনুসরণ করিতে হইবে, তবেই মানুষ ক্রমশঃ অর্থ ও কামের ভিতর দিয়া মোক্ষ বা আধ্যাত্ম জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। গীতা এই সাধনার এক সহজ সূত্র দেখাইয়া দিয়াছে।—জীবনে যাহাই কর, যে কার্য্য কর বা যাহা ভোগ কর, সব ভগবানে সমর্পণ কর। অর্থাৎ আমি ভগবানের দাস, সন্তান, যন্ত্র, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করিতেছি, ভিতরে এই ভাব লইয়া স্বধর্ম্ম বা স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম করিলেই মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে—

যতঃ প্রবৃত্তি ভূর্তানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

আমাদের শিক্ষাকে সাধনামূলক করিতে হইবে, তাহার অর্থ ইহা নহে যে ছাত্রগণকে অল্প বয়স হইতেই কতকগুলা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়াইয়া দিতে হইবে, কতকগুলা মতবাদ শিখাইয়া দিতে হইবে। ছাত্রগণকে বাইবেল, কোরাণ বা মনুস্মৃতি পড়াইয়া দিয়াই যাহারা মনে করিল যে তাহাদিগকে ধার্ম্মিক করিয়া তুলিতেছেন, তাহারা ভ্রান্ত। ইহাতে প্রকৃত ধর্ম্ম-শিক্ষা হয় না, অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি স্থাপিত হয় না, বরং অনেকক্ষেত্রে অন্ধ গোঁড়ামিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ছাত্রগণের হৃদয়ে ভগবদ্‌প্রেম, বিশ্বাস ও ভক্তির বীজ বপন করিয়া দিতে হইবে, তাহা শুধু বই মুখস্থ করিলেই হয় না। ভগবানকে কেহ ধর্ম্ম বা আল্লা বলিল বা কৃষ্ণ বলিল ইহাতে কিছুই আসে যায় না। মানুষ ভগবানের সন্তান, ভগবানকে ভক্তি করিয়া, জীবনের কর্ম্মের দ্বারা ভগবানের উপাসনা করিয়া মানুষ অত্যুচ্চ ভাগবতজীবন লাভ করিতে পারে এবং তাহাই পরম পুরুষার্থ—এই বিশ্বাসটি অল্পবয়সেই ছেলেদের হৃদয়ে রোপণ করিয়া দিতে হইবে, তাহার পর যে যেমন ভাবে এই মন্ত্রের সাধন করিতে পারে, তাহাকে সেই ভাবেই সাধন করিতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভগবদ্‌ভক্তি পুষ্ট করিবার জন্য ছেলেদিগকে পূজা উপাসনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিতে দেওয়া প্রয়োজন। তবে, ইহা যে কোন এক বিশেষ নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসারেই করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। গীতায় বলিয়াছে, পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহাই হউক ভক্তিভাবে অর্পণ করিলে ভগবান তাহা গ্রহণ করেন। ছাত্রদের মনে এই ভক্তির বীজ বপন করিয়া দিতে পারিলে তাহার পর আপনা হইতেই সব ঠিক হইয়া যাইবে দেশের ও দশের সেবা করিয়া মানব জাতির সেবা করিয়া ভগবানের সেবা করা হয় এবং এইরূপ সেবার ভিতর দিয়াই মানুষের জীবনের পূর্ণতম বিকাশ হয়—আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়গুলিকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতেই হইবে।

গুরু, সদ্‌গুরু ও অবতার

শ্রীযুক্ত পৃথ্বীতোষ বন্দোপাধ্যায়

গুরু, সদ্‌গুরু এবং অবতারের প্রকৃত অর্থ অনেকেই বুঝে না; সেই জন্য একটা অস্পষ্ট ধারণা লইয়া থাকে। যিনি অন্ধকার দূর করেন অর্থাৎ তমোরাশি নাশ করিয়া জ্ঞানের-পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন, তিনিই গুরু, সদ্‌গুরু হইতেছেন তিনি যিনি সৎবস্তুর জ্ঞান দেন, এবং সৎ-চিৎ-

আনন্দের অপরোক্ষানুভূতির পথ দেখাইয়া দেন। অবতার তিনি যাঁর এই অপরোক্ষানুভূতি হইয়াছে।

আমরা অবতারের উপদেশবাণীর অনুসরণ করিবার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া তাঁহাকেই অর্থাৎ তাঁহার নামরূপকেই পরমেশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতেছি। অবতারের নামরূপ পূজায় ও ধ্যানে আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল ভক্তি ও শ্রদ্ধা আমাদের গন্তব্য পথের সম্পূর্ণ পাথেয় নহে। সেইজন্য আমাদিগকে অর্দ্ধপথেই রহিয়া যাইতে হয়। পাথেয় ফুরাইলে আর অগ্রসর হই কি করিয়া?

অবতার কখনও এমন কথা বলেন নাই যে তাঁহার পূজা করিতে হইবে, কোন অবতার কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। আমরা যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ পাই, সে সকল অবতারদিগের শিষ্যমণ্ডলী লিখিত। অবশ্য এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থে শিষ্যেরা অবতারদিগের উক্তিই লিখিয়াছেন। অবতারদিগের উক্তিগুলি তাঁহাদের বোধ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; যেহেতু তাঁহাদিগের অপরোক্ষানুভূতি হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহাদের বাক্যগুলিকে আপ্তবাক্য বলিয়া মানিতে হইবে। পরমাত্মা এক, দুইজন নাই, সেইজন্য বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে অবতারদিগের উক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যাঁহাদিগের অপরোক্ষানুভূতি হয়, তাঁহারা পরমাত্মারই মত সর্ব্ববোধময়, সর্ব্ব-জ্ঞানময়, সর্ব্ব-শক্তিময়, সর্ব্বানন্দ-ময় এবং সর্ব্ব-মঙ্গলময় হইয়া থাকেন; তাঁহাদের বাক্যগুলিও সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রাপ্ত হয়।

শিষ্যগণ তাঁহাদের উক্তিকে মুখ্য করিয়া যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থাদি লেখেন তাহাতে থাকে তাহাদের বোধ, অবতারের নহে। সুতরাং তাহা অবতারের বোধ হইতে এক বা ততোধিক স্তর নিম্নে। সেই জন্যই ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতিতে অনেক নূতন কথা প্রক্ষিপ্ত থাকে। আবার যখন সেই সকল ধর্ম্মগ্রন্থের অন্যান্য ভাষায় তর্জ্জমা করা হয়, তখন স্তরভেদে সেই উক্তিগুলি অর্থ-বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। শেষে প্রকৃত অর্থ একেবারেই চাপা পড়িয়া সাধারণ মতবাদে পর্য্যবসিত হয়, এবং বৃথা কলহের সৃষ্টি করে। তখন এক একটি দল গঠিত হয়, এবং পরস্পরে অবতারের নিন্দাবাদ করে, এইরূপে ধর্ম্মের নামে কত দেশ মহাদেশ ধ্বংস হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্ম আনন্দের বস্তু না হইয়া হয় আতঙ্কের।

সদ্‌গুরু ধর্ম্মকে অনন্ত সত্যে, অনন্ত জ্ঞানে, অনন্ত বোধে, অনন্ত শক্তিতে ও অনন্ত আনন্দে মূর্ত্ত করিতে পারেন। ধর্ম্মের গোঁড়ামি থাকিলে ধর্ম্মজ্ঞান আসিতে পারে না। গোঁড়ামি সংস্কার; শুধু সংস্কার নহে, উহা ভীষণমূর্ত্তি। গুরু নিজে এই ভীষণ শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিবেন, শিষ্যকেও করাইবেন। চিন্তার ধারা যদি স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার সহিত প্রবাহিত না হয়, যদি সঙ্কীর্ণতা আসিয়া প্রতিপদে দ্বার অবরোধ করে, তাহা হইলে জ্ঞানের প্রসার কি করিয়া সম্ভব? মনের উদারতা না থাকিলে অনন্ত জ্ঞানের সহিত মেশা যায় না। কূপ কিংবা পুষ্করিণীর অবরুদ্ধ জল সাগরে মেশে না। সাগরে মেশে সেই জল, যাহা শৈল বিদীর্ণ করিয়া মৃত্তিকার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং অপ্রতিহত সরল গতিতে স্থলভূমি প্লাবিত করিয়া বহিয়া যায়। সদ্‌গুরু শিষ্যের চিন্তার স্বাভাবিক স্রোতকে অধিকতর বেগবতী করিয়া দেন, তাহার জ্ঞানকে অনন্ত জ্ঞানসাগরে মিশিবার সহায়তা করেন, কিন্তু সেই আনন্দ-ব্রহ্মে সেই শিষ্যই গিয়া মিশিতে পারে

সদ্‌গুরু তিনিই যিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পরমাত্মা কেবল জ্ঞানলভ্য বলিয়া উপদেশ দেন এবং জ্ঞানমার্গকেই একমাত্র মার্গ জানিয়া শিষ্যের পথকে সুগম ও সহজ করিয়া দেন।

গুরু কে—কে গুরু নয় তাহা জানি না। কোন্ প্রভাতের অস্ফুট আলোকে আমরা যাত্রা করিয়াছিলাম, ক্রমে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া ক্রমবিকশিত জ্ঞানালোক সমৃদ্ধ হইয়া আজ শ্রেষ্ঠ মানব জন্ম লাভ করিয়াছি। তাই আজ স্থাবর জঙ্গম, কৃমি, কীট, পশু, পক্ষী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর স্থূলতা ও সূক্ষ্মতার উপলব্ধি আমরা করিয়াছি, প্রতিজন্মে আমরা গুরুর সাহায্য পাইয়াছি, নতুবা অগ্রসর হইতে পারিতাম কি করিয়া? ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর বোধ আমার হইয়াছে। কিন্তু সে বোধ অখণ্ড নহে। আমি সেই জ্ঞান চাই যাহা দ্বারা এই খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র বোধগুলি একীভূত হইয়া বৃহত্তম অখণ্ড বোধে পরিণত হইবে, যাহা আমাকে পরম কল্যাণময়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বানন্দময় পরমাত্মায় বিলীন করিবে। যিনি সেই পথ আমার প্রদর্শন করিবেন. তিনিই আমার গুরু, তিনি সদ্‌গুরু। তাঁহাকে আমি প্রণাম করি—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

কবীরের দোঁহা

অষ্টবিকার—ক্রোধ

কুটিল বচন সব সে বুরা, জারি করৈ তন ছার।
সাধ বচন জলরূপ হৈ, বরসৈ অমৃত ধার॥ ৮॥

কুটীল বচন মন্দ অতি, জরজর করে কায়।
সাধুর বচন সলিল শীতল, অমিয় ধার ঢালে তায়

নিন্দক তেঁ কুকর ভলা, হঠ করি মাড়ৈ রারি।
কুকর তেঁ ক্রোধী বুরা গুরুহিঁ দিবাবৈ গারি॥ ৯॥

ঝগড়া-খোঁজা কুকুর শ্রেয়, নিন্দাকারী মানুষ হ'তে।
ক্রোধী যারা কুকুর-অধম, গুরুকে গাল খাওয়ায় তাতে॥ ৯॥

আবত গালী এক হৈ, উলটত হোয় অনেক।
কহেঁ কবীর উলটিয়ে বাহি এক কী এক॥ ১০॥

আনার সময় গালি একা, ফিরিয়ে দিলে হয় অনেক।
কবীর বলে উল্টো'না তায়, একই গালি থাকবে এক॥ ১০॥

গালী সোঁ সব উপজে, কলহ কষ্ট ঔর মীচ।
ছার চলে সো সন্ত হৈ, লাগ মরে সো নীচ॥ ১১॥

গালি হ'তে জন্মে সবই, কলহ ক্লেশ মরণ আর।
নীচ যে লাগে কোমর বেঁধে, সন্ত যে জন মানে হার ॥ ১১ ॥

জগমেঁ বৈরী কোই নঁহী, জো মন সীতল হোয়।
যহ আপা তূ ডাল দে, দয়া করে সব কোয় ॥ ১২ ॥

শত্রু কেহ নাইক হেথা, শীতল তোমার হয় যদি মন।
দূর কর এই অহঙ্কারে, সবাই দয়া করবে তখন ॥ ১২ ॥

ঐসী বাণী বোলিয়ে, মনকা আপা খোয়।
ঔরন কো সীতল করে আপৌ সীতল হোয় ॥ ১৩ ॥

এমন বচন বল সদা, ঘুচিয়ে আপন মনের মান।
অন্য জনে করবে শীতল, শীতল হবে নিজের প্রাণ ॥ ১৩ ॥

বোলী তো অনমোল হৈ, জো কোই জানে বোল।
হিয়ে তরাজু তোল কর তব মুখ বাহর খোল ॥ ১৪ ॥

অমূল্যধন বাক্যসদা, বলতে জানে কেউ যদি বোল।
নিক্তি দিয়ে মনের মাঝে, ওজন ক'রে মুখ তবে খোল ॥ ১৪ ॥

খোদ খাদ ধরন্তী সহে, কাট কুট বনরায়।
কুটিল বচন সাধু সহে, ঔর সে সহা ন জায় ॥ ১৫ ॥

খনন সহে বসুন্ধরা, কাটকুট সয় বনরায়।
কুটিল বচন সাধু সহে, অন্যের তা নাহি সয় ॥ ১৫ ॥

সহজ তরাজু আনকর, সব রস দেখা তোল।
সব রস মাহীঁ জীভ রস, জো কোই জানে বোল ॥ ১৬ ॥

ওজন ক'রে সকল রস, দেখিয়াছি নিক্তি এনে।
সবার মাঝে বচনের রস, কেউ যদি তা ব'লতে জানে ॥ ১৬ ॥

শব্দ বরাবর ধন নহীঁ, জো কোই জানে বোল।
হীরা তো দামোঁ মিলে, শব্দকা মোল ন তোল ॥ ১৭ ॥

ধন কিছু নাই শব্দ সমান, কেউ যদি তা ব'লতে জানে।
দাম দিলে ত রত্ন মিলে, শব্দ অতুল পায় না ধনে ॥ ১৭ ॥

সীতল শব্দ উচারিয়ে, অহং আনিয়ে নাহিঁ।
তেরা প্রীতম তুঝ্‌মেঁ, দুশমন ভী তুঝ মাহিঁ ॥ ১৮ ॥

শীতল বচন ব'লবে মুখে, এন নাক অহঙ্কার।
তোমার মালিক তোমাতে র'ন, অরিও রয় অনিবার ॥ ১৮ ॥

মহৎ বাণী

সংঘর্ষে মিলন

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাব মিলনের ; প্রাচ্যের গভীর ও পাশ্চাত্যের অদম্য কার্য্যকারিতা—একের অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী চেষ্টা—একের মুক্তিপ্রিয়তা—অপরের স্বাধীনতা, একের "ত্যাগ" অপরের "ভোগ"। জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ঐহিক কল্যাণ লাভে একের নিরুৎসাহতা, নিত্যসুখে সন্দিহান—অপরের ঐহিক সুখ লাভের অদম্য উৎসাহ। ইহার মিলন হইবে কি করিয়া ? আমরা চাই পাশ্চাত্যের সেই মহোদ্যম—স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভরতা 'সেই অটল ধৈর্য্য—কার্য্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন ও উন্নতিতৃষ্ণা—আর চাই আপাদ মস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ। দেখিতেছ না যে সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমঃ সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেখানে জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণে নিজের অকর্ম্মণ্যতাকে আচ্ছাদিত করিতে চাহে—যেখানে ক্রুরকর্ম্মী তপস্যার ভাণ করিয়া নিষ্ঠুরতাকে ধর্ম্ম করিয়া তোলে —যেখানে নিজ সামর্থ্যহীনতা কেবল অপরের উপর দোষ নিক্ষেপ করিতে চাহে—সে দেশ যে তমঃ সমুদ্রে ডুবিতেছে তাহার কি প্রমাণান্তর চাই ? আমরা যেমন রজোগুণের অভাবে মরিতে বসিয়াছি—পাশ্চাত্য জাতিও তেমনি সত্ত্বগুণের অভাবে মরিতে বসিয়াছে। কারণ সত্ত্বগুণই চির-জীবি। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বগুণের উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে, এই রজঃও সত্ত্বের আদান প্রদানের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির মিলন স্থান এবার ভারতবর্ষ। তবে পাশ্চাত্য বীর্য্য তরঙ্গে যেন আমরা ভাসিয়া না যাই। এই জন্য ঋষি প্রদত্ত "ধর্ম্ম" সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে—যেন পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট না হই।—স্বামী বিবেকানন্দ

অতীতে ভবিষ্য কথা

আমি ভারতবর্ষে ইংরাজাধিকার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহার কোন কথাই আমার অনুরাগ অথবা বিরাগ মূলক না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ইংরাজের বণিক্ ভাবে রাজ্যলাভ, তাহার জাতীয় প্রকৃতির অনুযায়ী রাজভাব এবং তাহার জ্ঞান ও পরিণাম দর্শন মূলক ন্যায় পরতার অভ্যন্তরে বৈদেশিক ভাব প্রদর্শন করিয়াছি এবং তৎসহ এ কথাও বলিয়াছি যে, এদেশে ইংরাজের বদ্ধমূলতার সহিত তাঁহার বলবৃদ্ধির অভিলাষ বর্দ্ধিত হইবার এবং প্রজাপুঞ্জের সহিত সহানুভূতির ন্যূনতা ঘটিবার সম্ভাবন।—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

ভূকম্পন

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সঞ্জীব চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্

(নেপাল)

ভূকম্পন একটি ভীষণ ব্যাপার উহাতে পৃথিবীর কত সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অতীত ইতিহাস ভূকম্পনের যেমন সাক্ষ্য দেয়, বর্ত্তমান যুগও ভূকম্পনের মহা-কোপের তেমনি সাক্ষ্য দিতেছে। ভূকম্পনে পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে, মহা সৌধ বিধ্বস্ত হয়, পৃথিবী স্থানে স্থানে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়; ভূকম্পনে জীবের প্রাণে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়; ভূকম্পনে সমুদ্রের জল উথলিয়া পড়ে; আবার বর্ত্তমান বিজ্ঞান বলে উহাতে কখনো কখনো ভূগর্ভ হইতে আগ্নেয়গিরি সমহ পৃথিবীর surface এর নিকটে আসিয়া পড়ে।

জড় ভূকম্পনের সাধারণ প্রকৃতি এ প্রকার ভয়ানক। মানুষের অন্তর জগতে আর এক রকমের ভূকম্পনের সামগ্রী আছে। তাহারাও কম সর্ব্বনাশী-শক্তি-সম্পন্ন নহে। তাহাদের ভাঙ্গার শক্তি, ধ্বংসের শক্তি, "আগ্নেয়গিরি"কে সমাজের নিকটে আনিবার শক্তি কম নহে। ধীরে অতি ধীরে, এ সমুদয় সামগ্রী শক্তি আহরণ করে। কিন্তু যখন উহারা আত্মপ্রকাশ করে, উহাদের ভীষণ শক্তি যখন নরসমাজে প্রকটিত হয়, তখন মনুষ্য সমাজে যে সর্ব্বনাশের উদ্ভব হয় তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে। অন্তর জগতের ভূকম্পন মনুষ্য সমাজে ভীষণতর হাহাকারের সৃষ্টি করে। উহার ভীষণ অগ্নির উদ্গারে মানুষ পিপীলিকার মত ধ্বংস হয়; উহার তীব্রবেগে মনুষ্যগণ তুফানে তৃণের মত সহস্রধা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

বিজ্ঞান জড়-ভূকম্পনের নিরোধের জন্য এখনো কিছু আবিষ্কার করিতে পারে নাই। কিন্তু অন্তর জগতের ভূকম্পনিবারণের জন্য সনাতন আর্য্য-ঋষিরা অদ্ভুত সত্যশক্তির আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। অন্তরে কি কি শক্তি নিহিত, কতরকমের বাসনার তীব্রবেগ উহাতে নিত্য নিত্য লীলা করিবার চেষ্টা করে, মানুষের তীব্র প্রবৃত্তির স্রোত কেমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার প্রয়াস পায় এবং কিসে সৎপ্রবৃত্তির উদ্রেক ও বৃদ্ধি এবং অসৎ প্রবৃত্তির নির্ব্বাণ ও রোধ হয়—আর্য্য ঋষিরা তাহাদের সাধনা পদ্ধতিতে তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাহা নহে তাঁহাদেরর এ বিশ্বাসও ছিল—যে ধরিত্রী অনর্থক কম্পিত হয় না—মানুষ পাপে জর্জ্জরিত হইলে সে পাপ ধরিত্রীতে সঞ্চারিত হয় এবং বসুন্ধরা সে জন্যই কাঁপেন। জড়ের ও অধ্যাত্মের সম্বন্ধের সূক্ষ্মদৃষ্টি আমরা হারাইয়াছি—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসও গিয়াছে। কাজেই অন্ধকারের জীবের ন্যায় আমরা সত্যের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু ভ্রমই করিতেছি আজ অসত্যকে সত্যের আসনে বসাইয়া পূজা করিতেছি—কাল আবার তাহার নিন্দা করিতেছি। এ চাঞ্চল্য জগৎময়; অথচ ইহার প্রকাশকেই আমরা civilisation বা "সভ্যতার প্রকাশ" বলিয়া আখ্যা দিতেছি। আজ জগতের সমাজের দিকে একটু সূক্ষ্মভাবে, একটু স্থিরভাবে তাকাইলে বেশ দেখা যায়—কতদিকে মানবের মনোরাজ্যের ভূকম্পের লক্ষণ হইতেছে। লোভের তৃপ্তি যে যুগে মানুষের আদর্শ, মোহের

স্বর্ণ-কারাগার যে যুগে মানুষের প্রিয় বাসস্থান, কামের কদর্য্য পঙ্ক যে যুগে মানুষের চন্দনলেপ, সে যুগে যে সমাজে সহস্ররকমে বিভীষিকাময় মনোরাজ্যের ভূকম্পন দেখা দিয়া সমাজকে কাঁপাইয়া তুলিবে উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে—সে যুগে যে মানুষ বহুরূপী শয়তানের একটি রূপকে ভগবান্ মনে করিয়া তাহার পায়ে আত্মবলি দিবে ইহাও অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ জগত-সমাজে আজ এবম্বিধ ভূকম্পনই চলিতেছে। উহাতে মাঝে মাঝে মানুষের মনে আতঙ্ক হয় সত্য, কিন্তু স্থির আতঙ্কের ভাব উহা হইতে মানুষ এখনো প্রাপ্ত হয় নাই। দোলায়মান শিশুর মত প্রবৃত্তির মোহদোলায় দুলিয়া আপাত সুখে এ যুগের মানুষ যতই সময়ের স্রোতে বহিয়া চলিতেছে ততই প্রলয়ের ভূকম্পনের সামগ্রী বাড়িয়া চলিতেছে—তাহার বেগ তীব্রতর হইতেছে এবং তাহার অগ্নি-উদ্গারণ-শক্তি সমাজের নিকটে আসিয়া পড়িতেছে। যাহারা এ দৃশ্য দেখিতেছে তাহাদের মনে কোনও শান্তি নাই—উপায় উদ্ভাবনের জন্য তাহাদের চিত্ত উদ্গ্রীব হইয়া আছে। তাহারা ভাবিতেছে আজ বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক, কি সাহিত্যিক, কি তথাকথিত দার্শনিক Research এর তত প্রয়োজন নাই—আধ্যাত্মিক **Research** এর যত প্রয়োজন।

কিন্তু এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুসন্ধানের ক্ষেত্র কোথায়? এই সর্ব্বনাশী ভূকম্পন রোধের উপায় কি? জগতের অন্য কোথাও ইহার উপায় আছে কিনা জানিনা—তবে ভারতের সাধনায় যে সে উপায় লিপিবদ্ধ আছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহার চক্ষু আছে সে সেই স্বচ্ছ-সরোবর চক্ষু মেলিয়া দেখুক, যাহার জ্ঞান আছে সে তাহার পবিত্র ও মধুর অমৃত পান করুক, যাহার অনুভূতি আছে সে তাহার মধুর স্পর্শ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হোক্। মানবের শান্তি প্রবৃত্তিময় বর্ত্তমান সভ্যতার উষ্ণ কটাহে নাই—সে কটাহের তপ্ত হলাহল মানব সমাজে শুধু জড়-ভূকম্পন হইতেও ভীষণতর ব্যথতার কম্পনের সৃষ্টি করিতেছে। মানবের শান্তি ও তৃপ্তি অতীতের তথা ভারতের অনাবিল পবিত্র সভ্যতায়। জগৎ ক্রমশঃই উহা উপলব্ধি করুক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সতীত্ব

(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

পঞ্চম অধ্যায়।

অদ্য প্রায় মাসাবধি কালের উপর, সদানন্দ ঠাকুর মহাবালেশ্বর হইতে অনুপস্থিত। সতীনাথ একাকীই আছেন। তাঁহার সদ্গুণে আকৃষ্ট হইয়া প্রায়ই লোকজন তাঁহার নিকট আসিত। প্রত্যেকেই সদানন্দ ঠাকুরের বিষয়ে সতীনাথকে প্রশ্ন করিত। কেও জিজ্ঞাসা করিত "সদানন্দ কত দিনের সাধু, কি বিষয়ে সিদ্ধ পারাকে সোণা করিতে পারেন কিনা" ইত্যাদি। আবার কোনও কোনও ব্যক্তি বলিত 'নিশ্চয়ই সদানন্দ ঠাকুর উড়ে চলে যেতে পারেন, সাদা ফুল লাল করিয়া

দিতে পারেন; ভগবানকে দেখিতে পান; তাঁর সহিত কথা বলেন" আবার আর জন বলিত "সমাধি করে সিদ্ধ হয়েছেন"। সতীনাথ এ সকল কথার কোন উত্তর না দিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। বলিতেন সদানন্দ ঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই জানেন না। এই মাত্র জানেন যে তিনি সতীনাথকে ছেলে বেলা হইতে মানুষ করিতেছেন। তাঁহার স্নেহ অপার্থিক এবং জ্ঞান ও কার্য্য বাহ্যাড়ম্বর-শূন্য। সদানন্দঠাকুরের কোন অলৌকিক শক্তি বা কার্য্য সতীনাথ কখন দেখেন নাই। আর সিদ্ধ পুরুষ কি না তাও তিনি জানেন না। কেননা, শিষ্যমণ্ডলী না থাকিলে সিদ্ধ কি অসিদ্ধ তাহা বড় একটা প্রকাশ পায় না। সতীনাথ লোক জনকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে তিনি সদানন্দ ঠাকুরের নিকট কোন মন্ত্রাদি লয়েন নাই। এবং যত দূর তাঁহার জানা আছে তাহাতে সদানন্দের কোন মন্ত্রশিষ্য নাই। লোক জন এ সব কথা যে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিত এরূপ বোধ হয় না। কারণ সেই এক প্রকারের প্রশ্নই বারংবার লোকেরা করিত। মানুষ এতই বহি-মুখে ছুটিয়াছে যে অন্তঃকরণের সংবাদ পাইবার একটু সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেই তথায় ছুটিয়া যায়। ইহারই অভিব্যক্তি সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণে এবং স্বামীজীর পদ-সেবাতে আজকাল দেখা যাইতেছে। হায়! মানুষ নিজে কস্তুরিকা মৃগ, বাহিরে ছুটিলে সুগন্ধের আকর কোথায় পাইবে! এক দিনে কিছু হয় না। হাজার উপদেশ পাইলেও সে উপদেশে কার্য্য হয় না। অন্তঃকরণ পবিত্র না করিলে শাস্ত্র পাঠ, শিষ্যত্ব গ্রহণে গৌরববোধ প্রভৃতি কিছুই নহে। হৃদয় পবিত্র করিলে, সুগন্ধে ও আলোতে মানুষ মোহিত হইয়া গিয়া আর বাহিরে হৈ চৈ করিয়া বেড়াইতে পারে না। এই জন্যই ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা।

একদিন সন্ধ্যার সময় কয় জন লাকের ও সতীনাথের মধ্যে যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল আমরা তাহা নিম্নে লিখিতেছি।—

১ম ব্যক্তি। সদানন্দ ঠাকুর নিজে ত মন্দিরের প্রসাদ খাইয়া জীবন ধারণ করেন। অথচ তুমি পরিচয় দিতেছ—তিনি তোমাকে মানুষ করিয়াছেন ও বিদ্যাদান করিয়াছেন। কি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়?

সতী। আমি বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু ঠাকুরের যখন যাহা দরকার তাহার অভাব হয় না। কত স্থানে কত দূরে দূরে গমন করেন কিন্তু কখন অর্থের অভাব দেখি নাই। আমাকেও সময় সময় যথেষ্ট সাহায্য করেন।

২য় ব্যক্তি। ওহে, পারা ভস্ম দিয়ে তামাকে সোণা করা যায়। লোকটা নিশ্চয়ই পারা ভস্ম করিতে পারে। কাজেই তাহার আর অর্থের অভাব হয় না।

১ম। পারা ভস্মে তামাকে সোণা করা যায় এটা একটি "বুজরুকি" মাত্র। তামা একটা মূল ধাতু এবং সোণা আর এক মূল ধাতু। পারা তৃতীয় মূল ধাতু। তামা কি আর সোণা হয়?

সতী। সে কথা বলা যায় না। কিসে কি হয় তাহা বলা অতিশয় কঠিন। বিশেষ যাহা দেখিয়াছি তাহাতে সোণাও মূল ধাতু নহে এবং তামাও নহে।

২য়। ইনি আবার নূতন রসায়নবিদ্যা প্রস্তুত করিবেন দেখছি! বড় বড় রাসায়নিক-গণ স্থির করিয়া দিয়াছেন যে সোণা ও তামা মূল ধাতু। আচ্ছা! যদি সোণা ও তামা মূল ধাতু না হয় তবে ওরা কিসে কিসে প্রস্তুত হইয়াছে প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পার?

১ম। তোমার ওরূপ ধারণা যুক্তি-যুক্ত নহে। পরামাণুও এখন আর নাই। এখন "রেডিয়াম" বাহির হইয়াছে। সোণা ও তামার ভিতর যে অন্য ধাতু আছে আগামীকল্য এরূপ কথা বাহির হইবে না একথা বলা যায় না।

সতী। আমরা সৃষ্টিতত্বে "কেঁকড়ার বাচ্চা"। কোথায় কি ভাবে কি আছে তা যদি জানিতে পারিতাম তবে যে মাথা হইতে সৃষ্টি হইতেছে তাহার মূল্য কি রহিল? সদানন্দ ঠাকুর বলেছেন সোণা বা তামা মূল ধাতু নহে। পারা ভিন্ন অন্য কোন ধাতুই বিশুদ্ধ নহে অর্থাৎ অন্য দ্রব্যের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়াছে।*

২য়। ওরূপ অনেক কথাই শুনা যায় হে! ওসব বিশ্বাস করি না। যত দিন না উক্ত ধাতুগুলিকে মিশ্র বলিয়া প্রমাণিত করা হয় ততদিন তোমার ও কথা শু'নে লোকে হাসিবে মাত্র।

১ম। একটি বালককে যদি বলা যায় পৃথিবী গোলাকার, সে প্রথমে হাসিয়া উঠে। কিন্তু সেই বালকই আবার জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বলিতে থাকে, পৃথিবী গোল। সেইরূপ রসায়ন-বিদ্যা এখনও বালক অবস্থায়। ইহার পরিণতাবস্থায় যে কি দাঁড়াইবে তাহা বলা যায় না। আমিও অনেক পড়িয়াছি কিন্তু কিছুতেই ধারণা হয় না যে যাহা আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগৎ জানিয়াছে তাহার বেশি জানিবার কিছু নাই।

সতী। না দেখিলে প্রত্যয় হওয়া অসম্ভব। সেই জন্যই উপযুক্ত শিক্ষকের দরকার। এখন প্রায় আর শিক্ষক পাওয়া যাইতেছে না। আর আমাদের দৃষ্টিশক্তির দৌড় খুব কম দূর মাত্র। অনুমান জ্ঞানই অধিক।

২য়। তুমি ত, হে ছেলে মানুষ! তোমার এত কি বুদ্ধি যে তুমি বড় বড় লোকদের অবজ্ঞা করিতেছ?

১ম। এতে ত অবজ্ঞার কথা কিছু দেখিতেছি না। সৃষ্টির অগাধ জ্ঞানরাশির নিকট মানুষের মস্তিষ্ক অতি ক্ষুদ্র। আমরা চিরদিনই শিক্ষা বিষয়ে বালক থাকিব। সদানন্দ ঠাকুর যে তোমার চেয়ে বা তোমার অন্যান্য রসায়নবিৎ পণ্ডিতের অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী নহেন বা হইতে পারেন না, তাহার যুক্তি কি?

২য়। তা হলে এতদিন সদানন্দের নাম স্বর্ণাক্ষরে দেশে দেশে লিপিবদ্ধ হইয়া যাইত। গুণবান লোক কি লুকিয়ে থাকিতে পারে?

১ম। এইটিই তোমার একটি মস্ত ভুল। মনুষ্যত্বের দিকে যতটা অগ্রসর হইবে ঠিক ততটা ক্ষুদ্রত্ব আসিয়া তোমার হৃদয় অধিকার করিবে। আমার বিশ্বাস সদানন্দ মানুষ। ঋষিকল্প চিন্তাশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারকে কেও কখন খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত না। তিনি কখন আত্মপরিচয় দিয়া ঢাক বাজান নাই। তাঁহার নিজ লিখিত আত্মজীবন-কাহিনী এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

সতী। সদানন্দ ঠাকুর আমাকে কেবলই শিক্ষা দেন "ছোট হও ছোট না হলে কিছু জানিতে পারিবে না। হাতের কণুই হাত বাড়ালে আর কিছুতেই দেখা যায় না। কিন্তু কাণ ধরিলে

* অবধৌতিক মতে পারা ভিন্ন আর মূল ধাতু নাই। পারদ সর্ব্ব ধাতুর মূল ও ব্যবহার জানিলে অমরত্ব দিতে পারে। এই জন্যই ইহাকে "শিববীর্য্য" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বেশ দেখা যায়।" আমি শুনেছি শিবাজী বহু ধন সম্পত্তি তাঁহার গুরুদেব রামদাস স্বামীর নিকট দেন। রামদাসস্বামী নির্লোভী সাধু—তাঁহার অর্থের প্রয়োজন ছিল না। সেই অর্থ তিনি দেশকাল পাত্র বিচারে সৎকার্য্যে ব্যবহার করিতেন। কত প্রকৃত দুঃস্থের দুঃখ মোচন করিয়াছিলেন এবং কত কত বিপদগ্রস্থের বিপদ উদ্ধার কল্পে টাকা ব্যয় করেন। এই সদানন্দের সহিত নাকি রামদাস স্বামীর সম্বন্ধ আছে।

২য়। বল কি! রামদাসস্বামী এখনও বেঁচে আছেন? অসম্ভব—এটা গল্প!

১ম। কেন, মহাবালেশ্বরেও ত লোকে বলে যে রামদাস স্বামী চিরজিবী—প্রায় অমর। আমরা তাঁহাকে না দেখিতে পাই কিন্তু তা বলে তিনি বাঁচিয়া থাকিতে পারেন না—একথা ভাবিও না। শিবাজীর গুরু একটা সামান্য মনুষ্য নহে। আচ্ছা, সতীনাথ! তুমি কি সদানন্দ ঠাকুরের মত আর কোন সাধু ব্যক্তিকে দেখিয়াছ?

সতী। আজ্ঞা, না। তবে শুনেছি আরও ঐরূপ অনেক লোক আছেন। তাঁহাদিগকে সিদ্ধচারণ ও দিক্‌পাল বলিয়া আখ্যাত করা হয়।

২য়। তাঁরাও কি অর্থ দিয়ে পরোপকার করে বেড়ান নাকি? আচ্ছা, পাগলের দল দেখিতেছি ত? নিজেরা না খেয়ে, না পরে, লোকের দিকে ছুটেছে!

১ম। অর্থের সদ্‌ব্যবহার না হইলে সে অর্থ-নিরর্থক।

২য়। রায়গড়ের জমীদার প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার মালিক। তিনি কত সৎকার্য্য করিতেছেন। তাঁহার বাড়ী ঘর আছে; যশ চারিদিকে; রাজা মহারাজা প্রভৃতি কত কি বলে। তুমি কি বলিতে চাও জমীদার বাবুর যে দান কর্ম্ম তাহা নিরর্থক!

সতী। শুনেছি জমীদার বাবু একজন যোগভ্রষ্ট মনুষ্য। বিদ্যা শিক্ষার্থে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারার্থে, লোকজনকে খাওয়াইতে ও অন্যান্য বহু বিষয়ে তিনি অকাতরে ধন দান করিয়া থাকেন। তিনি বহুলোক প্রতিপালক।

১ম। ওরে ওটা শুন্‌তে ভাল। সতীনাথ! তুমি বালক, বিশেষ ক দিন বা এ দেশে এসেছ। সকল বিষয় না জেনে কোন কথা বলিও না। অর্থের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং অসীম ক্ষমতা ও প্রভুত্ব লাভের তীব্র চেষ্টাই উক্ত জমীদারের চরিত্র। অর্থের সদ্‌ব্যবহার করা অতিশয় কঠিন। একে ত অর্থ-উপার্জ্জন করাই কঠিন, তদপেক্ষা কঠিন অর্থসঞ্চয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অর্থের ব্যয়। ব্যয় মাত্রেই সদ্‌ব্যয়। "ব্যয় ভূষণ" শব্দ অসদ্‌ব্যয়ী জনগণের প্রতি আরোপিত হয় না।

সতী। ঠাকুর বলেছেন যে দান মানেই ত্যাগ। ত্যাগ মানে নিজকে কষ্ট দিয়া যাহা ছেড়ে দেওয়া যায়। এইরূপ দানে ঠাকুর সিদ্ধহস্ত দেখিতেছি। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে কোন আড়ম্বর নাই এবং অপাত্রে কখনই একটি পয়সা দেন না। চোর বা স্তাবকমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া তিনি যশের পশ্চাতে ছুটেন না। তাঁহার উদারতা সামাজিক মঙ্গলে পরিণত। অন্যায় প্রশ্রয় পাইয়া সমাজের সুখকে অপার দুঃখে পরিণত করিতে পারে না। তিনি প্রায়ই রাজা রাধাকান্তদেব তারক প্রামাণিক, রাণী স্বর্ণময়ী প্রভৃতি বঙ্গদেশ বাসীর দানশীলতার কথা বলিয়া থাকেন। এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে এমন সময় একটি লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে সদানন্দ ঠাকুর আসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ঠাকুর স্বয়ং আসিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন ও সতীনাথ প্রভৃতি যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাত্রিকালের আহারাদির ব্যবস্থা জন্য সতীনাথ ব্যস্ত হইলে অপর লোকগুলি একে একে চলিয়া গেলেন। সদানন্দ ঠাকুর এবং সতীনাথ ও যথা সময়ে বিশ্রাম জন্য শয়ন করিতে গেলেন।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেলে সদানন্দ ঠাকুর সতীনাথকে ডাকিয়া নিদ্রোত্থিত করিলেন। প্রায়ই সতীনাথকে এইরূপ ডাকাডাকি করা হয়, কাজেই তিনি এ বিষয়ে কিছুই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। সদানন্দ ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—দেখ সতীনাথ, আমি মনে করিতেছি আমি এবার একবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইব। এবার তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইব। তুমি ত এখন একটু উন্মনা হইয়া পড়িতেছ—প্রকৃতির মহান দৃশ্য দর্শনে এ ভাবটার একটু উপশম হইবে। সতীনাথের কথা বলিবার কোন ক্ষমতাই ছিল না কাজেই সদানন্দ ঠাকুরের ব্যবস্থার উপর তাঁহার বলিবার কিছুই না থাকায় চুপ করিয়া রহিলেন।

সদানন্দ ঠাকুর পঞ্জিকা লইয়া তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইবার দিন ও সময় স্থির করিয়া দিয়া সতীনাথকে যাহা যাহা সঙ্গে লইতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অতঃপর সদানন্দ ঠাকুর সতীনাথকে বিদায় দিয়া নিজ কার্য্যে অভিনিবেশ করিলেন। ঊষার প্রাক্কালে সমীরণ সুমধুর অথচ মহীমোদ্দীপক গাথা ধ্বনি বহন করিতে করিতে প্রবাহিত হইয়া কলিকল্মষ পীড়িত-সীমাবদ্ধ দৃষ্টজীবনে হতাশ অনন্ত অদৃষ্ট জীবনে আকৃষ্ট-দৃষ্টি জীবের কর্ণ পটহে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধী মধুনক্তমুতোষসি
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুদ্যৌরস্তনঃ পিতা
মধুমান্নোবনস্পতি র্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

কণ্ঠস্বরে বুঝা গেল সদানন্দ ঠাকুর স্তব পাঠ করিতেছেন; সতীনাথ আর নিদ্রিত হইতে পারেন নাই। নানা চিন্তায় তাঁহার মনে উদ্বেগ আসিয়া পড়িয়াছিল। প্রায়ই তিনি সদানন্দ ঠাকুরের ঊষাকালের স্তবপাঠ শুনিয়া থাকেন—কিন্তু আজ সদানন্দ ঠাকুরের পিতা স্বর্গঃ ইত্যাদি পাঠ তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া তাঁহাকে কি এক অজ্ঞাত অনন্ত চিন্তা-রাজ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। সতীনাথ নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—এ কি—পিতা এত বড়—তবে কি পিতা সকলের বড়। দেবতা গন্ধর্ব্ব, প্রভৃতি অপেক্ষাও কি পিতা বড়। দেবতার মধ্যে যাঁহারা দেবতা যাঁহাদিগকে সাধ্য বলা যায় পিতা কি তাঁহাদের অপেক্ষাও বড়। বিরাট হইতে স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহা হইতে মরীচি অত্রি প্রভৃতি দশজন মানস পুত্র প্রজাপতি। এই দশজনকেই পিতৃলোক বলে। ইহারাই দেবতা গন্ধর্ব্ব স্থাবর জঙ্গম সকলের পিতা বা জনক। তবে ত পিতা দেবতারও আগে। কি ভীষণ সমস্যা! কি শাস্ত্র-রহস্য কিছুই বুঝা যায় না। কে এ বিষয়ে বুঝাইয়া দিবে—গুরুদেব এ তত্ত্ব একদিনও বুঝান নাই। বোধ হয় আমি অধিকারী হই নাই—আজ এ তত্ত্ব বুঝিবার এ তীব্র ইচ্ছা

কেন? পিতা শৈশবে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। পিতৃভক্তি কি তা ত বুঝিতে অবসর পাই নাই। আজ কেন পিতৃদেবতার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে? কে এই মানব হৃদয়ের অতি স্বাভাবিক বৃত্তিটিকে এতদিন চাপিয়া রাখিয়াছিল? দেখি এই রহস্য কিরূপে গুরুদেব ভেদ করিয়া আমার এই উৎকণ্ঠিত চিত্তকে শান্ত করিতে পারেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী কিরূপে হিন্দু-রাজত্ব পুনঃ স্থাপন করেন। প্রতাপগড়ের ভূমির প্রত্যেক বিন্দুতে সে বীরত্ব ও মহত্ব অক্ষয় অক্ষরে লিখিত আছে। দুর্গের পূর্ব্বাংশে শিবাজী প্রতিষ্ঠিত ভবানী মন্দির এবং ইহার অনতিদূরে আবদুল্লা বুরুজ। এই আবদুল্লা বুরুজেই সেনাপতি আফজল খাঁর মস্তক প্রোথিত হয়। প্রতাপগড়ে আজ মহোৎসব। মাঘ মাসের এই দিনে আফজল খাঁ শিবাজী কর্ত্তৃক নিহত হয়েন ও তাঁহার মস্তক মহা সমারোহে শিবাজী স্বয়ং আবদুল্লা বুরুজে প্রোথিত করেন। মহারাষ্ট্রীয় প্রথা অনুসারে সেই দিন হইতে মাঘ মাসের এই দিন একটি জাতীয় উৎসবের প্রধান সময়। নানা প্রকার পবাড়া, পাঠ, গীত, বাদ্য, খেলা প্রভৃতি এই উৎসবে দেখান হয়। পবাড়া-বীরকীর্ত্তি গাথা অর্থাৎ যোদ্ধাগণের কীর্ত্তি কলাপ পরিপূরিত। তাই আজ সেই উৎসবে নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া যোগদান করিতেছে। কোথাও বা শাহজী পরিত্যক্তা সসত্বা জিজাবাই কিরূপে নিজ পিতা লুখজী জাধব দ্বারা সিউনারী দুর্গে বন্দিনী হইলেন—কেমন করিয়া জিজাবাই সেই দুর্গাধিষ্ঠাত্রী শিবাই দেবীর একান্ত মনে আরাধনা করিয়া বরলাভ করিতেছেন—কেমন করিয়া শাহজী নিজ জায়গীর ও স্ত্রীপুত্রাদি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন ইত্যাদি দেখান হইতেছে। আবার অন্যত্র দাদোজী কোণ্ডদেব কিরূপে বালক শিবাজীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন—কিরূপে ১৯ বৎসর বয়সে শিবাজী তোড়ণাদুর্গ জয় করিয়া মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন—আর তাঁহার গুরু দাদোজী মৃত্যু শয্যায় কিরূপ অমূল্য উপদেশ দিয়া শিষ্য শিবাজীকে শিক্ষা দেন—কেমন করিয়া সেই বালক শিবাজী বিজাপুর সুলতানের সভায় অনিচ্ছা সত্বে গিয়াও নির্ভিক চিত্তে সুলতানকে সেলাম না করিয়া উপবেশন করেন—ইত্যাদি অভিনয় করা হইতেছে। কোথাও আবার ২২ বৎসর বয়সে শিবাজী কিরূপে মহাত্মা রামদাস স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন—কিরূপে গো ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ উপদিষ্ট হয়েন—কিরূপে রামদাস স্বামীর ভিক্ষা পাত্রে সমস্ত রাজ্য গুরুদক্ষিণা দেন—কিরূপে শিবাজী রাজা হইয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে এক দিন ভিক্ষা করেন—কিরূপে ব্রাহ্মণবীর মাবজী সোণদেবের ঘৃণিত উপঢৌকন, কল্যাণ নগরের পরাজিত শাসনকর্ত্তা মৌলানা আহম্মদের পুত্রবধূকে সসম্মানে ও সগৌরবে বিজাপুরে প্রেরণ করেন—এই সকল অভিনীত হইতেছে। আবার কোথাও আফজাল খাঁ কিরূপ বিশ্বাস হন্তা হইয়া শিবাজী আসিবামাত্র তাঁহার মস্তকে যমদাঁড় অসির আঘাৎ করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইতেছেন—কেমন করিয়া শিবাজী বাঘনখ দিয়া আফাজাল খাঁর উদর বিদীর্ণ করিতেছেন—কেমন করিয়া বিচ-বিয়র নামক কর্ত্তারিকা দ্বারা মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়া চলিয়া যাইতেছেন ইত্যাদি দেখান হইতেছে। এক এক দল এক একটি পালা অভিনয় করিয়া শিবাজীর প্রতিমূর্ত্তি স্কন্ধোপরি বহন করিয়া আবদুল্লা বুরুজে আফাজাল খাঁর কবর পর্য্যন্ত গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। আর পূর্ব্ব স্মৃতিতে মহারাষ্ট্রজাতি

উন্মত্ত হইয়া উৎসব করিতেছে। অতীতের কাহিনী পুনঃ পুনঃ আলোচনা না করিলে জীবনের ভবিষ্যৎ প্রহেলিকা বোধ হয় উদ্‌ঘাটিত হয় না, তাই মানুষ মাত্রেরই একটা অতীতের স্মৃতিতে আকর্ষণ বর্ত্তমান দেখা যায়। যে জাতি সেই অতীত স্মৃতি ভুলিয়া যায় সে জাতির পুনরভ্যুদয় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এই জাতীয় মহোৎসবে এই বৎসর একদল রমণীর আগমন হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকেই কাঁচনী দ্বারা বক্ষঃস্থল দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং সর্ব্বদা সঙ্গে এক প্রকার বাঘনখী পাঞ্জা রক্ষা করেন এবং হস্তে দীর্ঘদণ্ড ত্রিশূল বা পরশু বহন করেন। কি জাতি বা কি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে একমাত্র উত্তর দেন—"নারীসঙ্ঘ"। ইহারা শিবাজী উৎসব দর্শনে প্রতাপগড়ে আসিয়াছেন ও কিছুদিন অবস্থান করিবেন এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। সঙ্গে পরিচারিকা প্রভৃতি কিছুই নাই নিজেরা নিজেদের সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন। কেও কেও উৎসব দর্শনে মেলার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন কেও বা এক স্থানে দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অভিনয় দর্শন করিতেছেন। আমাদের সতীনাথের সহিত ক্রমে ক্রমে এই রমণী সঙ্গের কাহারও কাহারও আলাপ পরিচয় হইয়াছে। সতীনাথ ইহাদের গঠন সৌষ্ঠব ও শক্তি প্রকাশক আকার ইঙ্গিত দেখিয়া একটু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। উৎসবের আজ তৃতীয় দিবস। সদানন্দ ঠাকুর ইহার পূর্ব্বদিন মন্দিরে ফিরিয়াছেন। অপরাহ্নে সতীনাথ দেখিতে পাইলেন যে একাধিক স্থানে সেই রমণী-সঙ্ঘের এক একটি রমণী কতকগুলি নারী পরিবৃত হইয়া তাহাদের উপদেশ শুনাইতেছেন। সতীনাথ কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া কি উপদেশ দিতেছেন তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বক্তা রমণী রামায়ণের কথা উল্লেখ করিয়া সীতার প্রতি রাবণের অত্যাচার, মহাভারতের কথা তুলিয়া দ্রৌপদীর প্রতি দুঃশাসনের অত্যাচার, রাজতরঙ্গিণীর কথা তুলিয়া কাশ্মীর রাজগণের অমানুষিক নারী-নির্য্যাতন, সোমনাথের মন্দিরে ও তাঞ্জোর মন্দিরে অর্দ্ধসহস্র দেবদাসীর নিয়োগ ইত্যাদি শুনাইতেছেন। শেষে রাজপুত রমণীগণের প্রতি মুসলমানের অত্যাচার ও "জহরব্রত"র কথা শোনাইয়া বক্তা বলিতেছেন—দেশকাল পাত্র বিচারে এখন নারীজাতি নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে না পারিলে আর উপায় নাই। যে ক্ষাত্রশক্তি নারীর প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিত—রামায়ণের সে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ চরিত্র—সময়ের স্রোতে ডুবিয়া গিয়াছে। মহাভারতে সেই ক্ষাত্রশক্তি স্বয়ং নারীর প্রতি অত্যাচার করিয়া হীনবীর্য্য হইয়া যায়। মুনি ঋষিগণ সেই মহতী কৌরব সভায় উপস্থিত থাকিয়াও নারী নির্য্যাতন নিবারণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা একান্ত মনে প্রার্থনা করেন যেন এই ক্ষাত্রশক্তি এই ব্রহ্মাবর্ত্তে আর না থাকে। সেই অভিশাপে আজ ভারতের পুরুষ হীনবীর্য্য—নিজ স্ত্রীকন্যা ভগ্নী রক্ষা করিতে অক্ষম বরং নিজেরাই রমণীদের উপর অবিরাম নির্য্যাতন করিতেছেন। এখন আর আগুনে ঝাঁপ দিলে চলিবে না। তাহা হইলে আর এই হিন্দুজাতি থাকিবে না। আমাদের এই নারী সঙ্ঘের মধ্যে যত রমণী দেখিতেছেন ইহাদের প্রত্যেকেই ভীষণ নির্য্যাতন পীড়িতা হইয়া এই সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেখানে অসহায় অবস্থায় অত্যাচারী পুরুষ আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে সেখানে সমাজ পুনর্গ্রহণে কুণ্ঠিত হইলে আমরা মরি নাই বা জাতি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিনাই। এক এক জন যেমন ঘৃণিত ও পরিত্যক্তা হইয়াছি অমনি এই সঙ্ঘে যোগদান করিয়া মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি।

ভীষণ অত্যাচারের প্রতিরোধ চেষ্টায় কত স্থানে কত অত্যাচার নরকের কীটকে বাঘনখের দ্বারা পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়াছি কত রমণীরত্ন এইরূপ অসমান যুদ্ধে এই সজ্ঘকে অঙ্গহীন করিয়া মৃত্যুর কোলে শায়িত হইয়াছেন। তোমরা আর পুরুষের মুখাপেক্ষা করিও না—যে পিতা, যে ভ্রাতা সমাজের ভয়ে অযোগ্য পুরুষের হস্তে কন্যা রত্নকে অকাতরে অর্পণ করিতে পারেন—সে পিতা সে ভ্রাতা কখনই মিত্র নহেন। সে পিতা সে ভ্রাতার অবাধ্য হইয়া নারীসজ্ঘে যোগদান করিতে হইবে। * মহাশক্তির অংশ—আমরা—আমাদের অপবিত্র করে কে? যে সমাজে তা করে তার অস্তিত্ব নাই, তার মস্তকে পদাঘাত করিতে হইবে।

সতীনাথ স্তম্ভিত ভাবে এই বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন অফজাল খাঁর কবরের নিকট যে নারী বক্তৃতা দিতেছেন সেই জনতার দিকে গমন করিবার জন্য একজন পূজারী তাঁহাকে ডাকিতেছেন। সতীনাথ অন্য মনে তথায় গমন করিলেন। তথায় গিয়া শুনিলেন সেই নারীবক্তা বলিতেছেন তোমাদের সম্মুখে যে সেনাপতির মস্তক কবরে প্রোথিত তিনি যখন দৈবজ্ঞের মুখে শুনেন যে প্রতাপগড়ের সমারায়োজনে তাঁহারা মৃত্যু তখন তিনি এক এক করিয়া তাঁহার অন্তঃপুরস্থ ৭৭টি বেগমকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া তবে যুদ্ধে বহির্গত হয়েন। এই পুরুষগণ নারীকে ছাগলের মত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এখন আর এরূপ করিতে দিলে চলিবে না—পুরুষের অধঃপতনে নারীর রক্ষার ভার নারীকেই লইতে হইবে। এইরূপে উৎসব ক্ষেত্রের নানাস্থানে নারীসঙ্ঘ উদ্দীপনা সূচক বক্তৃতা দিতেছেন দেখিয়া সতীনাথ একটা গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন। সন্ধ্যার সময় মন্দিরে প্রত্যাগমন করিয়া সদানন্দ ঠাকুরের সন্ধ্যাকার্য্য সমাপন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা সমাপনান্তে সদানন্দঠাকুর সতীনাথকে অহ্বান করিলেন। সতীনাথের চিন্তান্বিত ভাব অবলোকন করিয়া সদানন্দঠাকুর কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে সতীনাথ উষাকালের সেই স্তবপাঠ শ্রবণে তাঁহার মনে যে ভাব উদয় হয় এবং তাহার মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই উৎসব ক্ষেত্রে এই নারীসজ্ঘের ব্যাপার সমস্তই গুরুদেবের শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। সদানন্দ ঠাকুর কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া সতীনাথকে বলিলেন ওসব কথা পরে বুঝিবে, এখন তীর্থ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা কর। এমন সময় সেই নারী সঙ্ঘের মধ্য হইতে এক পাগলিনী আসিয়া সদানন্দ ঠাকুরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া গীত আরম্ভ করিয়া দিল।

মানুষকে না ভক্তি করে
কারে ভক্তি কর্‌বে বল।
মানুষই ত জীব শ্রেষ্ঠ
মানুষ ই ত দেবের বল।
দেবের বড় সাধ্যগণ—
তারাও মত্যে করে পূজন,

---

* বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ এক সময় ব্রাহ্মণদের জাতি নাশ করিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে মহারাণী স্বয়ং উদ্যুক্তা হইয়া রাজাকে হত্যা করিয়া ছিলেন ও স্বয়ং সহ মৃতা হয়েন।

গর্গআদি ঋষিগণ
এরাত সব মানুষ ছিল ;
গোলোকেশ স্বয়ং যিনি
নরের পদ ধরেন তিনি
মানুষ ছিল ভৃগুমুনি
তবে, মানুষ কত বড় বল।
মানুষ তুমি দেখলে রে ভাই
বুঝ্‌তে তার তুলনা নাই
নরকে পূজা করে সবাই
তেমন মানুষ কোথা পাব বল ॥
মানুষ এবার পেলে পরে
রাখবো তারে হৃদয়পূরে
কল্পনাও ধরতে নারে
মানুষ পূজায় কত বল ॥

দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে পূজারীগণ ও অন্য লোক আসিয়া জুটিয়া গেল। সকলেই পাগলিনীর গান শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সদানন্দঠাকুর বিরক্তির ছলে বলিলেন "পাগলী ! ঢের হয়েছে—এখন গানের সময় নয়, তোমার নিজ কাজে চলিয়া যাও।" কে যেন কাকে বলিতেছে পাগলীর দৃক্‌পাত নাই সে নিজের মনে গান গাহিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। তখন কৌতুহলাক্রান্ত দর্শক মণ্ডলী হইতে প্রশ্ন হইল—"পাগলি ! তুই, পাগল হলি কেন ? তোর যেন কি একটা চাপা দুঃখ রহিয়াছে—তোর কি হয়েছে ?" প্রশ্ন শুনিয়া পাগলিনী বিকট অট্টহাসি হাসিয়া অসংলগ্ন ভাবে কথা বার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিল। কখন উচ্ছাসের সহিত বলিয়া উঠিল "হায়। হায় ! সে স্বামিজীকে বড় ভক্তি করিত—বড় বিশ্বাস করিত—স্ত্রী পুত্র অর্পণ করিয়া ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল—শেষ কি পরিণাম কি বিশ্বাস ঘাতকতা—কি নারকীয় আচরণ" ইত্যাদি। আবার পরক্ষণেই ধুয়া ধরিয়া—"প্রভুভক্তি—! ও কি শঠতা—! কি আত্ম-বঞ্চনা—! প্রভুভক্তি স্ত্রী কন্যা দিয়া দাসত্ব রক্ষা দাসত্বের উন্নতি: হায়! হায়! নারীর কপাল! ইত্যাদি। আবার নাচিয়া বলিতে লাগিল—"কেমন সুন্দর সমাজ—! কেমন সুন্দর সভ্যতা! পঁযট্টি বছরের ধনকুবের-আমার বর হবেন! বাবা অনেক টাকা ধন দৌলৎ পাবেন—আর কি তাতেই আমার জীবন স্বার্থক হবে—কেমন—ওঃ কি রক্ত—কি ভীষণ ছোরা—কি অকৃতজ্ঞতা—কি অপরিণাম দর্শন ইত্যাদি। পাগলিনীর কথা শুনিয়া শ্রোতাগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল তখন সেই পাগলিনী আবার গান ধরিল—

কি বিচার কলিকালে—
দুর্ব্বলের বলিদান ছেড়ে দিয়ে পুঃশ্ছাগলে ॥
"যজ্ঞার্থে পশব স্বষ্ট" পুরুষ পশু তন্ত্রবলে—
ধন্য ধন্য কলির কেলী—নারীর বলি দেয় সকলে ॥

হঠাৎ অদূরে মহাকোলাহল শ্রুতিগোচর হওয়ায় সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। পাগলিনী ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই দিকে নিমেষ মধ্যে চলিয়া গেল এবং সদানন্দঠাকুর সতীনাথ ও অন্যান্য পূজারীগণও সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কোলাহল বাড়িতে লাগিল—মার! মার! শব্দ উঠিল, লোক চারিদিক হইতে ছুটিতে লাগিল—কতক লোক বা চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সদানন্দঠাকুর ব্যাপার কি-কিছু বুঝিতে না পারিয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ত্বরান্বিত হইলেন। অদূরে দেখিতে পাইলেন তিন চারিজন লোক একটি নারীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া পলায়ন করিতেছে ও তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক লোক ও নারীসঙ্ঘের রমণীগণ ছুটিতেছেন। সদানন্দ ও সতীনাথ সেই দিকে ধাবিত হইলেন। নিকটে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে দুঃখ ও ক্ষোভের সীমা রহিলনা। দস্যুগণ একটী রমণীকে নারীসঙ্ঘ হইতে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া পলায়ন করিতেছে ও তাহাদের সঙ্গীগণ জনতার উপর অত্যাচার করিয়া রমণীর উদ্ধার চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে। রমণীসঙ্ঘ হইতে যত রমণী দস্যুদের প্রতি আক্রমন করিতেছেন ততই দস্যুগণ তাদের প্রতি ধাবিত হইতেছেন, ও বেশ রক্তারক্তি হইতেছে। সতীনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না এক লাফে গিয়া যে চারিজন দস্যু রমণীকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহাদের উপর পড়িলেন ও একবারে চারিজনকে বিধ্বস্ত করিয়া রমণীকে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু রমণী তখন অজ্ঞান কাজেই তাহাকে ভূমিতলে রাখিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অপর দস্যুগণ এই ঘটনা দেখিয়া যেমন সতীনাথের দিকে ফিরিল অমনি সদানন্দ-ঠাকুর তাদের প্রতি ধাবিত হইয়া বাধা দিতে লাগিলেন। এক দিকে সতীনাথের সহিত চারিজনের বিবাদ ও অন্যদিকে অবশিষ্ট দস্যুগণের সদানন্দের প্রতি আক্রমণ। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর সতীনাথ ও সেই মূর্চ্ছিতা রমণীকে লইয়া রমণীগণ প্রস্থান করিলেন। অবশিষ্ট দস্যুগণ যেন আরও উত্তেজিত হইয়া সদানন্দের বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ও পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল। এক দস্যু সুযোগ পাইয়া যেমন ছোরা উঠাইয়া সদানন্দের পৃষ্ঠে মারিতে উদ্যত হইল অমনি দেখা গেল বিদ্যুৎ বেগে সেই পাগলিনী আসিয়া তাহার ত্রিশূল দ্বারা দস্যুকে ভূপতিত করিল। দস্যুগণ তখন সদানন্দকে ছাড়িয়া সেই পাগলিনীর প্রতি ধাবিত হইল। কি অদ্ভুত শিক্ষা সেই পাগলিনী তখন এক হাতে ত্রিশূল ও অন্য হস্তে পরশু লইয়া এমন ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল যে দস্যুগণ তাহার নিকট ত যাইতেই পারিল না পরন্তু একে একে আহত হইয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল। জনসঙ্ঘের লোকগুলি তখন সাহস পাইয়া সেই পাগলিনী ও সদানন্দর সাহায্যার্থে সেই যুদ্ধে যোগদান করিলেন। দস্যুগণ হতাশ হইয়া এবার পলায়ন করিতে লাগিল। হৈ হৈ রবে লোক জন তখন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল কিন্তু কেহই দস্যুগণকে ধরিতে পারিল না।

দস্যুগণ চলিয়া গেলে পাগলিনীকে সঙ্গে লইয়া সদানন্দঠাকুর যেখানে সতীনাথ যুদ্ধ করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন চারিজন দস্যু আঘাতের প্রচণ্ডতার জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে কিন্তু প্রাণ দেহত্যাগ করে নাই। ব্যস্ততা সহকারে তাদের মুখে জল দিয়া ও ক্ষতস্থান গুলির পরিচর্য্যা করিয়া তাহাদের চারি জনকেই কোলে করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে আনয়নের ব্যবস্থা করিলেন। সতীনাথ ও মূর্চ্ছিতা রমণীকে যখন নারীসঙ্ঘের রমণীগণ লইয়া গিয়াছেন তখন

সদানন্দ তাহাদের জন্য ব্যাকুল না হইয়া দস্যুদের মূর্চ্ছিত দেহ লইয়া মন্দিরে আসিলেন। সমস্ত রাত্রি সেই পাগলিনীর সাহায্যে সেবা শুশ্রূষা করিয়া প্রাতঃকালে তাহাদের চেতনা ফিরাইয়া আনিলেন। যেই দস্যুগণ কথা কহিতে চেষ্টা করিল অমনি ইসারা দ্বারা সদানন্দঠাকুর তাদের কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। সেবা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া, পাগলিনীকে সঙ্গে লইয়া এইবার সদানন্দঠাকুর সতীনাথকে দেখিতে চলিলেন। পাগলিনীর আচরণ দেখিলে আর কেহই ভাবিতে পারিবে না যে সে প্রকৃতই পাগল।

রমণীসসঙ্ঘ যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন সেই সামান্য গৃহের এক অতি সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে সতীনাথ এখনও অজ্ঞান অবস্থায় শায়িত এবং একটী রমণী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আহত ব্যক্তির সেবায় নিযুক্তা। গত রাত্রি হইতে পালা করিয়া আহত সতীনাথের এইরূপে সেবা করা হইতেছে। যে রমণী নির্য্যাতিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন তিনি অল্প চেষ্টার পরেই চেতনা লাভ করেন ও তিনিই পালা হিসাবে এখন সতীনাথের পার্শ্বে আসীনা। সদানন্দঠাকুর ও পাগলিনী সেই কুটীরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। সদানন্দঠাকুর সেই রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইলেন কিন্তু পাছে তাঁহার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় সেই ভয়ে বাহ্যিক বিকার চিহ্ন সযতনে গোপনেব চেষ্টা করিলেন। এদিকে পাগলিনী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া কি একটা করিল যাহার ফলে আহত ব্যক্তির পার্শ্বস্থিতা সেই রমণী উল্কাবেগে কুঠির হইতে বহির্গতা হইয়া গেলেন। সদানন্দ ভাবিতেছেন—কি সুন্দর—বয়সেও ষোড়শী—রূপেও ঠিক ষোড়শী।

পাগলী এবার আহতের সেবায় নিযুক্তা হইলে—সদানন্দ ঠাকুর সতীনাথের শ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কপোল দেশের মাংসপেশী প্রভৃতির সঞ্চালন পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন অতিশয় শোণিত মোক্ষণ জন্য সতীনাথ অতিশয় ক্ষীণ অবস্থায় অবস্থিত। ক্ষতস্থানগুলি উত্তমরূপে প্রলেপ দ্বারা আবদ্ধ করা হইয়াছে এবং এখন প্রায় শোণিত-মোক্ষণ বন্ধ হইয়াছে। সদানন্দ যাহা বুঝিলেন তাহাতে হৃদয়, ফুস্‌ফুস্, বা আভ্যন্তরীন যন্ত্রের কোনটিই আঘাত প্রাপ্ত নাই। সুতরাং বিপদের কোন আশঙ্কা নাই। তবে সতীনাথের সুস্থ হইতে কিছু সময় লাগিবে। ইসারা করিয়া পাগলিনীকে বাহিরে যাইতে বলিলেন ও একটু গরম দুগ্ধ আনিতে আদেশ করিলেন। পাগলিনী অতি ধীরে অতি সন্তর্পণে কুটির হইতে বাহির হইয়া গেলে সদানন্দ ঠাকুর সতীনাথের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া মুখ ও নাসিকার নিকট কিছুক্ষণ হস্ত সঞ্চালন কবিলেন। প্রত্যেক বার হস্ত সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল আহত ব্যক্তির কপোল দেশের মাংসপেশীগুলি কার্য্য করিতেছে। শেষে সতীনাথের নাকের নিকট কি একটা জিনিষ ধরিলেন। কয় সেকেণ্ড মাত্র সেই দ্রব্যের ঘ্রাণ সতীনাথের নাক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র সতীনাথ চাহিলেন কিন্তু তীব্র দৃষ্টি সদানন্দের আজ্ঞায় আবার চক্ষু মুদিত করিলেন। সদানন্দ এবার সরিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং পাগলিনীর প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অতি অল্পক্ষণ পরেই গরম দুগ্ধ লইয়া পাগলিনী ধীরে ধীরে কুটিরে ফিরিল। দুগ্ধটুকু নিজহস্তে অতি অল্পমাত্রায় আহত ব্যক্তিকে সদানন্দ সেবন করাইয়া দিলেন ও কালবিলম্ব না করিয়া কুটিরের বাহিরে চলিয়া আসিলেন। বাহিরে আসিয়া রমণী সঙ্ঘের লোককে রোগীর নিকট যাইতে অনুরোধ করিয়া পাগলিনীকে বাহিরে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। ক্ষণকালমধ্যে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা সেই

দস্যু নির্য্যাতিতা রমণী কুটিরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন এবং পরক্ষণেই পাগলী বাহির হইয়া আসিল।

পাগলিনী রমণী-সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—দস্যুদের চারিজন আহত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গনে শায়িত, তাহাদের সেবার জন্য আমাদের মধ্যে পালা করিয়া এই ঠাকুরের সাহায্য করিতে হইবে। নিজ সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া সকলে ঠিক হও—আমি এখন আর মন্দিরে যাইব না—ঠাকুর একা চলিয়া যাইতেছেন। সদানন্দঠাকুর ভাবিতেছেন—কি রহস্য! মানুষ ঠিক কলের পুতুল। যখন যেরূপ নাচায় তখন ঠিক সেইরূপ নাচে। থামালে থামে ফেলিলে পড়িয়া থাকে—কাঁদালে কাঁদে—হাসালে হাসে! কোথায় আগামীকল্য তীর্থ যাত্রায় রওনা হইব না এই এক ঘোরতর বিপদ! সতীনাথের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এখন ৬ মাসের মধ্যে তার উত্থান শক্তি হইবার আশা নাই। তার পর যে ষোড়শী রমণীরত্নের জীবন রক্ষার্থ সে এই বিপদে পতিত তাহার অনিন্দ্যরূপ মানব চরিত্রের উপর কি কার্য্য করিবে কিছুই বলা যায় না। সতীনাথ শিক্ষিত ও চরিত্রসম্পন্ন স্বীকার করি, কিন্তু কালধর্ম্মের প্রভাব এড়ান অতিশয় দুরূহ, এমন কি প্রায় অসম্ভব। ঈশ্বরের কৃপায় সতীনাথ শীঘ্রই স্থানান্তরিত করিবার মত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আমি যে কি উপায়ে প্রমথনাথের উদ্বেগ নিবারণ করিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না, তারা পিতাপুত্রীতে আমার জন্য কাশীধামে অপেক্ষা করিবে; কিন্তু আমার যাওয়া এখন অনিশ্চিত। পাণ্ডাদের যেরূপ প্রতারণা ও অত্যাচার তাহাতে প্রমথনাথ ও মাধুরীর কোন বিপদ না ঘটে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে একটী নারী সমবিভ্যাহারে সদানন্দঠাকুর মন্দির প্রাঙ্গণে সেই আহত দস্যুদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহদের সেবা শুশ্রূষার দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

সরোজনলিনী ও নারীত্বের আদর্শ

শ্রীযুক্তা সতী দেবী

আজ নারীর আদর্শ কি এই নিয়ে চারিদিকে একটা বিচার বিতর্ক চলেছে। কেউ বলচে নারীর কর্ম্মক্ষেত্র ঘরের ভিতর—বাইরের জগতে উন্নতি করার চেয়ে ঘরের ভিতর থেকে ঘরেরই ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুলিকে হৃদয় দিয়ে বেঁধে দৃঢ় ও একতাবদ্ধ করে তোলাই হচ্চে তার ...ব সুতরাং তার আদর্শও তদনুযায়ী। আবার কেও বা বলচে না তা কেন? শক্তি সাহস ব ...কৌশলে নারী পুরুষের চেয়ে কম কিসে? এও তো দেখা গিয়াছে বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের প্রতিযোগিতায় নারী পুরুষের চেয়ে কম শক্তির পরিচয় দেয় না। তবে সেই বা একটী বাঁধাবাঁধি নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে বদ্ধ থাকবে কেন? সুতরাং নারী ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র যখন এক তাদের আদর্শও এক। ফলে এই অনুসারে দেশে দেশে তথাকথিত নারী-জাগরণের খুব একটা সাড়াও

পড়ে গিয়েচে। শুনেছি ইউরোপের ও আমেরিকার মেয়েরা স্বাধীনতার ঝোঁকে নাকি এতখানিই এগিয়ে চলেচে যে তারা পুরুষের সম্পর্কমাত্রকেও বিসদৃশ এবং নারীর মা হওয়াটাকেও একান্ত অপমানকর বলে মনে করে। অবশ্য বাড়াবাড়িতে প্রথম পক্ষও বড় কম যান না। তাঁরা আবার নারীকে এতখানিই ঘরের জিনিস করে তুলতে চান যে তাকে চাদর দিয়ে মুড়ে চারিদিকে আকাশ সমান পাঁচিল তুলে দিয়ে একেবারে তার বাইরের দৃষ্টিমাত্রকেও বন্ধ করে তাকে বাক্স সিন্দুকের জিনিস করে তুলতে চান। ফলে এই দোটানার মধ্যে পড়ে সত্যিকারের নারীপ্রকৃতি হাঁপাইয়া মরে।

এখন এর সত্যি কোনটা? আমাদের মনে হয় দুইয়ের মধ্যেই খানিকটা সত্যি ও খানিকটা মিথ্যা আছে। যাঁরা বলেন নারীর শুধু ঘরের অধিকার, তাঁদের বলি ঘর কি ঐ পাঁচিল ঘেরা জায়গাটুকু নাকি? একটু বড় করে দেখলে এই বিশ্ব সংসারই ত আমাদের মানব জাতির ঘর। হৃদয় দিয়ে সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম্মী পর্য্যায়গুলিকে এক করে বেঁধে একটী কেন্দ্রীভূত শক্তিতে গড়ে তোলাই যদি নারীর কাজ হয় তাহলে বাইরের আমাদের বড় সংসারের সমস্ত মানব জাতিকে এক করে বেঁধে এক মহামানব জাতিতে গড়ে তুলবে কে নারী প্রকৃতি ছাড়া। সুতরাং সঙ্কীর্ণ ভাবে ঘর বল্‌তে আমরা যা বুঝি তার বাইরেও নারীর দরকার আছে। আবার যাঁরা বলেন ঘর টর নয় পুরুষের বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রেই নারীর কর্ম্মক্ষেত্র সুতরাং নারী লড়াই করবে, রাজ্য পরিচালনা করবে, চাষ আবাদ শিল্প বাণিজ্য ব্যাটাছেলেরা যা কিছু করে সবই করবে। তবে যে এখন করে না,—তার কারণ তার শক্তিদৈন্য নয় পুরুষে তাকে ঠেলে টুলে ঘরের মধ্যে পুরে রেখেছে বলে। আমরা কিন্তু তাঁদের বলি তাঁদের একথাটাও সত্যি নয়। নারীর সঙ্গে একটা ঘরের ভাব জড়িয়ে আছে তা অস্বীকার করা যায় না। সেই হিসাবে তার কর্ম্মক্ষেত্র থেকে একেবারে ঘরের অংশ বাদ দেওয়া যায় না। আমরা নারীর সব অস্বীকার করতে পারি কিন্তু তার মাতৃত্বকে অস্বীকার করি কি রকম করে। এই খানেই তার পুরুষের সঙ্গে আকাশ পাতাল ব্যবধান। পুরুষ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নারীর মাতৃত্বের সহায়ক হতে পারে কিন্তু নিজে শত চেষ্টা করলেও মা হতে পারে না। আবার নারী জোর করে দু'এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটালেও সাধারণ ভাবে মাতৃত্বকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। সৃষ্টির এই সৃজন ও পালনের বড় দিকটায় নারীর কর্ত্তব্য যা 'তা' মুখ্য, পুরুষের গৌণ মাত্র।

এখন ঘর বা অন্য কথায় সংসার জিনিষটার ভিত্তি প্রধানতঃ এই মাতৃত্বের উপর। পুরুষের আপনার মধ্যে প্রকৃতির প্রেরণাকে সার্থক কর্‌তে ঘর বা সংসার হয়ত না হলেও চল্‌তে পারে কিন্তু নারীর নারী প্রকৃতির সার্থকতা লাভ কর্‌তে ঘর না হলে আর চল্‌বার জো নেই। রাস্তায় রাস্তায় ত আর সন্তান প্রসব করা যায় না বা সন্তানরা যতদিন না কর্ম্মক্ষম হয় রাস্তায় রাস্তায় ত আর তাদের মানুষ করা চলে না। এর জন্য বাঁধা বন্দোবস্ত ঘর বা সংসার চাই। এই ঘরবাঁধার যা গরজ তা প্রধানতঃ নারীর নিজের। পুরুষ হয়ত তাঁর সহায়ক হোতে পারে কিন্তু তা'র প্রেরক নয়। এই ঘর বাঁধার প্রবৃত্তি শুধু মানুষের মধ্যে নয় ইতর প্রাণীদের মায়ের মধ্যেও আছে। পক্ষিণী ডিম পাড়বার সময় বাসা বাঁধে—জলচরেরা জলের ধারে ঘোগ খোঁজে যেখান থেকে জলের স্রোত তাদের ডিমগুলিকে না ভাসিয়ে নিয়ে যায়, বাঘ ভাল্লুক প্রভৃতি বন্য পশুরা গুহা দেখে নেয়,

বিড়াল কুকুর ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তুরা এমন একটা স্থায়ী ও নিরাপদ আশ্রয় দেখে নেয় যেখানে তারা নিরিবিলিতে সন্তান প্রসব ও কিছুদিন ধরে নিশ্চিন্তায় তাদের পালন করতে পারে। এখন এ গুলি সাময়িক ভাবে ঘর ছাড়া আর কিছু নয় এবং এদের প্রয়োজন ও যা তা নারীর নিজের। পক্ষী ইত্যাদি কতকগুলি প্রাণী যারা জোড় বাঁধে তাদের মধ্যে পুরুষেরা হয়ত মেয়েদের এই ঘর বাঁধতে এবং ঘরের কর্ম্ম সুচারু রূপে নিষ্পন্ন করতে সাহায্য করে কিন্তু বিড়াল কুকুর ইত্যাদি জানোয়ার যাদের নির্দ্দিষ্ট কোনও জোড় নেই তাদের মধ্যে এই কাজটা মাকে নিজের গরজেই করে নিতে হয়। আর পক্ষীদের ভিতরেও পুরুষপক্ষীর পক্ষিণীকে যে একটু আধটু সাহায্য করে তা বারবরদারী মাত্র—শুধু পক্ষীমাতাকে নীড় বাঁধিতে সহায়তা করা, তাকে তা-দেওয়ার কাজে একটু আসান দেওয়া, ছানাদের জন্য খাবার সংগ্রহের কাজে সাহায্য করা, বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে পক্ষিণীর সংসারকে রক্ষা করা, ইত্যাদি। যেখানে পুরুষ থাকে না সেখানে মাকে নিজেই এই কাজগুলো কর্ত্তে হয়। এখন তাই যদি হয় অর্থাৎ ঘর সংসারের প্রয়োজন পুরুষের চেয়ে নারীরই যদি বেশি হয় তাহ'লে যাঁরা বলেন নারী ঘর সংসারের আদর্শ ভুলে পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষেরসঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চল্‌বে তাঁদের যুক্তিও অনেক খানি অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

এই দুই বিরুদ্ধবাদীদের ঝগড়ার মীমাংসা করে নারীর আদর্শ কি তার কর্ম্মক্ষেত্র কোথায় এবং তার সত্যিকারের কাজই বা কি এর একটা নির্দ্দিষ্ট মীমংসায় পৌছিতে হলে আমাদের সর্ব্ব প্রথম কয়েকটী জিনিস ভেবে দেখ্‌তে হয়। মানব-জাতির সমগ্র ভাবে জন্মান বাঁচা এবং পরিনতির দিক্‌দিয়ে বিচার কর্‌লে সত্যি করে এই জগৎটাকে কি বলে মনে হয়? কোটী জীবধাত্রী এবং কোটী জীবের আশ্রয় স্থল। এই প্রকাণ্ড ধরণী একটী প্রকাণ্ড সংসার ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ, জন্তু, জানোয়ার, কীট, পতঙ্গ এই সংসারের অন্তর্ভুক্ত। এই বিশাল সংসারে অনন্ত মাতৃরূপিণী নারী তাঁর অগণিত শিশু সন্তানগুলিকে জন্ম দিচ্চেন—লালন পালন কচ্চেন—সকলকার মাঝখান থেকে এক স্নেহের সূত্রে সকলকে ভ্রাতা ভগিনী সম্বন্ধে আবদ্ধ করে এক পরিবার ভুক্ত করে তুল্‌চেন। এ সংসার প্রধানতঃ তারই সংসার পুরুষ এর মধ্যে থেকে এর শান্তি রক্ষা করে সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে, বা হয় মাতার সংসারের উন্নতির সহায়তা করে। কিন্তু এগুলো সমস্তই বারবরদারী মাত্র। এই বিরাট সংসারের আদর্শকে বাদ দিয়ে দেখ্‌লে তার সমগ্রভাবে এই যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা শান্তিরক্ষার চেষ্টা করা শিল্প বাণিজ্য দ্বারা সাধারণভাবে সংসারের সুখ সুবিধার উন্নতি করার প্রয়াস—জ্ঞানের বিস্তৃতির দ্বারা সাধারণ দৃষ্টিচক্রের প্রসার ইত্যাদি বার-বরদারীর কোনও মূল্য থাকেনা এবং এই অখণ্ড আদর্শের বাইরে ঐ সমস্ত কেবল কতকগুলো ঐক্যসূত্রহীন, পরস্পর ধ্বংসকারী ভাবের সংঘাত হ'য়ে দাঁড়ায়। বস্তুতঃ এই আদর্শ এর মধ্যে আছে। মানুষ কেবল আপনার সংকীর্ণতা জনিত মোহে এই বিপুল সংসারের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধ অনুভব কর্‌তে না পেরে নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করে এবং ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে ও উদ্দাম প্রবৃত্তি জনিত তাড়নায় কতকগুলো বিরুদ্ধ স্বার্থের সৃষ্টি করে নিজেদের মধ্যে কামড়া কামড়ি করে মরে। ভ্রান্তিজনিত অন্ধতা ক্ষুদ্র আদর্শের আলেয়ার পিছনে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় সত্যি-কারের পথ দেখ্‌তে দেয় না, তাতে বিরোধ বাড়ে বই কমে না।

এই ক্ষুদ্রতা খণ্ডতার কলহ কোলাহলের মীমাংসা আছে, নারীর সকল বিরোধ ও পার্থক্য সমন্বয়কারী স্নেহকোমল মাতৃ হৃদয়ে। পুরুষ যেখানে উন্মার্গগামী ভাবের তাড়নায় ধ্বংস সৃষ্টি করে এবং তার চারিদিকে ভাঙ্গারস্তূপ সাদা হয়ে উঠে নারীর লক্ষ্মীর হাতে সমস্ত ভাঙ্গা চোড়া যোড়া লেগে যায় আবার সকলই সুব্যবস্থিত হয়। নারী বিবাদী চিত্তগুলিকে হৃদয়ের রসে গলিয়ে এবং তাদের মধ্যে মানব পরিবারের বৃহত্তর সম্বন্ধের অনুভূতি জাগিয়ে তাদের এক করে বাঁধেন এবং তাঁর স্নেহশাসনের নীচে সব বিরোধের অবসান হয়ে যায়। এই বিশ্বমাতৃত্ব এবং বিশ্ব গৃহিণীত্ব-বিশ্বের সমস্ত সন্তানগুলিকে এক বিপুল মাতৃস্নেহের তলায় আশ্রয় দিয়ে তাদের এক সংসারের অন্তর্ভুক্ত করে তোলা এবং তাদের বিচ্ছিন্ন ও বহুমুখী ও কেবল মাত্র প্রবৃত্তিশাসিত জীবন যাত্রা প্রণালীকে গুছিয়ে এক লক্ষ্যের অধীন করে আনা—ইহাই নারী জীবনের বিরাট আদর্শ এবং আমরা দেখেছি এর বীজ তার প্রকৃতিতে আছে।

কিন্তু লাফ্‌ইয়েত আর এই আদর্শের বিকাশ সংসাধন হয় না—নিজের ছোট সংসারটী থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে একে ফুটিয়ে তুল্‌তে হয়। ভাবে যদি না আসে তাহ'লে ব্যবহারে এর আরোপ চলে না। তাতে মিথ্যাচার হয়। প্রকৃতির ক্রিয়াক্ষেত্রে মিথ্যাচারের স্থান নেই। আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি নারীর কর্ম্মক্ষেত্র ঘর বা সংসার হলেও তা পরিণতিতে বৃহত্তর হয়ে বৃহত্তর সংসারের মধ্যেছাড়া পাবার অপেক্ষা রাখে আবার অন্যদিকে বৃহত্তর জগতে পুরুষের বিচিত্র কর্ম্ম-শক্তির সঙ্গে যোগ রাখ্‌তে হবে বলেই যে তাকে ঘরের ভাব বিসর্জ্জন দিতে হবে তা নয় বরং ঐরূপ ক্ষেত্রে ঐ অসাংসারিক বা সংসারের সঙ্গে স্পষ্টতঃ কোন যোগসূত্র-বিহীন কর্ম্ম পরম্পরকে ঘরোয়া বা বৃহৎ মানব পরিবারের সুখ সুবিধার অনুকূল করে তোলাই তার কাজ। নারীকে এই বৃহৎ ভাবে গৃহধর্ম্মের সাধনা আপনার ছোট সংসারটী দিয়ে আরম্ভ কর্‌তে হবে কিন্তু ক্রমবিকাশে গণ্ডীর প্রসারের দিকে তার প্রবৃত্তি থাকবে। এই প্রসারের দিকে প্রবৃত্তি আপনা আপনি আসে যদি নারী মনে করে তার ঐহিক জীবন অনন্ত জীবনেরই একটি ক্ষুদ্রতম অংশ (সরোজনলিনী পৃঃ ৪৩) এবং সে তার ক্ষুদ্র জীবনের ভিতর দিয়ে বৃহত্তর জীবনের জন্য সাধনা কর্‌চে – বা অন্য কথায় যদি গৃহসাধনা তার কাছে ব্রহ্ম সাধনা বা অনন্ত-জীবন লাভের সোপান হয়। এ সাধনার উত্তর সাধক তার স্বামী। বস্তুতঃ গৃহ-ধর্ম্মের আদর্শের সঙ্গে স্বামীত্বের সম্বন্ধ অতি নিকট। একলা ত আর সংসার হয় না। আর তাছাড়া এই প্রেম-ধর্ম্মের উদ্বর্ত্তনে প্রেমের বা অন্য কথায় হৃদয়ের প্রসারে বিশ্বকে আপনার করে নিতে হলে হৃদয়ের একটি স্থির অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। স্বামীই নারীর ভাবজীবনের উদ্বর্ত্তনের মুখে এই স্থির অবলম্বন বা বন্ধন স্তম্ভ। ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বৃহত্তর গণ্ডিতে ব্যবর্ত্তিত হ'বার পথে এই খোঁটা ধরেই সে কেন্দ্রচ্যুত বা পথহারা হ'তে পরে না। স্বামীই নারী-জীবনের অনন্ত প্রসারের মুখে একটী ধ্রুব বিন্দু যার উপর লক্ষ্য রেখে সে তার এই হৃদয়ের জয় যাত্রায় কখনও উৎকেন্দ্রিত হ'তে পারে না। সেই হিসাবে নারীত্বের সঙ্গে পতিব্রত্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। যাঁরা বলেন সতীত্ব একটা কুসংস্কার মাত্র নারীকে পুরুষের সঙ্গে জোর করে বেঁধে রাখ্‌বার জন্য একটা কৃত্রিম বিধান—তাঁদের মানুষের ভাবজীবনের উদ্বর্ত্তনের অনেক গোপন রহস্যের সঙ্গে পরিচয় নেই। ক্ষুদ্র, খণ্ড খণ্ড, উচ্চ আদর্শহীন, কেবলমাত্র ভোগের জীবন যাপন কর্ত্তে হয়ত এক স্বামীকত্বের কোনও প্রয়োজন হয় না—কিন্তু নারীর জীবনকে যদি উচ্চ আদর্শের প্রেরণায়

অখণ্ড ভাবরসে উদ্দীপ্ত হইয়া অনন্তাভিসারী হইতে হয় তবে সেখানে এর প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। যে হিসাবে নির্ঝরিণীর সমুদ্র অভিসারে তা'র রসধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তার মূলে একটি নিয়ত পরিপোষনশীল নির্দ্দিষ্ট উৎসের প্রয়োজন হয় এবং সেটীকে সরাইয়া লইলে তাহার রসধারাও শুখাইয়া যায় নারীর হৃদয় নির্ঝরিণীর এই জয় যাত্রায় স্বামীর প্রয়োজনও কতকটা সেই উৎসের অনুরূপ। দেবী সরোজনলিনী বর্ত্তমান বাঙ্গালী জীবনের উচ্ছৃঙ্খল ভাব বৈষম্যের মধ্যে কেমন করে এই বিরাট ভাব ধারাটীর সন্ধান পেয়ে ছিলেন সেইজন্য তাঁর জীবনে এই আদর্শের একটি সুন্দর বিকাশ দেখ্‌তে পাই। আমরা তাঁর জীবনী আলোচনা কর্‌লে দেখ্‌তে পাই এ বিষয়ে পতি-প্রেমই তাঁর প্ররোচক হয়ে ছিল। তিনি একদিকে গৃহ-কর্ম্মের যেমন নিপুণ গৃহিনী ছিলেন তেম্নি তাঁর মধ্যে বাহিরের সঙ্গে যোগ স্থাপনের ও বেশ একটা আগ্রহ দেখ্‌তে পাওয়া যেত। এই বাহিরের সঙ্গে পরিচয় তাঁর বেশ স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছিল। তিনি পাশ্চাত্য নারী-সমাজের মত স্বামী থেকে স্বতন্ত্র ভাবে নিজের একটা স্বাধীন দৃষ্টিচক্র সৃষ্টি না করে স্বামীর জীবনের ভিতর দিয়েই বাইরেটাকে দেখবার চেষ্টা করে ছিলেন। দম্পতির এই দেখাই সহজ ও স্বাভাবিক দেখা। মিলন যদি সম্পূর্ণ হয় এবং মিলিত হৃদয় দুটী এক হয়ে গিয়ে যদি একটি মানুষে পরিণত হয় তবে এই মিলিত একটি জীবনের দুইটি দিক্ থাকে—একটি বাইরের দিক্ একটি ভিতরের দিক্,—একটি পুরুষের দিক্ একটি নারীর দিক্। এ দুইএর কোনটীই কম বেশী নয় এবং দুইই সমান প্রয়োজনীয়। স্বামীকে ঘরের ভিতর আসতে হলে স্ত্রীর ভেতর দিয়ে এবং স্ত্রীকেও বাইরে যেতে হবে স্বামীর ভেতর দিয়ে—তবেই এই মিলনমাহাত্ম্য সিদ্ধ হয়। সরোজনলিনী এই খবর জান্‌তেন এবং সেই জন্যই তিনি স্বামীর সমস্ত কর্ম্মপরম্পরার সঙ্গে যোগ রাখ্‌তে ব্যাকুল হোতেন। এই ছিল তাঁর স্বামীর ভেতর দিয়ে বাহিরকে দেখ্‌বার এবং বাহিরের মধ্যে আপনাকে ফুটিয়ে তোলবার সাধনা। অলৌকিক প্রেমে তিনি একেবারে তাঁর স্বামীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন। সেই যে বলতেন "তুমি না থাক্‌লে আমার নিজকে কেমন যেন অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়—তোমার সরোর সব শক্তিই যেন তুমি।" এ খুব সত্যি কথা একনিষ্ঠ প্রেমই যে নারীর সমস্ত শক্তির উৎসব এবং এর অভাব হলে তার হৃদয়ের বাহিরের জগতে প্রসার; উৎসহীন নদীর ধারার মত, ধীরে ধীরে শুখিয়ে গিয়ে বালুকা রাশির মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়, একথা আমরা আগেই বলেছি। সেই জন্যই আমরা তাঁকে বল্‌তে শুন্‌তে পাই "বিধবা হওয়ার মত কষ্ট মেয়ে মানুষের আর কিছু নাই।" এবং অন্যত্র আমরা তাঁকে বল্‌তে শুনি "এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার দুটি পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া তোমাকেও ছেলেকে সুখে রাখিয়া হাতে শাঁখা ও সিঁদুর ভরা মাথা নিয়ে মরিতে পারি।" আমরা যদি মনে রাখি যে যে উৎকট বিলিতি আবহাওয়ার মধ্যে তিনি লালিত ও বর্দ্ধিত সেখানে বড় ভাই বোন-দিগকে নাম ধরে ডাকার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তার পরেও যে সাহচর্য্য ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তিনি সমস্ত জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন তাহাও ভারতীয় ভাব পরিপুষ্টির চেয়ে বিলিতি ভাব জাগ্রত করারই অনুকূল ছিল তা'হলে তাঁর মুখ থেকে এই খাঁটী ভারতীয় নারীসুলভ-বাণী উচ্চারিত হতে শুন্‌লে বিস্মিত না হয়ে পারি না। কিন্তু আমরা জানি যেখানে প্রেম ভোগ-কামনা মাত্র শূন্য এবং বিবাহিত জীবনকে ধর্ম্ম সাধনার একটা পথ মাত্র বলে মনে করা হয় সেখানে ইহাই স্বাভাবিক

পরিণতি। অবশ্য এর স্বাপক্ষে প্রমাণ তাঁর জীবনীতে অনেক আছে এখানে তার সমস্তগুলির উল্লেখ করা স্থানাভাব। তবে তাঁদের বিবাহিত জীবনটাকে কেবল যে তিনি ভোগের অবলম্বন বলে মনে কর্‌তেন না তার প্রমাণ আমরা সেইখানেই পাই যেখানে মাসিক পাঁচ ছশো টাকার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও শুদ্ধ দেশের কাজ কর্‌বার স্থবিধা হবে বলে তিনি স্বামীকে জজীয়তি থেকে কলেক্টরীতে ফিরে আসবার পরামর্শ দিচ্চেন কিম্বা অন্যত্র যেখানে তিনি বল্‌চেন "এত বেশী টাকা আমি চাই না, স্বাভাবিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের এবং কর্ত্তব্য পালনের জন্য যেটুকু দরকার তার বেশী টাকার কি প্রয়োজন, কিম্বা বল্‌চেন গহনার উপর আমার মোটেই লোভ হয় না।" এবং স্বামীকে বিবাহের সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে কাণের দুল উপহার দেওয়ার জন্য অনুযোগ করচেন।

বস্তুতঃ সরোজনলিনীর জীবনে যেমন দেখা যায় এ যুগে হিন্দু-দাম্পত্য আদর্শের এত বড় —স্বামীকে জড়িয়ে এমন করে পূর্ণ হওয়া আর বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় স্বামীর কাছ থেকে লেখা-পড়া শিখে ছিলেন বলে নয় পরন্তু স্বামীত্বের ভিতর দিয়ে এই বৃহত্তর জীবনে দীক্ষা পাওয়ার জন্যই তিনি স্বামীকে গুরুদেব বলে ডাকতেন। স্বামী অবশ্য হৃদয়ের সেই গোপন রহস্যের সংবাদ জান্‌তেন না? আর সেই জন্যই তাঁদের প্রথম মিলনমাঙ্গল্যের বিধি পদ্ধতিগুলি এমন কি তার বাড়ী খানি পর্য্যন্ত তাঁর কাছে এত পবিত্র বলে মনে হত এবং ঐ একই কারণে ঐ অনুষ্ঠানের সামান্য অঙ্গহানি মাত্রও (যথা গায়ে হলুদের অভাব) তাকে এত কষ্ট দিত। এই অপূর্ব্ব পতিপ্রেম ছোট বড় সামান্য অসামান্য সকল কিছুতেই নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা মিলাইয়া নেবার ক্ষমতা এবং একটা স্বাভাবিক অখণ্ড দিব্য দৃষ্টি এই সব কয়টীতে মিলিয়া—সরোজনলিনীতে পরে আমরা যে পরিণতি দেখ্‌তে পাই তাই এনে দিয়ে ছিল এর বিকাশের ক্রমের কথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। সরোজ নলিনীর জীবনে যে একটা স্বাভাবিক অখণ্ড দৃষ্টি, একটা সহজ ভূমার সঙ্গে যোগ ছিল—যার কথা আমরা পূর্ব্বে নারী জীবনের উদ্বর্ত্তনের পক্ষে অপরিহার্য্য বলেছি, তা তাঁর জীবনীলেখক স্বামীর বিবৃতি থেকেই বুঝতে পারা যায়। তিনি এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন "ঐহিক জীবনকে তিনি অনন্ত জীবনের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ বলে বিশ্বাস কর্‌তেন (সরোজ নলিনী পৃঃ ৮৩) তিনি যে এই জীবনটাকেই সব বলে মনে কর্ত্তেন না এবং এই জীবনে একটা অনন্ত জীবনের আভাষ দেখ্‌তে পেতেন তার প্রমাণ পাই আমরা নীচের কোটেসানগুলি থেকে—

১। সরোজ নলিনী দ্বিজেন্দ্রলালের 'হেসে নাও দুদিন বৈতনয়' এই গানটী প্রায়ই গাইতে ভাল বাসতেন। (স,ন, পৃঃ ৪৩)

২। "সত্যি জীবনটা বড় মজার।" (স,ন-পৃঃ ২৩)

৩। খোকা বাল্যে পদর্পণ করলে 'তোমারি দেহে পালিছ স্নেহে তুমি ধন্য ধন্যহে' ইত্যাদি সঙ্গীত গাহিয়া শিখাইতেন" (স, ন পৃঃ ৬৩)।

৪। "মানবাত্মার অবিনশ্বরতায় ও পরলোকে পূনর্মিলনের বিশ্বাস তাঁর মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা ছিল।" (স, ন-পৃঃ ২৭)

৫। "তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূর আমি ধাই' এই গানটী সরোজ নলিনী প্রায়ই গাইতে ভাল বাসতেন।" (স, ন-পৃঃ ২৮)

এই অখণ্ড ভাবের উদ্বুদ্ধ বিস্তৃত চিত্তে যে আদর্শ পড়ে তা আর সঙ্কীর্ণ থাক্‌তে পারে না। ফলে সরোজনলিনীর জীবনে তাহাই ঘটেছিল। আমরা তাঁর চিত্তকে এই অখণ্ড-ধর্ম্মিতার জন্য স্বামীর ক্ষুদ্র-গৃহ-গণ্ডী থেকে ব্যাবর্ত্তনে বৃহত্তর হতে হতে সমস্ত বাঙ্‌লা দেশে ছড়িয়ে পড়তে দেখতে পাই। স্বামীপুত্রের ছোট সংসার ধীরে ধীরে বাঙ্‌লার সমস্ত নরনারীকে নিয়ে বড় সংসারে পরিণত হচ্ছিল—ক্ষুদ্র মাতৃত্ব বিশ্ব মাতৃত্বের পথে যাত্রা করেছিল—এর আরও পূর্ণতর বিকাশ আমরা দেখতে পেতুম যদি অকালে কাল তাঁকে আমাদের মধ্য থেকে টেনে না নিত। অথচ এটা যে হচ্ছিল এর পরিচয় তাঁর নিজের উক্তির মধ্যেই আছে যথা "আমি যদি ঘরের কর্ত্তব্যে অবহেলা করি তবে সামাজিক কর্ত্তব্য করবার অধিকার লাভ হবে না" (স, ন—পৃঃ ৩৩)। এই সমস্ত জিনিসটাই প্রেমের প্রেরণায় পতিরূপী গুরুর উত্তর সাধকত্বে সহজ নারীধর্ম্মের বিকাশে গৃহগণ্ডির ভিতরে সম্পূর্ণ লোক চক্ষুর অগোচরে একান্ত আত্মগত ভাবেই হচ্ছিল এমন কি পতি পর্য্যন্ত এর বিন্দু বিসর্গ জান্‌তে পারেন নি। যে অসাধারণ মিলন ক্ষমতা ও প্রেম এমন আশ্চর্য্যজনক ভাবে স্বামীর উপর প্রযুক্ত হয়েছিল যে তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব ও সমস্ত কর্ম্ম পরম্পরাকে পর্যান্ত নিজের করে নিতে পেরেছিল তাহাই বাইরের জগতে ধনী নির্ধন ছোট বড় পুরুষ নারী শিশু হিন্দু মুসলমান ইংরেজ ফরাসী জাপানী সকলের সঙ্গে সমান ভাবে সখ্য স্থাপন কর্‌তে পারত। আমরা পূর্ব্বে নারীর যে একীকরণের শক্তির কথা বলেছি এইখানে তার সুস্পষ্ট বিকাশ দেখতে পাই।

সরোজনলিনীর জীবনে বর্ত্তমান নারী-সমস্যার সমাধান হয়েছিল অতি সহজ ও সঙ্গত ভাবে। আমরা এই রকম সমাধানের প্রকৃতি এই প্রবন্ধের গোড়াতেই আলোচনা করেছি। পতি-প্রেমের প্রেরণায়, নমনীয় নারীত্বের সহজ ধর্ম্মের গৃহ ও সমাজ পদ্ধতির আশ্রয়ে তাঁহার অনন্য সাধারণ প্রকৃতির যে অপূর্ব্ব বিকাশ হয়েছিল তাহাই নারী প্রকৃতির স্বভাব সুন্দর বিকাশ। এর মধ্যে ঘরও আছে বারও আছে কিন্তু সঙ্কীর্ণ একদেশদর্শিতা কোথাও নাই। প্রগতির উপর এর ভিত্তি ব্যাবর্ত্তনে বৃহত্তর হতে হতে সমস্ত সংসারকে আপনার হৃদয় মধ্যে টেনে নিয়ে শেষ কালে এ অনন্ত ভূমাসমুদ্রে আত্মসমর্পণ করে। এই যে অপূর্ব্ব ভাবের জাগরণ গৃহ সংসার এর জন্মশৈল, প্রেম এর গতিবেগ, পাতিব্রত্য কূলের গণ্ডী—সঙ্গীতের তাল লয় মানার মত এগুলি এর মূর্ত্তিকে প্রকটিত করবার পক্ষে অপরিহার্য্য, এদের বাদ দিলে এই ভাবের মাত্রা মাতি একটা উদ্দাম বিক্ষিপ্ত শূন্যবাদী কিম্ভূত কিমাকার জিনিস হয়ে দাঁড়ায়—সৃষ্টি কিছু করেই না পরন্তু একটা উৎক্ষিপ্ত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মত নিজেও পোড়ে এবং যাকে সম্মুখে পায় তাকেও পুড়িয়ে ছাই করে।

সরোজনলিনীর জীবনে খুঁটিনাটি ধরে বিস্তৃত আলোচনার এ স্থান নয় যদিও এরূপ আলোচনা লেখক বা পাঠকবৃন্দ কাহারও পক্ষে ব্যর্থশ্রম হয় না এবং তাঁর স্বামীর হৃদয় দিয়ে লেখা জীবনীখানির সর্ব্বত্র এরূপ আলোচনার উপাদান যথেষ্ট ছড়ানও আছে। তবে এখানে এই বলা যায় যে দেবী সরোজনলিনীর জীবনে বর্ত্তমান তথাকথিত নারী জাগরণের অস্বাভাবিক প্রতি-ক্রিয়ার বেশ একটি চমৎকার উত্তর আছে। তিনি তাঁর নিজের ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ জীবন দিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সন্ধিক্ষণে ভারতীয় নারীর প্রকৃত পথ কি তার ইঙ্গিত করে গিয়েছেন। তিনি তাঁর জীবনে নারীকে নিজের স্বরূপে ও স্ব শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অনেক সুন্দর

সুন্দর অনুষ্ঠানের রচনা করে গিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় তার চেয়ে তার নিজের অপূর্ব্ব জীবন যথাযথ ব্যাখ্যাত হয়ে ঘরে ঘরে প্রচারিত হলে এই নারী জাগরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে অনেক বেশী সহায়তা করে।

আদর্শের সন্ধানে

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এম, ই, ই,
(অধ্যাপক লাহোর ম্যাকলাওয়েড্ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ)

আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানুষের নিজের মনের সঙ্গে তার নিজের তৈরি কলের সাংঘাতিক লড়াই বেধে গেছে। * * * পরদেহজীবি পরাশ্রিত (parasite) জীব যেমন স্বাধীন উদ্যমশক্তি হারায় কলাশ্রিত মানুষ তেমনি মনেররুচি স্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছে। "ইউরোপীয় সভ্যতার সেই রুচিস্বাতন্ত্র্যনাশক মরুহাওয়া ভারতবর্ষীয় শিল্পগুলিকে সবই প্রায় নষ্ট করেছে। বহু-যুগের অভ্যাসে যে নৈপুন্য উৎকর্ষ লাভ করে, একবার নষ্ট হ'লে ফরমাস দিয়ে মূল্য দিয়ে সে নৈপুণ্যকে আর ফিরিয়ে পাবার রাস্তানেই, মানুষের সেই দুর্ল্ভ সামগ্রী আমরা হারিয়ে বসেছি।..."

"একটা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন জিনিষ জাতি বিশেষে যার তারতম্য আছে কিন্তু প্রকারান্তর নেই। যুক্তির নিয়ম সকল দেশেই সমান।...অতএব বুদ্ধিবৃত্তিমূলক যে শিক্ষা য়ুরোপ পৃথিবীকে দিচ্ছে তা সর্ব্বত্র এক হবেই।

"কিন্তু হৃদয়বৃত্তির দ্বারা মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। ঐ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাকবেই আর থাকাই শ্রেয়। একে নষ্ট করা আত্মহত্যারই সামিল। * * *

"দেশের উদ্বোধনের কথা আমরা আজকাল সর্ব্বদাই বলে থাকি। মনে করি সেই উদ্বোধন কেবল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন সভায়। অর্থাৎ কেবল অভাবের ক্রন্দনে, দারিদ্র্যের প্রার্থনায়। এই আমাদের মজ্জাগত ভিক্ষুকতায় আমরা ভুলে গিয়েচি, যেখানে দেশের আপন সম্পদ নিহিত সেই-খানেই দেশের আপন গৌরব প্রসুপ্ত আছে। সেই সম্পদ যতই উদ্ঘাটিত হবে আমাদের গৌরবের ততই উদ্বোধন হবে। আমাদের নব উদ্বোধনের উৎসবে বিলাতী গোরার বাদ্য অথবা বিদেশী সঙ্গীতের হাড়গোড় ভাঙ্গা একটা কিরূপ ব্যাপারের দ্বারা সম্পন্ন হবে না। আর আমাদের দেশের নির্ব্বাসিত লক্ষ্মীকে নূতন আবাহন কালে মন্দিরের দ্বারে যে আল্পনা আঁক্তে হবে তার ডিজাইন কি জর্ম্মানি হ'তে সংগ্রহ করে আন্‌বো?" (১)

এ সকল সত্ত্বেও জনকয়েক কৃতবিদ্য ভারতসন্তান বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, "মডার্ণ হও!" "সাহিত্য ও জাতীয়তা" প্রবন্ধে সর্ব্বজনবিদিত উপন্যাসিক ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত "সনাতন পন্থী" দেশবাসীকে ডাক দিয়া বলিয়াছেন,—

"বর্ত্তমান তুরস্কে যে প্রক্রিয়া চলিয়াছে তাও বিশেষভাবে অনুশীলন যোগ্য। অনতিদীর্ঘ-কাল পূর্ব্বে মুস্তাফা কামাল পাশা এক বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তার ভিতর একটা

(১)—কলাবিদ্যা প্রবন্ধে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথঠাকুর বিচিত্রা, কার্ত্তিক ১৩৩৬—(প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৬, ৫৪০ পৃষ্ঠা)

প্রকাণ্ড সার সত্যের ইঙ্গিত আছে। তিনি তাঁর দেশবাসী সনাতন-পন্থীদের তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, তোমরা একটা সুদূর অতীতে বসিয়া আছ—modern হও। এই কথাটাই আমিও আমার সনাতন-পন্থী স্বদেশবাসীকে বলিতে চাই। বিলাত বা কোন বিশিষ্ট দেশের অনুকরণ আমরা চাই না। কিন্তু চার পাঁচশত বৎসরের পুরাতন ভারতবর্ষের ভিতরে বসিয়া চারিদিক দিয়া পরিবর্ত্তনের পথে পাষাণ প্রাচীর গড়িয়া থাকিতেও আমরা চাই না। আমরা চাই ঠিক আজকার ভারতবাসী হইতে—আজকার বিশ্বের সমস্ত culture স্রোতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া সজীব ভাবে অগ্রসর হইতে, এক কথায়—modern হইতে।" (১)

অবশ্য তিনি একথাও বলিয়াছেন, "বিলাত বা কোন বিশিষ্টদেশের অনুকরণ আমরা চাই না।" কিন্তু বিবেচনা করিলে দেখা যায়, যে প্রক্রিয়ার দ্বারাই হউক, আধুনিক হইয়া আজ তুরস্ক যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে তাহার ও অন্য যে কোন পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এখন, "মডার্ণ" হইয়া যদি ইহাই হইতে হয়, তবে সহজ ভাষায়, পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণ করা ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। এখন বিবেচ্য এই,—এমনতর "মডার্ণ" হওয়া ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রেয় কি না!

সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বলেন,—

"আমার বিশ্বাস গত একশ' বৎসরের শিক্ষাদীক্ষার ফলে আমাদের দেহেরও রং ফিরে যায় নি, মনেরও নয়, যা বদ্‌লে গিয়েছে তা হচ্ছে আমাদের বাক্য। আমরা সবাই আজ ইউরোপীয় চলতি বুলি বলতে শিখেছি। আমাদের সাহিত্য ও সংবাদপত্র আমাদের সামাজিক জীবন ও আমাদের মানসিক জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়।" (২)

অর্থাৎ, আমরা যে ভারতীয় সেই ভারতীয়ই আছি, অথচ আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ সমস্তই বিদেশীয় হইয়া গিয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইহাই আরও চোখে আঙ্গুল দিয়া আমাদের দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"Mimic anglicism has become an obsession with us; we find its black footprint in every walk and endeavour of our life. We substitue meeting-houses for temples; we perform stage plays and sell pleasures in order to help charities; we hold lotteries in aid of orphanages, we give up the national and healthful games of our country and introduce all sorts of foreign importations. We have become hybrids in dress. in thought. in sentiment and culture, and are making frantic attempts even to be hybrids in blood".

অর্থাৎ,—

"নকল সাহেবিয়ানা আমাদিগকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছে; আমাদের জীবনের প্রত্যেক পথে, প্রত্যেক প্রয়াসে আমরা তাহার অশুভ পদচিহ্ন দেখিতে পাই। দেব-মন্দিরের পরিবর্ত্তে

(১)—"সাহিত্যে জাতীয়তা" বঙ্গবাণী, ৫ম বর্ষ, ১৩৩৩, ৩০ পৃষ্ঠা।

(২) কালের নব মনোভাব" বিচিত্রা, আশ্বিন. ১৩৩৬; প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ২৫২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

The Heart of Aryavarta, by Lord Ronaldshay, page 98.

মিলিত হইবার জন্য আমরা সভা সমিতির আশ্রয় লই; রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া দানের জন্য প্রমোদ বিক্রয় করি; অনাথাশ্রমের সাহায্যকল্পে 'লটারি' করি; জাতীয় ও দেশী স্বাস্থ্যপ্রদ খেলাধূলা বিসর্জ্জন দিয়া বিদেশী ক্রীড়া আমদানি করিয়া প্রবর্ত্তন করি। আমরা পোষাকে, চিন্তায়, মতি-গতিতে ও সভ্যতার সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, এমন কি বর্ণসঙ্কর হইবার জন্যও পাগলের মত চেষ্টা করিতেছি।"

ইহা কি অতিরঞ্জন? যখন আমাদের ভগিনী ও কন্যাগণ প্রকাশ্য ভাবে সভা সমিতি করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহারা আর "অবরুদ্ধ" থাকিতে প্রস্তুত নহেন, জাতিভেদ চাহেন না, অল্পবয়সে বিবাহ করিতে চাহেন না, বিবাহ-বিচ্ছেদ চাহেন, এমনকি যখন একথাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করিতে চাহেন, তখন যে বর্ণসঙ্করত্ব অতি নিকটে দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, ইহা মনে করিতে কি কল্পনা শক্তিকে অতি অধিক দূর প্রসারিত করিবার আবশ্যক করে? আবার এসব হইতেছে আমাদের দেশের জনকয়েক "মহারাণীদের" দ্বারা!

এই সকল অভিযোগের একবর্ণও যে মিথ্যা নয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত অংশটি হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যখন শেষবার কলিকাতায় কংগ্রেস হয়, সেই সময়, ত্রিবাঙ্কুরের ছোট মহারাণীর সভানেত্রীত্বে কলিকাতায় "অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ নেশ্যানেল কন্‌ফারেন্সের" অধিবেশন হয়। সেই কন্‌ফারেন্সে ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী হইয়াছিলেন। সেই সভার সম্বন্ধে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আছে,—

"Women claim that the marriageable age of girl should be raised to at least 16. They have also a grievance in that the age of consent is very low. Coming to the choice of the husband women demand that they should have much larger circle to choose from. In short their demand is that they should have a right to marry acording to choice, irrespective of the narrow limitations of caste.

"Similarly, women demand that the present-day laws relating to divorce, re-marriage and maintenance, which in their opinion are foolish, irrational and one-sided should also be altered in accordance with the requirements of modern society."

ইহার ভাবার্থ এই যে, বালিকাদের বিবাহের বয়স অন্ততঃ ১৬ বৎসরে উন্নীত করা উচিত, ইহাই স্ত্রীলোকেরা দাবী করেন। (১) তাঁহাদের আরও আপত্তি এই যে বর্ত্তমানে সম্মতির বয়স অল্প। পতি-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্ত্রীলোকেরা দাবী করেন যে, নির্ব্বাচন করিবার গণ্ডী আরও বড় হওয়া চাই। সংক্ষেপে তাঁহাদের দাবী এই যে, জাতীয় সঙ্কীর্ণ গণ্ডী যাহাই হউক, পছন্দমত যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করিবার অধিকার তাঁহাদের থাকা চাই।

(১) তখন শারদা-আইন পাশ হয় নাই।

"এইরূপ স্ত্রীলোকেরা আরও দাবী করেন, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পুনর্ব্বিবাহ ও ভরণপোষণ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে আইন আছে, তাঁহাদের মতে তাহা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, অসঙ্গত ও এক-দেশদর্শী ; বর্ত্তমান সমাজের প্রয়োজনের উপযুক্ত করিয়া সে সকল পরিবর্ত্তিত করা চাই।"

আর অবরোধ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য যে আন্দোলন তাহারও ওকালতী যখন আমাদের "সংস্কার পন্থীরা" করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন ললনাগণ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। তাঁহাদের পূর্ণচন্দ্র বিভাননকে আর অবগুণ্ঠন বা "বুরখা" রাহু অধিক দিন গ্রাস করিয়া রাখিতে পারিবে না। এই সংস্কার-পন্থীরা একেবারে মানিয়াই লইয়াছেন," শিক্ষিতা" স্ত্রীলোকেরা আর পর্দ্দা মানিবে না। তাঁহারা বলেন,—

"বালিকাদিগকে শিক্ষিতা করিতে হইলে অবরোধ প্রথা দূর করিতে হইবে, এবং শিক্ষিতা নারী যে অশিক্ষিতাদের মত পর্দ্দার আড়ালে থাকিতে চাহিবে না, তাহাত দেখাই যাইতেছে। অন্য নানা কারণেও পর্দ্দার বিলোপ কর্ত্তব্য ও অবশ্যম্ভাবী।" (১)

এই আমাদের বর্ত্তমান মনোভাব দাঁড়াইয়াছে। এইসব বিষয় একসঙ্গে ভাবিলে বাস্তবিক কি মনে হয়? দেশবন্ধু যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সেইমত মনে কি হয় না যে আমরা সর্ব্ব বিষয়ে সংকরত্ব পাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি? আমাদের মতিগতি কি যথেষ্ট পরিমাণেই পাশ্চাত্যের দিকে ঢলে নাই? কিন্তু আমাদের এই সাহেব হওয়াটাকে সাহেবেরাও যে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করেন তাহার প্রমাণ আছে—

"La Renaissance Religiense নামক পুস্তকের লেখকদের মধ্যে দুই একজন Orientalist আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন Paul Masson Oursel।...Oursel বলেন, ইউরোপ এশিয়াতে তার Science পাঠাক, কিন্তু তার মনোভাবের যেন আর রপ্তানি না করে। * * * তিনি আশা করেন যে relativity যখন বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে তখন জীবনেও স্বীকৃত হবে। সকল সভ্যতাই তার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্টতা রক্ষা করবে, কেউ অপর সভ্যতার মনের অধীন হবে না। * * * আমাদের সাহেব হওয়াটাকে Orientalistও বিপজ্জনক মনে করেন।" (১)

এখানে একটু মজার কথা আছে। ইউরোপীয় "ওরিয়েণ্ট্যালিষ্টরা" আজ যে জিনিষকে বিপজ্জনক মনে করিতেছেন, আমাদের ভারতীয় 'excidentalist"রা কিন্তু ঠিক তাহাকেই গৌরবের ও একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলিয়া মনে করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে, এইজন্যই কি লোকে বলে প্রাচী ও প্রতীচির কখনও মিলন হইবে না?

আজ আমরা পাশ্চাত্যভাবে যে কত ভীষণ অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িয়াছি, তাহার আবও একটা অতি স্পষ্ট প্রমাণ এ স্থলে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। উপরে উদ্ধৃত অংশ পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, ইউরোপ আশাকরে যে, "relativity যখন বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে, তখন জীবনেও স্বীকৃত হবে।" তথায় ইহা এখনও কতকটা আশামাত্র, আর আমরা ইউরোপের সেই আশা ইহারই মধ্যে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষা ও গৌরবের

[১] প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৬, ৭৭০ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

১—ফ্রান্সের নব মনোভাব" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—বিচিত্রা, আশ্বিন, ১৩৩৬—(প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ ২৫২ পৃষ্ঠা।)

বস্তু যে নারীর সতীত্ব,—যাহার গৌরবে ভারত আজিও গৌরবান্বিত, পাশ্চাত্যের মোহে, তাহাকে পর্য্যন্ত আমরা relativityর গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি। সতীত্ব সম্বন্ধে ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এক অ-পূর্ব্ব (অপূর্ব্ব ?) কথা বলেন। তিনি বলেন,—

(সতীত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে কেবল আমাদের সমাজ সম্বন্ধে মোটামোটি ভাবে জানিলেই চলে না। এ বিষয়ে সমস্ত জগতের মানব সমাজের প্রকৃতি ও পরিণতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। সে পরিচয় যার আছে সেই জানে যে সতীত্ব ধর্ম্মটার মূল্য relative—absolute নহে। সমাজের বিশেষ প্রণালীর সঙ্গেই সতীত্ব খাপ খায়, সেই প্রণালীর ভিতরেই সতীত্ব-ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়—অন্য অবস্থায় হয় না। এমন সমাজ আছে, যেখানে এক নারীর পক্ষে কেবল মাত্র এক পুরুষ অনুরক্তি নিন্দা ও শাস্তির বিষয় হইতে পারে।)

"এমনি নানা দেশের আচার অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে সতীত্ব বা পতিপত্নীর সম্বন্ধ বিষয়ক যে কোনও কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই কোন নিত্যবিধি কোথাও নাই। এ বিষয়ে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের মানদণ্ড সমাজের আবেষ্টনাপেক্ষ। সতীত্বের সমাদর ও সম্মানের মূল এই যে, ইহা স্বামী-প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রেমবশতঃ নারী আপনাকে ঠিক সেই ভাবে গঠিত করিতে ইচ্ছা করে যাহা তাহার স্বামীর আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী হইবে। আমাদের সমাজে যে আকাঙ্ক্ষা পত্নীর একনিষ্ঠার দিকে তাই একান্ত পাতিব্রত্য এখানে প্রশংসিত এবং প্রেমময়ী নারী এই পাতিব্রত্যের সাধনা করে।"

পাশ্চাত্য মনোভাব সম্পূর্ণ হইতে আরও বাকী আছে কি ? এই যে পাশ্চাত্য মনোভাবের ভীষণ আতিশয্য ইহা দুই এক বৎসরের ফলে হয় নাই ; যতদিন হইতে ভারতবাসী ইউরোপীয় দিগের সংস্পর্শে আসিয়াছে, ততদিন হইতেই এই পাশ্চাত্য প্রীতি ধীরে ধীরে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। শ্রীমতী মিথান চোকসী নামে একজন পার্সী মহিলা এক প্রবন্ধ লিখেন তাহাতে তিনি বাঙ্গালীদের পাশ্চাত্য প্রিয়তার কথা উল্লেখ করিয়া তাহার নিন্দা করিয়াছেন। "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় সে সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে আছে,—

Mrs. Mithan Choksi, M. A. a Parsi lady, writes in her article on "Some Impressions of Indian Women's Colleges"—"The best and the most thoughtful of the ssudents were now critical of, if not distinctly antagonistic to, the wholesale adoption of things foreign. Most people, European and Indian will agree that even if often aggressive and intolerant, this was a such healthier frame of mind than in the days when, it is said, the fascination of Western civilization was so great that prominent Bengalies prided themselves on even dreaming in English instead of Bengali"

(ক্রমশঃ)

(১)—"সাম্প্রতিক জাতীয়তা" প্রবন্ধে ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বঙ্গবাসী ৫ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৩, ৩৫—৩৬ পৃষ্ঠা।

(১) Mod. Rev. Dec. 1929 p 698.

অষ্টাদশ শ্লোকী গীতা

শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ তীর্থ

(সমাপ্ত)

(১৩)

'নানা প্রকার প্রবৃত্তি পরিপূর্ণ মনুষ্যকে কি প্রকারে 'উদাসীন' বলা যায় ?'—

উত্তর—আকাশ যেমন সূক্ষ্মরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, আত্মাও সেইরূপ দেব দানব, মানব, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ও লতা প্রভৃতির দেহে থাকিয়াও কাহারও দোষ গুণে লিপ্ত হয়েন না। নির্লিপ্ত রহিবার জন্য আত্মাকে দেহাদি হইতে বাহিরে যাইতে হয় না। দেহ ও ব্যবহারে থাকিয়াও আত্মা সর্ব্বদা নির্লিপ্ত থাকেন। যেমন সর্ব্বলোকের প্রকাশক সূর্য্য বাহ্য পদার্থ সমূহের দোষে দূষিত হয়েন না, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা সকল দেহের প্রকাশক হইলেও কাহারও ধর্ম্মে লিপ্ত হন না। আত্মাই সকল পদার্থের স্থির অস্তিত্ব, সকলের অন্তর্যামী, অসংখ্য ভেদের মধ্যে একমাত্র অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থ।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥

১৩শ অধ্যায়, ৩২ শ্লোক।

(১৪)

উপরোক্ত শ্লোকে, প্রকৃতিতে বিরাজমান ও প্রকৃতি হইতে পর যে আত্মতত্ত্বের বর্ণনা আছে—তাহা যিনি আত্মরূপে অনুভব করিয়াছেন, তিনি ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সঙ্গে থাকিয়াও তাহা হইতে সর্ব্বদা নির্লিপ্ত থাকেন। সত্ত্বগুণের ক্রিয়াস্বরূপ 'প্রকাশ' অথবা রজোগুণের ধর্ম্ম 'প্রবৃত্তি,' কিংবা তমোগুণ জন্য 'মোহ' উপস্থিত হইলেও তিনি সুখ, দুঃখ বা অজ্ঞানের প্রভাবে মুগ্ধ, পীড়িত বা আচ্ছন্ন হয়েন না। গুণত্রয়ের কর্ত্তৃত্ব অবগত হইয়া তিনি আত্মাকে সর্ব্বদা অকর্ত্তা বলিয়া নিশ্চয় করেন, এবং উহাদের আবির্ভাবে উদাসীন ও সমভাবে অবস্থিতি করেন। গুণাতীত পুরুষের এই লক্ষণ তাঁর নিজস্ব, তিনি স্বয়ং ভিন্ন অন্যে জানিতে অক্ষম।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥

১৪শ অধ্যায়, ২২ শ্লোক।

—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পাণ্ডব! যিনি প্রকাশ, ও প্রবৃত্তি ও মোহ প্রভৃতি স্বতঃ উদিত হইলেও কখনও দ্বেষ করেন না, এবং তাহাদের নিবৃত্তিরও আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত পুরুষ।

(১৫)

আত্মা প্রকৃতিতে আছেনই কিন্তু প্রকৃতি দ্বারা সিদ্ধ হন না। যেমন, মন্ত্রীর অস্তিত্ব রাজা থাকিলেই সিদ্ধ হয়, তেমনি প্রকৃতির সত্তা আত্মার স্থিতি হেতুই প্রমাণিত হয়। আত্মা প্রাণীমাত্রের দেহেই আছেন, আর আত্মার সত্তাতেই দেহ দেহধর্ম্ম করিতেছে। দেহের অধিষ্ঠান প্রাণাপান বায়ু নহে,—ঐ বায়ুস্থিত আত্মা। তোমাতে আমাতে আর সর্ব্বত্র একই আত্মার প্রকাশ। সূর্য্যচন্দ্রাদির তেজ, পৃথিবীর শক্তি, ওষধির রস, প্রাণিদেহের প্রাণাপানাদি সমস্তই পরমাত্মার প্রকাশ। আত্মা প্রতিদেহে বিদ্যমান থাকিয়াও স্বয়ং সর্ব্বত্র এক অখণ্ডরূপে স্থিত। সর্ব্বসংরক্ষিণী শক্তির মূলাধার তিনিই। তাই ভগবান বলিতেছেন :—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥

১৫শ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক।

(১৬)

এই প্রকারে যিনি প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ বুঝিয়াছেন, তিনি কখনও প্রকৃতির বাহিরে যাইবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করেন না, পরন্তু প্রকৃতিতে থাকিয়াই স্ব-স্বরূপ অনুভব করিতে তৎপর হন। যদি প্রকৃতিতে থাকা অনিবার্য্য হয়, তবে কি নিয়মানুসারে চলিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে ভগবান বলিতেছেন যে মনুষ্য-হৃদয়ে 'শাস্ত্র' ও 'কাম' এই দুই-এ চিরকাল দ্বন্দ্ব চলিতেছে। যিনি 'কামকে' আপন করিয়া 'শাস্ত্র'-কে ত্যাগ করেন, তাঁর কখন 'সিদ্ধি'-প্রাপ্তি হয় না, তিনি জীবনে 'সুখ' ও লাভ করিতে পারেন না, আর 'পরাগতি' ত তাঁর কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। স্থূলদর্শী পুরুষ 'শাস্ত্র' শব্দের অর্থ ধর্ম্মশাস্ত্রের বাক্য মাত্র বুঝেন, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী 'শাস্ত্র' অর্থে ধর্ম্ম শাস্ত্রের অন্তিম প্রভবস্থান পরমাত্মাকে গ্রহণ করেন। যে যে প্রসঙ্গে মনুষ্যের কর্ত্তব্য বুদ্ধি জাগ্রত হয়, সূক্ষ্মদর্শী তাহাতে পরমাত্মার ইচ্ছামাত্র দেখেন। এইরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধি এক অন্তঃশাস্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ হয়, আর বাহ্যশাস্ত্র উহারই পরিণাম-রূপে বিকাশমাত্র। আরম্ভ ও বাহ্যশাস্ত্রে একই পরমাত্মার অনাহত নাদ'-ধ্বনী হইতেছে,—একটী কথারই ভূয়ঃ ভূয়ঃ উচ্চারণ হইতেছে। 'প্রমাতা ও প্রমেয়-তে একই চৈতন্য প্রকটিত'—এই বেদান্ত সিদ্ধান্তের মর্ম্ম-গ্রহীতাই পূর্ব্বোক্ত বিষয় ধারণে সমর্থ।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

১৬শ অধ্যায়, ২৩ শ্লোক।

—লোকে যাহা বুঝিতে পারে, অথবা যাহা বুঝিতে পারে না, সেই গূঢ়ার্থ শিক্ষা দিবার জন্যই শাস্ত্র। বিধিনিষেধ বাক্য দ্বারা ও নানাবিধ উপদেশ দিয়া শাস্ত্র মনুষ্যের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উপেক্ষা করিয়া সেচ্ছাচারী হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহার সিদ্ধিলাভ (অন্তঃকরণের শুদ্ধি), ইহলোকে সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষরূপ উৎকৃষ্ট গতিও লাভ হয় না।

(১৭)

শাস্ত্রমর্য্যাদারক্ষাকারী পুরুষের বাক্য সর্ব্বদাই অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর। প্রত্যেক

বাক্যই অবশ্য এই ধর্ম্মচতুষ্টয় সম্পন্ন হওয়া চাই; কোনও অঙ্গহানি হইলে বাঙ্ময় তপস্যা হইতে চ্যুত হইতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে, অনুদ্বেগকর, সত্য ও হিতকর বাক্য শ্রোতার অপ্রিয় হইলে উহা নিষ্ফল। অতএব বাক্য অনুদ্বেগকর, সত্য ও হিতকর হইলেও প্রিয় না হইলে চলিবে না। কখন কখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই ধর্ম্মচতুষ্টয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়; কিন্তু সর্ব্বত্র এই চারিভাবের সমন্বয় করিবার ভাবনা রাখা আবশ্যক।

যেখানে ইহাদের সমন্বয় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় সেখানে কর্ত্তব্য কি?—ইহার উত্তর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে 'সত্য' শব্দকে মুখ্য করিয়া 'প্রিয় ও হিত' শব্দকে গৌণ স্থানে রাখিয়াই দেওয়া হইবে; অনুদ্বেগকর, সত্য ও হিতকারী বাক্য মধ্যে বিরোধ বিরল; তথাপি বিরোধ উপস্থিত হইলে সত্যেরই প্রাধান্য দিতে হইবে; কারণ সত্যই পরিণামে অনুদ্বেগকর ও হিতকারী। যদিও সত্য ও হিতাপেক্ষা প্রিয়বাদিতার মহত্ত্ব গৌণ, তথাপি ইহা অতি অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে বাক্য প্রিয় না হইলেও উদ্বেগকর যেন না হয়। যিনি নিজকর্ত্তব্যভাবনা স্বাধ্যায়রূপে পরিশীলন করেন নাই তিনি ঐরূপ বাচিক তপস্যা সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। অতএব স্বাধ্যায়ের অভ্যাস আবশ্যক। ইহাই তপস্যা। কারণ ইহা দ্বারা 'কাম' বা 'স্বার্থের' নিরোধ হইয়া যায়। তাই ভগবান্ বলিতেছেন :—

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥

১৭শ অধ্যায়, ১৫ শ্লোক।

—কাহারও মনোবেদনা না হয় এরূপ সম্ভাষণ, শ্রোতার শ্রুতি ও বোধ সুখকর ও কল্যাণজনক বাক্য-কথন এবং শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বেদাধ্যয়ন, এইগুলি বাঙ্ময় তপস্যা।

(১৮)

মোক্ষ জ্ঞান-লভ্য,—ক্রিয়া-লভ্য নহে, অর্থাৎ মোক্ষে নূতন কিছু প্রাপ্তি হয় না—স্বরূপের অনুসন্ধান হয় মাত্র। আত্মার স্বভাবই এইরূপ যে উহার জ্ঞান হওয়াই সম্ভব। উহাতে কোন প্রকারেরই ক্রিয়া সম্ভব নহে। ক্রিয়া প্রকৃতির—দ্রষ্টার নহে, দৃশ্য-ভূমিতে প্রকট হয়। ক্রিয়া হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, জ্ঞানের প্রকাশে ক্রিয়া এক নূতন ও চমৎকার রূপ ধারণ করে। এই হেতু মুমুক্ষুগণ বেদান্ত-বৃক্ষ-মূলে অমৃত সিঞ্চন করিয়া থাকেন, তাহাতেই পুষ্পপল্লবাদিও দিব্যরূপে প্রফুল্ল হইয়া উঠে। শাখা ও পত্রে যতই সিঞ্চন হউক, মূল শুষ্ক হইলে বৃক্ষকে জীবিত রাখিবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

অমৃতরূপ জ্ঞান নির্গুণাত্মক,—তমোগুণের অবস্থা নহে। অকর্ম্মণ্য হইয়া জড়বৎ অবস্থান বেদান্তের অভীষ্ট নহে, পরন্তু কর্ম্মকে জ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত করাই উহার লক্ষ্য। ইহাই গীতার 'কর্ম্মযোগ' বা 'কর্ম্মসন্ন্যাসের' বিষয়। এই প্রকারে যিনি 'যোগ' ও 'সন্ন্যাসের' একতা অনুভব করিয়াছেন, তিনিই নির্ভয়ে পরমাত্মার ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে সমর্থ। অসংশয় ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে,—যে ভাবে বিশ্বপ্রপঞ্চের ব্যবহারে পরমাত্মা সম্পূর্ণ নির্ব্বাধ—উহার 'অচ্যুত' রূপ

অভ্রষ্ট থাকে—প্রকৃতি বা মায়া দ্বারা তাঁহাতে দ্বৈতাপত্তি হয় না,—ঠিক সেইভাবে দেহ-ব্যবহারে আত্মা নির্লিপ্ত—উহার পরমাত্ম-স্বরূপের কোন খণ্ডন হয় না।

যেমন দেহ প্রকৃতির অংশ তদ্রূপ আত্মা পরমাত্মার অংশ। এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতেছে,—'তবে' কি চৈতন্যের অংশাংশিভাব সম্ভব?—যেরূপ নিজ কল্পনা দ্বারা আমি নিজ দেহকে প্রকৃতি সহ এক অথবা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বোধ করি, সেইরূপ আত্মাকে পরমাত্মার অংশরূপে কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। বস্তুতঃ যেমন প্রকৃতিই দেহরূপ, ঐ ভাবে পরমাত্মা ও আত্মরূপ। 'আমি' ও 'তুমি' যেরূপ পৃথক, আত্মা ও পরমাত্মা সেরূপ নহে, কারণ পরমাত্মা আমাদের উভয়ের মধ্যেই অনুস্যূত। এই দৃশ্যবিষয়ের ন্যায় উহা কোন বিষয় নহে,—বিষয় মাত্রের বিষয়তা-সাধক পরম তত্ত্ব।

'আত্মা' ও 'পরমাত্মা' অভিন্ন,—নানা আত্মা-রূপে বিলাসিত মাত্র। এই বস্তুস্থিতির নিদিধ্যাসনে আত্মাতে পরমাত্মাভাব স্ফুরিত হয়,—আত্ম-অনাত্ম-পদার্থের অবিবেকজ মোহ নষ্ট হয়, স্বরূপের স্মৃতিলাভে প্রকৃতিতে দ্বিতীয়তা বুদ্ধি দূর হয়। তখন ধারণা জন্মে যে স্বয়ং যাহা কিছু করি বলিয়া মনে হয় তৎ সমস্তই বস্তুতঃ পরমত্মা-কৃত, 'যেহেতু—'করণ' প্রকৃতির ভাব আর প্রকৃতি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। এই সমস্তই পরমাত্মার স্ফুরণ মাত্র। ইহারই নাম 'অদ্বৈত-অনুভব'।

এই অনুভব কি প্রকারে উদয় হয়? শ্রীকৃষ্ণরূপী পরমগুরু পরমাত্মার নির্ম্মল আবির্ভাব—তাঁহার প্রসাদেই হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের সমগ্র উপদেশ শুনিয়া তাই অর্জ্জুন বলিতেছেন ঃ—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

১৮ম অধ্যায়, ৭৩ শ্লোক।

—হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার সমস্ত মোহ বিনষ্ট হইল, তোমার প্রসাদে আমি আত্মজ্ঞানরূপ স্মৃতি লাভ করিলাম, তোমার উপদেশে আমি স্থিরচিত্ত হইয়াছি, এবং আমার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়াছে। এখন আমি তোমারই আদেশমত কার্য্য করিব।

—॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥—

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী সর্ব্বসাধারণের আলোচনা-সাপেক্ষ]

প্রতিবাদ পত্র।—গত পৌষ সংখ্যা ভারতের সাধনার 'আলোচনায়' "শাস্ত্র-পাঠে ভ্রমাশঙ্কা" পাঠ করিলাম। সমালোচ মহাশয়ের প্রশংসনীয় অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ধারকল্পে এখন আমাদের এইরূপ সত্যানুসন্ধান চেষ্টাই আবশ্যক এবং দেশপূজ্য মনস্বীগণ যতই এইদিকে অনুরক্ত হইবেন ততই শাস্ত্রের সনাতন-তত্ত্ব পরিস্ফুট হইবে। শাস্ত্রের ভ্রমপাঠ, মর্ম্মার্থ বোধের অভাবে কদর্থ প্রচার, উদারত্বের অভাবে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিচার এবং তজ্জন্য যাহা যাহা সাম্প্রদায়িক মতের বিরোধী তাহার অপলাপ এবং যাহা ঋষিবাক্যে ছিলনা এরূপ বাক্যাবলীর প্রক্ষেপ ইত্যাদি নানা দোষ শাস্ত্রে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রাচীনকালে শাস্ত্রোপদেশ মুখ-পরম্পরায় প্রচলিত থাকায় এইরূপ দোষের অবকাশ হইয়াছে এবং সত্যের অনুরাগ কালে প্রায় লোপ পাওয়ায় যাহার যেটুকু দরকার তিনি ততটুকু প্রক্ষেপ করিয়া স্ব-মত প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আলোচনাটি পড়িয়া হঠাৎ উদ্দেশ্য অনুসরণ করিতে পারি নাই। দুই তিন বার পাঠের পর বোধ হইল যে মনস্বী লেখক মহোদয় কোন একটি সাময়িক বিষয় মনে রাখিয়া এই আলোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ধারণা বলবৎ হইল যখন ১৮৯ পৃষ্ঠায় "তাহা হইলে সুশ্রুত পুত্র পৌত্রাদি লাভের জন্য দ্বাদশবর্ষাং পত্নীমাবহেৎ বিধান দিয়াছেন কোন কি আধুনিক আইন কর্ত্তার খেয়াল বশে ?" এই কথাগুলি পাঠ করিলাম। "শাস্ত্রে ভ্রমাশঙ্কা" সম্পাদকের এই হেডিংটি সমস্ত আলোচনাটিকে একটি সুরুচিপূর্ণ সতর্কতার আবরণে ঢাকিয়া দিয়াছে এবং তজ্জন্যই মূল প্রবন্ধ-লেখকের উদ্দেশ্যের সহিত আলোচনার যে ভাবলাঘবতা-জনক অসংলগ্নতা তাহা উপলব্ধি করিতে দেয় না, বরং প্রীতিরই উদয় করিয়া দেয়।

শাস্ত্রগুলির একদেশ লইয়া সিদ্ধান্ত করিতে গেলে ভ্রমাদি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। শাস্ত্রমতে গর্ভাষ্টমে উপনীত হইয়া উত্তম কল্পে ২৪ বৎসর ও অধম কল্পে ১২ বৎসর ব্রহ্মচারী থাকিয়া তার পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে আমরা ২৪ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারী লইয়া সংশ্লিষ্ট। তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে আচার্য্যের আদেশ লইয়া ব্রহ্মচারী ১৬ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ২৪ বৎসর বয়সে দার পরিগ্রহণ করিবেন। সাধারণতঃ ১৪ কি ১৫ বৎসব বয়স হইতে পুরুষের রেতের উদ্ভব হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং ব্রহ্মচারীকে রেত পুষ্ট হইবার জন্য অন্ততঃ ৮।১০ বৎসর সময় শাস্ত্রকার দিয়াছেন। কেন না ২৪ বৎসরে বিবাহ করার বিধি। অন্য দিকে দেখা যায় স্ত্রীজাতির রজো দর্শন সাধারণতঃ দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে হইয়া থাকে। এই প্রথম রজঃস্বলা নারীকে প্রথম পুষ্পিতা বা পুষ্পবতী বলা হয়। যদি গর্ভাধান দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ বা উনষোড়শ বর্ষের মধ্যে বিহিত হয় তাহা হইলে নারীকে শোণিত পুষ্টির জন্য বলিতে গেলে একটুও সময় দেওয়া হয় না। একের বেলা বাঁধাবাঁধি পুষ্টির

জন্য অন্ততঃ ৮ বৎসর সময় দিব, অন্যের বেলা ফুল ফুটিলেই তার ফল চাহিব ইহা বিচার ও যুক্তিতে তিষ্ঠে না। পুরুষ বা নারী এমন কি গাছ পালাতেও বীজ পুষ্টির জন্য সময় ভগবান দিয়াছেন। এখন এই ব্রহ্মচর্য্যহীন কালেও একটু হিতাহিত জ্ঞান থাকিলে আমরা ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাকি এবং তাই ১৬।১৭ বৎসরের মধ্যে কন্যা সন্তানের মাতা হয়েন।

বালা বা কন্যা অর্থে যতদিন নারী অক্ষতযোনি থাকেন। রাজবল্লভ গ্রন্থে বালা অর্থে ষোড়ষবর্ষীয়া নারী-রত্নকে বলা হইয়াছে। সুতরাং সমালোচক মহাশয় যেমন ধরিয়াছেন বালা হইলেই যে দ্বাদশবর্ষ হইতেই হইবে তাহা নহে। আমরা দেখিতে পাই যে স্ত্রীজাতি সচরাচর শীঘ্র শীঘ্র যৌবন চিহ্ন প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষের যৌবন চিহ্ন পাইতে অপেক্ষাকৃত বিলম্ব হয়, সুতরাং পুরুষের রেত-পুষ্টি জন্য ৮ বৎসর এবং নারীর শোণিত পুষ্টি জন্য অন্ততঃ ৪ বৎসর প্রদান করা অতিশয় সমীচিন ব্যবস্থা। কোনও বিশেষ মতলব সাধন জন্য চেষ্টা এক এবং যুক্তি, সিদ্ধান্ত ও মঙ্গল চিন্তাদ্বারা পরিচালিত হওয়া অন্য কথা। মতলব সিদ্ধির জন্য শাস্ত্র ঘাঁটিলে সেই পূর্ব্বোক্ত সংকীর্ণতা দোষ আসিয়া পড়িবেই। ঋষিরা মতলব-বাজী জানিতেন না। বিশ্বমঙ্গলই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যে ঋষিগণ ২৪।২৫ বৎসরের আগে পুরুষের বিবাহ ব্যবস্থা করেন নাই সে ঋষিগণ কখনই বলিতে পারেন না যে—নারীরূপ কলমের গাছে মুকুল আসিলেই ফল পাড়িয়া খাইবে। মাঠের জমীতে ফসলের বীজ দেবার আগেও সার দিয়ে অনেকদিন মাটীটা পচাতে হয়, তবে ভাল ধান্য বা শস্য হয়। অন্যথা আগড়া পুর্ণ, সুঁট্‌কো, পোকাধরা প্রভৃতি অনেক প্রকার শস্য লাভ করিয়া কেবল মনস্তাপ ভোগ হয় মাত্র। ষোড়য বর্ষের পূর্ব্বে মানুষের আকার ধারণ করিয়া এখনও অনেকে পুত্র উৎপাদন কার্য্যে রত হয়েন না। বঙ্গদেশের পাঠই যুক্তিতে টিকে—অন্যপাঠ যুক্তিহীন সুতরাং উদ্ধৃত বিষয়ে হানিকর। যে দেশের পাঠান্তর গ্রহণে আমরা আহূত সে সকল দেশের সামাজিক বিপ্লব অনুসন্ধান করা সত্যান্বসন্ধিৎসুর প্রথম কর্ত্তব্য। বিবাহ কখন হওয়া উচিত সে বিচার খেয়ালে হয় না। আর্য্যের বিবাহ-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে সেই ব্রহ্মচর্য্যটি আগে বুঝা চাই, সেই মাপ কাটি দিয়া বিবাহবয়স না মাপিলে আর্য্যবিবাহ বুঝিবার চেষ্টা পাগলামী মাত্র। কত রকম হৈ চৈ চলিতেছে উহাও তাহার মধ্যে অন্যতম। হিন্দুর বিবাহতত্ত্ব সভ্য জাতিগণ যদি চিনিতে পারিত তবে আজ পৃথ্বীভার অনেক লাঘব হইয়া যাইত। অনন্ত কহিনূর লাভ করিয়া মানব জাতি অক্ষয় ও অনন্ত ধনে সুখী হইয়া শান্তির ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতে পারিত। নানা সভ্য জাতির উদ্ভব ও অচিরে বিনাশ ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করিতে হইত না। আর আর্য সভ্যতা খণ্ড খণ্ড হইয়াও এখন পৃথ্বীতলে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কারণ এই বিবাহতত্ত্ব।

পুরাণ ও ইতিহাসে এ সম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত আছে। দু'একটি উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। রামচন্দ্র সীতাকে লাভ করিয়াই গর্ব্ভাধান করেন নাই। প্রমাণ রাবণ বধের পর বহু বর্ষান্তে তবে সীতার অপত্যসম্ভাবনা হয়। ফলে লবকুশ রামাপেক্ষা বীর্য্যবান হয়েন। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়াই গর্ব্ভাধান করেন নাই। অভিমন্যু পিতা অর্জ্জুন অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ বেশী রথী হইয়াছিলেন। আবার অপ্রাপ্ত বয়সের মধ্যেই অভিমন্যু এই মহাবীরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। বিরাটকন্যা উত্তরা যুবতী হইলে তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও তরুণ অভিমন্যুর সহিত বিবাহ হয়। অভিমন্যুর মত বীর্য্যবান ক্ষত্রিয়েরও অপ্রাপ্ত বয়সের রেত-জাত-পরীক্ষিৎ। তাই মাতৃগর্ব্ভেই গত

হইয়া পড়েন—"কুক্ষিস্থঃ স বিপন্নতে"। মাতা উত্তরা যুবতী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বেঁচেও তিনি অকালে ব্রহ্মশাপে অপমৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন—"জাতোবা ন চিরং জীবেৎ।" এরূপ অনেক ইঙ্গিত পুরাণে ও ইতিহাসে পাওয়া যায়। দেখিবার ইচ্ছাও প্রবৃত্তি থাকিলেই দেখা যায়।

সুশ্রুতের একটি শ্লোকের পাঠান্তর লইয়া লেখক মহাশয় যেরূপ প্রশংসনীয় পরিশ্রম করিয়াছেন তদ্রূপ শাস্ত্রের অন্যান্য স্থলেও অনেক পাঠান্তর আছে। স্বর্গগত ৺কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয় প্রায় ১৮ রকমের বাল্মিকী রামায়ণ-সংগ্রহ করেন। একটির পাঠ আর একটির সঙ্গে মিলে নাই। অবশেষে তিনি বোম্বাইর এক সংস্করণ অবলম্বন করিয়া রামায়ণ অনুবাদ করেন। গীতা ও চণ্ডীর পাঠ-ভেদের সীমা নাই। এই পাঠ ভেদ মহা অমঙ্গলের হেতু। ইহাই সাম্প্রদায়িক পুরাণাদি উদ্ভবের মূল। এতদিন আর্য-রীতি একেবারে ডুবে যেতো—যায় নাই কেননা, কেহই বেদটিকে গীতাতে ছাড়িতে পারেন নাই। বেদতত্ত্ব-দর্শী পুরাণের প্রক্ষিপ্ত অংশ ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ফাঁকে ফাঁকে দেখিতে পান। তাই সে ভ্রম পথগুলি এড়িয়ে চলেন। একটি হাস্যকর পাঠান্তর উদ্ধৃত করিতেছি—আছে "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং" এক উদ্ভট যোগী তাঁর পাঠ করিলেন "যোগঃ কর্ম্মস্বকৌশলং।" কেননা তাহা না করিলে তাঁর শিষ্য বৃদ্ধি হয় না। টাকাও আসে না, জন্মতিথি উৎসব ও হয় না! শাস্ত্রের ভ্রমাশঙ্কায় যথা সম্ভব বেদবিহিত আর্য পথ খুঁজিয়া চলা শ্রেয়ঃ। অলমতি বিস্তরেন।—ভার্গব।

আবেদন।—"প্রবাসীর" গত ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত লাল তুদাই রায়ের "আসামের কুকি জাতি" প্রবন্ধের প্রত্যেকটি উক্তি আমি প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামের একজন মনস্বী সাধক বলিয়াছিলেন—কুকিরা হিন্দু, তাহাদের খৃষ্টানদের কবল হইতে উদ্ধার করা হিন্দুসমাজের একান্ত কর্ত্তব্য। তদবধি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে তজ্জন্য কিছু করা যাইতে পারে কি না তাহারও নানা উপায় চিন্তা করিয়াছি। তাহাতে বিফল হইয়া প্রায় ২০শ বৎসর পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তাদের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তাঁহাদের কাছে কোনরূপ উৎসাহ বা সহানুভূতি পাই নাই; পরন্তু অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এতদসম্বন্ধে নিজে কিছু করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইতাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটা আশঙ্কাও জন্মিত—আমাদের পরামর্শ কুকি প্রভৃতি পার্ব্বতীয় লোকেরা শুনিবেন কেন? ইংরাজ মিশনারীদের পশ্চাতে প্রবল গভার্ণমেণ্ট রহিয়াছেন সুতরাং তাহারা উচ্চপদ, রাজকীয় সম্মান ও অর্থাগমনের প্রলোভন দিয়া কুকিদের আকৃষ্ট করিতেছেন; তেমন কিছুই ত আমাদের নাই। পরন্তু বাহির হইতে অযাচিত ভাবে তেমন উপদেশ ও সাহায্যদানের বিশেষ ফলও পাওয়া যায় বলিয়া আমার মনে হয় নাই। নিজের প্রয়োজন বোধ না থাকিলে অবশ্য সাধিয়া যাহা দেয় তাহা অবজ্ঞাতই হয় এবং এক জাতির উদ্ভাবিত উপায়ে অন্য জাতির সংস্কার সাধনের চেষ্টাও মঙ্গলপ্রদ হয় না—যেমন লাল তুদাই রায় স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন; "মিশনারী আন্দোলন সকল প্রকারে আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে।"

তিনি লিখিয়াছেন,—"আমাদের মধ্যে যাহারা মিশনারী আন্দোলনে যোগ দেয় নাই বা একবার যোগ দিয়া সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে তাহারা আজ দেশবাসীর (হিন্দুসমাজের) নিকট হইতে সারবান কিছু চাহিতেছে।"—তাঁহাদের এই শুভ আকাঙ্ক্ষাকেই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত

করিতেছি। সনাতন আর্য্যধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মরক্ষার ও আত্মোন্নতি সাধনের বাসনা যখন তাঁহাদের প্রাণে জাগিয়াছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হইবে। তাঁহারা বিশুদ্ধ আচারপ্রথার উন্মূলন চাহিতেছেন না, বিরাট সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুসমাজের সহিত তাঁহদের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য রাখাই তাঁহাদের কামনা। কুকি জাতির ধ্বংস সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কুকিরা কখনো আপনাদিগকে কুকি বলিত না। কুকি বলিয়া কোন শব্দ তাঁহাদের ভাষাতে নাই। বাঙ্গালীরা কখন কি ভাবে বলা যায় না উহাদিগকে ঐ নামে ডাকিতে আরম্ভ করেন।…কুকি, লুসাই ও মণিপুরী একই জাতি।…কুকিরা বলিষ্ঠ কষ্টসহিষ্ণু যুদ্ধপ্রিয় ও স্বাধীনতা-প্রিয় জাতি।…যদিও খৃষ্টান মিশনারিগণ অস্বীকার করেন—তবুও আমরা কুকি সমাজকে বিরাট হিন্দুজাতিরই একটি অংশ মনে করি। সরকারী গণনায় কুকিদিগকে হিন্দু লেখা হয় না। পার্ব্বত্যধর্ম্মী বলিয়া লেখা হয়। বহু দেবতার পূজা শ্রাদ্ধাদি ও পিতৃদেবতার পূজা কুকিদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ..আমরা শিব কালী গঙ্গা রাম ও লক্ষ্মীর পূজা করি। হিন্দুসমাজের যে কোনও নিম্নস্তরের ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচরণের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পার্থক্য নাই।

"গৃহবিবাদে ও যুদ্ধবিগ্রহে দুর্ব্বল পার্ব্বত্যজাতি ইংরাজদের বশ্যতা স্বীকার করিল।… সেই সময়ে মিশনারীরা গিয়া প্রচার করিলেন,—'প্রভু যীশুকে বিশ্বাস কর—তোমরা পরিত্রাণ পাইবে। যীশু আমাদিগকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। তোমরা পশু, তোমরা অসভ্য, মূর্খ বর্ব্বর, ভূত। তোমরা কিছু জান না, তোমরা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ কর। ইংরাজ খৃষ্টান, তাই দেখ কত বড়। যীশু আমাকে কেমন সুন্দর জুতা দিয়াছেন, টুপি দিয়াছেন, কোট দিয়াছেন, সিগারেট দিয়াছেন। আমাদের কথা শুনিলে তোমরাও এইরূপ পাইবে।'…মিশনারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ আমরা স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের শতকরা নব্বই জনের উপর আজ খৃষ্টান। ..কুকিরা পূর্ব্বে কখনো চুরি করিত না।…আর আজ যিনি খৃষ্টকে বিশ্বাস করেন,—তিনি চুরি করুন, নানা অসৎ কাজ করুন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, তার জন্য যে খৃষ্টই দায়ী।…কুকীদের সত্যবাদিতা, সরলতা, সাধুতা, বিশ্বাসপরায়ণতা আতিথেয়তা প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখন সভ্য হইয়া সত্যবাদী হইলে ব্যবসায়ই যে বন্ধ হইয়া যায়। সরলতা, সাধুতা ও বিশ্বাসপরায়ণতার কথা বলিবার দরকার নাই। এসব ত বোকামী। নিজের আত্মীয় কুটুম্বও সব সময়ে গৃহে স্থান পান না, এই ত গেল আতেথিয়তা। সভ্যতা লাভ করিতে গিয়া আমাদের যাহা কিছু ছিল সবই হারাইলাম।…যে আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে তাহারই হাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি। যে আমাকে, আমার পূর্ব্বপুরুষকে, আমার দেশকে শতমুখে নিন্দা করিতেছে—আমরা তাহারই সঙ্গে সহস্রমুখে আমাদের বাপান্ত করিতেছি ও মাথায় কুঠার মারিতেছি। এইভাবেই ধ্বংসের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া আমরা সভ্যতা পাইতেছি—অন্ধকার হইতে আলোকে যাইতেছি।"

পাঠকগণ! উক্ত প্রবন্ধে শুধু কুকিজাতির ধ্বংসের চিত্র নহে, সমগ্র হিন্দু জাতিরই ধ্বংসের মূল সূত্র স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন। প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় নিষ্ঠাবান হিন্দুর এই প্রবন্ধটি আমূল পাঠ করা এবং যথোচিত কর্ত্তব্য সাধনার্থ অবিলম্বে অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

কুকিদের করুণ প্রার্থনা ;—"আমরা পতিত, নিরাশ্রয়। বিরাট হিন্দুসমাজের দ্বারে

আমরা ভিক্ষাপ্রার্থী, কৃপাপ্রার্থী। আমরা পতিত, অক্ষম, বা যাই হই, আমরা হিন্দুই। সমগ্র জাতির এককোণে আমরাও কি একটু স্থান পাইব না? আমরা কি এতটুকু সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব?"

সুদীর্ঘ কালাবধি নৈষ্ঠিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মী নেতৃগণের সহিত নানারূপে মিলিত হইবার সুযোগে তাঁহাদের আন্তরিক অভিপ্রায় যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাতে বলিতে পারি,—কুকিদের এই প্রার্থনা কখনো প্রত্যাখ্যাত হইবে না। বিরাট হিন্দুসমাজে তাঁহাদের স্থান আছেই, হিন্দু জনসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি হইতে তাঁহারা কখনো বঞ্চিত হইবে না। এখন কর্ত্তব্য, উপায় নির্দ্ধারণ;—একদিক্ হইতে শ্রীযুক্ত লাল তুদাই রায় প্রমুখ কুকিদের নেতৃগণ, অন্যদিক হইতে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের পূজ্যপাদ অধিনায়ক ও অন্যান্য ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করুন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

এতৎ সম্বন্ধে পণ্ডিতশিরোমণি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় যে অভিমত দিয়াছেন তাহা এই—

"আমার সিদ্ধান্ত আমি অসঙ্কোচে জানাইতেছি। এ জাতি হিন্দু, এ জাতি বন্য বা 'পাহাড়িয়া' ইত্যাদি বিভাগ শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের কল্পিত। ঐ জাতীয় বিভাগ ও উচ্চতা নীচতা জ্ঞাপনের জন্যই দেশে আগুন জ্বলিয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন দ্বিজাতি বর্ণ, অনুলোম দ্বিজাতিগণ এই তিনেরই অন্তর্গত। উপনয়নহীন জাতিমাত্রই শূদ্র; তাহাদিগের দুইটি শ্রেণী, ন্যায়বর্ত্তী বা সৎ এবং তদিতর। তদিতর শ্রেণীর অবান্তরভেদ বহু আছে। সৎশূদ্রের অবান্তরভেদ থাকিলেও তাহা অল্প। যাহারা শ্বেতাঙ্গগণের মতে বন্য বা 'পাহাড়িয়া' তাহারাও শূদ্র। তবে সৎ শূদ্র নহে। যে সকল আরণ্য শূদ্র ধার্ম্মিক হইতে ইচ্ছুক তাহারা তান্ত্রিক শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে। যদি জীবহিংসাবিরত কোন জাতি থাকে তাহারা বৈষ্ণব হইতেও পারে। কিন্তু বৈষ্ণবাচার বড় কঠিন। বিশেষতঃ বীরত্ব বৈষ্ণবত্বের বিরোধী। নামে বৈষ্ণব হওয়া কাজে হিংসারত এমন কপটভাব আমার অনুমোদিত নহে। শাক্তধর্ম্মে সর্ব্বসাধারণ খুব নীচ হইতে খুব উচ্চ পর্য্যন্ত সকলেরই এক একটা স্থান আছে। ভারতীয় মাত্রেই জন্মতঃ হিন্দু। মুসলমান খৃষ্টান বা অন্য কোন নবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই তাহারা অহিন্দু হয়। ইহাই আমার সংক্ষিপ্ত অভিমত।"—শ্রীকালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

মাস-পঞ্জি—মাঘ, ১৩৩৭

ভারত সরকারের ব্যবস্থা পরিষদের নূতন অধিবেশন হইতেছে, তাহাতে ইউনাইটেড্ অপজিসন পার্টি নামে একটী নূতন দল গঠন হইল—ব্রহ্মদেশের আরাওয়াদ্দী জেলাতে বিদ্রোহ চলিতেছে, তাহাতে সরকারের সামরিক শক্তি প্রযুক্ত—ইটালীর মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত এক নূতন বিমান-পথ খুলিবার কথা—রাউণ্ড টেবিল বৈঠকে মুসলমান সভ্যগণের পরিত্যাগের সম্ভাবনার ভয় করা যাইতেছে—স্পেনে নূতন বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে—সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা ব্যবস্থা-পরিষদের

সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন—জেনেভার সর্ব্ব-জাতি সম্মিলনে ব্রিটিশ প্রতিনিধি মিঃ হেণ্ডারসন জোর করিয়া বলিতেছেন যে শান্তি সংরক্ষার নিমিত্ত সমগ্র ইউরোপের সম্মিলিত চেষ্টা একান্ত আবশ্যক—বেভেরিয়া নিবাসী আলেকস্-পন্ ডাঃ পল বেরোদার দ্বিতীয় বার বাঞ্চণঝঞ্ঝা পারাপার আয়োজন করিতেছেন—সম্মিলিত সঙ্ঘের একজন প্রধান কর্মী সার আর্থার সল্টার শীঘ্র চীনে যাইতেছেন—গোল টেবিল বৈঠকের অবসানে প্রধান মন্ত্রী বিজ্ঞপ্তি করিয়াছেন, তাহাতে রাজনৈতিক মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়—বিলাতের পার্লেমেণ্ট সভার নূতন অধিবেশন হইতেছে—লিবারেল দলের এক ভোজে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী একটী উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন—ভারত গভর্ণমেণ্ট আর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে বেআইনী মনে করিতেছেন না—মাদ্রাজি সভ্য শ্রীযুক্ত শ্রীমুথন চেটী ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটী সভাপতি হইলেন—সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ বৎসরের জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার একজন গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন—এলাহাবাদে কংগ্রেস-ওয়ার্কিং-কমিটির বৈঠক হইবার আয়োজন হইতেছে—মহাত্মাজীকে জারবেদা জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইল—সার আর্থার সল্টার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতিসঙ্ঘের উপযোগীতা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন—ব্রাজিলের অন্তর্বিদ্রোহীদলকে জারমেনী একটি যুদ্ধ জাহাজ বিক্রয় করিয়াছে—ভারতের সর্ব্বত্র 'স্বাধীনতা দিবস' উৎসব সমাহিত হইয়াছে, ঐ দিন কলিকাতার মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার হইলেন—বিহার বাগুসরাইতে দশহাজার লোকের উপর পুলিশ গুলি চালাইতে বাধ্য হয়—শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর ছয় মাস কারাদণ্ডাজ্ঞা হইল—মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই হইতে এলাহাবাদ রওনা হইলেন—শ্যামের যুবরাজ পুরাছত্র কলিকাতাতে আগমন করিয়াছেন—ভারত সরকার প্রকাশ করিয়াছেন যে গত ১৯৩০ সনে পুলিশের সহায়তার ১০ বার সামরিক বিভাগের সাহায্য লইতে হইয়াছিল—ব্রহ্মদেশে বিদ্রোহ নিবারণার্থে ভাইসরয় একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন—সন্ধি প্রস্তাবে কংগ্রেস তিনটি সর্ত্তের সঙ্কল্প করিয়াছেন—(১) রাজনৈতিক বন্দীদিগের বিনা সর্ত্তে মুক্তি, (২) শান্তিপূর্ণ পিকেটিং (৩) লবণ আইন অমান্য—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু পীড়িত—বিলাতে মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে একটা তীব্র বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে ভারতবাসীর কাছে কোনও রূপ নম্রতা স্বীকার চলিবে না, ভারতকে বাঁচাইবার (?) জন্য (to save India) একটা বিরাট আয়োজন করিতে হইবে—বিলাতে ডেইলী হেরল্ড পত্রিকা মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে এক তার পাইয়াছেন যে প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা ভারতের দাবীর পক্ষে নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত—রাইটার্স বিল্ডিং হত্যাব্যাপারের আসামী দীনেশচন্দ্র গুপ্তের প্রাণ দণ্ডের আদেশ হইল—সার হরি সিং গৌরের প্রস্তাবিত বিবাহ আইনের বিল এসেম্ব্লী সভাতে অগ্রাহ্য হইয়াছে—মিঃ জিন্না আর ভারতে না আসিয়া বিলাতে অবস্থান করিবেন—আইসলণ্ড ও নিউজীলণ্ডে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে—লক্ষ্ণৌতে পণ্ডিত মতিলালের মৃত্যু হইল—সার তেজবাহাদুর সপ্রু নাকি বিলাত হইতে প্রধান মন্ত্রীর উক্তির অতিরিক্ত কিছু মূল্যবান সন্দেশ আনিয়াছেন, মহাত্মা বলেন তাহাতে শান্তির সম্ভাবনা আছে—বর্মার ব্যবস্থা পরিষদের নূতন বাড়ী খোলা হইয়াছে—এলাহাবাদে সরকার ও কংগ্রেস পক্ষে মিলনের চেষ্টা হইতেছে। চাঁদপুরে ভলাণ্টিয়ারেরা পুনঃ লবণ সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছে, পুলিশ হস্তক্ষেপ করিতেছে না—মাদ্রাজে পিকেটিং চলিতেছে—বর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট "জেনারেল কৌন্সিল অব বর্ম্মা এসোসিয়েসনকে বেআইনী ঘোষণা করিয়াছেন ব্যবস্থা পরিষদে তাহার প্রতিবাদ হইয়াছে—মাদ্রাজে সার আর্থার সল্টার প্রকাশ করিয়াছেন যে অচিরে ভারতের পক্ষে জাতি সঙ্ঘের সংস্রবতা আবশ্যক হইবে—শ্রীযুক্ত ভি, জে, পেটেল ইউরোপ যাত্রা করিলেন।

নিবেদন

গ্রাহক মহাশয়দিগের অনেকে এ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বর্ষের দেয় চাঁদাটা পাঠান [illegible] ভিঃ পিঃ ডাকে পত্রিকা প্রেরণের অসুবিধা ও ব্যয়বাহুল্য আমাদের বা গ্রাহকগণের [illegible] করিতে না হয়, ইহা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। এজন্য নিবেদন সকলেই এ [illegible] বর্ষের মূল্য (সডাক ১।৵০) সত্বর মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিয়া অনুগৃহীত করি[illegible] অন্যথা পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে অগত্যা ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হইবে।

মাসে মাসে পত্রিকা প্রকাশ হইতে না পারায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু প[illegible] পড়িয়াছে বলিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। সহৃদয় গ্রাহকগণের অনেকে তীব্র [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন—নানা স্থান হইতে পত্রিকা প্রাপ্তির কামনা করিয়া আগ্রহ পূর্ণ [illegible] পাইয়াছি। নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও নিয়মিত প্রয়োজন আছে বলিয়াই পত্রিকা খানি [illegible] রূপে পরিচালন করিতে হইবে, ফাল্গুন সংখ্যা পত্রিকা প্রেরিত হইতেছে, চৈত্র [illegible] প্রায় প্রস্তুত, শীঘ্র প্রেরিত হইবে। আগামী বৈশাখ সংখ্যা হইতে নির্দ্ধারিত [illegible] মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত হইতে পারিবে—।

কার্য্যাধ্যক্ষ।



ভারতের সাধনা

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

দ্বিতীয় বর্ষ] ফাল্গুন—১৩৩৭ [পঞ্চম সংখ্যা

সাধনারপথে

মানব-সাধনা বা হিউম্যান ক্যালচারের স্বরূপ কি—ইহা লইয়া লোকের মধ্যে মতভেদ না আছে এমন নয়। আমরা অবশ্যই সাধনা ও ক্যালচার (culture) শব্দ সম অর্থে ব্যবহার করিতেছি; কিন্তু ইহা অতি ব্যাপক অর্থে, খণ্ড বা ব্যষ্টি ভাবে তাহা হয় না। আজ এ দেশের শিক্ষিতগণ অনেক কথা ও ভাবই ইংরাজীর ভিতর দিয়া ধরিতে চাহেন; আর বর্ত্তমান পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও ইংরাজী ভাষাতে culture কথাটি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এ জন্য এ দেশীয় প্রাদেশিক ভাষা সমূহে ইহার অনুবাদে নানা কষ্ট-কল্পনার উদ্রেক করিয়াছে—বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতে 'কৃষ্টি' বা 'সংস্কৃতি' প্রভৃতি শব্দের বিশেষ প্রয়োগ দেখা দিয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যে ঐ কথাটির ব্যবহার সর্ব্বপ্রথম মনীষী বেকনের লেখাতে দেখিতে পাওয়া যায়; কথাটির মূল উৎপত্তি ল্যাটিন ধাতু *cultura* হইতে। তাহার অর্থ—**to till, to cultivate**—কর্ষণ বা চাষ করা। এই মৌলিক অর্থে আমরা culture শব্দে চাষের কার্য্য, চাষের অবস্থা এবং চাষের উৎপন্ন দ্রব্য বা ফসল এই দুইদিকই বুঝিতে পারি। এক্ষণে ভূমির চাষ হইতে বুদ্ধির চাষে অর্থাৎ মনুষ্যের মনোবৃত্তির কর্ষণ বা উৎকর্ষ সাধন অর্থে কথাটীকে ভাবান্তরিত করিলে উহাদ্বারা সাধারণতঃ মানবধর্ম্মের কোনও উচ্চ প্রকর্ষকে—এজন্য যে চেষ্টা ও তাহার ফল এই উভয়কে—বুঝাইতে পারে।

সত্য ও সাধনা

কোনও রূপ উৎকর্ষ অর্জ্জনের চেষ্টা মানব জাতির স্বাভাবিক প্রেরণা—দৈহিক খাদ্যের আবশ্যকতার প্রেরণায় যেমন মনুষ্যকে ভূমির কর্ষণে নিয়োজিত করিয়াছে, আন্তরিক আরও কোন

গুরুতর ও গুহ্য প্রয়োজনের বশে মানুষ আত্মা বা মনের উন্নতিতে ব্রতী রহিয়াছে। এই উৎকর্ষ লাভের যে চেষ্টা তাহাই মানুষের সাধনা। এবং তাহার ফল (ঐ উৎকর্ষ লাভে) সিদ্ধি। এই সিদ্ধির নিমিত্ত মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন হয়, শিক্ষাগুণে যে ফল লাভ হয় তাহাই তাহার সংস্কৃতি বা প্রকর্ষ, আর তাহাতে জাতীয় চরিত্রে যে আচার ব্যবহার, নীতি, ধর্ম্ম, সাহিত্য, কলা ইত্যাদি বসিয়া যায়, তাহা তার সভ্যতা। এই ভাবে দেখা যায় "লোকের সাধনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। মানবের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চরিত্রে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা প্রাপ্তির যে চেষ্টা তাহাই—সাধনা, উহার উপায়—শিক্ষা, তাহাতে সাক্ষাৎ কৃতার্থতা—সংস্কৃতি ও পরোক্ষ ফল—সভ্যতা। সাধনা বীজ, শিক্ষা উহার পুষ্টি সাধন, সংস্কৃতি পরিপূর্ণ বৃক্ষ ও সভ্যতা উহার ফল ফুলাদি সুশোভন উৎপন্ন দ্রব্য সকল। পূর্ণমানবীয়তার ইহারা বিভিন্ন অঙ্গ—এমন ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত যে একটিকে ছাড়িয়া অপরটি বৃদ্ধি পায় না এবং কোনও একটির কিছুমাত্র লাঘব ঘটিলে, অপরগুলিরও হানি হয়। এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ইহাদের মধ্যে পার্থক্যবোধ রাখা কঠিন, সময় সময় এক অপরের বাচ্য হয়—সাধনা, সভাতা, সস্কৃতি, শিক্ষা একে অপরের পরিভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়।" * তাহা হইলে ইংরাজী culture শব্দে মূলতঃ যেমন কৃষি ও কৃষির ফল—উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা ও উৎকর্ষ লাভ উভয়ই বুঝায়, সাধনা বলিতেও ব্যাপক অর্থে তেমনই প্রকর্ষ লাভের চেষ্টা ও উপায় এবং প্রকর্ষ লাভ বা তাহা কল উভয়কে বুঝাইতে পারে।

মৌলিক অর্থ যাহাই থাকুক খণ্ড অর্থে ইহাদের বিভিন্ন ব্যবহার আছে—পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিতগণ একালে 'culture' অর্থে কিরূপ বিভিন্ন ভাব বুঝিয়াছেন তাহা মহামতি বেকন্ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইউরোপীয় প্রধান প্রধান চিন্তাশীল মনীষিগণের অভিমত হইতে বুঝিতে পারা যায়।—

"বেকন্ culture অর্থে বুঝিতেন জ্ঞানালোক বা তাঁহার সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী schoolmen বা যাজক-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রচারিত কু-সংস্কারের জঞ্জাল বা প্রাচীন ভাবধারা হইতে মুক্ত জ্ঞান। ফরাসী-চিন্তা-বীর ভল্‌টেয়ার্ ও মলেন্ মনে করিতেন জ্ঞান বা চিন্তা লোকের সাধনা বা সিদ্ধির (cultureএর) বড় অঙ্গ নহে; কর্ম্মই উহার অবয়ব। এজন্য চিন্তা বর্জ্জন করিয়া লোকের কেবল কর্ম্ম করিয়া যাওয়া উচিত; তাহাতেই তাহার সিদ্ধি লাভ।

জ্যার্ম্যান্ মনস্বী গেটের মতে মনুষ্য-জীবনের বহির্ভাগ ও অন্তর্ভাগের মধ্যে মিলন বা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া যে শক্তি লাভ করা যাইতে পারে, অথবা তাহাতে যে উৎকর্ষ লাভ করা যায়, তাহাই 'culture'. ভুণ্ড-প্রমুখ আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকগণ লোকের জ্ঞান-মূলক ও কর্ম্ম-মূলক উৎকর্ষের ভেদাভেদ মানেন না; তাঁহাদিগের মতেও অন্তর্জ্জগত এবং বহির্জ্জগত—বিচার শক্তি ও কর্ম্ম-প্রবণতা—এই উভয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করাই চরম উৎকর্ষ বা কল্‌চার' (culture) লাভ।

পাশ্চাত্য মনীষিদিগের মত

মনীষী ক্যাণ্টের মতে বিচার শক্তির সম্যক্ উৎকর্ষ লাভই 'কল্‌চার'-এর প্রধান অঙ্গ; এবং তাহার পরিণতি দর্শন-তত্ত্ব।

* ভারতের সাধনা প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা ৯ পৃষ্ঠ।

"কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য লোকদিগের মনোবৃত্তিতে অন্তর্জ্জগতের স্থান অতি তুচ্ছ ; ইহারা বহির্জ্জগতের জ্ঞানসম্ভার লাভ করাকেই 'কলচার' বলিতে চাহেন—লোকের জ্ঞানশক্তি ও জ্ঞানলাভে কৌতূহলই cultureএর মূল। এই হিসাবে কোনও বিশিষ্ট জাতি বা ব্যক্তি আপন অসাধারণ প্রতিভা দ্বারা কি কাজ করিলেন বা কি আদর্শ সংস্থাপিত করিলেন, তাহার পরিচয় লাভ করাও 'কল্চার'। মোটের উপর ইঁহারা বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানাদর্শের অনুযায়ী যে শিক্ষিতজীবন তাহাকেই 'কল্চার' বলেন। এই দৃষ্টিতে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য লোকদিগের কল্চার হইল প্রাচীন ধর্ম্ম-যাজক-প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া—বেকনের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত—ইউরোপীয় লোকেরা যে জ্ঞান লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাহাই। ইঁহাদের মতে ইউরোপের বর্ত্তমান যুগের চিন্তাধারায় এই 'কল্চারের' তিনটি ক্রমবিকাশের স্তর দেখা গিয়াছে—(১) প্রথম জ্ঞানালোকের যুগ (Enlightenment, ১৬২৫—১৭৮৯) ; (২) মধ্যে এক ভাব বা আদর্শবাদের যুগ (Romanticism, ১৭৮৯—১৮৫৭) ; এবং শেষ (৩) বর্ত্তমান এই বাস্তব-বাদের যুগ (Realism, ১৮৫৭ হইতে আজ পর্য্যন্ত)।" *

'সাধনা' বলিতে আজ এ দেশেও সকলে একই ভাব বুঝেন না। একদিকে যেমন ইহাকে কেহ কেহ যোগ-সিদ্ধির উপায় বিশেষ বলিয়া ঋষি বা তপস্বীদিগের অবলম্বনীয় কোনও পন্থা বিশেষ বলিয়া ধরিয়া থাকেন, অপরদিকে সাময়িক কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত জাতির বা ব্যক্তির সমক্ষে উপস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বা আবশ্যক কর্ম্ম পদ্ধতিও উহাদ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। এই ভাবে কেহ বলিবেন সাধনা অর্থ যপ তপ পূজা সন্ধ্যা বা আরতিপদ্ধতি। আবার কেহ বলিবেন অর্থ-সাধনা, শিল্প সাধনা, সাহিত্য-সাধনা, স্বরাজ্য-সাধনা ইত্যাদি। আমরা বলি এ সকলই ঠিক, কিন্তু ভারতের সাধনা বলিতে আরও গভীর ও বিস্তৃততর মৌলিক কিছু বুঝিতে হয়। এ সকলও উহার অন্তর্গত ; কিন্তু ইহারা উহার সমুদয় নয়। আর ইহাদেরও বাস্তবিক মর্ম্ম বা প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় ভারতের সেই সমষ্টি সাধনার দৃষ্টি হইতে। ভারতের এই সাধনার একটী বিশিষ্ট ধারা ও প্রকৃষ্ট প্রকৃতি আছে ইহাই আমাদের বিবেচ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়।

সাধনার ধারা

বাস্তবিক ধরিতে গেলে সকল লোকেরই—ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভাবে নিজ নিজ সাধনার ধারা আছে। লোকের প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সংস্কার, লক্ষ্য বা আদর্শের বিভিন্নতা বশে সেই সাধনার পরিণতি বা সিদ্ধিলাভ বিভিন্নরূপে হইয়া থাকে। যে জগজ্জয়ী বীর নিজ শৌর্য্য ও বীর্য্য বলে অসংখ্য লোকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, যে মহাপুরুষ বা ধর্ম্মপুরুষ ইহলোকের দৃষ্টির অন্তরাল ভেদ করিয়া পরলোকের সমাচার দানে সহস্র সহস্র মানবের হৃদয়ে উচ্চ আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, অথবা যে কবি শিল্পী দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক নূতন নূতন ভাবে মানুষকে নানা প্রকারে অভিভূত করিয়া গিয়াছেন,—ইহারা সকলেই আপন আপন সাধনার অসাধারণ সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন মাত্র। ইহাদের ছাড়া কত কত কোটি কোটি লোক আপন আপন ভাবে অসংখ্য প্রকারে নিজ নিজ সাধনায় কৃতার্থতা দেখাইয়া অনন্ত কালের বক্ষে ডুবিয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহাদের সংবাদ রাখে না—লোক গোচরে তাহার প্রকাশ পায় নাই। ব্যক্তির মধ্যে যেমন খণ্ডভাবে সাধনার বিকাশ দেখা

* ভারতের সাধনা ঐ ১১ পৃষ্ঠ।

যায় জাতির মধ্যে সমষ্টি ভাবে সেইরূপ মানব সাধনার পরিণতি হইয়া থাকে। অনেক জাতিই নিজ নিজ ভাবে অল্লাধিক পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে ব্যক্তির ন্যায় অসংখ্য জাতির সংবাদও ইতিহাস এখন দিতে পারে না।

প্রায় সকল প্রাচীন জাতির আদর্শ ও সাধনা পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। ইহার কারণ ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে একই রূপ—ইহাদের সাধনা ব্যাপক ভাবে কোনও চিরন্তন সত্য-নীতির ভিত্তিতে নিহিত ছিল না, জীবনাদর্শও তদনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, জীবনপ্রণালী সেই-রূপে পরিচালিত হয় নাই। তাহার সন্ধান পাওয়া সহজ বিষয় নহে। যে স্থলে কোনও সত্যাংশের লক্ষ্যেও কাহারও সাধনা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, পরোক্ষে হইলেও, তাহার প্রভাব কোনও না কোনও প্রকারে পরবর্ত্তী কালের মানব সমাজে রহিয়া গিয়াছে। এই ভাবেই ধর্ম্মপ্রচারক বা ভগবদ্‌তত্ত্ব-বিজ্ঞেতাদিগের প্রভাব বিশেষ রূপে পৃথিবীতে দেখা যাইয়া থাকে। জ্ঞানবীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের এবং কর্ম্মবীর বিজেতা বা শিল্পীগণের প্রভাবও জগতে বিদ্যমান থাকে। জাতিগতভাবে প্রাচীন বৌদ্ধ ও ইহুদীদিগের বর্ত্তমান মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মের উপর, প্রাচীন আর্য্যজাতির সমাজ নীতির প্রভাব বর্ত্তমান উন্নতিশীল জাতি সমূহের শাসননীতির উপরে, প্রাচীন গ্রীকদিগের দর্শন ও কলা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরে, রোমানদিগের আইন-কানুন বর্ত্তমান জগতের ব্যবস্থাশাস্ত্রের উপর প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ফীনসিয়দিগের বাণিজ্যসাধনা, লীডিয়ান দিগের নগর রচনা, মিসরের স্থাপত্য, ব্যাবিলনের জ্ঞানচর্চ্চা, পারসীকের সাম্রাজ্যনীতি প্রভৃতি অনেক বিষয় পরবর্ত্তী মানব-সমাজে অল্পবিস্তর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাদের কাহারও জাতীয় সাধনা কোনও স্থানেই স্থিরভাবে বা নিশ্চিত পরম্পরাক্রমে বিদ্যমান নাই। ঐ সকল জাতিই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কারণ ইহাদের জাতীয় সাধনার উচ্চ আদর্শ বিদ্যমান থাকিলেও তাহা এরূপ ছিল না যে জাতীয় জীবনীশক্তিকে চিরকাল সঞ্জীবিত করিয়া উহার সংরক্ষণ করিয়া চলিতে পারে। ধর্ম্ম বা যে নিগূঢ় সনাতন সত্য নিখিল বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহাই একমাত্র স্থির ও স্থায়ী নীতি যাহাতে রক্ষা হইয়া থাকে; তাহার অভাবে বিনাশ ও ক্ষয়। এই সত্যকে অবলম্বন করিয়া যে সাধনা, তাহাই বাস্তবিক সাধনা—সে সত্যের উপলব্ধি এবং জাতিগত বা ব্যক্তিগত জীবনে তাহার প্রয়োগ ও বিকাশ সাধন মানবীয় সাধনার পরাকাষ্ঠা। যে তাহাতে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে, তাহার মরণ নাই—সে অমৃত। অনন্ত কাল ও দিক ব্যাপী বিশ্বব্যাপায়ের অন্তরালে সেই একই সত্যরূপী ফল্গু-ধারা প্রবাহিত রহিয়াছে; যে তাহার উদঘাটন করিয়া তাহার পুণ্যবারিতে জীবন তর্পণ-সমাধা করিতে পারিয়াছে, সেই ধন্য, তার সাধনা সার্থক; যে তাহার সন্ধান মাত্র করিতে গিয়াছে সেও নমস্য, সাধনায় সিদ্ধির আভাস তাহার ঘটিয়াছে; কিন্তু যে তাহার কোনও সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবল উপরে বালুকার স্তূপ-গঠন ও রেখা মাত্র রচনা করিয়া গেল, তাহার সাধনা ব্যর্থই বলিতে হইবে।

এই সত্যের লক্ষ্যে ভারতীয় সাধনার গতি ও প্রকৃতি কি তাহা ইতিহাস ও তত্ত্বের দিক হইতে নির্দ্দেশ করা যায়—উহার মূল স্থিতি ঋষি-দৃষ্টি বা চরম সত্যের উপলব্ধিতে। ভারতীয় সাধনা বলিতে ভারতের আর্য্য ঋষিগণ স্মরণতীত কাল হইতে অসাধারণ তপস্যা বা অধ্যবসায় বলে জগত্তত্ত্বের যে চরম সত্যের উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহা ভারতের ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতিতে প্রয়োগ করিয়া মানব জীবনের ঃ উৎকর্ষ লাভের বিধান করিয়াছেন এবং সেই সত্যাদর্শে

অনুপ্রাণিত হইয়া বিভিন্ন যুগে, নানা প্রকার বিপ্লবের মধ্য দিয়া ও বিভিন্ন অবস্থায় নানা প্রকারে ভারতের মহাপুরুষগণ মানবের যে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ধারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও ভবিষ্যতেও করিবেন বলিয়া ভরসা ও বিশ্বাস করা যায় তাহাই বুঝিতে হইবে।

সাধনার পথ বা উপায়

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি মানবীয় সাধনার এই তিন পথ। মানুষ এই তিনটী শক্তি লইয়া আসিয়াছে, ইহাদের দ্বারাই তাহার জীবনের যাহা কিছু সার্থকতা তাহার সম্পাদন করিতে হইবে। এই কালের একজন শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য দার্শনিক [ইম্যানুয়েল্ ক্যাণ্ট] ইহাদের উত্তম বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন—পরবর্ত্তী কালের পণ্ডিতেরা এই বিভাগকে মনোবিজ্ঞানের সাধারণ চর্চ্চায় নিয়োজিত করিতেছেন। ক্যাণ্টের উদ্দেশ্য ছিল ইহাদের দ্বারা জগতের মূল তত্ত্ব কিরূপ বা কতদূর নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহার পরীক্ষণ। কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া পরবর্ত্তী পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ নূতন নূতন চিন্তাধারার পথ উন্মুক্ত করিয়া গেলেও, মূল লক্ষ্যে পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আর অধিকদূর যায় নাই—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি (ক্যাণ্ট-নির্দ্দিষ্ট knowing, willing, feeling) এই তিন অবস্থা কেবল মনোবিজ্ঞানের খণ্ড আলোচনার বিষয় রহিয়া গেল, পরা-তত্ত্বের প্রাপ্তির সাধন বলিয়া উন্নীত হইল না। ভারতীয় ঋষিদিগের দৃষ্টিতে মানব চরিত্রের এই প্রবৃত্তি গুলির সম্যক বিকাশসাধনই মানব সাধনার প্রকৃষ্ট পথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং ইহাদের দ্বার পরাতত্ত্বের উপলব্ধি, পরমানন্দপ্রাপ্তি ও ব্যবহারিক জীবনে উত্তম কর্ম্মনীতি নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল। তাই সর্ব্বভূতে সমদর্শন, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,' আত্মানুসন্ধান—'জ্ঞানে মুক্তি' প্রভৃতি ভারতীয় সাধনার জ্ঞানযোগের অধিগত বিষয় ; সর্ব্বজীবে দয়া ও প্রেম, সর্ব্ববিষয়ে ঈশ্বরত্বের উপলব্ধি ও সকল কার্য্যে ঈশ্বরীয়ভাবের আরোপ, অহিংসা, স্থির শান্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি ইত্যাদি ভারতীয় সাধনার ভাব বা ভক্তিযোগের লক্ষণ; এবং ত্যাগমূলক বা নিষ্কাম কর্ম্ম—ইন্দ্রিয় বিষয়ের ভোগলালসা নহে—ভগবদ্ গীতাতে যাহার চূড়ান্ত উপদেশ রহিয়াছে—তাহাই ভারতীয় সাধনার কর্ম্ম-নীতি। ইহাদের প্রত্যেকের পূর্ণ বিকাশে অপরের সহিত পার্থক্য বা বিরোধ কিছু থাকে না—সকলে এক পূর্ণ মানবত্বে মিশিয়া যায়। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির এইরূপ সমন্বয়েই ভারতীয় সাধনার বিশিষ্ট বিকাশ। ইহাতে অন্তপ্রকৃতির সমুদয় বিভিন্নতা বিদূরিত করিয়া এক অখণ্ড মানবশক্তির প্রতিষ্ঠা করে; এবং তাহাতে বহির্জগতের সমুদয় বিচ্ছিন্নতাকে বিদূরিত করিয়া এক অখণ্ড সমষ্টিব্রহ্মসত্ত্বায়—পরম সত্যের উপলব্ধি বা পরিণতি হয়। ইহাই ভারতীয় সাধনার চরম লক্ষ্য। ভারতের সমাজ ধর্ম্ম ও শিক্ষা এই আদর্শে নিয়ন্ত্রিত। ভারতের মহাপুরুষগণের চরিত্র ইহার প্রতীক রূপে আজও সমাজ পরিচালনা করিতেছে—ভারতীয় সাধনার চালক ও রক্ষক রূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

এই সত্য ও সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ভারতের সাধনার ধারা চিরন্তন কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।* আর যে সকল জাতি নিজ সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত তাহার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই, তাহাদের সঙ্গে ভারতীয় সাধনার এই স্থলেই পার্থক্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপে প্রাচীন গ্রীকদিগের অসাধারণ সাধনার কথা ধরা যাইতে পারে। গ্রীকগণ জ্ঞান-গৌরবে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আজিও তাহা গ্রীসের প্রাচীন স্মৃতিকে উজ্জ্বল

* 'The stream of Indian culture has flowed through the ages, reinforced by the time spirit at every stage. without being untrue to itself or losing its soul in the sweeping current,—Indian Culture Through Ages.

করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু গ্রীসের সেই চিন্তাধারায় কোনও স্থির শাশ্বত সত্যের সন্ধান মিলে নাই, যাহাতে সকলে গিয়া একস্থানে জ্ঞান-লিপ্সার পরিসমাপ্তি করিতে পাইতেন। সে জন্য দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে 'নানা মুনির নানা মত'—তাহাতে স্থির 'ঋষি-দৃষ্টি'র অভাব। আর সেজন্যই সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিতে, ধর্ম্ম ও শিল্পকলাতে ইহাদের ঐক্য বা সামঞ্জস্য ছিল না। ইহাদের উচ্চ জ্ঞান-সাধনা কর্ম্ম-সাধনাকে আপন করিয়া লইতে পারে নাই। সেইজন্য রাষ্ট্রনীতির প্রাবল্যে প্রথমতঃ আত্ম-কলহের দুর্ব্বলতা আনিয়া পরে পররাষ্ট্রের অধীনতায় সেই প্রাচীন গ্রীসের বিলোপ সাধন করিয়াছে। অন্য দিকে ভক্তি বা ধর্ম্ম সাধনার একান্ত অভাব হেতু পরবর্ত্তীকালে যখন ঐ ভাব লইয়া খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইল, তখন তাহার কাছে প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতাসম্ভারকে নাস্তিকতা বলিয়াও অবজ্ঞাত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

খৃষ্টান বা অন্যান্য বিশ্বাস ও ভক্তি মূলক ধর্ম্ম-মতবাদগুলিও প্রকৃত মানবীয়তার সাধনার দৃষ্টিতে একদেশ-দর্শী। ইহারা কেহই জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনা-ধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারে নাই। এজন্য সমষ্টিসত্যের অভাব হেতু ইহাদের অবনতি ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে—এ মতে জ্ঞান হইল সমুদয় অনর্থের মূল, কর্ম্ম শয়তানের কারসাজি! এজন্য যে খৃষ্ট ধর্ম্মমত এক সময় গ্রীসের অসাধারণ জ্ঞানগরিমাকে ম্রিয়মান করিয়া দিয়াছিল, তাহাকেও কালক্রমে মলিন হইয়া মধ্যযুগের ইউ-রোপীয় চিন্তাধারায় স্কলেষ্টিকদিগের হাতে প্রাচীন গ্রীকচিন্তার সাহায্যভিখারী হইতে হইয়াছিল।

সাধনার পথে বাধা

সাধনার পথে বাধা বিস্তর। জাতিগত সাধনার ক্ষেত্রেও এ বাধার বিপত্তি কম নয়। অনেক স্থলে একই পথের যাত্রীগণ পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, ইহাদের সাধারণ লক্ষ্য অতি উচ্চ এবং আদর্শ মহান্ না হইলে পরস্পর পরস্পরের ঘাতক হয়। এইরূপে অনেক দার্শনিক সম্প্রদার ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। শিষ্য গুরুর, ছাত্র শিক্ষকের পথ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়াছে। আর মূল তত্ত্ব বা উপদেশকে বিভিন্ন রূপে ধরিয়া বা বুঝিয়া নানা মত-পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধ এবং সক্রেটিসও ইহা হইতে অব্যাহতি পান নাই। সমগ্র মানব সাধনার ইতিহাসে একমাত্র বৈদিক আর্যতত্ত্বেই এইরূপ ভাব দেখা যায় যে, তাহার অনুবর্ত্তী বিভিন্ন মতবাদে উহাকে নিত্য সত্য ও যথার্থ বলিয়া সকলের সাধারণ ভিত্তিরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। ভারতীয় বিবিধ দার্শনিক বিচার পদ্ধতি (systems) গুলিতে যে স্বাধীনচিন্তার প্রসার ও বিভিন্ন মতবাদের পোষণ করা হইয়াছে, একই দেশের চিন্তাধারার সেরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু ইহারা সকলেই মূল বৈদিক তত্ত্বকে অভ্রান্ত বলিয়া নিজ নিজ আধার রূপে গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে সেইমৌলিক তত্ত্বের মাহাত্ম্যই প্রকাশিত হয়। উহাকে অবলম্বন করিয়া যে সাধনা বিকাশ লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহাই অব্যাহত ভাবে আজ পর্য্যন্ত ভারতে চলিয়া আসিতেছে।

অনেক সময় এক জাতির সাধনাও অপর জাতির সাধনার বাধক হইয়া থাকে। বিভিন্ন জাতির সাধনার মধ্যে এইরূপ সংঘর্ষ সকল সময়েই ঘটিয়াছে ও এখনও ঘটিতেছে। এই সংঘর্ষে অনেক জাতির সভ্যতা ও সাধনা একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অনেক সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, এবং একের সাধনা অপরের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রেও জাতীয় সাধনার শক্তি বা স্থায়িত্ব উহার মূল ভিত্তির শক্তির উপরই নির্ভর করে। এ স্থিতি বা স্থায়িত্ব দ্বারা মৌলিক ভিত্তির পরীক্ষা হয়।

ব্যক্তিগত ভাবে সাধনার পথে বাহিরের বাধায় অনেক জ্ঞান-বীরের পতন ঘটিয়াছে, অনেক ধর্ম্মবীর নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন, অত্যাচার উৎপীড়নের পরিসীমা থাকে নাই—খৃষ্ট, মহম্মদ, সক্রেটীস, গ্যোসিলিও—ইঁহারা বাদ যান নাই। রাষ্ট্রীয় শক্তির বাধাতে অনেক সাধনার গতিপথ রক্তস্রোতে অবরুদ্ধ হইয়াছে। এ সকলই হইয়াছে অজ্ঞানতার ঘোর মোহে—সত্যের সন্ধান না হওয়াতে, সত্য-শক্তির প্রতিষ্ঠার অভাবে।

ভারতীয়:সাধনার পথেও প্রতিবন্ধকের অভাব হয় নাই। যুগে যুগে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়াই ইহার ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু যে সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তিতে উহা প্রতিষ্ঠিত, তাহার সর্ব্বব্যাপী প্রভাবে অচিরে সকল বিপক্ষ শক্তিকে ইহার নিকট অবনত হইতে হইয়াছে। যতদিন ভারত তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তত দিন ইহার ভিত্তি কেহ টলাইতে পারে নাই—বরং অপর সাধনাকে হয় ইহার নিকট পরাভূত হইতে হইয়াছে অথবা ইহার সহিত মিশিয়া গিয়া আপনাকে ধন্য ও চরিতার্থ করিতে হইয়াছে। দেখিতে পাওরা যায় যে প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে প্রবাহিতএই সাধনার ধারা একদিকে যেমন অন্তর হইতে উত্থিত বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিদ্রোহী মতবাদকে শান্ত করিয়া আপন অঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছে, অন্য দিকে আবার তেমনই বিভিন্ন বৈদেশিক আক্রমণকারী রাষ্ট্রশক্তিকেও আপন প্রভাবে প্রভাবিত করিয়া আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিল। যতদিন ভারতীয় সাধনার দিব্যদৃষ্টি স্থির ছিল, ততদিন উহার শক্তিতে ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সুস্থ ও সবল ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন যুগের মহাপুরুষগণ সময় ও পরিবর্ত্তনশীল জগতের অবস্থা ও প্রয়োজন বুঝিয়া, সেই সাধনার ধারাকে অব্যাহত ভাবে বিভিন্ন যুগের ভিতর দিয়া প্রতিপদে উহার প্রসার সাধন করিয়া চলিয়াছেন; সময় সময় উহার উত্থান-পতন ঘটিয়াছে বটে কিন্তু আন্তরিক প্রকৃতি ও সত্তার বিনাশ সাধন হয় নাই, সময়ের স্রোতে উহা ভাসিয়া যায় নাই।

সাধনা সংগ্রাম

মুসলমানের আক্রমণে ভারতের সাধনার উপর এক বিশেষ বিপদ্‌পাত ঘটিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন সভ্যজগতের অন্যান্য দেশ সমূহ উহাদ্বারা যেরূপ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, সে তুলনাতে ভারতে কিছুই হয় নাই। তখন ভারত যে ভাবে আত্মসংরক্ষণ করিতে পারিয়াছিল ও ক্রমে সেই দুর্দ্ধর্ষ বৈদেশিকদিগকেও যেরূপ আত্মস্থ করিয়াছিল, তাহার অসাধারণ সাধনার বলই তাহার হেতু। তাহারই বলে মুসলমান আধিপত্যের অবশানে ভারত ধর্ম্ম, অর্থ, সমাজ এবং রাষ্ট্রে পুনঃ প্রাধান্য লাভ করিয়া বসিয়াছিল।

কিন্তু এখানেই তাহার বিপদের অবসান হয় নাই। ভারতীয় সাধনার আরও কঠোর পরীক্ষার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল যখন পাশ্চাত্যের এক সুসম্বদ্ধ রাজশক্তি ভারতের উপর আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল। যে ক্ষুদ্র সমরায়োজন দ্বারা ও অনায়াস-লব্ধ সুযোগ ও সুবিধাতে ইংরাজ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে, তাহা ঐতিহাসিকের নিকট বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা দ্বারা আরও যে এক বৃহত্তর সমরায়োজনের উদ্যোগ বা ভূমিকার সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র, তাহা মনে করিলে সে বিস্ময় ডুবিয়া যায়—এদেশে ইংরেজের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সাধনা ও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সাধনার যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার তুলনা মানবীয় সাধনার ইতিহাসে বিরল। বীরপুরুষদিগের বিজয় অভিযান, দ্ব ও সমরায়োজন অথবা রাষ্ট্রীয় বা

সামাজিক বিপ্লব দ্বারা যে সমুদয় সংঘর্ষ পৃথিবীতে হইয়া গিয়াছে, তাহাদের তুলনায় মানবের সাধনা ক্ষেত্রের সংগ্রাম আরও নিগূঢ় মাহাত্ম্যপূর্ণ, এবং মানবত্বের পরিণাম নির্ণায়ক। সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসে ক্রমান্বয়ে এই সাধনার সমষ্টিসংগ্রামই চলিয়া আসিতেছে—অন্য সমুদয় সংগ্রাম ইহার অধস্তন। এ মানবধর্ম্মের কুরুক্ষেত্রে অনেক পর্ব্ব সমাধা হইয়াছে, আজ পাশ্চাত্য ও ভারতীয়ের সংঘর্ষণে যে মহাপর্ব্বের আয়োজন হইয়াছে, তাহার তুলনায় প্রাচীন দেবাসুর সংগ্রাম তুচ্ছ। পরিণামে ভারতের সাধনাশক্তির জয় হইবে নিশ্চিত। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে এই সংঘর্ষে ভারতীয় সাধনার মৌলিক আধারে ভিতর ও বাহির হইতে যে প্রচণ্ড আঘাত পৌছিয়াছে, তাহাতেই বিশেষ আশঙ্কার উৎপত্তি ও সতর্কতা আবশ্যক হইয়াছে—আজ ভারতের শিক্ষানীতি বিকৃত, সমাজ বিধ্বস্ত, শিল্প ও বাণিজ্য লুপ্ত, রাষ্ট্রে বিচারে ও শাসনে জটিল হইতে জটিলতর সমস্যার উদ্রেক করিতেছে। দুর্দ্দশার চাপে পড়িয়া এক প্রকার জাতীয় জাগ্রতি দেখা যাইতেছে বটে, এবং তাহা হয়ত ভারতের জাতীয় সাধনারই পরোক্ষ ফল—কিন্তু যে সত্য-দৃষ্টি হইতে ভারতের সনাতন সাধনার ধারা প্রবাহিত, তাহার দিকে ইহার নজর নাই, বরং উহা হইতে বিমুখ। তথাপি মনে রাখিতে হইবে—যে ঋত ও সত্যকে অবলম্বন করিয়া ভারতীয় সাধনা প্রতিষ্ঠিত, আত্মপ্রতিষ্ঠায় শক্তি তাহার আছে। যাঁহারা তাহার স্বরূপ স্পষ্টতঃ দর্শন করিয়া ওতপ্রোত ভাবে উহাকে ভারতীয় জাতীয় প্রকৃতি ও ব্যবহারে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন—যাহাতে ভারতীয় সাধনার বিকাশ—তাহারাই এইরূপ আঘাত, ক্লেদবা মলিনতার প্রকৃতি নির্দ্দেশ ও তাহা নিবারণের উপায়স্বরূপ আশীর্ব্বাণী দান করিয়া গিয়াছেন—

পথ-নির্দ্দেশ

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানা চ পরাচ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ॥ ঋঃ সঃ ২।৩।২২।

—সর্ব্বলোককারণ বিশ্ব-গোপায়িতা পরমাত্মাকে আমি দেখিয়াছি, তাঁহার পরমার্থিক ও ব্যবহারিক এই দ্বিবিধ অবস্থাই আমি সর্ব্বপ্রকারে উপলব্ধি করিয়াছি। তিনিই ব্যবহারিক অবস্থায় এই বিশ্বের অন্তর ও বাহিরে সমষ্টি ও ব্যষ্টিতে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান, ইহার কার্য্যকারণত্ব তাঁহার পুনঃ পুনঃ অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমন করার বিকাশ বা আভাস মাত্র। আবার—

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যেঽশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতঃ কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি। ছান্দোগ্য—১৩।১

—আমি হৃদয় কন্দরস্থ দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হই এবং সেই ব্রহ্মলোক হইতে হৃদয় কন্দরে পুনঃ প্রত্যাগমন করিতেছি,—যেমন অশ্ব গাত্রলোম সকল কম্পিত করিয়া তাহা হইতে ধূলি প্রভৃতি অপসারিত করতঃ পবিত্র হয় এবং চন্দ্র যেরূপ রাহু-গ্রাস হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বপ্রভায় দীপ্তিমান হয়, সেইরূপ আমি সকল প্রকার অপবিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া সকল অনর্থের আধার স্বরূপ পাপ সম্বন্ধ ত্যাগ করতঃ কৃতকার্য্য হইয়া নিত্য সত্যলোক প্রাপ্ত হইতেছি।—ভারতের সাধনার ইহাই স্বরূপ এবং পথ-নির্দ্দেশক।

সন্ধ্যোপাসনা

আচমন মন্ত্র

সমষ্টির আচমন পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। প্রাণায়ামান্তে ব্যষ্টি বিশ্বে বা দেহে উপাসক নিবদ্ধ হইয়া সাকল্য হোম বা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের হবন করিতেছেন। "দেবোভূত্বা দেবং যজেৎ" অর্থাৎ প্রাণায়ামের সাধনায় "দেবোভূত্বা" সাধক দেবতার উপসনা করিতেছেন। তাই এখনও আমরা পূজার আগে আপনাকে দেবতা ভাবিয়া নিজের মাথায় আগে ফুল দিয়া তবে আরাধ্য দেবতার পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া থাকি।

তিনটি সন্ধ্যায় তিন প্রকারের আচমন মন্ত্র। যথা—

প্রাতে—

প্রাতঃকালের মন্ত্র

সূর্য্যশ্চেত্যনুবাক্যস্য যাজ্ঞিক উপনিষদৃষিঃ সূর্য্য মন্যু মন্যুপতি রাত্রয়ো দেবতা সূর্য্যশ্চেত্যারভ্য। রক্ষন্তামিত্যন্তস্যর্চশ্চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী যদ্রাত্র্যেত্যারভ্য ময়ীত্যন্তস্য পঞ্চপদা পঙক্তি ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্তস্য দশাক্ষরপাদাভ্যামুপেত বিরাট্ ছন্দোমন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং।
যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রি স্তদবলুম্পতু।

যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃত যোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা।

অর্থ

সূর্য্যশ্চ ইত্যাদি অনুবাক বা মন্ত্রের যজ্ঞকারী উপনিষদ্ নামক ঋষি; সূর্য্য, যজ্ঞ, যজ্ঞপতি ইন্দ্র এবং রাত্রি এই চারি দেবতা; এবং সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া রক্ষন্তাং পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশের ২৪ অক্ষর যুক্তা গায়ত্রী ছন্দ; যদ্রাত্র্যা হইতে ময়ি পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশের পঞ্চপদাত্মক পঙক্তি ছন্দ এবং ইদং হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাহা পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশের দশাক্ষরপাদভ্যামুপেত বিংশতি অক্ষরাত্মক বিরাট ছন্দঃ এই মন্ত্রটি আচমনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আপস্তম্ব বলেন যাজ্ঞবল্ক উপনিষদ ইহার ঋষি। অথবা ব্রহ্মা ইহার ঋষি। মন্ত্রের অর্থ— সূর্য্য যজ্ঞ ইন্দ্র ও রাত্রি প্রভৃতি দেবতাগণ অনাচরিত যজ্ঞ, ক্রোধাদি নিষ্পাদিত পাপ সকল হইতে আমাকে রক্ষা করুন। মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্না প্রভৃতি দ্বারা যে সকল পাপ কার্য্য আচরণ করিয়াছি তৎসমস্তই রাত্রির দেবতা বিনাশ করুন। এ ছাড়া আমার দ্বারা যাহা কিছু পাপ কর্ম্ম আচরিত হইয়াছে তৎসমস্ত পাপ আমার শরীর হইতে দূরীকরণ কল্পে স্বপ্রকাশ জ্যোতি সূর্য্যাগ্নিতে হবন করিতেছি।

মধ্যাহ্নের মন্ত্র—

আপঃ পুনন্ত্বিতি অনুবাকস্য নারায়ণ ঋষি রাপো দেবতাঃ অষ্টিশ্ছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতুমাং।

পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতিঃ ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাং।

যদুচ্ছিষ্টম ভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽ সতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।

আপ পুনন্তু মন্ত্রের নারায়ণ ঋষি, আপ্ দেবতা, অষ্টি ছন্দ ও আচমনে ইহার বিনিয়োগ।

মন্ত্রের অর্থ—জল পৃথিবীকে পূত বা পবিত্র করুন। পৃথিবী পবিত্র হইয়া আমার দেহস্থিত পঞ্চাগ্নি ও পঞ্চপ্রাণকে পবিত্র করুন। এরূপে শরীর পবিত্র হইয়া শরীরস্থ মূল আত্মশক্তিকে পবিত্র করুন। ব্রহ্মা বা আত্মা পবিত্র হইয়া অখাদ্য ভোজন, উচ্ছিষ্ট ভোজন, ও অসদাচার বা অসতের নিকট প্রতিগ্রহ জন্য যা কিছু পাপ হইয়াছে, বিদূরিত করুন। আমি সেই উদ্দেশ্যে এই জল অগ্নিতে হোম করিতেছি। (স্বাহা মন্ত্রটি প্রধানতঃ হোম কর্ম্মেই প্রযোজ্য।)

সায়াহ্নে —

মন্ত্র অগ্নিশ্চেত্যাদি অনুবাকস্য উপনিষন্নামা ঋষিঃ অগ্নিমন্যু মন্যুপত্যহানি চতস্রো দেবতাঃ অগ্নিশ্চেত্যারভ্য রক্ষন্তামিত্যন্ত ঋচশ্চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী যদহ্নেত্যারভ্য ময়ীত্যন্তস্য পঞ্চপদা পংঙক্তিঃ ইদমহমিত্যাদি স্বাহেত্যন্তস্য দশাক্ষর পাদদ্বয় যুক্তংবিশত্যক্ষরাত্মকং বিরাট্ ছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদহ্না পাপ মকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্নাঅহস্তদবলুম্পতু। যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাম মৃত যোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা।

অর্থ অগ্নিশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রের উপনিষৎ ঋষি; অগ্নি, যজ্ঞ, ইন্দ্র ও অহঃ এই চারি দেবতা এবং অগ্নিশ্চ হইতে আরম্ভ করিয়া রক্ষন্তাং পর্য্যন্ত ঋক্ মন্ত্রাংশের গায়ত্রী ছন্দ; যদহ্না হইতে আরম্ভ করিয়া ময়ি পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশের পঞ্চপদা পংঙতি ছন্দ; ইদং হইতে স্বাহা পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশের দশাক্ষর পাদযুক্ত বিংশতি অক্ষয়ময় বিরাটছন্দ। এই মন্ত্রের প্রয়োগ আচমনে করিতে হয়।

মন্ত্রের অর্থ :—অগ্নি, যজ্ঞ, যজ্ঞপতি ইন্দ্র, ও সূর্য্য ইহারা ক্রোধাদি উপজাত যে পাপ বা যজ্ঞ অনিষ্পাদন জন্য যে ক্রটি তাহা হইতে বিমুক্ত করিয়া আমাকে পালন করুন। আমি দিবাভাগে যা কিছু পাপাচরণ করিয়াছি, মন, বাক্য, হস্ত, পদ উদর ও শিশ্নাদ্বারা যে সকল অকার্য্য করিয়াছি তাহা এবং আর যা কিছু পাপ কার্য্য করিয়াছি দিবসের দেবতা আমাকে তাহা হইতে বিমুক্ত করুন। আমি পাপ ধ্বংস কল্পে এই জল গণ্ডুষ সত্য জ্যোতিতে হোম করিতেছি। আমার আচমন হোম সুসম্পন্ন হউক। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার আচমন করিতে হয়।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে যক্ষরূপী ব্রহ্মকে বিদিত হইবার জন্য সর্ব্ব প্রথমে অগ্নিকে প্রেরণ করা হয়। এই জন্যই ইহার নাম অগ্রগামী বা অগ্নি (অপম অর্থাৎ ইহার আগে কেহই যাইতে পারেন নাই)। এই জন্যই অগ্নিকে হিন্দুরা দেবতার মুখ বলেন অর্থাৎ এর দ্বারাই দেবতার দৌত্য সম্পাদিত হয়। এই আগুনটিই জীবদেহের তেজ। এই তেজ বা অগ্নিটিকে কার্য্যভেদে হিন্দুগণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সূর্য্যাগ্নি মস্তকে, আহবনীয় অগ্নি মুখে, দক্ষিণাগ্নিহৃদয়ে, কোষ্ঠাগ্নি বা গার্হপত্যাগ্নি নাভিদেশে ও প্রায়শ্চিত্তীয়াগ্নি নাভির নিম্নে। প্রাণায়াম আলোচনাকালে পঞ্চ প্রাণের মধ্যে প্রাণ অপান ও উদান বায়ুকেই যেমন প্রধান দেখিয়াছি, এই পঞ্চাগ্নির মধ্যেও তেমনি আহবনীয়, দক্ষিণা ও গার্হপত্য অগ্নিই প্রধান। অপানের স্থান নাভিতে। ব্রহ্মা বা সৃষ্টি কর্ত্তার স্থানও নাভিতে, চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ্য ও পেয় খাদ্যদ্রব্যের সম্যক পরিপাককারী গার্হপত্য অগ্নিটির স্থানও নাভিতে। ইনিই নাভির নিম্নে গিয়া গৃহপত্তন করেন। প্রাণের স্থান হৃদয়ে। কেশব বা পালন কর্ত্তার অবস্থিতি হৃদয়ে—আবার জরা প্রভৃতি দমনকারী ও অন্নগ্রহণকারী দক্ষিণাগ্নিটির স্থানও হৃদয়ে। উদানের স্থান কণ্ঠে। আবার লয়ের দেবতা শম্ভুটিও কপালে। গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি দ্বারা গৃহীত পদার্থ নিচয়ের পরিশোধনকারী আহবনীয় অগ্নিটি মুখে। শম্ভুর চরণ ছাড়িয়া আপোজ্যোতি-রস ইত্যাদির পূর্ণাধার কপোলদেশ ছাড়িয়া সহস্রারে অবস্থিত আবার সূর্য্যাগ্নিটিও মস্তকের ভিতর। আপো-জ্যোতিরস মন্ত্রটিই ব্রহ্মের শিরসূর্য্যাগ্নিটিও সেই পদার্থ।

অগ্নি প্রধান কেন

ব্রহ্মের চারিপাদ বা অবস্থা। জাগরিত, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয়। জাগ্রত ব্রহ্ম—ব্রহ্মা বা সৃষ্টি কর্ত্তা, স্বপ্নাবস্থার ব্রহ্মা—কেশব বা বিষ্ণু পালন কর্ত্তা, সুষুপ্তাবস্থায় তিনি শম্ভু বা রুদ্রএবং তার অতীতাবস্থায় তিনি তুরীয় বা আপোজ্যোতি রসামৃত ভূর্ভুব স্ব ওঁ। এখন সেই পূর্ব্বোদ্ধৃত "রাত্রিং প্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূত নিবেশনীং ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাং" কথাটি স্মরণ করা যাইতে পারে। আবার উপনিষদের—

ব্রহ্মের চারি পাদ

যথা মাক্ষীকৈকেন তন্তুনা জালং বিক্ষিপতি তেনাপ কর্ষতি তথৈবৈষ প্রাণো যদা যাতি সংসৃষ্টমাকৃষ্য। কথাটিও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। রাত্রিকালে মা সব ভিতরে গুঁটিয়ে নেন। উর্ণনাভ মক্ষিকা যেমন একটিমাত্র সূত্রদ্বারা অসংখ্য সূত্র বাহির করিয়া আবার ভিতরে প্রবেশ করাইয়া লয়—তদ্রূপ আত্ম-বস্তুটিও জাগরিতাবস্থা ছাড়িয়া স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়াবস্থায় ক্রমে ক্রমে চলিয়া যান। ইহাই নিদ্রা ইহাই বৃহত্ত্বের অণুত্ব, ইহাই অচিন্ত্য অবোদ্ধ্য জীবব্রহ্ম তত্ত্ব।

জীব ও ব্রহ্ম

সন্ধ্যার উপাসক ক্রমে তুরীর সুষুপ্তি, স্বপ্নাবস্থা পার হইয়া যখন জাগ্রত হইলেন—তখন তাঁহার প্রাতঃকৃত্য। এই কালটির নামও ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত অর্থাৎ সেটি ব্রহ্মের মুহূর্ত্ত তখনও সেই অমৃতময় বাক্যোদ্দিষ্ট—

প্রাতেঃ সন্ধ্যা কেন করিতে হয়

"বেদ এব পরং জ্যোতিঃ
জ্যোতিষ্কামো জ্যোতিরানন্দয়তে"

ভাবটা বর্ত্তমান। সেই সহস্রারস্থ সূর্য্যাগ্নির কথাটা উপাসক ভুলেন নাই। তিনি দেখেন—"জাগ্রতি শুভাশুভং নিরুক্তমস্য দেবস্য স সংপ্রসারোঽন্তর্যামী" জাগ্রতাবস্থাতেই তাঁহার শুভাশুভ

কর্ম্মের নিশ্চয়রূপে ফলভোগ হয়। সুতরাং তিনি তুরীয় ব্রহ্মে বা সূর্য্যাগ্নিতে জাগ্রত অবস্থাকৃত সকলপ্রকার অপকর্ম্মের ধ্বংসকল্পে "সূর্য্যে জ্যোতিষি" হবন করিতেছেন। হোমটি দেবযজ্ঞ। আবার শাস্ত্রে আছে পূজা করিলে পূজ্য বস্তুটি পাওয়া যায়—জপ করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায়—পরন্তু অগ্নিতে হোম করিলে সকল বিভূতি এবং সর্ব্ব সিদ্ধি হেসে হেসে পাওয়া যায়। "বিভূতিশ্চাগ্নিকার্য্যেন সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি।"

পর-হিংসাদি করাই মনের পাপ, অপ্রিয় ও অসত্য কথা বলা বাচনিক পাপ, ক্রোধাদিরবশে প্রহার বা অভিচার হোমাদি করা চৌর্য্যাদি হস্তকৃত পাপ, গো ব্রাহ্মণ বা পূজ্য ব্যক্তিকে পদাঘাত করা পদকৃত পাপ, অখাদ্য ভোজন উদরকৃত পাপ এবং অগম্যা গমন বা প্রাকৃতিক নিয়ম উপেক্ষা করিয়া কামসেবন শিশ্নাকৃত পাপ। সন্ধ্যাকালের পর রাত্রির মধ্যে যত প্রকার অকার্য্য করা যাইতে পারে তাহা সমস্তই প্রায় উক্ত কয় প্রকার কার্য্যের মধ্যে আসিয়া পড়ে। তুলসীদাস বলিয়াছেন—"পহেলা প্রহরমে সবকোই জাগে—দুসরা পহরমে ভোগী—তেসরা পহরমে তস্কর জাগে—চৌঠা পহরমে যোগী।" সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহর রাত্রির মধ্যে সাধারণ মানুষ প্রায় সকল রাত্রিকৃত কাজ করেন। তৃতীয় প্রহর নিদ্রার কোলে যায় ও চতুর্থ প্রহরে ব্রহ্ম চিন্তার আয়োজন। অন্যায় কার্য্য প্রায়ই গোপনে বা অন্ধকারে আচরিত হয়। রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহা দেখিয়া থাকেন। আমরা যতই অন্ধকারে বা গোপনে পাপকর্ম্ম করি না কেন মনটি এমনি পদার্থ যে সে তাহা লিখিয়া রাখে। এর নামই সংস্কার। আবার দিবালোক প্রকাশের সঙ্গে রাত্রিকৃত অধিকাংশ ঘোরতর পাপ কার্য্যগুলি আপনা হইতেই সরিয়া পড়ে। যে জ্যোতির প্রভাবে ঘোরতর পাপাচরণ দূরে পলাইয়া যায়—সেই জ্যোতির জ্যোতি যে সূর্য্যাগ্নিস্বরূপ পরমাত্মা—তাঁহার দয়া উপাসক প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি মন ও দেহকে পবিত্র করিবার জন্য জলগণ্ডূষ সেই পরমাত্ম জ্যোতিতে হবন করেন।

নানাবিধ পাপাচরণ

যে মন পাপ সংস্কার লিখিয়া লইয়াছিল—সেই মন পাপের হবন করিয়া পবিত্রতার সংস্কার গ্রহণ করিতেছেন। হিন্দুর জীবনই সংস্কারময়—এরূপ সংস্কারময় জীবন আর কোন জাতির নাই। শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেও যে নিত্য পাঠ্য মন্ত্রাদি আছে—তাহাতেও এই সংস্কার তত্ত্ব। সত্যপিপাসু তাহা গ্রন্থে দেখিয়া লইতে পারেন। আমরা তাহার মধ্যে একটিমাত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

সংস্কার

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি
ব্রহ্মৈবাহং ন শোক ভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং
নিত্য মুক্ত স্বভাববান্॥"

আমি দেবতা, আমি অন্য কিছু নহি। আমি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম—আমি শোক দুঃখের অতীত। আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ও স্বভাবে আমি নিত্যমুক্ত। সংস্কারের প্রভাব অতিশয় মৃদু শক্তিশালী—পরন্তু সংস্কার গাঢ় হইলে তাহার প্রভাব অতিশয় শক্তিশালী। সংস্কার বলেই আমরা জনককে পিতা বলিয়া ডাকি। সংস্কারেই আমরা ক কে ক বলি; অ কে অ বলি; লাল রংকে লাল বলি; সোণাকে সোণা বলি; পুরুষকে পুরুষ বলি; নারীকে নারী বলি।

সংস্কারের প্রভাব

সংস্কারবশেই আমরা সুখ ও দুঃখের ভেদজ্ঞান করি। অনেক বড় বড় চিকিৎসক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে একটা সুস্থশরীর লোককে যদি বলা যায় তাহার মাথাটা খারাপ হইয়াছে এবং সে লোকটি যথায় যায় সেখানেই যদি ঐ কথা শুনে তবে কিছুদিনের মধ্যে সে সত্য সত্যই পাগল হইয়া পড়ে। আমরা নিজেরাও বেশ দেখি যে মূত্র পরীক্ষা করিয়া যদি কিছু দোষ না পাওয়া যায়—অথচ বলিয়া দিই যে মূত্রে দোষ রহিয়াছে অমনি মনটা বিব্রত হইয়া পড়ে এবং কিছুদিন ঐরূপ মিথ্যাবাদ কর্ণে গেলেই মূত্রের রোগ সত্য সত্যই আসিয়া পড়ে। ছেলেবেলায় যে গাছতলায় ভূত আছে শুনিয়াছিলাম—বড় হয়েও যখন সে গাছতলায় অন্ধকারে যাইতে হয় তখন গা কাঁপে ঝিম্ ঝিম্ করে এবং যদি সেই বাল্য সংস্কার প্রবল হয় তবে সত্য সত্যই ভূত দেখিয়া ফেলি। প্রকৃত রোগগ্রস্ত রুগীকে যদি ধারণা করান যায় যে তার কোন রোগ হয় নাই এবং সেইরূপ সংস্কার যদি রুগীতে আনিতে পারা যায় তবে তাহার রোগ ক্রমে চলিয়া যায়। এখন চিকিৎসকগণ অনেক সময় ইহা স্বীকার করেন। আমরা জানি একটি রুগীকে যখন ঔষধ দিয়া কোন উপকার পাওয়া গেল না তখন কেবল ডিষ্টিল্ড জল ঔষধ বলিয়া সেবন করাইয়া সুস্থ করা হয়। রুগী জানিত উত্তম ঔষধ দেওয়া হইতেছে। প্রবাদ আছে যে কাঁচপোকা পক্ষবিহীন তেলাপোকাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কাঁচপোকায় পরিণত করে। তেলাপোকা কাঁচপোকার সংস্কারে শেষে দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে। সংস্কার প্রভাবে ভয়ে যদি ভূত দেখা যায়—সংস্কারে যদি রোগ আসে ও চলিয়া যায় সংস্কারে যদি জনককে পিতা বলিয়া অভ্রান্ত জ্ঞান হয়—সংস্কারে যদি ক কে খ বলিলে মারিতে যাই—কাল কে লাল বলিলে হাসিয়া ফেলি, তবে সন্ধ্যার এই আচমন মন্ত্রের সংস্কারটি হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চিন্তাহীনতার পরিচায়ক নহে কি? ভয় একটি নিকৃষ্ট বৃত্তি; তার ফলে যদি ভূত দেখা যায় তবে উচ্চ বৃত্তির সংস্কার গাঢ় হইলে কেন যে বলবান হইয়া অভিধেয় চৈতন্য বস্তু দেখা যাইতে পারে না তাহার যুক্তি মাথায় আসে না। সংস্কার লইয়াই সমস্ত জীবনটি গ্রথিত। তাই হিন্দু সংস্কার সংস্কার করিয়া আজও পাগল। তাই তারা এখনও গঙ্গা স্নান, তীর্থ দর্শন, প্রভৃতির জন্য পাগল। হিন্দুর প্রত্যেক কার্য্যটির মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্রটির সূক্ষ্ম সূত্রটি জাজ্বল্যমান। মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্তের সংস্কার ব্যাখ্যা অহিন্দুর কথা, অবৈজ্ঞানিকের কথা, অতত্ত্বজ্ঞের কথা, উহা হিন্দু গ্রহণ করেন না। আমার দুই হাজার টাকা বেতন- এলোকেশী আমার পত্নী—কেন? টাকা গুলিতে কি আমার নাম লেখা আছে? এলোকেশী আমার পত্নী তা কি তার গায়ে লেখা আছে? আমার সংস্কারে টাকা আমার—আমার সংস্কারে এলোকেশী আমার। তাই টাকাটা কেও নিলে আমি চোর বলি—এলোকেশীকে কেও ধরিলে তাহাকে কাটিতে যাই। পৃথিবী গোল, সূর্য্য খুব বড়—চন্দ্র পৃথিবী হইতে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান আমার কোথা হইতে আসিল। জিজ্ঞাসা করিলেই যেন প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি এরূপ ভাবে উত্তর দিয়া থাকি। অথচ আমার জ্ঞানটি সংস্কারপ্রসূত ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব সংস্কারই বিশ্বজ্ঞানের মূল। সংস্কারই সম্বন্ধতত্ত্বের ভিত্তি আবার মানসিক বৃত্তিটির স্থায়ী জ্ঞানটিই সম্বন্ধ নামে অভিহিত। বৃত্তিটিই দৃষ্ট ও অদৃষ্ট এই উভয় লোককে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং সংস্কারটিকে ভুয়া বলিয়া উড়াইয়া দেবার যো নাই।

মধ্যাহ্ন কালে যেমন সূর্য্য পরম জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়েন তদ্রূপ জীবের রজোগুণোদ্ভব কর্ম্ম চেষ্টাও পরম শ্রীবৃদ্ধি পায়। স্নায়ু ও মাংসপেশীগুলি পূর্ণরূপে তেজীয়ান হয়। সন্ধ্যার উপাসক তাই মধ্যাহ্নে পৃথিবীকে পবিত্র করিতেছেন, পূতা পৃথিবী সাধককে পবিত্র করুন, পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চাগ্নির শ্রেষ্ঠ প্রাণ বা অগ্নিকে পবিত্র করিতেছেন সেই শ্রেষ্ঠ প্রাণ বা অগ্নি যিনি ব্রহ্ম পদার্থ তিনি পবিত্র হইয়া সাধককে পবিত্র করুন। অখাদ্য ভোজন বা অসৎ প্রতিগ্রহাদি পাপের ধ্বংস কল্পে সেই শ্রেষ্ঠ অগ্নিতে জল দিয়া হোম করিতেছেন। পৃথিবীটি পবিত্র না হলে প্রাণাগ্নি হবনের আজ্যের স্থান পাওয়া যায় না। তাই পৃথিবীটি আগে। কারণ পৃথিবীটি আসন। আজ্য পাত্র ভূমিতে ভিন্ন রাখা নিষিদ্ধ। এখন বুঝিতে পারা গেল— কেন হিন্দুরা মাটিতে বসিয়া আহার করার এত পক্ষপাতী। টেবিলে বা অন্য কোন উচ্চ স্থানে আহার্য্য রাখিয়া হিন্দুরা কেন আহার করেন না। হিন্দুর আহারটি হবন কার্য্য তাহা তাহার আচমন মন্ত্রগুলিতেই প্রকাশিত। দুপুরে পিত্তের প্রকোপ—পিত্তই অন্ন পরিপাকের প্রধান সহায়ক। ইহাকেই দক্ষিণাগ্নি বলা যায়। দুই প্রহরেই আহার চেষ্টা—আহারের জন্য ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ করিতে হয়। কাজেই যাহা কিছু অপবিত্র আহারাদি গ্রহণ করা হইয়াছে বা হইতেছে তাহার দ্বারা দক্ষিণাগ্নি অপবিত্র হইয়া পড়িলে আহবনীয় ও সূর্য্যাগ্নি সাহায্যে পবিত্রতায় সংস্কার গ্রহণ করা হইতেছে। (১)

মধ্যাহ্নে কেন সন্ধ্যা করিতে হয়

মাটিতে বসিয়া আহার প্রশস্ত কেন

সায়াহ্নে অবসাদ। সকল শক্তিই তখন অন্তর্মুখী হইতে ব্যাকুল—সূর্য্যও অস্তগমনে তৎপর। যে সূর্য্যাগ্নিকে বরণ করিয়া রজ ও সত্ত্বের কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন সাধক সায়াহ্নে আবার সেই সূর্য্যাগ্নির কোলে ফিরিয়া যাইতে প্রার্থনা করিতেছেন। রজোগুণে সূর্য্য চিন্তা তমের আশ্রয়ে অগ্নি চিন্তা। একমাত্র অগ্নিই সর্ব্ব পদার্থকে নিজ আকারে পরিণত করিয়া থাকেন। সাধকও তাই নিজ আকারে ফিরে গিয়ে বসিবেন বলিয়া অগ্নিকে সহায় করিতেছেন। প্রাতে সূর্য্যাগ্নি বা পরমাত্মা হইতে বিচ্ছুরণ, মধ্যাহ্নে পূর্ণ শক্তিতে তাঁহাকে আবাহন এবং সায়াহ্নে তথায় পুনরাগমন চেষ্টা। অবতরণের জ্ঞান অধিরোহণে প্রতিষ্ঠিত—কাজেই সেই পরম তত্ত্বকে সত্য স্বরূপ জানিয়া তাঁহাতে— "সত্যে জ্যোতিষি" হবন করিয়া সুষুপ্ত ও তুরীয় অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। বাহ্য করণের অধ্যাস ধ্বংস করিয়া স্বরূপে সংন্যস্ত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। কৌপীন ধরিয়া মস্তক মুণ্ডন করিলেই সন্ন্যাসী হয় না তাহা তিনি জ্ঞাত আছেন।

সায়াহ্নে সন্ধ্যা

(১) 'পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্ম পূতা পুনাতুমাং"—পুনন্তু বহু বচনান্ত থাকায় ব্রহ্মস্পতিঃ শব্দটির অনেক প্রকার সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। পরন্তু মন্ত্রের পূর্ব্বাপর তাৎপর্য্য বোধ হইলে দেখা যায় পঞ্চপ্রাণের শ্রেষ্ঠ যে প্রাণ পঞ্চাগ্নির শ্রেষ্ঠ যে সূর্য্যাগ্নি ব্রহ্মস্পতিঃ শব্দে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। ব্রহ্মণস্পতিই "ব্রহ্ম" তাহা পরবর্ত্তী শব্দটিতেই বুঝা যাইতেছে। পুনন্তু শব্দটি—পঞ্চাগ্নিকে লক্ষ্য করায় বহু বচনে ব্যবহৃত। ইহার জন্য সাম্প্রদায়িক অর্থের প্রয়োজনাভাব—বিশেষতঃ যখন এইভাবে বুঝিয়া আমরা সহজ অর্থটি পাইতেছি। ব্রহ্মস্পতি মানে আচার্য্যও নহেন এবং ব্রাহ্মণগণও নহেন। প্রাণাগ্নি হবনে আবার আচার্য্য বা ব্রাহ্মণের কি দরকার? আর হবন ত প্রাণে বা অগ্নিতে আচার্য্য বা ব্রাহ্মণকে আহার করান সন্ধ্যায় আসিতে পারে না। কথা উঠিতে পারে ব্রহ্মত পবিত্র, তার আবার পূতত্ব কি—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে আমরা জাগ্রৎ অবস্থায় ব্রহ্মটি লইয়া কাজ করিতেছি।

কেহ যেন মনে না করেন যে সমষ্টি বিশ্বের ভাস্বর সূর্য্য তাহা হইলে ত কিছুই নয়। শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন যাহা কিছু "ভূত" অর্থাৎ পদার্থ বিরাট বিশ্বে আছে তাহার সকল গুলিই এই দেহরূপ ব্যষ্টিবিশ্বে আছে।

"সমান উ এবায়ং চাসৌ চোষ্ণোঽয়মুষ্ণোঽসৌ স্বর ইতী মমাচক্ষতে স্বর ইতি।

অর্থাৎ দেহস্থ প্রাণ এবং আকাশস্থ ঐ সূর্য্য উভয়েই সমান গুণ সম্পন্ন। কেননা প্রাণও তেজ সূর্য্যও তেজ। প্রাণ চলে গেলে ফিরেনা—তাই তাকে গতিশীল বলে—আবার সূর্য্যও অস্ত গমন করেন আবার উদিত হয়েন। কাজেই তিনিও গতিশীল। সন্ধ্যার সাধক বৃহৎকে ও অণুর অণুকে একত্র করে সাধন করেন। তাঁহার সাধনা এক-দর্শী বা অসম্পূর্ণ নহে। তার উদ্দেশ্য সেই সম্পূর্ণ একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থ লাভ। মনুষ্য মাত্রেরই কার্য্য দুই প্রকারে সাধিত হয়। এক তাহার ইচ্ছাধীনে এবং অপর তাহার ইচ্ছাতীতে। অর্থাৎ একটি নিজ কৃত নিয়মের বশবর্ত্তীতায় অপরটি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনতায় সম্পাদিত হয়। প্রথমটিই দৃষ্ট দ্বিতীয়টি অদৃষ্ট। প্রথমটি পুরুষকার দ্বিতীয়টি দৈব। সাধক যখন প্রাকৃতিক নিয়ম বা দৈবের ক্রোড়ে তখন তাঁহার পুরুষাকারটিও সেই প্রাকৃতিক নিয়মের ভিতর একটি অংশ মাত্র। তাহা হইলে দৈব বলবান - পুরুষকার অপেক্ষাকৃত হীন বল! এমত অবস্থায় সাধকের কার্য্য-গুলি যতক্ষণ বিরাট বিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়মের অনুকূলে আচরিত ততক্ষণ তাহা অভীষ্ট ফলপ্রদ। বলবান প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূলে আচরিত হইলে তাহা ফলপ্রদ হয় না। সন্ধ্যার সাধক তাই নিজের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াও সমষ্টি হইতে নিজেকে পৃথক ভাবিতে পারেন না। তিনি বিরাটকে ছাড়িয়া সাধনা করিতে অক্ষম। তিনি নিজের দেহ জমীটিতে লাঙ্গল দিয়া শস্যের আশা করেন না—দৈব বা পর্য্যন্যের নিকট বৃষ্টিও চাহেন। মহাশক্তির অসি ও ছিন্ন মুণ্ডের গণ্ডী হইতে দূরে থাকিয়া বরাভয়ের গণ্ডীতে নিবদ্ধ হয়েন। মায়ের অঙ্ক শায়ী হইয়া—তিনি মার সহিত যুদ্ধ করিতে নারাজ কেননা মা ইচ্ছা করিলেই চেপে মেরে ফেলিতে পারেন। তাই সাধক মাত্রেই বলিয়া থাকেন—মার কৃপা না হলে কিছুই হয় না। এই সত্য লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"যমেষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।
তস্যৈস আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥

পরমার্থ কেবল মাত্র পুরুষাকারে লাভ হয় না পুরুষকারের সাহায্যে প্রবল ইচ্ছা বা একাগ্র চিত্ত হইলে পরমার্থ স্বয়ং সাধককে দেখা দেন। সন্ধ্যায় সাধক "বুড়ী" ছেড়ে "কাণামাছি" খেলিয়া হুঁছট খেয়ে পা-হাত ভেঙ্গে—হাঁস পাতালে যাইতে রাজী নহেন।

কর্ম্মতত্ত্ব

আধুনিক মত

(কপিল মঠ হইতে প্রাপ্ত)

কোনও এক দেহধারণ, সেই দেহের আয়ু এবং সুখ ও দুঃখ ভোগ এই সকল ঘটনার মূল মানবের প্রধান মীমাংস্য বিষয়। উহারা কিরূপে হয় তাহার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মীমাংসাই কর্ম্মতত্ত্ব। অন্ধবিশ্বাস, তাদৃশ বিশ্বাস-মূলক সম্ভবপর হেতু বা theory,* অপ্রামাণ্য theory, speculation বা বিতর্ক অর্থাৎ এটা হবে কি ওটা হবে এতাদৃশ বহুমুখী অপ্রতিষ্ঠ তর্ক প্রভৃতির দ্বারা নিঃসংশয়ে কিছুই বুঝা যায় না।

প্রথমত দেখা যাক এ সম্বন্ধে কতগুলি থিওরী বা সম্ভবপর হেতুবাদ মানবসমাজে প্রচলিত আছে যাহার দ্বারা মানব ঐ বিষয়ের উপপত্তি (যুক্তি সঙ্গতি) করিতে চেষ্টা করে।

(১ম) **জড়বাদের থিওরী**।—এই মতে জড়দ্রব্যের দ্বারা জীব নির্ম্মিত। জড়েরই গুণ মন। শরীর গেলেই আত্মত্বের নাশ হয়। বায়ু জলাদির ক্রিয়ার ন্যায় জীবের ক্রিয়া। জড়দ্রব্যের সংঘাত হইতেই শরীরের উৎপত্তি। এই মতে বর্ত্তমান শরীরের সুখের জন্যই আমরা কর্ম্ম করি। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই তত্ত্বই ইহাদের কর্ম্মনীতির মূল। পুরাকালের এই বাদীরা যুক্তি মানিতেন না এবং অবিশ্বাসই সম্বল করিয়া

* Theory—উপপত্তির হেতু বা সম্ভবপর হেতু। কোন অজ্ঞাত বিষয় বুঝিতে হইলে আমরা একটা সম্ভবপর হেতু ধরিয়া লইয়া অনেক স্থলে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি। প্রথমত কেবল একটা সম্ভবপর হেতু ধরিয়া লইলে তাহাকে হাইপথেসিস্ বলে। পরে উহা যখন কতকটা প্রমাণ সঙ্গত করা যায় তখন তাহাকে থিওরী বা উপপত্তির হেতু বলা যায়। থিওরী সম্যক্ প্রমাণিত হইলে তখন তাহা fact বা তথ্য বা সত্য হয়, আর থিওরী থাকে না। দর্শন-বিজ্ঞান জগতে থিওরীর অনেক আবশ্যকতা আছে। থিওরী ধরিয়া অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। "The majority of Scientists however, appear to consider that the advantages of hypotheses regarded in the proper light and not representing the actual state of affairs are much greater than the disadvantages"—Seuter's Outlines of Physical Chemistry. প্রকৃত প্রায়-প্রবণ-চিত্ত ব্যক্তিরা theoryকে theory বলিয়াই ব্যবহার করেন। অজ্ঞেরাই থিওরীকে তথ্যরূপে ধরিয়া উহার অপব্যবহার করে, আবার অনেক তথ্যকেও থিওরী মনে করিয়া গোপন করে। মীমাংসকেরা বা Theologistরা সমস্ত শাস্ত্র বাক্যকে অভ্রান্ত মনে করিয়া পরে তাহা সঙ্গত করিবার জন্য থিওরী উদ্ভাবন করেন ও দার্শনিক প্রসঙ্গ করেন। প্রকৃত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা প্রথমে বিজ্ঞাত তথ্য সকল লয়েন ও পরে তাহা উপপন্ন করার জন্য থিওরী গ্রহণ করেন এবং ঐ তথ্য সকলের স্বভাব হইতে নিয়ম আবিষ্কার করেন। তথ্যসকল ও ঐরূপ নিয়ম সকলই প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্র। উহাতে যে থিওরী লওয়া হয় তাহা আবশ্যক হইলে ত্যাগ করা বা তৎপরিবর্ত্তে অন্য যুক্ততর থিওরী লওয়া বৈজ্ঞানিক প্রথা। থিওরীর অন্য অর্থও আছে।

এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা মনে করে দর্শনশাস্ত্র থিওরীর রাজ্য ও বিজ্ঞান তাহা নহে এবং ঐ জন্য দর্শনের অবজ্ঞা করে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। এ-বিষয়ে Dr. Carr বলেন "It is curious that we should associate the maxim" hypotheses nonfingo with the scientific method of experiment and suppose that the making of hypotheses is the particular vice of speculative metaphysics. The exact contrary is true." অর্থাৎ ইহা রহস্যজনক যে "থিওরী না করা" এই প্রথাকে আমরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীর একচেটিয়া মনে করি আর মনেকরি যে থিওরী করা দার্শনিকদের বিশেষ পাপ। সত্য ইহার ঠিক বিপরীত।

এই অযুক্ত মত খ্যাপন করিতেন। অধুনাতনকালে এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরা ইহা যুক্তির ভিত্তিতে স্থাপিত করিতে চাহেন। কিন্তু যুক্তি অপেক্ষা অবিশ্বাস বা Scepticism এখনও ইঁহাদের সম্বল। প্রাচীনকালেও লোকায়তদের অবিশ্বাসই সম্বল ছিল। যথা "জীর্ণে ভোজনমাত্রেয়ঃ কপিলঃ প্রাণিনো দয়া। বৃহস্পতিরবিশ্বাসঃ পঞ্চালঃ স্ত্রীষু মৰ্দ্দবম্॥" অর্থাৎ জীর্ণ হইলে ভোজন বৈদ্য আত্রেয়ের সারমত, প্রাণীতে দয়া কপিলের, নাস্তিক বৃহস্পতির অবিশ্বাস ও স্ত্রীদের প্রতি মৃদু ব্যবহার করা নীতিবিৎ পঞ্চালের সারমত। ইঁহারা বলেন শরীর কোষ সমষ্টি, কোষ-সকলের যন্ত্রীভূত হওয়াই ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের স্বরূপ। তাহার Function বা ক্রিয়া বিশেষই জ্ঞান চিন্তা ইচ্ছা আদি। তাহাদের দ্বারাই কর্ম্ম হয়। শরীরের মৃত্যুতে শরীরের উপাদানগুলিই থাকে, আত্মত্ব নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন লোকায়তের ন্যায় ইঁহাদেরও কর্ম্মনীতির মূল দৃষ্ট সুখ। তবে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এতদূর ইঁহারা যান না। প্রাণীর বা দেহের উৎপত্তি বিষয়ে ইঁহাদের এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন matter নামক জড়দ্রব্য হইতে স্বতঃই এককোষিক (unicellular) প্রাণী হয়। পরে তাহা হইতে বিকাশক্রমে উচ্চপ্রাণী হয়। অন্যশ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন matter এর ন্যায় প্রাণীও অনাদি (কৃত্রিম উপায়ে প্রাণী উৎপাদন করিতে না পারাতে ইঁহারা এইরূপ বলেন)। এই বাদীদের মতে matter and force (চলন) নামক দুই পদার্থ আছে। কেহ কেহ বলেন ঐ দুই এক (monist বা একবস্তুবাদীরা)। matter অণুসমষ্টি, সেই অণুদের ব্যূহনবিশেষ ও ক্রিয়া হইতে শরীর, শব্দাদিবোধ বা Sensation এবং Consciousness বা অন্তর্বোধ হয়।

ম্যাটার কি, এবং কিরূপেই বা তাহার ব্যূহন ও চলন হইতে জ্ঞান, ইচ্ছা আদি হয় তাহা ইঁহারা কিছুই বলিতে পারেন না। এই মতে force বা চলন এবং thought বা চিন্তন একই জিনিস। কেন বা কিরূপে ইহারা এক, তাহার উত্তর নাই।* সুতরাং ইঁহাদের মত মূলত যুক্তিহীন। সাধারণ matter ছাড়া ইঁহাদের নিরন্তরাল ঈথার নামক দ্রব্যও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঈথার যে কি, তাহার তত্ত্ব যে কিরূপে কল্পনা করিতে হইবে, ম্যাটারের ধর্ম্ম ব্যতীত তাহার অন্য কি ধর্ম্ম আছে ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই উত্তর নাই। সুতরাং এই অযুক্তবাদের দ্বারা কিছুই স্থির হয় না। এইরূপ বাদের বিষয় আমরা অগ্রে আরও (৭ প্রকরণ দ্রষ্টব্য) বিশেষরূপে বলিব। Speculation রূপ বিতর্কের বা বহুমুখী বিচারের রাজ্যে এই বাদীরাও দিশাহারা হইয়া ঘুরিতেছেন। ইঁহাদেরকেও যুক্তি লঙ্ঘন করিয়া অনেক সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তাহাও অন্ধ বিশ্বাসের সহিত তুল্যমূল্য।

(২য়) **কর্ত্তা বা** Creator **থিওরী**।—কিছু না হইতে যিনি উৎপাদন বা সত্ত্বীকরণ করেন তিনি Creator রূপ কর্ত্তা। এই মতে একজন কর্ত্তা আছেন যিনি আমাদেরকে

---

* "Mental phenomena cannot as yet be measured, and have not yet been shown to be co-related with physical energy. In other words it has not as yet been proved that mental force is energy at all. ..Although a close relation exists between physical changes in the brain-cells and mental phenomena no further connection has as yet been drawn between mental power and physical force."

করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কিরূপ, কেন আমাদিগকে করিয়াছেন, কি দিয়া করিয়াছেন এসব বিষয় বুঝার ও জানার উপায় নাই। ইহা বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে। তবে এই বাদীরা কিছু কিছু যুক্তি দিয়া ঐ বাদ সঙ্গত করার চেষ্টা করাতে উহা থিওরী। ইহাদের বিশ্বাস—কর্ত্তা "আত্মাদের" অনির্ব্বচনীয় উপায়ে উদ্ভাবিত করিয়া এক জলাশয়ে জিয়াইয়া (plankton বা প্লাবমান প্রাণীরূপে) রাখেন বা একজাতীয় উদ্ভিদের (Phanerogam) ফলরূপে রাখেন। পরে মাতৃজঠরস্থ বীজে তাহা প্রবেশ করাইয়া দেন। তাহাতে শরীর হয় এবং তিনি আত্মাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট (predestined) ভাগ্যযুক্ত করিয়া দেন, তাহাতেই তাহারা কর্ম্ম করে ও তদনুসারে কর্ত্তা সুখ দুঃখাদি দেন। কেহ বা বলেন যে কর্ত্তা "আত্মাদের" স্বাধীন ইচ্ছাযুক্ত (free will) করিয়া দেন, তাহার দ্বারা তাহারা কর্ম্ম করিলে তিনি তদনুসারে সুখ ও দঃখ দিয়া থাকেন। এই জাতীয় বিশ্বাসমূলক অন্য থিওরীর দ্বারাও এই বাদীরা বুঝানর চেষ্টা করেন। ঐ কর্ত্তা ঈশ্বরেরদ্বারা উপদিষ্ট ভাল কর্ম্ম করিলে এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিলে তিনি ইহলোকে ও পরলোকে ভাল করেন; আর তন্নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে বা তাঁহাকে প্রার্থনার দ্বারা তুষ্ট না করিলে তিনি মন্দ করেন। যখন অন্ধবিশ্বাস এই বাদের মূল তখন ইহা দর্শনরাজ্যে সম্যক্ স্থান পাইবার যোগ্য নহে। ইহার মূল বিশ্বাস্য প্রতিজ্ঞাগুলিতে যদি কেহ বিশ্বাস না করে তাহা হইলে তাহাকে এই বাদীরা কিছুই বলিতে পারেন না।

(৩য়) তৃতীয়মতে অনাদি ঈশ্বর ও পৃথক্ অনাদি জীবগণ আছেন। লীলা বা ক্রীড়ার জন্য ইচ্ছার দ্বারা ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে দেহ, আয়ু ও সুখ দুঃখরূপ ফলদান করেন এবং ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা। স্রষ্টা অর্থে ইহারা Creator বলেন না, কিন্তু কোন কারণ হইতে (সেই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ তিনি নিজেই) যিনি কার্য্যকে ব্যক্ত করেন তাঁহাকেই স্রষ্টা বলেন।

এই বাদেরও মূল অন্ধবিশ্বাস। নিজেদের থিওরী বিশেষ অনুসারে বিশ্বাস্য শাস্ত্রের বাক্য সকলের অর্থ করিয়া ইহারা সেই অর্থ যুক্তির দ্বারা সঙ্গত করিতে চেষ্টা করেন এবং ঐরূপ অর্থকেই তাঁহাদের প্রমাণের ভিত্তি করেন। সুতরাং ইহা প্রকৃত দার্শনিক আসন পাইবার যোগ্য নহে।

(৪র্থ) চতুর্থমতেও অনাদি অভ্রান্ত ঈশ্বর ও অনাদি জীব স্বীকৃত হয়। ভ্রান্তিবশতঃ বা ভ্রান্তি লইয়া ঈশ্বরই অনাদিকাল হইতে জীব হইয়া আছেন, সুতরাং ঈশ্বর ও জীব এক। অনাদি অচেতন কর্ম্ম আছে। তাহা লইয়া সৃষ্টিকালে ঈশ্বর জীব সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেও কর্ম্ম ও ঈশ্বর অনাদি বলিয়া জীবও অনাদি। ঈশ্বর লীলার বা ক্রীড়ার জন্যই কর্ম্ম করেন। এই লীলার উদ্দেশ্যাদি বুঝার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে সৃষ্ট-জীব কর্ম্ম করে। বৈধ কর্ম্ম করিলে ঈশ্বর ভাল ফল দেন, আর অবৈধ কর্ম্ম করিলে তিনিই মন্দ ফল দেন।

ইহাদের প্রমাণ শাস্ত্রবাক্য এবং তাহা নিজেদের থিওরী অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়া ইহারা নিজেদের মতের সঙ্গতি করার চেষ্টা করেন। সেই শাস্ত্র সকলকে যদি কেহ ভ্রান্ত বলে, তবে ইহাদেরও দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। সুতরাং এই মতও বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জগতে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।

(৫) পঞ্চমমতে সুখ, দুঃখ, দেহধারণাদি ঘটনা, কার্য্যকারণ ঘটিত ব্যাপার। প্রধান ও মূলকারণ এবং কার্য্যসকলকে বিশ্লেষ করিয়া ইহারা দেখান ও সেই ভিত্তিতে কর্ম্মতত্ত্ব

ব্যাখ্যা করেন। সেই কারণ কার্য্যের সংখ্যা পঁচিশ এবং তাহারা তত্ত্ব নামে খ্যাত। সেই পঁচিশ-তত্ত্ব অনুভূয়মানভাব পদার্থ সুতরাং তাহা জানিতে হইলে কোন থিওরীর আশ্রয় লইতে হয় না। সেই তত্ত্বসকলের স্বাভাবিক ক্রিয়া হইতে দেহ আয়ু ও সুখ দুঃখ হয়। অনুভূয়মান কারণদ্রব্য, কার্য্যদ্রব্য ও তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম লইয়া দেহধারণাদি ব্যাপারের ন্যায় সঙ্গত ব্যখ্যা করাতে এই মত সম্যক্‌রূপে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রণালীর অনুমত। ইহাতে থিওরীর আবশ্যকতা যে অতি অল্পই আছে তাহা বিজ্ঞ পাঠক দেখিতে পাইবেন। শেষোক্ত এই পঞ্চম-মত অনুসারে কর্ম্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ও জৈনেরাও কর্ম্মের ফল স্বাভাবিক নিয়মে হয় ইহা স্বীকার করেন কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মতত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যান নাই।

৩। এক্ষণে বিচার্য্য কর্ম্ম কাহার? "আমি জানি" "আমি করি"* "আমি দেহধারণ করি" ইত্যাকার অনুভূতি সকলেরই হইয়া থাকে; অতএব কর্ম্ম আমার বা আমির। প্রাণশক্তি বা দেহ, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, অহংকার, ও অহংজ্ঞানমাত্র বুদ্ধি এই সকলকেই আমি শব্দের অর্থরূপে আমরা ব্যবহার করি। এই সকল দ্রব্য একযোগে প্রবৃত্তির জন্য বা নিবৃত্তির জন্য যে ক্রিয়া করে তাহাই জৈব কর্ম্ম।

ক্রিয়া তিন প্রকার (১) অগ্নি বায়ুআদি ভৌতিক দ্রব্যের ক্রিয়া, (২) যন্ত্ররূপ অপ্রাণীদের ক্রিয়া (৩) প্রাণীর বা জীবের কর্ম্ম। ভৌতিক ক্রিয়ার মৌলিক স্বরূপ এস্থলে বিচার্য্য নহে। অপর দুই প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে যান্ত্রিক ক্রিয়ার ও জৈব ক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে। উভয়েই অনেক অঙ্গের সামঞ্জস ক্রিয়া হয়। পরন্তু জৈব কর্ম্ম ও অজৈব যান্ত্রিক বা কলের ক্রিয়ার ভেদও বুঝা উচিত। প্রাণী নিজের কর্ম্মযন্ত্র নিজেই নির্ম্মাণ করে ও তদ্দ্বারা কর্ম্ম করে; আর অপ্রাণী যন্ত্রসকল স্বকীয় কর্ম্মযন্ত্র নিজেই নির্ম্মাণ করে না। এই ভেদ মনে রাখিতে হইবে। প্রাণীরা যখন নিজের কর্ম্মযন্ত্র নিজেই নির্ম্মাণ করিতে পারে তখন তাহাদের শক্তি অফুরন্ত স্বীকার করিতে হইবে। অজৈব যন্ত্রসকলের ক্রিয়া যন্ত্রাঙ্গ ক্ষীণ বা বিকৃত হইলেই শেষ হয়, কারণ তাহারা স্বত কিছুই নির্ম্মাণ করিতে পারে না। তবে অবকাশ না পাইলে জৈব বা অজৈব কোন যন্ত্রই ক্রিয়া করিতে পারে না। সাধারণতঃ ক্রিয়া এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থায় যাওয়া মাত্র, আর দেহী স্বকীয় করণভূত যন্ত্রসকল লইয়া যে সমঞ্জসভাবে ক্রিয়া করে তাহাই কর্ম্মতত্ত্বের কর্ম্ম। ক্রিয়ামাত্র স্বাভাবিক, কিন্তু কর্ম্ম স্বাভাবিক নহে। স্বাভাবিক ক্রিয়ার যে জৈব ভেদ তাহাই

* তৃতীয় ও চতুর্থ মত অনুসারে ঈশ্বর আমাদের কর্ম্মের ফলদান করিতেছেন। ঐ বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য বলেন "ঈশ্বর মেঘের মত; মেঘ যেমন সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ষণ করে ঈশ্বরও তেমনি যে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে তাহাকে তেমনি ফল দেন। তাহা না করিয়া যে ভাল করিয়াছে তাহাকে মন্দ ফল দিলে এবং যে মন্দ করিয়াছে তাহাকে ভাল ফল দিলে তাঁহার বৈষম্য দোষ হইত।" ইহা হইতে ঈশ্বরের পক্ষপাতশূন্যতা সিদ্ধ হইলেও তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান্ ও করুণাময় (প্রায় সমস্ত আর্য্য শাস্ত্রেরই যাহা মত) তাহা সিদ্ধ হয় না। কারণ যে ভাল করিয়াছে তাহার ভাল করিলে তাহাকে করুণা বলা যায় না বরং ভাল করিবার সামর্থ্য থাকিলেও যখন ঈশ্বর ভাল করেন না তখন তাঁহাকে হয় অশক্ত না হয় নিষ্করুণ বলিতে হয়। ইহাতে কেহ কেহ বলেন দুঃখ না থাকিলে সুখ বুঝা যায় না সেইজন্য ঈশ্বর কুকর্ম্মকারীদের দুঃখ দেন। এতদুত্তরে বক্তব্য যে তিনি প্রকৃত সর্ব্বশক্তিমান্ হইলে দুঃখ না দিয়াও তো সুখ বুঝাইতে পরিতেন। তাহা করেন না কেন? ইহার কোন উত্তর উঁহারা দিতে পারেন না।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে এক জ্ঞানের পর আর এক জ্ঞান, এক ইচ্ছাদি চেষ্টার পরে আর এক চেষ্টা, এক সংস্কারের পর আর এক সংস্কার—এইরূপে জ্ঞান, চেষ্টা ও ধারণশক্তির নিয়ত ক্রিয়া হইতেছে। ক্রিয়া হয় কোন বিষয় লইয়া। স্থূলদেহধারণরূপাদি বিষয় হস্তাদির চাল্য বিষয় ও গৃহীত রূপাদির সংস্কার এবং স্থূল দেহধারণ এইরূপ সাধারণ বিষয় সকলেরই বিদিত। এই সাধারণ ক্রিয়া ছাড়া অসাধারণ ক্রিয়াও আছে; তাহাও না জানিলে কর্ম্মতত্ত্বের সব বুঝা যাইবে না।

স্বপ্নাবস্থায় কখন কখন ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান হয়; তাহা ছাড়া Clairvoyanco, telepithy প্রভৃতিতে দূরদৃষ্টি দূরশ্রুতি, দূরবিষয়ের জ্ঞান হওয়াও সিদ্ধসত্য। অতএব চিত্তেন্দ্রিয়ের ঐ অসাধারণ ক্রিয়াও আছে এবং তাহা কোন কোন স্থলে দেখা যায়। চিত্তেরদ্বারা ভবিষ্যৎ জ্ঞান, জ্ঞানেন্দ্রিয়েরদ্বারা ব্যবহিত বা দূরদৃষ্টি শ্রুতি প্রভৃতি, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণশক্তিরদ্বারা সূক্ষ্মদেহ বিশেষ ধারণ করিয়া কর্ম্ম করা, দূর হইতে কর্ম্ম করা (telekinesis) এইরূপ সর্ব্বকরণের অসাধারণ ক্রিয়াও দেখা যায়। জ্ঞানাদি শক্তি ক্রিয়া করিলে তাহার বিষয় চাই, অতএব সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ বিষয়, সূক্ষ্মশব্দ রূপাদি বিষয় সূক্ষ্ম দেহ ধারণের যোগ্য সূক্ষ্ম ভৌতিক বিষয় এই সমস্তের সত্তাও স্বীকার্য্য।

কর্ম্ম "আমির" তাহা ঠিক হইল। এক্ষণে দেখিতে হইবে "আমি" কিসের দ্বারা নির্ম্মিত এবং কি লইয়া আমিত্ব কর্ম্ম করে। আমিত্বের প্রথম অংশ দেহ অর্থাৎ দেহ যে শক্তির দ্বারা ধৃত (বা নির্ম্মিত, বৰ্দ্ধিত ও পোষিত হয়) উহার নাম প্রাণশক্তি। প্রাণশক্তি পঞ্চবিধ—প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান। ইহাদের বিশেষ বিবরণ "সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব" প্রকরণে দ্রষ্টব্য। মূল দেহধারণ শক্তিই এই পঞ্চপ্রাণ। তন্মধ্যে আত্মপ্রাণ বাহ্যোন্তব বোধের যে অধিষ্ঠান তাহার ধারণশক্তি। উদান সেইরূপ ধাতুগত বা আভ্যন্তর বোধের ধারণাশক্তি। ব্যান চালক অংশ সকলের ধারণশক্তি। অপান নিরোজঃ দ্রব্যের অপনয়ন শক্তি। সমান সমনয়ন শক্তি। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে এই পঞ্চবিধ শক্তি হইতেই সমগ্র দেহধারণ হয়। ইহারা সমস্ত প্রাণনক্রিয়ার ব্যাপক। ইহা ছাড়া আর অন্য প্রাণশক্তি নাই। ইহা প্রাণবিদ্যার সার।

কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ "আমিত্বের" দ্বিতীয় অংশ। ইচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্যকরার যন্ত্রই কর্ম্মেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়।

আমিত্বের তৃতীয় অংশ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসা বাহ্যজ্ঞানের এই পঞ্চদ্বারভূত শক্তিই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এইগুলি আমিত্বের বাহ্যশক্তি। আমিত্বের আন্তর অংশের মধ্যে প্রথম মন। মনের কার্য্য ত্রিবিধ—জ্ঞান, ইচ্ছাদি চেষ্টা ও সংস্কার বা ধারণ। তন্মধ্যে জ্ঞান ও সংস্কার অংশের অন্য নাম চিত্ত এবং যে অংশ চেষ্টা করে তাহা সঙ্কল্পক মন। প্রমাণ, বিপর্য্যয়,

---

* কাহার কর্ম্ম এ বিষয়ে এই প্রত্যক্ষ অনুভব থাকিলেও কেহ কেহ অন্য থিওরী (অন্ধবিশ্বাস অবলম্বনে) উত্থাপন করেন। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর বা দেবতাদের দ্বারা আমাদের করণকার্য্য সকল হয়। কোন কোন শাস্ত্রবাক্যই এই মতাবলম্বীদের প্রমাণ। ইহাতে আপত্তি হয় যে আমাদের সমস্ত কার্য্য ঈশ্বর করাইলে পাপপুণ্যের দায়ী কে? এবং ফলভোক্তাই বা কে? তাঁহারা ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। ধর্ম্ম সাধনে উদ্যমহীন লোকে এইরূপ মত লইয়া মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেন মাত্র। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে কুকর্ম্ম ঈশ্বরই করান বা যেই করান তাহার ফল যে দুঃখ তাহা নিজেকেই ভোগ করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের প্ররোচনায় মিথ্যা কথা বলিলেও নরকদর্শনরূপ ফল নিজেই পাইয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকার দ্বারা ভারতকার এই তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন।

বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পঞ্চ প্রকার জ্ঞান আছে। সমস্ত জ্ঞানই ইহার অন্তর্গত। ইহাদের নাম চিত্তবৃত্তি। সংকল্প, ইচ্ছা, কৃতি আদি চেষ্টাই সংকল্পক মনের কার্য্য। কর্ম্মতত্ত্বের জন্য ইহাদের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। তাই পরে ইহাদের বিশেষ বিবরণ করা হইবে। সংস্কার—জ্ঞান ও চেষ্টার ধৃতভাব। কোন জ্ঞান বা চেষ্টা হইলে তাহা যে সূক্ষ্মরূপে চিত্তে থাকে এবং হেতু পাইলে পুনরায় উঠে তাহাই সংস্কার। কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে হইলে ইহারও উত্তম জ্ঞান চাই।

আমিত্বের দ্বিতীয় আভ্যন্তর অংশ অহংবোধ। আমি করি, জানি এবং আমি এরূপ ওরূপ ইত্যাকার বোধ সকলের যে "আমি" তাহাই অহংকার। আমি এক বলিয়া প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। সেই এক অনুভূয়মান আমিত্ববোধ যাহা আমি এরূপ ওরূপ আকার ধারণ করিয়া আছে তাহাই অহংকার। ইহাও সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয়।

অহঙ্কারের কারণভূত যে শুদ্ধ "আমি" বোধ যাহা আমি এরূপ ওরূপ হয় তাহাই আমিত্বের তৃতীয় আভ্যন্তর অংশ বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহান্ আত্মা। বুদ্ধি অর্থে সাধারণতঃ জ্ঞান। অতএব যাহা মূল জ্ঞান বা আমিত্ব জ্ঞান তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব। তাহা মহান্ বা আভিমানিক সঙ্কোচরহিত আত্মা বা আমিত্ব। অতএব আমিত্বের অধ্যবসায় বা নিশ্চয় জ্ঞানই মহত্তত্ত্ব। সাধারণ জানা বা বুদ্ধি, যে বুদ্ধিতত্ত্ব নহে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

আমিত্বকে বিশ্লেষ করিয়া প্রাগুক্ত যে দ্রব্য সকল পাওয়া গেল তাহারা সব যে অনুভূয়মান তথ্য পদার্থ, অন্ধবিশ্বাস্য বা থিওরী নহে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। এই সকলের মিলিত ক্রিয়াই দেহীর কর্ম্ম। এই সকলকে আরও সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষ করিলে কি কি পদার্থ পাওয়া যায় তাহাও দ্রষ্টব্য। মহান্ আত্মা হইতে পঞ্চপ্রাণ পর্য্যন্ত সমস্ত শক্তির ভিতর ক্রিয়াস্বভাব দেখা যায়। তাহাতে তাহারা নিয়ত এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাইতেছে। আর ক্রিয়া হইলেই তাহা জ্ঞাত হয় বা অনুভূত হয়। চিত্তের জ্ঞান হওয়াও অবস্থান্তরতা অথবা অবস্থান্তরতার অনুভব। সেইরূপ ইচ্ছাদি হইলেও তাহা জ্ঞাত হয়। চক্ষুরাদির ক্রিয়া হইলেও রূপাদি জ্ঞান হয়। হস্তাদির ক্রিয়া হইলেও কর্ম্মানুভূতি হয়। প্রাণের ক্রিয়া হইতেও স্বস্থতা অস্বস্থতা আদি বোধ হয়। অতএব জ্ঞান বা বুদ্ধি হওয়াও উহাদের অন্যতম স্বভাব।

ঐ সমস্ত করণের আরও এক স্বভাব দেখা যায়। জ্ঞান ও চেষ্টা হইলে তাহা একেবারে নষ্ট হয় না (কোন ভাব পদার্থ অভাব হয় না) কিন্তু সূক্ষ্মভাবে ও শক্তিরূপে (ক্রিয়াশক্তিরূপে) থাকে। তাহাতে জ্ঞান আবরিত ভাবে যায় ও ক্রিয়া জড়ভাবে যায়। সুতরাং এই আবরিত ও জড় হওয়ার স্বভাবও সমস্ত করণের অন্যতম স্বভাব।

অতএব বলিতে হইবে মহৎ হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্যের মূলস্বভাব—প্রকাশ বা বুদ্ধ হওয়া, ক্রিয়া বা অবস্থান্তর হওয়া এবং আবরিত ও জড় হওয়া বা স্থিতি। সুতরাং যেমন মৃত্তিকা স্বভাবের একদ্রব্য বা মৃত্তিকা—ঘট, কলস, ইট আদি দ্রব্যের উপাদান, সেইরূপ প্রকাশ-স্বভাব ক্রিয়া-স্বভাব ও স্থিতি-স্বভাব দ্রব্য বা সত্ত্ব রজ-তমরূপ প্রকৃতিই মহদাদির উপাদান। ইহার ভিতরও কিছু থিওরী অথবা অন্ধবিশ্বাস নাই। ইহা আমাদের অনুভূতির ন্যায়সঙ্গত বিশ্লেষ মাত্র। এই বিশ্লেষ মৌলিক বিশ্লেষ; সুতরাং ইহা অপেক্ষা আর কিছু জ্ঞাতব্য উপাদানভূত মূল্য দ্রব্য নাই এবং হইতেও পারে না।

উপরে বলা হইল প্রকাশশীল সত্ত্ব ক্রিয়াশীল রজ ও স্থিতিশীল তম এই তিন দ্রব্য বাহ্য ও আন্তর সমস্ত দ্রব্যের মূল উপাদান এবং উহা ব্যতীত আর কোন **মূল নাই এবং হইতেও পারে না**। এবিষয়ে উত্তমরূপে নিশ্চয় হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য বাহ্যান্তরের মূল উপাদান বিষয়ে মানব এ পর্য্যন্ত যে দার্শনিক গবেষণা করিয়াছে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ দ্রষ্টব্য একবস্তুবাদ বা Monism. Ernest Haeckel ইহার একজন আধুনিক প্রধান আচার্য্য। ইঁহাদের মতে একটি Universal substance বা বিশ্ববস্তু আছে। তাহার দ্বিবিধ অবস্থা; (১ম) ম্যাটার ও (২য়) spirit বা মন। ম্যাটার নামক বস্তুর দ্বিবিধ অবস্থা, এক mass বা ponderable বা ভারযুক্ত দ্রব্য (কঠিন, তরল, বায়বীয়) এবং অন্য ঈথার। ইহা Imponderable বা ভারহীন দ্রব্য। যদিচ ঈথারের কিছু ভার আছে তাহাও ইঁহাদের স্বীকার করিতে হয়। Mass দ্রব্য অন্তরালযুক্ত অণুসমষ্টি আর ঈথার নিরন্তরাল সর্ব্বব্যাপী দ্রব্য এবং ইহা আণবিক অবয়বহীন ("Not made up of separate particles")। এই উভয় substanceএর বা বস্তুর নাম ম্যাটার; সুতরাং ম্যাটার হইল 'extended subst nce' বা ব্যাপী বস্তু। এই ম্যাটারই জীবিত বস্তু হয়। জীবিত বস্তুর গুণ sensation বা বাহ্যবোধ consciousness বা অন্তর্বোধ। জীবিত বস্তুর আত্মরূপ প্রোটোপ্লাজম্ময় কোষসকল। তাদৃশ জীবিত কোষের বা কোষসমষ্টির (organism এর) বিশিষ্ট গুণই প্রাণীগণের বাহ্যবোধ ও অন্তর্বোধ। অসীম ম্যাটার সর্ব্বদাই ক্রিয়াযুক্ত। এই ম্যাটার এবং ক্রিয়া বা force বা energy নিত্যবস্তু। প্রাগুক্ত ঐ বিশ্ববস্তুর অন্যধর্ম্ম যে বোধ এবং অন্তর্বোধ অর্থাৎ ঐ energy বা ক্রিয়াশক্তি তাহাই thought, soul, consciousness বা spirit. "ইঁহাদের মতে" matter or infinitely extended substance and spirit (or energy) or sensative and thinking substance are the two fundamental attributes or principal properties of the all embracing divine essence of the world the Universal substance (Haeckel's Riddle of the Univers ech. I). অর্থাৎ ম্যাটার বা অসীম ব্যাপী বস্তু এবং স্পিরিট (আত্মা) বা ক্রিয়াশক্তি বা বোধ ও চিন্তাকারী বস্তু, এই দুইটি ভাবই বিশ্বের দিব্য মূলতত্ত্বের বা বিশ্ববস্তুর দুই প্রধান ধর্ম্ম। ইঁহাদের একতত্ত্ববাদ এইরূপ। বোধ ও অন্তর্বোধ বা ইঁহাদের spirit মূলত substanceএর গুণ হইলেও উহা যন্ত্রিত কোষে (বা মস্তিষ্কাদিতে) বিকসিত হয় এবং শরীর গেলে ঐ spiritএর নিজত্ব কিছু থাকে না। ঐ soul বিলীন হয়। সুতরাং দৃষ্টজন্ম ব্যতীত প্রাণীদের ব্যক্তিত্বের আর কিছুই থাকে না। অতএব ইঁহাদের কর্ম্মনীতি এই নাস্তিকতা অনুসারেই ব্যবস্থাপিত হয়। ইঁহাদের divine essence বা God অনন্তস্বভাব ছাড়া আর কিছুই নহে।

Substance বা মূলবস্তু সম্বন্ধে ইঁহাদিগকে এই স্বভাব স্বীকার করিতে হয়; যথা—"I may formulate it in three propositions :—(1) No matter without force and without sensation. (2) No force without matter and without sensation. (3) No sensation without matter and without force. These three fundamental attributes are found inseparably throughout the Universe."—Haeckel.

অর্থাৎ হেকেল বলেন "আমি এই বিষয় নিম্নলিখিত তিনটী প্রতিজ্ঞায় নিবদ্ধ করিতে পারি, যথা (১) ক্রিয়া ও বোধ ব্যতীত ম্যাটার নাই (২) ম্যাটার ও বোধ ব্যতীত ক্রিয়া নাই (৩) ম্যাটার ও ক্রিয়া ব্যতীত বোধ নাই। বিশ্বে এই তিন মৌলিক গুণসকল অবিশ্লেষ্যভাবে মিশ্রিত। অন্যত্র ও ইনি বলেন, ' When sensation in the widest sense (as psychoma) is joined to matter and energy as a third attribute of substance………In thus uniting sensation with force and matter as an attribute of substance we form a monistic trinity (Wonders of Life p. 149). অর্থাৎ ম্যাটার ও ক্রিয়াশক্তির সহিত তৃতীয় বোধধর্ম্ম (সাইকোমা বা প্রকাশ নামক ব্যাপী অর্থের বোধ) বস্তুর ধর্ম্মস্বরূপ যোগ করিলে। ………"এইরূপে ক্রিয়াশক্তি ও ম্যাটারের সহিত বোধ গুণকেও আমরা বস্তুর ধর্ম্মরূপে যোগ করিয়া একবস্তুবাদের ত্রিগুণত্ব করিয়া থাকি।" (সাংখ্যের ত্রিগুণবাদের ইহা নিকটে গিয়াছে)।

(ক) মন ও ম্যাটার পৃথক এই দ্বিবস্তুবাদের একজন প্রধান আচার্য্য Lodge। উক্ত এক-বস্তুবাদীদের ভিত্তিতে অনেক অবিসম্বাদিত সত্য থাকিলেও শেষে উঁহাদের অনেক অযুক্ত কথা বলিতে হয় এবং উঁহাদের দর্শনও অসম্যক্। উঁহাদের substance বা মূল বস্তু কি? এক বস্তুবাদীদের প্রামাণ্যগুরু Spinoza বলেন "I understand substance (*substantia*) to be that which is in itself and is conceived through itself; I mean that the conception of which does not depend on the conception of another thing from which it must be formed.

"An attribute, I understand to be that which the intellect perceives as constituting the essence of a substance."

অর্থাৎ যাহা নিজেতেই নিজে থাকে এবং নিজের দ্বারাই যাহাকে অভিকল্পনা করা যায় তাহাকেই আমি বস্তু বলিয়া বুঝি। আমার বক্তব্য এই যে যাহার অভিকল্পনা অন্য এক তৎকারণভূত বস্তুর অভিকল্পনার উপর নির্ভর করে না তাহাই বস্তু।

আমি বস্তুধর্ম্ম (attribute) অর্থে ইহা বুঝি যে—যাহা কোন বস্তুর সার তত্ত্বরূপে বুদ্ধি গ্রহণ করে তাহাই বস্তুধর্ম্ম।

অতএব এক বস্তুবাদীদের মতে ইহা সিদ্ধ হইবে যে বিশ্বের মূলীভূত এমন এক বস্তু আছে যাহা কারণহীন, নিত্য এবং যাহা ম্যাটার বা ভারযুক্ত ও ঈথার বা ভারহীন ধর্ম্মযুক্ত এবং যাহা ক্রিয়াশক্তি (energy) বা বোধ-ধর্ম্মযুক্ত। ইহাতে মূল বস্তুর কিছুই বুঝা যায় না। ক্রিয়াশক্তি বা energy বুঝা যায় ও দেখা যায়। তাহা ছাড়া মূল বস্তুর অন্য কি গুণ আছে যদ্বারা ঐ মূল বস্তু অভিকল্পনা করা যাইবে? কিছুই নাই বলিতে হইবে। মূল বস্তু কথা মাত্র। আর এটম্ বা অণুও বিশ্লিষ্ট হইয়া এখন কেবল negative ও positive তড়িতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং উহাও energy। অতএব ক্রিয়াশক্তি ছাড়া ম্যাটার-ধর্ম্ম নাই। "বস্তুর গুণ ম্যাটার," এই কথা ফাঁকা কথা, ক্রিয়াশক্তিই বাস্তক দ্রব্য। আর ঈথার কি তাহার কিছুই জানা নাই। অনেক বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক উহাকে সম্পূর্ণ Hypothetical বা ধরে' লওয়া অজ্ঞাত বস্তু বলেন। কিন্তু একবস্তুবাদীরা উহাকে যেন কত জ্ঞাতবস্তুর

মত ব্যবহার করেন। আর ভারহীনও বলেন এবং ভারযুক্তও বলিতে বাধ্য হন (পৃথিবীর আকারের এক ঈথার গোলক ২৫০ পাউণ্ড ভারী হইতে পারে বলেন)। আর ভারযুক্ত ম্যাটারের মূলরূপ অণু (atom)। তাহাও আবার proton ও ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টি (protonএর চতুর্দ্দিকে electron ঘুরিতেছে, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহের ন্যায়)। এই ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন যে বিভিন্ন তড়িচ্ছক্তিযুক্ত কিছু, এই মাত্র জানা যায়। J. B. Burke বলেন "As of the atom or as it is now electron, we know nothing except that it is a seat of force, of inertia and of motion"—Origin of Life p. 20. অর্থাৎ অণুর অথবা যাহা যাহা এখন ইলেক্‌ট্রন হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে আমরা অন্য কিছুই জানি না; কেবল জানি যে উহা শক্তির, জড়তার, ও গতির আধার মাত্র। Lodge কল্পনা করেন যে ইলেক্‌ট্রন (অজ্ঞাত) ঈথারের মধ্যে ক্রিয়াবর্ত্ত মাত্র। এইরূপে দেখা গেল এক অজ্ঞাত নামমাত্র বস্তু* লইয়া এই বাদীরা জগতত্ত্ব বুঝাইতে চান।

(খ) ইহা সর্ব্বথা অন্যায্য। আরও ইঁহাদের অন্যায্য দৃষ্টি এই যে ইঁহারা energy এবং বোধরূপ মন এই দুইকে এক বলেন। energy অর্থে ক্রিয়ার শক্তি, বাহ্য ক্রিয়া অর্থে 'change of position (Watson's Text Book of Physics) বা একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন। তাহা কিরূপে জ্ঞানের সহিত এক বা জ্ঞান দ্রব্যের উপাদান তাহা উঁহারা কিছুই বুঝান না। উহা বুঝিবারও বিষয় নহে। উহা কেবল যুক্তিহীন অকল্পনীয় প্রতিজ্ঞামাত্র। (প্রঃ দ্রষ্টব্য) অতএব যাঁহারা বলেন দুই প্রকার শক্তি বা বস্তু আছে—(১) মানস বস্তু বা mind stuff (২) এক বাহ্যবস্তু বা matter (ম্যাটার ক্রিয়াশক্তি বিশেষ) তাদৃশ দুই বস্তুবাদী dualistদের দৃষ্টি অধিকতর যুক্ত। তদপেক্ষা যুক্ত মনোমাত্র বাদী psychomonist or subjective idealist দের মত। তাঁহারা সুযুক্তি সহকারে বলেন যে কোন কিছুর জ্ঞান হইলে তাহা আছে বলি। জানা ও থাকা একই কথা। জ্ঞানের হেতু আন্তর দ্রব্য মন ত আছেই (ডেকার্টের সুন্দর সূত্র এবিষয়ে আছে, যথা "cogito ergosum" অর্থাৎ আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি) আর বাহ্যদ্রব্য জানি বলিয়া আছে বলি। তাহা যেরূপ আছে বলি তাহা এক প্রকার জ্ঞান মাত্র। "এক প্রকার জ্ঞান" ইহা ছাড়া বাহ্যদ্রব্য সম্বন্ধে কি বলিতে পারা যায়? The atoms are nothing more than ideas" (J. B. Burke's Origin of Life P. 338) অর্থাৎ অণুসকলকে যেরূপ জানি তাহা মনের ভাব ছাড়া আর কিছু নহে। Hume বলেন—যে বাহ্যকারণে আমাদের এই মনোভাব হয় তাহা যে কি তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, তাহা ঈশ্বরেচ্ছা বা অন্য

* কারণ ক্রিয়াশক্তিই একমাত্র বস্তু পাওয়া যায়; তাহা ছাড়া আর ব্যাপী substance বস্তু কোথায় আছে? Relativity অনুসারে দেখিলে জড়বাদীদের কিছুই থাকে না। If we adopt in mathematics and physics the principle of relativity (and have we any choice ?) the obstinate resistant form of the physical world dissolves to thin air and disappears " Dr. H. Wildon Carr's Principle of Relativity—P. 61. অর্থাৎ গণিত-বিজ্ঞানে ও জড়-বিজ্ঞানে যদি আমরা আপেক্ষিকতা বাদ খাটাই (তাহা না খাটান ছাড়া অন্য কি পথ আছে ?) তাহা হইলে বাহ্য জগতের নিরেট অনপসার্য্য ভাব (যাহা সাধারণ মনে হয়) হাওয়াতে মিলাইয়া যায় এবং থাকে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা nature of matter and forceকে অন্যতম world-enigma বা বিষমসমস্যা বলেন।

কিছু হইতে পারে। Berkeley বলেন (ভারতীয় অনেক দার্শনিকও বলেন) "The universe is a system of ideas in the Divine, the all pervading Mind", অর্থাৎ বিশ্বজগত্ত সর্ব্বব্যাপী ঐশ মনের প্রকার বিশেষের কল্পনমাত্র। Schopenhaur কেও বলিতে হইয়াছে জগৎটা "Divine Will." এইরূপে ম্যাটার নামক পদার্থের মূল কি তাহা দার্শনিক যুক্তির দ্বারা অনুসন্ধান করিলে জড়বাদীদের ম্যাটার বিলীন হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহাদের দৃষ্টি—দৃষ্টবিষয়ে অনেক সত্যের উপর স্থাপিত হইলেও—মূল বিষয়ে যুক্তিহীন ও অসম্যক্। এই সব বিতর্কের সহিত অজ্ঞেয়বাদের তর্কও উত্থাপ্য। তাঁহাদের মতে মূল বস্তু কি তাহা অজ্ঞেয়। এই জ্ঞায়মান জগতের মূল কি তাহা জ্ঞেয়ত্বের বিষয় নহে। কারণ ম্যাটারের ক্রিয়া হইতে আমাদের জ্ঞান হয়, কিন্তু যাহার ক্রিয়া হইতে রূপাদির জ্ঞান হয় তাহা রূপাদিযুক্ত পদার্থ হইতে পারে না, সুতরাং তাহা অকল্পনীয় বা অজ্ঞেয়। মনের পক্ষেও তাহা অব্যক্তব্য। কিন্তু এক অজ্ঞেয় বস্তু যে আছে তাহা এবং তাহা যে বাধা দেয়, ক্রিয়া করে, স্থিতি করে ইত্যাদি কথা তাঁহাদিগকে বলিতে হয়।

H. Spencer বলেন "Thus it turns out that the objective agency, the noumenal power, the absolute force declared as unknowable, is known after all to exist, persist, resist, and cause our subjective affections and phenomena. Yet not to think or to will;" অর্থাৎ এইরূপে দেখা যায় যে এই বস্তুশক্তি বা একনানাত্বহীন ক্রিয়াশক্তিরূপ বাহ্যকারণ, যাহাকে অজ্ঞেয় বলা হয় তাহাকে ফলত আমরা "জানি" যে তাহা আছে, তাহা স্থিত, তাহা বাধা দেয় এবং আমাদের মানস ও বাহ্য কার্য্য উৎপাদন করে; কিন্তু তাহা চিন্তা বা ইচ্ছা করে না।

(গ) বিশ্বের মূল সম্বন্ধে (সাংখ্য ব্যতীত) মানবের যে সমস্ত দার্শনিক চিন্তাপ্রস্থান আছে তাহাদের প্রধান গুলি বিবৃত হইল। অন্য সকল উহাদেরই অন্তর্গত। সাংখ্যের দর্শন অন্যরূপ। তাহাতে ঐ সমস্ত বাদ সমন্বিত হয় এবং তাহা সম্যক্ তলস্পর্শী। তাহা ঐ সমস্ত "ism", "—logy", প্রভৃতির সম্যক্ উপরিস্থিত।

প্রাগুক্ত একবস্তুবাদী (জড়বাদী monist) হইতে অজ্ঞেয় বাদী পর্য্যন্ত সকলকেই স্বীকার করিতে হয় যে বাহ্যে ও অন্তরে নিয়ত ক্রিয়া হইতেছে। ক্রিয়া মানে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাওয়া। বাহ্য ক্রিয়া 'change of position' বা একস্থানে অবস্থিত বস্তুর অন্যস্থানে অবস্থান। অন্য কথায় তাহা অবস্থান্তরতা আন্তরক্রিয়াও অবস্থান্তরতা। জ্ঞান, ইচ্ছা আদি অন্তরভাবের দেশব্যাপী অবস্থান নাই। তাহারা যে লম্বা, চওড়া ও মোটা নহে বা তাদৃশ আকার যুক্তরূপে কল্পনীয় নহে, তাহা অনুভূত হয়। তাহাদের ক্রিয়া সুতরাং এক কাল হইতে অন্য কালে যাওয়া-রূপে অবস্থান্তরতা। অনুভবও হয় বর্ত্তমানক্ষণে এক জ্ঞান আছে পরক্ষণে অন্য জ্ঞান হইল। এইরূপে জ্ঞানের ভিন্নতা পূর্ব্বাপরকালে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। অতএব কালমাত্র ব্যাপী ক্রিয়া যে মানস স্বভাব ইহা সিদ্ধ হইল। যাহা জ্ঞেয়রূপে জানা যায় তাহাদের সমস্তেরই এই ক্রিয়া-স্বভাব বা ক্রিয়াশীলতা সর্ব্ববাদীদেরই স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানের ও জ্ঞেয়ের যে এই ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন তাহা সকলের

অনুভূয়মান সিদ্ধ সত্য। উহা থিওরী অথবা বাচিক সামান্য (abstraction) নহে। ক্রিয়ার দ্বারা জ্ঞানযন্ত্র সক্রিয় হইলেই জ্ঞান হয়। শব্দ-স্পর্শাদির জ্ঞান, ইচ্ছাদির জ্ঞান, সুখ দুঃখাদির জ্ঞান, সবই ক্রিয়া হইতে হয়, জ্ঞান উদ্ভূত হওয়াও ক্রিয়া এবং জ্ঞান লীন বা আবরিত অবস্থায় যাওয়াও ক্রিয়া। এইরূপে ক্রিয়া ও জ্ঞান অবিনাভাবী। জ্ঞান বা বোধ দুইরকম, এক গ্রাহ্য ভাবের বোধ—যেমন শব্দাদি বাহ্যজ্ঞান; দ্বিতীয় জ্ঞান-যন্ত্রের স্বগতবোধ—যেমন সুখাদিবোধ, আমি আমাকে জানি এইরূপ বোধ। এই উভয় প্রকার বোধই ক্রিয়া সহ-ভাবী। অতএব বাহ্যাভ্যন্তর ভাবের আর এক স্বভাব হইল প্রকাশ বা বুদ্ধ হওয়া। ইহাও কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। অতএব বাহ্যাভ্যন্তর সর্ব্ববস্তুর অন্যতম স্বভাব বা মৌলিক ধর্ম্ম বা attribute হইল প্রকাশশীলতা। ইহাও অনুভূয়মান সত্য।

সত্যের বা যাহা আছে বলিয়া জানি এরূপ পদার্থের অভাব হয় না এবং অসত্যের বা যাহা নাই বা যাহা জানার অযোগ্য এরূপ পদার্থের ভাবও হয় না। ইহা সমস্ত স্বস্থপ্রকৃতিক (normal) দার্শনিক বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন। অতএব ঐ ক্রিয়ার ও প্রকাশের অভাব নাই যদিও তাহাদের এক অংশের নাশ হইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে দার্শনিক ভাষায় নাশ শব্দের অর্থ অভাব নহে, কিন্তু অলক্ষ্যভাবে থাকা। বিশ্বে কতখানি ক্রিয়া আছে? অবশ্যই বলিতে হইবে অমেয় ক্রিয়া আছে। প্রকাশও সুতরাং অমেয়। অতএব সিদ্ধ হইল অমেয় নিত্য প্রকাশ ও ক্রিয়া আছে।

(ঘ) প্রকাশ ও ক্রিয়া মেয় বা খণ্ড খণ্ডভাবে বা স্তোকে স্তোকে বর্ত্তমান দেখা যায়। জ্ঞেয় বস্তু সকল প্রত্যেকে সসীম। যাহাকে অসীম বস্তু বলে তাহারা বৈকল্পিক মাত্র—সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে। যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা যাহা কল্পনা করিতে পারি তাহা সব সসীম। যাহাদের পরিণামের ও সংখ্যার সীমা দেওয়া অযুক্ত তাদৃশ পদার্থদের অমেয় অসীম ও অনন্ত বলি। প্রত্যেক জ্ঞান সসীম তাই প্রত্যেক জ্ঞেয়ও সসীম। প্রকাশ ও ক্রিয়ার জ্ঞায়মান অবস্থা সকল এইরূপে সসীম দেখা যায় বলিয়া, বলিতে হইবে যে প্রকাশ ও ক্রিয়া অসীম হইলেও তাহা খণ্ড খণ্ড রূপে অবস্থিত আছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ একতান জ্ঞান বা ক্রিয়া নাই। * আছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ক্রিয়ার (সুতরাং জ্ঞানের) প্রবাহ মাত্র। ক্রিয়া ভাঙ্গে কেন? অবশ্য তাহার (ভাঙ্গার) কিছু কারণ আছে। সেই কারণ কি হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে, ক্রিয়ার বিরুদ্ধে কোন পদার্থ আছে যাহা ক্রিয়াকে ভাঙ্গে। ক্রিয়ার বিরুদ্ধ পদার্থের নাম জড়তা। জড়তা দ্বিবিধ—ক্রিয়ার জড়তা বা মান্দ্য এবং জ্ঞানের জড়তা বা আবরণ। অতএব বলিতে হইবে ক্রিয়ার (সুতরাং জ্ঞানেরও) পশ্চাতে এক জড়তা স্বভাব বর্ত্তমান আছে। তজ্জন্যই ক্রিয়া ও জ্ঞান খণ্ড খণ্ড ভাবে হয়। খণ্ড খণ্ড ভাবে হওয়া অর্থে—বর্ত্তমান ক্রিয়া বা জ্ঞান রুদ্ধ হইয়া পরে আর একটা উঠা। উহা কোথা হইতে উঠে? উত্তরে বলিতে হইবে জড়ীভূত জ্ঞান ও ক্রিয়া হইতেই পুনশ্চ ব্যক্ত জ্ঞান ও ক্রিয়া হয়। কারণ অভাব হইতে ভাব হয় না।

*Physicist দেরও চরম সিদ্ধান্ত—"Energy acts in quanta" অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি স্তোকে ক্রিয়া করে। বিদ্যুৎ, আলোক, শব্দ প্রভৃতি সমস্তই স্তোকে স্তোকে ক্রিয়া।

এবং ক্রিয়া হইতে যে ক্রিয়া এবং প্রকাশ হইতে যে প্রকাশ হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সেইরূপ ব্যক্ত জ্ঞান ও ক্রিয়া যখন ভাঙ্গিয়া যায় তখন জড়ীভূত হইয়া যায়।

এইরূপে সিদ্ধ হয় যে বাহ্য ও আন্তর পদার্থের আর এক মৌলিক স্বভাব জড়তা বা স্থিতিশীলতা। অতএব প্রকাশশীল ভাব বা সত্ত্ব, ক্রিয়াশীলভাব বা রজ এবং স্থিতিশীল ভাব বা তম এই তিন ভাব পদার্থ বাহ্য ও আন্তর ভাবের উপাদান বিষয়ে চরম ও মৌলিক বিশ্লেষ। এই বিশ্লেষের পর আর বিশ্লেষ হইতে পারে না। যাহা হইতে পারে না বা কল্পনাও করিতে পারি না তাহার নাম "নাই"। অতএব সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনের উপরে কোন জ্ঞেয় দ্রব্য নাই। যাহা জ্ঞেয় তাহাই ঐ তিনের লক্ষণের দ্বারা আক্রান্ত বা ঐ তিনের সমাহার। ঐ তিন ছাড়া কোন দ্রব্য আবিষ্কার করার বৃথা চেষ্টা করিলেই পাঠক এ বিষয়ের সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

মনে কর একটি জ্ঞান। তাহা কি? বোধ বা জ্ঞান-স্বভাব দ্রব্যের তাহা এক খণ্ড অবস্থা বলিতে হইবে। ক্রিয়ার দ্বারা তাহা উদ্ভূত হইয়া পুনশ্চ ক্রিয়ার দ্বারা তাহা সংস্কারভাবে গেল। (পাত্র হইতে এক চামচ বালি তুলিয়া সেই বালির পাত্রে তাহা ফের ঢালিলে যেমন হয় ইহাও সেইরূপ) ইহাতে কি পাওয়া গেল? জড়তাকে অভিভব করিয়া ক্রিয়া বোধ বস্তুকে পরিচ্ছিন্ন করত উঠাইল ও পরক্ষণে তাহাকে আবরিত ভাবে লইয়া গেল। ইহাই একটি "জ্ঞান" হওয়ার তত্ত্ব বা প্রকাশ ক্রিয়া স্থিতির এক খেলা মাত্র। সেইরূপ ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ আদিও প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতির এক এক প্রকার বিকাশ মাত্র। জ্ঞানেচ্ছাদি মনোভাবের উপাদান বিষয়ে তদতিরিক্ত আর কিছু বলার, সুতরাং বুঝার নাই।

বাহ্য বিষয় সম্বন্ধেও ঐ কথা। বাহ্য দ্রব্য আমরা শব্দাদি পঞ্চগুণের দ্বারা জানি। তাহারা বৈষয়িক (Physical বা শব্দতাপরূপ ক্রিয়া) বা রাসায়নিক (Chemical অগ্নিজ্বলা আদি) বা সাধারণ (mechanical) ক্রিয়া মাত্র। সেই ক্রিয়া হইতে ইন্দ্রিয়গত জড়তা উদ্রিক্ত হইয়া শব্দাদি জ্ঞান হয়। তাহা ছাড়া বাহ্যদ্রব্যের যে ভারবত্তা ও জড়তা গুণ আছে তাহাও ক্রিয়াবিশেষ। ভারবত্তা পৃথিবীর বা অন্য আকর্ষকের দিকে গতিরূপ ক্রিয়া, জড়তা বা inertia, উদ্রেচক ক্রিয়ার বিরুদ্ধ ক্রিয়া মাত্র। অপ্রবেশ্যতা বা i penetra bility দ্রব্যের স্বগত ক্রিয়াবর্ত্তমাত্র।

অতএব বলিতে হইবে আপেক্ষিক জড়ীভাবে স্থিত ক্রিয়া inertia (জড়ত্ব) এবং শব্দাদি ব্যক্ত ক্রিয়া ম্যাটারের প্রকৃতরূপ। ইহাতে জড়তা, ক্রিয়া ও জ্ঞাত হওয়া বা প্রকাশ এই তিন স্বভাব ম্যাটারেও বা বাহ্যদ্রব্যেও পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই সুতরাং আর জ্ঞাতব্য হইতে পারে না।

(ঙ) প্রাগুক্ত একবস্তুবাদীরা যে বলেন বোধ, ক্রিয়া ও ম্যাটার অবিনাভাবী, (উদ্ধৃত বচন দ্রষ্টব্য) তাহা খুব সত্য কথা এবং সাংখ্যের অনুগত ও অনুমত কথা। কিন্তু ম্যাটার বা Substance কি? তাহা বিশ্লেষ করিলে কেবল আপেক্ষিক জড়ীভূত ক্রিয়ামাত্র এবং বোধ পাওয়া যায়। তদপেক্ষা অধিক আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না। অজ্ঞেয়বাদীদেরকেও

exist, persist, resist, act, ইত্যাদি জ্ঞাত গুণ বলিতে হয়। তাহার পর যাহা unknowable বা অজ্ঞেয় কল্পনা করা হয় তাহা বস্তুত নাই। কারণ যাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় বা যাহা কখনও জ্ঞেয় হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা = নাই। তদ্বিষয়ে বল্বার কিছু নাই। এইরূপে জানা গেল প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির অতিরিক্ত কিছুই নাই সুতরাং তদতিরিক্ত কিছু জানারও নাই। তদ্ব্যতীত কিছু জ্ঞেয় আছে বলিলেই বলা হইবে যে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির এক অবস্থা বিশেষ আছে।

(চ) অতএব সিদ্ধ হইল সত্ত্ব, রজ, তম ছাড়া আন্তর ও বাহ্যভাবের কোন উপাদান নাই ও হইতে পারে না।

কৃষ্ণাবতরণ

অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সাহা এম, এ,

বেদে ও অতি-প্রাচীন উপনিষৎ-সমূহে কৃষ্ণলীলার কোনো প্রসঙ্গ নাই (?) পরবর্ত্তী পুরাণাদি শাস্ত্রে কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণকাহিনী পাওয়া যায়—সুতরাং বুঝিতে হইবে কৃষ্ণোপাখ্যান পৌরাণিক যুগের ঋষিগণের রচনা। এই প্রকার বালকোচিত সিদ্ধান্ত এক শ্রেণীর পণ্ডিত সমাজে এখনো প্রচলিত আছে। এই বিচিত্র যুক্তিধারা এদেশের শিক্ষিতগণ সাহেবদের কাছে শিখিয়াছেন। পুরাতন ব্রিটিশ-কথাসাহিত্যে আর্থার, স্কন্দনভীয় পুরাণে ওদীন ও বল্‌দের এবং প্রাচীন জার্ম্মান সাহিত্যে সীগ্‌ফ্রিদ প্রভৃতির কাল্পনিক আদর্শ আহরণ করিয়া সাহেবেরা কৃষ্ণবিষয়িণী পুরাণ কথার যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন—আমাদের দেশের জ্ঞানীরাও তাহাদেরি অনুকরণ করিয়া এ বিষয়ের সেই ভাবেই ভাবনা করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনো করিতেছেন।

যে দেশে শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থ বর্ত্তমান, এবং যে দেশ গত সাড়ে চারিশত বৎসর ধরিয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু এবং রূপ-সনাতনাদি আচার্য্যগণের শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং তাঁহাদের জীবনের জলন্ত আলেখ্য দর্শন করিয়াছে, সেই দেশে কৃষ্ণকাহিনী কবে কল্পিত হইল এই প্রকার প্রশ্ন কেবল অসঙ্গত নয়—কুৎসিতও। এ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানী জনের প্রশ্ন হইবে—সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্য-মহৎপদং হইতে অবতরণ করিয়া কবে আনন্দচিন্ময়রসোজ্জলবিগ্রহ শ্যামসুন্দর গোবিন্দ দুঃখদৈন্যতমসাচ্ছন্ন মর্ত্ত্যলোকে আত্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন? কবে মানব-জীবনাকাশের সকল মেঘকুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া পরম রমণীয় জ্যোতির্ম্ময় কৃষ্ণ-সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল? শ্রীমদ্‌ভাগবতে যে সকল জ্ঞানাতীত তত্ত্ব ও অমৃতমাধুর্য্যময়ী লীলার বর্ণনা পাইতেছি তাহা কোন্ যুগে সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যঋষিগণের নির্ম্মল জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল? এই প্রকার জিজ্ঞাসাই সঙ্গত এবং ইহাই বুদ্ধিমানের জিজ্ঞাসা। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের কৃপায় আমরা এ বিষয়ে বিবিধ জ্ঞান লাভ করিতে আশা করি।

পরমব্রহ্মের পূর্ণতম স্বরূপ কৃষ্ণ। এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্যচ। মানবচেতনার অশেষবিধ অবস্থা আছে। চেতনার কোনো

কোনো বিশেষ অবস্থায়ই মানবজীবনে কৃষ্ণাবির্ভাব সম্ভব—অন্যান্য অবস্থায় নহে। বেদসংহিতা ও উপনিষদাদি জ্ঞানচৈতন্যের যে ভাবভূমি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে—তাহাতে কৃষ্ণের প্রকাশ অসম্ভব। স্থানান্তরে সে বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। বেদে কৃষ্ণ নাই। সুতরাং কৃষ্ণ কল্পনা। ইহা নিতান্ত অজ্ঞানের কথা। বেদে কৃষ্ণ নাই। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গজ্যোতির প্রতিভাই বেদ। বেদ কৃষ্ণসূর্য্য-প্রকাশের পূর্ব্বগামী বিশ্বব্যাপী অরুণালোক। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ। ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদে তদপ্যস্য তনুভা।—বেদ ও উপনিষদে তোমরা যে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের কথা শুনিতেছ, তাহা কিন্তু সচ্চিদানন্দঘন গোবিন্দের অঙ্গপ্রভা—বৈষ্ণব ঋষি আমাদের কানে কানে এই কথা বলিতেছেন। বেদ সাহিত্য দিব্য জ্যোতির সাহিত্য। কিরণের উপর কিরণ, রশ্মির উপর রশ্মি, চঞ্চলচ্ছটার উপরে ছটা—ইহাই বেদ সাহিত্যের প্রকৃতি। এই কিরণ-সমূহের ফাঁকে ফাঁকে চিরচঞ্চল কৃষ্ণ খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন। গোবিন্দ শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। বৈদিক ঋষিগণ কিরণারণ্যে পথ ভুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আলোকের অতল অকূল সাগরে ডুবিয়া মরিয়া অমৃত হইতেছেন। কৃষ্ণকে তাঁহারা কেমন করিয়া দেখিবেন? কিরণারণ্যের উজ্জ্বলতম বর্ণনা ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ছান্দোগ্যোপনিষদের শেষের দিকে একটী আশ্চর্য্য কথা আছে—

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ৮।১৩

অনন্ততরঙ্গায়িত ব্রহ্মসিন্ধুর মাঝখানে সহসা এই শ্যাম-শতদল কোথা হইতে আসিল? ভাষ্যকার বলিতেছেন—শ্যামাৎ গম্ভীরাৎ হৃদয়াভ্যন্তরস্থিতাৎ অতএব দুর্জ্ঞেয়াৎ ব্রহ্মণঃ শবলং বিচিত্রবর্ণং নানা কামমিশ্রং ব্রহ্মলোকমিত্যর্থঃ।—ঋষি বলিতেছেন, আমি শ্যাম অর্থাৎ হৃদয়-তলস্থিত দুরধিগম্য ব্রহ্মকে ধ্যানের দ্বারা অবগত হইয়া, শবল অর্থাৎ নানা কামনামিশ্রিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতেছি। সুন্দর কথা। কিন্তু ব্রহ্ম-বস্তু 'শ্যাম' কেন? বেদে কৃষ্ণ নাই বলিয়া যাঁহারা ঘোষণা করেন তাঁহারা একথা ভাবিয়া দেখিবেন। গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা বলিতেছেন—

যদি নয়ন মুদে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যাম।

ছান্দোগ্যের প্রথম দিকে আছে—

অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে
সৈব ঋক্ তদব্রহ্ম তদেব রূপং। ১।৭।৫

সর্ব্বব্যাপক বিভু ব্রহ্ম ঋষিগণের নয়নে নয়নে দিব্য পুরুষ রূপে ভাসিতেছেন—রূপ ভাসে!

নহে দূরে নহে পাশে
নয়ন মুকুরে রূপ ভাসে।

কখনো 'শ্যাম' কখনো গৌর—'চম্পক শোণকুসুম কনকাচল' জিনিয়া—

হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে *
আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ। ছান্দোগ্য। ১।৬।৬

পরতত্ত্ব বৈদিক ঋষির নয়নে কখনো আবার সুনীল সুন্দর প্রতিভায় প্রকাশিত হইতেছে।

তাই ঋষি বলিতেছেন—আকাশশরীরংব্রহ্ম। অর্থাৎ আকাশের যে মনোরম নীলিমা—উহা ব্রহ্মের অঙ্গকান্তিচ্ছটা। ব্রহ্ম কেমন? সত্যাত্মা প্রাণারামং।

তিনি যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া সমভাবে সচ্চিদানন্দবৈভবে বর্ত্তমান। তিনি পরমাত্মস্বরূপ।

ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষনামী। চরিতামৃত।

তিনি আবার 'প্রাণারামং' প্রাণে প্রাণে রমণ করেন। তিনি রাধারমণ। আরাধনরত সকল রমণীর সঙ্গসুখবিলাসী।

রতিসুখ সারে গতমভিসারে
মদনমনোহরবেশং।

তিনি 'মন আনন্দনং'। তাঁহার দর্শনে, তাহার স্মরণ মাত্রে বিশ্বের সকল জনগণের প্রাণ মন আনন্দিত হয়।

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দিবরশ্যামঃ।

তিনি আনন্দেরও আনন্দ। নিখিলের সকল আনন্দ তাহারি। সেই জন্য তাহার নাম নন্দ-নন্দন, তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্মা প্রাণারামং।
মন আনন্দনং। শান্তি সমৃদ্ধিরমৃতম। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ৬।১

উপনিষৎ-সাহিত্যের নানাপ্রকার শুষ্ক গভীর তত্ত্বসমূহের আখ্যান শুনিতে শুনিতে—যখন শোনা যায়—রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি—তখন চমকিয়া উঠিতে হয়। তিনি সর্ব্বভূতগুহাশয়, তিনি সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ, তিনি মহতো মহীয়ান, তিনি স্বতন্ত্র, তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা, তিনি গন্ধরেষ্ঠ, তিনি ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বর, তাঁহার শাসনে সূর্য্য উত্তাপ দান করে, মৃত্যু তাঁহার আজ্ঞাকারী, বাক্য, তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না মন তাঁহার সন্ধান জানে না—ইত্যাদি উপনিষদবচনের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে—'রসো বৈস রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি' শুনিলেই, মনে হয়—এযে অন্য দেশের কথা,

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং।
তথাঽরসং।

এ তো সেই অরূপ অরস ব্রহ্ম নয়। এযে রসময় রসিকশেখর। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। শৃঙ্গাররসরাজময়মূর্ত্তিধর কি এই?

তবে হাসি তারে প্রভু দেখা'ল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ। চরিতামৃত।

রসোবৈ সঃ।—ইহা রসরাজ মহাভাব নয়, তবে কি? রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।—

অর্থাৎ

গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটি গুণ।

গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হ'তে শতগুণ গোপী আস্বাদয়।

* * *

গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত।

* * *

গোবিন্দ প্রেক্ষণাক্ষেপিবাষ্পপূরাভিবর্ষিণং।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা। চরিতামৃত।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি—প্রভৃতি শ্রুতিবচনে যাহা অস্ফুট কোড়করূপে পাইতেছি—তাহাই বিকশিত সুরভি পুষ্প-রূপে দেখিতেছি শ্রীমদ্ভগবতে—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসার মসমোর্দ্ধ মনন্য সিদ্ধং।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য।

গোপীগণের সৌভাগ্যের সীমা নাই। কে জানে তাহারা কি তপস্যা করিয়াছিল। তাই তাহারা অতৃপ্ত নয়নে দিবানিশি গোবিন্দের রূপামৃত পান করে। সকল শোভাসৌন্দর্য্যের সকল লাবণ্যমাধুরীর সার এইরূপ। এরূপের তুলনা নাই। ইহা সুরকন্যাগণেরও দুষ্প্রাপ্য। এইরূপ যশ শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের পরমধাম।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
আবার, ক ইদম্ কস্মা অদাৎ
কামঃ কামায়াদাৎ।
কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা
কামঃ সমুদ্রমাবিবেশ।

ইত্যাদি শ্রুতি শ্রুতিগোচর হইবামাত্র মনে পড়ে রাসপঞ্চাধ্যায়ের।

তাসামাবির ভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মথমন্মথঃ
কৈশোর বয়স, কাম, জগৎ সকল।
রাসাদিলীলায় তিন করিল সফল। চরিতামৃত।
রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীরললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত। চরিতামৃত
কাম-সাগরে হাম সহজই নিমগন
কাম পুরাবি তুহুঁ রাই। গোবিন্দ দাস।

'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন
কাম-গায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন। চরিতামৃত।

পরব্রহ্ম-স্বরূপ কৃষ্ণের এই কামক্রীড়া কাহাদিগকে লইয়া ?

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি
স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। ব্রহ্মসংহিতা।

এঁরা কৃষ্ণের নিজেরি মানসী প্রতিমা। আনন্দচিন্ময়রসস্বরূপিণী হ্লাদিনী শক্তি। শত শত প্রকাশ মূর্ত্তি ব্রজাঙ্গনা।

চড়ি গোপীর মনোরথে মনমথের মন মথে
নাম ধরে মদনমোহন।

রাসাদি লীলা যিনি করেন তিনি মদনও ন'ন, মদনের অধীনও ন'ন। তিনি মদনমোহন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হইতেছে। তিনি এক এবং সর্ব্বপ্রকার স্বার্থনিরপেক্ষ। তবু তিনি চিদচিৎ বিবিধ বিচিত্র ভূতনিবহ সৃজন করেন। ধারণ করেন। তাঁহার এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে। তিনি স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াও নানারূপে প্রকাশিত হন। তিনি অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, চন্দ্র। তিনি জল। তিনি প্রজাপতি। তিনি স্ত্রী, তিনি পুরুষ। তিনি কুমার, তিনি কুমারী। তিনি নীল পতঙ্গ। তিনি শ্যামবর্ণ লোহিতচক্ষু শুক পক্ষী। তিনি বিদ্যুদ্‌বান্ মেঘ। তিনি ঋতু। তিনি সমুদ্র।

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।

অতি সরল অতি সহজ অর্থ। কিন্তু এই পরিস্ফুট অর্থের পশ্চাতে আর একটী অর্থ আছে—যাহা গোপন নহে। কিন্তু তবু নয়ন গোচর হয় না। ভাষ্যকারও কোনো দিকে কোন ইঙ্গিত করেন নাই, কিন্তু তবু একটা রহস্য আছে। প্রাণে তাহার অস্ফুট প্রতিবিম্ব পড়ে। একটী রূপের ছটা, একটী রসের প্রতিভাস। একটী সুকোমল মধুরিমা। পতঙ্গ, বিহঙ্গ, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঋতু, সমুদ্র। এই ছয়টী বিষয়ের কথা ? না একের কথা ? ছয়ই। কিন্তু একস্থানে মিলিয়া গিয়াছে। বেশ আশ্চর্য্যই। ছয় নয়। এক। ভাষ্যকার বলিতেছেন পতঙ্গ মানে ভ্রমর। প্রজাপতিও হইতে পারে। সুন্দর কথা। নীলবর্ণের ভ্রমর। বিনোদ ভ্রমর। বড় চঞ্চল। উড়িয়া উড়িয়া ফুলে ফুলে মধু পান করে! কিন্তু ব্রহ্ম। গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপ বধূটীবিটং ব্রহ্ম। মহাভাবাবেশময়ী কৃষ্ণবিরহিনী শ্রীমতী রাধিকা একদিন একটী নীল ভ্রমরকে চরণপ্রান্তে পতিত দেখিয়া কৃষ্ণের প্রতিনিধি মনে করিয়া বলিয়াছিলেন—মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং। মধুপ, শঠের সখা, শঠই। আমার পদ তুমি স্পর্শ করিও না।

সকৃদধর সুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।

নিজের মোহিনী অধরসুধা ফুলবালাগণকে একবার মাত্র পান করাইয়া তুমি যেমন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, কৃষ্ণও আমাদিগকে তেমনি করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে।

কৃষ্ণ সুনীল মধুপের মত। সুনীল মধুপই। নীলই। কিন্তু কেবল নীল নয়। হরিতও। শ্যামও। শ্যামং হিরণ্যপরিধিং। লোহিতাক্ষঃ। নয়নের কোণদ্বয় লৌহিত্যবর্ণ। কিন্তু শুধু তাই নয়। চোখ দুইটী লাল। সুরার নেশায় বিভোর যে! ব্রজাঙ্গনাগণের মাদকতাময়ী প্রেমমদিরা নিরন্তর পান করে। সুতরাং লোহিতাক্ষঃ। তড়িদ্‌গর্ভ। সুন্দর সজল মেঘ। বুকভরা বিদ্যুৎ। নৌমীড্য তেহভ্রবপুষে।

কৃষ্ণ নব জলধর-জগৎ শস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃতধার। চরিতামৃত।

নবীন ঘন নীরদের অন্তর পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে দীপ্তরাগোজ্জলা সৌদামিনী—জ্যোতির্ম্ময়ী শ্রীরাধা। দুরন্তপ্রেমজ্বালাময়ী। অনুক্ষণ তীক্ষ্ণকিরণচ্ছটা স্ফুরিত হইতেছে। সুতরাং তড়িদ্‌গর্ভঃ। ঋতবঃ। গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন আমি ঋতুসমূহের মধ্যে বসন্ত ঋতু।

মাসানাং মার্গশির্ষো হহ মৃতুণাং কুসুমাকরঃ।

বসন্ত ঋতুরাজ। সকল ঋতুর প্রাণ। রাধাতন্ত্রে শ্রীরাধাকে বলা হইয়াছে ঋতুমার্গ-প্রদর্শিনী। শ্রীরাধা ঋতুসমূহকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন। শ্রীরাধাকে অনুসরণ করিয়া—শ্রীরাধার রূপের আকর্ষণে প্রেমের আকর্ষণে কৃষ্ণই চিরকাল চলিতেছেন। শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য সম্পদ্ স্পর্শ করিবার জন্য, ঋতুচক্ররূপে নানাভাবে নানাবেশে কৃষ্ণেরই অভিযান—দেশে দেশে কালে কালে।

তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগবিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ। গোবিন্দলীলামৃত

শ্রীরাধার রূপরাশি দিকে দিকে বিকাশিত। বনে বনে কুঞ্জে কুঞ্জে প্রতিতরু লতায় রাধা-রূপ স্ফুরিত হইতেছে।—ললিতোজ্জ্বলা রূপমূর্ত্তিখানি অতি চঞ্চলা। নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলে। কৃষ্ণ সেই সম্মোহন সৌন্দর্য্যে পাগল হইয়া ঋতুচক্র পথে, ঋতু চক্ররূপে, নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছ। সুতরাং ঋতবঃ। সমুদ্রাঃ।

তারুণ্যামৃত পারাবার তরঙ্গ-লাবণ্য সার
নিয়ত আবর্ত্তভাবোদ্গাম।

কৃষ্ণই সমুদ্র। সরসামস্মি সাগরঃ। অখিলরসামৃতসিন্ধু। ভাবসিন্ধু। প্রেমসিন্ধু! মাধুর্য্যসিন্ধু। ললিতলীলারত্নাকর। অনন্ত আনন্দসুধানিধি। সুতরাং সমুদ্রাঃ।

কৃষ্ণপ্রেমসুখসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়। চরিতামৃত।

এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইব মন্ত্রটীর বহিরর্থ পতঙ্গ বিহঙ্গ মেঘ বিদ্যুৎ ঋতু সমুদ্র। কিন্তু অন্তরর্থ কৃষ্ণ। বেদোপনিষদের অনন্ত ব্রহ্মরশ্মির অন্তরালে অন্তরালে নব-নব-নর্ম্মবিলাসী কৃষ্ণের ছায়ালোকের লুকোচুরি খেলা। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ। ঐ শুভ্র জ্যোতির দিগদিগন্তব্যাপী দীপ্তির মধ্যে মধ্যে, প্রতিনিয়ত প্রতিভাসিত হইতেছে একটী সুনীলোজ্জ্বল জ্যোতির আভাস—

বসন্ত দিনের কত স্পন্দনে কম্পনে,
নিশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে !—রবীন্দ্র।

কৃষ্ণ একা ন'ন। সঙ্গে সঙ্গে চিরসঙ্গিনী নানারঙ্গিণী রাধা।

মুখর-নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে।
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে.
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।—রবীন্দ্র।

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমে এই যুগল-তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। ভূতসমূহের রস অর্থাৎ সার পৃথিবী। পৃথিবীর রস জল। জলের রস ওষধি। ওষধির রস পুরুষ। পুরুষের রস বাক্। বাক্যের রস ঋক্। ঋকের রস সাম। সামের রস প্রণব। প্রণবই ব্রহ্ম। সকল রসের রস। সএষ রসানাং রসতমঃ।

বাগেব ঋক্। প্রাণঃসাম। ওমিত্যেতদক্ষর মুদ্গীথঃ।
তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্বাকচ প্রাণশ্চ। ঋক্‌চ সামচ।

সুতরাং ব্রহ্মের বুকের মধ্যে পাইতেছি একটী মিথুন। একটু যুগল ভাব।

তদেতন্মিথুনম্ ওম্ ইতি এতস্মিন্ অক্ষরে
সংসৃজ্যতে। যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো
বৈ তৌ অন্যোন্যস্য কামং।

অতএব পরব্রহ্মের অন্তরতম প্রাণের মধ্যে রহিয়াছে—একটী পরস্পর কামনা পরিপূরণের ব্যাপার।

রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীরললিত।
নিরন্তর কাম ক্রীড়া যাহার চরিত।

এই কাম হইতেই ব্রহ্মাব্যক্তের ভগবদভিব্যক্তি। এই কামের অর্থ পরমতম প্রেম। রসানাং রসতমঃ। যুগল কাম-রতি-তত্ত্ব। ব্রহ্মের নিগূঢ়তম রহস্য।

আপয়তো বৈ তৌ অন্যোন্যস্য কামং।
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি-রূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা-নাম পুরাণে বাখানে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে কথাটী ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন স্তরে বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম পূর্ণনাম। সর্ব্ব শক্তি সর্ব্বৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু প্রজাপতিরূপে যেন তাহার বড় অভাব। কিসের যেন আকাঙ্ক্ষা। আনন্দস্বরূপের আনন্দের অভাব। বড় নিঃসঙ্গ। বড় একা।

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।
সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ।

* * * *

স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে।
স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ
সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ত্ততঃ
পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্।

একাকী ব্রহ্মের আনন্দ নাই। তিনি সঙ্গিণী কামনা করিলেন। এক ছিলেন। দুই হইলেন। যুগল হইলেন। তারপর বহু হইলেন।

এই শ্রুতির সঙ্গে—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতির্হ্লাদিণী শক্তিরস্মা
দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

প্রভৃতি বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইবে।

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি।"

* * * *

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ।

* *

কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে। চরিতামৃত

ব্রহ্মের প্রাণে যখনই কামনা তখনি রাধার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। অশেষ কামনা। অনন্ত লীলাবিকাশ। অনন্ত মিলন বিরহ।

কাম সাগরে হাম সহজই নিমগন
কাম পূরাবি তুহুঁ রাধা।

বেদে কৃষ্ণ নাই এ কথা যাঁহারা বলেন তাহারা কৃষ্ণ কি বিষয়, কৃষ্ণলীলা কি ব্যাপার বিশেষ কিছু জানেন না। যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া, মন প্রাণ দিয়া বুঝিয়াছেন এবং বেদোপনিষদও গভীর ভাবে এবং বিস্তৃত ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন—তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা এ বিষয়ে উপদেশ চাই। গোস্বামিপাদগণ কৃষ্ণ বিষয়ে সকল তত্ত্বেরি মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণলোকে বসিয়া কৃষ্ণ কথা লিখিয়াছেন। আমাদের মত জ্ঞানহীন ভক্তিবিরহিত লোকের পক্ষে গোস্বামিগণের বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা খুব কঠিন। দ্বিতীয়ত তাঁহারা নিজেরাও সর্ব্বতোদর্শী ঋষি ছিলেন। অনুসরণও করিয়াছেন প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের চিন্তা ধারা এবং লিপিপ্রণালী। ঐতিহাসিক অনুশীলন এবং অনুকল্পনা তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ঐতিহাসিক-পন্থায় প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সে যুগে পৃথিবীতে কোথাও আধুনিক বিধানের ঐতিহাসিক যুক্তিপ্রণালীর উদ্ভব হয় নাই। এতদ্ব্যতীত ভাগবত ধর্ম্ম এবং আধ্যাত্মিক সাধনা সম্বন্ধে সকল বিষয়েরি সর্ব্বোত্তম সিদ্ধান্ত গোস্বামিপাদগণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন সনাতন-ধর্ম্ম-শাস্ত্র এবং গোস্বামিশাস্ত্র আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মানুসারে নূতন করিয়া বুঝিতে হইবে। একটী সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্র

পড়িয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণাবতরণের কথা বলিতেছিলাম। বিশ্বে এবং বিশেষতঃ ভারতবর্ষে কৃষ্ণের আবির্ভাব কোন যুগে কেমন করিয়া হইয়াছে—কৃষ্ণবিষয়ক শাস্ত্র সমূহ কথন প্রকাশিত হইয়াছে? কৃষ্ণলীলা এবং কৃষ্ণপ্রেমসাধনা কেমন করিয়া বিকাশ ও বিস্তার লাভ করিয়াছে। গোলোকাধিপতি কৃষ্ণের বসুদেবাত্মজ-রূপে অবতীর্ণ হওয়ার রহস্য কি, সমগ্র ভারতের আধ্যাত্মিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কৃষ্ণের স্থান কোথায়—ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের বিস্তৃত বিচার ও গবেষণা করিতে হইবে। কৃষ্ণাবতরণ যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলেই সংসার-সাগরোত্তরণ পন্থার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতিমামেতি সোঽর্জ্জুন ॥

যক্ষের ধন

[সাহিত্য-সেবীর সংগ্রহ]

কাল—বিচার

প্রভুপাদ নীলকান্ত গোস্বামী-কৃত

কাল তিন ভাগে বিভক্ত; অতীত কাল, বর্ত্তমান কাল ও ভবিষ্যৎ কাল। আমরা যখন ব্যাকরণ পাঠ করি তখন পুস্তকে এই অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল অভ্যাস করিয়াছিলাম। সেই ব্যাকরণের কথাই পরম্পরায় প্রচারিত হওয়ায় অশিক্ষিত নরনারীগণও কালের তিন নাম কার্য্য কালে বাক্যদ্বারা ব্যবহার করিয়া থাকে। যে কাল গিয়াছে তাহার নাম অতীত কাল, যাহা রহিয়াছে তাহা বর্ত্তমান কাল এবং যাহা আসিবে তাহাই ভবিষ্যৎ কাল। কালের অতীতাবস্থা, বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ অবস্থায় ঐ তিন নামের ব্যবহার হয়। কিন্তু কালের কি অবস্থান্তর আছে? কালের অবস্থান্তর নাই, আমরা অভিনিবেশের সহিত চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি কালের অবস্থান্তর নাই। কাল যায়ও না আসেও না। কাল স্থাণুর ন্যায় অটল, অচল। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জগতের কিছুই ছিল না, নিবিড় অন্ধকারাবৃত সত্তামাত্র ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তখনও কাল ছিল, এখনও কাল আছে এবং যখন মহাপ্রলয়ে আবার জগৎ অন্ধকারময় হইয়া যাইবে তখনও কাল থাকিবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে কাল যে অবস্থায় ছিল এখনও সেই অবস্থায় আছে এবং পরেও ঠিক সেই অবস্থায় থাকিবে। কাল অতীত হয় না, কাল ভবিষ্যৎ হয় না, কাল কেবলই বর্ত্তমান। যুগ গিয়াছে আবার আসিবে, বৎসর গিয়াছে আবার আসিবে, ঋতু গিয়াছে আবার আসিবে, মাস গিয়াছে আবার আসিবে, পক্ষ গিয়াছে আবার আসিবে, তিথি গিয়াছে আবার আসিবে এবং বার গিয়াছে আবার আসিবে। এইরূপ কত প্রহর, কত দণ্ড,

কত পল, কত বিপল, কত অনুপল গিয়াছে, আবার কতই আসিবে, কিন্তু প্রকৃত কাল যায়ও নাই, আসিবেও না, কাল একই ভাবে,—অপরিবর্ত্তিতরূপে পূর্ব্বে ছিল, বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং পরেও থাকিবে ; কালে যুগ নাই, কালে বৎসর নাই, কালে ঋতু নাই, কালে মাস নাই কালে পক্ষ নাই, কালে তিথি নাই, কালে বার নাই, কালে প্রহর নাই, কালে দণ্ড নাই, কালে পল নাই, কালে বিপল নাই, কালে অনুপল নাই। কালের নাম কাল।

কালে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নাই ; মানবগণ আপন আপন ব্যবহারের সুবিধার জন্য চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের গতি এবং তদনুসারে পৃথিবীর অবস্থান্তর দেখিয়া, অদ্বিতীয় ও অটল কালের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ কল্পনা করিয়া লইয়াছে। তাহা না করিলে মানবের দৈনন্দিন ব্যাপার চলে না। রাত্রিকাল, প্রাতঃকাল, সন্ধ্যাকাল, শীতকাল, গ্রীষ্মকাল প্রভৃতি কালাংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত কালে রাত্রি নাই, প্রভাত নাই, সন্ধ্যা নাই, শীত নাই, গ্রীষ্মও নাই ; কাল একই প্রকার।

তবেই বুঝিতে পারা যায় যুগ, বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস, বার, তিথি প্রভৃতির সঙ্গে কালের কোনও সম্বন্ধ নাই ; ১টা, ২টা, ৩টা প্রভৃতি নির্দ্দেশের সঙ্গেও কালের সংস্রব নাই। যেমন রাত্রিকালে যে গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছে সে গৃহ আলোকিত এবং তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী দীপশূন্য গৃহ অন্ধকারময়, কিন্তু দুই গৃহেই একই কাল বর্ত্তমান, সেইরূপ পৃথিবীর যে অংশে অনির্ব্বাপ্য মহাপ্রদীপ প্রভাকর পরিদৃশ্যমান সেই অংশ আলোকিত ; সেই অংশের অধিবাসিগণ, সেই কালাংশকে দিবাকাল বলে এবং ঐ সময়ে পৃথিবীর যে অংশে সূর্য্য অদৃশ্য সেই অংশের অধিবাসিগণ কালের সেই অংশকেই রাত্রিকাল বলিয়া থাকে। অতএব্য কালে দিবারাত্রিও নাই, সুতরাং কাল যায়ও না আসেও না। পরমাণু হইতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত, তৃণ হইতে বনস্পতি পর্য্যন্ত এবং কীটাণু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ ও সমস্ত জীবই যায় ও আসে এবং অনুক্ষণ তাহাদের অবস্থান্তর হয়। জীবের এ গমনাগমন এবং জড়পদার্থের অবস্থান্তর দেখিয়াই কার্য্যকুশল মানবগণ ব্যবহারিক সুবিধার নিমিত্ত অটল কালাংশের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। অতত্ত্বদর্শী সাধারণ লোকেই মনে করিয়া থাকে,—কাল যাইতেছে ও আসিতেছে—কিন্তু আপনারাই যাইতেছে ও আসিতেছে ইহা একবার ভাবিবার অবকাশ পায়না বা অবকাশ করিয়া লয় না। এক ব্যক্তি আপন অদৃষ্ট বশতঃ শত বৎসর পরমায়ু লইয়া জন্মিয়াছে ; একবার সূর্য্য উদিত হইয়া অস্তগমনের পর পুনরুদিত হইলেই তাহার নির্দ্দিষ্ট শত বৎসর পরমায়ুর একদিন করিয়া গেল,—সে ব্যক্তি মৃত্যুর অভিমুখে এক পা অগ্রসর হইল,—যমের বাড়ী একটু নিকট হইয়া আসিল। কলিকাতা হইতে পায়ে হাঁটিয়া বর্দ্ধমান যাইলে নিজ বাটী হইতে এক পা ফেলিলেই বর্দ্ধমান একটু নিকট হইবেই ; সেইরূপ একবার সূর্য্য ঘুরিয়া আসিলেই মানুষের মৃত্যু-মুখ একটু নিকটবর্ত্তী হইবেই হইবে। বিরুদ্ধদর্শী মানুষ ইহা দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝে না। বুঝে না বলিয়াই কেহ ধনলাভে অনুক্ষণ ধাবমান, কেহ বা ধনমদে প্রতিনিয়ত উন্মত্ত হইয়া আত্মোন্নতির উপায় অনুসন্ধান করে না।

পৃথিবী অনুক্ষণ ঘুরিতেছে ইহা স্থির, কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে সূর্য্যকেই ঘূর্ণায়মান দেখিতে

পাওয়া যায় সেইরূপ পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থই অনুক্ষণ গমনশীল, কিন্তু ভ্রান্তি প্রযুক্ত লোকে অচল কালকেই গতিশীল বলিয়া মনে করে।

আমাদের মনে হয়, কোনও এক চিন্তাশীল তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ ঈশ্বর, কাল, জগৎ ও জাগতিক পদার্থ সমুদয়কে আদর্শ স্বরূপ অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীতে পাশাক্রীড়া পরিচালিত করিয়াছেন। পাশাক্রীড়ার প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের হৃদয়ে কালসম্বলিত ভুবন-রহস্য স্বতঃই সমুদিত হইয়া থাকে। এখন চারিজন ক্রীড়ক চারিদিকে বসিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীনকালে দুই জনেই ক্রীড়া করিতেন, ইহা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এবং বিদর্ভরাজ নলের পাশাক্রীড়ায় বুঝিতে পারা যায়। পাশাক্রীড়ায় দুই জন ক্রীড়ক, এক ক্রীড়াসন কম্বল, এক বিচিত্র বর্ণের গৃহাঙ্কিত ক্রীড়াকর (ছক) তিরি, টারদানা, কচে বারো, পোহা বারো প্রভৃতি সাঙ্কেতিক চিহ্ন বিশিষ্ট তিন পাশক, শ্বেত, পীত, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণের চারিটি করিয়া ষোলটিক্রীড়নক (ঘুঁটি) দেখিতে পাওয়া যায়। দুই জন ক্রীড়ক স্ব স্ব নিক্ষিপ্ত পাশকত্রয়ের উর্দ্ধপৃষ্ঠস্থ সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিয়া তদনুসারে ক্রীড়নক অর্থাৎ ঘুঁটি সকলকে পরিচালিত করিয়া থাকেন। ক্রীড়কের চালনায় ঘুঁটি উঠে, নামে, মরে, বাঁচে, উঠিয়া নামে, নামিয়া উঠে, মরিয়া বাঁচে এবং বাঁচিয়া মবে। ক্রীড়া সমাপ্ত হইলে ছক তুলিয়া ফেলা হয়, কম্বলাসন পাতাই থাকে, ক্রীড়ক তাহাতে বসিয়া কার্য্যান্তরে প্রবৃত্ত হন।

মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্তসূত্রে বলিয়াছেন, "লোকবত্তুলীলা কৈবল্যম্" অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় পরব্রহ্মের লোকবৎ লীলা অর্থাৎ খেলা মাত্র। এখন আমরা শাস্ত্রানুসারে বুঝিতে পারি, এই জগদ্ব্যাপার পরমেশ্বরের ক্রীড়া মাত্র। নিষ্কর্ম্মা লোকেই ক্রীড়াপ্রিয় হইয়া থাকে; তাঁহার ন্যায় নিষ্কর্ম্মা আর দ্বিতীয় নাই, সুতরাং তিনি প্রতিনিয়তই এই ক্রীড়া লইয়াই আছেন। তাঁহার সমকক্ষ ক্রীড়ক কেহই নাই, সেই জন্য মূর্খের শিরোমণি অজ্ঞানকে প্রতিপক্ষ করিয়া খেলিতেছেন। তিনি জ্ঞানময় আর অজ্ঞান অজ্ঞানই, সুতরাং নিজেই তাহাকে চা'ল বলিয়া দিতেছেন। কখনও অজ্ঞানকে হারাইতেছেন, কখনও বা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার কাছে হারিতেছেন। নতুবা সে দেখিতে আসিবে না, সুতরাং তাঁহার খেলাও বন্ধ হইয়া যাইবে। তিনি কালরূপ সুবিস্তৃত কৃষ্ণবর্ণ কম্বলাসনে বসিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। ভূরাদি সপ্তলোক তাঁহার ক্রীড়াকর (ছক); এক একটি লোক এবং তদন্তর্গত দেশ প্রদেশ সকলই বিচিত্র বর্ণাঙ্কিত গৃহ; সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন গুণই তাঁহার পাশকত্রয়; জীবের স্বকর্ম্মাজ্জিত ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্টই ঐ পাশকত্রয়ের চতুস্পৃষ্ঠস্থ ক'চে বারো পোহা বারো প্রভৃতি সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার জীবই চতুর্বর্ণের ক্রীড়নক (ঘুঁটি)। জীবগণ স্বকর্ম্মফলে জ্ঞান ও অজ্ঞান কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অনুক্ষণ অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে; কালরূপ কৃষ্ণবর্ণ কম্বল পাতাই আছে, তাহার নড়ন চড়ন নাই।

অনন্ত বিসারিত নিত্যবর্ত্তমান কালের বক্ষঃস্থলে ভাসমান ধরামণ্ডলের অবস্থান ভেদে যখন শৈত্যবাহুল্য হয়, সমস্ত জীব অসহ্য শীতে কম্পিত হইতে থাকে, অবিকৃত কালের সেই অংশকে শীতকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। আবার যখন, মন্দ মন্দ মলয়ানিলের সংবীজনে সমস্ত জীব পরমারাম অনুভব করে, এবং আম্র মুকুলের সুগন্ধে চতুদ্দিক আমোদিত করিয়া তুলে, অনন্তকালের সেই অংশ বসন্তকাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আবার যখন প্রখর

রবিকিরণে ভূমণ্ডল সন্তপ্ত হইয়া উঠে আমরা অচঞ্চল কালের সেই অংশকে গ্রীষ্মকাল বলিয়া থাকি। এই পৃথিবীর অবস্থান ভেদে পৃথিবীরই অবস্থা ভেদ হয়; কাল যেমন তেমনিই থাকে। পৃথিবীর অবস্থারই পরিবর্ত্তন হয়, কালের পরিবর্ত্তন নাই। যেমন অনন্ত অচল বিমলাকাশে নীল পীত লোহিতাদি বিচিত্রবর্ণের জলদজাল উদিত হইতেছে, বায়ুবেগে বিচরণ করিতেছে, আবার ক্ষণকাল পরেই বিলীন হইয়া যাইতেছে, কিন্তু অনন্ত আকাশের উদয় নাই, বিচরণ নাই, বিলয়ও নাই; মেঘের সঙ্গে আকাশের কোন সম্বন্ধই নাই। সেইরূপ কালবক্ষে ভ্রমণশীল ধরামণ্ডলের ভাবান্তরে কালের ভাবান্তর হয় না। পৃথিবীর বর্ত্তমানভাব অতীত হইয়া ভবিষ্যদ্‌ভাব আসিতেছে, আবার তাহাই অর্থাৎ ভবিষ্যদ্‌ভাবও ক্ষণিক বর্ত্তমান হইয়া অতীত হইতেছে; কাল যাইতেছে না, আসিতেছেও না; একভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন আকাশস্থ মেঘের বিচিত্র বর্ণ দেখিয়া লোকে নীলাকাশ, পীতাকাশ লোহিতাকাশ ইত্যাদি বিশেষণের ব্যবহার করিয়া থাকে, সেইরূপ কালোদিত বিচিত্র পার্থিব ভাব অবলোকন করিয়া শীতকাল, বসন্তকাল, গ্রীষ্মকাল প্রভৃতি কালাংশের নামকরণ করিয়া থাকে মাত্র। বস্তুতঃ কালে শীত নাই, বসন্ত নাই, গ্রীষ্ম নাই; কোন অবস্থান্তরই নাই। কাল ত একই; কাল ত দুই নাই; অতএব যদি কালে শীত বসন্তাদি থাকিত, তবে এক সময়ে পৃথিবীর সকল স্থানেই শীত হইত, এক সময়ে পৃথিবীর সকল স্থানেই বসন্ত হইত এবং এক সময়ে পৃথিবীর সকল স্থানেই গ্রীষ্ম হইত। কিন্তু তাহা ত হয় না। যদি কালে দিবারাত্রি থাকিত তবে এক সময়ে পৃথিবীর কোথাও দিবা, কোথাও রাত্রি হইতে পারিত না। আমরা কালের যে অংশকে দিবা বলিতেছি, ঠিক এই অংশকেই ভিন্নদেশস্থ লোকে রাত্রিকাল বলিতেছে। এমন কি, আমরা যে মুহূর্ত্তে এই কালের বিষয় আলোচনা করিতেছি, এই মুহূর্ত্তকেই পৃথিবীস্থ কেহ কেহ প্রাতঃকাল বলিতেছে, কেহ কেহ মধ্যাহ্নকাল বলিতেছে, কেহ কেহ সায়ং কাল বলিতেছে। ফলতঃ দিবারাত্র্যাদি ও সায়ং প্রাতরাদি যে যে কল্পিত বিভাগে অবিভাজ্য কালকে বিভাগ করা হইয়াছে সেই ভাগের এক একটি ভাগ একই সময়ে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও আছেই আছে। দূর দেশের কথা দূরে থাকুক, এই ভারতবর্ষের মধ্যেই একই সময়ে কোথাও শীত কোথাও গ্রীষ্ম; কলিকাতার লোকে যে সময়কে ১০॥ সাড়ে দশটা বলিতেছে, জব্বলপুরের লোক ঠিক সেই সময়কেই ১০টা বলিতেছে। কাল ত একই—তবে এরূপ হয় কেন?

আবার আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, নরলোকাদি ভিন্ন ভিন্ন লোকে বৎসরাদি কল্পিত কালাংশের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। মনুষ্য-পরিমাণের এক বৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র অর্থাৎ এক দিবস। উত্তরায়ণের ছয় মাস দেবতাদের এক দিবা ভাগ এবং দক্ষিণায়নের ছয়মাস তাঁহাদের রাত্রিভাগ। ইহাই দেবতাদের এক দিন; এইরূপ দিনের ৩৬৫ তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে এক বৎসর; এইরূপ বৎসরের ১০০ একশত বৎসর তাঁহাদের পরমায়ু। দেবতাদের এইরূপ বৎসরের ১২০০০ দ্বাদশ সহস্র বৎসরে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ হয়। তন্মধ্যে সত্যযুগের পরিমাণ দিব্য চারি হাজার বৎসর এবং চারিশত বৎসর সন্ধ্যা ও চারিশত বৎসর সন্ধ্যাংশ; অতএব দিব্য চারি হাজার আটশত বৎসরে সত্য যুগ। ত্রেতা যুগের পরিমাণ

দিব্য তিন হাজার বৎসর এবং তিনশত বৎসর সন্ধ্যা ও তিনশত বৎসর সন্ধ্যাংশ, অতএব ত্রেতাযুগের পরিমাণ দিব্য তিন হাজার ছয়শত বৎসর। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দিব্য দুই হাজার বৎসর এবং দুইশত বৎসর সন্ধ্যা ও দুইশত বৎসর সন্ধ্যাংশ, অতএব দ্বাপর যুগের পরিমাণ দিব্য দুই হাজার চারিশত বৎসর। কলিযুগের পরিমাণ দিব্য এক হাজার বৎসর এবং একশত বৎসর সন্ধ্যা ও একশত বৎসর সন্ধ্যাংশ, অতএব সর্ব্বসমেত দিব্য এক হাজার দুইশত বৎসর কলিযুগ হইয়া থাকে। এই যে দিব্য দ্বাদশ সহস্র পরিমিত চারি যুগ, এইরূপ চারিযুগ একাত্তর বার হইলে এক একজন মনুর অধিকার সমাপ্ত হয়; এইরূপে চৌদ্দজন মনুর অধিকার সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মার রাত্রিকাল; এইরূপ দিবারাত্রিতে ব্রহ্মার এক দিবস। এইরূপ দিবসের তিনশত পঁয়ষট্টি দিবসে ব্রহ্মার এক বৎসর এবং এইরূপ বৎসরের একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলেই প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মার পরমায়ু অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতিকালের পরিমাণ যেরূপ প্রলয়কালের পরিমাণও সেইরূপ। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতিকাল ও প্রলয়কাল সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের পলক অর্থাৎ নেত্রের উন্মেষ ও নিমেষ। আমাদের দৃষ্টিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কালের মধ্যে কতশত যুগ যুগান্তর হইয়া যায়, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের পলকে পলকে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। তবেই আমরা দেখিতে পাই, নরলোক হইতে উচ্চ ও উচ্চতর লোকে কাল ক্রমশই সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিতেছে। এই সম্বন্ধে একটি গল্প আমাদের মনে হইল।

একদিন কৈলাসে নন্দী মহাদেবের পদসেবা করিতেছে, এমন সময়ে সুদূর হইতে তুমুল আনন্দধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। নন্দী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর! ওসব কিসের শব্দ হইতেছে? মহাদেব উত্তর করিলেন, রাবণ নামে আমার এক পরম ভক্ত আছে, আমি তাহাকে লঙ্কার রাজসিংহাসনে বসাইলাম, সেই জন্যই এই আনন্দধ্বনি হইতেছে। নন্দী ইহা শুনিয়া অভিমানভরে বলিলেন, ঠাকুর! রাবণকে ভক্ত বলিয়া লঙ্কার রাজা করিলেন; আর আমি চিরকাল পা টিপিয়া মরিলাম; কিন্তু আমার ভাগ্যে কিছুই হইল না। আশুতোষ হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা তোমাকেও একটা ঐ রকম রাজ্য দিব। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে—এমন সময়ে একটা বিষম শোকসূচক রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। নন্দী জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর! ও আবার কিসের শব্দ? মহাদেব বলিলেন, আমার সেই ভক্ত রাবণ মরিয়া গেল, তাই লঙ্কায় হাহাকার রবে রোদনধ্বনি উঠিয়াছে! নন্দী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, রাবণ এইমাত্র রাজা হইল, আবার এখনই মরিয়া গেল? ঠাকুর! আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি রাজা হইতে চাই না; চিরকাল আপনার পা টিপিব;—সেই ভাল।

আমরা এখন বুঝিলাম, কাল অজ্ঞানের যম,—দুর্ব্বলের বৈরী,—নরমের বাঘ। কাল যতই উপরে উঠিতেছে, যতই জ্ঞানের নিকট যাইতেছে,—ততই কাহিল হইয়া পড়িতেছে। অবোধ মানবের নিকট কালের বৎসর নামক—সুদীর্ঘ অব্দ সত্ত্বাধিক দেবলোকে অতি ক্ষুদ্র একটি দিন মাত্র। ব্রহ্মার কাছে মানবীয় নয়শত চুরানব্বই চতুর্যুগ একটি দিবা ভাগ। ঈশ্বরের কাছে জগতের স্থিতি কালটা নেত্রোন্মীলন মাত্র। আমরা ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত মহাদেব ও নন্দীর গল্প তুলিয়াছি, গল্পটী ঐতিহাসিক হিসাবে মিথ্যা হইলেও পারমার্থিক সত্য। রামায়ণে

ও পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় রাবণের রাজ্যকাল দশ সহস্র বৎসর। ইহা অত্যুক্তিপ্রিয় প্রাচীন কবিদিগের অতিরঞ্জন বাক্য হইলেও রাবণ যে, বহুকাল ধরিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রাবণের রাজ্যকাল যতই দীর্ঘ হউক, মহাদেবের পদসেবায় যথেষ্ট নহে। নন্দী দেবাদিদেবের পদসেবা আরম্ভ করিয়াছে এমন সময়ে রাবণ রাজা হইল, আবার পদসেবা সমাপ্ত না হইতেই মরিয়া গেল। মর্ত্ত্যলোকবাসী রাবণের নিকট কালের দীর্ঘায়ত অঙ্গ জ্ঞানরূপী মহাদেবের কাছে জীর্ণ শীর্ণ—অতি অল্প,—পদসেবায় কুলায় না। অতএব কাল অজ্ঞানের যম, দুর্ব্বলের বৈরী, নরমের বাঘ।

আবার এক রহস্য।—আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, বৈকুণ্ঠ ও গোলোকাদি ভগবদ্ধামে বা পরব্রহ্মের নিকটে কাল একেবারেই নাই। ভগবদ্ধাম বা পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত একই প্রকার। প্রকৃতির অন্তর্গত সমুদায় লোকেই, সকল পদার্থেরই জন্ম, জন্মান্তর অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম হ্রাস ও ধ্বংস এই ছুইপ্রকার অবস্থা পর্য্যায়ক্রমে হইয়াই থাকে; কিন্তু অপ্রকৃত ভগবদ্ধামে এ সকল নাই। এই সকল অবস্থান্তর নাই বলিয়াই সেখানে কালের অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ মনুষ্যগণ যাহা দেখিয়া কালের কল্পনা করিয়া থাকে তাহাই নাই—সুতরাং কালের উপলব্ধিই নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি অজ্ঞানের কাছেই কাল অতি করাল কৃতান্তস্বরূপ এবং উত্তরোত্তর জ্ঞানাধিক্যের নিকট উত্তরোত্তর কৃশ হইতে কৃশতর; সুতরাং পূর্ণজ্ঞানের নিকট কাল অস্তিত্ব-বিহীন,—সেখানে কালের নামগন্ধও নাই। ভগবদ্ধাম জ্ঞানানন্দময়, সেখানে কালের কথাও থাকিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে দেবকীস্তবের মধ্যে এই একটি শ্লোক আছে। দেবকী ভগবান্‌কে বলিতেছেন,—

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো
চেষ্টামাহুঃস্বেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াং—
স্তন্ত্বেশানং ক্ষেম ধাম প্র পদ্যে॥

"অর্থাৎ হে মায়াধীশ! পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত নিমেষাদি বৎসর পর্য্যন্ত এই যে সুমহান্ কাল, পণ্ডিতেরা এই কালকে তোমার চেষ্টা মাত্র বলিয়া থাকেন। ঐ কাল নামক তোমার চেষ্টাতেই বিশ্বসংসার সর্ব্বদাই চেষ্টাশীল রহিয়াছে। অতএব তুমি সকল-মঙ্গলের আলয়; আমি তোমার শরণাগত হইলাম। অতএব আমরা দেখিলাম,—পরিবর্ত্তনশীল জগতের চেষ্টা বা ক্রিয়াই কাল-নামে অভিহিত হইয়া থাকে; কাল বলিয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট বস্তু বিশেষ নাই। সাংখ্যকার বলিয়াছেন, 'সপরিণম্য ক্ষণমপ্যব্যতিষ্ঠতে', অর্থাৎ জগৎ পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়া ক্ষণকাল থাকে না। জগতের কি চেতন কি অচেতন সমস্ত পদার্থেই, কি অন্তরে কি বাহিরে, অনুক্ষণ কোনো না কোনো ক্রিয়া করিতেছেই। ঐ ক্রিয়াই কখনো অতীত, কখনো বর্ত্তমান, কখনো ভবিষ্যৎ হইতেছে, ক্রিয়ার ঐ তিন প্রকার অবস্থাই কার্য্য সুবিধার জন্য কল্পিত কালে কল্পিত হইয়াছে। অতএব মানবগণ সাবধান হইয়া চলিও। তোমার নির্দ্দিষ্ট অস্তিত্বই যাইতেছে,—সূর্য্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তোমার যে অস্তিত্বটুকু অকার্য্যে অবহেলিত হইবে তাহা আর ফিরিয়া পাইবে না। এই পরম সত্য স্মরণ রাখিয়া সর্ব্বদা স্বকার্য্যসাধনে যত্নবান্ হও।

কবীরের দোঁহা।

অষ্টবিকার—মোহ।

মোহ ফন্দ সব ফন্দিয়া, কোই ন সকৈ নিরবার।
কোই সাধুজন পারখী, বিরলা তত্ত্ব বিচার ॥ ১

সব পড়েছে মোহের ফাঁদে, রেহাই না পায় কোন জন।
তত্ত্ব বিচার ক'রে সাধু পরখ করে দু' একজন ॥ ১

প্রথম ফন্দ সব দেবতা, (সুখ) বিলসৈঁ স্বর্গ নিবাস।
মোহ মগন সুখ পাইয়া, মৃত্যুলোক কী আস ॥ ২

প্রথম মোহ সব দেবতা, সুখে বিলাস স্বর্গ বাস।
মোহে মগন পায় তাহে সুখ, মর্ত্ত্য লোকের প্রধান আশ ॥ ২

দুজে ঋষি মুনিবর ফন্দে, তাসে রুচি উপজায়।
স্বর্গলোক সুখ মানহীঁ, (ফিরি) ধরনি পরতহৈঁ আয় ॥ ৩

দ্বিতীয় ফাঁদ ঋষিমুনি, রুচি জন্মে তা'দের ধ'রে।
মান চাহে স্বর্গ নিবাস, (ফিরে) ধরায় আসে বারে বারে ॥ ৩

কুরুক্ষেত্র সব মেদিনী, খেতী করে কিসান।
মোহ মিরগ সব চরি গয়া, আস নরহী মলিয়ান ॥ ৪

কুরুক্ষেত্র সব মেদিনী, কৃষাণ তাহে ফসল করে।
মোহমৃগ চরে গেল, আর কি ফসল আসবে ঘরে ॥ ৪

কাহু জুগতি ন জানিয়া, কেহি বিধি বাঁচে যুখেত।
নহিঁ বন্দগী নহিঁ দীনতা, নহিঁ সাধু সঙ্গহেত ॥ ৫

কোন উপায় জানে না যে, কেমন করে ফসল বাঁচে।
নাইক প্রণাম নাই দীনতা, সাধুর সনে প্রেম না আছে ॥ ৫

জব ঘট মোহ সমাইয়া, সবৈ ভয়া আঁধিয়ার।
নির্মোহ জ্ঞান বিচারিকৈ, কোই সাধু উতরৈ পার ॥ ৬

পুঞ্জীকৃত মোহ যখন, সকল পূরে অন্ধকারে।
জ্ঞানের বিচার ক'রে বিরল, মোহরহিত সাধু তরে ॥ ৬

সলিল মোহকী ধার মেঁ, বহি গয়ে গহীর গম্ভীর।
সুচ্ছম মছরী সুরত হৈ, চঢ়িহৈ উলটে নীর ॥ ৭

ভীম গরজন প্রচণ্ড তেজ, মোহের স্রোতে বয়ে যায়।
মৎস্যরূপী সুরত তাহে উল্টা পথে উর্দ্ধে ধায় ॥ ৭

সতীত্ব

(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

সপ্তম অধ্যায়

কাশীধাম

হিন্দুর জীবন সংস্কারময়। কাশীধাম মুক্তিক্ষেত্র এ সংস্কার এই পাশ্চাত্য সভ্যতালোকে আলোকিত হিন্দুর মন হইতে একেবারে লোপ পায় নাই। এখনও কত লোক শেষের দিন স্মরণ করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া এই মহাতীর্থে আসিয়া জীবনের শেষের দিন অপেক্ষা করিতেছেন। কাশীধাম যেমন ধার্ম্মিকের আশাপ্রদ নগরী সেইরূপ পণ্ডিতগণেরও বিদ্যালাভের প্রধান পীঠস্থান। এখনও কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব, কি গাণপত্য সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট লাভার্থ এই তীর্থে সমাগত হইয়া থাকেন। আবার এই সংসারে পুরুষের ঘোরতর প্রতারণায় যে সকল নারী অপার অনুতাপ দগ্ধ হইতে থাকেন তাঁহারা পতিত-পাবনী বিধৌত এই কাশীধামেই শান্তি অন্বেষণে আসিয়া থাকেন। কাশীধাম জাতি বিচার জানেনা এখানে দেবতার ও যে আদর পতিতারও সেই আদর। মুক্তিক্ষেত্র মুক্তির জন্য—তাতে ভেদ বিচার নাই। পতিতাও মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে যে আদর পান—একজন ধনকুবের বা অদ্বিতীয় পণ্ডিতও সেই শ্মশানে সেই আদর পাইয়া থাকেন। সেই দাতার শিরোমণি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে পতিতারও যে আদর—একজন পবিত্রাচারী ব্রাহ্মণেরও সেই আদর। এই তীর্থ বঙ্গদেশ বাসীর বিশেষ আদরের জিনিষ। এইখানেই অগণিত পণ্ডিত শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী নদীয়াবাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া নিজ পাণ্ডিত্য গৌরব বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া স্তব করিয়াছিলেন। (১) * এইস্থানেই ভট্টপল্লী নিবাসী তারাচরণ তর্করত্নের সহিত দয়ানন্দ সরস্বতীর

---

(১) গৌরাঙ্গদেব হরিনাম করেন শুনিয়া প্রকাশানন্দ তাঁহাকে প্রথমে এত অবজ্ঞা করেন যে নিমাইর কান্দনের শব্দ পাছে কাণে যায় তাহার প্রতিষেধকল্পে সরস্বতী মহাশয় দোর বন্ধ করিতেন। একদিন নিমাই তাঁহার বাটীর নিকট দিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে যান—প্রকাশানন্দ আর দরজা বন্ধ করিয়া থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া আসিয়া যে ভাব দেখান তাহার চিত্র নিম্নোদ্ধৃত কীর্ত্তনটিতে অঙ্কিত হইয়াছে :—

সুধা মাখা হরিনাম নিমাই কোথা হতে এনেছ।
হরিনাম শুনে আমার হৃদয় বীণা আপনি বেজে উঠেছে
কত দিন ধরে শুনেছি এ নাম
কখনত এমন করে নাই প্রাণ
কি যেন কি এক নব ভাবের উদয়
হৃদয় মাঝারে হতেছে।
কেটে গেছে মম নয়নেরই ঘোর
গলে গেছে কঠিন পাষাণ হৃদয় মোর

বিচার হয়। এই স্থানেই সেদিন কাশী নরেশ মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার উপযুক্ত সেবা করেন। বঙ্গবাসী, পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিয়া যাইও না—ভুলিয়া গেলে দৃষ্টান্তের অভাবে আপনার মাপ কাটিটি হারাইয়া ফেলিবে। আর সে পৈতৃক ধন পাইতে পারিবে না।

আজ কয়দিন হইল কাশীধামে উত্তরাখণ্ড হইতে একটি সাধু আসিয়াছেন। কাশীবাসী সন্ত মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষভাবে একটা নাড়াচাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই ব্যস্ত ভাবে কাজে যাইতেছেন ও বলিতেছেন বহুদিন পরে মহাত্মাসঙ্ঘের শ্রীশঙ্কর স্বামী আসিয়াছেন। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলে মহাত্মাসঙ্ঘের সাধুগণ প্রায়ই উত্তরাখণ্ড ছাড়িয়া নিম্নদেশে আগমন করেন না। তাঁহাদের কার্য্যাবলী তাঁহাদের ভক্তগণ দ্বারাই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। আজ স্বামিজীর আবির্ভাবে তাই কাশীবাসী সন্তগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কি যেন কি একটা বড় কাজ পড়িয়াছে তাই মহাত্মাকে স্বয়ং আসিতে হইয়াছে। সে কাজটা কি এই প্রশ্নই সন্তগণকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষতঃ এবার একটা নূতন জিনিষ দেখা যাইতেছে—স্বামিজীর সঙ্গে এবার তাঁহার পত্নী রোহিণী দেবী আসিয়াছেন। বড় দীর্ঘজীবী দম্পতি হইলেও—এখন উভয়েই বেশ শক্ত আছেন।

একদিন প্রাতঃকালে সন্ধ্যাকার্য্য সমাপন করিয়া স্বামিজী বসিয়া আছেন এমন সময় এক যুবক আসিয়া প্রশ্ন করিলেন "ঈশ্বর সাকার না নিরাকার"। স্বামিজীকে প্রায়ই এইরূপ তর্কের মীমাংসার জন্য প্রশ্ন করা হয়। তিনি প্রায়ই মৌন থাকেন বা দুএকটা অবান্তর কথা বলিয়া প্রশ্ন কর্ত্তাকে নীরাশ করেন। আজকার প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী যুবককে বলিলেন "বাপুহে! তিন দিন সন্ধ্যার সময় বিশ্বনাথের মন্দিরে আরতি দেখিয়া তারপর আমার নিকট আসিও তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।" যুবক যেন সে কথায় তত সুখী হইলেন বলিয়া বোধ হইল না—কিন্তু উপায় নাই। স্বামিজীর নিকট আর দ্বিতীয় কথা বলিবার তাঁহার সাধ্য হইল না। আবার এক যুবক আসিয়া প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"বিবাহ করা উচিত কি না"। স্বামিজী সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া যুবকের কে কে আত্মীয় আছেন তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। যুবক যতই তাহার প্রশ্নের উত্তর চাহেন স্বামিজী ততই অবান্তর কথায় যুবককে নিরস্ত করেন। এইরূপে সময় যাইতেছে এমন অবস্থায় রোহিনী দেবীর আহ্বানে স্বামিজী আসন ত্যাগ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। ইতি-মধ্যে স্বামিজীর ভক্তগণ ও আগন্তুক জনমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত মত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

কি যেন কি এক উজ্জ্বল আলোকে আমায় লইয়ে চলেছে।
কে যেন বলিছে মোর কাণে কাণে
তোদের পারের উপায় হ'ল এত দিনে
ঐ প্রেমেরই পশরা শিরোপরে ধরি
প্রেমের ঠাকুর এসেছে।
আজ হতে নিমাই তোমার সঙ্গে যাবো
জ্ঞানেরই গৌরব কভু না করিব
আমার সব ছেড়ে ফেলে হরি হরি বলে
নাচিতে বাসনা হতেছে ॥

১জন। আচ্ছা! মহাশয়, শুনেছি শ্রীশঙ্কর স্বামী একজন মহাত্মা। তবে তাঁর সঙ্গে স্ত্রীলোক কেন? আবার শুনি নাকি উনি উঁহার বিবাহিতা পত্নী?

শিষ্য। মহাত্মাসঙ্ঘের সকলেই বিবাহিত। স্বামিজীর সঙ্গে এবার তাঁহার পত্নী রোহিণী দেবী আসিয়াছেন। নিশ্চয় বিশেষ কোন কারণ আছে।

১জন। সাধুর সঙ্গে স্ত্রী সম্বন্ধ, দেখিলেই কেমন বোধ হয়—স্ত্রীলোক নিয়ে কি করে সাধু হওয়া যায়, বাপু! তা ত শুনি নাই এবং বুঝিও না।

২য় জন। শুধু তাই নয়; আবার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যত পতিতা ও গণিকা প্রায়ই স্বামিজীর আশ্রমে যাতায়াত করিতেছে। এত রমণী সংসর্গ! কি জানি কি ভাব বাবা!

শিষ্য। যে যেরূপ কাচের আয়না ধরে সে সেইরূপ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখে। আপনাদের যাঁর যেরূপ কাচ—তিনি তদ্রূপ চিত্র দেখিবেন। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। যাঁর চিত্ত পড়িতেছে তাঁর এতে কিছু যায় আসে না। তিনি নির্ব্বিকার থাকেন।

১জন। ও মহাশয়! ওরূপ ছেন্দো কথায় বজরুকী প্রচার করা সহজ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রমাণে সাধুত্বের পরিচয় দেওয়া যায় না।

শিষ্য। শ্রীশঙ্কর স্বামী সাধু বলিয়া পরিচয় লাভে ব্যাকুল নহেন। তিনি শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্যও কাশীতে আগমন করেন নাই। আপনাদিগকে কোন অনুরোধ করা হয় নাই যে তাঁহাকে সাধু বলিয়া আপনারা মানুন বা পূজা করুন।

২য় জন। বড় গর্ব্বের কথা বলা হইল না কি? শ্রীশঙ্করস্বামী মহাত্মা ইহা বহুকালের প্রসিদ্ধ কথা।—তাই তাঁর আগমনে বিস্তর বিদ্ধলোক তাঁহার দর্শনে এখানে আসিয়া থাকে তাঁহাদের মনে যত প্রকার বাধা আছে সে তাহার মীমাংসার পূর্ণ উত্তর পাইলে তবে তাঁহার তৃপ্তি পাইবেন।

১জন। উনি আমাদের মনুষ্য মধ্যেই ধরিতেছেন না—দেখিতেছে না!

শিষ্য। আপনারা আমার প্রতি অবিচার করিতেছেন। আপনাদের প্রশ্নের কি উত্তর দিব বলুন। প্রশ্নের মূল নাই। সাধু, অসাধু এ সব বিচার মুখের কথায় হয় না। শিষ্যের সংখ্যা গণনায় সাধুত্বের পরিচয় হইলে মহাত্মাগণের মধ্যে কেহই সাধু নহেন—বিবাহ না করাই সাধুত্ব হইলে মহাত্মাগণ কেহই সাধু নহেন। আগে জীবন কি ও ইহা লইয়া কি করিতে হইবে তাহা না বুঝিলে ধর্ম্মের প্রশ্নাদি করা জেঠামী মাত্র। যুক্তি তর্কের দ্বারা যাহা যুক্তিতর্কের অতীত পদার্থ তাহা জানা যায় না। এই জন্যই এত দর্শনশাস্ত্র, এত ব্যাখ্যা—এত ভাষ্য এত টীকা এত টিপ্পনী। যদি জিনিস জানা যেতো, তবে এত সব শব্দজালের অবতারণায় কোন প্রয়োজন হইত না।

ইতি মধ্যে স্বামিজী ব্যস্ত হইয়া বহির্গত হইলেন ও শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া আদেশ দিলেন —"শীঘ্র কাশী রাজঘাট ষ্টেশনে গমন কর—একটী ভদ্রলোক ও একটী বালিকা আজ কয়দিন হইতে পীড়িত অবস্থায় তথায় পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আমার এই আশ্রমে আনয়ন কর।" শিষ্য দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বামিজীর আজ্ঞা পালনে তৎপর হইয়া আসন ত্যাগ করিলেন। অন্যান্য লোকগুলি স্বামিজীর ব্যস্ত ভাব দেখিয়া ক্রমে ক্রমে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন।

পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিত প্রমথনাথ ও মাধুরী বহুকষ্টে আজ কয়দিন হইল কাশীধামে আসিয়াছেন। পথক্লেশে উভয়েই অত্যন্ত পীড়িত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় রাজঘাট ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী

ধর্ম্মশালাতে আশ্রয় লইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের উভয়কে দেখে এমন কোন লোক নাই। যে সকল সমাজ পতিতা রমণী রোহিণীদেবীর পূজার জন্য স্বামিজীর আশ্রমে যাওয়া আসা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রমথনাথও মাধুরীর অবস্থা দেখিয়া আজ প্রাতে রোহিণীদেবীকে সংবাদ দেন। ইহারই ফলে স্বামিজীর আশ্রমাভ্যন্তরে গমন ও শিষ্যকে রাজঘাটে প্রেরণ।

শিষ্য রাজঘাট ধর্ম্মশালায় আসিয়া অনুসন্ধানে জানিলেন যে হরিহর পাণ্ডার বাড়ীতে উভয়কে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। হরিহর পাণ্ডার নাম শুনিবামাত্র শিষ্য চমকিয়া উঠিলেন। তিনি জানিতেন যে উক্ত পাণ্ডা অতিশয় মন্দলোক ও ঘোরতর প্রতারণা পরায়ণ। বাড়ীতে আশ্রয় দিব বলিয়া লইয়া গিয়া সে কত যাত্রীর এইরূপে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। বিশেষতঃ কোন ধনী বা ভদ্রলোক পাইলে তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। অতিশয় যত্ন সহকারে যাত্রীদের লইয়া গিয়া তাহার এক প্রশস্ত প্রাসাদে আশ্রয় দেয় এবং যাত্রীদের সকল বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিয়া দেয়। যাত্রীরা প্রথমে কোন সন্দেহ করিতে পারে না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহারা তীর্থযাত্রা শেষ করিয়া সেস্থান ত্যাগ করিতে চাহে সেইক্ষণেই পাণ্ডার আর দেখা পাওয়া যায় না। ফটকের নিকট পাহারা মোতায়েন কাহারও ভিতরে প্রবেশের উপায় নাই বা যাত্রীদের বাহির হইবার উপায় নাই। চীৎকার করিলেও বাহিরে শোনা যায় না—অতিশয় বড় প্রাঙ্গন। পাণ্ডার চরগণ যাত্রীদের নিকট প্রভূত অর্থের দাবী করে ও যদি না দিতে পারে তবে তাদের নিকট হাণ্ডনোট বা অন্য কোন দলিল লেখাইয়া লইতে চাহে। যদি যাত্রীগণ ইহাতে স্বীকৃত না হয়েন তবেই আর বাহির হইতে হুকুম নাই। শিষ্য এসকল ঘটনা জানিতেন বলিয়া একবারে উৰ্দ্ধশ্বাসে স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলেন। স্বামিজী শুনিয়া একটু বিশেষরূপ চিন্তিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন সদানন্দের আশঙ্কাই বোধ হয় ফলতঃ সত্য হইয়া পড়ে। আমি যথাসময়ে কাশীতে আসিয়াও প্রমথনাথ ও তাঁহার কন্যাকে পাণ্ডাদের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। যাহা হউক স্বামিজী তখন একটু চিন্তা করিয়া শিষ্যকে বলিলেন "আচ্ছা! এ বিষয়ে সত্বরই ব্যবস্থা হইতেছে, তিনি একটু অপেক্ষা করুন।"

হরিহর পাণ্ডা খুব বড়লোক ধন কুবের। পুলিশ তাহার হাতের মুঠোর ভিতর। কাজেই পুলিশের সাহায্যে প্রমথনাথ ও মাধুরীর সন্ধান ও উদ্ধার করা এক প্রকার অসম্ভব ইহা স্থির করিয়া স্বামিজী অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে হরিহর পাণ্ডার লোকেরা প্রমথ ও মাধুরীকে যত্ন করিয়া আরোগ্য করিবে তাহার পর তাহাদের নিকট অর্থ শোষণার্থ নিজ পন্থা অবলম্বন করিবে। সুতরাং উভয়ের জীবন জন্য স্বামিজীর কিছুমাত্র ভাবনা হইল না। তিনি যে সকল নারী রোহিণী দেবীর নিকট আসিত, বিশেষ যে নারী সর্ব্বপ্রথমে প্রমথ ও মাধুরীর পীড়ার সংবাদ দেয় তাহা দ্বারাই উভয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

হরিহর পাণ্ডার যাত্রীগণ যেখানে যেখানে থাকে সেই সেই স্থানেই রমণীগণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ৪।৫ দিন যাবৎ চেষ্টাতেও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। হঠাৎ এক সন্ধ্যার সময় বিশ্বনাথ মন্দিরে রুদ্রপাঠ ও আরতি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই দেখা গেল জনতার ভিতর এক ভদ্রলোক একটী ১০।১২ বৎসরের বালিকা সহ আরতি দর্শন অভিপ্রায়ে মন্দিরে আসিয়াছেন। যে রমণী প্রমথনাথ ও মাধুরীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন তিনিও সেই সময় মন্দিরে আরতি দর্শনার্থ

আসেন। তিনি বেশ চিনিতে পারিলেন ইহাদের দুই জনকেই তিনি পীড়িত অবস্থায় ধর্ম্মশালায় দেখেন ও এদের সঙ্গে যে বলবান পাণ্ডা রহিয়াছে, এ হরিহর পাণ্ডার লোক। রমণী আশ্বস্ত বোধ করিলেন বটে কিন্তু কি উপায়ে প্রমথনাথ ও মাধুরীকে পাণ্ডার কবল হইতে উদ্ধার করা যাইবে তাহা ভাবিয়া একটু বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে মন্দির জনতায় পূর্ণ হইয়া গেল। যথা সময়ে বিশ্বনাথের আরতি আরম্ভ হইল জনতা নিস্তব্ধভাবে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন এরই মধ্যে সেই রমণী প্রমথনাথের নিকট গিয়া যেই কথা বলিতে আরম্ভ করেন অমনি সেই রক্ষক পাণ্ডা তাহাকে গলা ধরিয়া টানিয়া দূরে সরাইয়া দিল। রমণী যেই ক্রোধান্বিতা হইয়া পাণ্ডার আচরণের প্রতিবাদ করেন অমনি পাণ্ডা তার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া দিতে গেল। হঠাৎ জনতার মধ্য হইতে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত যুবক (যাহাকে স্বামিজী আরতি দর্শনে ঈশ্বর সাকার বা নিরাকার স্থির করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন) লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পাণ্ডার উপর আক্রমণ করিয়া পাণ্ডাকে চমকিয়া দিল। হরিহর পাণ্ডার লোককে এরূপে আক্রমণ করে বিশ্বনাথের মন্দিরে কেন কাশীতে পাণ্ডা মহলে এরূপ লোক ছিল না। যুবক পাণ্ডার হস্ত হইতে রমণীকে মুক্ত করিয়া দিলে পাণ্ডা ও যুবকের সহিত ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ করিল। জনতা উত্তেজিত হইয়া রমণী মুখ-নির্গত প্রমথনাথ ও মাধুরীর উপস্থিত বিপদ সঙ্কুল অবস্থার কথা শুনিয়া যুবকের সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইল এবং সকলে সাহায্য করিয়া প্রমথ ও মাধুরীকে সেই রমণীর সহিত মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিল। পাণ্ডাজী সিদ্ধিসেবী—চৌবেজী হইয়াও বেশ বুঝিলেন যে মৎস্যাহারী বঙ্গবাসী যুবক বলবান এবং যতটা সহজে "বাঙ্গালী কো" জান কাবু করিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহা হইল না। পাণ্ডাজী নিজেই তখন বাবুজী বাবুজী করিতে লাগিলেন। সেই যুবক তখন উচ্চৈঃস্বরে উপস্থিত জন মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি কাশী গয়া ও প্রয়াগ তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি—স্ত্রী কন্যা লইয়া তীর্থ যাত্রায় অনেক বিপদ। বিশেষতঃ গয়া ও প্রয়াগে। পাণ্ডাবেশ ধারী পশুগুলির অকার্য্য কিছুই নাই। হায়! হায়! কত রমণী রত্ন এই পশুদের অত্যাচারে সর্ব্বস্ব হারা হইয়াছে, কত গৃহস্থ ছলনার পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া প্রাণের দায়ে কত টাকা দিয়াছে বা টাকা দিব বলিয়া হাণ্ডনোট লিখিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। অতএব আপনারা খুব সাবধানে পাণ্ডাদের বিশ্বাস করিবেন—এই পাণ্ডাদের অত্যাচার নিবারণার্থ পুরুষ ও নারী দুই প্রকারেরই স্বেচ্ছা সেবকের দল প্রস্তুত হওয়া দরকার হইয়াছে এবং ক্রমে হইতেছে। আপনারা যে তীর্থে যাইবেন—তথায় সর্ব্বপ্রথমে এই সেবক সঙ্ঘের অনুসন্ধান করিয়া তার পর কোন পাণ্ডার আশ্রয়ে যাইবেন, ইত্যাদি।

এদিকে প্রমথনাথ ও মাধুরী সেই রমণীর সঙ্গে বরাবর স্বামিজীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে রমণীকেও স্বামিজীর আশ্রমে বা কেন যাইতেছে এইরূপ প্রশ্ন করিবার অবসর তাঁহারা পান নাই। রমণীর নিকট পাণ্ডাদের শঠতার বিষয় সংক্ষেপে শুনিয়া তাঁহারা ভয়ে একবারে উতলা হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বামিজী তাহাদের উভয়কে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া একটু বিস্মিত হইলেন—কিন্তু বিশেষ কিছু না বলিয়া মাধুরীকে রোহিনীদেবীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া প্রমথ-নাথের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

প্রমথনাথ সংক্ষেপে তারাপুর হইতে রওনা হইবার পর পথে যাহা যাহা দেখিয়াছিল

তাহা বলিয়া গয়ার পাণ্ডাদের অত্যাচারের কথা নিবেদন করিলেন এবং সেই জন্যই কোন পাণ্ডার ওখানে উঠেন নাই ইহাই বলিলেন। যাহাহোক এই রমণীর সাহায্যে ও একটি যুবকের সদাশয় আচরণে তাঁহার এই মহা বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন ইহা বলিলেন। স্বামিজী বিশেষ কিছুই মতামত প্রকাশ করিলেন না। কেবল মাত্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—পাণ্ডাদের ও মোহান্তদেয় অত্যাচারে পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রগুলি একবারে যাইতে বসিয়াছে। কাল-ধর্ম্ম এতই প্রবল যে ইহার প্রতিকারের উপায় দেখিতেছিনা। যাহা হুউক এখন সদানন্দ না আসার জন্য তোমাদের আর কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। প্রমথনাথ হঠাৎ সদানন্দের নাম শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন—তবে কি সদানন্দঠাকুর স্বামিজীকে কোন সংবাদ দিয়া আমাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন—তাঁহার সহিত কি এই স্বামিজীর কোন সম্বন্ধ আছে। যাহা হুউক বোধ হইতেছে ইহার ভিতর কোন বিশেষ রহস্য আছে।

রাত্রি অধিক হওয়ায় স্বামিজী সকলকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া আসন হইতে উঠিয়া ভিতরে গেলেন এবং মাধুরীও পিতার নিকট আনীতা হইলেন। মাধুরী পিতার নিকট ছাড়া অন্যত্র শয়ন করেন না।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রমথনাথ ও অন্যান্য দু চারিজন ভদ্রলোক স্বামিজীর আসনের নিকট আসিয়া বসিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সেই যুবকও আজ স্বামিজীর দর্শনার্থে পুনরায় আসিয়াছেন। এখনও স্বামিজী বাহির হয়েন নাই। প্রমথনাথ সেই যুবককে দেখিয়াই চিনিলেন এবং সে যুবকও প্রমথনাথকে স্বামিজীর আশ্রমে দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া গেলেন। প্রমথনাম প্রথমেই কৃতজ্ঞতা ব্যঞ্জক ভাষায় অভ্যর্থনা করিলে উভয়ের মধ্যে সামান্য কথাবার্ত্তা হইল।

প্রমথনাথ। মহাশয়ের কৃপায় পাণ্ডার অত্যাচার হইতে গতকল্য রক্ষা পাইয়াছি।

যুবক। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন প্রয়োজন নাই। আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমি করিয়াছি। পাণ্ডাদের জাতি কুলনাশা অত্যাচার দেখিয়া—মনুষ্যত্ব থাকিলে কেহই স্থির থাকিতে পারে না। আপনার সঙ্গের বালিকা বোধ হয় আপনারই কন্যা।

প্রম। আজ্ঞা হাঁ। বালিকা আমার কন্যা। আমরা পিতা-পুত্রীতে তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হই। আমাদের শুভার্থী একজন বহুদর্শী ব্রাহ্মণের আমাদের সহিত এই কাশীধামে আসিয়া মিলিবার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সময় অতীত হইয়া গেলেও তিনি আসিয়া পৌছেন নাই। আমরা অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছি। গয়ার অত্যাচাবে তীর্থযাত্রায় কি বিপদ তাহা বুঝিয়াছি—এবং তজ্জন্য সেই বহুদর্শী ব্রাহ্মণের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছি মনে হইতেছে। দেখি এই স্বামিজী—কি করেন ইহার সহিত যেন সেই ব্রাহ্মণের পরিচয় আছে বলিয়া বোধ হইল।

যু। আপনি সৌভাগ্যবান। এই স্বামিজী সোজা লোক নহেন। ইহার পরিচয় আমাকে দিতে হইবে না। অতি অল্প দিনের মধ্যেই আপনি সব বুঝিবেন।

এমন সময় স্বামিজী আসনে আসিয়া বসিলেন। সেই যুবক তখন গিয়া পদদ্বয় ধারণ করতঃ প্রণাম করিলেন। স্বামিজী বলিলেন—"ওঠ! আজ কয়দিন তোমাকে দেখি নাই বিশ্বনাথের

আরতি দর্শন করিয়াছিলে।" যুবক নিরুত্তর অথচ তাঁহার চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রমথনাথ ও অন্যান্য লোকগুলি এ রহস্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একটু উৎকণ্ঠিত হইলেন।

স্বামিজী। আপনারা হয় ত এই ঘটনার রহস্য ভেদ জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। শুনুন এই যুবক অতিশয় মেধাবী ও দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত। তর্ক করিয়া ইহাকে কেহই ঈশ্বর সাকার বা নিরাকার বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই। ইহার তর্ক প্রবৃত্তির নিরাশ না হওয়ায় ইনি কয়দিন পূর্ব্বে আমার নিকট আসিয়া ঈশ্বর সাকার বা নিরাকার এই প্রশ্ন করেন। আমি ইহাকে অন্ততঃ তিনদিন বিশ্বনাথের আরতি দেখিয়া আমার নিকট পুনরায় আসিতে বলি। ইনি আজ ৫।৭ দিনের মধ্যে আর আমার নিকট আসেন নাই। আজ আসিয়াছেন। যে চক্ষে ও কপোল দেশে বিদ্যার অহংকার ফুটিয়া বাহির হইতেছিল আজ সেই চক্ষে ও কপোল দেশে বিনয়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রশ্নচ্ছটায় যাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল তোলপাড় হইতেছিল—আজ সেই হৃদয় কি একটা শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। বিশ্বনাথের ইচ্ছায় বোধ হইতেছে ইহার প্রশ্নের মীমাংসা ইনি লাভ করিয়াছেন।

যুবক। করযোড়ে উচ্ছাসের সহিত বলিতে লাগিলেন :—

শাস্ত্র শব্দজাল মানবে পণ্ডিত করে
খ্যাতি, যশ, অভিমান, বিষময় ফল ধরে।
কোথা শান্তি হাহাকারে হৃদয় কাতর করে
ঢাকিতে মানের টাটি বঞ্চনা আশ্রয় করে
বিষ্ণু পাদোদ্ভব বারি যেই জন বাঞ্ছা করে
উচ্ছিষ্ট সে শাস্ত্র জ্ঞান তারে তৃপ্তি দিতে নারে
রাশি রাশি শাস্ত্রচয়—অসার ভস্মের প্রায়
সে সব নাড়িলে পরে মনে মলিনতা হয়
নিষ্কাম যে কর্ম্মরত জ্ঞান তার পদানত
শান্তির বিশাল বট কর্ম্মবীজে অঙ্কুরিত
পবিত্র হৃদয় ক্ষেত্রে সেই আলো জ্বলে তার
উজ্জল প্রভায় তার দূরে যায় অন্ধকার
আমিত্ব ব্যষ্টিকে ছাড়ি সমষ্টিতে ব্যাপ্ত হয়
আমিত্বের সুবিস্তারে আমিত্বের লয় হয়।

হে সর্ব্বজ্ঞ! আমার প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি। আর জিজ্ঞাসা নাই। এখন আপনার চরণে আশ্রিত।

স্বামিজী। তুমি কি বিবাহিত?

যুবক। কয় বৎসর পূর্ব্বে আমার বিবাহ হইয়াছিল।

স্বা। চুপ করিলে যে—পত্নী কি জীবিতা নহেন?

যু। আমাদের গৃহে ডাকাত পড়ে—সেই সূত্রে আমরা সকলেই কোনরূপে প্রাণ বাঁচাই—কিন্তু তার পর হইতে আমার সেই কিশোরী পত্নীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্বামিজী। তবে কি তিনি অপহৃতা না মৃতা ?

যুবক। ঠিক বলিতে পারি না। বিশেষ ওবিষয়ে আমার আর কোন জিজ্ঞাসা নাই।

স্বামিজী। তোমার জিজ্ঞাসা না থাকিতে পারে কিন্তু আমার আছে। তোমার বাড়ী কোথায়?

যুবক। মেদিনীপুর জেলায়। সেখানে এখন আমার আর কোন সম্পর্ক নাই। সবই পরিত্যাগ করিয়াছি। বাবা অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং আমি ২৪ বৎসরের মধ্যে ষড় দর্শনে ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি শেষ করি। বাবা জীবিত থাকিতেই আমার মনে মনে এক ঘোরতর সংশয় হয় যে বাবা এত বড় জ্ঞানী হইয়াও কেন শালগ্রাম শিলা ও শিবলিঙ্গ পূজা করেন। বাবা মারা যাবার অল্প দিন মধ্যেই আমাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে—ঘর দরজা অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দেয়, এবং আমার দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কা পত্নীকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাবার মৃত্যু ও এই দুর্ঘটনাতে মন উদাসীন ভাব ধারণ করে এবং আজ ৪।৫ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমন করিয়া বেড়াইতেছি। হঠাৎ আপনার কাশীধামে আগমন বার্ত্তা শুনিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর পাই কিনা দেখিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছিলাম।

স্বামিজী। তোমার পত্নীর আর কোন অনুসন্ধান কর নাই ?

যুবক। যতদূর সম্ভব খোঁজ করিয়া ছিলাম কেহই কিছু বলিতে পারেন নাই।

স্বামিজী। সেই কিশোরীর কি নাম ছিল ?

যুবক। ষোড়শী।

স্বামিজী আর বিশেষ কিছু না বলিয়া কার্য্যব্যপদেশে ভিতরে গমন করিলেন। যাইবার সময় প্রমথনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গেলেন—এই যুবকের সাহায্যে তীর্থ ক্ষেত্রাদি দর্শনের বিশেষ সুবিধা হইবে। উপস্থিত জনমণ্ডলী নির্ব্বাক ভাবে এই সব কথা শুনিতে ছিলেন এবং স্বামিজী উঠিয়া যাবার পর একে একে উঠিয়া নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

প্রমথ। মহাশয় আপনার জীবন ত অদ্ভুত দেখছি।

যুবক। প্রত্যেকেরই জীবনে কিছু না কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কেহ সে গুলি লক্ষ্য করেন কেও করেন না। এখন চলুন আমরা গঙ্গাস্নান করিয়া বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার দর্শন করিয়া আসি।

প্রমথনাথ ব্যস্ত হইয়া মাধুরীকে সঙ্গে লইয়া যুবকের সহিত গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইলেন।

এ দিকে রোহিনীদেবীর সহিত স্বামিজীর যেরূপ কথা বার্ত্তা হইল তাহার কিয়দংশ পাঠককে উপহার দেওয়া হইতেছে।

রোহিণী। ভাগ্যিস্ ঐ পতিতা রমণী আমাদের সংবাদ দিয়াছিল তাই প্রমথনাথও মাধুরী ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল। তুমি পতিতাদের উদ্ধারের জন্য কোন একটা উপায় কর। আহাঃ, ওরা সমাজের অত্যাচারে একেবারে যায় যায় হইয়াছে।

স্বামিজী। সদানন্দ আসিলে এ বিষয়ে বিবেচনা করা যাইবে। সে এ বিষয়ে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। আমার এখন মনে হইতেছে সদানন্দের নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিয়া এখানে না পৌঁছানের বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। যাহা হউক প্রমথনাথ ও মাধুরীকে রক্ষা করা হইয়াছে। প্রমথনাথ সদ্বংশ জাত—ব্রাহ্মণ সন্তান ও শাস্ত্র জ্ঞানে খুব পণ্ডিত ।

রোহিণী। আবার ঐটুকু মেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে কত স্তব কত গল্প শুনাইল। মেয়েটার ভিতরে যেন আর একটা কে আসিয়া কথা বলে।

স্বা। মাধুরী কুমারী ও অতি সরলা। পিতার প্রতি অতিশয় অনুরক্তা। বাবার কাছে থেকে ঐরূপ কতক গুলি স্তবাদি অভ্যাস করিয়াছে। সদানন্দ উহাকে পাত্রস্থ করিবার জন্যই এ দিকে আসিতেছেন।

রো। ঐ যে লোকটী এদের উদ্ধার করিয়া দিল ও যেন আবার একটা পাগল দেখছি কথার ভাবে বোধ হ'ল ওর পত্নী নাই—তাই সে বোধ হয় পাগল।

স্বা। উহার নাম গৌরীনাথ শর্ম্মা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কেমন আসিয়া জুটিল দেখ—উহার সাহায্যে প্রমথনাথ ও মাধুরীর তীর্থ ভ্রমণ সহজসাধ্য হইবে। এবং ভবিষ্যতের মধ্যে যে রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাহাও ক্রমে প্রকাশ পাইবে; গৌরীনাথের পত্নী বোধ হয় মারা যায় নাই—আমি ঠিক জানি না, তবে মনে হচ্ছে এই সকল ঘটনার মধ্যে কি একটা রহস্য রহিয়াছে।

রো। তোমার অনুমান প্রায়ই ঠিক হয় এত দীর্ঘকাল দেখে দেখে এই বুঝেছি। আমার ধারণা সকল বিষয় তুমি জানিয়াও যেন কিছু জান না এইরূপ আচরণ কর।

স্বা। ঘটনাচক্রে যাহা যাহা আসিয়া উদয় হয় সেই সেই বিষয় অনুসরণ করিয়া চলি। দেখ কখনও ভাবি নাই যে আবার এত শীঘ্র কাশীতে আসিতে হইবে। যদি না আসিতাম তবে সদানন্দের চিরবাঞ্ছিত একটি মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে ঘোরতর ব্যাঘাত ঘটিত। সকলই বিশ্বনাথের ইচ্ছা।

রো। আচ্ছা! বাছা সদানন্দের মঙ্গল হউক, তাকে দেখিবার জন্য আমারও মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

স্বা। নারীর প্রাণের নিবেদন বিশ্বনাথের শ্রীচরণে নিশ্চয়ই পৌছায় এবং তিনি তাহা পূর্ণ করেন। সদানন্দ বিপদগ্রস্ত হইলেও শীঘ্রই আসিবেন।

ক্রমশঃ।

রটনা—প্রপাগাণ্ডা

শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ শেঠ

উপর্য্যুপরি কয়েকটী ঘটনা পর্য্যালোচনায় দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মতিগতির যে নিদর্শন ফুটিয়া উঠিতেছে তাহার আলোচনার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা। ঘটনা কয়টী এক একটা দিক্ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই মনে হয়। প্রথমে ঘটনাবলীর পরিচয় দান উচিত।

১। গত পৌষ মাসের প্রথমার্দ্ধে বোম্বাই প্রদেশের জলগাঁও সহরে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর একটী সম্মেলন হয়। তিনদিন ধরিয়া ঐ সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সমগ্র ভারত হইতে প্রায় দেড় সহস্র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বখান্দেশ জেলার আবালবৃদ্ধবনিতা এই সম্মেলনে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়। নাথোম্বারা-

ধীশ মহন্ত সভাপতি হন। দক্ষিণ ভারতের চারিজন বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্য আমন্ত্রিত উপস্থিত ছিলেন। শত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ধনী মানী বণিক্ সভাক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করেন। ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় সনাতনহিন্দুর পক্ষে কর্ত্তব্য কি তাহার বিচার বিবেচনার জন্য ঐ সম্মেলন বৈঠক বসে। বলা বাহুল্য যে ইংরাজী শিক্ষিত উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার শ্রেণীর লোকও যথেষ্ট ছিলেন। ঐ সম্মেলনের সংবাদ সংগ্রহের জন্য সংবাদপত্রের কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। অধিবেশনের প্রত্যেক দিনের কার্য্যাবসানে তার যোগে এই কলিকাতা সহরের অমৃতবাজার পত্রিকা, বসুমতী, হিতবাদী, বঙ্গবাসী প্রভৃতিতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠান হয়। বাঙ্গলা পত্রিকায় যথাযথ তাঁহা প্রকাশ হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা তাহা প্রকাশ করেন নাই।

কলিকাতার লিবাটি ও এডভান্স পত্রিকায় তার পাঠান হয় নাই—ইহা আমরা অনুসন্ধানে নির্ণয় করিয়াছি। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ নিশ্চিতই জানিতেন যে ঐ দুই দৈনিকের কর্তৃপক্ষ সম্মেলনের সংবাদ দিবেন না। একদিকে অত বড় একটা সাধারণ গোচরণীয় সংবাদ গোপন করিতে বাঙ্গলার কোনও দৈনিকের ইতস্ততঃ বোধ হইল না। অপর দিকে উক্ত সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনের সাফল্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া ঐ জলগাঁও সহরের কয়েক শত দরিদ্রের বন্ধু সাজিয়া একজন রাজনৈতিক চক্রী প্রথমদিনের রাত্রে একটী বিরোধী সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় মন্তব্য পাশ হয় যে জলগাঁও বর্ণাশ্রমী সম্মেলন দরিদ্র-শোষণকারীদের সম্মেলন সুতরাং তাহার বিরোধ করা ও সম্ভব হইলে তাহা পণ্ড করা একমাত্র বিধেয়। ঐ মন্তব্যানুসারে দ্বিতীয় দিন প্রাতে সম্মেলনের মণ্ডপ তোরণে ঐ দলের জন পঞ্চাশ লোক ধর্ণা দেয়। সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের সকলকেই সভাপতির সম্মান রক্ষার প্রতিশ্রুতি পাইলেই প্রবেশ করিতে দিতে সম্মত ছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাহারা সম্মত না হওয়ায় তাহাদিগকে সভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। পরদিন কি কলিকাতা কি বোম্বাই কি মাদ্রাজ কি প্রয়াগ সকল প্রদেশের ইংরাজী দৈনিক কাগজে তার বাহির হইল যে অস্পৃশ্য বলিয়া বহিষ্কৃত লোকেরা বর্ণাশ্রমী সম্মেলনের অধিবেশনে সত্যাগ্রহ করিতেছে। যাহারা ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তাহারা কেহই এই মিথ্যা রটনায় বিস্মিত হন নাই। তাহার প্রধান কারণ জলগাঁও এর পূর্ব্বে পূর্ব্বে কুম্ভমেলায়, বোম্বাইসহরে, মাদ্রাজ সহরে ও দিল্লী সহরে যে কয়টী বর্ণাশ্রমী বা সনাতনী সম্মেলন হইয়াছিল, তাহার বিবরণ প্রকাশিত ত হয়ই নাই, বরং তত্তৎ সম্মেলন সম্বন্ধে মিথ্যাপ্রচার করিতে কোনও সংবাদপত্র ইতস্ততঃ করে নাই।

এখন এই মতিগতির কারণ কি? সর্দ্দার বিবাহ-আইন পাশ হওয়াতে সমগ্র সনাতন হিন্দু-সমাজ কংগ্রেস-আন্দোলন ও ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয়ের উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারাইয়াছে। এই কথাটা লুকাইবার আবশ্যকতা কংগ্রেস-পক্ষীয় সাংবাদিক ও সংবাদ পত্রের বোধ জন্মিয়াছে। দেশের সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে সনাতনী হিন্দু কংগ্রেসকে বিশেষ কোনও বিদ্বেষের চক্ষে এ যাবৎ দেখে নাই। কংগ্রেসও এ যাবৎ সনাতন হিন্দুকে স্বকীয় দলভুক্ত বলিয়া প্রচার করিয়া আসিয়াছে। সর্দ্দার বিবাহ আইন এই পারস্পরিক বিশ্বাসের সূত্রটী ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ইংরাজ রাজপুরুষ তাহা বেশ ভালরকমই জানেন ও জানিয়া এই বিরোধটীকে দেখিয়া বেশ আনন্দও

উপভোগ করেন। তথাপি ইংরাজী সংবাদিকগণ সনাতন হিন্দুর সম্মেলন জিনিষটাকে যেন ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চান। ইহা দ্বারা এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে এই সকল সংবাদপত্রের কর্ত্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন যে এক পক্ষে সংবাদ গোপন অপর পক্ষে মিথ্যা নিন্দা রটনা—ঘটনাকে রটনা করিলেই তাহার মূল্য হয়—সত্য হউক মিথ্যা হউক রটনাই ঘটনার প্রাণবস্তু। ইহার দ্বারা আরও মতিগতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পরে বলিতেছি। অন্যান্য কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ আগে করি।

২। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা গুলি এবং দেখাদেখি কয়েক-খানি বাঙ্গলা দৈনিক গর্ভাবরোধকের বিজ্ঞাপন ও গর্ভরোধ, সন্তান সংক্ষেপ, জন্মশাসন প্রভৃতি কয়েকটী নোংরা প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছে। এই সকল সংবাদপত্র সম্পাদক মণ্ডলী মনে করেন যে আধুনিকতম সভ্যদেশের সমপর্য্যায়ে দাঁড়াইতে গেলে এই সকল কামায়ন পরীক্ষায় মেডেল পাইতে হইবে। বিলাতী সাংবাদিক মহলের আবর্জ্জনাস্তপ হইতে মস্তিষ্কের ভোজবাজিজাত এই সকল রচনা যখন তখন নিজেদের পত্রে তুলিয়া দিয়া ইহারা মনে করেন যে আমরাও আমাদের দেশের লোককে সভ্য করিতেছি। অথচ ১৯২৭ সালে গর্ভরোধের বিরুদ্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক মতামত বাহির হইয়াছে তাঁহার কোনও সন্ধানও ইহারা জানেন না। সার জেম্‌স্ মারচাণ্ট বিলাতের স্বাস্থ্য বিভাগের একজন লোকমান্য পদস্থ লোক। তিনি ১২ জন ডাক্তার ডাক্তারণীর লিখিত মতের ভূমিকা দিয়া গর্ভরোধের অনিষ্টকারিতা যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহা প্রচার করার কোনই আবশ্যকতা বোধ আমাদের ইংরাজী দৈনিক গুলির কর্ত্তৃপক্ষ কাহারও নাই। চট্টগ্রামের প্রাচীন সংবাদ পত্রসেবী শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই বিষয়ে ব্যথা বোধ করিয়া নিজের অর্থব্যয়ে এই সম্বন্ধে একটী মত প্রচার করেন। প্রচলিত গর্ভরোধ-সাপক্ষের মত নহে বলিয়া তাহা কোনও সংবাদপত্র প্রকাশ করেন নাই। আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি—এই ঘটনায় কোন্ মতিগতির পরিচয় পাওয়া যায়?

৩। স্বনাম-ধন্য ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসু শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু দেশের বর্ত্তমান মতিগতি বিপথে যাইতেছে বিশ্বাস করিয়া "স্বরাজ—সাধনা মূলক না রাজনৈতিক" শীর্ষক এক পুস্তিকা লিখিয়াছেন। হইতে পারে প্রমথ বাবুর মৌলিক বিশ্বাস ভুল কিম্বা তাঁহার সমস্যা-পূরণ ভ্রমাত্মক। ইহাও না হয় মানিতে পারি যে প্রমথ বাবুর মতামত আধুনিক কালের পক্ষে একেবারে অবহেলার যোগ্য। জ্ঞানে, বিদ্যায়, অভিজ্ঞতায় ও আধুনিকতার সর্ব্ববিধ সংস্পর্শে প্রমথ বাবু ভারতের সাংবাদিক ও সমালোচক শ্রেণীর এতটা উচ্চতর পর্য্যায়ে অবস্থিত যে তাঁহার মতামতের ওকালতি করিবার আবশ্যকতা আমরা বোধ করি না। কিন্তু কোনও একটী প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র তাঁহার ঐ পুস্তিকার সমালোচনা কালে যে অজ্ঞতা ও দলপ্রিয়তার পরিচয় দান করিয়াছে তাহাই আমাদের প্রসঙ্গের আলোচ্য। সমালোচকের মতে "সাধনা মূলক স্বরাজ" বা "বর্ণাশ্রম স্বরাজ" যেন সোণার পাথর বাটী। হয় সমালোচক "স্বরাজ" কথাটারই প্রয়োগেতিহাস জানেন না, নতুবা তাঁহার পাঠকবর্গের সেই অজ্ঞতা কল্পনা করিয়া "রাজনৈতিক স্বরাজ" কথাটার ভিতর "চপ সন্দেশ" রূপী যে অপচার রহিয়াছে সেই অপচারের প্রচারোদ্দেশ্যে ভুল বুঝাইবার জন্য ব্যস্ত। যদি ইতিহাস ও সাহিত্য জানা থাকিত, তবে তিনি জানিতেন যে সাধনা ও বর্ণাশ্রম বাদ দিয়া যে স্বরাজ

তাহা অর্থহীন বাক্য-বিন্যাস মাত্র, নিরাকারের চরণ ধ্যান মাত্র, দায়িত্বহীন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের মতন। আর কেবল মাত্র রাজনৈতিক স্বরাজ লইয়া এ দেশের যুবক মস্তিষ্ক যাঁহারা উত্তেজিত করিতেছেন, তাঁহারা আমড়া গাছে ল্যাংড়া ফলাইবার ব্যর্থ প্রয়াসে নিযুক্ত। তাহার পর সমালোচক বলিয়াছেন যে প্রমথ বাবুর লেখা obscurantism দোষে দূষিত ও বইখানি curious jumble of political and non-political ideas (রাজনৈতিক ও রাজনীতির সম্পর্ক বর্জ্জিত ভাব সমূহের একটা অপূর্ব্ব চচ্চড়ি)। লেখক ভুল করিয়াছেন যে তিনি যেটাকে ধোঁয়াটে বলিয়া মনে করেন বা যাহা কিছু তাঁহার চক্ষে অস্পষ্ট প্রতিভাত হয় তাহাকেই তিনি obscurantism বলিতে পারেন না। ইংরেজী কথার অভিধানিক অর্থ আছে। ঐ কথাটার সর্ব্বমান্য অর্থ এই :—opposition to inquiry or enlightenment অনুসন্ধিৎসা বা জ্ঞানালোকের বাধা দেওয়াই হইল obscurantism বিলাতের উক্ষপার কোষে obscurantist কথার ব্যবহারিক প্রয়োগের উদাহরণ আছে :—The true obscurantists are the passions, the prejudices, the blinding delusions of our nature, warpt by evil habits and self-indulgence ষড়রিপু, জন্মগত সংস্কার, অসৎ অভ্যাসে ও ভোগ-পরায়ণতায় রঞ্জিত আমাদের প্রকৃতি সঞ্জাত অন্ধ মোহ এই সকলই হইল প্রকৃত obscurantist। এখন জিজ্ঞাস্য এই প্রমথ বাবু obscurantist না এই সমালোচকটী obscurantist ?

৪। সম্প্রতি এক বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রে একজন শ্রদ্ধেয় বঙ্গমহিলার চরিত কথার পরিচয় প্রকাশ হইয়াছে। বাংলার ঘরে বাহিরে এমন কোনও অভিজ্ঞ বাঙ্গালী নাই যিনি এই প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাকে শ্রদ্ধা না করেন। লেখিকা লিখিয়াছেন যে তিনি "পতিসেবার ভার কখনো কাহারো হাতে সমর্পণ করেন না।" সত্যই তাহাই এবং তাঁহার চরিত কথায় এই কথাটী যথাযোগ্য স্থান পাইয়াছে। কোনও হিন্দু রমণীই পতি সেবার ভার আর কাহারো হাতে সমর্পণ করেন না, করিতে পারেন না। কিন্তু এই প্রবন্ধটীর পাদটীকায় পত্রিকাটীর সম্পাদকীয় মন্তব্য যাহা বাহির হইয়াছে তাহা পড়িয়া আমরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। স্তম্ভিত হই নাই কেন না সত্য যতই অপ্রিয় হউক না, তাহা বলিতেই হইবে, কিন্তু সত্যকে কৈফিয়ৎ হিসাবে যদি ব্যবহার করিতে হয় তবে যে সত্যেরই অমর্য্যাদা করা হয়! সম্পাদিকা লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান যুগে নারীর 'সতীত্ব' বা সাধ্বীত্বের আদর্শ লইয়া তরল মতি নব্য শিক্ষিত শিক্ষিতা অনেকে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকেন। * * * এখনও কি বলিবেন এই আত্মিক সাধনা সম্ভূত সতীত্বের আদর্শ জাতির পক্ষে অনাবশ্যক এবং প্রগতির পরী (?) পন্থী ?" যাহাদের জন্য সম্পাদিকা মহোদয়া মন্তব্য লিখিয়া প্রশ্নোত্তর চাহিয়াছেন তাহারা সম্ভবতঃ আর একবার বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু আমাদের পাঠক বর্গকে জিজ্ঞাসা করি—সতী-সাধ্বীর চরিত কথা লিখিতে গিয়া কৈফিয়ৎ দিবার আবশ্যকতায় যে জাতীয় মতিগতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহা কোনও কিছুর পরিপন্থী কিনা ?

আমাদের একান্ত অনুরোধ উপরোক্ত চারিটী ঘটনা একত্রে বিবেচনা করিয়া সাংবাদিক মহলে কোন মতিগতির পরিচয় দান করে তাহা আমাদের পাঠকগণই বলুন। আমাদের সংবাদ পত্রকুল একটা বিলাতী আমদানী কথা শিখিয়াছে—প্রপাগাণ্ডা। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষানবিসী কাল হইতে

আমাদের শিক্ষকরা শিখাইতেছেন ও ছাত্রেরা শিখিতেছেন যে সভ্যদেশের মতবাদানুযায়ী মত ও আচার ব্যবহার না শিখিলে সভ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইবে না। আর সভ্য বলিয়া পরিচয় না হইলে রাজনৈতিক অধিকার লাভ হইবে না। এই যে সভ্যতা, সেটার পরিচয় বা সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিলে শিক্ষক বা শিক্ষিত কেহই এক উত্তর দিবেন না বা দিতে পারিবেন না। অথচ নানা প্রকার মতের দোহাই দিয়া প্রপাগাণ্ডার বশ্যতাও স্বীকার করিবেন ও নিজেরাও প্রপাগাণ্ডা করিবেন। সেই প্রপাগাণ্ডার তালে তালে নিছক বিক্রয়ের অছিলায় খবরের কাগজ "বিকায় যে" এই যুক্তিতে এই সকল অপকার্য্য করিতেছে।

অথচ "প্রপাগাণ্ডা" ১৬২২ খৃষ্টাব্দে রোমান ক্যাথলিক কোনও বিশিষ্ট মতবাদ প্রচারের জন্যই প্রথম ব্যবহৃত হয়। এখনও কথাটার আভিধানিক অর্থ এই :—Concerted movement for the propagation of a particular doctrine or practice—কোনও একটী বিশেষ মতবাদ বা লোকাচার রটনার জন্য সমবেত আন্দোলন। ইংরাজ সম্বন্ধে বিখ্যাত লেখক এমার্সনের উক্তি They are still aggressive and propagandist, enlarging the dominion of their arts and liberty—অর্থাৎ ইংরাজের শিল্পকলা ও ইংরাজের স্বাধীনতার পরিধি বাড়াইতে ইংরাজ এখনও প্রথমাক্রমণ করে (পায়ে পা দিয়া ঝগড়াটে) ও রটনা প্রিয়। আমাদের সম্পাদক কুল রটনার শক্তি শিখিয়াছেন, কিন্তু রটনা করেন কাহার শিল্প চাতুর্য্য ও কাহার স্বাধীনতার প্রবৃত্তি? সনাতনীর সম্মেলন সংবাদ লুকাইয়া, তাহার নামে মিথ্যা প্রচার করিয়া, স্বরাজ কথার অপব্যবহারকে প্রকৃত সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া যে রাজনৈতিক লাভের আশার উন্মাদনায় ইহারা উন্মত্ত সেই রাজনৈতিক লাভ ইংরাজের art of living (জীবন যাত্রার পদ্ধতি) ও liberty (বা পার্লেমেণ্ট অধিকার) ছাড়া আর কিছু কি? গর্ভরোধের বিজ্ঞাপনে ও সতীত্বের কৈফিয়তে কোন বিজাতীয় আদর্শের প্রথমাক্রমণ সূচিত হয় ও কাহার শিল্প চাতুর্য্যে মাথা অবনত হয়? আর এই দুইএর একত্রাবস্থান যে মনোরাজ্যে সভ্যতার আদর্শ-মরীচিকায় এই সকল সংবাদ পত্র সেবকদিগের দিক্-ভ্রম উৎপাদন করিতেছে, তাহাদের মতিগতির প্রকৃত পরিচয় সম্ভব কি? প্রকৃত পরিচয় দিতে গেলে হয় বলিতে হয়, ইহারা উন্মাদ, না হয় ইংরাজী সভ্যতার বেতন-ভোগী দালাল।

প্রকৃত বস্তুগত ভাবে দেখিতে গেলে স্পষ্টই স্বীকার করিতে হয় যে propaganda মতবাদ প্রচার বা মিথ্যা রটনা মাত্র। আধুনিক রাষ্ট্র-সমূহের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য গত যুদ্ধের সময় হইতে আবিষ্কৃত এবং প্রকৃত সমাজ তত্ত্বাভিজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রই শিক্ষা দেন যে when the interests and passions conducting the propaganda happen to be vested with influence on the governning or teaching staff in schools and colleges, liberty of research, teaching and publication is sure to be injuriously affected. যেখানে স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ বা মাষ্টার মহাশয়দের স্বার্থ বা প্রবৃত্তি দ্বারা রটনা চলিত হয়, সেখানে সত্যানুসন্ধান, সৎশিক্ষা ও সৎপ্রচার ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করিলাম, তিনিই স্বীকার করিয়াছেন যে It gives great opportunities to the subtle play of interested influence. ইহার দ্বারা স্বার্থের শক্তি সূক্ষ্মভাবে বহাল করিবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়। এই স্বার্থ সংঘাতের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ধ্বংস—তাহা আধুনিকতম সংবাদ

তত্ত্ববিদ্ ঠিক মনু মহারাজের ভাষায়ই স্বীকার করেন—সমূলস্তু বিনশ্যতি। ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে স্বাধীন চিন্তার অবসর প্রদান ও ভাবের আদান প্রদান আর আমাদের শ্রীভগবানের বাণী "যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" এই আশান্বিত থাকা। প্রপাগাণ্ডা বা রটনা এই মৌলিক তথ্যের বিরোধী। এই গেল মৌলিক তথ্যের দিকের কথা।

কার্য্যতঃ আর দুইটা কথা আছে। যাহারা রাজনীতির মোহে দেশের সনাতন মতকে চাপা দিতে বা বিদ্রূপ করিয়া হেনস্থা করিতে চান তাঁহারা যেন মনে রাখেন ইংলণ্ডের আধুনিকতম রাজনীতিক পণ্ডিত এ, ডি, লিণ্ডসে বলেন—Politics is still largely a scene of conflicts for power and of irrational enthusiasms রাজনীতি এখনও ক্ষমতা ও অযৌক্তিক ডামাডোলের ঘাত প্রতিঘাতের রঙ্গমঞ্চ মাত্র। এবং তিনিই প্লেটোর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া শিখাইয়াছেন যে there can be no salvation to states until they are ruled by men with true understanding of the ends or purposes of life. জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথার্থ্য জ্ঞান যাহাদের হইয়াছে তাহারাই কোনও একটী রাষ্ট্রের মুক্তি বিধান করিতে পারে। প্রপাগাণ্ডা বা রটনা ঠিক ইহার বিপরীত কার্য্য সংসাধন করে।

আর যাহারা বিলাতী ভাবে সভ্যতার বড়াই করিতে চান তাঁহারা জানেন না যে এই সভ্যতার প্রপাগাণ্ডায় ঐ বিলাত ও মার্কিণ কতটা পর্য্যুদস্ত হইতে বসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে চিন্তাশীল লেখকের লেখায় ইহা ফুটিয়া উঠে। গত ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসের Forum পত্রিকায় তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। "The fact is that the excessive harvest of evils which we are gathering has been brought on us by a revolution in thinking and in conduct led by the modern rationalist, materialists and the radical intelligentsia most of whom had no part in war. They are moralists without morals, behaviorists for profit and all of them propagandists engaged in undermining our youths." কথাটা এই যে আমাদের বর্ত্তমানের দুঃখকষ্টের স্তুপের জন্য আমরাই দায়ী। চিন্তায় ও ব্যবহারে একটা বিপর্য্যয় আনিয়াছে আধুনিক যুক্তিবাদী, জড়বাদী ও চরম বুদ্ধিবাদী। ইহারা কেহই গত যুদ্ধে কিছুই কর্ম্মভোগ করে নাই। ইহারা নীতিহীন নীতিবাদী, দুটো পয়সার জন্য 'চাল' বিশারদ, আর যুবকযুবতীকে উৎসন্নে দিবার জন্য রটনা-পরায়ণ।

এখানকার সংবাদপত্র সম্পাদকগণ ঠিক ঐ কাজেরই প্রশ্রয় দিতেছেন। এই পথের বিপদ্ হইতে সাবধান করিবার জন্যই বৎসর দুই পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব বিচার পতি উডরফ বলিয়াছিলেন—"রাজনৈতিক অধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবের পরাজয় ঐতিহাসিক কার্য্যকারণ পরম্পরায় ঘটিয়া যায়। তাহা হইতে পরাধীন জাতির আত্মরক্ষার উপায় তাহার ধর্ম্ম। ইহার অর্থ পিতৃপুরুষের পারম্পর্য্যধারার প্রতি, জাতির আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি ও ভারত শক্তির প্রতি ভক্তিমান্ থাকা।" এই সহজ সরল কথা না মানিয়া যাহারা অন্য প্রকার মতবাদের রটনা করে, তাহারা আত্মদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী ও সত্যদ্রোহী। হয়ত ইহারা বুঝিতে পারে না, কিন্তু অগ্নির দাহিকা শক্তি অজ্ঞের অবহেলা মার্জ্জনা করে না—এটা জানিয়া রাখা উচিত। আমাদের শাস্ত্রের অমোঘ ও অব্যর্থ উপদেশ—সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনায় সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী—যাহা ভারতের সাধনার এক বিশেষ লক্ষ্য— সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচনাসাপেক্ষ]

বেদনায় বিহ্বলতা

"The Recording Angel enters only those good deeds which we do not record ourselves."

গত পৌষ সংখ্যায় "সমাজের বাস্তব চিত্র এবং তাহা হইতে শিক্ষা" নামক একটি শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহোদয় সমাজের মঙ্গল কামনায় একটি বাস্তব ঘটনা লোক-লোচনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। এই ঘটনাটি লইয়া যে সকল তথ্যের আলোচনা করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে প্রবন্ধের ভিতর যে সকল অনার্য ভাবের বিকাশক বাক্যাবলী আছে সে বিষয় কিছু না বলিলে "ভারতের সাধনা"র প্রতি বোধহয় কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি আইসে।

প্রথম। রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য নহে। উহা ইতিহাস বলিয়া হিন্দু গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্রেও উহাদিগকে ইতিহাস নামে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। লেখক মহোদয় এই দুই জাতীয় ইতিহাসকে মহাকাব্য বলিয়া নিজ শিক্ষার পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিতীয়। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত উপন্যাসগুলি সকল আধুনিক বাঙ্গালী পাঠ করেন নাই। এমন অনেক বাঙ্গালী এ কালেও আছেন যাঁহারা উক্ত গ্রন্থকারের পুস্তক চক্ষের সম্মুখে পড়িলেও তাহা পাঠ করে নাই। অবশ্য এরূপ লোক কম কিন্তু আছে এবং তারাও আজকালের শিক্ষা পাইয়াছে। তবে তারা অবশ্যই অনেকের চক্ষে পিটির (pity) পাত্র সন্দেহ নাই! ঋষিতুল্য মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায় প্রথম প্রথম "বিষবৃক্ষ" লিখিয়া তদানীন্তন তরুণ সমাজে এক যুগান্তর আনিয়াছিলেন। বিধবা কুন্দনন্দিনীর সর্ব্বনাশের কেন্দ্র নগেন্দ্রনাথের সেই ধর্ম্ম বিধ্বংসী চিত্র সে সময়ে বঙ্কিমকে কোথায় নিয়াছিল তাহা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টাগণ জ্ঞাত আছেন। কিন্তু সেই অসাধারণ বুদ্ধিজীবী লেখক পরিণামে বিষ-বৃক্ষে যে বিষফল প্রসব করিয়াছিল তাহা দেখিয়া চন্দ্রশেখর, দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ, ধর্ম্মতত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়া নিজের পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিম মহৎ অধিকারী ছিলেন তাই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত অচিরেই আচরিত হয়। অধম অধিকারীর নিকট মহতের বুদ্ধি ও চিন্তা আসিতে পারে না। যশ ও অর্থ লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা যাহাদিগকে সমাজের ধর্ম্ম, সমাজের চরিত্র, সমাজের যা কিছু ভাল তাহা বিক্রয় করিতে প্রচোদিত করে—তাহারা মনুষ্য সমাজের পরম গুপ্ত শত্রু। লেখনী বজ্রাপেক্ষা অধিক বলশালী এবং তাহা অজ্ঞাতে মানব মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সমাজে জয় পতাকা উড়াইয়া থাকে। মহাকবি মিল্‌টন তাঁহার "আরিও প্যাগেটিকা" নাম পুস্তকের এক

স্থানে বলিয়াছেন :—"Books are not absolutely dead things but do contain a potency of lifэ in them to be as active as that Soul was whose progeny they are. I know they are men as lively and vigorously productiva as those fabulous dragons' teeth and being sown up and down may chance to spring up armed men." ইদানীন্তন কালেও "দি ভেরী রেভারেণ্ড ইঞ্জ" মহোদয় (The very Rev. W. R. Inge) সে দিন দুঃখের সহিত বলিয়াছেন :—"Never theless, there will be a return to stricter ideals as there was in the reign of queen Victoria. When the change comes, some of our best-selling novelists will find their books barred as the novels of Mrs. Aphra Behn were barred in the 19th century. It will serve them right for at present they are doing infinite mischief. I am confident that this reform will come not only because the pendulum always swings back after a time but because after all a happy marriage is the best thing in human life." (The Morning Post May 1925). এক বিজ্ঞ আমেরিকার কবি বলিয়াছেন :—

Then let your secret thoughts be fair
They have a vital part and share
In shaping worlds and moulding fate
Gods' system is so intricate.

অবৈধ প্রণয় প্রভৃতি হিন্দু ইতিহাস ও পুরাণেও আছে। কিন্তু তাহা একটা পবিত্র ভাবে আবরিত। সে সকল পাঠ করিলে কুন্দনন্দিনী ও নগেন্দ্র মনে পড়ে না—ছাত্র ও মেসের ঝির চিত্র চক্ষে আসে না। পলাণ্ড ভক্ষণ যাহারা করে তাদের ঢেঁকুরে শুধু সে দুর্গন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা নহে, তাদের গায়েও গন্ধ হয়। যে ভিত্তিতে যে গঠিত তার বিকাশ ঠিক তদ্রূপ হইতে বাধ্য। চরিত্র গঠন সর্ব্ব কার্য্যের ভিত্তি, সে ভিত্তি ঠিক হইলে গারার গাঁথুনীর বাহ্য চাকচিক্য ময় দালানগুলির মত এক ভূমিকম্পে পড়ে না, লোকও মরে না, জাতিও ধ্বংস পথে যায় না।

তৃতীয়। ম্যালেরিয়ার উদ্ভব কিসে তাহা বলা তত সহজ নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলা স্বাস্থ্য-নিবাস বলিয়া পরিচিত ছিল। উহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। যেই রেলপথ খুলিল তার পর হইতেই স্বাস্থ্য হানি হইতে আরম্ভ হয়। এখন বর্দ্ধমান ম্যালেরিয়ায় 'ডিপো" ! এরূপ বাঁকুড়া মেদিনীপুর প্রভৃতি। রাক্ষসী রেল "ওয়াগণ" ম্যালেরিয়া ছড়াইয়া যায়। তাহার কতকগুলি প্রধান কারণ—(১) স্থানীয় বিশুদ্ধ দ্রব্যের রপ্তানি ; (২) তৎপরিবর্ত্তে ভেজাল জিনিষ আমদানী ; (৩) শারীরিক অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ম্মচেষ্টার অভাব ; (৪) অন্য দেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার ; (৫) তৈল ও কয়লার পাক ; (৬) অকালে ভোজন ; (৭) আহারান্তেই কর্ম্ম ; (৮) অবিরাম গাত্রাচ্ছাদন ; (৯) সূর্য্যোত্তাপের মুখ না দেখা ; (১০) অবগাহন স্নানের অভাব ; (১১) আমদানীর জোরে নানা প্রকার সুস্বাদু আহার ও পান ; (১২) নগ্নপদ একবারে ত্যাগ ; (১৩) রেলের সাহায্যে সমৃদ্ধিশালীগণের দেশত্যাগ ; (১৪) উন্মুক্ত স্থানের ঘাট্‌তি ; (১৫) বেগ ও উদ্বেগ এবং (১৬) ডাক্তারী চিকিৎসা প্রভৃতি। কত মহোপাধ্যায় বহুদর্শী ডাক্তারগণ আমেরিকাতে এ বিষয়ে

কত কথা বলিয়াছেন। প্রবন্ধ বৃদ্ধি ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। ডাক্তারী চিকিৎসা যে এখনও চিকিৎসা বিজ্ঞান হয় নাই এবং ইহা যে কেবল কতকগুলি "Inconsistent jargon" তাঁহা আমেরিকার মেডিকেল কলেজের এক ৩৬ বৎসর ব্যবসাকারী ডাক্তার তাঁহার ছাত্রদের সম্মুখে বক্তৃতায় মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। আর একজন বলিয়াছেন—ডাক্তার একটি গদাধারী অন্ধ সম। তিনি গদাটি একবার রোগের মাথায় আন্দাজে মারেন আর একবার রোগীর মাথায় মারেন। যদি রোগে লাগে তবে রোগ মরে নতুবা রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য। আর একজন বলেছেন যে আমরা চিকিৎসার অজ্ঞতায় যতলোক হত্যা করিয়াছি পৃথিবীতে যুদ্ধ (war), ওলাউঠা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি মড়কে (Pestilence) তত লোক হত হয় নাই। ম্যালেরিয়া বর্দ্ধমানের মাটিতে বা জলে নাই—আছে শরীরেও থাকে। শরীর আবার আহার, আচার, ব্যবহার, সংসর্গে ও চিন্তাতে পুষ্ট। গরু, মেষ, মহিষ, পশু, পক্ষী, গাছ পালা সবই ত বর্দ্ধমানে আছে এবং তারা সকলেই সেই জল, সেই বাতাস ভোগ করিতেছে। কই তারা ত ম্যালেরিয়ায় ভুগে না। তারা ত ঠিক দুধ দেয় তাদের সন্তানগণ ত যক্ষ্মায় মরে না। এ সব এত গুরুতর তত্ত্ব ও এর সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে খেয়ালে বসিয়া সিগার সেবন করিতে করিতে তাহার অনুসন্ধানে কিছুই হয় না। পরন্তু জটিলতা বৃদ্ধি পায়। ভগবানের এমনি সৃষ্টিকৌশল যে তাঁহার নিয়মগুলি প্রতিপালন করিয়া চলিলে রোগ কচিৎ হয় এবং যদিও হয় তজ্জন্য ঔষধ খুব কম প্রয়োজন। ঢক ঢক করে তরল বিষ পান করিতে হয় না। ডেলা ডেলা তীব্র বিষ কুইনাইন খাইতে হয় না। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছতর ধাতু রস ও রক্তের মধ্যে অতি অবিবেচনার সহিত তীব্র বিষ মিশাইয়া দিতে হয় না। প্রমাণ—এখন সাঁওতাল পরগণা ও মধ্য-প্রদেশে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এমন স্থান আছে যথায় মহাপ্রভু ডাক্তারদের পাদস্পর্শ হয় নাই অথচ সে গ্রামের লোক দীর্ঘ জীবী ও নিরোগী। বিদেশ হইতে যে রঙ্গীন চশমাটি আমরা যতনে পরিয়াছি তাহা না খুলিলে ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মার তত্ত্ব বুঝা যাইবে না।

এখন 'বাস্তব ঘটনা'র বিষয় দেখা যাক। যে ঘটনাটির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মূল হেতু মুসলমান দারোগার কাম পিপাসা। দারোগা পুরুষ বিধবা নারী। পুরুষ বলবান নারী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলা। এই অনর্থের মূল পুরুষ। তাঁহার প্রবল শক্তি তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে অব্যাহত গতি। আচ্ছা নারীর জন্য হৃদয় বেদনাটুকু কিছুক্ষণের জন্য পকেটে পুরে একবার পুরুষটার সংস্কার করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে কি? বিচারটি এ পক্ষেও হওয়া আবশ্যক। আমি প্রবল আমার বিচার আমি করিব এ ভাবটা ন্যায় পথের কথা নহে। সমাজের এমন বল হওয়া আদৌ দরকার যাহাতে পুরুষ ধৈর্য্যশালী হয়। পুরুষ যত ঠিক হইবে নারীর তত বিপদ কম। Focusটা নারীতে না পড়ে পুরুষে দিন কয়েক পড়ুক না। নারীর চক্ষের জল ও কুলত্যাগ আপনিই বন্ধ হইবে যদি তাদের রক্ষক পুরুষ ঠিক হয়। পুরুষের বেলা খেলা আর নারীর বেলা বেদনা। বলি, নারীকে বেদনা দেবার মূল কে? সমাজ সংস্কার চেষ্টা অনেকবার হইল—ক্ষুদ্র জীবনে তা দেখেছি। কিন্তু সংস্কারক মহোদয়গণ নিজেদের সংস্কার করিতে একবারে নারাজ। বরং নিজেদের আমোদে ঘৃতাহুতি দিবার জন্য নারীর চক্ষের জলে গোলাপ জল ও ল্যাভেণ্ডার মিশাইয়া অবগাহন স্নান করেন। প্রত্যক্ষ ও জলন্ত দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে অঙ্কিত রহিয়াছে। সে সব বলিলে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। সত্যগোপনে নামপ্রতিষ্ঠা আজকালের যুগ-ধর্ম্ম।

যে চিত্র লিখিত হইয়াছে আমি তাহার প্রত্যুত্তর কল্পে প্রত্যক্ষ ঘটনা দু একটী নিবেদন করিতেছি। হয়ত অবিশ্বাস যোগ্য মনে হইবে কিন্তু যাহা লিখিতেছি তাহা অতি সত্য।

১। কোন সময়ে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর সবডিবিসনের এক পল্লীতে এক ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত ব্যারাকপুরের এক ছেলের বিবাহ সম্বন্ধ হয়। পাত্র বিবাহ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পর পাত্রীর পিতা কোন কারণে ঐ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে অসম্মত হয়েন। বড় অবমাননা। অন্য এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নাবালিকা কন্যাকে সেই রাত্রে সেই পাত্রে অর্পণ করিয়া পাত্রের মান রক্ষা করেন। পাত্র ও পাত্রী সন্তান সন্ততি লইয়া এখনও জীবিত। প্রথমোক্ত কন্যার পিতা আর এক দ্বিতীয় পাত্রে নিজ কন্যা পরে দান করেন। কন্যাটী তখনও বালিকা। ভগবানের এমনি কৌশল যে কন্যা পুষ্পিতা হইবার পূর্ব্বেই জামাতা মারা যান। অক্ষতযোনি কন্যা বিধবা হইলে পিতামাতার যাহা হয় তাহা হইল। যৌবন প্রাপ্তির পর কন্যাকে কেও অত্যন্ত প্রলোভন দেখাইলে কন্যা অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত তাহা উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শেষে সেই বাল বিধবা যুবতী তাহাতে মর্ম্মান্তিক বেদনা বোধ করেন এবং ভগবান তাহাকে এ সংসার হইতে উদ্ধার করেন। কই এখানেত সেই বিধবাকে কেহই কুলটা করিতে পারিলেন না। এই চিত্রে ও মূল প্রবন্ধোক্ত চিত্রে কি তফাৎ!

২। ভাগলপুরে এক বাড়ীতে দুই ব্রাহ্মণ বন্ধু বাস করিতেন। দুই জনেই যুবক কিন্তু অল্প বয়স হইতে ধর্ম্ম-পথের পথিক। প্রথম বন্ধুর বিবাহিত যুবতী-পত্নী সেই গৃহে বাস করিতেন। দ্বিতীয় বন্ধু অবিবাহিত। সেই অবিবাহিত বন্ধুর সহিত বন্ধু-পত্নীর এতই ভালবাসা হয় যে সেই রমণী বন্ধুর নিকট শয়ন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এক সময় এমন অসাধারণ ঘটনা ঘটে যে বন্ধু প্রায় ধৈর্য্যহারা হয়ে পড়েন। গুরু সহায় থাকায় অবশ্য পদস্খলনের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এত অগ্রসর অবস্থাতেও হিন্দুনারীর স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তিটিই এইক্ষেত্রে প্রবল ছিল। নারী জোরের সহিত তখনও শিক্ষা দিয়াছিলেন "তোমার স্নেহ স্বর্গের, তোমার ধৈর্য্য দুর্লভ, কিন্তু আমার স্বামী—(যিনি পাশে শয়ান) তিনি ভিন্ন আমার বাস্তবিক জীবনসঙ্গী আর কেহ হইবে না। এ কি মহান্ হৃদয়! এ কি মহান্ আদর্শ! ইহাই হিন্দু-নারীর হৃদয়ে রক্ষা কবচের কাজ করিয়া থাকে। ভাবিতে গেলে সতীনাথের চরণে মাথা নত হইয়া পড়ে।

৩। কোন সময় সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া এক ধন শালিনী পাশ্চাত্য রমণী এক দেশীয় ব্রাহ্মণ যুবকের কৃপা প্রার্থনা করেন। তাহার এ অবৈধ প্রার্থনা ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অনুকম্পার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন। সে রমণী কামে উন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে জড়াইয়া ধরে ও তাহার বুকে অজ্ঞান হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ অতি যতনে তাহার চৈতন্য আনিয়া রমণীকে তাঁহার বাঙ্গলায় পৌঁছাইয়া দেন। এখানে ত পুরুষ নারীকে রক্ষা করিল। দারোগাতে ও এ ব্রাহ্মণে কত তফাৎ!

৪। কলিকাতার সন্নিকটস্থ কোন স্থানে কোন বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে এক যুবতী কন্যা ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ শিক্ষিত (?) যুবককে সেই কন্যার সহিত তাস খেলিতে দেওয়া হইত! আশ্চর্য্য এই যে সে যুবক যখনি সেই গৃহে যাইতেন সেই যুবতীর মাতা স্বয়ং কন্যাকে ও যুবককে ঘরে পুড়িয়া দরজা বন্ধ দিয়া দিতেন। এসব ঘটনা অতিশয় ভীষণ। ডাক্তার সাহেবের বর্ণিত বিধবার মা—তবু ত পথে —আর এ মা—তারও অনেক দূরে—নরকের দ্বারে। সমাজ সংস্কার কেবল একদিক করিলে হইবে না।

৫। সোনাগাছার বেশ্যা মহলে কোন বিশেষ কারণে একবার যাওয়া আসা করিতে

হয়। এক বৃদ্ধা বেশ্যাকে কোন ভদ্র মহিলার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন "বাবা কেও যেন স্বামী ত্যাগ করে বেশ্যা না হয়। ধান ভেনে খাক্—চাকরাণী হউক্ তবু যেন কূলে থাকে। ইত্যাদি। (ডাক্তার সাহেবের বর্ণিত শরৎ বাবুর সংগৃহীত "ষ্ট্যাটিষটিক" দ্রষ্টব্য।) এই সময় জানিতে পারা যায় কত কুল-মহিলা রূপের দোষে পুরুষের প্রলোভনের অত্যাচার প্রভাবে বেশ্যা হইতে বাধ্য হইয়াছেন! ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিয়া হতাশ প্রাণে ভগবানের চরণে মন গড়াইয়া পড়ে। পুরুষ সংস্কার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। চরিত্রবলহীন লেখনীকে আইন করিয়া বন্ধ করা দরকার হইয়াছে। অধুনা বাজারের গরল পূর্ণ তরল সাহিত্য কত কদর্য্য সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

মূল প্রবন্ধোক্ত 'বাস্তব' ঘটনার পাশাপাশি এই উপর্য্যুক্ত বাস্তব ঘটনাগুলি বসাইয়া আমাদের সমাজ সংস্কারের পথটি যদি ডাক্তার সাহেব বলিয়া দেন তবে হিন্দু সমাজ চিরকৃতজ্ঞ হইবে সন্দেহ নাই। সেই সঙ্গে যদি জানিতে পারা যায় যে (১) অবৈধ প্রণয়োৎপন্ন সন্তানগণ সমাজে কোথায় স্থান পাইবে; (২) পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান হওয়াতে বাল বিধবার বিবাহ বিধি-বদ্ধ হইলে অনূঢ়া গণের কি দশা হইবে; (৩) হীনশক্তি পুরুষের একাধিক দার হইলে ক্ষীণায়ু জাতিং অচিরে ধ্বংসের প্রতিষেধ কল্পে কি করা যাইতে পারে; এবং (৪) দরিদ্র সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে অন্ন সংস্থানের কি ব্যবস্থা হইবে—এসব বিষয়ের উপদেশ পাইলে সোণায় সোহাগা হইবে। যদি contraceptionই বিধিবদ্ধ হয় তবে স্নায়ুবিক বিকৃতির যে জাতি-ধ্বংসকারী অনিবার্য্য ফল তাহারই বা নিবারণ কি করে হইবে তাহারও উপদেশ প্রয়োজন। ভারত ব্যতীত যে সকল দেশে বা ভারতেও যে সকল নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলন আছে, তথাকার জাজ্জ্বল্যমান ব্যভিচার স্রোতটিই বা কি দিয়ে নিরোধ করা যাইবে তাহারও যুক্তি প্রমাণ অবশ্যই প্রয়োজন। বারবণিতা যদি না থাকে তবে পশুগুলির গোয়াল কোথায় করা যাইবে তাহারও একটি বৃহৎ স্থান দরকার—সে বিষয়েও একটা "রিজোলিউসন" প্রয়োজন হইবে!

যাহাহউক লেখক মহোদয়ের "বাল বিধবাদের সমাজের মধ্যে থাকিয়া ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাত্রা করিবার সুবিধা হয়," ইত্যাদি কথাগুলি মন্দ নহে। এবং ঐরূপ একটু আদর্শভাবের আভাস থাকাতেই বোধ হয় প্রোক্ত প্রবন্ধটি ভারতের সাধনায় স্থান পাইয়াছে। লেখক মহাশয় বাস্তব ঘটনার উল্লেখে যে প্রাণের বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে সহৃদয় দেশবাসী মাত্রেরই সম-বেদনা আছে। তবে তাহার প্রতিকারের পন্থা অতি সতর্ক ও সমীচীন ভাবে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অন্যথা সমাজের রোগ নষ্ট না হইয়া নূতন ও জটিল রোগ সৃষ্টির আশঙ্কা আছে।

"Mme : Undset is no admirer of the movement for equality between the sexes All words about comradeship lead to nothing It deprives the man of his feeling of obligation and responsiblity towards the family and leads him away from his natural position as a bread-winner and protector of his children. Women are in no need of equality." No Feminist—Forward 16-12-28.

এক্ষণে সেই অনন্ত কালের প্রবাহিত রামায়ণী গঙ্গায় প্রভু রাম সীতার একটু কথা বলিয়া কল্মষপূর্ণ এই জ্বালাময় জীবনের উচ্ছাস বায়ু নিরোধ করিতেছি—

রাম যখন সীতা উদ্ধার করিয়া আসিতে ছিলেন—তখন জনক রাজা কন্যা ও

জামাতার প্রত্যুদ্‌গমনার্থ মুঙ্গেরের নিকট আগমন করেন। রাম শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করেন—তাত! জানকী কি শুদ্ধা আছেন? জনক উত্তর দেন—আর্য্য রাম! সীতা আমার নিকট যতদিন ছিলেন ততদিন পরম পবিত্রা ছিলেন। তারপর তোমার নিকট গিয়া তিনি শুদ্ধা বা অশুদ্ধা আছেন তাহা তুমি জান। পতিই পত্নীর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য দায়ী।"

নারীর জন্য সংস্কার পরে দরকার হবে আগে পুরুষ সংস্কার আরম্ভ হউক।

হায়! কোথা সেই সীতার বাক্য—

ন পিতা নাত্মজো নাত্মা
ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং
পতিরেকো গতিঃ সদা।

মা! ভারত লক্ষ্মি! কোন পাপে আজ এ বিড়ম্বনা। আজও কি সময় হয় নাই? কবে আসন নড়িবে! মহতের ও মহদাচরণের অবমাননা—শয়তানী কালে পর্ণ হইয়াছে—এবার একবার দৃষ্টিপাত কর। ছাগলের বংশ নিপাত কর। ইতি—ব্যথার ব্যথী।

সংশয়

ইদানীং ভারতের প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে যুবতী রমণীরা সত্যাগ্রহে যোগদান করতঃ যথেষ্ট কষ্টসহিষ্ণুতা ও বীরত্বের পরিচয় দিতেছেন বলিয়া অনেকে উল্লাস প্রকাশ করিয়া থাকেন। সত্যাগ্রহ চালাইবার জন্য এখনও কোনও যুবক ও বালকের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া ত শুনা যায় না, তবে কেন রমণীরা একার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন? 'না জাগিলে ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না' বলিয়া যাঁহারা ললনা-জাগরণের সুর তুলিয়াছেন, বর্ত্তমান সত্যাগ্রহে যোগদান তাঁহাদের সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার একটা নিদর্শন হইতে পারে; লেখনী চালনায় বক্তৃতা দানে না পুরুষের খুঁটে খুঁটে লড়াই করায় তাঁহাদের শক্তির পরিচয় পাইয়া অনেকে গর্ব্বানুভবও করিতে পারেন; কিন্তু এই সমস্ত নারীসমাজের বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা কি না সে সম্বন্ধে আমার মনে নানা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। যথা:—

(১) যেখানে দৈহিক শৌর্য্যবীর্য্য, বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি মানসী শক্তিতে এবং কট-কৌশল ও বাকচাতুর্য্যে জয় পরাজয় নির্ভর করে সেখানে রমণীদেরে অগ্রসর করিবার প্রয়োজন হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সেখানে পুরুষেরা ঐ সব বিষয়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে রমণীরাও ঐসকল বিষয়ে অগ্রসর হইতে আপত্তি কি? আমাদের মনে হয় উহা স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক অধিকার নহে। অনধিকার চর্চ্চায় ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ হইতে হয়। স্ত্রীজাতি নিজের কর্ত্তব্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে পালন করিয়া চলিলে তাঁহাদের স্বামীরাও ভ্রাতারা যদি অকর্ম্মণ্যও হন, তাঁহাদের পুত্রেরা শ্রেষ্ঠ হইয়া সেই ক্ষতি বহু পরিমাণে পূরণ করেন। এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। দেশে বীরপুরুষের অভাব হইলে প্রাণবলে বলীয়সী শ্রীশ্রীমতী লক্ষ্মীবাই, জোয়ান অব্‌ আর্ক প্রভৃতি সৈনিকবাহিনী পরিচালনায় অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও যে রমণী কর্ত্তৃক সৈনিকবাহিনী গঠিত হইয়াছে তেমন দেখা যায় না। বর্ত্তমানে

আমাদের গৃহ ধ্বংসপ্রায়, রমণীগণ নিপুণা গৃহিণী হইয়া আমাদের গৃহ রক্ষা করুন, তাহাকে সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠবদানকরতঃ সমুন্নত করিয়া তুলুন। তাহাতেই জাতি শ্রীসম্পন্ন হইবে, শৌর্য্যবীর্য্যেপূর্ণ হইবে, জগদ্বরেণ্য হইবে। গৃহহীন ভবঘুরেদের জাতিই নাই, তাহাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা আকাশকুসুমবৎ অলীক।

(২) যে সব বিষয়ে পুরুষদের প্রবল হওয়া উচিত সেই সব বিষয়ে স্ত্রীলোকেরা প্রবল হইয়া উঠিলে এবং পুরুষেরা তজ্জন্য স্ত্রীলোকদের মুখাপেক্ষী হইতে থাকিলে পুরুষদের এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতিরও অধঃপাত সুনিশ্চিত। দৃষ্টান্ত—ব্রহ্মা-জাতি।

(৩) স্ত্রীলোকদের 'অবলা' সংজ্ঞা এবং 'বিনাশ্রয়ে ন জীবন্তি বনিতাঃ' ইত্যাদি সংস্কার নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় বোধে তাঁহাদের 'সবলা' ও 'স্বাবলম্বনশীলা' করিবার জন্য কতিপয় পুরুষ ও শিক্ষিতা রমণী অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। দৈহিক শক্তিতে পুরুষ অপেক্ষা রমণীরা স্বভাবতই দুর্ব্বল; তজ্জন্য তাঁহাদের অবলা বলিলে তাঁহাদের অগৌরব হয় এমন মনে করিবার কি আছে? মনের বলে জননীগণ যে কত সবল, পতির ও পুত্রকন্যার কত উৎপাত, সংসারের কত ঝঞ্ঝাবাত তাঁহারা অম্লানবদনে সহ্য করেন তাহা দেখিলে তাঁহাদের মহাশক্তি স্বরূপিণী বলিয়াই ত মনে হয়, স্বতঃই তাঁহাদের চরণে মস্তক লুইয়া পড়ে। হিন্দুর গৃহে গৃহে এমন কত রমণী দেখা যায় যাঁহারা স্বীয় পতি অপেক্ষা রূপে বুদ্ধি বিচক্ষণতায় ও কর্ম্মনৈপুণ্যে অনেক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তজ্জন্য গুণহীন স্বামীকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করা বা অনুপযুক্ত মনে করত তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পুরুষান্তর গ্রহণের কল্পনাও তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। পরন্তু সেই স্বামীর সেবাতেই নিজকে কৃতার্থ মনে করেন; ফলে বহু সুপুত্র লাভ করিয়া গৌরবান্বিতা হন। সাসারকে সুখশান্তি পূর্ণ করা, শ্রেষ্ঠ সন্তানের জননী হওয়া যাঁহাদের কার্য্য, তাঁহাদের যেমন সবল সুপুষ্ট নীরোগ দেহ চাই, তেমনই দয়াধর্ম্ম পূর্ণ, স্বামীতে একান্ত নির্ভর ভক্তিপূর্ণ অন্তর চাই। তা' না হইলে তাঁহাদের গৃহও সুখশান্তির আলয় হয় না, তাহাদের সন্তানেরাও উচ্চগুণ সম্পন্ন হয় না, জাতিও উন্নত হয় না।

(৪) রস ও তৈলযুক্ত কোমল মৃত্তিকাতেই মধুর ফলশালী ও সারবান বিরাট বৃক্ষসমূহ জন্মে, কিন্তু মৃত্তিকা যখন নীরস কঠোর শিলারূপে পরিণত হয় তখন তাহাতে কোন সারবান বৃক্ষ জন্মে না। তেমনই যে সমস্ত রমণী পুরুষোচিত কঠোর কর্ম্ম আরম্ভ করেন, যাঁহাদের অন্তর কঠোর ও জটিল বিষয়ের চর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকে, সর্ব্বদা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া অগ্রসর হইতে ব্যগ্র থাকেন তাঁহারা বিদুষী ও বীরাঙ্গণা হইতে পারেন, কিন্তু তাহারা যে কোথাও শ্রেষ্ঠ সন্তানের জননী হইয়াছেন এমন দেখা যায় না। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, শিবাজি, যীশুখৃষ্ট, নেপোলিয়ান, গান্ধী প্রভৃতি মহাপুরুষদের জননীগণ বিদুষী ও বীরাঙ্গণা ছিলেন না, কিন্তু সকলেই দয়া ধর্ম্ম ও পাতিব্রত্যের আদর্শ ছিলেন। ঐ সমস্ত জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষগণ ব্যতীত প্রত্যেক দেশে যেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদেরও পশ্চাতে ঐরূপ এক একটি পুণ্যময়ী আদর্শ জননীকেই দেখিতে পাই। ইহাই হিন্দুর কাম্য। হিন্দু চায় দয়া ধর্ম্মে পাতিব্রত্যে বিভূষিতা কোমলপ্রাণা রমণীগণ জগদ্ধাত্রীরূপে গৃহে গৃহে বিরাজ করুন। অনেকে খনা গার্গী প্রভৃতির নাম করিয়া এবং মহর্ষি মনু "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ'—বচন তুলিয়া স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করেন। শিক্ষা বলিতে

শুধু আক্ষরিক শিক্ষা নহে, সংসারের বহু কার্য্যকরী শিক্ষাকেও বুঝায়। কার্য্যকরী শিক্ষা প্রায় সকল বিষয়েই আক্ষরিক শিক্ষা হইতে শ্রেষ্ঠ। তেমনই লক্ষ্মীবাই প্রভৃতির নাম করিয়াও ঘরে ঘরে বীরাঙ্গনা সৃষ্টির কল্পনাও কেহ কেহ করেন। পশুঘাতী অস্ত্রবলে বাহিরের দু'দশটা শক্র দমন করিয়া নয়, আত্মবলে অন্তরের ভীষণ শক্রসমূহকে দমন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে যাঁহারা জয় করিতে পারেন তাঁহারাই প্রকৃত বীর। হিন্দুর গৃহে তেমন বীরাঙ্গণার অভাব এখনও হয় নাই। খনা গার্গী মৈত্রী প্রভৃতি বিদ্বৎসাম্রাজ্যের ও লক্ষ্মীবাই প্রভৃতি বীরসমাজের গৌরব বটে কিন্তু দু'দশটা খনা গার্গী লক্ষ্মীবাই না থাকিলেও ভারতের কোন ক্ষতি হইত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কৌশল্যা প্রভৃতি জননীর বা সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি পতিব্রতা সতীর একটি না থাকিলে ভারতের, তথা জগতের কত ক্ষতি হইত কেহ ধারণা করিতে পারেন কি?

(৫) প্রশ্ন হইতে পারে, বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ বা স্বরাজ আন্দোলনে রমণীদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাহা কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরের রাস্তায় নহে, পল্লীর গৃহে গৃহে প্রত্যেক গৃহের মা ভগ্নী বধূ ও কন্যারা যদি চরকার বা টাকুতে সূতা কাটিয়া তদ্দারা স্বীয় পরিবারের উপযোগী বস্ত্রাদি নিকটবর্ত্তী তাঁতিদের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া লয়েন, গ্রামের কোন গৃহে মদ গাঁজা বিলাতী বস্ত্র বিলাতী লবণ, কোনরূপ বিলাসদ্রব্য তামাক বিড়ি সিগারেট চা প্রভৃতি প্রবেশ করিতে না দেন, কোন বালক বালিকাকে স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইতে না দেন, তবেই ত স্বরাজ অচিরে আমাদের হাতে আসিবে। গৃহের ও পল্লীর সংস্কারে মহিলাদের অপরিসীম শক্তি ও প্রভাব রহিয়াছে। লেখনী চালনায়, বক্তৃতায় বা সত্যাগ্রহে নহে, আত্মকর্ম্মে। সেদিকে কাহারো দৃষ্টি নাই, কোন শিক্ষিতা মহিলাকে নিজের পল্লীভবনে আসিতে দেখি না। আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের অন্ততঃ ৫০ জন শিক্ষিতা রমণী কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে আছেন, তাঁহাদের ৫ জনও যদি এই ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বগ্রামের অপর সকল মহিলাকে জাগ্রত করিতে আসিতেন তবে এক মাসের মধ্যেই তাঁহারা উহাকে আদর্শ পল্লীতে পরিণত করিতে পারিতেন। কিন্তু সহরেরর দ্বিতল ত্রিতল ভবনের বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা, কলের জল মটোরগাড়ী প্রভৃতির বিলাসব্যসন ত্যাগ করিতে যে তাঁহারা পারেন না। অথচ যেখানে ভয়ানক আশঙ্কা রহিয়াছে, বিশেষতঃ মহাত্মাজির আদেশানুসারে সর্ব্বপ্রকারে অত্যাচারিত হইয়াও অঙ্গুলী সঞ্চালনের অধিকার নাই, সেখানে তাঁহাদের যাওয়ার এত ব্যগ্রতা কেন? যাহারা সুকুমার শিশুদের···লাঠি চালাইতে পারে, কোষ ও উপস্থকে বুটের আঘাতে নিষ্পেষিত করিতে পারে, যুবতী মহিলাদের উপর তাহারা পাশবিক অত্যাচার করিবে না, এমন ভরসা আছে কি? তৎসম্বন্ধেও কি লোমহর্ষণ কাহিনী দেশমধ্যে প্রচারিত হয় নাই?

নব্য ভাবাপন্ন রমণীদের সম্বন্ধে আমার সংশয় সত্যমূলক না হইতেও পারে। তজ্জন্য যেই সমস্ত বৈজ্ঞানিক দেহতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উক্তরূপ সংশয়সমূহ দূরীকরণের চেষ্টা করিলে উপকৃত হইব। আরো একটু স্পষ্ট করিয়া বলি, —আমাদের চিরাগত সংস্কার এই যে জনক জননীর দৈহিক অবস্থা অপেক্ষা মানসিক অবস্থাই সন্তানের দৈহিক ও মানসিক শক্তিগঠনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। ইহাতে প্রকৃতির বা বিধাতার বিধান অপেক্ষা জনক জননীর কৃতিত্বই প্রবলতর, ইহাতে মানব নিজেই নিজের নিয়ন্তা পশুপক্ষীরা

জনক-জননীর প্রকৃতি ও শক্তিই লাভ করে। মানব তেমন করে না। মানব সমাজে সর্ব্বদাই দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ জনক জননীতে নিকৃষ্ট সন্তান নিকৃষ্ট জনক জননীতে শ্রেষ্ঠ পুত্র কন্যা জন্মিতেছে। আবার একই জনক জননীর ৫টি সন্তানের একটি বহুগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ, অপরগুলি গুণহীন নিকৃষ্ট হয়, পাঁচটি পাঁচ রকমেরও হয়। ইহার মূল জনক জননীর—বিশেষভাবে জননীর মনের অবস্থা বা আত্মশক্তি। এজন্য বিবাহ বন্ধনের সময় হইতে পতি পত্নী মিলিয়া যেন সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং পত্নী যেন শ্রেষ্ঠ সন্তানের জননী হইতে পারেন তেমনভাবে তাঁহাদের মনগঠনের নিমিত্ত হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা বিবিধ দৈবানুষ্ঠান ও আচার প্রথার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রমণীগণ নিজেদের নিত্য অনুষ্ঠেয় অন্যান্য কর্ম্মের সহিত তৎসমস্তকে অগ্রাহ্য করতঃ শুধু বীরোচিত শরীরচালনায় বা বিজ্ঞোচিত মস্তিষ্ক চালনায় যে সফলতা লাভ করিবেন তদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ হইবে, কি বহু অকল্যাণ হইবে,—পাশ্চাত্য জগতে রমণীদের যথেচ্ছাচারের প্রাবল্য দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াও তাহার বিচার করিতে হইবে।—শ্রীকালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

মাস-পঞ্জি—ফাল্গুন, ১৩৩৭

ভাইসরয় লর্ড আরউইন ও মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎকার চলিতেছে—বিগত ১৯৩০-৩১ সনে ভারতীয় রেলপথ সমূহে পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে—ভারতের বয়কট আন্দোলন স্থগিত হইবে বলিয়া লিবারপুল ও নিউইয়র্কে কার্পাসের দর চড়িয়া গিয়াছে—বোম্বাই প্রদেশে গত ১৯৩০-৩১ সনে এক কোটি টাকা কম কর আদায় হইয়াছে—রেঙ্গুনে একটী নূতন হারবার খোলা হইল—জয়পুরের মহারাজার মৃত্যু হইয়াছে—বিগত ১৯২৫ হইতে ১৯৩০ সন পর্য্যন্ত ৫৭ জন ভারতীয় ও ৪৯১ জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ভারতীয় সৈনিক বিভাগে অফিসারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন—ভাইসরয় ও গান্ধী সংলাপের ফলে শান্তির সম্ভাবনা বলিয়া প্রকাশ—রেলওয়ে বোর্ডে একজন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করিবার কথা হইতেছে—পিকেটিং ব্যাপারে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি প্রয়োগে মহাত্মা গান্ধী তীব্র নিন্দা করিতেছেন—ফিজি দ্বীপে ভীষণ ঝড় হইয়া বহুলোকের প্রাণনাশ ঘটিয়াছে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভকেশন উৎসব বহু পুলিশ পাহাড়ার ব্যবস্থাতে সমাহিত হইয়াছে—সংবাদ এই কংগ্রেস ওয়ার্কিংকমিটি ভাইসরয়প্রদত্ত সন্ধির সর্ত্তে সন্তুষ্ট নহে। গ্রীসের মধ্য দিয়া ভারতে আসিবার বিমান যাত্রার পথ গ্রীস-গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন—বঙ্গের জমিদার-দিগের গভর্ণমেণ্ট হইতে টাকা কর্জ্জ দিবার জন্য এক আবেদন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইয়াছে—সেন্‌সাসের প্রাথমিক গণনা অনুসারে বঙ্গের লোকসংখ্যা শতকরা ৮.৯ জন বৃদ্ধি হইয়াছে—পুনরায় প্রকাশ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আরউইন-গান্ধী সন্ধি-সর্ত্তে সম্মতি দিতে প্রস্তুত—ভারতের অণ্ডার সেক্রেটারী আর্ল রাসেলের মৃত্যু হইল—গান্ধী-আরউইন সন্ধি-সর্ত্তে ভারতে 'সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স' সংগ্রাম স্থগিত থাকিবে, বয়কটও জোরে চলিবে না, তবে দেশীয় শিল্পের উন্নতিতে

তৎপরতা থাকিবে—পুলিশের অত্যাচার সম্বন্ধে সরকার অবধান করিবেন—রাজনৈতিক অপরাধি-দিগকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব। এতদ্ ফলে কংগ্রেসপক্ষ গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশনে যোগ দান করিবে—পার্লেমেন্টের সভ্য মিঃ চার্চ্চহিল সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে ভারত সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের উপস্থিত কার্য্যাবলী বিমূঢ়তার পরিচায়ক—মিঃ হেনরী স্নেল ভারতের অণ্ডার-সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন—আরববাসীরা ইহুদি দিগকে বয়কট করিবার নীতি অবলম্বন করিয়াছে—হেম্বার্গের এক সভায় ১৫০০ কমিউনিষ্ট গ্রেপ্তার হইয়াছে—নানা স্থানে সিভিল-ডিসওবিডিয়েন্স-বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে—হাউসঅব কমন্স সভাতে ভারত মন্ত্রী ওয়েজউড্‌বেন জ্ঞাপন করিয়াছেন যে গোল টেবিলের সভা পুনঃ আগামী হেমন্তে বসিবে—স্পেনের বিদ্রোহ ব্যাপারে ৮১ জন সৈনিক কর্ম্মচারী সাময়িক বিচারের অধীনে আছে—মহাত্মা গান্ধী আহম্মদাবাদ যাইতেছেন ও বলিয়াছেন যে যত দিন স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন তিনি তাহার আশ্রমে প্রবেশ করিবেন না—"Purna Swaraj will be achieved if the Congress is satisfied with the constitution evolved at the next Round Table Conference. Such a result can be achieved only if the Congress at its Karachi session ratifies the Delhi peace pact and decides to attend the Round Table Conference " এই মহাত্মার উক্তি—এসেম্ব্লী সভাতে মুসলমান সভ্যগণ বলিতেছেন যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ সমস্যা নিরাকরণের নিমিত্ত ভাইসরয়কে প্রেসিডেণ্ট করিয়া একটা Reconciliation Board স্থাপিত হউক—আসামের অধিবাসী সংখ্যা বিগত দশ বৎসরে শতকরা ১৫.৪ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে—বিহার ব্যবস্থাপক সভাতে সরকারের খরচ কমাইবার নিমিত্ত একটা প্রস্তাব পেশ হইয়াছে—বোম্বাইর গভর্ণর ইউরোপীয় বণিক দিগকে বলিয়াছেন যে কংগ্রেস সহ সরকারের সন্ধি স্থাপনে ভবিষ্যতে তাহাদিগের মঙ্গল হইবে—বিলাতে রাউণ্ড টেবিল সভার বৈঠক বসিবে বলিয়া মহাত্মা সম্মতি দিয়াছেন—মুক্ত কংগ্রেসকর্ম্মিগণ করাচিতে এ বৎসরের স্থগিত কংগ্রেস-অধিবেশনের আয়োজন করিতেছেন।

ভারতের সাধনা

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

দ্বিতীয় বর্ষ] চৈত্র—১৩৩৭ [ষষ্ঠ সংখ্যা

সাধনারপথে

সাহিত্য ও সাধনা

ভাষা ও চিন্তার মধ্যে সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ একথা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। ভাষাতেই চিন্তার সমৃদ্ধি, আবার চিন্তার প্রসার ও প্রপূর্ত্তি দ্বারা ভাষার পরিপুষ্টি। মানুষের এমন সুস্পষ্ট ভাষা-সম্পদ্ আছে বলিয়াই চিন্তা জগতে সে এত উচ্চ—জীব জগতের শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী। মানবের সাধনা বা সকল প্রকার প্রকর্ষের ভিত্তি আবার এই চিন্তা-শক্তি। তাহা হইলে লোকের সাধনা ও ভাষার সম্বন্ধও অতি নিকটবর্ত্তী।

সাধনা ও ভাষার এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মিলন-ক্ষেত্র সাহিত্য। সাহিত্যে সভ্যতা বা সাধনার বিকাশ, আবার সাহিত্যে ভাষার পরিপূর্ণতা। জগতের কোন জাতি কত খানি উন্নতি বা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহার নিদর্শন তার সাহিত্যে। লোকের ব্যক্তিগত প্রকৃতির প্রকাশ যেমন তার ভাষা বা কথনে, জাতির প্রকৃতির বিকাশ হয় তেমনই সাহিত্যে। তবে জাতি যেমন ব্যক্তিসমষ্টির উপাদানে গঠিত হইলেও তার অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব বা ঐশ্বর্য্য নির্ভর করে তাহাদের কোনও বিশেষ সাধনার বলের উপরে, তেমনই সাহিত্য ভাষায় গ্রথিত হইলেও তাহার সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বিভব ও স্থায়িত্ব লোক চরিত্রের বিশেষ কোনও সাধনার সাপেক্ষ। বিভিন্ন জাতির সাহিত্য তাহাদের সাধনার অনুযায়ীই গড়িয়া উঠে এবং গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারা জাতীয় প্রকৃতির অন্তর ও বাহির দুই দিক নির্দ্দেশ করে।

ভারতের সাধনা ও সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় প্রকৃতির এই ভিতর বাহির দুই দিকের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান। ভারতীয় সাধনার যে বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য্যকে আজও মানব

সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য তাহার প্রাণ-সঞ্চার করিয়া তাহাকে শরীর দান ও সুসম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সে শরীর সবল কি দুর্ব্বল, জীবিত কি মৃত, সে বিচার কোন সাময়িক উত্তেজনা বা ভাব-বিহ্বলতা দ্বারা হইতে পারে না। সংস্কৃত ভাষার প্রাণ আছে কি না, কিম্বা তাহা মৃত ('dead language') ইহার নির্ণয় করিতে হইলে ভারতের সাধনার সঞ্জীবনী শক্তি কিরূপ তাহারই ধারণা করিতে হয়। সে শক্তি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ বা অবিশ্বাস নাই, বিপক্ষ পক্ষকেও ইহা মাথা হেট্ করিয়া স্বীকার করিতে হয়। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে সেদিনও এরূপ কথা শুনা গিয়াছে যে,—'ভারতের বৃটিশ রাজত্বের অবসান হইবে, কিন্তু ইহাদের এই সাহিত্য সম্পদ তাহারও বহুকাল পর পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে; আর ভারতবর্ষ যে অতুলনীয় ধন ও শক্তির ভাণ্ডার তাহা হয়ত লোকে ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু এ সম্পদ কখনও লুপ্ত হইবে না।,—এ উক্তি আধুনিক সময়ের কোনও বিপ্লব-পন্থী বা নৈষ্ঠিক প্রাচীন মতাবলম্বীর নহে—ভারতেয় সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান ব্রিটিশ রাষ্ট্র নির্ম্মাতার লিখিত অভিমত *। ভারতের ধন, ঐশ্বর্য্য এবং রাষ্ট্রশক্তি এ সমুদয় অপেক্ষা সংস্কৃত সাহিত্যসম্পদ শ্রেষ্ঠ। কারণ উহা ভারতের সাধনারূপী প্রাণশক্তির ধারক ও সংরক্ষক।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতশিক্ষা

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সংস্কৃত-ভাষা-শিক্ষাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার অবশ্য-পাঠ্য বিষয়-তালিকা হইতে বহিষ্কার করিতে প্রায় কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। আরও দুই একবার এইরূপ প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই; সমাজে তখন দুই চারি জন প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তাহাদের মতামত ও প্রভাব বলবৎ বলিয়া গণ্য হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক গণের মধ্যেও তখন আধুনিক ভাঙ্গন-প্রবণ ভাবের প্রসার এত দূর বৃদ্ধি পাইয়া উঠে নাই। যেরূপ আয়োজন হইয়াছে, তাহাতে সংস্কৃতের সহিত সত্য সত্যই হয় ত লেখাপড়াজানা হিন্দুর ছেলের কোন পরিচয়ই আর থাকিবে না। এখন যে প্রণালীতে সংস্কৃত শিক্ষা হয়, তাহাতেই যে সকল হিন্দুর সংস্কৃত ভাষার সহিত সমুচিত পরিচয় থাকে বা সকলে সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে পারে তাহা নহে; তথাপি হিন্দু বা ভারতীয় জীবনের দৈনন্দিন ক্রিয়া কলাপের অনেক বিষয় যাহা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলের কর্ণগোচর হয়, তাহা শুনিয়া মর্ম্মার্থ বুঝিবার অবসর অনেকের হইত। লোকের সাধারণ ধর্ম্ম জীবন বা সামাজিক জীবনের কথা ছাড়িয়া দিলে, নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই উহার এক বিশেস আবশ্যকতা আছে। অনেকে আছেন, যাঁহারা কেবল মাত্র সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অবসর পাওয়াতেই পরিণামে পাণ্ডিত্য-গৌরব অর্জ্জন করিয়া কৃতী হইতে পারিয়াছেন; বিশ্ববিদ্যালরের প্রবেশ করিবার কালে হয়ত ইহাদের সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ বা সংস্কৃত পড়িবার বিশেষ কোনও প্রবৃত্তি জন্মিবার হেতুই ছিল না—কেবল মাত্র বাধ্য হইয়া সংস্কৃত

* Their writings will survive when the British dominion in India shall have long ceased to exist and when the sources it once yielded of wealth and power are lost to remembrance—*Warren Hastings* in Wilkin's Translation of the *Bhagavat Gita.*

পড়িতে যাওয়াতে উহার প্রতি অনুরাগ স্ফুরিত হইয়াছে এবং ক্রমে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে পাণ্ডিত্যের অধিকারী করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ কৃতী সন্তানগণের সংখ্যা অল্প নহে। বরং বলা যাইতে পারে যে, যে সকল পণ্ডিত—অধ্যাপক, 'ডাক্তার' বা আচার্য্য এ যাবত বিশেষ কোনও গবেষণা বা তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা কৃতীত্ব অর্জ্জন করিয়া এদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশকেই কোনও না কোনও প্রকারে সংস্কৃত ভাষাও সংস্কৃত সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ ও পর্য্যালোচনা করিতে হইয়াছে। ভারতীয় বিদ্বান ও পণ্ডিত দিগের নিজস্ব বলিয়া যদি কোনও বিষয় থাকিয়া থাকে, তবে তাহা সংস্কৃত। সে জন্য সংস্কৃতকে অন্য সকল 'ক্লাসিক্যাল' বা প্রাচীন ভাষার সামিল না করিয়া উহাকে এদেশের উচ্চ শিক্ষায় এক স্থায়ী আধার রূপে গ্রহণ করা আবশ্যক। এজন্যই নিম্নশিক্ষার অবস্থাতে উহার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। অন্যথা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে মহা আত্ম হননের কার্য্য হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে যে মনোবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ এক্ষণে সংস্কৃত শিক্ষাকে এক অনাবশ্যক আবর্জ্জনা বলিয়া বর্জ্জন করিতে যাইতেছেন, তাহারও পরীক্ষণ হওয়া আবশ্যক। যে কালের স্রোতে বিহ্বল হইয়া লোকে আজ প্রকৃতকে ছাড়িয়া বিকৃতের দিকে ছুটিয়াছে—সাময়িক উত্তেজনার স্বার্থে সত্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে—নানা দিকে তরল মস্তিষ্কতা অনাচার ও অসংযমের সৃষ্টি হইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ সতর্ক থাকার আশা করা যায়।

মানব সভ্যতার জন্ম-ভূমি

মিঃ জে-বি হেল্ডেন বিলাতের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দিগের একজন। নৃ-তত্ত্বের আলোচনাতে তাহার খ্যাতি আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের রয়েল ইনষ্টিটিউট্ নামক সভাতে তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মানবের আদিম সভ্যতার ভূমি বলিয়া যে সকল স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে পঞ্জাব ও আফগানি স্থানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ একটী। অন্য স্থান ইজিপ্ত বা প্রাচীন মিসর। এতদ্ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিতে চাহেন যে—এতাবৎ কাল সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস ছিল যে মানবের আদি জন্মভূমি ভূপৃষ্ঠের কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে হইয়া থাকিবে—তাহাই ইডেনের উদ্যান ভূমি (?) মিসর, চীন বা অন্য কোনও স্থানে অবস্থিত; কিন্তু এখন মনে হয় যে মানবকুল পৃথিবীর চারিটী স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে আপনাদের জীবন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রিত রক্ত পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক হেল্ডেন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। জাগতিক তত্ত্বের আরও বহু সিদ্ধান্তের (theory) ন্যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকের এই অভিনব অভিমতেরও মূল্য আছে ও থাকিবে। তথাপি বলিতে হয়, আধুনিক বিজ্ঞানে কেবল মাত্র সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু-জ্ঞানেতেই মানব বিচারের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া যে গণ্ডীর সৃজন করা হইয়াছে, তাহাতে চরম কোনও সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইতে পারে না। তবুও দেখিতে পাওয়া যায়, অধুনাকার এই বিজ্ঞানের প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন অনেক মতবাদের সামঞ্জস্য প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। মানবীয় সভ্যতার ইতিহাসে বৈদিক যুগের হিন্দুদিগের স্থান সর্ব্বপ্রাচীন, একথা আজ সকল দেশের পুরাবৃত্ত

বিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। হিন্দুগণ নিজে তাহাদের স্থিতি বা আদিম জন্মভূমি কোথায় ছিল, তাহা লইয়া কোনও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত বা প্রচার করিয়া যান নাই—হিন্দুর প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্ম্মগ্রন্থাদির সাধারণ ভাব হইতে ইহা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যে ভারতেই তাহাদিগের আদি নিবাসভূমি ছিল। অধ্যাপক হেল্ডেন প্রাচীন মানব সভ্যতার ভূমি বলিয়া যে দুইটী স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহার মধ্যে ভারত একটী। কে জানে যে আরও গভীরতর গবেষণার প্রকৃষ্ট দৃষ্টি বলে ভারতবর্ষকেই বর্ত্তমান বিজ্ঞান মানবের আদিম সভ্যতার ভূমি বলিয়া গ্রহণ করিবে না?

বর্ত্তমান পদ্ধতিতে ভারতীয় পণ্ডিতগণ এ যুগে ভারতীয় সভ্যতার আদিম অবস্থান ও অবস্থাদি সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় তাঁহার 'ঋগ্‌বেদের সাধনা'—"Rigvedic culture" নামক পুস্তকে যে কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞানবিদ্‌ অধ্যাপক হেল্ডেনের আধুনিক অভিমত তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছে। উহার একটী অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—"That the Vedic civilisation was evolved in *Sapta Sindhu* (the ancient name of the Punjub) … …..Mention of some of the well-known Punjab rivers in the hymns of the Rigveda and of the Himalaya mountain and of the Mujavat peak on which Indra is said to to have been born and of Gandhara and some of the rivers of Bactria, goes firmly to establish the original cradle of the Aryans in Sapta Sindhu which included the beautiful valley of Kashmir and parts of Bactria on the north and Gandhara on the west. etc."—অর্থাৎ দাস মহাশয়ের মতে উত্তরে কাশ্মীর ও বক্ত্রীয় দেশ ও পশ্চিমে গান্ধার লইয়া পাঞ্জাব প্রদেশের প্রাচীন সপ্তসিন্ধুই আর্য্য সভ্যতার শিশুশয্যা? তাহার এই অভিমত প্রধানতঃ ঋগ্‌বেদের আন্তরিক প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত; বাহিরের নৃতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বাদি বিদ্যাও এ মতের সমর্থন করিয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুরাতাত্ত্বিক সার আর্থার কীথ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মানবজাতির জন্মস্থানই ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী স্থান, কারণ তথায় এমন সব জীব-কঙ্কাল পাওয়া যাইতেছে, তাহা ক্রমবিকাশের স্তরে মনুষ্য জাতির সন্নিকটবর্ত্তী—যদিও ঠিক্ ঠাক্ মনুষ্য-কঙ্কাল তেমন পাওয়া যাইতেছে না। অনেক নৃ-তত্ত্ববিদ্‌ এখন এই মতের সমর্থন করিয়া থাকেন।

রাষ্ট্রে বাঙ্গলা

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বঙ্গদেশের অবস্থা ও স্থান আজ অতি নিম্নে, এজন্য অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহারা কার্য্যতঃ রাষ্ট্রক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকের পরিচালনা করিতেছেন, তাহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালীর স্থান এখন নাই বলিলেই চলে। ইহার উপর শাসন-

নীতির অত্যধিক নিষ্পেষণ, বিভিন্ন জাতির আর্থিক নির্যাতন, রোগ—তাপ—দারিদ্র্য বাঙ্গালীর উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান রাষ্ট্রসংস্থা সর্ব্বপ্রকারেই বাঙ্গলাকে ক্ষীণ করিবার পক্ষে।

তারতম্য আজ এত তীব্র হইতেছে এই জন্য যে, বাঙ্গলাই এ পর্য্যন্ত ভারতের জাতীয় জাগরণের অগ্রণী ও জাতীয় কর্ম্মধারার পথ-প্রদর্শক হইয়া আসিতেছিল। আর এখনও বাঙ্গলার ভাবসম্পদ ও ত্যাগমূলক কর্ম্মন্যতা অতুলনীয় রহিয়াছে। লোকের সাফল্য নির্ভর করে প্রধানতঃ দুইটী বিষয়ের উপর—তার নিজ আন্তরিক শক্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। বাঙ্গালীর আন্তরিক শক্তির অভাব নাই কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাঙ্গালী দিন দিনই ব্যতিব্যস্ত ও হীনবল হইয়া পড়িতেছে। ফলে তার আর স্থির স্থিতি এমন মিলিতেছে না যেখান হইতে সুস্থ ও সবল ভাবে কর্ম্মধারা পরিচালন করে। এজন্য যে শিক্ষা ও আদর্শ সম্মুখে রাখা আবশ্যক তাহারও একান্ত অভাব। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়া বাঙ্গালীকে দিন দিন আন্তরিক শক্তি হারাইতে হইয়াছে ও আরও হারাইতে হইবে। বাঙ্গালীর ভাবুকতা আছে কিন্তু তাহা কোনও কর্ম্ম-পথ খুঁজিয়া পায় না; অন্তরের তীব্র প্রেরণা আছে, কিন্তু বাহিরে তার পথ নাই; ঐকান্তিক কর্ম্মলালসা রহিয়াছে কিন্তু ক্ষেত্র নাই, সম্ভাব্য শক্তি আছে, তার স্ফুরণের উপায় নাই—দিন দিন তাহা আরও অধিক নিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

এই চাপ ও বাঁধনের মধ্যে বাঙ্গালীকে বাঙ্গলার ভাবে চালাইয়া লইতে পারে, এমন কেহ নাই। বাঙ্গলা এখনও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, শ্রেষ্ঠ কবি ও ঔপন্যাসিককে ক্রোড়ে করিয়া আছে, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ্, শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ সাধকের গর্ব্ব করিতে পারে। কিন্তু ইঁহারা কেহই বাঙ্গলার অন্তরের বস্তুকে অধিকার করিয়া নাই—ভিতর বাহিরের সমুদয় বাঁধা কাটাইয়া বাঙ্গালীকে স্থির লক্ষ্যে চালাইয়া লইতে পারিতেছেন না। সমগ্র বাঙ্গলার একটী বাঙ্গালী প্রকৃতি আছে, তার এক বৈশিষ্ট্য আছে; তাহাকে সংযত ও সুপরিচালিত করিয়া এক দিকে লইয়া চলিতে পারে, এমন কিছুই নাই। সে স্রোত কোথা হইতে উদ্ভূত, কোন্ দিকে তার গতি তার সন্ধান নাই। ফলে অবরোধ-গতি শক্তির ন্যায় বাঙ্গলার প্রতিভা ও বল আজ চতুর্দ্দিকে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে বিচ্ছুরিত হইয়া চলিয়াছে। বিভিন্ন দিকের চাপে তাহার বিনাশের আশঙ্কাও আছে। এই নানা দিগুন্মুখীন বিক্ষিপ্ত শক্তিই এখন মতভেদ, দলাদলি, চাপল্য ও ব্যভিচারের নানা মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছে।

এক রাষ্ট্র ক্ষেত্রেই দলাদলির সীমা নাই। যে রাষ্ট্র-মত এখন সমগ্র ভারতের লোকে সাধারণ ভাবে মান্য করিয়া চলিয়াছে, বঙ্গদেশে তাহার যেমন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক একনিষ্ঠ সমর্থক ও অনুবর্ত্তন-কারীর দল রহিয়াছেন, তেমনই তাহার ঘোরতর বিরোধকারী পরিপক্ক মতেরও অভাব নাই; এই দুই চরম মতের মধ্য স্থলে নানাপ্রকার মতবাদ বিভিন্ন রূপে ক্রিয়া করিতেছে। এবং যাহারা রাষ্ট্রের নায়ক বলিয়া পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন,—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে যাহারা আধিপত্য করিতেছেন এবং অন্য প্রকারে যাহারা কংগ্রেসের অনুবর্ত্তন করেন—তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে বিবাদ আজ বহুদিন হইতে চলিতেছে, তাহা একদিকে যেমন জাতীয় শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া চলিয়াছে, অপর দিকে তেমনই বাঙ্গালীকে অপরের নিকট হেয় ও অবজ্ঞেয় করিয়া রাখিবার সুযোগ দান করিতেছে; আজ দলাদলি লইয়াই বাঙ্গলার উচ্চ মুখ ছোট হইয়া গিয়াছে,

বাঙ্গলা আজ অপর সকলের নিকট কৃপার পাত্র ও উপদেশ পাইবার জন্য লালায়িত। যদি কাহারও তেমন ব্যক্তিত্বের জোর থাকিত, অথবা উচ্চ কোনও নীতির বশে কাজ করিতে পারিত, তবে যে ক্ষুদ্র স্বার্থ আজ এই অপমানের বোঝা বাঙ্গলার শিরে ক্রমশঃ অধিক চাপাইতেছে, তাহার প্রতীকার ইহারা নিজেই করিতে পারিতেন। কাহাকেও অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না, মুখ গম্ভীর করিয়া বলিতে হইত না—তোমাদের ঝগড়া মিটাইয়া ফেল। লজ্জা ও অপমান সকলকে সহিতে হইতেছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে যাহা সমাজেও তাহাই—একদিকে যেমন সংস্কারের তীব্র আন্দোলন সমাজ, গৃহ ও ব্যক্তিগত নীতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার নানা আয়োজন চলিয়াছে, অপর পক্ষে তাহার প্রতিকার কল্পে নানা ভাবনা ও চেষ্টাও বাঙ্গলাতেই অধিক দেখা যাইতেছে। বাস্তবিক এক প্রদেশে এমন বিভিন্ন ও বিরোধী শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া আর কোথায় দেখা যায় না। জাতীয় কর্ম্মধারার কোনও বিহিত উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে এ সকল বিরোধী ভাব ও তাহার প্রকৃতি অবধারণ করিয়া চলিতে হইবে।

বস্তুতঃ বাঙ্গলার সর্ব্ব প্রকার কার্য্যাবলীর সহিত ভারতের সাধারণ সাধনার ধারার একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এ যুগে ভারতীয় সাধনার প্রধান উত্তরাধিকার পড়িয়াছিল বাঙ্গলার উপরে। মধ্যযুগে বিদেশীর আক্রমণের সংঘর্ষ ও নানা প্রকার বিজাতীয় নির্য্যাতনে ভারতীয় সাধনার প্রধান কেন্দ্রস্থান গুলি বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী বঙ্গদেশ তখন উহার সংরক্ষণও প্রসার সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল—বিজাতীয় ভাবকেও সে অনেকটা আপন সাধনার বশে আনিতে পারিয়াছিল। বিদ্যাও জ্ঞান চর্চ্চার অপূর্ব্ব প্রসারসাধন তখন বাঙ্গলাতে হয়, সাহিত্য ও কলার নূতন উন্মেষ দেখা দেয়, ধর্ম্মের নূতন বিধি ও নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাবে বাঙ্গলার স্বকীয় সাধনার এক ভিত্তি তখন সংগঠিত হইয়া উঠে। তাহার উপর দাড়াইয়া সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্যের নব আগত শক্তি ও সাধনার সম্মুখীন হইবার ভারও ভারতে সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গলার উপরই সংন্যস্ত হইয়াছিল। নব্যভারতের ইতিহাসে সে এক গুরুতর অবস্থা। প্রাশ্চাত্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই বাঙ্গালীর মনোবৃত্তির উপর তাহার প্রভাব কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা অনেকেই অবগত আছেন; কিন্তু অচিরে তাহার প্রতিক্রিয়া রূপে বাঙ্গলা যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে পারিয়াছিল তাহাও কম লক্ষণীয় বিষয় নহে। ইহারও মূল শক্তি আসিয়াছিল বাঙ্গলার সেই সাধনাগত আত্ম-চৈতন্যের আধার-ভূমি হইতে। এবং তাহারই ফলে এ যুগে বঙ্গদেশ হইতে ভারতের সকল প্রকার জাতীয়তার প্রস্রবণ উৎসরিত হইয়া উঠিয়াছে—এক দিকে যেমন সাহিত্য ও কলাদিতে বঙ্গদেশ অসাধারণ বিকাশ দেখাইয়াছে, ধর্ম্ম, জনসেবা ও স্বদেশপ্রীতির নূতন ভাব তেমনই দেশমধ্যে জাগরিত করিয়া তুলিয়াছিল। জাতীয় জাগরণের সে উৎসই আজ সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছে—বাঙ্গলাকে এজন্যই ভারতের নব্য জাতীয়তার গুরু বলিয়া আর সকল প্রদেশ শ্রদ্ধা না করিয়া পারে না। আজ একথা ভুলিলে চলিবে না যে, বাঙ্গলার এই অসাধারণ কর্ম্মণ্যতার বীজ সেই ভারতের মৌলিক সাধনার ভূমি হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। বাঙ্গলা তাহার যে উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল, অদ্যকার বাঙ্গলার সকল প্রকার বাদ-বিবাদ, কর্ম্ম-বিমুখতা ও কর্ম্মোন্মুখীনতার সমুদয় সমস্যা সেই সাধনার দৃষ্টিতেই সমাধান করিতে হইবে—এবং তাহা করিতে পারিলেই নব্য ভারতে বাঙ্গলার সাধনার সার্থকতা সম্পাদন হইবে।

গান্ধী-আরউইন সন্ধি

মহাত্মা গান্ধী ও রাজ-প্রতিনিধি লর্ড আরউইনের পরস্পর সাক্ষাৎকারের ফলে এদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এ সাক্ষাৎকারে ভাইস্-রয় ও মহাত্মার পরস্পরের প্রতি সৌজন্য ও সুখ্যাতির পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে, যেন ইহাদের পরস্পরের ব্যবহারের নিমিত্তই এই সাক্ষাৎকার-ব্যাপার নিষ্ফল হইয়া যায় নাই। মহাত্মা কয়েকটী সর্ত্তে অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য মূলক জাতীয় সমর-প্রচেষ্টা স্থগিত করিয়াছেন, অন্য পক্ষে সরকার দলন-নীতির মূল অস্ত্র স্বরূপ অর্ডিন্যান্সগুলি প্রত্যাহার করিয়াছেন ও সত্যাগ্রহী বন্দীদিগকে মুক্তি দান করিয়াছেন। মোটামোটি এই সর্ত্তে জাতীয়-কর্ম্মী কংগ্রেস পক্ষ রাউণ্ড টেবিল সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করিয়া ভারতের ভাবী সংস্কার মূলক শাসন বিধি প্রণয়নের সহায়তা করিবেন। মহাত্মার এই নির্দ্ধারণ কংগ্রেস পক্ষ ও তৎসহ দেশবাসী মান্য করিয়া লইয়াছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মার মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, সন্দেহ নাই। এক বৎসর পূর্ব্বে মাত্র তিনি যে নীরব বিজয়ের অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন তাহা প্রায় অতীত হইতে না হইতেই দেশের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব কর্ম্মন্যতার উত্তেজনা উদ্দীপিত করিয়া, দেশের সর্ব্বত্র অসাধারণ ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহার এক প্রকার সমাপন করিয়া ফেলিলেন। ইহার কৃতিত্ব ও দায়িত্ব সমুদয়ই একমাত্র মহাত্মার। তথাপি প্রশ্ন উঠিতে পারে এ ব্যাপারে কাহার জিত হইল, কাহার হার হইল? এ গান্ধী-আরউইন রফা শেষ পর্য্যন্ত টিকিবে কি না? এ রফাতে শাসনকর্ত্তৃপক্ষের যে মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, তাহা কি প্রকৃত না উহা কেবল একটী রাজনৈতিক চাল মাত্র—মহাত্মা গান্ধী কি কোনও নূতন মায়াজালে আবৃত হইলেন? ইত্যাদি।

এই রূপ সংশয়ের প্রসার আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে অব্যবহিত পরবর্ত্তী কতকগুলি ঘটনা দ্বারা! এই সন্ধির চুক্তির পরই লর্ড আরউইনের কার্য্য কাল শেষ হইল। এই ব্যাপারে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব বা হাত থাকিয়া থাকিলে এই নীতি আর তেমন ভাবে অনুসৃত নাও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই সন্ধির অব্যবহিত পরই মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি দেশ নেতৃগণের অনুনয় অগ্রাহ্য করিয়া লাহোরে কতিপয় রাজনৈতিক অপরাধীর ফাঁসি হইয়া গিয়াছে! আবার মেদিনীপুরে অহিংসনীতির বিপক্ষে একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর জীবনহনন হইয়াছে। এইরূপ নানা অশান্তির কারণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার সরকার এই সাময়িক সন্ধির সর্ত্ত মানিয়া চলিতেছেন না বলিয়া যেমন অভিযোগ শুনা যাইতেছে, জনপক্ষে পিকেটিং প্রভৃতি ব্যাপারে সন্ধির নীতি প্রতিপালিত হইতেছে না বলিয়া সরকার পক্ষ অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।

কিন্তু এই সকলই সন্ধির সর্ত্ত মাত্র; উদ্দেশ্য তাহার অন্যরূপ। সে উদ্দেশ্য কার্য্যতঃ কি হয় বা না হয়, তাহা দ্বারাই গান্ধী-আরউইন সন্ধির সফলতা বা নিষ্ফলতার বিচার করিতে হইবে।

কংগ্রেস গোল টেবিলের সভায় যোগদান করে নাই বলিয়া উহার কার্য্য অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে; প্রথম সভার উপসংহারে একথা স্বীকৃত

হইয়াছে এবং দ্বিতীয়বার বৈঠকে যাহাতে কংগ্রেস পক্ষ যোগদান করিতে পারে, সে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হইয়াছিল। তৎপর লর্ড আরউইনের এই আপোষ-নীতি উক্ত সভায় কংগ্রেসের যোগদান করিবার পক্ষেই মাত্র সহায়ক হইয়াছে—এ সকল কারণে ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ দিগের নিকটে কংগ্রেস ও মহাত্মাগান্ধীর গুরুত্ব আরও অধিক করিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বিগত অধিবেশনে যাহারা ভারতের প্রতিনিধি বলিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদের দ্বারা ভারতের প্রকৃত দাবী বলিয়া কোনও বিষয় সভার বৈঠকে উপস্থিত হয় নাই। পক্ষান্তরে বিভিন্ন দলের লোক নিজ নিজ খণ্ড স্বার্থের কথাই তুলিয়াছিলেন। ভারতের অন্তরের কথা, ভারতের সাধনার কথা, অগণিত দুর্দ্দশাগ্রস্থ লোকের অভাব আকাঙ্ক্ষা ও আবশ্যকতার কথা কেহ বড় বলেন নাই। দলাদলি মত ভেদ ও সাম্প্রদায়িক বিরোধের কথাই চলিতেছিল। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা তাহাতে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছিল মাত্র। ইংরেজের রাজনৈতিক মনোবৃত্তি তাহার প্রশ্রয় দিয়াই চলিয়াছিল। তাহাদের অন্তরের কথা অনেক দিন পর্য্যন্ত বুঝিবার ও জানিবার বাকী ছিল। কিন্তু ইংরেজ জাতি উপস্থিত অবস্থা বুঝিয়াই কাজ করিয়া থাকে—প্রত্যক্ষ লক্ষণ দৃষ্টে প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে যায়, কোনও দূরবর্ত্তী নিদান খুঁজিতে চায় না। ভারতের প্রকৃত অবস্থা এবং কেবলমাত্র মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে অহিংস সংগ্রামের দ্বারা স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা চলিতেছে এবং যে নৈতিক শক্তি ও ত্যাগের বলকে এই সংগ্রামের পরিচালক শক্তি রূপে প্রয়োগ করিয়া ভারতের আত্মিক শক্তির এক নূতন পরিচয় দান করিয়াছে, আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি সমূহের অবলম্বিত হিংসামূলক পশুশক্তির উপরে তাহা যে আপন শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে যাইতেছে তাহাকে আর বিশ্বজগৎ অস্বীকার করিতে পারিতেছে না ; চতুর্দ্দিকে তাহার লক্ষণ দেখা দিয়াছে ও ব্রিটিশ রাজনীতিও আর ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। সে জন্যই গোল টেবিলে এই অহিংস সমর-কামীদিগের আসনগ্রহণের আয়োজন হইয়াছে। যদি ইহাতে সত্য সত্যই ইংরেজের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তবেই এই আয়োজন সার্থক হইবে। নচেৎ নহে।

সন্ধ্যোপাসনা

পুনর্ব্বার মার্জ্জন

প্রাণায়াম ও ব্যষ্টির আচমন শেষ করিয়া সন্ধ্যার সাধক পুনরায় জড় দেহে ও সমষ্টিতে ফিরিয়া আসিতেছেন। তিনি প্রথমেই নিজ দেহটিকে আবার মার্জ্জন করিতেছেন। পবিত্র হইতেছেন। আশ্বলায়ন স্মৃতিতে আছে যে আচমন শেষ হইলে আবার দেহ মার্জ্জন করিবে। মার্জ্জনের মন্ত্র :—

মন্ত্র ও অর্থ

আপো হিষ্ঠেতি সিন্ধুদ্বীপঋষি রাপোদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ পঞ্চমী বর্দ্ধমানা সপ্তমী প্রতিষ্ঠা অন্টম্যাদ্যানুষ্টুপ্ চ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

(১) ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্থান উর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে।

(২) ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ ন উশতী রিব মাতরঃ।

(৩) ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ।

(৪) ওঁ শন্নো দেবী রভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভি শ্রবন্তুনঃ।

(৫) ওঁ ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চ র্ষণীনাং। অপো যাচামি ভেষজং।

(৬) অপসু মে সোমোঽব্রবীদন্ত র্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবং।

(৭) ওঁ আপ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্‌চ সূর্য্যং দৃশে।

(৮) ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতংময়ি।
যদ্বাঽমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতং।

(৯) ওঁ আপোহদ্যান্বচারিষং রসেন সম গস্মহি। পয়স্বানগ্ন আগহি তং মা সংসৃজ বর্চ্চসা।

অর্থ—আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রের ঋষি সিন্ধুদ্বীপ, ছন্দ গায়ত্রী পঞ্চমী বর্দ্ধমানা সপ্তমী প্রতিষ্ঠা অষ্টম্যা দ্যানুষ্টুপ এবং এই মন্ত্রের বিনিয়োগ মার্জ্জনে করিতে হয়। আমরা ইতি পূর্ব্বেই এক হইতে তিন ঋচের অর্থ বলিয়াছি। বাকি মন্ত্রগুলির ভাবার্থ এইরূপ :—

আমরা জল পান করিয়া অভীষ্ট প্রাপ্ত হই। জল পান দ্বারা আরোগ্য লাভ করি। শস্যাদি সকল বস্তুই জলের সাহায্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাজেই একমাত্র জলই মনুষ্যের সুখ সাধন করিয়া থাকে। অতএব আমরা জলের নিকট সুখ প্রার্থনা করিতেছি। সোমদেব বলিয়াছেন জলের মধ্যেই জগতের সুখকর তেজ আছে ও সকল প্রকার ঔষধ বর্ত্তমান আছে। অতএব হে জল সকল আমার শরীরের যা কিছু পাপ, আমি যদি কাহারও কোন অনিষ্টাচরণ করিয়া থাকি, যদি সাধু ব্যক্তিদের অভিসম্পাত করিয়া থাকি, যদি মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি তাহা হইলে সে সব পাপ আমার শরীর হইতে দূর কর। আজ এইমাত্র আমি প্রাণাগ্নি হবনে জলের সার গ্রহণ করিয়াছি

হে জলান্তর্গতঃ তেজোময় পরমার্থ, তুমি উপস্থিত হও এবং স্বীয় তেজের দ্বারা আমাকে মার্জ্জিত ও পরিশোধিত করিয়া তোমার সহিত মিলাইয়া লও।

উপর্য্যুক্ত মন্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বোক্ত ব্যষ্টির আচমনটি হোম কার্য্য মাত্র। সাধক হোমান্তে জড় জগতে আসিয়া পবিত্রতার সংস্কার গ্রহণ করিতেছেন। এখানেও প্রার্থনা ক্ষুদ্র আমিতে নিবদ্ধ নহে। জগতের মঙ্গল সাধকের প্রার্থনা। জলের মধ্যস্থ তেজের সহিত নিজকে তেজোময় করিতে ব্যাকুল।

অঘমর্ষণ

আচরণ

আচমনরূপ হবন অন্তে ও শরীরের মার্জ্জন করিয়া সাধক প্রাণাগ্নি যজ্ঞে সংসকৃত অন্তঃকরণের পাপ গুলিকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছেন। তজ্জন্য তিনি জল নাসিকার নিকট ধরিয়া বাম নাসা দ্বারা পূরক করিয়া দক্ষিণ নাসার দ্বারা রেচকে পাপগুলিকে একত্র করতঃ বাম হস্ততলে নিক্ষেপ করিতেছেন। যথা—

ঋতমিত্যস্যাঘমর্ষণ ঋষির্ভাববৃত্তো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অশ্বমেধাবভৃতে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র—ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ ইত্যাদি (ইহা স্নান মন্ত্রে পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং অর্থও লিখিত হইয়াছে।)

এই অঘমর্ষণ মন্ত্রের ঋষি অঘমর্ষণ দেবতা ভাববৃত্ত, ছন্দ অনুষ্টুপ্ এবং ইহা অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নানে ব্যবহৃত হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে পূর্ব্বাচরিত কার্য্যগুলি একটি মহাযজ্ঞ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

প্রথমে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চিন্তা করিয়া সাধক অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া তুরীয় পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়াছেন। তাহার পর এই অঘমর্ষণ মন্ত্রে আবার সেই সমষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এখন তাই সেই সমষ্টির সূর্য্য যিনি সৃষ্টির আদি তাঁহাকে জলাঞ্জলি দিতেছেন।

প্রাতে ও সায়াহ্নে পূর্ব্বোক্ত গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষ্যাদি স্মরণানন্তর গায়ত্রী পাঠ করিয়া এই জলাঞ্জলি দিতে হয়। মধ্যাহ্নে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া জল দিতে হয়।

আকৃষ্ণেণ ইত্যস্য হিরণ্যস্তূপঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্য জলাঞ্জলি দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনাদেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।

আকৃষ্ণ ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি হিরণ্যস্তূপ দেবতা সবিতা ; ছন্দ—ত্রিষ্টুপ্ এবং ইহা সূর্য্যকে জলাঞ্জলি দিবার সময় প্রয়োগ করা হয়।

অর্থ

জগতের ধ্বান্তকে বলে সংহরণ করিয়া স্বপ্রকাশ জ্যোতি সূর্য্যদেব ভূলোকবাসী মর্ত্ত্যগণকে ও ভুবলোকবাসী অমর্ত্ত্য বা দেবগণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া হিরণ্ময় রথে আরোহণ করিয়া ভুবনকে প্রকাশমান করিয়া আগমন করিতেছেন।

প্রাতে ও মধ্যাহ্নে জলটুকু সূর্য্যের উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপন করিতে হয় এবং সায়াহ্নে তাহা ভূমিতে ফেলিতে হয়।

সূর্য্য বা আদিত্যকে দ্বাদশ ভাগে হিন্দুগণ দেখিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে (১) বরুণ, (২) অরুণ, (৩) সূর্য্য (৪) বেদাঙ্গ ও (৫) তপন এই পাচ ভাগ পূর্ব্বাহ্নে নিবদ্ধ এবং (১) গভস্তি (২) যম (৩) স্বর্ণরেতা (৪) দিবাকর ও (৫) বিষ্ণু সায়াহ্নে নিবদ্ধ। মধ্য সময়ে ইন্দ্র ও রবি বলিয়া সূর্য্যকে আহ্বান করা হয়। ইন্দ্র দেবরাজ বা দেবতার মধ্যে বলবান ও বজ্রধারী এবং পূর্ণতেজে যখন সূর্য্য রুদ্ররূপী তখন তিনি রবি। রবির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রেও আছে—অবতীমাং স্বয়োলোকাং তস্মাৎ সূর্য্য পরিভ্রমাৎ। অচিরাৎ তু প্রকাশেত অবনাৎ স রবি স্মৃতঃ। সুতরাং মধ্যাহ্ন সময়েই সূর্য্য পূর্ণ বলবান এবং তজ্জন্যই সাধক তাঁহার পূর্ণ তেজ ও বলের স্মরণ করিয়া উপাসনা করতেছেন। মধ্যাহ্নে তিনি সেই পূর্ণত্বকে ছুঁইতে চাহেন ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রাতে ও সায়াহ্নে বিশেষ কোন মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়াই গায়ত্রী দ্বারা উপাসনা করেন।

সূর্য্যোপস্থান

মন্ত্র প্রাতে—চিত্রং দেবানামিতি ষড়ৃচস্য কুৎসঋষিঃ সূর্য্যো দেবতাঽনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

(১) ওঁ চিত্রন্দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।

(২) ওঁ সূর্য্যো দেবী মুষসং রোচমানাং মর্য্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ। যত্রানরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতিভদ্রায় ভদ্রং।

(৩) ওঁ ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ। নমঃ সান্তো দিবঃ আপৃষ্ঠম্ স্থুঃ, পরিদ্যাবা পৃথিবী যন্তি সদ্যঃ।

(৪) ওঁ তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্ত্তোর্বিততম্ সঞ্জভার। যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রীবাসস্তনুতে সিমস্মৈ।

(৫) ওঁ তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্য্যোরূপং কৃণুতে দ্যো রূপস্থে। অনন্তমন্যদ্ রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সম্ভরন্তি।

(৬) ওঁ অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য নিরংহস পিপৃতা নিরবদ্যাৎ। তন্নো মিত্রোবরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উতদ্যৌঃ॥

অর্থ—প্রাতকালীন সূর্য্যোপস্থান ছয়ঋচে মন্ত্রের ঋষি—কুৎস, দেবতা সূর্য্য, ছন্দ অনুষ্টুপ এবং সূর্য্যদেবের আরাধনায় এই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়।

(১) মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ দেবতাবৃন্দেরও আশ্চর্য্যকারী সূর্য্যদেব উদিত হইতেছেন। তিনি স্বকীয় তেজে পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশ লোক প্রকাশ করিতেছেন। ইনি স্থাবর জঙ্গম জগতের আত্মা স্বরূপ।

(২) মানবগণ যেমন কোন সুন্দরী যোষিতের পশ্চাৎ গমন করে তদ্রূপ সূর্য্যদেব পরম কল্যাণী উষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছেন।

এই সূর্য্যোদয় হইলে নরগণ দেবকার্য্য সাধনার্থ কর্ম্মচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব এবম্বিধ সর্ব্বমঙ্গলদায়ী ও সর্ব্বকল্যাণকারী সূর্য্যদেবকে মঙ্গল কামনায় স্তব করি।

(৩) আমাদের স্তবনীয়, কল্যাণকর, সর্ব্বরসগ্রহণস্বভাব ও গমনশীল সূর্য্যরশ্মিগণ গগনতলে সমুদিত হইয়া একই সময়ে আকাশ ও ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান।

(৪) সর্ব্ব প্রেরক আদিত্য দেবের স্বাধীনতা ও মহত্ত্ব লোকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান, যেহেতু তিনি উদিত হইলে জীবের কর্ম্মচেষ্টা আরম্ভ হয় এবং কর্ম্ম শেষ হউক বা না হউক তিনি অস্তগামী হইলে কর্ম্মচেষ্টা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। রাত্র্যবসানে আবার কর্ম্মারম্ভ হয়।

(৫) সূর্য্যদেব উদয়কালে সমস্ত সংসারকে সম্মুখে দেখিবার জন্য স্বীয় তেজোরাশি আকাশে প্রকাশ করেন। তদীয় রসাকর্ষণশীল রশ্মিজাল বিশ্ব-ব্যাপক ও শ্বেতবর্ণ—ইহারা নৈশান্ধকার নাশ করে ও তেজ বিস্তার করে। রাত্রে রশ্মিজাল সূর্য্যে অন্তপ্রবিষ্ট হওয়ায় অন্ধকার আগমন করে।

(৬) হে দীপ্যমান রশ্মিগণ! এইক্ষণে সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন—তোমরা আমাদিগকে অতি নিন্দনীয় পাতকাদি হইতে মুক্ত কর। এবং মিত্র বরুণ, দেবমাতা, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ ইহারা সকলে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

মন্ত্র মধ্যাহ্নে—উদুত্যমিতি ত্রয়োদশর্চ্চস্য সূক্তস্য প্রস্কণ্বঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা আদ্যানাং নবানাং গায়ত্রী অন্ত্যানাং চতসৃনামনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

(১) ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং।

(২) ওঁ অপত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ। সূরায় বিশ্বচক্ষসে।

(৩) ওঁ অদৃশ্রমস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু। ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা।

(৪) ওঁ তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য। বিশ্বমাভাসি রোচনং।

(৫) ওঁ প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্। প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে।

(৬) ওঁ যেন পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু। ত্বং বরুণ পশ্যসি।

(৭) ওঁ বিদ্যামেষি রজঃ স্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ। পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য।

(৮) ওঁ সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য। শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ।

(৯) ওঁ অযুক্ত সপ্তশুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ। তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ।

(১০) ওঁ উদ্বয়ং তমসস্পরিজ্যোতি ষ্পশ্যন্ত উত্তরং।
দেবং দেবত্রা সূর্য্য মগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্।

(১১) উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবং।
হৃদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমানঞ্চ নাশয়।

(১২)　ওঁ শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি।
অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নিদধ্মসি।

(১৩)　ত্ত উদগাদয় মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্ মো অহং দ্বিষতেরধম্।

অর্থ—উদুত্য প্রভৃতি ১৩টি ঋক মন্ত্রের ঋষি প্রস্কন্ন, দেবতা সূর্য্য, প্রথম নয়টির ছন্দ গায়ত্রী শেষ চারিটির ছন্দ অনুষ্টুপ। সূর্য্যোপস্থানে ইহার প্রয়োগ হয়।

(১) সকল লোকের দৃষ্টি গোচরার্থ রশ্মিগণ সেই প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজ্ঞ সূর্য্যদেবকে ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে।

(২) যেমন প্রসিদ্ধ চৌরগণ দিবা প্রকাশে পলায়ন করে তদ্রূপ সূর্য্যাগমে নক্ষত্রগণ অদৃশ্য হইয়া পড়েন। কেন না, সূর্য্য বিশ্ব প্রকাশক।

(৩) দীপ্যমান অগ্নি যেমন সকল প্রকাশ করে সেইরূপ সূর্য্য রশ্মিও নিখিল জগৎ প্রকাশ করিতেছে।

(৪) হে সূর্য্যদেব! আপনি অতি ত্বরিত গমনশীল নিখিল বিশ্বের দর্শনীয় ও প্রকাশক। আপনি আকাশকে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিতেছেন।

(৫) হে সূর্য্যদেব! আপনি দেবগণের মধ্যে মরুদ্দেবদিগের সম্মুখে ও মনুষ্যগণের সম্মুখে উদয় হয়েন। সকল স্বর্লোকবাসীগণেও আপনাকে দেখে।

(৬) হে সূর্য্যদেব! আপনি পবিত্রতাকরণে শক্ত। আপনার তেজে সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। আপনি যে জ্যোতি দ্বারা নিখিল বিশ্বকে প্রকাশ করিতেছেন আমরা সেই জ্যোতির স্তব করিতেছি।

(৭) হে সূর্য্য! আপনিই দিবস ও রাত্রি উৎপত্তিশীল পদার্থনিচয়কে প্রকাশ করিতেছেন। আপনি বিস্তৃত আকাশমণ্ডলে গমন করিতেছেন।

(৮) হে সর্ব্ব প্রকাশক। তেজই আপনার কেশ বা স্বরূপ। সাতটি রশ্মি আপনাকে রথে বহন করিতেছে।

(৯) সর্ব্বপ্রেরক সূর্য্য সপ্ত রশ্মি স্বীয় রথে যোজনা করিয়াছেন। রশ্মিগণ অতি সতর্ক। সূর্য্যের পতন ভয় নাই। সূর্য্য গমন করিতেছেন।

(১০) আমরা তমসা পরোস্থিত দেবতাদিগের মধ্যে দেবতা যে সূর্য্য তাঁহার উপাসনা করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে আমরা যেন সূর্য্যের পরম জ্যোতি প্রাপ্ত হই।

(১১) হে মিত্র! আজ আপনি আকাশে উদিত হইয়া আমার হৃদয় রোগ ও বাহ্য হরিদ্বর্ণ শারীরিক রোগ নাশ করুন।

(১২) আমরা আমাদের হরিদ্বর্ণ রোগকে হরিদ্বর্ণ প্রাণী শুক-শারিকা পক্ষীতে অর্পণ করিতেছি এবং হরিদ্রব বা হরিতালেও দিতেছি।

(১) এই পুরোবর্ত্তী অদিতিপুত্র সূর্য্য আমাদের অতি অনিষ্টকারী সকল শত্রুপক্ষের ধ্বংস করিয়া তাহাদের বল কাড়িয়া লইয়া উদিত হইয়াছেন। ইনি আমার অনিষ্টকারী ব্যাধির বিনাশ করুণ। আমি হিংসা করিতে অক্ষম।

সায়াহ্নে ঃ—আকৃষ্ণেনেতি হিরণ্যস্তুপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রী ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

(১) ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনাদেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।

মোষু বরুণেতি শুনঃশেপ বশিষ্ঠ ঋষির্বরুণো দেবতা গায়ত্রী ছন্দঃ সায়ং সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

(২) ওঁ মোষু বরুণ মৃণ্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমং। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।

(৩) ওঁ যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ণ ধ্মাতো অদ্রিবঃ। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।

(৪) ওঁ ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।

(৫) ওঁ অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।

(৬) ওঁ যৎ কিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যে জনেহভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মযুযোহপি মমানস্তস্মাদেনসো দেব রিরীষঃ॥

(১) ইহার অর্থ মধ্যাহ্নে সূর্য্য জলাঞ্জলিদানের সময় বলা হইয়াছে।

'মোষু প্রভৃতি পঞ্চ মন্ত্রের ঋষি বসিষ্ঠ, দেবতা বরুণ, ছন্দ গায়ত্রী। সায়ং সন্ধ্যায় সূর্য্যোপস্থানে ইহার প্রয়োগ হয়।

(২) হে রাজন্ বরুণ! আমি আপনার মৃৎপিণ্ড নির্ম্মিত গৃহে থাকিব না, তেজনির্ম্মিত গৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করি। আপনি প্রসন্ন হউন দয়া করুন।

(৩) হে পাশধারিণ! যখন আমি ভয়ে কম্পমান ও বায়ু পূর্ণ চর্ম্মপাত্রের ন্যায় স্ফীত ও বদ্ধ হইয়া গমন করিব তখন তুমি আমাকে কৃপা করিও।

(৪) হে ধনিন্! হে নির্ম্মলস্বভাব বরুণ! আমরা অশক্ত হইয়া ক্রিয়া করিতে পারি না, সুতরাং তোমার পাশে বদ্ধ হইতেছি তুমি দয়া করিও।

(৫) হে বরুণ! আমি অপের মধ্যে বাস করিয়াও তৃষ্ণায় কাতর হইতেছি আমাকে সুখী কর।

(৬) হে বরুণ! আমরা দেবতা সম্বন্ধে অন্যায়াচরণ করিয়াছি অজ্ঞানবশে তোমার কার্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি। তজ্জন্য আমাদের পাপ হইয়াছে। সেই পাপ বশে তুমি আমাদের প্রতি হিংসা করিও না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সমষ্টি বিশ্বের দৃশ্যমান সূর্য্যটি বস্তুতঃ যে জিনিষ ব্যষ্টি বিশ্বের—সূর্য্যোপম বা পরমাত্মাটিও সেই জিনিষ। ব্রহ্মের দুইটি রূপ একটি মূর্ত্ত ও অপরটি অমূর্ত্ত। মূর্ত্তটি 'সৎ' অর্থাৎ বিদ্যমান, অমূর্ত্তটি "ত্যং" অর্থাৎ পরোক্ষ বা বলিবার বা দেখিবার উপায় নাই। "সৎ" হইতেই ত্রিগুণের কার্য্যাবলী। ত্যং গুণাতীত অবস্থা। "ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন" অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে সূর্য্য নাই তার উদয়াস্তও নাই। এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশক, মোটা সূর্য্যটিতে ক্ষিতি, অপ ও তেজের সারাংশ বর্ত্তমান। সেই সারাংশই আমাদের নিকট সদ্রূপে প্রতিভাত। মরুৎ

ও ব্যোম বা আকাশ এরা ক্ষিতি, অপ ও তেজ অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ। এবং এরা মোটা ভূতত্রয় অপেক্ষা ব্যাপক এবং পরম গতিশীল। এই দুই সূক্ষ্মভূতের সারাংশই সূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ ঘনশ্যাম জ্যোতি বা সূর্য্যের অধিদৈবত। সন্ধ্যার সাধক জড়োপাসক নহেন—কেননা তাঁহার নিকট জড় বলিয়া কোন পৃথক বস্তু নাই। প্রত্যেক অণুটিতে তিনি মৃত্ত, মর্ত্ত্য, স্থিত ও সৎ এই চারি অবস্থা দেখিয়া থাকেন এবং উপাসনা সতেরই করিয়া থাকেন। সাধক প্রাতঃকালে সূর্য্যের স্তব করিয়া কি প্রার্থনা করিতেছেন এখন তাঁহাই দেখা যাউক। সূর্য্যের রজগুণাত্মক কর্ম্মাবলির উল্লেখ করিয়া এবং স্বাধীনতা লাভে একনিষ্ঠ সাধক সূর্য্যের প্রভুত্বের পরিচয় দিয়া, রশ্মিগণ ও মিত্র, বরুণ, দেব-মাতা, সিন্ধু, পৃথিবী এবং আকাশ প্রভৃতি দেবতার নিকট সকলের জন্য মঙ্গল ভিক্ষা করিতেছেন। দেবমাতা বা অদিতি দ্বাদশ আদিত্যের প্রসূতি। মিত্র সূর্য্যের দ্বাদশ নামের একটী নাম। মিত্রই দ্বাদশের মধ্যে প্রধান। বরুণ জলের অধিদেবতা, সিন্ধু জল; পৃথিবী বা ক্ষিতি। অপ ও তেজের সারাংশ সম্ভূত সূর্য্যের যে রূপ তাহাই লক্ষ্য করা হইল এবং সেই সঙ্গে সকলের জননী যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি (অদিতি) তাঁহারও শরণ লওয়া হইল। সাধক জাগ্রত অবস্থায় অবস্থিত তাই প্রকৃতির কোলে সাধন করিতেছেন। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা না জানিয়া উপাসনা করিতে নাই এ কথা বারংবার ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন। অধিদৈবত না জানিয়া উপাসনা করা অতিশয় অনিষ্টকারী এবং সে উপাসনায় উন্নতির পরিবর্ত্তে বিশেষ নিম্নগতি হইয়া থাকে। কাজেই সমষ্টি সূর্য্যের অধিদৈবতকে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রার্থনা।

ঋষিগণ সূর্য্যকে পাচ অমৃতে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম অমৃতই লোহিত বর্ণাংশ, দ্বিতীয় অমৃত শুক্লাংশ, তৃতীয় অমৃত কৃষ্ণবর্ণাংশ, চতুর্থ অমৃত গাঢ় কৃষ্ণাংশ এবং পঞ্চম অমৃত কেবল জ্যোতি বা ব্রহ্ম। প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসক তাই লোহিত বর্ণাদ্য রশ্মিগণকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা করিতেছেন। এই রশ্মিগণই যাবতীয় রস আকর্ষণ করেন ও তাহার সারাংশ সূর্য্যে বহন করেন। কাজেই কার্য্যারম্ভে রশ্মিগণকে অবলম্বন করিয়া সাধক সূর্য্যের অধিদৈবতাকে লক্ষ্য করিতেছেন। 'অজামেকং লোহিত শুক্লকৃষ্ণং" এই শ্রুতিবাক্যও লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণের অবস্থিতির পারম্পর্য্য ইঙ্গিত করিতেছে। লোহিতবর্ণ সর্ব্বাগ্রে তারপর বর্ণমিলন বা শুক্লত্ব তারপর বর্ণের অভাব বা কৃষ্ণত্ব। তাই প্রাতে রক্তমূর্ত্তি দেবতা, মধ্যাহ্নে শ্বেত ও সায়াহ্নে কৃষ্ণ বা শ্যাম। শিশুগণ লাল কাপড়, লাল খেলনা, অর্থাৎ যা কিছু লাল তাই ভালবাসে। কেননা তাদের জীবনের জাগ্রতাবস্থার সেইমাত্র সূচনা হইয়াছে। এই তত্ত্ব অনুসরণ করিয়াই রক্তবর্ণ সিন্দুর, লালপাড় কাপড় প্রভৃতির প্রচলন। অচল ও সুমেরুবৎ ব্রহ্মের বিক্ষোভের হেতু আনন্দোচ্ছাস তাহার ফলেই সৃষ্টি কার্য্য। তাহা হইলে সেই আনন্দোচ্ছাসই রজোগুণের প্রথম বিকাশ। ব্যষ্টি তত্ত্বেও তাই মূলাধার চক্রটিকে পরমানন্দ, সহজানন্দ, বীরানন্দ ও যোগানন্দ প্রভৃতির আধার স্থান বলা হইয়াছে। আবার এই-খানেই ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক ও কোটী সূর্য্য সমপ্রভ স্বয়ম্ভু লিঙ্গটি বিদ্যুৎপ্রভা মূলশক্তিটি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিত। কাজেই লালটি আগে। ছেলেদের খেলনাটি লাল হওয়ার একটি মহাসূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। হিন্দুসন্তান ঋষিদের বংশধর—তাঁহারা সত্যের অনুসন্ধান তৎপর হইলে ঋষি প্রচারিত তত্ত্ব কথার সনাতনত্ব দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। অবশ্য অনেক জঙ্গল জুটিয়াছে সে সব বাছিয়া ফেলিতে হইবে।

মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যের প্রধান মূর্ত্তি মিত্রের নিকট সাধক কি প্রার্থনা করিতেছেন তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখা যায় তিনি পরম তেজস্বী মিত্রের নিকট হৃদয়টিকে নীরোগ করিতে নিবেদন করিতেছেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে হৃদয়টিই প্রাণ বা আত্মার স্থান। আমরা অধুনাতন কালেও দেখিতে পাই যে হৃদয় রোগের প্রধান চিকিৎসা সূর্য্যালোকে অবস্থিতি করা (sun-bath)। প্রবাদও আছে যে ক্ষয়-রোগগ্রস্থ রোগীর নিকট পারাবত রাখিলে সেই পারাবত ক্ষয়রোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে। শুক পক্ষী এই পারাবত জাতীয়। শুক পক্ষী সহজে পাওয়া যায় না বলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে পারাবত ব্যবহার করা হয়। শুক পক্ষীই শুয়া পক্ষী। আবার শিয়াল কাঁটা নামক ঔষধিকেও শুক বলা হয়। শিয়াল কাঁটার রসের সহিত তৈল ব্যবহারে দুষ্টপিত্তজাত রোগাদির উপকার হয়। হরিতাল বা হরিয়াল পক্ষীও পারাবত জাতীয় (ঘুঘুর মত পক্ষী) এবং ইহারও গুণ হৃদয় রোগ আকর্ষণ করা। আবার হরিতাল নামক ধাতু দ্রব্যটিও "হরেবীর্য্যং" বলিয়া আখ্যাত। শুক ও হরিয়াল পক্ষীর মাংস শ্বাস কাশ ও ক্ষয় রোগের ঔষধ এবং হরিয়ালের মাংস রক্তপিত্ত রোগ নাশক। হরিতাল ধাতুটিও কফ-পিত্ত নাশক। সাধারণ ভাবে প্রার্থনাটি পড়িলে মনে হয় সাধক কি স্বার্থপর নিজের রোগ অপর জীবে অর্পণ করিয়া নিজের নীচ-বৃত্তিরই পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাতে স্বার্থের রেখা নাই—আছে গভীর প্রকৃতি তত্ত্বজ্ঞতার পরিচয়। শুক হরিয়াল প্রভৃতি হৃদয় রোগ আকর্ষণ করিয়া মানুষকে নীরোগী করে অথচ তাদের সেই বিষে কোন অপকার হয় না। যেমন গোখরা সাপ। যেখানে এই বিষধর সর্প বাস করে তথায় মানুষ প্রভৃতি জীব হইতে বা অন্য প্রাকৃতিক বস্তু হইতে যে বিষ উদ্গীর্ণ হয় তাহা এই সর্পটি গ্রহণ করিয়া শুধু মানুষকে রক্ষা করে তাহা নহে পরন্তু সেই বিষটিই আবার মানুষকে ব্যবহারকৌশলে ভীষণ রোগ হইতে মুক্ত করে। বৃক্ষাদিও মানুষের প্রশ্বাসবায়ুর বিষ দিবাভাগে গ্রহণ করিয়া রাত্রিতে তাহা উদ্গীরণ করে। সোমদেব তাহা গ্রহণ করিয়া মানুষকে অমৃত প্রদান করেন। তাই আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যে গৃহ প্রাঙ্গনবাসী পুরাতন গোখরা সাপ মারিয়া ফেলিলে সেই গৃহস্থের অমঙ্গল হয় এমন কি অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে সেই বাড়ী ত্যাগ না করিলে সেই বংশ লোপ পাইয়া যায়। এইরূপে বৈদিক ঋষি মন্ত্রের—প্রত্যেক স্থানে মহান প্রকৃতির সনাতন মঙ্গল-নীতি গুলির ইঙ্গিত লিপিবদ্ধ। সে তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে নহে। ত্রয়োদশ ঋক্‌টি অতি পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দিতেছে যে এ প্রার্থনায় হিংসা বা দ্বেষের লেশ নাই। নির্বুদ্ধি জনগণই বেদমন্ত্রের বিশ্বব্যাপী মহান মঙ্গল ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

সায়াহ্নে সূর্য্যদেব অস্তগামী হইলে সমষ্টি বিশ্বে তেজের অভাব হইয়া পড়ে। তখন শৈত্যের বা জল বা অপের প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই জলের অধিদৈবতই বরুণ দেব। ইনি দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে ক্ষিতি ও অপ লইয়াই প্রধানতঃ আমাদের এই সংসার খেলা। এই দুই তত্ত্ব নাভির নিম্নে অবস্থিত। আবার নাভির নিম্ন হইতেই সংসার গঠন—আনন্দ ভোগ। কাজেই বরুণ দেবই আমাদের এই মৃন্ময় গৃহ বা দেহের মূলীভূত কারণ। তাই সূর্য্যের মিত্র বা সত্ত্ব প্রকাশক মূর্ত্তিটির অপসরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধক প্রবল বরুণ দেবের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার স্বর্ণময় বা তেজোময় গৃহে প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন। অন্তিম

কালে সকলকেই এই বরুণের কবলে আসিতে হয়। মৃত্যুকালে কণ্ঠের ঘড় ঘড়ানিটি এড়াইবার যো নাই। বরুণ বা শ্লেষ্মাটি গলাটিকে টিপিয়া ধরেন। সাধক তাই সুষুপ্তিতে ফিরিয়া যাইবার আগে বরুণের তেজোময় গৃহের চিন্তা করিতেছেন। সূর্য্য যেমন সব গুটিয়ে স্ব-সত্তায় গমন করেন, ব্যষ্টি জীবটিও স্ব-সত্তায় যাইতে চাহেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পারে যে লোক অবস্থিত সেই লোকের চিন্তাই এই মন্ত্রার্থ। মিত্রাবরুণৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ—মিত্র ও চাই না বরুণও চাই না। চাই তাহার উপরিস্থিত তেজোময় লোক।

ষড়াঙ্গন্যাস

সাধক সমষ্টি হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া ব্যষ্টিতে গমন করেন। পুনরায় ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে আগমন করিয়া এবার প্রকৃত সাধনসার অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। "ষড়ভিন্তদঙ্গমন্ত্রৈ যথাঙ্গমাত্মনি বিন্যস্য আত্মানং তদ্রূপং ভাবয়েৎ"—আত্মশক্তিটিকে তিনি সমষ্টি হইতে নিজ অঙ্গে নিবদ্ধ করিতেছেন। তাই প্রধান প্রধান অঙ্গগুলিতে শক্তির অধিষ্ঠান ভাবিতেছেন এবং সব দেহটিতে সেই এক শক্তি অধিষ্ঠিত তাহা দেখিয়া যাইতেছেন।

১। ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। ২। ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা। ৩। ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্। ৪। ওঁ স্ব কবচায় হুঁ। ৫। ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ নেত্র ত্রয়ায় বৌষট্। ৬। ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

মন্ত্রগুলির অর্থ সহজবোধ্য। প্রথম মন্ত্রে করতল (তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা) দিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতে হয়। দ্বিতীয়ে সর্ব্বাঙ্গুলি বা তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মস্তক, তৃতীয়ে সর্ব্বাঙ্গুলি বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা, চতুর্থে সর্ব্বাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয়, পঞ্চমে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা নেত্র ও ষষ্ঠে করতলদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়। অঙ্গন্যাস অতি বিস্তৃত প্রক্রিয়া—তন্মধ্যে প্রধানতঃ এই ছয়টি স্থানই সন্ধ্যার সাধক অবলম্বন করেন। ইচ্ছা করিলে বিস্তৃত ন্যাসতত্ত্ব পাঠকগণ দেখিতে পারেন। এই ছয়টি মন্ত্রের শেষ শব্দগুলি যথা নম, স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্ ও ফট্ কেন ব্যবহার তাহার কথা চিন্তা করা যাইতেছে। 'নম' শব্দটি সর্ব্বস্ব ত্যাগের বাচক আমরা হোম করিয়া তজ্জন্যই আজ্যশেষ "ন—মম" এই বলিয়া একটি পৃথক পাত্রে রাখিয়া থাকি। অর্থাৎ আমার কিছুই নাই সবই দেবতার। স্বাহা, বষট্ ও বৌষট্ হবন কার্য্যের মন্ত্র। হুঁ মন্ত্র শাস্ত্রাদি প্রয়োগে তনুরক্ষায় ব্যবহৃত হয়। আর ফট্টি শত্রু বা অমঙ্গলকারী বস্তুকে দূরীকরণ সময়ে ব্যবহৃত হয়। হৃদয়ে তিনি—তাঁকে আগেই সব দিবার সংকল্প, মস্তকেও নেত্রে সেই পূর্ব্বোল্লিখিত সূর্য্যাগ্নি ও আহবনীয় অগ্নিতে হবনের সংকল্প;অনুষ্ঠানের অস্ত্র বাহুদ্বয়ে কর্ম্ম প্রয়োগের আভাষ এবং করতলে বিঘ্ন বিঘাতনের চিন্তা। আত্ম নিবেদন করিতে হইবে ইহা সত্য এবং আত্মনিবেদনই সাধনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু আত্ম শক্তিটির উপর সাধকের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা আগে সেই কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে হইলেই প্রাণাগ্নি হবনে সিদ্ধ হইতে হইবে। প্রাণাগ্নি যতক্ষণ না বিষয়প্রপঞ্চকে নিজ আকারে আকারিত করিতে সুযোগ পান ততক্ষণ সিদ্ধি নাই। হোম কার্য্যের ব্যাঘাতক মারীচাদি রাক্ষস সর্ব্বদাই বর্ত্তমান

তাই হুঙ্কার ও ফটাদির প্রয়োজন। চণ্ডীতেও দেখা যায় দেবী হুঙ্কার দ্বারা অসুর নাশ করিয়াছিলেন। কপিধ্বজ রথের কপিও হুঙ্কারে কুরুকুল ক্ষয় করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার সাধক অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করেন না এবং আত্মবঞ্চনা কি তাহা বেশ বুঝেন। ট্রেজারীতে অনেক টাকা আছে আমি বলিলাম, রামকে লক্ষ টাকা দান করিলাম। আমার সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আমার সর্ব্ব কামনা বর্ত্তমান আমি পথ না পেয়ে বলিয়া বসিলাম, হে হরি! আমার কিছু চাহিনা আমাকে 'মুক্তি' দাও। আমি নিষ্কাম। টাকায় অধিকার হউক তবে দান করিবার অধিকারী হইব; কর্ম্মে অধিকার হউক তবে কর্ম্মন্যাস করিতে অধিকারী হইব। কিছু করিলাম না কর্ম্মের বা সাধনের দিক দিকেও গেলাম না—বলিয়া বসিলাম নিষ্কাম কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম! কি বাতুলতা! ভাবিলেও হাস্য সম্বরণ করা যায় না। সন্ধ্যার সাধক—আত্ম বঞ্চনাকে বিশ্ববঞ্চনা ভাবেন তাই তিনি মারীচাদি রাক্ষসকে দূরে রাখিয়া হবন কার্য্যের আয়োজন করেন ও প্রাণাগ্নি সাহায্যে তদাকারে পরিণত হইয়া অধিকারী হয়েন এবং তার পর "ন—মম" অর্থাৎ সব তোমার—"তুঁহু" "তুহুঁ" বলেন। সাধনা বা অনুষ্ঠানটা হিন্দুর নিকট এত সোজা নয় যে দুখানা পুস্তক পড়িলাম, দুচারিটা সূক্ষ্মতত্ত্বের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে শিখিলাম, তিলক কাটিলাম, মালা জপিলাম, কেঁদে গড়াগড়ি দিলাম, অনুষ্ঠানের ভয়ে কৌপীন পরিলাম, জগৎ প্রসবিণী রমণীকে মোটা চক্ষের আড়ালে রাখিলাম—আর অমনি "ন-মম" হইয়া পড়িলাম। আগে "মম" টা। "মম" বা "আমার" আগে করা চাই। তাই "আমার" কথাটি এত প্রিয়; তাই পরমার্থ পথের পথিক মাত্রই একবাক্যে পুনঃপুনঃ বলিয়া গিয়াছেন—আগে "আমার" কর তারপর নিষ্কাম বা আত্মনিবেদন বুঝিতে পারা যাইবে। নিষ্কাম ও নিস্বার্থ কথা বড়ই কঠিন। প্রাণাগ্নি হবনে মলিন প্রবৃত্তিকে শোধন করিলে তবে সে কথার অর্থবোধ হয়। আত্মস্থ না হইলে—আত্মশক্তিকে নিজবশে না আনিতে পারিলে আত্ম নিবেদন করা যায় না। "মম" হয় না এবং ফলও পাওয়া যায়! এ সম্বন্ধে মহাভারতকার সুন্দর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতে থাকেন তখন দ্রৌপদী কাপড়টা প্রথম প্রথম হাত দিয়ে ধরে থাকেন। যখন তাতেও কিছু হয় নাই তখন অসহায়া ভাবে কাপড় ছেড়ে দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া 'বিপত্তৌ মধুসূদন' বলিয়া ডাকেন। ঠিক এই অবস্থাতেই মধুসূদন আসিয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেন। একটু রাখিলেও নিবেদন হয় না। সবটি আগে নিজের করিয়া সেই সবটি দিতে হয় তবে আত্ম নিবেদন বা "ন মম" কথাটির সার্থকতা হয় অন্যথা নহে। বিষয় প্রপঞ্চকে নিজবশে আনিতে অনেক অনুষ্ঠান দরকার। সৃষ্টি সর্ব্বত্র কর্ম্মময়।

নষ্টরাজ্যের পুনরুদ্ধার

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

আজ আমরা পরাধীন, দুর্ব্বল ও নষ্টরাজ্য হইলেও অতীত কালের কোন এক সময় যে স্বাধীন, সবল ও স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলাম, তাহা বোধ হয় আমাদের মধ্যে কেন, জগতের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু কেন সেই ভাব চলিয়া গেল, আর কেন এই ভাব আসিল, আর কি করিয়াই বা তাহা আবার ফিরিয়া পাওয়া যায়, তাহা আজ কাল অনেকেই আলোচনা করিতেছেন। অবশ্য আমাদের এই পরাধীনতা, এই দুর্ব্বলতা ও এই স্বরাজ্যহীনতা যে কেবল এই স্থূল জাগতিক বিষয়ে হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু ইহা আমাদের আধ্যাত্মিক বিষয়েও হইতে চলিয়াছে। এজন্য আমাদের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয় বিষয়ে আমরা কি করিয়া আমাদের পূর্ব্বাবস্থা হারাইয়াছি এবং কি করিলে তাহার পুনরুদ্ধার ঘটে, তাহা এক্ষণে আলোচ্য।

দেখা যায়, সাধারণ নিয়মদ্বারা বিশেষের জ্ঞান লাভে ভুল হয় না, কিন্তু বিশেষের জ্ঞান-দ্বারা সাধারণের জ্ঞান প্রায়ই ভ্রমসঙ্কুল হয়। এতদনুসারে কার্য্যমাত্রেরই কারণ দুইরূপ ; একটী—কার্য্যের জনককারণ, যেমন অগ্নিপ্রজ্বলনের প্রতি কাষ্ঠাদি, এবং অপরটী—প্রতিবন্ধকনাশক কারণ, যেমন অগ্নিজ্বলনের প্রতি জলাদিসংযোগনিবারণ। অগ্নির প্রজ্বলন রক্ষা করিতে হইলে কাষ্ঠাদির সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে, এবং জলাদিসংযোগের নিবারণ করিতে হইবে। এটী সর্ব্বসাধারণ নিয়ম।

এখন এই নিয়মটী আমাদের পক্ষে প্রয়োগ করিলে কি হয়, দেখা যাউক। ইহা যদি প্রয়োগ করা যায়, তবে, যে সব গুণগ্রাম থাকায় আমাদের স্বাধীনতাদি ঘটিয়াছিল, তাহার পালন করিতে হইবে, এবং যে প্রতিবন্ধক আসায় উহা বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা অপনোদন করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে এইটুকু করিতে পারিলেই, অর্থাৎ অগ্নিপ্রজ্বলনের পক্ষে জলাদিসংযোগরূপ প্রতিবন্ধক নিবারণ এবং ইন্ধনসংযোগরক্ষা করার ন্যায় জনককারণের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই আমাদের পূর্ব্বাবস্থালাভ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু এই স্থলে আজকাল অনেকে বলেন যে, পূর্ব্বাবস্থা আর কখন কাহারও ফিরে না, সুতরাং আজ উক্ত উভয়বিধ স্বাধীনতাদি লাভ করিতে হইলে বর্ত্তমান সময়োচিত ব্যবস্থা করাই আবশ্যক, পূর্ব্বের পথে চলিবার চেষ্টা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না ; যেমন পূর্ব্বের যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে উন্নতি হইবে না, পূর্ব্বের ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ করিলে আজ আর যুদ্ধজয় হয় না, পূর্ব্বের জাতিভেদ মানিয়া চলিলে আজ আর স্বাধীনতার প্রধান সহায় একতা সম্ভবপর হয় না ; তদ্রূপ বিধবাবিবাহ, পতিত্যাগ করিয়া পত্যন্তরগ্রহণ, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি না অবলম্বন করিলে আমাদের স্বাধীনতার চিন্তা স্বপ্নবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। আজকাল স্বাধীনতার এবং উন্নতির যাহা উপায়, তাহারই অবলম্বন এবং সেই উন্নতির যাহা অন্তরায়, তাহার নিরাকরণ করা আবশ্যক ; পূর্ব্বের উপায় অবলম্বন এবং পূর্ব্বের অন্তরায়নিবারণ করিলে আজ কোন ফলোদয় হইতে পারে না, ইত্যাদি।

সুতরাং সমস্যা হইতেছে—আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পূর্ব্বের পথে আমরা চলিব, কি আজ যে পথ নূতনভাবে সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে, সেই পথে চলিব? বস্তুতঃ, যাঁহারা পূর্ব্বের পথে চলিতে বলেন, তাঁহাদের কথাতেও যুক্তি আছে, আর যাঁহারা নূতন পথে চলিতে বলেন, তাঁহাদের কথাতেও যুক্তি আছে। কেহই একেবারে যুক্তিহীন কথা বলিতেছেন না।

এখন এই সমস্যা মীমাংসার জন্য আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য—এই উভয় পথের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা, এই দ্বিতীয় প্রয়োজন—দেশ কাল ও পাত্রভেদে স্বাধীনতার জনককারণ এবং প্রতিবন্ধক-বারণ রূপ উভয়বিধ কারণের অনুষ্ঠান করা।

প্রথম দ্রষ্টব্য—আমাদের যে পূর্ব্বপুরুষগণের স্বাধীনতা ছিল, আমরা তাঁহাদের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি কি না? যদি আমরা তাঁহাদের প্রকৃতি পাইয়া থাকি, তবে তাঁহারা স্বাধীনতালাভের জন্য যাহা করিয়া ছিলেন, আমরা তাহা করিলেই আমাদেরও স্বাধীনতা লাভ ঘটিবে। যেমন পূর্ব্বে যদি কাষ্ঠসহযোগে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে আজ সেই কাষ্ঠ ও সেই অগ্নি থাকিলে আজও সেই কাষ্ঠসহযোগই অগ্ন্যুৎপাদের প্রতি কারণ হইবে। আজ সময় পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া অগ্নির জন্য কাষ্ঠকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। আর পূর্ব্বের অবস্থা একেবারে ঠিক্ ঠিক্ না ফিরিলেও তৎসদৃশ অবস্থা যে ঘটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন দিবার পর রাত্র এবং রাত্রের পর দিন আসে।

কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকৃতি ও আমাদের প্রকৃতি দেখিলে আমরা বুঝি যে, আমাদের এমন কিছু প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন হয় নাই যে, আজ আর তাঁহাদের পূর্ব্বানুসৃত পথে আমাদের স্বাধীনতা অপ্রাপ্য হইবে। তাঁহারাও সুখস্বাধীনতা চাহিতেন আমরাও তাহা চাহি, তাঁহারা উন্নতি চাহিতেন আমরাও তাহা চাহি। তাঁহাদের যেমন হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল আমাদেরও তাহাই আছে। পুষ্টিকর মিতাহার খাদ্য ও মিতাচারে তাঁহাদের দেহ ও মনের উন্নতি হইয়াছিল, আজ তাহাতে আমাদেরও উন্নতি হয়—দেখা যায়। অতএব আমাদের মধ্যে তাঁহাদের মূল প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছু হয় নাই। আমরা এখনও তাঁহাদেরই সন্তান বলিয়া পরিচয় দিই, তাঁহাদের আদর্শই এখনও আমাদের অনেকেরই আদর্শ, তাঁহাদের বেদ এখনও আমাদের বেদ, তাঁহাদের ধর্ম্মই এখনও আমাদের ধর্ম্ম।

আচ্ছা, তবে কি আগন্তুক কোন প্রকৃতিবশে আমাদের এই দশা হইয়াছে? না, তাহাও বলা যায় না। কারণ, যদি কোন আগন্তুক প্রকৃতিবশে আমাদের অধঃপতন হইয়া থাকে, তবে সেই আগন্তুক প্রকৃতিটী আমাদের মূল প্রকৃতির বিরোধী বলিয়া আমাদের উন্নতির প্রতিবন্ধকই বলিতে হইবে। এজন্য তাহাকে আগন্তুক প্রকৃতি না বলিয়া তাহাকে প্রতিবন্ধকমাত্র বলাই উচিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে—আমাদের যে এই অধঃপতন, তাহার কারণ আমাদের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকের উপস্থিতি, অন্য কিছুই নহে।

এখন দেখা যাউক—এই প্রতিবন্ধকটী কি? আমরা দেখিতে পাই—প্রতিবন্ধক দুই প্রকার হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিজ্বলনের পক্ষে এক প্রকার—অগ্নিকাষ্ঠসংযোগে বিরতি এবং দ্বিতীয় প্রকার—ঝটিকা বা জলাদির সংযোগ। অর্থাৎ কারণসমূহের স্বরূপের ব্যাঘাতসম্পাদন অথবা তাহাদের ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সম্পাদন।

এখন ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রথম প্রকার প্রতিবন্ধকনিবারণের জন্য আমরা

আমাদের পূর্ব্বের ধর্ম্মকর্ম্মের, পূর্ব্বের ন্যায় অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিব, এবং দ্বিতীয় প্রকার প্রতিবন্ধক-নিবারণের জন্য—যেরূপ প্রতিবন্ধক তজ্জাতীয় প্রতিকার করিব। এইরূপ করিতে পারিলেই আমরা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিব।

কিন্তু প্রথম প্রকার প্রতিবন্ধকনিবারণের জন্য যে পূর্ব্বের ধর্ম্মকর্ম্মের পূর্ব্বের ন্যায় অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাতে একটা আপত্তি হইতে পারে যে, পূর্ব্বের যে অবস্থার অব্যবহিত পরে আমাদের এই অধঃপতন, সে সময়ের ধর্ম্মকর্ম্মও তৎপূর্ব্বের ধর্ম্মকর্ম্মেরই ত অনুরূপ ছিল, সুতরাং পূর্ব্বের ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান আজ কখনই অবলম্বনীয় হইতে পারে না।

একথা কিন্তু ঠিক্ নহে; কারণ, ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, পূর্ব্বকালেও যে অধঃপতন, তাহাও অধর্ম্মেরই ফল, তাহাও তৎপূর্ব্বের আচরিত ধর্ম্মকর্ম্মের সম্যক্ অনমুষ্ঠান। ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন এস্থলে অনাবশ্যক। অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠানে কখনও অধঃপতন হয় না, কিন্তু অধর্ম্মানুষ্ঠানেই অধঃপতন ঘটিয়া থাকে। আর তাহা হইলে আমাদের পুনরভ্যুদয় পূর্ব্বের ধর্ম্মানুষ্ঠানেই হইতে পারিবে।

যদি বলা যায়—পূর্ব্বকালে এমনও দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, ধর্ম্ম যুদ্ধ করিয়া হিন্দুগণ পরাজিত হইতেছে, কিন্তু অধর্ম্ম যুদ্ধ করিয়া ম্লেচ্ছগণ জয়ী হইতেছে, আর এখনও তাহাই হইতেছে; অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধঃপতন নিবারণ হয় না। উহা কালের ধর্ম্ম, উহা অনায়ত্ত বিষয়।

ইহার উত্তর, বস্তুতঃ দ্বিতীয় প্রকার প্রতিবন্ধকনিবারণ করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেই প্রদত্ত হইবে। অর্থাৎ যে জাতীয় প্রতিবন্ধক তজ্জাতীয় প্রতিকার আবশ্যক—এই পক্ষই এখন আলোচ্য হইতেছে। অতএব এই বিষয়টী আলোচনা করিলে বুঝাযায় যে ম্লেচ্ছদিগের সহিত সংঘর্ষে হিন্দুগণের ধর্ম্মানুমোদিত পথ—ঠিক্ পথ হয় নাই। সেস্থলে ম্লেচ্ছনীতি অবলম্বনে অন্ততঃ পক্ষে সাবধান হওয়াও উচিত ছিল। আর তাহাই সে ক্ষেত্রে ধর্ম্ম ছিল, তাহা অবলম্বন না করায় যে অধর্ম্ম হইয়াছে, তাহারই ফলে অতীত ও বর্ত্তমানের অধঃপতন ও পরাজয়।

এ সম্বন্ধে মহাভারতে একটী প্রসঙ্গ আছে। যথা—এক সময়ে যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আমরা উভয় পক্ষই অধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছি কিন্তু তথাপি আমাদিগকে ধর্ম্মপক্ষ বলে, আর কুরুপক্ষকে অধর্ম্মপক্ষ বলে—ইহার কারণ কি?"

ভীষ্মদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিতেছি না, তুমি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কর"।

কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করা হইল—তিনিও বলিলেন—"তাই ত? কথা ত সঙ্গত! কিন্তু ইহার উত্তর ত আমারও স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না; আচ্ছা, উপস্থিত মুনিঋষিবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করা হউক, তাহারা নিশ্চয়ই ইহার সমাধান করিয়া দিবেন।"

মুনিঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু তাঁহারাও নীরব রহিলেন। তখন ভগবান্ বলিলেন—"ইহার উত্তর একমাত্র ব্যাসই দিতে সমর্থ—মনে হইতেছে, অতএব তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হউক।"

ব্যাসদেব তথায় ছিলেন না। তাঁহাকে আহ্বান করা হইল। ব্যাসদেব আসিলেন এবং যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নটী তাঁহাকে করিলেন।

ব্যাসদেব তখন মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! ধর্ম্মের তত্ত্ব বড়ই রহস্যময়। দেখুন—অধার্ম্মিকের সহিত সংঘর্ষে অধর্ম্ম অবলম্বন করাও ধর্ম্ম, এবং ধার্ম্মিকের সহিত সংঘর্ষে ধর্ম্ম অবলম্বন করাই ধর্ম্ম।" কুরুপক্ষ অধর্ম্মকে ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাই তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে তোমরা বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ অধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলে, আর তাহারই ফলে তোমাদের জয় হইয়াছে। তোমরা সম্পূর্ণ ধর্ম্মপথে থাকিয়া যুদ্ধ করিলে তোমরা কখনই জয়ী হইতে পারিতে না।"

ব্যাসদেবের এই কথা সকলেই অনুমোদন করিলেন। বস্তুতঃ, এই কথাটী খুবই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে। কারণ, হিন্দুগণ যখন ম্লেচ্ছগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়, তখন ইতিহাসই বলিয়া দেয় যে, হিন্দুগণ ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু ম্লেচ্ছগণ তাহা করে নাই। আর তাহারই ফলে হিন্দুগণ পরাজিত হয়। উভয়পক্ষ দিবাবসানে যুদ্ধ করিবে না—এই সর্ত্তে হিন্দুগণ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলে ম্লেচ্ছগণ রাত্রিকালে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া হিন্দুদিগকে পরাজিত করে। এক্ষেত্রে যদি হিন্দুগণ ম্লেচ্ছগণের প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মনীতি অবগত হইয়া সাবধানও থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই পরাজিত হইতেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধির প্রতীকার যদি কৃষ্ণ না করিতেন, তবে পাণ্ডবগণ কি কখন জয়ী হইতে পারিতেন? কখনই না। এইরূপ অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ব্যাসদেবের উক্ত ধর্ম্মলক্ষণ সর্ব্বথা সঙ্গত হইয়াছে।

এখন তাহা হইলে আমাদের উন্নতির জনককারণের অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের পূর্ব্বের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, আর উন্নতির প্রতিবন্ধকনিবারণের জন্য আমাদের অধর্ম্মত্যাগ এবং যাহাতে আমাদিগকে পদানত হইয়া থাকিতে হইতেছে, সেই নীতি অবলম্বনেপ্রতি ব্যবহার করিতে হইবে। সেই নীতি আমাদের ধর্ম্মনীতির তুলনায় অধর্ম্ম হইলেও সেই অধর্ম্মও এখন আমাদের ধর্ম্ম-স্বরূপ হইতেছে, বুঝিতে হইবে। অন্ততঃপক্ষে সাবধানও হইতে হইবে। ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য, ইহাই আজ আমাদের নষ্ট গৌরব উদ্ধারের লাভের উপায়।

কিন্তু এস্থলে কেহ কেহ বলেন—আমাদের পূর্ব্বাবস্থা লাভের জন্য এত অভিলাষ কেন? পূর্ব্বাবস্থা যদি ভালই হইবে, তবে উহা গেল কেন? জীব ও জগতের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে, অতএব বর্ত্তমানের অনুকূলে থাকিয়া যাহাতে উন্নতি হয়, তাহাই কর্ত্তব্য।

এই কথাটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনে হয়—এই মতবাদিগণ পূর্ব্বাবস্থাকে হেয় এবং পর অবস্থাকেই উপাদেয় বলিয়া ভাবেন। কিন্তু তাহা হইলে একটা প্রশ্ন হইবে—কার্য্য ভাল, কি কারণ ভাল? কার্য্য নিত্য, কি কারণ নিত্য? আর যাহা ভাল, তাহা নিত্য কি অনিত্য? অনিত্য বস্তু কখন কি ভাল বা উপাদেয় পদবাচ্য হয়? ইত্যাদি।

ইহার উত্তরে বালকেও বলিবে—যাহা নিত্য তাহাই ভাল, যাহা অনিত্য তাহা কখনও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। আর তাহা যদি হয়, তবে কারণরূপই কার্য্যরূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের প্রভাবে আমাদের ধারণা হইয়াছে—আমরা জড় হইতে চেতন হইয়াছি, আমরা মন্দ হইতে ভাল হইতেছি, ইত্যাদি; আর তাহারই ফলে ক্রমোন্নতিবাদের অনুরাগী হইয়াছি। বস্তুতঃ, সৃষ্টিস্থিতিলয়ের রহস্য—ক্রমোন্নতি নহে, কিন্তু উহা পূর্ণ হইতে অপূর্ণবৎ

অবস্থালাভ এবং সেই অপূর্ণবৎ অবস্থা হইতে পুনরায় সেই পূর্ণাবস্থালাভই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের রহস্য হওয়া অধিকতর সঙ্গত। অতএব আমাদের পূর্ব্বাবস্থালাভের চেষ্টা স্বাভাবিকও বাঞ্ছনীয়—উভয়ই।

এখন কথা হইতেছে, যদি প্রকৃত পূর্ব্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান, এবং অধর্ম্মবর্জ্জন, আর অধার্ম্মিকের সহিত ব্যবহারেই অধার্ম্মিকের অধর্ম্মাচরণও ধর্ম্ম—এই তিনটী আমাদের পূর্ব্বাবস্থালাভের কারণ বা উপায় হয়, তবে সেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কি, তাহা কি করিয়া নির্ণীত হইতে পারে? পূর্ব্বের ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া অধর্ম্মে পরিণত বা অধর্ম্মমিশ্রিত হইয়াও যে ধর্ম্ম নামে চলিয়া যায় নাই, তাহার নির্ণয় কি করিয়া হইতে পারে? বস্তুতঃ, পূর্ব্বের প্রকৃত ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকিলে, অধর্ম্ম তাহার সহিত মিশ্রিত না হইলে, অন্য কথায়—অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া অনুষ্ঠান না করিলে কি আর আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের দুর্গতি হইয়াছিল? কখনই নহে। সুতরাং অতি পূর্ব্বকালেও ধর্ম্ম ও অধর্ম্মনির্ণয়ে ভ্রমপ্রমাদবশতঃই আমাদের এই বর্ত্তমান অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই কথার উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে কার্য্যকারণতত্ত্বটী ভাবিতে হইবে। এই কার্য্যকারণতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে কতকগুলি দৃষ্টকারণ আছে, আর কতকগুলি অদৃষ্টকারণ আছে। দৃষ্টকারণের দোষাপনোদন আমরা সহজেই করিতে পারি; ঝটিকায় দীপ নির্ব্বাপিত হইতেছে, দ্বার বন্ধ করিয়া প্রদীপ রক্ষা করিতে পারি; কিন্তু অদৃষ্ট কারণের দোষাপনোদন কি করিয়া সম্ভব হয়? এই অদৃষ্টকারণ—জীবাদৃষ্ট এবং ঈশ্বরেচ্ছাদি বহু বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই অদৃষ্টকারণের দোষাপনোদন ত আমাদের দৃষ্ট উপায়দ্বারা কখনই সম্ভবপর হয় না।

বস্তুতঃ, এই অদৃষ্টকারণকূটকে আয়ত্ত করিবার জন্যই আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থা। ধর্ম্মের দ্বারা উক্ত অদৃষ্টকারণনিচয় আয়ত্ত হয় এবং অধর্ম্মদ্বারা তাদৃশ শক্তির অভাবে আমাদের উন্নতির পথ অপরিচিত হইয়া যায়। আর এই জন্যই ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয় দৃষ্টোপায়সম্পন্ন জীবের দ্বারা সম্ভবপর হয় না। ইহা সেই একমাত্র সর্ব্বজ্ঞদ্বারাই সম্ভবপর হয়। অসর্ব্বজ্ঞ অজ্ঞ জীব কখনই কার্য্যমাত্রের অদৃষ্টকারণ নিচয় অবগত হইতে পারে না, আর তজ্জন্য তাহার দোষের প্রতিকারও করিতে পারে না। মহর্ষি বেদব্যাস যে ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন, বস্তুতঃ তাহাও দৃষ্ট উপায়। তাহা অজ্ঞ মানবই চিন্তা করিয়া আবিষ্কার করিতে পারে। কিন্তু অদৃশ্য অদৃষ্টের দোষগুণনির্ণয় ও তাহার প্রতিকার কখনই করিতে পারে না। এ জন্য সর্ব্বজ্ঞের বাক্যই—সর্ব্বজ্ঞের উপদেশই আবশ্যক হয়।

আর তাহা যদি হয়, তবে ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে বুঝিতে গেলে সেই সর্ব্বপ্রাচীন সর্ব্বজ্ঞের বাক্য যে বেদ, সেই বেদই অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ, বেদদ্বারা যাহারা সর্ব্বজ্ঞ হন, তাঁহাদের বাক্য কখন বেদের ন্যায় প্রমাণ হয় না। বেদপ্রচারের পর হইতে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত মতামত হইয়া গিয়াছে, সকলই সেই বেদানুমোদিত কি না পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। আর তাহা হইলে মধ্যযুগের অধর্ম্মাচরণ, যাহা ধর্ম্ম নামে প্রচলিত হওয়ায়, তাহাদের অধঃপতন ঘটিয়াছিল, তাহাও নির্ণয় করা যাইতে পারিবে।

অতএব আমাদের যদি পূর্ব্বের উন্নত অবস্থা আবার লাভ করিতে হয়, আমাদের যদি

স্বরাজ্যসিদ্ধি পুনরায় আবশ্যক হয়, তবে প্রথম—আমাদের যথার্থ বেদানুমোদিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে, প্রবৃত্তির বশে যে সব অধর্ম্মাচরণ চলিয়াছে, তাহার বর্জ্জন করিতে হইবে এবং যে সকল বিরোধী শক্তি আমাদিগকে পদানত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে তাহাদের পথেই নিবারণ করিতে হইবে; ইহা হইলেই আমাদের পূর্ব্বাবস্থালাভ অনিবার্য্য।

কাব্যের স্বরূপ

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

যে যেমন, তাহাকে তেমনি করিয়া দেখিতে হয়, নইলে তাহার স্বরূপ চেনা যায় না; এবং সত্য পরিচয় না হইলে যে রসটুকু পাওয়া উচিত, সে সৌন্দর্য্য যে আনন্দে তাহার সম্পূর্ণতা তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

যাহাকে জানা যায় সেই বিশেষ ভাবে অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে ও নিঃশেষে তাহার সত্ত্বটুকু জীবনের সহিত মিশিয়া গিয়া আনন্দে ও অমৃতে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে।

আকাঙ্ক্ষার সহিত ভোগেচ্ছা বিজড়িত। উপভোগের জন্যই বস্তু বাঞ্ছনীয়। যে রস, যে রূপ, যে মাধুর্য্য বিষয়ের সার সেই টুকুই চাই। আর ঐ পাইবার জন্যই বিশেষ করিয়া চিনিতে বুঝিতে জানিতে হয়। অপরিচিতের প্রতি আকর্ষণ জন্মায় না; যেখানে যত জানার গভীরতা, সেই খানেই অনুরাগ তত নিবিড়। যাহা বুঝিনা তাহার মাধুর্য্যের অধিকারী হওয়া অসম্ভব।

জ্ঞানের দুইটা দিক আছে। বাহির দেখিয়াই বিচার হয়না তাহা কেমন, ভিতরটাও দ্রষ্টব্য। বাহ্ অন্তরেরই আভাস, ভিতরের ভাল মন্দ লইয়াই প্রায় বস্তুর সৌন্দর্য্য নির্দ্ধারণ হয়। দেহটা দেখিয়াই যদি মুগ্ধ হওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক গ্রহণীয় অংশ বাদ পড়িয়া যায়। আবার কেবল যে রসেরই অপ্রাপ্তি তাহা নয়, বিশেষ করিয়া না তৌলাইলে ভুল ধারণায় অনেক সময় অনিষ্টও হয়। পলাসের রঙ্গে আকৃষ্ট হইলে কেবল মধু গন্ধেরই অভাব ঘটে, কিন্তু বিষকুম্ভে লুব্ধ হওয়া মহা বিপজ্জনক।

উপভোগের যত কিছু আছে, তাহার মধ্যে কাব্য পরম বাঞ্ছনীয়। কেবল মাত্র সঙ্গীত ও চিত্র কাব্যের সমান আদরের। সঙ্গীত ও চিত্রের যে আনন্দ তাহাও একটা ক্ষণিকের অনুভূতি মাত্র। কথা ছাড়িয়া যেটুকু রাগ রাগিণী, তাঁহাতে শোনার সময় একটু তৃপ্তি বোধ হয়, স্থায়ী ভাবে কোন কিছু রাখিয়া যায় না। ছবিও তেমনি রেখায় রঙ্গে দর্শন মুহূর্ত্তের সুখকর মাত্র।

কিন্তু কাব্য তাহা নয়, কাব্য আনন্দ ও অমৃত, পুষ্টির ও তুষ্টির। কেবল শুনিতে ভাল, দেখিতে শোভন নয়; মধুর মত মিষ্ট অথচ বলকর।

এই জন্য মানুষকে যাহা লইয়া ঘর করিতে হয়, কিম্বা যাহা মানবের আকাঙ্ক্ষার, সে

সকলের মধ্যে কাব্যই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। আর ঐ কারণেই কাব্যকে বিশেষ করিয়া ঘষিয়া মাজিয়া, বুঝিয়া চিনিয়া লওয়া আবশ্যক।

যাহাকে তেমন প্রয়োজন নাই, তাহাকে বেশী করিয়া না দেখিলেও ক্ষতি নাই, কিম্বা যেটুকু প্রয়োজনীয় অন্য সমস্ত বাদ রাখিয়া তাহারি উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করিলেও চলে। কিন্তু কাব্যে খাদ খাঁটি নিখুঁত করিয়া কষিবার। কেননা, কাব্যের প্রভাব কেবল একটা ব্যষ্টি চরিত্রেই আবদ্ধ নয়, তাহা সমস্ত জাতীয় জীবনকে নিয়মিত করে। একের ক্ষতি অপেক্ষা বহুর অনিষ্ট মহা মারাত্মক।

রসাত্মক বাক্য কাব্য। যে কথায় চিত্তে কোন না কোন রসোদ্রেক করায়, সেই সমস্ত শব্দের অলঙ্কার অনুপ্রাস ছন্দ যতির সুসংবদ্ধ অবস্থাই কাব্য। কেবল মিষ্ট শ্রুতি-মধুর বাক্য সমষ্টি হইলেই চলিবে না, তাহার আবার একটা স্থায়ী রসোদ্ভাবন ক্ষমতা থাকা চাই। শব্দ কবিতার শরীর, রস আত্মা; সেই জন্যই বলা হইয়াছে রসাত্মক।

এখন বিচার ওই রস লইয়া। আগে রস আছে কিনা, পরে তাহা রসাভাস কিনা? যাহা সত্য সুন্দর ও মঙ্গলময় তাহাই প্রকৃত রস। আর যাহা মনুষ্যত্বের হানিজনক, পশুত্বের ও স্বেচ্ছাচারের উত্তেজক, সমাজ সংহতির বিঘ্নকর তাহাই রসাভাস।

"শৃঙ্গার বীর করুণাস্তুত হাস্য ভয়ানকাঃ।
বীভৎস রৌদ্রৌ বাৎসল্যং শান্তশ্চেতি রসাঃ দশ॥"

কবিতার ঐ দশটীর মধ্যে কোন না কোন একটী রসের ব্যঞ্জনা চাই। যতখানি হ'ক তাহার অস্তিত্ব আবশ্যক। পরিমান কবির প্রতিভার উপর নির্ভর করে।

শান্ত করুণ হাস্য বাৎসল্য প্রভৃতিতে তেমন ভেজাল চলে না, তাই সে সমস্তে রসাভাস ঘটিবার তত আশঙ্কা নাই, উহাদের সহজে চেনা যায়।

বিশেষ গোলযোগ বাধে শৃঙ্গার রসে। আর কাব্যে আদিরসেরই অত্যন্ত প্রাধান্য এবং উহাই যত জটিল।

পশুত্ব ও মানবত্ব দুই ভাবের সমবায়ে মানবজীবন গঠিত; কিন্তু যেখানে জীব-ভাবের প্রভাব কমিয়া আসিয়াছে, সেই খানেই মানবতার স্ফূর্ত্তি।

শৃঙ্গার পশুভাব; তাহা কেবল যৌন আশক্তি। উহার পরিণতি প্রেমে। প্রেমের ব্যাপক অর্থ ছাড়িয়া নরনারীর প্রণয়ের আরম্ভ রমণেচ্ছা হইতে। প্রেমে শৃঙ্গারে এই সম্বন্ধ থাকায় বাছিয়া লওয়া কঠিন হয়, তাহা রতি রাগ কি শুদ্ধ প্রেম! আর অন্য জীব-ভাব অপেক্ষা মানব মনে যৌন আশক্তির প্রাবল্য বলিয়া কাব্যে যেখানে ইন্দ্রিয়াশক্তির অভিব্যঞ্জনা, সেই খানেই ভালবাসার ভ্রম হয়। প্রেম শুদ্ধ রস, কাম রসাভাস। প্রেম বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহা শৃঙ্গার রস কিনা বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, তাহা কতখানি স্বার্থের সীমা ছাড়াইয়াছে বা তাহাতে ভোগ লালসা উদ্দীপিত করে কিনা? কেবল ভোগ, কেবল দেহের লালসা প্রেম নয়।

শৃঙ্গার রস স্বকীয়ার মধ্যে আবদ্ধ হইলে তেমন ভয়ের কথা নাই; কারণ তাহা একটা বাঁধনের মধ্যে নিয়মিত আছে। আশঙ্কা পরকীয়ায়।

কেবল স্বকীয়া অনুরাগে কাব্যের কারবার চলে না, পরকীয়া নাকি তার প্রধান অবলম্বন। আর রসাভাস ঘটে—এই পরকীয়া অনুরাগে।

পরকীয়া হইতে প্রীতির সূত্রপাত করিলে, হয় দাম্পত্যের মধ্যে তার অবসান দেখাইতে হইবে, নয় যাহা কেবল লালসা, তাহাকে কুৎসিৎ ঘৃণ্য করিয়া, তার অমঙ্গলের দিকটা আঁকিতে হইবে। যেখানে কেবল রক্ত মাংসের আকাঙ্ক্ষা, পশুর মত আত্ম সুখ বাসনাই উজ্জ্বল চিত্রিত, ব্যষ্টি প্রকৃতি যেখানে স্বেচ্ছাচারী, তাহাই রসাভাস।

কেবল শৃঙ্গার নয়, পশুভাব মাত্রেরই কেমন একটা মাদক শক্তি আছে, সহজেই সে দিকে লোভ জন্মায়। যাহা অনাচার, মানুষের প্রকৃতিতে তাহাই যেন রমণীয়!

কেন এমন হয়, এখানে তাহা আলোচ্য নয়; তবে মোটামুটি বলা যায় যে, ঐ গুলা সাধারণ জীব প্রকৃতি। আর সহজাত বলিয়া স্বতঃ স্ফূর্ত্ত। মনুষ্যত্ব—সাধনার। সাধনা আয়াসের। আয়াস হইতে আয়েসের মোহ বেশী।

ভাল মন্দ লাগাকে অনেকে কাব্য বিচারের কষ্টিপাথর করেন। ঐ অনুভূতিতে কাব্য সমালোচনা বড়ই ভুল।

ভাল লাগিলেই যে বস্তু বাস্তবিক সুললিত ও সুন্দর হইবে এবং মন্দ বোধ হইলেই যে তাহা সত্যই খারাপ, ইহা বিষম ভ্রম। লম্পটের বার-বিলাস সুখকর, মাতালের মদ খাইতে ভাল লাগে, সঙ্গীতানভিজ্ঞের উৎকৃষ্ট রাগ রাগিণী অপেক্ষা চুটকি মিষ্ট; তাই বলিয়া কি প্রকৃতই ঐ সব সুষ্ঠু অনুভব?

কাব্যে যে ভাব বা চিত্র লালসাদিগ্ধ; যেখানে ত্যাগ অপেক্ষা ভোগ প্রকট বা যে সমস্ত রস আকাঙ্ক্ষার উত্তেজক, তাহা সহজেই মনোরম বোধ হয়। ভাল মন্দ লাগার নিকষে কষিলে কাব্যের শুদ্ধাশুদ্ধির যাচাই হয় না।

বাহ্য প্রতিকৃতিতে ,নয় মনোভাবের চিত্রে দেখিতে হইবে যে, তাহা কত খানি পাশব বৃত্তিকে অতিক্রম করিয়াছে। কিম্বা তার পরিণাম ভয়ঙ্কর হইয়াছে কিনা? ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ, স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ, উচ্ছৃঙ্খলতা অপেক্ষা সুনিয়ম, ব্যষ্টির তুষ্টি অপেক্ষা সমষ্টির কল্যাণ যে কাব্যে সুচিত্রিত তাহাই উৎকৃষ্ট কবিতা।

সাহিত্য সংসারে কলা কৌশল বা art এর বড়ই আধিপত্য। আর্টের খাতিরে কুরুচি সুরুচি বলিয়া চলিয়া যায়, দুর্নীতি সুন্দর আখ্যা পায়।

কিন্তু আর্ট কি? আর্টের একটা চির প্রতিষ্ঠ শাশ্বত সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। উহার মূলেও ঐ ভাল মন্দ লাগা।

অশোভন কল্মষ পাশবতাকে শোভন লোভন মধুময় করিয়া অঙ্কিত করা কলা কৌশল নয়; কুৎসিতকে কুৎসিতম করিয়া, কল্যাণকে সুসজ্জিত করিয়া চিত্রিত করাই যথার্থ আর্ট। পাপের মধ্যে সৌন্দর্য্য দর্শন পাশব প্রকৃতির পরিচায়ক। মানব স্বভাবে কুবাসনা যখন আছে, তখন কাব্যেও তাহা থাকিবে, লোভনীয় হইয়া নহে—ঘৃণ্য হতশ্রী ভাবে। কেবল ভাল লাগায় কাব্যের সৌন্দর্য্য নয়। সত্য ও শিবের সম্মিলনে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। আবার সত্যই কেবল মাত্র সুন্দর নয়; কারণ কুবাসনাও ত সত্য, মানুষের প্রকৃতির প্রেরণা। যাহা সত্য এবং শিব, বাস্তব জীবনে মঙ্গলময়, তাহাই সুন্দর।

কাব্যের কার্য্য চিত্ত-বিনোদন; কিন্তু সেই তৃপ্তি ক্ষণিকের অনুভূতি নয়। বিশ্ব-সংসারে

বিপুল দুঃখ দাব ; মানুষকে অনেক যুঝিতে হয়। কাব্য ভগীরথের মত সমস্ত ব্যথা বেদনার উপর আনন্দের ধারা বহাইয়া জীবনকে সঞ্জীবিত করিবে। সূর্য্যরশ্মি পুষ্প বিকশিত করে, বসুধাকে আলোকে পুলকিত করে, ভাস্বর দ্যুতিতে দেখাইয়া দেয় কি কান্ত, কি কুশ্রী। কাব্যও কিরণ সম্পাতে—প্রকৃতির শোভা ফুটাইবে, অন্তরের অন্ধকার অলিগলিকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবে কি শ্রেয়ঃ কি বা হেয়।

রূপ বাঞ্ছনীয়, প্রাণ ততোধিক। গঠনের পারিপাট্য, বেশ ভূষা চাই। কিন্তু অধিক বাঞ্ছিত প্রাণ। মর্ম্মর মূর্ত্তিকে লইয়া ঘর করা যায় না ; প্রাণের সহিত বাহ্য সৌষ্ঠব থাকিলে তাহা অনিন্দ্যমোহন। কাব্যে ভাবের সহিত প্রকাশ ভঙ্গিমার শিল্পচাতুর্য্য থাকা খুব আবশ্যক। শিথিল ছন্দে, দুর্ব্বোধ ভাষায়, অলঙ্কার অনুপ্রাস ব্যতীত বর্ণনীয় ভাবটী পরিস্ফুট হইতে পারে না।

আবার এই রচনার কারিগরিতে একটা ত্রুটীর সম্ভাবনা আছে। বাহিরের রূপ মোহ বড়ই বেশী। অনেক সময় মিষ্ট শব্দ, ঝঙ্কৃত ছন্দ, মধুর অনুপ্রাস, অলঙ্কারের লোভে আদি বস্তুটী ছাড়া পড়ে।

সাধারণতঃ প্রাণ দেখিয়া ত ভদ্রাভদ্র নির্ণয় হয় না, হয় বহিরের প্রকাশে। কাব্যে ও ঐ রকম ভাষা ছন্দের মনোহারিত্বে চমক লাগাইয়া দেয় বুঝি বা বাহির যেমন, ভিতরও তেমনি শ্রীযুক্ত।

ভাবের অভাব যেমন একটা দোষ, ভাব দুর্ব্বোধ্যত্তাও তেমনি বিষম ত্রুটী। জটিল বিষয় কান্ত করিয়া প্রকাশ কাব্যের কার্য্য। অপ্রকাশকে ব্যক্ত, জটিলকে ঋজু, অবোধকে সরল হৃদয়গ্রাহী করাই কবিতার বিশিষ্টতা। ভাষার অন্তঃস্তলে যখন ভাব খুজিয়া পাওয়া যায় না, তখন বুঝিতে হইবে যে উহা নাই বা যাহা আছে তাও না থাকার মতন। মৃন্ময় মূর্ত্তি যেমন, উহাও তেমনি শব্দের শুষ্ক কাঠামো মাত্র। মিষ্টিসিজ্‌ম্ বলিয়া যে কথাটা আছে, তাহা একটা ছলনা ; অক্ষমতাকে ঢাকিবার জন্য একটা বড় ফাঁকি। কাব্য হইবে শতদলের মত সৌরভে সুষমায় বিকশিত। কবিতায় প্রহেলিকার স্থান নাই।

অন্যায়ের একটা স্বভাব ছল অনুসন্ধান। কাব্যে আধ্যাত্মিকতাও একটা ছলনা। হয়ত বাস্তব ক্ষেত্রে ভাবটা অতি সাধারণ বা ইতর। আধ্যাত্মিক অর্থ করিয়া তাহাকে অভিজাত শ্রেণী-ভুক্ত করা হইল। হয়ত কোথাও রস অস্ফুট, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া বড় করা হইল। ইহাও অতি হেয় চেষ্টা। যাহা যেমন, তাহাকে তেমনি করিয়াই দেখা উচিত। সহজেই যাহা সুন্দর অমনিই যাহা মোহন, তাহাকে আর কৃত্রিম সাজ পরাইতে হয় না ; আবার হীনকে সাজাইয়া মহৎ করাও অন্যায়।

শক্তির অভিব্যক্তি সৃষ্টি কার্য্য। যাহা আছে, তাহার পুনরাবৃত্তি সৃজন নয়, তাহা অনুকরণ। সৃষ্টি অর্থ সম্পূর্ণ নূতন ; যাহা নাই—তাহার জন্ম-দান।

কাব্যের কারবারও পুরানো লইয়া নয়, তাহার বৈশিষ্ট্য নব সৃষ্টিতে। অবশ্য তাহা অবাস্তব কল্পনা বা খেয়াল হইবে না। হইবে এই বাস্তব জগতের হৃদয়ে হৃদয়ে সত্য অনুভূতির, জীবনের সাধনার।

নিখিল-বিশ্ব পূর্ণ হইয়া নাই ; কত ভ্রম প্রমাদে সংসার চলিতেছে, কার্য্যে চিন্তায়, আচারে অনুষ্ঠানে কত সংকীর্ণতা। সাধারণ মানুষ অতি-মানবের স্বপ্নও দেখিতে জানে না। কাব্য আনিবে সেই সব কল্পনা, সেই আদর্শ, কর্ম্মের সেই পদ্ধতি প্রকরণ, সেই চিন্তা ও ভাব, যাহাতে

ব্যক্তি ও জাতিকে দেবত্বে উন্নিত করিবে। একটা বাস্তব স্বর্গরাজ্য সৃজনের আকাঙ্ক্ষা জাগাইবে। মানবের উন্নতি শুধু স্বভাব প্রভাবেই হয় নাই, ঋষির তপস্যা লব্ধ অমৃতের বাণী তাহাকে অমরতার দিকে অগ্রগামী করিয়াছে। কাব্য ঋষির সত্য দৃষ্ট বেদ-গাথা।

আনন্দ মাত্রেই যে অমৃতময় তাহা নয়; সুখ মাত্রই যে সারবান—এমন কোন কথা নাই। কেবল একটা মুহূর্তের বিলাস, কেবল আকাঙ্ক্ষার আহুতি, পতঙ্গের বহ্নি প্রিয়তার মত ধ্বংস-কর। স্বার্থেই ইহার সার্থকতা।

স্বার্থ ছাড়িয়াছে বলিয়া, সংযম শক্তি-দায়ক বলিয়াই মানব জীব শ্রেষ্ঠ। আপনার সুখ সাধ বাসনা সংসার সমাজের কাছে বিলাইয়া দেওয়াতে—উৎসর্গ করাতেই মানুষ—মানুষ। কাব্য কেবল নিরর্থক পাশবিক স্বার্থের উপকরণ হইবে না। হইবে মিষ্টত্বের সহিত সঞ্জীবক।

এই ভারতের অরণ্য হইতেই আরণ্যক অমৃত গাথা উদ্গীত হইয়া মৃত্যু-মূঢ়, দৈন্য-দীন মানবকে আনন্দ ও অমরত্বে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। কাব্যে গানে গাথায়—ভারত আবার সেই বাণীই চাহিতেছে।

কবীরের দোঁহা

অষ্টবিকার—মান ও অহঙ্কার

কঞ্চন তজনা সহজ হৈ সহজ ত্রিয়াকা নেহ।
মান বড়াই ঈরষা দুরলভ তজনী য়েহ ॥ ১ ॥

ছাড়া সহজ ধনের মায়া, সহজ ছাড়া প্রেম জায়ার।
অহঙ্কার আর ঈর্ষা মান, মহা কঠিন পরিহার ॥ ১ ॥

মায়া তজী তো ক্যা ভয়া, মান তজা নহিঁ জায়।
মান বড়ে মুনিবর গলে, মান সবন কো খায় ॥ ২ ॥

কি হ'য়েছে মায়া-ত্যাগে, মান ছাড়া নাহি যায়।
মানে মহামুনির পতন, মান সকলেরে খায় ॥ ২ ॥

কালা মুঁহকর মানকা আদর লাবৌ আগি।
মান বড়াই ছাড়িকে রহৌ নাম সেই লাগি ॥ ৩ ॥

মানের মুখে লাগাও কালি, আদরেতে আগুন দাও।
মান বড়াই পরিহরি নামে সদা রত রও ॥ ৩ ॥

বড়া হুআ তো ক্যা হুআ, জৈসে বড়ী খজুর।
পন্থী কো ছায়া নহীঁ, ফল লাগৈন অতি দূর ॥ ৪ ॥

কি হয়েছে বড় হয়ে, খেজুর গাছ ঐ যেমন বড়।
পথিক না পায় ছায়া শীতল, ফল যত সব উর্দ্ধে জড় ॥ ৪ ॥

ভক্ত অরু ভগবন্ত এক হৈঁ, বূঝত নহী অজ্ঞান।
সীস নবাকত সন্ত কো, বড়া করৈ অভিমান ॥ ৫ ॥

অভেদ ভক্ত ভগবানে, বুঝে না ক মূর্খ যত।
দহে তীব্র অভিমানে, সান্ত পদে হ'তে নত ॥ ৫ ॥

প্রভুতা কো সব কোউ ভজৈ, প্রভু কো ভজৈ না কোয়।
কহ কবীর প্রভু কো ভজৈ, প্রভুতা চেরী হোয় ॥ ৬ ॥

সবাই ভজে প্রভুতারে, কেউ নত নয় প্রভুর পায়।
কবীর কয় যে প্রভু ভজে, প্রভুতা তার পড়ে পায় ॥ ৬ ॥

জহঁ আপা তহঁ আপদা, জহঁ সংসয় তহঁ সোগ।
কহ কবীর কৈসে মিটৈ, চারো দীরঘ রোগ ॥ ৭ ॥

অহং যথা আপদ তথা, সংশয় শোক একই স্থানে।
কবীর বলে এ চারিরোগ, কিসে যাবে কেবা জানে ॥ ৭ ॥

অহং অগ্নি হিরদে জরৈ, গুরুসে চাহে মান।
তিন কো জম ন্যেইতা দিয়া, হো হমারে মিছমান ॥ ৮ ॥

অহঙ্কারের আগুন হৃদে গুরুর কাছে চাহে মান।
যম তাহারে ডেকে বলে, আমার গৃহে নিমন্ত্রণ ॥ ৮ ॥

সাধনা-মূলক সংগঠন—অভিভাষণ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু

ভারতের জাতীয়তার বন্ধন-রজ্জু বা ভিত্তি তার সাধনা বা কল্‌চারে। এ জাতীয়তার অবয়ব বা অঙ্গ প্রথমতঃ সকল শ্রেণীর হিন্দু-জাতি ও বৌদ্ধেরা ; পরে মুসলমানগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ভারতের স্বরাজও অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সাধনাকে অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল—আধুনিক রাজনৈতিক স্বরাজ তাহা হইতে অন্য বিষয়। ভারতবর্ষের মত এক বিরাট দেশের পক্ষে যতদূর শ্রীসম্পন্ন হওয়া সম্ভব, এই সাধনা-মূলক স্বরাজের বশে ভারত তাহাই ছিল। ভারতের সে শ্রী ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম যুগ পর্য্যন্তও বিদ্যমান ছিল। তখনকার একজন ইংরেজ (Sir Thomas Munro) তাহাতে এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে,—"If a

* "ভারতীয় সাধনা সংসদ" সংগঠনের প্রস্তাবে—২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭।

good system of agriculture, unrivalled manufacturing skill, a capacity to produce whatever can contribute either convenience or luxury, school established in every village for teaching reading, writing and arithmetic, the general practice of hospitability and charity amongst each other, and above all a treatment of the female sex full of confidence, respect and delicacy are among the signs which denote a civilised people, then the Hindus are not inferior to the nations of Europe, and if civilisation is to become an article of trade between England and India, I am convinced that England will gain by the import cargo." আজ যে আমরা আমাদের সে সাধনা-গত স্বরাজ হারাইয়া বসিয়াছি, পাশ্চাত্য সভ্যতার দাপে নব্য ভারতের অধঃপতনই তার কারণ। স্বকীয় সাধনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াই নব্যভারত আজ পাশ্চাত্যের আদর্শে পাশ্চাত্যের মতন অভাবের পর অভাব সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, সাম্য চাহে, জনতান্ত্রিকতা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছে। এই ভাবে চলিয়াই এক্ষণে আমরা আমাদের সাধনাগত স্বরাজের তিনটী প্রধান অবলম্বন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি—তাহা (১) প্রকৃত গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন, (২) স্বদেশীয় শিল্প ও (৩) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীভাব। আর এজন্যই আমাদের বর্ত্তমান এই উদ্বেগ ও দুঃখ যন্ত্রণার অধিকাংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতের প্রকৃত মুক্তি তাহার এই সাধনা-মূলক স্বরাজ্যের পুনরুদ্ধার সাপেক্ষ। আজ জগতের জাতিতে জাতিতে ও বিভিন্ন জাতির সাধনার মধ্যে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের সাধনার স্বপক্ষে শক্তি সঞ্চয়ের চিহ্ন দেখা যাইতেছে; এ এক শুভ লক্ষণ। কিন্তু এ সকল শক্তি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত, এবং অপেক্ষাকৃত অসম্বদ্ধ। এখনও ইহাদের মধ্যে কোনও সংহত শক্তি প্রতিষ্ঠিত না থাকাতে ভারতীয় সাধনার বল পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখীন হইয়া উহাকে প্রতিহত করিতে পারিতেছে না; কারণ ঐ সভ্যতার পক্ষ সমর্থন করিবার লোক অনেক; তাহারাই উহার শক্তিযোজনা করিয়া দিতেছে। এই জন্যই একটী কেন্দ্রীয়সঙ্ঘ সংগঠিত হওয়া আবশ্যক—সেখানে ভারতীয় সাধনার সমর্থক ও অনুরাগী ব্যক্তিগণ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া ভাবের আদান প্রদান করিবেন, নিজেদের কর্ম্ম নির্দ্ধারণ ও কার্য্য প্রণালী স্থির করিবেন। এবং সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বিরোধী ও আমাদের জাতীয় সাধনার উচ্ছেদ সাধনে সদা যত্নশীল পাশ্চাত্য ভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। দিন দিন এই সনাতন ভারতীয় সাধনার প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিরুদ্ধাচরণ ও ক্ষতি করিবার প্রবৃত্তি যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, তাহাতে এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধতার আরও অধিক প্রয়োজন। আধুনিক পাশ্চাত্যের শিল্প-বাণিজ্য ও ভোগৈশ্বর্য্যসম্বল সভ্যতার আপাতমধুর চাকচিক্যে মোহিত হইয়াই নব্য ভারতের ক্রান্তিকারী কালাপাহারী সংস্কারকদল ভারতের সেই প্রাচীন সবল ও সুস্থ সমাজ-গঠনের ধ্বংস সাধন করিয়া তাহার স্থানে পাশ্চাত্যের অনুকরণে নূতন সমাজ গড়িতে যাইতেছে। ভারতীয় সাধনার আদর্শ পুনঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই দেখা যাইবে যে এই নূতন কাল্পনিক সমাজের ভিত্তি কত বিপদ-সঙ্কুল এবং তাহাতে সুখসম্পদের আশাই বা কত ভ্রমাত্মক। পাশ্চাত্যভাবে বিজিতমনা এই সকল সমাজ-সংস্কারকদিগের বিভ্রাটকারী কার্য্য পদ্ধতির দিকে দৃকপাত না করিয়া প্রস্তাবিত সমিতি স্বদেশীয় সাধনার অনুকূল

প্রণালীতেই সমাজ সংস্কারের কার্য্য সকল সুসঙ্গত উপায়ে করিতে যাইবেন। এক একটী করিয়া তাহার কার্য্য প্রণালীর দিগ্ দর্শান যাইতে পারে।

বর্ত্তমানকালের আইনআদালতগুলি বিশেষ করিয়া দেখিবার জিনিস—উহা দেশের বিচক্ষণ প্রতিভা-সম্পন্ন (আইন-জীবি) ব্যক্তিদিগের মল্লভূমি ; আর তাহাতে ধনীদিগের হস্তে সঞ্চিত ধনের অতিপূর্ত্তি রূপ ব্যাধিরও নিরাকরণ হয় বটে ! কিন্তু দেশের সাধারণ জনতার পক্ষে উহা অত্যধিক ব্যয়সঙ্কুল —অতিমাত্র হয়রাণীকর ; বিচারপতিগণের অত্যধিক দীর্ঘ সূত্রিতা বা ঢিলামীর দরুণ গরীব-দিগের প্রাণান্ত উপস্থিত করে। শালিসী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্থানে স্থানে চেষ্টা হইতেছে বটে ; কিন্তু তাহার কোনও বিধিবদ্ধ ফল দেখা যায় না। পূর্ব্বে এদেশে পঞ্চায়তি বিচারাদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং তাহা ছিল ভারতের স্বকীয় সাধনা মূলক স্বরাজের একটী অতি বড় প্রয়োজনীয় সংরক্ষক ভূমি। তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলে, দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

আবার বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে শিক্ষার প্রচার হইতেছে, তাহাতে দেশের কৃষির উপর এক বিষময় ফল পড়িতেছে। পূর্ব্বে যে সকল লোকের কৃষিই উপজীবিকা ছিল, এবং ব্যবসার হিসাবে যাহারা কৃষির উন্নতি বিধানে সদা যত্নপর ছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ বুদ্ধিমান ও সঙ্গতিপন্ন লোকেরাই এক্ষণে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করিয়া লাঙ্গল ছাড়িয়া কলমধারণ করিয়াছে। এইরূপ করাতে কৃষির ত অনিষ্ট সাধন হইয়াছেই ; তা ছাড়া ভদ্রলোক বলিয়া যে এক শ্রেণীর নিঃসম্বল লোক দেশে বিদ্যমান, যাহাদের মধ্যে বেকার-সমস্যা অন্য সকল শ্রেণীর লোকের অপেক্ষা অতিশয় অধিক, তাহাদের মধ্যে ভিড় ও অবসাদ আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু এখানেই এ দুরবস্থার পরিসমাপ্তি হইতেছে না। ইহার উপরে আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার ভোগবিলাস সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে—অনেক প্রকার অনাবশ্যক ও অব্যবহার্য্য দ্রব্যের ব্যবহার বাড়িয়াছে, অনেক অসার পদার্থকে সারবান বলিয়া গ্রহণ করা হইতেছে, অনেক প্রকার বুদ্ধিভ্রংশতা দেখা দিয়াছে ও নানাপ্রকারের বাহুল্য ঠাঁই পাইতেছে। তাহাতে নিতান্ত অসঙ্গত রূপেই লোকের জীবন সংগ্রামের কাঠিন্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এবং ইহাই বর্ত্তমান সময় এদেশের লোকের মধ্যে যে শারীরিক ও নৈতিক অবনতি দেখা যাইতেছে তাহার প্রধান কারণ। আবার এই অসঙ্গত ও ভোগবহুল লালসার তৃপ্তির জন্যই বৈদেশিক পণ্যের আমদানী হইতেছে, এবং তাহাতে স্বদেশীয় শিল্পের ধ্বংস-সাধন ঘটিয়াছে। ভারতের সাধনার মূলনীতি অবলম্বনে আপনাদের জাতীয় জীবন পুনঃ সরল ও সহজ করিয়া লইতে পারিলেই ইহার প্রতিরোধ হইবে—কেবল মাত্র বয়কট্ বা পিকেটিং দ্বারা সেরূপ হইতে পারে না ; ইহাদের ফল যে ক্ষণিকবা সাময়িকতাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে দেখা গিয়াছে।

দেশবাসীগণের মধ্যে অনেকেই এখন আমাদের, সাধনা-মূলক স্বারাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষপাতী ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে আবার অনেকের অভিমত এই যে, প্রথমে আমাদের রাষ্ট্রিয় (Political) স্বরাজ হস্তগত হওয়া আবশ্যক, তাহার পর সাধনা-মূলক (cultural) স্বরাজ আসিতে পারে। আমাদের কিন্তু দৃঢ় ধারণা এই যে, বর্ত্তমান অবস্থায় যে স্বরাজের কথা হইতেছে, ও যাহা প্রাপ্তির প্রত্যাশা সকলে করিতেছেন, সেই স্বরাজ হইতে দেশের প্রকৃত সাধনা-মূলক স্বরাজ আসিবার সম্ভাবনা খুবই কম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শিক্ষার কথা ধরা যাউক। বর্ত্তমানে আমাদের এই

যে শোচনীয় দুর্দ্দশা, তাহার সর্ব্ব প্রধান কারণই দেশের বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী—এই যে আমাদের বন্ধনের বেড়ি তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য এমন কৌশলপূর্ণ যন্ত্র আর কিছুই নাই ! মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার ব্যবস্থায় শিক্ষা এক্ষণে হস্তান্তরিত বিভাগে অর্থাৎ দেশীয় মন্ত্রীর হস্তে অর্পিত বিষয়। কিন্তু মন্ত্রীই বলুন বা ব্যবস্থাপক সভাই বলুন, যাহাদের উপর পরিচালন শক্তি আছে বলিয়া বলা হয়, তাহাদের কেহই এ যাবত শিক্ষা পদ্ধতির প্রকৃত কোনই পরিবর্ত্তন সাধন করিতে যান নাই, পক্ষান্তরে তাহারা সর্ব্বদাই বলিয়া আসিতেছেন যে তাহাদের হস্তে অর্থ নাই যে শিক্ষার কোনও বিস্তার সাধন করিতে পারেন। বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক মণ্ডলে সংবাদ পত্র ও বক্তাদিগের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে দেশমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতা মূলক হওয়া চাই, এবং স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সমভাবে উচ্চশিক্ষার প্রসার ও বিস্তার সাধন করিতে হইবে। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি (যাহা অশেষ দোষ ও ক্ষতির আকর) হইতে এক চুলও পরিবর্ত্তনের চিহ্ন ইহাদের কোথাও দেখা যাইতেছে না। আসল কথা হচ্ছে এই যে, দেশের রাজনৈতিক নায়কদিগের মধ্যে যাঁহাদের কথা ও প্রভাবের মূল্য আছে তাহাদিগের অধিকাংশের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি অল্পাধিক পরিমানে ভারতীয় সাধনার বিরোধী ; কাজেই তাহাদিগ হইতে উহার পুনরুদ্ধার সাধনের আশা বৃথা। ভারতের সাধনা বিষয়ে ইহাদের ধারণা কত হীন ও ক্ষীণ তাহা ভাবিতেও সন্তাপ উপস্থিত হয়। বিগত ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার এক অংশ হইতে ইহার একটু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে—

"The entire social fabric requires a thorough over-hauling, and has to be revolutionised'; no amount of tinkering or super-imposition of piecomeal reforms would serve our purpose. A frontal attack should be led on the forces of reaction. If it is found that Hindu culture means purdah and Mahomedan culture means the harem, both must go. If Hindu culture means caste system and marriage before puberty, and Mahomedan culture means polygamy none of them should have a place in our social polity. Mere mutual toleration for Hindu and Mehomedan culture is not enough It is at best a negative virtue ; something positive must be done, and the shackles alike of the Shariats and Shastras should be unceremoniously cast off if they are found to stand in the way of the formation if a united nation"

(ক্রমশঃ)

যুধিষ্ঠিরের সময়। *

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধবৎসর।

মহাভারত জগতে অতুলনীয় গ্রন্থ। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট বা বিশাল গ্রন্থ পৃথিবীতেই দেখা যায় না। ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও কলা-প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। তাহা আবার যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, এইটুকু মাত্র বলিলেই চলিতে পারে যে, 'মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই মহাভারতে আছে।' তাই কবি স্বয়ং বলিয়াছেন—"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ" ইহার অনুবাদে বাঙ্গালীও বলিয়া থাকে—"যা' নাই ভারতে, তা' নাই ভারতে।" তা'র পর, ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর, ভাবও মনোহর এবং বৈচিত্র্যময়। সর্ব্বাপেক্ষা ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই গ্রন্থ ইতিহাস হইলেও ঋষিপ্রণীত বলিয়া হিন্দু ইহাকে আপ্তবাক্য ধর্ম্মগ্রন্থ মনে করে, ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে পাঠ করে এবং পঞ্চম বেদ বলিয়া স্বীকার করে, আর, জগতের সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহার আদর করে এই জন্য যে, ইহা সকল প্রকার জ্ঞানের আকর এবং ভারতের প্রাচীন চিত্র দেখিবার পক্ষে বিশাল আলেখ্যপট।

এহেন মহাভারতগ্রন্থের নায়ক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং প্রতিনায়ক কুরুরাজ দুর্য্যোধন। সুতরাং ইঁহাদের চরিত্র জানিবার জন্য যেমন আকাঙ্ক্ষা ও কৌতুক জন্মে, তেমন সময় জানিবার জন্যও আকাঙ্ক্ষা ও কৌতুক জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সেই সময়নিরূপণসম্বন্ধে বহুতর মতভেদ আছে; তবে, তাহাতে কোন দুঃখ বা আক্ষেপ করিবার কারণ নাই। কেন না, দুই এক শতাব্দীপূর্ব্বের ঘটনা নিয়াই যখন মতভেদ হইতে দেখা যায়, তখন বহুশতাব্দীপূর্ব্বের ঘটনা নিয়া যে মতভেদ হইবে, তাহা ত সম্পূর্ণ সম্ভবপর। তা'র পর, এ বিষয়ে যতগুলি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাও পরস্পর-বিরোধী। অতএব যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির সময়নিরূপণসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে প্রথমে ইহাই আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, পরস্পরবিরোধী প্রমাণগুলির মধ্যে কোন্ প্রমাণ প্রবল এবং কোন্ প্রমাণ দুর্ব্বল। প্রমাণের প্রবলতা বা দুর্ব্বলতা জানিবারও ইহাই সমীচীন উপায় যে, যে উদ্দেশ্যে যে শাস্ত্র বা যে গ্রন্থ রচিত, সেই বিষয়ে সেই শাস্ত্র বা সেই গ্রন্থই প্রবল প্রমাণ, অপরগুলি দুর্ব্বল প্রমাণ। ইহার উদাহরণও আমরা এইরূপ দেখিতে পাই; আত্মা বা অধ্যাত্মবিষয় নিরূপণের জন্য বেদান্তশাস্ত্র, সুতরাং সে বিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রই প্রবল প্রমাণ, ধর্ম্মনিরূপণের জন্য স্মৃতিশাস্ত্র রচিত, অতএব ধর্ম্মনিরূপণসম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রই প্রবল প্রমাণ এবং শব্দব্যুৎপাদনের জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র প্রণীত, সুতরাং সে বিষয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রই প্রবল প্রমাণ।

---

* ১৩৩৭ সাল ২৭শে অগ্রহায়ণ কলিকাতা বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদে এবং ঐ সালেই ৪ঠা পৌষ কলিকাতা উৎসবসভায় এই প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল।

এইরূপ আরও বহুতর উদাহরণ দেখা যায়। অতএব কুরু-পাণ্ডবের ইতিহাস বিবৃত করিবার জন্য মহাভারত রচিত হইয়াছিল বলিয়া কুরু-পাণ্ডবসম্বন্ধে কোন বিষয় নির্ণয় করিতে হইলে মহাভারতকেই প্রবল প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। অতএব আমরাও এই নিয়মের অনুসরণ করিয়াই যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণসম্বন্ধে প্রথমে মহাভারতের বচনই উদ্ধৃত করিলাম।

১। "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ॥"
(মহাভারত-আদিপর্ব্ব-দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩ শ্লোক)

কলি ও দ্বাপরযুগের সন্ধিকাল অত্যন্ত সূক্ষ্ম; তাহাতে অষ্টাদশদিনব্যাপী যুদ্ধ হইতে পারে না। অতএব দুর্গাপূজায় অষ্টমীর শেষ দণ্ড এবং নবমীর প্রথম দণ্ড, এই দণ্ডদ্বয়াত্মক কাল যেমন সন্ধিপূজার একটি কাল বলিয়া পারিভাষিত হইয়াছে † এবং দিনের শেষ অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত ও রাত্রির প্রথম অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত, এই মুহূর্ত্তাত্মক কাল যেমন সায়ংসন্ধ্যার একটী কাল বলিয়া পরিভাষিত আছে ‡; তেমন এখানেও দ্বাপর-যুগের শেষ কতটুকু এবং কলিযুগের প্রথম কতটুকু, এমন একটী কালকেই দ্বাপর ও কলির 'অন্তর' নামে পরিভাষিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে, সেকাল কতটুকু, তাহা আমরা অন্য একটী পরিভাষা দ্বারা ধরিয়া লইতে পারি। সে পরিভাষা এই,—"সংখ্যাঽনাদেশে শতম্।" অর্থাৎ কোন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে শত সংখ্যা ধরিতে হইবে। এই হিসাবে দ্বাপরের শেষ ৫০ বৎসর এবং কলির প্রথম ৫০ বৎসর এই একশত বৎসর কালকেই দ্বাপর ও কলির অন্তর কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে *। কিন্তু শাস্ত্রে যুগসন্ধ্যা বা যুগসন্ধ্যাংশ বলিয়া যে সুদীর্ঘকালের পরিভাষা করা আছে, †

† "অষ্টমীনবমীসন্ধৌ তৃতীয়া খলু কথ্যতে। তত্র পূজ্যা ত্বহং পুত্র! যোগিনীগণসংযুতা। অষ্টম্যাঃ শেষদণ্ডশ্চ নবম্যাঃ পূর্ব্ব এব চ। অত্র যা ক্রিয়তে পূজা বিজ্ঞেয়া সা মহাফলা॥" তিথিতত্ত্ব-ধৃত কালিকাপুরাণ।

‡ "উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ। তমেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥" ব্যাসসংহিতা। "হ্রাসবৃদ্ধী চ সততং দিনরাত্র্যোর্যথাক্রমম্। সন্ধ্যামুহূর্ত্তমাখ্যাতা হ্রাসে বৃদ্ধৌ সমা স্মৃতা॥" যোগিযাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

* "সংখ্যাঽনাদেশে শতম্" এই শতশব্দদ্বারা কেহ একশত মাস বা দিন ধরিতে চাহিলেও তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কেন না, তাহাতে কোন বস্তুক্ষতি হয় না।

† "......দ্বে সহস্রে দ্বাপরে তু সন্ধ্যাংশৌ তু চতুঃশতে। সহস্রমেকং বর্ষাণাং দিব্যং কলৌ প্রকীর্ত্তিতম্॥ দ্বে শতে চ তথান্যে বৈ সংখ্যাতঞ্চ মনীষিভিঃ। ......" মৎস্যপুরাণ ১১৮ অধ্যায়। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতাগ্রন্থেও এই জাতীয়ই লিখিত আছে। ইহার অর্থ—দেবপরিমাণের দুই হাজার বৎসরে দ্বাপরযুগ, তাহার সন্ধ্যা ঐ পরিমাণে দুইশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও ঐরূপই দুইশত বৎসর, আবার দেবপরিমাণের এক হাজার বৎসরে কলিযুগ, তাহার সন্ধ্যা ঐ পরিমাণে একশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও ঐরূপই একশত বৎসর। মনুষ্যের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদের ১বৎসর হয়। এই হিসাবে মনুষ্যপরিমাণে দ্বাপরযুগের সন্ধ্যা ৭২০০০ বৎসর এবং মনুষ্যপরিমাণে কলিযুগের সন্ধ্যা ৩৬০০০ বৎসর। এই হিসাবে দ্বাপর ও কলি এই উভয়ের সন্ধ্যাকাল মনুষ্যপরিমাণে ১০৮০০০ একলক্ষ আট হাজার বৎসর।

তাহা ধরা যাইতে পারে না। কারণ, তত দীর্ঘকাল ধরিলে যুদ্ধের প্রকৃত কাল বুঝিবার জন্য অন্য প্রমাণের সাহায্য লইতে হয় বলিয়া বক্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; বিশেষতঃ তাহা হইলে, অবশ্যই মহর্ষি "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে" এইরূপ না বলিয়া নিঃসন্দেহার্থ "সন্ধ্যাকালে চ সম্প্রাপ্তে" এইরূপই বলিতেন। অতএব এইক্ষণ উক্ত মহাভারতের বচনটীর এইরূপ অর্থ দাঁড়াইল যে, দ্বাপর ও কলিযুগের মধ্যবর্ত্তী একশতবৎসরের অনধিক সময়ের মধ্যে কুরুক্ষেত্রে কুরুসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধ হইয়াছিল।

২। সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে একটী কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, 'দ্বাপরযুগের শেষে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল।' এই কিংবদন্তীও উক্ত মহাভারতের বচনটীর সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে। পুরুষপরম্পরায় এই কিংবদন্তী চলিয়া আসিবার কারণ এই যে, এ যাবৎ ভারতবর্ষে যত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ একটী প্রধান ঘটনা এবং সেই যুদ্ধই ভারতবর্ষের অবনতির প্রথম ও প্রধান কারণ। কেন না, সেই যুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত বীরই নিহত হইয়াছিলেন; যে দুই চারিজন অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারাও বিষাদে মৃতপ্রায় থাকিয়াই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহাতে উপযুক্ত শিক্ষক না থাকায় উপযুক্ত যুদ্ধশিক্ষা না পাইয়া ক্ষত্রিয়জাতি অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্যই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের পরে আর 'নারায়ণ' ও 'ব্রহ্মশির' প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্রের নামও শুনা যায় নাই। তা'র পর, কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজারা সেই যুদ্ধে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর ব্রাহ্মণপ্রতিপালক লোক ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ উপার্জ্জনের জন্যই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহাতে আর তাঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাত্মবিষয়-প্রভৃতি আলোচনা করিবার অবসর ছিল না। এই জন্যই সেই কুরু-পাণ্ডবযুদ্ধের পূর্ব্বে রচিত 'পূর্ব্বমীমাংসা' এবং 'উত্তরমীমাংসা' দর্শনের পরে আর গভীর গবেষণা-পূর্ণ কোন মূল শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল বলিয়া শুনাও যায় না; কেবল পূর্ব্বরচিত শাস্ত্রগুলির উপরে ভাষ্য, টীকা ও টিপ্পনী এবং তাহার সংগ্রহগ্রন্থ রচিত হইয়া আসিতেছে দেখা যায়। অতএব সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধই যে ব্রাহ্মণ জাতিরও অবনতির কারণ, ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে। আবার সেই যুদ্ধে ভারতের প্রায় সকল প্রতাপশালী রাজাই নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া জলে ও স্থলে সর্ব্বত্রই দস্যু ও তস্করের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; তাহাতেই সমুদ্রযাত্রা ও দূরতীর্থপর্য্যটনপ্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছিল ‡। সেই কারণেই বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় বৈশ্যজাতিরও সেই সময় হইতেই অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র শূদ্রজাতি যথাস্থানে থাকিলেও উপরের তিনটী জাতিই অবনতির দিকে ধাবিত হওয়ায় সম্পূর্ণ হিন্দু জাতিই ক্রমশঃ অবনত হইয়াছিল। অতএব বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধই ভারতবাসী হিন্দুর প্রথম ও প্রধান অবনতির কারণ। সুতরাং যে বিপদ উপস্থিত হওয়ায় চিরকালের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং যে রোগ উৎপন্ন হওয়ায় শরীরটী চিরকালের জন্য স্বাস্থ্যবিহীন হইয়া পড়ে, সেই বিপদ এবং সেই রোগের উৎপত্তির দিন

‡ "সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।.......তীর্থসেবাতিদূরতঃ......। এতানি লোক-গুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ"॥ উদ্বাহতত্ত্বধৃত আদিত্যপুরাণ।

যেমন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে, সেইরূপ কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময়ও ভারতবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাহাতেই ভারতবর্ষে পুরুষপরম্পরায় এই কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, 'দ্বাপরযুগের শেষে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল।'

কাশ্মীরদেশবাসী রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা কহ্লণমিশ্রও প্রতিবাদের উপক্রমে ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে * এই কিংবদন্তীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"......ভারতং দ্বাপরান্তে-হভূদ্বার্ত্তয়েতি বিমোহিতাঃ।" (রাজতরঙ্গিণী-প্রথমতরঙ্গ-৪৯ শ্লোকাংশ) অর্থাৎ দ্বাপরযুগের শেষে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল এইরূপ কিংবদন্তী দ্বারা অনেক লোকই মোহিত। বঙ্কিমবাবুও এই কিংবদন্তী শুনিয়া তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।" সুতরাং প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের কহ্লণ এবং অনধিক পূর্ব্বে বঙ্গের বঙ্কিম এই কিংবদন্তী স্বীকার করায় ইহা যে দীর্ঘকাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্র চলিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৩। এই কিংবদন্তী এবং উক্ত মহাভারতের বচন অনুসারে এই পর্য্যন্ত জানা গেল যে, দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিসময়ে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখন কল্যব্দ কত, তাহা জানিতে পারিলেই সাধারণভাবে যুধিষ্ঠিরের সময় জানা যাইবে। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণিগ্রন্থে কাল-মানাধ্যায়ে কল্যব্দের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন—

"যাতাঃ ষণ্মনবো যুগানি ভমিতান্যন্যদ্‌যুগাঙ্ঘ্রিত্রয়ং
নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।"...†

দ্বিতীয় পাদের স্থূলার্থ—শকাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর অতীত হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী মকরন্দকারও বলিয়াছেন—

"শাকো নবাগেন্দুকৃশানুযুক্তঃ কলের্ভবত্যব্দগণো যুগস্ত॥" ‡

যখন কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর অতীত হইয়াছিল, তখন শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল।

এখন হিসাব করিয়া দেখা যাউক, বর্ত্তমান সময়ে কল্যব্দ কত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ১৮৫২ শকাব্দ (১৯৩০ খৃষ্টাব্দ) চলিতেছে। সুতরাং উক্ত কল্যব্দের ৩১৭৯ সংখ্যার সহিত, শকাব্দের ১৮৫২ যোগ করিলেই বর্ত্তমান কল্যব্দ পাওয়া যাইবে; ৩১৭৯ + ১৮৫২ = ৫০৩১। অতএব জানা

---

* রাজতরঙ্গিণী-প্রথম তরঙ্গ-৫২ শ্লোক—"লৌকিকেহব্দে চতুর্ব্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্। সপ্তত্যাভ্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরাঃ॥" রাজতরঙ্গিণী রচনা করিবার সময়ে কাশ্মীরাব্দ ২৪ এবং শকাব্দ ১০৭০ অতীত হইয়াছিল। শকাব্দের সহিত ৭৮ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ হয়। সুতরাং ১০৭০ + ৭৮ = ১১৪৮।

† শকনৃপস্য শকাব্দস্য, অন্তে আরম্ভাদৌ, নন্দাদ্রীন্দুগুণাঃ কলের্বৎসরাঃ, তথা যাতাঃ। নন্দাঃ ৯; অদ্রয়ঃ ৭, ইন্দুঃ ১, গুণাঃ ৩, অঙ্কস্য বামা গতিরিতি ৩১৭৯।

‡ যদা কলেযুগস্য নবাগেন্দুকৃশানুযুক্তঃ অব্দগণো ভবতি, তদা শাকঃ শকাব্দারম্ভঃ। নব ৯, অগাঃ পর্ব্বতাঃ ৭, ইন্দুঃ ১, কৃশানবঃ ৩, অঙ্কস্য বামা গতিরিতি ৩১৭৯।

গেল যে, আজ হইতে পাঁচ হাজার একত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০১ অব্দে) কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল; সুতরাং বর্ত্তমান কল্যব্দ ৫০৩১ *। এখন পূর্ব্বোক্ত মহাভারতের বচন ও কিংবদন্তী অনুসারে এইটুকু জানা গেল যে, উক্ত কল্যব্দ আরম্ভের অনধিক পূর্ব্বে বা সেই বৎসরে, কিংবা তাহার অনধিক পরে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল।

৪। এখন যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত সময় জানা অত্যন্ত সহজ হইয়া আসিয়াছে। কেন না, মহারাজ যশোধর্ম্মদেব-বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার † অন্যতম রত্ন জগদ্বিখ্যাত মহাকবি কালিদাস ৩০৬৮ কল্যব্দে ‡ (খৃষ্টজন্মের ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে) তাঁহার ¶"জ্যোতির্বিদাভরণ" গ্রন্থের দশমাধ্যায়ে লিখিয়া গিয়াছেন—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রম-শালিবাহনৌ নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেঽনু নাগার্জ্জুনমেদিনীবিভুর্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শককারকা নৃপাঃ ॥১১০॥"

যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং বলি এই ছয় জন রাজা ক্রমশঃ শকাব্দ-(লৌকিক গণনাব্দ) প্রবর্ত্তক।

তৎপরে লিখিয়াছেন—

"যুধিষ্ঠিরাব্দেদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ কলম্ববিশ্বেঽভ্র-খ-খাষ্টভূময়ঃ।
ততোঽযুতং লক্ষচতুষ্টয়ং ক্রমাদ্ধরা-দৃগষ্টাবিতি শাকবৎসরাঃ ॥১১১॥"

এই জ্যোতির্ব্বিদাভরণের "সুখবোধিকা" নাম্নী টীকা অনুসারে এইরূপ অর্থ জানা যায়—যুধিষ্ঠির হইতে ৩০৪৪ বৎসর, বিক্রমাদিত্য হইতে ১৩৫ বৎসর, শালিবাহন হইতে ১৮০০০, বিজয়াভিনন্দন হইতে ১০০০০ বৎসর, নাগার্জ্জুন হইতে ৪০০০০০ বৎসর এবং বলি হইতে ৮২১ বৎসর, এইভাবে গণনাব্দ চলিয়াছিল, চলিতেছে এবং চলিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যুধিষ্ঠিরাব্দের ৩০৪৪ বৎসর

* আধুনিক পঞ্জিকাসমূহে এই কল্যব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† "ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামর-সিংহ-শঙ্কু-বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥"
জ্যোতির্বিদাভরণ ২২ অধ্যায় ১০ শ্লোক।

‡ "বর্ষৈঃ সিন্ধুর-দর্শনাম্বর-গুণৈর্যাতে কলৌ সম্মিতে
মাসে মাধবসংজ্ঞিতে চ বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ।
নানাকালবিধানশাস্ত্রগদিতজ্ঞানং বিলোক্যাদরাৎ
ঊর্জ্জে গ্রন্থসমাপ্তিরত্র বিহিতা জ্যোতির্বিদাং প্রীতয়ে ॥"
জ্যোতির্বিদাভরণ ২২ অধ্যায় ২১ শ্লোক।

"সিন্ধুরঃ (পুং) হস্তী" শব্দকল্পদ্রুমঃ। সিন্ধুর ৮, দর্শন ৬, অম্বর ০, গুণ ৩, 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ" এই নিয়মে ৩০৬৮। কালিদাসের এই সময়সম্বন্ধে আমার টীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞানশকুন্তলপ্রভৃতিগ্রন্থের মুখবন্ধে বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে।

¶ "জ্যোতির্বিদাভরণকালবিধানশাস্ত্রং শ্রীকালিদাসকবিতো হি ততো বভূব।"···
জ্যোতির্বিদাভরণ ২২ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে বিক্রমাদিত্যসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে।

অতীত হইলে, বিক্রমাব্দ বা বিক্রমসংবৎ আরম্ভ হইয়াছে; তাহাতে এখন আর সর্ব্বত্র যুধিষ্ঠিরাব্দ চলে না; আবার এই বিক্রমাব্দের ১৩৫ বৎসর অতীত হইলে, শকাব্দ বা শালিবাহনাব্দ আরম্ভ হইবে, তখনও আর এ বিক্রমাব্দ সর্ব্বত্র চলিবে না ইত্যাদি। এখন যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের ঐ অব্দসংখ্যাগুলি যোগ করিলে কি হয় তাহা দেখা যাউক—

যুধিষ্ঠিরাব্দ	...	৩০৪৪
বিক্রমাব্দ	...	১৩৫
শকাব্দ বা শালিবাহনাব্দ (বর্ত্তমান)		১৮৫২
		৫০৩১

এখন দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে যে কল্যব্দ ৫০৩১ জানা গিয়াছে, যুধিষ্ঠিরাব্দও অবিকল তাহাই ৫০৩১।

সম্ভবতঃ এবিষয়ে জগতের সকল মনস্বীই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় 'নবরত্ন' বলিয়া বিখ্যাত যে নয় জন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা পণ্ডিতমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়ই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার কালিদাস কবিত্বে যেমন সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তেমন জ্যোতিষশাস্ত্রেও অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'জ্যোতির্বিদাভরণ' গ্রন্থ দেখিলে এবং কাব্যগ্রন্থগুলি পর্য্যালোচনা করিলে প্রমাণিত হইবে *। তা'র পর, জ্যোতির্বিদাভরণগ্রন্থ যে সেই নবরত্নসভায় আলোচিত, সম্মত ও আদৃত হইয়াছিল, তাহাতেও কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অতএব যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণসম্বন্ধে প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন যত রকম প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে এই জ্যোতির্বিদাভরণোক্ত প্রমাণের গুরুত্ব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সে সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। তবে, উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কালিদাস মহাকবি এবং অসাধারণ জ্যোতিষী ছিলেন বটে, কিন্তু বেদব্যাসপ্রভৃতির ন্যায় ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ছিলেন না, সুতরাং তিনি যুধিষ্ঠিরাব্দ বা বিক্রমসংবৎ চলিতেছিল বলিয়া তাহার কথা লিখিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সময়ে দূর ও সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত শকাব্দপ্রভৃতির কথা তিনি লিখিয়া গেলেন কি করিয়া? যদিও এবিষয় পর্য্যালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি আমরা সংক্ষেপে একথা বলিতে পারি যে, অসাধারণ জ্যোতির্বিৎ কালিদাস জ্যোতিষগণনার সাহায্যেই জ্যোতির্বিদাভরণে ঐ শকাব্দপ্রভৃতির কথা লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও জ্যোতিষিকদিগকে দূর ভবিষ্যৎ গণনা করিতে দেখা যায় এবং সে গণনাও ফলের সঙ্গে মিলিয়া থাকে।

৫। সে যাহা হউক, এখনও এই সন্দেহ রহিয়াছে যে, "যুধিষ্ঠিরাব্দেবদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ" এই জ্যোতির্বিদাভরণের লেখা দ্বারা যুধিষ্ঠির হইতে যে ৩০৪৪ বৎসর পাওয়া যাইতেছে, তাহা যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইতে, বা তাঁহার রাজ্যলাভ হইতে, অথবা তাঁহার স্বর্গারোহণ হইতে ধরা হইয়াছিল? এই সন্দেহ

---

* "...ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বেনারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ।" রঘুবংশ ১৪ সর্গ, ৪০ শ্লোক। এই বিষয়টা যুক্তি দ্বারাও নিরূপিত হইতে পারে।

"গ্রহৈস্ততঃ পঞ্চভিরুচ্চসংশ্রয়ৈরসূর্য্যগৈঃ সূচিতভাগ্যসম্পদম্।" রঘুবংশ ৩য় সর্গ, ১৩ শ্লোক।

"...অঙ্গারও রাসিং বিঅ অণুবক্কং পড়িগমণং ণ করেদি।" মালবিকাগ্নিমিত্র ৩য় অঙ্ক।

স্তম্ভনেরও পর্য্যাপ্ত প্রমাণই রহিয়াছে। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে * গুজরাটের চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলিকেশী রবিকীর্ত্তিনামক কোন কবিদ্বারা † রচনা করাইয়া কতকগুলি শ্লোক একখানি শিলাফলকে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; তাহার মধ্যে এই দুইটী শ্লোক দেখা যায়—

"...ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দ-শত-যুক্তেষু গতেম্বব্দেষু পঞ্চসু॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্‌সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্॥" ‡

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে ৩৭৩৫ বৎসর অতীত হইলে এবং শকাব্দের ৫৫৬ বৎসর অতীত হইলে, (এই শিলাফলক উৎকীর্ণ হইল।)

ইহাতে বুঝা গেল যে, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে যখন ৩৭৩৫ বৎসর, তখন শকাব্দের ৫৫৬ বৎসর ছিল। অতএব ৩৭৩৫ হইতে ৫৫৬ বাদ দিলে ৩১৭৯ থাকে; ঐ ৩১৭৯ যুধিষ্ঠিরাব্দেই শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি। সুতরাং এখন এই যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং শকাব্দ যোগ করিয়া দেখা যাউক কি হয়—

যুধিষ্ঠিরাব্দ	...	৩১৭৯
বর্ত্তমান শকাব্দ	...	১৮৫২
		৫০৩১

বর্ত্তমান ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কল্যব্দও ৫০৩১ ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। অতএব এই শিলালিপি অনুসারে নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে যে, কুরুপাণ্ডবেব যুদ্ধ শেষ হইবার পরদিন অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের দিন হইতেই যুধিষ্ঠিরাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ শেষ হইবার পরদিনই যে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার কারণ এই যে, "সপ্ত বিত্তাগমা ধর্ম্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ..." এই মনুবচন অনুসারে জয়কেও একটী স্বত্বের কারণ বলিয়া জানা যায়, অর্থাৎ জয় হইলেই বিজিত দ্রব্যে বিজেতার স্বত্ব জন্মে। সুতরাং যুদ্ধে জয় হওয়ার পরেই রাজ্যে যুধিষ্ঠিরের স্বত্ব জন্মিয়াছিল।

এই ক্ষণ মহাভারত হইতে উদ্ধৃত "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে" ইত্যাদি বচন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত উল্লিখিত চিরকিংবদন্তী, ভাস্করাচার্য্য ও মকরন্দকারের কল্যব্দনিরূপণ, কালিদাসের জ্যোতির্বিদাভরণ এবং গুর্জররাজ দ্বিতীয় পুলিকেশীর শিলালিপি, এই কয়টী বিষয়ের অভূতপূর্ব্ব সামঞ্জস্য

---

* ৫৫৬ শকাব্দে এই শিলালিপি খোদিত হইয়াছিল, ইহা এই শিলালিপি হইতেই জানা যাইতেছে এবং শকাব্দের সহিত ৭৮ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ হয় ইহাও দেখা গিয়াছে। অতএব ৫৫৬+৭৮ =৬৩৪ খৃষ্টাব্দ জানা গেল।

† রবিকীর্ত্তিনামক কোন কবি যে এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহা এই শিলালিপিতেই আছে।

‡ এই শ্লোক দুইটীর ব্যাখ্যা—'ভারতাৎ আহবাৎ কুরুপাণ্ডবীয়াদ্ যুদ্ধাৎ পরম্, ইতঃ পূর্ব্বঞ্চ ত্রিসহস্রেষু সপ্তাব্দশতযুক্তেষু ত্রিংশৎসু পঞ্চসু চ অব্দেষু গতেষু সৎসু; শকানাং ভূভুজামপি পঞ্চশতাসু পঞ্চাশৎসু ষট্‌সু চ সমাসু বৎসরেষু, সমতীতাসু সতীষু, কলৌ কালে ইদমুৎকীর্ণমিত্যর্থঃ।

দেখিয়া, যুধিষ্ঠিরের এই সময় নিরূপণসম্বন্ধে সন্দেহ না থাকায় বস্তুতই হৃদয় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছে এবং আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছে। সে যাহা হউক, এখন সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, আজ হইতে ৫০৩১ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই বৎসরেই যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং কল্যব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল।

তবে একমাসে বা একদিনে যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং কল্যব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল না। ইহার প্রমাণ, ভারতসাবিত্রীতে পাওয়া যায়। †

"হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্।
প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে॥

অমাবস্যান্তু মধ্যাহ্নে নিহতঃ শল্য এব চ।
অমাবস্যান্তু সন্ধ্যায়াং রাজা দুর্য্যোধনো হতঃ॥"

বেদে অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসকে হেমন্ত ঋতু বলা হইয়াছে, আর যমদৈবতনক্ষত্র ভরণী *। সুতরাং অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর দিন ভরণীনক্ষত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী অমাবস্যার দিন মধ্যাহ্নকালে শল্য রাজা এবং সন্ধ্যাকালে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। অতএব মুখ্যচান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যাতে যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল, তাহার পরদিনই পৌষমাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন এবং সেই দিন হইতেই যুধিষ্ঠিরাব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল; আর সেই পৌষমাসের শুক্লপ্রতিপদ হইতে দেড় মাস অর্থাৎ ৪৫ দিন পরে মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া সেই মাঘী পূর্ণিমা হইতেই কল্যব্দ গণনা চলিয়া আসিতেছে। মাঘী পূর্ণিমাতেই যে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ তিথিতত্ত্বধৃত বিষ্ণুপুরাণের বচন—

"বৈশাখমাসস্য তু যা তৃতীয়া, নবম্যসৌ কার্ত্তিকশুক্লপক্ষে।
নভস্যমাসস্য তমিস্রপক্ষে ত্রয়োদশী, পঞ্চদশী চ মাঘে॥
এতা যুগাদ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈরনন্তপুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ।"

অতএব একই বৎসরে পৌষী শুক্লপ্রতিপদে যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং তৎপরবর্ত্তী মাঘী পূর্ণিমাতে কল্যব্দ আরম্ভ হইয়াছিল।

সুতরাং যুধিষ্ঠির দ্বাপরযুগের শেষ দেড়মাস এবং কলিযুগের প্রথম অবস্থায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। অতএব আধুনিক পঞ্জিকাকারগণ যে, যুধিষ্ঠিরকে দ্বাপরের শেষ রাজা এবং কলিযুগের প্রথম রাজা বলিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহাও ইহা দ্বারা সমর্থিত হইল।

---

† ভারতসাবিত্রী যে কোন্ গ্রন্থের অন্তর্গত তাহা খুজিয়া পাওয়া গেল না। তবে, ইহা যে আর্ষ এবং প্রমাণিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, অনেক স্থানে শ্রাদ্ধে এই ভারতসাবিত্রী পঠিত হইয়া থাকে এবং ভীষ্মপর্ব্বের ১৭ অধ্যায়ের ২য় শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ ইহার অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

* "...সহাশ্চ সহস্যশ্চ হৈমন্তিকাবৃতূঃ..." তিথিতত্ত্বধৃত শ্রুতিঃ। "অশ্বি-যম-দহন-কমলজ-শশি-শূলভৃদদিতি-জীব-ফণি-পিতরঃ..." ইত্যাদি জ্যোতিষবচন অনুসারে ভরণী যমদৈবত নক্ষত্র।

পঞ্চ পাণ্ডব এবং দুর্য্যোধনের জন্ম ও মৃত্যুর সময়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক মনস্বী যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া আপন আপন মতানুসারে সুদীর্ঘ এক এক শতাব্দী বা তদন্তর্গত একটী মাত্র বৎসরই নিরূপণ করিয়া চরিতার্থ এবং সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু আমাদের সে শতাব্দী বা তাহার অন্তর্গত একটী বৎসরমাত্র নিরূপণ করিলে চলিবে না। কারণ, আমরা মহাভারতের যথাস্থানে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং দুর্য্যোধনের কোষ্ঠী সন্নিবেশিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি; তাহাতে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির জন্মসম্বন্ধীয় বৎসর, মাস, দিন, এমন কি দণ্ডপর্য্যন্ত আমাদের নিরূপণ করা আবশ্যক; তবে তাহা অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেন না, মহাভারত যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির ইতিহাস; সুতরাং তাহাতে উঁহাদের প্রায় সমস্ত বৃত্তান্তই পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠির যে বৎসর রাজা হইয়াছিলেন, সে বৎসরের কথা আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই বলিয়া আসিয়াছি; এখন সেই সময়ে তাঁহার ও ভীমপ্রভৃতির কত বৎসর করিয়া বয়স হইয়াছিল, ইহা জানিতে পারিলেই অনায়াসে তাঁহাদের জন্মবৎসর জানা যাইবে; তা'র পর, মহাভারতের আদিপর্ব্ব ১১৭ অধ্যায়ে উঁহাদের জন্ম-মাস-তিথি এবং লগ্নপ্রভৃতি কোষ্ঠী করিবার উপকরণ প্রায় সমস্তই সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং উঁহাদের কোষ্ঠী করা দুষ্কর হইবে বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক, যুধিষ্ঠির যখন রাজা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার ও ভীমপ্রভৃতির কত বৎসর করিয়া বয়স হইয়াছিল, ইহাই এখন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। মহাভারত-আদিপর্ব্ব ১২০ অধ্যায়ে (মুম্বয়ী নির্ণয়সাগর-যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকে আদিপর্ব্ব ১৩৪ অধ্যায়ে) এই কয়টী বচন দেখা যায়—

"পাণ্ডবানামিহায়ুষ্যং শৃণু কৌরবনন্দন!।
জগাম হাস্তিনপুরং ষোড়শাব্দো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১০॥
ভীমসেনঃ পঞ্চদশো বীভৎসুর্ব্বৈ চতুর্দ্দশঃ।
ত্রয়োদশাব্দৌ চ যমৌ জগ্মতুর্নাগসাহ্বয়ম্ ॥১১॥
তত্র ত্রয়োদশাব্দানি ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিতাঃ।
ষণ্মাসান্ জাতুষগৃহান্মুক্তা জাতো ঘটোৎকচঃ ॥১২॥
ষণ্মাসানেকচক্রায়াং বর্ষং পাঞ্চালকে গৃহে।
ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিত্বা পঞ্চ বর্ষাণি ভারত! ॥১৩॥
ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্তে ত্রীণি বর্ষাণি বিংশতিম্।
দ্বাদশাব্দানথৈকঞ্চ বভূবুর্দ্যূতনির্জ্জিতাঃ ॥১৪॥
ভুক্ত্বা ষট্ত্রিংশতং রাজন্! সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্।
মাসৈঃ ষড়্ভির্মহাত্মানঃ সর্ব্বে কৃষ্ণপরায়ণাঃ ॥১৫॥
রাজ্যে পরীক্ষিতং স্থাপ্য দিষ্টাং গতিমবাপ্নুবন্।
এবং যুধিষ্ঠিরস্যাসীদায়ুরষ্টোত্তরং শতম্ ॥১৬॥

এই বচনগুলির মর্ম্মার্থ—যুধিষ্ঠিরের ১৬ বৎসর, ভীমের ১৫ বৎসর, অর্জ্জুনের ১৪ বৎসর এবং নকুল ও সহদেবের ১৩ বৎসর বয়সের সময় তাঁহারা জন্মস্থান শতশৃঙ্গপর্ব্বত (হিমালয়ের অংশবিশেষ) হইতে হস্তিনারাজধানীতে গমন করেন। সেখানে তাঁহারা দুর্য্যোধনপ্রভৃতির সঙ্গে ১৩ বৎসর বাস

করেন, পরে জতুগৃহে যাইয়া ৬ মাস থাকিয়া তথা হইতে চলিয়া যান; পথে ঘটোৎকচের জন্ম হয়; তৎপরে তাঁহারা একচক্রাপুরীতে ৬ মাস থাকিয়া দ্রুপদ রাজার ভবনে ১ বৎসর থাকেন, তথা হইতে আসিয়া আবার হস্তিনায় দুর্য্যোধনপ্রভৃতির সঙ্গে ৫ বৎসর থাকিয়া, ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া ২৩ বৎসর অতিবাহিত করেন, তৎপরে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ১২ বৎসর বনবাস এবং ১ বৎসর অজ্ঞাত বাস করেন; (তাহার পর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যুধিষ্ঠির রাজা হন) তৎপরে তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনন্তর তাঁহারা পরীক্ষিৎকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির ৬ মাসে স্বর্গলোকে যাইয়া উপস্থিত হন। (আর, ভীমপ্রভৃতি সকলেই স্বর্গে যাইবার পথে পর্ব্বত হইতে পতিত হন) এই হিসাবে স্বর্গারোহণ করিবার সময়ে যুধিষ্ঠিরের ১০৮ বৎসর ৬ মাস বয়স হইয়াছিল।

হস্তিনায় উপস্থিত হইবার সময়ে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির যে উক্তরূপই বয়স হইয়াছিল, তাহা আদি-পর্ব্ব-প্রথম অধ্যায়ের ৭৭ শ্লোকটী পর্য্যালোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়। যথা—

"ঋষিভিশ্চ তদা নীতা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ প্রতি স্বয়ম্।
শিশবশ্চাভিরূপাশ্চ জটিলা ব্রহ্মচারিণঃ ॥৭৭॥"

মুনিরা নিজেরাই দুর্য্যোধনপ্রভৃতির নিকটে তখন ব্রহ্মচারী, জটাধারী ও সুন্দরাকৃতি সেই বালক কয়টীকে নিয়া গেলেন ॥৭৭॥

উপনয়ন না হইলে ব্রহ্মচারী হয় না; অথ চ ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন একাদশ বৎসরে বিহিত *। সুতরাং নকুল ও সহদেবের একাদশ বৎসরে উপনয়ন হইলে এবং তাহার পর এক বৎসরের কিছু অধিক কাল সেই পর্ব্বতে থাকিয়া পাণ্ডু পরলোক গমন করিলে, নকুল ও সহদেবের ১৩ বৎসর বয়স হয়; তাহাতে যুধিষ্ঠিরের ১৬, ভীমের ১৫ এবং অর্জ্জুনের ১৪ বৎসর বয়সই দাঁড়ায়।

সে যাহা হউক, উক্ত বচনগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাই বুঝা যায় যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠিরের ৭২, ভীমের ৭১, অর্জ্জুনের ৭০ এবং নকুল ও সহদেবের ৬৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল †। তাহার পর, জ্যোতিষপ্রভৃতি শাস্ত্রের নিয়ম আছে যে, বয়স হিসাবে যে বৎসর, মাস বা দিন লিখিত হয়, তাহা অতীতই ধরিতে হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির যথাক্রমে ৭২, ৭১, ৭০ও ৬৯ বৎসর এবং কয়েক মাস ও দিন অতীত হইয়াছিল। ওদিকে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, অগ্রহায়ণ মাসে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং পরবর্ত্তী মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগ ও কল্যব্দ আরম্ভ হইয়াছিল, আবার আদিপর্ব্বেরই ১১৭ অধ্যায়ের সুস্পষ্ট বচন ও যুক্তি অনুসারে জানা যায় যে, জ্যৈষ্ঠ-মাসের পূর্ণিমায় যুধিষ্ঠিরের, চৈত্রমাসের শুক্লত্রয়োদশীতে ভীম ও দুর্য্যোধনের এবং ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমায় অর্জ্জুনের জন্ম হইয়াছিল ‡। এখন ইহা জানা গেল যে, সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায়

---

* "গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্। রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথা কুলম্॥" যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

† এই আদিপর্ব্বের ১১৭ অধ্যায়ে নকুল ও সহদেবের জন্মমাসপ্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং উঁহাদের কোষ্ঠী দেওয়া যাইবে না।

‡ এই বয়সে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি বৃদ্ধ এবং অক্ষম হইবারই সম্ভাবনা; এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নহে। কারণ, উঁহাদেরই, পিতামহ ভীষ্ম এবং দ্রোণপ্রভৃতি যথানিয়মে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহা মহা-

যুধিষ্ঠিরের ৭২ বৎসর, চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে ভীমের ৭১ বৎসর, এবং ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমায় অর্জ্জুনের ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল; তখন তাঁহারা অজ্ঞাতবাস হইতে মুক্ত হইয়া দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির চেষ্টা করেন এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাকেন; তাহাতে আষাঢ়মাস হইতে অগ্রহায়ণমাসের শুক্লাদ্বাদশীপর্য্যন্ত সময় অতীত হয়। তাহার পর, অগ্রহায়ণমাসের শুক্লত্রয়োদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, আঠার দিনের দিন অমাবস্যাতে জয়লাভ করেন, তাহার পরদিন পৌষী শুক্লপ্রতিপদে যুধিষ্ঠির রাজা হন এবং তৎপরবর্ত্তী মাঘীপূর্ণিমাতে কলিযুগ ও কল্যব্দ আরম্ভ হয়। সুতরাং এই হিসাবে নিম্নে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির জন্ম ও মৃত্যুর সময় লিখিত হইল।

১। কল্যব্দ আরম্ভের ৭২ বৎসর, ৭ মাস, ২৯ দিন পূর্ব্বে, (৩১৭৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) জ্যৈষ্ঠমাসে, পূর্ণিমা তিথিতে, দিনের বেলা ১৬ দণ্ডসময়ে শতশৃঙ্গপর্ব্বতে যুধিষ্ঠিরের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) স্বর্গারোহণ হইয়াছিল।

২। কল্যব্দ আরম্ভের ৭১ বৎসর, ১০ মাস, ২ দিন পূর্ব্বে, (৩১৭৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) চৈত্রমাসে, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে, দিনের বেলা ১৬ দণ্ডসময়ে শতশৃঙ্গপর্ব্বতে ভীমসেনের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) মৃত্যু।

৩। কল্যব্দ আরম্ভের ৭১ বৎসর, ১০ মাস, ২ দিন পূর্ব্বে (৩১৭৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) চৈত্র মাসে, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে, রাত্রি ৬ দণ্ডসময়ে হস্তিনারাজধানীতে দুর্য্যোধনের জন্ম এবং কল্যব্দ আরম্ভের দেড় মাস পূর্ব্বে (৩০২৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) রণক্ষেত্রে মৃত্যু। *

৪। কল্যব্দ আরম্ভের ৭০ বৎসর, ১০ মাস, ২৯ দিন পূর্ব্বে (৩১৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) ফাল্গুনমাসে, পূর্ণিমা তিথিতে, দিনের বেলা ২১ দণ্ডসময়ে, শতশৃঙ্গপর্ব্বতে অর্জ্জুনের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) মৃত্যু।

৫। কল্যব্দ আরম্ভের ৬৯ বৎসর পূর্ব্বে (৩১৭১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) শতশৃঙ্গপর্ব্বতে নকুল ও সহদেবের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্দে (৩০৬৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) মৃত্যু। †

অদ্য ৫০৩১ কল্যব্দের, ১৮৫২ শকাব্দের এবং ১৩৩৭ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ (১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর। সুতরাং অদ্য হইতে ৫১০৩ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইয়াছিল। এই নিয়মে ভীমপ্রভৃতিরও গণনা করিতে হইবে।

ভারতেই দেখা যায়। তা'র পর, ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানসেনাপতি হিণ্ডেনবার্গেরও ৮২ বৎসর বয়স ছিল বলিয়া শুনা যায় এবং বর্ত্তমান সময়েও ঐরূপ বয়সের অনেক লোককেই সমস্তকার্য্যক্ষম দেখা যায়।

* "যস্মিন্নহনি ভীমস্তু জজ্ঞে ভরতসত্তম! দুর্য্যোধনোঽপি তত্রৈব প্রজজ্ঞে বসুধাধিপ!॥" আদিপর্ব্ব ১১৭ অধ্যায় ২১ শ্লোক। ইহাতে জানা যায়—ভীম ও দুর্য্যোধনের এক তারিখেই জন্ম; মধ্যাহ্নসময়ে ভীমের জন্ম সেখানে লিখিতই আছে, আর, যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, সেই রাত্রিতে তুলালগ্নে দুর্য্যোধনের জন্ম হইয়াছিল। তত্রত্য ভারতকৌমুদীটীকায় যুক্তি দ্রষ্টব্য।

† নকুল ও সহদেবের জন্মমাসপ্রভৃতি মূলে লিখিত নাই বলিয়া তাহা দেখা গেল না। সুতরাং ইঁহাদের কোষ্ঠীও দেওয়া যাইবে না।

বিরোধ সমাধান।

এই সন্দর্ভে জানা গেল যে, যুধিষ্ঠির যে দিন রাজা হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং তাহার দেড় মাস পর হইতে কল্যব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। ওদিকে কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ ও কল্কিপুরাণে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যে দিন মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন, সেই দিন কলি প্রবেশ করিয়াছিল। যথা—

"যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাঽহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবত ১২-২-৩৩ শ্লোক।
"যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাঽহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগং তস্য সংখ্যাং নিবোধ মে॥" বিষ্ণুপুরাণ ৪-২৪-৪০ শ্লোক।
"যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সন্ত্যজ্য মেদিনীম্।
তস্মিন্ দিনেঽবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ঃ কলিঃ কিল॥" ব্রহ্মপুরাণ ২১২-অ-৮৫ শ্লোক।
"গতে কৃষ্ণে স্বনিলয়ং প্রাদুর্ভূতো যথা কলিঃ।" কল্কিপুরাণ ১অ-১৩ শ্লোক।

এই বচনগুলি যুক্তিসঙ্গতও বটে। কেন না, সাক্ষাৎ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকিতে, পাপ-প্রবর্ত্তক কলি প্রবেশ করিতে সমর্থ ছিল না। এদিকে যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন এবং সেই ষট্‌ত্রিংশত্তম বৎসরেই শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রয়াণ করেন। যথা—

"ষট্‌ত্রিংশে ত্বথ সম্প্রাপ্তে বর্ষে কৌরবনন্দনঃ।
দদর্শ বিপরীতানি নিমিত্তানি যুধিষ্ঠিরঃ॥"
"ষট্‌ত্রিংশেঽথ ততো বর্ষে বৃষ্ণীনামনয়ো মহান্।
অন্যোন্যং মুসলৈস্তে তু নিজঘ্নুঃ কালচোদিতাঃ॥"
(মহাভারত, মৌসলপর্ব, প্রথম অধ্যায়, প্রথম ও ত্রয়োদশ শ্লোক)

অতএব যুধিষ্ঠিরাব্দের ৩৬ বৎসর পরে কল্যব্দের আরম্ভ ধরা উচিত ছিল। ইহার উত্তরে আমরা বলিব—যেমন সূর্য্যোদয়ের চারি দণ্ড পূর্ব্ব হইতেই শাস্ত্রে দিন বলিয়া ধরা হয় *, অথ চ সূর্য্যোদয় হয় তাহার পরে; তেমন এক্ষেত্রেও বিধাতার নিয়মানুসারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের দেড়মাস পর হইতেই কলির অধিকার হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া তৎকালে প্রবেশ করিতে না পারায় ৩৬ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ হইলেই কলি প্রবেশ করিয়াছিল বা নিজের প্রভাব ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং ভাস্করাচার্য্যপ্রভৃতি কলির অধিকার ধরিয়া কল্যব্দ গণনা আরম্ভ করিয়াছেন; আর শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভৃতি কলির প্রভাব ব্যক্ত করাকেই কলির প্রবেশ বলিয়াছেন। অতএব উভয় মতের কোন বিরোধ নাই।

২। বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎসংহিতার ১৩ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥
একৈকস্মিন্নৃক্ষে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাম্।..."

---

* "ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্ত চতুষ্টয়ম্। নাড়ীনাং তদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্ত সংজ্ঞিতে॥" তিথিতত্ত্বধৃত।

ইহার তাৎপর্য্য এই—যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ হইতে ২৫২৬ বৎসর গত হইলে শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান শকাব্দ ১৮৫২, তাহার সহিত ঐ ২৫২৬ যোগ করিলে ৪৩৭৮ হয়। এদিকে বর্ত্তমান কল্যব্দ ৫০৩১, তাহা হইতে ঐ ৪৩৭৮ বাদ দিলে ৬৫৩ থাকে। অতএব জানা যাইতেছে যে, বরাহমিহিরের মতে ৬৫৩ কল্যব্দে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন।

বরাহমিহিরের এই মত অনুসরণ করিয়াই কহ্লণমিশ্র ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজতরঙ্গিণীগ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে লিখিয়া গিয়াছেন—

"শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥৫১॥

(কুরুপাণ্ডবাস্তেষাং যুদ্ধানি) ৬৫৩ কল্যব্দে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই মতেও কল্যব্দ ঠিকই আছে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরাব্দ তাহা হইতে ৬৫৩ বৎসর পরবর্ত্তী হইতেছে ইহাই বিরোধ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় যে নয়জন পণ্ডিত "নবরত্ন" নামে বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের মতের গুরুত্ব অন্যান্য পণ্ডিতের মত অপেক্ষা অনেক অধিক। তা'র পর, এই বরাহমিহিরও সেই নবরত্নসভার বরাহমিহির নহেন। কেন না, আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, সেই নবরত্নসভা খৃষ্ট জন্মের ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, আর এই বরাহমিহির খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহার শেষ ভাগে তিরোভূত হন।* সুতরাং জ্যোতির্বিদাভরণকার কালিদাসের মত অপেক্ষা এই বরাহমিহিরের মত বিশেষ দুর্ব্বল। দ্বিতীয় কথা এই যে, কুরুপাণ্ডবের সমস্ত বৃত্তান্ত বলাই যে গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য, সেই মহাভারতের সুস্পষ্ট বচনের সঙ্গে যে মতের মিল হইবে, সেই মত গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। অতএব পূর্ব্বোক্ত "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে" ইত্যাদিমহাভারতবচনের সহিত কালিদাসের মত ও উক্ত শিলালিপিকারের মত মিলিত হয় বলিয়া তাহাই গ্রাহ্য।

ইহাতে বরাহমিহির ও কহ্লণমিশ্রের মত পরিত্যাগ করিতে বলা হইল না; কিন্তু পণ্ডিতসম্প্রদায়সিদ্ধ এই রীতির অনুসরণ করিতে বলা হইল যে, স্মৃতির মধ্যে মনুস্মৃতি প্রধান† সুতরাং তাহার সঙ্গে অন্য স্মৃতির বিরোধ হইলে, সেই মনুস্মৃতির—যথাশ্রুত অর্থ রাখিয়া, ‡ অন্য স্মৃতির বিভিন্নার্থ করিয়া, সেই অন্য স্মৃতিকে যেমন মনুস্মৃতির সহিত মিলিত করিবার রীতি আছে; এ ক্ষেত্রেও তেমন কালিদাস ও শিলালিপিকারের মতের সহিত বিরোধ হইয়াছে বলিয়া এই ভাবে বরাহমিহির ও কহ্লণমিশ্রের মতের মিল করিতে হইবে যে, কলি ও দ্বাপরের সুদীর্ঘ সন্ধিকালের মধ্যে দ্বাপরের অন্তঃপাতী শেষ ৬৫৩ বৎসর ধরিয়া বরাহমিহির ও কহ্লণমিশ্র ঐ কথাগুলি বলিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই বিরোধভঞ্জনের অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

* ব্রহ্মগুপ্তরচিত খণ্ডখাদ্যের টীকায় আমরাজ লিখিয়াছেন—"নবাধিকপঞ্চশতসংখ্য শাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ"।

† "মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে। বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্" ॥ বৃহস্পতিসংহিতা।

‡ "স্মৃত্যন্তরবিরোধে মনুস্মৃতিরেব গ্রাহ্যা"। শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার।

৩। তা'র পর, অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কতিপয় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের কয়েকটী বচন দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। সে বচন কয়টী এই—

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥২৬॥
সপ্তর্ষীণান্তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥২৭॥
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ ॥২৮॥
... ...
যদা দেবর্ষয় সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥৩১॥
যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥৩২॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়)

রাজা পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব বলিতেছেন—'আপনার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দের অভিষেকপর্য্যন্ত এক হাজার এক শত পঞ্চদশ বৎসর। নক্ষত্ররূপী সপ্তর্ষিগণের মধ্যে যে দুই জন ঋষিকে আকাশে প্রথম উদিত হইতে দেখা যায়, তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহাকে রাত্রিতে সমান দেখা যায়, সেই নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইয়া সপ্তর্ষিগণ মনুষ্যপরিমাণের এক শত বৎসর অবস্থান করেন। সেই সপ্তর্ষিগণ এখন আপনার সময়ে মঘানক্ষত্রে আছেন। সপ্তর্ষিগণ যখন (এখন) মঘা নক্ষত্রে বিচরণ করিতেছেন, তখন (এখন) কলি দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছে। যখন ঐ সপ্তর্ষিরা মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে যাইবেন, তখন নন্দ হইতেই এই কলি বৃদ্ধি পাইবে' (যথাশ্রুত অনুবাদ)।

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥৩২॥"
(বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, চতুর্বিংশ অধ্যায়)

এই অধ্যায়ে আরও কতিপয় বচন, উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের বচনগুলিরই প্রায় অনুরূপ দেখা যায়। আবার এই অধ্যায়ে আরও দেখা যায়—

"মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ...মহাপদ্মস্তৎসুতাশ্চৈকং বর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।"

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়েও প্রায় অবিকল এইরূপ বচন দেখা যায়—

"মহানন্দিসুতো রাজন্! শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী।
মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ ॥

তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ॥
নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নান্নুদ্ধরিষ্যতি।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ॥
স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতে।"

পুরাণের এই বচনগুলিতে চন্দ্রগুপ্তের কথা পর্য্যন্ত পাওয়া গেল। তাহার পর, ইতিহাসে দেখা যায় এই চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে * সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন; তাহার কয়েক বৎসর পরে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত জয় লাভ করেন এবং সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করেন।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কতিপয় মনস্বী লোক যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণে নানাবিধ মতের আবিষ্কার করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যকে অত্যন্ত সন্দেহসঙ্কুল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। রমেশচন্দ্র ১২৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্র ১৪৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে, প্রাট্ ১২০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে, বুকানন ১৩০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এবং উইলসন, কোলব্রুক ও এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ ১৪০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে, এতদ্ভিন্ন কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহারও বহুপরে † যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক মতের অনুকূল যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে হইলে, প্রবন্ধ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে; সুতরাং সে বিষয়ে বিরত থাকা গেল।

উক্ত মতগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া ইহা জানা যায় যে, পরীক্ষিতের জন্ম অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ হইতে নন্দের অভিষেককালের মধ্যে এইরূপ ব্যবধান হয়; রমেশচন্দ্রের মতে ৯২৩ বৎসর, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ১১০৩, প্রাটের মতে ৮৭৩, বুকাননের মতে ৯৭৩ এবং উইলসন-প্রভৃতির মতে ১০৭৩ বৎসর মাত্র।

ইহার প্রতিবাদে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, ইহারা যে মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই মহাভারতেরই দুইটী বচন পর্য্যালোচনা করিলে, নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরকে এত অর্ব্বাচীন করিতে পারিতেন না। সে বচন দুইটী এই—

"ততস্ত্বং পুরুষশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মেণ প্রতিপেদিবান্।
ইদং বর্ষসহস্রাণি সর্ব্বভূতানুপালকঃ॥১৮॥"
"পরিশ্রান্তো বয়স্থশ্চ ষষ্টিবর্ষো জরান্বিতঃ।
ক্ষুধিতঃ স মহারণ্যে দদর্শ মুনিসত্তমম্॥২৬॥"

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৪৪ অধ্যায়। পুস্তকবিশেষে আদিপর্ব্ব ৪৯ অধ্যায়।) প্রাচীন টীকায় প্রথম বচনটীর কোন অর্থ দেখা যায় না।

(জনমেজয়ের নিকট বৃদ্ধমন্ত্রিগণ বলিতেছেন)—"তৎপরে আপনি কুলক্রমাগত এই রাজ্যতন্ত্র ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন এবং অতিশৈশবাবস্থাতেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সহস্র বৎসর প্রজাবর্গ শাসন করিতেছেন॥১৮॥" ৺কালীপ্রসন্নসিংহকৃত অনুবাদ।

* এমনই আশ্চর্য্য যে, এই আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ নিয়াও তিনটী মতভেদ আছে। কেহ ৩২৪, কেহ ৩২৫ এবং কেহ ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ বলেন।

(জনমেজয়ের নিকট বৃদ্ধমন্ত্রিগণই বলিতেছেন)—"তৎকালে তিনি (পরীক্ষিৎ) ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক ও অতিজীর্ণকলেবর হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অতি অল্পকালের মধ্যে একান্ত ক্লান্ত ও ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত আক্রান্ত হইলেন। পরে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে অরণ্য-মধ্যে এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন ॥২৬॥ ৺কালীপ্রসন্নসিংহকৃত অনুবাদ।

মহাভারতের এই স্থান হইতে জানা যায় যে, ইহার পরে সেই মুনি পরীক্ষিতের কথার উত্তর না দেওয়ায় পরীক্ষিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া মুনির গলায় মড়া সাপ ঝুলাইয়া দেন, এই বৃত্তান্ত জানিয়া ঐ মুনির পুত্র পরীক্ষিৎকে অভিসম্পাত করেন, তাহাতেই সপ্তমদিনে তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়। তৎপরে জনমেজয় রাজা হন।

এখন মহাভারতেরই সুস্পষ্ট বচন অনুসারে জানা যাইতেছে যে, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে ৬০ বৎসর এবং তাঁহার পুত্র জনমেজয়ের রাজত্বকাল ১০০০ বৎসর এই ১০৬০ বৎসরের মধ্যে জনমেজয়ের রাজত্বকালেই রমেশচন্দ্র, প্রাট্ ও বুকাননের মতে নন্দের অভিষেক হইয়াছিল; আর, জনমেজয়ের পুত্র শতানীকের রাজত্বকালেই বঙ্কিমচন্দ্র ও উইলসন প্রভৃতির মতে নন্দের অভিষেক হইয়াছিল, ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয়; অথচ ইঁহাদের রাজ্য-কাল হইতে অতিদূর ভবিষ্যতে নন্দের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। অতএব এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত কোন ঐতিহাসিকই স্বীকার করিতে পারেন না।

তবে, জনমেজয়ের এক হাজার বৎসর রাজত্ব করা অসম্ভব মনে করিয়া, উক্ত বচন দুইটীকে প্রক্ষিপ্ত বা অতিরঞ্জক বলিয়া, বা পাঠান্তর কল্পনা করিয়া, কিংবা ব্যাখ্যান্তর ঘটাইয়া, উঁহারা আপন আপন মত রাখিবার চেষ্টা করিতে পারেন। তাহা হইলেও আমরা বলিব যে, উঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপন সিদ্ধান্তের অনুকূলে শ্রীমদ্ভাগবতের যে বচনটীকে প্রধান অবলম্বন বলিয়া ধরিয়াছেন, সে বচনটীর শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা দেখিলে, তাঁহারা সম্ভবতঃ উক্ত-রূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না। সে বচনটী ও তাহার শ্রীধরস্বামিকৃত ব্যাখ্যা এই—

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥" শ্রীমদ্ভাগবত ১২-২-২৬।

"কলিযুগাবান্তরবিশেষং বক্তুমাহ আরভ্যেত্যাদিনা। বর্ষসহস্রং পঞ্চদশোত্তরং শতঞ্চেতি কয়াপি বিবক্ষয়া অবান্তরসংখ্যেয়ম্"। শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা।

ইহার তাৎপর্য্য এই—'এই যে এক হাজার এক শত পনর সংখ্যা বলিয়াছেন, ইহা শুকদেব কোন উদ্দেশ্যবশতঃ কোন বৃহত্তর সংখ্যার অন্তর্গত সংখ্যাই বলিয়াছেন।"

ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে, ঋষিকল্প শ্রীধরস্বামীর মতেও পরীক্ষিতের জন্মকাল হইতে নন্দের অভিষেককালের মধ্যে এক হাজার এক শত পনর বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক বৎসর গিয়াছিল।

এখন যদি অপর পক্ষ শ্রীধরস্বামীর এই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাটীকেও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অগ্রাহ্য করেন, তবে আমাদের বাধ্য হইয়াই সেই দায়ভাগলিখিত জীমূতবাহনের উপহাসোক্তিটীর উল্লেখ করিতে হইবে যে, "পরমপ্রেক্ষাবন্মনুগৌতম-দক্ষাদিপ্রযুক্তপদানাং প্রতিক্ষণমবিবক্ষামাচক্ষাণঃ স্বস্যৈব সাক্ষাদবিবক্ষিতত্বং খ্যাপয়তি।"

তার' পর, বঙ্কিমবাবু, হিন্দুসভ্যতার অর্ব্বাচীনতাবাদী যে সাহেবদের উপর নানাবিধ ব্যঙ্গোক্তি করিতে ছাড়েন নাই, সেই সাহেবদের মধ্যেই হিপার্কস্ ও মাস্কোলাইনের দেখার উপর নির্ভর করিয়া, জ্যোতিষগণনা দেখাইয়া তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে এক প্রৌঢ়িবাদ বলিয়াছেন যে, "ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।" আমরা কিন্তু ঐ সাহেব দুইটীর দেখাকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করি না; সুতরাং বঙ্কিমবাবুর এই সিদ্ধান্তকেও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করি না।

এখন দেখা যাউক, প্রকৃত সিদ্ধান্ত ঠিক রাখিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের ঐ বচনগুলির সামঞ্জস্য করা যায় কি না। আমরা পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া আসিয়াছি যে, আজ (১৯৩০ খৃষ্টাব্দ) হইতে ৫০৩১ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল; আর ইহাও যুক্তির সাহায্যে বলিয়াছি যে, কুরুপাণ্ডবসম্বন্ধে মহাভারতের প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং অন্যান্য প্রমাণ দুর্ব্বল; তৎপরে আবার দেখাইয়াছি যে, পরস্পর বিরোধস্থানে প্রবল প্রমাণের যথাশ্রুত অর্থ রাখিয়া দুর্ব্বল প্রমাণের অর্থান্তর করিতে হইবে। পাঠক মহোদয়গণ! এইগুলি মনে রাখিয়া পর্য্যালোচনা করিবেন।

"অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কুরুপাণ্ডবয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥"

এই মহাভারতোক্ত প্রবল প্রমাণের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণোক্ত

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥"

এই বচনের বিরোধ হয় বলিয়া, "পঞ্চদশোত্তরম্" এই পঞ্চদশ শব্দের অর্থ পঞ্চদশ শত। ইহাতে লক্ষণা হইল বটে, তবে তাহা অজহৎস্বার্থা বলিয়া তত দোষাবহ নহে; বিশেষতঃ ঋষিকল্প শ্রীধরস্বামীই এই লক্ষণা করিবার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। তাহা আমরা অনতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সুতরাং এই শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের বচনেই পাওয়া গেল ১০০০+১০৪ +১৫০০=২৬০০ বৎসর। তা'র পর,

"তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ॥"

এই শ্রীমদ্ভাগবতের বচন অনুসারে ইহা জানা যাইতেছে যে, মহাপদ্মনন্দের পুত্রেরাই একশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণোক্ত গদ্যেরও এইরূপই অর্থ করিতে হইবে। তাহাতে মহাপদ্মনন্দের নির্দ্দিষ্ট রাজত্বকাল পাওয়া না গেলেও বাধ্য হইয়াই বলিতে হইবে যে, মহাপদ্মনন্দ ৭৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছিলেন; * না হইলে, উক্ত

* মহাপদ্মনন্দের ১৭৪ বৎসর বয়স এবং তাঁহার পুত্রগণের ঐ হিসাবে যথাসম্ভব বয়স ছিল; এমন অবস্থায় চাণক্য তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করেন; ইহা স্বীকার করিলে, চাণক্যকর্ত্তৃক নয়জন নন্দের হত্যাও সম্ভবপর হয়। ঐরূপ দীর্ঘ জীবনলাভ অসম্ভব নহে। কেন না, মৃচ্ছকটিকে দেখা যায়—"লব্ধ্বা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ"; আমরাও ১২০ বৎসর এবং ১৩২ বৎসর বয়সের লোক দেখিয়াছি। তা'র পর, রাজতরঙ্গিণী প্রথম তরঙ্গ ৩০৯ শ্লোক (স বর্ষসপ্ততিং ভুক্ত্বা ভুবং ভূলোকভৈরবঃ।"...) ইহাতে জানা যায় কাশ্মীররাজ মিহিরকুল

মহাভারতবচনের সহিত সামঞ্জস্য হয় না। এক্ষণে খৃষ্টজন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই ৩২৭ বৎসর ধরিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা যে খৃষ্টজন্মের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইবে। যথা—

"আরভ্য ভবতো জন্ম"—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত—	২৬০০	বৎসর।
মহাপদ্মনন্দের রাজত্বকাল	৭৪	"
মহাপদ্মনন্দের পুত্রগণের রাজত্বকাল	১০০	"
খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব হইতে আলেকজাণ্ডারের ভারতাক্রমণকাল	৩২৭	"
	৩১০১	

এখন শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের অবশিষ্ট বচন কয়টীর সামঞ্জস্য দেখাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সে বচন কয়টী এই—

"সপ্তর্ষীণাস্তু যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥২৭॥
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ ॥২৮॥
যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥৩১॥
যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥৩২॥" *

ইহার শেষ বচনটীর "তদা নন্দাৎ" এইখানে নন্দশব্দ ধরিলে এবং তাহার অর্থ মহাপদ্মনন্দ করিলেই অত্যন্ত অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। সুতরাং পূর্ব্ব বচন দুইটীর অর্থ, সকলের মতেই সমান থাকিবে, পরের বচন দুইটীর অর্থ এইরূপ করিতে হইবে—যখন সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে আসিয়াছিলেন, তখন (যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে এবং পরীক্ষিতের শৈশব ও যৌবনকালে) কলি উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সেই সপ্তর্ষিরা মঘানক্ষত্র হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র ভোগ করিয়া যাইবেন, তখন হইতে, (কলির প্রবৃত্তি অবধি) বার শত বৎসর আরম্ভ হইবার উপক্রমে, এই কলি নিজের অনুকূল রাজা ও প্রজা লাভ করায় আনন্দে বৃদ্ধি লাভ করিবে।

সপ্তর্ষিরা এক একটী নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর অবস্থান করেন, মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া এগার নক্ষত্র; সুতরাং সপ্তর্ষিদের এগারটী নক্ষত্র ভোগ করিতে এগার শত বৎসর লাগে। অতএব এখন আর কোথাও কোন অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। সুতরাং এই প্রবন্ধটী সংস্কৃতভাষায় লিখিলে, অবশ্যই এখন লিখিতাম যে, "ইতি সর্ব্বমবদাতম্।"

---

৭০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়াও ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং নন্দের ৭৪ বৎসর রাজত্ব করা অসম্ভব বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে।

* ৩১-৩২ শ্লোকয়োরর্থঃ—যদা সপ্ত দেবর্ষয়ো মঘাসু বিচরন্তি, তদা যুধিষ্ঠিররাজত্বসময়ে পরীক্ষিতশ্চ শৈশবযৌবনসময়ে কলিঃ প্রবৃত্তঃ। তু কিন্তু যদা তে মহর্ষয়ো মঘাভ্যঃ পূর্ব্বাষাঢ়াং যাস্যন্তি, তদা প্রভৃতি দ্বাদশাব্দশতে দ্বাদশাব্দশতোপক্রমে আত্মা স্বরূপং যস্য স তাদৃশঃ, এষ কলিঃ, আনন্দাৎ সানুকূলরাজপ্রজালাভামোদাৎ বৃদ্ধিং গমিষ্যতি।

আদর্শের সন্ধানে (৩)

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-ই-ই,

[অধ্যাপক, ম্যাক্লাউয়েড্ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, লাহোর]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভিন্ন ভিন্ন মনীষীজীবনের ভিন্ন ভিন্ন দিকের উন্নতির কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, মর্ম্ম সকল কথারই এক, আর তাহা এই যে, ভারতীয় জীবন ভারতীয়েরই ছাঁচে ঢালিতে হইবে।

শিক্ষার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বাঙ্গলার গৌরব স্যার অশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন,—

" * * গত ষোল বৎসর কাল আমরা এই সিদ্ধান্তই অবিসংবাদিতরূপে গ্রাহ্য করিয়া আসিতেছি যে, উচ্চশিক্ষার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে পাশ্চাত্য বিদ্যায় যাহা কিছু ভাল এবং প্রাচ্যের যাহা কিছু অত্যুত্তম এই দুইয়ের সমবায় ঘটাইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতিগত আদর্শের উন্মেষপথে যাহা অবশ্য সাধ্য তাহাকেও উদ্‌বুদ্ধ করিতে হইবে।" (১)

এইবার দেখা যাক, ভারতীয় সভ্যতা বলিতে কি বুঝায়।—মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস, ভি, ভ্যাঙ্ক্যাটেশ্বের ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় এই ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল ;—

The hall-mark of Indian Culture according to the Professor, * is its comprehensiveness and inclusiveness thus providing not only for the differing needs of various social grades but also developing the various sides of life in every individual, and, whereas in China and Grecce the arts and even philosophy were independent of religion in India all cultural activities led to the one goal of religion.

অর্থাৎ—"ঐ অধ্যাপকের মতানুসারে বিশালতা ও ব্যপকতাই ভারতীয় সভ্যতার মানদণ্ড ; ইহাতে যে কেবলমাত্র সমাজের বিভিন্ন স্তরের পৃথক্ পৃথক্ অভাবেরই মোচন হয় তাহা নহে, অধিকন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের জীবনের বিভিন্ন অবস্থানের বিকাশ পাওয়ারও সম্ভব হয়। চীন ও গ্রীসদেশের শিল্প, এমন কি দর্শন শাস্ত্রেরও পর্য্যন্ত ধর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না, কিন্তু ভারতে সকলপ্রকার সংস্কৃতিগত কর্ম্মকুশলতাই সেই এক ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।"

---

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক অধিবেশনে ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ—বঙ্গবাণী, ২য় বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩০, ২৬৪ পৃষ্ঠা।

* Professor S. Y. Vankateswar ; University professor of Indian History, Mysore. Mod. Rev. May 1929. p. 595.

অতএব, ধর্ম্মভাবই ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র। এই ধর্ম্মভাবকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ বলেন,—"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণ এই যুগের ধর্ম্ম। কিন্তু এই একীকরণে পাশ্চাত্যকে প্রতিষ্ঠা বা মুখ্য অঙ্গ যদি করি, আমরা বিষম ভ্রমে পতিত হইব। প্রাচ্যই প্রতিষ্ঠা, প্রাচ্যই মুখ অঙ্গ। বহির্জ্জগৎ অন্তর্জ্জগতে প্রতিষ্ঠিত, অন্তর্জ্জগৎ বহির্জ্জগতে প্রতিষ্ঠিত নহে। ভাব ও শ্রদ্ধা শক্তি ও কর্ম্মের উৎস, ভাব ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু শক্তি প্রয়োগে ও কর্ম্মের বাহ্যিক আকারে ও উপকরণে আসক্ত হইতে নাই। * * *

"* * * * কয়েকদিন রাজসিক তেজে তেজস্বী হইয়া অসুর মহান, শ্রীসম্পন্ন, অজেয় হয় তাহার পরে অন্তর্নিহিত দোষ বাহির হয়, সব ভাঙ্গিয়া চূরমার হয়। ভাব ও শ্রদ্ধা, সজ্ঞান কর্ম্ম, অনাসক্ত কর্ম্ম যে দেশের শিক্ষার মূল মন্ত্র, সেই দেশেই অন্তর ও বাহির, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একী করণে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির সকল সমস্যার সন্তোষজনক মীমংসা কার্য্যতঃ হইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান ও শিক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সেই মীমাংসা করিতে পারিব না। প্রাচ্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পাশ্চাত্যকে আয়ত্ত করিতে হইবে। অন্তরে প্রতিষ্ঠা বাহিরে প্রকাশ। ভাবের পাশ্চাত্য উপকরণ অবলম্বন করিলে বিপদগ্রস্ত হইব, নিজ স্বভাব ও প্রাচ্য বুদ্ধির উপযুক্ত উপকরণ সৃজন করিতে হইবে।" (১)

হয়ত কেহ বলিবেন," সবই বুঝিলাম; কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে, এই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল জলোচ্ছ্বাসের দিনে, যখন সকল প্রাচ্যদেশই একে একে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিয়া তবে জাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছে, তখন ভারতের পক্ষে তাহার সুদূর অতীতকে বুকে জড়াইয়া থাকিবার যুক্তি কি বাতুলতার মত শুনায় না? যখন সকলেই সময়ের প্রবল স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া যাইতেছে, যে স্রোতোধারার গতিরোধ করিতে ঐরাবতও সক্ষম হয় নাই, ভারতের পক্ষে তাহা কি সম্ভবপর হইবে?"

এই সন্দেহের উত্তরে আত্মশক্তিতে অনন্যসাধারণ আস্থাবান্ আত্মনির্ভরতার জীবন্তমূর্ত্তি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলিতেছেন শুনুন! তিনি বলিতেছেন,

"আমি ক্ষীণ বুদ্ধির দ্বারা যতটুকু বুঝি, তাহাতে মনে হয়—* * কাহারও কাছে আত্মবিক্রয় করিবেন না। ভগবান যখন আপনাদের স্বতন্ত্র মানুষ গড়িয়াছেন, কাহারও লেজে বাঁধিয়া এসংসারে পাঠান নাই, তখন নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাসবান্ হউন।" (২)

এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা,—ব্যক্তিগত, সমাজগত ও ধর্ম্মগত বৈশিষ্ট্য রক্ষাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব, জাতির জাতীয়ত্ব। আমেরিকার নিগ্রোগণও মানুষ; তাহারা বেশভূষা, সমাজ, ভাষা ও ধর্ম্ম,—সর্ব্ববিধ বৈশিষ্ট্য হারা হুইয়া আজ যাহা হইয়াছে, তুরস্ক তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া, (বাঁচিয়া আছে বটে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছে বটে, এমন কি রাজনৈতিক হিসাবে উন্নত হইতেও পারিয়াছে বটে), আজ জাতি, হিসাবে যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ভারত যদি

---

(১) —ধর্ম্ম ও জাতীয়তা, ৯৪-১০০ পৃষ্ঠা।—

(২) যুব-সম্মিলনী অভিভাষণ প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬, ৩৭৩ পৃষ্ঠা।

তাহার বংশপরম্পরার্জ্জিত সভ্যতার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারে, তবে অদূর ভবিষ্যতে সেও কি তুরস্ক অথবা আমেরিকার নিগ্রোদেরই মত হইয়া যাইবে না? আমাদেরই পাশ্চাত্যমতিগতি সম্পন্ন শ্রেণী বিশেষের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতির দিকে দেখিলে ইহারই মধ্যে যে কেহ আমাদের উক্তির যথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

তর্ক উঠিতে পারে,—"কেন, জাপান?"

তাহার উত্তরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানী অধ্যাপক মিষ্টার আর কিমুরা কি বলেন শুনুন! "জাপানের সামাজিক প্রথা" প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"* * * প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল (১৯২৩ খৃঃ) পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের দেশে (জাপানে) দেখা দিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের আচার ব্যবহারগুলি—আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে একেবারে আহত না করিয়া—যতটুকু সম্ভব ততটুকু, আমারা ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতেছি।" (১)

পাশ্চাত্য মোহ-মদিরা জাপান অবিচারে গলাধঃকরণ করে নাই বলিয়াই যে আজও সে প্রাচ্য-গৌরব রবি হইয়া আছে, তাহা, তুরস্ক ও তাহার অবলম্বিত প্রণালীর তুলনা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

কেমন করিয়া যে জাতি উন্নত হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা ১৯২৯ সালের মার্চ্চ মাসের মডান রিভিউ পত্রিকাতে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

Many uncivilized peoples have been deliberately exterminated. Others though not deliberately exterminated, have greatly decreases in numbers or entirely disappeared from the face of the earth owing to contract with various baneful factors of civilized life, such as contagious diseases, alcoholism, etc. Some uncivilized peoples have become extinct or almost extinct, in the presence of more organised, numerous, civilized and resourceful peoples, they felt depressed, lost joy and zest in life and became despondent.

Want of hope can kill not only uncivilized peoples, but civilized peoples also. For all peoples such conditions of life are necessary as would allow them and encourage them to grow to their full stature, and thus keep the fire of hope ever burning in their hearts. * * * The genius of a race does not copy though it may imitate. It is fully able to discover new devices adapted to changing circumstances. (২)

(১) বঙ্গবাণী, ২য় বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০, ৪৩৩ পৃষ্ঠা।

(২) Mod Rev. March 1929. p. 390.

"বহু অসভ্যজাতিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ধ্বংস করা হইয়াছে। অন্যেরা ইচ্ছাকৃত ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত না হইলেও সংখ্যার বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে অথবা সংক্রামক ব্যাধি মদ্যপান প্রভৃতি সভ্যতার বহুবিধ সাংঘাতিক উপসর্গের সংস্রবে আসার ফলে ধরাবক্ষ হইতে এককালে লোপ পাইয়াছে। কতকগুলি অসভ্যজাতি শৃঙ্খলাসম্পন্ন সংখ্যা বহুল, অর্থশালী সভ্যজাতির সমক্ষে ভগ্নোদ্যম হইয়া জীবনের আনন্দ ও আগ্রহ ছাড়িয়া হতাশ হইয়া একেবার নির্ম্মূল বা অল্পবিস্তর নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

"আশা শূন্য হইলে কেবল যে অসভ্যজাতিই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, সভ্যজাতিও ধ্বংস পায়। সকল জাতিরই সজীবতার পক্ষে এমন কতকগুলি অবস্থার প্রয়োজন, যাহাতে তাহারা জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার উৎসাহ ও অবকাশ পায়, ও তাহাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে আশার শিখা চিরপ্রজ্জ্বলিত থাকে।

জাতির প্রতিভা অন্যের অনুকরণ করে না, অনুসরণ করিতে পারে। পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার পক্ষে উপযুক্ত নব নব পন্থা আবিষ্কার করিতে সে সম্পূর্ণ সমর্থ।"

এই "পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার" সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া আজ ভারত যাহা হইতে বসিয়াছে, তাহার প্রতিবিধান সময় থাকিতে আজও যদি সে না করে, তবে তাহার সমাজ ও ধর্ম্মগত বৈশিষ্ট্য লোপ যে অদূর ভবিষ্যতে অনিবার্য্য, তাহা যে কেহ অনুমান করিতে পারেন; আর সেই বৈশিষ্ট্যের পুন প্রতিষ্ঠার জন্যই আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির সার্ব্বজনীন পুনর্গ্রহণ অপরিহার্য্য।

অল্পসংখ্যক হইলেও এই কথাই আজ ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অন্তরে উদিত হইয়াছে। আর তাহার ফলও যে ফলিতে আরম্ভ না হইয়াছে, তাহা নহে। ভারত তাহার অনাদর—পরিত্যক্ত সভ্যতাকে যে পুনর্ব্বার মাথায় তুলিয়া লইবার জন্য নতজানু হইয়াছে, সে সমাচার প্রতীচ্যে পৌছিয়াছে।

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডশের 'দি হার্ট অফ আর্য্যাবর্ত্ত' নামক পুস্তকে আছে—

My own experience has led me to the conclusion that there are few among those who are styled compendiously the Hindu intelligentsia who are not imbued to a greater or less extent with the spirit which I have described above (manifestation of the prik of race) and who do not look back with feelings of something approaching repugnance to the time not long past, when their own class permitted itself to be dominated by the mental outlook and the mode of life of Europe. An observant Indian writer Mr. St. Nihal Singh, who after an absence of eleven years returned to India in 1921 and spent two years in travelling over the country has declared that what

struck him most was the revolution in the spiritual and intellectual outlook upon life of those with whom he came in contact. "The people in general" he asserts, are becoming more and more dissatisfied with being turned into mock Englishmen. An ever, deepening national impulse is compelling India to go back to the fount of her own traditions and her own culture, to insist upon developing along her own lines so that he may be able to contribute to the knowledge of the world instead of being merely a recipient of such knowledge as may be vouchsafed to her." (১)

ইহার ভাবার্থ এই যে,—

নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এ সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে যে, যাঁহাদিগকে হিন্দুসমাজের শিক্ষিতেরদল বলিয়া সংক্ষেপে আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাঁহাদিগের মধ্যে এমন অল্পই আছেন, যাঁহাদের মনে অল্পাধিক পরিমাণে উপরোক্ত মনোভাব (জাতীয় অভিমানের প্রকাশ্য বিদ্যমানতা) বর্ত্তমান নাই, এবং যাঁহারা অতীত যুগকে,—যে অদূর অতীতে তাঁহাদের নিজ, শ্রেণীর লোকেরাই আপনাদিগকে পাশ্চাত্য মনোবৃত্তি ও পাশ্চাত্য জীবন যাপন প্রণালীর দ্বারা অভিভূত হইতে দিতেন,—কতকটা বিরাগের চক্ষে না দেখেন, মিষ্টার সেণ্ট নিহাল সিং, এক পর্য্যবেক্ষণশীল ভারতীয় লেখক. এগার বৎসরের পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতে ফিরিয়া আসেন, ও দুই বৎসর যাবৎ দেশময় পরিভ্রমণ করেন, তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, যাঁহার যাঁহার সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন, তাঁহাদেরই আধ্যাত্মিক ও মানসিক বৃত্তির আমূল পরিবর্ত্তন দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি বলেন, সাধারণ লোকে নকল সাহেবীয়ানার প্রতি দিন দিন বীতরাগ হইতেছে। এবং দিন দিন গভীরতাপ্রাপ্ত জাতীয় প্রবর্ত্তনা ভারতকে তাহার নিজ সংস্কৃতি ও কিম্বদন্তীর উৎসের দিকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিতেছে, আপনার পদ্ধতি মত আপনার উন্নতি করিতে তাগিদ দিতেছে,—যাহাতে সে জগতের করুণার দ্বারে প্রার্থীর মত না দাঁড়াইয়া তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডার দান করিতে পারে।"

রোঁমা রোল্যাণ্ড বলিতেছেন,—

The intimate reapproachment that has been existing between Europe and India for one century and the influx of European thought into Indian Universities and its fascination for Indians have not resulted in making them renounce to the slightest degree their ancient and vast wisdom, but have only led :to the revival of their ardent intellectual curiosity and their genius for metaphysical conquest (মনোরাজ্যবিজয় ?) which enables them to

(১) The Heart of Aryavarta, page vi.

combine foreign ideas into new accords and organise them in their appropriate symphony. (১)

অর্থাৎ,—

"গত এক শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপ ও ভারতের গভীর পুনর্মিলন চলিতেছে, ইউরোপের চিন্তাধারা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতেছে; এবং উহার প্রতি ভারতবাসীদের আকর্ষণ সত্বেও, উহা কিন্তু তাহাদের পুরাতন গভীর প্রজ্ঞাকে অতি সামান্য পরিমাণেও বর্জ্জন করাইতে পারে নাই, এবং উহাতে তাহাদের অনন্ত জ্ঞান তৃষ্ণা ও মনোরাজ্য বিজয়ের স্বাভাবিকী বুদ্ধি পুনরুদ্দীপিত করিতে তাহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, ফলে তাহারা বিদেশীয় ভাব সমূহের নূতন সমন্বয় ও যথাযোগ্য একতা সাধন করিয়া তাহাদিগকে সুব্যবস্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছে।"

কেহ কেহ ইহাকে ভারতের পাশ্চাত্যবিদ্বেষ নামে অভিহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন? এমন কি লর্ড রোণ্যাণ্ডশেও বলিয়াছে,—

Peoples, like individuals have distinctive temperaments. The Briton is, by general consent phlegmatic. Whatever else the Indian may be he is not phlegmatic. In this respect he is the antithesis of the Englisman, he is emotional, mentally agile, sensitive to ideas rather than to the hard facts of expericnce, the exuberant product of a sun-soaked atmosphere as compared with the chilly climate of Northern Europe.

Working upon such a temperament the reaction against the West has acquired an unreasoning violence and the result has been to give many Indians an oxtravagant idea of their country's past and an irrational dislike of the xxxx civilisation, the culture, the thought, the mode of life, and above all, perhaps, the material prosperity of West. (i)

"ব্যক্তি বিশেষের মত জাতি বিশেষেরও বিশিষ্টতা জ্ঞাপক স্বভাব আছে। সর্ব্বসাধারণের মতে ব্রিটিশরা অলস স্বভাবাপন্ন। আর যাহাই হউক; ভারতীয়েরা অলস স্বভাব নহে। এ হিসাবে তাঁহারা ইংরাজের ঠিক বিপরীত। ভারতীয় লোকেরা আবেগপ্রবন, মানসিকতৎপরতা সম্পন্ন, অভিজ্ঞতার কঠোর সত্য অপেক্ষা ভাবে অধিকতর অভিভূতিশীল,—উত্তর ইউরোপের শৈত্য পূর্ণ জলবায়ুর তুলনায় সূর্য্যরশ্মি বহুল বায়ুমণ্ডলের উচ্ছ্বসিত ফল।

এমনই স্বভাবের উপর ক্রিয়ার ফলে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এক অলক্ষিত প্রবলতার আকার ধারণ করিয়াছে, এবং তাহার হইয়াছে এই যে, ইহার দ্বারা বহু ভারতীয়ের মনে তাহাদের দেশের অতীত সম্বন্ধে একটা অতিরিক্ত ধারণা আনিয়া দিয়াছে, এবং তাহারই সঙ্গে, পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, তাহার চিন্তাধারা, জীবনযাবন প্রণালী,—এবং

(১) M. Romain Rolland on Vivekananda—Mod Rev. Jan. 1929, p. 109.

(i) The Heart of Aryavarta, page. ix.

সর্ব্বোপরি পাশ্চাত্যের ঐহিক ঐশ্বর্য্যের উপর একটা বিবেক বুদ্ধি পরিশূণ্য বিরাগ আনিয়া দিয়াছেন।" কিন্তু যদি কোন ইংরাজ, বা যে কোন ইউরোপীয়, তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন,—Englishmen can scarcely view with anything but sympathy * such attempts of modern India as have neen described above, to strike root once more in her own intellectual soil. (i)

ইহার ভাবার্থ এই,—

"আপনার জ্ঞান ভূমিতে পুনর্ব্বার মূল প্রোথিত করার কথা যাহা উপরে বর্ণন করা হইয়াছে, বর্ত্তমান ভারতের তেমন চেষ্টাকে ইংরাজেরা সহানুভূতির চক্ষে ছাড়া অন্যকোন চক্ষে কখনও দেখিতে পারে না।"

এই প্রচেষ্টাকে পাশ্চাত্য বিদ্বেষ মনে করা মহাভ্রম। এ পরিবর্ত্তিত মনোভাবের দিনেও চিন্তাশীল কোন ব্যক্তিই বলিবেন না, তিনি প্রতীচিকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন; কিন্তু তাহা বলিয়া যদি কেহ একথা বিশ্বাস করেন, পাশ্চাত্যের যাহা কিছু তাহাই ভাল, তবে তিনি বিষম ভ্রান্ত। প্রতীচি যদি সমস্ত জগতের বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্বেও তাহার আপন পথে অগ্রসর হইতে পশ্চাৎপদ না হয়, তবে ভারত (এতদিন তাহার একনিষ্ঠ শিষ্যত্ব করিয়া) তাহার সে সদ্গুণের অনুসরণ কেন না করিবে? প্রতিদিন আমরা যাহা করিতেছিলাম, তাহা অন্ধ অনুকরণ, আজ আমাদের চক্ষু ফুটিয়াছে, এখন হইতে আমরা আমাদের অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে জীবনপাত করিব; কাহারও কোন কথায় ভুলিব না, আমরা ভারতীয় ভারতীয় সভ্যতাকেই সসম্ভ্রমে মাথায় তুলিয়া লইব; ইহাই আমাদের ভারতীয় জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য,—এবং আদর্শ বা উদ্দেশ্য।

(i) The Heart of Aryavart, p. 79.

দিগ্ দর্শন

অনন্তের কক্ষে

"শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের স্বাস্থ্য ও বল এ উভয়ই সঙ্গ-সাপেক্ষ। সর্ব্বজীবনের আধার অনন্ত জীবনচৈতন্যরূপী ভগবদ্‌সত্বায় কোনও রোগ—কোনও দুর্ব্বলতা নাই। তাঁহার সহিত অভিন্ন সম্বন্ধ রাখিয়া চলিলে—তাহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমপর্ণ করিয়া সে সম্বন্ধ সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করিয়া জাগরূক রাখিলে ও জীবনে তাহা উপলব্ধি করিয়া চলিলে—এক কথায় সেই অনন্ত মঙ্গলময়ের রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে, দেহের রোগ আসিবার অবসর কোথায়? সে অনন্তের কক্ষে বিচরণ করিতে পারিলে সম্পূর্ণ নিত্য নূতন দেহের স্বাস্থ্য ও বল আপনিই আইসে।"—আর ট্রাইন্।

চিকিৎসা-ব্যাধি

আজ আমরা এক অতিমাত্র ব্যস্ততা ও অস্থিরতার যুগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। চতুর্দ্দিকে প্রত্যেক বিষয় অতি তীব্রবেগে চলিতেছে, ইহার সহিত তাল সামলাইয়া চলা কঠিন। যে সকল ঘটনা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অতি আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হইত, আজ তাহা অতি সাধারণ ও নিত্যকার বিষয়...... নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনায় স্নায়ুর উপর অত্যধিক ও অস্বাভাবিক চাপের দরুণ শরীরের স্নায়বিক শক্তির প্রকৃতিদত্ত বলের ক্ষমতায় আর শরীররক্ষা হইয়া উঠিতেছে না! বর্ত্তমান কালের এই ভীষণ শরীরবিধ্বংসী জীবন-পদ্ধতিতেই আজ লোকের নানাবিধ উত্তেজক ও মাদক দ্রব্যের আবশ্যক হইতেছে—উত্তেজনাবর্দ্ধক ঔষধের দ্বারা যেন লোকে ক্ষয়িত শক্তিকে চাবুক মারিয়া চালাইতে চাহে, আর (চুরুট মদিরা প্রভৃতি) মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা ও আবশ্যকতাকে অচেতন ও মৃত করিয়া চাপিয়া রাখিয়া বিস্মৃতির সুখাস্বাদন করে। আজ ইহাদের চাহিদা এতই অধিক ও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলন এমন যে প্রত্যেক সুপরিচালিত গৃহস্থের বাটিতেই কোনও না কোনও ঔষধের বাক্স বা আলমারী না থাকিলে চলে না। পেটের পীড়া, মাথা বেদনা বা হৃদ-রোগ—এ সকল ব্যারামের জন্য স্নায়ুর জোরদার, মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকারক বা নিদ্রার উৎপাদক নিত্য ঔষধ চাই। চাক্ষুষ ফল ইহাদের দেখা যায় বটে,—স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ক্লান্তিবোধ, অনিদ্রা ও বেদনার উপস্থিত উপশম দেখা যায় এবং অবসন্ন দেহ উঠিয়াও দাঁড়ায়। কিন্তু ইহাতে এসকল রোগের লক্ষণ শীঘ্রই আরও গুরুতর আকারে দেখা দেয়; এবং রোগীর জন্য পুন মাদক ঔষধের আবশ্যক নয়। এইরূপ ঔষধ ব্যবহারের অভ্যাস যত হইতে থাকে ঔষধের পরিমাণও তত বাড়িতে থাকে, এবং অবশেষে এই ঔষধের বেড়ি ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ করিয়া ফেলে—এক শ্রেণীর ঔষধ-সেবী পিশাচের (drug fiend) সৃষ্টি হয়। সকল দেশেই ইহাদের সংখ্যা এক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে—আর সকল দেশ অপেক্ষা আমেরিকাতে অধিক। বারবনিতার দল ছাড়া এই ঔষধাসক্ত লোকের সংখ্যা চিকিৎসক প্রভৃতি ব্যাবসায়ী দিগের মধ্যেই অধিক, আর বেশী যে সকল স্ত্রীলোক সমাজে অধিক মেশামেশা করে (society women) তাহাদের মধ্যে"—ডাঃ ক্রেশ (আমেরিকা)।

প্রতিবেশী

নীরসতাই নিষ্ঠুরতার জন্মভূমি; আর আমাদের জীবনে যে নিষ্ঠুরতার লীলা চল্‌ছে নীরসতাই যে তার মূলে রস জুগিয়ে আসছে সে কথা বলা বাহুল্য।...আমাদের জীবনে শিক্ষার বীজ কোনোও ভাল ফল ফলাতে পারছে না। একটু চিন্তা করিলেই বুঝতে পারা যাবে, চিত্ত ভূমির রসহীনতাই তার প্রধান কারণ। ...আমাদের উৎসবগুলি আনন্দহীন। বৎসরে দু বার ঈদ আমাদের দুয়ারে এসে হাজির হয়। কিন্তু এক জিহ্বার রস ছাড়া আর কোনও রসই তারা ক্ষরণ করতে পারে না। আর করবেই বা কি করে? সমাজের যাঁরা শীর্ষ স্থানীয় সেই আলেম সম্প্রদায়ই যে অতিরিক্ত Puritanism এর চর্চ্চায় রসহীন শুষ্ক, প্রসন্নতার প্রীতির ছাপ তাদের চেহারায় নেই—সেখানে সাধারণত পরিলক্ষিত হয় একটা রুক্ষতা আর অপ্রসন্নতার ভাব। তরুণদের প্রতি এদের একটুও মমত্ববোধ থাকলে হয়ত এই উৎসব গুলি সঙ্গীত শোভায় সত্যিকার উৎসবে পরিণত হত। কিন্তু সে আশা করা অনেকটা আগ্নেয় গিরির নিকট জল ভিক্ষার মতই নিষ্ফল। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের পানে চাহিলে আজ স্বতই মনে হয় তাদের উৎসব গুলি কত সজীব, কত আনন্দময়। হিন্দুরা বিশ্ব-প্রবিষ্ট সগুণ ব্রহ্মারও পূজা করে থাকে। Transcendant যিনি তিনি Immanent ও, সসীম অসীমেরই একটা খণ্ডপ্রকাশ, এই ধারণা তাদের আছে। সুতরাং প্রকৃতির স্পর্শের মধ্য দিয়া ভগবানের স্পর্শলাভ করা হিন্দুদের নিকট একটা ধর্ম্ম ব্যাপার বলেই বিবেচিত হয়। প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গ ছড়িয়ে আছে যে রসধারা তাতে অবগাহন ক'রে চিত্তকে সরস করে তোলার আর্ট তারা জানে।—মোতাহের হোসেন, বি এ।

(প্রবাসী মাঘ ১৩৩৭)

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ ও আলোচনা সাপেক্ষ, 'ভারতের সাধনা'র ইহা এক বিশেষ লক্ষ্য।]

বাস্তবের শিক্ষা

পৌষ সংখ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার "সমাজের বাস্তব চিত্র এবং তাহা হইতে শিক্ষা" শীর্ষক একটী আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। সরসী বাবু আমায় চিনেন ও আমিও তাঁহাকে চিনি এই ভরসায় তাঁহার আলোচনার আলোচনা করিতে দুঃসাহসী হইয়াছি। ঐ ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা দ্বারা মতামত পরিবর্ত্তন হইতে পারে এমন বিশ্বাস আমার নাই কাজেই তাহা লইয়া কালি কলম খরচ করিতে প্রয়াসী হওয়াও ব্যর্থ।

বিষয়টী এই। ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে বিধবা। তাহার উপর সুন্দরী কন্যা অকালে বাল-বিধবা হইল। তাহার পর ষড়যন্ত্র-বশে ঐ সুন্দরী বাল-বিধবাকে মুসলমানের ঘরণী হইতে হইয়াছিল। সরসী বাবুর আলোচনার শেষ বক্তব্য এই যে "হয়ত এই বাল-বিধবাটী চিরজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকিত।"

ব্রহ্মচারিণী থাকাই যদি শ্রেয়ঃ হয় তবে সরসী বাবু সমাজের কোন বাস্তব চিত্র হইতে কোন শিক্ষা প্রচারের জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন তাহা ব্যক্ত করেন নাই। অর্থাৎ প্রবন্ধের শেষ বক্তব্যের সহিত প্রসঙ্গোক্ত আলোচনার পূর্ব্বাপর কার্য্যকারণ সম্পর্ক নাই। সমস্ত লেখাটীর ভিতর দিয়া একটা একমুখী চিন্তার ধারা স্বচ্ছন্দ গতিতে বহিয়া বহিয়া শেষোক্ত উক্তিতে পৌঁছায় নাই। এই গেল অভাবাত্মক শিক্ষা।

অথচ তিনি ছয় দফা ভাবিবার কথার প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। ছয়টী দফা এই :—

১। বাঙ্গালীকে সমবেত ভাবে ম্যালেরিয়া দূরীকরণের চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা এমন অনেক করুণ ঘটনা অবশ্যম্ভাবী।

২। গৌরীদান প্রথা লোকাচার বা দেশাচারের কুপ্রথা।

৩। চাকুরীর সংস্পর্শে চরিত্র দোষে জামাতার যক্ষ্মা ও অকাল মৃত্যু। চাষ আবাদে এই প্রকার চরিত্র দোষ অনেক পরিমাণে কম হয়।

৪। যক্ষ্মা রোগের জন্য সাধারণের সাহায্য আবশ্যক।

৫। বিধবার জমিদার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

৬। বাল-বিধবার বিবাহ প্রচলন পক্ষে লোকমত বাঞ্ছনীয় কি না?

প্রসঙ্গের চিন্তার ধারা একমুখী না হওয়ার আরও দুই একটা অবান্তর কথা উঠিয়াছে।

একটা কথা বলা হইয়াছে যে বিধবা বিবাহের শত্রুপক্ষীয়েরা বিবাহাভাবে কুলত্যাগের বাস্তবতা নাকি মানিয়া লয়। সরসীবাবু নিজে একথা না বলিয়া অপর একজন অবলাবান্ধব লেখকের উক্তি দ্বারা এই কথা ধরিয়া লইয়াছেন। কথাটা অপ্রিয় হইলেও বলিতে হয় যে গত একশত বৎসরের সমাজসংস্কারের ইতিহাসে বারম্বার এ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে সমাজ-সংস্কারকরা বিপক্ষের মুখে অনেক অসত্য ও অদ্ভুত বা অসঙ্গত মত ব্যক্ত করেন।

আর একটী কথা বলা হইয়াছে যে বাঙ্গালীজাতির বাস্তবের দিকে দৃষ্টি বড় কম। প্রসঙ্গতঃ বলা হইয়াছে যে হিন্দু আমলের ইতিহাস পাওয়া যায় না, আর হিন্দুদের সামাজিক আচার ব্যবহার, জাতিভেদ, বিবাহ বন্ধন প্রভৃতি প্রথায় জটিলতা আছে। অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই সমস্ত কাল্পনিক বর্ণনার প্রতিবাদ করিতে হয়। বাঙ্গালী জাতির বাস্তবের দৃষ্টি কম স্বীকার করিতে হইলে দেখিতে হয়—এই বাঙ্গলা কি অবাস্তব লইয়া এত দেশ বিদেশের ধনরত্ন-লোলুপ বণিকদিগের লোভের দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল? বৈদেশিক পর্য্যটকরা কি দেখিয়া বাঙ্গলার সমৃদ্ধির কথা লিখিয়াছিল? আজ কয়দিন কি কারণে বাঙ্গলার দারিদ্র্য এতটা বাস্তব জ্ঞানের অভাব সূচিত করিল? তাহার পর ইতিহাস পাওয়া যায় না শুনিলেই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, জাতির চরিত্র কি আকাশ হইতে বৃষ্টির ধারার মতন পড়ে না মাটিতে চারার মতন তিল তিল করিয়া পরিবর্দ্ধমান হয়? ইতিহাস কি কেবল রাজারাজড়ার আড়ম্বরের কথানুক্রমিক বর্ণনা না জাতির পরম্পরাগত জীবন যাত্রার সজীবতা ও সাফল্য ও জীবনযাত্রার সরল স্বচ্ছন্দ গতিতে তাহা পরিস্ফুট? আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহার যদি আজ জটিল ঠেকিয়া থাকে তাহা আমাদের আচার ব্যবহারের অন্তর্নিহিত অবস্থায় ঠেকিতেছে না ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার অছিলায় আচার ব্যবহারকে বর্জ্জন করিবার কষ্টসাধ্যতায় ঠেকিতেছে? ইতিহাস থাকুক আর নাই থাকুক, সামান্য একটু চেষ্টা করিলেই দেখা যায় যে কৌটিল্য বাৎস্যায়নের আমল (কিঞ্চিদধিক ২০০০ বৎসর) হইতে আজও যে সকল আচার ব্যবহারে হিন্দুত্বের পরিচয় তাহা একইভাবে এই হিন্দুজাতির সুখ, স্বাস্থ্য, সম্পদ, ও জাতি গৌরব পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। কেবল তাহাদেরই নিকট ইহা জটিল বোধ হইতেছে, যাহারা অন্যান্য সভ্য দেশের আচার ব্যবহারের জটিলতা কল্পনায় আনিতে পারিতেছে না। "সদ্য বিধবাকে" "নাক চুল কাটিয়া বিক্রি করা" ও "অস্থি চর্ম্ম পিসিয়া ফেলা" নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে গ্রন্থকারের হৃদয়-ফিরির বিজ্ঞাপন হইতে পারে, কিন্তু কোনও জটিল বাস্তবের চিত্র নহে।

সুতরাং এই প্রকার অপসিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করিতে যাইয়া সরসীবাবু বিধবা বিবাহের ওকালতি করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু কয়েকটী কথা তাহাকে স্মরণ রাখিতে বলি।

প্রথম, ম্যালেরিয়া, চাকুরীর মোহে চরিত্র দোষ, যক্ষার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি, জমিদারের স্বার্থে বড়যন্ত্র করা এই সকল কারণ বর্ত্তমান থাকিতে দেশে অকাল মৃত্যু নিবারণ আকাশের চাঁদ ধরার প্রয়াস।

দ্বিতীয়, গৌরীদান প্রথা নহে। কন্যার বিবাহকে যদি পুত্রের উপনয়নের সমস্থানীয় বলিয়া ধরিতে হয় (যাহা বেদের অনুজ্ঞা) তাহা হইলে গৌরীদানই সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণের

একমাত্র শুদ্ধ বীজ। আজ আমরা সমাজকে অবহেলা করা ও পারিবারিক কল্যাণকে কুসংস্কার মনে করা বিদেশীর কাছে শিখিয়াছি বলিয়া গৌরীদানকে বিদ্রূপ করিতেছি। অল্পবয়স্কার স্বামী হয় বলিয়া বিবাহই কি স্বামীর অকাল মৃত্যুর কারণ?

তৃতীয়, বালবিধবার বিবাহের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছিল। তাঁহার সমস্ত আন্দোলন আলোচনা যুক্তিতর্ক বালবিধবার পুনঃ সংস্কারের প্রচলন চেষ্টায়। তিনি কতটা সফল হইয়াছিলেন তাহার ইতিহাস আমরা জানি। কিন্তু তাহার পর বিধবা বিবাহের ওজুহাতে কাহার বিবাহ কি ভাবে চলিতেছে ও তাহার ফল কি ফলিতেছে তাহার মর্ম্মন্তুদ বাস্তব হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায় তাহার পরিচয় আমরা দিতে অপারগ। জানি না বলিয়া অপারগ নহি, জানি বলিয়া তাহার পাঁজরভাঙ্গা কাহিনীর শতাংশের একাংশও যথাযথ চিত্রিত করিতে পারিব না বলিয়া অপারগ।

সরসীবাবু "শাস্ত্রীয় বিচার যুক্তি তর্কের মোহ" হইতে যতই দূরে থাকিতে চেষ্টা করুন, আমরা বিশ্বাস করি তিনি যে ঘটনার ঔপন্যাসিক ইন্দ্রজালকে বাস্তব মনে করিয়া শিক্ষনীয় সন্ধানে ব্যাপৃত, তাহা শাস্ত্র বিশ্বাস থাকিলে ঘটিত না, আর মোহত্যাগ রূপ স্বাধীনতামরীচিকায় যতই আমাদের শিক্ষিত সমাজ ছুটিবে, ততই ঐরূপ ঘটনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিবে।

বিধবা-বিবাহ আলোচনাকালে একটা কথা স্মৃতি পথে রাখা সকলেরই উচিত। ইংরাজী ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারি তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি বিভারলি সাহেব কলিকাতাতে একটী সামাজিক সভার অধিবেশনে বলেন যে হিন্দুর প্রত্যেক নারী যে বিবাহিতা হইবার অবসর পান এটা কম কথা নহে। আর ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে অনূঢ়ার সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে সমগ্র হিন্দুবিধবার সংখ্যা তাহার কাছেও পৌছায় কি না তাহা আমার সন্দেহ হয়। ইংরাজী ১৯২১ সালের আদম সুমারির কর্ত্তা মার্টেন সাহেবও সকল নারীর বিবাহাবসর স্বীকার করিয়াছেন। আর ভারতের হিন্দু বিধবার সংখ্যা লোক সংখ্যার অনুপাতে শতকরা ১·৬। ওদিকে গ্রেটব্রিটেনের অনূঢ়ার সংখ্যা লোক সংখ্যার অনুপাতে শতকরা ১৬—অর্থাৎ দশগুণ। ভারতের নরনারীর সংখ্যা হিসাবে একটী বিধবা-বিবাহ দিলে একটী কুমারীর বিবাহবঞ্চনা করিতে হয়। পৃথিবীর কোনও সমাজ আজও মরধামে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া মানব মানবীর দুঃখ ঘুচাইতে পারে নাই বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কাজেই হিন্দু সমাজও যদি না পারিয়া থাকে তাহাতে সামাজিক হিসাবে লজ্জার কথা কিছুই নাই।

তথাপি বলিব, বর্ত্তমান অপশিক্ষার কুফলে, পিতা মাতা ভ্রাতা শ্বশুর দেবরের স্বার্থপরতায়, কামায়ণ সাহিত্যের প্রচারে ও সর্ব্বোপরি অবলাবান্ধবদিগের প্রগতির অত্যাচারে কেবল বাল-বিধবার কেন অনেক রকম বিধবারই বিবাহ আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহা সমাজের রোগের চিকিৎসা; লজ্জার, ঘৃণার, কলঙ্কের ও আত্মবিস্মৃতির ব্যভিচার মাত্র। তাহা লইয়া ভাবা বা লেখা চলে না। শ্রীভগবানের নিকট নিবেদন করিয়া নিভৃতে বনে, মনে ও কোণে প্রার্থনা করিতে হয়—

নাশায় চাস্তুর ভগবন্ বৃত্তিং কয়োতু।

কল্পনা

সুশ্রুতের একটী শ্লোকের কোন পাঠ ঠিক এবং "পাঠভেদ মহা অমঙ্গলের হেতু" তাহাই দেখাইতে "শাস্ত্রপাঠে ভ্রমাশঙ্কা" শীর্ষক অলোচনা গত পৌষমাসে করিয়াছি। মাঘমাসে তাহার একটী প্রতিবাদ পড়িলাম। প্রতিবাদক বলিতেছেন "বঙ্গদেশের পাঠই যুক্তিতে টিকে"। বঙ্গদেশের পাঠ বলিয়া যদি কিছু থাকিত তবে একথা প্রাসঙ্গিক হইত। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ছাপা সুশ্রুতে একই পাঠ আছে, এবং তাহাই ভ্রমাত্মক বলিয়া আশঙ্কা করিয়া তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য কারণ সুশ্রুতের অন্যান্য স্থান ও অধ্যায় হইতে দেখাইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সুশ্রুত সকল কালের সকল দেশের মাপ কাঠির মাপে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। কাজেই তাহার বঙ্গদেশে এক পাঠ ও অন্যদেশে অন্যপাঠ কল্পনায়ও আনা চলে না। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সিদ্ধান্ত একেবারে সকলপ্রকার যুক্তি-সিদ্ধ অভ্রান্ত সত্য না মানিলে গ্রন্থকারকে বিজ্ঞানবিদ্ বলাই চলে না—এই সরল হেতুবাদে সুশ্রুতের কোন পাঠ সুশ্রুতের যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অনুকূল তাহাই দেখান আমার পূর্ব্ব আলোচনার বিষয় ছিল। সেই সকল যুক্তি ও সিদ্ধান্তের পারস্পরিক আপেক্ষিকতা একে একে সমস্ত ভ্রমপূর্ণ দেখাইয়া তবে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে 'উনষোড়শ বর্ষায়াম্' পাঠ ঠিক। নতুবা তাহা সুশ্রুতের সিদ্ধান্ত না হইয়া অন্য কাহারও মত হইয়া দাঁড়াইতে পারে। প্রতিবাদক মহাশয় সে পন্থা অবলম্বন করেন নাই।

প্রতিবাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"যদি গর্ভাধান দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ বা উনষোড়শ বর্ষের মধ্যে বিহিত হয় তাহা হইলে নারীকে শোণিত পুষ্টির জন্য বলিতে গেলে একটুও সময় দেওয়া হয় না। একের (পুরুষের) বেলা বাঁধাবাঁধি পুষ্টির জন্য অন্ততঃ ৮ বৎসর সময় দিব, অন্যের (নারীর) বেলা ফুল ফুটিতেই তার ফল চাহিব ইহা বিচার ও যুক্তিতে তিষ্টে না"। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় কেবলমাত্র সুশ্রুতের বিচার ও যুক্তি দেখান হইয়াছে, সাধারণ ভাবে "সময় দেওয়া হয়" কিনা বা "ফুল ফুটিতেই ফল" চাওয়ার যুক্তিযুক্ততা আছে কিনা তাহা দেখান হয় নাই। সুশ্রুতের বিচার প্রণালী মানিলে বলিতে হয় যে সুশ্রুত সময়ও দেন নাই এবং ফল চাওয়ার কোনও অযৌক্তিকতাও দেখান নাই। আর আধুনিকতম বিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপক ভাইসম্যান পুষ্টিকর কোষাণু যে প্রজনক কোষাণু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ঠিক সেই কথাটাই দেখাইয়াছেন।

তৃতীয় কথা এই বালা অর্থে সুশ্রুত কি বলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। অন্য গ্রন্থে "বালা"র অন্য অর্থ থাকা বিচিত্র নহে। সুশ্রুতের অর্থ ধরিয়াই বলিয়াছি "অত্যন্তবালা" অর্থে ১১।১২ বয়স্কা ছাড়া অন্য অর্থ সম্ভব হয় না। "বালা হইলেই যে দ্বাদশ বর্ষ হইবেই" একথা বলা হয় নাই।

চতুর্থ কথা এই যে উত্তরার দৃষ্টান্ত উত্তরার কৈশোরে গর্ভধারণক্ষমতারই পরিচয় দেয়। নতুবা অভিমন্যুর মতন বীরের অন্যায় সমরে শোচনীয় মৃত্যুরশোকে প্রিয়তমা উত্তরার গর্ভনাশ হয় নাই—এই সামান্য প্রমাণই সুশ্রুতের প্রকৃত মতেরই সমর্থক।

পঞ্চম কথা এই যে "বিবাহ কখন হওয়া উচিত সে বিচার খেয়ালে হয় না" বলিয়াই "দ্বাদশ বর্ষাৎ পত্নীমা বহেৎ", বিধানের যুক্তিতে "উনষোড়শ" পাঠ টিকে না তাহাই দেখাইয়াছি।

গৌতম গৃহ্যসূত্রের "প্রাগৃতো দানম্" "অপ্রযচ্ছন্ দোষী" হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত স্মৃতিকার কন্যার সম্প্রদানের উর্দ্ধকাল দ্বাদশবর্ষ ধরিয়াছেন। মহাভারত ত্রিশের সহিত দশবর্ষার বিবাহ ব্যবস্থা দিয়াছেন, মনু দ্বাদশ বর্ষার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাই শ্রেষ্ঠকল্প ব্যবস্থা। সুশ্রুত সেই মতের পোষকতা পূর্ব্বাপর করিয়াছেন তাহাই দেখাইয়াছি।

"আর্য্যের বিবাহ তত্ত্ব বুঝিতে হইলে" "ব্রহ্মচর্য্য বুঝা চাই" এ কথার কোনও সংশয় ভ্রমাত্মক সুশ্রুতপাঠের আলোচনায় উঠিবার অবসর নাই। এখনও বাঙ্গলাদেশে শত শত গ্রামেও তেলেগু তামিল দেশে প্রায় সর্ব্বত্র দ্বাদশবর্ষা কন্যার সম্প্রদানের পর একবৎসর পিতৃগৃহে বাসের ব্যবস্থায় "ত্রিরাত্রং দ্বাদশরাত্রং সম্বৎসরম্বা" এই আশ্বলায়ন বিধানকে কার্য্যতঃ মানা হয়। তাহার পর স্বামীর উপর বাৎস্যায়নের সাবধান বাণী "নতুকালে ব্রত খণ্ডনম্ অনুশিষ্যাচ্ছ।" যে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে তাহার প্রমাণের জন্য সর্ব্বপ্রকার কুচেষ্টা করিয়াও স্বধর্ম্ম-বিদ্বেষী সংস্কারক মণ্ডলী বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বাহির করিতে পারেন নাই। হয়ত শিক্ষিত যুবকরা আজকাল এ সকল কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষা করিতে শিখিতেছে। পর্ব্ববর্জ্জ অরোগিনী প্রভৃতি ও নারীর অসম্মতি প্রভৃতি যে সকল সংযমবিধি বয়স ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে পালনীয় তাহা মানিত হয় না বলিয়াই আজ অনাচারের অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিতেছে। আমার পূর্ব্ব আলোচনায় যদি সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের অনাবশ্যকতার ইঙ্গিতও কেহ ধরিয়া লয়েন, তাহা হইলে সে ইঙ্গিতের জন্য, যে আধুনিক সভ্যতার ও শিক্ষার দম্ভ বিবাহকে পুরুষের কামের কাছে নারীকে বিক্রয় (being sold to man's lust) বলিতে লজ্জাবোধ করে না, সেই পাপ শিক্ষা দায়ী। গত দেড় বৎসর পূর্ব্বে, আমারও মস্তিষ্কে এই পাপশিক্ষাজাত অনেক কুসংস্কার বর্ত্তমান ছিল, এখন একদিকে গৃহ্যসূত্র হইতে স্মৃতিপুরাণাদি, অপরদিকে হ্যাভলক ইলিস, এইচ, জি, ওয়েলস্, বেনলিণ্ডসে, ডাঃ বাউয়ার, ডাঃ নরম্যান হেয়ার প্রভৃতি আধুনিকতম যৌনতত্ত্ববিদ্‌গণের গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখিতেছি যে আমাদের স্মৃতি ও আয়ুর্ব্বেদ মানবতার শ্রেষ্ঠ অবদানকে মুক্ত আকাশের তলে কি করিয়া সহস্রদল পদ্মের মতন বিকশিত করিতে হয় তাহারই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহারই অনুযায়ী পাঠ হইল "ঊনদ্বাদশ"; "ঊন ষোড়শ" নহে। এখনও ইউরোপ বা আমেরিকা সবটা ধরিতে পারে নাই। তবে সত্তর বৎসর বয়সে হ্যাভলক ইলিস যে সত্য ধরিতে পারিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে শীঘ্রই বিজ্ঞান সবটাকেই মানিতে পারিবে। এই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মায়ারের "প্রাচীন ভারতে যৌনাচার" হয়ত পথপ্রদর্শক হইতে পারে। হ্যাভলস ইলিসের উক্তিটীকে ভাবিবার জন্য দিয়া উপসংহার করি:—
The people whose lives are free from the disturbing influence of sex, are not likely to be themselves a disturbing influence in the world's routine—যে জনসঙ্ঘের জীবনী যৌন ব্যবহারের উৎপাত হইতে মুক্ত, সম্ভবতঃ তাহারা পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোনও উৎপাত করিবে না। এই মুক্তির চরম রহস্য হ্যাভলক ইলিসের ভাষায় Reproduction বা "সন্তান"। চরক সুশ্রুত বহুশতাব্দী পূর্ব্বে এই তত্ত্ব বিঘোষিত করিয়াছে বলিয়া ভ্রমাত্মক পাঠটী দেখাইয়া দিয়াছি। আমার যদি ভ্রম থাকে আমি শুধরাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মৌলিক তত্ত্বটীকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মানিয়া লইয়া পাঠান্তর পরিকল্পনাকে সেই তত্ত্বের সহিত মিলাইয়া তাহা দেখাইতে হইবে। নতুবা, কল্পনা-কল্পনাই থাকিতে বাধ্য।

—শ্রীনরেন্দ্র নাথ শেঠ।

মাসপঞ্জি—চৈত্র ১৩৩৭।

ল্যাঙ্কেসায়ারের কাপড়ের কলের অধিকারীগণ ভারতবর্ষে এক বিপুলায়তনের কল প্রতিষ্ঠানের সঙ্কল্প করিতেছে—উদ্দেশ্য বৈদেশিক বস্ত্র শিল্পের উপর ভারত গভর্ণমেণ্ট যে কর ধার্য্য করিয়াছেন, তাহা হইতে রেহাই পাওয়া—রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের দ্বিতীয় বৈঠক যাহাতে আগামী জুনমাসেই বসে, সেজন্য বিলাতের একদল লোক পীড়াপীড়ি করিতেছে—বঙ্গদেশে এযাবৎ ১৬ শতের অধিক আইন-অমান্যকারী বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা দিল্লীর গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের অনুমোদন করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন—ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ভারত হইতে ব্রহ্মদেশের ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবে প্রতিবাদ পাশ করিয়াছে—ভাইসরয় লর্ড আরউইন দিল্লীতে ভারতীয় 'রাজন্য-সভার' নূতন বৈঠকের উদ্বোধন করিলেন—আগ্রার দাঙ্গাতে ২০ জন লোক আহত—জহরলাল নেহেরু বলেন পূর্ণ স্বরাজ অর্থ—Indians' full control of army and the administrative and financial policy of India—স্থানীয় শিল্পের উন্নতি বিধানে মিশরবাসীরা ভারতীয় প্রণালী অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন—কলিকাতা হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিমান যাত্রার স্থায়ী পথ খুলিবার জন্য পার্লেমেণ্ট কমন্স সভাতে প্রস্তাব হইয়াছে—বিলাতের বেকার সংখ্যা "রেকর্ড" নম্বরে উঠিয়াছে বলিয়া প্রকাশ—পার্লেমেণ্ট সভার শ্রমিক সভ্যগণ নিয়মিতরূপ উপস্থিত থাকেন না বলিয়া দলনায়ক প্রধান মন্ত্রী তিরস্কার করিয়াছেন—ভারতীয় রাষ্ট্র সভায় টাটার লোহার কারখানা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার নিমিত্ত একটী কমিটী গঠনের প্রস্তাব উঠিয়াছিল, কিন্তু গৃহীত হয় নাই—এসম্ব্লী সভাতে বঙ্গের প্রতিনিধিগণ ও ইউরোপীয় সভ্যগণ নূতন লবণ কর প্রস্তাবের বিরোধ করিবেন—ল্যাঙ্কেসায়ারের কাপড়ের ব্যবসায়ীদিগের এবৎসর মোট ১৬২৩৬৮ পৌণ্ড ক্ষতি হইয়াছে—অষ্ট্রেলিয়াতে একদল শ্রমিকসেনা গঠনের আয়োজন হইতেছে, শ্রমিক বিরোধী দলের প্রতিপক্ষে এই প্রচেষ্টা—চীনে ২ জন আমেরিকান মিশনারীকে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশ—বোম্বাই ও লণ্ডনের মধ্যে টেলিফোন ব্যবস্থা হইল—এসেম্ব্লীতে সরকারের রাজস্ব বিল লইয়া মহা বিতর্ক চলিতেছে—লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভগত সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর প্রাণদণ্ড প্রত্যাহার নিমিত্ত জনসাধারণের আবেদন ভাইসরয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন—বোম্বাই হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত একটী স্থায়ী এক্স্‌প্রেস মালগাড়ী চালাইবার কথা—ফিলিপাইন দ্বীপে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছে—ভূপালের নবাব বাহাদুর এবার রাজন্যসভার নায়ক বা চ্যানসেলার নির্ব্বাচিত হইলেন—সার জন সাইমনের মতে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের শেষ গঠনমূলক ফল "Very nebulous indeed"—বিলাতে এবৎসর সরকার শিক্ষার জন্য ৫৮০০০০০০ পাউণ্ড খরচ করিবেন—মহাত্মাগান্ধী ও রাউণ্ড টেবিলের প্রত্যাগত ভারতীয় সভ্যবর্গকে লইয়া লর্ড আরউইন একআপোষ বৈঠক করিতেছেন—ভগৎসিং প্রভৃতি তিনজনকে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে রাত্রিকালে ফাঁসী দেওয়া হইয়াগেল—তাহাতে দেশময় নূতন উত্তেজনা দেখা যায়—কংগ্রেসমণ্ডলে দিল্লী প্যাক্ট লইয়া চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত, মহাত্মা গান্ধী তাহা প্রশমন করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করেন। করাচী কংগ্রেসে অনেক ইউরোপীয় ও আমেরিকান সংবাদপত্রপ্রতিনিধি উপস্থিত আছেন—ভগৎসিংহ প্রভৃতির ফাঁসী ব্যাপার লইয়া কানপুরে অসাধারণ দাঙ্গা চলিতেছে, প্রায় ১২৪ জন লোক হত হইয়াছে—করাচীতে কংগ্রেস অধিবেশন আরম্ভ হইল—প্রকাশ্য সভাতে কংগ্রেস দিল্লীর প্যাক্টকে মান্য করিয়া লইল—কংগ্রেস পক্ষ হইতে আগামী রাউণ্ড টেবিলে প্রতিনিধি প্রেরণ করা স্থির হইল।

ভারতের সাধনা

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

দ্বিতীয় বর্ষ]　　　　বৈশাখ—১৩৩৮　　　　[সপ্তম সংখ্যা

সাধনারপথে

ঐক্য ও সাধনা

বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসের কার্য্য যে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাতীয়কর্ম্ম একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। লক্ষ্য যাহাই থাকুক্ আর যে উপায়েই তাহার প্রাপ্তির চেষ্টা হউক্ আজ সমগ্র দেশের যত লোক উহার ভাবে প্রভাবিত এমন আর কিছুতে নহে। সে জন্যই বিদেশীয় রাজশক্তি উহাকে নিতান্ত বিরোধী জানিয়া এবং এযাবত নানা প্রকারে নিগ্রহ করিয়াও আজ উহার নিকট অন্ততঃ বাহ্যিকও মাথা নোয়াইয়াছেন। কংগ্রেসকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র ভারতময় এই যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা—ইহাই গান্ধী নায়কত্বের কৃত-কৃত্যতা। মহাত্মার কর্ম্মপ্রণালীও সে লক্ষ্যে পরিচালিত।

ভারতে একতা নাই, সকল দিকে অনৈক্য ও বিভিন্নতা—জাতিতে জাতিতে প্রভেদ, ধর্ম্মে, ভাষায়, আচার ব্যবহার, বেশ ভূষা, আহারাদি সর্ব্ব বিষয়ে বিভিন্নতা—এ সকল অনৈক্যের মধ্যে ভারতে কোনও জাতীয়তা গড়িয়া উঠিতে পারে নাই এবং সেজন্য ইহার সকল প্রকার রাজনৈতিক অধঃপতন।—এ অভিযোগও একটা নূতন কথা নয়। বিদেশীয় রাজ-শক্তি ইহার সকল প্রকার প্রশ্রয় দেয় ও দিয়াছে। তাহার প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখিবার পক্ষে এ এক নীতি। এ অনৈক্য ও বিরোধ ভারতবর্ষকে চিরকাল পদানত করিয়া রাখিয়াছে এবং আজও রাখিতে চাহে। এই সমুদয় অনৈক্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া যে পরিমাণে দেশে ঐক্য সংস্থাপিত করা যাইবে, সে পরিমাণেই জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে—দেশ স্বরাজ বা স্বাধীনতা পাইবে। মহাত্মার অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও হিন্দুমুসলমানমিলন চেষ্টা এই ঐক্যের সন্ধানে ব্যস্ত; এবং পাশ্চাত্য ভাবে

প্রভাবিত তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে যাহারা সমাজতান্ত্রিকতা ও গণসাম্যের পক্ষপাতী তাহাদেরও এই ঐক্য-প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য। কিন্তু এই ঐক্য-প্রতিষ্ঠার প্রযত্ন কোন্ দিকে কি ভাবে কতখানি কৃতকার্য্য হইল তাহা অবশ্যই পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বিষয়।

দেখিতে ত পাওয়া যায় হিন্দুমুসলমানের বিরোধ এখনও এক বৃহৎ সমস্যা—আবশ্যক হইলেই রাজদরবারের উচ্চ স্থান বা শিক্ষিত সমাজে এবং হাট ঘাট মাঠে নিরক্ষর অশিক্ষিত দিগের মধ্যে সর্ব্বত্র বিবাদ বাধে; এবং সদাই সশঙ্কিত ভাবে সকলে চলিতেছে; এভাব বাড়িয়াই চলিয়াছে। আবার অছুঁততার দূরীকরণ করিতে গিয়া আর এক প্রকার অছুঁতের সৃষ্টি হইয়াছে—অশিক্ষা ও অনাচার বর্ণ ও আশ্রমের আদর্শকে হীন করিতে চাহে—দেবতা ও ব্রাহ্মণকে ম্রিয়মাণ করিয়া আর এক অছুঁতের গণ্ডীতে ফেলিয়াছে; বাহিরের কথা ছাড়িয়া দিয়া মূল কংগ্রেসের মধ্যেও দলাদলি ও অনৈক্যের অভাব নাই। কংগ্রেস সার্ব্বদেশিক কার্য্যকরী সমিতির সংগঠনেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। আর অন্য প্রদেশের দলাদলির কথার এত প্রকাশ না থাকিলেও বাঙ্গলা দেশে কংগ্রেস এখন যে অবস্থাতে তাহাতে দলাদলি ব্যতীত ইহাদের আর কোনও কর্ম্ম আছে বলিয়াই কেহ মনে করিতে পারে না। দুইখানি দৈনিক ইংরেজী সংবাদপত্র এই দলাদলির যন্ত্র রূপে নিয়োজিত—কুৎসা, নিন্দা ও ঝগড়ার আকারে দিন দিন এই দলাদলির নূতন নূতন কথা শুনা যাইতেছে। দুইজন নেতা ও তাহাদের ক্ষুদ্র সংখ্যক অনুবর্ত্তীদলের মধ্যে যে অনৈক্য তাহাই আজ বাঙ্গলার প্রায় সর্ব্বত্র কংগ্রেস-মণ্ডলে ব্যাপ্তি লাভ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে আঃ ছিঃ পড়িয়াছে। বাঙ্গলা তার এই দলাদলি মিটাইবার জন্য বাহিরের নিকট কাঙ্গাল! বাঙ্গলার ভিতরেও এজন্য কংগ্রেসের প্রতি অনেকের একটা অশ্রদ্ধা আসিয়াছে। তাহারা কংগ্রেস ছাড়িয়া বাহিরে দাড়াইতে চাহেন। এই দলাদলির প্রসঙ্গে আমরা গতমাসে বাঙ্গলার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করিয়াছিলাম। অনেকে ইহার মূলে জাল জুয়াচুরি ও প্রতারণা দেখিতে পান—"Fraud, corruption and jobberies have disgraced Bengal Congress politics for which a small number of men are primarily responsible" এরূপ কহেন। আমরা বলি প্রকৃত বাঙ্গলা কি ইহাই? ইহারাই কি দেশকে পরিচালন করিবেন? বাঙ্গলার উচ্চ আদর্শ ও ভাব-সম্পদ কি তিরোহিত হইয়াছে? বাঙ্গলার ত্যাগমূলক কর্ম্মণ্যতা ত এখনও কম নহে! তবে এরূপ হয় কেন? লোকের দলাদলি হয় প্রধানতঃ দুই কারণে—জাতিগত আদর্শের সংঘাতে অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থ পদ সম্ভ্রম মান অর্থের প্রতিযোগিতা বা লালসায়। প্রথম প্রকারের দলাদলি শ্লাঘনীয় ও সময় বিশেষে বাঞ্ছনীয়? দ্বিতীয় প্রকার তেমনই ঘৃণ্য। আজ বাঙ্গলা এই যে দলাদলির কলঙ্ক-কালিমাতে সমুদয় ভারতের চক্ষে হেয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কোন্ প্রকারের দলাদলি তাহাই ভাবিবার কথা হইয়াছে। আশার কথা এই যে বাঙ্গলাতে কখনও উচ্চ আদর্শ-বাদের অভাব হয় নাই। সে আদর্শবাদ চৈতন্যদেব হইতে অরবিন্দ পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া বাঙ্গলার ধর্ম্ম, সমাজ, জ্ঞান ও রাষ্ট্রে বাঙ্গলার যে আত্মচৈতন্যের সন্ধান দেয়, তাহাই যদি এ দলাদলির হেতু হইয়া থাকে তবে ইহার সার্থকতা আছে। সে আদর্শবাদের যোগ-সূত্রে রামমোহন ও রামকৃষ্ণ, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ প্রভৃতি ভারতের জাতীয় সাধনার যে প্রাণবস্তুর নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কাছে অপর কোনও আদর্শের স্থান হয় না। অদ্যকার এই কলহের কোনও নেতা যদি সে আদর্শকে বক্ষে লইয়াই

চলিয়া থাকেন তবে তিনি একদিন জয়যুক্ত হইবেন, এই ভরসা করা যায়। এযুগে ভারতীয় সাধনার এক বিশেষ উত্তরাধিকারিত্ব তাহার আছে, এই কথা আমরা পূর্ব্ববারে বলিয়াছি। কিন্তু ভয়—উচ্চ বংশের লোক যেমন স্বভাব-ভ্রষ্ট হইলে তেমনই নীচ হয়, ভাল বস্তু পঁচিলে যেমন অধিক দূষিত হইয়া উঠে, ইহাদের দলাদলি সেই আদর্শচ্যুত হইয়া তেমনই ঘৃণ্য ও বিপরীত ভাবাপন্ন না হইয়া থাকে। অধুনাকার বাঙ্গলার শিক্ষা ও সাহিত্যে, সমাজ ও রাষ্ট্রে এবং রীতি-নীতিতে উন্নতির নামে যে চাপল্য ও ব্যভিচারের প্রবাহ চলিতেছে, তাহাতে এই সংশয় উঠিয়া থাকে।

সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা সন্দেহ না আসিয়া পরে না যে, আজ বাঙ্গলাদেশে যে দলাদলি ও অনৈক্য বিসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে, অচিরে তাহা সমগ্র ভারতে বিস্তৃত না হইয়া পড়ে। কারণ দলাদলির হেতু সর্ব্বত্র আছে। জাতীয় সাধনার মৌলিক গ্রন্থির উচ্ছেদ সাধন অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। তাহাতেই প্রকৃত ঐক্য সূত্র বিলীন হইয়াছে। কেবল মাত্র রাজনৈতিক লাভালাভের বিচারে ও আশায় এক প্রকার ভাব-গত ঐক্যের সন্ধান হইতেছে মাত্র। তাহার কোনও প্রকার ব্যতিক্রম হইলে, ঐক্যের স্থানে অনৈক্যের সম্ভাবনা সর্ব্বত্র রহিয়াছে। আজ যে ঐক্য ভারতীয় রাষ্ট্রে দেখা যাইতেছে, এবং যাহাতে শঙ্কিত হইয়াই বৈদেশিক রাজশক্তিকেও কথঞ্চিত অবনত হইতে হইয়াছে, তাহার মূল ভিত্তি একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব—কোনও সার্ব্বজনীন উচ্চ নীতি নহে। তাঁহার মহান্ ব্যক্তিত্বের নিকট সকলেই অবনত—সকলেই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত; কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম-নীতিতে সকলে সমানভাবে আবদ্ধ হইতে পারে না—তাঁহার শ্রেষ্ঠ অনুবর্ত্তনকারীগণের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই সে নীতির উপরে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এজন্য মূল কংগ্রেস মণ্ডলেই এক সময়ে এক বিরাট বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছিল—তাঁহার নীতি-বিরোধী স্বরাজ্যদলের হাতে সমুদয় ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া তিনি তখন পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; পরে আবার তিনি তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্বের জোরেই পুনঃ সকলকে আপন একতারে ভিড়াইয়া লইয়াছেন। আজ ব্রিটিশ রাজশক্তিও তাহার নিকট ধরা দিতে চাহে। মহাত্মার এই কর্ম্ম-নীতি ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্য-তত্ত্ব বুঝিয়া দেখিবার বিষয়—এককথায় তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপেই ভারতের, আর কর্ম্মনীতি বাহিরের। ব্যক্তিগত চরিত্রে তিনি ভারতীয় সাধনার প্রতীক। ইহার বিরোধ কেহ করিতে পারে না। সে সাধনায় সকল প্রকার বিরোধের বিলয়সাধন হয় এবং চিরকাল হইয়াছে। উহার উচ্চ নীতি সকল ধর্ম্ম ও সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই গ্রহণ করিতে পারে। ভারতের ইতিহাসের সুদীর্ঘ কালের নানা পার্থক্য, বিরোধ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে একমাত্র ভারতীয় সাধনা (culture)ই তাহার ঐক্য রক্ষা করিয়াছে—সকল বিরোধ ক্রমে এক ভারতীয় সাধনার সাম্যের লক্ষ্য চলিয়াছে। এ সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষগণের সহিত মহাত্মা চিরকাল লোকসমাজের পূজা পাইবেন। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি যে নীতি অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহার অভাবে উহার গতি কি হইবে কেহ বলিতে পারে না।

রাষ্ট্রে নাটকীয়তা

রাষ্ট্রক্ষেত্রে সময় সময় মহানাট্যের অভিনয় হইয়া থাকে। নাট্যের লক্ষণ লোকের মনে কোনও অসাধারণ ভাবের উত্তেজনা, আবেগ বা চমৎকারিতা উৎপাদন করিয়া দিয়া বিশেষ কোনও ফল

বা লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাওয়া। বাস্তব ঘটনাতে নাটকীয় ভাব মণ্ডিত হইলে তাহাও নাট্যেরই সামিল। ভারতীয় ইতিহাসে এরূপ চমৎকারিতাপূর্ণ বাস্তব ঘটনার অভাব নাই। পাণিপথ ও পলাসী প্রভৃতির নাটকের কথা এখানে বলিব না—কবির ভাষায় উহাও নাটক—"The drama of war." এযুগের ইতিহাসে মুষ্টিমেয় ইংরেজ বণিকের ভারত জুড়িয়া বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া বসার ন্যায় এমন চমৎকার জনক ব্যাপার নাকি আর হয় না। উহা হয়ত দৈবেরই নট-চক্রান্ত—"The drama and contrivance of God's providence." কিন্তু ভারত যদি এই নাটকেরই অভিনয় ক্ষেত্র, তবে ইহার অভিজ্ঞ রাষ্ট্র-পরিচালকগণ কি এই নাটকীয়তাকে শাসন-নীতিরও অঙ্গীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না? গুরুতর সঙ্কট ও সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া সময় সময় শাসক-সম্প্রদায় যে কার্য্যক্রম ও নীতির পরিচয় দিয়া থাকেন তাহাতেই এই প্রশ্ন উদিত হয়। শাসন, বিচার, অনুসন্ধান, কমিশন প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়ের মধ্যেও গুপ্ত নাটকীয়তার ভাব অনেকই দেখিতে পাওয়া যায়; গুরুতর ব্যাপারে তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভারতীয় প্রকৃতি স্বভাবতঃ ভাব-প্রবণ; নাট্যে তাহা প্রশ্রয় পায়।

বিগত দেড় শত বৎসর ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে কয়েকটী সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সিপাহীযুদ্ধের পর বঙ্গ-ভঙ্গআন্দোলনের ন্যায় কঠিন সমস্যা রাষ্ট্র শক্তিকে আর কখনও সম্মুখীন হইতে হয় নাই। সুদীর্ঘ ছয় বৎসর ঘোরতর সংগ্রামের পর পরদেশীয় শাসনশক্তির দৃঢ় সঙ্কল্প টলিয়াছিল—বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হইল। কিন্তু তাহাতে যে নাটকীয় অভিনয় দেখা গিয়াছিল, তাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ভাঙ্গা বাঙ্গলাকে জোরা পাইয়া বাঙ্গালীর আনন্দের সীমা ছিল না—পরোক্ষে আর যাহা যাহা ঘটিল সেদিকে লক্ষ্য দিবার অবকাশ কাহারও ছিল না। ক্রমে যে সকল প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অতঃপর অসহযোগ আন্দোলনে সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাবের আর এক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; মহাত্মা গান্ধীর অসাধারণ নেতৃত্বে ক্রমে উহা আইন-অমান্য-সংগ্রামে পরিণত হইয়া ভারতীয় রাষ্ট্রে আর এক গুরুতর সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। রাজপ্রতিনিধি লর্ড আরউইন তাঁহার কার্য্যকালের অন্তিম সময়ে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ ও সংলাপ দ্বারা তাহার যে সমাধানের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও কম চমৎকারিতার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। বস্তুত এই 'গান্ধী আরউইন সংলাপ' ও 'দিল্লির সন্ধি' (Gandhi-Arwin meeting" —"Delhi Truce") কে ভারতীয় রাষ্ট্র-নাটকের ("Drama of India") একটী বিশেষ অঙ্ক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এ সন্ধির পরিণাম অবশ্যই অনিশ্চিত; রাষ্ট্রের প্রকৃত সমস্যার সমাধান ইহাতে হইবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই; কোনও নূতন সংগঠন ইহার দ্বারা হয় নাই, রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা স্বরূপ কিরূপ হইবে তাহা লইয়া এখনও মতভেদ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তথাপি ইহাতে বিশ্বের লোক চমৎকৃত হইয়াছে; এবং নাট্যের অভিনেতৃদ্বয় জয়যুক্ত হইয়াছেন; জগতের চক্ষে তাঁহারা উজ্জলতর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন; এবং সাময়িক হইলেও এই একটী মাত্র কার্য্যদ্বারা সমগ্র ভারতব্যাপী এত সুদীর্ঘ কালের এক বিরাট বিক্ষুব্ধ ভাব এক মুহূর্তে শান্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতের বাহিরে অনেক স্থানে এবং বিলাতেও অনেকে এই ব্যাপারকে একটী তাজ্জব ব্যাপার বা "miracle" বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে এবং তাহাই ভাবে।

সু-নাট্যের একটী লক্ষণ এই যে উহা লোকের মনে প্রথমতঃ একটী অস্বাভাবিক উদ্বেগ বা

উত্তেজনার সৃজন করিয়া দিয়া ক্রমে উহাকে শান্ত করিয়া আনে। দীল্লির এই সন্ধির ব্যাপারকে বিলাতের জন সাধারণ যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে এ লক্ষণও বিশেষ সুসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ এই সন্ধির সর্ত্তকে তাহারা ভাইসরয়ের গান্ধীর নিকটে আত্মসমর্পণ—"Term of Viceroy's surrender to Gandhi" বলিয়াই ঘোষিত করিয়াছিল। ইহাতে যে আবেগ ও উদ্বেগ প্রকাশিত হয়, তাহাই আরও স্পষ্টতর ভাবে প্রকাশ পাইল, এই বলিয়া সে ভারতে ব্রিটিশরাজ কংগ্রেসের সমুদয় কথাই মানিয়া লইয়াছে, ব্রিটিশগণ এক্ষণে ভারত ছাড়িয়া যাইতে পারে—"A Complete confirmation of Congres propaganda, asserting that the British are on the run" (ব্রিষ্টেল ইভিনিং ওয়ার্লড); আর একজন বলিয়া উঠিলেন—গান্ধীরই জয়—'A triumph of Gandhi' (অবজার্ভার)। কিন্তু ক্রমশঃ এই স্বর নরম ও শান্ত হইয়া আসিল। তখন কেহ বলিলেন—ভাইসরয় যে সকল কথা মানিয়া লইয়াছেন, তাহা অন্য বিষয়ের তুলনায় তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর—"The concession of Viceroy is relatively unimportant and immaterial (টাইমস্); কেহ বলিলেন, মোটামোটি রকমটা ভালই হইয়াছে—"On the whole satisfactory (গ্লাসগো হিরেল্ড্); যাহা করা আবশ্যক ছিল তার সবই পাওয়া গেল—"A complete achievement of every point which needed to be achieved (ইয়র্ক সিয়ার পোষ্ট); পরিণাম বেশ হইয়াছে—"A happy ending" (ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডেন); ফল যুগনির্ম্মাণকারী—"The result epoch-making" (নিউ লীডার); ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ভারত প্রবাসী ইংরেজ দিগের মধ্যেও এ ব্যাপার লইয়া প্রথমতঃ বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিলাতে এই সংবাদ প্রেরিত হইল যে—"The British in India had received the news of Viceroy's *capitulation* with amazement and despair" অর্থাৎ ভারতের বিটিশ প্রবাসীগণ ভাইসরয়ের গান্ধীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করার কথা শুনিয়া বিস্ময় ও নিরাশায় নিমজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু অচিরে ইহারা সামলাইতে পারিয়াছিল। তখন সংবাদ প্রেরিত হইল—"The British opinion was one of universal relief and thankfulness" (অবসার্ভারের সংবাদ দাতা), অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ প্রবাসীগণ সর্ব্বত্র স্বস্তি লাভ করিয়াছে, এজন্য তাহারা কৃতজ্ঞ। ব্যবস্থাপক সভায় ইউরোপীয়গণ এক স্বরে বলিয়া উঠিলেন—The Viceroy and Mr. Gandhi have opened a new chapter of freedom and glory in the history of the British Empire" অর্থাৎ ভাইসরয় ও মিঃ গান্ধী ভারতের বিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের প্রবর্ত্তন করিলেন, সে অধ্যায় মুক্তি ও গৌরবের।

যে সকল বিষয় উদ্বেগ ও উত্তেজনার মধ্যে শান্তি ও সাম্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, নাট্যে হইলে তাহাকে বলে শিল্প-চতুর্য্য, রাষ্ট্রে হইলে সে চাতুর্য্য হয় নীতির।

মিলনের সার্থকতা

নীচকে অধিকতর নীচাশয় দেখাইয়া, তুষ্টকে অধিকতর কল্মষিত বলিয়া জন সমাজের

যেমন লাভ, মহান্‌কে মহত্তর বলিয়া দেখাইয়াও জগতের তেমনই উপকার হয়। ইদানীং দীল্লিতে গান্ধী-আরউইন সংলাপের ফলে যে সমস্ত বিষয় সম্ভাব্য বলিয়া দেখা যাইতেছে তাহাতে ভাইস্‌রয় লর্ড আরউইনের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র যে উজ্জ্বলতর রূপে চিত্রিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। ভারতীয় লোকের মুখে তাঁহার গুণপণাব্যাখ্যার মূল্য যত খানি পাশ্চাত্যবাসীর নিকট হইতে তাহা শুনিতে পাইলে তাহা অবশ্য আরও অনেক অধিক হয়। বিলাতের একদল লোক যদিও তাহাকে এই ব্যাপারে দুর্ব্বল মেরুদণ্ড-বিহীন খর কুটার মতন তুচ্ছ—"a man of straw" বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, আর একদল অবশ্যই তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতেছেন; তাহার গুণেই ভারতকে বিষম গোলযোগ হইতে রক্ষা করা গেল—"His qualities alone have stood between India and chaos." কেবল ইহাই নহে, কেহ কেহ কবি কিপ্‌লিংএর একটি প্রসিদ্ধ বাক্য নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধীর মতনই পাশ্চাত্যের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে পরিণত হইলেন। কবির কথায় আছে—

Oh East is East, and West is West, and never the two shall meet
Till Earth and Sky meet presently at God's great judgement seat.
But there is neither East nor West, border nor breed nor birth
When two strong men meet face to face, though they come from the ends of the earth."

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের একজন দেশীয় সভাষদ্ নাকি সত্য সত্যই মহাত্মা গান্ধী ও অপসরণশীল ভাইসরয়কে এক পর্য্যায়ে সুপারম্যান বা অতিমানুষ নামে অভিহিত করিয়া লর্ড আরউইনকে 'মহাত্মা আরউইন' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে 'মহাত্মা' বলায় অনেক বিজ্ঞ ভারতীয়ের নিকটও অসমঞ্জস লাগিয়াছিল। আর সেদিন একজন উচ্চ ইংরেজ রাজ-কর্ম্মচারীকে মহাত্মার এই বিশেষণ উচ্চারণ করিতে শুনিয়া মহাত্মা স্বয়ং বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজপ্রতিনিধির এই নূতন আখ্যা নাকি নিতান্ত অনুচিত হয় নাই। তাই একজন বিজ্ঞ বিলাতী মাসিক পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছে—"The title which is less far-fetched than might be thought, if we remember that the exact significance of the term 'Mahatma,' so our Indian authority tells us, is not so much a saint as a man of soul-force"—মহাত্মা বলিতে যদি 'সাধু-সন্ত' বুঝিতে হয় তবে এই আখ্যায় অবশ্যই ইহাদের আপত্তি আছে, কিন্তু তাহা না হইয়া যদি আত্মিক (মনের নহেত?) বলসম্পন্ন পুরুষ হন তবে কোনও বাধা নাই; আর 'মহাত্মা' শব্দের এই শেষ অর্থই নাকি কোনও ভারতীয় ভাষাবিদ্ তঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন।

ভারতের রাজপ্রতিনিধি 'মহাত্মা' হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাউন ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই, বরং খাঁটী ভারতীয়ের ইহা আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। ভারত মহাত্মার দেশ—যুগ যুগান্তর ধরিয়া মহাত্মাগণ ভারতে জীবিত আছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত কোন কোন পাশ্চাত্য ধর্ম্মবাদীও বিশ্বাস করেন। ভারতের শিক্ষা বলে প্রত্যেক আত্মাই মহান্। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই মহাত্মা: কিন্তু এজন্য চাই সমুচিত শিক্ষা ও সাধনা। আজ ভারতের যে

মহাপুরুষ ভারতে ও জগতে 'মহাত্মা' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন সত্যের পরীক্ষণে নিয়ন্ত্রিত তাঁহার জীবন সম্পূর্ণই সেই সাধনার! আর একদিনেই তিনি এই আখ্যা লাভ করেন নাই। ভারতের কোটি কোটি নরনারীর চিত্তের উপর তিনি সুদীর্ঘকালের সাধনায় যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হইয়াছে তাঁহার এই আখ্যায়। আর কবি কিপ্‌লিং এর উক্তিতে যে দুইজন শক্ত পুরুষের উল্লেখ আছে, যাঁহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভেদকে ঘুচাইয়া দিতে সমর্থ, তাহারা কি কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের নির্দ্দিষ্ট কোনও দুই জন ভবিষ্যৎদৃষ্টির লোক, না সর্ব্বকালের সাধারণ মনুষ্য—ইহার ভাষা হওয়া আবশ্যক। উক্ত কবির উক্তিকে এ যাবত লোকে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অচ্ছেদ্য প্রভেদের সঙ্কেত-বাক্য মাত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। এ দুইয়ের মিলনের যে সর্ত্ত তাহাতে নির্দ্ধারিত আছে, সেদিকে কাহারও মন যায় না। ভারতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিশেষ শক্ত বীরপুরুষ-দ্বয়েরই সঙ্ঘর্ষ ও মিলন আরও ঘটিয়া গিয়াছে—মহাবীর অলেকজণ্ডারের সেই পঞ্চনদতীরে পুরুরাজ্যের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধির কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে—তখন এক শক্ত বীর-হৃদয় শক্ত বীর-বাণীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন সংঘটন করাইয়া ছিল—সখ্যতার বন্ধনে! আবার একবার মিলন হইয়াছিল চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকাসের সংঘর্ষে—তখন ভারতের বিপুল ক্ষাত্র শক্তির কাছে গ্রীক শক্তি পরাজয় মানিয়া প্রাচী ও প্রতীচীর মিলন সংঘটন করে আরও ঘনিষ্ঠতর—রক্তের বন্ধনে। আজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে অসাধারণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেও এই পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলনের সম্ভাবনা আছে, অনেকে তাহা প্রতীক্ষা করে; এ মিলন হয়ত হইবে—উভয়ের আত্মিক সাধনারই বন্ধনে। যদি কোনও বীর পুরুষ সত্য সত্যই ভারতের সাধনা শক্তির নিকট পাশ্চাত্যের উচ্চ শির নত করিয়া সে মিলন সংঘটন করায়, তবে তিনি নিশ্চয়ই ধন্য হইবেন।

চরকা-শিল্পের সফলতা

গত ১৯২৯-৩০ সনের নিখিল ভারতীয়-চরকা-সমিতির কার্য্য-বিবরণীতে দেখা যায় যে ভারতের সকল প্রদেশেই চরকা-শিল্পের উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেবল বাঙ্গলা প্রদেশে কমিয়াছে। বিগত বৎসর দেশের জাতীয় কর্ম্মধারায় একটী স্মরণীয় বৎসর সন্দেহ নাই। ঐ বৎসরই জাতীয় মহাসমিতির লাহোর অধিবেশনে স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সর্ব্ব প্রথম উপায় বলিয়া মহাত্মা গান্ধী লবণকর আইন ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে ডাণ্ডীতে অভিযান করেন। তৎপর একটী বৎসর সমগ্র দেশ মধ্যে অসাধারণ উত্তেজনা, উদ্বেগ ও অশান্তি চলিতে থাকে; সহস্র সহস্র লোক নানারূপ উৎপীড়ন ও কারাবাস সহ্য করিতে থাকে। কিন্তু ইহাতে চরকা-শিল্প বা খাদি উৎপাদন বন্ধ হইতে পারে নাই; বরং প্রায় সকল স্থানেই তাহার বৃদ্ধি পাইয়াছে—নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাহা বুঝা যাইতে পারে—

প্রদেশ—	উৎপাদন—		শতকরা বৃদ্ধি—
	(১৯২৮-২৯)	(১৯২৯-৩০)	১৯২৯-৩০
অন্ধ্র	৩৩৯৮৪৫	৭৯৮০৮৬	১৩৫
বিহার	২৩৪৭৮৫	৩৮৭৭৩১	৬৫
বাঙ্গলা	৪৩৮৪৬৯	৪১৫৯৯৮	০
দিল্লী	১৩০৩২৯	২৫০২৯৩	৯২
গুজরাট	৩১৮৬৩	৩৭০৯০	১৬
কর্ণাটক	৬৮৭৭২	৯৪৯৪১	৩৮
কাশ্মীর	১১৯১১১	২৩৩৩০৪	৯৭
মহারাষ্ট্র	৪৭৫৯৪	১০৩০৯৯	১১৫
পঞ্জাব	১৪১৫৫৬	৩০১৭৭২	১১৫
রাজস্থান	২৭৬৫৬৮	৪৫৯১১১	৬৬
তামিলনাড ও কেরল	১১১৫৬৭৪	১৬১৯৯৪৯	৪৫
যুক্ত প্রদেশ	১৬৮১৩২	৩৪৩১৮৬	১০৪
উৎকল	৪৩১০৪	৭৭৮৪৯	৮১
	৩১৫৫৫৮৭	৫৩০০৮১৬	৬৮

এই বৃদ্ধির কারণ অবশ্যই গত বৎসরের বিশেষ প্রকারের জাতীয় আন্দোলন। ডাণ্ডীর যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্ব্বত্র খাদির চাহিদা বাড়িয়া উঠে; এবং যেখানে যত খাদি মজুদ ছিল তাহা শূন্য হয়। তখন সর্ব্বত্র খাদির মূল্য সাময়িক বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এ জন্য খাদির উৎপাদনও বাড়িতে থাকে। আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয় বস্ত্রের পিকেটিং চলিতে থাকে, তাহাতেও খাদির কাটতি বৃদ্ধি পায়; পরে সরকারপক্ষ পিকেটকারীর উপর দলননীতি অবলম্বন করিতে থাকেন, তাহাতে খাদির প্রতি লোকের অনুরাগ বাড়ে। খাদি বিক্রয়ের অসুবিধা নিবারণের জন্য স্থানে স্থানে কেবল চরকার সূতার বিনিময়ে বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়, এইরূপ ব্যবস্থায়ও খাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তুলার মূল্য হ্রাস হওয়াতেও খাদি প্রচলনের সুবিধা হইয়াছে; কারণ চাষীরা অত্যল্প মূল্যে তুলা বিক্রয় করা অপেক্ষা গৃহে সূতা প্রস্তুত করিয়া তাহা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে থাকে। এ সকল সুবিধার সঙ্গে অসুবিধাও অনেক হইয়াছিল—নানা স্থানে খাদিকর্ম্মীগণ আইন অমান্য সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন ও অনেকেই কারাগারে আবদ্ধ হন। অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় মিলে খাদির অনুকরণে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা খাদি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হয়; লোকের রুচি দেশীয় মিলের কাপড়ের অনুকূলে থাকাতেও খাদির প্রচলনে বাধা হয়।

এই সকল সুবিধা ও অসুবিধা—অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার প্রভাব কোন্ প্রদেশে কত দূর পড়িয়াছে, তাহা এই হ্রাস-বৃদ্ধির তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। এতদ্ প্রসঙ্গে বাঙ্গলা প্রদেশের বর্ত্তমান অবস্থাও বিশেষ অনুধাবনীয় হইয়াছে।

সন্ধ্যোপাসনা

গায়ত্রীর ধ্যান

পূর্ব্বে উল্লিখিত ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া সাধক এখন গায়ত্রীর ধ্যান করিতেছেন। বিস্ফুরিত শক্তিকে সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে আনিয়া ও ব্যষ্টির অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে তাহাকে নিবদ্ধ করিয়া সাধক আরও অন্তর্মুখী হইতেছেন। স্থূল হইতে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মে যাইতেছেন। সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিলেও দেখা যায় সব একই নিয়মে পরিচালিত। একটা পাখীও নিজের বাসায় আসিবার আগে ভাঁওর দেয় তার পর বাসাটিতে বসিতে পারে। এরোপ্লেনটি মাটিতে নামিতে আগে ভাঁওর দিতে বাধ্য হয়। একটা পুস্তক পাঠে মনঃসংযোগ করিতে হইলে একটু ইতি উতি করিতে হয়; ভাল লিখিতে হইলে তাহার উপক্রমণিকা প্রয়োজন। উপক্রমণিকা বা অনুক্রমণিকা ভিন্ন কিছুই লেখা যায় না। ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারের পূর্ব্বে শুধু ওয়াট সাহেবকে ভাঁওর দিতে হইয়াছিল তাহা নহে আরও অনেককে ভাঁওর দিতে হইয়াছিল তবে লক্ষ্য বস্তুটি পাওয়া গিয়াছে। নিউটনকে অনেক ভাওর দিতে হয় তবে আকর্ষণ তত্ত্ব স্থির হয়। ডিউকীটি লাভ করিবার আগে অনেক ভাওর দিতে হয়, কাট্‌লেটটি লাভ করিতে অনেক ভাওর দিতে হয়। ভাইকে পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিতে হইলে হাইকোর্টে অনেক ভাওর দিতে হয়। পরকীয় রস ভোগ করিতে হইলে স্ত্রীকে বঞ্চনা অর্থনাশ এমন কি প্রাণহন্তারক হইবার জন্যও নানারূপ ভাওর দিতে হয়। একটি ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের আড্ডা খাড়া করিতে যখন এত আয়োজনের প্রয়োজন তখন সন্ধ্যায় সাধককেও এত প্রচেষ্টা করিয়া ধ্যানে বসিতে হইতেছে। এখন তিনি ধ্যান করিবেন।

প্রাতে—ওঁ কুমারীং ঋগ্বেদ যুতাং ব্রহ্মর[illegible] হস্তাং সূর্য্যামণ্ডল সংস্থিতাং।

মধ্যাহ্নে—ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীং। যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যামণ্ডলসংস্থিতাম্।

সায়াহ্নে—ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভ বাহিনীং সূর্য্যামণ্ডল মধ্যস্থাং সামবেদ সমাযুতাম্।

অর্থ—প্রাতঃকালে গায়ত্রীকে কুমারী, ঋগ্বেদহস্তা, ব্রহ্মরূপা, হংসারূঢা, কুশহস্তা, এবং সূর্য্যামণ্ডলে অবস্থিতা এইরূপ চিন্তা করিবে।

মধ্যাহ্নে—তাঁহাকে যুবতী, যজুর্ব্বেদময়ী, বিষ্ণুরূপা, গরুড়াসনা, পীতবাসসা, এবং সূর্য্যমণ্ডলস্থা এইরূপ ভাবিবে।

সায়াহ্নে—তাঁহাকে বৃদ্ধা, সামবেদ সমাযুতা শিবরূপা, বৃষভস্থা, এবং সূর্য্যামণ্ডল মধ্যস্থা এইরূপ ভাবিবে।

গায়ত্রী ও ত্রিমূর্ত্তি সন্ধ্যার সাধক প্রাতঃকালের মূর্ত্তিকে **গায়ত্রী**, মধ্যাহ্ন মূর্ত্তিকে **সাবিত্রী**, ও সায়াহ্ন কালের মূর্ত্তিকে **সরস্বতী** নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যায় যে ত্রিমূর্ত্তির ধ্যান আছে তাহা এই :—

প্রাতে—ওঁ হংসোপরি পদ্মাসনস্থাং চতুর্ম্মুখাং রক্তবর্ণাং দ্বিভুজাং ব্রহ্মণঃ সদৃশ রূপাং ব্রহ্মাণীং ধ্যায়েৎ।

ওঁ বালাং বালাদিত্যমণ্ডলস্থাং রক্তবর্ণাং রক্তাম্বরানুলেপন স্রগাভরণাং চতুর্ম্মুখীং দন্তকমণ্ডল্বক্ষ সূত্রাভয়াঙ্ক চতুর্ভুজাং হংসারূঢ়াং ব্রহ্মদৈবত্যাং ঋগ্বেদমুদাহরন্তীং ভূর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং গায়ত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ।

ওঁ গায়ত্রীং রবিমণ্ডলমধ্যস্থাং রক্তবর্ণাং চতুর্ম্মুখীং হংসোপবিষ্টাং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মলোক তারয়ন্তীম্।

মধ্যাহ্নে—ওঁ কৃষ্ণাং চতুর্ভুজাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরাং বিষ্ণোঃ সদৃশরূপাং সাবিত্রীং ধ্যায়েৎ। ওঁ যুবতীং যুবাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্বেতবর্ণাং শ্বেতাম্বরানুলেপন স্রগাভরণাং সত্রিনেত্র পঞ্চবক্ত্রাং চন্দ্রশেখরাং ত্রিশূল খড়্গ খট্বাঙ্গ ডমরুকরাং চতুর্ভুজাং বৃষারূঢ়াং রুদ্রদৈবত্যাং যজুর্ব্বেদমুদাহরন্তীং ভুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সাবিত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ। ওঁ সাবিত্রীং রবিমণ্ডলমধ্যস্থাং শ্বেতবর্ণাং চতুর্ভুজাং শঙ্খচক্র গদাপদ্মধরাং গরুড়ারূঢ়া কেয়ূরাগুলঙ্কৃতাং বিষ্ণোঃ সদৃশরূপাং।

সায়াহ্নে—ওঁ শুক্লাং বৃষারূঢ়াং ত্রিশূল-ডমরু-করামর্দ্ধ-চন্দ্র বিভূষিতাং বৃষভস্থাং শম্ভোঃ সদৃশরূপাং সরস্বতীং ধ্যায়েৎ। ওঁ বৃদ্ধাং বৃদ্ধাদিত্য মণ্ডলস্থাং শ্যামবর্ণাং শ্যামাম্বরানুলেপন স্রগাভরণাং একবক্ত্রাং শঙ্খচক্র-গদা-পদাঙ্ক-চতুর্ভুজাং গরুড়ারূঢ়াং বিষ্ণুদৈবতাং সামবেদমুদাহরন্তীং স্বর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সরস্বতীং নাম তাং ধ্যায়েৎ।

ওঁ শ্যামাং ত্রিনেত্রাং অজিন বসনাং ত্রিশূল খট্বাঙ্গ হস্তাং বৃষারূঢ়াং মহেশ্বরীং।

ঋগ্বেদীয় ধ্যান মন্ত্রগুলির অর্থ সহজবোধ্য। সুতরাং বিস্তারিত বঙ্গানুবাদের তত প্রয়োজন নাই। ঋগ্বেদীয় ধ্যানেও প্রাতে গায়ত্রী ও বালিকা, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী ও যুবতী এবং সায়াহ্নে সরস্বতী ও বৃদ্ধা। এ বিষয়ে পার্থক্য নাই। সাধারণ ধ্যানে প্রাতঃকালের ও সায়াহ্নের মূর্ত্তির রং স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই, পরন্ত ঋগ্বেদীয় ধ্যানের মধ্যে প্রাতের বর্ণ লোহিত, এবং সায়াহ্নের বর্ণ শুক্ল ও শ্যাম দুইই বলা হইয়াছে। সাধারণ ধ্যানে মধ্যাহ্নে গায়ত্রী পীতবর্ণা ঋগ্বেদীয় ধ্যানে মধ্যাহ্নের বর্ণ কৃষ্ণ ও শ্বেত দুইই বলা হইয়াছে। সাধারণ মতে প্রাতঃকালের দেবতা ব্রহ্মরূপা, মধ্যাহ্নের দেবতা বিষ্ণুরূপা ও সায়াহ্নের দেবতা শিবরূপা। ঋগ্বেদ মতেও প্রাতে ব্রহ্মাণী, মধ্যে বিষ্ণুরূপা এবং সায়াহ্নে শম্ভুর সদৃশরূপা মহেশ্বরী। সাধারণ মতে প্রাতে ঋগ্বেদযুতা মধ্যে যজুর্ব্বেদময়ী ও সায়াহ্নে সামবেদ সমাযুতা। ঋগ্বেদ মতেও তাই। গায়ত্রী দেবতাটি না পুরুষ না স্ত্রী। ইনি স্ত্রীও বটেন এবং পুরুষও বটেন। ইনি সর্ব্ববর্ণময়ী আবার সর্ব্ববর্ণের অভাবময়ীও বটেন। ইনি নপুংসকরূপী তাহা বলিয়া ক্লীবার্থ বাচক নহেন। ইনি সর্ব্বশক্তির আধার। তাই গায়ত্রীর আরাধনা

পুংদেবতার মত করিবার ব্যবস্থা আছে। সন্ধ্যার সাধক এবম্বিধ গায়ত্রী দেবতাকে যে রূপে ইচ্ছা ধ্যান করিতে পারেন। যথা গৃহ্য পরিশিষ্টে—

"তাং সর্ব্বদেব স্বরূপাং ধ্যায়েৎ অনুসন্ধ্যামন্যান্যরূপাং বা যদেক রূপাং ঋগ্‌ যজুঃ সাম ত্রিপদাং তির্য্যগূর্দ্ধ্বা ধো দিক্ষু ষট্‌কুক্ষিং পঞ্চশিরসমগ্নিমুখীং বিষ্ণুহৃদয়াং ব্রহ্মশিরস্কাং রুদ্রশিখাং দণ্ড কমণ্ডলু-অক্ষসূত্রাভয়াঙ্ক চতুর্ভূজাং শুভ্রবর্ণাং শুভ্রাম্বরানুলেপস্রগাভরণাং শরচ্চন্দ্র সহস্র প্রভাং সর্ব্বদেবময়ীং ইমাং দেবীং গায়ত্রীমেকামেব তিস্যৃ সন্ধ্যাসু ধ্যায়েৎ।" অর্থাৎ সেই গায়ত্রীকে তিন সন্ধ্যায় একই ভাবে চিন্তা করিতে পারা যায়।

সাধক প্রাতে কুমারী বা বালিকার অর্থাৎ রজোগুণাত্মক ব্রহ্মের চিন্তা করেন; মধ্যে যুবতীর বা সত্বগুণাত্মক পরমার্থের ধ্যান করেন এবং সায়াহ্নে বৃদ্ধার বা তমোগুণাত্মক লয়মূর্ত্তির ধ্যান করেন। ঋক্ বলিলে বেদের সম্পূর্ণ মন্ত্রাংশকেই বুঝায়। সৃষ্টির আদিতে সমগ্র বেদ মন্ত্রই উদ্ভূত হয় "সসর্জ্জ বীজং" অর্থাৎ বেদ তখন বীজরূপে ছড়ান ছিল; তাই কুমারী ঋগ্বেদযুতা অর্থাৎ বেদ ও গায়ত্রী ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ক্রমে বিবর্ত্তবশে অঙ্কুর শ্রীবৃদ্ধি পায় ও তাহার পূর্ণ বিকাশ হয়। আবার পাদ ও ছন্দঃ জ্ঞানের উদয়ে ঋক্ বা মন্ত্রগুলি ক্রমে বিশেষত্ব লাভ করে। তাই সাধক মধ্যাহ্নে পাদও ছন্দময়ী যজুর্ব্বেদ রূপী যুবতীর ধ্যান করেন। ক্রমে অবসাদ বা লয়ের দিকে গমনোন্মুখ হইয়া সাধক পাদ ও ছন্দোময়ী মন্ত্রের যে অংশ কেবল গান করা যায় সেই সামবেদ সমাযুতা তমোগুণময়ী মহেশ্বরীর ভাবনায় আত্মস্থ হয়েন। বাল্য ও যৌবন কালে বিবর্ত্তে ঘুরিয়া ফিরিয়া সাধক জীবনের অন্তকালে সাধনলব্ধ মধুপানে বিভোর হইয়া বলেন:—

"ঋগ্‌ভি স্তবন্তি, যজুর্ভির্যজন্তি সামভির্গায়ন্তি।"

আগে ঋক্ অর্থাৎ সমগ্র বেদমন্ত্র তারপর যজু বা মন্ত্রের পাদ ও ছন্দাদি স্থির তারপর গানের মত মন্ত্র বাছা বা সাম। আগে কর্ম্মারম্ভ বা রজঃ, তারপর কর্ম্মের পূর্ণতা বা সত্ব তারপর কর্ম্ম নিবেদন-লয় বা তম। আগে বোধন, তারপর পূজা তারপর সাক্ষাতে স্তব। আগে চাউল তার পর চোয়ান তার পর সেবনার্থ মদ্য। আগে বৃক্ষ তার পর পুষ্প চয়ন তার পর পানার্থ মধু। আগে ব্রহ্মচর্য্য বা কুমারীর মত সর্ব্ববীজধারণসামর্থ্য তার পর গার্হস্থ্য বা সৃষ্টির পালন তার পর বানপ্রস্থ বা সৃষ্টির সংহরণ। আগে বাল্য তার পর যৌবন তবে বৃদ্ধত্ব। আগে বিদ্যা সঞ্চয় তার পর লাফালাফি করিয়া চাকুরী তার পর পেনসন্। আগে প্রভুর নিকট কার্ড পাঠাবার চেষ্টা তার পর কার্ডটি প্রভুর হাতে পৌছান তার পর প্রভুর দর্শন ও সেলাম। আগে মূল্য তার পর বোতল তার পর সেবন। বাহিরে বসিয়া প্রভুকে সেলাম করায় ফল হয় না, বোতল না আনিলে সেবন হয় না। বোধন না করে পূজা হয় না। কাজেই আগে পরমার্থ বস্তুটি দেখা চাই তবে তাকে সেলাম বা স্তুতি করা যায় অন্যথা মনে মনে সন্দেশ খাওয়া মাত্র।

আবাহন

গায়ত্রী দেবতার ধ্যান করিয়া সাধক তার পর তাহার আবাহন করেন।

মন্ত্র—ওঁ আয়াতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রহ্ম সম্মিতং। গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতা ইদং ব্রহ্ম জুষস্ব নঃ।

ওঁ ওজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধাম নামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুঃ অভিভূরোঁ। গায়ত্রীমাবাহয়ামি।

অর্থ—আমাদের অভীষ্ট বরপ্রদা গায়ত্রী বিনাশ রহিত ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানদানার্থ আমাদের নিকট আগমন করুন। বেদমাতা আমাদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিউন। গায়ত্রী, তুমিই ওজ তুমিই শক্ত বা বিষয় জয়ের শক্তি, তুমিই কর্ম্ম নির্ব্বাহক বল, তুমিই তেজ বা দীপ্তি, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার সার যে তেজ তাহাই তুমি, তুমিই বিশ্ব, তুমিই এই বিশ্বের আয়ু, তুমিই সব, তুমিই সকলের মূল এবং তুমিই সর্ব্ব পাপহন্ত্রী ও পরমার্থ স্বরূপা। তোমাকে ডাকিতেছি। আইস। কি মহানের আবাহন! কি প্রার্থনা! যাহা কিছু বলা যাইতে পারে তাহার সমস্তই এই কয়টি কথায় বোধ হয় বলা হইয়াছে। ধ্যান করিলেই দেবতার দর্শন লাভ হয় না এ—কথা বোধ হয় এই আবাহনে পরিস্ফুট। ধ্যানেই যদি দেবতা পাওয়া যাইত তবে আবাহনের দরকার হইত না। ইষ্টলাভের জন্য ধ্যানের উপর আরও কিছু আছে। সন্ধ্যার সাধক তাই কিছু মুস্কিলে পড়িয়া থাকেন। তিনি দেখেন :গায়ত্রী মন্দিরের দরজা ধ্যানে খোলা যায় না। সে দরজায় কীলক বা খিল লাগান রহিয়াছে। সে খিল বা অভিশাপ মোচন জন্য সাধক প্রবৃত্ত হইতেছেন।

শাপোদ্ধার

ওঁ অস্য গায়ত্রী শাপ বিমোচন মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষি গায়ত্রী ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মশাপ বিমোচনে বিনিয়োগ ঃ—

ওঁ যদ্ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্তাং পশ্যন্তি ধীরাঃ।
সুমনসো বা গায়ত্রী ত্বং ব্রহ্মশাপাৎ বিমুক্তা ভব।

ওঁ বশিষ্ঠ শাপ বিমোচন মন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষি বশিষ্ঠ দেবতা বশিষ্ঠ শাপ বিমোচনে বিনিয়োগ ঃ—

ওঁ অর্ক জ্যোতিরহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতি রহং শিবঃ।
শিব জ্যোতিরহং বিষ্ণু বিষ্ণুজ্যোতি শিব পরং॥
গায়ত্রীত্বং বশিষ্ঠশাপাৎ বিমুক্তাভবঃ।

ওঁ বিশ্বামিত্র শাপ বিমোচন মন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র ঋষিরাত্মা দেবতা বিশ্বামিত্র শাপ বিমোচনে বিনিযোগঃ ঃ—

ওঁ অহো দেবি মহাদেবি দিব্যে সন্ধ্যে সরস্বতি।
অজরে অমরে চৈব ব্রহ্মযোনি নামোঽস্তুতে।
গায়ত্রীত্বং বিশ্বামিত্র শাপাৎ বিমুক্তা ভব।

বশিষ্ঠ শাপ উদ্ধারের পাঠান্তর আছে। যথা—

'ওঁ সোঽহং অর্কময়' জ্যোতিঃ'
অর্ক জ্যোতি অহং শিবঃ
শিবঃজ্যোতিঃ অহং শুক্রঃ
শুক্র জ্যোতিঃ রসোঽস্ম্যহং' ।

অর্থ—ব্রহ্মশাপ বিমোচন মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্ম, ছন্দঃ, গায়ত্রী, দেবতা বরুণ। **গায়ত্রীর ব্রহ্ম-শাপ** বিমোচনে ইহার প্রয়োগ হয়। ব্রহ্মবিদ্‌গণ পণ্ডিত, ধীর ও শোভন মনস্ক জনগণ তোমাকে ব্রহ্মরূপিণী বলিয়া জ্ঞাত আছেন। তুমি ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হও।

বশিষ্ঠ শাপ বিমোচন মন্ত্রের ঋষি বশিষ্ঠ, (অনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ), দেবতা বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ শাপ বিমোচনে ইহার প্রয়োগ।

অর্থ—সূর্য্যের জ্যোতির জ্যোতি আমি ব্রহ্মা। ব্রহ্মার জ্যোতির জ্যোতি আমি শিব। শিবের জ্যোতির জ্যোতি আমি বিষ্ণু। বিষ্ণুর জ্যোতির জ্যোতি আমি পরম শিব। (পাঠান্তরের অর্থ)—

আমি সূর্য্যের জ্যোতি। সূর্য্য জ্যোতির জ্যোতি আমি শিব। শিবের জ্যোতির জ্যোতি আমি শুক্র বা শ্বেতবর্ণ শম্ভু। শুক্র জ্যোতির জ্যোতি আমি রসময়।

বিশ্বামিত্র শাপ বিমোচন মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দ অনুষ্টুপ, দেবতা আত্মা। বিশ্বামিত্র শাপ বিমোচনে ইহার প্রয়োগ।

অর্থ

হে মহাদেবি! হে সন্ধ্যে! হে সরস্বতি! তুমি অজর অমর তুমি ব্রহ্মযোনি তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশ্বামিত্র শাপ হইতে বিমুক্ত হও। এই শাপোদ্ধারের কথা বৈদিক সন্ধ্যা মন্ত্রের মধ্যে উল্লেখ নাই। ইহা তান্ত্রিক উপাসনার অঙ্গ। পরে এ বিষয় আলোচনা হইবে। শাপ প্রতিবন্ধক। একটি দেব মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে অনেক প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইতে হয়। যথা পবিত্র হওয়া চাই, উপবাসী থাকা চাই, নগ্নপদ হওয়া চাই। তার পর মন্দিরের দ্বার রক্ষকের কৃপা চাই। অর্থাৎ এই শাপোদ্ধারের রহস্যই হইতেছে অধিকারী হওয়া। কি অবস্থায় গিয়া পৌছাইলে কিরূপ মানসিক বল লইয়া গেলে এবং কাহার সাহায্য পাইলে তবে গায়ত্রীর নিকট যাওয়া যায় তাহাই এই শাপোদ্ধারে ব্যক্ত হইয়াছে।

তুরীয়, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও ব্রহ্মা ব্রহ্মের এই চারি বিভাগ। স্বায়ম্ভুব মনু ইহার পর পর্য্যায়। এই মনু হইতেই মরীচি, অত্রি, আঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশ মানস পুত্র। ইহাদের মধ্যে ভৃগু বশিষ্ঠ প্রভৃতি নয়টিকে ব্রহ্মা বলা হয়।

ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা।
মরীচিং দক্ষ মত্রিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্॥

আদৌ ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া বেদ প্রাপ্ত হয়েন। **গায়ত্রীর** সাধক তাই সেই ব্রহ্মার আশ্রয় করিয়া গায়ত্রী মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকারত্ব প্রার্থনা করিতেছেন। তারপর পর্য্যায় বশিষ্ঠদেবের কৃপা ভিক্ষা করিয়া অধিকারিত্ব যাচ্ঞা করিতেছেন। এই দুই পর্য্যায়ে মানস ক্ষেত্র তাহার পর যোনিজ মানব (মনুর অপত্য) বিশ্বামিত্রের কৃপা চাহিতেছেন। সাধক মানব কাজেই বিশ্বামিত্রকে ছাড়িয়া মানস ক্ষেত্রে যাইতে অক্ষম জ্ঞান করিতেছেন।

এখন একবার সেই "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" ঋক্ মন্ত্রটি দেখা যাক। সেই পরম কারণসমুদ্র হইতে প্রথমে ধাতা বা ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছিল। তাই ব্রহ্মশাপের দেবতা বরুণ। ব্রহ্মশাপ বিমোচনে তাই বরুণের স্মরণ। বরুণ কারণার্ণবের অধিদৈবত। সুমনস বা সুশোভন মনস্ক ও ধীর গণই ব্রহ্মের উপলব্ধি করেন, অন্যে পারে না।

বশিষ্ঠ শাপের বশিষ্ঠই ঋষি। তিনি নিজেই নব ব্রহ্মের এক মূর্ত্তি বিশেষ। তাই তিনি বলিয়াছেন আমিই সূর্য্য জ্যোতির জ্যোতি ব্রহ্মা। আমিই ব্রহ্ম জ্যোতির জ্যোতি শিব। আমিই শিব জ্যোতির জ্যোতি বিষ্ণু। আমিই বিষ্ণু জ্যোতির জ্যোতি পরং শিব। পাঠান্তর মতে শিবজ্যোতির জ্যোতি আমি শুক্র এবং শুক্র জ্যোতির জ্যোতি আমি রসময়। সন্ধ্যার সাধকের নিকট দুই পাঠের অর্থই এক বস্তুকে লক্ষিত করে। সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের উপর যে পদ বা স্থান তাই গায়ত্রী মন্ত্রের অভিধেয় বস্তু। সেটি ত্রিদেবের একত্ব। তথায় দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বাভাবে "শিব" বড় বা "বিষ্ণু" বড এরূপ চিন্তার অভাব। পরন্তু সন্ধ্যার সাধক মাত্রেই পরম শিবের উপাসক। তাই ব্রাহ্মণ নিত্য শৈব। শিব লিঙ্গটি তাই ব্রাহ্মণের এত আদরের। এই শিব লিঙ্গই ব্রাহ্মণের আদি প্রতীক এবং ইদানীন্তন কালে "রিসার্চ্চ" বিদ্গণও বলেন যে এই শিবলিঙ্গ পূজা আদৌ পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। শিবলিঙ্গই ওঁকার। "ওমিত্যেক্ষরং পরমাত্মানোঽভিধানং নেদিষ্টং তস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি।" বিশ্বামিত্র শাপ মন্ত্রের বিশ্বামিত্রই ঋষি কিন্তু দেবতাটি আত্মা। বিশ্বামিত্র যোনিজ মানুষ তাই সৃষ্টির মূল শক্তিকে ধরিয়াছিলেন। তিনি কঠোর সাধনা দ্বারা তবে গায়ত্রীর দর্শন পান। গায়ত্রীই ব্রহ্মযোনি ইহা উপলব্ধি করেন। সন্ধ্যার সাধক আগে মানুষকে উপাসনা করেন, পরে অযোনিজ ব্রাহ্মণের উপাসনা করেন তারপরে ব্রহ্মার উপাসনা করেন। তারপর এই তিনের সার্টিফিকেট দেখাইয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন ও গায়ত্রীকে দর্শন করেন।

গায়ত্রী মন্ত্র

ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধী মহি ধীয়োযো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

অর্থ

যিনি সকল ভূতকে প্রসব করেন, যিনি সকল ভাবকে উদ্ভব করেন, যিনি ভূত সকল ও ভাব সকলকে পবিত্র করেন এমন যে সবিতা, যিনি দেবতা অর্থাৎ দীপ্তি ক্রীড়াদি যুক্ত পদার্থ, যিনি ভর্গ অর্থাৎ যিনি ভাজিয়া নিজ স্বরূপে লইয়া যান এমন যে বস্তু, যিনি আমাদের ধীশক্তিকে পরিচালনা করেন আমি তাঁহার ধ্যান করি। ইনি ওঁ অর্থাৎ প্রণবের অভিধেয় পরমার্থ।

সন্ধ্যার সাধক এই মন্ত্র সাধ্যানুসারে জপ করেন। জপের প্রক্রিয়া এই যে অভিধেয় বস্তুতে ও জপের মন্ত্রে কোন পার্থক্য থাকিবে না। মন্ত্র ও দেবতাকে এক করিয়া জপ করিতে হয়। অন্যথা জপ অসিদ্ধ। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া গায়ত্রী দর্শন লাভে তাঁহাতে ও মন্ত্রে ভেদ থাকে না। রামকে সম্মুখে পাইয়া আর রাম নাম করিয়া ডাকিতে হয় না। রাম সম্মুখে, রামকে সম্পূর্ণ ভাবে দেখা যায় কাজেই নামে ও রামের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না।

জপের সংখ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ আছে। এ স্থানে সংক্ষেপতঃ দু'একটি বিধি উদ্ধৃত করিতেছি।

আশ্বলায়ন বলিয়াছেন :—

"জপেৎ প্রণব পূর্ব্বাভির্ব্যাহৃতিভিঃ সংহিবতু
তিসৃভির্ভূঃ প্রভৃতিভি গায়ত্রীং ব্রহ্মরূপিণীং।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ শতমষ্টোত্তরং জপেৎ।
কালত্রয়েঽপ্যশক্তশ্চেদষ্টাবিংশতিমেব বা।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

ওঁ কারং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ভূর্ভুবস্বঃ স্তথৈবচ।
গায়ত্রী প্রণবশ্চান্তে জপোহেয় উদাহৃতঃ।

শৌনক বলিয়াছেন :—

অষ্টোত্তর শতং নিত্যং অষ্টাবিংশতিমেবচ
বিধানাৎ দশকং বাপি ত্রিকালেষু জপেদ্ দ্বিজঃ
কৃত্বোত্তানকরৌ প্রাতঃ সায়ঞ্চাধোমুখৌ ততঃ
মধ্যে তির্যক্ করো প্রোক্তৌ জপ এব উদাহৃতঃ।

এই প্রমাণ গুলির সংস্কৃত সরল সুতরাং অর্থ সহজবোধ্য।

বিধিযজ্ঞ হইতে জপ-যজ্ঞ দশগুণ শ্রেষ্ঠ। উপাংশু জপ আবার শতগুণ শ্রেষ্ঠ! মানসজপ আবার সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ। আবার সংখ্যা হিসাবে দশবার জপকে অবর বা অধম, শতবার জপকে মধ্যম এবং সহস্রবার জপকে পরম বা শ্রেষ্ঠ জপ বলে। আর দশ সহস্রবার জপ করিলে সর্ব্ব পাপ খণ্ডিত হয়। যত বার জপ হইবে গায়ত্রীর-সান্নিধ্যও সেই পরিমাণে অগ্রসর হইবে ইহা মানস বিজ্ঞানসম্মত।

জপান্তে সাধক—জপ-ফল গায়ত্রীতেই অর্পণ করিয়া ব্যষ্টি হইতে পুনরায় সমষ্টিতে প্রত্যাগমন করেন। জপে নিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে গায়ত্রী কবচ বা দেহরক্ষার মন্ত্র পাঠ করার ব্যবস্থা আছে। সে কবচ-মন্ত্র বৈদিক সন্ধ্যা মন্ত্রের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয় নাই। সন্ধ্যার সাধক ইচ্ছা করিলে তাহা আচার্য্য বা শাস্ত্র মুখে দেখিতে পারেন।

আত্মরক্ষা ও শান্তি

মন্ত্র—কাশ্যপ ঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ জাতবেদসে সুনুবাম (সুনবাম) সোম মরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ স নঃ পরিষদতি দুর্গাণি বিশ্বানাবেব সিন্ধুং দুরত্যাগ্নিঃ।

তচ্ছং যো রা ইত্যস্য শংযু ঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতা শক্করীচ্ছন্দঃ নমো ব্রহ্মণে ইত্যস্য প্রজাপতিঋষি বিশ্বেদেবা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ শান্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তচ্ছং যো রা বৃণীমহে।
ওঁ নমো ব্রহ্মণে নমো অস্ত্বগ্নয়ে।

অর্থ—এই মন্ত্রের ঋষি কাশ্যপ, ছন্দ ত্রিষ্টুপ্, দেবতা অগ্নি আত্মরক্ষায় ইহার প্রয়োগ হয়।

আমরা অগ্নির নিমিত্ত সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। অগ্নি আমাদের অনিষ্টকারীদের ভস্ম করেন। নৌকা দ্বারা যেরূপ নদী উত্তীর্ণ হওয়া যায় এই বিশ্বজীবগণ ঠিক সেইরূপ অগ্নির সাহায্যে সমস্ত দুঃখের পারে যাইতে সমর্থ হয়।

তচ্ছং মন্ত্রের ঋষি—শংযু, দেবতা বিশ্বেদেবা, ছন্দ শক্করী নমো ব্রহ্মণে মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি দেবতা বিশ্বেদেবা, ছন্দ জগতী। শান্তির জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

সেই প্রসিদ্ধ মঙ্গল নিদানকে আমরা বরণ করিতেছি। ব্রহ্মে আত্ম-সমর্পণ করিতেছি। ব্রহ্মরূপী অগ্নিতে আত্ম-সমর্পন করিতেছি। সাধক সবটিতে পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়া অর্থাৎ বিশ্বের সবটি হাতে লইয়া গায়ত্রীকে দান করিয়া সমষ্টিতে ফিরিতেছেন। আগুন বা তেজটি সকলের মূল দেখিয়াছেন তাই অগ্নির শরণাপন্ন হইতেছেন। আগুন সকলকে তদাকারে পরিণত করিয়া বিশ্বকে বিশ্বপতির কাছে লইয়া যায় তাহা স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে। সেই মঙ্গল নিদান অগ্নিকে (পার্থিব) এখন তিনি বরণ করিতেছেন। তিনিই ব্রহ্ম কাজেই তাঁহাতে সমষ্টিকর্ম্মের আহুতি দিতেছেন। আগুনে সকল বস্তু অর্পণ করিতেছেন। পার্থিব অগ্নির আধার সমষ্টি সূর্য্য, সাধক তাই সূর্য্যের উপাসনা করিয়া তাঁহাতে অর্ঘ দিতেছেন। এখানে সন্ধ্যা-সাধনা শেষ। তারপর সাধক বেদপাঠে নিরত হইতেছেন।

এই ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাতে বিস্তৃত ভাবে যাহা আছে তাহাই সংক্ষেপত সাম ও যজুতে আছে। বিশেষ পার্থক্য খুব কম। সামের সূর্য্যোপস্থানে প্রথম দুটি মাত্র ঋক্ উচ্চারিত হয় এবং তিন সন্ধ্যাতেই একই প্রকার উপস্থান। যজুতে তিনটি ঋক্ বলা হয়। তার মধ্যে তৃতীয়টি ঠিক্ ঋগ্বেদের মত নহে তবে অর্থ প্রায় এক। সামবেদীয় সাধক আত্মরক্ষার পর রুদ্রোপস্থান আচরণ করেন।

সন্ধ্যার সাধন পথ—অন্য সকল প্রকার সাধন পথকে নিজের অঙ্গে ধারণ করেন। একটু চিন্তা করিলেই এই তথ্যের উপলব্ধি হইবে সন্দেহ নাই। সন্ধ্যা-সাধনার সম্পূর্ণ আকার দর্শন করা আমার মত মূর্খের ও সাধনহীনের সাধ্যের অতীত। অথবা ইহাও সত্য কথা যে অংশ দর্শনই মানুষের সম্বল। সর্ব্ব-তত্ত্বজ্ঞান মানুষে সম্ভব নহে। এই অংশ দর্শনেরও আবার উত্তম অধমাদি ভেদ আছে। আমি অধম আমার কৃতকার্য্যতার আশা করাই বাতুলতা। যাহা অকৃতকার্য্যতা তাহা আমার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—তবে আমার এই ক্ষীণ চেষ্টা উত্তম অংশ-দর্শী মহাত্মাগণের মনে আর্য-সাধন-পথের প্রচারকল্পে যদি প্রচোদনা আনিয়া দেয়—তবে ভাবিব আমার কর্ম্মচেষ্টা অনন্ত কার্য্যমূলে স্পর্শ করিয়াছে।

হে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ! আপনারা ত্রিজাতিই সন্ধ্যার অধিকারী। আপনারা নিজ পৈতৃক সম্পত্তির পুরাতন দলিল দস্তাবেজগুলি নাড়িয়া নিজ ধনে অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন। বঙ্গবাসীর বড় দুর্ভাগ্য কেন না বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া জাতি নাই; ইহাই প্রচলিত সমাজ নীতি বলিয়া দিতেছে। বঙ্গেও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ছিলেন। নতুবা ব্রাহ্মণ থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণকে রক্ষা ও প্রতিপালন করিতে আরও দুই জাতির প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। বঙ্গ সন্তান! স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্বং" এই অপব্যাখ্যার এবং তাঁহার নব্যস্মৃতির প্রভাবেই বাঙ্গলা সমাজের এই দুর্ভাগ্য। পল্লীগ্রামে যেখানে যান দেখিবেন যথায় ব্রাহ্মণ পরিবার তথায়

ব্রাহ্মণেতর অপর উচ্চ জাতিদিগের সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন। এখনও অনেক স্থান আছে যেখানে প্রকৃত ব্রাহ্মণ যাঁহারা তাঁহাদিগকে যদি কায়স্থ প্রমুখ ভূম্যাধিকারী বা সমাজ নেতৃগণ ছেড়ে দেন তবে তাঁহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠিবে। আধুনিক প্রভাবে সে সমাজ-বন্ধন অবশ্যই দিন দিন ক্ষিণ্ন হইতেছে বটে! তাহাও দেশের দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কিছু নয়।

যদি সবাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইল তবে ব্রাহ্মণত্ব থাকে কি নিয়ে? ব্রাহ্মণ কাকে যজন করিবেন—কার অধ্যাপনা করিবেন! সেরূপ হইলে ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব পাইয়াছেন।

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেণ চ সহাসনং।
শূদ্রাজ্ জ্ঞানাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্ত—মপি পাতয়েৎ।
(অঙ্গিরা, আপস্তম্ব, পরাশর)

তথাহি—শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন যো দ্বিজোজনয়েৎ সুতান্।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা অন্নাচ্ছুক্রঃ প্রবর্ত্ততে।
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবা—হরেৎ পশুঃ (মানুষ)॥
ন শূদ্র দর্শনং কুর্য্যাৎ মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ॥

এ সকল শাস্ত্র বাক্য স্মরণ রাখিয়া বঙ্গবাসী কে বলিতে পারেন যে সকল শূদ্রের মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণ! রঘুনন্দনের ব্যবস্থা সম সময়ে কতক ফলিয়াছিল। পাণ্ডিত্যের প্রতিভায় অপর সকলে ব্রাত্য জাতিতে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যদেব বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও কায়স্থকে গুরু করিয়াছিলেন; যবনকে ব্রাহ্মণ পদবী দিয়াছিলেন—সমাজের ক্ষণস্থায়ী বন্ধন ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। রঘুনন্দনের ব্যবস্থা তাৎকালিক রোগের অমোঘ ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সে ঔষধ তখন কার্য্যকারী হইয়াছিল। তিনি তাৎকালিক সংস্কারক ছিলেন—সার্ব্বকালিক দৃষ্টিসম্পন্ন ঋষি ছিলেন না। কাজেই চৈতন্যদেব সম সময়েই রঘুনন্দনের বন্ধনকেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। সেরূপ শক্তি সম্পন্ন পুরুষও আর ৪০০ বৎসর বঙ্গে জন্মেন নাই। চারিশত বৎসরে ব্যাধি বহুরূপে জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সমাজ কিন্তু আজ অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে।—ঘোর বিপ্লবের মুখে চূরমার করিয়া সকল দিক ভাঙ্গিয়া প'ড়িতেছে। সকল জাতিই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইতেছে। কেহ কেহ ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেছেন—কেহ বা সকল জাতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া উন্নীত (?) করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন! কিন্তু এ উন্নতি-ব্যবস্থার মূলে কোন উচ্চ নীতি বা আদর্শ নাই—আছে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ও ধ্বংসের চেষ্টা থাকে। জগতে কোন জিনিষ পশ্চাতে ফিরিয়া যায় না সত্য। সকল গন্তব্যই এক মহা লক্ষ্য পথে। আবার এখন আর কটি আর্য্য সন্তান লইয়াও ভারত নাই। ভারতে এখন অনেক প্রকারের মানুষের সম্মিলন হইয়াছে। যদি মহান পৃথিবীব্যাপী এই সম্মিলনের ফলে আমাদের অস্তিত্বের বিলুপ্তি না করিয়া সুসংস্কৃত নবমূর্ত্তি ধারণ করিতে প্রবল ইচ্ছা হয় তবে ভারতের আচার, শিক্ষা ও ধর্ম্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ তাহার মৌলিক সত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নবাগত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য ও নূতন পদার্থের যথাযোগ্য সন্নিবেশের দরকার হইয়াছে। তাহাতে উহা দীপ্তভাবে প্রকাশিত হইবে। জাতীয়তা ফিরিয়া পাইতে হইবে, অবশ্য সুসংস্কৃত ভাবে। নচেৎ এই বিপ্লব মুখে ছুটিলে, বা ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্রেক মাত্রে সর্বত্যাগী বিরাগীর চূড়ামণি সাজিলে বা ঘেটু মনসা পূজায় মাত্র লইয়া থাকিলে অথবা বৈজ্ঞানিক বা

ফিলজফার হইয়া নাস্তিক বনিলে! আমাদের অস্তিত্ব নষ্ট হইবে—এবং সেই ধ্বংসের ভস্মে আমাদের বলিয়া আর কিছু থাকিবে না। ভারতের আর্যধারা পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অব্যাহত ভাবে চলিয়া নাই। তাহা বলিয়া ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিলে আর্য্য সন্তানের চলিতে পারে না। ব্রাহ্মণের সেই প্রাণের প্রাণ স্বার্থত্যাগও সত্য; ক্ষত্রিয়ের বাক্য পালন ও রক্ষণে সামর্থ; বৈশ্যের অর্থোপায়; শূদ্রের সেবা ঋষি-নির্দ্দিষ্ট এই আদর্শ চিরকাল অনুকরনীয় থাকিবেই। সমাজ রক্ষার নিমিত্ত এখন ত্রিজাতির প্রতিষ্ঠা দেওয়া চাই—তবে সন্ধ্যার এই বিশ্বব্যাপী সাধনের ফল লোকে বুঝিতে পারিবে। ব্রাহ্মণকে স্বরূপে দেখিতে পাইবে—তখন ব্রাহ্মণ আর টিকি দেখাইয়া বা সংস্কৃত বচন পাঠ করিয়া বিদায়টির জন্য শূদ্র বা ম্লেচ্ছে দ্বারে যোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্ধ্যার উদ্দীপ্ত বলে ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইবে। সমাজের রত্নগুলি আর নানা রূপ বুজরুকী ও কাপট্যের অত্যাচারে পৈতৃক সাধন-পথ—যাহার তুলনা আজও কোনও সমাজে হয় নাই তাহা—ছাড়িয়া কর্ম্মহীন জড়পিণ্ডের নিকট গিয়া সন্ধ্যার অংশ বিশেষের বা অংশের ক্ষুদ্রাংশ বিষয়ের উপদেশ লাভের জন্য মস্তক অবনত করিবে না। ব্রাহ্মণকেও আর পঁচা শিল্পের মাল লইয়া দোকানদারী করিতে হইবে না। রাধুনীর কাজ এক চেটিয়া হইয়াছে, প্রকারান্তরে ব্রাত্য জাতিদের পদসেবন করা হইতেছে। স্বয়ং ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াই অতি দুঃখের সহিত এ সকল কথা বলিতেছি।

এক্ষণে প্রহ্লাদের সেই দৈত্য পুত্রদিগের প্রতি উপদেশটি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিবঃ—

"সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেতা
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।"

আর সন্ধ্যাসিদ্ধের প্রাণের অন্তস্থলে যে বেদমন্ত্র অবিরাম প্রতিধ্বনিত হয় তাহাই স্মরণ করিতেছি:—

"মহো অর্ণঃ সরস্বতী
প্রচেতয়তি কেতুনা
ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি।"

সন্ধ্যার এই স্বপ্রকাশ বিশ্বব্যাপী জ্যোতিঃ আমাদের সঙ্কটকালের পথ-প্রদর্শক হউন্।—ইতি ভার্গব-কথিত।

সাধনা-মূলক সংগঠন—অভিভাষণ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি সংশোধনার্থে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু চেষ্টা হইয়াছে, তাহার সমুদয়ই এমন লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত যাহারা সকলেই রাজনীতির সহিত সম্পর্কিত নহেন—অন্ততঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহেন। বিংশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে রাজনীতি-ক্ষেত্রের বাহিরেরই কতিপয় মনস্বী প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়া ভারতীয় সাধনার মৌলিক ভিত্তিতে বর্ত্তমান সময়ের অনুকূল আধুনিক বিজ্ঞানাদির পাঠবিধিসহ বিদ্যালয়, আশ্রম প্রভৃতি স্থাপনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন (এ শিক্ষার মূল লক্ষ্য সরল জীবন যাপন ও উচ্চ চিন্তা শক্তির সংবর্দ্ধন)। এই ভাবেই গুরুকুল-কাংগ্রী, বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন, রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, দেওঘর, কাশী প্রভৃতি স্থানের বিদ্যাপীঠ সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতাতে 'ভারতীয় সাধনা-মূলক শিক্ষা পরিষদ্' নামে একটী সভা ভারতের সাধনা মূলে এ দেশের শিক্ষা প্রসার কল্পে স্থাপিত হইয়াছে ; 'ভারতের সাধনা' নামে তাহার মুখপত্র স্বরূপে এক খানি অতি সুন্দর মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। আমার এখন প্রস্তাব এই যে এই সমিতিকে আরও প্রসারিত করিয়া সমগ্র ভারতের জন্য সংস্থাপিত করা হউক্, যেন তাহাতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের এইরূপ ভাবের কর্ম্মীগণ এক সঙ্গে মিলিত ও পরস্পর ভাবের আদান প্রদান করিতে পারে—এ দেশের সাধনার অনুকূল দেশবাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে, সামাজিক সংস্কার বিধান এবং শিল্প-কলাদির উন্নতি সাধন করিতে পারে।

আমাদের দেশীয় সাধনা-গত স্বরাজ এখন অনেকটা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও একবারে বিলুপ্ত হয় নাই—বিশেষ করিয়া দেখা যায় যে, বর্ত্তমান সভ্যতার বিষময় প্রভাব হইতে যাহারা দূরে থাকিতে পারিয়াছে তাহাদের মধ্যে উহা এখনও বিদ্যমান। এক্ষণে সেই স্বরাজকে পুনঃ উদ্‌যাপিত করিয়া লইতে হইবে—এই জন্য সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক ভারতের সাধনার ভাবকে জাগ্রত করিয়া তোলা। আর প্রয়োজন পাশ্চাত্যের সভ্যতার পথ হইতে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়া থাকা। আমাদের নব্য মতের দেশবাসীগণের অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন—তাই কি বাঞ্ছনীয়? তাহারা ইহা চান না যে, (পাশ্চাত্যের লোকেরা পাছে মনে করিয়া থাকে) আমরা বর্ব্বর (?) হইয়া থাকি—যদি আমরা পাশ্চাত্যের পথের অনুগমন না করি, তবে তাঁহারা যে আমাদিগকে নিঃসহায়, সংস্কারের অযোগ্য, অসভ্য এবং কোনও রূপ উন্নতি করিতে অক্ষম বলিয়া মনে করে! কেহ কেহ হয়ত নিঃসঙ্কোচে বলিবেন—পশ্চিমের আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিয়া, এবং উচ্চকণ্ঠে তাহা বলিয়া গৌরব বোধ করিয়া, এমন কি খোসামোদ করিয়া, যখন যেমন তখন তেমন,—দুই রকম কথা বলিয়া ও দুইদিক রাখিয়া চলিলে, কাকুতি মিনতি ও দৃঢ় শপথাদি করিলে মাত্র আমরা আমাদের ভূ-বিধাতা ব্রিটিশ রাজসরকারের মন ভিজাইতে পারি! যদি তাহাদের বিচারে না টিকি, তবে মধ্যে মধ্যে যে অনুগ্রহ তাহারা দেখান, তাহা হইতেও যে বঞ্চিত হইতে হইবে! আমার উত্তর এই :—যে অনুগ্রহের কথা ইহারা বলে তার প্রকৃতি ভ্রান্তি বা মোহময় ; তা ছাড়া দীন, ক্ষীণ ও পীড়িত অবস্থায় থাকিয়া সভ্য ও উন্নতিশীল বলিয়া প্রশংসা লাভ করা অপেক্ষা কি সুস্থ ও সুখী থাকিয়া বর্ব্বর বা অনুন্নত বলিয়া

নিন্দিত হওয়া ভাল নয়? মনুষ্যত্বই বড় জিনিষ। আত্ম মর্য্যাদাবোধ, সৎকর্ম্মণ্যতা ও আত্মনির্ভরতা তার লক্ষণ। পরিণামে তাহাতে যে কল্যাণ বিধান হয়, হীন আনুগত্য, প্যান্ প্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ ভাব, ভিক্ষা বা রুক্ষব্যবহার পাইয়া তাহা অবশ্যই হইতে পারে না। আবার নব্য ভারতের 'বিপ্লব' পন্থী সংস্কারকগণের কেহ কেহ হয়ত এই বলিয়া নাক সিট্‌কাইবেন যে, প্রাচীন ভারতের জীবন-পদ্ধতি ত আদিম-জনোচিত, অঙ্কুরে অবস্থিত, নিতান্ত চাষাড়ে, ক্রমোন্নতিবাদের বিরোধী। সত্য কথা। কিন্তু এই যে, ইহারা ক্রমোন্নতিবাদ দ্বারা 'সরল' হইতে জটিলতা, সমজাতিকত্ব হইতে বিভিন্ন জাতিকত্বের ক্রম বিকাশ বুঝিয়া থাকেন, তাহা জাগতিক স্থিতিতে কতক দূর পর্য্যন্ত মাত্র মঙ্গল-দায়ক হইয়া থাকে ও চলে মাত্র; সে সীমা জড় জগতের অবস্থা ও লোকের আর্থিক ও নৈতিক অব-স্থার উপর নির্ভর করে। চিরন্তন কাল ধরিয়া অগ্রসর হওয়াই বড় কথা নহে, উন্নতি বলিয়া অপরকে দাবাইয়া রাখিয়া সম্মুখে এগিয়ে যাওয়াও নহে। পরন্তু উন্নতিকামী জগতের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে একটা জীবন্ত বা স্বাভাবিক সমতা-সংরক্ষণ করিয়া যে উন্নতি তাহাই প্রকৃত উন্নতি।

আমাকে যেন কেহ ভুল বুঝিবেন না, আমি ইংরেজী শিক্ষার সুফলের প্রতি অন্ধ নহি। উহা কতকটা সুফলও আনিয়াছে—গতানুগতিক প্রথার বন্ধনকে শিথিল করিয়াছে, প্রামাণ্য বলিয়া অনেক বিষয়ের প্রভুত্ব টলাইয়াছে, ইহাতে স্বাধীন চিন্তার প্রসার বাড়িয়াছে, এবং অনেক নূতন নূতন জ্ঞানের ক্ষেত্র বিকশিত হইয়াছে; ধরা-বান্ধা ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রের গণ্ডী ছাড়িয়া ভারতীয় মনীষা এক্ষণে আরও অন্য দিকে ক্রিয়া করিতেছে। যে চিকিৎসা ও গণিত শাস্ত্রে প্রাচীন হিন্দুগণ অত্যাশ্চর্য্য ফল দেখাইয়া গিয়াছেন, এক্ষণে পাশ্চাত্যের উন্নত প্রণালীতে তাহার চর্চ্চা হইতেছে। উপন্যাস, জীবনচরিত, নির্ম্মাণকলা, বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বর্ত্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন ভাবে অধীত হইতেছে।

কিন্তু এ সকল উপকার অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক অপকার হইয়াছে। বর্ত্তমান এই শিক্ষার গুণে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বপক্ষে ও ভারতীয় সাধনার বিপক্ষে যে কঠিন মনোবৃত্তি গঠিত, বর্দ্ধিত ও প্রচারিত হইয়া আসিতেছে তাহা দ্বারা। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন অধ্যয়নীয় বিষয়ে, বিশেষ করিয়া পদার্থ বিদ্যার, যে আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ হইয়াছে তাহাকে আদরে গ্রহণ করিতেই হইবে; যতদূর জানা যায়, ভারতীয় সাধনার পুনঃ উন্মেষ মূলে সম্প্রতি এদেশে যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাহাদের পাঠ-বিধিতে ঐ সকল বিষয়ের স্থান হইয়াছে। এবং রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের মত কয়েকটী বিদ্যালয়ে দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছাত্রদিগকে এমন শিক্ষা দিতেছেন যে তাহারা প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও উপস্থিত হইতে পারে। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ এ বিষয়টীর প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, এজন্য তাহাদের সাধারণ শিক্ষা বিভাগ টিকে নাই; এবং ইহার প্রতি লক্ষ্য করাতেই ইহার কার্য্যকরী বা টেক্‌নিক্যাল্ বিভাগ উন্নতি ও প্রসার লাভ করিয়াছে। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে লোকের বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট না পাইলে চাকুরী মেলা কঠিন; জীবিকারও উপায়ান্তর নাই। ভারতের সাধনা ও জীবনাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত সমিতিকে সর্ব্বপ্রযত্নে দেশের এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যেন লোকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে গঠিত ও পাশ্চাত্য ভাবের সম্বর্দ্ধক ও উত্তেজক বর্ত্তমান এই সকল বিদ্যালয় সমূহের দূষিত অথচ কুহকময় প্রভাব এড়াইয়া চলিতে পারে।

এক্ষণে পাশ্চাত্যের এই বর্ত্তমান সভ্যতা বা সাধনা এবং আমাদের সাধনার মধ্যে পার্থক্য কি তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক। সাধারণতঃ বলিতে গেলে আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি হইল জড়-বিজ্ঞান; আর প্রাচীন সভ্যতার মূল মনোবিজ্ঞান; ভারতের সভ্যতা ঐ প্রাচীন সভ্যতার একটী প্রধান অংশ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বিদ্‌গণের মতে আমাদের সকল জ্ঞানই চরমে দেহেন্দ্রিয়ের বোধ হইতে আইসে, এবং যাহা এই ইন্দ্রিয়শক্তির পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত না হয় তাহা জ্ঞানই নয়; ইহাদের মতে ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত বা অতি-প্রাকৃত কিছু হয় না। আর যদি কোনও বিজ্ঞান-বিদ্ (সার অলিভার লজ বা ওয়ালেসের মতন) অতি-ইন্দ্রিয় কিছু বলিতে যান, তবে তাঁহাকে অপদস্থ ও একঘ'রে হইতে হয়। পক্ষান্তরে প্রাচীনকালের দার্শনিকগণ—বিশেষ করিয়া ভারতের ঋষিগণ—এই অতি-ইন্দ্রিয় বিষয়ের অনুসন্ধানে কেবল যে বিরত হন নাই এমন নহে; পরন্তু এমন আবশ্যক বলিয়া ঐ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন যে ইন্দ্রিয়ের গোচর এই বিশ্বের সম্বন্ধেও তেমন করেন নাই। জগতের আদি কারণ, প্রকৃতি, স্থিতি ও পরিণাম কি এ সকল মৌলিক বিষয়ে ভারতীয় ঋষিগণ যেমন সর্ব্বোপরি মনোযোগ দিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ দিগের ঐ বিষয়ে তেমনই সর্ব্বাপেক্ষা কম ধারণা। এক কথায় আত্মতত্ত্ব বা পরমচৈতন্য ছিল প্রাচীন দিগের মূল সাধনার বিষয়, আর আধুনিক পাশ্চাত্যের মন জড়-জগত লইয়াই ব্যস্ত। প্রাচীন ও আধুনিক সাধনার ধারায় এই মৌলিক পার্থক্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বিগত কয়েক দশক বর্ষের মধ্যে ইহাদের ভিতরে এমন একটি বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে যে একটী অপরটীর সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া মনে হইতেছে।

এই অধ্যাত্ম-সাধনা বশেই হিন্দুর নিকট স্বাদেশিকতার উপরে মানবীয়তার স্থান, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ অধিক বাঞ্ছনীয়, স্বার্থপরতার উপরে পরার্থ-পরতা ঠাঁই পাইয়াছে; আর পাশ্চাত্য-বাসীর জড়বাদ মূলক সাধনা তেমনই সর্ব্বমানবের কল্যাণ অপেক্ষা নিজ দেশের লোকের জন্য, ত্যাগের কথা না ভাবিয়া ভোগ লইয়া, এবং পরার্থতার স্থানে স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। হিন্দুগণ এই ত্যাগ ও সংযমের দ্বারাই মানবের শাশ্বত শান্তির সন্ধান করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন রোমক ও গ্রীকদিগের সাধনাও এ বিষয়ে হিন্দু সাধনার অনুরূপ ছিল। বাহ্যিক জড় প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া অন্তঃপ্রকৃতির উৎকর্ষ সাধনার্থে সক্রেটিস বা ষ্টইক সাধুগণ যেরূপ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, কোনও হিন্দু গুরুও তাঁহার শিষ্যদের প্রতি সেরূপ কঠোর জীবন যাপনের উপদেশ দিয়া যান নাই। প্রাচীন এপিকিউরাসের সুখ-ভোগ-বাদেও দেহের সুখ অপেক্ষা মনের সুখ ভোগকেই জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। হিন্দু বেদান্তবাদী, মুসলমান সুফী সম্প্রদায়, রোমান ষ্টইক ও গ্রীক এপিকিউরিয়ান—ইহারা সকলেই মানবের কল্যাণ ও সুখের সন্ধান করিয়া গিয়াছেন। এবং বাহ্য প্রকৃতি অপেক্ষা অন্তর্প্রকৃতিতেই তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আর পাশ্চাত্যের বর্ত্তমান সভ্যতা মানুষের সুখ অন্বেষণ করিতেছে—নিরন্তর লোকের ইন্দ্রিয় সুখ ও বাহ্যিক সুখ ভোগের প্রবৃত্তির বৃদ্ধি ও পরিপোষণ করিয়া; এবং কে কি প্রকারে বা কি উপায়ে তাহা চরিতার্থ করিতে পারে তাহারই বিভিন্ন উপায় আবিষ্কার হইতেছে। আজ যে পন্থাটি এক ভোগের চরম লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে, কাল তাহাই আবার নূতন আর একটী ভোগের উপায় বা প্রশ্রয়দাতা হইয়া দাঁড়াইতেছে।

এই সকল শোচনীয় অবস্থার প্রতিবিধান কল্পে যে জন-সঙ্ঘ বা সমিতিকে উদ্যোগী হইতে

হইবে, তাহার কার্য্য ও দায়িত্ব যে অতি গুরুতর তাহা বলাই বাহুল্য। অন্যকার এই বিবিধ আন্দোলনের বাহ্যিক চাকচিক্য হইতেও এই সমিতিকে মুক্ত থাকিতে হইবে, সাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলনে লোকের মন যেমন সহজে আকৃষ্ট হয়, ইহাতে তেমন কিছু থাকিবে না; ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধারণ চক্ষে নিস্তেজ ও নীরস বলিয়া অনুমিত হইবে। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব বোধে একদল দক্ষ, নিঃস্বার্থ ও আন্তরিকতা-সম্পন্ন লোক যদি সম্মিলিত হইয়া এই কার্য্যে ব্রতী হন এবং ইহাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে এই সমিতি যে অচিরে সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার লক্ষ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করাই প্রধান কথা ও প্রথমতঃ আবশ্যক। আর এ বিষয়ে দৃঢ় ধারণা জন্মান আবশ্যক যে, এরূপ কোনও সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা সযত্নে ও সতর্ক ভাবে ভারতের সভ্যতা ও সাধনার পক্ষ সমর্থনার্থে দৃঢ় বদ্ধপরিকর না হইলে, উহাকে রক্ষা করা কঠিন হইবে—একথা মনে রাখিতে হইবে যে ভারতের সাধনা জাগতিক অপর সকল জাতির সাধনার ধ্বংসের পরও আজ পর্য্যন্ত সঞ্জীবিত রহিয়াছে; আর উহা অতীত কালের ন্যায় ভবিষ্যতেও মানবজাতির অশেষ কল্যাণের হেতু বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

[**দ্রষ্টব্য**—'ভারতীয় সাধনা-মূলক শিক্ষা-পরিষদ' নামক সমিতির সহিত 'ভারতের সাধনার' পাঠকগণ পরিচিত আছেন। এই সমিতিকে এক বিধিবদ্ধ সুগঠিত জনশক্তিতে সংগঠিত করিবার জন্য আজ দুই বৎসরের অধিক কাল যাবত চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। এতদ্ সম্পর্কেই 'ভারতের সাধনা' পত্রিকাখানি প্রচারিত হইয়া আসিতেছে এবং ভারতীয় সাধনার (Indian culture) মর্ম্মার্থ ও বৈশিষ্ট্য দিন দিন অধিকতর উপলব্ধ হইতেছে। ভারতীয় সাধনার আন্তরিক প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্যক্ অভিব্যক্ত করিয়া ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে উহার প্রয়োগ ও ব্যবহার করিতে পারিলে এবং বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্র, সমাজ, আর্থিকঅবস্থা ও শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয় তদনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই বর্ত্তমান নানা প্রকারের বিভীষিকাময় অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া দেশের ও দশের প্রকৃত কল্যাণ বিধান হইবে—এ বিশ্বাস এখনও অনেকের আছে। ভারতের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ একই সূত্রে গ্রথিত—মানব ইতিহাসের এ একটী চরম সত্য কথা। ভারতের এ মুক্তির জন্য যে সমুদয় পন্থা অবলম্বিত হইতে পারে তন্মধ্যে তাহার নিজ সাধনার পথ—উহার বাধক শক্তির অবরোধ ও স্বকীয় প্রকৃতি ও শক্তির পুনরুদ্দীপন করিবার প্রয়োজন কত খানি আছে, তাহা বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। এজন্য যে পর্য্যালোচনা, ভাববিনিময়, সঙ্ঘবদ্ধতা ও কর্ম্মপরতার প্রয়োজন তাহা কেবল মাত্র কোনও একটী বিষয়ে (শিক্ষা বা অন্য কিছু) লক্ষ্যে নিবদ্ধ না রাখিয়া সমগ্র ভারতের সাধনার লক্ষ্য ও অবলম্বনে পরিচালনা করা সঙ্গত বোধ হইয়াছে। প্রবীণ ও চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয় তাঁর অনন্যসাধারণ সুদীর্ঘ কালের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার অভিজ্ঞতা লইয়া সমিতিকে অশেষ উৎসাহ ও আশার সমাচার দান করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার প্রস্তাবে ভারতীয় সাধনা-মূলক শিক্ষা পরিষদকে লইয়া ভারতীয় সাধনার সর্ব্বদিকদর্শী বিস্তৃততর ভারতীয়-সাধনা-সংসদ্ নামে এক সমিতি গঠিত হয়। এই প্রস্তাব উত্থাপন কালে শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় যে অভিভাষণ করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে প্রকাশিত হইল।]

"শক্তির সাধনা"

অধ্যাপক—শ্রীসঞ্জীব চৌধুরী, এম্-এ, বি এল্

(নেপাল)

সৃষ্টি শক্তির লীলাক্ষেত্র। বাহ্যজগতের অন্তরালে এ শক্তির ক্রীড়া। যতক্ষণ মানুষ শুধু বাহ্য নিয়া ব্যস্ত থাকে, যতক্ষণ তাহার দৃষ্টি শুধু বাহিরের পদার্থের উপর নিক্ষিপ্ত থাকে, ততক্ষণ সে 'শক্তি' বলে কাজ করিয়া যায় বটে, কিন্তু সে শক্তি কি, তাহা কত অসীম, কোথায় তাহার খেলা, কি ভাবে চলে, সে দিকে তাহার দৃষ্টি থাকে না। আহার, নিদ্রা ভয় ও মৈথুন মানুষকে এমন অন্ধ করিয়া রাখে যে সে সৃষ্টির অন্তরালে স্থিত মহাশক্তির খেলার সামান্য কণাটুকুও উপলব্ধি করিতে পারে না। সে দেখে শুধু বাহির—শুধু বাহিরের প্রকাশ। তাহার চিন্তাশক্তি বাহ্যিক দ্রব্যের অভ্যন্তরে প্রকট হইতে চাহে না। সে শুধু প্রবৃত্তির স্রোতে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মই সাধন করিয়া যায়—তাহার অন্তর্দৃষ্টি থাকে না। সেও এক প্রকার শক্তির সাধক বটে, তবে তাহার সে সাধনা অজ্ঞাতে সাধিত হইয়া থাকে। শক্তির "কর্ম্ম" তাহার থাকে—কিন্তু শক্তির "জ্ঞান" তাহার থাকে না। ইহারা অতি নিম্নতন স্তরের শক্তি-সাধক। জগত এই শ্রেণীর লোকে পরিপূর্ণ।

দ্বিতীয় স্তরের শক্তি-সাধক শক্তির আভাস পায়। বাহ্যিকের অন্তরালে সে অসীম শক্তির ক্রিয়া দেখে ও উপলব্ধি করে। সে বুঝিতে পারে যে বাহ্যিকই শুধু সত্য নয়—বাহ্যিকের অভ্যন্তরে শক্তির খেলা নিয়ত চলিতেছে। সে খেলার বিরাম নাই—তাহা অসীম ও অনন্তকাল স্থায়ী। সে খেলার গতিনির্দ্দেশ করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হয় না। পূর্ব্বতন স্তরের লোক হইতে তাহার দৃষ্টিশক্তি প্রখর বলিয়া সে স্রষ্টার সৃষ্টি-চাতুর্য্যের কতকটা আভাস পায়। যে শক্তির স্পন্দন থামিলে বিশ্বের কর্ম্মনীতি সম্পূর্ণ থামিয়া যায়—এ জাতীয় শক্তি-চিন্তক তাহাকে অনুভব করিতে পারে। তবে সে যাহা দেখে তাহাও অংশ দৃষ্টি। সে দেখে এক শক্তি সর্ব্বজীবে। সে চাহে সে শক্তির আভাস। তাহার চেষ্টাও প্রশংসনীয়। কারণ সে একান্ত জড়তার স্তর পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকতার স্তরে অগ্রসর হইতেছে; তাহার দিব্য চক্ষু উন্মীলনের জন্য প্রয়াস পাইতেছে। সে শক্তির "ক্ষমতার" দিক্ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া তাহার উপাসনার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। ইহাদের সংখ্যা সমাজে নিতান্ত কম নহে।

তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি-সাধকের প্রকার কিছু বিভিন্ন। সে শক্তির সত্তা উপলব্ধি করিয়া, কোনও এক আদর্শকে মানবের হিতের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করিয়া—শক্তি-সমুদ্র হইতে মানুষের জন্য দুই এক বিন্দু শক্তি আহরণ করিবার প্রয়াস পায়। তাহার শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা আছে— কর্ম্মে উৎসাহ আছে এবং সময়ের আদর্শে আস্থা আছে। সুতরাং সে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিছু উপরের স্তরে বিচরণ করে। সে "দেখিয়া" সন্তুষ্ট নয়—তাহার আহরণের প্রবৃত্তি প্রবল। তবে এখনো তাহার বিচারশক্তি জন্মে নাই—আদর্শের বিচারজ্ঞান তাহার অভ্যন্তরে সত্যের গৌরবে

প্রকাশিত হয় নাই। সে শুধু বুঝে শক্তি অসীম—শক্তি আহরণ-ধর্ম্ম। কোন্ জাতীয় শক্তি মনুষ্য সমাজে কি প্রকার স্পন্দনের সৃষ্টি করিতে পারে, সে বিচার তাহার জন্মে নাই। দরিদ্র যেমন ধনের স্তূপ দেখিলে গ্রহণের জন্য মত্ত হয়—অসীম শক্তির স্তূপ বা প্রবাহ দেখিয়া সেও তেমনি মত্ত হয়। সে চাহে শুধু আহরণ। কোথায় তাহার ব্যয় হইবে—সদ্ব্যয়ে তাহার চিত্ত স্বর্গ-সুখী হইবে, কি অসদ্ব্যয়ে তাহার আত্মা অধোগামী হইবে সে দিকে তাহার দৃষ্টি থাকে না। বর্ত্তমান জগৎ এই তৃতীয় স্তরে। বর্ত্তমান যুগ শক্তি সাধনার জন্য মত্ত। বিভিন্ন শক্তির ও শক্তিস্রোতের বিচার জ্ঞান ও পার্থক্যজ্ঞান ইহার জন্মায় নাই।

শক্তি সাধনার চতুর্থ স্তরে শক্তির বিচার-শক্তি জন্মে। কোন্‌টি শক্তির চন্দন, কোন্‌টি শক্তির বিষবৃক্ষ, এই স্তরে তাহার ভেদাভেদ জ্ঞান হয়। তখন তাহার মত্ততা থাকে না—তখন স্থিরতা জন্মে। কর্ম্মের প্রবল বেগে তখন মানুষের অভ্যন্তর-চক্ষু উন্মীলিত হয়। তখনই তাহার প্রকৃত আদর্শজ্ঞান জন্মে। ইতিপূর্ব্বের আদর্শজ্ঞান ভ্রান্ত ও চঞ্চল। এ স্তরের আদর্শ জ্ঞান স্থির ও অচঞ্চল। শক্তির মোহ মদিরার মোহের ন্যায়। উহার স্রোত মানুষের মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি-শক্তিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু যখন শক্তির মূল্য সম্বন্ধে হৃদয়ে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সাধক যখন শক্তি-প্রবাহের উৎপত্তি, গতি, ও পরিণতি দেখিতে পায়, তখন সে শক্তির অসীম ধারার কোন্‌টি সাধনার জিনিষ, কোন্‌টি সাধনার সহকারী পদার্থ এবং কোন্‌টি আপাতমধুর হইলেও পরিণামে বিষময়ী উহা বুঝিতে পারে। এ শ্রেণীর সাধকের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের শক্তি আছে। ইহাদের কর্ম্মগতিতে মনুষ্যসমাজ বিপদে পড়ে না; বরং স্থির ভাবে সত্যাদর্শের নিকটে ইহারা মানুষকে আহ্বান করিতে থাকে। এই জাতীয় সাধক হইতেই শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মপন্থী Artistদের উৎপত্তি।

পঞ্চম শ্রেণীর সাধকের স্থান আরও উচ্চে। উহারা শুধু সত্যের প্রকৃতি উপলব্ধি ও দর্শনে তুষ্ট হয় না। সত্যে উহাদের অন্তরচক্ষু ঝলসিয়া যায় না। বরং উহারা সত্য হইতে সাধনার পথনির্দ্দেশের জন্য শক্তি আহরণ করিয়া আনে। উহাদের শক্তি অসীম। উহারা সৃষ্টি বৈচিত্র্য, সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টিশক্তি দেখিয়া তুষ্ট হয় না। জগতের গতি সহস্র বৈষম্য ইহাদে নিকট শুধু কয়েকটি স্বতন্ত্র ধারায় পরিণত হইয়া ধরা দেয়—এবং উহারা সে ধারার উপযু সাধনা পথে মানুষ কি ভাবে স্তরে স্তরে চালিত হইয়া ক্রমশঃ অধ্যাত্ম-পথে অগ্রস হইবে তাহার জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম বাঁধিয়া যায়। ইহারাই সমাজের প্রকৃত রক্ষাকর্ত্তা বাহ্যজগতে যাহারা "মানুষের উপকার"—fraternity কি universal brotherhood নিয়া চেঁচাই বেড়ায় তাহারা নহে। এই স্তরের লোকের বিধিবদ্ধ নিয়মগুলিকে আধুনিক লোকে মোহবশে Artificial বা কাঠকুঠো মনে করে—অথচ ইহারাই মানুষের মুক্তির পদ-দর্শক; ইহারাই মনুষ্য সমাজের প্রকৃত "কবি"। ভারতের সাধনার পথগুলি এই শ্রেণীর মহাকবির বা মহাযোগীর সৃষ্টি; মানুষে প্রকৃত দেবত্ব দেখিয়া তাঁহারা মানুষকে দেবতা করিবার পথ বাঁধিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টি সম্পূর্ণ বা Complete এবং নিখুঁত। তাই ভারতে যত জাতি আসিতেছে কালবশে তাহা ভারতীয় সাধনার হস্তে ধরা পড়িয়া যাইতেছে ও যাইবে। ভারতের সাধনার চ খৃষ্ট অপেক্ষাও বড় খৃষ্ট, মহম্মদ অপেক্ষাও বড় মহম্মদ ওতপ্রোত ও অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। তা

ভারতের সাধনার মহাশৈল আজও অটুট, অক্ষত—অথবা সে সাধনার মহাসাগরের পবিত্র নীরে কালে পৃথিবীর সমস্ত জাতির সমস্ত বিভিন্নতা ডুবিয়া শান্তি পাইবে, সত্যদর্শীরা হৃদয়ে এখনো সে আশা দৃঢ়রূপে পোষণ করে। সাধনার প্রকৃত শক্তি ভারতকে ধন্য করিয়াছে—কালে জগতকেও ধন্য করিবে সন্দেহ নাই।

কবীরের দোঁহা

অষ্টবিকার—মান ও অহঙ্কার

উঁচা কুল নীচা মতা, নাহিঁ গুরুসে হেত।
হীন গিনে গুরুভক্তকো, খালীখতা অনেক ॥ ৯ ॥

কুলের গরম নীচমতি যার, গুরুপদে নয়ক রত।
ভক্তজনে তুচ্ছ গণে, ভ্রম করে সে অবিরত ॥ ৯ ॥

উঁচে কুলকে কারণে, ভুলা সব সংসার।
তব কুলকী ক্যা লাজই হৈ, যহ তন হোবৈ চার ॥ ১০ ॥

উচু কুলের অভিমানে, সব ভুলেছে এ সংসার।
কি হবে সে কুলের দশা, দেহ যবে হবে ছার ॥ ১০ ॥

হস্তী চরিকে জো ফিরৈ, উপর চঁবর ঢুরায়।
লোগ কহৈঁ সুখ ভোগবৈ, সীধে দোজখ জায় ॥ ১১ ॥

যে চড়ে যায় হাতীর পিঠে, গায়ের কাছে চামর ঢুলায়।
লোকে কয় খুব সুখে আছে, নরক মাঝে সোজা সে যায় ॥ ১১ ॥

জৌন মিলা সো গুরু মিলা, চেলা মিলা ন কোয়।
চেলা কো চেলা মিলৈ, তব কুছ হোয় তো হোয় ॥ ১২ ॥

যেথা যাবে গুরু পাবে, চেলা কেহ নাহি পায়।
হয় যদি ত কিছু হ'বে, চেলার যদি চেলা পায় ॥ ১২ ॥

বড়া বড়াই না তজৈ, ছোটা বহু ইতরায়।
জ্যোঁ প্যাদা ফরজী ভয়া, টেঢ়া টেঢ়া জায় ॥ ১৩ ॥

ছোট থাকে মনে ম'রে বড় বড়াই ছাড়ে না।
ব'ড়ে যেমন দাবা হলে, বাঁকা বাঁকা ফেলে পা ॥ ১৩ ॥

উঁচে পানী না টিকে, নীচেহি ঠহরায়।
নীচা হোয় সো ভর পিয়ে, উঁচ পিয়াসে জায় ॥ ১৪ ॥

উঁচু ডাঙ্গায় জল না দাঁড়ায়, নীচে নেমে আসেই আসে।
নীচু হয় ত প্রাণ ভরে খায়, উঁচু মরে ঘোর পিয়াসে ॥ ১৪ ॥
লেনে কো সতনাম হৈ, দেনে কো অনদান।
তরণেকো হৈ দীনতা, ডুবন কো অভিমান ॥ ১৫ ॥
লতে হয় ত সৎনাম লও, দিতে হয় ত অন্নদান্।
দীনতা হয় ত্রাণের উপায় মজতে হয় ত অভিমান ॥ ১৫ ॥
—শিবপ্রসাদ।

সতীত্ব

(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

অষ্টম অধ্যায়

খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে তাহার ইতিবৃত্ত ইতিহাসের পত্রে পত্রে লেখা আছে। তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সেই ভীষণ অত্যাচারের ফলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র নিজ নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। ইহাদের মধ্যে যে মহামতিগণ সে অত্যাচার সহ্য করিয়া ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা ও স্বধর্ম্ম-প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখান তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও ভারত ইতিহাসের তমসাচ্ছন্ন আকাশে উজ্জ্বল সূর্য্য সদৃশ; যদিও ভারতের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অনেকে প্রাণের দায়ে পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। একের দৃষ্টান্ত স্বরূপে রাণা প্রতাপসিংহ, রাণা রাজসিংহ, রাজা প্রতাপাদিত্য, ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতির প্রাতঃস্মরণীয় নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অন্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাজু ব্রাহ্মণ—যাঁহার অমানুষিক অত্যাচারে গঙ্গাবংশীয় উড়িষ্যার রাজন্যবর্গের অতুল কীর্ত্তি চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গিয়াছিল; এবং হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণে কতদূর অত্যাচারী হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত "কালাপাহাড়" নামে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মুরশিদাবাদের মসনদে যিনি প্রথম বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হয়েন সেই মুরশিদকুলী খাঁও ব্রাহ্মণের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের আর এক দৃষ্টান্ত। ভারতের হিন্দুজাতি যে এখনও নিজেদের স্বধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আছে ইহা একটা খুব বড় রকমের আশ্চর্য্য ব্যাপার।* সদানন্দ ঠাকুরের অপার যত্নে এবং সেই নারী-সঙ্ঘের আশাতীত সেবার ফলে আহত দস্যুগণ ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল। একদিন সন্ধ্যার পর এই দস্যুগণের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল—

---

* ভট্ট মোক্ষমূলার বলিয়াছেন - -

As to modern times, and I date them from about 1000 after Christ, I can only say that after reading the acts of the terrors and horrors of Mahomedan rule my wonder is that so much of native virtue and truthfulness should have survived. (Max Muller,)

১ম দস্যু। এই ব্রাহ্মণটা বড় বদ্‌মাইস। কিন্তু কি আশ্চর্য্য শিক্ষা—আমাদের মত লোকেরও এইরূপে সেবা করিতেছে। দেখে মনটা কেমন খাটো হইয়া আসিতেছে।

২য় দস্যু। কাফের কি কোন ধর্ম্মবুদ্ধিতে এসব করিতেছে? উহারা ভয়ে মরিতেছে। কি জানি যদি আবার আমরা মারামারি করি। কাফেরের ধর্ম্মবুদ্ধি হতেই পারে না।

৩য় দস্যু। ঐ স্ত্রীলোক গুলাও দেখ অকাতরে আমাদের সেবা করিতেছে; অথচ আমরা ওদের সর্ব্বনাশ করিতেছিলাম।

১ম। যাই বল ভাই! এর ভিতর কি একটা অতিশয় মনোহারী জিনিষ রয়েছে যেটা এত বড় যে আমাদের সকল বিচার ও সকল জ্ঞানকে নীচু করে সম্মুখে উচু হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা যে অন্যায় করতেছিলাম আমরা যে ওদের আততায়ীর কাজ করেছিলাম এই এত দিনের সেবার মধ্যে একটি কথাও সে বিষয়ে এদের কাহারও মুখে শুনা গেল না। বদ্‌মাইস ত বটেই—কিন্তু তবু কেন মনে এই দুর্ব্বলতা! হে ঈশ্বর! এ ভীষণ বিপদে কেন ফেলিতেছ! ওরা যে বদ্‌মাইস, ওরা যে ভীরু, ওদের যে সাহস নাই!

২য় ও ৩য়। তবুও ভীরুত ত বটেই। ভাল হলেই ওদের আবার দেখা যাইবে। আমাদের হাত থেকে খাওরাং ছিনাইয়া লইল! ওঃ! কি আস্পর্দ্ধা!

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার কার্য্যাদি শেষ করিয়া সদানন্দঠাকুর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং দস্যুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা এখন বেশ সুস্থ হইয়াছ, আগামী কল্য এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ উদ্দিষ্ট স্থানে গমন করিবে; কেননা আমরাও এ স্থান হইতে শীঘ্রই অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইব।"

দস্যুগণ তখন বলিতে লাগিল যে, তাহারা পরদিন রাত্রিশেষে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, তবে ভীরুদের এই দুর্ব্বিনীত ব্যবহারের প্রতিশোধ তাহারা লইবে। সদানন্দ হাসিয়া বলিলেন, তাহাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য তাহারা আচরণত করিবেই এবং তজ্জন্য "ভীরুগণ" কিছুমাত্র চিন্তিত নহে—তাদের চিন্তার আরও অনেক বড় বিষয় আছে—মানস সরসের শুদ্ধ অপাপ বিদ্ধ রাজহংস দেখিয়া দেখিয়া চড়ুই পাখীর রূপে তারা মুগ্ধ হইতে পারে না। খড় কুটো কৃমি ময়লা, কীটপতঙ্গ আহার করিয়া যে পাখী দিনে সাতবার ডিম পারে তাদের চিন্তা অপেক্ষা মণ ওজনে আম মাংসভোজী সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশু যাহাদের বার বৎসরে একটি সন্তান হয় তাদের চিন্তা ভীরুগণে অধিক করে। এই সময় পাগলিনী ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল—তার কণ্ঠে "নারী চায় প্রতিবিধিৎসিতে" এই উচ্চ রব ও হস্তে ত্রিশূল। দস্যুগণ দেখিয়াই চিনিল যে এ সেই রমণী যিনি দস্যুদের পরাস্ত করিয়া সেই ষোড়শী রমণীকে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছে। সদানন্দ ঠাকুর তখন পাগলিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তুমি এ সময় এখানে কি জন্য আগমন করিলে?'

পাগ। চাই প্রতিবিধান। নর পশুগুলির ছিন্ন মস্তক এই ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে পশুদের কীর্ত্তি ও তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা কোন পথে তাহা গান করিয়া বেড়াইব।

সদা। তুমি শান্ত হও—এ বিষয় চিন্তা করিবার এখন সময় নহে—চল আগে সতীনাথকে রক্ষা করিতে হইবে। পাগলিনী আর বাক্যব্যয় না করিয়া সদানন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই নারী-সঙ্ঘের আশ্রমে-যেখানে সতীনাথ রহিয়াছেন সেই দিকে চলিতে লাগিলেন।

এদিকে দস্যুগণ ভাবিতে লাগিল—কি ভীষণ এ নারী-চিত্র ! যাহাই হউক সদানন্দের কথায় বোধ হইল সেই ভীরুলোকটা—যে আমাদের কয়জনকে কাহিল করিয়াছিল—এখনও জীবিত আছে এবং নিশ্চয়ই সে সেই সুন্দর মেয়েটাকে নিজের হাত করিয়াছে। আচ্ছা ! দেখা যাক—আমরা কি করিতে পারি।

নবম অধ্যায়

একটী ছোট কুটীরের মধ্যে সতীনাথ শয্যায় শায়িত আছেন। তাঁহার পার্শ্বে সেই ষোড়শী রমণী বসিয়া পরিচর্য্যা করিতেছে।

সতী। আমি প্রায় সুস্থ হইয়াছি। ঠাকুর শীঘ্রই এস্থান হইতে আমাকে অন্যত্র লইয়া যাইবেন। তোমাদের যত্নে ও ঠাকুরের অশেষ কৃপায় আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

ষোড়। আমার সতীত্ব ও প্রাণরক্ষার জন্য আপনার এই বিপদ ঘটিয়াছিল। আমার জীবনের যে কি রহস্য তাহা বলিতে পারি না।

সতী। তুমি নারী-সঙ্ঘে কিরূপে আসিলে—তুমি কি বিবাহিতা ?

ষোড়। আমাদের ঘরে ডাকাত পড়ে—আমার তখন বয়স ১২ বৎসর। আমাকে ডাকাতগণ চুরি করিয়া লইয়া পলায়। পথে ঐ পাগলিনী ও অন্যান্য রমণীগণ ঘোরতর সাহস দেখাইয়া দস্যুদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন। সেই অবধি ইহারা আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। আমার স্বামী কোথায় আমি তাহার কোন সংবাদ পাই নাই।

সতী। বুঝিলাম তুমি বিবাহিতা ও এই তোমার দ্বিতীয় বার বিপদ। আচ্ছা, ঐ পাগলিনী কে ? ওকেই ত নারী-সঙ্ঘের পরিচালিকা বলে বোধ হয়—অথচ ও যেন একটা প্রকৃতই পাগল।

ষোড়। এই নারী-সঙ্ঘ উহার করতলগত যষ্টি মাত্র। উনি যাহা বলিবেন তাহা প্রতিপালন করিতেই হইবে। আমার বোধ হয় না উনি ঠিক পাগল। আপনার ঠাকুরের সহিত এই পাগলিনীর বিশেষ কোন সংস্রব আছে। চেহারাতে রমণী কিন্তু কার্য্যে উনি বীর পুরুষ-পুঙ্গব।

সতী। আমারও সন্দেহ হইয়াছে যে সদানন্দঠাকুর নারী-সঙ্ঘের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট। যেমন দেশ, কাল ও পাত্র হইয়াছে তাহাতে ভারত ললনাগণ নিজেদের রক্ষা করিবার উপায় ও উদ্যোগ না করিলে তাঁহাদের রক্ষার আর উপায় নাই।

এমন সময় সদানন্দঠাকুর পাগলিনীকে সঙ্গে লইয়া সতীনাথের কুটিরে প্রবেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ষোড়শী সে ঘর হইতে তড়িৎবেগে প্রস্থান করিলেন।

সদা। দস্যুগণকে আগামী কল্য মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিয়া আসিলাম। এখন আমাদের শীঘ্র যাইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বেই যে বিলম্ব হইয়াছে তজ্জন্য অনেক ক্ষতি ঘটিয়াছে।

সতী। আপনার আদেশ হইলেই আমি এ কুটীর ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। এখন আমি চলে ফিরে বেড়াতে পারি। আর এই "নারী-সঙ্ঘে" কেন থাকি।

পাগলিনী। নারী ছিল বলেই বেঁচেছ—অন্যথা কি হতো বলা যায় না।

সদা। দস্যুগণের যেরূপ ভাব দেখিলাম তাহাতে যে তাহারা—অন্ততঃ তাদের মধ্যে কেও কেও তাদের পাপসংকল্প একবারে ত্যাগ করেছে তা বলে বোধ হয় না। হয়ত তাহারা ষোড়শীকে আবার সুযোগ পেলেই আক্রমণ করিবে।

সতী। (চমকিয়া উঠিয়া) কি ভীষণ বিপদ! ষোড়শীকে কি তবে রক্ষা করা যাইবে না? দস্যুগণের এ প্রবৃত্তি কেন?

পাগ। এর ইতিহাস সংক্ষেপে তুমি ক্রমে ক্রমে জানিবে। নারী-সঙ্ঘের প্রত্যেক নারীই এ বিষয়ে তোমাকে কিছু না কিছু বলিতে পারিবে।

সদা। দস্যুগণ আর কেহ নহে; যে সব ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণগণ প্রবল অত্যাচারে জীবন রক্ষার্থ ধর্ম্মান্তর গ্রহন করিয়াছিলেন ও এখনও করিতেছেন—ইহারা তাহাদেরই বংশধর।

সতী। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ঔরসে এই কুলাঙ্গারগণ কি করে জন্মেছিল! এ যে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

সদা। আমি জানি ইহারা কে কোন্ বংশজাত। তাই ওদের আমি কিছু বলি নাই।

সতী। কি রহস্য—সেই সব উচ্চ প্রবৃত্তির বীজ একবারে ধ্বংস হইয়া এরা কি ক'রে এত নীচ হইল?

সদা। সৃষ্টি বিকারে। এর মধ্যে ভালও আছে—মন্দও আছে। ভাল গুণ গুলি প্রায়ঃ চাপা থাকে—মন্দগুলি সহজে গজিয়ে উঠে। একমাত্র নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার বলেই মন্দগুণ গুলিকে দমিত করিয়া চাপা চাপা সূক্ষ্মতর ভাল গুণগুলিকে জাগিয়ে তোলা যায়। যে নীতি ও ধর্ম্ম ভাল গুণ গুলির "পাট" করিতে চেষ্টা করে সে নীতি ও ধর্ম্ম চাক্ষুষ তত মনোরম বোধ হয় না। বিশেষতঃ ভাল গুণগুলি প্রবল উদ্যমে ডালপালা লইয়া সহজে প্রকাশিত হইতে চাহে না। কিন্তু একবার প্রকাশিত হইলে তাহাদের আর দমন করা যায় না। কিন্তু মন্দগুলি সহজে তেজস্বী হইয়া উঠায় যে নীতিতে তাহাদের "পাট" হয় তাহা সহজেই মানবহৃদয় অধিকার করিয়া বসে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহারা ক্ষুদ্র চারা হইতে প্রবল বৃক্ষে পরিণত হয়। সহজ তেজ সম্বল থাকায়, তাহারা উদ্যম ও উৎসাহে আশাতীতরূপে বলবান হয়। এখন সহজ মনোহারী জিনিসের পাট বড় ভাল লাগে। শূকর প্রতিপালনে গৃহস্থের অনেক সুবিধা—দলে দলে শূকর জন্মে—ছাগল পুষিলেও তাই। হরিণ ও কস্তুরিকা মৃগ সহজে পাওয়া যায় না এবং তাদের দ্বারা তখনি গৃহস্থের সুবিধা হয় না। ইক্ষু চাষ বা বেগুন চাষ বড় কষ্টকর—কিন্তু খেসারী বা পেঁয়াজ ফেলে দিলেই প্রচুর জন্মে। শূকর বা ছাগল মাংস দুদিনে পচে যায়, হরিণ মাংস বহুদিন নষ্ট হয় না। নষ্ট হলেও খাওয়া যায়। বহুদিন যত্ন করিলে হয়ত একটি কস্তুরিকা নাভি পাওয়া যায়। বেগুন বা আক একবার ক্ষেত্রে জন্মিলে তাহার মূল্য স্বরূপ অনেক পাওয়া যায়। খেসারী বা পেঁজ অল্প মূল্যেই পাওয়া যায়। ঝিঞা ও ফিংঞা পাখী অনেক কিন্তু মৃত্তিকাগর্ভের কাঁঠাল ও সারস পাখী অতি দুর্ল্লভ। দস্যুগণ সে নীতি ও ধর্ম্ম অবলম্বনে চালিত তাহাতে ভালর চাষ একবারে বন্ধ। এই তত্ত্বের অভিব্যক্তি ইতিহাসে সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে।

পাগ। আর আমাতে—কেমন নয়?

সতী। মনুষ্য চরিত্রের কি অদ্ভুত গঠন। কিছুই বুঝা যায় না।

সদা। মনুষ্য চরিত্র বুঝা অতিশয় কঠিন। এরূপ গুরুতর তত্ত্ব আর আছে কিনা সন্দেহ। অন্যের ধন সম্পদ কি করে হস্তগত হইল—কত মানব হত্যা করা হইল—কি প্রকার চতুরতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া অপরের ন্যায্য সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইল ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া, তাহার নাম ইতিহাস দেওয়া হয়। যদি মানব চরিত্র প্রথম হইতে কেমন করিয়া উন্নতি ও অবনতির দিকে যাইতেছে সে বিষয়ের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইত—তবে মানব-সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধনা হইত। রামায়ণ ও মহাভারতে যুদ্ধাদি আছে—আবার মনুষ্য চরিত্রের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ ও উন্নতি ও অবনতির ইতিবৃত্ত ও আছে। কালের অনিবার্য্য প্রভাবে ভাল গুলির ধ্বংস হইয়াছে। মন্দগুলির আদর প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

সতী। আমার বড় আবেগ হইতেছে—সংক্ষেপে সে ইতিবৃত্ত প্রকাশ করুন্।

পাগ। ইতিবৃত্ত দ্রৌপদী, ইতিবৃত্ত কাশ্মীর রাজমহিষীগণ, ইতিবৃত্ত হাজার হাজার দেবদাসী—আর ইতিবৃত্ত "নারী-সঙ্ঘ"।

সদা। বেদ পথের অধঃপতনে দেহাত্মবোধ নিরোধক ও অহিংসামূলক ধর্ম্ম ও নীতির উৎপত্তি। সেই ধর্ম্ম ও নীতির অধঃপতনে মন্দগুলির বা পশুবৃত্তি গুলির অপ্রতিহতরূপ "পাট" আরম্ভ হয়। পুরাতত্ত্ব পাঠে বুঝিতে পারা যায় এই বৃহৎ মনুষ্য মণ্ডলীর প্রায় সর্ব্বত্রই তখন এই পাটের এক চেটিয়া প্রভাব। এই অবস্থায় এই মন্দগুলির উত্তেজক কোন ধর্ম্ম ও নীতি প্রচারিত হইলে যে তাহা তৎক্ষণাৎ হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এ বিষয়ে বিশেষ বলিয়া দিবার কিছুই নাই। আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে।

এমন সময় কপাটে কি একটা শব্দ হইল! সকলে সেই দিকে তাকাইলেন। ষোড়শী দরজার পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব শুনিতে ছিলেন—হঠাৎ অন্যমনস্ক হওয়ায় কপাটে একখানা হাত লাগিয়া শব্দ হইয়াছিল। সদানন্দ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন সতীনাথ ষোড়শীর দিকে তখনও চাহিয়া রহিয়াছেন। মনুষ্য চরিত্র বিশ্লেষণ পটু সদানন্দের মুখের উপর দিয়া একটা চাঞ্চল্যের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া আবার লুকাইয়া গেল। হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া ষোড়শী পাগলিনীর ক্রোড়ে পড়িয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন "তবে কি আমার রক্ষা নাই—আমার যে ভয়ে প্রাণের ভিতর কেমন করিতেছে।" এই বলিতে বলিতে ষোড়শীর সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িল। সতীনাথ যেন একটু ব্যস্ত হইলেন। পাগলিনী বলিল, "ব্যস্ত হইবার কিছুই নাই—ষোড়শীর আরও ১।৪ বার ওরূপ হইয়াছে। ওর সংজ্ঞা আপনিই হইবে।" সদানন্দঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"রূপেই জগৎ মোহিত। রূপের জন্য মানুষ পাগল। সূর্য্যদেবই রূপের আধার। অথচ তাঁহার রূপের কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। যে যখন যেরূপ যন্ত্রে রূপ দেখিতে চায় সূর্য্যের রূপ তখন সেই যন্ত্র সাহায্যে সেই-যন্ত্রের মতই প্রকাশ পায়। রূপের নিজস্ব কোন বিভিন্নতা নাই। যন্ত্রভেদে পৃথক পৃথক দেখায়। সংজ্ঞাপ্রদায়ক তোমার যে শক্তি তাহা তোমাকে রূপ হইতে পৃথক করিয়া রাখিতেছে। ঐ শক্তির প্রভাবেই তুমি রূপময় বাহ্য জগৎ হইতে পৃথক ভাবিয়া থাক। ঐ শক্তিটি একবার দূরে রাখিয়া কল্পনা কর দেখিবে সৃষ্টিতে কেবল অনন্ত রূপরাশি। কাল ও শক্তির যে সংযোটন তাহাই রূপের বিকাশ। রামধনু জলবাষ্পে সূর্য্যকিরণের সম্বন্ধ হওয়ায় উৎপন্ন হয়। ইহা অনুভব করিতে চেষ্টা কর। কতকগুলি পুস্তক পড়িলে বুঝা যাইবে না। বিষয় গুরুতর কাজেই

ইহা বাক্যশক্তির গণ্ডীর বাহিরে। রূপ আবার পদার্থগুলির বাহ্য বিকাশ মাত্র—রূপের নিজের অস্তিত্ব নাই। বাহ্য বস্তুগুলির অনুসন্ধান করিলে দেখিবে দুটি জিনিষের সাহচর্য্যে ঐ বিকাশ—সে দুটি কালও শক্তি। কাল আশ্রয়—শক্তির বিকাশ—দেশ আধার। এই তিনই দক্ষিণাকালী মূর্ত্তিতে পরিস্ফুট। মা উন্মত্তা কিন্তু কাল জগৎযোড়া—পড়িবার ভয় নাই। যখন আবার সব ঠাণ্ডা হয়—সংস্কোচ শেষ হয়, তখনই বিন্দুরূপ। তাই সেণ্ট আগষ্টিন বলিয়াছেন "যে বিন্দু বিশ্ব-সৃষ্টিতে সর্ব্বত্রই মধ্যবিন্দু তিনিই ঈশ্বর।" তান্ত্রিক তাই বলেন সত্যলোকে মহাকালী চনকাকারে বিন্দুরূপে সংপুটা।

বিশ্বনিয়ন্তা রূপের আভাস দিয়া একটি পুতুল এই সংসারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। মানুষ রূপের সন্ধানে তার পিছনে পিছনে ছুটিতেছে। যে যেরূপ ভাবযন্ত্র দিয়া পুতুলের রূপ খোঁজে সে সেই ভাবেই ডুবিয়া যায়। ভাবযন্ত্রটি একনিষ্ঠ ভাবে আরোপিত হইলেই পুতুলের প্রকৃত রূপ মূর্ত্ত পরিগ্রহ করে। যিনি কামদেবের দৃষ্টিকে অশুচি জ্ঞান করেন—তিনিই ইহলোকে ধন্য হয়েন।

সতীনাথ কথাগুলি শুনিয়া একটু লজ্জিত হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। ষোড়শী জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ বকিতে লাগিল:—"হে হৃদয়ের দেবতা! হে আর্য্য! তুমি কোথায় জানি না। তুমি জীবিত বা মৃত তাও জানি না। তুমি যেখানেই থাক—আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় তোমার চিত্রে পরিপূর্ণ—এখানে আর দ্বিতীয় বিন্দুটিরও স্থান নাই। দেহটা লইয়া আমার বিপদ। আমার এই দেহ কি সতীনাথ (মহাদেব) রক্ষা করিবেন না?—শুনেছি সতীর সতীত্ব তিনি স্বয়ং রক্ষা করেন।" এবার সদানন্দ ঠাকুরের সেই সঞ্চিত অন্ধকার ভাব সরিয়া গেল। তিনি হাস্যবদনে পাগলিনীকে বলিলেন—"এইরূপ নারী-রত্নকে রক্ষা করিবার জন্যই—এইরূপ জাতি-রক্ষয়িত্রী কুললক্ষ্মীদের উদ্ধার কল্লেই স্বামীজির ইঙ্গিতে আমি এই নারী-সঙ্ঘের প্রবর্ত্তন করিয়াছি। পাগলিনী থাকিতে ষোড়শীর বিপদের সম্ভাবনা নাই। সতীনাথ! একথা এত দিন তোমাকে বলি নাই, কেন না প্রয়োজন হয় নাই। আজ ঘটনাচক্রে রহস্যভেদ করিলাম। এই সঙ্ঘ আমার অলক্ষে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। তুমি এদের সাহায্য করিবে। এদের গৌরবের চক্ষে দেখিবে। পাগলিনী এদের এখানকার নেত্রী, স্বামিজী উঁহাকে বড় স্নেহ করেন।" সতীনাথ সবই যেন নূতন দেখিতে লাগিলেন। আজ ২০।২২ বৎসর মধ্যে তিনি কোন দিন বুঝিতে পারেন নাই যে সদানন্দ ঠাকুরের আবার ঐরূপ একটা কার্য্য চলিতেছে এবং স্বামিজীর সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। যাহা হৌক চুপ করিয়া থাকিলেন। ষোড়শী এখন উঠিয়া বসিয়াছে। সদানন্দ পাগলিনীকে ইসারা করিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইতে বলিলেন। পাগলিনীকে বিদায় দিয়া এবং সতীনাথকে বিশ্রামের আজ্ঞা করিয়া তিনি স্বয়ং মন্দিরে প্রত্যাগমন করিবার জন্য রওনা হইলেন।

সতীনাথ শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—ষোড়শী সুন্দরী বটে। কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য কিসে—নাকে, কাণে, চক্ষে, ভ্রূতে, ওষ্ঠে, গ্রীবায়, অঙ্গে না চলনে? এত দিন সে আমার সেবা করিল; তাহার প্রত্যেক অঙ্গ আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি। কোনটিই সাধারণ নারীজাতির অঙ্গ হইতে বিশিষ্ট ভাবে পৃথক নহে। চক্ষুর গঠন—ভ্রূর গঠন-একই ধরণের। তবে ষোড়শীকে এত সুন্দরী দেখায় কেন? আর সাধারণ নারীগণকে কেন এরূপ ভাবে সুন্দরী দেখায় না! অথচ

প্রত্যেক রমণীরই নিজ নিজ একটা বিশিষ্টতা আছে তা বেশ বুঝা যায়। চিত্র-বিদ্যা শিক্ষাকালে সদানন্দঠাকুর উপদেশ দিয়াছিলেন যে চিত্রের উৎকর্ষ লাভ—অঙ্গের প্রত্যেক অংশের আপেক্ষিক স্থান নির্ণয় ও তাহাদের প্রত্যেকের আকার প্রকার স্থির করার উপরই নির্ভর করে। কি মহিমা-ময় সৃষ্টি! প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুটিই পৃথক ভাবে সাজান। ভাবের উপরই রূপ নির্ভর করে বটে। তবে কি আমার হৃদয়ে কোন মন্দভাব খেলা করিতেছিল—নতুবা ঠাকুর এরূপ তিরস্কার করিবেন কেন! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সতীনাথ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

দশম অধ্যায়

কাশীতে গুণ্ডাদের মধ্যে আজ একটা মজলিস বসিয়াছে। মধ্যরাত্রে সকলে মিলিত হইয়া এক প্রকাণ্ড দালানে বসিয়া ঘোরতর তর্ক বিতর্ক চলিতেছে।

১ম গুণ্ডা। মরদ্ হোকে ক্যাসা তোম্ লোক—আওরাৎ কা পাশ বেইজ্জৎ হোয়া!

২য়। মহাবালেশ্বর থেকে পথেআসিতে তিন চারিবার চেষ্টা করিয়াও আমরা একটা আওরাৎকেও নিজেদের কবলে আনিতে পারি নাই। একটা পাগলী আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছে। ওঃ! কি ভীষণ ত্রিশূল ও সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি!

৩য়। আমাদের দলের কতলোক চিরদিনের জন্য এ পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছে। সেই পাগলিনী যেন রমণীর অবয়বে কোন এক মহা বীর পুরুষ।

১ম। হাম্ দেখ্‌লেংগে। উন্‌লোককো ঠিকানা বাতাও।

২য়। ২৭নং সকরকন্দ গলিতে তারা বাসা লইয়াছে। কর্ত্তা, যত সোজা ভাবছেন তা নয়। যে নারীর পল্টন তাদের ঘিরে থাকে সে পল্টনকে এঁটে ওঠা দায়।

৩য়। মহাবালেশ্বরের ঘা এখনও ভাল করে শুকোয় নাই। সাকরেদটা, ভীরুদের সেবা দেখে ভুলে গেল—শুনছি নাকি সে ফকীর হয়ে ফকীরের দলে মিশেছে। এবার কর্ত্তা কি করেন দেখা যাক্—।

এই কথা শুনিয়া সকল গুণ্ডা একবারে রাগিয়া উঠিল এবং কর্ত্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, তাহারা সকলে সাহায্য করিয়া "ভীরু বাঙ্গলকো" জব্দ করিবে। তাহার মধ্যে একটা খোঁড়া গুণ্ডা যে রমণীদের আক্রমণ করিয়া ইতিপূর্ব্বে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল ও বহুকষ্টে বাঁচিয়াছে সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "বাপ্! কি ভীষণ তেজ! কি ভীষণ মূর্ত্তি! কি শিক্ষা! পাগলিনী একাই এক লক্ষ বীরপুরুষের ক্ষমতা রাখে। তার পর যেই জ্যান্ত রমণী ধরিবে অমনি সে গুপ্ত অস্ত্রে তোমার দফা শেষ করিয়া দিবে। কর্ত্তা এবার শিক্ষা পাবেন। আর যাঁরা এখন লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁরা বুঝিবেন কি ঠেলা। এ পিছন ফিরে ঘোমটা টেনে দাঁড়ান আওরাৎ নয়, বাবা যে ধরলুম আর নিলুম্ এরা নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে জানে। কিন্তু যাইহোক সেই সকলের চেয়ে খুব সুকৃত রমণীটীকে দেখিলে আর ধৈর্য্য থাকে না।"

যথা সময়ে সিংহগড় ত্যাগ করিয়া সদানন্দ ও সতীনাথ কাশীধামে পৌছিয়া শ্রীশঙ্কর স্বামীর আশ্রমে মিলিত হইয়াছেন। সদানন্দের ইঙ্গিতে সেই রমণী-সঙ্ঘও অলক্ষে তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া কাশীতে সকরকন্দ গলিতে আড্ডা পাতিয়াছেন। স্বামীজির আড্ডায় যত পতিতা

জুটিয়াছিল সকলেই আসিয়া রমণীসঙ্ঘে যোগদান করিয়াছে। প্রমথনাথের সহিত সতীনাথের আলাপ পরিচয় হইয়াছে। গৌরীনাথও সেই আশ্রমেই থাকেন। সদানন্দ সিংহগড়ের বিপদ ও তথায় এবং পথে দস্যুগণের অত্যাচারের কথা সমস্তই বলিয়াছেন। নারী-সঙ্ঘের সেই অদ্ভুত কার্য্যাবলীর কথা শুনিয়া গৌরীনাথের মনে একটা প্রবল ঔৎসুক্য আসিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা—কি করে তাদের সঙ্গে মিশিয়া তাদের সাহায্য করেন। কিন্তু সদানন্দের এমনি কৌশল যে কিছুতেই জানিবার যো নাই যে সেই রমণী-সঙ্ঘ কাশীতেই আসিয়াছেন। তা ছাড়া সে রমণী-সঙ্ঘ পুরুষের সংসর্গ রাখে না।

প্রমথ। কাশীতে অনেকদিন থাকা হইয়াছে—এবার হরিদ্বারের দিকে গমন করিলে হয় না?

সদানন্দ। স্বামিজীর ইচ্ছা হইলে হরিদ্বারে রওনা হওয়া যাইবে।

প্রমথ। স্বামিজীর নিকট এ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে হয় না?

সদা। স্বামিজী ইতিপূর্ব্বেই সে বিষয় চিন্তা করিতেছেন। আমাদের এখন কিছু করিতে হইবে না। সময়ে তিনি আমাদের হরিদ্বার যাবার উপদেশ দিবেন। কাশীর বিপদ আগে কেটে যাক, তারপর নড়াচড়া।

প্রম। কেন, এখানে আবার কিছু বিপদ আছে নাকি—একবার ত বহুকষ্টে গৌরী-নাথের সাহায্যে রক্ষা পাইয়াছি।

সদা। বুঝিবে।

এমন সময় স্বামিজী আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

গৌরী। নারী সঙ্ঘের কার্য্যকলাপ শুনিয়া আমার প্রাণে ইচ্ছা হইয়াছে তাঁহাদের সহিত মিলিত হই।

স্বামী। বিশ্বনাথের ইচ্ছায় হয়ত তুমি তাদের শীঘ্র দেখিতে পাইবে এবং হয়ত তখন তোমার জীবনে নূতন আলোক প্রকাশিত হইবে। কাশীতে যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে সকলে সাবধানে থাকিবে; কখন কি আসে বলা যায় না।

এমন সময় একটি আগন্তুক আসিয়া সদানন্দকে প্রণাম করিল ও সংবাদ দিল যে গুণ্ডাগণ দলবদ্ধ হইয়া রমণী-সঙ্ঘের সর্ব্বনাশ করিবে বলিয়া গতকল্য রাত্রে পরামর্শ করিয়াছে। সদানন্দ যেন সেই আগন্তুককে চিনিতেন কাজেই বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। গৌরীনাথ একবারে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "রমণী-সঙ্ঘ কি কাশীতে এসেছেন নাকি?"

আগ। তাঁহারা কিছুদিন থেকে মকরকন্দ গলিতে আসিয়া বসবাস করিতেছেন।

গৌরী। আমি তাঁহাদের সাহায্যার্থ তথায় যাইব। আপনি অপেক্ষা করুন।

স্বামী। তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না, তুমি উত্তেজিত হইও না। তোমার ক্ষমতা কতটুকু।

গৌরীনাথ অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিলে, সদানন্দ স্বামীজির ইঙ্গিতে উঠিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকও স্থান ত্যাগ করিলেন। স্বামীজি তখন প্রমথনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

দেখ, সময় ভাল নয়—নারীর উপর কখন কি অত্যাচার হয় বলা যায় না। মাধুরীকে লইয়া তুমি এখন কিছুদিন অন্যত্র যাইবে না। এখানে অবস্থিত করিতে থাক যখন সুবিধা হইবে আমি তখন সদানন্দের দ্বারা তোমাকে জানাইলে তবে হরিদ্বার মুখে রওনা হইবে। আমরা আর কাশীতে বেশী দিন থাকিব না। শীঘ্রই উত্তরাখণ্ডে চলিয়া যাইব। এখন সদানন্দ আসিয়াছে, সে তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল দেখিবে। ভয় করিও না।"

প্রম। আপনারা কি ২।৪ দিনের মধ্যেই কাশীত্যাগ করিবেন।

স্বামী। আমরা আগামীকল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাশীত্যাগ করিব।

প্রমথনাথ। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

সামুদ্রিক বিজ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জ্যোতিভূষণ

বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় জ্যোতিস জগদ্বিখ্যাত। কারণ প্রাচীনকালের মুনিঋষিগণ মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশের দ্বারা ও যোগবলে এই অপার শাস্ত্রের ঈদৃশ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে তাঁহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে ইহাদ্বারা জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের যাবতীয় শুভাশুভ ঘটনাবলী এবং পরিবর্ত্তনশীল মানব জীবনের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় শুভাশুভ বৃত্তান্ত নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। তৎকালে জ্যোতিষ শাস্ত্র রাজাধিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া নির্জ্জন কুটীরবাসী দীনাতিদীন পর্য্যন্ত সকলের নিকট অতীব আগ্রহের সহিত সমভাবে আদৃত হইত। পুরাতন ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে পুরাকালে প্রায় সকল রাজারই রাজসভায় জ্যোতিষের আলোচনা হইত এবং রাজ্যের শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত থাকিত। এই শাস্ত্রের উপর আপামর সাধারণের পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস ছিল এবং শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর আগ্রহও ছিল। ইদানীং প্রতিপদক্ষেপে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদর্শনকারী জ্যোতিস শাস্ত্রের উপর বিশ্বাসের মাত্রা অনেক ম্লান হইয়া আসিয়াছে; তাহার কারণ এই অপার শাস্ত্রের কেবল মাত্র সারাংশ শিক্ষা করিয়া শেষ করাই এক জীবনে হইয়া উঠে না, তাহাতে আবার অনেক সময় শিক্ষাগুরুর শিক্ষা-কৌটিল্যে শিক্ষার্থীর অবহেলায় অথবা শাস্ত্র কাঠিন্যে ইহা যথাযথ শিক্ষা করা যায় না। শিক্ষা কৌটিল্যহেতু সাঙ্কেতিক কতগুলি বিষয় পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। পরন্তু অকর্ম্মণ্য কতকগুলি লোক সংসার ক্ষেত্রে অভাব রাক্ষসীর কবল হইতে নিস্তার লাভ করিবার জন্য এই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভিত্তিহীন কথা বলিয়া শাস্ত্রের প্রতি মানবের অগাধ বিশ্বাসের হ্রাস করিয়া দিতেছে। এই হেতু আজ জগতে জ্যোতিষের ঈদৃশ দুর্দ্দশা। কিন্তু পুরাতন মূলগ্রন্থরাজি এখনও সেই প্রাচীন কালের খ্যাতি-প্রতিপত্তির স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও যদি

যথাযথভাবে এই শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করা যায় তাহা হইলে এই লুপ্তপ্রায় জ্যোতিস-শাস্ত্র আবার জগতে সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়া প্রতিপদক্ষেপে প্রত্যক্ষ ফল দর্শাইয়া জগজ্জনকে চমৎকৃত করিতে পারে (১)।

বর্ত্তমানে প্রমাণ এবং কারণানুসন্ধায়ী বৈজ্ঞানিক জগতে আদিকালের লিখিত প্রায়শঃ প্রমাণাভাব বা প্রমাণহীন বিষয়গুলি সামুদ্রিক শাস্ত্রালোচনাকারীদিগের নিকটে তাদৃশ আদৃত হয় না বলিয়া নানা দিক্ দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর নানাবিধ গ্রন্থ হইতে যথাশক্তি কারণ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এই শাস্ত্রের আলোচনা করা যাইতেছে।

১। অনাদিনিধন পরমপিতা পরমেশ্বর লোকপিতামহ ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ (১) প্রকাশিত করেন। (২) ব্রহ্মা হইতে পর্য্যায়ক্রমে মুনিঋষিগণ কর্ত্তৃক ইহা নরজগতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। জ্যোতির্ব্বেদ ষড়ঙ্গ বেদ মধ্যে অন্যতম অঙ্গ এবং ইহা বেদের চক্ষু স্বরূপ। (৩) সামুদ্রিক শাস্ত্র জ্যোতির্ব্বেদের একটী শাখা।

২। সর্ব্বজগন্নিয়ন্তা ভগবান জগতে কীটানুকীট হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্য্যন্ত নানাবিধ জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাদের জীবন বৃত্তান্ত তদীয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানবগণকে পরিজ্ঞাত করাইবার নিমিত্ত প্রত্যেক জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে নানাবিধ চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন। উক্ত চিহ্নাবলী

---

[১] (ক) নিষ্ফলান্যন্য শাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলম্।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিনৌ॥

[১] (খ) অন্যান্য শাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং,
নতেষু কিঞ্চিদ্ভুবিদৃষ্টমস্তি।
চিকিৎসিত জ্যোতিষ তন্ত্রবাদাঃ,
পদে পদে প্রত্যয়-মাবহন্তি॥

[১] (ক) মীন শরীরাবচ্ছেদেন ভগবদ্বাক্যম (ন্যায় শাস্ত্রম)
(খ) ধর্ম্মপ্রতিপাদকমপৌরুষেয় বাক্যম (বেদান্ত শাস্ত্রম)
(গ) ব্রহ্মামুখ নির্গত ধর্ম্মজ্ঞাপকশাস্ত্রম (পুরাণম)
(ঘ) ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্ট পরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো বেদয়তি স বেদঃ।

[২] জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ (ভাগবতম্)

[৩] (ক) শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গণঃ।
ছন্দোবিচিতিরিত্যেতৈঃ ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে॥
(খ) ছন্দঃ পাদৌতু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়ণং চক্ষু নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে (শিক্ষা)
গ্রহণাদি গণন শাস্ত্রং জ্যোতিঃ।

আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র ভগবানের শ্রীহস্ত লিপি (৪)। তবে আমরা উহা পড়িতে পারি না কেন? ইহার কারণ, পারশী ভাষা যদি আমরা না জানি এবং উক্ত ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থ যদি আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয়, তাহা হইলে গ্রন্থখানি যেরূপ আমাদিগের নিকট কতগুলি চিহ্নের সমষ্টি বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ভগবানের শ্রীহস্ত লিখিত জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্থ ভাষাও কেবল মাত্র কতকগুলী চিহ্নের সমষ্টি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সামুদ্রিক শাস্ত্রাভিজ্ঞ গুরুর নিকটে অধ্যয়ন করিয়া উক্ত চিহ্নাবলীর গূঢ়মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলে ইহার কাঠিন্য দূরীভূত হইয়া পরিশেষে অপার আনন্দ প্রদান করিতে থাকে।

৩। সামুদ্রিক শাস্ত্র কি? সামুদ্রিক শব্দের অর্থ দুইটী যথা:—যাহা মুদ্রার (চিহ্নের) সহিত বর্ত্তমান এবং যাহা সমুদ্র সম্বন্ধীয়। এই শাস্ত্রের সম্বন্ধে বহুপ্রকার মত ভেদ আছে। কোন কোন শাস্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে শাস্ত্র সমুদ্র কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছিল তাহাই সামুদ্রিক শাস্ত্র (১) কোথাও বা উক্ত আছে যে এই শাস্ত্র দেবাদিদেব শিবের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল (২) এবং

৪। ক-বিধাত্রা লিখিতা যাতু ললাটেঽক্ষর মালিকা।
জ্যোতির্ব্বিত্তাং বিজানীয়াদ্বোরা নির্ম্মল চক্ষুসা॥
খ—ললাটে লিখিতং যত্তু ষষ্ঠীজাগর বাসরে।
নৃহরিঃ শঙ্করঃ ব্রহ্মাঃ নান্যথা কর্ত্তুমর্হতি॥

গ—Benham, in his work published in Columbus in 1900, has mentioned that, "He made the human hand a reflection of the brain, and He wrote in it a language plain, simple, and easy to understand, which He intended that we should use for our benefit, for He put in human brains the key by which this language could be read. But man all-important in his own wisdom, yet with ignorance as dense as night, has been blind to his own advantages and refused to decipher the story plainly written for his guidance."

ঘ—"He sealeth up the hand of every man, that all men may know his work" (Thirty-seventh Chapter of the Book of Job, verse 7.)

* হস্তের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল:—

(ক) "The superiorty of man is owing to his hands". (Anaxagoras)

(খ) "The hand is the organ of organs, the active agents of the passive powers of the entire system." (Aristotle)

(গ) "We ought to define the hand as belonging exclusively to man, coresponding in its sensibility and motion to the endowment of his mind." (Sir Charls Bell)

(১) সামুদ্রিকম্—সমুদ্রোক্ত স্ত্রীপুংলক্ষণ গ্রন্থঃ, তদ্বিবরণং যথা—
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—কীদৃশঃ পুরুষো বন্দ্যোঽবন্দ্যোবা কীদৃশো ভবেৎ।
কন্যা বা কীদৃশী শস্তা গর্হিতা বাপি কীদৃশী॥
মহেশ উবাচ—শৃণু কৃষ্ণ প্রবক্ষ্যামি সমুদ্র বচনং যথা—
লক্ষণস্তু মনুষ্যাং একৈকেন বদাম্যহম্॥
বামভাগেতু নারীণাং দক্ষিণে পুরুষস্য চ।
নির্দ্দিষ্টং লক্ষণং তেষাং সমুদ্রেণ যথোদিতম্॥

। শিবোক্তং তন্ত্রসামুদ্রং কররেখা শুভাশুভম্।
যস্য বিজ্ঞান মাত্রেন পুরুষো নহি শোচতি॥
অজ্ঞাত্বা লক্ষণং হ্যেতৎ নরোহি কার্য্যমাচরেৎ।
তস্মাৎ দুঃখমবাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

অন্যমতে যে শাস্ত্রের সাহায্যে মানবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন ও যাবতীয় চিহ্নাদি দৃষ্টে বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ ঘটনাবলী বর্ণন করা যায় তাহাই সামুদ্রিক শাস্ত্র।

৪। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন ও চিহ্নাদি দেখিব কেন এবং রেখাদির উৎপত্তিই বা হয় কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অল্প বা অধিক সঞ্চালন হেতু ক্ষুদ্রত্ব বা বৃহত্ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং চর্ম্মের আকুঞ্চন ও প্রসারণ হেতু চিহ্ন বা রেখাদির উৎপত্তি হয়। কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে জগতের প্রায় সকল লোকই চিন্তাপ্রবণ চিত্ত; তন্মধ্যে কেহ বা অধিক কেহ বা অল্প। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম যে চিন্তাকালীন ভ্রূযুগল ও কপাল কুঞ্চিত হইয়া থাকে। যাহারা অধিক চিন্তাকারী তাহাদের ভ্রূযুগল ও কপাল চিন্তাকালীন চর্ম্মের আকুঞ্চন ও প্রসারণ হেতু অধিককাল কুঞ্চিত থাকিতে থাকিতে রেখার ন্যায় চিহ্নে পর্য্যবসিত হয়। অতএব সাধারণতঃ এই চিহ্ন দ্বারা জানা যায় যে কোন নির্দ্দিষ্ট মানব চিন্তাকারী কিনা। তাহা হইলে কোন মানবের কপালে উক্ত প্রকার রেখা দৃষ্ট হইলে কেন তাহাকে চিন্তাকারী বলা যাইবে না?

৫। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উক্ত আছে যে অধিক চিন্তা করিলে অঙ্গুলীর অগ্রভাগে অধিকতর রক্ত সঞ্চিত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করে, অতএব ইহাও চিন্তাপ্রবণতার চিহ্ন।

৬। শারীরিক অস্বাস্থ্য বা অন্য কোন কারণে রক্তের অল্পতা হেতু শরীর শিথিল ও শুষ্ক হইলে করতলের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশস্থ পর্ব্ব নত হইয়া পড়ে ও সমগ্র করতলের চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া যায় এবং অবশেষে রেখায় পরিণত হয়। তবে ঈদৃশ কারণে উৎপত্তিজনিত রেখার ফলাফল তাদৃশ মিলে না।

৭। রেখাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে সামুদ্রিক গ্রন্থাদিতে অনেক প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে, জাতকের জন্মের পর হস্তের আকুঞ্চন ও প্রসারণ হেতু এবং হস্তদ্বারা কাজকর্ম্ম সম্পাদন জন্য রেখাদির উৎপত্তি হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহা সততই পরিলক্ষিত হয়, যে, জাতক করতলের রেখাদি সহই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। মাতৃগর্ভে হস্ত কুঞ্চিত অবস্থায় থাকা হেতু এবং করতলের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ থাকা নিবন্ধন বিভিন্ন প্রকার মস্তিষ্ক বিশিষ্ট জাতক বিভিন্ন প্রকার রেখাদি সহই জন্মগ্রহণ করে। (১) তবে ২৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানবের

১। (ক) About the lines of the Palm, Mr. Benham, in his work, stated that, "Just as the nose will become the future organ of sense of smell, the ear of hearing, the eye of sight, so the lines in the hand are prepared and in the hand, ready to receive the spark that will set the entire machinery in motion And when the vital spark of life has entered the body, as we believe through the ends of the fingers, and causes the nose, eyes and ears to perform their functions, it at the same moment causes the hand to do its part."

(খ) On the plain of the hands also, Mr. Hearon Allen mentioned, the papinllea (which do not all contain a tactle corpuscle) occur in great numbers, and are arranged in regular rows; it is these rows of corpuscles which causes the lines in the hands."

(গ) "It is a well-known fact that there are more nerves in the hand than in any other part of the body, and in the palm they are more numerous than in any other part of the hand. The palms also contain a great number of corpuscles, which are arranged in regular rows, and are considered to be a cause of the lines in the hands. A science which has been firmly believed in and practised by men of great learning ought not to be lightly treated by those who have never made it a subject of study." (W. H. Cotton, Future, Jan. 1893)

জীবনের গতি স্থির হয় না বলিয়া প্রধান প্রধান রেখার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইতে দেখা যায়। উক্ত বয়সের পর প্রধান রেখাদির কচিৎ পরিবর্ত্তন হয় ও সূক্ষ্ম রেখাদি কখন কখন করতলে নিপতিত হয় বা লুপ্ত হয়।

৮। হস্ত সামুদ্রিক, পদ সামুদ্রিক, কপাল সামুদ্রিক ইত্যাদি বহুবিধ ভাগে বিভক্ত সামুদ্রিক শাস্ত্র মধ্যে হস্ত সামুদ্রিক খণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন? মানবগণের মস্তিষ্ক মধ্যে নিত্য নূতন চিন্তার আবির্ভাব হইতেছে এবং উক্ত চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মানব কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। মস্তিষ্ক চালনার সহিত করতলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কারণ মস্তিষ্ক মধ্যে যতগুলি বিভিন্ন স্থান আছে তাহার প্রত্যেক স্থানের সহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা মূল ও স্থূল স্নায়ুর সহিত যোগ আছে। এই মূল স্নায়ু মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া গলদেশের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ শরীরের অধোমুখে গমন করিয়াছে। ইহার দুইটী প্রধান শাখা দুই করতলাভিমুখে গমন করতঃ বহু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা স্নায়ু মণ্ডলীতে বিভক্ত হইয়া সমগ্র করতলে বিস্তৃত হইয়াছে। অতএব শরীর ও মনের যাদৃশ অবস্থাই হউক না কেন সমস্তই মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয় এবং মস্তিষ্কের সহিত করতলের পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ নিবন্ধন করতলে সকলই পরিলক্ষিত হয়। (১)

মস্তিষ্কের যে বিভিন্নাংশ যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার বিবরণ ও চিত্র শরীর বিজ্ঞানের বিবিধ পুস্তকে তাহা দেখা যাইতে পারে।

৯। মানবের আত্মারশক্তি, জীবনীশক্তি এবং শারীরিক বল করতল পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করা যায় কিনা? মানবশরীরে বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই তিনটী যতক্ষণ সম অবস্থায় থাকে ততক্ষণ মনুষ্য সুস্থ শরীরে থাকে, কিন্তু উহার মধ্যে একের বৈষম্য হইলেই মানব ব্যাধিগ্রস্ত হয়। উক্ত বৈষম্য জনিত ব্যাধির লক্ষণ হস্তের নাড়ী ধরিয়া বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় এবং

১। (ক) As regards the nerve-fluid, Abercrombie in his work published in London, in 1839, stated that "The communications of perception from the senses to the mind has been accounted for by the motions of the nervous fluid, as a subtle essence resembling electricity or galvanism."

(খ) Seeing the significances of the mounts of Jupiter, Saturn etc., Mr. Benham in his work mentioned that, It may be asked, 'why do the mounts identify these types?' To this question, the answer must be given, that at this time we have not fully solved the mystery, but there are some facts leading in that direction which will doubtless in time give us a full explanation of the matter ; for we know that the haman hand, which is the servant of brain and which executes all of the work we do, only operates in response to the comands of the brain. Sever the connection between hand and brain by cutting the complex system of nerve telegraph uniting the two (as in paralysis), and the hand becomes like a lump of putty, dead and useless. The hand which is the most useful instrument ever created, cannot perform one act by itself, for there is no brain or intelligence located in the hand to direct it, but all that it does is by command of the brain, the seat of mind and intelligence, which is located at considerable distance from the hand itself: It shows that the hand is entirely dependent on the brain for its intelligence, and that, being the servant, it reflects the kind of brain behind it by the manner and intelligence with which it performs its duties It is a well accepted fact that the centre of the brain, which is in connection with the hand, has been located, and dissections show that different formations of this brain centre are found accompanied by differently shaped hands. This proves that the hand physically shows what kind of a brainis directing it."

বৃদ্ধাঙ্গুলীটী দৃঢ় করিলে নাড়ীর গতির বৈষম্য ঘটে। ইহাতে দেখা যায় যে হস্তের অন্যান্য অঙ্গুলী অপেক্ষা বৃদ্ধাঙ্গুলীর সহিত এই নাড়ীর অধিক সম্বন্ধ আছে। মৃত্যুকালে মানবদেহ পদতলাভিমুখ হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে শীতল হইয়া আসিতে থাকে, এবং যে পর্য্যন্ত না গলদেশের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত শীতল হয়, সে পর্য্যন্ত হস্তে নাড়ীর গতির বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎপরে প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর গতি বন্ধ হইয়া যায়। অতএব প্রাণবায়ুর সহিত হস্তের নাড়ীর সম্বন্ধ, এবং নাড়ীর সহিত বৃদ্ধাঙ্গুলীর সম্বন্ধ থাকায় বৃদ্ধাঙ্গুলীর আকৃতি (বৃহত্ত্ব বা খর্ব্বত্ব) এবং অবস্থা করতলাভিমুখে নত বা উন্নত দৃষ্টে আত্মার শক্তি, জীবনীশক্তি এবং শারীরিক বল ইত্যাদির পরিমাণ নিরূপণ করা যাইতে পারে। এবং উক্ত নিরূপিত বিষয়ের সাহায্যে আয়ুও স্থূলতঃ নির্ণয় করা যাইতে পারে। ইহাদ্বারা আরও বুঝা যায় যে, যাহারা কথা বলিবার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলীটী মুষ্টিবদ্ধ করিয়া হস্তসঞ্চালন দ্বারা প্রাণের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে তাহাদের মানসিক শক্তি কম এবং তাহারা আত্ম-নির্ভরশীল নহে।

১০। আরও দেখা যায় যে যখন বালক বালিকা ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাহাদের শরীর বা মনের এমন কি জীবনীশক্তিরও কোন ক্ষমতা থাকে না বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী করমুষ্টির মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ থাকে। ক্রমে ক্রমে জীবনীশক্তির বৃদ্ধির সহিত অন্যান্য শক্তিগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তৎসহ বৃদ্ধাঙ্গুলীও ক্রমশঃ মুষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া বহির্ভাগে আগমন করিতে থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুলী যদি জন্মের পর কিছু দিনের মধ্যে মুষ্টির সীমার বাহিরে না আসে তাহা হইলে জাতক ক্ষীণজীবী হইয়া থাকে।

১১। যাহারা বিকৃত মস্তিষ্ক (পাগল) তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিতে অতীব ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল হইয়া থাকে। প্রায়শঃ তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর আকৃতিরও সাধারণ বৈষম্য ঘটে (১)। বৃদ্ধাঙ্গুলী সম্বন্ধে প্রচলিত কতকগুলি কিংবদন্তী নিম্নে প্রদত্ত হইল (২)।

১২। জীবনী শক্তির সহিত হস্তের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা? হস্তমধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলীর সহিত জীবনী শক্তির যথেষ্ট নৈকট্য সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। কারণ বার্দ্ধক্য বা অস্বাস্থ্য হেতু যখন জীবনীশক্তি হ্রাসত্ব প্রাপ্ত হয় তখন বৃদ্ধাঙ্গুলীও ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলদেশাভিমুখে গমন করিতে থাকে। ইহার প্রমাণ মৃত্যুর পর প্রায় সকল লোকেরই বৃদ্ধাঙ্গুলী বক্র হইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলদেশাভিমুখে নত থাকিতে দেখা যায়। অতএব যদি কোন ব্যক্তির শরীরে বহির্দৃষ্টে কোন অস্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ না পায়, এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীটী করমধ্যাভিমুখে নত হইয়া পড়ে তাহা হইলে

১। (ক) "If one will visit the asylums of the country, he cannot fail to notice that all congenital idiots have very weak, poor thumbs; infact, some are so weak as not to be properly developed even in shape." Language of the hand.

২। (ক "The thumb individualize the man"

(খ) "Witness my thumb and seal" (for contracts.)

(গ "We may lick thumbs on that."

(ঘ) "Do you bite your thumb at us Sir ?" (for challange)

কেন বলা যাইবে না যে উক্ত ব্যক্তির শরীরে কোন গুপ্ত কঠিন রোগের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা জীবনীশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে (২)।

১৩। বক্ষস্থলের সহিত করতলের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা ? এই প্রশ্নের উত্তর মৎপরীক্ষা ক্ষেত্রের একটী বিশিষ্ট উদাহরণ দ্বারা বিশেষ প্রমাণিত হইবে বলিয়া সন্নিবেশিত হইল। গত ১৩৩৭ সালের ৬ কার্ত্তিক তারিখে কলিকাতার অন্তর্গত হাটখোলা নিবাসী কোন পাট ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারীর হাত দেখিতে যাইয়া দেখিলাম উভয় করতল শরীরের আয়তন অনুসারে ক্ষুদ্র, অঙ্গুলী সকল দীর্ঘ, উচ্চ গ্রন্থি বিশিষ্ট, মূলদেশ ক্ষীণ, নখ সংযুক্ত পর্ব্ব ও নখ অতিবৃহৎ, নখগুলি দীর্ঘ, কচ্ছপপৃষ্ঠবৎ এবং শ্বেত চন্দ্র বিশিষ্ট। (অনুমান সাহায্যে এতদূর বলা যাইতে পারে যে তার কনিষ্ঠাঙ্গুলীর নখ সাধারণ বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখ অপেক্ষা ৫ বৃহৎ।) আমি করতলের এরূপ অবস্থা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলাম, "আপনার বক্ষস্থল সম্বন্ধীয় ব্যাধি হইয়াছে ও মানসিক শক্তির অত্যন্ত ন্যূনতা পরিলক্ষিত হইয়াছে।' উহার দক্ষিণ হস্তের নখ অপেক্ষা বামহস্তের নখ অধিক বৃহত্ত্ব দৃষ্টে বলিলাম, "আপনার বক্ষস্থলের দক্ষিণভাগ অপেক্ষা বামভাগ অধিক দোষ দুষ্ট হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি কোন চিহ্নের সহায়তায় ইহা স্থির করিলেন ?" তদুত্তরে আমি বলিলাম, "আপনার নখের বৃহত্ত্বই ইহার মূলচিহ্ন।" তখন তিনি তাহার নখের বৃহত্ত্বের রহস্য ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন "আমি আমার বাল্যবয়সে একবার কোন গাছ হইতে পড়িয়া যাই এবং আমার বক্ষস্থলের বামদিগের একখানি হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। আমি চিকিৎসার পর নারোগ হই বটে কিন্তু ব্যাধি আরোগ্যান্তে আমার করতলের অঙ্গুলীর নখ সকল ও অগ্রভাগ ক্রমে ক্রমে এইরূপ হইয়া যায়। আমার বিশেষ স্মরণ আছে যে বাল্যকালে বৃক্ষ হইতে পতনের পূর্ব্বে আমার হাতের অঙ্গুলী বা অঙ্গুলীর নখ সকল এইরূপ ছিল না।" তখন তিনি

২। (ক) It is mentioned in Mr. Cheiroe's work, which was published in 1895, that, "One will see that, as death approaches and the reason goes, the thumb loses its power and drops in on the hand, but that if the reason has only faded temporarily the thumb still retains its power and there is hope of life."

(খ) Mr. Benham in his work added that, "Epileptics also show comfirmations of the thumb quality just before a seizure and before any other warning has been given, the thumb closes in in the palm. It is beyond the power of the palient's will, and its indicator. the thumb gives way and hides itself.........when, however, the thumb folds into the palm, the bra'n is much disturbed and the will cannot hold out a great deal longer"

(গ) Mr Ida Ellin, in his work stated, "What is the meaning of the thumb being folded in the hand ? - The thumbs of the infants are habitually closed over by fingers, because their character is not unfolded, as they have not started to think or act for themselves, but as they do so their thumbs become covered less and less. It is worthy of note that idiots invariably lay their thumbs in their hands with their hands with their fingers over them, thus showing that the will or logic is sleeping or absent In death the thumb frequently retires, as it were, indicating that will and logic are leaving the house of clay, for the thumb, which is the sign of active intelligence, is no longer required. I have also noticed that in cases of partial paralysis, and of prolonged rheumatism the thumb often folds itself in the hand unconsciously, so that it is necessary to ascertain whether there is any disea e in the system before passing judgement upon the intellect from this position of the thumb alone : although where otherwise in good health. the possess or of the folded thumb lacks ability to govern and direct his own affairs,

তাহার বক্ষস্থল দেখাইলেন। দেখিলাম, বামবক্ষের স্তনচিহ্নের পার্শ্বস্থ একখানি অস্থি ভগ্ন। উহার জন্য দক্ষিণ বক্ষস্থল অপেক্ষা বাম বক্ষস্থল কথঞ্চিৎ নিম্ন ভাব ধারণ করিয়াছে এবং উক্ত পতন-বয়স হইতে শারীরিক বল, মানসিক শক্তি ইত্যাদি ন্যূন হইয়া আসিতেছে। ইহাদ্বারা বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, করতলের সহিত বক্ষস্থলের যথেষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে।

১৪। কোন রোগের সহিত করতলের সম্বন্ধ আছে কিনা? আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুসারে কতগুলী ব্যাধির লক্ষণ করতলের বর্ণের দ্বারা বিশেষ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন, যাহাদের শরীরে পিত্তাধিক্য তাহাদের করতল এবং পদতল হইতে সর্ব্বদাই ঘর্ম্ম নির্গত হয় এবং তৎসহ করতলের বর্ণও অস্বাভাবিক রক্তিমাভ হইয়া থাকে; অতএব কোন ব্যক্তির করতলের ঈদৃশ অবস্থা দৃষ্ট হইলে নিশ্চয়ই নির্ণয় করা যাইতে পারে যে উক্ত মানব পিত্তাধিক্য-শরীর-বিশিষ্ট।

১৫। যাহাদের শরীর যকৃৎ সম্বন্ধীয় রোগগ্রস্ত তাহাদের মুখ এবং চক্ষুর বর্ণ হরিদ্রাভ হয়, তৎসঙ্গে করতলের বর্ণও হরিদ্রাভ হইয়া থাকে এবং এমন কি অনেক সময় করতলস্থ রেখাদির বর্ণও হরিদ্রাভ দৃষ্ট হয়। অতএব হরিদ্রাভ করতল বিশিষ্ট মানব দৃষ্ট হইলে "উক্ত মানবের শরীরে যকৃৎ সম্বন্ধীয় রোগের প্রকোপ আছে" ইহা প্রায় নিশ্চয়তার সহিতই বলা যাইতে পারে।

১৬। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুসারে বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা বাতব্যাধির লক্ষণের নিরাকরণ হইয়া থাকে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর চিকিৎসা দ্বারা উক্ত রোগের উপসমও হইয়া থাকে। (১)

১৭। প্রাচীনকালে বৃদ্ধাঙ্গুলীর চর্ম্মদৃষ্টে আসামীদিগকে দোষী কি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করা হইত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত কলঙ্কিনক মহামতি মিঃ ফ্রান্সিস্ গলটন্ বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা দোষী কি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিবার সহজ পন্থা উদ্ভাবন করিয়া লণ্ডন সহরবাসীদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। অতএব বৃদ্ধাঙ্গুলীর আকৃতির সহিত মানবের অন্তর নিহিত দোষাবলীরও বিশেষ সম্বন্ধ আছে নিশ্চিত।

১৮। করতলের বিভিন্ন প্রকার বর্ণের সহিত মানব শরীরের কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে কিনা? করতলের বর্ণ বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে রক্তাভ, হরিদ্রাভ এবং পাংশুবর্ণাভ এই তিন প্রকারই প্রধান। করতলের বর্ণ বিভিন্ন প্রকার হইবার কারণ কি? প্রথমতঃ দেখা যায় যে যাহাদের শরীর সুস্থ, সবল এবং কোন প্রকার ব্যাধিহীন তাহাদের করতল স্বাভাবিক রক্তিমাভ। যাহাদের শরীর অস্বাস্থ্য হেতু রক্তহীন তাহাদের করতলের বর্ণ রক্তাভাবহেতু পাংশুবর্ণাভ হয় এবং শরীরের শুষ্কতার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশস্থ পর্ব্ব নত হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে বলে "যাহাদের করতল পাংশু বর্ণাভ হয় তাহাদের কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না এবং তাহারা স্বার্থপর হয়।" ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, যাহাদের দেহ রক্তহীন তাহাদের

১। Mr. Cheirs, in his work published in America in 1894, mentioned tha', "It is a well-known fact among the specialists of nerve disease that by an examination of the thumb they can tell if the patient is affected or is likely to be affected by paralysis or not, as the thumb will indicate such a likelihood a long time before there has appeared the slightest trace of such a disease in any other part of the system. If it indicate such an affection, an operation is at once performed on the thumb centre of the brain, and if the operation is successful (which is again shown by the thumb) they have baffled the disease and the patient is saved."

মনও নিস্তেজ। মন নিস্তেজ হইলে কোন কার্য্যই করিতে ইচ্ছা হয় না, এবং কার্য্য না করিলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের পথিপার্শ্বস্থিত অভাব রাক্ষসীর কালকবল হইতে নিস্তার লাভ করা সুকঠিন। কিন্তু পাংশু বর্ণাভ করতল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মনের তেজের ন্যূনতা হেতু কার্য্য সম্পাদনে অনিচ্ছা বশতঃ কোন কার্য্যের সামান্য অংশ করিয়া বা না করিয়াই তৎফল লাভ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহে। এই অবৈধ উপায় অবলম্বন জন্যই তাহারা মানব সমাজে স্বার্থপর বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়। (১)

১৯। করতল দৃষ্টে মানব শরীরের বৈদ্যুতিক শক্তির আধিক্য বা ন্যূনতার নিরাকরণ করা যায় কিনা? মানব শরীর মধ্যে পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী, ভ্রূমধ্য এবং হস্তের তর্জ্জনী এই তিন স্থানে বিদ্যুতের সম্বন্ধ অধিক। ইহার প্রমাণ, যখন কোন মনুষ্য নিদ্রা যায় তখন তাহার ভ্রূমধ্য লক্ষ্য করিয়া (তাহাকে স্পর্শ না করিয়া) তাহার ভ্রূমধ্যের অতি সন্নিকটে তর্জ্জনী স্থাপন করিলে বিদ্যুতের স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গতি হেতু উক্তস্থান বারম্বার কম্পিত হইতে থাকে ও নিদ্রিত ব্যক্তি চমকিত হইয়া উঠে এবং তৎসহ তাহার নিদ্রাও ভঙ্গ হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ উদ্যানে ভ্রমণ কালে যদি আমরা কোন তরুণ ফল দেখিবার বা দেখাইবার জন্য তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করি তাহা হইলে উক্ত ফলটী বিদ্যুতের আকর্ষণ বিকর্ষণাদি গতি সহ্য করিতে না পারিয়া জীবনীশক্তিহীন হইয়া ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়। তৃতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই যে, সাধারণতঃ মানব যখন প্রতিজ্ঞা সূচক, প্রমাণ সূচক অথবা কোন স্বভাবসিদ্ধ সত্যসূচক কথা তর্কক্ষেত্রে বলে, বা তর্জ্জন গর্জ্জনাদি দ্বারা কোন কথা প্রকাশ করে, তখন তর্জ্জনী ব্যতীত অন্য সকল অঙ্গুলী মুষ্টিবদ্ধ করিয়া প্রাণের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। ইহাদ্বারা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, তর্জ্জনী অঙ্গুলীটি প্রাণের তেজপ্রকাশক। তর্জ্জন গর্জ্জনাদি ক্ষেত্রে এই অঙ্গুলীটি প্রদর্শন করাইয়া প্রাণের ভাব ব্যক্ত করা হয় বলিয়াই বোধ হয় প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এই অঙ্গুলীটির নাম তর্জ্জনী রাখিয়া ছিলেন। সে যাহা হউক, তর্জ্জনী অঙ্গুলীটি সুশ্রী, সুগঠিত ও আকৃতিগত সর্ব্বপ্রকার সুলক্ষণ যুক্ত হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণ সাহায্যে জাতকের শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তির ও প্রাণের তেজের আধিক্যের সূচনা কেন করিবে না?

২০। করতল বৃহৎ বা খর্ব্ব হয় কেন? করতলের বৃহত্ব বা খর্ব্বত্ব সম্বন্ধে দেখা যায় যে, মানবজাতি শরীর মধ্যে যে অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ যতই অধিক পরিমাণে সঞ্চালন করে, সেই অঙ্গ বা

(১) About the color, Mr. Benham, in his work, mentioned that, "Physiollogically considered, blood which produces color performs two most important functions. It swiftly courses through our veins and arteries, absorbes and carries away impurities, and at the same time renews and sustains life. These impurities, which the blood absorbes, carbonize it, and unless this life current flowing through us is itself renewed, it will turn to poison Nature has provided for this emergency a most wonderful machine, called the lungs, whose functions it is to take into their cells fresh air, and to throw off the poisonous carbonic gas. * * * Thus renewed it returns through the veins to the heart, which receives it and pumps it out again to all parts of the system. In this manner blood is propelled to the outermost part of the body, the skin, and gives to it its color; it is the amount and quality of the blood that changes the color of the skim. It is well said that, "Blood is the renewer and sustainer of life," and therefore the color of the skin becomes, to the palmist, an all-important subject."

প্রত্যঙ্গ ততই কর্ম্মক্ষম হয় এবং আকারে বৃহৎ হয়। অতএব যে ব্যক্তি হস্তপাঙ্গা সম্বন্ধীয় শারীরিক পরিশ্রম যত অধিক পরিমাণে করে তাহার হস্তপাঙ্গা ততই কর্ম্মক্ষম ও অনুপাতানুসারে আকারে বৃহৎ হয়। ইহা দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে যে, বৃহৎ করতলবিশিষ্ট জাতক অধিক পরিমাণে হস্তপাঙ্গা সম্বন্ধীয় শারীরিক পরিশ্রমী হইবে।

২১। মানব জাতি বাক্য দ্বারা প্রাণের ভাব ব্যক্ত করিবার সহিত হস্তসঞ্চালন দ্বারা ও ইঙ্গিত করিয়া প্রাণের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। কথা বলিবার সময় ইঙ্গিত জন্য যে হস্তের গতি তাহা স্বভাবসিদ্ধ। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে মনের অবস্থার সহিত হস্তের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বিশেষতঃ বোবা লোকদিগের পক্ষে কর সঞ্চালন দ্বারা প্রাণের ভাবের অভিব্যক্তি ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অতএব বোবা লোকদিগের পক্ষে এই হস্তই বাকশক্তি সম্পাদনের কর্ম্ম করিয়া থাকে।

২২। বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশ এবং তর্জ্জনীর মূলদেশের মধ্যস্থান হইতে যে রেখা উত্থিত হইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশস্থ পর্ব্ব বেষ্টন করিয়া মণিবন্ধাভিমুখে গিয়াছে তাহাকে আয়ুরেখা (মতান্তরে পিতৃরেখা বা কর্ম্মরেখা বলে। এই রেখায় আয়ুবিচার করা হয় কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে স্থূলতঃ এই বলা যাইতে পারে যে বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশস্থ পর্ব্ব শরীরের রক্তের তেজ অনুপাতে স্থূল বা ক্ষীণ হয়। এই জন্যই ইংরাজীতে ইহাকে Great blood vessel বা Great palmer arc বলে। করতলের মধ্যস্থল সাধারণতঃ করতলের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান অপেক্ষা নিম্ন থাকে। যাহাদের শরীর সুস্থতা হেতু অনুপাত অনুসারে স্থূল, তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশস্থ পর্ব্বও অনুপাত অনুসারে স্থূল ও উচ্চ। যখন করতল মুষ্টিবদ্ধ করা হয় তখন বৃদ্ধাঙ্গুলী করমধ্যাভিমুখে আকর্ষিত হইলে উক্ত অঙ্গুলীর মূলদেশস্থ পর্ব্ব আসিয়া করতলের মধ্যস্থলে পতিত হয় এবং উক্ত দুই স্থলের মধ্য স্থলে সীমা রেখার ন্যায় একটী দাগ পড়ে এবং রেখায় পরিণত হয়। সাধারণতঃ যাহার বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশস্থ পর্ব্ব যত উচ্চ হয় তাহার জীবনী শক্তির ততই আধিক্য প্রকাশ পায়, এবং উপরি উক্ত কারণ জনিত রেখাও তত বড় হয়। অতএব স্থূলতঃ এই রেখা দ্বারা আয়ু নির্ণয় করা যাইবে না কেন ? যদিও মানব সর্ব্বদাই মৃত্যুর অধীন, যখন ইচ্ছা তখনই কাল কবলগ্রস্ত হইতে পারে, তথাপি জীবনী শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস হেতু অনুমান সাহায্যে উক্ত রেখার বৃহত্ব বা খর্ব্বত্ব দৃষ্টে জাতক দীর্ঘায় বা অল্পায়ু ইহা কেন আমরা স্থির করিতে পারিব না ?

২৩। মানব জাতির মধ্যে পুরুষের দক্ষিণ হস্ত এবং স্ত্রীলোকের বাম হস্ত বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিত কেন ? পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে নরনারীর উভয় হস্তের রেখা প্রায় একরূপই থাকে, তবে কখন কখন এই নিয়মের বিপর্য্যয়ও ঘটিয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীলোকের বাম অঙ্গ অধিক শক্তিমান ও কর্ম্মঠ এবং পুরুষের দক্ষিণ অঙ্গ অধিক শক্তিমান ও কর্ম্মক্ষম বলিয়া স্ত্রীলোকের দক্ষিণ হস্তের রেখা অপেক্ষা বাম হস্তের রেখা স্পষ্ট হয় এবং পুরুষের বাম হস্তের রেখা অপেক্ষা দক্ষিণ হস্তের রেখা স্পষ্ট হয়। এই জন্যই স্ত্রীলোকের বাম হস্তের রেখা এবং পুরুষের দক্ষিণ হস্তের রেখা দেখিয়া জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের ফলাফল বর্ণনা করা উচিত। (১)

১। (ক) বামভাগেতু নারীনাং দক্ষিণে পুরুষস্য চ।
নির্দ্দিষ্টঃ লক্ষণং তেষাং সমুদ্রেন যথোদিতম্

যে সকল পুরুষ স্ত্রী-স্বভাবাপন্ন তাহাদিগের বামহস্ত এবং যে সকল স্ত্রীলোকের স্বভাব পুরুষের ন্যায় তাহাদিগের দক্ষিণ হস্ত দেখিয়া জীবনের ফলাফল বর্ণন করা উচিত (১)।

২৪। পাশ্চাত্য বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত তাঁহাদিগের সর্ব্বজনসমাদৃত গ্রন্থাদিতে হস্তের বিশেষত্ব দেখাইয়া বহু বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটী নিম্নে প্রদত্ত হইল। (২)

ঈদৃশ আরও বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহা দ্বারা সহজেই বোধগম্য হয় যে, করতলের আকৃতির এবং রেখাদির সহিত মানব জীবনীর পূর্ণ মাত্রায় সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং সামুদ্রিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞতালাভ করিলে করতলের আকৃতি দ্বারা ও তন্মধ্যগত রেখাদির সাহায্যে মানবের ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান জীবনের যাবতীয় শুভাশুভ ঘটনাবলীর বর্ণন করা যাইতে পারে।

পল্লীসেবা

(কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পত্র।)

'পল্লীসেবা', 'দরিদ্রনারায়ণের সেবা' ইত্যাদি কথা ইদানীং বেশ চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃত পল্লীসেবার কাজ যে কোথাও কিছু হইতেছে তাহার প্রমাণ পাই না। গত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'পল্লীসেবা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমি তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহা এই—

বিনীত নমস্কার নিবেদনঞ্চ—

আপনি জগতে বিধাতার একটী শ্রেষ্ঠ দান, এ ভাবেই আমি আপনাকে দেখি। আপনার

(খ) It must be remembered that we use the left side of our brain more than we do the right hand And consequently it is this hand which denotes the developed or active brain, the left only giving the natural tendencies or inclinations" (Language of the Hand.)

(গ) "Length of days in her right hand, riches and honour are in her left " (Prov. iii. 16.)

(ঘ) " The left is the hand we are born with ; the right is the hand we make."

(ঙ) The left hand is most accurate in showing you the naturally designed map of his life, and the right hand will tell you how the subject has altered it." (Laws of scientific Hand-reading.)

১। নারদোক্ত করাবলোকনপ্রকারঃ যথা :—

স্ত্রিয়া বাম করং বামে স্বহস্তেন্যস্ত বীক্ষ্যতে।
যো নরঃ স্ত্রীপ্রকৃতকস্তং করো বীক্ষতে বুধৈঃ॥
দক্ষিণাং বলবান বামঃ পুংসঃ স্ত্রীশীল শালীনঃ।
নৃশীলায়াঃ স্ত্রিয়া বামাদ্ দক্ষিণো বলবান্ ভবেৎ॥

২। ক। "And receive his mark on his forehead or in his hands." (Rev. xiv. 9.)

খ। "What evil is in my hand ?" (Sam xxvi 18.)

গ। "He is a tell-man of his hands." (Shakespeare.)

ঘ। "I will swear to the Prince that thou art a tall fellow of thy hands." (Shakespeare)

ঙ। "By these hands, they are scoundrals and subtractors." (Shakespeare)

চ। "I am a proper fellow of my hands." (Henry iv, ii.)

অনেক কথায় প্রাণ নেচে ওঠে, আবার কোন কোন কথায় হতাশ হই। সম্প্রতি প্রকাশিত 'পল্লীসেবা' শীর্ষক প্রবন্ধের অনেক উক্তি যে নিখুঁত সত্য তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু পল্লীভবনের যে চিত্র অর্দ্ধশতাব্দীর উপর দেখে আসছি তাতে মনে হয় ইহার সমস্তটা দিকে আপনার দৃষ্টি পড়ে নি। তাই কয়েকটা কথা লিখ্‌ছি।

পল্লীর হৃদয়বিদারক চিত্রসমূহ আমার মনের উপর যেন ঝাপিয়ে পড়ছে। কোন্‌টির কাহিনী আগে বল্‌ব তাই ঠিক করতে পারছি নে। 'বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত করে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদকে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ্ সুপ্রতিষ্ঠিত করার' অতি সুন্দর ব্যবস্থা বহু যুগযুগান্তর ধরে আমাদের পল্লী-সমূহে ছিল। বেশী দিনের কথা নহে, ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও দেখেছি এক একটি গ্রাম এক একটি পরিবারের মতন ছিল, প্রতিবেশী গ্রামসমূহকে দেখ্‌তাম ভাই বন্ধুর পরিবারের মতন। বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হ'তে মূর্খ হাড়ী ডোম মুসলমান ও ধনী জমীদার হ'তে দীন ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই যেন এক পরিবারভুক্ত ছিল, বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ধর্ম্ম আচার প্রথা ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার সত্ত্বেও পরস্পরে মা বাপ ভাই বোন, কাকা ভাইপো মামা ভাগিনা খুড়ী মামী ইত্যাদি সম্বন্ধ পাতিত। এখনও তেমন সম্বন্ধ পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে দূরে অবস্থিত দরিদ্র পল্লীসমূহে চল্‌তেই আছে। তখন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের গৃহ ছিল সকলের জ্ঞানালোচনার আশ্রম, ধনীর গৃহ ছিল সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অন্নসত্র, সঙ্গে সঙ্গে কাঙালদের ভূরিভোজের ব্যবস্থাও সেখানেই হ'তো। তখন স্বগ্রামের উৎকর্ষ-সাধনের জন্যই কেহ জ্ঞানাহরণ ও কেহ অর্থাহরণের উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশ যেতেন। জমীদার, কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী ও চাকরীজীবী সকলেরই লক্ষ্য থাকতো নিজের একান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়ে সেরে উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা অন্নাদিদানবহুল পূজোৎসব শ্রাদ্ধপার্ব্বণ রাস্তাঘাটনির্ম্মাণ দীঘি-পুকুর খনন ইত্যাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণ প্রতিপালন, আত্মীয় বন্ধুর তৃপ্তিসাধন ও দীনদুঃখীর ভরণপোষণ করে পুণ্য ও যশঃ অর্জ্জন করা। বিলাসভোগের জন্য সুরম্য হর্ম্ম্য, গাড়ীজুড়ি মটোর বিজলির আলো কলের জল বা জিহ্বার লালসাতৃপ্তির জন্য পলাউ কালিয়া কোর্ম্মা চপকাটলেটের আয়োজন তাঁরা করতেন না। বর্ণানুসারে যতই নীচ বা অর্থের হিসাবে যতই দীন দরিদ্র হোক, তখন উচ্চ শ্রেণীর কেহ তাহাকে তুচ্ছ করছে বা চেপে রেখেছে এমন কথাও শুনতেম না। ধনীর বাড়ীর উৎসব ভোগ করতো গ্রামের সকলে, কারো পয়সা দিয়ে টিকেট করবার প্রয়োজন হ'তো না। দরিদ্রের বাড়ীতেও পুত্রকন্যার বিবাহে আমোদ উৎসব হ'তো পিতামাতার মৃত্যুতে শ্রাদ্ধাদি হ'তো, সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ বা সর্ব্বোচ্চ জমিদারকেও তাহার বাড়ীতে পাওয়া যেতো, সঙ্গতিশালীর গোলার ধান পুকুরের মাছ, ক্ষেতের শাকসবজি পেতে তার বাধা হ'তো না। তখন সেই শ্রেণীর সঙ্গতিশালী ও উপার্জ্জনক্ষম লোকেরা এইভাবে গ্রামের সকলকে এক সূত্রে আবদ্ধ করে রাখতেন আজ সেই শ্রেণীর লোকেরা যেন যোটবদ্ধ হয়ে সম্যকরূপে গ্রামের সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন; কেহ বিলাতে, কেহ কলিকাতায়, কেহ দিল্লীতে, কেহ রেঙ্গুনে, অন্যেরা অগত্যা স্বগ্রাম হ'তে ১০।১২ মাইল দূরবর্ত্তী নগরে গিয়ে বাস করছেন। মেয়েদের আধুনিক শিক্ষাবিধিও তার সহায় হয়েছে। দু'চার পাত বাংলা ও ইংরাজী পড়েই মালক্ষ্মীরাও আর পল্লীবাসে তৃপ্ত নহেন, কলের জল বিজলির আলো এবং মটোর ও সিনেমা না হ'লে তাঁদেরো আর চলে না।

আশী নব্বই বৎসর পূর্ব্বে মাসিক দেড় শ দু'শ টাকা উপার্জ্জন করে যিনি স্বীয় ভদ্রাসনকে নিত্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত সাধুসন্ন্যাসী প্রভৃতির ভজন পূজন সঙ্গীত কীর্ত্তন ও কথকথায় মুখরিত রাখিতেন, গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারণকে তদ্দ্বারা পরমানন্দ দান করতেন, যাঁর বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে শুধু একটি দু'টি গ্রাম নহে, সারা জেলাটা চল্‌তো, আজ তাঁরই পৌত্রেরা মাসিক চার পাঁচ হাজার টাকার অধিক উপার্জ্জন করলেও ৪।৫টি কপর্দ্দকও স্বীয় ভদ্রাসনের জন্য দেন না। আত্মীয় বন্ধু স্বগ্রামবাসীদের সহিত পরিচয়টুকু রাখার জন্যও দশ বিশ বৎসর পরে একবার গ্রামে আসাও কর্ত্তব্য বোধ করেন না। আপনার উপমানুসারে তাঁরা ভদ্র হয়ে কোন দ্বীপে বাস কচ্ছেন জান্‌তে পারলেও না হয় পল্লীবাসী তাঁদের অনুকরণ করে কৃতার্থ হ'তো। কিন্তু পশ্চিমের হাওয়া তাঁদেরে যে কোথায় উড়ায়ে নিয়ে গেছে তার সন্ধানই যে পাই না। আপনার ভাষাতেই বলি 'দেশকে মুক্তিদান করবার জন্য যাঁরা উৎকট অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁরাই যে সমাজের মধ্যে গুরুতর ভেদের কারণ, পক্ষাঘাতের' কারণ। 'তাঁদের দৃষ্টি সেখানে পড়বে' কি করে? অল্পদিনমধ্যে এই যে দুর্ঘটনা—যমের চরের আনাগোনা—আরম্ভ হয়েছে, ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় ছিদ্র বর্ণাশ্রমানুযায়ী স্বধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা বলেই ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তদ্দ্বারাই দেশের সুদৃঢ় যোগ-বন্ধন ক্রমশঃ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ফলে অপরিপক্ক মস্তিষ্কপ্রসূত পাশ্চাত্যভাবের নানা আন্দোলনে স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বধর্ম্ম ও সদাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা, আহার বিহারে যথেচ্ছাব এবং পরস্পরে বিষম বিদ্বেষ পল্লীবাসী নিরীহ নিরালম্ব লোকদের গ্রাস ক'রে ফেলছে।

মানব-সম্বন্ধের এই বিষম বিকৃতি যে আমাদের সমগ্র জাতিকে সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে চলেছে তা প্রত্যক্ষ করেও আপনি 'গ্রাম কয়েকটির মধ্যে প্রাণ উদ্বোধনের যজ্ঞ আরম্ভ করছেন এবং তেত্রিশ কোটীর ভার নেবার যোগ্যতা নেই' বলে সারা ভারতবর্ষকে বাদ দিচ্ছেন। ভগবান আপনাকে যেমন অসাধারণ শক্তিমণ্ডিত করেছেন, তেমনি যথেষ্ট সুযোগও দিয়েছেন। তার যথাযথ নিয়োগ দ্বারা পাশ্চাত্য যাবতীয় মোহকে এদেশ থেকে দূর করবার চেষ্টা করলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি শুধু ভারতের তেত্রিশ কোটীর কেন জগতের দেড়শ কোটী লোকের মোহ কাটাবার সূচনা করে যেতে পারেন। পল্লীর প্রাণ উদ্বোধনের জন্য আপনি কিরূপ যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন তা আমি অবগত নহি। ক্ষুদ্রের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন,—যদি আপনার এই উদ্যম এদেশের প্রাচীন বর্ণাশ্রমানুকূল সমাজের বিরুদ্ধ ও স্বতন্ত্র কিছু হয় তবে তা আর একটা ভেদের সৃষ্টি করবে মাত্র। বিরাট পুরুষ বুদ্ধদেব থেকে আরম্ভ করে যিনিই স্বতন্ত্র কিছু করতে গেছেন তিনিই একটা নূতন ভেদের সৃষ্টি করেছেন। আর আজ কাল এই যে গণ্ডায় গণ্ডায় অবতার ও আনন্দযুক্ত স্বামীর সৃষ্টি হচ্ছে, স্পষ্ট দেখ্‌ছি, তাঁদেরও কাজ দাঁড়িয়েছে এদেশের মেরুদণ্ডকে টুকরো টুক্‌রো করা এবং দেশটাকে পশ্চিমের ঘূর্ণাবর্ত্তে ঠেলে দেওয়া।

বিনয়াবনত

শ্রীকালীশঙ্কর দেবশর্ম্মণঃ।

সুচক্রদণ্ডী, পোঃ পটীয়া চট্টগ্রাম, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৭ বাং।

কবিবর এই পত্রের কোন উত্তর দেন নাই। এজন্য তাঁহাকে অনুযোগ দেওয়ার কিছুই নাই। কোথায় তিনি আর কোথায় এ অধম। অন্যান্য নব্য সংস্কারকদের ন্যায় তিনিও

প্রাচীন প্রথানুসারে উন্নতিসাধন কামনা করেন না, অথচ প্রাচীন কালের সুখশান্তি সমৃদ্ধি সকলই পূর্ণ মাত্রায় পাইতে চাহেন। এক একজন নব্যসংস্কারক এক একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর সৃষ্টি করতঃ যে তাহারই অচির ধ্বংসের কারণ হইয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও যে ইহারা শুধু ভাঙ্গিয়া গড়ার জন্য ব্যাকুল, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

যাঁহারা প্রাচীন প্রথাকে শ্রদ্ধা করেন, প্রাচীন প্রথা এখনও জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া তাহার সংরক্ষণ একান্ত আবশ্যক মনে করেন, আমার বিনীত নিবেদন তাঁহারাই একবার এই দিকে দৃষ্টিপাত করুন। হিন্দু জাতি মুমূর্ষু বটে, যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করিলে এখনও তাহার বাঁচিয়া উঠিবার যথেষ্ট ভরসা আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য বিপ্লবের স্রোত যেমন ভীষণ ভাবে ইহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে তাহাতে শুধু হা হুতাশ করিলে চলিবে না। প্রাণমণ যথাসর্ব্বস্ব লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। —শ্রীকালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

দিগ্‌দর্শন

উন্নতির প্রহেলিকা

মানব সভ্যতার আদিম যুগের বিষয়ে সাধারণ ভাবে বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আজ আমারা যে সভ্যতার গর্ব্ব করিতেছি—কি জ্ঞান, কি চরিত্র ইহার কোনও দিক দিয়াই আমরা সেই প্রাচীনকাল হইতে অতি অল্প দূরই অগ্রসর হইয়াছি—হয়ত মোটেই অগ্রসর হই নাই—এ ওয়ালেস্।

ভাষার চাতুরী—"প্রগতি"

আজ বাক্য ও পদ-বিন্যাসের দিন! লোকে না বুঝিয়াই ইহাতে প্রতারিত হইয়া চলিয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রতারণার রাজত্ব—বাক্য ও সুচারু পদ-বিন্যাস তাহার অস্ত্র। ভাষা চিন্তার সেবক না হইয়া প্রভুর আসন গ্রহণ করিয়াছে। আজ উন্নতি (Progress) বলিয়া যে কথাটা লোকের মুখে মুখে শুনা যায় তাহাও এই ভাষা চাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—"There is no word which is more commonly used, and there is none the real meaning of which is so little understood. People generally consider running with the most powerful and apparently prosperous crowd as constituting 'Progress' without any consideration of the goal the path is likely to lead to" [P. N. Bose]—মূল 'Progress' কথার যদি এই দশা, তবে তার অন্ধ অনুবাদে যে 'প্রগতির' সৃষ্টি তার গতি কি!—ইতি শ্রোতা।

দোষ পরিহার

ভারতবর্ষের অবস্থা হীন হইয়াছে। আজি কালি ইংরাজেরা বিধি পূর্ব্বক, অবিধিপূর্ব্বক, সর্ব্ব প্রকারেই ভারতবাসীর নিন্দা করিতেছেন। ভারতবাসী নিজেও জানিতেছেন যে, তিনি কলহে মগ্ন, অসূয়াপরবশ, মিলনে অশক্ত, বিদ্যাহীন, ধনহীন এবং স্বল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু দোষ মাত্রই ধর্ম্মহানি হইতে জন্মে। অতএব শাস্ত্রে কলিযুগে যে ধর্ম্মহানির উল্লেখ আছে, তাহাতেই সমষ্টিভাবে এবং ব্যষ্টিভাবে সকল দোষের উল্লেখ হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ভারতবাসীর শাস্ত্রই ভারতবাসীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তিরস্কার করিয়াছেন এবং স্নেহময় পিতার ন্যায় তিরস্কারের সহিত তিরস্কারের অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কলি হইতে দোষ হইয়াছে। কলি জয়েই দোষের পরিহার হইতে পারে।—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়

শিক্ষা-সমস্যায়

(সাধনামূলক সংগঠন প্রস্তাব *)

আজ দেশের সম্মুখে নানাবিধ সমস্যা উপস্থিত। এ জন্য নানা উদ্দেশ্যে লোক নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছে।

এই সকল উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত এক বিশেষ প্রকার শিক্ষায়তনের প্রয়োজন। প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না, জাতীয় জীবনের আবশ্যকতা পরিপূর্ণ হয় না, এবং উহা বিজাতীয় ভাব ও প্রভাবে দূষিত। সময় সময় এদেশে জাতীয় শিক্ষার নামে যে সকল শিক্ষায়তন বা বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা প্রায়ই কোনও সাময়িক উত্তেজনার বশে, আদর্শবাদের প্রেরণায় বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (১)

সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতা হইতে শিক্ষাকে মুক্ত রাখিতে হইবে। উদার মনুষ্যত্বের (broad humanity র) দৃষ্টিতে, সমগ্র জাতির উন্নতি লক্ষ্য রাখিয়া, দেশীয় ভাব ও সংস্কার—বিশেষতঃ ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতিতে যে উদার ভাব ও পরম সত্যের বীজ নিহিত রহিয়াছে তাহার ভিত্তিতে—শিক্ষাকে মনুষ্যত্ব-বিকাশের সাধন মনে করিয়া—রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে শিক্ষার্থীকে উত্তমরূপে (কার্য্যকরী ও ব্যবহারিক ভাবেও) শিক্ষিত করিয়া, পরন্তু সাময়িক কোনও উত্তেজনায় তাহাদিগকে সংলিপ্ত না করিয়া—বিদ্যার্থীদিগের দ্বারা এক মহান্ জাতীয় সম্পদের সৃষ্টি ও মহামানবীয়তার গৌরব বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে—এই

---

* ভারতীয় সাধনামূলক শিক্ষাপরিষদের পক্ষ হইতে ভারতের সাধনা প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা পৃষ্ঠ ১ শিক্ষা ও জাতীয় সাধনা। প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১ আর্য্যসমাজের গুরুকুল কাংড়ী, সনাতনী হিন্দুদিগের ঋষিকুল হরিদ্বার, বাঙ্গলার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (বঙ্গ ভঙ্গের আন্দোলন কালীন); ও তদন্তর্গত জাতীয় বিদ্যালয় সমূহ; অসহযোগ আন্দোলন সময়ের ভারতব্যাপী অসংখ্য বিদ্যাপীঠ সমূহ; আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটী ইত্যাদি।

শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। স্থান ও অবস্থা ভেদে এই সকল **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুকুল, ঋষিকুল,** বিদ্যাশ্রম, শিক্ষাশ্রম, আচার্য্যাশ্রম, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন নামে কথিত হইতে পারে; স্থানের নাম বা কোনও ব্যক্তি বিশেষের নামেও উহাদের অভিহিত করা যাইতে পারে।

সুশিক্ষার অনুকূল নানা অবস্থায় ও ব্যবস্থায় এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইবে, যেমন—

(১) সৎসঙ্গ।—বিশেষতঃ আচার্য্য বা গুরুর সঙ্গে রাখিয়া তাঁহার চরিত্র প্রভাবে ছাত্রগণের চরিত্র গঠন,

'আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি
স্বয়মাচরতে যস্মাত্তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥"

আচার্য্যের এই লক্ষণ সার্থক করিয়া ছাত্র চরিত্র গঠন করা।

(২) ব্রহ্মচর্য্যপালন।—ব্রহ্মচর্য্য ভবিষ্যৎ মানুষ গড়িবার মৌলিক আধার বা প্রধান বল। ব্রহ্মচর্য্যে যে আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক তেজের সংমিশ্রণ রহিয়াছে, তাহা জগতে অজেয়। ছাত্রজীবনে যখন ভাবী সংসারসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, তখন এই ব্রহ্মচর্য্যের সম্যক পরিপালন ও পরিপোষণ একান্ত আবশ্যক; এজন্যই ছাত্রজীবনের নাম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।

(i) ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনের নিমিত্ত কতকগুলি বিশেষ নিয়মের ব্যবস্থা করিতে হইবে—বিশুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃজন—সমাজ, গৃহ ও বিদ্যালয়ের সাধারণ হাবভাব ও বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ ও পবিত্র রাখিতে হইবে। সহপাঠী, সহকারী বা অনুচর, দাস দাসী প্রভৃতির মধ্যে কোনও রূপ দুর্নীতির আচরণ না থাকে। কর্ত্তৃপক্ষ, গুরু বা শিক্ষক, পিতামাতা, অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়কগণ এজন্য সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

(ii) শরীরচর্চ্চা বা ব্যায়াম—সমুচিত ব্যায়াম বা শরীরচর্চ্চাদ্বারা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হইয়া থাকে। শারীরধর্ম্মের ইহা একটী গূঢ় কথা। শরীরের বিবিধপ্রকার উত্তেজনা বশে ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয়; শারীরিক শক্তির মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য না থাকিলেও ব্রহ্মচর্য্যে ব্যাঘাত ঘটে, এজন্য দেখা যায় দুর্ব্বল ও অলস প্রকৃতির লোকের মধ্যে উহার অধিক অভাব। শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা দৈহিক তেজ বা energyর একটী স্বাভাবিক গতি নির্দ্দিষ্ট হয়; ব্যায়াম দ্বারা শরীর দৃঢ় ও সবল হইলে শারীরিক তেজের মধ্যে একটী স্বাভাবিক সামঞ্জস্যও সংরক্ষিত হয়; এ অবস্থা ব্রহ্মচর্য্যসংরক্ষণের অনুকূল। শরীর চর্চ্চার অনুশীলনে রত, বালক ও যুবকগণ ইহার এই সুফল ভোগ করিয়া থাকেন। অনেক সাধু বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এইজন্যই ব্যায়ামচর্চ্চা, কুস্তী, ডন ইত্যাদি নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত। হিন্দু সাধনায় শরীরচর্চ্চার যে সকল বিধান আছে—আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি—তাহাও ইহার অনুকূল।

(iii) যম, নিয়মাদি—যাহা আশ্রম জীবনের অবশ্য প্রতিপালনীয়।—শারীরিক ব্যায়াম যেমন ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল শারীরিক অবস্থার উৎপাদন করে, যম-নিয়মাদি দ্বারা তেমনই উহার অনুকূল, এবং তদপেক্ষাও অধিক ফলপ্রদ, মানসিক ও আন্তরিক অবস্থা উৎপন্ন হয়।

(iv) আশ্রম-জীবন ও দৈনিক-কার্য্যপ্রণালী—গৃহে বালক বালিকাগণের দৈনিক কর্ম্মতালিকা এমন ভাবে নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে হইবে যে, তাহাতে ছাত্রগণ অলসতা বা দুষ্ট

আচরণের অবকাশ না পায়। বিশুদ্ধ আনন্দের রসে তাহাদিগের চিত্তমন এমন অভিভূত করিয়া রাখিতে হইবে যে, কোনওরূপ দূষিত আমোদ প্রমোদের দিকে তাহাদিগের চিত্ত ধাবিত হইতে পারিবে না।

v। নীতি বাক্যাদির উপদেশ এবং সংনীতি, সদ্‌-সাহস ও আত্ম-সম্মান-সূচক সদ্‌-কাহিনী, পৌরাণিক বৃত্তান্ত ও মহাপুরুষগণের জীবন চরিত্র ব্যাখ্যান।—যাহাতে কেবল শ্রবণ মাত্রে নহে, পরন্তু বালক বালিকাগণের চরিত্রের উপরে প্রভাব পড়ে ও জীবন কার্য্যতঃ গঠিত হয়, এমন ভাবে।

(vi) ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ধর্ম্ম-ভাবের প্রতিষ্ঠা।—ধর্ম্মে সকলেরই জীবন সংশোধন করে; এমন সংশোধক সাধন আর কিছু নাই। শিশুকাল হইতেই বালক বালিকা দিগকে এতটুকু ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হয়, যাহাতে তাহাদিগের শরীর ও মন বিশুদ্ধ থাকে। ভক্তি ও শ্রদ্ধা শিক্ষা দ্বারা মানব চরিত্রের অনেক দূষিত ভাব বিদূরিত হয়। এসকল দ্বারা জীবনের অসাধারণ সংস্কার সাধিত হয়।

৩। যথাসাধ্য প্রাকৃতিক আবহাওয়াতে স্বাধীন ও অনায়াসসাধ্য শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন।—প্রাকৃতিক বস্তু সকলের পর্য্যবেক্ষণমূলক শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন; বৃথা পুস্তকের ভার না চাপান—কিন্তু নিয়ম ও সংযমের মধ্যে রাখিয়া শিশুদিগের ভিতরের শক্তি বিকাশ লাভের ব্যবস্থা করিতে হইবে; কোনওরূপ পীড়ন বা শাস্তির চাপে ঐ শক্তি নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিলে কদাচ তাহার ব্যবহার করা হইবে না; কিন্তু পাত্র বিশেষে উহাদ্বারা তাহার বিকাশ লাভের বা সংশোধনের সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার যথোচিত প্রয়োগ করা যাইবে।

৪। নৈসর্গিক প্রভাব সম্পন্ন স্থান—নদীর কূল, পর্ব্বতপ্রান্ত বা বিস্তৃত প্রান্তর পার্শ্বে বিদ্যালয়ের স্থান হইলে ভাল হয়।

৫। আহার বা খাদ্যের সুব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী স্থান নির্দ্ধারণ ও অন্য সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

সন্দেহ ও বাধা

দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে লোকের মতি সহজে এইরূপ কার্য্যের দিকে আকৃষ্ট হইবে কি না, অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন। দেশে এক্ষণে নানা বিরোধী ভাবের তরঙ্গ খেলিতেছে—পুরাতন সমাজকে সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজ স্থাপন করিতে কাহার কাহারও চেষ্টা; এদেশের প্রাচীন সভ্যতা বা সংস্কৃতিতে ইহারা কোনও গুণ দেখিতে পান না; পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য অর্থনীতি ও ভোগ-বিলাস ও স্বার্থ-নীতি-পূর্ণ রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া, ইহারা এদেশের যাবতীয় বিষয় উঠাইয়া দিয়া পাশ্চাত্য অবয়বে নূতন দেশ গড়িতে চাহেন। ইহাদের যাবতীয় আন্দোলন—জনতান্ত্রিকতা, নারীজাগরণ, যুবকআন্দোলন প্রভৃতি সমুদয়ই পাশ্চাত্য পুস্তকের অধীত বিদ্যার ফল ও পাশ্চাত্যের বাহ্যিক অনুকরণ মাত্র। আর বর্ত্তমান এই অধঃপতনের অবস্থাতে আমাদিগের জাতীয় চরিত্রে যে সমুদয় দোষ আসিয়া স্পর্শিয়াছে,—বর্ত্তমান এই সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ও আর্থিক দুরবস্থা এবং তজ্জনিত নানাবিধ দুর্নীতি দেশে যেইরূপ প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই ইহারা দেশের সভ্যতা বা স্বকীয় সাধনায় উচ্চ কিছু আছে, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আস্থাহীন হইয়াছেন; এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অন্তরে ইহারা প্রবেশ করিতে চাহেন না—পারেনও না।

দেশের বাহ্যিক কতকগুলি অভাব ও দোষের প্রতিকার এবং ভাবপ্রবণ কোনও সাময়িক আদর্শের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ইহারা অন্য কোনও গুরুতর বিষয়ের কথা ভাবেনও না ; দেশের দুরবস্থা সত্য করিয়া উৎপাটনের নিমিত্ত বা সর্ব্বসাধারনের অবস্থার স্থায়ী উন্নতির জন্য কোনও প্রকৃত কার্য্য, কর্ম্মধারা বা প্রোগ্রেম ইহাদিগের কার্য্যপ্রণালীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের কার্য্যক্রমের প্রতি কোনও লক্ষ্য না রাখিয়া, এক্ষণে ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতির শক্তির উপর সম্যক আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক তাহার অনুযায়ী এক সুশিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলন করিতে হইবে। তাহা হইলে জাতীয় কল্যাণের পথ পুনঃ উন্মুক্ত হইবে। এই সাধনার প্রকৃতি, ফল ও উচ্চ আদর্শ 'ভারতের সাধনা' পত্রিকাতে বিবিধ রূপে বিবৃত হইয়া আসিতেছে।

ভারতীয় সাধনার ক্ষীণ স্পন্দন এখনও হিন্দুর জাতীয় জীবনে স্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে ; হিন্দু সংস্কৃতির জীবনী-শক্তি সকল লোকে সমভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন। এক্ষণে হিন্দুর এই সাধনা শক্তিকে জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে পুনঃ সঞ্জীবিত ও সম্বর্দ্ধিত করিয়া, এই মৃতকল্প সমাজকে পুনঃ সবল করতঃ তাহাকে ভারতের কল্যাণ, জগতের সুখ ও শান্তি এবং বিশ্ব-মানবীয়তার চরিতার্থতায় নিয়োগ করিতে হইবে। হিন্দু-সাধনায় ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের বীজ সমূহ বিদ্যমান। উহার প্রভাবে বর্ত্তমানকালের এই ঐহিকতা মূলক নানা কর্ম্মধারা ও বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান সমূহ চরমের লক্ষ্যে ভগবদ্মুখীন হইতে পারে। তাহা হইলে জগতে প্রকৃত সুখ শান্তি বিরাজ করিবে, এবং ভারতের এই সুদীর্ঘকালের সাধনাসম্বলিত নানা অবস্থার মধ্য দিয়া প্রবহমান এই জীবন-ধারা সার্থক হইবে। ভারতীয় সাধনা মূলক সনাতন শিক্ষাপ্রণালীর পুনঃ প্রবর্ত্তন দ্বারা উহার প্রথম সোপান নির্ম্মান করিতে হইবে।

উপযুক্ত প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ হইলে সহায় ও সহানুভূতির অভাব হইবে না। দেশে এক্ষণে এক প্রকার নূতন কর্ম্মোন্মুখীনতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে আশ্রম ও ক্ষুদ্রায়তনের বিদ্যাপীঠ সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কোনও কোনও বিদ্যালয় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া উঠিয়াছে—হরিদ্বার গুরুকুল, রাঁচি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, দেওঘর রামকৃষ্ণ পীঠ, ইত্যাদি। কিন্তু ইহাদের অনেকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাব এত প্রবল ও সমাজ হইতে ইহারা এত বিচ্ছিন্ন যে দেশের যাহা প্রকৃত অভাব, তাহা ইহাদের দ্বারা মিটিতেছে না। কোনও উদার শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা ভারতীয় সাধনার মৌলিক নীতিগুলিকে অবলম্বন করিয়া এমন এক সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক যাহা দেশের প্রত্যেক স্থানে বিস্তার লাভ ও সমাজের উপর অবারিত ভাবে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

কর্ম্মী

নবীন জাতীয় জাগরণে উন্মুখ শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষা ব্রতে জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত একদল কর্ম্মী, শিক্ষাসেবক বা গুরু আবশ্যক। ইহারা দেশের আর সমুদয় আন্দোলন ও উদ্বেগ হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া, কেবলমাত্র শিক্ষাকেই আপন জীবনের ব্রত ও দেশ বা জাতির প্রতি একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আমাদের যুবক-কর্ম্মী ও সমাজ-সেবকগণ নানা আদর্শ বাদের দ্বারা চালিত হইয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া উঠিতে পারেন না। সকল ক্ষেত্রেই কর্ম্ম

বিভাগ আবশ্যক। আদর্শ-বাদের দ্বারা মনের উদারতা ও প্রসার সাধন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে কোনও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম কেবল ক্রিয়াত্মক ও ব্যবহারিক উপযোগিতার দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা এই জন্য একদল জাতীয় কর্ম্মীকে কেবলমাত্র শিক্ষার কর্ম্মক্ষেত্রে আত্ম-নিয়োগ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি।

শিক্ষার ক্ষেত্রই আর অন্য সমুদয় জাতীয় কর্ম্ম-ভূমির কেন্দ্র স্বরূপ—জাতীয়তার সূতিকা গৃহ। তাহাতে সুফল ফলাইতে পারিলে তাহা দ্বারা জাতীয় কর্ম্মণ্যতার আর সকল দিক আপনিই উন্মেলিত হইয়া উঠিবে। আধুনিক ইতিহাসেও দেখা যায় যে, যখনই কোনও জাতি আপনার ভবিষ্যত গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হইয়াছে, তখন সর্ব্বাগ্রে তাহার শিক্ষার সংস্কার করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে জারম্যান জাতি সর্ব্বাগ্রে আপন জাতীয় শিক্ষারই সংস্কার করিয়া লইয়াছিল, আর সেই শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণের বলেই সমগ্র জ্যারম্যানজাতি ও জারম্যানসাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। আবার ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে জ্যারম্যানদিগের দ্বারা পরাভূত হইয়া ফরাসীগণ সর্ব্বাগ্রে আপন শিক্ষা পদ্ধতিরই সংস্কার করিয়াছিল, তার ফলে ফ্রান্স জ্ঞান বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ জাতির পদবীতে উঠিয়াছিল; এবং বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে বিজয় লাভ করিবার প্রধান গৌরব তাহারই হইয়াছে। জাপান, চীন, মিশর, তুর্কী সকলেই অভ্যুত্থানের মুখে সর্ব্বপ্রথম জাতীয় শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করিয়াছে। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে এই যে শোচনীয় অবস্থা—দিন দিন আমরা যে অধঃপতনের দিকে যাইতেছি, তাহার মূল কারণই সুশিক্ষার অভাব ও বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাব। সুশিক্ষার গুণে সকল অবস্থায়ই সকল প্রকার অভাব দূর করিয়া আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। দেশের অবস্থা বদলাইতে হইলে, প্রচলিত শিক্ষার গতি অবরোধ করিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠার মূলীভূত জাতীয় সাধনার আধার অবলম্বনে নূতন শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা চাই। উপস্থিত শিক্ষাপদ্ধতিতে স্বার্থবান শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা সে কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না। এজন্য প্রকৃত জাতীয়ভাবে প্রবুদ্ধ নবীন কর্ম্মী সম্প্রদায়ের প্রয়োজন।

এই শিক্ষকমণ্ডলী সম্পূর্ণরূপেই এই শিক্ষার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিবেন। ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি পরিচালিত ও জাতীয় শিক্ষালয় সমূহ গড়িয়া উঠিবে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-নিকেতন সমূহ তাঁহাদিগের আপন বিষয় হইবে, এবং তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ইহাদের হইবেন। এই সকল জাতীয় শিক্ষকগণকে লইয়া এক বিরাট শিক্ষা সংসদ বা গুরুকুল-মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইবে।

গুরুকুল কি ?

গুরু বা শিক্ষককে অবলম্বন করিয়া বিদ্যার্থী, শিষ্য বা ছাত্রগণের যে কুল বা বংশ বা গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়, তাহাই গুরুকুল। গুরু এখানে প্রধান বা কেন্দ্র স্থানীয়। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বা তাঁহার প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া, ছাত্রগণ আসিয়া মিলিত হইবে এবং তাঁহার চরিত্রগুণে চরিত্রগঠন করিয়া তাঁহার বিদ্যাশিক্ষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিবে। ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে গুরুর চরিত্র প্রভাব অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। এই শিক্ষার মূল সূত্র এই যে, প্রত্যেক লোকের অন্তরে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বীজ

নিহিত রহিয়াছে; উচ্চ মনুষ্যত্বের প্রভাবে বা সংশ্রবে তার সম্যক বিকাশ সাধন হয়; আর ঐ অন্তর্নিহিত শক্তির সম্যক্ বিকাশ লাভ হইলে, যাবতীয় অধীত বিদ্যার ফল—কলা, বিজ্ঞানাদির জ্ঞান লাভ—অতি সহজে হইয়া থাকে। এজন্য বিদ্যালয়ে গুরুশিষ্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ও একত্র অবস্থানের ব্যবস্থা, যেমন কোনও বংশের মূল পুরুষ ও তাহার সন্তান সন্ততিগণের মধ্যে হয়। বংশে যেমন কোনও ব্যক্তির ও তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে এক শোণিত ধারা প্রবাহিত থাকে, বিদ্যালয়েও সেইরূপ গুরুর আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানসিক জ্ঞান-বিজ্ঞানরস ধারা শিষ্য বা ছাত্রগণের মধ্যে প্রবহমান থাকিবে। এদেশে চিরকাল গুরুপরম্পরার ভাব চলিয়া আসিতেছিল; ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা এখনও অনেকটা বিদ্যমান আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাহা আরও প্রবল ছিল; প্রত্যেক শাস্ত্রকার গণের গুরু-পরম্পরা নির্দ্দিষ্ট আছে; ব্যাস বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষি নাম ঐরূপ কুল-নির্দ্দেশক; আজিও গোত্রের নামে যে বংশের পরিচয় হইয়া থাকে, তাহা শিক্ষা দীক্ষায় আমাজাতির বিভিন্ন পরিবারের গুরু-কুলের নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

বিদ্যালয়ে গুরু বা শিক্ষকের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ধারা শিষ্য বা ছাত্রগণের মধ্যে প্রবহমান থাকিবে; তবেই বিদ্যালয়ের নাম 'গুরুকুল' সার্থক হয়। গুরুকুল বলিতে কোনও বিশেষ এক শ্রেণীর 'স্কুল' বা সম্প্রদায় বিশেষের বিদ্যালয় বুঝিলে চলিবে না। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অবলম্বনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এদেশের মৌলিক প্রাচীন শিক্ষা-নীতি। গুরুকুল নামও অতি প্রাচীন—আর্যযুগের। ইদানীং 'আর্য্য সমাজ' আপনাদিগের সাম্প্রদায়িক ভাবে প্রাচীন বৈদিক যুগের অনুবর্ত্তন করিতে গিয়া, আপনাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষাসংস্থান বিশেষের নাম "গুরুকুল" রাখিতেছেন। হরিদ্বার, বৃন্দাবন, দেওঘর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের 'গুরুকুল' স্থাপিত হইয়াছে; পাঞ্জাবের বহুস্থানে 'কন্যা-গুরুকুল' ও 'শিশু-গুরুকুলও' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রদায় বিশেষের হাতে পড়িয়া গুরুকুল নামটী এখন অনেকটা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছে। সনাতন হিন্দু সম্প্রদায় উহার বিরোধ করিতে গিয়া অনেক প্রতিযোগী শিক্ষায়তন—'ঋষিকুল,' 'সনাতন ধর্ম্ম কলেজ' প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। ফলে গুরুকুল নামটী এক্ষণে অনেক হিন্দুর কাছে, অপ্রিয় ও বিদ্বেষমূলক বলিয়া মনে হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক 'গুরুকুল' নামে সকল হিন্দুর সমান অধিকার। 'গুরু' নামে এদেশের সকল লোকের—শিখ, সনাতননামী, আর্য্যসমাজী প্রভৃতি, এমন কি মুসলমান পর্য্যন্ত—সকলে এক অতি উচ্চ ও সম্মানার্হ পাত্র বুঝিয়া থাকেন। 'গুরুট্রেনিং' নামক শিক্ষক-শিক্ষার ব্যবস্থাতে, সরকার বাহাদুরও 'গুরু' নামের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এবং উহা জাতি নির্ব্বিশেষে সকল লোকে মানিয়া লইয়াছেন। শিক্ষকগণ যে বাস্তবিক পূজ্য ব্যক্তি ও সমাজের গুরু স্থানীয়, এই বাক্যদ্বারা তাহারও আভাস পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, গুরুকুলশিক্ষাপদ্ধতিতে যে শিক্ষার মৌলিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহা সকলেই মানিয়া লইতে পারেন। হিন্দুগণও তাহা সর্ব্বজনীন ভাবেই গ্রহণ করিতে পারেন। অন্যথা গুরুকুলের মূল নীতি অবলম্বনে যে সকল বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিতেছে বা উঠিবে, তাহাকে আশ্রম-বিদ্যালয়ের অর্থজ্ঞাপক যে কোনও নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

গুরুকুলে বহুগুরুর সমাবেশ হইতে পারে। তাহাতে এক গুরুমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক গুরু আপন আপন ছাত্রগণের তত্ত্বাবধান ও আপন আপন বিষয়ের অধ্যাপনা করিবেন।

সকল বিদ্যালয়েই তাহা হইয়া থাকে। কোনও কোনও স্থানে কেবলমাত্র একজন গুরুর অধীনে এক পাঠশালা বা গুরুকুল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। যে গুরুকুলে বহুগুরুর সমাবেশ তাহার একজন অধিনায়ক থাকিবেন ; সকল বহুজনসমন্বয়েগঠিত প্রতিষ্ঠানেই তাহা করিতে হয়। গুরুকুলের প্রধান আধ্যক্ষকে 'কুলপতি' বলা হইত। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে কুলপতি নাম প্রসিদ্ধ—কুলপতিকে এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—

মুনীনাং দশ সাহস্রং যোঽন্নদানাদি পোষণাৎ
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষি রসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥

প্রাচীন ভারতের অনেক ঋষির এই 'কুলপতি' আখ্যা ছিল। অন্যন দশহাজার মুনি-ছাত্র তাঁহাদিগের গুরুকুল বা শিক্ষায়তনে অন্নদানাদিতে পরিপোষিত হইয়া বিদ্যালাভ করিত। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় প্রাচীন ভারতে শিক্ষার কিরূপ প্রসার লাভ হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে এই প্রাচীন 'গুরুকুল' ও 'কুলপতিগণের' উল্লেখ আছে। উহাকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইলেও, বৌদ্ধ যুগের শেষ ভাগে নালন্দাতে বৌদ্ধ চীন যাত্রী হিউএনসঙ্ যে শিক্ষায়তন বা বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়াছিলেন ও সেখানে তিনি নিজে কতককাল থাকিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সেখানেও যে এইরূপ দশ সহস্রের অধিক ছাত্র থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন, তাহার চাক্ষুষ বিবরণ তিনি নিজ হাতে দিয়া গিয়াছেন। আর ভারতের দিগ্‌দিগন্ত ও বহু বিদেশ হইতেও ছাত্রগণ আসিয়া তথায় অধ্যয়ন করিত।

প্রাচীন ভারতের সমুদয় উন্নতি ও জ্ঞান সম্পদের মূল আধার ছিল গুরুকুলশিক্ষাপদ্ধতি। কেবল মুনি বা ঋষিগণই যে গুরুকুলে থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা নহে ; ক্ষত্রিয়গণও উপযুক্ত আশ্রমে থাকিয়া অস্ত্রবিদ্যা বা ধনুর্বেদ শিক্ষা করিতেন। মহাভারতে দ্রোণাচার্য্যের আশ্রমে থাকিয়া কুরুবালকগণ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রম গুরুকুল বিশেষ। আবার বৈশ্য বা শিল্পীগণ ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প-কারুকার্য্যে সুদক্ষ 'গুরুর' নিকট থাকিয়া, নানা বিদ্যা শিক্ষা করিত। অনেক সময় উহা বংশগত ছিল। এদেশে এই গুরুকুল শিক্ষা প্রথা চিরকাল বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান যুগের টোলগুলি তাহার ক্ষীণ আভাস মাত্র। শিল্প এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে শিক্ষা কুল বা জাতিগত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাতেই বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চশিক্ষা পণ্ডিতদিগের হস্তে এবং ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং শিল্পশিক্ষা উপযুক্ত দক্ষ শিল্পী ও ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা সমাজে বিস্তারিত ভাবে চলিত। মোটকথা সকল বিষয়েই গুরুস্থানীয় উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকিয়া চরিত্রের সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ সাধন পূর্ব্বক অধীত বিদ্যার অধিকার লাভ করা ছিল প্রাচীন ভারতের শিক্ষার পদ্ধতি।

বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন গুরুকুল পদ্ধতির সম্পূর্ণরূপে পুনঃ প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয় বটে। কিন্তু কালানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিয়া উহার মৌলিক প্রণালীর উপর সর্ব্বকালেই আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। কারণ এই পদ্ধতির মূলে এমন কতকগুলি সত্যমূলক নীতি নিহিত আছে যে তাহা সকল মানবের পক্ষে সকল কালে প্রযোজ্য। তাহা স্থির রাখিয়া উহার আধার মূলে বর্ত্তমান কালের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীর গুরু শিষ্যে একত্রঅবস্থানমূলক শিক্ষা যে এখনও প্রতিষ্ঠিত

হইতে পারে তাহা পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়—"পাব্লিক স্কুল," প্রভৃতি ও ছাত্রাবাস সম্বলিত (Residential) বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি—যেখানে ছাত্র ও অধ্যাপক গণের একত্র অবস্থান, সেগুলি তাহার প্রমাণ। কিন্তু এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যালয় সমূহ বাহ্যিক ব্যবস্থা লইয়াই ব্যস্ত—গুরু ও শিষ্যের আন্তরিক সম্বন্ধ দ্বারা মানব জীবনের আভ্যন্তরিক প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার প্রকৃত উন্নতি করিবার যে ব্যবস্থা তাহা ইহাদের দৃষ্টিতে নাই।

এদেশে গুরুকুল শিক্ষা পুনঃ প্রবর্ত্তন করা যে সহজ তাহার বিশেষ হেতু এই যে, ভারতে এক্ষণেও হিন্দু-সংস্কৃতির ভাব প্রবল। সাক্ষাতে হউক্ বা পরোক্ষে হউক্, ইচ্ছা করিয়া হউক্ বা অনিচ্ছায় হউক্, অজ্ঞাতসারে লোকে অল্পাধিক পরিমাণে উহা মানিয়া থাকে। দেশের এবং লোকের প্রকৃতিতে উহা বদ্ধমূল। হিন্দু ব্যতীত অপর জাতির লোকেরাও উহার প্রভাবে প্রভাবিত; কারণ এদেশের মৃত্তিকা ও জলবায়ুর সহিত উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বহু বিদেশীয় জাতি উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালে যদি কোনও জাতি উহার বিদ্বেষ করিতে চাহে, তবে তাহা বাহ্যিক; আন্তরিক উহার উদার প্রকৃতির সহিত সকলেরই মিল আছে। কালে সকলেই উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে; ইতিহাসের দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তই করিতে হয়। শিক্ষা বিষয়ে যে সকলেই উহার অনুসরণ করিতে পারে তাহা অবধারিত।

অবশ্যই হিন্দু জাতির যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশেষ অধিকার একথা বলা বাহুল্য। বাস্তবিক ভারতীয় সংস্কৃতি হিন্দু-সংস্কৃতিই। দেশে বিদেশে সকলে এই দুইকে একবস্তু বলিয়াই মনে করে। কিন্তু হিন্দুগণ ভারতীয় ধর্ম্ম বা সংস্কৃতির প্রধান রক্ষক বা অধিকারী হইলেও তাহারই বর্ত্তমান কাল প্রভাবে বা অবস্থায় উহা হইতে অধিকতর বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুগণ যেরূপ আপনাদের জাতীয় আদর্শ হারাইতে বসিয়াছে এমন আর কেহ নহে। সর্ব্বত্র তাহারা আপনাদিগের ধর্ম্ম সাধনা বা সংস্কৃতির বিষয়ে দিন দিন অধিক উদাসীন হইতেছে। শিক্ষা পদ্ধতি হইতে উহারাই ধর্ম্মকে অধিকতর বিসর্জ্জন দিয়াছে। এজন্য দেখা যায় যে হিন্দুদিগের মধ্যে অতি মনস্বী ব্যক্তিগণও স্বধর্ম্ম-বর্জ্জিত।

হিন্দুজাতির মধ্যে বিশেষতঃ বাঙ্গালা জাতির শিক্ষাপদ্ধতিতে এইরূপ বিরুদ্ধ ভাব প্রবল হইয়াছে বলিয়া তাহার প্রতিকার কল্পে এদেশের গুরুকুল শিক্ষাপদ্ধতি বা ভারতীয় সাধনা মূলক শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা আরও অধিকতর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

এই ভারতীয় সাধনার অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রন করা কিছু মাত্র কঠিন বিষয় নহে। কারণ শিক্ষার অতি উচ্চ আদর্শই ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। আর আমরা মূলতঃ এখনও সেই ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতির অবলম্বনে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। সেই সভ্যতা বা সংস্কৃতির প্রকৃতি ভাল রূপে বুঝিয়া আমাদের সকল প্রকার জাতীয় কর্ম্মধারা বা অনুষ্ঠান তদনুসারে পরিচালিত করিলেই তাহাদিগের স্বাভাবিক বিকাশ লাভ হইবে। ঐ সংস্কৃতি বা সভ্যতাই আমাদের জাতিগত স্বাভাবিক সম্পদ। বর্ত্তমান কালের নানাপ্রকার বিজাতীয় প্রভাব ও বিকৃত ভাব হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় আমাদের সেই সংস্কৃতির অনুযায়ী জাতীয় সকল প্রকার কর্ম্মপদ্ধতি বা সাধন প্রনালী নিয়ন্ত্রিত করা। শিক্ষা ক্ষেত্রে ইহার সমুচিত প্রয়োগ করিতে পারিলে আমাদের জাতীয় শিক্ষায়তন সমূহ আপনা আপনি গড়িয়া উঠিবে। এজন্য সর্ব্বোপরি ভারতীয়

ধর্ম্ম বা হিন্দুর সংস্কৃতি যে মানবের চরম উৎকর্ষ ও পরম লাভের নিদান এই ভাব দৃঢ়রূপে মনে বসাইতে হইবে; ইহাতে অটুট বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। লোকের মনে এক্ষণে এবিষয়ে একটা বিস্মৃতি আসিয়াছে! বিজাতীয় শিক্ষা ও বিজাতীয়দিগের নানারূপ বিদ্বেষমূলক প্রচেষ্টা উহার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিতেছে। এবিষয়ে ইহাদের মনোবৃত্তি বুঝিয়া আমাদের আরও সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। এ বিশ্বাস মনে দৃঢ় হইলে লোকে উহার অনুযায়ী শিক্ষার জন্য উদ্গ্রীব হইবে। কারণ শিক্ষা ঐ সংস্কৃতির অনুচর মাত্র।

বর্ত্তমান যুগ ভারতীয় সাধনা বা ধর্ম্মের পক্ষে এক সাংঘাতিক সময়; এবং তাহাতে অতি-মাত্র ত্রস্ত ও বিহ্বল হইয়া একদল লোক ভারতীয় সাধনার উপরে সমুদয় প্রত্যয় হারাইয়াছে। ইহার পুনরুদ্ধার বা জাতীয় কর্ম্মধারায় উহার কোনরূপ কার্য্যকারিতা বা উপযোগিতা হইতে পারে এ সম্বন্ধে নৈরাশ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাও দেখা গিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সাধনা বা ধর্ম্মের স্বরূপ ও শক্তির বাস্তবিক পরিচয় ঘটিলে এরূপ কোনও নৈরাশ্যের কারণ থাকে না। ভারতের ধর্ম্ম নৈরাশ্যমূলক নহে। বর্ত্তমান সময়কে একদিকে যেমন মহা দুঃখও সঙ্কটের কাল বলিয়া মনে হয়, অপর দিকে উহাতে এক শুভেরও সূচনা দেখা যাইতেছে; যেন ভারতের সংস্কৃতি আপন সঙ্কোচ ও হ্রাসের অবস্থা হইতে এক প্রতিক্রিয়ারূপী প্রসারণের দিকে অগ্রসর হইতেছে। জগতের পারি-পার্শ্বিক অবস্থাও একদিকে উহার অনুকূল; জাতিতে জাতিতে সংস্পর্শ, মানবীয় জ্ঞানের বিকাশ, ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতির প্রতি সকল দেশের লোকের শ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে; জগতের যেই রাষ্ট্রনীতি ও ঐহিকতামূলক অর্থনীতি এক্ষণে ভারতের সাধনা ও অপর সকল অবস্থার ঘোর বিরোধী সেই রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিতেছে। এ অবস্থাতে ভারতের সনাতন ধর্ম্ম ও সত্যমূলক সাধনা জগতের অনেক গুরুতর সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে—ভারতের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ তাহা দ্বারা সংসাধিত হইবে; এবং সংসারময় উহার প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া উঠিবে। স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব কাল হইতে ভারতীয় সাধনার এই নব সম্প্রসারণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমাদের জাতীয় কর্ম্মধারা এক্ষণে উহার অনুকূলে পরিচালিত করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে নিশ্চিত। উপস্থিত দেশের শিক্ষানীতিকে ইহার ভিত্তিতে পরিচালিত করিতে পারিলে সকল কার্য্য অতি সহজ ও সুফলপ্রদ হইবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেই বর্ত্তমান সময় ভারতের জাতীয় ভাব ও সাধনার উপর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আঘাত পড়িয়াছে। একটা বিজাতীয় ভাষায় রাজকীয় ব্যাপার পরিচালিত হয়, সেজন্য কতকগুলি অধস্তন কর্ম্মচারী ও কেরাণী সৃষ্টি করা একালের এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল. এই গোটা কয়েক চাকুরীর লোভে, আপন স্বাভাবিক জাতীয় আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া লোকে অন্ধের মতন ছুটিয়াছে; যে সকল উপায়ে দেশের শিক্ষার পদ্ধতি পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল, তাহারা সকলই চলিয়া গিয়াছে।

শিক্ষাই জাতীয় সাধনায় সিদ্ধি লাভের প্রধান উপায়; সেই শিক্ষা উহার বিরোধী হইলে, তাহাতে যত প্রকার কুফল ফলিতে পারে, এই অত্যল্পকাল মধ্যেই আমাদিগের তাহা ভোগ করিতে হইতেছে। দিন দিন শিক্ষার ব্যভিচার বাড়িয়া চলিয়াছে। শিক্ষার সংস্কার, কমিশনের উপর কমিশন বসিতেছে কিন্তু কোন ফল লাভ হইতেছে না। বর্ত্তমান সময় বাঙ্গলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বিলে এই জাতীয় সাধনাবিরোধী-শিক্ষাপদ্ধতি আরও ভাল করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে! বর্ত্তমান যুগে যে সকল সুবিধা ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে—জড়বিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, বিভিন্ন জাতির সম্মেলন, যাতায়াতের সুবিধা মুদ্রাযন্ত্র, রেলপথ ইত্যাদি—তাহাদের সহায়তা লইয়া, ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষার আধারভূত প্রাচীন সেই সাধনার ভাব (cultural spirit) জাগাইয়া তুলিয়া, ইহাদের সমধিক উন্নতিসাধন পূর্ব্বক জাতীয় জীবনের কালোপযোগী সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাই বর্ত্তমান যুগে এদেশ বাসীর প্রধান কর্ত্তব্য। এজন্য সর্ব্বোপরি ভারতের এই সাধনার ভিত্তিতে শিক্ষাবিধি পরিচালিত করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী—যাহা ভারতের সাধনার এক বিশেষ লক্ষ্য—সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা, আগত ও আলোচনাসাপেক্ষ]

পুস্তক পরিচয়।—(১) স্বামি-শিষ্য-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ স্বামী ভবানন্দ গিরি প্রণীত, প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ছয় আনা মাত্র। প্রাপ্তি স্থান শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসী সঙ্ঘ, লালতারাবাগ, হরিদ্বার। স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের সাক্ষাৎ উপদেশাবলীর সংগ্রহ পুস্তক। যাহাদের সাক্ষাতে মহাপুরুষের সরল ও হৃদয় স্পর্শী উপদেশ শ্রবণ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয় নাই, তাঁহারা ঘরে বসিয়া তাহা শুনিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবেন। গৃহস্থ জীবনের অনেক অমূল্য উপদেশ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ব্যবহারিক জগতের অত্যাবশ্যক মূল্যবান কথাও সন্নিবেশিত রহিয়াছে। সঙ্কলন কর্ত্তা অধ্যাত্মতত্ত্বে একটী অনতি-দীর্ঘ সারবান বিবৃতি ভূমিকাতে সংযোজন করিয়াছেন। এ পুস্তক বঙ্গে সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, অল্প সময়ের মধ্যে পুনঃ সংস্করণ হওয়াতেই তাহার প্রমাণ।

অদ্বৈত সিদ্ধি।—(২) পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বঙ্গগৌরব শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত অদ্বৈত সিদ্ধি নামক অদ্বৈত সিদ্ধান্ত মূলক অমূল্য গ্রন্থের মূল, টীকা, তাৎপর্য্য ও অনুবাদ সহ অভিনব বঙ্গীয় সংস্করণ। অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ। সম্পাদক অধুনাকার বঙ্গের দার্শনিক লেখক দিগের মধ্যে সুপরিচিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় পুস্তকে সার্দ্ধ চারিশত পৃষ্ঠায় একটী ভূমিকার সংযোজন করিয়া পুস্তক খানিকে আধুনিক পাঠকের পক্ষে গ্রন্থ পরিচয়, গ্রন্থকারের জীবন বৃত্তান্ত, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, অভিপ্রায়, গ্রন্থপাঠের ফল, ইত্যাদি বিষয়ের সুবিস্তৃত বিবরণ দিয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে গ্রন্থখানিকে এক অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান বিষয়ে পরিণত করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া গ্রন্থকারের পরিচয় দান প্রসঙ্গে তিনি ভারতের অদ্বৈত চিন্তাধারার যে ইতিহাস ও তাহার আবির্ভাব কালের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে যে পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা আজকালকার পরানুকরণ প্রবৃত্ত অন্বেষণ কারী 'স্কলার' সমাজে দুর্লভ। পরিশেষে 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থের (প্রতিবাদ কল্পে অদ্বৈত সিদ্ধির সৃষ্টি, তাহার মূল ও অনুবাদ গ্রন্থের) পরিশিষ্ট সংযোজন করিয়া দেওয়ায় পুস্তকের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুস্তকের প্রথম ভাগ প্রকাশিত। প্রথা ৯০০ শত পৃষ্ঠা, মূল্য ৫৲ পাচ টাকা; প্রাপ্তিস্থান কলিকাতা ৬নং পার্শিবাগান লেন, প্রকাশকের নিকট।

তর্কাবতরণ

"নাশায় চাশুভ-ভয়স্য মতিং করোতু"।

সর্ব্ব-মঙ্গলময়ী অম্বিকা অশুভ ভয় হইতে আমাদের রক্ষা করিতে যত্নবতী হউন। চৈত্র সংখ্যা ভারতের সাধনার ৩৮২ পৃষ্ঠায় যে "কল্পনা" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পাঠে এখন বুঝা গেল লেখক মহোদয় দ্বাদশবর্ষ হইতে যে কোনও সময়ে গর্ব্ভাধান করাই সুশ্রুতের ব্যবস্থা এই সিদ্ধান্তের একান্ত পক্ষপাতী। শাস্ত্রের পাঠ কি এবং তাহা ভুল কি না বা কখন কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত এসব বিষয়ের আলোচনার সহিত আমার লিখিত মূল প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ এই তর্কের সূত্রপাত একটি অবান্তর কারণ হইতে। সেটি বোধহয় বিবাহ ঘটিত নূতন আইনটির বিরুদ্ধাচরণ। সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কোন হেতু আমার মূল প্রবন্ধে নাই। কাজেই এই প্রতিবাদের উত্তর দিবার কোন চেষ্টা আমার না থাকাই উচিত—কিন্তু জানিয়াও সত্যের অপলাপ চেষ্টার প্রশ্রয় দেওয়া কোন হিন্দু সন্তানেরই উচিত নহে আমি অক্ষম হইলেও যখন ভিষক মহাশয়গণের মধ্যে কেহই কথা বলেন নাই—তখন নিম্নলিখিত কয়টি কথা পাঠক মহোদয়গণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। উদ্দেশ্য বিষয়টির সত্য নিরূপণ চেষ্টা মাত্র।

এই তর্কাবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য "ঊনষোড়শ" পাঠ শুদ্ধ কি "ঊনদ্বাদশ" পাঠটি শুদ্ধ এইটি ঠিক করা। বাকী যে সব কথা তাহা আমার পক্ষে অবান্তর। আমার বক্তব্য বঙ্গদেশের পুস্তকে যে "ঊনষোড়শ" পাঠ দেখা যায় তাহাই মূল পাঠ; "ঊনদ্বাদশ" পাঠ প্রক্ষিপ্ত। প্রতিবাদক মহাশয়ের মতে "ঊনদ্বাদশ" পাঠই শুদ্ধ, যুক্তিযুক্ত এবং তজ্জন্য তিনি পৌষ সংখ্যা ভারতের সাধনার ১৮৫ পৃঃ হইতে ১৯০ পৃঃ পর্য্যন্ত ব্যাপী একটি প্রমাণযুক্ত প্রবন্ধ বাহির করেন। আমরা সেই প্রবন্ধের প্রমাণগুলি লইয়াই এখন বিচার করিতেছি। প্রথমতঃ সুশ্রুতের উদ্ধৃত প্রমাণগুলির বিষয় দেখা যাক্। সুশ্রুতের ১৪শ অধ্যায় শোনিত বর্ণনায় লিখিত। সুশ্রুত রসের উৎপত্তি বলিয়া বলিতেছেন—

"স খল্বাপ্যোরসো যকৃৎ প্লীহা নৌ প্রাপ্য রাগং উপৈতি" অর্থাৎ রস যকৃৎ প্লীহার সংসর্গে আসিয়া রঞ্জিত হয়। তার পর বলিতেছেন রঞ্জিতা স্তেজসাত্মাপঃ শরীরস্থেনদেহিনাং অব্যাপন্নাঃ প্রসন্নেন রক্তমিত্যভিধীয়তে। রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃ সজ্ঞং প্রবর্ত্ততে তদ্বর্ষাদ্ দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ং অর্থাৎ রস জাব শরীরস্থ তাপে সুস্থ অবস্থায় পরিণত হইলে তাহাই রক্ত নামে অভিহিত হয়। স্ত্রীলোকদের পক্ষে সেই রক্ত হইতে রজঃ হয় এবং সেই রজঃ দ্বাদশ বর্ষ হইতে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়া পঞ্চাশে ক্ষয় পায়। তার পর সুশ্রুত রক্ত হইতে শরীরের উত্তরোত্তর ধাতুর ও পরিণতির কথা বলিতেছেন। এখানে গর্ভাধান সম্বন্ধে আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই এবং থাকিতেও পারে না। যদি সুশ্রুত আমার মত প্রবন্ধ লেখক হইতেন তবে ঐরূপ উপহাসাস্পদ একটা শ্লোক জুড়িয়া দিতেন কিন্তু তিনি বৈদ্য-শাস্ত্র কর্ত্তা। বৈদ্য-শাস্ত্র বেদের অংশ তাই তিনি বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে স্ত্রীপুরুষের কিরূপ চিহ্নাদির প্রকাশ পায় তাহার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন - বালানামপি বয়ঃ পরিণামাৎ শুক্র প্রাদুর্ভাবো ভবতি রোমরাজ্যাদয়োঽথার্ত্তবাদয়শ্চ বিশেষা নারীনাং রজসি চোপ চীয়মানে শনৈঃ শনৈঃ স্তন গর্ভাশয় যোন্যভি বৃদ্ধি-র্ভবতি। অর্থাৎ

বালক বালিকার বয়সের পরিণাম ক্রমে শুক্রাদি ও আর্ত্তবাদি হয়। বিশেষ নারীদের রজঃ পুষ্টি হইতে থাকিলে ক্রমে স্তনোদ্গম ও গর্ব্ভাশয়ের ও যোনির আয়তন বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এর পর পঞ্চদশ অধ্যায়ে সুশ্রুত দোষ ধাতু মলক্ষয় বৃদ্ধির কথা বলিতেছেন। "দোষ ধাতু মল মূলংহি শরীরং তস্মাদেতেষাং লক্ষণ মুচ্যমানমুপধারয়।" তার পর রস কি করে—রক্ত কি করে ইত্যাদি দেখাইয়া বলিতেছেন—'রক্ত লক্ষণ মার্ত্তবং গর্ব্ভকৃচ্চ। গর্ব্ভো গর্ব্ভ লক্ষণং।" অর্থাৎ রক্ত অমল ও বিশুদ্ধ ধাতু কি না তাহা জানিবে কি করে—না আর্ত্তব দেখিয়া এবং তাহা গর্ব্ভকৃৎ কি না। আর অদুষ্ট গর্ব্ভ জানিবে গর্ব্ভ দেখিয়া। সুশ্রুত শাস্ত্র কর্ত্তা কাজেই ছেলেদের মত এক নিঃশ্বাসে গর্ব্ভের অবিধেয়তার কথা এখানে আলোচনা করিবার প্রয়োজন দেখেন নাই। সেটা বহুপরে যথাস্থানে করিয়াছেন। ধাতুর দোষ গুণ বিচারে গর্ব্ভাধানের কথা থাকিতে পারে না। তাই তিনি ধাতু ঘটিত সমতা ও অসমতার কথা বলিয়া অধ্যায় শেষ করিয়াছেন :—

দোষাদীনাং তু সমতামনুমানেন লক্ষয়েৎ।
অপ্রসন্নেন্দ্রিয়ং বীক্ষ পুরুষং কুশলোভিষক্॥
সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতু মলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে॥
স্বস্থস্য রক্ষণং কুর্য্যাৎ অস্বস্থস্য তু বুদ্ধিমান
ক্ষপয়েদ্ বৃংহয়েচ্চাপি দোষ ধাতু মলান ভিষক্।
তাবদ্যাবদরোগঃ স্যাদয়েরা রোগ সমন্বিত॥

৩৫ অধ্যায়ের প্রথমে কোন্ রোগী দীর্ঘায়ু এবং কে মধ্যমায়ু তাহার পরীক্ষার বিষয় বলিতেছেন—

গূঢ় সন্ধি সিরা স্নায়ুঃ সংহতাঙ্গ স্থিরেন্দ্রিয়ঃ।
উত্তরোত্তর সুক্ষেত্রো যঃ স দীর্ঘায়ুরুচ্যতে॥
গর্ভাৎ প্রভৃত্য রোগো যঃ শনৈঃ সমুপচীয়তে
শরীর জ্ঞান বিজ্ঞানৈঃ স দীর্ঘায়ু সমাসতঃ॥

অর্থাৎ যার শরীরগ্রন্থি শিরা স্নায়ু সংহত, ইন্দ্রিয় স্থির ও ক্রমে ক্রমে সুদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে তিনি দীর্ঘায়ু। যিনি গর্ভ হইতেই অরোগ এবং তজ্জন্য যার ক্রমে ক্রমে শরীর ইন্দ্রিয়াদি বিধিমত পুষ্টি পায় তিনি দীর্ঘায়ু। তার পর বাহ্য শরীরের পরিমাণাদির দ্বারা আয়ুর বিশেষ বিচার উপদেশ দিতেছেন। তার পর বলিতেছেন :—

পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানিয়াৎ কুশলো ভিষক্।

দেহঃ সৈরঙ্গুলৈরেষ ইত্যাদি। এই সকল উপদেশ "আয়ুষো বিজ্ঞানার্থং"।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়াছেন "তমেকান্তে নোপক্রমেৎ"। এইটি শরীরের মাপাদি আরম্ভ করিয়া আয়ুর বিশেষরূপ (বিজ্ঞানার্থং) জ্ঞান সিদ্ধান্তের পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কেন না সমস্ত অঙ্গের পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। একান্ত পরীক্ষা দরকার। এই পরীক্ষা শেষ হইবার পর কি হইবে না যদি পুরুষ রোগী পঞ্চবিংশ বয়সের হয়েন এবং নারী রোগী ষোড়শ বর্ষের

হয়েন তবে ভিষক বুঝিবেন প্রোক্ত পুরুষ রোগী ও নারী রোগী শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠনে সমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার প্রমাণ পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পূর্ণত্ব প্রাপ্তি। এরূপ রোগী দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও মহৎ বিত্তাদি লাভ করেন। তদন্যথা মধ্যমে মধ্যম ও অধমে অবর লাভ হয়। এখানে গর্ব্বের বিষয় আলোচনার কোন প্রসঙ্গ থাকিবার কথা নয় এবং সুশ্রুত তাহার অন্যথা করেন নাই। তিনি সুচিন্তাশীল ঋষি উচ্ছৃঙ্খল ভাব তাঁহাতে স্থান পায় নাই। তবে এইটী স্পষ্ট বলিয়াছেন যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পূর্ণ পরিমাণ পুরুষে পঁচিশ বৎসরে হয় আর নারীতে ষোল বছরে হয়। সুশ্রুত আবার বয়সকে তিন ভাগ করিয়াছেন "বয়স্ত্র ত্রিবিধং—১। বাল্যং ২। মধ্যং ও ৩। বৃদ্ধং। তাহার মধ্যে "বাল্য" ঊনষোড়শ বৎসর ব্যাপী। আবার বাল্যঊনষোড়শবৎসরকে তিনি—তিন ভাগ করিয়াছেন যথা—১। ক্ষীরপাঃ ২। ক্ষীরান্নাদা ৩। অন্নদা। প্রথমটি এক বৎসর, দ্বিতীয়টি দুই বৎসর, এবং তৃতীয়টী ১২ বৎসর ও পরবর্ত্তী অর্থাৎ ১৫ বৎসর পর যাবৎ জীবন তাবৎ কাল ব্যাপী। ষোল হইতে সপ্ততি বৎসর মধ্যম আয়ু। ইহার যদি ব্যত্যয় হয় তবে বুঝিতে হইবে যৌবন-গঠনে সম্পূর্ণতার হানি হইয়াছে। তত্রাবিংশতে বৃদ্ধিরাত্রিংশতো যৌবন মাচত্বারিংশতঃ সর্ব্বধাত্বিন্দ্রিয় বলবীর্য্য সম্পূর্ণতা। অর্থাৎ কুড়ি হইতে বৃদ্ধি আরম্ভ হয়—আর ত্রিশ হইতে যৌবন প্রাপ্তি হয় এবং ৪০ বৎসর হইতে সকল ধাতু ইন্দ্রিয়াদির সম্পূর্ণতার শেষ হয়। এখানে সংক্ষেপে আমরা পাইলাম পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল্য বয়স। পুরুষের "বাড়" ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত যাহা হয় নারীর "বাড" ১৬ বৎসরেই ততটা হয়। সুতরাং পুরুষ পচিশ ও নারী ১৬ ইহারা সমতাগত বীর্য্য যুক্ত। এখানে বীর্য্য শরীরের পূর্ণতাকে বলিতেছে। শারীর স্থানের প্রথম অধ্যায়টি "সর্ব্বভূত চিন্তা শারীরং" ও তাহার পর "প্রকৃতি পুরুষের সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যের ব্যাখ্যা। শরীর স্থানের দ্বিতীয় অধ্যায় শুক্র শোণিত শুদ্ধি নাম শারীরং। তৃতীয় অধ্যায় গর্ভাবক্রান্তি শারীরং, ৪র্থ গর্ভ ব্যাকরণং, ৬ষ্ঠ প্রত্যেক মর্ম্ম ও তাহার স্থান নির্দ্দেশ, ৭ম সিরাবর্ণন বিভক্তি, ৮ম সিরাব্যধবিধি, ৯ম ধমণী ব্যাকরণ এবং দশমে গর্ভিনী ব্যাকরণ। এই অধ্যায়ে সুশ্রুত গর্ভিণী ও প্রসূতির কর্ত্তব্য বিষয় বলিয়া নবাগত কুমারের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এবং শিশুর রোগ বিচারাদি পরে করিবেন বলিয়া বলিতেছেন যে কুমার শক্তিমন্ত হইয়াছে জ্ঞাত হইয়া তাহাকে বিদ্যা গ্রহণ করাইবে। তারপর তাহার পঁচিশ বৎসর বয়স হইলে দ্বাদশ বর্ষের পত্নীকে প্রাপ্ত করাইবে। "দ্বাদশ বর্ষাং পত্নীং আবহেৎ পিত্র্যধর্ম্মার্থ কামঃ প্রজাঃ প্রাপস্যতি" এই পত্নী গ্রহণ করাইবে কি জন্য না ভবিষ্যতে পিতৃ সম্বন্ধীয় ধর্ম্মার্থ কাম প্রদ পুত্র লাভের জন্য। তার পরই সুশ্রুত সাবধান করিয়া দিতেছেন ও বলিতেছেন—

ঊনষোড়শ বর্ষায়াম প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং
যদ্যাধত্তে পুমান গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে।
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ
তস্মাৎ অত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥

আরও বলিতেছেন "অতি বৃদ্ধায়াং দীর্ঘ রোগিণ্যামন্যেন বা বিকারেণোপ সৃষ্টায়াং গর্ভাধানং নৈব কুর্ব্বীত। পুরুষস্যাপ্যেবংবিধস্য ত এব দোষাঃ সম্ভবন্তি। অর্থাৎ বলিয়া দিতেছেন যে পচিশ বৎসরের পুরুষকে ১২ বৎসরের নারীকে ভবিষ্যতে পুত্র লাভের জন্য গ্রহণ করাইবে বটে কিন্তু মনে

রেখো উনষোড়শ বর্ষের নারী ও অপ্রাপ্তপঞ্চবিংশতি পুরুষের সংযোগে যে গর্ভ হয় তাহার বিপদ আছে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই সুশ্রুতের মতে "বালা"র বয়স ১৫ পর্য্যন্ত ইহা দেখিয়াছি। এবং কুড়ি হইতে বৃদ্ধি ও ত্রিশ হইতে যৌবন। ২৫বর্ষে পুরুষ যে শারীরিক ও ধাতব গঠন পান নারী ১৬ বৎসরে তাই পান। কাজেই সুশ্রুত উনষোড়শ পাঠ না দিয়া উনদ্বাদশ দিতেই পারেন না, দিলে সমস্ত গ্রন্থে একটা অসামঞ্জস্য মতের বিকৃতি আসিয়া পড়ে। দ্বাদশ বর্ষে আর্ত্তবের উদ্ভব হয় এ কথা সুশ্রুতের, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি; তা হলে নারী একাদশ পর্য্যন্ত আর্ত্তবহীন। এ অবস্থায় 'অত্যন্ত বালা' একাদশ বর্ষে না দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষের মধ্যে ইহার বিষয় বোধ হয় আর বিচার করিবার দরকার হয় না। "আবহেৎ" দিলেন উনদ্বাদশ হইলে "প্রাপ্নুতি" না দিয়া প্রাপয়েৎ থাকিত। এইত গেল সুশ্রুতের বৈদ্য-শাস্ত্র মত। সুশ্রুত শাস্ত্র কর্ত্তা। তাঁহার গ্রন্থ সমস্ত হিন্দু দর্শন বেদ ও শ্রুতি প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্র বিরোধী কোন সিদ্ধান্ত তথায় লিপিবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। এখন ধর্ম্ম-শাস্ত্র এ বিষয়ে কি বলেন তাহাও সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

১ম। দশ বৎসরের কুমারীকে অপরাজিতা, এগার বৎসরে রুদ্রাণী, বারয় ভৈরবী, তেরয় মহালক্ষ্মী, চৌদ্দয় পীঠনায়িকা, পনরয় ক্ষেত্রজ্ঞা ও যোলয় অম্বিকা বলা হয়। কেহ বা চৌদ্দ বৎসরে কুমারীকে নায়িকা বলেন এবং ষোলতে চর্চ্চিকা বলেন। আবার পাঁচ হইতে বার পর্য্যন্তই অব্যাকৃতা কুমারী। আবার দশ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত কুমারী যৌবন বিকারের অধিকারে থাকেন। তার মধ্যে দ্বাদশ হইতে দ্বাবিংশতি বয়স পর্য্যন্ত যে নারী তিনি সুকুমারী বলিয়া আখ্যাতা। অপরাজিতা কুলকলা * রুদ্রাণী কুল-বধূরূপা ও সন্তান বীজের অঙ্কুরধারিণী। ভৈরবী অদৃষ্ট সমৃদ্ধি দায়িনী যোগেশ্বরী ভুবনমোহিনী। মহালক্ষ্মী সাক্ষাৎ অদৃষ্ট সমৃদ্ধিদা ও কুলক্ষোভহা। পীঠ নায়িকা সর্ব্ব হিতকারিণী আনন্দ রূপিণী ত্রিভুবন ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিতা পরমেশ্বরী। ক্ষেত্রজ্ঞা মদন বিহ্বলা কুলবতী আত্ম পরোগমা মহা ভৈরবী। অম্বিকা সম্পূর্ণ বিধুবমুখী কমল মধ্য সম্ভাবিনী অমৃত পূর্ণ দেহা। (১) ঐশ্বর্য্য (২) অনৈশ্বর্য্য, (৩) বৈরাগ্য, (৪) অবৈরাগ্য, (৫) ধর্ম্ম, (৬) অধর্ম্ম, (৭) জ্ঞান ও (৮) অজ্ঞান এই আটটি পীঠ। এই আটটি বুদ্ধির ধর্ম্ম। বুদ্ধিতেই সেই পরাশক্তি প্রতিষ্ঠিতা। কাজেই চৌদ্দ বৎসরের আগে কুমারী অপরিণত বুদ্ধি সম্পন্না। আগে নিজের পীঠকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া চাই—তারপর তিনি ক্ষেত্রজ্ঞা হয়েন। সুশ্রুতও প্রকৃতি পুরুষ বিচার কালে এই ক্ষেত্রজ্ঞার কথা বলিয়াছেন। ক্ষেত্রজ্ঞার পর অম্বিকা অর্থাৎ জননী। চণ্ডীতে যে মহিষাসুর নিধনের কথা আছে তাহাতেও দেখা যায় ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ইন্দ্র প্রভৃতির যা যা শক্তি তা সব দিবার পর একটি সম্পূর্ণ তেজোময়ী নারী মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়েন—তিনিই অম্বিকা অর্থাৎ পূর্ণ শক্তি ধারিণী। উনষোড়শ বর্ষে ক্ষেত্রজ্ঞা মাত্র।

২য়। গর্ভস্থ প্রাণী চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত জলাবস্থায় থাকে। নারীর আর্ত্তব ষোল দিন। চন্দ্রের ষোল কলা। ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বালককে শাসনে রাখিতে হয়। দীক্ষায় কাল ষোল বৎসরে। ষোড়শোপচারে পূজা, ষোলটি বিকার, সাতটি বিকৃতি, তারপর পরা প্রকৃতি, তারপর পুরুষ পঞ্চ-বিংশতি তম তত্ত্ব—এরূপ অনেক জিনিষের তত্ত্বে উনষোড়শ পাঠের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* কাত্যায়নী আনন্দাদি মধ্যে মুদা সর্ব্বাঙ্গাদিতকেতা

৩য়। বাল্যে শ্লেষ্মা, যৌবনে পিত্ত ও বৃদ্ধাবস্থায় বায়ু। পিত্ত জীবের অগ্নি বা তেজ। তেজই হিন্দুর প্রাপ্য বস্তু। ঊনষোড়শ বর্ষে পিত্তপ্রধান সন্তান পাওয়া যায় না। ষোল হইতে বাইসের মধ্যেই সুকুমারী নারী সুসন্তান-জননী হইতে পারেন।

৪র্থ। যখন কুমারী অম্বিকা বা চর্চ্চিকা হয়েন তখন তাঁহাকে জননীত্বে আনয়ন করিতে হয় ইহা শাস্ত্র বিধি। "নোদ্বাহেৎ পিতা বালাং।" পূর্ণ ষোল বৎসর না হইলে গর্ভাধান নিষিদ্ধ এবং ধর্ম্মনীতি পতিসেবা প্রভৃতি জ্ঞান যে কন্যা লাভ করে নাই—তাহাতে জননীত্বারোপ চেষ্টা ভূয়োভূয়ো নিষিদ্ধ।

আর প্রবন্ধ বাড়াইতে চাই না। যাহা বলিলাম বোধ হয় সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে সত্য-তত্ত্বের উপলব্ধি বিষয়ে ইহাই যথেষ্ট। যদি এতেও না হয়, তবে বলিব এদিকে কিছু হবে না। তাঁরা যে পথে যাচ্ছেন সেই পথে চলুন। অতঃপর আর এ সম্বন্ধে আমি পৃথক ভাবে আলোচনা করিব না। স্বমত শোষণার্থ শাস্ত্রের অংশালোচনায় সত্য কিরূপে অপলাপ প্রাপ্ত হয় তাহা যেমন এই আলোচনায় জানা গেল তদ্রূপ বহু শ্রুতি ও দর্শনের সত্যার্থ অপলাপে কিরূপে হিন্দুর ধর্ম্ম আজ অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে, প্রমাণ প্রয়োগ ও ইতিহাস লইয়া তাহা দেখিবার চেষ্টা আমি 'ভিক্ষুকের ঝুলিতে' করিয়াছি। ব্রহ্মের কল্পনাকে ঈক্ষণ বলিয়া শ্রুতি বলেন। কল্পনা এই বৈরাজ সৃষ্টির মূল। ব্রহ্ম সত্য তাঁর কল্পনাও তাই সত্য। অনাত্মজ্ঞানিকের কল্পনা অসত্য—সে কল্পনা অলীক ও অনিবার্য্য ভাবে ধ্বংসমুখী। ইতি—ভার্গব।

ভ্রম সংশোধন।—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় 'রটনা-প্রপাগাণ্ডা' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "চট্টগ্রামের প্রাচীন সংবাদপত্রসেবী........প্রচলিত গর্ভরোধ সাপক্ষের মত নহে বলিয়া তাহা কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন নাই।" বিগত ডিসেম্বর মাসে জলগাঁও নগরে আমি তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু "অমৃতবাজার পত্রিকার" সম্পাদক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করত উহার গুরুত্ব বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনি তাহা পরে প্রকাশ করিয়াছেন।—

শ্রীকালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

সুচনা।—"ভিক্ষুকের ঝুলি"—আগামী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে ভারতের সাধনায় 'ভিক্ষুকের ঝুলি' নামক প্রবন্ধটী পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে। বিশেষ কোনও বিবেচনায় উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করা কতক সময় স্থগিত ছিল।

ভাঃ সঃ

ভারতের সাধনা—হিন্দীতে।—বাঙ্গলার বাহিরেও 'ভারতের সাধনার' প্রচলন আছে। ঐ সকল স্থানের গ্রাহকগণ সকলেই যে বাঙ্গালী তাহা নহেন। যুক্ত প্রদেশ ও বেরারের কতিপয় অ-বাঙ্গালী হিন্দী ভাষাভাষী গ্রাহকের 'ভারতের সাধনার' প্রতি অনুরাগ দেখিয়া আমরা সবিশেষ আনন্দ বোধ করি। কতক দিন হইল লক্ষ্ণৌ নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগন্নাথ প্রসাদ শুক্ল মহাশয় যিনি এখন এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলে কোনও গবেষণার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এই পত্রিকার হিন্দী-সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। এজন্য এক উদ্যোগ চলিতেছে।

কি ভাবে ইহা কার্য্যে পরিণত করা যায় তাহার আলোচনার ফলে, একটী প্রস্তাব এই যে, "পৃথক ভাবে অন্য একখানি পত্রিকা মুদ্রিত না করিয়া 'ভারতের সাধনা' বঙ্গীয় সংস্করণের সহিতই এক অংশ হিন্দীতে মুদ্রণ করা যাইতে পারে।" আমরা এখনও বঙ্গদেশের মধ্যে পত্রিকা খানির সমুচিত ভাবে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি নাই। এ জন্য এত শীঘ্র কার্য্যান্তরে হস্তক্ষেপ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছি। প্রস্তাবিত যুক্ত-হিন্দী-বাঙ্গলা সংস্করণ বিষয়ে সহৃদয় গ্রাহকগণের মতামত পাইবার জন্য আমরা একান্ত অভিলাষী ; আশা করি তাঁহারা এ বিষয়ে সত্বর তাঁহারা তাঁহাদিগের সুচিন্তিত অভিমত জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।—সম্পাদক

মাস-পঞ্জি—বৈশাখ ১৩৩৮

কলিকাতা করপরেশনের নূতন মেয়র নির্ব্বাচনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কংগ্রেস কর্ত্তৃক মনোনীত প্রার্থী হইয়াছেন—পর্ত্তুগালে বিপ্লববাদী দিগের শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। লর্ড ও লেডী আরউইন নূতন দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন—এংগ্লো-অষ্ট্রেলিয়া বিমান পথের প্রথম রথখানি অদ্য দমদমে আসিয়া পৌছিয়াছে (২রা)—ভারতীয় শিল্পের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নতি সাধন নিমিত্ত একটী গবেষণা-মন্দির স্থাপনের নিমিত্ত স্যর সি, ভি, রমন এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন—স্পেনীয় বিপ্লবের ফলে রাজা এ্যালফেনজো সিংহাসন ত্যাগ করিলেন, রাজতন্ত্রের স্থানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল—মহাত্মা গান্ধী ভারতে খৃষ্টান মিশনারী দিগের কার্য্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করিয়া এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া এতদ্দেশীয় মিশনারী সমাজে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে—করাচির রায়ত-সভা জমিদারদিগকে প্রাপ্য করের হার কমাইয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক অর্থ নীতির উন্নতি কল্পে কানাডাতে আগামী বর্ষে এক কনফারেন্স বসিবার আয়োজন হইতেছে—দিল্লীতে গান্ধী-আরউইন-সন্ধি সর্ত্তে সোলাপুরের দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে কারাবাস হইতে মুক্তি দেওয়া হইল—বোম্বাই সহরে মহাত্মা গান্ধীর সহিত ভাইসরয় লর্ড আরউনেএর আর একবার মিলন হইল—লঙ্কায় ভীষণ ঝড় হইয়াছে—ভাবী ভাইসরয় আর্ল ওয়েলিংডন বোম্বাইতে আসিয়া পৌছিলেন (৪ঠা) মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বোম্বাইর কাপড়ের কলওয়ালাদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছেন যে কিরূপে ভারতে আমদানী বিদেশীয় বস্ত্র পুনরায় বাহিরে রপ্তানী করিয়া দেওয়া যায়—বিলাতের বেকার সমস্যা আন্দোলনে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় সরকারের প্রতি তীব্র ভর্ৎসনা করা হইয়াছে—লর্ড ও লেডী আরউইন অদ্য বোম্বাই বন্দর হইতে জাহাজযাত্রা করিলেন (৫ই)—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের পক্ষ সমর্থনার্থে ইংলণ্ড হইতে কানাডা রাজ্যে একটী মিশন যাইতেছে—দিল্লীর প্রাচীন রাজপ্রতিনিধি-নিবাস দিল্লীবিশ্ব বিদ্যালয়ের জন্য প্রদত্ত হইল বলিয়া প্রকাশ—দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন লৌহ যুগের সভ্যতার কতিপয় প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন আবিস্কৃত হইয়াছে—লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারতীয় জাতীয় মুসলমান সম্মিলন হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রণালীর পক্ষে প্রস্তাব পাশ করিলেন (৮ই)—ভারতের সৈন্যদিগের জন্য একপ্রকার নূতন রাইফেল বন্দুক ও বেয়নেট ব্যবহারের নিয়ম নির্দ্ধারণ হইল—পর্ত্তুগালে বিপ্লব প্রশমিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রকাশ, মাদেরায় পর্ত্তুগীজ উপনিবেশে ব্রিটিশের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট যে চেষ্টা করিতেছেন, পর্ত্তুগীজগণ তাহাতে বিশেষ প্রভাবান্বিত—হৃত-সিংহাসন স্পেনরাজ এলফনজো ইংলণ্ডে বিপুল সংবর্দ্ধনা পাইয়াছেন; উইণ্ডসার কেস্‌লে তিনি রাজা ও রাণীর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন (৯ই)—ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে মহিলা দিগের প্রশংসা করিয়া লণ্ডন সহরে এক মহিলা সভার প্রস্তাব পাশ হইয়াছে—কাণপুরের দাঙ্গাতে পুলিশ সমুচিত কার্য্যতৎপরতা দেখায় নাই বলিয়া সরকারী অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইতেছে—কলিকাতা সহরে বাস করা দিন দিন আতঙ্কের কারণ হইয়াছে। অদ্য দ্বিপ্রহরে বিমানচন্দ্র বসু নামক একজন এড্‌ভোকেটের বৃদ্ধা মাতাকে নিশ্বাস বন্ধে হত্যা করিয়া একদল আততায়ী গৃহের মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছে; রাত্রিকালে ভূতপূর্ব্ব প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অশীতি বর্ষীয়া পত্নীকে কে হত্যা করিয়াছে (১০ই)—কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিশ কমিশনার সার রেজিন্যাণ্ড ক্লার্ক ভারতীয় পুলিশের বিস্তর প্রশংসা করিয়া এক

বক্তৃতা করিয়াছেন—কয়লা হইতে কেরোসিন প্রস্তুত নিমিত্ত বিলাতে নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে—রাজপুত্র প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমনান্তর প্রত্যাগমন্ কালে পর্ত্তুগাল লিস্‌বন নগরে পদার্পণ করিয়া আসিতেছেন—গুজরাট প্রদেশে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হইতেছে—বিগত রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সে আত্মরক্ষণের (Safe Guards) যে যে সর্ত্ত ইংরেজ রাজ সরকার দিয়াছেন মিঃ গান্ধীকে তার সমুদয় গুলিই মানিয়া লইতে হইবে বলিয়া মিঃ চার্চ্চহীল জোরে প্রপেগাণ্ডা চালাইতেছেন, রক্ষণশীল দলের প্রায় সকলেই তাহার সমর্থনে আছে—জেনেভার সর্ব্ব জাতি-সঙ্ঘের নিকট এক অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে যে অচিরে যেন ইউরোপের রূপ-প্রদর্শনী (Beauty Competition) গুলি বন্ধ করা হয়, কারণ তাহাতে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কলিকাতা সহরের নালী সমূহের (drainage) যে অবস্থা তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে সহর বাসীর বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়া প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বি, দে ও ডেপুটী এক্‌জিকিউটিভ অফিসার মত প্রকাশ করিয়াছেন—মেদিরার বিপ্লব চেষ্টা দমনার্থে লিসবন হইতে যুদ্ধ জাহাজ প্রেরিত হইতেছে—কলিকাতা মুসলমান দিগের একটী খাস গোল টেবিল বৈঠক বসিবার প্রস্তাব হইতেছে—সীমলাতে একটী নৌ-বৈঠক (Shipping Conference) বসিতেছে—প্যারিস সহরে একটি আন্তর্জাতিক কার্পাস-সম্মিলন (International Cotton Federal Conference) বসিতেছে, তাহাতে ২২টী দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন—পাঞ্জাবের গভর্ণর সার জিওফ্রী ডি মণ্টোগমরী তৎ প্রদেশের চরমপন্থীরাজনৈতিক কর্ম্মীদিগের প্রতি তীব্র সতর্কতা বাণী প্রকাশ করিয়াছেন—ভারতীয় রেল পথ সমূহে একটা সর্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট আশঙ্কা আছে বলিয়া প্রকাশ—চট্টগ্রামে কোনও বিপ্লব প্রচেষ্টার সম্ভাবনা আছে বলিয়া সরকার বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতেছেন—মহাত্মা গান্ধীকে এক প্রাপ্ত পত্রের জবাব দিতে হইয়াছে যে তিনি সরকারের সহিত যোগ দিয়া জাতীয় আন্দোলনের মূলোচ্ছেদ করিতে যাইতেছেন—ভারতে একটী বিমান-সেনা-বিভাগ খুলিবার কল্পনা ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ করিতেছেন—ভারত গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক কার্য্য প্রণালীর প্রতিবাদে বিলাতের ল্যাঙ্কশায়ারের বস্ত্র-ব্যবসায়ী গণের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে।—রুশদেশে ভূমিকম্প হইয়া ৪০০ শত লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে। রোমানিয়ায় রাষ্ট্র-সঙ্কট উপস্থিত—উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশর জন্য শাসন সংস্কার সমিতি গঠিত হইল—চন্দন নগরের মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন নগর বাসীগণ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়াছেন—ফ্রান্সের সর্ব্বত্র কমিউনিষ্ট দল গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় লাল পতাকা উড়াইয়াছে—রুষের নবরাষ্ট্রের নির্ব্বাসিত নেতা ট্রট্‌সকি স্পেনে যাইয়া বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাজকোষে বহু টাকার অনটন—চীনের সহিত ইংরেজের নূতন সন্ধি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না—অর্থের অনটন হেতু এবারের সেনসাস বা লোক গণনার তালিকা সমূহ খর্ব্বীকৃত করা হইবে বলিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের আদেশ—কাণ্টার বেরির আর্চ্চবিশপ জানাইতেছেন যে ভারতে খৃষ্টান চার্চ্চ সমূহের শক্তি বদ্ধমূল করিবার জন্য চেষ্টা হইবে—কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটের প্রকাশ্য স্থানের এক পুস্তকালয় অধ্যক্ষ ভোলানাথ সেন তাহার দুইজন কর্ম্মচারী সহ দিন দুপ্রহরে কতিপয় মুসলমান আততায়ী দ্বারা ছুরিকাঘাতে নিজ দোকানে হত হইলেন (২৪শে)—রাজা পঞ্চম জর্জ্জের ২১শ বর্ষ রাজত্ব কাল পূর্ণ হইল (২৫শে)—কবিবর রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর বোলপুর শান্তিনিকেতনে তাঁহার ৭০শ জন্ম বার্ষিকী উৎসব সমাপন করিলেন (২৬শে)—মহাত্মা গান্ধী সীমলাতে বড়লাট সহ সাক্ষাৎ জন্য যাইতেছেন—শ্রীযুক্ত পি, শেষাদ্রি জেনেভার লীগ-অব-নেশনের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা-মণ্ডলে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যাইতেছেন—লণ্ডন সহরের একজন পাকা বিমানচারী মিঃ গ্রি, ফ্রায়ার তাহার প্রথম বিমান যাত্রার ৪০শ বার্ষিক উৎসব সমাপন করিলেন (৩০শে)—মঃ ডুমার ফরাসীর রাষ্ট্র-নায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন—সীমলা শৈলে ভাইসরয় গোল টেবিলের রাষ্ট্রগঠন-উপ-সমিতির সভ্যগণ সহ সংলাপ করিতেছেন (৩১শে)।

ভারতের সাধনা

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

দ্বিতীয় বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮ [অষ্টম সংখ্যা

সাধনারপথে

যেই কারণেই হউক আমরা 'সাধনা' শব্দকে মোটা মোটি পাশ্চাত্য ভাষায় প্রচলিত 'কালচার'—culture—শব্দের এক পর্য্যায়ে ধরিয়া লইয়াছি। কিন্তু ভারতের সাধনা বা Indian culture এর এক বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এই পত্রিকাতে ইহার আলোচনা হইয়াছে এবং আরও হইবে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পর্কিত বলিয়াই এ বিষয়ে অনেক প্রশ্ন ও বিতর্কের সম্মুখে আমাদের পড়িতে হয়। আজ কাল আমরা অনেক কথাই ইংরাজীর ভিতর দিয়া ধরিতে বা বুঝিতে চাই; আমাদের শিক্ষা দীক্ষা ও মনোবৃত্তির উপর দুরন্ত দাস-ভাব এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে যে, স্বাধীন ও মুক্ত ভাবে অনেক কথা বলিতে গেলে কেবল যে বাহিরের বন্ধনের ভয় তাহা নহে, ভিতরের শৃঙ্খলেও আটকাইয়া যায়। প্রকৃত কোনও আত্মশক্তির উদ্বোধন করিতে পারিলেই ইহা হইতে উদ্ধার আছে, নচেৎ নহে। ব্যাপক ভাবে আমাদের সে শক্তি রহিয়াছে—এক মাত্র ভারত বর্ষের নিজ সাধনা বা 'কালচারতে'। উহার প্রকৃতি অবধারণ করিয়া তাহার দৃষ্টি ও বলে জাতীয় জীবনের সকল দিক—শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই প্রকৃত মুক্তি সম্ভবপর; নচেৎ নহে। কিন্তু একথা এ স্থলে বক্তব্য নয়।

মনের বিকাশ
কি
সত্তার প্রকাশ

এই 'কালচার' শব্দকে পাশ্চাত্য সকল দেশেই ঠিক এক অর্থে ধরে নাই; কালচার (culture) সভ্যতা (civilisation)র প্রধান অঙ্গ; পাশ্চাত্য সভ্যতার আজিও কোনও নিশ্চিত নীতি স্থিরীকৃত হয় নাই, এই পার্থক্য তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যে ইংরাজী ভাষার

প্রভাবে আজ আমরা আমাদের সমুদয় ভাবসম্পদ লইয়া ডুবিয়া যাইতেছি, তাহাতে 'culture' কথার বহুদিন কোনও ব্যবহার ছিল না। এই শব্দটী সর্ব্বপ্রথম দেখা দেয় ইংরেজমনীষার একজন প্রধান অধিকারী ফ্রান্সিস্ বেকনের লেখাতে। বেকন পূর্ব্বতন কালের প্রচলিত জ্ঞানরাশি ও ভাবধারাকে কুসংস্কারের জঞ্জাল বলিয়া ত্যাগ করিয়া নবীন জ্ঞানালোকের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং তিনি 'কালচার অর্থে এই জ্ঞানালোককেই বুঝিতেন। এই অর্থে মানুষের 'কালচার' হইল মনের বিকাশ; লোকের মনের-শক্তি ও জ্ঞানলাভের কৌতূহল তাহার মূল। এই হিসাবে কোনও বিশিষ্ট জাতি বা ব্যক্তি আপন আপন প্রতিভা দ্বারা কি কার্য্য করিলেন বা কি আদর্শ সংস্থাপন করিলেন, তাহার পরিচয় লাভই 'কালচার'—সেই কর্ম্ম বা আদর্শের অন্তরালে যে জাতীয় প্রকৃতি বা সাধনা রহিয়াছে, তাহা নয়। মোটের উপর ইহারা বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানাদর্শের অনুযায়ী যে শিক্ষিত জীবন তাহাকেই 'কালচার' বলিবেন। শিক্ষিতের মনোবৃত্তি যে যে ভাবে বিকাশ লাভ করে—সাহিত্য কলা দর্শনাদির চর্চ্চা—তাহাই 'কালচার'। সাধনা সভ্যতা বা 'কালচার' যে নামেই বলা যাউক্ না কেন, উহা যে মানব ধর্ম্মের কোনও প্রকর্ষ লাভ তাহাতে দ্বিধা থাকা উচিত নয়। এই প্রকর্ষ কেবল মনোবৃত্তির বিকাশলাভেই নিবদ্ধ কি না, তাহাই প্রশ্ন। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের কথা, ভাব ও বক্তৃতাদিতে কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ অর্থই ধরা পড়ে। আমরা যেরূপ ইংরেজী ভাবে অচ্ছন্ন তাহাতে এরূপ না হইয়া আর কি হইবে!

ভারতের সাধনা বা Indian culture বলিতে অন্য কথা বুঝিতে হইবে। জগতের অন্তর্নিহিত কোনও সত্য-নীতি আছে, এই বিশ্বাস ভারতীয় ধর্ম্মের আস্তিকতার মূল। উহাতে রত থাকিয়া বা সংযোগ রাখিয়া চলিবার অধিকার মানুষের আছে, এবং তাহাতেই মনুষ্য জীবনের কৃতার্থতা। ইহা উপলব্ধি করিয়া ব্যক্তিগত জীবনে তাহার অনুবর্ত্তিতায় মানবধর্ম্মের যে উৎকর্ষ হইতে পারে, তাহা সাধনা এবং সাধনা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। ঋষিদিগের দৃষ্ট সত্য ইহার মূল ভিত্তি; এবং যুগে যুগে ভারতের মহাপুরুষগণের প্রদর্শিত পথ তাহার গতি নির্দ্দেশ করে। ঐতিহাসিক পরম্পরা ও দার্শনিক বিচার দ্বারা তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। বিশ্বের ঋত বা সত্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভারতের সাধনা সর্ব্বমানবেরও সাধনা। উহা কেবল মনের বিকাশ মাত্র নহে, সত্যেরই প্রকাশ। এই সাধনাকে প্রচলিত 'কালচার' কথার সহিত এক পর্য্যায়ে ধরিতে হইলে সাধনাকে 'কালচারে'র অনুগামী না করিয়া, 'কালচার'কেই সাধনায় অনুবর্ত্তী বলিয়া ধরিতে হইবে। 'কালচার' শব্দে এইরূপ উচ্চতর ভাব পাশ্চাত্যের কোনও কোনও মনীষীও স্বীকার করিয়াছেন—ফরাসী চিন্তাবীর ভলটেয়ার মনে করিতেন, জ্ঞান ও চিন্তা (মনের ক্রিয়া) লোকের সাধনা বা সিদ্ধির (cultureএর) বড় অঙ্গ নহে, কর্ম্মই উহার প্রধান অবয়ব। এজন্য লোকের চিন্তা বর্জ্জন করিয়া কেবল কর্ম্ম করিয়া যাওয়া উচিত, তাহাতেই সিদ্ধি বা মানবজীবনের পরিণতি। মনস্বী গেটের (জ্যারম্যান) মতে মনুষ্যজীবনের বহির্ভাগ ও অন্তর্ভাগের মধ্যে মিল বা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া যে উৎকর্ষ লাভ হয়, তাহাই 'কালচার'। এইরূপ মতবাদের পশ্চাতে 'কালচারে'র কোনও স্থিরতর ভিত্তি বা নীতিসূত্রের দৃষ্টি থাকা চাই—ভারতীয় সাধনাতে তাহা সুস্পষ্ট।

বীর ব্রাহ্মণ

এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুই জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মৃত্যু হইল, তাঁহাদিগকে ভুলিয়া গেলে চলে না। পণ্ডিত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য পূর্ব্ববঙ্গের একটী ব্রাহ্মণ পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বাল্যকাল হইতে বারানসীতে অধ্যয়ন ও পরে অধ্যপনা করিয়া কাশীধামেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গলার কেহ বড় তাঁহাকে দেখে নাই, জানিতও তাঁহাকে অতি অল্প লোকে। কিন্তু কাশীতে তাঁহার সম্মানের সীমা ছিল না। ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ আসন তিনি অধিকার করিতেন। পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রবিড় দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, কাশীতে তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা। অদ্বৈত বেদান্তে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতাতে আনয়ন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজে তাহার প্রতিষ্ঠা অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গলার সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করে। বাঙ্গলার মধুসূদন (সরস্বতী) যে অদ্বৈতসিদ্ধি নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া আজ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এ যুগে বেদান্ত শাস্ত্রে নায়ণের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার পঠন পাঠন বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না। শাস্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টায় তাহা এখানে আরম্ভ হইয়াছে, এবং তিনিই অধ্যাপক রূপে উহার শিক্ষার্থীরও সৃষ্টি করিয়াছেন; কলিকাতা সংস্কৃত-পরীক্ষাবোর্ডের বেদান্ত উপাধি পরীক্ষায় উহাকে অবশ্য পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করাও তাঁহারই প্রযত্নে হইয়াছে।

কিন্তু এ পরিচয় ইঁহাদের পাণ্ডিত্যের যৎ-সামান্য মাত্র। ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে তাঁহাদের ইহা আরও কম। তাঁহারা নিজ ব্যক্তিত্ব, হিন্দুত্ব বা ব্রাহ্মণত্বের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা এ যুগে দুর্ল্লভ। হিন্দু বাঁচিবে কি মরিবে, ব্রাহ্মণের কোনও মূল্য আছে কিনা এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে—অদ্যকার ভারতের নানা বিপদ পাতের মধ্যে যে অসংখ্য সমস্যার উদ্রেক হইয়াছে তাহার মধ্যে ইহাও একটী প্রশ্ন। এবং এ জন্য যে সকল সংঘর্ষ বা সমরায়োজন চতুর্দ্দিকে হইয়া আসিতেছে, তাহাতে হিন্দুর আত্মরক্ষণের অধিকার ও প্রয়োজন এই দুইই আছে। কারণ হিন্দুত্ব লোপ পাইলে কেবল ভারতের নহে, জগতের ও মানবের ক্ষতি আছে। বাস্তবিক হিন্দুত্বের প্রশ্নই আজও ভারতের অপর সমুদয় সমস্যা অপেক্ষা গুরুতর। ভারত চিরকাল নানা প্রকারের অবস্থা ও বিভিন্ন সংঘর্ষের মধ্যে একমাত্র হিন্দুত্ব রক্ষা করিয়াই স্বপ্রতিষ্ঠিত—জগতে 'হিন্দুস্থান' বলিয়া পরিচিত। এ হিন্দুত্ব ভারতের প্রকৃতির সহিত অভিন্ন। এজন্য সমুদয় বিরোধী শক্তিও ইহার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া থাকে। অদ্যকার জগতের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক প্রতিকূল শক্তিসমূহ ভারতবাসীকে যতদূর নির্য্যাতিত করিয়া রাখিয়াছে, ভারতের ধর্ম্ম বা হিন্দুত্বও তেমনই ভিতর বাহির চতুর্দ্দিক হইতে নিপীড়িত হইতেছে। এবং বাহিরের প্রভাব ও চাপে যেমন ভিতরে ভারতবাসীর মধ্যে নানা প্রকারের পার্থক্য দ্বন্দ্ব হিংসা দ্বেষাদির সৃষ্টি হইয়াছে ভারতীয়-সমাজও ধর্ম্মেও তেমনই নূতন নূতন বিরোধ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে—এজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দু ও মুসলমানে বিরোধ, নৈষ্ঠিক হিন্দু ও সংস্কারবাদীর বিরোধ, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে বিরোধ—অনুষ্ঠান লইয়া বিরোধ, আচার লইয়া বিরোধ, আইন-কানুন বা রাষ্ট্রবিধি সমুদয় লইয়াই বিরোধ।

হিন্দু ধর্ম্মের মূল শক্তি ব্রাহ্মণত্ব—মানব ধর্ম্মেরও তাহাই, তবে যে দেশে যে আকারই তাহা থাকুক না কেন। ভারতে তাহা যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। সে ব্রাহ্মণত্ব আজ কাঞ্চনমূল্যে বিক্রিত ও নিঃশেষিত-প্রায়। তাহাতে ভারতের ও জগতের কল্যাণ কি অকল্যাণ হইবে সে বিচার ভবিষ্যত ইতিহাস করিবে। কিন্তু এ অবস্থায় যদি কেহ ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ লইয়া বর্ত্তমান সমরাঙ্গণের কোনও স্থানে অবতীর্ণ হয়, তবে তাহাকে লক্ষ্যের বাহিরে রাখিলে চলিবে না।

দেশ এখন বিজাতীয় ভাবে আচ্ছন্ন; বিদেশীয় রাজশক্তি কেবল দেশের ক্ষাত্র শক্তিরই বিলোপ সাধন করে নাই, বাহিরের ভোগ ঐশ্বর্য্য ও চাক্‌চিক্যের মোহে দেশের আত্মশক্তি—ব্রাহ্মণত্বকেও বিভ্রান্ত করিয়াছে। এ কালের অনেক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষও তাহা হইতে অব্যাহতি পান নাই—তাঁহাদিগের পশ্চাতে চলিয়া দেশ উঠিয়াছে কি পড়িয়াছে, তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মণ যে সে জালে পড়িয়া আত্মমর্য্যাদা ত্যাগ করিবে, স্বার্থপর হইবে, নিজ সরল সতেজ স্বভাব ত্যাগ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছু নয়। এ মায়া ছিন্ন করিয়া আজিও যে দাঁড়াইতে পারিবে, দেশের অন্তঃপ্রকৃতি তাঁহার সহিত নাচিয়া উঠিবে। তপস্বী ব্রহ্ম-বান্ধব যে দিন বিজাতীয়তা মাত্রকেই পাপ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া দেশের কুসংস্কার (?) কেও আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন, সে দিন বাংলার অন্তরে যে শক্তির সঞ্চার দেখা দিয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মণত্বেরই প্রেরণা। তাহা নিষ্ফল হইয়া যায় নাই। প্রকৃত ব্রাহ্মণের কোনও ভাব লইয়া যদি কেহ দাড়ায় তবে তাহার শক্তির পরিচয় আজও সকলে দেখিতে পায়।

অছুত-উদ্ধার আন্দোলনে যখন সমুদয় দেশ প্রভাবিত এবং সংস্কারবাদী হিন্দুদিগের সহিত কাশীর প্রধান পণ্ডিত ও ব্যক্তিগণ বাস্তবিক নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তখন পণ্ডিত বামাচরণ নৈষ্ঠিক (Orthodox—গোঁড়া নহে) হিন্দুর পক্ষে তাহার বিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হন। আর সর্দ্দার বিবাহআইন যখন বিধিবদ্ধ হইতে যায় তখন হিন্দুর ধর্ম্ম-বিধানে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল বলিয়া লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহোদয় সরকার-প্রদত্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি ও আপন যথা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সমুদয় ভারতবর্ষব্যাপী আর এক আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন। ইহাদের কার্য্যের ফল বা প্রকৃতির আলোচনা এস্থলে উদ্দেশ্য নয়—যে সমুদয় ঘরের ও বাহিরের প্রবল বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে ইহারা দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তাহাতে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সমুদয় জাতীয় ব্যাধির প্রতিকারকল্পে বিশুদ্ধ শিক্ষার আবশ্যকতা ইহারা উভয়েই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং এজন্য দুই পণ্ডিত কাশীতে এক সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের চেষ্টায় নিয়োজিত হন। এতদ্ সম্পর্কে ইহারা উভয়েই একত্র কলিকাতাতে আগমন করিয়াছিলেন। তখন ভারতীয় সাধনা-মূলক শিক্ষা পরিষদের পক্ষ হইতে দুই একবার উঁহাদের নিকট যাওয়া এবং ও আলাপাদি করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। তখন অন্যান্য পণ্ডিত গণের মধ্যে এই দুই ব্রাহ্মণের দুইটী বিশেষ গুণ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় নাই—দুই জনাই বেশ আনু-ষ্ঠানিক ও নিষ্ঠাবান। পণ্ডিত বামাচরণ বালকের ন্যায় সরল ও নির্ম্মল—দেহকান্তি, আচার, ব্যবহার ও কথা সমুদয়ই তদনুরূপ। মনে হইল, এ ব্রাহ্মণ এক ঘোর দুর্দ্দিনে তাঁহার এই সরল-সহজ নীতি ও চরিত্র দ্বারা সমাজে অমৃতরস দান করিয়াছিল, আজ তাহার কত অভাব! পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী

মহাশয়ের সহিত অনেক কথাই হইল, তাহাতে এক কর্ম্মী, তেজস্বী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহাপুরুষের সমন্বয় দেখিতে পাইয়াছিলাম। যতদূর মনে হয় তাঁহার কথা গুলি এই—কালের প্রভাবে বা কলির প্রভাবে দেশের ও ধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত (কথা হইতেছিল অদৃষ্ট ও পুরুষকার লইয়া) হইয়া উঠিলেও ইহার প্রতিকারের প্রযত্ন সর্ব্বদাই করা যাইতে পারে—যেমন দুঃসহ গ্রীষ্মের সময় আরামের জন্য লোকে দার্জ্জিলিং যাইয়া থাকে।

—শিক্ষা পদ্ধতি হইতে ইংরেজী শিক্ষাকে একবারে বাদ দিলে সুশিক্ষা হইতে পারে, নচেৎ নহে। তাহা করিলে আমাদের ক্ষতি কিছুই নাই। সংস্কৃত দ্বারা শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য তাহা সুসিদ্ধ হয় এবং মনুষ্যত্বের অর্জ্জন সুসম্পন্ন হয়; ইংরেজী পড়িয়া বাহ্যিক কতকগুলি আবর্জ্জনার জ্ঞান হয়, অভাব জ্ঞান বাড়ে ও জীবনের দুঃখ মাত্র হয়। প্রাচীন আদর্শের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও তাহাদিগের অসাধারণ মৌলিক প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তি আর এখন হয় না, কারণ ইংরেজী শিক্ষা।

দুইজন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও চরিত্র সম্পদ্‌কে অবহেলা করিয়া বর্ণাশ্রম রক্ষার ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অকাল কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন—বর্ণাশ্রম থাকিলে ক্ষত্রিয় তাঁহাদের বাঁচাইয়া রাখিত।

ধন-সঙ্কট

আজ চতুর্দ্দিকে অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত। কেবল ভারতে হইলে আরও অনেক কিছু বিপদ্‌ পাতের ন্যায় ইহাকে অদৃষ্ট বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইত। কিন্তু এ সঙ্কট সমুদয় পৃথিবীব্যাপী—চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিয়াছে।

কবে কোন্‌ জাতি মুদ্রার সৃষ্টি করিল, তাহা লইয়া সভ্যতার ইতিহাস গণনা হয়। তার পর স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, সীসা, রাঙে আসিয়া পরিণত হইয়া এক্ষণে কাগজের আকারে অর্থ বিশ্বজগত ছাইয়া ফেলিয়াছে। তবুও আজ অর্থের অনটন কেমন করিয়া হইল, তাহাই বিচিত্র বিষয়।

ভারত অর্থকে অনর্থের মূল বলিয়া ঠেলিয়া রাখিয়াছিল—অপ্রাপনীয় বলিয়া নহে, ধর্ম্ম মোক্ষ ও কাম্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবে না বলিয়া। পশ্চিম উহারই মূলে সভ্যতার বুনিয়াদ গড়িয়াছে। ধর্ম্ম ও নীতিকে উৎপাটিত করিয়া যেদিন পাশ্চাত্যের মনীষা নিজ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে জীবনের প্রধান অবলম্বন ও ইন্দ্রিয়-ভোগকে জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়া বসিল তখন হইতে নবীন যুগের নব পৃথিবীর সৃষ্টি, আজ ইহারা তার গর্ব্বে গৌরবান্বিত। অর্থনীতি হইল ইহার প্রধান তন্ত্র ও সংহিতা। মিতাচার, সুশৃঙ্খলা বা উত্তম গৃহ পরিচালনার নামে প্রাচীন কালে যে কথার (Economic) সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই আজ ধন-বর্দ্ধন-শাস্ত্র নামে (Polit cal Economics) প্রসার লাভ করিয়া সমুদয় সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিল। তাহার চূড়ান্ত ফল ফলিয়াছে—সকল দেশের রাষ্ট্র-শক্তি উহার সেবায় নিয়োজিত, এবং সে জন্য আর সকলের উৎসাদ সাধন করিতে বদ্ধপরিকর। এজন্যই জগতের সমুদয় আয়োজন চলিয়াছে। ধন-সাধনার সর্ব্বতোমুখী জয় শীঘ্রই

জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—বৈশ্যশক্তি ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রশক্তির উপরে অধিপত্য করিয়া বসিয়াছে দেবগুরু মাথা হেঁট করিয়াছেন—বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের নিকট পরাজিত—প্লেটো, ক্যাণ্ট ও হেগেলকে এডাম্‌স্মিথ ও মার্শেলের নিকট অবনত হইয়া থাকিতে হইয়াছে। সকল কথা বলিবার প্রয়োজন এ স্থলে কম। তবে অর্থ যে অনর্থের মূল তাহা এ বাজারেও স্পষ্টই দেখা দিয়াছে—কয়েক বস্তা কাপড় ও ছুরি কাঁচি রং বিক্রী করিয়া অর্থ লাভের প্রতিযোগিতায় অত বড় ইউরোপের ধ্বংসকারী যুদ্ধটা হইয়া গেল! বণিকের সুশোভিত বন্দর পট্টন হাট বাজার আজ শূদ্রের হাতে লণ্ড ভণ্ড; আর শেষ এই বিশ্বব্যাপী অর্থের প্রচণ্ড অনটন!

লোকের বাহ্যিক অভাব সৃষ্টি করিয়া দিয়া সভ্যতার প্রসার বাড়াইয়া দেও—এই হইল এই নব্য তন্ত্রের যুক্তি। অন্তরের অভাব বোধের তাড়নায় উদ্বিগ্ন হইয়া মানুষ যে ধর্ম্ম ও নীতি জগতে স্থাপনা করিয়া গিয়াছে তাহাই বাস্তবিক সভ্যতার ভিত্তি হইয়া রহিয়াছে। অপরের অভাব সৃষ্টি করিয়া আপন স্বার্থ-সিদ্ধি ও অর্থ-লাভ করিবার যে প্রয়াস তাহা সভ্যতার প্রসার নহে—সয়তানের কীর্ত্তি। অপরের ভোগ ও বিলাস বৃদ্ধি করিতে গিয়া নানা অভাব সৃজন করিলে, নিজ বিদ্যা বুদ্ধি কলা কৌশল জ্ঞান সমুদয় তার সেবায় নিয়োজিত করিলে—উদ্দেশ্য অর্থলাভ করিয়া তোমার নিজ আরও বিস্তৃততর অভাব ও ভোগের তৃপ্তি সাধন করিবে। অর্থ আসিল, তাহা গোলা-জাত করিলে, রাশি রাশি ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইল—তাহাতে সে অভাব সৃষ্টির কার্য্য আরও শত গুণ চলিতে লাগিল—প্রতিযোগিতা বাড়িল, লড়াই হইল, পৃথিবীর একভাগ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, গৃহ শ্মশান হইল, তথাপি বিরাম নাই। অপরের বিনাশ-শোণিতে সে লোলুপ লালসা আরও বাড়িয়াই চলিল। দুরন্ত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় গোলাজাত মূল ধনের সমুদয় নিঃশেষ করিয়া অন্যের অভাব পূরণের জন্য অসীম পরিমাণ দ্রব্যজাত প্রস্তুত করিয়া ফেলিলে, এবং আরও করিতে যাইতেছ। কিন্তু সসীম লোকের সীমিত আকাঙ্ক্ষা বাস্তব অবস্থার সীমার মধ্যে নিবদ্ধ; তোমার ধনাকাঙ্ক্ষার সহিত তাহার মিল বা সামঞ্জস্য রহিল না। তুমি ঘরের ধন খোয়াইয়া বসিয়া প্রতিদানে তা ফিরিয়া পাইলে না—ঘোর অভাবে নিশাহারা হইয়া পড়িলে; হাতে হাত ধরিয়া দলে দলে পড়িয়া মরিলে! এই গেল এক দিক। আরও কত দিকে ঐরূপ বিভ্রাট ঘটাইয়া বসিয়াছে। যে দানবীয় মায়াতে এ গোলক ধাঁধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সে অপরকে আবদ্ধ করিয়াছে, আপনিও জড়াইয়াছে। আজ সে ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিতে বসিয়াছে। এ ভেল্‌কীতে ভারত কতখানি আত্মহারা, নির্যাতিত ও বিলুণ্ঠিত-সর্ব্বস্ব হইয়াছে, তাহাই আজ বুঝিতে হইবে এবং ধীরতা অবলম্বন করিয়া, আত্মস্থ হইয়া, আত্মশক্তির উদ্বোধনের নূতন উদ্যোগ করিতে হইবে। ব্যাপাক ভাবে সে শক্তি ভারতের নিজ সাধনার স্তরে স্তরে সংস্পৃক্ত রহিয়াছে। সে সাধনাই ভারতের গৃহ, বাটী, গ্রাম সমাজে এবং ধনী, নির্ধন, রাজা, প্রজা জমিদার, উচ্চ নীচ সকলের মধ্যে নূতন বল সঞ্চার করিতে পারে। ভারতের সমাজ-নীতি সমাজের অর্থ-সাম্যকে চিরকাল প্রধান স্থান দিয়া আসিয়াছে—জাতি-ভেদ ও বর্ণ-বিভাগ তাহার নীচে। ভারতের সেই সনাতন নীতির সমাজ-ব্যবস্থায় নূতন সমাজ-সংগঠন সম্পাদিত হউক্। গ্রাম-সংগঠনের দিকে লোকের মতি ইতিপূর্ব্বেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। একালের এই আসুরিক অর্থনীতির বশেই গ্রাম বিধ্বস্ত ও ধ্বংস মুখে পতিত হইয়াছে। পরের সৃষ্ট ভোগ-বিলাশের প্রবাহে ভাসমান দেশের ধনী ও জমিদার-শ্রেণী গ্রাম

ছাড়িয়া সহরে বাস করিতেছেন, প্রজার শোণিত-সিক্ত অর্থ সহরের আড়ম্বর ও অপব্যয়ে উড়াইয়া দিতেছে। ভারতীয় সাধনার রীতিতে মিতব্যয়ী ভূম্যাধিকারীর সমুদয় অর্থ প্রজার মঙ্গল ও আনন্দ বর্দ্ধনে ব্যয়িত হইত। অন্যদিকে ব্যবসায়ীকুল বিদেশীয় বণিকের লাভ ও ধনপুষ্টির নিমিত্ত বিদেশীয় পণ্য যথেষ্ট লাভে নিরীহ গ্রামবাসী দিগের উপর চাপাইয়া দিয়া দেশকে নিঃস্ব করিয়া দিতেছে; আবার আইন আদালতে অর্থের বিনিময়ে বিচার বিক্রীত হইতেছে, তাহার ছায়াতে থাকিয়া হাকিম, উকীল ও নানাশ্রেণীর হীনপ্রকৃতি আইনের দালালগণ মৃত সমাজ দেহের অর্থ-শোণিত লইয়া নিজ দেহের পুষ্টি-সাধনে ব্যস্ত। সে অর্থও ব্যয় হয় সমাজের বাহিরে নানাবিধ অপচারে। ভারতীয় সাধনার দৃষ্টিতে সমাজ ব্যবস্থায় এ সকল অপচারের স্থান নাই—সর্ব্বসাধারণের মধ্যে মৈত্রী ও সাম্য ভাব এবং পল্লীসমাজের স্বাধীন শাসন-বিধিতে ভারতের সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, সর্ব্বসাধারণের উদার ও সরল নীতিজ্ঞান তাহার সকল দিকে রস ও বল সঞ্চয় করিত। অদ্যকার এই বিজাতীয় অর্থের বাজারে আগুন ধরাতে আবার সকলের দৃষ্টি সেই দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। অর্থের এই আসুরিক তাণ্ডবতা ছাড়িয়া, সমাজ আবার সুর পুরীতে আবর্ত্তন করিতে থাকুক। ভারতের সে মহা-সাধনার মহাশক্তির উদ্বোধন মন্ত্রে কেবল ভারত নাই, জগত জাগরিত হইয়া উঠিবে। অদ্যকার এই তমসাচ্ছন্ন সঙ্কটকে সে উদ্বোধনের পূর্ব্বগামিনী মহালয়ার সুযোগ-রজনী বলিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে।

রাষ্ট্র-ভাষা—সমস্যা

কলিকাতাতে এবার হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনের বিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল। হিন্দী ভাষার পরিপুষ্টি সাধন এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য। হিন্দী ভাষা সর্ব্বসাধারণের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে পারে, সে জন্যও এই সম্মিলন চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সাহিত্য হিসাবে হিন্দী ভাষার তেমন উন্নতি না হইয়া থাকিলেও প্রচলিত কথিত ভাষারূপে হিন্দীর প্রচলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। হিন্দী ভাষার পরিপুষ্টি সাধনের নিমিত্ত কতকগুলি অনুকূল অবস্থাও বিদ্যমান রহিয়াছে। হিন্দীসাহিত্য-সম্মিলন ও নাগরী-প্রচারিণী সভা এবং আরও অনেক বিবিধ প্রতিষ্ঠান হিন্দী সাহিত্যের উন্নতি ও হিন্দী প্রচলনের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন; ইহাদের প্রযত্নে অনেক পুস্তক অন্যান্য ভাষা হইতে অনুবাদিত হইয়া হিন্দীতে প্রকাশিত হইয়াছে; পরীক্ষা, পুরস্কার-বিতরণ ও বিশেষ কোনও পুস্তক প্রণয়ন বা অনুবাদ করিবার নিমিত্ত ইহাদের বিশেষ বিশেষ পারিতোষিকাদির ব্যবস্থা আছে। হিন্দী ভাষার সহায়ক অনেক ধনী ও শ্রেষ্ঠী লোক এবং কতিপয় রাজা ও জমিদার রহিয়াছেন। অনেক অনুন্নত স্থানের স্থানীয় চলিত ভাষার সহিত হিন্দীর অনেকটা মিল থাকাতে, ঐ স্থানের লোকদের শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহারা হিন্দী পুস্তকাদি অধ্যয়ন করে, এবং আপনাদিগের ভাষাকে হিন্দী ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছে, এইরূপে অনেক স্থানের কথিত ভাষা, স্থানের প্রকৃতি অনুসারে পৃথক হইলেও, রাজকার্য্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যাদির কার্য্য ও শিক্ষায় হিন্দীতে চলে। হিন্দী ভাষাতে মনের ভাব—বিশেষ করিয়া আবেগপূর্ণ ভাবের কথা শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায়—বাঙ্গলা দেশে দেখা যায়, এবং শুনিয়াছি গুজরাট ও মহারাষ্ট্রেও ঐরূপ হয়—লোকে রাগের ভরে অমনিই দুই একটা হিন্দী

কথা বলিয়া ফেলে। হিন্দী ভাষাতে লোকে শীঘ্র শীঘ্র অভ্যস্ত হইতে পারে। সর্ব্বশেষে বলিতে হইবে যে বর্ত্তমান রাজনৈতিক জাতীয় আন্দোলন হিন্দী ভাষার বিশেষ সমর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—মহাত্মা গান্ধী হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ও বিভিন্ন স্থানে উহার প্রচারের জন্য কার্য্যতঃ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। অনেক জাতীয় বিদ্যালয়ে হিন্দীভাষী ব্যতীত অপরের মধ্যেও হিন্দী শিক্ষার সূচনা হইয়াছে এবং হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণের সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

বাহ্যিক আয়োজন এবং সুবিধা ঘটিয়া থাকিলেও কিরূপ ভাবে হিন্দী বাস্তবিক সমগ্র ভারতের ভাষা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, তাহার নিশ্চিত উপায় কিছু এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। এখনও উহা দূর অভীপ্সিত বস্তুর ন্যায় স্বপ্ন-কল্পনা মাত্র। প্রধান অন্তরায় এই যে ইংরেজী ভাষা দেশের বুকের উপর এমনই দৃঢ় আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে যে, স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও শীঘ্র উহাকে অবসারিত করা যাইবে না; আবার হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া প্রচলিত করিবার সময় অন্য ভাষা-ভাষী প্রদেশীয় লোকদিগের মধ্যে তাহার বিরোধ করিবার আশঙ্কাও আছে। আবার কোনও ভাষাকে দেশের প্রচলিত অপর ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বসিতে হইলে তাহার নিজ ভাবসম্পদ বা সাহিত্যের গৌরবই তাহাতে প্রধান সহায়তা দান করিতে পারে। এ বিষয়ে ভারতের অন্যান্য কয়েকটী প্রাদেশিক ভাষা হইতেই হিন্দী এখনও পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে ভাষা লোকের কায়া ও চিন্তার ন্যায় আপনিই আপনাকে গড়িয়া তোলে, বাহিরের অবস্থাতে তাহার সাহায্য করিতে পারে মাত্র, কিন্তু প্রকৃত প্রসার বা উন্নতির কার্য্য ভাষার নিজেরই হাতে—তার নিজ অন্তঃশক্তির উপর তাহা নির্ভর করে, কেহ জোর জুলুম করিয়া কিছু করিতে পারিবে না। ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষা স্বভাবতঃ আপন আপন রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া চলিয়াছে—জাতীয় জীবনের অন্যান্য দিকের সহিত ইহার অবশ্যই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আজ ভারতের জাতীয় জীবন যেমন সকল দিকে সমষ্টিগত একটী একতার দিকে চলিয়াছে, তাহাতে দেশের ভাষার কোনও একাভিমুখিনী গতি হওয়া স্বাভাবিক। এ গতিতে অন্যান্য সকল প্রাদেশিক ভাষা যে কেবল হিন্দীর লক্ষ্যেই চলিবে তাহা নহে—হিন্দীকেও অপর সকল ভাষার সহিত সেই এক অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে রূপ বদলাইয়া চলিতে হইবে। হিন্দীতে এই রূপান্তরতার ভাব অন্য অনেক ভাষার অপেক্ষা সহজ-সাধ্য ইহা ঠিক, এবং বর্ত্তমান চলিত হিন্দী সেই রূপান্তরতারই সহজ পরিণাম। সকল ভাষাকে এই এক লক্ষ্যে চলিবার পক্ষে যে সকল বাধা বিঘ্ন আছে তাহা অপসারিত করিয়া দিলেই উদ্দেশ্য সহজে সুসিদ্ধ হইতে পারে। এজন্য সর্ব্ব প্রধান প্রতিবন্ধক বিভিন্ন ভাষার লিপি-পার্থক্য। ভারতের সমুদয় ভাষাগুলিকে এক দেবনাগর অক্ষরের পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিলে, ইহাদের পরস্পরের ভাব বিনিময় ও সংমিশ্রণের এক অপূর্ব্ব সুযোগ সংঘটিত হইবে এবং তাহাদের পরস্পরের ভাবসম্পদের সমন্বয়ে ভারতের ভাবী রাষ্ট্রভাষা সহজে সংগঠিত হইয়া উঠিতে পারিবে। সে সৃষ্টি স্বাভাবিক; কিন্তু তাহা কালের অপেক্ষা রাখে।

কর্ম্মতত্ত্ব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রাচীন দার্শনিক মত

সাংখ্য ব্যতীত প্রাচীনকালের বিশুদ্ধ দার্শনিক মত—এদেশে ন্যায় ও বৈশেষিক এবং পাশ্চাত্যদেশে গ্রীকদের কোন কোন দর্শন। ন্যায়, বৈশেষিক মত প্রসিদ্ধ এবং এস্থলে উত্থাপন করা অনাবশ্যক। বৈশেষিকদের একপ্রকার পরমাণুবাদ আছে; তাহারও বিশেষ কথা বলা অনাবশ্যক; যেহেতু বক্ষ্যমাণ পরমাণুবাদের উহা অন্তর্গত। গ্রীকদের মধ্যে ডিমক্রিটাসের (ও তৎপরে এপিকিউরাসের) পরমাণুবাদ প্রসিদ্ধ। তন্মতে (১) পরমাণু ও শূন্য অবকাশ এই দুইটি সত্য পদার্থ আর সব অলীক মত মাত্র (২) পরমাণু অসংখ্য ও তাহারা অসংখ্য আকার বিশিষ্ট (৩) তাহারা অনন্তশূন্যে কেবল পড়িতেছে বা পতনরূপ গতিবিশিষ্ট (৪) উহাদের আর একগুণ সাময়িক গতির হ্রাস বা পার্শ্বগতি (clinamen)। তাহাতে তাহারা পুঞ্জীভূত হইয়া দ্রব্য উৎপাদন করে। (৫) Soul নামক আত্মারও অণু আছে। তাহারা অগ্নির অণুর মত সূক্ষ্ম, চিক্কণ, গোল সর্ব্বাপেক্ষা গতিশীল, এবং সর্ব্বশরীরে অপ্রতিহতভাবে প্রবেশ করিতে সমর্থ। এইরূপ পরমাণুর দ্বারা দেব মনুষ্যাদি সমস্ত নির্ম্মিত! ইহা গ্রীকদের প্রাচীন জড়বাদ। বলা বাহুল্য যে এইসব থিওরী কেবল কল্পনামূলক ও যুক্তির ভিত্তিরহিত (fanciful theory). যাহা নাই বা শূন্য তাহা বস্তুরূপে কল্পনা করা অসম্ভব। আলোক অন্ধকার বা অন্য ইন্দ্রিয় বিষয় ব্যতীত শুদ্ধ ফাঁক কল্পনা করা সাধ্য নহে, সুতরাং উহা বাঙ্মাত্র বিকল্প জ্ঞান। আর ঐ পরমাণু কিসের দ্বারা নির্ম্মিত? তাহা অবিভাজ্য কেন?—তাহা এই প্রণালীর দর্শনে নির্ণেয় নহে (এখনও যে অণুক বিষয় বৈজ্ঞানিক জগতে স্থান লাভ করিয়াছে তাহাও যে কি তাহা সেই দৃষ্টিতে জ্ঞেয় নহে)।

তবে ডিমক্রিটাস যে বলেন শূন্য হইতে শূন্য হয় বা কিছু না হইতে কিছু হয় না (নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ); যাহা আছে তাহা কখনও শূন্য হয় না; না ভাবো বিদ্যতে সতঃ); কিছু নিষ্কারণে হয় না; প্রত্যেক ঘটনা কারণের নিয়মানুসারে ঘটে—এই সব নিয়ম অতি সত্য এবং সাংখ্যের সম্যক্ অনুমত।

প্রাচীন গ্রীসে দুইটি মত লইয়া দুই দার্শনিক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত ছিল। তন্মধ্যে হেরাক্লাইটাস্ (Heraclitus) প্রবর্ত্তিত মতে "হওয়া" বা সত্ত্বক্রিয়া (becoming) বস্তুর (existence এর) মূলতত্ত্ব। এই বাদের পণ্ডিতেরা বলেন; যখন সমস্তই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল প্রবহমাণ ভাব; তখন সার্বত্রিক "সত্ত্বক্রিয়াই" প্রকৃত সত্য। যখন সবই বদলাইয়া যাইতেছে তখন কোন কিছুর সম্বন্ধে ঠিক করিয়া বলা যায় না। অগত্যা চুপ করিয়া থাকা ইহাদের অভিমত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হেরাক্লাইটাসের শিষ্য ক্রেটাইলাস্‌কে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মাত্র অঙ্গুলি নাড়িতেন।*

* জৈনদের স্যাদ্‌বাদ মত অনুসারে দ্রব্যের গুণ অনন্ত সুতরাং সর্ব্ব দ্রব্য সম্বন্ধে ধ্রুব বলা যায়। প্রশ্ন করিলে সর্ব্ব দ্রব্য সম্বন্ধে "স্যাৎ" বা হইতে পারে এরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত।

উক্ত গ্রীক মতের ন্যায়ানুসারে কিছু না বলাই সিদ্ধান্ত। জৈনদের মতে সমস্ত বলাই সিদ্ধান্ত। বস্তুত এই দুই

(ছ) গ্রীক্‌দের দ্বিতীয় প্রধান দর্শনের গুরু পার্‌মেনাইডিস্ (Parmanides) তাঁহার মতে সত্তা (being) সর্ব্বভাবের মূল তত্ত্ব। এই দুইবাদের মধ্যে যাহা সত্য তাহা সমন্বয় করিলে সাংখ্যের মধ্যেই আসিয়া পড়ে। বস্তুত "হওয়া" বা সত্বক্রিয়াও যেমন মূলতত্ত্ব, "আছে" বা সত্বও সেইরূপ মূলতত্ত্ব। ক্রিয়া হইলেই জ্ঞান, আর জ্ঞান হয়—"আছে" এমন কিছু বা সত্ত্ব লইয়াই। "হওয়াকে" ও "যাহা হয়" তাহাকে অর্থাৎ সত্বক্রিয়াকে ও সত্বকে বিযুক্ত করার যো নাই। উহারা অবিনাভাবী পদার্থ। স্বতরাং উভয়েই তুল্যরূপে মূলভাব। উহাদের সহিত পূর্ব্বপ্রদর্শিত জড়তা লইলে সত্ব, রজ, ও তম-রূপ তিন মূল ভাবপদার্থলব্ধ হইয়া দর্শন সম্যক্ হয়। গ্রীক্‌দের অন্যতম প্রধান দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটল্, মন ও ভূত এই (পূর্ব্বকথিত) দুইবস্তুবাদী (dualist). প্লেটোর পদার্থ বা categorys মধ্যে প্রধান—Being, rest and motion বা সত্তা, স্থিতি ও গতি, ইহা সত্ব রজ তম এই তিন গুণের প্রায় কাছাকাছি।

খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দে যে নব প্লেটো বাদ (Neo-platonism) প্রচলিত হয় (মিসরের আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় ইহার উদ্ভব) তাহা ভারতীয় দার্শনিক মত হইতে গৃহীত। উহার প্রাচীন আচার্য্য প্লোটিনাস্ ভারতীয় দর্শন শিক্ষার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু ঘটনাক্রমে পারেন নাই বলিয়া কথিত হয়। আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে (বা পূর্ব্ব হইতে) ভারতীয় দর্শন পাশ্চাত্য দেশে প্রসারিত হয়। তাহাতে প্লোটিনাস্ ভারতীয় দর্শনের বিষয় নিশ্চয়ই বিজ্ঞাত ছিলেন নচেৎ ভারতে শিক্ষার জন্য যাইবার উদ্যম করিবেন কেন? দুর্ভাগ্যের বিষয় প্লোটিনাসের মূল গ্রন্থসকল এক খৃষ্টান সম্রাটের আদেশে ধ্বংসীকৃত হয়। তবে অনেকে স্বগ্রন্থে তাঁহার লেখা উদ্ধৃত করাতে তাঁহার মত অনেকটা জানা যায়। উপনিষদের মতের ন্যায় অনেকটা তাঁহার মত। তাঁহাদের ব্রহ্ম উপনিষদের ব্রহ্মের মত নির্গুণ, অমনা, অনণু, অদীর্ঘ (without attributes, thought and magnitude) ও তিনি মূল কারণ। জীব বা "nous" ব্রহ্মের অবভাস (emanation) ধ্যানের দ্বারা জীব শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মত্বে যান বা ব্রহ্মবৎ হন। ধ্যান বা যোগ ও তৎপরে সমাধি (ecstasy) ইহাদের প্রধান সাধন। অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য আদিও ইহারা পালন করিতেন। এইরূপে সাংখ্যযোগীদের ও ইহাদের কর্ম্মনীতি সদৃশ। ইহাদের পদার্থ এইরূপ—১ম অদৃশ্য পদার্থ যথা (১) আদিপুরুষ বা supreme being (২) জীব বা আত্মা (৩) মন। ২য়—জড়জগৎ। ইহাদের "nous" (এই শব্দের সাধারণ অর্থ বুদ্ধি) যাহা আদিপুরুষের আভাস-স্বরূপ তাহা ভারতীয় দর্শনের বুদ্ধিতত্ত্ব মহত্তত্ত্ব বা জীবের সদৃশ, মহত্তত্ত্ব যেমন ব্যক্তপদার্থের মূল কারণ তেমনি "nous" ও সমস্ত গ্রাহ্য পদার্থের মূল কারণ (archetype of all existing things)। ধ্যানের দ্বারা যে অলৌকিক শক্তি হয় এ বিষয়েও তাঁহারা ভারতীয় দর্শনের সহিত একমত। প্রার্থনা মাত্র সম্বল খৃষ্টানদের মতের সহিত ইহাদের এই সাধনসাধ্য মত অত্যন্ত বিরুদ্ধ ছিল বলিয়া শেষে খৃষ্টানদের

মতই একরূপ। কারণ জৈনমতের "সব বলা" অর্থে প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ কিছু না বলা; আর গ্রীকমতে অসংখ্যপ্রকার ব্যাক্তব্য হইতে পারে বলিয়া কিছু না বলা।

"কিছু না বলা" বা সব হইতে পারে" বলা দার্শনিক হিসাবে নিরর্থক। এরূপ দৃষ্টিতে জগতত্ত্ব বুঝিতে হইবে যাহাতে মূল পর্য্যন্ত যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা থাকে। তাহাই প্রকৃত দর্শন স্বমত যদি অবচনীয় হয়; তবে পরকে জানাইবে কিরূপে?

দ্বারা ইহা বিলুপ্ত হয়। ইহা সাংখ্যযোগাদি ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য Plato আদির মিশ্র মত। ইহাদের তাই eclecticও বলা হইত।

(জ) বিশ্বের মূল সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকেরা কতদূর উঠিয়াছেন তাহা দেখান হইল। বিশ্বের আর এক মূল যে দ্রষ্টৃরূপ হেতু আছে—যাহার বিষয় অব্যবহিত পরেই বলা হইবে—তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা কিছুই জানেন না। তাঁহাদের spirit, soul প্রভৃতি পদার্থ সাংখ্যের দ্রষ্টৃপুরুষ নহে। spirit বা soul পদার্থ ঠিক দার্শনীক পদার্থ নহে। উহার লক্ষণ ঠিক যে কি তাহাও কেহ বলেন না। যেন প্রসিদ্ধ পদার্থের মত উহা ধরিয়া লওয়া হয় ও স্বেচ্ছানুসারে নানারকমে উহা ব্যবহার করা হয়। কেহ কেহ বিতর্ক করিতে করিতে সাংখ্যীয় 'পুরুষের' কিছু নিকটে গিয়াছেন বটে কিন্তু প্রকৃত ন্যায়সঙ্গত দ্রষ্টৃপুরুষের ধারণার অনেক দূরে আছেন।

লাইব্‌নিট্‌স্ (Liebnitz) যে monad নামক অণু-আমিত্বের কথা বলেন তাহার কতক অংশ প্রকৃত পথে অগ্রসর হইয়াছে। আমরা অনুভব করি "আমি এক, অবিভাজ্য, অশেষ প্রকার জ্ঞানযুক্ত * অশেষ প্রকার ক্রিয়ার আধার। এইরূপ এক একটি আমিত্বেই monad অণু। ইহারা অসংখ্য দেখা যায় বলিয়া অসংখ্য। জড় বা matter পদের দ্বারা যে বিজ্ঞান হয়, ইহা কাযে কাযেই তাদৃশ পদার্থ নহে। এই বাদের যতটুকু বলা হইল তাহা বেশ অনুভূয়মান সত্য পদার্থ। অজ্ঞেয় অথচ জ্ঞেয়, কাল্পনিক matter নামক পদার্থের (conceptএর) ন্যায়,—ম্যাটারের অবয়বভূত অণু বিভাজ্য হইলেও তাহাকে অবিভাজ্য কল্পনা করার ন্যায়,—অকল্পনীয় শূন্য কল্পনা করার ন্যায় এই আমিত্ব অণু (or monad) বাদে ন্যায়বিগর্হিত, স্বোক্তিবিরুদ্ধ কথা বলিতে হয় না। এই বাদে ঈশ্বর সর্ব্বপ্রধান (supreme) monad। তিনি সর্ব্বজ্ঞ। মানুষ, পশু ও ভূত (elements of matter) সকল অপেক্ষাকৃত ক্রমশঃ মলিন জ্ঞান (idea) যুক্ত monad।

এই বাদের সহিত ভারতীয় সাংখ্য বেদান্ত ও বৌদ্ধ মতের অনেক দূর পর্য্যন্ত ঐক্য আছে। সাংখ্য বেদান্তের প্রত্যেক জীব ও বৌদ্ধের পঞ্চস্কন্ধযুক্ত সত্ত্ব ঐরূপ monad। আর সাংখ্যের সর্ব্ববিদ্ সর্ব্বকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ, বেদান্তের সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভ, বৌদ্ধদের সর্ব্বজ্ঞসত্ত্ব (আদি-বুদ্ধ আদি) ঐরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানযুক্ত মন্যাড্ (monad)। নিজের আমিত্বরূপ মন্যাড্‌কে জানিলে যে বিশ্বের জ্ঞান হয় (But this is typical of the universe and reveals its nature and origin) এ বিষয়েও ভারতীয় দর্শন একমত। ইহার পর এই মন্যাড্‌কে বিশ্লেষ করিয়া সাংখ্য দেখান, ইহার কোন অংশ অবিভাজ্য এক, এবং কোন্ অংশ বিভাজ্য; কোন্ অংশ অনুৎপন্ন ও কোন্ অংশ উৎপন্ন; কোন্ অংশ নির্ব্বিকার ও কোন্ অংশ বিকারী। তন্মধ্যে উৎপন্ন, বিকারশীল অংশের মূল কারণ যে নিত্য, বিকারস্বভাব ত্রিগুণ, তাহা দেখান হইয়াছে। পর প্রকরণে নির্ব্বিকার দ্রষ্টার বিষয় বিবৃত হইতেছে।

প্রাগুক্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থমতে যে যে ঈশ্বরবাদের থিওরী আছে তাহাতে সর্ব্বজ্ঞ-

* I am a monad, an active centre, an agent, the whole universe is mirrored into that centre, focussed there and my activity consists in perceiving.

মনোযুক্ত ঈশ্বর স্বীকৃত হন। মনের উপাদান ঐ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন স্বভাবযুক্ত দ্রব্য অতএব ঐ ঐ মতও সাংখ্যীয় সিদ্ধান্তের অনুগত হইল।

ঝ। শুদ্ধ এই প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতি স্বভাব উপাদান দ্রব্য দিয়া যে আমি নির্ম্মিত উহাই যে আমিত্বের সব তাহাও বলা যায় না। কারণ প্রকাশ অর্থে বুদ্ধ হওয়া সুতরাং তাহা অচেতন বা দৃশ্য, এক ভাব হইতে আর ভাবে যাওয়া—এইরূপ স্বভাব বা ক্রিয়াও অচেতন এবং উহাদের স্থিতিস্বভাবও অচেতন। শুদ্ধ অচেতন দ্রব্যের দ্বারা সচেতন আমিত্ব নির্ম্মিত এইরূপ চিন্তা ন্যায়-সঙ্গত হইতে পারে না। অনুভবও হয় 'আমি জ্ঞাতা' অতএব এই অনুভূতিকে বিশ্লেষ করিয়া ন্যায় সঙ্গত সিদ্ধান্ত করিলে বলিতে হইবে ঐ অচেতন উপাদান ছাড়া আমিত্বের এক চেতন হেতুও আছে। সব দ্রব্যের-উপাদান ও নিমিত্ত দুইরকম কারণই হয়। আমিত্বের সচেতনতা ঐ চেতন হেতু-যোগে হইবে। অতএব ঐ চেতন হেতুকে পূর্ণ চেতন বা স্বতঃসিদ্ধ চেতন বলিতে হইবে অর্থাৎ তাহা আমিত্বের মত অন্য চেতন যোগে চেতনবস্তু নহে। স্বতঃসিদ্ধ চেতনের নাম দ্রষ্টা বা চিৎ বা চৈতন্য। ন্যায়ানুসারে লক্ষণ করিতে হইলে চৈতন্যকে অচেতন দৃশ্যধর্ম্মশূন্য দ্রব্য অর্থাৎ নির্ব্বিকার দ্রষ্টা বলিয়া লক্ষিত করিতে হইবে।

শঙ্কা হইতে পারে দ্রষ্টা ও দৃশ্য যখন সম্পূর্ণ বিপরীত—দ্রষ্টা যখন নির্ব্বিকার, স্বয়ং প্রকাশ, চিদ্রূপ, দৃশ্যধর্ম্মহীন তখন তাহার যোগে বিকারী, অচেতন, দৃশ্য, ত্রিগুণ কিরূপে সচেতন বা চেতনা-বৎ হইবে। দ্রষ্টা ও দৃশ্য কিরূপ পদার্থ তাহা উত্তমরূপে বুঝিলে এই শঙ্কা নিরসিত হইবে এবং ইহার অবকাশ থাকিবে না। প্রথমত দেখিতে হইবে ঐ উভয় পদার্থকে—দ্রষ্টা ও দৃশ্য, চেতন (স্বয়ং-প্রকাশ) ও অচেতন, চৈতন্য ও জড় এই যে সব নাম দেওয়া হইয়াছে তাহার অর্থ কি ও কেন দেওয়া হইয়াছে। দ্রষ্টা = বিজ্ঞাতা; দৃশ্য = বিজ্ঞেয়; চেতন = স্বতঃবোধ; অচেতন = বোধ্য; চৈতন্য = চেতা; জড় = চেতয়িতব্য। অতএব এই নাম সকল পরস্পর সাপেক্ষ্য অর্থাৎ দ্রষ্টা বলিলেই দৃশ্য থাকিবে; স্বতঃবোধ থাকিলে বোধ্য থাকিবে। এরূপ সাপেক্ষ নাম দিবার বা অভিকল্পনা করার কারণ কি? উত্তরে বলিতে হইবে অনুভব করি বলিয়া। আমরা অনুভব করি যে "আমি জ্ঞাতা" আবার ইহাও অনুভব করি যে আমার সব জ্ঞাতা নহে, কতক জ্ঞেয়। "আমি" এই বোধে যেমন জ্ঞাতৃত্ব থাকে সেইরূপ শরীরাদি জড়ভাবের অভিমানও থাকে। অতএব আমিত্ব চেতন ও অচেতনের মিশ্রণ, ইহা অনুভূয়মান সত্য। আমিত্বের শুদ্ধ "জ্ঞাতা" অংশ চেতন দ্রষ্টা, অন্য অংশ অচেতন বা চেতয়িতব্য দৃশ্য। আরও অনুভব করি ঐ দুইভাব পৃথক্ হইলেও উহারা মিলিয়া থাকাতে আমিত্বের অচেতন অংশ চেতনবৎ হইতেছে। "আমি শরীরবান্" ইত্যাদি ভাব ইহার উদাহরণ। এই সকল তথ্যের উদাহরণ দেখিয়াই বলি দৃশ্যের নিশ্চয়ই প্রকাশ নামক অন্যতম অংশ থাকিবে। প্রকাশ অর্থে বোধ। সমস্ত বোধই কোন বোদ্ধার দ্বারা প্রকাশিত। বোধের অন্য উদাহরণ নাই বলিয়া অন্য বোধও নাই। কোন থিওরী বা সম্ভবপর হেতু দিয়া বুঝাইবার জন্য বলি না 'চেতন সম্পূর্ণ পৃথক্ অচেতনকে চেতনাবৎ করে (যাহাতে অনভিজ্ঞ লোকের শঙ্কা আসে) কিন্তু অনুভব কার বলিয়াই উহা বলি (আমিত্বের উদাহরণে)। যেমন সরবৎ খাইয়া বলি ইহাতে চিনি ও জল আছে তেমনি আমিত্বের মধ্যে অবিভাজ্য একত্ব ও বহুত্ব, নির্বিকারত্ব ও বিকারত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব দেখিয়া বলি অখণ্ড এক, নির্ব্বিকার, জ্ঞাতা ও বিভাজ্য,

বিকারী জ্ঞেয় দ্রব্য আছে। আর ঐ দুই দ্রব্য মিলিয়া আছে বলিয়া বলি উহারা মিলিবার দ্রব্য। মিলনও যে কিরূপ তাহা অনুভব করিয়া বলি এক প্রকাশক ও অন্য প্রকাশ্য ; এক স্বপ্রকাশ ও অন্য প্রকাশ্য হইবার যোগ্য প্রকাশ বা এক বিজ্ঞাতা ও অন্য বিজ্ঞান।

সংযোগজাত পদার্থমাত্রেরই কারণ থাকে। দ্রষ্টা চিৎ ও দৃশ্য ত্রিগুণ এই দুইটি চরম বিশ্লেষ বা ultimate analysis বলিয়া কারণহীন পদার্থ। যাহাদের কারণ নাই তাহারা নিত্যকাল স্ব-স্বভাবে বর্ত্তমান বলিতে হইবে।

ঞ। অতএব জানা গেল অনাদি বর্ত্তমান নির্ব্বিকার দ্রষ্টা ও বিকারী গুণত্রয়রূপ দৃশ্যের যোগে আমিত্ব নির্ম্মিত। এখন প্রশ্ন হয় কত কাল হইতে আমিত্ব নির্ম্মিত হইয়াছে? উত্তরে বলিতে হইবে অনাদি কাল হইতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যোগ ("আমি জ্ঞাতা" এরূপ জ্ঞান) আছে। কারণ অযুক্ত অনাদি দ্রষ্টার ও দৃশ্যের হঠাৎ যুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমিত্ব নামক জ্ঞান অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।* উপাদানের বিকার স্বভাবহেতু সমস্ত জ্ঞানই বিকারী বা ভেঙ্গে ভেঙ্গে হয়। অতএব আমিত্ব জ্ঞানও বিকারী। অর্থাৎ "আমি জ্ঞাতা" এইরূপ জ্ঞান "আমি জ্ঞাতা" "আমি জ্ঞাতা" এইরূপ ভাঙ্গার ও উঠার প্রবাহ স্বরূপ। তজ্জন্য এইরূপ অনাদি পদার্থকে প্রবাহরূপে অনাদি বলা হয়। আমিত্ব অনাদি হইলে আমিত্বের কর্ম্মও অনাদি। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে কর্ম্ম অনাদি।

আরও জানিতে হইবে মূল উপাদান প্রধানের ক্রিয়া স্বভাব, দ্রষ্টার দ্বারা প্রকাশিত হওয়াই কর্ম্মের পরম মূল। স্ব-প্রকাশ দ্রষ্টার স্ব প্রকাশ স্বভাব ও দৃশ্যের প্রকাশযোগ্যতা স্বভাব মিলিয়া একটি জ্ঞান নামক প্রকাশ হয়। তাহা হইবামাত্রই দৃশ্যের অন্যতম স্বভাব যে ক্রিয়া তাহা তাহাকে (জ্ঞানকে) ভাঙ্গিয়া আবরণের দিকে লইয়া যায়। সেইরূপ ক্রিয়াস্বভাব আবরণ স্বভাকেও ভাঙ্গিয়া প্রকাশের দিকে লইয়া যায়। ইহাই মৌলিক কর্ম্ম। ইচ্ছাদিরা জ্ঞানেরই অনুগামী ও প্রবল ক্রিয়ার জ্ঞান মাত্র। সুতরাং মূল জ্ঞানগত ক্রিয়া হইতে অন্য সব কর্ম্ম হয়।

ট। এক্ষণে বিচার্য্য কি লইয়া কর্ম্ম হয়। ক্রিয়া হইলেই তাহা কোন বিষয় লইয়া হয় ; অতএব কর্ম্মেরও বিষয় চাই। ইহার উত্তর সহজবোধ্য। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণযুক্ত পদার্থ লইয়া যে কর্ম্ম হয় তাহা সকলেরই বোধগম্য আছে। শব্দাদিগুণক দ্রব্য লইয়া প্রাণশক্তি শরীর গঠনাদিরূপ কর্ম্ম করে ; কর্ম্মেন্দ্রিয় শক্তি, শরীরকে, শরীরস্থ দ্রব্যকে ও শরীরবাহ্য দ্রব্যকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চালিত করে ; জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি উহাদিগকে জানিতে থাকে ; অন্তঃকরণ শক্তি উপরে থাকিয়া ঐ তিন প্রকার শক্তিকেই নিযুক্ত করে।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে বিষয় সাধারণ স্থূল এবং সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার। শব্দাদিবিষয় যে অতি সূক্ষ্ম হইতে পারে তাহা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও স্বীকার্য্য হয়। অতএব সেই

* জার্ম্মান দার্শনিক Schelling বলেন "There is in every man a feeling that he has been what he is from all eternity" ইহা খুব সত্য কথা।

জড়বাদী Haeckel বলেন বস্তু substance যেমন নিত্য তেমনি বস্তু হইতে যাহা যাহা হইতে পারে তাহারাও নিত্য অর্থাৎ কার্য্যতঃ বস্তুর জাতি নিত্য (ব্যক্তি নহে।) ইহাও ঐ একই প্রকার যুক্তি।

সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া করণ শক্তি সকল সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে ; স্থূলশরীর নিরপেক্ষ চালনাদি কার্য্য করে এবং স্থূল বিষয় জ্ঞাত হয়।

এইরূপে দেখা গেল কর্ম্ম কি, কর্ম্ম কাহার, কি লইয়া কর্ম্ম এবং কর্ম্মের মূল কি ? এক্ষণে বিচার্য্য কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় কি না ? শঙ্কা হইবে যদি ক্রিয়াই আমিত্বের মূল উপাদানের স্বভাব তবে কর্ম্মের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে ? উত্তরে বক্তব্য শুদ্ধ ক্রিয়া মূল উপাদানের স্বভাব নহে। প্রকাশ ও স্থিতিও তাহার স্বভাব। প্রকাশ ও স্থিতি বা আবরণ পরস্পর বিরুদ্ধ। ক্রিয়া অর্থে এস্থলে (দেহীর কর্ম্মতে) হয় প্রকাশ নয় স্থিতিকে বাড়ান অথবা কমান। প্রকাশ ও স্থিতি যদি সমানবল হয় তবে ক্রিয়া লক্ষ্য হইবে না। সুতরাং প্রকাশ ও স্থিতিকে তুল্য বল করিতে পারিলে ক্রিয়া অলক্ষ্য হইবে। ইহার নাম গুণসাম্য। গুণসাম্য করার উপায়ের নাম যোগ (যোগদর্শন দ্রষ্টব্য)। অতএব যোগের দ্বারা কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়। "বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি। প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নি দগ্ধকর্ম্মচয়োঽচিরাৎ।" বিষ্ণুপুরাণ। ৬।৭।৩৫—কপিল মঠ হইতে প্রাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

সভ্যতা

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

নিখিল বিশ্বের অনন্ত বস্তু সম্ভার আপনার সত্তাতেই সত্য নহে ; অর্থাৎ বায়ুর কোন বিশেষ উপযোগীতা নাই, সলিল কেবল সলিলের জন্যই নহে, ফুলের প্রস্ফুটন যে একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার তাও নয়। সৌর জগতে সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়াই যেমন গ্রহ উপগ্রহ অনন্ত নক্ষত্র রাজি নিরন্তর ঘুরিতেছে তেমনই বিশ্বের এই অগণ্য বস্তুরাশি ফলফল গন্ধগাম আলো বাতাস একটী বস্তুকে কেন্দ্র করিয়াই বিরাজিত। সে বস্তুটি আত্মা চৈতন্য বিশিষ্ট প্রাণশক্তি।

বিজ্ঞানেব ঈক্ষণাগারে অনিল আলোকই প্রাণের অগ্রজ হইতে পারে, কিন্তু ইহারা যে প্রাণকেই তুষ্ট করিতে, পুষ্ট করিতে সৃষ্ট হইয়াছিল, এ কথা ধ্রুব সত্য।

উষার ললাটে রক্তিম সবিতা রক্তোজ্জ্বল জ্যোতিতে উদিত হইত। কে তাহার ভাস্বর দীপ্তি পুলকবিষ্ফারিত নয়নে দর্শন করিত ? বসন্তের শোভন স্বপ্ন পুষ্পনরিমগ্ন আত্ম-দানের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইত ; কে সৌরভে আমোদিত হইত ? যে বেণুখণ্ড আজ মুরলী হইয়া কত উচ্ছ্বসিত আশায়, কত স্বর্গীয় স্বপ্নে, কত গাঢ় করুণার ঝঙ্কারে বাজিতেছে, প্রাণ না থাকিলে কে তাহাকে জীবন সঞ্চার করিত ? অসুন্দর শব্দকে সুন্দর করিয়া তুলিত ? প্রাণের নাস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিরও বিনাশ। কাহার জন্য স্বস্তি ? সুখের রম্য উপকরণ ? সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ বিকাশ ! প্রভাতের জাগরণ সমারোহ, রজনীর সুধাংশু সুষমা কাহার জন্যই বা !

এই নিখিল বিশ্বরাজ্যের অধিশ্বর আত্মা। আর এই অনন্ত পকৃতির ঐশ্বর্য্য সম্পদ আত্মারই প্রীতিপূজাউপকরণ।

বেশ দেখা যায় প্রাণের অনুমোদনেই বস্তুর মূল্য। যে গরল সাক্ষাৎ মৃত্যু স্বরূপ, তাহাই আবার সাগ্রহে ব্যবহৃত হয় প্রাণকে রক্ষা করিবার জন্য। দারুণ গ্রীষ্মে যে জল অমৃতোপম স্নান করিয়া, পান করিয়া, সারাদিন ব্যবহার করিয়াও সাধ মেটে না; শিতকালে সেই সলিলই ভয়াবহ, সামান্য স্পর্শ করিতে ত্রাস হয়। কেন? প্রাণ যখন স্বীকার করিল তখনই হইল ভাল, যখন অঙ্গিকার করে না, তখনই তার মর্য্যাদা গেল। বস্তুর কোন নিজস্ব মাধুর্য্য নাই।

প্রাকৃত এবং কৃত্রিম, স্বাভাবিক অথবা সৃষ্ট যে সকল পদার্থ আজ জীবনের চারিদিকে জমা হইয়াছে, তাহারা উহার ঘাড়ে চাপিয়া পড়িয়াছে এমন বলা যায় না। বরং পিপীলিকা যেমন একটি একটি করিয়া ধুলিকণা সংগ্রহ করিয়া বল্মিকস্তূপ রচনা করে, তেমনি করিয়াই সে তার প্রয়োজনীয়কে একত্র করিয়াছে।

প্রাণ যে দিন প্রথম ধরায় আবির্ভূত হইয়াছিল সে দিন সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ, নিরাবলম্ব, একমাত্র উলঙ্গ শরীরই তাহার আশ্রয়। তার পর ধীরে ধীরে জীবনের ক্ষুধা বাড়িতে লাগিল, আর সে আপনার উপযোগী পদার্থ আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রাথমিক সঞ্চয় অত্যন্ত সীমাবিশিষ্ট ছিল একেবারে মাপাযোপা—যতটুকু দরকার তার বাহিরে একতিলও নহে। ইহা প্রাণের প্রাথমিক জীবন কথা। ইহা অনুন্নত অবস্থা।

তারপর কত যুগ বহিয়া গিয়াছে, এই বহুযুগের সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকীয়ও বিশাল হইয়া উঠিয়াছে। আজ প্রয়োজনীয়ের সীমা নাই, তার মধ্যে স্বাদ ও শিল্প, সূক্ষ্ম ও বৃহৎ বিবিধ বিষয়ই জমা হইয়াছে। পূর্ব্বের সহজ এবং সাধারণ ও ছিল প্রয়োজনীয়, অদ্যকার কৃত্রিমও আবশ্যকীয়। একের মধ্যের ছিল সহজ জ্ঞান, অন্যের মধ্যে আছে চৈতন্যের আদেশ। কিন্তু মূলতঃ উভয়ে বেশী পার্থক্য নাই।

কেবলমাত্র ভোগবাসনা সাধারণ জীবস্বভাবেরই লক্ষণ। ইহাতে আত্মার দৈন্য ঘোচে না, অজ্ঞানতার কালিমা বিদূরিত হয় না। সর্ব্ববিধ কামনার মধ্যেই অকল্যাণ নিহিত আছে। অসভ্য অর্দ্ধনগ্ন আমমাংসভোজী মনুষ্যের মধ্যে যে কুপ্রবৃত্তি, হিংসা, দ্বেষ, অপ্রীতির ভাব ছিল, বর্ত্তমানের শিল্পী বৈজ্ঞানিক সহস্র সুখ সুবিধায় স্রষ্টা মানুষের ভিতরেও যদি সেই কদর্য্যতা থাকে, তবে পরস্পরের মাঝে প্রভেদ কোথায়?

সুধুই বাহ্য বিষয়ে সভ্যতার প্রকাশ নহে। অভ্রমৌলি প্রাসাদ, হিরক কণক মুক্তার অধিশ্বরই সুসভ্য, আর কুটীরবাসী নিঃস্বসম্বল কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহস্থ, দেশসেবক, কবি, কিম্বা সর্ব্বত্যাগী অশিল্পী অবৈজ্ঞানিক বিশ্ব-সেবক সন্ন্যাসী—তাঁহারাই যে অভদ্র তাহাও নহে।

আত্মার প্রয়োজন শান্তি। জর-জগতেই হউক, অথবা ভাব-রাজ্যেই হউক, যেখান হইতেই স্নিগ্ধ, মিষ্ট অনুভব মিলিবে তাহাইত মূল্যবান। দেখা যায়, কাহারো তুষ্টির জন্য কেবল জড়-পুঞ্জেরই প্রয়োজন; রত্ন, অলঙ্কার ভোগ্য পেয় বিবিধ বিলাস দ্রব্য, আর কেহ বীণার আলাপনেই বিভোর হইয়া আছে, কেহ একখানি পুস্তকে অনাবিল আনন্দ পাইতেছে।

সুখই সভ্যতার আদি দাস। বিশ্ব মানব যাহা করিয়াছে, যাহা করিতেছে, অনাগত কালে যাহা করিবে, সমস্তই প্রাণের প্রীতির জন্য। কার্য্য ও শিল্প—নীতি ও ধর্ম্ম—তপস্যা ও ঈশ্বর, এ সমুদয়ে একান্ত আবশ্যকতা নাই, যদি না সমস্ত আত্মার সন্তোষ হয়।

যত জড়সর্ব্বস্ব ইহপরায়ণই হউক, সকলের উপর ঈশ্বর আছেনই। কিন্তু আত্মার উর্দ্ধে ঈশ্বরও নহেন। ঐশ্বরিক প্রয়োজনও আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত। আত্মা অসীম শান্ত ক্ষীণশক্তি, মুহুর্মুহু ক্লান্ত হইয়া পড়ে; দুঃখ হইতে কোন উপায়েই পরিত্রাণ পায় না, সুখকে প্রাণপণেও আয়ত্ত করিতে পারে না; যাহাকে তৃপ্তির মনে করিয়া নিবিড় আগ্রহে আঁকড়াইয়া ধরে, তাহাও হস্তচ্যুত হইয়া যায়, তাই সে চায় যে অনন্ত শক্তির অভিব্যক্তি বিশ্ব ও প্রাণ, তাহারই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, তাহারই সত্তায় সত্তান্বিত হইয়া আপনার দুর্ব্বলতা দূর করিতে। মানবমন যদি বুঝিত ভগবৎ শক্তির সাধ্য নাই এ ক্রটীর নিবারণ করিতে, দুঃখ হইতে মুক্তি দেওয়া ঐশ্বরিক শক্তির অতীত, তবে মানুষের কাছে দশটা ছোট জিনিষের মত ঈশ্বরও ছোট হইয়া থাকিতেন।

আমার অনুভূতি সভ্যতার আদিম উপহার হইলেও তাহার চরম আশীর্ব্বাদ নহে। সত্য সভ্যতা চিত্তবৃত্তির প্রস্ফুরণে, মনুষ্যত্বের প্রস্ফুটনে, হৃদয়ের বিশুদ্ধতায়।

সাধারণ জীব-প্রকৃতি তমোভাবাপন্ন মলিন। তার সুখপিপাসা সর্ব্বগ্রাসী; সে শুধু চায় আপনাকেই। আনন্দের বিমলতা, ভোগের সাত্ত্বিকতা, ত্যাগের মহত্ত্ব, প্রীতির প্রফুল্ল সৌন্দর্য্য—অজ্ঞান আত্মার কাছে এ সব অজ্ঞাত। এই মোহাচ্ছন্ন জীবপ্রকৃতি ভোগ করে প্রবৃত্তির উত্তেজনায়, কিন্তু তার ভবিষ্যত ফলের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সে মঙ্গলও জানে না, অমঙ্গলও বুঝে না। যে সুখের লালসায় সে লালায়িত, তাহা হয়ত মৃত্যু স্বরূপ, এ বিচার বুদ্ধি তার নাই। সহজ জ্ঞান অজ্ঞানেরই নামান্তর। অজ্ঞান সর্ব্বপ্রকার অকল্যাণের হেতু।

সর্ব্বেশ্বর "আমি"। তবুও নিখিল সংসারে এই "আমি" একটা স্বতন্ত্র ব্যষ্টি হইলেও অনন্ত "আমিত্বে" তার নিগূঢ় মিলন আছে। আমার সুখ অপরের সুখের দিকে চলিবে আমার তৃপ্তি অন্যের তুষ্টির পরে, আমার স্বাচ্ছন্দ্য পার্শ্ববর্ত্তীকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিয়াই—এই সংযোগ জ্ঞানেই সভ্যতার প্রথম অঙ্কুর। অজ্ঞান যেখানে আপনাকে ভরাইবার জন্য সকলকে বঞ্চিত করিয়া আত্মবিলাসের পথ প্রস্তুত করিবে, মনুষ্যত্ব সেখানে প্রীতির দ্বারা সর্ব্বকে স্নিগ্ধ করিয়া শাশ্বত কল্যাণের অধিকারী হইবে।

সভ্যতার শেষ পরিণতি আত্মজ্ঞান। মহৎ বৃত্তিগুলির মধ্যেও ভোগের অংশ জড়িত আছে বলিয়া তাহাও দুঃখের কারণ হইতে পারে। পরের বেদনায় ব্যথা অনুভব করা মহাপ্রাণতার লক্ষণ; এই বেদনা বোধেও আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারে। ইহাতেও আত্মার মোহ আসে।

আত্মা মুক্ত স্বরাট্ এই জ্ঞান আত্মবিজ্ঞান। ভালবাসিব, করুণা করিব, বিশ্বের বেদনায় কাঁদিব, অমৃত পান করিব, কিন্তু আমাকে হারাইয়া নহে; আমি বিভু সর্ব্বেশ্বর হইয়া। যাহা কিছু আমারই চরণের তলে। আমি কখনও মূর্চ্ছিত হইব না, মোহিত হইব না, পরাজিত হইব না, দাসত্ব করিব না। এই মুক্ত ভাবই চরম আত্ম-বিজ্ঞান। সকল সুখ ও সভ্যতার উৎস, শাশ্বত শান্তির জননী। আমি আনন্দের জন্য আমাকে টলাইব না, পীড়িত করিব না। তৃপ্তিকে জয় করিয়া, তাহাকে দাসত্ব করাইব; কখনও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আমাকে ক্লান্ত শ্রান্ত করিব না।

ভারতবর্ষ এই আত্মতত্ত্বের জন্যই সাধনা করিয়াছে।

কারণ আত্মা যদি বদ্ধ ও মোহমূঢ় থাকে, তবে সুখের কোন সম্ভাবনা থাকে না; সে ভোগ্যের দাস হইয়া পড়ে।

ঠিক এই ব্যাপারটী বর্ত্তমান সময়ে ঘটিয়াছে। এখন সভ্যতা জীবনের সেবক না হইয়া জীবনই সভ্যতার দাস হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ যেমন সাঁতার কাটিতে গিয়া নিজ বাহুবলের পরিচয় না বুঝিয়া অধিক দূরে গিয়া ক্লান্ত শরীরে নিমজ্জিত হয়, এখন সভ্যতার ঠিক সেই দশা হইয়াছে; উহা প্রাণের সহায়ক না হইয়া উহার হন্তারক হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। মানুষ সভ্যতার জন্য উন্মত্তভাবে ছুটিতেছে. কিন্তু তাহা ভীষণ অশান্তির কারণ। ইহা দাসত্ব নহে ত কি?

আত্মজ্ঞান সুখাতীত বিরক্ত কিছু নয়। কিন্তু এই ভারতবর্ষীয় সুখ বস্তুতান্ত্রিক নহে আধ্যাত্মিক। জড়ভোগের ভিতর তৃপ্তি নাই. অশেষ অশান্তি। পিপাসা বাড়িয়াই চলে, নিবৃত্তি হয় না। পিপাসাইত দুঃখ। তাই ভারতবর্ষ উদার কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিল :—

"ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে॥"

প্রকৃত আনন্দ জড়সাপেক্ষ না হইয়াও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভালবাসিয়া যে অগাধ তৃপ্তি, ইহা সর্ব্বপ্রত্যক্ষ; অথচ এই আধ্যাত্মিক উপভোগের তৃষ্ণা শ্রান্তিজনক নহে। স্নেহে সখ্যে সেবায় যে অগাধ আত্ম-প্রসাদ মনুষ্য মাত্রেরই তাহা অগোচর নহে: কাব্য সঙ্গীত বস্তুতান্ত্রিক না হইয়াও শিষ্ট-সুখজনক।

তবে সভ্যতার সুখ আধ্যাত্মিক ব্যাপার হইলেও যে তার সহিত বাহিরের জড়ের কোন সম্বন্ধই থাকিবে না এমন নয়। শিল্প-কলা, বিলাশ-সৌষ্ঠব এ সকলও সভ্যতার বিশিষ্ট অঙ্গ। সৃজনের যে আনন্দ তাহাও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। আবিষ্কার করিয়া, উদ্ভাবন করিয়া, রচনা করিয়া যে হর্ষ, তাহাও আত্মার শুদ্ধ বিলাস। চিত্তবৃত্তির প্রবণতা যেমন ভালবাসার দিকে, তেমনি জানিবার দিকেও। সে প্রাকৃতিক পদার্থকে উপভোগ করিয়া যেমন পুলকিত হয়, আপনি সৃজন করিয়াও তেমনি তৃপ্তি বোধ করে। তাই সে ব্যোমযানে অসীম আকাশের দিকে ছুটিতেছে, বিজলী ধরিয়া গৃহকে উদ্ভাসিত করিতেছে, অগণ্য পণ্য-শিল্প প্রস্তুত করিয়া সৃজনানন্দ ভোগ করিতেছে।

যাহাই হউক, বাহির কিন্তু ভিতরের শীর্ষে নহে; যদি বস্তুগত পুলক আধ্যাত্মিক আনন্দকে ছাপাইয়া চলে, তবে তাহা ভবিষ্যত অমঙ্গলের কারণ হয়।

মোট কথা, সভ্যতা আত্মজ্ঞানে; মনুষ্যত্বে উহার বাহ্য প্রকাশটি মোহহীনতায় এবং প্রীতি মৈত্রী ও সন্তোষে। যে স্বর্গ ভোগ করে অথচ তার বশীভূত নয়, যে বিশ্বকে ভালবাসে, গাঢ় মমতায় বক্ষে ধারণ করে এবং সাত্ত্বিক আনন্দে প্রসন্ন থাকে, তাহাই সভ্য জীবন।

ইহার সহিত বস্তুর সম্পর্ক অতি সামান্য। জীবন রক্ষার জন্য যতটুকু দরকার, বস্তু তার বেশী না হইলেও সভ্যতার হানি হয় না।

আত্মজ্ঞানেরও অন্তরঙ্গ আকাঙ্খা শান্তি। জাগ্রত বোধ-শক্তির দ্বারা পরিপূর্ণ রূপে, অবিচ্ছিন্ন ভাবে অমৃত উপভোগের জন্যই আত্মজ্ঞান। সর্ব্বশেষ কথা আত্মার কল্যাণকর সুখ।

আধ্যাত্মিকতায় অথবা জড়-পুঞ্জে—যাহাতেই হউক, সভ্যতা যদি সেই সুখের স্বরূপ না

হইয়া অসুখেরই কারণ হয় তবে সভ্যতার প্রয়োজন কি ? আমার উপরে ত সভ্যতা নয় ! ব্যোমযান ও জাহাজ, বৈদ্যুতিক হাওয়া এবং আলো এ সব যদি মানুষের চিত্তকে অশান্ত করিয়াই তোলে, তবে সে সকলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করায় আত্মার মূঢ়তাই প্রকাশ পায়।

বিবেচনা করা উচিত কিসের জন্য জীবন ! সভ্যতাকে পুষ্ট করিতে, জড় পদার্থের সমৃদ্ধি সাধন করিতেই কি মানব জীবন ? দাস যেমন প্রভুর সেবায় নিজ সুখ সাধ বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য ; মানুষ কি সেই প্রকার সভ্যতার দাস যে আপনাকে দলিত করিয়া প্রপীড়িত করিয়াও সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি করিবে !

এই যে বর্ত্তমান সভ্যতা, ইহার স্বপক্ষে যতই অনুকূল মত অচ্ছেদ্য তর্ক ও যুক্তিজাল থাক, ইহা একটা ভয়ঙ্কর বৈনাশিক নেশা। আত্মাকে মোহগ্রস্ত করিয়া সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত করিতেছে।

কাজ নেই এক দিনে কাশী বা উত্তর মেরুতে পৌছান, নক্ষত্রলোকের সহিত পরিচয়ে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, সমুদ্রের তলে ডুবিয়া যাওয়া কিম্বা যোজনান্তব্যাপী কথা বার্ত্তা কওয়া— প্রয়োজন নাই— কারুখচিত কাচের পেয়ালায় নৈপুণ্য-রচিত সজ্জাআভরণে, যদি আত্মার শান্তি না থাকে।

সভ্যতায় শান্তিও হইল না, মনুষ্যত্বও জাগিল না। সেই অভাব অনাটন আকাঙ্ক্ষা রহিয়াই গেল ; বরং বাড়িতেই লাগিল। অন্য দিকেও পাশবিক প্রবৃত্তি দুর্দ্দম হইয়াই রহিল, তবে সভ্যতা হইল কিসে ?

বিশ্ব-জগৎ যদি বড় গলা করিয়া সমস্বরে বলে যে যাহারা শতক্রোশগতি গোলা ছুটাইতে না পারে তাহারা বড়ই অসভ্য, তবে আনন্দে সে অপবাদ গ্রহণ করিয়া প্রত্যুত্তর দিতে হইবে—নখদন্তহীন মানবপশুর উহা নখ দন্ত। মানুষ সিংহ ব্যাঘ্র নয়, মারিবার যন্ত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব নয়, মানুষের পরিচয় হৃদয়ের বিকাশে।

মানুষের সুখ পিতার সুখ, মাতার তৃপ্তি, মহাপুরুষের আনন্দ। ভালবাসিয়া, মমতা করিয়া, আত্মদান দিয়া, অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াই মানুষ আনন্দ পাইবে। সুসভ্য মানুষের স্বরূপ সে বুকের টানে, স্নেহ করিয়া, ত্যাগ করিয়া, পরের জন্য কাঁদিয়া।

ভারতবর্ষ মন্ত্র দান করিয়াছে "আত্মানং বিদ্ধি"। ইহা কেবল ভারতবর্ষেরই সাধনা নয়, সমগ্র জগতের সুমহান তপশ্চর্য্যা।

আত্মা যখন জানিবেন, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তখনই মানুষ যথার্থ সুসভ্য হইবে। সত্য অমৃতের আস্বাদ পাইবে। তার আগে সুখও নাই, সভ্যতাও নাই।

কবীরের দোঁহা

অষ্ট-বিকার—কপটতা।

কবীর তহাঁ ন জাইয়ে, জহাঁ কপট কা হেত।
জানো কলী আনারকী, তন রাতা মন সৈত ॥ ১ ॥

কবীর সেথা যেও নাক যেথা কপট ব্যবহার।
যেমন রাঙা ডালিম খোলা, কিন্তু শাদা ভিতর তার ॥ ১ ॥

কবীর তহাঁ ন জাইয়ে, জহাঁ ন চোখা চিত্ত।
পরপূটা অবগুণ ঘনা, মুহঁড়ে উপর মিত্ত ॥ ২ ॥

কবীর সেথা যেও নাক, নাইক যেথা খাটী প্রাণ।
নিন্দাবাদ অবর্ত্তমানে, সম্মুখেতে গুণগান ॥ ২ ॥

চিত কপটী সবসে মিলৈ, মাহঁী কুটিল কঠোর।
ইক দুর্জন ইক আরসী, আগে পীছে ঔর ॥ ৩ ॥

কপট মেশে সবার সনে, মনের মাঝে কুটীল অতি।
দুর্জ্জন আর আরসী দুয়ের, দুদিকে দুই প্রতিকৃতি ॥ ৩ ॥

হেত প্রীতিসে জো মিলৈ, তাকো মিলিয়ে ধায়।
অন্তর রাখে জো মিলৈ, তাসে মিলৈ বলায় ॥

যে মিশে প্রীত প্রণয় নিয়ে, সঙ্গ কর তাদের সনে।
তাহার সঙ্গে মেলায় অসুখ, প্রভেদ যারা রাখে মনে ॥ ৪ ॥

—শিবপ্রসাদ।

ভারতের কৃষক—অভিজ্ঞের অভিমত

ভারতীয় কৃষককুলের কৃষিপ্রণালী আদিমজনোচিত ও অনুন্নত বলিয়া যে ভুল ধারণা আমরা পোষণ করিয়া আসিতেছি, তাহা আজ আমি নিঃসন্দেহে পরিত্যাগ করিলাম; আর এই কথা বলিতে চাই যে এই পর্য্যন্ত সরকার এদেশের কৃষককে কৃষি শিখাইবার যত চেষ্টা করিয়াছেন তাহার যে প্রায় সমুদয়ই ব্যর্থ হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, ভারতের কৃষক তাহার এই ভাবী শিক্ষকদিগের অপেক্ষা, কি প্রকারে ও কি অবস্থাতে তাহাদের কৃষিকার্য্য করিতে হইবে, তাহা অনেক ভাল বুঝে।—ডাঃ ভয়েলকার (ভারত গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত নিখিল-ভারত কৃষি-পরিদর্শক)

—ভারতের রাইয়তকুলের তাহাদের নিজ নিজ কাজের এতটা জ্ঞান ও ব্যবহারিক নিপুণতা আছে যে, তাহা কোনও বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের থাকা সম্ভবপর নয়—স্যর হেন্‌রী কটন।

—ভারতের কৃষকগণ নিরক্ষর হইলেও অনভিজ্ঞ নহে। বাল্যকাল হইতে সযত্নে তাহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও রীতি-নীতিতে শিক্ষা লাভ করে, সরল মাতৃভাষায় তাহাদের প্রাচীন মহাকাব্যগুলির (রামায়ণ, মহাভারত) কথা শুনিতে পায়। পশু, পক্ষী, চাষ, আবাদ, জমি ও শস্যাদির সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ।—স্যর উইলিয়ম হোল্ডারনেস্।

—ভারতীয় কৃষকরা মূর্খ নহে, জগতের আর সকল চাষাদের ন্যায় তাহাদেরও খর্ব্বতা আছে, কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ পল্লী ও প্রতিবেশীদিগের গণ্ডীর মধ্যে তাহারা খুব চতুর ও কার্য্যপটু ; আর যদি ইংলণ্ডের গ্রাম্য চাষাদের সহিত তুলনা করা যায় তবে বলিতে হইবে যে, এই দুইএর মধ্যে ভারতের কৃষকরা অধিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি—স্যর হারকুট রিজলী।

ইতিহাসের ইঙ্গিত—সহর ও সভ্যতা

সহরে বাস বা নাগরিক জীবনের সহিত সভ্যতার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ—সভ্য অর্থ নগরবাসী—আজকালকার সভ্যতাভিমানী লোকদিগের এইরূপ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। সে সভ্যতার তাড়নায় আজ দেশ শুদ্ধ লোক গ্রামের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সহরের দিকে ছুটিয়াছে। কলিকাতা, দিল্লী, ঢাকা বা আগড়া প্রভৃতি বড় বড় সহরে গিয়া থাকিবার যাহার সুযোগ সুবিধা ঘটে, সে ত তাহাই খুঁজিতেছে, তদভাবে অন্য লোকেরা নিজ নিজ গ্রামের নিকটবর্ত্তী বা আপন আপন জিলায় গিয়া বাস করিবার উদ্যোগ করিতেছে। বর্ত্তমানে বিজাতীয় সভ্যতার রাজ বিধানে নগরসৃষ্টিও অগণিত হইয়াছে ও হইতেছে।

কিন্তু নগর সভ্যতার সম্বর্দ্ধক নহে—উহার বিনাশক! ইতিহাস তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য দান করিতেছে। নগর-রচনা ও নাগরিক জীবন-যাপনের ভাব এরূপ ভাবে প্রথমে উদ্ভাবিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল প্রাচীন এশিয়ামাইনরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে। তাহাই আধুনিক সভ্যতার শিশু শয্যা। সেখানেই বাণিজ্য-বৃত্তি সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান বাণিজ্যপ্রধান সভ্যতার অঙ্কুর উৎপাদন করে—ফিনিসীয়গণ বাণিজ্যের কেন্দ্র বন্দরাদি ও ইলিরিয়গণ রাষ্ট্র-দুর্গাদি রচনা করিতে সিদ্ধ-হস্ত ছিল। ইহাদের হইতেই ভবিষ্যতে বিভিন্ন দেশের নাগরিক ভাব প্রসার লাভ করে ও কালক্রমে বাবীলন, আথেন্স ও রোমের ন্যায় নগর সমূহ গড়িয়াউঠে। প্রাচীন বাবীলন, গ্রীক ও রোমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সম্পূর্ণই নগরকে কেন্দ্র করিয়া ; বাবীলন নগরের গঠন ও ঐশ্বর্য্য স্বর্ণ-লঙ্কার ন্যায় আজিও উপকথার বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। বাবীলনের নামেই সে কালের একটা বিশাল সভ্যতা কথিত হইয়া থাকে, গ্রীসের নগরগুলির নামে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও বিভিন্ন রকমের সভ্যতার কথা শুনা যায়, আর এক মাত্র রোমের নামে সমুদয় ইতালী এবং পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ একটা সাম্রাজ্যকে বুঝাইত ; সে প্রভাব আজও বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু এই নগরকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহারা কোথায়—সমুদয়ই সমূল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, চিহ্ন মাত্র নাই।

সঙ্গে সঙ্গেই আর দুইটি সভ্যতার কথা মনে আইসে—তাহা চীন ও ভারতবর্ষের। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা আজও বর্ত্তমান, চীনেরও তাহাই। ইহারা জগতের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। ইহার একটী বিশেষ কারণ এই যে, এ উভয় সভ্যতার প্রাণ-বস্তু নিবদ্ধ ছিল গ্রামে—সহরে নহে। নাগরিক সভ্যতা যে দুর্নীতির বিষ সৃষ্টি করে এবং সমাজে ভেদাভেদ বা বৈষম্য আনয়ন করে, তাহাই উহার বিনাশের কারণ হয়, কালে সে আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ নৈতিক বলই সমাজের প্রকৃত শক্তি আর সাম্য উহার সংরক্ষক। সমাজ সুস্থ ও সবল থাকিলেই সভ্যতা স্থিরতা থাকে। তদভাবে সভ্যতা মৃত দেহে প্রাণের মত অস্থায়ী হইতে বাধ্য।—দর্শক।

শিক্ষা-সমস্যায়

সাধনা-মূলক সংগঠন প্রস্তাব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শিক্ষায়তন ও তাহার পরিচালনা

প্রাথমিক শিক্ষা

অতি প্রাথমিক অবস্থা হইতেই জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। এ দেশেত গর্ভাধান হইতেই লোকের 'সংস্কার' অর্থাৎ শিক্ষার সূচনা হইবার বিধান আছে। তদবধি জন্মকাল হইতে বিবিধ সংস্কার শিক্ষার সহযোগী শাস্ত্রীয় বিধান মাত্র। এই সংস্কারের কথা ছাড়িয়া দিলেও পিতা মাতা যে জন্মকাল হইতে শিশুদিগের শরীর ও মনের সুস্থতা সম্পাদন ও সম্যক বিকাশ লাভের উপায় সকল করিয়া দিতে পারেন, এবং অনেকে তাহা করেনও তাহাতে সন্দেহ নাই। মোটের উপর শিশুর পালন ও পোষণ সম্পর্কে যাহা কিছু করা তাহাতে—তাহা যে শিক্ষার অঙ্গ মাত্র—এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহাই তাহার শৈশব-শিক্ষা। গৃহের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পিতা মাতার চরিত্র ও পারিবারিক জনবর্গের ব্যবহার দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পঞ্চম বর্ষ হইতে এদেশে বিদ্যারম্ভের রীতি আছে। এক বৎসর কাল নানা আমোদপ্রদ উপায়ে বালক বালিকাদিগের নিকটবর্ত্তী ব্যক্তির পরিচয়, বস্তু-পরিচয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির নাম, আত্মীয় স্বজনের নাম ইত্যাদি মৌখিক শিক্ষা দেওয়া চলে।

ষষ্ঠ বৎসর হইতে উপযুক্ত গুরুর অধীনে শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। গুরুকুলের (অর্থাৎ ভারতীয় সাধনা-মূলক শিক্ষা পদ্ধতির) এক সাধারণ শিক্ষা-পদ্ধতি ও কার্য্য প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া পল্লীতে পল্লীতে পল্লী-গুরুদিগের অধীনে গুরুকুল পাঠশালাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education)—মোটামোটি ৪ বৎসর কাল—এই গুরুকুল পাঠশালাতে পরিচালিত হইবে। জেলার বিভিন্ন গ্রামে ও সহরের পল্লীতে পল্লীতে গুরুকুল পাঠশালা গড়িয়া উঠিবে। বিশিষ্ট লোকদিগের চণ্ডীমণ্ডপে বা বাহির বাড়ীর কোনও গৃহে তাহার স্থান হইবে। গ্রামের চরিত্রবান্ ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে আস্থাবান ব্যক্তিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই গুরুকুল শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তদনুসারে স্থানীয় অবস্থার অনুকূল এই সকল পল্লী-পাঠশালা সমূহ স্থাপন করিবেন। অথবা গুরুকুল মহামণ্ডলের (পরে দ্রষ্টব্য) পক্ষ হইতে গুরু নিযুক্ত করিয়া বা উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে পাঠাইয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে এই সকল পাঠশালা স্থাপন করিতে পারেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সকল বালক ও বালিকার জন্য অর্থাৎ সার্ব্বজনীন করিতে হইবে। রাষ্ট্র আইনের বিধান বা বাধ্যতা না হইলেও জনমত বা সমাজমত সুদৃঢ় করিয়া তাহা করিতে হইবে। পাঠ ও শিক্ষা গুরুকুল মহামণ্ডল (বা তজ্জাতীয় কোনও শিক্ষা পরিষদের) নির্দ্ধারিত নিয়ম

অনুসারে হইবে।* বালক বালিকাগণ প্রমথ দুই বৎসর কাল এক সঙ্গে শিক্ষা পাইতে পারে। পরে বালিকাদিগের জন্য পৃথক্ পাঠশালার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বালক বালিকাগণ নিজ নিজ গৃহ হইতে আসিয়া পাঠশালাতে পাঠ করিয়া যাইবে। তবে প্রথম হইতেই যাহাতে তাহাদিগের চরিত্র গঠন হয়, এবং তাহাদিগের শিক্ষা ধর্ম্ম ও জাতীয় সাধনা বা ভারতীয় সংস্কৃতির অনুকূল হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; এবং গুরু বা শিক্ষকগণ এজন্য বালক বালিকাদিগের গৃহের ব্যবহারাদির অনুসন্ধান বা তত্ত্বাবধান করিবেন; এবং যাহাতে এই প্রণালীর শিক্ষার প্রভাব বালক বালিকাগণের গৃহেতেও প্রসার লাভ করে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

পল্লী পাঠশালা বা প্রাথমিক শিক্ষায় বালক বালিকাগণের বয়ঃক্রমে সাধারণতঃ ৬ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে থাকিবে। আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থাতে প্রত্যেক হিন্দু বালক বালিকার এই শিক্ষা-লাভের অধিকার থাকিবে। সর্ব্বত্র পল্লী-গুরুকুল সমূহ গড়িয়া না উঠিলেও প্রত্যেক গৃহস্থ আপন আপন গৃহে বালক বালিকা বা শিশু সন্তানগণের জন্য এই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

যাহাতে প্রত্যেক বালক বালিকার অন্তরে প্রাথমিক জীবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মহান্ মনুষ্যত্বের আধারভূত ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম্ম বা সাধনার মৌলিক বীজ সমূহ নিহিত হইতে পারে, তাহা প্রাথমিক গুরুকুল শিক্ষা-পদ্ধতিতে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তৎসঙ্গে মাতৃ-ভাষায় লেখন, পঠন ও সাধারণ গণিত, ইতিহাস ও দেশের মৌলিক এবং ভৌগোলিকতত্ত্ব, আর্থিক জ্ঞান ও কর্ম্মশীলতাবিকাশ সাধনের প্রীতিপ্রদ উপায় সকল বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।

[প্রাথমিক গুরুকুল পাঠশালার শিক্ষা সমাপনান্তে বালিকা ও সাধারণ শ্রমজীবি দিগের বালকগণের জন্য আর অধিক বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থা আপাততঃ করা হইবে না। বালিকাদিগের এই পাঠশালার শিক্ষা আরও ২।১ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। শ্রমজীবি ও দেশের সর্ব্বসাধারণ জনগণের জন্য 'জন শিক্ষা' ও স্ত্রীদিগের জন্য 'স্ত্রী-শিক্ষার' বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে।]

মধ্যশিক্ষা

এক বা ততোধিক আশ্রম বিদ্যালয় (Residential) স্থাপিত হইবে, উহা তৎ তৎ স্থানের নামানুসারে অমুক 'গুরুকুল', অমুক 'আশ্রম', বা 'বিদ্যাভবন' আদি নামে অভিহিত হইবে। ব্যক্তি বিশেষ বা ঘটনা বিশেষের স্মৃতিকল্পেও উহাদের নামকরণ হইতে পারে। বিদ্যার্থী ছাত্রগণ এখানে ছয় বৎসর কাল (সাধারণতঃ ১১শ হইতে ১৬শ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত) গুরুগণের সহিত একত্র বাস

* সম্প্রতি বঙ্গদেশে যে প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রচলিত হইতে যাইতেছে তাহা ভারতীয় সাধনার—বিশেষতঃ হিন্দু বালক বালিকাগণের প্রকৃত শিক্ষার কিরূপ প্রতিকূল ও বিরোধী তাহা বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয় হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সাধনা বা culture এর বিষয়ে হিন্দুগণই অত্যধিক উদাসীন। সময়ান্তরে ইহার বিশেষ আলোচনা হইবে। এই বিলের নিয়ম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতশিক্ষা-বিরোধী কার্য প্রণালী হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই আরও ভারতের নিজ সাধনা-মূলক (খাঁটি cultural) শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক।

করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিবে। এই আশ্রম জীবনে ছাত্রগণের শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠন ও ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের প্রতিপালন প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে।

পাঠ-পদ্ধতিতে প্রথমতঃ বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সমতুল অধিকারী বা প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যমান পর্য্যন্ত—গুরুকুল আদর্শের অনুযায়ী বৃদ্ধি বা সঙ্কোচ করিয়া—শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। এই ছয় বৎসরের মধ্য-শিক্ষার আশ্রম সমূহকে গুরুকুল 'বিদ্যালয়' নামে অভিহিত করা হইবে। 'বিদ্যালয়ের' ছাত্রগণকে এই প্রথম সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হইবে। সংস্কৃত শিক্ষায় বিশেষ জোর দিতে হইবে, যেন লিখন ও কথন অনায়াসে আয়ত্ত হইতে পারে। অল্প সময়ে ও অল্প শ্রমে ইংরেজী শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছাত্রগণ ইচ্ছানুসারে ইংরেজী শিক্ষায় মন না দিয়া কেবল সংস্কৃত শিক্ষায় ব্রতী থাকিতে পারে; ইহারা গুরুকুলের নিজ পরীক্ষা ও তৎসঙ্গে রাষ্ট্রের প্রচলিত ব্যবস্থার আদ্য মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা দিতে পারিবে। আবার ইংরেজী শিক্ষায় বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিয়া ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাদিতেও উপস্থিত হইতে পারে; এজন্য বিদ্যালয়ের শেষ দুই বৎসর কাল ছাত্রগণকে বিশেষ রূপে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা থাকিবে। গুরুকুলের সাধারণ শিক্ষার পাঠবিধি প্রচলিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ-বিধি অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ও প্রকৃষ্ট (পাঠ বিধিতে দ্রষ্টব্য—ভাষা ও বিজ্ঞানাদি লইয়া) থাকিবে এবং গুরুকুল বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই কোনও ক্রিয়াত্মক বা কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে; যেন ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে কোনওরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিতে পারে।

গুরুকুল বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে বিদ্যার্থীগণ আর দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া সাধারণতঃ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিসমাপ্ত করিবে। এইজন্য কোনও কোনও বিদ্যালয়ে অধিকারী পাঠ-বিধি আরও বৃদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। এই সকল শিক্ষালয় গুরুকুল 'মহাবিদ্যালয়' বা অন্য কোনও নামীয় মহাবিদ্যালয় নামে অভিহিত হইবে। তাহাতে আশ্রম নিয়ম ও কার্য্যকরী শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পাঠ্য (Intermediate course) পর্য্যন্ত এবং কোনও কোনও বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক পাঠ্য সমূহ পড়ান হইবে। উপরন্তু গুরুকুলের স্বকীয় সংস্কৃতাদি শিক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা থাকিবে। পাঠ্য হিসাবে সাহিত্য এবং কলা ও বিজ্ঞান (Arts & Science) এই উভয় দিকে যথা সম্ভব শিক্ষার পরিসমাপ্তি এই মহাবিদ্যালয়ে হইবে; এবং বিশেষ করিয়া কোনও কার্য্যকরী শিক্ষা (চিকিৎসা, কৃষি কারুকার্য্যাদি) এমন ভাবে পূর্ণ হইয়া আসিবে, যাহাতে ছাত্রগণ স্বাধীন ও সম্মানার্হ ভাবে কোনও জীবনোপায় করিয়া লইতে পারিবে।

অতঃপর ছাত্রগণকে সাধারণ সমাবর্ত্তন নিদর্শন পত্র দিয়া আশ্রম জীবন হইতে মুক্তি দান করা হইবে, যাহাতে পরিপক্ক সংসারী হইয়া তাহারা সংসার ধর্ম্ম পরিপালন করিতে পারে।

উচ্চ শিক্ষা

অতঃপর বিশেষ বিদ্যাচর্চ্চার নিমিত্ত গুরুকুল মহামণ্ডলের অধীনে দেশের কোনও বিশেষ স্থানে একটী গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ উপযুক্ত মেধাবী

ছাত্রগণ উপযুক্ত সময় অবস্থান করিয়া এখানে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অধ্যয়ন ও গবেষণা করিবেন এবং গুরুকুল পরিষদের যাবতীয় উচ্চ জ্ঞানচর্চ্চার কার্য্যে যোগদান করিবেন। এই সময় প্রত্যেক বৎসর বিদ্যার্থীকে আপন আপন কার্য্যের বিবরণ ও তৎপ্রতিপোষক এক একটী নিবন্ধ প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার প্রথম দুই বৎসরের ফল দেখিয়া বিদ্যার্থীদিগকে প্রাথমিক একটী উপাধি, এবং দ্বিতীয় দুই বৎসরের ফল দেখিয়া অন্য বিশেষ কোনও উপাধি দান করা হইবে। অতঃপর আরও অধিক কার্য্যের জন্য উর্দ্ধতন উপাধির ব্যবস্থা থাকিবে। এই বিভাগের ছাত্রগণের জন্য বিশ্বিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষার ব্যবস্থা ও হইতে পারে।

আশা করা যায় যে, দেশের চিন্তাধারা যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে এবং রাষ্ট্রে যেরূপ উদার ভাব দিন দিন প্রবেশ লাভ করিতেছে, তাহাতে প্রস্তাবিত এই জাতীয় সাধনা-মূলক শিক্ষা পদ্ধতি যথার্থরূপে কার্য্য করিয়া সমাজ ও দেশের প্রকৃত কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতে পারিলে, এই শিক্ষা-পরিষদ্ দেশ মধ্যে একটী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান লাভ করিবে। এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে ইহা আপনার গুণগত বৈশিষ্ট্য লইয়া একটী বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা-পরিষদ বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃতি ও মান্য পাইতে থাকিবে। শুনিতে পাওয়া যায়, এক টোকিও সহরে জাপানের কয়েকটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান; ভৌগোলিক বিভাগ না মানিয়া কেবল গুণ ও মতগত বা শিক্ষার আদর্শভেদে বিভিন্নতা লইয়া সর্ব্বত্র ঐরূপ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কেবল ইহাদের আদর্শের মহত্ত্ব ও কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা থাকা চাই। আশা করা যায় ভারতের সাধনার বা প্রকৃত Indian culture এর অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই আজ এইরূপ আপন আদর্শানুযায়ী শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তৎপর হইবেন।

গঠন প্রণালী

ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতির মূলে শিক্ষা ও জাতীয় কর্ম্মধারা পরিচালন করিবার উদ্দেশ্যে 'ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ্', 'ভারতীয় সাধনা ও শিক্ষা প্রচার সমিতি,' 'ভারতীয় সাধনা-মূলক শিক্ষা প্রচার সমিতি,' 'ভারতীয় সাধনা সংসদ্' বা অন্য কোনও সাধারণ নামে একটী মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। উহা ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী করা ও তজ্জন্য উহার আবশ্যক নিয়মাবলী প্রভৃতি প্রণয়ন করিতে হইবে।

এই পরিষদ্—

১। গুরুকুল আদর্শের বিদ্যালয় সমূহ স্থাপন করিবেন।

২। গবেষণা মন্দির ও পুস্তকালয় সংস্থাপন করিবেন।

৩। সাময়িক পত্রিকা, সমালোচনাদি প্রচার করিবেন।

৪। পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবেন এবং তজ্জন্য আবশ্যক বোধে ও সামর্থ্যানুসারে মুদ্রণ যন্ত্রাদি স্থাপন করিবেন।

৫। প্রচার-মণ্ডলী সংগঠন করিবেন।

৬। ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক সাম্যনীতি মূলে সমাজ সংগঠন (ধ্বংস নহে) ও জনগণ মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক সঙ্ঘ, পঞ্চায়ত, সমবায়াদি গঠন ও স্থাপন করিবেন।

৭। অর্থসংগ্রহ ও আয়ের উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন ও তাহার সমুচিত ব্যবহারের সুব্যবস্থা করিবেন।

বিদ্যালয় গঠন প্রণালী

গুরুকুল পর্য্যায়

১। পল্লীপাঠশালা।—(১) কোনও একজন গুরু বা শিক্ষকের প্রযত্নে এই পাঠশালা স্থাপিত ও পরিচালিত হইতে পারে। প্রাথমিক গুরুকুল পাঠশালা বা প্রাইমারীর সমুদয় চারিটী পাঠের ব্যবস্থা এই পাঠশালাতে নাও থাকিতে পারে; মাত্র দুই একটী শ্রেণীর ছাত্র লইয়া এই পাঠশালা চলিতে পারে।

(২) কয়েকজন গুরু একত্র হইয়া এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করিতে পারেন।

(৩) গ্রামের লোকে সদ্‌প্রবৃত্তি বশে একত্র হইয়া উপযুক্ত গুরু নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের অধীনে এই পাঠশালা স্থাপন ও পরিচালন করিতে পারেন। এই পরিচালক-সমিতির মধ্যে গুরুগণের বিশেষ স্থান থাকিবে।

(৪) প্রাদেশিক গুরুকুল মহামণ্ডল বা প্রধান শিক্ষা-পরিষদের পক্ষ হইতে স্থানে স্থানে এই সকল পাঠশালা স্থাপিত হইতে পারে।

২। গুরুকুল বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়।—এই সকল বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনের নিমিত্ত প্রত্যেক জেলা বা বিশিষ্ট স্থানে (যেমন কলিকাতাকে একটী জেলা রূপে ধরিয়া, তথায়) এক বা ততোধিক গুরুকুলমণ্ডল বা স্থানীয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। প্রধান সমিতির পক্ষ হইতে স্থানে স্থানে এই সকল স্থানীয় সমিতি গঠনের পক্ষে সহায়তা করা হইবে। কিন্তু প্রধানতঃ স্থানীয় লোকের চেষ্টা, উদ্যোগ ও আগ্রহেই এই সকল স্থানীয় সমিতি ও বিদ্যালয় সমূহ গড়িতে হইবে। এক একটী স্থায়ী স্থানীয় সমিতি এই সকল বিদ্যালয়ের পরিচালনা করিবেন, গুরু বা শিক্ষকগণের তাহাতে বিশেষ স্থান ও অধিকার থাকিবে।

৩। প্রধান গবেষণা মন্দির বা উচ্চ শিক্ষার স্থান :—প্রতি প্রদেশে ও বিশিষ্ট কোনও স্থানে (যেমন হরিদ্বার—তত্ত্ব-মন্দির) এরূপ গবেষণা মন্দির বা উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার পরিচালনের জন্য একটী প্রাদেশিক প্রধান সমিতি থাকিবে। সম্প্রতি মূল প্রধান পরিষদ ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

এই সমুদয় বিদ্যালয়, শিক্ষাকেন্দ্র বা পল্লীপাঠশালা সমূহের গঠনপ্রণালী আদি মূল পরিষদের গঠন, কার্য্য ও নিয়মাবলীর সহিত এক যোগে প্রস্তুত হইবে। (ক্রমশঃ)

—সম্পাদক, ভারতীয় সাধনা মূলক শিক্ষা পরিষদ।

যক্ষের ধন

(সাহিত্য-সেবীর সংগ্রহ)

বৃটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি

৺রমেশচন্দ্র দত্ত

১৩০৮

জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য পৃথিবীর সকল জাতিই প্রধানতঃ দুইটি উপায়ের উপর নির্ভর করে। একটি কৃষিকর্ম্ম,—অপরটি শিল্প। যদি কোনও জাতি এই দুইটি উপায়ের একটি হইতে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে সে জাতির অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। যে জাতির শিল্প নাই শুধু কৃষিকর্ম্মই অবলম্বন, তাহাদের উপার্জ্জনের অর্দ্ধপরিমিত উপায় ত বন্ধ। শস্যোৎপাদনই জীবন ধারণের এক মাত্র উপায় হইলে, যে বৎসর ভাল শস্য হইল না সে বৎসর উপবাস ত ধরা কথা। আমাদের সেই অবস্থাই হইয়াছে, বিগত চল্লিশ বৎসরে দশবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, এবং দেড় কোটি মনুষ্য অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, ইংলণ্ডের সংকীর্ণ শাসননীতিই আমাদের শিল্পহানির একটি কারণ। ইংরাজ শিল্পজীবী জাতি—আমাদের শিল্প যত ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে,—ইংলণ্ডের শিল্পের পক্ষে ততই সুবিধা—ততই অধিক কাটতি। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ রেশম ও তুলার বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহা ছাড়া আরও বহু প্রকার শিল্প জাত, সমস্ত এসিয়া খণ্ডে এবং ইউরোপের তাবৎ প্রধান নগরে, বিক্রয়লাভ করিত। কিন্তু ভারতের শাসনভার বৃটিশ হস্তে ন্যস্ত হইবা মাত্র তাঁহারা ভারতীয় শিল্পের অবনতিসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন।

১৭৬৫ সালে বাঙ্গলার রাজস্ব সংগ্রহের ভার ইংরাজের হস্তগত হয়। চারি বৎসর পরেই—অর্থাৎ ১৭৬৯ সালে—কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের পত্রে কর্ম্মচারিগণকে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন—"বঙ্গের রেশম প্রস্তুতের ব্যবসায়কে উৎসাহিত এবং রেশম বয়ন শিল্পকে নিরুৎসাহ করা হউক।"—আরও আদেশ হইল "যাহারা রেশম কাটে, তাহাদের সকলকে কোম্পানির কল কারখানায় কার্য্য করিতে বাধ্য করা হউক। যদি কেহ এ আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অন্যত্র এ কার্য্য করে, তবে সে কঠিন দণ্ড পাইবে"।*

হাউস্ অব কমন্সের নির্ব্বাচিত সভাগণের মতে, এই আদেশের ফলে—শিল্পজীবী ভারতবর্ষের সমগ্র মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া, গ্রেট ব্রিটেনের কলের জন্য উপকরণ দ্রব্যের (সূতা ইত্যাদি) উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।†

* **Ninth Report** of the Select Committee of the House of Commons on **Administration** of Justice in India, 1783. **Appendix 37.**

† **Ninth Report**, Page 64

ভারতের নূতন রাজা, স্বার্থলোভে ভারতের সম্বন্ধে যে অবিচারপূর্ণ নীতি অবলম্বন করিলেন, তাহা তাঁহাদের ঈপ্সিত ফলও প্রসব করিল। রেশম ও তুলার বস্ত্র বয়ন ভারতে হ্রাস প্রাপ্ত হইল। যে জাতি পূর্ব্বে অন্যজাতিকে বস্ত্র পরাইত, সে জাতিকে নিজের লজ্জা নিবারণের জন্য ইংলণ্ডের শরণাপন্ন হইতে হইল। ১৭৯৪ হইতে ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত কি পরিমাণ মূল্যের বস্ত্র ইংলণ্ড * হইতে ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার অঙ্কপাত নিম্নলিখিত তালিকায় দেওয়া গেল।

বর্ষ শেষ ৫ই জানুয়ারি

১৭৯৪	১৫৬১ টাকা	১৮০৪	৫৯৩৬০ টাকা
১৭৯৫	৭১১০ ,,	১৮০৫	৩০৯৪৩০ ,,
১৭৯৬	১১২০ ,,	১৮০৬	৪৮৫২৫০ ,,
১৭৯৭	২৫০১০ ,,	১৮০৭	৪৬৫৪৯০ ,,
১৭৯৮	৭৪৩৬০ ,,	১৮০৮	৬৯৮৪১০ ,,
১৭৯৯	৭৩১৭০ ,,	১৮০৯	১১৮৪০৮০ ,,
১৮০০	১২৫৭৫০ ,,	১৮১০	৭৪৬৯৫০ ,,
১৮০১	২১২০০০ ,,	১৮১১	১১৪৬৪৯০ ,,
১৮০২	১৬১৯১০ ,,	১৮১২	১০৭৩০৬০ ,,
১৮০৩	১৭৮৭৬০ ,,	১৮১৩	১০৮৮২৪০ ,,

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের "ইণ্ডিয়ান ব্লুবুক" গুলির পাতা উল্টাইলে,—নববিজীত প্রজাগণের মধ্যে স্বীয় শিল্পবিস্তারকল্পে নতন বণিকরাজের অসাধারণ আগ্রহ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই বহিগুলির মধ্যে একখানি অতীব কৌতূহলপ্রদ। ১৮১৩ সালে হাউস্ অব্ কমন্সে এক বিশেষ সভা আহূত হইয়াছিল। সেই সভায় ওয়ারেন হেষ্টিংস, সার্ জন ম্যালকম, সার্ টমাস্ মনরো প্রভৃতির মত সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। এই বৎসরের পূর্ব্বে ৫০ বৎসর ধরিয়া ভারতে বারম্বার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। এই সভায় অনুসন্ধানের বিষয় কি ছিল? ভারতবাসীর কিসে উন্নতি হইবে, পুরাতন লুপ্তপ্রায় শিল্পাদি কিসে পুনরুজ্জীবিত হইবে, কি উপায়ে দুর্ভিক্ষ দমন ও প্রজাপুঞ্জের প্রাণরক্ষা হইবে,—এই সকল কি? না—ইহার কিছুই নয়। বরং ঠিক ইহার বিপরীত।—প্রায় প্রত্যেক সাক্ষীকেই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কি হইলে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, ভারতবাসী স্ব-কৃত শিল্পের পরিবর্ত্তে বিলাতী শিল্পজাত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবে। এ ব্যাপারটা যদি আমাদের প্রাণ লইয়া টানাটানির বিষয় না হইত,—তাহা হইলে এই সাক্ষ্যের অনেকগুলি প্রশ্নোত্তর পাঠ বিশেষ আমোদের কারণ হইতে পারিত।—ওয়ারেন হেষ্টিংসকে প্রশ্ন করা হয়:—

* Return to an order of the House of Commons dated 4th May 1813.

"তুমি ত ভারতবাসীর চরিত্র ও অভ্যাসের বিষয় ভালরূপ অবগত আছ, তোমার কি মনে হয় ভারতবাসী নিজের ব্যবহারের জন্য বিলাতী মাল খরিদ করিবে ?"

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ উত্তর করেন :—

"প্রয়োজন সাধন কিম্বা বিলাস চর্চ্চার জন্যই লোকে পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার করে। ভারতের দরিদ্র লোকের বলিতে গেলে কোনই 'প্রয়োজন' নাই। প্রয়োজনের মধ্যে তাহাদের বাসস্থান, খাদ্য আর যৎসামান্য বস্ত্র ;—এ সমস্ত দ্রব্যই তাহাদের পদতলের মৃত্তিকা হইতেই প্রাপ্তব্য।"

সার্ জন্ ম্যালকম ভারতবাসীর সম্বন্ধে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি বোধ হয় অতি অল্প ইংরাজই সেরূপ অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি অতি সহৃদয়তার সহিত ভারতবাসীর নানা সদ্গুণের বিষয় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "সমগ্র উত্তর ভারতব্যাপী মনুষ্যগণ শুধু যে শারীরিক দৈর্ঘ্য (ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা ইহারা বরং দীর্ঘতরই হইবে) এবং বলিষ্ঠ গঠনের জন্য বিখ্যাত তাহা নহে, তাহারা অনেক উচ্চশ্রেণীর মানসিক গুণেরও অধিকারী। তাহারা সাহসী ও সহৃদয়,—তাহাদের সত্যপ্রিয়তা তাহাদের সাহসেরই মত বিশিষ্ট রূপে উন্নত।"—ভারতবাসীর বিলাতী মালের ব্যবহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—"বিলাতী দ্রব্যের ক্রেতা হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। একেত তাহাদের জীবন প্রণালী অতি সাদাসিধা। যদি বা তাহাদের এ সব দ্রব্য প্রয়োজনও হইত, তাহা হইলেও তাহারা কিনিতে পারিত না, কারণ সে সামর্থ্য তাহাদের নাই।"

গ্রেম মার্সার নামক ব্যক্তি অনেক বৎসর ভারতবর্ষে ডাক্তারি করিয়াছিলেন। রাজস্ব ও শাসন বিভাগেও তিনি কিছুকাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার সাক্ষ্যে প্রকাশ, তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্লি বিলাতী শিল্প বিস্তার কল্পে রোহিলখণ্ডে এক মেলা বসাইয়াছিলেন. সে মেলায় বিলাতী পশমী দ্রব্যের এক প্রদর্শনী ছিল। বলা বাহুল্য ভারতীয় শিল্পজাতের প্রসারতা বৃদ্ধির জন্য ওয়েলেস্লি বা কোনও ইংরাজ শাসনকর্ত্তারই এতদনুরূপ উদ্যমশীলতা দেখা যায় নাই।

উল্লিখিত সমস্ত সাক্ষ্যের মধ্যে কর্ণেল মন্‌রোর সাক্ষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য (কর্ণেল মন্‌রো কালক্রমে মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তা হন এবং স্যর উপাধি প্রাপ্ত হন)। তৎসাময়িক বা পরবর্ত্তী কোনও ইংরাজই বোধ হয় ভারতবাসী সম্বন্ধে মন্‌রোর মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার যেমন ভারতবাসীর প্রতি যথার্থ সহানুভূতি ছিল, এমন আর কাহার ছিল ? ভারতবাসীর উন্নতিকল্পে তাঁহার মত যত্নশীলতা আর কে দেখাইয়াছেন ?—ইংরাজ সাধারণের মনে ভারতবাসী সম্বন্ধে একটা চিরকুসংস্কার বদ্ধমূল আছে,—হাউস্ অব কমন্সের সভ্যগণও সে কুসংস্কার হইতে মুক্ত নহেন। এই সভ্যগণ মন্‌রোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভারতে রমণীরা স্বামীর ক্রীতদাসীবৎ নহে কি ?" মন্‌রো ক্রুদ্ধভাবে উত্তর করিয়াছিলেন—"না,—তাহাদের অবস্থা,—তাহাদের স্বামীর ক্রীতদাসীবৎ নহে। পরিবারবর্গের মধ্যে তাহাদের ক্ষমতা, এ দেশীয় রমণীগণের অপেক্ষা কিছুমাত্র অল্প নহে।" ভারতবাসীকে সভ্য করা সম্ভব কিনা জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিয়াছিলেন—"যদি নিপুণ কৃষিপ্রণালী, শিল্প-কৌশল, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় উদ্ভাবন ক্ষমতা, লিখন পঠন ও অঙ্ক শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন, অতিথিসৎকার, দয়াধর্ম্ম, সর্ব্বোপরি স্ত্রীজাতির প্রতি

বিশ্বস্ত সম্মানপূর্ণ আচরণ—এই গুলি সভ্যতার চিহ্ন হয়, তাহা হইলে হিন্দুরা ইউরোপীয় জাতিগণ অপেক্ষা হীন নহে। যদি দুই দেশের মধ্যে সভ্যতার আমদানি রপ্তানিরই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমার ধারণা আমদানিতেই আমাদের দেশ লাভবান হইবে।"

ভারত-সাম্রাজ্যরূপ যে সুদৃঢ় অট্টালিকা আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি—এই সকল ব্যক্তিগণই এ অট্টালিকার ভিত্তি খনন করিয়া ছিলেন। ইঁহাদের উক্তি ও লেখা প্রভৃতি হইতে একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। সে পুস্তক আজি কালিকার ইংরাজদের অনেক কাজে লাগিবে। পূর্ব্বে ইংরাজরা ভারতে যথার্থ বাস করিতেন—এখন তাঁহারা প্রবাস করেন মাত্র। এখন অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতে পৌছান যায় এবং প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়। দেশের লোককে তাঁহারা ভাল করিয়া জানেন না—জানিতে চাহেনও না। একটা বাহিরের—অফিসগত যোগ আছে মাত্র—অন্তরের যোগ নাই ;—সুতরাং সহানুভূতিও নাই।

প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছাড়িয়া আমরা পথান্তরে পর্য্যটন করিতেছি।—বাণিজ্য প্রসার সম্বন্ধে মনরো উত্তর দিয়াছিলেন :—

"আমার মনে হয়, ভারতে বিলাতী দ্রব্যের বিক্রয় সম্বন্ধে, মূল্যাধিক্য ছাড়া আরও কতিপয় বিঘ্নজনক কারণ বর্ত্তমান আছে। এই কারণগুলির মধ্যে জলবায়ুর প্রভাব, ধর্ম্মগত ও জাতিগত অভ্যাসবিভিন্নতা এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের নিজ শিল্পের নৈপুণ্য প্রধান।"

কিন্তু বণিক-রাজ উৎসাহ হারাইলেন না। বিলাতী মাল ভারতে প্রচলিত করিতে তাঁহারা যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড হইতে যে সকল দ্রব্যজাত ভারতে প্রেরিত হইবে, তাহাতে অতি যৎসামান্য শুল্ক বসান হইল। অপর পক্ষে, ভারতের রপ্তানির উপর বিলক্ষণ শুল্ক চাপান হইল। মারে রাজা রাখে কে,—রাজা যখন এই রকম করিয়া ভারতীয় শিল্পের গলা টিপিয়া ধরিলেন, তখন সে শিল্পকে কে রক্ষা করিবে? এই নীতি অবলম্বনের ফল কিরূপ হইয়াছিল তাহা দশ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮২৩ সালে,—কোম্পানিরই একজন ডিরেক্টর, হেনরি সেণ্ট জর্জ্জ টকার নিম্নপ্রকার ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—

"ভারতের সংস্রবে আমরা কি বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছি? ভারতের রেশমীবস্ত্র এবং তুলামিশ্রিত বস্ত্রাদি বহুদিন হইতে আমাদের বাজার হইতে নির্ব্বাসিত। তুলার বস্ত্র কতদিন ভারতের একটা প্রধান শিল্প বলিয়া পরিগণিত ছিল। তাহার উপর শতকরা ৬৭৲ টাকার শুল্ক বসাইয়া, এদেশে যে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছি তাহা নহে,—উৎকৃষ্ট কলের সাহায্যে সুলভে মাল তৈয়ারি করিয়া ভারতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছি। এই প্রকারে শিল্পজীবী ভারতবাসিগণ কৃষিজীবীতে অবনত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেই কি আমরা ক্ষান্ত হইয়াছি? ইঁহাদের ভূমিজাত শস্যের পরিবর্ত্তে, উহাদিগকে আমাদের শিল্প দিয়াই কি ক্ষান্ত হইতেছি? না, ভারতবর্ষে যে চিনি উৎপন্ন হয়, তাহার প্রস্তুতের খরচার উপর শতকরা ২০০৲ টাকার শুল্ক চাপাইয়া দিয়াছি। চিনির ব্যবসায়কে দমন করিবার উপায় অবলম্বনে, আমরা তুলা উৎপত্তিরও বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইতেছি। আমরা যেন সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদের এসিয়াবাসী প্রজাগণকে বলিতেছি 'আমরা তোমাদিগকে যাহা পাঠাইব, তাহা তোমরা ক্রয় করিতে ও ব্যবহার করিতে বাধ্য। আমরা কিন্তু কয়েকটা জিনিষ ছাড়া তোমাদের কোনও দ্রব্য ক্রয় করিব না।' আমরা যদি ভারতের রাজা না হইতাম,

যদি ক্রয় বিক্রয়ের সম্পর্ক থাকিত তাহা হইলেও এ ব্যবহার অতি অদ্ভুত বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজা হইয়া যখন এরূপ ব্যবহার করিতেছি তখন ইহা অদ্ভুতত্বের চরমসীমা।"*

ভারতের ঐতিহাসিকগণও এই অবিচার সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। মিলের ইতিহাস সম্পূর্ণ করিতে গিয়া, অধ্যাপক এইচ্ এইচ্ উইলসন লিখিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষ যে দেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সে দেশ কর্ত্তৃক তাহার অনিষ্টসাধনের ইহা একটা দুঃখজনক দৃষ্টান্ত। (১৮১৩ সালের) সাক্ষ্যে প্রকাশ, সে সময় পর্য্যন্ত, ভারতীয় রেশম ও তুলার বস্ত্র, লাভ রাখিয়াও, তৎশ্রেণীর বিলাতী মালের অপেক্ষা শতকরা ৫০৲ হইতে ৬০৲ নিম্নমূল্যে বিক্রয় হইতে পারিত। সুতরাং বিলাতী মালকে রক্ষা করিবার জন্য, ভারতীয় মালের উপর শতকরা ৭০।৮০৲ টাকা শুল্ক বসান প্রয়োজন হইল! তাহা যদি না হইত, এই নিষেধসূচক শুল্ক যদি না বসিত, তাহা হইলে পেস্‌লি ও ম্যানচেষ্টারের কলগুলি আরম্ভেই বন্ধ হইয়া যাইত, এবং সেগুলিকে ষ্টীমের বলেও, পুনরায় চালান কঠিন হইত। ভারতীয় শিল্পের বলিদানে এই কলগুলির জন্ম। ভারত যদি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে সে প্রতিশোধ লইত। সেও বিলাতী মালের উপর নিষেধসূচক শুল্ক চাপাইয়া দিত। এই উপায়ে সে নিজের শিল্পজাতকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিত। এই আত্মরক্ষার কার্য্যটুকু ভারতবর্ষ করিতে পাইল না,—বিদেশীর কৃপায় তাহার নির্ভর। শুল্কহীন বিলাতী মাল লইতে সে বাধ্য হইল। বিদেশীয় কারিগর রাজনৈতিক অবিচারের হস্ত ব্যবহার করিয়া প্রতিযোগীকে দমন করিয়া রাখিল এবং শেষে তাহাকে গলা টিপিয়া মারিল। ন্যায় যুদ্ধ হইলে তাহার জয়লাভের কোনই আশা ছিল না।"†

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, অধিকাংশ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পেরই অবনতি দেখা গেল। তাহার পর রেলওয়ে খুলিতে আরম্ভ হইল। যেমন পৃথিবীর সর্ব্বত্র, সেইরূপ ভারতেও, রেলওয়ে প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। দূরত্বকে হ্রাস করিয়াছে, ভ্রমণকে সহজ সত্বর ও সুলভ করিয়াছে। তা হইলেও, এই রেলওয়ে দ্বারা আমাদের অনেক অনিষ্টও ঘটিয়াছে! অনেক সময় রাজকোষ হইতে নূতন রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়া থাকে; যৌথ কারবারের মহাজনেরা রেল খুলিলে, তাহাদের লাভের অল্পতা ঘটিলে রাজকোষ হইতে তাহা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এই কার্য্য প্রণালী হইতে যে আর্থিক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার প্রতি চক্ষু বুজিয়া থাকায় কোনও ফল নাই। প্রথমতঃ,—রেলওয়ে রাজকোষে অর্থক্ষতি আনয়ন করিয়াছে। ৫০ কোটি টাকারও অধিক, এই লোকসান পূরণের জন্য রাজকোষ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। বার্ষিক লোকসান এখনও চলিতেছে।‡ দ্বিতীয়তঃ, মালবহনের ব্যবসায়ে পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ গোরুর গাড়ীওয়ালা, মাঝি প্রভৃতি প্রতিপালিত হইত,—তাহাদের অন্ন গিয়াছে। লভ্যাংশ ইংলণ্ডের অংশীদারগণের আয়বৃদ্ধি করিতেছে। তৃতীয়তঃ, এই রেলওয়ের সাহায্যে ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিলাতী পণ্যজাত

---

* Memorials of the Indian Government being a selection from the papers of Henry St George Tucker, London, 1853 P. 494, et seq.

† Mill and Wilson's History of British India (London 1858.) Vol VII, P. 385.

‡ See the last Blue Book on Indian Railways

গিয়া পৌছিতেছে,—সুতরাং দেশীয় শিল্পাদির অবনতির পথ খুব প্রশস্ত হইয়াছে। ১৮৯৮ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে পরিমাণ রেলওয়ে দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে খোলা প্রয়োজন, তাহা খুলিয়াছে।‡ তথাপি ভারতগবর্ণমেণ্টের শ্রান্তি নাই,—লাভ-আশা-হীন নূতন নূতন রেল খুলিয়া চলিয়াছেন। ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে অধিক দূর যাইতে হইবে না। ইংলণ্ডের ধনী ও সওদাগরগণ পার্লামেণ্টে ভোট দিবার অধিকারী। ভারতবাসীর সে অধিকার নাই। এখন যদি গভর্ণমেণ্ট ধনীমহাজনের হস্তে রেল নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হন, তাহা হইলেই ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হয়; কিন্তু ভোটের ক্ষমতার উপর ন্যায় কবে জয়লাভ করিয়াছে ?

পৃথিবীর যে দেশেই হউক, যাহাদের শিল্পজাত সম্যক্ উন্নতিলাভ করে নাই;—তাহারা উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের শিল্প যাহাতে রক্ষা পায়, সে জন্য যথাযোগ্য যত্ন করিতেছে। অপর পক্ষে, ভারতের শিল্পকে কখনও উৎসাহিত করা হয় নাই বা তাহার রক্ষার জন্য কোনও উপায় অবলম্বন করা হয় নাই। বিলাতী মূলধনের লাভের দিকে অতি সাবধান মনোযোগ সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে। অসংখ্য কমিশন বসিয়া তুলা, নীল, কাফি, চা, চিনি সম্বন্ধে রিপোর্ট করিয়াছে,—কি উপায়ে বৃটিশ মূলধন নিয়োজিত হইতে পারে। ভারতের শিল্পের উন্নতি কল্পে কখনও কমিশন আহৃত হয় নাই।

ভারতবাসিগণ প্রত্যেক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে। বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে, ষ্টীম ও কলের সাহায্যে পাশ্চাত্য প্রণালীতে স্বীয় শিল্পের উন্নতি করিতে যত্ন করিয়াছে। বোম্বাই ও বঙ্গে তুলার কল খোলা হইয়াছে; এই কলের উৎপন্ন মাল ভারতে এবং বাহিরে কিছু কিছু বিক্রয়ও হয়। এই নূতন উদ্যমের মঙ্গলকল্পে পার্লামেণ্টে কোনও রাজকীয় সমিতি বা কমিশন আহৃত হয় নাই। যদি কোনও মন্ত্রীসভায় রাজত্বে এরূপ কমিশন আহৃত হইত, তাহা হইলে অচিরাৎ সে সভার মন্ত্রিগণ ভোটের বলে স্থানচ্যুত হইতেন। ফলতঃ লাঙ্কাশায়ারের ভোটদাতাগণ ভারতগভর্ণমেণ্টকে এরূপ শুল্ক আইন প্রচার করিতে বাধ্য করিয়াছে,—যেরূপ আইন প্রজা-হিতাকাঙ্ক্ষী কোনও গভর্ণমেণ্ট পাস করিতে পারিত না।

এই প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় ভারতীয় শিল্প বিপন্ন। লোকে ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে কৃষির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছে।—লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের খরচ যোগাইবার জন্য,—ভারত হইতে অবসর প্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের পেন্সনের জন্য,—বিলাতী মহাজনের মূলধনের সুদ যোগাইবার জন্য,—রাশি রাশি ভারতীয় দ্রব্যজাত ইংলণ্ডে পাঠাইবার প্রয়োজন হইতেছে। নিম্নে একটী তালিকায়, পণ্যে ও নগদ টাকায় ভারত হইতে কি পরিমাণ অর্থ বিলাতে প্রতি বৎসর প্রেরিত হয়, এবং বিলাত হইতে ভারতেই বা কি পরিমাণ প্রেরিত হয়, তাহার অঙ্কপাত দেওয়া গেল।*

‡ Their Report, p. 330.

* See Mr Tozer's paper on Indian Trade read before the Society of Arts, London, on the 14th March 1901.

ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বার্ষিক গড়পড়তা আমদানি ও রপ্তানি

বার্ষিক গড়পড়তা	ভারতে আমদানি মাল ও সোণা রূপা।	ভারতে হইতে রপ্তানি মাল ও সোণা রূপা।	রপ্তানি অপেক্ষা আমদানির আধিক্য অথবা ভারতের বার্ষিক শোষণ।
১৮৫৯-১৮৬৩	৪১ কোটি টাকা	৪৩ কোটি টাকা	২ কোটি টাকা
১৮৬৪-১৮৬৮	৪৯ ,,	৫৭ ,,	৮ ,,
১৮৬৯-১৮৭৩	৪১ ,,	৫৭ ,,	১৬ ,,
১৮৭৪-১৮৭৮	৪৮ ,,	৬৩ ,,	১৫ ,,
১৮৭৯-১৮৮৩	৬১ ,,	৮০ ,,	১৯ ,,
১৮৮৪-১৮৮৮	৭৫ ,,	৯০ ,,	১৫ ,,
১৮৮৯-১৮৯৩	৮৮ ,,	১০৮ ,,	২০ ,,
১৮৯৪-১৮৯৮	৮৮ ,,	১১৩ ,,	২৫ ,,

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ভারত হইতে বার্ষিক অর্থশোষণ, বিগত ৪০ বৎসরে ২কোটি টাকা হইতে ২৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এ টাকার অধিকাংশ দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবির উপার্জ্জন,—এ টাকা কোনও আকারে আর তাহাদের ব্যবসায় বা পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করিতে ফিরিয়া যায় না। বৎসর বৎসর ইংলণ্ডের আয় ও মূলধনের পরিমাণই বৃদ্ধি করিতেছে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ, দুইটি দেশ একই রাজার শাসনাধীন। এক দেশের প্রজা তাহাদের বিপুল ও বর্দ্ধনশীল মূলধন পৃথিবীর কোথায় কিসে খাটিবে সেই চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত ;—অন্য দেশের প্রজা নিরন্ন—উপায়হীন ;—চারি বৎসর অন্তর একবার করিয়া দুর্ভিক্ষের প্রকোপে ছারখার হইতেছে। এ কি দৃশ্য !

ভারতের সমগ্র রাজস্বের সহিত তুলনা করিলে উপরোক্ত সংখ্যাপাতের অর্থ আরও ভাল বুঝা যাইবে। ভারতীয় ব্যয় সম্বন্ধে সম্প্রতি রাজকীয় কমিশনের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, ভারতের রাজস্ব বার্ষিক ৫৭ কোটি টাকা। সুতরাং ভারতীয় সমগ্র রাজস্বের প্রায় একার্দ্ধ ভাগ পরিমিত ধন, বৎসর বৎসর ভারত হইতে শোষিত হইতেছে—অথচ তাহার বিনিময়ে ভারত এক কপর্দ্দকও পাইতেছে না। ঐ টাকার ২৫ কোটি ভারতবাসীর সম্বৎসরের আহারের সংস্থান হইতে পারে। যে দেশ হইতে এই ভয়ঙ্কর শোষণ হইতে থাকিবে, সে দেশ অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে দরিদ্র হইবে না, দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইবে না, ইহা কি সম্ভব ? ভারতবাসীকে ভোট হইতে বঞ্চিত রাখিয়া তাহাদের যে শাসন করা হইতেছে—ইহাতে ভারতের কি মঙ্গল হইতেছে, না তাহা কখনও হওয়া সম্ভব ?

ভিক্ষুকের ঝুলি

ত্রিদণ্ডী ভার্গব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মুখোপাধ্যায়। পুরুষ সূক্তে শূদ্রের উল্লেখ থাকায় অনেক পণ্ডিতগণ চারি জাতি যে আদিম কাল হইতে আছে তাহার প্রতিবাদ করিবার পক্ষে মহা গোলমালে পড়িয়া বলিয়া বসেন যে ওসব **Interpolation**। কিন্তু জেনো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র চির দিন আছে ও থাকিবে। এখনও সর্ব্বত্র ঐ জাতি বিভাগ বর্ত্তমান। তবে শূদ্রের সংখ্যা পরবর্ত্তী কালে প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়াছে। "আমার জন্মভূমি" বলিয়া যে গানে আজ তোমরা উন্মত্ত তাহা কত মিষ্টি ও উৎসাহপূর্ণ।

শ্রী। কিন্তু জাতি বিভাগ কখনই বংশগত হইতে পারে না এবং বংশগত হওয়ার জন্যই আমাদের এত অধঃপতন।

মু। তুমি এটা বড় বুদ্ধির কথা বলিলে না। বৃত্তি যদি বংশগত না হয় তবে চারিবর্ণের যে বেড়া তাহা থাকে কি করে বল দেখি? সমাজের চরম উৎকর্ষ লাভ যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তবে বৃত্তি পুরুষানুক্রমে চারিবর্ণে না থাকিলে উন্নতি অসম্ভব নয় কি? বৃত্তি গুলি গ্রহণ করা কাহারও ইচ্ছাধীন ছিল না—বর্ণ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। ঋগ্বেদে আছে যে পুত্র তাহার পিতার বৃত্তি গ্রহণ করিবে। এবং ঋষি ও ঋষিপুত্রগণ তাহা প্রতিপালন করিতেন। এখনও দেখ রাজবংশ বা বনিয়াদি বংশ সর্ব্বত্র সেই বংশ পরম্পরার পরিচয় দিতেছে। মুরশিদাবাদের নবাব কবে চলে গেছেন কিন্তু এখনও আমরা তাঁর বংশধরকে নবাব বলি এবং বিশেষ সম্ভ্রম দেখাই। রাজপুত্রকে রাজার তুল্য দেখি। স্ববৃত্তিনিষ্ঠ হওয়াই আর্য্যের মূল শাসন। ইহা পরিত্যাগ করিয়া আর্য্য সভ্যতা বুঝিতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র।

শ্রী। তা হলে কি এক বর্ণ অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করিলে একবারে মহাপাতক গ্রস্ত হইবে? সীতানাটকে দেখা যায় শ্রীরামচন্দ্র নিজে ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় শূদ্রকের মস্তক ছেদন করেন,— অপরাধ সে বেদচর্চ্চা ও বেদসাধনা করিত।

মু। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের পুস্তক পাঠ করিয়া তোমার ভীষণ ভুল ধারণা হইয়াছে দেখিতেছি। সত্যকাম, জাবাল, কবীর প্রভৃতির ইতিবৃত্ত স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতেছে যে উদার আর্য্য-ঋষিগণ কত সতর্কে এই ব্যতিক্রম স্বীকার করিতেন। জনক রাজর্ষি হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁকেও ব্রাহ্মণ্যবৃত্তি দেওয়া হয় নাই। তাঁর বংশধরগণ সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন অথচ জনক—ঋষি। পাছে বংশত্বের **dilution** হইয়া চরম উৎকর্ষের বিঘ্ন হয় তজ্জন্য দূরদর্শী সমাজ-রক্ষক ব্রাহ্মণ অতি সাবধানে ব্যতিক্রম স্বীকার করিতেন। শূদ্রকের বিনাশ এই সমাজ বন্ধনের দৃঢ়তার পরিচায়ক মাত্র। যদি ফাঁসির হুকুম না থাকে তবে হত্যার সংখ্যা বাড়িয়া মনুষ্যসমাজ নষ্ট হইয়া যাইবে।

যে যা ইচ্ছা সেই বৃত্তি গ্রহণ করিলে সমাজের সামঞ্জস্য অসম্ভব, তাহা তুমি নিজ চক্ষে ইদানিন্তন কালে দেখিতে পাইতেছ। এই বর্ণ ও বৃত্তি বিভাগ চিরদিন আছে ও থাকিবে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। হাজার চেষ্টা করিলেও কোনরূপে না কোনরূপে ইহা থাকিবেই। ওশেনিয়া অঞ্চলের আদিম মনুষ্য Nobles, Hovas, Zarahovas এবং Andavoes এই চারি জাতির মধ্যেও মিশ্র বিবাহ ছিল না—এবং Andavoes প্রায় আমাদের দেশের শূদ্রের মত। Wolf এবং Raven দুই জাতির মধ্যে পার্থক্য আছে। কচ্ছ জাতির মধ্যে তিন শ্রেণী আছে এবং নিজ শ্রেণীর মধ্যে শোণিত বিনিময় করিতে পারে না। টোঙ্গা দ্বীপে তিন শ্রেণীর মানব আছে—মাতাবু, মোয়া এবং তোয়া—এবং তাহাদের Latoo markers, Barbars এবং Chili Carver এর কার্য্য ছাড়া সকল বৃত্তিই বংশানুক্রমে আচরিত হইয়া থাকে। প্রেসকট সাহেব বলিয়াছেন যে পেরু দেশে "All occupations were hereditory and that the division of castes was as precise as that which existed in Hindusthan & Egypt. Sons of priests at Cazes inherited the office of their fathers So did the Amantas—learned men—Havaras—Singers & the public registrars. There was a similar system in Mexico, according to Zurita. জার্ম্মাণ দেশেও জেনোসেন স্যাপটেন, ব্যাভেরুষ্টাগু, বর্গোরুষ্টাগু প্রভৃতি জাতি বংশগত। রুষ দেশের এই জাতি বিভাগের সুন্দর ইতিবৃত্ত তুমি Russian code of Svod Zakonof নামক গ্রন্থের নবম পর্য্যায়ে যে ১৬০০ নিয়ম আছে তাহা পড়িলে দেখিতে পাইবে। প্যালগ্রেভ সাহেব তাঁহার History of the Rise and Progress of the English Constitution নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে প্রাচীন বৃটেনের "Collegia Opificum" এই জাতিবিভাগ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। থিওডোসিয়ান কোড পুত্রকে পিতার বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল। ইহুদীদের মধ্যেও জাতি বিচার বেশ ছিল। পেট্রিসিয়ান ও প্লীবীয়ানদের মধ্যে (রোমে বা গ্রীসে) দুই জাতির কন্যার আদান প্রদান ছিল না। এখনও সকল জাতি সকল দ্রব্য আহার করেন না। ব্রীটনে পূর্ব্বে শূকর মাংস বা মুরগ মাংস চলিত না। ইহুদী ও আরবীয়গণ যদিও তাহাদের বিধবার বিবাহ দিত না, কিন্তু the custom of getting sons through widows for their husbands as well as through wives by appointment was prevalent in those countries [অন্যের দ্বারা পুত্রোৎপাদন অনুমোদিত ছিল]। উচ্চ ইহুদীগণ কখনই নীচ ইহুদীগণের জল গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং যদি তুমি পূর্ব্বতন জাতিগণের ইতিবৃত্ত একত্রে সংগ্রহ কর এবং বুদ্ধির সহিত আলোচনা কর দেখিতে পাইবে সেই পুরাতন আর্য্য জাতির সমাজ আচার ব্যবহার ইত্যাদি নানা প্রকারে নানা দেশে অবস্থিত ছিল। সর্ব্ব বিষয়েই দেখা যায় মানব জাতির আদিম মূল সেই আর্য্যভূমি ও আর্য্য জাতি। তাহারা পরবর্ত্তীকালে যথায় গিয়াছে তথায় নিজেদের জাতি আচার বিচার ইত্যাদি লইয়া গিয়াছে। দেশ কাল ও অবস্থায় পড়িয়া সব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রী। তবে কি পৃথিবীটা এক সময়ে সকলের জানা ছিল? আদিম জাতিরা কি পৃথিবীর ভূগোল-তত্ত্ব জানিত?

মু। তুমি কি জান না যে গ্রীণল্যাণ্ড বা ওসেনিয়ায় প্রায়ই এক রকম লিজেণ্ড, এক রকম ইনিষ্টিটিউসন, এক রকম ব্যবহার ও আচার, এক রকম ভাস্কর্য্য, এক রকম মিথ্ প্রভৃতি বর্ত্তমান

ছিল। তুমি কি বলিতে চাও এই সমস্ত ঠিক একই সময়ে সর্ব্বত্র উদ্ভূত হইয়াছিল? পুরুষ সূক্তের Legend গুলি কি ঠিক একই ভাবে সর্ব্ব দেশের মানুষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? রামের চৌদ্দবৎসর বনবাস, সীতাপহরণ, লঙ্কাধ্বংস এবং হেলেনঅপহরণ, চৌদ্দবসৎরযুদ্ধ ও ট্রয়নগর ধ্বংস প্রভৃতি কি ঠিক একই নিয়মে এক সঙ্গে হইয়াছিল? এগুলি কি বিস্ময়কর ব্যাপার নহে? অঙ্ক শাস্ত্রের দশমিক জ্ঞান কি ঠিক একই সময়ে গ্রীণল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে উদ্ভূত হইয়াছিল? তীর, ধনু, শড়কী, কোদালী প্রভৃতি কি একই সময়ে সকল স্থানে প্রস্তুত হইত? মালেগাসী দেশে কি ঠিক একই নিয়মে একই সময়ে জাতি বিচার প্রচলিত হইয়াছিল? আর্কলজিষ্টগণ বলিয়া থাকেন, "Art of making fire a d cooking food, the art of carving on horns and bones (not probably by bone instruments but something harder and powerful enough to cut or sharpen stones used) the art of sewing a coarse kind of cloth and domestication of animals were known in Europe from 7000 to 11000 B.c (৭০০০ হইতে ১১০০০ বৎসর খৃষ্টপূর্ব্বে কাপড় শেলাই বা পশুপালন ইউরোপে প্রচলন ছিল) and that the cerials in use and the domesticated animals were from some hot climate of Asia (এই পশু পালন এসিয়া হইতে আসিয়াছিল). This research shows that civilisation was then at a stage superior to that of, say, Tonga Islanders and it also throws a flood of light on th view that migration actually took place from a common home with some civilisation attached there and that common home was some hot climate in Asia, where animals and cerials were natural. (গ্রীষ্ম প্রধান এশিয়া খণ্ড হইতে সব প্রচারিত হয়)। The Skeleton man found by Dr. Dowler in the Delta near New Orleans under four burried forests is said to be 50,000 years old (নিউ অর্লীনসদেশে যে মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহা পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের) The remains from California found in a deposit near the Table-mountains and the fragments of pottery found by Mr. Willson in beds of clay with sand & gravel along the coast of Equader are ascribed to the Pliocene and Post-Pliocene periods. So there was some civilisation even at that period & Geographical distribution must have taken place even before that period if at all. Geologists affirm that it was in the Premian or Triassic age that India was connected with South-East Pacific Islands as well as with Africa and separated from the mains land of Asia by a channel between Himalayas and the Deccan, while there was dry land in India. It was afterwards separated from Africa and the Islands were joined to the main land of Asia by an up-heaval of the channel at a later period". মানব শাখা ভারত হইতেই নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। এই পিতৃভূমি মধ্য এসিয়াতে হইতেই পারে না, তাহা অত্যন্ত শীত প্রধান। তথাকার flora কখনই মানুষের প্রীতিকর হইতে পারে না। পুরাবৃত্তে কথিত জল-প্লাবনই শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত মনুর জলপ্লাবন। এই সব তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা করা অতিশয়

গুরুতর। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বা এন্‌থলজিষ্ট পণ্ডিতগণ এখনও এ বিষয়ে বালক মাত্র। তাঁহাদের এই অত্যাশ্চর্য্য সত্যঅনুষ্ঠান মানব জাতিকে চিরদিন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিবে। কেন না —আর্য্য জাতির এর চেয়ে গৌরবের আর কোন জিনিষ নাই। মানুষ-মনের অভ্যুদয় কি প্রকারে হইয়াছিল তাহার ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করাই মানুষের লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক—কোথায় কোন্ যুদ্ধে কে জিতিল, কে হারিল তাহা লইয়া মানুষের ইতিবৃত্ত প্রস্তুত হয় না। সৃষ্টি কর্ত্তার অপার মহিমা সে ইতিহাসে জানা যায় না। বিভিন্ন সভ্যতার আলোচনা যে সকল মহাপণ্ডিতগণ করিয়াছেন ও করিতেছেন সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝিবেন যে—"World shows a wreck of some great civilisation which could not but be achieved except in a common home and that common home could not but be any where except in a country of ever-lasting spring. Wheresoever there is a vestige of civilisation in any country, European scholars are invariably found to bring its date as near as possible to there own day, as if civilisations were almost simultaneous in all countries; as if mind among all peoples developed in the right direction with the age of the world. But mind like all other things does not change or progress in one particular direction under all circumstances and in all countries simultaniously or almost simultaneously with the age of the world. Some people progress, some retrograde and even stand still at the same time. Thus while it is twenty first century with the Europeans, the first century with the Hotentots has not yet begun, and the last century of the Egyptians and the Babyloneans is long past. When the Bushmen un-affected by the modern civilisation would re-act their twentyfirst century, no body knows. If ever they would reach there, referring to the civilisation of Europe, provided then there be any vestige of it, they would wonder how could there be a civilisation greater than their own in the beginning of the world! A son of a great man is not always greater than the father. Similarly when one civilisation is accidentally found upon the ruins of another or parts of others, it is by no means to be understood to have superseded them or necessarily an improvement upon them. The different direction of the father and son unde diff-rent or altered circumstances does not mean an improvement. Sometimes when on the average the son is an improvement on the father, at other times son is found to be a degradation from the father. It is against the law of nature to look up for continual progress and no fall of civilisation of the world on the average. There must be breaks, falls, stand-stills and commencements altogether anew. The Bushmen would not reach their twenty-first century or the last century from which they would count their fall at one bound, even if aided by preceding civilisations and when there, they would not necessarily be proud of a civilisation superior to the modern European one. Steam, electricity etc. might be forgotton or might not be required under their circumstances. At that time Geological change might even efface all trace of Europe. Inspite of all these probabilities, there is a wonderful mental development and

a beautiful civilisation there. There might not have been a European civilisation, there might not be any Europe at all, which is now holding the lamp and illuminating the darkness of the world alone and un-aided. In that case, there would now be a stand-still all the world over. The modern civilisation is connected with the oldest of Historical civilisation as a descendant is connected with a fore-father. A peculiar future civilisation will be by no means an inprovement when ours will be almost lost to history, only because that future civilisation would not be able to form a true estimate of ours or would consider it mythical and be reluctant to form a true estimate scientifically. Thus it is surely wrong and unjustifiable to ignore a civilisation that men achieved in their common home when the rest of the world was un-inhabited and un-inhabitable. Some of us are worshipping these men as gods and monsters and some of us are rejecting them as such, but the fact remains that these men were none but real human creatures who lived their day. The original men were pure, simple, broad-minded, large-hearted with all-comprehending intellect and of a healthy and vigorous tenour in body, mind and soul. There descendants are still enjoying the world but have grown narrower and narrower and weaker & weaker with their expansion and age. They had the foundation of their civilisation upon conventions which are still unaltered and they completed it with a view to all ages and all circumstances. The Decimal system of Arithmetic, the wonderful social system, the various arts of peace and industry throughout the world and the Vedas—the source of all myths and superstitions of the world—are still pointing them out as none but divine creation—next to none but God. The Hindus claim to be their main line and the Brahmins—there superior breed. The extreme conservatism almost to a fault, which mark them since their beginning up to date shows that they cannot but be right in their claims. It is by giving up this conservatism willingly or carelessly that different races of man have beeu formed from time to time that now people the world. If some of us even now cut off our connection with society the main Ganges would still flow throwgh the heart of আর্য্যবর্ত্ত and overflow its banks with crystal water that is being eternally poured from the urn of "ব্রহ্ম"। আমাদের সভ্যতা পূর্ব্বের সহিত মিলে না বলিয়া সে সভ্যতা ছিল না বা ভাল ছিল না একথা বলা উপযুক্ত নহে। আজ যে বিদ্যুৎ বা যে বাষ্প এত প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে হয়ত তাহা দু একশ বছর পরে বা ২০০০ বৎসর পরে হটেন্‌টট্‌ জাতি যখন সভ্য হইবে তখন দরকার হইবে না। তখন সে জাতি ভাবিবে আজকালের সভ্যতা ভাল ছিল না, ইত্যাদি।

শ্রী। লোকমান্য তিলক তাহার আর্টিক হোম নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে আর্য্যগণের আদিম বাস উত্তর মেরুতে ছিল।

মু। মতুয়ারী বুদ্ধির লেপা আলাদা আর সত্য প্রকাশের জন্য কলম ধরা পৃথক জিনিষ। ভারতের পূজনীয় তিলক মহোদয় জেলে অবস্থিতি কালে এই গ্রন্থের সূচনা করেন। তাঁহাব

মতুয়ারী বুদ্ধি ফল লাভ করে ও তিনি ভট্ট মোক্ষমূলরের সহায়ে জেলদণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করেন। অপ্ শালার নিকট মৃত্তিকা স্তুপগুলি আছে এবং তাহার ইতিহাস নাই বলিয়া আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান তথায় ছিল এই সিদ্ধান্ত কখনই সমীচীন হইতে পারে না। অগ্নি ও সূর্য্য দেখিলে আহ্লাদের সহিত তাঁহার উপাসনা করা হইত এই প্রমাণ দ্বারা বৈদিক সূত্রগুলির অপভাষ্য করা সত্যের অনুসন্ধান নহে। প্রধানতঃ ফলমূলাশী আর্য্যগণ—চীর-বল্কলধারী পিতামহগণ—কখনই উদ্ভিজ্জহীন—অত্যন্ত শীত প্রধান দেশে এইরূপ একটা মহান্ বিশ্ব-মানবের সভ্যতা তৈরী করিতে পারেন নাই। তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান—তুমি বুদ্ধির অংশ—সকল বিষয়ের তথ্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টিত হইবে।

এখন আর বকাবকি না করে বল দেখি।—"আমার জন্মভূমি" বলিয়া যে গানে আজ তোমরা উন্মত্ত—তাহা কত মিষ্টি ও উৎসাহপূর্ণ।

পরিমল। জন্মভূমিকে সকলেই ভালবাসে। "আমার" কথা বড় মিষ্টি।

বিনয়। আবার সেই জন্মভূমি যদি শ্রীবৃদ্ধিতে লোভনীয় হয়—তবে তাহা ভোলা যায় না।

মু। যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্মশীল রাজা কেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন!

শ্রী। পৈতৃক রাজত্ব রক্ষা করিবার জন্য। ভীষণ লোভপরবশ দুর্য্যোধন সেই ধ্বংস ব্যাপারের মূল হেতু।

মু। তা হলে সমৃদ্ধিশালী পৈতৃক সম্পত্তিতে লোভ অতি প্রাকৃতিক—কেমন নয়? তোমার পৈতৃক বাস্তু ও পৈতৃক সম্পত্তি যদি তোমার ভাই সুখে ভোগ করে এবং তুমি যদি ঘটনা চক্রে খৃষ্টান হইয়া গিয়া অন্যত্র উঠিয়া যাও ও কষ্ট পাও, তবে কি তোমার পৈতৃক ধনে লোভ হইবে না? তুমি তাহা পুনরায় লাভ করিতে চেষ্টা করিবে না?

শ্রী। নিশ্চয় করিব—অন্ততঃ যতটা পারি কেড়ে নিতে চেষ্টা করিব।

মু। প্রকৃতির প্রিয়পুত্র—আর্য্য পিতামহগণ এইরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের যে সব শাখা হিমালয়ের উপত্যকা ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পারস্য, আরব, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি দেশে চলিয়া যান—সেই সকল জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণ দ্বারা বারংবার আক্রান্ত হয়েন। ইহাদিগকে অসুর অর্থাৎ অনার্য্যবীর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। স্থান মহাত্ম্যে (climatic condition) এই সকল শাখা মণ্ডলী প্রকৃতির সে দয়া পান নাই—যাহা তাঁহাদের অন্য শাখাগণ জন্মভূমিতে বাসের ফলে পাইয়াছিলেন। এক দিকে প্রচুর ফলমূলাদি ও উদ্ভিজ্জগণ বিরাজিত পিতৃরাজ্য, অন্য দিকে বিভিন্ন প্রকার উৎকট ঋতু প্রভাবে প্রভাবিত—মানুষের প্রাকৃতিক খাদ্যহীন ক্ষুদ্র দেশ। পরস্পরের মধ্যে এই বিরোধ দীর্ঘকাল চলিয়াছিল এবং উভয় পক্ষেই জয় পরাজয় ইতিবৃত্তে দেখা যায়। এই দীর্ঘ বিরোধের ফলে কতক কতক স্বদেশ-ত্যাগী পূর্ব্ব-ভ্রাতাগণ পিতৃ-ভূমিতে থাকিয়া যান—এবং বোধ হয় তাহাতে পরবর্ত্তী কালে চতুর্থ শ্রেণী শূদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অনেক আর্য্য পিতামহগণ হিমালয় প্রদেশ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে ও মধ্যদেশে নামিয়া আসিতে বাধ্য হয়েন। এবং ইহারাও নিজেদের আচার অভ্যাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

শ্রী। এই জন্যই অনেক পুরাতত্ত্ববিৎ বলিয়া থাকেন—"The Persians, the Ionians,

the Scythians, the Chinese and many other races living beyond the boundaries of India were at one time Khatriyas and it is the experience of the un-suitable modification on them by the different climates, of their colour, that prove beyond doub's that the probibition was not whimsical." এখন আমরা দেখিতে পাই—এই বঙ্গদেশের মধ্যেই যখন ইদানীন্তন কালের যানবাহনাদি ছিল না তখন কুচবিহার উত্তর বঙ্গ পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সমাজে আচার বিচার কত পৃথক ছিল।

পরিমল। The degradation of the Brahmins of Bengal indicates why Adisur had to import Brahmins from Kanonj and why king Balla Sen had to put barriers by introducction of Kuleenism to safe-guard the breed.

মু। তা হলে জলবায়ুর প্রভাব কত প্রবল তাহা কিঞ্চিৎ বুঝা গেল। এখন যে "এদেশেতে জন্ম আর এই দেশেতে মরি" এই কথায় কিছু সত্য আছে তাহা তোমরা বুঝিতে পারিলে। এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয় যতটুকু পারা যায় দেখা যাক্।

এই পরিষ্কার থাকার প্রথা উচ্চ তিন শ্রেণীর মধ্যে বেশী প্রচলিত—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ আচার প্রতিপালনে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ইঁহারা স্নান করেন নিজেদের পরিহিত বস্ত্রাদি ধৌত করেন। কেহ কেহ দুইবার কেহ বা তিন বার করিয়া স্নান করেন। এমন কি মলমূত্র পরিত্যাগের পর, স্নান, বস্ত্র পরিবর্ত্তন ইত্যাদি নানা প্রকার পরিষ্কার থাকিবার ব্যবস্থা ইঁহাদের আছে। ব্রাহ্মণের গৃহ পরিষ্কার ও পবিত্রতার মুর্ত্তি। তাহার পাকগৃহ একটি দেবতার মন্দির তুল্য। গাভীর গোবর ও পবিত্র জাহ্নবী সলিল তাঁহার আদরের disinfectant দ্রব্য।

শ্রী। সেই জন্যই গোবর ছড়া দেওয়া, সেই জন্যই যেখানে ময়লার সম্ভাবনা তথায় গোবর জল ঢালা, সেই জন্যই জলে ময়লা নিক্ষেপ নিষিদ্ধ, সেই জন্যই আগুনে অপবিত্র দ্রব্য নিক্ষিপ্ত করা মহাপাপ বলিয়া ধর্ত্তব্য।

মুখো। এখনকার মতে ময়লা জিনিষ পোড়াইয়া ফেলাই ব্যবস্থা। কিন্তু আর্য্যগণ তাহা করেন নাই। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে অপবিত্র দ্রব্য দগ্ধ হইলে তাহার স্থূল অনিষ্টকারী শক্তি—অতিশয় সূক্ষ্ম বীজে পরিণত হইয়া অদৃশ্য বাষ্পাকারে চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানগুলি বিষাক্ত বীজাণুতে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। সমাজও প্রতিবেশীর অনিষ্টের হেতু হয়। আর্য্যদের সবাই সমান তাই তাঁদের সব কাজ বিশ্বমঙ্গলের জন্য।

পরিমল। গোবর ত পরিত্যক্ত জিনিষ—তাহার এত পবিত্রতা কিসে? দেখিলেই ঘৃণা হয়।

মু। গোবরে কি আছে তাহা কার্য্যক্ষেত্রে গোবর ব্যবহারে জানা যায়। গোবর ও গোমূত্র (গাভীর) বিষাক্ত বীজাণুর পরম শত্রু। রাসায়নিক পণ্ডিত সে বিষয় আলোচনা করিতে পারেন। সাদা চোখে আমরা দেখিতে পাই গরু যেখানে থাকে তথায় বিষধর কালসর্পও যায় না। বিষধর সর্প দৈবাৎ গরুকে দংশন করিলেও গরু মরে না। ভীষণ যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগী গো সেবা ও গোয়াল পরিষ্কারাদি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সদ্য যমের হাত হইতে রক্ষা পায়, ইহাও দেখা গিয়াছে। গোমূত্র ব্যবহারে দেখা গিয়াছে চর্ম্মরোগ এমন কি কুষ্টরোগও আরোগ্য হইয়াছে। আর্য্য জাতি মূর্খ ছিলেন না—তাই গরুর এত যত্নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রী। আচ্ছা পরিষ্কার পরিচ্ছিন্নতা রক্ষাকল্পেই কি একে ছুঁয়ো না—ওর কাছে বসিও না—আর একজনের প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করিও না—এইরূপ ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়।

মু। ঠিক তাই। ঐ ব্যবস্থার মূলে ঘৃণা বা অবহেলার লেশ মাত্র নাই। এখনও দেখা যায়—বসন্ত বা বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীকে পৃথক রাখা হয়। এখনও ব্রাহ্মণের পত্নী মাসে মাসে ও সন্তান প্রসবের পরে ঠিক ডোমের মত পৃথক থাকিতে বাধ্য হয়েন। কোন রোগে মৃত্যু হইলে সেই পরিবার শুদ্ধ লোক পৃথক থাকিতে বাধ্য হয়েন। সেই পত্নীকে—সেই আত্মীয়গণকে ঠিক অস্পৃশ্য জাতির ন্যায় গণনা করা হয়। তাহাদের পৃষ্ট আহার্য্য গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। তবে কি তুমি বলিতে চাও—সেই পত্নীকে—সেই নিজ পুত্রকে ব্রাহ্মণ ঘৃণা বা অবহেলা করেন! তাহা অস্বাভাবিক। ডোমকে যে ছুঁইতে দেওয়া হয় না বা তাহার সঙ্গে এক আসনে বসা হয় না বা তাহার হস্তদ্বারা প্রস্তুত আহার্য্য গ্রহণ করা হয় না তাহার মূলে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার ব্যবস্থা। ইহাতে দ্বিধা ভাবের লেশ নাই।

"It is an unclean society that suffers the most from all kinds of diseases. Individually a man may be externally extraordinarily clean, but his society and food contain germs which may not affect him but may affect others living in different environments and condition." মনুষ্য ও পশুতে শৌচাচার লইয়া পার্থক্য। পশুদের শৌচাচার নাই। তুমি যদি নেপাল প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া থাক তবে দেখিয়াছ—তৎ তৎ বাসী ব্রাহ্মণ ও খেতরীগণ একবারে শৌচাচারবর্জ্জিত হইলেও এখনও তাদের আভিজাত্যের নেশা টুকু আছে—তাহারা মলমূত্র ত্যাগের পর জল ব্যবহার করে। কিন্তু অন্য জাতি সত্য সত্যই একেবারে শৌচাচার-বিবর্জ্জিত।

শ্রী। পরিষ্কার হইতে এখন ত সাবান প্রভৃতি অনেক ভাল জিনিষ ব্যবহৃত হয়, তবে আর কেন গোবর বা মাটী আমরা ব্যবহার করি?

মু। গোবরের গুণের কথা পূর্ব্বেই কিছু বলিয়াছি। উহার বিষয় জানিতে চাও রসায়ন বিদ্যার সাহায্য লইতে পার। আমি রাসায়নিক পণ্ডিত নহি। মাটীর কথা তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। আগে শাস্ত্রে কিরূপ মাটী ব্যবহারের বিধি আছে তাহা ভাবিয়া দেখ। যে মাটী পচা বা যাহা অপবিত্র, যেমন মূষিকোৎখাত বল্মীকবৃক্ষমূলস্থ শ্মশানস্থ ও শৌণ্ডিকালয়স্থ মৃত্তিকা, তাহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। যে মাটীতে কাঁকর বা পাথর থাকে তাহা পরিত্যাজ্য। মহী সর্ব্ব শক্তির বীজাঙ্কুর ধারণ করে। অষ্ট প্রকার মহী দিয়া দেবপূজার ব্যবস্থা।

শরীর যদি মহীজাত দ্রব্যের শক্তিতে (উদ্ভিজ্জাদির মধ্য দিয়া) পুষ্টি পায় তবে পূর্ণ শক্তির বীজাঙ্কুর যে মহী ধারণ করে সেই পবিত্র মহী ব্যবহারে যে ফল সেই ফল কি তোমার সাবান ব্যবহারে লাভ করা যায়! হাত পা বা গা জ্বালা করিলে তন্নিবারণার্থে হাতে পায়ে ও গায়ে কত রকম মালিষ দেওয়া হয়। হাত ও পায়ের চেটোতে স্নায়ু যন্ত্রের বাহ্য প্রকৃতির শক্তি গ্রহণের মুখ গুলি আবদ্ধ। তদ্দ্বারা সহজে বাহ্য শক্তি রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। যদি মালিষে রোগ যাইতে পারে তবে মহীর সর্ব্বৌষধি-শক্তি কেন যে মানব শরীরে আকৃষ্ট হইয়া উপকার করিতে পারে না—তাহা আমার মাথায় ঢুকে না। দ্বাদশবার মহী ব্যবহারের ব্যবস্থা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার গুলির ভিতর

প্রাকৃতিক ঋতের যে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক আইন মান্য করা হয় তাহা আমরা বিবেচনা শক্তিহীন হইয়া বুঝিতে পারি না। তোমাকে একটা সত্য ঘটনা বলিতেছি। এক গলিত কুষ্ঠ রোগী সর্ব্ব চিকিৎসায় আরোগ্যলাভে বঞ্চিত হইয়া—হতাশ হৃদয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে থাকেন। হঠাৎ এক দিন এক অপরিচিত সাধু আসিয়া তাঁহার দুঃখের হেতু শুনিয়া উপদেশ দেন যে বিশুদ্ধ গঙ্গাগর্ব্ভ-জাত মৃত্তিকা আনিয়া তাহা তুলসী বৃক্ষের নীচে রাখিয়া দিয়া অন্ততঃ মাসাবধি কাল পরে সেই মৃত্তিকা গাত্রে লেপন করিলে রোগ আরাম হইয়া যাইবে। লোকটি সাধুর বাক্যানুসারে ঐরূপ গঙ্গামৃত্তিকা বার বৎসর ব্যবহারে একবারে রোগ মুক্ত হয়েন।

মাটীর শক্তি অসীম যদিও তাহা তোমার ষ্টিকনাইন্ ইনজেকসনের মত আশু তীব্র ফলদায়ী নহে। রোগ এক দিনে হয় না—সেরূপ তাহার একদিনে এক মুহূর্ত্তে আরোগ্য চেষ্টাও অবৈজ্ঞানিক। প্রকৃতি ধীরা কিন্তু অপ্রতিহতগতি। তিনি রাজরাজ্যেশ্বরী চিরযৌবনা—শুম্ভ নিশুম্ভ-নিধনকারিণী—রক্তবীজ-নাশিনী—উল্লাসিনী। এক দিকে তাঁহাকে তুমি অবমাননা করিলে তিনি জীহ্বা বিস্তারে শত বিস্তারে শত সহস্র দিকে তোমাকে ধ্বংস করিবেন। এ সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নহে। ইচ্ছা হইলে তুমি আয়ুর্ব্বেদ বিধান ও মৃত্তিকা ব্যবহার বিধান দেখিতে পার।

পরি। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ত কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশ করে না। **Lt Col. J. J. Harper Nelson I. M. S.** বলিয়াছেন :—

Indigenous systems of medicine have no pretence whatever to be in the slightest degree scientific, but are founded on tradition and superstition. অর্থাৎ বৈদ্য-চিকিৎসার কোনও বৈজ্ঞানিক সূত্র নাই। কতকগুলি প্রচলিত কথার উপর ও কতক গুলি ভ্রমপূর্ণ কিম্বদন্তির উপর উহা প্রচলিত।

মু। সবই এখন পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মত চলিতেছে। বৈদ্যশাস্ত্র বেদের অংশ—আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ব বেদের অংশ। বেদের এক অংশ সত্য অন্য অংশ মিথ্যা একথা যাহারা বলেন তাঁহাদের বুদ্ধির দৈন্যতাই প্রকাশিত হয়। **Sir Havelock Coarles. Kt. I. M. S.** উত্তরে বলিয়াছেন :—

I am only repeating to you what the Aryan medical science preached two thousand years ago and reproducing to you only a small fragment of the lesson taught by Charaka (চরক) অর্থাৎ আমি যাহা বলিতেছি তাহা দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার আর্য্যজাতির ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি মাত্র। চরকের অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র আমি বলিতেছি। ডাক্তার **Clarke of Philadelphia** বলিয়াছেন :—**If the physicians of the present day would drop from the Pharmacopoeia all the modern drugs and chemicals and treat their patients according to the methods of Charaka there would be less work for underkers and fewer chronic invalids in the world**— অর্থাৎ তোমার পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র তুলিয়া দিয়া যদি চরকের মতে চিকিৎসা প্রচারিত হয় তবে পৃথিবীতে মৃত্যুর সংখ্যা এবং এত চিররুগ্ন চির-অকর্ম্মণ্য লোকের সংখ্যা কমিয়া যায়। ডাক্তার **A. F. R. Hoernle M. A. Ph. D. C. I. E.** ভারতের চিকিৎসাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

"Probably it will come as a surprise to many as it did to myself, to discover the amount of anatomical knowledge which is disclosed in the works of the earliest medical writers of India. Its extent and accuracy are surprising when we allow for their early age, probably the 6th century before Chirst and their peculiar methods of definition—আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। প্রাচীন ভারতের শারীরিক বিদ্যার আলোচনা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

যে জাতি দিব্য দৃষ্টি বলে কোন্ নাড়ী কোথায় থাকে তার সূক্ষ্ম মুখে কি শক্তি এই সকল লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিল—সে জাতি শরীরের চিকিৎসা জানিত না একথা বলাও যা আর একটি নিছক মিথ্যাবাদ প্রচারও তা। নিজের জিনিষের অনুসন্ধান চেষ্টা হারাইলে এইরূপ ফল অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

শ্রী। আমি বহু রোগীর সেবা করিয়াছি। বনবিষ্ণুপুরের শেষ রাজা রামকৃষ্ণ সিংহমল্ল দেব যখন মারা যান তখন বড় বড় ডাক্তার আনা হয়। বাঁকুড়া হইতে সিভিল সার্জ্জেন মহোদয়ও আগমন করেন। সকল ডাক্তারগণই আশা করেন রাজা হঠাৎ মারা যাবেন না। কিন্তু বৃদ্ধ বৈদ্য স্বর্গগত হলধর কবিরাজ মহাশয় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলেন যে রোগী সেই দিন (নির্দ্দিষ্ট সময়ে) মারা যাইবেন। সেই কবিরাজেরই বাক্য ফলে সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল। আর এক ৭৭ বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রোগীর কলিকাতায় চিকিৎসা হয়। সে ঘটনা ১৯২২ খৃঃ অব্দে হয়। সক্ষম আত্মীয়গণ কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার আনেন। সকলেরই মত—রোগী অনেক দিন ভুগিবে। তাঁহাকে গঙ্গা-যাত্রা করান উচিত নহে। কিন্তু একজন ক্ষুদ্র কবিরাজ কে আহ্বান করিয়া দেখান হয়। তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলেন যে আরও ৩।৪ ঘণ্টা পরে তিনি পুনরায় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মত প্রকাশ করিবেন। এ দিগে রোগী নিজে ডাক্তারের মত অগ্রাহ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—ডাক্তারগণ কিছুই বুঝেন নাই। তোমরা আমাকে গঙ্গাতীরে লইয়া চল আমি আজই মারা যাইব। সন্দিগ্ধ আত্মীয়গণ কবিরাজ মহাশয়ের মতামত জন্য অপেক্ষা করেন। যথা সময়ে কবিরাজ মহাশয় পুনরায় আগমন করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করেন। বলেন যে যে পরিমাণে দেহের ক্ষয় হইতেছে তাহাতে অনুমান হয় যে রোগী সেই দিন অপরাহ্নের মধ্যেই মারা যাবেন। এবার আত্মীয়গণ তাঁহাকে গঙ্গায় লইয়া যান এবং রোগী সেই অপরাহ্নেই মারা যান।

এরূপ অনেক ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কত রোগী ডাক্তারদের অবিবেচনায় মারা গেছেন, কতজনে আবার চিরতরে স্বাস্থ্য হারাইয়াছেন। এক একটা রোগীর বিষয় ভাবিলে আমার মন পাগল হইয়া উঠে। কি বিষম ভুলে যে রোগীর জীবন চলিয়া যায় তাহার বিষয় ভাবিলেও আর স্থির থাকিতে পারি না।

পরিমল, তুমি বুদ্ধি হারাইয়া ডাক্তারদের কথা বেদবাক্য বলিয়া সর্ব্বদা স্বীকার করিলে অধিকাংশ স্থলেই ভীষণ বিপদে পড়িবে। ধন ত যাবেই—প্রাণও যাবে। সাবধান!

পরি। উত্তম দ্রব্য দিয়া সাবান তৈরী করিয়া তাহা দ্বারা মাটী অপেক্ষা ত শতগুণে উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

মু। স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন দ্রব্য হইতে যে বিশুদ্ধ ও অবিকৃত শক্তি সহজে পাওয়া যায় তাহা কখনই secondary source হইতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যকৃত জিনিষ আপাততঃ যতই গুণশালী হউক্—তাহা প্রাকৃত জিনিষের সমান নহে। উন্মুক্ত বাতাস ও সূর্য্যালোক যত স্বাস্থ্য দেয় তত স্বাস্থ্য পাখার বাতাস বা বিদ্যুৎ আলোকে দেয় না। সদ্য গব্য দুগ্ধ যে শক্তি ও স্বাস্থ্য দেয়—তাহা condensed milkএ পাওয়া যায় না—অথচ পদার্থ হিসাবে উভয়েই এক। ধরিত্রী আমাদের ধরে আছেন বলিয়াই তিনি ধরিত্রী—আমরা তাঁর পীঠে চ'ড়ে আছি বলে নয়—তিনি আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন।

এখন আমরা অভ্যাস ও সংসর্গের বিষয় সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করি। অভ্যাস কাকে বলে তাহা ভাবিয়া দেখ।

শ্রী। যাহা আমাদের স্বভাব ও সহজ নয় এমন জিনিষ প্রায় নিজের মত যাহা দ্বারা হয় তাহাকেই অভ্যাস বলে। যেমন কেহ অভ্যাস বলে বিষ খাইয়া হজম করেন—কেহ বা অভ্যাসের ফলে পানদোষ ছাড়িতে পারেন না। অভ্যাসের প্রভাব অতি প্রবল। ইহা প্রায় স্বভাবে মিশিয়া যায়। অভ্যাসে সত্য স্বভাব প্রায় ডুবিয়া যায়। অভ্যাসে লোক কুম্ভক করিয়া প্রায় মৃত্যু জয় করে—প্রকৃতিকে উল্‌টে দেয়।

মু। তবে অভ্যাস সম্বন্ধে সাবধান হওয়া অতিশয় প্রয়োজনীয় ইহা স্বীকার্য্য। দ্বিজ জাতিদের এই অভ্যাসের জন্য বিশেষ বিধি-নিষেধ পিতামহগণ করিয়াছিলেন। তাহাই আচার ও তপস্যা নামে অভিহিত। অভ্যাসের বিষয় দৃষ্টি না রাখিলে শরীর-সমাজে অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে। এ বিষয়ে তোমরা ইংরাজী গ্রন্থে অনেক উপদেশ পড়িয়াছ। এখন সংসর্গের ক্ষমতা ভাব, সংসর্গ অতি প্রবল। ভাল সংসর্গে ভাল হয় মন্দ সংসর্গে মন্দ হয়। সাধুও চোরের কাছে থাকিয়া চোর হইয়া পড়ে। অসৎ সংসর্গকে কাল সর্পের ন্যায় দেখিবার উপদেশ শাস্ত্রে আছে এবং তোমাদের পাশ্চাত্য গুরুগণ ও এ বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। তাহার পুনরুক্তি করিয়া আর সময় নষ্ট করিব না।

এখন পূর্ব্বোক্ত কথা মনে কর। একটি সম্পূর্ণ মানব তৈরী করিতে হইলে তাহার কি কি দরকার ?

শ্রী। শরীরের ও মনের মধ্যে Equilibrium বা সাম্য-স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

(ক্রমশঃ)

দিগ্‌দর্শন

লোকসংখ্যা-সমস্যা

গত ২১এ মে তারিখের "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" সংবাদ পত্রের সম্পাদক ভয়ানক চিন্তান্বিত হইয়া ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দুর্ভাবনায় আকুলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। সাধারণ লোকে "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্"কে যে চক্ষে দেখে, সেটা যে খুব সমীচীন বুদ্ধি তাহা বলিতে পারি না। যখনই

"ষ্টেট্স্ম্যান" কোনও বিষয় লইয়া কোনও একটী গবেষণা করে, তখনই আমাদের ভয় হয় যে আবার বুঝি এই ভারতের কোনও উপকারক উপস্থিত। গত ত্রিশ বৎসর প্রত্যেক মাসেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আবার দেখা যায়, আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের অনেক বোলই এই "ষ্টেট্স্ম্যানে"র মন্তব্যের পুনরুক্তি। কাজেই ব্যাপারটাকে লইয়া আলোচনা করা উচিত বলিয়া মনে হয়। মন্তব্যটী ইহাই :—

"গত দশবৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা শতকরা দশজন হিসাবে বাড়িয়াছে (বাঙ্গলাদেশে শতকরা ৭জন বাড়িয়াছে) আদম সুমারির গণনায় এই সংবাদ পাওয়া যাওয়াতে অনেক লোক আকুল হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় তিন কোটি লোক নাকি বাড়িয়াছে। শস্য তৈয়ারির জমি কিছুই বাড়ে নাই, আর শস্যের বিঘা পিছু উৎপাদন পরিমাণও বাড়িয়াছে বলিয়া কোনও প্রমাণ নাই।

"ভারত দরিদ্র অস্বীকার করা যায় না। ভারতের রাজনীতিকেরা সরকারকেই তজ্জন্য দোষী করে। নব্য ম্যালথুসিয়ানদের মতে গভর্ণমেণ্টেরই দোষ, কেননা তাহারা শান্তিরক্ষা করিয়াছে, ডাক্তার-ডাক্তারখানা যোগাইয়াছে, হাঁসপাতাল করিয়া দিয়াছে, আরও পরমায়ু বৃদ্ধির সুবিধা করিয়া দিয়াছে। পুরাকালে যুদ্ধ ফেসাদ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষে লোকসংখ্যা হ্রাস করিত। ভারতের ভিতরে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হইয়াছে, উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রোগ কমিয়া গিয়াছে, জলসেচননালী ও রেলপথের দরুন দুর্ভিক্ষ নাই বলিলেই হয়। মোটের উপর একশত বৎসর পূর্ব্বে দেশের যে অবস্থা ছিল তদপেক্ষা অবস্থা এখন খুবই উন্নত। কাজেই লোকসংখ্যা খুবই বাড়িয়াছে।" "খুবই" এই কথার ইংরাজী প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—**alarmingly** অর্থাৎ ভীতিজনক ভাবে।

"ষ্টেট্স্ম্যান" সম্পাদকের মন্তব্য লিখিবার পূর্ব্বে "ইণ্ডিয়ান্ মেডিকেল গেজেট"-এ একজন ডাক্তার ঐ বিষয় লইয়া এক প্রবন্ধ বাহির করেন। উপরোক্ত সমস্ত মন্তব্যই সেই ডাক্তার লেখকের মতের প্রতিধ্বনি। ডাক্তার ও ষ্টেট্স্ম্যান সম্পাদক উভয়েই যেন ভারতের লোকবৃদ্ধির ভাবনায় একেবারে দিশাহারা। ডাক্তারটীর ভাবনারও আরও কিছু নমুনা দেওয়া ভাল।—

"লোকসংখ্যা আহার্য্যের অনুপাতে হারাহারি ভাবে না থাকিলে, প্রকৃতি স্বয়ং অনাহার ও রোগের সনাতন পন্থায় কাজ সারিবে। মহামারী হইলে কেবল যে শিশু ও বুড়াবুড়ী মরে তাহা নহে, বলবান স্বাস্থ্যবান পরিবার-প্রতিপালকও যে মারা পড়ে। সেই কারণে সদ্যোজাত শিশুর জীবন রক্ষার উপায় উদ্ভাবন চেষ্টা বাঞ্ছনীয় নহে। তাহাকে মানুষ করিবার খরচা তখনও ব্যয়িত হয় না, আর শিশুর যন্ত্রণাহীন মৃত্যু দীর্ঘ রোগী বয়স্কের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় নহে কি? কিন্তু এসব ভাবনা ভাবা যায় না। তবে লোকসংখ্যা কমাইবার উপায় কি? আয়র্ল্যাণ্ডে পুরুষ ৪০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ করে না। অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশে জন্মাবরোধ পন্থা কাজ করিতেছে। ফ্রান্সে ঐ পন্থা মতটা লইয়া গিয়াছে, ভারতে বহু বহু যুগ তাহার কোনও ভয় নাই। ভারতে সর্দ্দা-আইন এ বিষয়ে লোক চেতনা জাগাইতে পারে, মহীশূরে জন্মাবরোধ ব্যবস্থাগার একটা সময়োচিত কাজের কাজ, মাদ্রাজে "নব্যম্যালথুসিয়ান লীগ" বেশ শিক্ষিত লোক কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জন্মাবরোধই প্রকৃত উপায়।"

"ষ্টেট্স্ম্যান"ও এই পরামর্শ "তথাস্তু" বলিয়াছে। ডাক্তার লেখক বলেন এই কাজের জন্য একটী কমিশন বসান হউক। "ষ্টেট্স্ম্যান" বলে—উহাতে বড় আশা নাই। বারবার দেখা

যাইতেছে কমিশনে যাহা খরচ হয় তাহাতে কিছুই লাভ হয় না। ষ্টেটস্‌ম্যানের পরামর্শ নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে নবরাষ্ট্র এই সমস্যার সমাধান যেন সম্ভব করে।

জানিবার উপায় নাই যে "ইণ্ডিয়ান্ মেডিকেল গেজেটের" ডাক্তার লেখকটী "ষ্টেট্‌স্‌-ম্যানের" কোনও কিছু হন কিনা? কিন্তু "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" কেবলমাত্র সম্পাদকীয় মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া নিশ্চিত রহিল না। তাহার পরই কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ অর্থনীতিবিদ্ কয়াজীর মত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ ডাক্তার প্রমথনাথ বানার্জ্জীর মত ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিল।

কয়াজীর মত সংক্ষেপতঃ এই:—

১। চাষীর লোক পিছু জমির পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে।

২। কৃষির উন্নতি করিতে হইলে বহুদিন ও শত শত কোটি টাকা দরকার। পৃথিবীতে টাকাটার বড়ই অনটন।

৩। ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে ঘরে ঘরে যুদ্ধ ফেসাদ লাগিয়াছিল, দুর্ভিক্ষ ছিল, মহামারী ছিল, জাতিভেদ ও ধর্ম্মবিধি দ্বারা একান্নবর্ত্তী পরিবারে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ কিছু চিন্তার বিষয় ছিল না। ব্রিটিশ শাসন সেই সাম্যাবস্থা (equilibrium) ওলট পালট করিয়া দিয়াছে। কাজেই তৎকালীন লোকসংখ্যা দমনের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে এখনকার জন্মাবরোধ ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় হইয়াছে।

৪। ভদ্রলোকের সমস্যা লোকবৃদ্ধিসমস্যা অপেক্ষাও জটিলতর। ভদ্রলোকের জমির সম্পর্ক রাখা উচিত ছিল।

ডাঃ বানার্জ্জীর মত সংক্ষেপতঃ এই :—

১। জন্মাবরোধ শিক্ষিত সমাজের পক্ষে আত্মঘাতী নীতি।

২। লোক বৃদ্ধির সহিত খাদ্য যোগানের সমস্যা তত গুরুতর নহে—লোকসংখ্যার সহিত ধনের সম্পর্ক যতটা।

৩। কৃষি ও শ্রমশিল্পের উন্নতিই একমাত্র উপায়।

আমাদের বক্তব্য

১। এবারকার আদমসুমারির অঙ্ক বিশ্বাসযোগ্য নহে। একদল অতি বুদ্ধিমান লোক আদম সুমারিতে সাহায্য করা সরকারের সহিত সহযোগ করা বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। আর একদল লোক ঘোষণা করিল লোক সংখ্যার অনুপাতে ভোট সংখ্যা যখন নির্দ্ধারিত হইবার কথা হইতেছে, তখন যে যাহার সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বাড়াইয়া দাও। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি দেখান যাহাদের উদ্দেশ্য তাহারাই দুইদল লোককে দুইরকম কার্য্যে যদি লাগাইয়া থাকেন বলিয়া প্রকাশ পায়, তবে তাহার সঠিক খবর পাইলে আমরা বিস্মিত হইব না। কার্য্যতঃ প্রত্যেক সম্প্রদায় লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া লিখাইয়াছে। শতকরা দশজন লোক দশবৎসরে বর্দ্ধিত হওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক নহে, যে তজ্জন্য বিশেষ কোনও চিন্তার বিষয় আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

শতকরা একজনও বাড়ে নাই ; কিন্তু বলিবার জো নাই, আদম সুমারিতে একমাত্র ফল নির্দ্দেশ করিতেছে যে উপরোক্ত তিন পক্ষ পণ্ডিতরাই ঠিক। অর্থাৎ "ইণ্ডিয়ান্ ম্যাডিকেল গেজেট" ডাক্তার ঠিক্, "ষ্টেটস্‌ম্যানের" সম্পাদক ঠিক, "কয়াজী" ঠিক। ব্রিটিশ শান্তি, ব্রিটিশ রেলপথ, ব্রিটিশ জলসেচ, ব্রিটিশ স্বাস্থ্য-বিধান এ হেন দরিদ্র দেশেও শতকরা দশজন লোকবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। সর্দ্দা-আইন দেশের প্রতিনিধির সমর্থনে পাশ হওয়াতে পারিবারিক দুঃখ দুর্দ্দশার মৌলিক নিদান বাল্য-বিবাহ বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। আর লোক বৃদ্ধি প্রমাণিত হওয়াতে সামাজিক দুঃখ দুর্দ্দশার মৌলিক নিদান দেশের লোকের কামাশক্তি। অধিকন্তু দেশের কোনও প্রকার দারিদ্র্যের জন্য পরাধিকৃত রাষ্ট্রশক্তি দায়ী নহে।

২। যদিও ডাক্তার লেখকটী দয়া করিয়া স্বীকার করেন যে বৎসরে ৫০।৬০ লক্ষ লোক নিবার্য্য ব্যাধিতে মরে, আমাদের দেশের লোক যদি জন্মাবরোধ চালায় তবে চাই কি নিবার্য্য ব্যাধিতে যাহারা মরে তাহাদের ব্যাধি নিবারণের সুবিধা হইতে পারে। ১৯০২ সালের জুন মাসের ল্যান্সেট পত্রিকা (বিলাতী ডাক্তারদের প্রধান মুখপত্র) দুঃখ প্রকাশ করেন যে উনবিংশ শতাব্দীর দশ বৎসরে ইংরেজের ভারতীয় প্রজার ১ কোটি ৯০ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে মারা যায় ও ১০ লক্ষ লোক প্লেগে মারা যায়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব বার্মিংহামে বলেন যে ভারতেয় ৪ কোটি লোক খাদ্যাভাবে আছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে পাইওনিয়র পত্রিকা গয়া জেলায় দশ লক্ষ লোকের অভাবগ্রস্ত অবস্থা দেখিয়া লেখে—ভারতে প্রায় দশ কোটি লোক দারিদ্র্যের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত। এখন অতীতে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। জন্মাবরোধটা বৈজ্ঞানিক মতে পরীক্ষিত হইলে ইহার পূর্ব্বেই ভারতের জন্য ব্যবস্থা করা হইতে পারিত। এখন যখন এতগুলি লোক উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিয়াছে, তখন ঐ একই উপায়ে ভারতের অতীত আগত ও অনাগত দুঃখের অবসান করা উচিত।

৩। ডাক্তার লেখক ও সম্পাদক দুই জনেই "নব্য ম্যালথসিয়ান"দের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। বাঙ্গলার লোকে দুর্ভাগ্য বশতঃ অনেকেই হয়তঃ এখনও এই গভীর চিন্তাবান্ অভিনব তাত্ত্বিকের কথা জানেন না। এজন্য তাঁহাদের দিব্য দৃষ্টির জন্য কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। ম্যালথস নামে কেম্ব্রিজের পণ্ডিত ১৮২৪ সালে ৬৮ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হন। তিনিই প্রথম খতিয়ান কসিয়া দেখেন যে মানুষের জন্মের হার খাদ্যবৃদ্ধির হারের অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। উপায় ? তিনি বলেন লোকের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া দাও, উপনিবেশ সংস্থাপন কর আর পিতামাতাকেও সন্তান্ পালনের দায়িত্ব শিখাও। অর্থাৎ সংযমের দ্বারা সন্তান সংখ্যা নিয়মিত কর। ব্রিটেনিয়া বিশ্বকোষে লিখিত আছে—**Malthus is in no way responsible for the immoral theories popularly connected with his name. Malthus approved of only one method of solving the population question, namely, moral self-restraint. His single precept is—"Donot marry till you have a fair prospect of supporting a family."** ম্যালথসের নামে যে সকল দুর্নীতিপূর্ণ মতবাদ চলিতেছে তাহার জন্য ম্যালথস দায়ী নহেন। তাঁহার সমর্থিত একমাত্র পন্থা সংযম—"যতদিন না একটী পরিবারকে যথাসম্ভব প্রতিপালন করিবার শক্তি অর্জ্জন কর, ততদিন বিবাহ করিও না।" ইংলণ্ডের

লোকের তাঁহার উপদেশ কতটা মানিয়াছে তাহা ভাবিবার কোনও আবশ্যকতা আমাদের নাই। 'নব্য ম্যালথুসিয়ান' ঐ মত মানেন না। বিশ্বকোষের ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সংস্করণে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ক্লড গিলিবড লিখিয়াছেন "the views and methods advocated by the modern upholders of small families, who call themselves Neo-Malthucians would have received nothing but condemnation from Malthus"—"নব্য ম্যালথুসিয়ান" নামধারী ক্ষুদ্র পরিবারের সমর্থকরা যে মত বা উপায় (জন্মাবরোধকে অল্পই বলা হইয়াছে) প্রচার করেন, সে সমস্ত ম্যালথসের কাছে তিরস্কার ছাড়া আর কিছুই লাভ করিত না। ইংরাজী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ক্যান্টারবারীয় ধর্ম্মযাজকরা যে ল্যাম্বেথ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত প্রচার করেন, তাহাতেও গর্ভাবরোধ ব্যবহার স্বাস্থ্য-বৈজ্ঞানিকের পরামর্শ ব্যতীত ব্যবহার একেবারে অত্যন্ত গর্হিত বলা হইয়াছে। ইংরাজের নিজের দেশেও প্রকৃত সংপথের বার্ত্তা যতটুকু গতবৎসর পর্য্যন্ত জানিতে পারা গিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল। তবে ভারতের দুঃখের ভাবনায় যাহারা আকুল তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

৪। ভারতের দারিদ্র্য? তাহার ইতিহাসের পুনরুক্তি করিয়া নিজেদের পরপ্রত্যয়নেয়তার, পরনির্ভরতার, পরপদলেহনের, পরানুচিকীর্ষার ও পরকে আপন করার লজ্জাহীনতার অন্ধতামস আর ঘনাইয়া তুলিতে চাহি না। পচিশ বৎসর পূর্ব্বের বয়কট ও স্বদেশী আজও মানিত হইলে বাঙ্গলার ও ভারতের রূপ হয়ত অন্য রকম থাকিত। ভারতের অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিত বলিতেছেন —জমি লইয়া টানাটানি বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৮৫৭ সালে ভারতের নৌ-বহর ছিল ৩৪২৮৬, ১৮৯৯ সালে তাহা ২৩০২এ দাঁড়ায় ও পরবৎসরে তাহা ১৬৭৬এ ঠেকে। ২৭।২৮ বৎসর পরে তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য উপকূল বাণিজ্য রক্ষার আইন আসিলে, সেই আইন পণ্ড করিবার জন্য দেশে বিদেশে কি বিরাট আয়োজন! বাঙ্গালীর পয়সায় সাঁওতাল পরগণায় চারি পাঁচটী সহরের প্রতিষ্ঠা, আর সেই জেলায় হাজার বিঘা উর্ব্বরা জমিতে বাঙ্গালীর অধিকার জন্মিতে অসুবিধার জন্য রেগুলাশন। জমি লইয়া টানাটানি হওয়া বিচিত্র কি? গর্ভাবরোধ চালাইলে লোক কমিয়া গেলেই টানাটানিও কমিয়া যাইবে।

৫। যাহারা এই ভারতের লোকবৃদ্ধির ভাবনায় এ দেশে গর্ভাবরোধ প্রচলন করাইবার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তাহাদের আশ্বাস দিতেছি যে ভাবনা নাই, গর্ভাবরোধ প্রচারের আর আবশ্যকতা নাই। বিনা প্রচারেই উহা যথেষ্ট চলিয়াছে এবং চলিবে। ঠিক যে কারণে নারীর ভোটাধিকার চলিয়াছে, যে কারণে সর্দ্দা-আইন পাশ হইয়াছে, যে কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের প্রার্থনা জাগিয়াছে, সেই কারণেই গর্ভাবরোধ অবশ্যম্ভাবী। নারী-প্রগতির কান টানিলে মাথা আসিবেই আসিবে। ইহা আমাদের কাহারও দূরদৃষ্টিলব্ধ জ্ঞান নহে। নারী-প্রগতির পাণ্ডা ডোরা রাসেল, ব্রিকন্ট, সামুয়েল স্মলহৌসেন প্রভৃতির প্রচারিত মত। ইহার একটা বাদ দিয়া অপরটীকে আনা চলে না, চলিতে পারে না, চলিবার নয়। যাহারা সে স্বপ্ন দেখে তাহারা বাতুল কিম্বা একেবারে আকাট মূর্খ। যে race suicide বা জাতির আত্মহত্যার কথা ডাক্তার প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্থাপন করিয়াছেন ঐ কথাটাই বিখ্যাত মার্কিনী-নেতা সভাপতি রুজভেল্ট প্রচলন করেন—যুক্তরাষ্ট্রের সভ্যতম প্রদেশগুলির "সখের" শ্রেণীর সন্তানাভাব দেখিয়া প্রচার

করেন। ডোরা রাসেলের স্বামী বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও ইংলণ্ডের "সপের" শ্রেণীয় সন্তানাভাব দেখিয়া ঐ আশঙ্কা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের "সাহেব কৃষ্ণ সাহেব বিষ্ণু বোম ভোলানাথ বিলিতী" কিছুতেই ঘুচিতেছে না। কাজেই আদর্শের অনুকরণ অবশ্যম্ভাবী। মারী ষ্টোপেস্ বাঁচিয়া থাকুন, শীঘ্রই এদেশের সভ্যাদের নিকট হইতেও গর্ভনিস্তারিণী কবচের দরখাস্ত ঠিক তথাকারই মতন হাজারে হাজারে তাঁহারই নিকট পৌছিবে। সুতরাং প্রচারের আর আবশ্যকতা নাই।

৮। এই রকমই পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বার হইয়াছে। এই একই কারণে বেবিলন, থীব্স্, ক্রীট, আলেক্জান্দ্রিয়া, রোম, কাথেজ, বাইজান্তিয়ম্, উজ্জয়িনী, কনৌজ, পাটলীপুত্র, বোগদাদ শ্মশান হইয়াছে। আজ দুইটা বা চারিটা কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, আর না হয় দিল্লী বা এলাহাবাদ সেই পথে না যাইবে কেন? সমুদয় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ইউরোপের একজন প্রধানতম মনীষীর মতে "সভ্যতার বন্ধ্যাত্ব" রোগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অভিব্যক্তি-বাদের সত্যও যদি মানা যায় তবে দেখা যায় যে মানুষের চরম পরিণতি এই আত্মঘাতী নীতি। শীকারী-মানুষের সভ্যতার স্তরে প্রথম ধাপ হইল কৃষি। তখন মানুষ প্রথমে প্রকৃতির নিকট হইতে রূপান্তরে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তখন প্রকৃতিকে মাতৃরূপে দেখিল তাই নিজের সন্ততি ও বিস্তৃতি মাকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে গ্রাম ছাড়িয়া সহরের বুদ্ধিজীবী হইল, সে ইতিহাস রচিল; কিন্তু সে ইতিহাস সহরের কীর্ত্তি নিচয়, বৃত্তি হইল বুদ্ধির খেলার কিন্তু সে বুদ্ধি গ্রামকে গ্রাম্য বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিল, নাটক লিখিল—তাহা নাগর নাগরীর প্রেমবিরহের ঘাতপ্রতিঘাতে, উপন্যাসে আকৃষ্ট হইল—তাহা মানব মানবীর হৃদয় লইয়া বুদ্ধির খেলায়, টাকা চিনিল—যাহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের একমাত্র অবলম্বন ও আত্মেতর সকলকে হেয় করিবার অমোঘ অস্ত্র, আর সর্ব্বোপরি গড়িল রাষ্ট্র—যাহা পুরুষের বর্ত্তমানের ক্রীড়াক্ষেত্র ও প্রেরণা শক্তির আধার কিন্তু যাহা মানবতার চিরন্তন শাশ্বত সত্যকে ভুলাইয়া দেয় যে নারী মাতৃরূপে প্রকৃত ইতিহাস, পুরুষ রক্ষী ও যোদ্ধারূপে সেই ইতিহাস গড়ে। সেই মাতৃত্ব হইল সর্ব্বশক্তির সমন্বয়, সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আলয়, সর্ব্ব আর্ত্তের ত্রাণ। তখন তাহার পরিবর্ত্তে দেখা দেয় নাগরী (ইউরোপ ইহাকে বলে ইবসেনী নারী)। মার্কিনে এই নারী একটী প্রমোদ-মেলা হারাইতে চায় না, ফ্রান্সে এই নারী প্রেমাস্পদের একটী নিশিও বিফল করিতে দেয় না, ইংলণ্ডে এই নারী ছয়টী স্বামীকেও অসম্ভব বোধ করে না; প্রাচীন ভারতে এই নারীর সৌন্দর্য্য-মর্য্যাদায় বৈশালী নগরীতে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। "কে না জানে যে, বিশ্বনারীর বহুপুত্রের পিতা একজন যাত্রার সং"? এই অবস্থায় সকল সভ্যতায়ই লোকসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়—তাহা কেহ রোধ করিতে পারে নাই, পারে না, পারিবে না। সম্রাট অগষ্টস রোমে পারেন নাই, খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে চীনে সম্ভব হয় নাই, সম্রাট অশোক স্তম্ভে বিধিনির্দ্দেশ করিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই, রুজভেল্ট "জাতিঘাতী" চীৎকার করিয়া কিছুই করিতে পারিতেছেন না। ইহাই বাঞ্ছনীয়। কেন না, লক্ষ্মী-নারায়ণের সংসারে নারীত্বের ও মাতৃত্বের এত বড় অপমান যে নরপশুরা ভোগাড়ম্বরের দম্ভে মেধাসাহায্যে করিতে পারে, তাহারা বিষ্ণুশক্তির মর্য্যাদা নষ্ট করে, তাহারা ভুলিয়া যায় "ন মেধয়া, ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ" কাজেই তাহাদের ধ্বংস বাঞ্ছনীয়। তাহারা

আমাদের দেশেরই হউক বা অন্য দেশেরই হউক তাহারা মানবের শত্রু, দেবতার শত্রু, বিশ্বত্রাস অসুর। যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ অপেক্ষা এই আত্মঘাতী-নীতি প্রকৃত মানব কল্যানের জন্য অধিকতর বাঞ্ছনীয়। ইতিহাসে তাহা বাড়ম্বার ঘটিয়াছে ও আবার ঘটিবে। তাই হিন্দু লোকবৃদ্ধি লইয়া ভাবিত হয় না।—শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ।

সতীত্ব

(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বনে।)

(সমাপ্ত)

সদানন্দঠাকুর এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে সতীনাথের সহিত মাধুরীর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। প্রায়ই মাধুরীকে সদানন্দ সঙ্গে রাখেন। সতীনাথ কোন ক্রমেই মাধুরীকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পান না। এইরূপে দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। সদানন্দের ইচ্ছানুসারে গৌরীনাথের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে প্রমথনাথ কাশীধামের সমস্ত বিখ্যাত তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিতে লাগিলেন। গৌরীনাথ তীর্থ-দর্শনে দক্ষতা লাভ করায় প্রমথনাথের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। আজ গৌরীনাথ ও প্রমথনাথ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তীর্থস্থান দর্শনে বহির্গত হইবার সময় সতীনাথকে সঙ্গে লইলেন। প্রথমে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিলেন। মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে গৌরীনাথের নিকট শুনিলেন। তারপর দশাশ্বমেধের নিকট রাজা মানসিংহ প্রতিষ্ঠিত অবজারবেটারী—এখন নষ্ট-প্রায়। কিছুদিন পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট উহার পুনঃ সংস্কারকল্প প্রকাশ করিলে কাশীর পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী উহা মাটীর যন্ত্রের সাহায্যে সংস্কার করিয়া দিতে প্রস্তুত হয়েন। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ভারতের দুর্ভাগ্য। পরে তাঁহারা দুর্গাবাড়ী ও ভাস্করানন্দের আশ্রম দর্শন করিলেন। গৌরীনাথ বলিলেন—ভাস্করানন্দ স্বামী উলঙ্গ থাকিতেন ও শাকসিদ্ধ খাইয়া জীবন যাপন করিতেন। তৈলঙ্গস্বামীর মূর্ত্তি দেখাইয়া গৌরীনাথ বলিলেন—ইনি হঠযোগসিদ্ধ সাধু ছিলেন। ইহাদের জীবন চরিত আছে। তৈলঙ্গ স্বামী জলে ভাসিতেন এবং অনেক অলৌকিক শক্তি দেখাইতে পারিতেন। প্রকাশানন্দের স্থান দেখাইয়া বলিলেন এইখানে ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়া সহস্র সন্ন্যাসীর প্রভু অদ্বিতীয় পণ্ডিত প্রকাশানন্দ তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। যেখানে দয়ানন্দ ও তারাচরণের তর্ক হয় সেই স্থানে আসিয়া তারাচরণের অতুল্যমেধা ও বুদ্ধির কথা সতীনাথ ও প্রমথনাথকে শুনাইয়া দেন। তারপর রাখালদাস ন্যায়রত্নের (তারাচরণের জ্যেষ্ঠের) বাসস্থানের নিকট দিয়া যাইবার সময় বলিলেন যে—ন্যায়রত্ন বিদ্যার জাহাজ ছিলেন—তিনি শেষ বয়সে শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এইরূপে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া গৌরীনাথ ও অপর দুইজন বাসায় ফিরিবার সময় ঠিক করিলেন যে সন্ধ্যার সময় বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার আরতি দেখিবেন।

যথা সময়ে তিন জনে বিশ্বনাথের আরতি দর্শনার্থ মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। আরতি আরম্ভ হইল—মন্দির নিজ গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়া—"ব্যোম্" "ব্যোম" শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। কোন অজানিত দেশের সংবাদ যেন ব্যোম্ ধ্বনি জীবের অন্তঃকরণে উদয় করিয়া দিতে লাগিল। যেন "ব্যোম্" শব্দ আর কোনও বিশেষ মধুর শব্দের সহিত যোজিত—অথচ তাহা যেন ধরা যায় না। মন্দিরের ভিতর যখন মানবগণ এইরূপে নিবিষ্টচিত্ত, তখন হঠাৎ একটা হৈ হৈ শব্দ বাহির হইতে কাণে পৌঁছিল। সকলেই চকিত হইয়া বাহিরের দিকে এগিয়ে দেখিতে আসিলেন। একটি নারী ছুটিয়া আসিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতে লাগিল যে গুণ্ডারা একটি যুবতী নারীকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। এক পাগলিনী ত্রিশূল হস্তে গুণ্ডাদের কর্ত্তাকে জখম করিয়া ফেলিয়াছে বটে—কিন্তু অনেকগুলি গুণ্ডা থাকায় যুবতীকে অন্য গুণ্ডারা ধরিয়া ফেলিয়াছে। দু তিন জন সন্ন্যাসিনীও মারা পড়িয়াছে।

এই কথা শুনিয়া গৌরীনাথ উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন এবং নিমেষ মধ্যে তীরবেগে ঘটনা স্থলাভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রমথনাথ ও সতীনাথ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন বটে—কিন্তু গৌরীনাথের সঙ্গ রাখিতে পারিলেন না। গৌরীনাথ ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখেন এক পাগলিনী ত্রিশূল হস্তে গুণ্ডাদের কবল হইতে যুবতীকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু গুণ্ডারা সংখ্যায় বেশী থাকায় পারিয়া উঠিতেছেন না। এক গুণ্ডা পাগলিনীকে হত্যা করিবার জন্য ছোরা তুলিয়াছে এমন সময় গৌরীনাথ লম্ফ দিয়া তার ঘাড়ে পড়িয়া তার ছোরা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ভূতলে পতিত করিলেন। এবং ছোড়ার সাহায্যে যে গুণ্ডারা যুবতী নারীকে ধরিয়া ছিল তাদের আক্রমণ করিলেন। বহু চেষ্টার পর গুণ্ডারা ভীষণ ভাবে আহত হইয়া রমণীকে ত্যাগ করিল। কিন্তু গৌরীনাথও আহত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ইত্যবসরে প্রমথনাথ ও সতীনাথ তথায় আসিয়া পড়িলেন। গৌরীনাথ ও স্ত্রীলোকটি উভয়েই তখন মূর্চ্ছিত। দুইজনে সমবেত জনমণ্ডলীর সাহায্যে মূর্চ্ছিত পুরুষ ও নারীকে বহন করিয়া আশ্রমে ফিরিলেন। কর্ত্তা-গুণ্ডা সেইখানেই পঞ্চত্ব পাইয়াছিল—অন্য গুণ্ডারা পলায়ন করিল কিন্তু পাগলিনী তাদের পিছনে ছুটিল। অনেক সন্ন্যাসিনী তাকে বহুকষ্টে ফিরাইয়া আনিল। পরে জানা গেল গুণ্ডারা কাশী ছাড়িয়া পলাইতেছে।

আশ্রমে আনয়ন করিয়া দুই পৃথক ঘরে দুই আহত জীবের সেবার ব্যবস্থা সদানন্দ করিয়া দিলেন। প্রমথনাথ গৌরীনাথের এবং সতীনাথ রমণীর সেবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। সন্ন্যাসিনীগণ ও পাগলিনী অনুসন্ধানের ফলে সেই আশ্রমে আসিয়া যোগ দিল। তাহারাও পালা করিয়া সেবার সাহায্য করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা কেহই সদানন্দের আশ্রমে বাস করিত না।

ক্রমে ক্রমে গৌরনাথের চেতনা ফিরিয়া আসিল। তিনি শুনিলেন যে, যে রমণীকে উদ্ধার করা হইয়াছে, তিনি পাশের ঘরে আছেন। জীবনের কোন ক্ষতি হয় নাই, এখন বেশ ভাল আছেন। গৌরীনাথের বড় ইচ্ছা তাহাকে একবার দেখিবেন—কিন্তু দুর্ব্বলতার জন্য সদানন্দের আজ্ঞায় তার শয্যাত্যাগ নিষিদ্ধ। মাধুরী প্রায় সেই রমণীর কাছে থাকেন। এক দিন একান্তে যখন কেবল মাধুরী ও সেই রমণী ঘরে আছেন সেই সময় দুইজনে কিছু আলাপ হইল।

মাধুরী। আপনি খুব সুন্দরী দেখছি এবং আকার প্রকার দেখে মনে হয় কোন ভদ্র ঘরের লোক, তবে একাকিনী কেন ?

রমণী। আমার অদৃষ্ট। আমার কথা শুনিলে তোমার কষ্ট হইবে। আমি দস্যুহস্তে প্রায়ই এইরূপ অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইতেছি। কেবল ঈশ্বর কৃপায় এই সব মহাবিপদ হইতে রক্ষা পাইতেছি। এখন আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।

মাধুরী। এই সন্ন্যাসিনীদের দলে কি করে আসিলেন ?

রমণী। শুনিবে—এই বলিয়া পূর্ব্ব ঘটনা সমস্তই সংক্ষেপে মাধুরীকে শুনাইয়া দিলেন।

মাধুরী। আপনার নাম ?

রমণী। ষোড়শী।

মাধুরী গৌরীনাথের ইতিহাস পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল এখন সে বুঝিল এই রমণীই গৌরীনাথের অপহৃতা পত্নী। কিন্তু কিছু না বলিয়া অন্য কথা পাড়িল। এমন সময় সদানন্দ আসিয়া মাধুরীকে ডাকিয়া লইলেন। পাগলিনী রমণীর ঘরে প্রবেশ করিলেন।

পাগলিনী কিরূপে গুণ্ডাদের মারা হইয়াছে—কিরূপে গৌরীনাথ রমণীকে উদ্ধার করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিলেন। ষোড়শী শুনিয়া কৃতজ্ঞতায় কাঁদিয়া ফেলিল। পাগলিনী বলিল—সেই যুবকও এই আশ্রমে এখন শয্যাশায়ী—তবে শীঘ্রই আরোগ্য হইবেন।

ষোড়শী। তিনি দেখিতে কিরূপ ? তাঁর নাম কি ?

পাগ। নারীসঙ্ঘের রমণীদের সে সংবাদে প্রয়োজন নাই।

ষোড়শী। আপনাদের না থাকিতে পারে—কিন্তু আমার আছে ?

পাগ। তুমি কি এখনও তোমার পতির আশা কর নাকি ?

ষোড়। নিশ্চয়ই। তিনি জীবিত বা মৃত আমার তাতে যায় আসে না। জীবিত থাকেন ভালই। যুবকের নাম যেন শুনিলাম গৌরীনাথ। আমার প্রভুর নামও তাই। সেই জন্যই একথা জানিবার ইচ্ছা।

পাগ। যদি ঐ যুবক সেই তোমার পতি গৌরীনাথই হয়েন তবে তুমি কি করিবে ?

ষোড়শী। কি করিব তাহা জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন। পতি-পত্নীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

পাগ। সে পাতিব্রত্য আর নাই ! তা হলে আমাদের নারীসঙ্ঘের প্রয়োজন হইত না।

ষোড়। পতিব্রতা না থাকিলে সংসার বিলয় প্রাপ্ত হইত। সংসার আছে—কাজেই পতিব্রতাও আছে।

পাগ। আমাদের মধ্যে সকলেই পতিব্রতা কিন্তু পতিগণ আমাদের সে ব্রত গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁদের অবহেলাতেই আমাদের এত কঠিনহৃদয় হইতে হইয়াছে।

ষোড়। সকলেই সমান নহে। আমি আমার পতির হৃদয়ের ধন ছিলাম। তিনি পরস্ত্রীর মুখ দেখিতেন না।

পাগ। শুনেও সুখী হলেম। তবে তিনি তোমাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই কেন ?

ষোড়। তাঁহার ক্ষমতার অতীত ছিল। তিনি আমাকে হারাইয়া পাগলের মত গৃহত্যাগী।

পাগ। হয়ত আবার বিবাহ করিয়া তিনি সুখী হইয়াছেন।

ষোড়। ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া বলিল—ঐ কথা বলিও না। আমার পতি-ব্রত তাঁরও পত্নী-ব্রত। তিনি কখনই আমার স্থানে অন্য রমণীর চিত্র গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাতে হিন্দু পতি-পত্নীর জীবনের গুরুত্ব তিনি বেশ জানেন। হিন্দুর চক্ষে বিধবার বিবাহ যেমন অসঙ্গত ও অমার্জ্জনীয় বিপত্নীকের বিবাহও সেইরূপ। রাম স্বর্ণ-সীতা গঠন করিয়া অশ্বমেধ সমাধা করেন—অনুরুদ্ধ হইয়াও দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেন নাই। পতি-পত্নীর সম্বন্ধ কেবল রক্তমাংসের সম্বন্ধ নহে।

পাগ। তুমি তবে ত পরম সৌভাগ্যবতী দেখছি!

ষোড়। নিশ্চয়ই। আমার হৃদয় দুয়ারে এখন শক্ত কপাট পড়িয়াছে—ভিতরে ধূপ ধূনার আরতি চলিতেছে। সেখানের দেবতা—সেই পতি।

পাগ। ভাল—দেখে নেওয়া যাক্ হিন্দুত্বের কি প্রভাব।

এমন সময় প্রমথনাথ পাগলিনীকে ডাকিলেন। সেও বাহিরে চলিয়া গেল। প্রমথনাথ বলিলেন, সদানন্দঠাকুরের আদেশ পাগলিনী ও তার সঙ্গিনীগণ এখন সেস্থান ত্যাগ করিয়া নিজেদের আশ্রমে গমন করুন এবং আর না ডাকিলে যেন না আসেন। পাগলিনী ও অন্য রমণীগণ চলিয়া গেলেন।

একাদশ অধ্যায়

কবিগণ বাস্তব ঘটনা—উপস্থিত বা অতীত—লইয়া কাব্য লেখেন। অথবা অলীক কল্পনার সাহায্যে মধুরতার সৃষ্টি করেন। কিন্তু মহাকবিগণ ভবিষ্যৎ বাস্তব ঘটনা যাহা সূক্ষ্ম চৈতন্য-জগতে বর্ত্তমান তাহা লইয়া তাঁহাদের মহাকাব্য লিখিয়া থাকেন। কবি ও মহাকবিতে এই পার্থক্য। যিনি অতীত ও উপস্থিত ঘটনাবলীর সমন্বয়ে বিরাট মহাভারত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তিনি কবি—আর যিনি চৈতন্য রাজ্যে বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ঘটনা অবলম্বনে অপূর্ব্ব রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তিনি কেবল 'আদিকবি' নহেন মহাকবিও বটেন। কবি সীমাবদ্ধ ও অনিত্য বাস্তব ঘটনার সমাবেশে লোক চরিত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন—মহাকবি অনন্ত ও নিত্য চৈতন্য রাজ্যের সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া লোক চরিত্রের উপর প্রভাব রাখিয়া যান। একের চরিত্রাঙ্কন অপেক্ষাকৃত জটিল কাজেই সাধারণ লোক-চরিত্রের উপর ক্ষণস্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সামর্থ্যবান হয় মাত্র; অন্যের চিত্রাঙ্কন জলের মত সরল এবং সর্ব্বসাধারণ লোক চরিত্রের উপর চিরস্থায়ী ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। রামায়ণ যত দিন হইতে রচিত হইয়াছে তত দিন হইতে উহা পাঠ করিয়া যতলোক কাঁদিয়াছে ও এখনও কাঁদিয়া থাকে তাহাদের নয়ন জল এক স্থানে ধরিলে একটা সাগর জন্মিয়া যাইত। পরন্তু মহাভারতের প্রভাব সেরূপ হয় নাই। ইদানীন্তন কালে বাঙ্গলার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কেবল 'সাহিত্য সম্রাট' ছিলেন না, তিনি মহাকবিও ছিলেন। তাঁহার আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর ও সীতারাম প্রভৃতি গ্রন্থ মহাকাব্য। এই সকল গ্রন্থের চরিত্র-লিখন চৈতন্য-জগত হইতে আনীত। এক আনন্দ মঠের প্রভাবে আজ ভারত মাতিয়া উঠিয়াছে, অন্যান্য গ্রন্থের প্রভাব এখনও তেমন দেখা যায় না। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে তাহাদের অঙ্কিত চিত্রগুলি চিরকাল কাজ করিবে।

আমরা এই ঘটনা বিবৃতির উপসংহার কালে বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর গ্রন্থের তত্ত্বান্বেষণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া পারিতেছি না। শৈবালিনী কেন পাগল—প্রতাপ কেন পাগল তাহার নিগূঢ় তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস এই ঘটনাবলীতে পাই। সতীত্বে ও পাতিব্রত্যে "প্রভেদ বিস্তর" তাহা বুঝিবার জন্যই এই ক্ষুদ্র চেষ্টা। বঙ্কিমের প্রতাপ যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে কেন রূপসীর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন নাই এবং তজ্জন্য তাঁহার বড় অপরাধ হইয়াছিল ইত্যাদি রকমের আলোচনা করিয়া তরুণ ও তরুণী যুগলকে ভুলাইবার প্রচেষ্টা এখানে নাই। চেতন্য রাজ্যের সনাতন চিত্র দর্শন করিবার ক্ষমতা সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, কাজেই আজকালের সাহিত্যের অধিকাংশ স্থলেই কিছু না কিছু একটা বিশেষ জানোয়ারের গাত্র-গন্ধ পাওয়া যায়। একদিন ঋষিতুল্য মানবগণ "কবি কালিদাস" বলিয়াছিলেন আজ আমরা রামা শ্যামাকেও কবি বলিয়া উচ্চরবে চীৎকার করি। এক সময় এক বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন "পুরাণ সন্দেশ কিছু মিশাইয়া ক্ষীর। বদন ময়রা করে সন্দেশ বাহির।" আমরা পচা সন্দেশ খাইয়াই কবিত্ব রসের ঢেকুর তুলিয়া বেড়াই। বিশুদ্ধ সন্দেশ দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে।

এখন গৌরীনাথ বেশ সুস্থ হইয়াছেন। তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ষোড়শীকে একবার দেখেন। কিন্তু সদানন্দ ভাবিতেছেন, এখনও তার সময় হয় নাই। এক স্থানে থাকিয়া কি করে যে গৌরীনাথের এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা দমন করা যায় তাহা ঠিক করিতে পারিতেছেন না। এক দিকে মাধুরীকে সতীনাথের চক্ষের অন্তরালে রক্ষা করা অন্য দিকে আবার ষোড়শীকে গৌরীনাথের দর্শন পথে হঠাৎ আসিতে না দেওয়া—দুইই কঠিন হইয়া পড়িতেছে।

প্রমথনাথ। গৌরীনাথ সন্দেহ করে—ষোড়শীই তাহার অপহৃতা পত্নী। তার মানসিক উত্তেজনা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি প্রায় দুর্দ্দমনীয় হইতেছে। সে পাগল হইয়া যাইবে।

সদা। উহা স্বাভাবিক কিন্তু—আর একটু বিলম্ব না করিলে সমস্তই পণ্ড হইবে।

প্রম। আমি তা কতকটা বুঝি। কিন্তু আমার মনে হয় আর বেশী দিন এরূপ ভাবে রাখা যাবে না।

সদা। এখনও অনেক বাকি। তবে ঈশ্বর ইচ্ছায় দেখ কি হয়।

এমন সময় সতীনাথ আসিয়া বলিলেন, গৌরীনাথের ভীষণ জ্বর আসিয়াছে তিনি যাতনায় ছট্‌ফট্ করিয়া চীৎকার করিতেছেন। সদানন্দ ও প্রমথনাথ সতীনাথের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ গৌরীনাথের ঘরে গমন করিলেন।

সদা। কি যাতনা হইতেছ বাবা।

গৌরী। ঐ কি দেখি—নরমালা-বিভূষণা কালী—কি ভীষণ! কি ভয়ঙ্কর! ও কি দেখি—ব্যাঘ্রচর্ম্মে বিভূষিতা তারা! ও আবার কি! ষোড়শী—ঐ আমার ষোড়শী!—ধরিব—ধরিব! ওকি—ভুবনেশ্বরী? চলে যাও—চলে যাও! ওকি ভৈরবী? চলে যাও! আবার কি ছিন্নমস্তা? কি ভীষণ! প্রাণ যায়—অসম্ভব সম্ভব নাকি! ওকি সর্ব্বনাশী ধূমাবতী! চলে যাও—ছেড়ে দাও! ওকি বগলা? মেরো না! ওকি মাতঙ্গী? কি মূর্ত্তি—কাল কেন? ওকি কমলা—মা—এবার কি জ্বালাতে সহস্র কলস জল ঢালিতে এলি? আয় তবে আয়—আর জ্বলে মরিব না!

সদা। দেখছি—পাগল হয়ে গেল নাকি! কি হচ্ছে বল দেখি, গৌরীনাথ!

গৌ। আমার শরীর জলে গেল—কেবল জ্বালা! কেবল জ্বালা! ভীষণ বিভীষিকা চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করছে। মনে হচ্ছে—ষোড়শীকে এনে দিলে আমি বাঁচব—নতুবা এ জ্বালা আমাকে ধ্বংস করবে।

সদা। কি দেখিতেছ।

গৌরী। বেশ বুঝিতেছি সতীর দক্ষযজ্ঞে গমনকালে কেন দশমহাবিদ্যার প্রকট—কেন সতীর দেহত্যাগ। আর দেখিতে চাই না—ষোড়শীকে এনে দিন।

সদা। তা হলে কি জ্বালা যাবে?

গৌরী। নিশ্চয়—এ জ্বালার শেষ তাহার সহিত মিলনে।

সতীনাথ। আমার পূর্ব্ব-দৃষ্ট স্বপ্নের এক অংশের উত্তর পাইলাম বলে বোধ হচ্ছে, প্রভো! আর এক অংশের উত্তর পরে পাবো। এখন আর বিলম্ব না করিয়া ষোড়শীকে এনে গৌরীনা·কে দেখ্‌তে দিন।

সদা। তোমার কথাই রক্ষিত হউক। প্রমথ! তুমি ষোড়শীকে এই ঘরে লইয়া আইস।

ধীরে ধীরে সেই অনিন্দ্য সুন্দরী ষোড়শী গৌরীনাথের ঘরে প্রবেশ করিলেন—গৌরীনাথ অনিমেষ নয়নে তাঁহার দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি! কথা নাই জড়বৎ অবস্থিত!

সদানন্দ বলিতে লাগিলেন, এই তোমার অপহৃতা পত্নী ষোড়শী—ইনি অগ্নির ন্যায় পবিত্র আছেন।

গৌরী। কি সুন্দর—ইনিই কি আমাকে এত বিভীসিকা দেখাইতেছিলেন। আর্য্যে! আমি ত তোমাকে অবহেলা করি নাই। ঘটনাচক্রে তোমাকে হারাইয়া আমি বিশ্বপথের সন্ন্যাসী—ভিখারী—তোমার চিন্তায় ভোলানাথ। আমাকে বৃথা কেন ভয় দেখাইতেছ! তুমি ছাড়া যে আমার অস্তিত্ব নাই।

ইতাবসরে সদানন্দের ইঙ্গিতে প্রমথনাথ ও সতীনাথ ঘর ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। ষোড়শীর মুখে একটীও বাক্যস্ফুট হইল না—গৌরীনাথের কণ্ঠে গিয়া রত্নহারের ন্যায় ঝুলিয়া পড়িলেন: সদানন্দ তৎপর হইয়া তাহাকে ধরিতে গিয়া দেখেন—রমণী মূর্চ্ছিতা! সদানন্দের চক্ষে কেহ কখন অশ্রু দেখেন নাই, আজ তাঁহার দুই চক্ষুতে জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া প্রমথ ও সতীনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—এসে দেখে নাও সতীর দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ কত সত্য! দশমহাবিদ্যা কত সত্য!

হায়! হায়! কোথায় সে সতীত্ব! আর কলম চলে না।

প্রমথ ও সতীনাথ দেখিলেন গৌরীনাথ ও ষোড়শীর জীবন দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সতীত্বের রহস্য প্রকট করিয়া জীবকে শিখাইয়া দিয়া গেল—সতী কে? এবং পতিব্রতার সহিত তার কত প্রভেদ। যাহাদের সতীচ্ছদ অক্ষুন্ন তারাই সতীত্বের কথা উচ্চারণ করিবার অধিকারী, অন্যে নহে। কুমারীপূজার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত না হইলে "আছে একমাত্র সতী বিশ্বচরাচরে" এর ভাব হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব। নিমিষে সতীনাথআবিষ্ট হইয়া পড়িলেন—

তাহার সম্মুখ হইতে পরদার পর পরদার নিবিড় আবরণ সরিয়া গেল। দেখিলেন—বুঝিলেন—বা শুনিলেন—কে তাহাকে বলিতেছেন

—সতীনাথ, তোমার পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তুমি দশমহাবিদ্যা ও দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ বিশ্বাস কর নাই। সেই জন্য তোমার জ্ঞান প্রকট করিবার উদ্দেশ্যে আমরা উভয়ে পৃথিবীতে মানব দেহ ধারণ করি। হিন্দু দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হইয়া কিরূপে সেই মহা সত্য প্রকাশ করে তাহাই তোমাকে দেখান হইল। আবার আমরা হর-গৌরী ভাব তোমাকে দেখাইব তাহার আয়োজন পূর্ব্বেই করিয়াছি। শীঘ্রই তোমার যে অপর ভ্রম তাহাও অপসারিত হইবে। শাস্ত্র-বাক্য সব সত্য। তোমার বুঝিবার অধিকার হয় নাই বলিয়া শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিও না। সতী ও সতীপতি অনন্তকালস্থায়ী চির-দাম্পত্যে আবদ্ধ—তথায় বিচ্ছেদ নাই। তাহাই শিবলিঙ্গ—তাহাই পার্ব্বতীপরমেশ্বর—তাহাই রামসীতা—তাহাই শ্রীরাধাকৃষ্ণ—তাহাই কালী ও মহাকাল। রতি-কামের পৃষ্ঠে নৃত্য করিয়া আমরাই ছিন্নমস্তা—রতি ও কামের অধিকারে থাকিলে ইহা অবোধ্য। ইহা শুদ্ধ চৈতন্য রাজ্যের অনন্ত লীলাখেলা। পঞ্চভূত-প্রধান দেহ লইয়া কেবল পাণ্ডিত্যের সাহায্যে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। আনুষ্ঠানিক ভাবে ধর্ম্ম-রত হইলে তবে আমাদের কৃপায় ইহা প্রস্ফুট হয়। সৎসঙ্গ কর। সদানন্দ ব্রাহ্মণ—তার কাতর প্রার্থনাতেই তোমাকে ইহা দেখান হইল। ব্রাহ্মণ না হলে এতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। ব্রাহ্মণ হও। অপর প্রশ্নের উত্তর পাইবে।

সতীনাথের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া বিষধর সর্পের দংশনের ন্যায় জ্বালা দিতে লাগিল। তিনি সদানন্দের পদতলে পড়িয়া প্রার্থনা করিলেন যে তাঁহার বিবাহ দেওয়া হউক। প্রমথনাথ সকল ব্যাপার দেখিয়া নিজের পাণ্ডিত্য কত সীমাবদ্ধ তাহা ভাবিয়া মৌন ভাবে রহিলেন।

সদা। এত দিনে সতীনাথ, তোমার চক্ষু খুলিল। এখন বুঝিতে পারিলে যে ব্রাহ্মণ না হলে কিছুই বুঝা যায় না। ব্রাহ্মণ হতে হলে বিবাহ দরকার। পিতৃঋণ শোধ দিতে হবে তবে পিতৃভক্তি পাবে। যার পিতৃভক্তি নাই সে দৃষ্ট আইনে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়—কাজেই অদৃষ্ট ও অনন্ত আইনের নিকট পরিত্যাজ্য, সেখানে যাবার যো নাই।

সতী। আর বলিবেন না। সকলই আমি দেখিতে পাইতেছি। আর বিলম্ব না করিয়া আমায় বিবাহ দিন।

সদা। তার আয়োজন পূর্ব্বেই করিয়াছি। তুমি মাধুরীকে দেখিতে চাহিলেও দেখিতে দিই নাই। আজ তুমি বিবাহের অধিকারী হইলে আজই তোমাকে মাধুরীকে দেখাইবার ব্যবস্থা করিব এবং সেই সঙ্গে বিবাহ-সংস্কার কার্য্য শেষ করিব। তুমি এখন এ ঘর পরিত্যাগ কর।

সতীনাথ বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

প্রম। এই দুই পবিত্র দেহের কি সংকার হইবে?

সদা। এর সংকার তুমি আমি করিতে অনধিকারী। এই সতীর অঙ্গের প্রত্যেক অংশই মহা পবিত্র—ইহা পঞ্চভূতের অতীত পদার্থ। সৃষ্টির রক্ষক সুদর্শনধারী বিষ্ণুর ইহা নিজস্ব ধন। তিনি এই সতীদেহের মালিক, তাঁর ব্যবস্থা তিনি করিবেন। সতীত্ব সৃষ্টি রক্ষার প্রধান বীজ—সে ধনের অধিকার যাঁহাকে পালন ভার দেওয়া হইয়াছে তাঁর; তিনি সে বীজ পৃথ্বিতলে ছড়াইয়া দিবেন। সেই বীজ যেখানে পড়িবে তাহাই পীঠস্থান হইবে। গৌরীনাথের

ধ্বংস নাই, দেখ গৌরীনাথের চাক্ষুষ দেহ আর ওখানে নাই। সে ভস্মশেষ হইয়া চলিয়া গিয়াছে! সতীর দেহ কাঁধে লইয়া রুদ্র মূর্ত্তি নৃত্য করিতেছেন। বিষ্ণু তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া মহাধ্বংসের পর সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন।

প্রম। দক্ষযজ্ঞের লীলা নিত্যও চিরস্থায়ী। নতুবা সৃষ্টি লোপ পাইত।

সদা। নিশ্চয়ই। বৈষ্ণবের ভাষায় বলি

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়
কেহ কেহ ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥"

আশীর্ব্বাদ করি—সতী ও সতীনাথ—মহাদেবের সেই লীলা তোমার হৃদয়ে প্রতিভাত হউক।

এমন সময় পাগলিনী তথায় আসিয়া গোলমাল আরম্ভ করিয়া দিল।

সদা। তুমি এখন এখানে কেন?

পাগ। আর অবসর নাই—আমার আর কাজ নাই—আমি আপনার নিকট বিদায় চাই।

সদা। কি পাগল! তোমার জ্বালায় যে অস্থির হইয়া পড়িলাম। তোমার এখন ঢের কাজ বাকী। এখন যাবে কোথা? তোমার সঙ্গের আশ্রিতা রমণীগণ যাবে কোথা?

পাগ। তারা যে কাজে এসেছিল তাহা যতদূর সম্ভব প্রচার করা হইয়াছে। এখন নারীগণ নিজেদের কর্ত্তব্য কিছু কিছু বুঝিয়াছেন। এর বেশী এ জন্মে আর হবার আশা নাই। আপনারও কাজ প্রায় শেষ—এখন আগে আমি যাই তারপর আপনি আসিবেন।

সদা। ওটা ঠিক নয়—আমার কাজ শেষ হয় নাই। অনেক বাকি। তা ছাড়া মহাত্মাগণ আদেশ না করিলে আমি যাইতে পারি না। তোমার যাওয়া কি এখন সম্ভব!

পাগ। আমার কাজ হয়েছে। আপনি থাকুন—আমাকে ছেড়ে দিন। আমার সঙ্গের রমণীগণ পূর্ব্বেই চলে গেছেন। তাঁহাদের আত্মা এখন হিন্দুর নারীগণের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। এর পর তাহা প্রবল বলশালী হইয়া হিন্দুসমাজে এক অচিন্তিতপূর্ব্ব শক্তি আনয়ন করিয়া বিশ্বকে বিমোহিত করিবে। নতুবা হিন্দুত্বই মিথ্যা।

সদা। তুমি মনুষ্য শরীরে না থাকিলে ব্রাহ্মণ, নারী ও গো কে রক্ষা করিবে?

পাগ। রামদাস স্বামীর আজ্ঞায় আমি আপনার সাহায্যার্থ নারী দেহে আসিয়াছিলাম। আমার এখন আর দরকার নাই? যখন দরকার হবে তখন আবার ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য আসিব।

সদা। সবই বুঝিতেছি। কিন্তু শ্রীশঙ্কর স্বামীর অনুজ্ঞা এখনও পাই নাই।

পাগ। রামদাসস্বামী শ্রীশঙ্কর স্বামীকে পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে আমার আর থাকার দরকার নাই।

সদা। দণ্ডের জন্য তোমাকে আনা—দণ্ড না থাকিলে অসুরগণকে কে শাসন করিবে।

পাগ। নারীর হৃদয়ে সে দণ্ডের অঙ্কুর জাগরিত করিয়া দিয়া গেলাম। সে জন্যই আমি এবার নারী দেহে আবির্ভূত হই। নারীজাতি এবার থেকে দণ্ড দিতে পারিবে এ ভরসা রাখি।

সদা। তুমি গেলে যে আমি সহায়হীন হইয়া পড়িব।

পাগ। সে ভয় আপনার করিতে হইবে না। চণ্ডী এবার ভয়ঙ্করী হইয়াছেন। তিনি

আপনাকে রক্ষা করিবেন। কেবল দেবতাগণের তপস্যা এখনও পূর্ণ হয় নাই, তাই যাহা কিছু বিলম্ব হইতেছে।

সদা। ধর্ম্ম-রক্ষা কি করে হবে?

পাগ। হিন্দুর বিশ্বাসই তাহার ধর্ম্ম-রক্ষক। সেই বিশ্বাস অপঘাতে লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল—আবার তাহা পুনর্জ্জীবিত হইতেছে এই আশা করা যায়।

সদা। সে বিশ্বাস কি আসিয়াছে?

পাগ। সকলের না হোক—কাহারও কাহারও এসেছে। তবে তপস্যা শেষ হয় নাই। হলেই সব পূর্ণ হবে।

সদা। মহাত্মাগণ কি আভাস দিতেছেন?

পাগ। তাঁরা শুধু হিন্দুর নহেন। সকল জীবের। সর্ব্বসামঞ্জস্য তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছেন। সময়ে সকলই হইবে।

সদা। তবে আমরা আশা করে কাজ করে যাই।

পাগ। আমার বোধহয় সেই আভাসই আপনি শ্রীশঙ্কর স্বামীর নিকট হইতে পাইবেন। আমি আর থাকিতে পারি না—রামদাস স্বামী ডাকিতেছেন। এই বলিয়া পাগলিনী মাটিতে পড়িয়া গেল। প্রমথনাথ ত্রস্ত হইয়া তাহাকে ধরিতে গিয়া দেখেন তার প্রাণ দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ আকাশবাণী হইল—

রামদাস স্বামীর আজ্ঞায় আমি নারীদেহে গিয়াছিলাম—আবার প্রয়োজন মত আসিব। তোমারা কার্য্য করিয়া যাও।

প্রমথনাথ বলিলেন কি আশ্চর্য্য—এই নারী দেহে কোন বীরাত্মা আসিয়াছিলেন দেখছি।

সদা। শিবজীর আত্মা আসিয়া সতীত্ব রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া গেলেন। শিবজী অমর—যখন সময় হইবে তখন আবার দেখিতে পাইবে।

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্ব্বুধাঃ।

দ্বাদশ অধ্যায়

আজ সতীনাথের সহিত মাধুরীর বিবাহ। বিশেষ কোন আয়োজন নাই। বৈদিক কার্য্যটি যাহাতে হয় তাহার জন্যই সদানন্দ ব্যাকুল। যথা সময়ে বিবাহসংস্কার হইয়া গেল। বিবাহের প্রত্যেক বেদমন্ত্রগুলি সতীনাথ বুঝিয়া লইলেন। শুভদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সবই শুভ হইয়া উঠিল। মাধুরীর পাতিব্রত্যে সংসার সুখময় ভাবে বহুদিন কাটিয়া গেল।

সদানন্দের প্রকৃত পরিচয় ক্রমে প্রমথনাথ বুঝিতে পারিয়া নিজ সৌভাগ্য চিন্তায় আকুল হইয়া পিতামহের শ্রীচরণে গড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার অভিভাবকত্বে থাকিয়া সতীনাথ গার্হস্থ্য জীবন সমাপন করিয়া পুত্রের উপর মাধুরীর ভার দিয়া সদানন্দের সহিত বানপ্রস্থে গমন করিলেন।

প্রমথনাথ ও তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। উত্তরাখণ্ডের এক গুহবায় তিনজনে নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। মহাত্মাগণের কৃপায় প্রমথনাথের পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরূক হইল। তিনি দেখিলেন পূর্ব্ব জন্মে তিনি সেই পণ্ডিত ছিলেন যিনি দক্ষ যজ্ঞ ও দশ মহাবিদ্যা বিশ্বাস করিয়া সতীনাথের নিকট অবমানিত হয়েন। সতীনাথ সেই পণ্ডিত যিনি তাঁহাকে অবমাননা করেন। সতীনাথও সকল বুঝিয়া প্রমথের চরণতলে পড়িয়া রহিলেন। সতীনাথ বলিলেন, আমি এত দিনে আমার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর পাইয়াছি। আমার পুত্র হওয়ার পর বুঝিয়াছি—স্বপ্নে কেন হরগৌরী ও গণেশ দেখি। ষোড়শী যেই অগ্নি শিখার মূল—মাধুরী সেই অগ্নিশিখার নিবারক। ষোড়শী সতী ও দশমহাবিদ্যা—মাধুরী গৌরী বা উমা ও পতিব্রতা। ষোড়শীর সতীত্ব গৌরীনাথকে পাগল করে—কাম ভস্ম করে—মহাদেবকে নিদ্রিত করে। উমার পাতিব্রত্যে কামের স্থূল দেহ ও গণেশের জন্ম। গৌরীনাথ ও ষোড়শী জীবদেহ ব্যবধানে দেহান্তে পূর্ণ হরগৌরী দেহ লইয়া পূর্ণাবয়ব যুগলমূর্ত্তি। এক যুগ্ম সৃষ্টিতত্ত্বে অসম্পূর্ণ—অন্য পরম সুন্দর পূর্ণ-তনু, এক রসহীন—অপর আনন্দময় তনু। একের জ্বালাই ধর্ম্ম—অন্যের শান্তি পুরস্কার। এক পাগল—অপর সৃষ্টির পিতামাতা—"জগতঃ পিতরৌ পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ। এক সৃষ্টির বীজনাশী—অন্য সৃষ্টির প্রতিষ্ঠাতা। এক সৌন্দর্য্য ও আনন্দের অতীত—অন্য সৌন্দর্য্যের ও আনন্দের পূর্ণ খনি। এক অব্যক্তঅবাচমনসোগোচর—অন্য জীবের আরাধ্যধন, জীবন্ত যুগলমূর্ত্তি। বঙ্কিম মহাকবি—চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী সেই গৌরীনাথ ও ষোড়শী—এবং প্রতাপ ও রূপসী আমাদের সতীনাথ ও মাধুরী। তফাৎ—প্রতাপ ও রূপসীর সম্বন্ধ অসম্পূর্ণ, সতীনাথ ও মাধুরীর সম্বন্ধ সম্পূর্ণ। সতীনাথ মাধুরীকে শরীর সম্বন্ধ দিয়া পতিব্রতা করেন—প্রতাপ মহান চরিত্র হলেও রূপসীকে সতী রাখেন। চন্দ্রশেখর জ্বলে মরেন—শৈবলিনী পাগল হয়েন। প্রতাপ পরকিয়া ভাব লইয়া নিজেও জ্বলে মরেন রূপসীকেও জ্বালান। যে বিষ খায় নাই সে একথা বুঝিবে না। দাম্পত্য জীবনে শরীর সম্বন্ধ না ঘটিলে অফুরন্ত নিত্য বৃদ্ধিশীল জ্বালা—তাহার শেষ নাই। বঙ্কিমের দুই নায়ক নায়িকা তজ্জন্যই জ্বালা পূর্ণ—উভয়েই শরীর সম্বন্ধ বর্জ্জিত থাকায় তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল—দুই দম্পতিতে গঙ্গাবারি পতিত হয় নাই। শরীর ধরিলে শরীরধর্ম্ম পালন করিতেই হয়। এই জন্যই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম এত বড়—এত মহান।—

গল্প সমাপন হইল। যদি প্রবৃত্তি হয় পাঠকমহোদয়গণ আমাদের সঙ্গে বলুন :—

গোভির্বিপ্রৈশ্চ বেদৈশ্চ সতীভিঃ সত্যবাদিভিঃ।
অলুব্ধৈর্দ্দানশীলৈশ্চ সপ্তভিঃ ধার্য্যতে মহী ॥

অর্থাৎ গো, বিপ্র, বেদ, সতীনারী, সত্যবাদী, অলুব্ধ, দানশীল এই সপ্ত পদার্থই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এরাই ধর্ম্ম।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনা'র সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ ও আলোচনা সাপেক্ষ, 'ভারতের সাধনা'র ইহা এক বিশেষ লক্ষ্য। আলোচনাকারীগণ যথাসম্ভব অবান্তর কথা পরিত্যাগ করিবেন, এই অনুরোধ—ভাঃ সঃ]

সুশ্রুতে গর্ভাধানের বয়স।—সুশ্রুতের গর্ভাধানের বয়স ষোড়শ অথবা দ্বাদশ—ইহা লইয়া কিছুদিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। সুশ্রুত সংহিতার কোন কোন পুস্তকে "উনষোড়শ" এবং কোন কোন পুস্তকে "উনদ্বাদশ"—এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম পাঠ ঠিক হইলে যে সকল স্ত্রীলোকের বয়স ১৬ বৎসরের কম তাহারা গর্ভাধানের অনুপযুক্ত। শেষোক্ত পাঠ ঠিক হইলে দ্বাদশ বৎসরের কম বয়সের স্ত্রীলোক গর্ভাধানের অনুপযুক্ত। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় সুশ্রুতে "উনষোড়শ বর্ষায়াং" ও "উনদ্বাদশ বর্ষায়াং" এই দুই পাঠের মধ্যে "উনদ্বাদশ বর্ষায়াং" পাঠই বিশুদ্ধতর মনে করেন। তাঁহার মতে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে বালিকার গর্ভাধান দোষাবহ নহে। আমরা সকলেই এই মতই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়া থাকি। সর্দ্দা বিলের প্রতিবাদ সম্পর্কে আমি অমৃতবাজার পত্রিকাতে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম ও Age of Consent Committeeর নিকট যে Statement পাঠাইয়াছিলাম—তাহাতেও এই মতেরই পোষকতা ছিল। যদি উনদ্বাদশ বর্ষায়াং" এই পাঠটী শুদ্ধ বলিয়া স্থির হয় তাহা হইলে 'উনষোড়শ বর্ষায়াং" এই পাঠটী দুষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইবে।

সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেই দ্বাদশ বর্ষ বয়সেই বালিকার গর্ভাধান হওয়া উচিত—এইমতের সমর্থন দৃষ্ট হয়। গত বৈশাখের "ভারতের সাধনায়" 'ভার্গব' এই কল্পিত নামধেয় কোনও লেখক "উনদ্বাদশ বর্ষায়াং" এই পাঠটীর দোষ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, সুশ্রুতের মতে স্ত্রীলোক দ্বাদশ বর্ষ বয়সে বিবাহিত ও ঐ সময়ে ঋতুমতী হইলেও ১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্বামিসহবাসের ও গর্ভ-ধারণের অযোগ্যা। এই মত সমর্থনের জন্য তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন—সে সকলের সবিশেষ আলোচনা না করিয়া কেবল মাত্র সুশ্রুত অনুসারে স্ত্রীলোকের ন্যূনকল্পে কত বয়সে গর্ভধারণের যোগ্যতা ঘটিতে পারে—সংক্ষেপে তাহাই আলোচনা করিতেছি।

১। সুশ্রুত অনুসারে সাধারণতঃ দ্বাদশ বর্ষ বয়সে বালিকা ঋতুমতী হইয়া থাকে—"তদ্বর্ষাদ্ দ্বাদশাৎকালে বর্ত্তমান মসৃক্‌পুনঃ"—ইত্যাদি (শরীর স্থান তৃতীয় অধ্যায়)।

২। তাহার পর সুশ্রুত অনুসারে ঋতুমতী বালিকার কি লক্ষণ তাহাই দেখা যাউক 'নবকামাং"—ইত্যাদি অর্থাৎ রজস্বলা বালা স্বামি সংসর্গ কামনা করিয়া থাকে।

("শরীর স্থান তৃতীয় অধ্যায়")

৩। এইবার রজস্বলা স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর কর্ত্তব্য কি—তাহাই দেখাইতেছি।

(ক) "পুষ্পকালে শুচিস্তস্মাদপত্যার্থী স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ"—অর্থাৎ স্ত্রী রজস্বলা হইলেই তাহার স্বামি অপত্যার্থী হইয়া পবিত্র ভাবে তাহার সংসর্গ করিবে। ("শারীর স্থান তৃতীয় অধ্যায়")

(খ) "দর্ভসংস্তরশায়িনীং করতলশরাবপর্ণান্যতমভোজিনীং হবিষ্যং ত্র্যহঞ্চ ভর্ত্তুঃ সংরক্ষেৎ। ততঃ শুদ্ধস্নাতাং চতুর্থে অহন্যহতবাস সমলঙ্কৃতাং কৃতমঙ্গলস্বস্তি বাচনাং ভর্ত্তারং দর্শয়েৎ" (২য় অধ্যায় শারীর স্থান)। ইত্যাদি বচন হইতে জানা যাইতেছে যে সুশ্রুতের মতে রজস্বলা স্ত্রী মাত্রেরই চতুর্থ দিনেই স্বামীর নিকটে যাওয়া উচিত। তাহার পরে ঐ স্থানেই সুশ্রুত এই বিষয়ে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন:—"তৈলস্নিগ্ধাং তৈলমাষোত্তরাহারাং নারীমুপেয়াদ্রাত্রৌ"—

সুশ্রুতের উল্লিখিত বচন সমূহ হইতেই স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার মতে (১) দ্বাদশবর্ষ বয়সেই সাধারণতঃ বালিকা রজস্বলা হইয়া থাকে, (২) রজস্বলা হইলেই তাহার রত্যনুরাগ আপনা হইতেই হইয়া থাকে, ও (৩) রজোদর্শনের চতুর্থদিনে স্ত্রীলোক মাত্রেরই ভর্ত্তৃসংসর্গ বিধেয়। এইরূপ স্থলে "ঊনদ্বাদশ বর্ষায়াং" এই কথাই সুশ্রুতের অভিপ্রেত ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদের অন্যান্য গ্রন্থেও এই মতই সমর্থিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে "সুশ্রুত ঊনষোড়শ পাঠ না দিয়া ঊনদ্বাদশ দিতেই পারেন না।"—ভার্গব মহাশয়ের এই মত আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। সুশ্রুত "অত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ" লিখিয়াছেন। সুশ্রুত ও অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থকারগণ "বালা" অর্থে দ্বাদশ হইতে ষোড়শ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোক বুঝিয়াছেন" সুশ্রুতের মতে "অত্যন্ত বালায়াং" অর্থে দ্বাদশ হইতে কম বয়সের স্ত্রীলোক ইহাই বুঝিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদের অন্যান্য গ্রন্থেও এই মত সমর্থিত হয়। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি নাই।

রসাচার্য্য কবিরাজ—শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়, এম-এ (ট্রিপল্) সাংখ্য তীর্থ.

অনুসন্ধান

গত চৈত্র সংখ্যা 'ভারতের সাধনার' ৩৪১ পৃঃ লেখক মহোদয় মহাভারতে একটি প্রসঙ্গ আছে বলিয়া আরম্ভ করিয়া ৩৪২ পৃঃ নিম্নোদ্ধৃত উপদেশটি ব্যাসদেব কথিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—'মহারাজ! ধর্ম্মের তত্ত্ব বড়ই রহস্যময়। দেখুন—অধার্ম্মিকের সহিত সংঘর্ষে অধর্ম্ম অবলম্বন করাও ধর্ম্ম এবং ধার্ম্মিকের সহিত সংঘর্ষে ধর্ম্ম অবলম্বন করাই ধর্ম্ম। কুরুপক্ষ অধর্ম্মকে ধর্ম্মজ্ঞান করিয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাই তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে তোমরা বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ অধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলে, আর তাহারই ফলে তোমাদের জয় হইয়াছে। তোমরা সম্পূর্ণ ধর্ম্মপথে থাকিয়া যুদ্ধ করিলে কখনই জয়ী হইতে পারিতে না।"

প্রোক্ত প্রসঙ্গটি মহাভারতের কোন স্থানে আছে তাহা আমরা দেখিয়া লইতে পারিলাম না। মহাভারত বৃহৎ গ্রন্থ যদি লেখক মহাশয় অন্ততঃ কোন পর্ব্বে পাওয়া যাইবে তাহা প্রকাশ করেন তবে বিশেষ উপকৃত হইব।

হিন্দুত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে নিবদ্ধ। স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে একমুখী গতি অতিশয়

প্রবলা হইয়া ব্যক্তি বা জাতিকে চরম পরিণতিতে লইয়া যায়। তদ্বিপরীতে ইতোভ্রষ্ট ততোনষ্ট। দেশ ও কালের উত্তর গতিতে আমরা যে তাড়নার প্রভাবে ধর্ম্মকে সময় বিশেষে ত্যাগ করিয়া অধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে অন্ত উপদিষ্ট তাহা নিশ্চয়ই আমাদের পূর্ব্বতনগণের নিকট উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু হিন্দুগণ স্বধর্ম্ম বলবান জানিয়া তাহা ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র-বুদ্ধির ন্যায় পরধর্ম্ম আশ্রয় করেন নাই।

অবশ্য মহাভারত শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বে পুণ্য ও পাপ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। যুধিষ্ঠিরের মনে হিংসাজনিত জ্ঞাতি ও কুটুম্ববধ জন্য পাপ চিন্তায় উদ্রেক ও তাহার মীমাংসা কল্পে সেই সকল কথার অবতারণা। কিন্তু ধর্ম্মত্যাগ করিয়া অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দেওয়া কথা আমাদের চক্ষে পড়ে নাই। সত্য প্রতিষ্ঠাই যদি হিন্দুত্বের লক্ষ্য হয় তবে অসত্যাশ্রম করিবার উপদেশ অহিন্দুর তাহাতে সংশয় নাই। অনুশাসন পর্ব্ব দশম অধ্যায়ের শেষে যে উপদেশ রহিয়াছে তাহা এই—

"বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অন্যকে উপদেশ প্রদান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। কারণ উপদিষ্ট ব্যক্তি যদি দৈবাং উপদেষ্টার বাক্যানুসারে পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে তবে উপদেষ্টাকে নিশ্চয়ই সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞব্যক্তিদিগের পক্ষে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই বিধেয়।"

ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভূরি ভূরি উপদেশ মহাভারতে আছে যেমন, কোন স্থানেই ক্ষত্রিয়কে কপটতার আশ্রয় করিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবার উপদেশ নাই।

হিন্দুর নিকট ক্ষাত্র-ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সে ক্ষত্রিয় যদি স্বধর্ম্ম-ত্যাগে উপদিষ্ট হয় তবে সমাজ অসত্যে ধাবমান হইয়া ধ্বংসের মুখে প্রবাহিত হয়। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিশ্ব নানা প্রকৃতি বিশিষ্ট। যখন যে প্রকৃতি যে বাহ্যরূপের সহিত মিলিত হয় তখন দৃষ্টিও তদভিগামিনী হইতে বাধ্য হয়। অনুরূপ দৃষ্টি হইতে অনুরূপ ধর্ম্মের উৎপত্তি অনিবার্য্য প্রাকৃতিক নিয়ম। আবার অনুরূপ ধর্ম্ম হইতে অনুরূপ কর্ম্মের আয়োজন হয়। দৃষ্টি যখন ইহলৌকিক বিষয়ে ছুটিয়া যায় তখন তাহাকে লৌকিক ধর্ম্মাচরণ বলে আর যখন তাহা কেবল পরলোক প্রধান হয় তখন তাহাকে পারলৌকিক ধর্ম্ম বলে। এই লৌকিক ও পারলৌকিক দৃষ্টি ও ধর্ম্মকে সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে, দৃষ্টকে অদৃষ্টের অঙ্ক-শায়িনী না করিতে পারিলে, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের পূর্ণত্বলাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহা প্রাকৃতিক সুতানলয়ের অনুকূল তাহাই বিশ্বনীতির অভিধেয় তত্ত্ব ও সৎ এবং যাহা তাহা নয় তাহা অসৎ। সত্যই প্রকৃতির স্বরূপ। কাজেই হিন্দুরা সত্যকে কোন অবস্থাতেই ছাড়েন নাই। পরবর্ত্তীকালে বিকার ধরিলে প্রকৃতির সহিত একতানতা লোপ পায়। ভেদজ্ঞানের বিষম মোহে আজ হিন্দু সন্তান আপনাতে একটা ভীষণ কৃত্রিম প্রকৃতির আরোপ করিয়া তাহাতে ডুবিয়া রহিয়াছে। কাজেই সর্ব্বদা মিথ্যার সঞ্চার হইতেছে ও প্রকৃতির প্রয়োজন হানি ও হিন্দু সন্তানের অবিরাম স্বভাবচ্যুতি হইতেছে। অধোগতির ইহাই সংক্ষেপতঃ কারণ। নষ্টরাজ্য অসত্য পথে বা অধর্ম্ম পথে উদ্ধার হয় না। চণ্ডী গ্রন্থে তাহা বিবৃত। মিথ্যাচার নৈমিত্তিক নিয়মে এখন স্তূপীকৃত—এখন প্রাকৃতিক অনিবার্য্য নিয়মে একটি বিপ্লব উপস্থিত হইতে বাধ্য—নতুবা ভগবানের বাক্যের সার্থকতা থাকে না—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।

জাতীয় অধঃপতনের ইতিহাস অতি বিস্তৃত ও মহাজটিল ব্যাপার। তাহার আলোচনা প্রবন্ধে করা অসম্ভব। ইতি—অনুসন্ধিৎসু হিন্দু।

(১) প্রতিবাদ।—বৈশাখ মাসের 'ভারতের সাধনায়" শ্রীযুক্ত ভার্গব কথিত 'সন্ধ্যোপাসনা' প্রবন্ধটী পড়িতেছিলাম। উহার শেষদিকে প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন "চৈতন্যদেব বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও কায়স্থকে গুরু করিয়াছিলেন; যবনকে ব্রাহ্মণ পদবী দিয়াছিলেন, সমাজের ক্ষণস্থায়ী বন্ধন ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।"

আমি প্রবন্ধকারের এই তিনটী চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। তিনি কখনও কোন কায়স্থকে গুরু করেন নাই, কোন যবনকে ব্রাহ্মণ পদবী দান করেন নাই, অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রীয় নীতির কোনও অপলাপ করেন নাই। আমি জানি কায়স্থ-কুল ধুরন্ধর কোনও কোনও মহাত্মা, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের গুরু কেশব ভারতীর মুখের বিনয় বাক্য "আমি ক্ষুদ্রাধম" এই শব্দটীকে "আমি শূদ্রাধম" এই শব্দে পরিবর্ত্তিত করিয়া কেশব ভারতীকে কায়স্থ করিবার বহুতর চেষ্টা করিয়াছেন; তাহাদের সেই চেষ্টা বিফল হইয়াছে। আমার এই প্রতিবাদটী আপনার প্রত্রিকায় প্রকাশ করিবেন। আমি দারুণ ব্যাধিতে শয্যাগত নড়িবারও ক্ষমতা নাই। দি শ্রীগুরু কৃপায় বাঁচিয়া উঠি, তবে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করিয়া দেখাইব যে, শ্রীচৈতন্যদেব কায়স্থকে গুরু করা দূরে থাকুক তিনি কোন কায়েস্থের গৃহে ভিক্ষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের তিনি একজন একান্ত পরিপোষক ছিলেন। যবনকে ব্রাহ্মণ পদবী দেওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। নিবেদন ইতি।—

স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ। (বারানসী)

(২) মীমাংসা।—বিগত ফাল্গুন সংখ্যা ভারতের সাধনায় প্রকাশিত 'কৃষ্ণাবতরণ' প্রবন্ধের এক খানি অতি তীব্র সমালোচনা পাওয়া গিয়াছে। বেদে কৃষ্ণ-তত্ত্ব আছে—ইহাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়, অথচ লেখক মহাশয়র দুই একটী স্থানে বৈদিক ঋষিগণের প্রতি অসতর্কিত কটাক্ষ করিয়াছেন—"বৈদিক ঋষিগণ কিরণারণ্যে পথ ভুলিয়া বেড়াইতেছেন। আলোকের অতল অকূল সাগরে ডুবিয়া মরিয়া অমৃত হইতেছেন। কৃষ্ণকে তাহারা কেমন করিয়া দেখিবেন?" 'বেদ-সংহিতা ও উপনিষদাদি জ্ঞান-চৈতন্যের যে ভাব-ভূমি হইতে সমদ্ভূত হইয়াছে—তাহাতে কৃষ্ণের প্রকাশ অসম্ভব, কৃষ্ণাঙ্গ জ্যোতির প্রতিভাই বেদ। বেদ কৃষ্ণসূর্য্য প্রকাশের পূর্ব্বগামী বিশ্বব্যাপী অরুণালোক।"...ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রবন্ধে সাহিত্যের ভাব-বিলাসই অধিক—তত্ত্বের দিগ্দর্শন কম দেখা যায়। ইহাতে সমালোচক মহাশয়ও অত্যধিক বিচলিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সকল বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ও প্রভুপাদ গোস্বামীগণ এক বাক্যে বেদের প্রমাণ্যতা ও সর্ব্বাধারতা স্বীকার করিয়াছেন। যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ব জগতে প্রকট করিয়া গিয়াছেন তিনিও ঋষি—বেদ-সংহিতার সৃষ্টি কারক। সে কৃষ্ণ-তত্ত্ব ও বৈদিক-তত্ত্বে কোন বিরোধ নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অতিরিক্ত অনুরাগ বশতঃ এক দিকে ঋষিদৃষ্টিতে যেমন অবজ্ঞা আসিতে পারে, পরবর্ত্তী বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা বশে তেমনই আর্য-পন্থীদিগের বিদ্বেষ দেখা যায়। ভারতের সাধনার ধারাতে ইহাদের সামঞ্জস্য আছে। সময়ান্তরে তাহার প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

মাস-পঞ্জি—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মালব্য সিমলাতে ভাইসরয় সহিত সাক্ষাৎ করিলেন (১লা)—বিলাতে ভারতমন্ত্রী মিঃ ওয়েজউড্ বেন দীল্লি চুক্তিসর্ত্তের সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন—লর্ড আরউইন বিলাতে পৌছিয়া ভারত সমস্যার ব্যবস্থার জন্য এরূপ কোনও চুক্তির আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতেছেন—মিঃ চার্চ্চহিল বলিতেছেন যে, দীল্লির চুক্তি ইংরেজের পক্ষে ঘোর বিপদ ও অপমান জনক "A Great disaster and humiliation" ব্রহ্মদেশের মেমিও সহরের নিকট কর্ণেল মরসেদ নামক একজন সৈনিক কর্ম্মচারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে—ম্যানচেষ্টারের বস্ত্রব্যবসায়ীগণ সমবেত ভাবে কাপড়ের দাম কমাইয়া ভারতের বাজার দখল করিবার চেষ্টায় আছেন—ফ্রান্সে সোয়া লক্ষ বস্ত্রশিল্পী ধর্ম্মঘটে লাগিয়াছে—সীড্নীতে সর্ব্ব প্রথম বিমানপোত পৌছিল (৬ই)—ব্রিটিশপররাষ্ট্রসচিব মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন জেনেভার নিরস্ত্রকরণী সভার সভানায়ক হইবেন—লণ্ডন সহরে যে যুক্ত-ভারত রাষ্ট্র গঠনের উপসমিতি বসিতেছে (Federal structure Sub-Committee) তাহাতে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রনের উত্তর মহাত্মা গান্ধী দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম সাধারণে অজ্ঞাত—কলিকাতা সহরে জল-নিকাসের যে অসুবিধা হয়, তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত করপোরেশন তৎপর হইতেছেন বলিয়া প্রকাশ—কলিকাতার দুইজন অধ্যাপক স্যর জাহাঙ্গীর কয়াজী ও ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষে লোকবৃদ্ধি ও খাদ্য সমস্যা লইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—মেদিনীপুরের পেডি-হত্যার অভিযুক্ত পাচজন যুবককে আদালতে খালাস দিয়া পুনঃ বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স দ্বারা ধৃত করা হইয়াছে।—মামুদাবাদের মহারাজার মৃত্যু হইল (৯ই)—বঙ্গীয় কংগ্রেস-দলাদলি তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে—ভারত গভর্ণমেণ্ট সরকারের খরচ শতকরা ১০ করিয়া কমাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতেছেন—ইতালী রাষ্ট্রনায়ক সিগনর মুসোলিনী ঘোড়া হইতে পড়িয়া ঈষৎ আহত হইয়াছেন—ডাঃ পল বোয়ার এর নেতৃত্বে একদল বেভিরিয় আরোহী এবার কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণের চেষ্টায় আসিয়াছেন, গত ১৯২৯ সনে ইহারা আর একবার এ চেষ্টায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিলেন—সিন্ধু দেশে ভীষণ গরম পড়িয়াছে. ভারতবর্ষে এ যাবত আর কখনও এমন গরম পড়ে নাই—মহাত্মা গান্ধী বারদোলীতে শ্রীযুক্ত পেটেলের সহিত স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন (১৩ই)—মিস্ কেথেরীন মেয়ো তাহার 'মাদার ইণ্ডিয়া' পুস্তকের আর এক পরিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এদেশের বাল্যবিবাহাদি বিষয় লইয়া নূতন কুৎসা প্রকাশিত হইয়াছে—অষ্ট্রেলিয়াতে অবিবাহিত পুরুষগনের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য করা ও গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী-গণের বেতন হ্রাস করিবার প্রস্তাব চলিতেছে—জাপানে মজুরী হ্রাস করিবার প্রস্তাব হইয়াছে—রাণী মেরির ৬৪ বৎসর বয়ক্রম শেষ হইল—স্পেনের হৃত-রাজ্য রাজা এল্ফন্সোর ফরাসীর রিভিয়েরাতে বাস করা স্থির হইল—পর্ত্তুগীজ-পূর্ব্ব আফ্রিকাতে বিপ্লবের সূচনা দেখা যায়—সিগনোর মুসোলিনী ইতালী হইতে 'ফ্রি মেশনরী' তুলিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন—ব্রহ্মদেশের গোলমালে হাজার হাজার ভারতবাসী ব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া আসিতেছে—আগামী ৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফেডারেল ষ্ট্রাকচার সবকমিটির বৈঠক সমাপ্ত করিতেই হইবে—সিমলাতে ভারতীয় সৈনিক

শিক্ষা (স্বাণ্ডাই) সমিতির বৈঠক বসিয়াছে—তথায় শিক্ষার্থী ছাত্র গণের অনুমোদনাদি হইতেছে—জারমেনির পররাষ্ট্রসচিব লণ্ডন পরিদর্শনে যাইতেছেন, মহাযুদ্ধের পর ইংরেজ রাজ সরকার এইরূপ ব্যাপার এই প্রথম অনুমোদন করিলেন—সীমান্তপ্রদেশের শিগগণ স্ব-রক্ষণের বিশেষ দাবী করিতেছে—বাঙ্গলার রাজনীতিজ্ঞদের দলাদলি সালিসীতে মীমাংসা করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী এক বিশেষ সংবাদ পাঠাইয়াছেন—শ্রীযুক্ত ভি: জে: পেটেল মহাশয় বিলাতে ব্রিটিশ নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া বক্তৃতাদি করিতেছেন—লর্ড ব্রেণ্টফোর্ড মি: চার্চ্চহিলের আরউইন-বিরোধী মত সমর্থন করিতেছেন—ইজিপ্তের নির্ব্বাচনব্যাপার লইয়া সমগ্র দেশময় সৈনিক-ছাউনী বসিয়াছে—বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগে পরিচিত অধ্যাপক জেমসের মৃত্যু হইল—বিলাতে ও ভারতে নূতন উপাধিবর্ষণ হইয়া গেল—স্পেনীয় নূতন রাজসরকার আভিজাত্য সম্প্রদায়ের সকল উপাধি কাড়িয়া লইয়াছেন—মহীশূর রাজ্যে স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার সত্ব লইয়া এক নূতন আইন পাশ হইয়াছে—সন্দীআইন ভঙ্গ লইয়া নোয়াখালীতে দুইটী মোকদ্দমা উপস্থিত—চট্টগ্রামে curfew order বা রাত্রিতে দীপনিবারণী বিধি জারী হইয়াছে—ইরাক-রাজ ফৈজল ইউরোপ ভ্রমণে যাইতেছেন—ব্রহ্ম রাজসরকার নূতন পুলিশবল বৃদ্ধি করিয়াছেন—স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জেনেভার জাতি-সঙ্ঘের সম্মুখে ভারতের কৃষির দুর্গতি সম্বন্ধে এক ভাষণ করিয়াছেন—মন্ত্রী রাম্‌সে ম্যাক্‌ডন্যাণ্ড ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেণ্ডারসন জারমেনী যাইতে আমন্ত্রিত হইয়াছেন—বিলাতে সংবাদ প্রকাশ যে মহাত্মা গান্ধী লণ্ডন হইতে আমেরিকাতে বেতারে কথা বলিবেন—দেশীয় রাজন্যদিগের কেহ কেহ ভারতের একরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার (Policy of federation) প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ—লাহোরের ষড়যন্ত্র মামলাতে পুলিশ একজন approver তৈয়ারী করিয়াছিল বলিয়া আদালতে অভিযোগ হইয়াছে—মুসলেম্ নায়ক মি: জিন্না ভারতে ফিরিয়া আসিতেছেন—জগতের বাণিজ্যিক অবনতিতে আটলাণ্টিক্ মহাসাগরে গমনশীল জাহাজের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে—ভারতে বাণিজ্য না চলায় গ্লাসগোর একটী প্রাচীনতম কাপড়ের কল বন্ধ করা হইল।

হিমাচলের কেমাত যাত্রীদল প্রথম গন্তব্য স্থানে পৌছিয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে—কানপুরের জেলামেজিষ্ট্রেটকে বদলী করিয়া দেওয়া হইল—রুমানিয়াতে পঙ্গপাল পড়িয়াছে, তাহাতে একটী প্রদেশ উৎসন্ন যাইবার আশঙ্কা পনর হাজার কৃষক দল বান্ধিয়া তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সমরায়োজন করিয়াছে—বাঙ্গলার কচুরীপনা এবারের বর্ষাতেও পূর্ব্ববৎ-বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে—বোম্বাইতে নিখিল ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের প্রজাবৃন্দের এক সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে সর্ব্ব দেশের জন্য প্রজাপ্রতিনিধি-মূলক শাসনতন্ত্রের দাবী করা হইল—ভূপালে মুসলমান সভার যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা এখন স্থগিত রহিল—ইটালীতে ক্যাথলিক-ধর্ম্মবিরোধীদিগের প্রতাপ বাড়িয়াছে—যুক্তপ্রদেশের রাজসরকার এই বৎসর কোনও ছাত্রকে বিদেশে পড়িবার সাহায্য করিবে না বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন—মি: সি, এফ্ এণ্ড্রুস্ ল্যাঙ্কাসায়ারের বয়নকারখানাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন—অষ্ট্রেলিয়াতে ভীষণ অর্থসঙ্কট উপস্থিত, ১০০০০০০০ পাউণ্ডের অনটন।

ভারতের সাধনা

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

দ্বিতীয় বর্ষ] আষাঢ়—১৩৩৮ [নবম সংখ্যা

সাধনারপথে

এক বন্ধুবর লিখিয়াছেন—চারিদিকে লোকের মনোবৃত্তি দেখিয়া নিরাশা আসিয়া পড়ার কোনই কারণ দেখি না। কারণ ভগবানের রাজ্যে সত্যটাই ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয়, ইহাই বিশ্ব-জনীন নিয়ম। আমাদের ভারতবর্ষেও তাহাই হইতেছে। এক্ষণে এই renaissance যুগে ভারতের কৃষ্টি নব কলেবর ধারণ করিতেছে। এই চেষ্টাই চারিদিকে চলিতেছে। এক্ষণে যদি একদল লোক আসিয়া ইহাকে বাধা দিয়া তাহাদের মনগড়া ভারতের সাধনা গলার জোরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাহাদের কথা যদি কেহ না শুনে তাহা হইলে দোষ দিবেন কাহাকে?—লেখকের কথার মধ্যে এমন একটী প্রশ্ন আইসে যাহা কেবল ভারতের সাধনার অনুধাবনীয় নহে, জগত্তত্ত্বেরও চরম বিচারের বিষয়। ভারতের সাধনায় ইহার আলোচনা অনেক বার হইয়াছে। পুনরুক্তি হইলে তাহা কখনও অতিরিক্ত হইবে না। এস্থলে প্রশ্ন এই, এই যে renaissance (=লুপ্ত বস্তুর নব জাগরণ) এর লক্ষণ ভারতের সাধনার ধারাতে দেখা দিয়াছে—তাহা কি চারিদিকে লোকের যে মনোবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিত এক-বস্তু, না তাহার বিরোধী? আর যে ভগবানের রাজ্যের সত্য বস্তুটী চিরকাল প্রতিষ্ঠিত (প্রস্ফুটিত?) হইয়া আসিতেছে তাহাও কি এই মনোবৃত্তির সহিত অনন্য? আমরা একবার বলিয়াছি যে ভারতের সাধনার ধারা মনুষ্যের চঞ্চল মনোবৃত্তির বিকাশ মাত্র নহে,—উহা বিশ্ব-জগতের অন্তর্নিহিত চিরস্থির সত্যেরই প্রকাশ। এ সত্যের প্রকাশ কেবল একই রূপে—সমান ভাবে, এক-টানা চলে না—বর্ত্তমান মনুষ্যের মনোবৃত্তিতে যে তাহার সরল সহজ স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ

চরম প্রশ্ন

আসিয়া পড়িয়াছে তাহা বলা চলে না। জাগতিক গতিতে ক্রম-বিকাশের (evolution) সঙ্গে ক্রম-লয়ও (involution) রহিয়াছে—সৃষ্টির সহিত প্রলয়ের সম্বন্ধ আছে। বিরুদ্ধ ভাবকে অতিক্রম করিয়াই জগৎ-স্থিতি সংরক্ষিত ও ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। অসত্যের সহিত সংঘর্ষে, যুগে যুগে লোকের মনোবৃত্তির বিরোধিতার মধ্যে, সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়।—যেমন অশ্ব গাত্র-লোম সকল কম্পিত করিয়া তাহা হইতে ধূলি প্রভৃতি অপসারিত করতঃ পবিত্র হয় এবং চন্দ্র যেমন রাহু-গ্রাস হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া স্ব-প্রভায় দীপ্তিমান হয়, সেইরূপ আমি সকল প্রকার অপবিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া সকল অনর্থের আধার স্বরূপ পাপ-সম্বন্ধ ত্যাগ করতঃ কৃতকার্য্য হইয়া নিত্য সত্যলোক প্রাপ্ত হইতেছি *—ভারতের সাধনার ধারার ইহাই স্বরূপ। উহা কেবল আধুনিক মনোবৃত্তি-প্রসূত কৃষ্টির কলেবর নহে।

বিরামে বিড়ম্বনা

দুর্দ্দশার ঘোর পীড়নে দারিদ্রের নিষ্পেষণে বা হীন দাস্যবৃত্তির অবিশ্রান্ত শ্রম-কাতরতায় মানুষকে যেমন অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে, শান্তি বা সংঘর্ষের বিরতি হইতে সময় সময় তাহা অপেক্ষা কম অকর্ম্মণ্যতা আসে না—বিশেষ করিয়া যদি তাহাদের কোনও স্থির লক্ষ্য না থাকে, কোনও উচ্চ আদর্শ অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইয়া থাকে, অথবা নিজ শিক্ষা ও সাধনা-বলে কোনও স্থির কর্ম্ম-পদ্ধতি জীবনে স্থান লাভ না করিয়া থাকে। বাঙ্গলার জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ইহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। এ কথা সর্ব্ববাদী-সম্মত যে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে যে জাতীয় ভাবের উন্মেষ হয়, তাহাই আজ ভারতের সর্ব্বত্র সংবর্দ্ধিত হইয়া বিশাল ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে; স্বাদেশিকতা ছিল সেই আন্দোলনের প্রাণ শক্তি; স্বদেশ-প্রীতি, স্বদেশীয় শিল্পের প্রচলন ও বর্দ্ধন তখন জাতির কর্ম্মধারাকে উত্তমরূপেই বাড়াইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ঐ আন্দোলনের সাময়িক কারণ বঙ্গ-ভঙ্গের রাজবিধান যখন রহিত হইল, তখন জাতীয় নেতৃবর্গের নির্দ্দেশ অনুসারে স্বদেশী আন্দোলনও স্থগিত হইল। তদবধি বাঙ্গলার আন্দোলন নানা দিকে পরিচালিত হইলেও 'স্বদেশী' বলিতে তখন স্বদেশীয় শিল্পের উদ্ধার ও তাহা দ্বারা জাতিকে আর্থিক সম্পদে বলীয়ান করিবার যে স্থির পন্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা স্থগিত হইয়া গেল। পরে যখন ইউরোপীয় মহা-সমরের সময় সেই স্বদেশী ব্রত উদ্‌যাপনের এক মহা সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন বাংলা ঘুমের ঘোরে নিমজ্জিতই থাকে। সেই অবসরে বিদেশীয় ও পর-প্রদেশীয় লোকেরা ব্যবসা, শিল্প ও বাণিজ্যে বাঙ্গলার বুকের উপর আরও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসে; আজিও তাহার বিরাম হয় নাই—বড় বড় কাজ কারবার হইতে ছোট খাট দোকান পশার পর্য্যন্ত আজ বাঙ্গলার প্রায় সকল বিষয়ই বাঙ্গলার বাহিরের লোকের হাতে চলিয়া গিয়াছে ও আরও যাইতেছে। এই কলিকাতা সহরের বড় বড় হৌস কারখানা ও কারবারের স্থান, নূতন নূতন বৃহৎ অট্টালিকা ও প্রাসাদ, মটর বাস রিক্সা ইত্যাদি যান বাহন, নূতন প্রতিষ্ঠিত মুদী দোকান, খাবারের দোকান, এমন কি মৎস্য ও তরকারীর দোকান পর্য্যন্ত ইহার প্রমাণ দিতেছে। আর যে চরখা-আন্দোলন বাঙ্গালী তখন আরম্ভ করে তাহা পরবর্ত্তী

* ছান্দোগ্য ৮।১৩।১

খদ্দর-আন্দোলনে পুনঃ গৃহীত হইলেও আজ বাহিরের আমদানী খদ্দরের দ্বারাই বাঙ্গলার বাজার চলিতেছে। মূল আন্দোলনের বিরাম হইতে বাঙ্গলার ভাগ্যে এতটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

আবার সুদীর্ঘ এক বৎসর কাল অভাবনীয় জাতীয় সংগ্রামের পর বিগত গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে কংগ্রেস-পক্ষ কংগ্রেস হইতে সে সংগ্রামের বিরত্তি ঘোষণা করিয়াছেন এবং সেজন্য এতদিনের পরিচালিত গণ-আন্দোলনের কার্য্য এখন স্থগিত। সকলের দৃষ্টিই এক্ষণে আগামী গোল টেবিল বৈঠকের দিকে নিবদ্ধ। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে লণ্ডন সহরে পুনঃ ঐ বৈঠক বসিবে—মহাত্মা গান্ধী ও তাহার অনুবর্ত্তী দেশ নায়কগণ দিল্লীর চুক্তির সর্ত্ত রক্ষার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রদেশের আন্দোলনের গতিকে সংহত করিয়াছেন। মহাত্মা যখন দিল্লীর চুক্তিতে আবদ্ধ তখন কংগ্রেসের সুনাম রক্ষার জন্য গোল টেবিলে না হউক্, "দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্রিটিশ রাজনীতিক দিগের বৈঠকে তিনি কংগ্রেসের বাণী শুনাইবার জন্য" লণ্ডন গমন করিতে প্রস্তুত। এবং বলেন, "দেশের দুঃখ ও দুর্দ্দশাকর অপর আর একটী সংগ্রামে জাতিকে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে যাহাতে সম্মান জনক ভাবে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয়, তাহাই তাহার আন্তরিক কামনা।"

অপর দিকে দীল্লির সর্ত্ত অনুযায়ী মনোভাবের পরিবর্ত্তন কিছু দেখা যায় না, এ অভিযোগ সর্ব্বদাই শুনা যাইতেছে। বিলাতের এক পক্ষ যেমন ইহার সমর্থন করিতেছেন, অপর অনেকে ইহার বিরোধ এবং প্রতিবাদে ব্যস্ত। এ অবস্থাতে গোলটেবিল বৈঠকে যে বিশেষ কোনও ফল লাভ হইবে এ আশা না করিলেই চলে। বরং আশঙ্কা এই যে, অদূর ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ একটী জাতীয় সমস্যার সূচনা হইবে। উপস্থিত বিরামের প্রতিক্রিয়ায় তাহা হয়ত অতিশয় ভীষণ আকারই ধারণ করিবে। কিন্তু গোল টেবিলে আশানুরূপ ফল কিছু লাভ হইবে, এ ভরসাতেও জাতীয় কর্ম্মণ্যতাতে বিরাম আসিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। গোল টেবিল শাসন-নীতির কোনও পরিবর্ত্তন করিতে পারে—শাসন-চক্রের কিঞ্চিত অদল বদল হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেই জাতীয় কর্ম্মধারার পরিসমাপ্তি হইবে না। জাতিকে প্রকৃত স্বরাজ্য-সাধনার অনুকূল করিতে হইলে এই বিরামের সময়ে অনেক কর্ম্মই করিবার রহিয়াছে।

জাতীয় ঋণ

ভারতবর্ষ আজ যে সমুদয় নাগ-পাশে আবদ্ধ হইয়া অধীনতার চরম অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে, জাতীয় ঋণ নামক এক অস্বাভাবিক ঋণের বোঝা তাহার অন্যতম। কেবল মাত্র পর-রাষ্ট্রের শাসন নহে, শিক্ষা দীক্ষা আচরণ ও সভ্যতার বিভিন্ন ব্যবহারে পরকীয় বাঁধনে ভারত এক্ষণে ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ এবং দিন দিন অধিকতর অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান বণিক-বৃত্তি-প্রধান শাসনকর্ত্তা দিগের হস্তে পড়িয়া ভারত অর্থ-নীতিক্ষেত্রে কিরূপে কতখানি নিঃস্ব ও নিঃসহায় হইয়াছে, এই তথা-কথিত জাতীয় ঋণ তাহার একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখায়। মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় রাষ্ট্রের কতকগুলি বাস্তব অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া লোকের চাপান দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছেন; কতকদিন পূর্ব্বে লবণ-কর রূপ অন্যায় আইনের অসঙ্গতি দেখাইয়া অনেকের চৈতন্য সম্পাদন করেন, শাসন-কর্ত্তৃপক্ষকে তজ্জন্য মাথা নত করিতে হইয়াছে। পরে তিনি এই জাতীয় ঋণের প্রতি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া এ দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থায় ততোধিক আর এক অন্যায়ের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন।

এতাবৎকাল এ সমুদয় অন্যায় বা অসঙ্গতি লোকে মানিয়াই চলিয়াছিল—প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ রাজশক্তির কোনও কার্য্যে প্রশ্ন করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। দেশের অধিকাংশ লোক অজ্ঞতার অন্ধকারে বাস করিত। কিন্তু এক্ষণে দেশে নূতন জাগ্রতি দেখা দিয়াছে, জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপুল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে শাসক সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তিতেও পরিবর্ত্তন না আসিয়া পারিতেছে না। এমতাবস্থায় জাতীয় ঋণের প্রকৃত অবস্থা কি তাহা বুঝিয়া শাসক ও শাসিত উভয় সম্প্রদায়ের লাভ আছে। ইংরেজ যে সময় এ দেশে এই জাতীয় ঋণের প্রবর্ত্তন করেন, তখন এক নির্ব্বাধ স্বেচ্ছা-চালিত রাজশক্তির বলেই তাহা করিয়াছিলেন,—যদিও ইহারা মুখে আপনাকে ভারতের ন্যাসী বা ট্রাষ্টী বলিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ভারতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতাই হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজ ভারতীয় রাষ্ট্রের এই জাতীয় ঋণ প্রভৃতি যে সমুদয় কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইতেছে, তাহাতে বিশ্ব-দরবারের সম্মুখেও তাহাকে জবাবদিহী হইতে হইতেছে।

সময় বুঝিয়াই মহাত্মার প্ররোচনায় বিগত জাতীয় মহাসভা করাচিতে এই ঋণ বিষয়ে এক তদন্ত-সমিতি স্থাপন করেন। সম্প্রতি ঐ সমিতি তাহার তদন্তের বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন ; তাহাতেই ভারতে ব্রিটিশ শাসন-নীতির এই বিশিষ্ট রূপটি প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রায় সকল রাজ্যেরই জাতীয় ঋণ আছে। যে দেশের শাসন-সংস্থা প্রকৃত জাতীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও জাতিয় স্বার্থে পরিচালিত, সে স্থানেই বাস্তবিক 'জাতীয় ঋণ' কথার সার্থকতা আছে। কারণ ইহারা ঋণের টাকা দেশবাসীর কল্যাণে নিয়োজিত করে ; এবং অনেক স্থলে ঐ টাকা মূলধন রূপে খাটাইয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করে। জাতীয় ঋণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শাসন-সংস্থার এক বিশেষ লাভও আছে—জাতীয়ঋণের অনেক টাকা দেশের ধনী ও সঙ্গতি-পন্ন লোকদিগের হইতে লওয়া হয় ; ইহারা ঋণ দান করিয়া গভর্ণমেণ্টের স্বার্থে স্বার্থবান থাকে ; এবং প্রকৃত জাতীয় শক্তির সহিত প্রতিষ্ঠিত রাজসরকারের বিরোধ হইলে, ইহারা নিজ টাকার মমতায় জাতির বিরুদ্ধে রাজসরকারের সাহায্যে দণ্ডায়মান হয়। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ঋণ জাতির পক্ষে আত্মঘাতী হইয়া থাকে।

যে প্রকারেই হউক্ ভারতের ঘাড়ে এক্ষণে যে ঋণের বোঝা চাপিয়া আছে, তাহার পরিমাণ সরকারী হিসাবেই ১১০০ কোটি টাকারও অধিক। যে দিন হইতে ইরেজ এদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়াছেন সেদিন হইতেই এই জাতীয় ঋণও বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। এবং সে জন্য শত শত কোটি টাকা তাহার সুদ স্বরূপে দিয়া আসিতেছে। ভারতের অভাবনীয় দারিদ্র্যের এক কারণ এই জাতীয় ঋণের ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। এই ঋণের অধিকাংশের সহিত ভারতের লাভালাভের কোনও সম্পর্ক নাই, উহা কেবল ইংলণ্ডের স্বার্থে কৃত ; অপর কতক অংশের সহিত ভারতের অল্পাধিক স্বার্থ বিজড়িত। কংগ্রেস-তদন্ত-কমিটি দেখাইয়াছেন যে, এই বিপুল ঋণের মধ্যে অন্ততঃ ৭২৯ কোটি টাকাই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে আফগানযুদ্ধ, বর্ম্মা যুদ্ধ এবং ভারতের বাহিরে যেখানে যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে ইংরেজের সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির কার্য্যই সংসাধিত হইয়াছে—ভারতের স্বার্থের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ভারতের জাতীয় ঋণের প্রারম্ভ এই সকল ব্যাপারে আবার। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব ব্রিটিশ রাজ-মুকুটে হস্তান্তর করিবার কালে তাহার প্রাপ্য অনেক টাকা, সিপাহী বিদ্রোহের

দমন খরচ বহু কোটি টাকা এবং সাক্ষাৎ ব্রিটিশরাজের শাসনকালে এ যাবত কাল অবধি আবিসিনিয়ার অভিযান, দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, মিশরের যুদ্ধ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত যুদ্ধ, ব্রহ্মের যুদ্ধ ও ব্রহ্ম অধিকার প্রভৃতির খরচে সে ঋণ ত বাড়িয়াছে—তদতিরিক্ত বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধের দান ও তাহার খরচ বাবদ ভারতের ঋণ বিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ তদতিরিক্ত রেলপথ-বিস্তার, মুদ্রা-বিনিময়ের অব্যবস্থা, ইণ্ডিয়া আফিসের খরচ, পারস্য চীন এডেন প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য-প্রতিনিধি-সংরক্ষণ, ইত্যাদিতে অসংখ্য টাকা ঋণ হইয়াছে। কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ অনুসারে এরূপ সমুদয়ে মোট ৭২৯ কোটি টাকা ভারতের দেয় নহে—ইংলণ্ডের স্বার্থে গৃহীত। এ ঋণের হিসাবে অবশ্যই সামরিক বিভাগে যে অত্যধিক খরচ বৎসর বৎসর হয়, তাহা ধরা হয় নাই। উহারও অধিকাংশ কেবল মাত্র ভারতের স্বার্থে রক্ষিত হয় না। তদন্ত কমিটির হিসাবে এই সামরিক ব্যয় হইয়াছে এ যাবৎ ২১১২৮ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে খুব একটা মোটা অঙ্ক ভারতের ফিরিয়া পাওয়া উচিত। সর্ব্বশেষ এই বিপুল ঋণের যে অংশের জন্য ভারত প্রকৃত পক্ষে দায়ী নহে, কিন্তু তাহার যে সুদ ভারত এ যাবৎ কাল যোগাইয়া আসিতেছে, তাহার পরিমাণও বহু শত কোটি টাকা হইয়াছে।

এই দুরন্ত ঋণ-ভারে ভারত দিন দিন দীন হইতে দীনতর হইয়া পড়িয়াছে—এককালের ধনৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন বিপুল অর্থের অধিকারী ভারত—যে ভারত শেষ কালেও তাজমহল ও ময়ুর সিংহাসনের মত সম্পদের লক্ষণ দেখাইতে পারিয়াছিল, সে আজ এই কয়েক দশকের শাসন-পীড়নে দৈন্যের চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে – তাহার বিরাট জন-সঙ্ঘের তেজ, বল ও জীবন-শোণিত দ্রুতগতিতে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

আজ ভারতকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত কেবল ভারতবাসীর নহে—জগতবাসীর প্রয়োজন আছে। আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক দৃষ্টিতে একথা বলা হইতেছে না—জগতের আর্থিক ও ঐহিক সুখ-বৃদ্ধির নিমিত্তই ভারতের বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক—ভারতকে ধন ধান্য ও ঐশ্বর্য্যে শ্রীসম্পন্ন করার প্রয়োজন। এই গুরুতর ঋণভারের মত গুরু বোঝা ভারতের বুকের উপরে চিরতরে চাপা থাকিলে, ভারতের সে ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই—অপর সকল বিষয়ে স্বাধীন হইলেও নহে। আর্থিক অধীনতাই আজ ভারতের পক্ষে আর সর্ব্বপ্রকার অধীনতা হইতে কঠোর।

অহিংসার ব্যতিক্রম

মহাত্মা গান্ধী সংসারের এক বিষম বিপদ্‌পাতের অবস্থাতেই ভারতে অহিংস সংগ্রামের উদ্বোধন করিয়াছেন। অহিংসা ভারতের ধর্ম্ম ও সাধনা-গত নীতি—অমর ঋষিদিগের পরিদৃষ্ট চরম অধ্যাত্ম-তত্ত্বের সহিত উহার সম্বন্ধ। ভারতীয় দৃষ্টিতে উহা কোনও সাময়িক নীতি-চাতুর্য্য নহে—পরম ধর্ম্ম—ভারতীয় সাধনা-গত জীবনের সহিত উহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যুগে যুগে ভারতের মহাপুরুষগণ এই অহিংসা-নীতির প্রচার করিয়া সমাজকে দুর্নীতি ও ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। লৌকিক ভাবে গৌতম বুদ্ধ যেই রূপে উহা জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' ভারতের চিরাগত এই নীতি-সূত্র তাঁহার নামে চলিতেছে। আরও এক গুরুতর সমস্যার সময়ে—যখন বৈদেশিক আক্রমণ ও বিধর্ম্মীদিগের উৎপীড়নে দেশের শক্তি ও সমাজ বিধ্বস্ত, ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায়, তখন 'মেরেছ বেশ করেছ, তবু মুখে

হরি বল' এই বলিয়া বাঙ্গলার চির-গৌরব নদীয়ার যুগ-পুরুষ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ আততায়ীকেও 'কোল দিয়াছিলেন' ; এবং এক অপূর্ব্ব মৈত্রী-বন্ধনে শত্রুমিত্র সকলকে একত্র সম্বদ্ধ করিয়া নিরুপম প্রেমরসে সমুদয় দেশকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। তদবধি বাঙ্গলাতে উচ্চ-নীচের ভেদ আর তীব্র হইতে পারে নাই, শাসক ও শাসিতের পার্থক্য চলিয়া গিয়াছিল, অছুঁত বলিতে বাঙ্গলাতে কিছু নাই বলিলেই চলিত। তার পর দৈববশে ভারত পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমে তাহার করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে ! বৈদেশিক শোষণ-নীতিতে সমুদয় দেশ নিঃস্ব। তাহার মধ্যে আবার শিক্ষা, অবস্থা ও পদগৌরবে কতিপয় সংখ্যক লোক উন্নতি লাভ করিয়া দেশের অপর জন সাধারণ হইতে এক বিষম পার্থক্য ও বিরোধের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে। চির প্রচলিত সেই প্রাচীন সাম্য ও মৈত্রীর স্থানে বিষম বিদ্বেষ ও পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। রাজনৈতিক কারণে শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও তীব্র কঠোর ভাবের উদ্রেক হইয়া আসিতেছে। এক অভাবনীয় দৈন্য, দুর্দ্দশা ও বিদ্বেষের বিষ সমুদয় দেশ ছাইয়া রহিয়াছে—এই অবস্থাকে এক সয়তানী কাণ্ড বলিয়া তাহার নিরোধ-কল্পে ও তাহার বিরুদ্ধে মহাত্মাজি অহিংসার নীতিতে এক অভিনব সংগ্রামের আয়োজন করিয়াছেন।—পৃথিবী সকল লোকের চক্ষু আজ তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত। ইহাকে কেবল স্বরাজ-সংগ্রাম বলিলে চলে না—বাস্তবিক উহা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুনীতির, দুরাচারের বিরুদ্ধে সদাচারের, হিংসার বিরুদ্ধে নিরাবিল অহিংসার, নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সহন-শীলতার সমরায়োজন। এক কথায় অসুর ও অনার্য্যভাবের প্রতিরোধে সুর-জনোচিত আর্য্য ভাবের সংগ্রাম। এই সংগ্রাম কেবল কোনও রাজশক্তির বিরুদ্ধে নহে—ইংরেজের বিরুদ্ধে নহে—কোনও সম্প্রদায় বিশেষের সহিত নয়—ধনী ও উচ্চ বর্ণের কাহারও সঙ্গে নয়—বিদেশী বণিকের সহিত নয়—ভোগ বিলাস ও জড়বাদের নানা ব্যভিচারের বিরুদ্ধেও নয় ; জগতের অন্তরালে যে সত্য ও ঋত নিহিত রহিয়াছে তাহার ব্যতিক্রমে সংসারে যে অনৃত ও পাপাচার সময় সময় বৃদ্ধি পাইয়া স্থিতিতে অতিষ্ঠতা আনিয়া ফেলে, তাহারই বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম। জগৎ-সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যুগে যুগে সুরাসুরের এই সংগ্রাম চলিয়াছে। পাপের সহিত পাপের সংঘর্ষে—দুর্নীতির বিরুদ্ধে অপর দুরিতের বিরোধে—অসত্যের সহিত মিথ্যার সংগ্রামে—পরিণামে পাপাচার ও মিথ্যারই প্রসার বৃদ্ধি পায়—ধ্বংস আইসে। অসত্যের বিরুদ্ধে—পাপের প্রতিকূলে - দুর্নীতির প্রতিরোধে, কেবল মাত্র সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে—নিষ্কলঙ্ক নীতির প্রসার লাভ করিলেই মাত্র, সত্যের জয় বা পাপের পরাভব হইয়া থাকে। সে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা জগতে দুর্ল্লভ হইলেও ভারতের ইতিহাসে—ভারতের সাধনা বলে—তাহা যুগে যুগে ঘটিয়াছে ও ঘটিবে।

মহাত্মা গান্ধী ভারতের জাতীয় সংগ্রামে আজ যত দূর বিজয় লাভ করিয়াছেন, তাহার ব্যক্তিগত চরিত্রের উচ্চ নীতিই যে তাহার একমাত্র কারণ, একথা কাহাকেও বলিতে হয় না। অহিংসাকে তিনি এই সংগ্রামের প্রধান অস্ত্ররূপে বাছিয়া লইয়াছেন—অহিংসাই এ ক্ষেত্রে সত্য ও ধর্ম্মের প্রতীক।

মহাত্মার ব্যক্তিগত জীবন ও কর্ম্ম-নীতিতে অহিংসার ভাব এত দূর দৃঢ়বদ্ধ ও প্রবল হইলেও, আজ দেশের সকল লোকে যে সেই নীতিকে তেমন সম্মানের চক্ষে দেখিতে পারিতেছে না তাহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র দেখা গিয়া থাকে। আংশিক ভাবে ও পরোক্ষে অহিংসার ফল

স্থানে স্থানে দেখা গিয়া থাকিলেও ব্যাপক ভাবে তাহা এখনও দেখা যায় নাই—সর্ব্বত্র তাহা কখনও হইবে কি না, তাহাও সন্দেহ-জনক। হইলে জাতীয়তার প্রত্যেক স্তরে তাহার লক্ষণ দেখা যাইত ; বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরাও তাহাতে প্রভাবিত না হইয়া থাকিতে পারিত না। কারণ অহিংসা ও করুণা কেবল এক পক্ষকেই মহিমা-মণ্ডিত করে না—বিপক্ষকেও ধন্য ও আশীর্ব্বাদ দান করে। মহাত্মার অহিংসা-নীতি সেরূপ সফলতা লাভ করিতে এখনও কালের প্রতীক্ষা করিতেছে। উপর্য্যুপরি নানা দিকে সংঘটিত নানা প্রকারের ঘটনাতে এই আশঙ্কা আইসে।

কানপুর ও ঢাকা বা কিশোরগঞ্জে যে বীভৎস কাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই অল্প দিনের মধ্যে কলিকাতা নগরীতে যে কয়টী ঘটনা ঘটিল তাহাতে যে পাপ পৈশাচিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিবার বিষয় নহে। দুই বৃদ্ধা সম্ভ্রান্ত মহিলা আপন জরা-শয্যায় শায়িতা—এই নগরীর ন্যায় জনাকীর্ণ স্থানের বক্ষের উপর সামান্য মাত্র কিছু দ্রব্য বা অর্থের লোভে আততায়ীগণ তাহাদিগকে শ্বাস-নিরোধে হত্যা করিয়া গেল—হিংসা ও ক্রূঢ়চিত্ততা কত দূর পর্য্যন্ত লোকের স্বভাব-সিদ্ধ হইয়া গেলে এরূপ কাণ্ড সম্ভব, তাহা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন !

বাবু ভোলানাথ সেন কলিকাতার পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাগণের মধ্যে একজন—বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। কাহারও মনে কোনওরূপ দুঃখ বা রোষ জন্মাইতে পারে, তাহাকে যে একবার দেখিয়াছে সে ভাবিতে পারিত না। তাঁহার সদা প্রীতিকর ব্যবহার, মুখ ও মনের ভাবে অপ্রীতির কোনও কারণ কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই। কিন্তু জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রীতি ও দুঃখের উদ্দেশ্য-বস্তু তাহাকে হইতে হইয়াছে—অতি নিকৃষ্ট হীন নির্দ্দয়তার রোষ তাহার উপর বর্ষিত হইয়াছে। দিবা দুপ্রহরে যখন আপন দোকানে বসিয়া ব্যবসায়ে নিবিষ্টমনা ছিলেন, তখন দূরদেশের অপরিচিত দুইজন মুসলমান অতর্কিতে আসিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া গেল ; সঙ্গে তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারীকেও ছোড়ার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। এ ব্যাপারের অন্তরালে যে হিংসা ও নৃশংসতার চিত্র লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা সমাজের আর এক শোচনীয় অবস্থা জ্ঞাপন করে—বিচারাদালতে প্রকাশ, ভোলানাথ তাহার এক প্রকাশিত পুস্তকে হজরত মহম্মদের একখানি চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, ইহা মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব-সীমান্ত হইতে আগত এই হন্তারকগণ প্রতিশোধ লইয়াছে। সংবাদান্তরে প্রকাশ ছিল—কলেজ ষ্ট্রীটে গুণ্ডা ও গাট-কাটাদিগের অত্যাচার সর্ব্বদা চলে, ভোলানাথ বাবু তাহার দুই একটা লোককে ধরাইয়া দিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করাইতেছিলেন—সেই আক্রোশে এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। ইহার কোন্‌টী বাস্তবিক সত্য তাহা নির্ণয় করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক—কারণ জগতের একটী প্রধান প্রচলিত ধর্ম্ম তাহাতে নিষ্কলঙ্ক হইবে। তবে এই দুই কারণেই যে এরূপ নিশংস কাণ্ড ঘটিতে পারে অদ্যকার এই সমাজের অবস্থায় তাহাতে সংশয় করিবার কারণ নাই। ধর্ম্মের নামে অনেক নৃশংস ব্যাপার একালে ঘটিয়াছে ও আরও ঘটিতে পারে, এ সকল যে প্রকৃত ধার্ম্মিকের কর্ম্ম নহে—পাপাচারীদিগেরই কার্য্য—একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আবার গুণ্ডামী, গুপ্তহত্যা, গুপ্তচুরি এ কালে যে বাড়িয়াই চলিয়াছে, কলিকাতার মত সহরে তাহার প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্মের নামে যাহারা অধর্ম্মাচরণ করে, তাহারও যে এই শ্রেণীরই লোক তাহাতেও সন্দেহ নাই।

সকল দেশে সকল সময়েই এক শ্রেণীর লোক এইরূপ দুষ্কৃতির সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে—রাষ্ট্রের সুব্যবস্থায় ইহার প্রতিকার হইতে পারে—সুশিক্ষা ও সদাচারের প্রচলন দ্বারা ইহারা সংযত হইতে পারে; অভাবের পীড়ন ও অন্নকষ্ট না থাকিলে এরূপ অপরাধের মাত্রা কমিয়া যায়; আর এই সকল দুবন্ত প্রকৃতির লোকদিগকে বাছিয়া বাছিয়া আটক রাখিলে বা সামরিক বিভাগে লইয়া গিয়া শিক্ষাদান করিলে, ইহাদের প্রকৃতিতে একপ্রকার সংশোধন আসিতে পারে—সমাজ তাহাতে সাক্ষাতে পীড়িত না হইয়া পরোক্ষে উপকৃত হয়। অদ্যকার ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এরূপ আবশ্যক ও সদ্ বিষয়ের বিবেচনার অভাব। তাই কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীটের মত প্রকাশ্য স্থানে দিনের দুপ্রহরে হাজার হাজার লোক চক্ষুর উপরে এরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছে এবং প্রতি পদ বিক্ষেপে সর্ব্বদা এরূপ ঘটিতে পারে। যেরূপ বিরুদ্ধভাব ও বিপরীত অবস্থায় আজ অহিংসাকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রযত্ন হইতেছে, ইহা তাহার আর এক উদাহরণ।

আবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাষ্ট্রক্ষেত্রেই হিংসার কয়েকটী গুরুতর ঘটনা ঘটিয়া গেল। উপর্য্যুপরি কয়েকজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হিংসানীতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্তে—দেশপ্রেমিকতার বিফল উন্মাদনাবশে কয়েকজন যুবকের হস্তে প্রাণ-দান করিয়াছেন; আর কয়েক জনের উপর ঐরূপ হননের চেষ্টা বিফল হইলেও তাহা যে হিংসানীতির প্রসারের পরিচয় দিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ সমাজের নানা দুরাচার ও ব্যভিচারের সঙ্গে সঙ্গেই এই হিংসা ও অত্যাচারও যে সর্ব্বত্র বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহার প্রতি লোকের দৃষ্টি সহজে আকৃষ্ট হইতেছে না—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে হিংসা বা অহিংসা তাহাই সকলের মনোরাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যিনি অহিংসাকে রাজনৈতিক সংঘর্ষের প্রধান অস্ত্র বলিয়া ধরিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতিতে যে হিংসার লেশ মাত্র নাই—তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। যে বিশ্বাস, আশা বা আস্তিকতা সেই কর্ম্মনীতির মূল, আজ যাহারা তাহার ব্যতিক্রম করিতে যাইতেছে, তাহারা তাহা হইতে বিচ্যুত। তাহাদের শিক্ষা—দীক্ষা—দৈনন্দিন জীবনের অবস্থা—সমস্তই সেই কর্ম্ম-নীতির বিরোধী। আজ অহিংসা নীতিকে কতখানি বিরোধী অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে হইতেছে, ইহাদের দ্বারাও তাহাই প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

অহিংসাকে জয়মণ্ডিত করিয়া সংসারকে স্বর্গধামে পরিবর্ত্তিত করিবার আর এক সহজ উপায় রহিয়াছিল শাসন কর্ত্তৃপক্ষের হাতে—ইহারা যদি সত্য সত্যই অহিংসাকে মাথায় তুলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেন—নিজ ব্যবহারেও অহিংসার করুণা হিংসার উপরে বর্ষণ করিতে পারিতেন, তবে বুঝি আজ হিংসার যে বহ্নি নানা স্থানে লেলিহমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সমূলেতেই নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত। তদভাবে আজ সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া নির্য্যাতনের হিংসা হিংসার পাপকে—বর্দ্ধিত করিয়া না চলিলেও—কমাইতে পারে নাই। রাষ্ট্রের সাধারণ অবস্থা ইহার সাক্ষ্য দান করিয়া আসিতেছে। নীতিও ন্যায়ের নামে সে অহিংসার পূর্ণ সমর্থন হয়ত কেহ করিয় উঠিতে পারিবেন না—কর্ত্তব্য ও সাহসিকতার নামে হিংসার পীড়নের মর্ম্মান্তিক দুঃখকেও ইহারা সহিয়া লইবেন কিন্তু দেশের সাধারণ অবস্থায় সর্ব্বত্র যে কুশিক্ষাও দুর্নীতির প্রশ্রয় আজ বহুদিন ধরিয়া হইয়া আসিতেছে, তাহাতে দেশের ভবিষ্যত যে নানা রূপেই আরও অন্ধকারময় তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

কর্ম্মতত্ত্ব

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

কর্ম্ম যে করণশক্তির চেষ্টা তাহা বলা হইয়াছে এবং করণসকলেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। অধুনা কর্ম্মতত্ত্ব বুঝার জন্য করণসকলেরও যথাবশ্যক বিশেষ বিবরণ এবং জাতি আয়ু ভোগরূপ কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধ ব্যক্তব্য। প্রথমত প্রাণের বিষয় জ্ঞাতব্য। শরীর ধারণের জন্য প্রথম কর্ম্ম আহারকে সমনয়ন করা বা শরীরের উপাদানরূপে পরিণামিত করা। দ্বিতীয় কর্ম্ম নিরোজ বা প্রাণহীন মলসকলকে সর্ব্বশরীর হইতে পৃথক করা। তৃতীয় কর্ম্ম সমনয়নীকৃত দ্রব্যকে (রস ও রক্তকে) ও পৃথক্‌কৃত মলকে চালিত করিয়া যথাস্থানে লওয়া। এই সমস্ত কর্ম্মের জন্য বোধের আবশ্যক ; কারণ বোধহীন শরীরাংশ মৃত হয় কোন কার্য্য করে না। অতএব সমনয়ন, অপনয়ন, ও চালন যন্ত্রসকলের মধ্যস্থ বোধযন্ত্র ও প্রাণধারণের চতুর্থ মূল কারণ। সেই বোধ দ্বিবিধ — এক ধাতুগত বোধ ও অন্য বাহ্যোদ্ভব বোধ (ক্ষুধা, পিপাসা ও শ্বাসোদ্ধার বোধ)। এই পঞ্চশক্তিই যথাক্রমে সমান, অপান, ব্যান, উদান ও প্রাণ। বুঝিয়া দেখিলে দেখিবে ইহা ছাড়া আর প্রাণশক্তি নাই। আধুনিক প্রাণবিদ্যা এই শক্তি সকলের অনেক অবান্তর বিশেষ ও তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে বটে কিন্তু তাহা চিকিৎসকদের জন্যই আবশ্যক।* দার্শনিকদের ঐ কয়টী শক্তি সম্যক্ লক্ষণে লক্ষিত করিয়া বুঝিলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। এই প্রাণশক্তি সকলের নিয়ত কার্য্য হইতেছে। কোন প্রধান অংশের চেষ্টা রুদ্ধ বা বিকৃত হইলে সর্ব্বশরীর মৃত হয়। অতএব প্রাণশক্তির চেষ্টা বা কর্ম্ম শরীর-ধারণের হেতু। এইরূপে শরীর ধারণরূপ প্রাণের কর্ম্মের এক ফল জাতি বা দেহ। প্রাণক্রিয়া সহজ হইলে স্বাস্থ্য সুখ হয়, বিকৃত হইলে পীড়া বা দুঃখ হয়। ইহারা ঐ কর্ম্মের ভোগ নামক ফল। সেইরূপ ক্রিয়া যতকাল স্বসামর্থ্যানুসারে চলিতে পারে ততকাল শরীর থাকে ইহার নাম আয়ুর্ফল।

অপর করুণশক্তির মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ সেচ্ছাচালন যন্ত্র। প্রাণকে অন্তর্গত করিয়া হস্তাদিশক্তি স্ব স্ব যন্ত্র গঠন করিয়া কার্য্য করে। প্রাণ যেমন উহাদের সহায়, উহারাও সেইরূপ প্রাণকে সহায়তা করে। কারণ সমস্ত করণশক্তির উপরে এক নিয়ন্তা আছে যাহার নিয়ন্ত্রণে সকলে একযোগে সমঞ্জসভাবে কার্য্যকরে। বাক্ পাণি আদি কর্ম্মেন্দ্রিয়শক্তিগণের কর্ম্মে প্রাণধারণের সহায়তা হয় ; উক্ত স্বাস্থ্যাদি ছাড়া অন্য সুখ দুঃখভোগ হয় এবং প্রাণধারণ কালেরও হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের কর্ম্মেরও ঐরূপ ফল। বহিঃস্থিত শব্দাদি ক্রিয়া ইন্দ্রিয়মধ্যে আগমন

* To the conception of the body as an assemblage of molecular thrills—some started by an agent outside the body, by light, heat, sound, touch or the like ; others begun within the body spontaneously as it were, without external cause, thrills which travelling to & fro, mingling with commuting each other, either end in muscular movements or die within the body—to this conception we must add a chemical one, that of the dead food being continually changed and raised into the living substances and of the living substance continually breaking down in to the waste matters of the body, by processes of oxidisation, and thus supplying the energy needed both for the unseen molecular thrills and the visible muscular movements—Encyclopaedia Britanica, 10th Edition, Vol. 19 page 9.

করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সক্রিয় করিলেই শব্দাদি জ্ঞান হয়। কর্ণাদি শক্তির দ্বারা শরীরের কর্ণাদি ইন্দ্রিয় নির্ম্মিত বা জাতি হয়। আর শব্দাদি জ্ঞানের দ্বারা যে সুখদুঃখভোগ ও আয়ুরক্ষা হয় তাহা প্রসিদ্ধ বিষয়।

অন্তঃকরণ শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা মস্তিষ্কাদি শরীরাংশ (জাতি) নির্ম্মিত হয়, আর প্রধান যে মানস সুখ ও দুঃখ (ভোগ) তাহা সংঘটিত হয় এবং আয়ুষ্কালও নিয়মিত হয়। এইরূপে দৃষ্ট কর্ম্মের দ্বারা জাতি, আয়ু ও ভোগ যে নিষ্পন্ন হয় তাহা প্রত্যক্ষত দেখা যায়।

কর্ম্মতত্ত্বের প্রধান বিষয়—পূর্ব্বে আচরিত কোন কর্ম্মেরদ্বারা কিরূপে পরে ঐ তিন প্রকার ফল হয়। সংস্কারের দ্বারাই উহা হয়। শরীরেন্দ্রিয়ের যে কোন কর্ম্মই হউক না কেন তাহার স্ফুট বা অস্ফুট অনুভব হয়। অনুভব হইলেই তাহার একরূপ ছাপ করণশক্তিতে ধরা থাকে। তাহাই সংস্কার। কোন জ্ঞান হইলে পরে তাহার স্মরণ হয় দেখা যায়। সংস্কারের জ্ঞানই স্মরণ জ্ঞান। তেমনি কোন চেষ্টা করিলে (চেষ্টা সব বোধমূলক) সেই চেষ্টা পরে সহজেই করা যায় বা স্বতই হইয়া যায়। ইহাও সংস্কার হইতে হয়। কারণ শক্তি না থাকিলে চেষ্টা হইবে কিরূপে? অতএব জ্ঞানের ও চেষ্টার শক্তিরূপ অবস্থাই সংস্কার। অনুভব ঘটিলে অন্তঃকরণে যে পুনঃ সেই অনুভব হইবার সুপথ হয় তাদৃশ বিশেষত্বের নামই সংস্কার (ছাপ কথাটা বাহ্য দ্রব্যের উপমায় বলা হয়। অন্তঃকরণ কালব্যাপী দ্রব্য, তাহার ছাপ যে বাহ্য দ্রব্যের মত নহে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে । অনুভব যত প্রবল (তীব্রতায় বা পুনঃ পুনঃ ঘটাতে) হইবে সংস্কারও তত প্রবল হইবে। ইহাও দৃষ্ট বিষয়। উপযুক্ত কারণে সংস্কারের স্মৃতি উঠিলেই সংস্কার অভিব্যক্ত হয়। অভিব্যক্ত হইলেই শরীরেন্দ্রিয়ে ও মনে ক্রিয়া হয়। সেই ক্রিয়া হইলেই শারীর ও মানস সুখ দুঃখাদি ঘটিবে (কিরূপ সংস্কারে কিরূপ ফল হয় তাহা সবিশেষ বিবৃত হইবে)। এইরূপেই পূর্ব্ব কর্ম্ম হইতে পরে ফল হয়। এই ভবিষ্য কর্ম্মফলের কারণ-কার্য্য-ঘটিত নিয়মসকল বিবৃত করাই কর্ম্মতত্ত্বের বিষয়।

যদি ইহজীবনই একমাত্র জীবন হইত তবে কর্ম্মতত্ত্বের বিশেষ আবশ্যক হইত না (একেবারেই যে হইত না তাহা নহে)। কিন্তু ইহজীবনই যে একমাত্র জীবন ইহা দার্শনিক যুক্তির নিকট বিন্দুমাত্রও স্থান লাভ করিতে পারে না। নিতান্ত মূঢ়ধী ব্যক্তিরাই অন্য জীবন নাই এরূপ অকল্পনীয় বিষয়ের আবিল কল্পনা মাত্র করিয়া থাকে, এ বিষয় অন্যত্র (সরল সাংখ্যে):বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে ; এখানে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। জন্মান্তর (যাহাকে পাশ্চাত্যেরা metempsychosis বা transmigration of soul বলেন) কোনরূপ mythও নহে বা অন্ধ বিশ্বাসও নহে। উহা সুদৃঢ় দার্শনিক যুক্তির ভিত্তিতে স্থাপিত তথ্য মাত্র।* "আত্মা" সম্বন্ধে ইহা ছাড়া যে সব মত আছে তাহা যে অন্ধবিশ্বাসমূলক তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। জন্মান্তর বিষয়ে এইগুলি প্রধান যুক্তি:—(১) যাহা আছে তাহা বরাবর কোন না কোন অবস্থায় আছে। 'আমি আছি" বলিয়া সকলের অবাধিত বোধ হয়; অতএব আমি বরাবরই কোন একরূপ ভাবে আছি।

* এ বিষয়ে Hume বলেন, "metempsychosis" বা জন্মান্তরবাদ "is the only antimaterialistic system which Philosophy could harken to" Huxley বলেন, "there is nothing in the analogy of nature against it and much to support it. Schopenhauer ও এইরূপ বলেন।

জড়বাদীরা বলিবেন উহা সত্য বটে কিন্তু "আমি" ম্যাটারের বা ভূতের অথবা বিশ্ব-বস্তুর দ্বারা নির্ম্মিত; অতএব "আমি" ম্যাটাররূপে বা বিশ্ববস্তুরূপে ছিলাম ও পরে সেইরূপে থাকিব। আমি যে ম্যাটারের দ্বারা নির্ম্মিত তাহার কোন প্রমাণ আছে? জড়বাদীরা তাহার কোন প্রমাণ দিতে পারেন না, কেবল উহা dogma রূপে লইয়া অন্ধবিশ্বাস করেন। বস্তুত ম্যাটার যে কি তাহাই যখন অজ্ঞেয়, তখন ম্যাটারের দ্বারা আত্মভাব সমস্ত নির্ম্মিত এই মত নিতান্ত ন্যায়-বিগর্হিত।

(২) প্রাচীন কালের লোকায়তরা বলিতেন জড়ের গুণ চৈতন্য; এখনকার জড়বাদীরাও (monist প্রভৃতিরা) বলেন Universal substance বা বিশ্ববস্তুর একগুণ Sensation বা বোধ। বোধ মানে কি? সকলকেই বলিতে হইবে, শব্দস্পর্শাদির বা সুখ দুঃখাদির অনুভবই বোধ। বাহ্য-বোধ কোন উদ্রেক পাইলেই হয়। উদ্রেক (শব্দাদি ক্রিয়া) স্তোকে স্তোকে হয়; সুতরাং বোধও খণ্ড খণ্ড রূপ হয়। বোধের স্বরূপ কি? "আমি সুখী", 'আমি দুঃখী", "আমি এই শব্দ জানিলাম", ইত্যাদি এক একটি অনুভব। এই সব অনুভবের 'আমি নামক এক কেন্দ্র বা প্রতিসংবেদী বা প্রতিফলক (reflector) হইতে সমস্ত প্রাণীর প্রতিফলিত ক্রিয়া (reflex action) সংঘটিত হয়। যেমন মানুষের পিঠে লাঠি পড়িলে মানুষ কাঁদে পলায়, কুকুরাদি ইতর প্রাণীর পিঠেও লাঠি পড়িলে তাহারা মানুষের মত আচরণ করে। স্থাবর প্রাণী উদ্ভিদেরও ঐ প্রতিফলিত ক্রিয়া হয়। আলানের দিকে লতার গমন (প্রথমে আলানের বোধ, পরে গমনরূপ প্রতিফলিত ক্রিয়া) উহার উদাহরণ। * ফলে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকেরা এবং অধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা সকলেই বলেন যে মানুষ হইতে উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর প্রাণধারণ প্রক্রিয়ার মৌলিক পার্থক্য নাই (পাশ্চাত্যদের মত পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)। প্রাণধারণের জন্য বোধ আবশ্যক; অতএব সর্ব্ববিধ প্রাণীর বোধ আছে।

আমার বোধ আছে ও তাহা কিরূপ তাহা আমি নিজেই অনুভব করিয়া জানি। অন্য ব্যক্তির যে বোধ আছে তাহা আমি অনুমানের দ্বারা জানি। অনুমান করি সাদৃশ্য দেখিয়া। ইহাতে সমস্ত মনুষ্য জাতির যে আমার মত আমিত্ব বোধ আছে তাহা জানি। প্রকৃত দার্শনিকেরা সর্ব্ব-প্রাণীর মৌলিক সাদৃশ্য দেখিয়া সর্ব্বপ্রাণীরই আমিত্ববোধ স্বীকার করেন। বস্তুতঃ ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। পাশ্চাত্যদের অনেকের পক্ষে ইহা (ইতর প্রাণীদের আমিত্ব স্বীকার) এক দুরুত্তার্য্য বিষয়। যদিচ নিরপেক্ষ কেহ কেহ ইহা স্বীকার করেন (যুক্তিযুক্ত বলিয়া)। কিন্তু উত্তমরূপে বিচার করিলে ভারতীয় মত ছাড়া যে গত্যন্তর নাই তাহা স্পষ্ট হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জ্ঞান হইলে যে ভাব হয় তাহা ভাষায় "আমি জান্‌ছি" এইরূপ বাক্যের দ্বারা ভাষাবিৎ মনুষ্যেরা প্রকাশ করে। উহা ছাড়া অন্যরূপ বোধ যে আছে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না; সুতরাং তাহা নাই। যদি বল আছে, তবে দেখাও তাহা কিরূপ; যদি বল তাহা থাকিতে পারে, তবে দেখাও তোমার বোধ ছাড়া কিরূপ বোধ হইতে পারে। "সোনার পাথর বাটীর উহা অলীক অকল্পনীয় বিষয়, সুতরাং দার্শনিক বিচারে উত্থাপ্যই নহে।

তোমার দুঃখ ঘটিলে "আমি দুঃখী" এইরূপ বোধ হয়। আর এক কুকুরের দুঃখ ঘটিলে তাহার উহা হয় না এরূপ বলার কিছুই হেতু নাই। কুকুর ভাষা জানে না যদি বল তাই উহার

* অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু ইহা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা দেখাইতেছেন। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বা reflex action এবং বোধ ও প্রতিবোধ এই দুই ভাব সমস্ত জৈব কার্য্যের সমতুল্য লক্ষণ।

ওরূপ জ্ঞান না হইতে পারে। তাহাতে ব্যক্তব্য এই যে, শিশু ও এড়মুকগণও (কালা বোবা) ভাষা জানে না ; তাহাদের দুঃখবোধ কি তোমা অপেক্ষা অন্যরূপ ? "আমি জানি" এই বাক্যের যাহা অর্থ বুঝ তাহা ছাড়া অন্যরূপ যে বোধ হইতে পারে ইহা অন্তত কল্পনাও যদি করিতে পার তবে বলিতে পার যে উহা ছাড়া বোধ হইতে পারে। নচেৎ "সসীম অনন্ত থাকিতে পারে" এইরূপ কথার ন্যায় "অন্যরূপ বোধ আছে" এই কথা অলীক।

অবশ্য ভাষাবিৎ ব্যক্তির কোন বোধের সহিত ভাষাজনিত বিজ্ঞান (concept) সম্প্রযুক্ত থাকে, কিন্তু মূল বোধ সর্ব্বপ্রাণীরই এক, ইহা চিন্তাকরা ও স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

(৩) "জড়ে চৈতন্য আছে" বা "বিশ্ববস্তুর (substanceএর) মধ্যেও sensation বা বোধধর্ম্ম আছে" এইরূপ কথা বলিলেই বলিতে হইবে সেই চৈতন্য বা বোধ 'আমি জান্‌ছি" এইরূপ বোধ।* "আমি জান্‌ছি" এই জানা সংহত্যকারী বা অনেক যন্ত্রের মিলিত ক্রিয়া। শরীর মন আদিরা যে বহু অঙ্গের মিলিত এক যন্ত্র বা organ তাহা সর্ব্বমতেই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব বোধ বা sensation বলিলেই বলিতে হইবে উহা সংহত্যকারী এক যন্ত্রের কার্য্য বা organised beingএর কার্য্য। অতএব "বিশ্ববস্তুর ধর্ম্ম বোধ" (অর্থাৎ জড়বাদীদের Univeral substance এর এক ধর্ম্ম sensation) এরূপ কথা বলিলে প্রকৃত পক্ষে বলা হইবে—বিশ্ববস্তুর সংহত্যকারী বোদ্ধা ব্যক্তিদের (যাহারা "জানে") সমষ্টি মাত্র। অতএব জড়বাদীরা যে বলেন "আমি পূর্ব্বে ম্যাটার "ছিলাম পরে ম্যাটার হইয়া থাকিব"—একথা বোধ্য হইলে ইহার অর্থ কি হইবে ? ম্যাটার যাহাদের মতে অজ্ঞেয়, তাহাদের মতে ঐ কথার অর্থ হইবে "আমি অজ্ঞেয় ছিলাম ও পরে অজ্ঞেয় থাকিব।" ইহা বিচারের পূর্ব্বেরই শঙ্কা, সিদ্ধান্ত নহে। আর বিশ্ববস্তুবাদী যাহাদের মতে বিশ্ববস্তুর ধর্ম্ম ম্যাটার, ক্রিয়া ও বোধ—তাহাদিগকে বলিতে হইবে "আমি পূর্ব্বে বিশ্ববস্তু ছিলাম পরেও বিশ্ববস্তুতে মিশিয়া যাইব।" কিন্তু বিশ্ববস্তুর এক ধর্ম্মবোধ এবং বোধ মানে "আমি জান্‌ছি" এইরূপ "জ্ঞানের ব্যক্তিত্ব।" সুতরাং তন্মতে অগত্যা বলিতে হইবে "আমি পূর্ব্বে বিশ্ববস্তুর অংশভূত একবোদ্ধা ব্যক্তি ছিলাম পরেও এক বোদ্ধা ব্যক্তি হইব" অর্থাৎ 'আমি' নামক বোধব্যক্তি (organised being) যাহা সর্ব্বপ্রাণীতেই বোদ্ধরূপে লভ্য তাহা অনাদিকাল হইতে আছে ও থাকিবে। এই জন্যই ভারতীয় দার্শনিকেরা জীবকে অনাদি বলেন। (৪) নদীর বালী যেমন ঘর্ষণাদি কারণে প্রত্যেকে বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট ও তাহাদের আকার প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ ঐ কারণে বদলাইয়া যাইতেছে, সেইরূপ ঐ বোধব্যক্তিদের বা দেহীদের আকার প্রকার প্রতিমুহূর্ত্তেই কর্ম্মরূপ কারণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে ও প্রত্যেকে বিভিন্ন। বোধব্যক্তি সকল দেহরূপ যন্ত্রের দ্বারা বোধ-চেষ্টাদি করে দেখা যায় ; কিন্তু দেহযন্ত্র কিয়ৎকালমাত্র স্থায়ী সুতরাং অনাদি বিদ্যমান দেহী অসংখ্য দেহধারণ করিবে।

(৫) দেহধারণের প্রক্রিয়া দেখিলেও ইহা স্পষ্টই নিশ্চিত হয় যে দেহের নির্ম্মাণ, বর্দ্ধন

* Sensation—গ্রহণ গ্রাহ্য নহে। জড়বাদীরা sensation বা বোধকে শব্দাদি ধর্ম্মের ন্যায় যে গ্রাহ্যধর্ম্ম মনে করেন তাহা নিতান্ত ভ্রান্তি। গ্রহণ শক্তির ও গ্রাহ্যমূলের সংযোগে যে জ্ঞান তাহাই শব্দাদি ও কঠিন, তরল, ব্যাপী আদি গ্রাহ্য জ্ঞান। বোধ বুঝিতে হইলে "আমি জান্‌ছি" এইরূপ বাক্যের দ্বারা বোধ

এবং পোষণ, এক উপরিস্থিত শক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। প্রাণী ক্ষুদ্র দেহবীজ লইয়া নিজের দেহ প্রথমে গঠন করে, পরে বর্দ্ধন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পোষণ করিতে থাকে।*

পাশ্চাত্যদের সূক্ষ্ম প্রাণবিদ্যা পর্য্যালোচনা করিলে এক উপরিস্থিত শক্তির উদ্রেকে যে শরীর নির্ম্মিত হইতেছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য হয়। একজন প্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিৎ শরীরনির্ম্মাণ বিষয়ে বলেন—"On physiological grounds it is reasonable to postulate that some force acts from above." অর্থাৎ শরীর নির্ম্মাণ বিষয়ে শরীরের ক্রিয়া তত্ত্ব অনুসারে দেখিলে বলিতে হইবে যে কোন এক শক্তি উপর হইতে ক্রিয়া করিয়া শরীর নির্ম্মাণ করে। "Life is directive force upon matter." অর্থাৎ প্রাণ ম্যাটারের উপর নিয়ন্ত্রণ-শক্তি—জড়বাদীদের একথা বুঝিতে হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে দেহধারণের পূর্ব্বে এক নিয়ন্ত্রণ-শক্তি থাকে যাহার নিয়ন্ত্রণে দেহ নির্ম্মিত হয়।†

বস্তুত পক্ষে প্রাণবিদ্যা অনুসারে দেখিলে দেখা যায়, দেহের সর্ব্বপ্রথম অবস্থা একটি ক্ষুদ্র কোষ (impregnated ovum) তাহা স্বগত শক্তির দ্বারা দুই হয়, সেই দুইটি পুন দুইভাগ হইয়া চারিটি হয়, এইরূপে কোষসকল বিভক্ত হইয়া সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয়। বর্দ্ধিত কোষসকল, যেরূপ শরীর হইবে তদনুসারে মূল হইতেই উপরিস্থ শক্তির দ্বারা সজ্জিত হইতে থাকে। প্রাণীর শরীর হইবে এরূপ কোষসকলও আছে এবং স্বয়ং প্রাণী স্বাধীন কোষসকলও আছে। স্বয়ংপ্রাণী কোষসকলও বিভক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হয় কিন্তু তাহারা ওরূপ সজ্জীভূত হয় না। বহুকে একযন্ত্রে যন্ত্রীভূত করিবার জন্য উপরিস্থ নিয়ামক একশক্তি চাই। সেই শক্তি কিরূপ তাহা তাহার কার্য্য দেখিয়াই বুঝা যায়। অর্থাৎ যেরূপ হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়, যেরূপ মস্তিষ্ক, যেরূপ হৃদয় ফুস্ফুস্ আদি যন্ত্রগণ নির্ম্মিত হয় সেই শক্তি তাহার অনুরূপ। সেই শক্তিতে ঐ সব যন্ত্রনির্ম্মাণের শক্তি সমাহৃতভাবে অনভিব্যক্ত অবস্থায় আছে, ক্রমশঃ তাহা যন্ত্রচালকরূপে যন্ত্রনির্ম্মাণ করতঃ অভিব্যক্ত হয়। বটকণিকা হইতে এক বৃহৎ বটগাছ হইল। কাহাকে না বলিতে হইবে যে সেই বটকণিকায় পূর্ণ বটবৃক্ষ জননের শক্তি অনভিব্যক্তভাবে নিহিত ছিল। তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি ঐ শক্তিতে নিহিত থাকে; তদনুসারে তাহার মস্তিষ্কাদি হয় ও সেই মস্তিষ্কাদি লইয়া ঐ শক্তি নিজের অনুরূপ কার্য্য করে। দেহধারণের হেতুস্বরূপ এই পূর্ব্ববর্ত্তী শক্তির স্বরূপ কি হইতে পারে? শক্তির ক্রিয়ার পূর্ব্বাবস্থা বা যাহা হইতে ক্রিয়া হয় তাহাই শক্তি। অতএব ঐ শক্তি মানস ক্রিয়ার শক্তি ও

* Sir Oliver Lodge এ বিষয়ে সুন্দর কথা বলেন। তিনি বলেন—"There was an individual organising power which put the matter together and here was our machine made of matter, a beautiful machine wonderfully designed and constructed unconsiously by us; but that was not the individual, the soul of the thing any more than the canvas and pigments are the soul of the picture." ইহা ঠিক ভারতীয় মতের অবিকল অনুরূপ।

† Inspite of the fact that the egg is a single cell, it is impossible to avoid the belief that in some way it contains the star fish. We need not of course think of it as containing the structure of a star fish but we are forced to conclude that its structure is such that it contains the star fish potentially. * * * Each must in some way contain its corresponding adult. In other words, the organisation must be within the cells and hence not simply produced by the association of cells.—H. W. Conn's Story of Life's Mechanism p. 141.

জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াশক্তি। সুতরাং উহাই জীব বা দেহী। এইরূপে দেহধারণ বিষয়ে বিচার প্রয়োগ করিলে তাহার হেতুভূত পূর্ব্বস্থিত এরূপ প্রাণী সিদ্ধ হয় যাহাতে তন্নির্ম্মিত দেহের আকার, প্রকার, জ্ঞান, চেষ্টাদি সমস্তের বীজ বা সংস্কার নিহিত থাকে। সুশ্রুত বলেন "ক্ষেত্রজ্ঞাঃ শাশ্বতা শ্চেতনাবন্তো লোহিতরেতসোঃ সন্নিপাতেষ্বভিজায়ন্তে" অর্থাৎ শাশ্বত চেতনাবান্ বোদ্ধা প্রাণীরা পিতৃমাতৃবীজের সন্নিপাতে বা মিলনে অভিজাত হয়।

এই জন্মান্তরবাদ ভারতবর্ষের সর্ব্ব সম্প্রদায় গ্রহণ কারন। প্রাচীন মিশর ও গ্রীসেও ইহা গৃহীত হইয়াছিল। এমন কি খৃষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতাব্দে খৃষ্টানেরাও অনেকে এই মতাবলম্বী ছিলেন। Neo-Platonistরাও ইহা মানিতেন। কিন্তু ভারতেই ইহা সম্যক্ দার্শনিক ভিত্তিতে স্থাপিত হয় এবং সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাচরণের ইহা মজ্জাস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মান্তর বাদের দার্শনিক তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞ কেহ কেহ মনে করেন ইহাতে দুইটি সাংঘাতিক আপত্তি (fatal objections) আছে।* তাহা যথা (১) স্মৃতির উপরই আমিত্বের বা ব্যক্তিত্বের একত্ব নির্ভর করে; কিন্তু যখন আমরা পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিতে পারি না তখন "সেই আমিই যে এই আমি" তাহা কি করিয়া বলি ?

(২) Soul নামক "আত্মা" যাহাই হউক না কেন, তাহার ধর্ম্মসকল শারীর ধর্ম্মের দ্বারাই বিশেষণীয়। একটা কুকুরের soul যদি একটা মানুষের শরীরে আসে (এরূপ অসম্ভবকে সম্ভব কল্পনাও যদি কর) তবে ঐ "সোল" এত পরিবর্ত্তিত হইবে যে তাহা আর কুকুরের "সোল"ই থাকিবে না।

যাঁহারা পূর্ব্বলিখিত বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই আপত্তি নিঃসার বোধ হইবে। প্রথমত soul নামক আত্মা এবং ভারতীয় দর্শনের "সংসরণশীল জীব" অত্যন্ত পৃথক পদার্থ। "জীব" একটা metaphysical essence নহে; কিন্তু psychological and physiological entity অর্থাৎ অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণনামক শক্তিযুক্ত "আমি"। বিস্মৃতির কারণ থাকিলে বিস্মৃতি হয়। যখন দেখা যায় শৈশবের কথা বিস্মৃত হওয়া যায় বা প্রবল রোগ বিশেষে লোকের পূর্ব্বকথার বিস্মৃতি ঘটে, তখন এক নূতন শরীর ধারণে যে বিস্মৃতি ঘটিবে ইহা খুবই ন্যায়সঙ্গত। তথাপি কোন কোন লোকের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি যে প্রকাশিত হয় তাহা সর্ব্বদেশের লোকের মধ্যেই খ্যাত আছে। আমাদেরও অনেক ঐরূপ স্মৃতির বিষয় গোচরে আসিয়াছে। এবিষয়ে Lodge ও Doyle এর উক্তি দ্রষ্টব্য। রোগজনিত বিস্মৃতি হয় বলিয়া বা শৈশবের কার্য্যের স্মৃতি থাকে না বলিয়া কি বলিতে হইবে যে তখন এক soul ছিল আর পরে অন্য এক soul হইয়াছে ? কোন কোন লোকের এরূপ আত্মবিস্মৃতি ঘটে যে তাহারা নিজের নাম ধাম ভুলিয়া যায় ও নিজের নাম অন্য মনে করে এবং ঘর বাড়ী ছাড়িয়া সেই নামেই

---

* There are fatal objections to it. The first is that personal identity depends on memory and we do not remember our previous incarnations. The second is that the soul, whatever it may be, is influenced throughout all its qualities by the qualities of the body. Modern psychology discredits the ideá that the soul is a metaphysical essence which can pass indifferently from one body to another. If (to suppose the impossible) the soul of a dog were to pass into a mans body' it would be so changed as to be no longer the same soul; and so, in a less degree, of change from one human body to another.—Encyclopaedia Britanica, 11th Ed. Tol 18, P. 26o.

জীবন যাপন করে (পরে হয়ত হঠাৎ পূর্ব্বকথা স্মরণ হয়)। এরূপ মস্তিষ্ক-বিকৃতি মধ্যে মধ্যে কাহারও কাহারও ঘটিয়া থাকে তাহা চিকিৎসা জগতে প্রসিদ্ধ আছে। তাহাতে বলিতে হইবে কি যে ঐরূপ ব্যক্তির soul বদলাইয়া যায়। ঐ সব ক্ষেত্রে বিশেষ স্মৃতি না থাকিয়া সামান্য স্মৃতি থাকে কেবল বদ্‌লায় বিশেষ কোন জ্ঞান। তাহার সশক্তি আমিত্ব-স্মৃতি ঠিক থাকে কিন্তু আমিত্বের নাম আদির বিস্মৃতি ঘটে। অতএব বিস্মৃতি ঘটিলেই যে soul পৃথক্ হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত ন্যায্য নহে।

আর পাশ্চাত্যেরা soul অর্থে যাহা বুঝেন, তাহাতে কুকুরের soul ও মানুষের soul পৃথক্ বস্তু হইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে জীব মানে যে পদার্থ তাহার শক্তির ও বিকাশভেদ আছে বটে কিন্তু মৌলিক ভেদ নাই। কুকুর নামক দেহীও অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ এই সব শক্তিমান্ সত্ত্ব, মানুষও তাহাই। কেবল ঐ ঐ শক্তি সকলের বিকাশের তারতম্য মাত্রই ভেদ। কুকুরের দর্শনশক্তি ও মানুষের দর্শনশক্তির আকারাদিগত ভেদমাত্র আছে, মৌলিক ভেদ নাই। জীবত্বের লক্ষণ জ্ঞান, চেষ্টা ও ধৃতি এই তিন শক্তিমান্ সত্ত্ব। মানুষ হইতে উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত সকলেরই ঐ কার্য্য দেখা যায়। ভেদ আকারের ও তারতম্যের। যেমন একই ধাতু দ্রাবিত করিয়া নানাবিধ ছাঁচে ঢালিলে নানা আকারের ও নানা ওজনের হয় কিন্তু সেই ধাতু একই থাকে, এক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ। কুকুরের দর্শনশক্তিও মানুষের চক্ষুর ছাঁচে (বাসনায়) প্রবেশ করিলে মানুষ চক্ষু হইবে। ছাঁচের দ্বারা যেমন ধাতুর পরিবর্ত্তন হয় না, শরীরের দ্বারাও সেইরূপ জীবত্বের পরিবর্ত্তন হয় না। অতএব উক্ত আপত্তিকারীর যুক্তি নিঃসার এবং প্রকৃত বিষয়ের অজ্ঞতা হইতে সম্ভূত।

পাশ্চাত্যদের মধ্যে অনেকে জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা পশু হইতে মনুষ্যরূপে অভিব্যক্ত হওয়া (evolution) বুঝেন, কিন্তু মনুষ্যের পশু হওয়া (involution) বুঝিতে অনিচ্ছু। তাঁহাদের দোষও নাই; কারণ এই বিষয়ের উত্তম প্রকরণ গ্রন্থ (যাহাতে উহার তত্ত্ব বিবৃত আছে, এরূপ) প্রচলিত নাই। পশু ও মনুষ্যে ভেদ কেবল শক্তিবিকাশের তারতম্য মাত্র। যেমন পশুর মন জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির বিকাশ হইয়া মনুষ্যদেহধারণ সম্ভব তেমনি মনুষ্যের ঐ ঐ শক্তির বিকাশের অভিভবে বা পাশব শক্তির বিকাশে পশুদেহধারণ সম্ভব হয়। জীব অনাদিকাল হইতে আছে, সুতরাং অসংখ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অসংখ্য অর্থে যতপ্রকারের দেহ হইতে পারে তত-প্রকারের অসংখ্য দেহ। অতএব সেই সব দেহের সংস্কার (যাহার নাম বাসনা) প্রত্যেক জীবেই আছে। কীটে মনুষ্যদেহের বাসনা আছে; মনুষ্যেও কীটদেহের বাসনা আছে। সেই বাসনাই ছাঁচস্বরূপ। উপযুক্ত কারণে তাহা অভিব্যক্ত হইলে, করণশক্তিসকল সেই আকারবান্ হয়। পশুও ঐরূপে মানুষ এবং মানুষও ঐরূপে পশু হইতে পারে।

যদি জীবের আদি থাকিত তবে এরূপ বিকাশের বা বিকাশবাদের ভিত্তি থাকিত। অনাদি জীব যদি অনাদিকাল হইতে অভিব্যক্ত হইতে হইতে আসিতেছে, তবে সর্ব্বপ্রাণীই এতদিন অভিব্যক্তির শেষে যাইত। আর যখন অনাদিকাল হইতে অভিব্যক্ত হইতে হইতেও অনেক জীব এখনও অভিব্যক্তির শেষে যাইতে পারে নাই—অত্যন্ত নিম্নস্তরেই আছে, তখন কখনও অভিব্যক্তির শেষে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। অভিব্যক্তির দিকেই বা কেন সব জীব যাইবে, অনভিব্যক্তির দিকেই

বা কেন যাইবে না। তাহার কোন হেতু নাই। অতএব অনাদিকাল হইতে যখন জীব আছে তখন যথাযোগ্য কর্ম্মরূপ হেতুতে কখন অভিব্যক্তির ও কখনও বা অনভিব্যক্তির দিকে চলিয়াছে—ইহাই ন্যায়সঙ্গত দর্শন।

কেমন করিয়া প্রাণীর দেহ প্রথমে উৎপন্ন হইল এই বিষয়ে অনেক থিওরী আছে। পৃথিবী প্রথমে অত্যুত্তপ্ত ছিল ; সুতরাং বর্ত্তমানের ন্যায় প্রাণীর বাসের অনুপযোগী ছিল। শীতল হইলে প্রাণী আবির্ভূত হইয়াছে ইহা নিশ্চয়। কিন্তু কেমন করিয়া প্রথমে প্রাণীদেহ হইল তাহার কিছুই ইতিবৃত্ত নাই। একমতে ঈশ্বরের বা প্রজাপতির ইচ্ছা হইতে প্রাণীদেহ হইয়াছে। আবার স্বতঃই বা অনুকূল নিমিত্ত পাইয়া প্রাণীরা দেহধারণ করিতে পারিয়াছে, ইহাও প্রাচীন শাস্ত্রে পাওয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞানে এবিষয়ে অনেক থিওরী চলিতেছে। কিন্তু কিছুই স্থির হয় নাই। তবে অনেকে মনে করেন প্রথমে এককৌষিক প্রাণী অথবা vadiove monera আদি এককৌষিক জীবেরও পূর্ব্ব অবস্থার জীব কোন এক অজ্ঞাত কারণে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়াছে; পরে বাহ্য নিমিত্তবশে ক্রমবিকাশ ক্রমে উচ্চপ্রাণীর দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয় প্রমাণিত সত্য নহে ; বিতর্ক বা speculation মাত্র। এককৌষিক প্রাণীদেহও বহুকৌষিকের ন্যায় সুযন্ত্রিত দেখা যায়। যদি তাহা স্বতঃই উৎপন্ন হইতে পারে তবে বহুকৌষিক প্রাণীর দেহও স্বত হইবে না কেন—এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক ঐ মতে আস্থা স্থাপন করেন না। এককৌষিক দেহ যেরূপেই হউক পরে উহা হইতে অভিব্যক্ত বা evolve হইয়া যে উচ্চপ্রাণীদেহ (বংশ-পরম্পরাক্রমে) হইয়াছে ডারউইনের এই অভিব্যক্তিবাদ (theory of descent) পাশ্চাত্য বিদ্যায় খুব প্রসার লাভ করিয়াছে। শীতোষ্ণ জল, বায়ু, খাদ্যের অভাব বা প্রাচুর্য্য বা ভিন্নতা, আত্মরক্ষা প্রভৃতি বাহ্য পারিপার্শ্বিক (environment) কারণে প্রাণীদের যে নূতন কর্ম্ম করিতে হয় তাহাতে তাহাদের শরীরও পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহাদের বংশও সেইরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে হয়, এইরূপে বহুকালে মনুষ্যশরীর পর্য্যন্ত হইয়াছে—ইহাই এই বাদের সার। যুক্তি স্বরূপ এই বাদীরা প্রাণীদের ক্রমিক পরিবর্ত্তন দেখান। প্রত্নপ্রাণিবিদ্যা (palaeontology) হইতে দেখান যে পৃথিবীর এক অবস্থায় যে প্রাণীরা ছিল পর অবস্থায় তাহারা পরিবর্ত্তিত আকারের হইয়াছিল। যেমন এক ভূস্তরে পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত ঘোড়া পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী (বহু লক্ষ বৎসরের পর) কালের স্তরে যে প্রস্তরীভূত অশ্বপঞ্জর পাওয়া যায় তাহাতে অঙ্গুলিসকল অবিকাশের দিকে পরিবর্ত্তিত দেখা যায়, পরে আধুনিক অশ্বের অঙ্গুলিহীন পদের বিকাশ হইয়াছে। যুক্তির দ্বারা ঐ বাদ স্থাপিত করার চেষ্টা করেন এবং ইয়ুরোপে ইহারই প্রাবল্য।

আমেরিকায় কিন্তু ঐ বাদের বিরুদ্ধ এক প্রবল সম্প্রদায় হইয়াছে। তাঁহারা বলেন ভূতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় এমনও দেখা যায়, বহু বহু লক্ষ বৎসরব্যাপী নানা ভূস্তরে একই প্রকার প্রাণী দেখা গিয়াছে ; যেমন (pterodactyle) টেরোডাক্টাইল্ বা পক্ষাঙ্গুলি প্রাণি বিশেষ। আরও তাহারা সুযুক্তি সহকারে বলেন যে বাহ্যকারণে (প্রাগুক্ত) প্রাণীদের দেহ পরিবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু তাহা অতি অল্পমাত্র এবং বংশপরম্পরায় যে তাহা সব চলিতে থাকিবে তাহার স্থিরতা নাই ["If such acquired characters are transmissible (a doubtful point)] Prop A. S. Pearse বলেন—"The pattern of evolution to set by environment, but there is little or no

evidence that changing environment causes adaptive variations of such a degree that new species are produced. Animals adapt themselves to environment by changing their system of activities, but such responses are apparently limited in extent to the inherent possibilities of variation already within the system. Animals have great powers of adaptation to environment, but are not fundamentally changed by it." অর্থাৎ—পারিপার্শ্বিক বাহ্যনিমিত্তবশে প্রাণীরা কিছু বদলায় বটে কিন্তু তাহাতে এক নূতন জাতি উৎপন্ন হয় না। কোন এক প্রাণিজাতির মধ্যে কতকটা পরিবর্ত্তিত হইবার স্বাভাবিক শক্তি থাকে বটে কিন্তু তাহার দ্বারা তাহাদের মৌলিক পরিবর্ত্তন (যেমন গাধা হইতে ঘোড়া হওয়া) হয় না।

আর এই অভিব্যক্তিবাদের (theory of descent) প্রধান প্রমাণ যে অল্পে অল্পে ক্রমপরিবর্ত্তন, তাহারও উদাহরণ পাওয়া যায় না। মানুষ বা ঘোড়াকে ক্রমশঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতি হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান জাতিতে উপনীত হইতে হইলে যত ক্রম (link) থাকা উচিত ছিল তাহার কিছুই পাওয়া যায় না বলিলে হয়। Dr. A. T. Schofield বলেন—"We fear we must at last part with our friend the 'missing link.' Leading scientists of the day., deny the existence of our friend anywhere. For man to have descended from the ape would require millions of years and a hundred links and of such there is no record nor any trace." এই সব কারণে mutation theory বা হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে জাত্যন্তরের আবির্ভাব এই বাদ প্রচলিত হইতেছে। বানর হইতে "নিয়াণ্ডারথল" মনুষ্য, পরে প্রায় লক্ষ বৎসরের পর "ক্রোম্যাগ্‌নো" মনুষ্য, পরে বর্ত্তমান ইউরোপের মনুষ্য—এই সকলের মধ্যে যে বিশাল ফাঁক আছে তাহা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। Prof. H. H. Sheldon বলেন"—In the past, anthropologists tried to trace the path from monkey to Neanderthal man, from Neanderthal man to Cromagnon and to the present modern man. * * * There is a vast gulf between the monkey living in the tree-tops with no evidence of family life and Neanderthal man who made his house in a cave, understood the use of fires, made many useful implements and who according to some, evidenc, performed ceremonial death-rites, Their is a vast difference between Neanderthal man who rambled through the forest with his curved spine holding him permanently in the stooped position, his knees always slightly bent and his brain beneath his heavy receding skull and modern man. * * In the case of the mutation theory we are forced to look upon man as a sudden creation in at least one sense of the word."

অস্মদীয় কর্ম্মতত্ত্বের সহিত অভিব্যক্তিবাদের বিশেষ সম্বন্ধ নাই এবং বিরোধও নাই। অভিব্যক্তিবাদ একরূপ দেহের বংশপরম্পরাক্রমে অন্যরূপে পরিবর্ত্তনের কথা মাত্র বলে। কর্ম্মতত্ত্বের তাহা অবান্তর কথা। যে শক্তির দ্বারা দেহধারণ হয় ও হইতে পারে এবং তৎসহ সুখদুঃখাদি

ভোগ হয় তাহাই কর্ম্মতত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়। একটা প্রাণিদেহ যে বাহ্যকারণে বা দৃষ্টকর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা কর্ম্মবাদের অনভিমত নহে। বৃকপালিত মনুষ্যশিশুরা এ বিষয়ে উদাহরণ। দৃষ্ট জন্মবেদনীয় কর্ম্মের দ্বারা অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপেই যে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণিজাতি হইয়াছে তাহার প্রমাণ নাই ও তাহা সম্ভবও নহে। এ বিষয়ে mutation বাদ বা হঠাৎ উৎপত্তিবাদ অধিকতর যুক্ত। কর্ম্মতত্ত্ব অনুসারে অনাদিকাল হইতে অসংখ্য প্রকারের জীবনামক সচেতন শক্তি আছে; তাহারা উপযুক্ত উপাদান পাইলেই দেহধারণ করিতে পারে। ইহা কর্ম্মবাদের মত, সুতরাং কর্ম্মবাদ mutation বাদেরও বিরোধী নহে।

অতঃপর সংক্ষেপে কর্ম্মতত্ত্বের বিবৃত সিদ্ধান্তসকল উক্ত হইতেছে:—

(ক) নিত্যদ্রষ্টা ও দৃশ্য ত্রিগুণ প্রাণীর মৌলিক নিমিত্ত ও উপাদান। প্রাণী অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ এই শক্তিসকলের সমষ্টি। তাহাদের ক্রিয়াই কর্ম্ম।

(খ) দ্রষ্টা ও দৃশ্য ত্রিগুণ নিত্য হওয়াতে তাহাদের সংযোগভূত দেহী জীব অনাদিকাল হইতে আছে। সুতরাং কর্ম্ম অনাদি।

(গ) কর্ম্ম করিলেই তাহার সংস্কার হয়। সেই সংস্কার হইতে অথবা তৎসহায়ে পুনশ্চ কর্ম্ম হয়? এইরূপে কর্ম্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে।

(ঘ) কর্ম্ম করিতে হইলে দেহ বা করণশক্তির অধিষ্ঠান চাই; দেহ কিয়ৎকালস্থায়ী সুতরাং অনাদি জীব অসংখ্য দেহধারণ করিয়াছে। দেহসকলের জাতি অসংখ্য প্রকার; অতএব জীব অনাদিকাল হইতে দেহধারণ করিয়া আসিলে অসংখ্য প্রকারের দেহধারণ, সংস্কার বা জাতিবাসনা আছে। যথাযোগ্য কারণে তাহা অভিব্যক্ত হইলে জীবের করণশক্তিসকল সেই আকারের হইতে পারে। অতএব দেহী সর্ব্ববিধ জন্মগ্রহণ করিতে পারে যদি তদুপযুক্ত কর্ম্মেরদ্বারা কোন জাতিবাসনা উদ্রিক্ত হয়।

(ঙ) কর্ম্মসকল দুইপ্রকার—(১) পূর্ব্ব সংস্কারবশে যাহা করা যায়। ইহাকে ভোগভৃত কর্ম্ম বলে। (২) সংস্কারের বিরুদ্ধে তদ্বিরুদ্ধ সংস্কারের সাহায্যে যাহা করা যায়। ইহাকে পুরুষকার বলে। ধর্ম্মশাস্ত্রের বৈধ ও নিসিদ্ধ কর্ম্মসকল পুরুষকার।

(চ) করণ চেষ্টাসকল অবাধ বা অনুকূলভাবে হইলে তাহাতে সুখবেদনা হয়, আর বাধিতভাবে হইলে তাহাতে দুঃখবেদনা হয়। সুখ ইষ্ট বলিয়া ও দুঃখ অনিষ্ট বলিয়া দেহী সুখের জন্য ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য কর্ম্ম করে। পূর্ব্বসংস্কারবশে যে সুখ দুঃখ লাভ হয় তাহার অন্যথা অর্থাৎ সুখের বর্দ্ধন ও দুঃখের হ্রাস করিতে হইলে পুরুষকার চাই। সংযমমূলক সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মই তাদৃশ পুরুষকার।

(ছ) মনুষ্য এতৎসম্বন্ধে যে সব আলোচনা করিয়াছেন তাহার বিবরণ দিয়া কর্ম্মবাদ এবং তত্ত্বদর্শন যে সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তি-যুক্ত তাহা দর্শিত হইয়াছে। ইহা যে met physical speculation মাত্র নহে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। সাংখ্যীয় তত্ত্বদর্শন speculation বা বিতর্কমাত্র নহে (যদ্দ্বারা বুদ্ধির কিছু ধার বাড়ে এরূপ নহে) কিন্তু সম্যক্ কার্য্যকর বিজ্ঞান। ইহার দ্বারা দুঃখ-নিবৃত্তির আরচণ বিষয়ে প্রাণী নিঃসংশয় হইয়া তদাচরণে সোৎসাহে চলিয়া প্রতিপদে ফললাভ করিতে থাকে।

———

সূর্য্যালোক

৺বলাইচাঁদ মল্লিক

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ"

সর্ব্ববিধ ব্যাধি হইতে পরিমুক্ত হইবার জন্য প্রাগৈতিহাসিককাল হইতে আর্য্যগণ সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া আসিতেছেন। বৈদিক ঋষিগণ "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" (ঋগ্বেদ ১ম ম, ১১৫ সূ)—স্থাবর জঙ্গম সকলেরই আত্মা সূর্য্য—এই সত্য জগতে ঘোষণা করিয়াছেন, এবং কি উপায়ে সেই সত্যকে লাভ করিতে পারা যায়, তাহার সুগম উপায়ও উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া এই সবিতৃ দেবের বরণীয় ভর্গ ধ্যান করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়া আসিতেছেন, এবং তাহার দ্বারাই আত্মতত্ত্ব লাভ করিতেছেন। ভারতবাসীর নিকট এ তত্ত্ব নূতন নহে। সুখের বিষয় এই তত্ত্ব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এক্ষণে স্বীকার করিতেছেন—Flammarian, Vans Kennedy প্রমুখ মনীষীগণ ইঁহাদের মধ্যে প্রধান। Flammarian একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ফরাসী পণ্ডিত। তিনি গণিত-জ্যোতিষ সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, শেষ বয়সে তিনি, মৃত্যুকালে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরে জীবের কি অবস্থা ঘটে এই সম্বন্ধে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহা অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। Colonel Vans Kennedy তাঁহার Nature and Affinity of Ancient and Hindu Mythology (1831) নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন—শেষে বলিয়াছেন—"This Savitri, the sun, is of course more than the fiery ball that rises from the sea or over the hills, but nevertheless, the real sun serves as a symbol and it was that symbol which suggested to the supplicant the divine power manifested in the sun." —"এই সবিতৃদেব বা সূর্য্য, যিনি সমুদ্র বা পর্ব্বত শিখর হইতে উদিত হন, ইনি কেবলমাত্র অগ্নি পিণ্ডের ন্যায় যাহা দেখিতে পাই তাহা নহেন—পরন্তু প্রকৃত পক্ষে সূর্য্য একটী প্রতীক মাত্র, তিনিই পরমাত্মার মূর্ত্তি, এই সূর্য্যের ভিতর দিয়া সেই পরমাত্মার শক্তি প্রকাশিত হইতেছে।"

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ ভাবে ইহার উপকারিতা লাভ করিতেছেন, তাহাই আমরা এস্থলে আলোচনা করিব। প্রথমেই আমরা ডাক্তার রোলিয়ারের। (Dr Rollier) কথা উল্লেখ করিতেছি—তিনিই প্রথমে "সূর্য্যালোকের" দ্বারা রোগনাশ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং এই উপকারিতা দেখাইয়া তিনিই "সুইজারলাণ্ডের, বোইসিন্ নগরে 'সৌরকিরণের চিকিৎসালয়" স্থাপন করেন। বিগত ২৫ বৎসর সূর্য্যালোক দ্বারা আমাদের শরীর সম্বন্ধে কি কি উপকার লাভ করিতে পারি তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা তথায় হইয়াছে।

প্রথমে ক্ষয়রোগ চিকিৎসার জন্য "সূর্য্যালোক" ব্যবহার করা হয়। ক্ষয়রোগ, বিশেষতঃ, শিশুগণের ঘাড়ের "বীচী" (গ্রন্থী) এবং হাড়ের ও সন্ধিস্থলের অংশ-বিশেষ রুগ্ন হইয়া পড়ে, সেই

সকল স্থলেও সূর্য্যালোকের উপকারিতা বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইয়াছে। এই উপকারিতা দেখিয়া ডাক্তার রোলিয়ার বিশেষ ভাবে সূর্য্যালোকের বিষয় সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন, যদিও এখনও পর্য্যন্ত তাহার গবেষণা শেষ হয় নাই, তথাপি "রৌদ্র চিকিৎসা" এবং "রৌদ্র স্নান" আমাদের মনুষ্যদেহের কিরূপে রোগের বীজাণু নষ্ট করে এবং কত রকমে আমাদের উপকার করে, তাহা দেখিয়া তিনি এই চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন।

রৌদ্রস্নান—আমাদের শরীরের বিশেষ উপকার করে। কিন্তু কিরূপে রৌদ্র-স্নান করিতে হয়, তাহাও জানা আবশ্যক। আমাদিগের শরীরের উপর সাক্ষাৎ ভাবে রৌদ্র লাগাইতে হইবে—কাচ প্রভৃতির ব্যবধানও থাকিবে না, এবং ঘরের ভিতর হইলেও চলিবে না। সাক্ষাৎ ভাবে মুক্ত বাতাসে, সূর্য্যালোক সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিতে হইবে। কাচের ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ উপকার হয় না, তাহার কারণ সূর্য্যরশ্মির মধে Ultra-violet বর্ণ আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী—সাধারণ কাচের মধ্যে সূর্য্যরশ্মি আসিলে সেই Ultra-violet বিকৃত হইয়া যায় সেই জন্য আমরা সাক্ষাৎভাবে সূর্য্যালোক ধারণের ন্যায় তাহার গুণ ও উপকারিতা লাভ করিতে পারি না।

জামা কাপড়ের ভিতর দিয়া আলোক ধারণ করাও সেই জন্য উচিত নহে। তাহাতেও এইরূপ উপকার হইতে আমরা বঞ্চিত হই।

এইরূপ খালি গায়ে মুক্ত স্থানে সাক্ষাৎ ভাবে সূর্য্যালোক ধারণ করার সহিত আরোও একটি কার্য্য করিতে হইবে। তাহাতে স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার হয়।

—এই অবস্থায় অবস্থিত হইয়া দীর্ঘভাবে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে। দীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাস লইলে, শরীরের ক্রিয়া যাহা অস্বাভাবিক ও মন্দীভূত ভাবে চলিতেছিল তাহা বেশ সতেজে ও স্বাভাবিক ভাবে চলিতে আরম্ভ করে, এবং আমাদের জড়তা দূর হইয়া বেশ সজীবিতা সম্পাদন করে। রক্তচলাচল বেশ সতেজ ভাবে চলিতে আরম্ভ করে। এবং তাহার দ্বারা অন্যান্য অঙ্গের কার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিতে থাকে। শরীরের বাহিরের চর্ম্ম এই সূর্য্যালোকের সঙ্গ ও শ্বাসের সাহায্য পাইয়া, তাহার কার্য্য প্রাকৃতিক নিয়মে পূর্ণভাবে করিতে থাকে। আমরা যেমন শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা বাহিরের আক্‌সিজেন গ্রহণ করিয়া থাকি সেইরূপ আমাদের চর্ম্ম দ্বারা ও বাহিরের নির্ম্মল বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহাতে আমাদের শরীরস্থ অগ্নি উদ্দীপিত হয়। ইহাতে ক্ষুধা-মান্দ্যাদি রোগও অপসারিত হয়।

ইহার দ্বারা আরও একটী বিশেষ কার্য্য সাধিত হয়। যে মনকে আমরা কিছুতেই স্থির করিতে পারি না, তাহাও স্থির হইয়া যায়। আর শরীরের যেরূপ ব্যাধি আছে - মনেরও সেইরূপ সাধারণতঃ ব্যাধি আছে, শরীর যেমন পরিশ্রমাদিতে নিস্তেজ হইয়া পড়ে, পরিশ্রম করিতে পারে না—মনও সেইরূপ কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না—মনও নিস্তেজ জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। ইহাকে সাধারণতঃ "স্যান" বলে। এ মানসিক জড়ভাব ও সূর্য্যালোক গ্রহণের ফলে দূর হইয়া যায়। এবং আয়ও হইয়া যায়।

শাস্ত্রেও এ বিষয়েরও উপদেশ অনেক আছে। তাহাতে ইহার পূর্ব্বে তত্ত্ব-বিষয়ক সাধকের জ্ঞান ও নির্জ্জনবাস এবং অন্ন দোষ পরিত্যাগের কথার বিধান আছে যথা—

বৃদ্ধতত্ত্বেন ধীদোষ শূন্যেনৈকান্তবাসিনা।
দীর্ঘংপ্রণবমুচ্চার্য্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে ॥
জিতে তস্মিন্ বৃত্তিশূন্যং মনস্তিষ্ঠতি মূকবৎ। ৪৩।

যিনি তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন এবং কাম ক্রোধাদি বুদ্ধি দোষও পরিহার করিয়া একান্তে নির্জ্জন বাস করিতেছেন তিনি যদ্যপি দীর্ঘ প্রণব অভ্যাস করেন, তাহা হইলে তাহার মন বশীভূত হয়, মন বশীভূত হইলে বৃত্তিশূন্য ও স্থিরভাবে অবস্থান করে।

নিয়মিত ভাবে, প্রাতঃসূর্য্যালোক সেবন করিলে শরীরে বলাধান, সৌন্দর্য্য ও আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারা যায়। বেন্‌জামিন্ ফ্রাঙ্কলীন তাঁহার স্ব-রচিত জীবন বৃত্তান্ত মধ্যে মুক্তবায়ু এবং সূর্য্যালোকের উপকারিতা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। অন্যান্য লোক যেরূপ প্রাতঃকালে শীতে কাতর হইয়া পড়েন, বেনজামিন্ সেইরূপ কাতর হইতেন বটে কিন্তু প্রতিদিন তিনি নিয়মিত ভাবে প্রাতঃকালে বালসূর্য্যের আলোকের সেবা করিতেন—আপন বাটীর প্রাঙ্গণে তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ রূপে, এই রৌদ্র সেবা করিতেন তাহার ফলে তিনি সমস্ত দিনই কঠোর পরিশ্রম করিতে পারিতেন এবং বৃদ্ধ বয়সেও রোগ তাঁহাকে বিশেষ রূপে আক্রমণ করিতে পারে নাই।

ঋতুর পরিবর্ত্তনের সহিত সূর্য্যালোকের উপাদানেরও ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সমশীতোষ্ণমণ্ডলে (Temperate Zone) ও গ্রীষ্ম এবং বসন্ত কালে Ultra Violet (ধূমলবর্ণের অতীত বর্ণ) অধিক পরিমাণে বিকীর্ণ হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য আমরা যখন বৎসরের মধ্যে সূর্য্যালোক অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হই, সেই গ্রীষ্মকালে Thyroid glandএ আওডাইন অধিক পরিমাণে নিঃসারিত হইয়া থাকে।

শীতকালে যাঁহারা ঘরের ভিতর অধিক সময় অতিবাহিত করেন, বাহিরে প্রায় বাহির হয়েন না তাঁহাদের শরীরে রক্তহীনতার ভাব স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার তাহার সহিত যদি তাঁহাদের কোন শারীরিক পরিশ্রম না থাকে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের সুবিধা না থাকে এবং সর্ব্বোপরি তাঁহাদের স্বাস্থ্যকর আহার্য্য গ্রহণের ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে অনেক প্রকার অসুখ ভোগ করিতেই হইবে।

হিন্দুশাস্ত্রে রূপকভাবে সূর্য্যালোকের বিষয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে।—

"সপ্তাশ্বরথমারূঢ়ং প্রচণ্ডং কশ্যপাত্মজম্। এক চক্রধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্ ॥"

— যিনি সপ্ত অশ্বদ্বারা বাহিত এবং এক চক্রযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার তেজ অতিশয় প্রচণ্ড, সেই কশ্যপাত্মজ সূর্য্যদেবতাকে আমি প্রণাম করি।

সপ্ত অশ্ব, সপ্তবর্ণ এবং এক চক্র শ্বেতবর্ণ। ধূম্রল (লীন ঘোর নীল) ঈষৎ নীল হরিৎ হরিদ্রা পাটল রক্ত এই সপ্ত বর্ণ। এই সপ্ত বর্ণ পর পর রাখিয়া সেই গুলি চক্রাকারে বেগে ঘুরাইলে এই সাত বর্ণ একমাত্র শ্বেত বর্ণে পরিণত হইবে।

বেলোয়ারী ঝাড়ের কলমের মধ্যে সূর্য্যরশ্মি পড়িলে, দেওয়ালে তাহার যে প্রতিবিম্ব পতিত হয় তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সাতটি বর্ণই দেখিতে পাওয়া যায়। এবং বর্ণগুলি পুনর্ব্বার একাধারে বিন্যস্ত করিলে পুনরায় সাদা রংয়ে পরিণত হইয়া থাকে। এই সাতটি স্বতন্ত্র বর্ণই সাত প্রকার

স্পন্দনে স্পন্দিত হয়। এই জন্যে প্রত্যেক বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ফল হইয়া থাকে। এই সাতটি রং যেমন আমরা চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই, তাহারই কার্য্য বা স্পন্দন আমরা স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই, সেইরূপ আমরা যে সকল বর্ণ দেখিতে পাই না, আমাদের পক্ষে অদৃশ্য—তাহাদের ক্রিয়া আমাদের শরীরের উপর হইয়া থাকে। ইহাই ত্রিবিধ ভাবে হইয়া থাকে। কতকগুলি উত্তাপ, কতকগুলি যৌগিক (mechanical) এবং কতকগুলি রাসায়ণিক ভাবে আমাদের শরীরে ক্রিয়া করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে Ultra violetর কথা বলা হইয়াছে, তাহা আমাদের শরীরে বিশেষ অভ্যন্তরে কোন ক্রিয়া করে না, সাক্ষাৎ ভাবে ঐ বর্ণ আমাদের কেবল মাত্র চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ করে মাত্র। কিন্তু ঐ রশ্মি আমাদের ত্বকের কোষাণুর উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে।

সূর্য্যালোকে শরীর উন্মুক্ত রাখিলে শরীরে শক্তিও বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরে দৃঢ়তা সম্পাদন করে। মনের জড়তা দূর হয় এবং অধিক কার্য্য করিতেও সক্ষম হয়। তাহার সঙ্গে আশা উৎসাহ এবং জীবনের সুখময় ভাব বৃদ্ধি করিতে থাকে।

ডাক্তার সিউইণ্ড (Dr. Schuind) বলেন "সূর্য্যালোকে স্নান করিলে পুনর্জ্জীবন লাভ হয়—জীবন ভারবোধ না হইয়া সুখকর—জীবনধারণ সফল বলিয়া মনে হইবে। মানসিক প্রফুল্লতা লাভ হয়। সৌরস্নানের আরও বিশেষ ফল এই যে, শরীরের মধ্যে যদি কোন আভ্যন্তিকক অঙ্গে রক্ত বিশেষভাবে জমিয়া যায় এবং রক্তের চাপ যদি অধিক হইয়া পড়ে, তাহাও প্রশমন করিয়া দেয়। রক্তের রক্তবর্ণ কোষাণুও বৃদ্ধি করাইয়া দেয়। মূত্রাশয়ের ক্রিয়া অতি উত্তম ভাবে চলিতে আরম্ভ করে, শ্বাসের গভীরতাও বৃদ্ধি করে. এবং রক্তমধ্যে অক্‌সিজনের মাত্রাও বৃদ্ধি করাইয়া দেয়। এই সকল ক্রিয়াই স্বাস্থ্যের অনুকূল এবং প্রকৃতিরও অনুকূল।

পূর্ব্বে যে Ultra Violetর কথা বলা হইয়াছে তাহা শরীরের মধ্যে কোন অঙ্গে লাগাইলেও সকল শরীরেই তাহার দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। সূর্য্যদেব আমাদের শরীরের উপরিভাগে চর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্তের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্য ভাবে করিয়া থাকেন, তাহার ফলে সর্ব্বশরীরই বিশেষ উপকার পাইয়া থাকে। ইহা এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যে সৌরস্নানে রক্তের মধ্যে ক্যালসিয়ম্ (Calcium), ফস্ফরাস (Phosphorus) এবং লৌহের ভাগ বৃদ্ধি করিয়া থাকিয়া তাহার দ্বারা আমাদের শরীরে রক্তহীনতা দূর হইয়া থাকে।

সৌর্য্যালোক

সৌর কিরণের আরও একটি বিশেষ গুণ এই যে আমাদের রোগের মূল যে সকল জীবাণু (Germ) সেই জীবাণু সকলকে (Bacteria) ও নাশ করিয়া থাকে। রোগের বীজাণু, অন্ধকারে, আর্দ্র এবং উত্তপ্ত স্থলে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু সৌর কিরণে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি যক্ষ্মা (Tuberculosis)র বীজাণু কয়েক ঘণ্টা সৌর কিরণের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে রাখিলে নষ্ট হইয়া যায়। ফুস ফুসের প্রদাহ (Pneumonia) সম্বন্ধীয় জীবাণুও এবং অন্যান্য অনেক রোগের বীজাণু যাহা আমরা বুঝিতে পারি না, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য সকল দেশে, বিছানা এবং

পরিধানের বস্ত্রাদি রৌদ্রে দিবার ব্যবস্থা অনেক দিন হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। কেবল পরিধানের বস্ত্রাদি নহে, আমাদের ব্যবহার্য্য সকল দ্রব্যই রৌদ্রে দেওয়া উচিত, তাহাতে কোন প্রকার রোগের বীজাণুর প্রভাব থাকে না। যে সকল ক্ষত বা ঘা অনেক দিন রহিয়াছে, কোন প্রকারের ঔষধে ভাল হয় না, তাহা ও সূর্য্যকিরণে আরোগ্য হইয়া থাকে। অনেক চর্ম্মরোগ ও বিশেষতঃ ব্রণাদিও সৌরালোকে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দেশ সূর্য্যালোকের আরও একটী প্রধান বিষয়ের উপকারিতা জানিতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষে আতুড়ের শিশুকে সূর্য্যালোকে রাখিয়া দিবার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার দ্বারা শিশুর অঙ্গ পুষ্টির বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। কোনও রূপ শিশুরোগে আক্রান্ত হয় না। সাধারণতঃ শিশুগণের রিকেট (Ricket) রোগ ইয়ুরোপে বিশেষ প্রবল। সূর্য্যালোকের অভাব এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুকে রৌদ্রে না দেওয়া "সেকতাপ" না দেওয়ায় ইহা প্রায় ঘটিয়া থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলে (tropics) প্রায়ই এরোগ দেখিতে পাওয়া যায় না—তাহার কারণ গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শিশুগণকে প্রায় রৌদ্রে প্রতিদিনই রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে এ সকল রোগ প্রায়ই হয় না। প্রখর সূর্য্যালোকে শিশুগণকে এবং বালক বালিকাগণকে খেলিতে দিলে, অপকার না হইয়া উপকারই হইয়া থাকে। খাদ্যাভাবে যেমন শরীর রক্ষা হয় না, সেইরূপ সূর্য্যালোক অভাবে শরীরের স্বাস্থ্য ও রক্ষা করা যায় না। যে সকল ছেলে সহরের সূর্য্যালোক বিহীন ঘরে বাস করিয়া, সেইরূপ স্থানেই খেলা করিয়া থাকে তাহাদের সহিত যে সকল ছেলে প্রদীপ্ত সূর্য্যালোকের সঙ্গ পায় এবং মুক্ত বায়ু ও সেবন করিতে পায় তাহাদের স্বাস্থ্যের তুলনা করিলেও বুঝিতে পারিবে না।

কালরংয়ের বা মোটা রকমের কাপড় ব্যবহার করা ভাল নহে। তাহা ভেদ করিয়া সূর্য্যালোক শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না—বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে সহজ সাদা হাল্কা কাপড় ব্যবহার করিলে উপকার হইয়া থাকে! সকলের পক্ষে সাদা কাপড় ব্যবহার করা উচিত। ঈষৎ নীল বা ফিকা নীল বা পাশুটে রং বরং ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু এইটি সকল সময়ে মনে করিতে হইবে যে সূর্য্যের তাপ আমাদের উপকার করে না কিন্তু সূর্য্যের আলোকেই আমাদের সর্ব্ববিধ রোগ ধ্বংস করিয়া থাকে।

প্রথমে সূর্য্যালোক পাঁচ মিনিটের অধিক সময় করিবে না এবং শরীরের মধ্যে পাদদ্বয় হইতে অভ্যাস করিবে। তাহার পর সময়ও শরীরের অন্যান্য অবয়বের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া শেষে তিন ঘণ্টা বা অধিক কাল অভ্যাস করিতে পারা যায়। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোক গ্রহণ করিবেন না—প্রাতঃ সূর্য্যের আলোকই গ্রহণীয়।

চক্ষুদ্বয় ও মস্তক রক্ষা করিয়া আলোক ধারণ করিতে হইবে। তাহাতে চক্ষুর জ্যোতি রক্ষা করিয়াই উহা ধারণ করিতে হইবে।

দৃষ্টির সাধনা

অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত সঞ্জীব চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্

(নেপাল)

সাধনার পথ অসংখ্য। কত লোক যে বর্ত্তমান যুগে সাধনার কত পথে অগ্রসর হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কাহারো পথ অর্থ-সাধনা, কাহারো পথ রাজ্য-সাধনা, কাহারো পথ বিজ্ঞান-সাধনা, সাহিত্য-সাধনা ও নীতি-সাধনা। আবার অন্য কাহারো পথ ইতিহাস-সাধনা, রাজনীতি-সাধনা, ধর্ম্ম-সাধনা বা মুক্তি-সাধনা। যে যে পথের সাধক সে সে পথকে সত্যপথ, উন্নতির পথ, আপনারও জগতের কল্যাণের পথ বলিয়া ধরিয়া নিতেছে। তাহার সাধনার পথ তাহার নিকট অক্ষত, অবিমিশ্র ও অনাবিল বলিয়া মনে হইতেছে। সকলেই প্রকারন্তরে শক্তি সাধনা করিতেছে। কিন্তু সে শক্তি কি জাতীয়, কোথায় তাহার পরিণতি সে দৃষ্টি তাহারা করিতেছে না। সে বিচারের দিকে ভাল রকম দৃক্‌পাতও করিতেছে না। অর্থের যেমন মোহ আছে, ক্ষমতার যেমন মাদকতা আছে, 'সাধনা' কথাটিরও তেমন মাদকতা আছে। সাধনা বলিলেই যেন মনে একটা শ্রদ্ধা আসে। সুতরাং যে জাতীয় সাধনাই হউক না কেন, তাহার দু' পাচটা আপাত মধুর সুফল দেখা দিলে মানুষ মত্ত হইয়া প্রবৃত্তির অনুসারে সে পথে ছুটিয়া যায়। ইহাই আধুনিক জগতের রীতি। এবং এই ক্ষুদ্র দৃষ্টির জন্যই বর্ত্তমান জগতে এত উঠাপড়া, এত গোলমাল এবং Relativity বা সম্পর্ক-নীতির দোহাই দিয়া বিভিন্ন মতের এত সমর্থন।

এই চাঞ্চল্যের জন্য দায়ী কে? কি কারণেই বা আধুনিক জগতের এই অহরহঃ মতি-পরিবর্ত্তন? পূর্ণ Democracy বা গণ-তন্ত্রের দিনে রাজতন্ত্রের প্রশংসার সুর আবার ইংলণ্ড হইতেই বাজিয়া উঠিতেছে; Relativityর বা সম্পর্কনীতির কর্ত্তা Einstein বৃদ্ধবয়সে আবার Absolutism এর দিকে গা' ঢালিতেছেন, বিজ্ঞানচর্চ্চায় পুষ্ট নরধ্বংসী মহাস্ত্রগুলি Disarmament Canference এর হস্তে আত্মসম্মান হারাইতেছে এবং এতকাল পুষ্ট ঘোরতর violent নীতি Non-violenceএর কাছে লজ্জাস্কর পরাজয় স্বীকার করিতেছে এবং আরো কত কি হইতেছে। এ সমুদয় বৈষম্য কেন? আমাদের বিশ্বাস এই বৈষম্যের হেতু মানুষের "দৃষ্টির সাধনার" অভাব। দৃষ্টি-সাধনা মানুষের আদি সাধনা নহে বলিয়া—এবং প্রকৃত দৃষ্টির সাধনার পূর্ব্বে মানুষ কোন না কোন প্রকার সাধনার মোহে ধরা পড়িয়া যায় বলিয়া, মানব সমাজের এই ঘোরতর নিত্য পরিবর্ত্তন-শীল নীতি-সমূহের উপাসনা এবং তাহাদের পায়ে অসংখ্য মহাপ্রাণের অনর্থক আত্মবলিদান। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় কারণ আমাদের চক্ষে পড়ে না।

কথাটি আরো কিছু পরিষ্কার করিয়া না বলিলে হয়তো স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে না। একদিন হঠাৎ কলিকাতা Senate Houseএর সাম্নে কোনও এক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ Doctor of Science এর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি লেখকের বাল্যবন্ধু। সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, তিনি Research করিতেছেন। আমি বলিলাম Research

তো ভাই! সারা বৎসরই কর। ছুটিতে একবার পিতামাতার চরণে গিয়া ছুটিমাস কাটাইয়া আস না কেন?" তিনি ইঙ্গিত করিলেন, Science পৃথিবীর উপকার করে—সুতরাং সে সেবা ও সে সাধনা বহু উচ্চে। বিজ্ঞান সাধনার মূল্য যে আমার জ্ঞাত নহে তাহা ঠিক্ সত্য নহে। তবুও চিন্তা করিয়া তাহাকে একটি প্রশ্ন করিলাম, "Do you really know whether your science is a devil or a god. Can you answer me that it is all God only?" তিনি একটি জবাব দিলেন। সে জবাব হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে বহু আধুনিক তথাকথিত প্রত্নতত্ত্ববিৎ-গণের ন্যায় আমার বন্ধুরও একটি জিনিষ নাই—সেটি "দৃষ্টির সাধনা।" "দৃষ্টির সাধনার" স্তর তিনটি। প্রথম স্তর সত্যের অবয়ব-দর্শন; দ্বিতীয় স্তর তাহার মন-দর্শণ, তৃতীয় স্তর তাহার আত্মা-দর্শন।

মানুষের যেমন অবয়ব, মন ও আত্মা আছে সত্যের ও তেমনই অবয়ব, মন ও আত্মা আছে। মানুষের মধ্যে যেমন অবয়ব, মন ও আত্মার দিক্ হইতে পার্থক্য আছে, সত্যেরও তেমনই প্রকারের পার্থক্য আছে। কোনও মানুষকে চিনিতে হইলে যেমন শুধু তাহার অবয়ব দেখিয়া চেনা যায় না, তাহার মন প্রাণের দিকে দৃষ্টি থাকা চাই, সত্যের জগতেও সে বিচার খাটে। সত্যের অবয়বে মুগ্ধ হইলে সত্য দর্শন হয় না। মাকালের অবয়ব অত্যন্ত সুন্দর; ব্যাঘ্রের অবয়বও সৌন্দর্য্যের দিক্ হইতে ঘৃণ্য নহে; সুন্দর মানুষটি দেখিলে প্রথমতঃ তাহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া দেখিলে কিছুক্ষণ মিশিয়া পরীক্ষা করিলে হয়তো বুঝা যাইবে যে সোণার রঙে সর্ব্বদা সোণার মন থাকে না। সত্য সাধনার পথেও ঠিক্ এই বিচার অত্যাবশ্যক। সত্যের মনপ্রাণ না দেখিয়া শুধু অবয়ব দৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়াছে বলিয়া আজ তথাকথিত অত্যুন্নত দেশগুলিরও ঐহিক পারত্রিক হিসাবে এই দুরবস্থা; তাহারা যেন কোন এক অজানা দেশে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে—শান্তির ও তৃপ্তির আশা করিয়া সে দেশে আসিয়াছে সত্য, কিন্তু সেখানে শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সেখানে শুধু শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উপদ্রব (অথবা সোজা কথায় বলিতে গেলে সেখানে শুধু "নরক"।।

পঞ্চ জাতীয় সত্য-সাধনা আধুনিক জগতে প্রবল—প্রথম বৈজ্ঞানিক, দ্বিতীয় রাজনৈতিক, তৃতীয় নৈতিক, চতুর্থ কলাবিদ্যাসম্বন্ধীয় এবং পঞ্চম ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। শুধু অবয়ব দেখিতে গেলে বৈজ্ঞানিক সাধনা অত্যন্ত মঙ্গলজনক। কেননা বিজ্ঞান প্রকৃতির আশ্চর্য্য শক্তি মানুষের নয়ন পথে আনে—বিজ্ঞানে জগতের লোক একে অন্যের নিকটে আসে ও পরস্পরকে ভালরকম চিনিতে পারে—বিজ্ঞানে মানুষের সুখের বস্তুর আধিক্য হয় ও শারীরিক ক্লেশের অপনোদন হয়। কিন্তু অভ্যন্তর দেখিতে গেলে দেখা যায় তাহাতে যে সর্ব্বনাশী শক্তি নিহিত করে তাহার সংযম না হইলে শুধু কয়েক বৎসরে ধরিত্রী মানবশূন্য হইতে পারে—বিজ্ঞানে একজাতীয় লোক অন্য জাতীয় লোকের উপর অসীম অত্যাচার অবিচার করিতে পারে—বিজ্ঞানের সুখবস্তু ও সুখলিপ্সা মানুষকে নৈতিকপথ ও ধর্ম্মপথ হইতে সম্পূর্ণ বিচলিত করিতে পারে এবং বিজ্ঞান মানুষের অভ্যন্তরের সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে শুধু utility এর দিক্ হইতে দৃষ্টি করিয়া তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে (Democracy বা প্রজাতন্ত্র ও তদ্রূপ। "মানুষ ভাই ভাই একের অন্যের উপর অত্যাচারকারী অন্যায় যে যাহার স্বাধীন ইচ্ছামত রাজনীতি ক্ষেত্রে বিচরণ করুক—বর্ত্তমান সমাজকে ভাঙ্গিয়া

সকল লোককে সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী করিয়া দাও—সকলেই সুখে থাকুক এ সমুদয় প্রজাতন্ত্রের আদর্শ। ইহারা বড়ই আপাতমধুর। কিন্তু সাধকের দৃষ্টি সাধনা তাহাকে বলিয়া দেয় যে এ সমুদয় Democratic সত্যের শুধু অবয়ব। তাহার মন নহে—আত্মা ত নহেই। এত শ্রদ্ধার প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে ও এমন বিষবৃক্ষের বীজ নিহিত আছে যে দৃষ্টি ঠিক্ না রাখিয়া, সংযমের দিক পুষ্ট না রাখিয়া চলিলে অবিমিশ্র প্রজাতন্ত্র পৃথিবীতে মনুষ্যের মধ্যে ভীষণ মনুষ্য-দ্রোহিতার সৃষ্টি করিতে পারে এবং তাহাতে আবার মানুষ রাজতন্ত্রের জন্য উন্মত হইয়া রাজতন্ত্রকে আদর্শ মনে করিয়া তাহারই জন্য আবার কয়েকটি কুরুক্ষেত্রের রক্তপাত করিতে পারে এবং যেই ছাপাযন্ত্রগুলি মনুষ্যের এত আদরের তাহারা তীব্র বিভেদের বীজ রোপণ করিয়া মানুষের সর্ব্বনাশের পথ সুগম করিয়া রাখিতে পারে। এইত গেল রাজনীতির কথা। অবয়ব দেখিয়া সাহিত্য-সাধনা যে কত সর্ব্বনাশী এবং মানুষের মনকে কত অধঃপাতে নিতে পারে, তাহার পরিচয় বর্ত্তমান আমেরিকা ও ইংলণ্ডের উপন্যাস এবং আমাদের জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাসগুলি। প্রাণহীন "অবয়ব-দৃষ্টি"-প্রসূত সাহিত্য-সাধনার বিষময় ফল মানুষের চক্ষে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং শীঘ্রই হয়তো উহা সার্ব্বজনীন বিশ্বাসের ক্ষেত্র পাইবে।

আধুনিক জগতের নীতির দৃষ্টিও "অবয়ব দৃষ্টি" এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে ধর্ম্মের দৃষ্টিও "অবয়ব দৃষ্টিতে"ই পর্য্যবসিত। আজ কাল আমরা নীতির "প্রাণ" দেখি না, "মন" দেখি না—দেখি শুধু অবয়ব। এ ভ্রমে কত সনাতন সর্ব্বমঙ্গলময়ী নীতিকেই যে আমরা বিজ্ঞান ও ভাবপ্রবণতার জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত না হওয়াতে ত্যাগ করিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার ধর্ম্ম-সাধনা তো ঋষির ও সাধকের হাত ত্যাগ করিয়া কবির এবং রাজনৈতিক ভাব-প্রবণতার হাতে পড়িয়া কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। তাই এযুগে চাই সকল সাধনার উপর "দৃষ্টির সাধনা"। মানুষ বুঝুক, বিশেষতঃ এ দুর্দ্দিনে আমাদের ভারত বুঝুক, যে "দৃষ্টির সাধনাই" মানুষের আদি সাধনা। যাহা অটুট্ সত্য বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইতেছে মানুষ উন্নত আত্মদৃষ্টির দ্বারা সে সত্যের "মন ও আত্মা" দেখিয়া তাহাকে সাধনার উপযুক্ত মনে করিলে সে সাধনায় প্রবৃত্ত হোক, ইহাই আমাদের কামনা। মানুষের হৃদয়ে সত্যের অন্তঃদৃষ্টির সাধনা জাগ্রত হউক এবং মানুষ প্রথমে "দৃষ্টি সাধনা" করিয়া পরে "সত্যসাধনা"র পথে অগ্রসর হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কবীরের দোঁহা

অষ্ট-বিকার—আশা।

আসা জীবৈ জগ মরৈ, লোক মরৈ মন জাহি।
ধন সঞ্চৈ সোভী মরৈ,, উবরৈ সোধন খাহি ॥ ১ ॥
জগৎ মরে আশা থাকে, মানুষ মরে মনটী যায়।
সেও মরে যে জমায় পুঁজী, থাকে যারা অর্থ খায় ॥ ১ ॥

আসা বেলী কর্ম্মবন, বাঢ়ত মনকে সাথ।
ত্রিস্না ফূল চৌগান মেঁ, ফল করতাকে হাথ ॥ ২ ॥
আশালতা কর্ম্মবনে, বাড়তে থাকে মনের সাথে।
আকাঙ্ক্ষার ফুল সে বাগানে, ফলটী থাকে বিভুর হাতে ॥ ২ ॥

জো তূ চাহৈ মুঝকো, রাখো ও'র ন আস।
মুঝহি সরীখা হ্বৈ রহো, সব সুখ তেরে পাস ॥ ৩ ॥
আমাকে তুই চাহিস যদি, রাখিস্ ঠিক অন্য আশা।
আমার মত হ'য়ে থাকিস্, সকল সুখ তোর কর্‌বে বাসা ॥ ৩ ॥

আস বান জগ ফন্দিয়া, রহা অরধ লপটার।
নাম আস পূরণ ক'রৈ, সকল আস মিটি জায় ॥ ৪ ॥
আশা তৃষ্ণার ফাঁদে প'ড়ে, জগৎ অর্দ্ধ বিজড়িত।
পূর্ণ কর্‌লে নামের আশা, সব আশা হয় দূরীভূত ॥

আসন মারে ক্যা ভয়া, মুই ন মন কী আস।
তেলীকেরা বৈল জ্যোঁ, ঘরহী কোন পচাস ॥ ৫ ॥
আসন ক'রে কি ফলোদয়, মনের আশা নাহি মরে।
কলুর বলদ ঘরের ভিতর, তুকুড়ি ক্রোশ যেমন ঘোরে ॥ ৫ ॥

কবীর জগকো কহাকহূঁ, ভবজল বূড়ে দাস।
সতগুরু সম পতি ছোড়িকে, করৈ মনুষ কী আস ॥ ৬ ॥
জগৎজনে কি কব আর, ভক্ত ডোবে ভবের নীরে।
সৎগুরুরূপ পতি ছেড়ে, আশা রাখে মানুষ পরে ॥ ৬ ॥

—শিবপ্রসাদ।

দিগ্‌দর্শন

প্রগতি কি প্রনাশ

"অনবদ্যা পতি জুষ্টেব নারী" বেদে পতিব্রতা নারীর বহু শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে অগ্নি কিরূপ পবিত্র এবং শুদ্ধ হয়েন তাহার উপমা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—অনবদ্যা পতি জুষ্টেব নারী। হিন্দু সমাজ এক একটি হিন্দু সংসার লইয়া গঠিত। সংসারের সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য বা শ্রীবৃদ্ধি যাহা কিছু ভাবিতে পারা যায় সবই নারীর সতীত্বের উপর নির্ভর করে। এক কথায় সতীত্ব সংসারের মহাভিত্তি। এই জন্য হিন্দু-শাস্ত্রের সর্ব্বত্র সতীত্বের আদর বর্ণিত হইয়াছে।

হিন্দুর বিবাহ ধর্ম্ম-সংস্কারগুলির মধ্যে একটি প্রধান সংস্কার। কেন না হিন্দু সন্তান "পিত্র্য ধর্ম্মার্থকাম প্রজাঃ" হইয়া বিবাহ করেন। তাঁহার নিকট পত্নী ইহ ও পরকালের সঙ্গিনী। হিন্দুর পত্নী হিন্দু সন্তানের নিকট কেবল ইহ জন্মের নহে জন্ম জন্মান্তরের ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে সঙ্গিনী। তাই হিন্দু সন্তান নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য এত ব্যাকুল ও এত কাতর। শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ এ বিষয়ে নানা বিধি ও শাসন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পত্নী গৃহ-স্বামিনী এবং পরম প্রণয়িনী। পুরুষ ও নারীর দেহ ও মনের পবিত্রতা রক্ষিত না হইলে সংসার ধর্ম্ম অকপটে আচরিত হওয়া অসম্ভব। একা পুরুষ বা একা নারী অর্দ্ধ জীব ; পুরুষ ও নারীর মিলনেই পূর্ণ জীব হয়। (১) সুতরাং পুরুষ ও নারী যাহাতে অনন্যগতি ও অনন্যমতি হয় তাহার জন্যই হিন্দু লালায়িত।

এখন পাশ্চাত্য সমাজ ও সংসারের দিকে দৃষ্টি করিলে প্রোক্ত পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধে কি পাওয়া তাহা সংক্ষেপে দেখা যাক। সেখানে স্ত্রীর সতীত্ব বিষয়ের আবশ্যকীয়তা ও শাসন ধর্ম্ম-দৃষ্টিহীন, ইহকালের আদান প্রদানে নিবদ্ধ ও আত্মস্বার্থ সিদ্ধিতে পর্য্যবেশিত। স্বামী ভাবেন আমি যখন খাইতে দিতেছি ও পরিতে দিতেছি তখন আমার পত্নী কেন সতীত্ব রক্ষা করিবেন না। পত্নী ভাবেন আমাকে যখন স্বামী প্রতিপালন করিতেছেন তখন আমি কেন সতীত্ব রক্ষা করিব না, ইত্যাদি। তবে যদি উভয়েই মত করেন তবে উভয়েই পথান্তর গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং পাশ্চাত্যের সতীত্বটুকু চুক্তি-মূলক। সেখানে স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ সাংসারিক চুক্তিমূলক। ব্যবহারের একটু এদিক ওদিক হইলেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করার হেতু উদ্ভূত হয়। এ ক্ষেত্রে সতীত্ব ভঙ্গ করিলে কিয়ৎ পরিমাণে নিন্দনীয় হইলেও হিন্দুর ন্যায় একবারে হেয় হয় না। পাশ্চাত্যের বিবাহ ভঙ্গের কারণ উদ্ভূত হইলেও সময়ে মিট্‌মাট্‌ হইতে পারে কিন্তু হিন্দুর সতীত্ব নষ্ট হইলে সেখানে মিট্‌মাট্‌ হইতে পারে না।

রাবণ অরক্ষিতাবস্থায় সীতাকে পাইয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। রাম পত্নীর উদ্ধারকল্পে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া রাবণ বংশ ধ্বংস করিয়া পত্নীর উদ্ধার করেন। এত কষ্টেও

(১) স আত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ (?) ... সবৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ। সহৈতাবানাস যথা—স্ত্রী পুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ, ততঃ পতিশ্চ পত্নীচ ভবতাম্ (বৃঃ আ ১।৪।৩)

কিন্তু সীতার সতীত্ব দুষ্ট হইয়াছে কি না সে সন্দেহ নিরাকরণকল্পে রাম সীতার অগ্নিপরীক্ষা করেন। অগ্নি স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত হইয়া সার্টিফিকেট দিলে তিনি সীতাসম্বন্ধে নিঃসন্দগ্ধ-চিত্ত হইয়া সীতাকে গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য পৌরাণিক চিত্রে দেখা যায় মানিলস্ হেলেনকে দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হেলেনও সতীত্বভঙ্গজন্য বা বহুকাল পরসহবাস জন্য কিছুমাত্র লজ্জিতা হয়েন নাই। পাঠকবর্গ ওডেসীতে হেলেন ও টেলিমেকসের মধ্যে যে কথা বার্ত্তা হয় তাহা দেখিতে পারেন। গ্রোটের ইতিহাস-পাঠে সতীত্বের এইরূপ মূল্য অনেক স্থানে দেখা যায়। পাশ্চাত্য পৌরাণিক গ্রন্থপাঠে দেখা যায় যে কাহারও সুন্দরী পত্নী থাকিলে যদি অন্য কেহ তাহাকে উপভোগ করিতে চাহিত তবে সেই স্ত্রীর স্বামীর নিকট তদ্বিষয়ে আবেদন করিতে হইত। এরূপ আবেদনে স্বামী গর্ব্বিত হইতেন। প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আফ্রোদিতি ব্যভিচারিণী। সতীত্বের দেবী দীয়ানার ক্রমে এণ্ডিমিয়ন, প্যান ও ওরিওয়েনের প্রতি আশক্তি ও রতি। হিন্দুর রতিদেবী কামদেবের ধ্বংসে তপস্যা প্রভাবে স্বামীর অতনুদেহলাভ করেন—অন্য পতির চেষ্টায় চেষ্টিত হয়েন নাই। শচী বহুবার অপহৃতা হইয়াও অসুর পতি গ্রহণ করেন নাই। শকুন্তলা পরিত্যক্তা হইলেও পত্যন্তর গ্রহণ করেন নাই। গ্রোটে বলিয়াছেন—No personal feeling or jealousy on the part of the husband found sympathy from any one—and he permitted without difficulty, sometimes actively encouraged compliances on the part of his wife. অর্থাৎ স্বামী পত্নীর অসতীত্বাচরণের সহায়তা করিতেন। আর হিন্দুর আচরণ সম্পূর্ণ পৃথক। রাবণ বধ, বৃত্রাসুর বধ, কীচকবধ প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত।

লাইকারগাস্ জাতি ও সমাজ গঠনোদ্দেশে যে সকল নিয়ম প্রচলন করেন তাহার মধ্যে একটি নিয়ম এইঃ—

পুরুষ বিবাহের পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্ত্রী সহবাস করিতে পারিবেন না; যে কিছু সহবাস তাহা চুরি করিয়া করিবে যেন অন্য কেহ তাহা জানিতে না পারে।

ইহার স্বাভাবিক ফলে নারীগণ পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর আখ্‌ড়ায় গিয়া স্বামী সহবাস করিয়া আসিত। ইহারই পরিণতি অধুনাতন কালের ক্লাব ও নৃত্যাদির অভিনয়। প্লুটার্ক বলিয়াছেন এই সকল রমণী পোষাক হিসাবে প্রায়ই উলঙ্গবৎ থাকিতেন। কাজেই আমরাও এখন ক্লাব প্রভৃতিতে নারীকে উলঙ্গই দেখিতে পাই। (১)

হিন্দুশাস্ত্রে বলেন পতি ভার্য্যার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন—পত্নী সাধ্বী ও পতিব্রতা থাকিলে তাহাকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিবে ও কখনই তাহাকে রুষ্টবাক্য বা প্রহার করিবে না। ঘোর কষ্টে পড়িলেও সাধ্বী পত্নীকে পরিত্যাগ করিবে না। স্বীয় ভার্য্যা বর্ত্তমানে কদাপি কুভাবে বা দূষিত হৃদয়ে পরস্ত্রী স্পর্শ করিবে না। পর নারীর সহিত নির্জ্জনে বাস বা শয়ন করিবে না। কোন স্ত্রীকে অযুক্ত কথা বলিবে না। সুবুদ্ধিব্যক্তি উৎসবে, লোক যাত্রায় তীর্থে এবং পরগৃহে পুত্র বা বিশেষ আত্মীয় সঙ্গভিব্যাহারে না দিয়া কদাপি একাকিনী পত্নীকে প্রেরণ করিবেন না। আর পত্নী সর্ব্বতোভাবে স্বামীর সেবা করিবে। সর্ব্বতোভাবে পত্নী পতীর আজ্ঞানুবর্ত্তিণী থাকিবে।

(১) The Spartan damsels seem to have worn a light tunic, cut-open at the skirts, as to leave the limbs both free and exposed to view (Grote).

স্ত্রীগণ অন্য পুরুষের মুখ নিরীক্ষণ করিবে না। অন্যের সহিত সম্ভাষণ করিবে না। যাহাতে অন্য পুরুষ শরীর দেখিতে না পায় এরূপ সতর্কভাবে থাকিবে। স্ত্রী বাল্যে পিতার, যৌবনে পতির ও বার্দ্ধক্যে পতি-বান্ধবের অধীনে থাকিবে। কোন কালেই তাহার স্বাধীনতা থাকিবে না। (২)

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচারে আজ আমরা উপদেশ পাইতেছি যে স্ত্রীস্বাধীনতার একান্ত প্রয়োজন এবং যত দিন না হিন্দুনারী স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিতে শিখে ততদিন ভারতের উন্নতি নাই। আমরাও অবিচারে তথাস্তু বলিয়া ছুটিতেছি। কিন্তু ইহাতে লাভ কার ও লোকসান কার তাহা একটু ভাবিয়া দেখা যাক্। পাশ্চাত্যের লাভ—স্বামী গোলাম—পত্নী আয়া। প্রভুত্বের পরিণতি ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে তাহা ধারণা করা দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতা-মুগ্ধ হিন্দু-সংসারের লাভ ত নাইই—লোকসান-সমূহ। পুরুষ ব্যভিচারী হইলে সে আপদ বাহিরে থাকে—পত্নী ব্যভিচারিণী হইলে বাহিরের আপদ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং পাশ্চাত্যের অনুকরণে গৃহের মধ্যে হিন্দুর যেটুকু সুখ-শান্তি এখনও আছে তাহার ধ্বংস করিবার জন্য উন্মত্তবৎ ছুটিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক হিন্দু সন্তানেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। হিন্দুর সবই গিয়াছে কেবল গৃহের সুখটুকু এখনও অনেক সংসারে আছে—তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা দেখিয়া হৃদয় কম্পিত না হইয়া স্থির থাকে না।

নিয়মেই বিশ্বসৃষ্টি। এই সৃষ্টি নিয়মের বাধ্য। এ সৃষ্টিতে স্বাধীন কেহ নহে। সকলেই নিয়ম বা শাসনের অধীন। ভূত-জগৎ আত্মার বা চৈতন্য-শক্তির অধীন। লঘু গুরুর অধীন, নীচ উচ্চের, ছোট বড়র, দরিদ্র ধনবানের, অবাচাল বাগ্মীতার, সরল কপটের এবং অজ্ঞানী জ্ঞানীর অধীন। সৃষ্টিতত্ত্বে যখন নারী পুরুষাপেক্ষা হীনশক্তি—তখন নারীর পুরুষের শাসনে থাকাই বিশ্ব-শাসনের অনুকূল গতি। হীনশক্তি উচ্চশক্তির অধীনে চলিলেই পূর্ব্বোক্তের উন্নতি

---

(২) লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাত্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যাঃ কর্ত্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতা॥ (যাজ্ঞবল্ক্য)
গৃহস্থো গোপয়েদ্দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
ন ভার্য্যাস্তাড়য়েৎ কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোর কষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা।
স্থিতেষু স্বীয় দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বান্ অন্যথা নারকী ভবেৎ॥
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্ত ভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যং ন দর্শয়েৎ।
উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষন্য নিকেতনে।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবর্জ্জিতাম্॥
ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপোদানং ব্রতং গুরুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ।
নান্য বক্তুং নিরীক্ষেত নান্যৈঃ সম্ভাষণঞ্চরেৎ।
ন চাঙ্গং দর্শয়েদন্যান্ ভর্ত্তুরাজ্ঞানুসারিণী।
তিষ্ঠেৎ পিত্রোর্বশে বাল্যে ভর্ত্তুঃ সম্প্রাপ্তযৌবনে।
বার্দ্ধক্যে পতিবন্ধুনাং ন স্বতন্ত্রা ভবেৎ কচিৎ॥ (মঃ নিঃ তঃ)

ও উভয় শক্তির মিলনে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয়। যখন হীনশক্তি স্বীয় ক্ষমতার বিষয়ে জ্ঞানহারা হইয়া ভ্রান্তমতি হয় এবং উচ্চশক্তি স্বীয় শক্তির প্রাবল্যহেতু উদ্দৃপ্ত হয় তখন তাহার ফলে সেই উদ্দৃপ্ত উচ্চশক্তির প্রবল অগ্নি হীন শক্তিকে দগ্ধ করে এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রলয় কাণ্ডের অভিনয় হয়। উদ্দৃপ্ত দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন ক্ষীণশক্তি দ্রৌপদীর উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া কুরুক্ষেত্ররূপ প্রলয় কাণ্ডে আর্য্যভূমিকে শ্মশানে পরিনত করিয়াছিল। ক্ষাত্রশক্তি তখনও একবারে না লোপ পাওয়ায় সে উদ্দাম উদ্দৃপ্ততাকে শাসনে আনা সম্ভবপর হইয়াছিল। এখন আমরা সম্পূর্ণ ক্ষাত্রশক্তি-হীন। আমাদের এ অবস্থার বিষয় আর লিখিয়া বলিবার দরকার নাই। প্রত্যেক দৈনিক ঘটনাবলী তাহার পক্ষে মর্ম্মভেদী দৃষ্টান্ত। আমি সে দিনের একটি ঘটনার উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করিতেছি। একজন ভদ্র বঙ্গবাসী তাঁহার সুন্দরী পত্নীকে লইয়া এক সেকেণ্ডক্লাশ রেল গাড়ীতে গমন করিতেছিলেন। এক ষ্টেশনে দুই শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সেই গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সেই রমণীর প্রতি কটূক্তি প্রভৃতি আরম্ভ করিল দেখিয়া সেই বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাহিরের থেকে যখন গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন তখন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের মধ্যে একজন আসিয়া তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিল না। অনেক কাকুতি মিনতি যখন ফলদায়ী হইল না তখন অগত্যা সেই ভদ্র লোক পার্শ্বস্থ প্রথম শ্রেণীর এক পাশ্চাত্য রমণীর সাহায্যে সে দিন সে বিপদ হইতে উদ্ধার পান। শত শত বঙ্গবাসী পুরুষ প্ল্যাট ফরমে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে থাকেন এবং বলিতে লাগিলেন যে যেমন কর্ম্ম—সেকেণ্ড ক্লাসে বৌ নিয়ে যাচ্ছেন! ইত্যাদি। এক সময় ব্যারেকপুরে আমার এক আত্মীয়ের পত্নী পুকুরে নাইতে যান—দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই সময় দুই গোরা তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়। ক্ষাত্রশক্তিহীন জীবসঙ্ঘ বর্ত্তমানেও সেই আত্মীয়া পুষ্করণীর জলে ঝাপাইয়া পড়েন। পুষ্করণীর মধ্যস্থলে অগাধ জলে সাতার কাটিয়া আত্মরক্ষা করেন। গোরারা সাতার জানিত না বলিয়া ঈশ্বর সে নারীকে রক্ষা করেন। এরূপ ঘটনা অনেক দেখা যায়।

সৃষ্টি কর্ত্তার সৃষ্টিতত্ত্বে নারী প্রকৃতি হিসাবে পুরুষ অপেক্ষা অনেক ক্ষীণ। প্রকৃতিই মন ও বুদ্ধির হেতুভূতা। অধুনাতন সমাজে দেখা উচিত—পুরুষ কতদূর কর্ত্তব্যপরায়ণ ও পাপ বিরত এবং তাহারা কতদূর ধর্ম্ম ও নীতিপরায়ণ। মণ্টেইন একটা কথা বলিয়াছেন "প্রত্যেক মানুষ যদি সরল ভাবে আপন আপন মনের কথা প্রকাশ করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রত্যেককে পাঁচ ছয় বার ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিতে হয়।" আডিসনও বলিয়াছেন যে—যদি আমাদের মনটা বাহিরে বিছাইয়া দেওয়া যেতো তবে দেখা যেতো সর্ব্বত্রই সেই একই প্রকার ভাব তরঙ্গ খেলা করিতেছে। এ অবস্থায় আত্মিক বা চৈতন্য শক্তি যদি অঙ্কুশরূপে কার্য্য না করে তবে পুরুষ কি না করিতে পারে তাহা বলা দুঃসাধ্য। যদি প্রবল শক্তি পুরুষ এইরূপ হয় তথায় হীনশক্তি নারীর কথা সহজেই বোধগম্য। পুরুষ তবু নারী অপেক্ষা কি মনে, কি বুদ্ধিতে, কি জ্ঞানে অধিক শক্তিবান—পুরুষ পঞ্চবিংশতিতম্ তত্ত্ব। সে কিছু ঢাকা দিয়া চলিতে পারে। আর নারী—যার অধিকার অধঃস্তন চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—যদি সে পুরুষের ন্যায় স্বাধীনা হয় তবে সে কত অধিক পরিমাণে দুষ্কর্ম্মান্বিতা হইয়া পড়ে তাহা আর বলিতে হয় না। নারী ভাবপ্রবণা—ভাব একবার কুভাবে গড়াইলে তাহাকে ফেরান অসম্ভব—তার নিজের সে ক্ষমতা নাই। এমত ক্ষেত্রে যদি পুরুষ সেই ভাব প্রবণতায় ঘৃতাহুতি দেয় তবে ত আর রক্ষা থাকে না। অতএব যত দিন না পুরুষের নৈতিক জীবন গঠন

ধারা নিজ কর্ত্তব্য পালনে একনিষ্ঠ হয় ততদিন স্ত্রীর স্বাধীনতা দেওয়ার চেষ্টা একটা ভাণ মাত্র। তাহার ভিতর ভীষণ পরোক্ষ স্বার্থ বর্ত্তমান। আমেরিকা ইউরোপ প্রভৃতির সমাজ ও গৃহচিত্র প্রত্যহ তত্তদ্দেশের সংবাদ পত্রে বা পুস্তকে যাহা প্রকাশিত হইতেছে বা হইয়াছে—তাহা দেখিলেই এ বিষয়ে চক্ষু ফুটা উচিত। স্বর্গীয় এক মহা সাহিত্যিক বলিতেন—ভারতের সব ভাল, সব ভাল—কিন্তু তথায় বেকন জন্ম গ্রহণ করে নাই—বেকন চাই, বেকন চাই। অথচ বেকনের মত চরিত্রহীন, ঘুষখোর ও কদাচারী লোক বোধ হয় ইংলণ্ডে জন্মায় নাই। অধুনাতন ভারতেও অধিকাংশই এখন মেফিষ্টফিলির অবতার। ফষ্টকে ভ্রমে ফেলিতে একা মেফিষ্টফিলিতে রক্ষা ছিল না—এই ঘোর কলিকালে ভারতে শত শত মেফিষ্ট-ফিলি দণ্ডায়মান। চৈতন্য ও ধর্ম্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই। কেও কাহারও কথা শুনিতে চায় না। সবাই পরিচালক বা গুরু। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই মেফিষ্টফিলির দল "পাঁচজনের" শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করে না। যদি ব্যক্তিত্বগত জ্যেষ্ঠত্ব লাভই তাহাদের আন্তরিক ভাব হইত তবে এরূপ অসামঞ্জস্যের উদ্ভব হইতে পারিত না। ফলকথা উক্ত পাঁচ জনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দর্শন করাইয়া পরোক্ষ স্বার্থলাভই উদ্দেশ্য। বাহিরে "পাঁচজন" যাহা ভাল বলিয়া ঘোষণা করেন তাহাই তৎকালে কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হয় অথচ ভিতরে বুঝেন যে সেই পাঁচজনও একই প্রকার জীব লইয়া গঠিত। যাহারা অপাত্র ও অখ্যাতির কারণ তারাই সুখ্যাতির জন্য লালায়িত। তাদের নীতিতে সুখ্যাতি কেনাও যায়—পয়সা থাকিলেই হইল। সকলের নীতি ও ধর্ম্ম এখন কণ্ঠগত ও বচনে প্রকাশিত। অন্তর্দর্শন ভিন্ন যে দূরদর্শন হয় না—এ কথা এ জাতীয় লোক স্বীকার করেন না। তা হলে ত পাঁচজনের একজন হওয়া যায় না। সকল সময়েই নির্ব্বাক ভাব কার্য্য-ক্ষমতার এবং বচনবাগীশতা অকর্ম্মার লক্ষণ। যে কুকুর ডাকে—সে কামড়ায় না। যে কামড়ায় সে ডাকিবার অবসর পায় না। চাতুরী, কাপট্য, অসত্য ও প্রগল্‌ভতা ভীরুর আশ্রয়। সারল্য ও সত্য বলের চিহ্ন। কৌশল দুর্ব্বলের অবলম্বনীয়। প্রকৃত বলের চিহ্ন যাহা তাহা কোথায় চলিয়া গিয়াছে—দুর্ব্বলতাই এখন প্রশংসনীয়। স্বাধীনতা ও তেজস্বিতা এখন আত্মসম্মান জ্ঞানের ছোপে—উচ্ছৃঙ্খলতাকে বেশ ঢাকা দিয়াছে। কোন ধর্ম্মধ্বজী জাতি নাশের ধ্বজা উড়াইয়া রাজা রাজড়ার সমৃদ্ধি করতলগত করিতেছেন; কেহবা নিজের প্রথম জীবনের দুর্নীতিপূর্ণ কার্য্যগুলি বেশ সুন্দর ভাবে ঢাকা দিয়া কবিতা বা সাহিত্যচর্চ্চায় দেশমান্য হইয়া উঠিতেছেন; কেহবা আজীবন ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র থাকিয়াও বাহ্যিক সৎকার্য্যাদি করিয়া দয়ার অবতার বলিয়া নাম কিনিতেছেন; কেহবা দেশ দেশান্তর হইতে পোষাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যাদি সরবরাহ করিয়া, মিটিংএর সময় খদ্দর পরিয়া জন-নায়কত্ব লাভ করিতেছেন; কেহবা নিজের পুত্র কন্যার কদর্য্য আচরণগুলি লোকলোচনের অন্তরালে রাখিয়া সমাজের পরিচালক হইতেছেন; কেহবা আজীবন পরস্বাপহরণ ও স্ত্রীলোকের সতীত্ব হরণ করিয়া অন্তকালে পূজা পাইতেছেন; কেহবা অর্থ বলে অন্যের সংসারে আগুণ জ্বালাইয়া দিয়া দেশ-নায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইতেছেন; কেহবা আজীবন এ ফুলে সে ফুলে উড়িয়া বেড়াইয়া সতী শিরোমণি হইতেছেন ও নারীর কর্ত্তব্যের উপদেশ দিতেছেন; কেহবা শিষ্যের সংসারে আততায়ীর কার্য্য করিয়া আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিতেছেন; কেহবা ধনী শিষ্যগণের মস্তকে হাত বুলাইয়া গুরুপূজা পাইতেছেন; কেহবা শিষ্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া কোম্পানীর কাগজ করিতেছেন। যখন ভারত সমাজে পুরুষের নৈতিক জীবনের এই চিত্র, তখন নারী-জাগরণের ফলে কি ফল ফলিবে তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে! (৫৬২ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।)

ভিক্ষুকের ঝুলি

(ত্রিদণ্ডী ভার্গব)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

মূখো। এখন তুমি পিতামহগণের ব্যবস্থা ভাব। আমি একটি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর সন্তানের বিষয় প্রথম ধরিব। ব্রাহ্মণের সন্তান জন্মিবামাত্র তাহার সংস্কার আরম্ভ হয়। সংস্কারের সোজা অর্থ যা তাই বুঝ। অর্থাৎ তাকে মাঝা ঘসা করার ব্যবস্থা হয় পাছে কোথাও মড়চে বা দাগ লাগে। শরীরের সপ্তধাতুকে সমান ভাবে পুষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা জন্মাবস্থা হইতেই চেষ্টা করা হয়। ষড়রস-বর্জ্জিত আহার—কষ্ট-সহিষ্ণুতার মধ্যে পালন—প্রকৃতির আইনের যতটা সম্ভব অনুকূলে বর্দ্ধন—কুচিন্তা ও কুসংসর্গ পরিত্যাগ—আচার্য্যের শাসনে শাসিত ও শিক্ষালাভে আত্মদান ইত্যাদি বেড়ার মধ্যে ব্রাহ্মণ পুত্র মানুষ হয়। এইরূপে ২৪ বৎসর কাটিয়া গেলে ছেলের শরীর-ধর্ম্মে একটা অচিন্তিত সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রক্ত বেশী হইয়া মাংস বৃদ্ধি করে না—মাংস বৃদ্ধি না হওয়ায় মেধা বৃদ্ধি পায় না—মেধ বৃদ্ধি না পাওয়ায় অস্থি ক্ষীণ হয় না—অস্থি ক্ষীণ না হওয়ায় মজ্জা পুষ্ট হয়—মজ্জা সতেজ থাকায় শুক্র স্বাস্থ্যাবস্থায় রক্ষিত হয়—শুক্র রক্ষিত হওয়ায় স্নায়ু-যন্ত্রের স্বাস্থ্যলাভে ওজ লাভ হয়। ওজের উপরই মন ও বুদ্ধি।

শরীর-সমাজে এরূপে সামঞ্জস্য হইলেও তাহা পূর্ণ উন্নতি লাভ করে না। এইরূপ **well organised army** লইয়া ব্রাহ্মণ দিগ্‌বিজয় লাভের আশায় প্রবৃত্ত হয়। সেই দিগ্বিজয়ের প্রধান সেনাপতি পত্নী বা দারা। ব্রহ্মচর্য্যান্তে ব্রাহ্মণ-সন্তান বিবাহিত হয়েন। ব্রহ্মণের সেই অপূর্ব্ব গৃহস্থ-ধর্ম্মপালন তোমাকে মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে বলি। অল্পে সন্তুষ্ট-চেতা সেই গৃহী আর্য্য-শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা মানিয়া সেই শাসিত রক্ত মাংস প্রভৃতি সৈন্যগণকে Ration যোগাইয়া বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট করিয়া লয়েন। তারপর সেই পরিপুষ্ট ও সামঞ্জস্য-লব্ধ শান্তশরীর মন ও বুদ্ধি লইয়া বানপ্রস্থে রওনা হয়েন। এই বানপ্রস্থ রূপ অভেদ্য দুর্গে বসিয়া রাজ রাজ্যেশ্বর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পতির দুর্গের তোরণ দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলেন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এ কথার অর্থ এত দূরে কিছু বুঝা যায়।

শ্রী। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে শুক্র রক্ষা করিলে স্বাস্থ্য ও তেজ পাওয়া যায় ও মানুষ অমর হয়—তবে ব্রাহ্মণের দার পরিগ্রহে ত তাহার ব্যতিক্রম ঘটে।

মূ। সৃষ্টির মধ্যে কোন জিনিষই নিরর্থক নহে। শুক্রও নিরর্থক সৃষ্ট হয় নাই, তাহারও উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন। সেই সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের বিষয় ভাব। আর্য্য প্রবর্ত্তিত বিবাহ ও গার্হস্থ্য, বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করিয়া চলিলে শুক্রের উন্নতি সাধনে বুদ্ধি বৃত্তির শক্তি বৃদ্ধি হয়। এবং অবান্তর ফল স্বরূপ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত সৃষ্টি রক্ষা হয়। সৃষ্টি ইচ্ছা বা কাম মনোজ্ঞবৃত্তি। মনের আধার স্নায়ুমণ্ডলী। স্নায়ু-মণ্ডলীতে আখের রসের মত এই শুক্র ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত। মনোজ্ঞ প্রভাবে স্নায়ু যন্ত্রে যে চালন পরিচালন হয় তাহারই ফলে বিন্দু নির্গম। শরীরের শ্রীবৃদ্ধি যে নিয়মে

ব্যায়ামের স্নায়ু হয় ঠিক সেই নিয়মে স্নায়ু যন্ত্রেরও শ্রীবৃদ্ধি করিতে নিয়ন্ত্রিত ভাবে কাম ব্যবহার আবশ্যক। over-exercise যেমন শরীরে বলাধিক্য না করিয়া দুর্ব্বল করে তদ্রূপ স্নায়ু যন্ত্রের ব্যায়ামাধিক্যে যন্ত্র ও যন্ত্রাধিপতি মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আবার ব্যায়াম না করিলে শরীর শুধু দুর্ব্বল হয় তা নয়, তাহাতে রোগ প্রভৃতির দ্বারা জড়ত্ব প্রাপ্তও হয়। (১) স্নায়বিক যন্ত্র জড়ত্ব লাভ করিলে তাহার সৃষ্টি নিরর্থক হইল—অথচ ঈশ্বরের সৃষ্টি নিরর্থক নহে।

ব্রাহ্মণের জীবন গঠনের অতিশয় কঠিন ব্যবস্থা গুলি বেশ আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় ব্রাহ্মণের সর্ব্ব কার্য্যই দেবোদ্দেশ্যে—এমন কি যাহা বুদ্ধির অভাবে আমরা অশ্লীল কর্ম্ম ভাবি তাহাও কি মনোহারিত্বে পরিণত হইয়াছিল তাহা শ্রুতিমন্ত্রে বুঝা যায়। আমি একটা মাত্র মন্ত্র বলিতেছে—

"পূষা ভগং মে সবিতা দদাতু।
রুদ্র স্বষ্টা মে কল্পয়তাং ললনামুগ্রম্।
ত্বষ্টা রূপাণি তেজো বৈশ্বানরো দদাতু
গর্ত্তন্ধেহি সিনীবালি গর্ত্তন্ধেহি পয়স্বতি!
বিষ্ণু যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপানি পিংশতু
আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ত্তং দধাতুতে।"

বাঙ্গলা করার দরকার নাই। তুমি এরূপ সর্ব্বত্র দেবতার উদ্দেশে সর্ব্ব কার্য্য করা আর কোথাও দেখাতে পার? যদি না পার তবে ব্রাহ্মণের জীবন গঠনের একটা বিশেষত্ব তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

শ্রী। দেবতা মানে ত প্রাকৃতিক ঋত সত্য তপস্যা। আর্য্য সন্তানের যা কিছু কর্ম্ম সবই ঐরূপ দেবতার নামে করা হয়। পৃথ্বী দেবতা, বায়ু দেবতা, অগ্নি দেবতা, বরুণ দেবতা ইত্যাদি সকল natural power ই দেবতা।

মু। ইহা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তেত্রিশ কোটী দেবতা এই পৃথক পৃথক ঋত ও সত্যের নাম মাত্র। ব্রাহ্মণ সন্তান এই দেবতার অনুকূলে চলিয়া দেবতার দেবতা সাধ্যগণকে জয় করিতেন। সাধ্যগণও ব্রাহ্মণের এই well organised army র নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিলেন। যাত্রার গান শোন নাই—মা দশভূজা বলিতেছেন—"ওটা যে আমার সাধের ছেলে, ভোলানাথ! কি ভুলে গেলে হে, মজেছ কার বিল্বদলে ওহে ও দেব ত্রিপুরারি! প্রাণে মরি।" দেবতাকুলকে পরাভব বা জয় করিয়া পরমেশ্বরের তোরণ দ্বারে উপস্থিত হইলে জয় বিজয় দ্বার রক্ষকদ্বয় পরস্পর চাওয়া-চায়ি করে—জ্ঞান ও কর্ম্মে ইসারা চলে-ইতিমধ্যে মা অলক্ষিতে তোরণ দ্বারের অর্গল খুলিয়া দিয়া সাধের ছেলেকে যাঁর নাম নাই, যাঁর কামনা নাই, যাঁর সবই আমি ও তুমি—তাঁহার নিকট লইয়া যান। সেখানেও সেই সর্ব্ববলে বলীয়ান ব্রাহ্মণ যুদ্ধার্থী হয়—পরাজয় স্বীকার কর—না হয় বক্ষে পদাঘাত করিব। ব্রাহ্মণেব নিকট—আসামী সর্ব্বেশ্বর পরাজয় স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদের নিকট হিরণ্য কশিপুর, লবকুশের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের পরাজয়—বভ্রুবাহনের নিকট পার্থ পরাজয় ইত্যাদি পরবর্ত্তী পৌরাণিক কথা ইহারই আভাষ মাত্র।

(১) সুশ্রুত চরক প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়।

এখন দেখ এইরূপ সর্ব্বতোমুখী পূর্ণমনোবল সম্পন্ন একটি ব্রাহ্মণকে কে খেঁতে দিবে বা কে তাহার দেহরক্ষা করিবে। সেই রক্ষকের জন্য একটি ক্ষত্রিয় শিশুর জীবনভাব। ক্ষত্রিয় শিশুর প্রধান লক্ষ্য শারীরিক শক্তি সঞ্চয় ও রক্ষার্থে প্রবল যোদ্ধা হওয়া। আর্য্য শাস্ত্র ঠিক তাহার অনুকূলে ইহার বিধি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহারও জীবন এইরূপ দৃঢ় বেড়ার মধ্যে গঠিত হইত। সে একটি শরীর শক্তির সামঞ্জস্য অপ্রতিহতগতি হইত। তাহার মানসিক উন্নতি ব্রাহ্মণের দ্বারা শাসিত হইত। সেইরূপ একটি বৈশ্য সন্তানও ধন সঞ্চয় ও ধন রক্ষা কল্পে গঠিত হইত। শূদ্রও নিজবৃত্তি পালনে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতেন।

শ্রী। এইরূপ চারিজন লইয়া সমাজ কল্পনা করিলে চারিটী পৃথক মনুষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত কি করে হইতে পারে? এক মানস বলে শ্রেষ্ঠ, অন্য ক্ষাত্রশক্তিতে শ্রেষ্ঠ, আবার তৃতীয় ধন উৎপাদন ও সঞ্চয়ে অভিনিবিষ্ট, ৪র্থ সেবা ধর্ম্মে নিরত—বিবাদ অবশ্যম্ভাবী।

ম। এই জন্যই ব্রাহ্মণের শাসন অবনত মস্তকে মানিবার ব্যবস্থা বড় দৃঢ় ছিল। ব্রাহ্মণকে ভূদেব বলিয়া ধরা হইত। তাঁহার শাসন অন্য তিন ব্যক্তি অবাধে স্বীকার করিয়া লইতেন। এবং ব্রাহ্মণও পাছে অনৈতিক অসামাজিক বা অধর্ম্মের কোন কার্য্য করিয়া ফেলেন বলিয়া পদে পদে দেবতাকে (5th power) খাড়া করিয়া চলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের দৈনিক জীবন ঘড়ির কাঁটার মত পরিচালিত—প্রত্যেক সেকেণ্ড একটা না একটা বিধিনিষেধ-এ দৃঢ় বদ্ধ। তুমি একটি মিনিট তার থেকে অন্য চিন্তার জন্য বাহির করিতে পারিবে না। তাহা হইলেই ব্রাহ্মণের বিধি লঙ্ঘন পাপের প্রায়শ্চিত্য করিতে হইবে।

শ্রী। যে কাল ও সমাজের কথা বলিলেন, তাহা এখন ইউটোপিয়ায় পরিণত। আমরা বাস্তব জীবনে তাহা দেখিতে পাই না। কল্পনার চিত্রে এখন আর সমাজ শাসিত হয় না।

ম। আমিও বলিতেছি না যে আর্য্য সমাজ এখন পিতামহগণ প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও সভ্যতার কোন ধার ধারেন। তবে সেই অসম্ভব আনুষ্ঠানিক গণের পঞ্চপাত্র ও সন্ধ্যাবন্দনারূপ নিত্যকর্ম্মের আফিংর নেশাটুকু এখনও রহিয়াছে। তুমি আর্য্য শাস্ত্রোক্ত চারি যুগের কথা চিন্তা কর। সেই আদিম সময়ে মানুষ কিরূপ ছিল তাহা সত্যযুগের সংক্ষেপ বিবরণে দেখিতে পাইবে। সত্যযুগে—সত্য ও ধর্ম্ম পূর্ণ ছিল—সামবেদ ছিল। সামবেদ আর কিছুই নহে ঋগ্বেদের যে মন্ত্রগুলি গান করা যায় সামবেদ তাহাই। পিতামহগণ সত্যে সামগা ছিলেন—প্রাকৃতিক শক্তির গুণ ও ধর্ম্ম গান করিতেন—তাঁহাদের সাধনা তাহাতেই পর্য্যবেশিত ছিল। ত্রেতাযুগে—সত্য ও ধর্ম্ম ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় তখন ঋগ্বেদের কর্ম্ম কাণ্ডের প্রচলন হইতে থাকে। সত্যযুগে সত্য ও ঋতের গুণগানে দেবতাগণ "নন্দন্তি" ছিলেন—দ্বাপরে দেবতা-নন্দন চলে যায়, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের প্রভাব বিস্তার পায়। দ্বাপরে সত্য ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম কমিয়া যায়, তখন যজুর্ব্বেদের অধিকার অর্থাৎ Ruling power। সত্য ও অসত্যে মিশ্রিত কপটাচার ও পাণ্ডিত্যের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। কলিযুগে বেদ নাই—ধর্ম্ম নাই বলিলেই হয়। মানুষ ক্রমে নিম্নপর্য্যায়ে চলিতেছেন। তা হলেই তুমি বুঝিতে পার তোমার জন্মের বা তোমার পিতৃপিতামহগণের জন্মের কত লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আমি যে সমাজের কথা বলিতেছি তাহা সৃষ্ট হইয়াছিল। তোমার প্রত্নতত্ত্বের অধিকার ৪০০০ বা ৮০০০ খৃঃ পূর্ব্ব অব্দ, লোকমান্য তিলক এইরূপ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর্য্য পিতামগণ তাহার বহু পূর্ব্বে

সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত অশূর জাতিদের আক্রমণের ফলে ব্রহ্মাবর্ত্তে বা মধ্যদেশে প্রয়াণের ফলে (climatic effeot) আদি সভ্যতা, শিক্ষা ও আচার ধর্ম্ম প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। ইহারই পরিণামে বেদের অধিকার ক্রম হীনতা প্রাপ্তি, সম্পূর্ণ মনোবলও ক্ষাত্র বলের ক্রমাবনতি এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে—সেই আদি ও প্রবল সমাজের অবনতি। বেদ ও বেদান্ত (উত্তর মীমাংসা নহে) সেই আদিম সমাজের নিজস্ব জিনিষ, তার পরবর্ত্তী কালে ক্রমে ক্রমে ষড় দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থ—মনু, অত্রি, বিষ্ণু হারীত প্রভৃতি সংহিতা—যাহা ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া উক্ত তাহা সমাজের ক্রমোন্নতিতে উৎপন্ন। এই সমাজ দীর্ঘকাল স্থায়ী ভাবে ছিল বলিয়াই তুমি এখনও আর্য্যের অতুল্য বুদ্ধি—অতুল্য শক্তি ও অতুল্য ধনের বিষয় ভাবিয়া বিমোহিত হও। সে ধন আজও অফুরন্ত—সে বন্ধন আজও যেয়েও যায় না।

শ্রী। ধর্ম্ম শাস্ত্র ত অনেক—গীতা, চণ্ডী, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। আপনি সংহিতা গুলিকেই তবে ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিতেছেন কেন?

মু। ধর্ম্ম ধরে থাকে। সংহিতা সেই ধরে থাকার Law codes. গীতা ও চণ্ডী দর্শন শাস্ত্র, মানসিক বিশ্লেষণ মাত্র—অনেক তর্ক উঠিবে অনেক বুঝিতে পারিবে না—অনেক গোলমাল ঠেকিবে। কিন্তু তুমি ইহা ঠিক জানিও, তুমি এই সূত্র ধরিয়া গভীর চিন্তা করিলে এই তত্ত্বের সুমীমাংসা লাভ করিবে। আর্য্য সন্তানের ভাবিবার ইহা অপেক্ষা গুরুতর জিনিষ আর নাই। আজীবন এই চিন্তা-স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেও ইহার তত্ত্বজ্ঞান হওয়া দুরূহ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি করিয়াছিল ও তাহার কতটুকু এখন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা উপস্থিত কালধর্ম্ম সম্মুখে রাখিয়া বুঝিতে পারা অসম্ভব। অর্জ্জুনের মত লোকটিকেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বুঝাইতে শ্রীকৃষ্ণকে গীতার অবতারণা করিতে হইয়াছিল। অর্জ্জুন যে সে মানুষ ছিলেন না—উর্ব্বশী ভুলাতে পারে নাই, পশুপতি অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়া পাশুপাত অস্ত্র দেন। আদিম কাল বুঝিতে হইলে সেই সমাজে ফিরিয়া যাইতে হইবে, অথচ তাহা অসম্ভব। তোমরা আজ "ভারতের সাধানা"র আলোচনায় প্রবৃত্ত—ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু সৃষ্টি, সমাজ সভ্যতা ও ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত, কাজেই এত বকাবকি। গোড়া ছেড়ে আগায় বসিলে পতন অনিবার্য্য। আমি যতদূর পারিলাম সৃষ্টি, সমাজ প্রভৃতির কিঞ্চিৎ আভাষ দিলাম—এখন মহারথীগণ এই পথে দিগ্বিজয়ে প্রচোদিত হইলে আমার এই চেষ্টা সাফল্য লাভ করিবে। এর পর মানসিক তত্ত্বেই ধর্ম্ম, তার সাধন পথ এবং পরমেশ্বরের বিভিন্ন মূর্ত্তির কিরূপে আসিল তাহা বুঝা যাইবে। এখন তোমরা যাও।

শ্রীশঙ্কর পরিমল ও বিনয় কুটির ত্যাগ করিয়া পথে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিল।

বিনয়। ইহার মতে বিবাহ অনিবার্য্য, সকলকেই বিবাহ করিতে হইবে—তবে চতুরাশ্রম সন্ন্যাসের বৈদিক ব্যবস্থা কেন, বাবা?

শ্রী। সন্ন্যাস একটা আশ্রম, সেটার সহিত দশনামী সন্ন্যাসীর সম্বন্ধ খুব কম। চতুরাশ্রমের সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা অতীব দুরূহ ও সকলের ভাগ্যে সম্ভব হইত না। আজকাল মানুষের আয়ু গড়ে ৩০।৪০ বৎসর, অথচ এই সন্ন্যাস ৮০ বৎসর বয়সের পর গ্রহণ করার ব্যবস্থা। তাহা ছাড়া "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" "যাবজ্জীবং দশপূর্ণ মাসেন যজেৎ" ইত্যাদি বিধি সন্ন্যাস আশ্রমকে ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিত। বাণপ্রস্থে যদহরেব বিরজেত—তদহরেব প্রব্রজেত।" ইহাই

মূলমন্ত্র ছিল। কাজেই সন্ন্যাসাশ্রম সত্য ত্রেতাতেই সম্ভব ছিল—এবং কলিকালে তাই সন্ন্যাস নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহা ভুলিও না—এই সন্ন্যাসী গৃহস্থাশ্রম প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইতেন। কাজেই বিবাহ অনিবার্য্য ছিল। বিবাহ কেন দরকার তাহাত মুখোপাধ্যায় মহাশয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তুমি অগস্ত কোম্‌তের পুস্তকাবলী পড়িলে এ দিকের যে একটা মহত্ব আছে তাহা বুঝিতে পারিবে। সে গ্রন্থাবলী অনেক বিস্তর। দুএক স্থান হইতে বিষয়টা কি এবং অগস্ত কোম্‌তে উহা কি ভাবে দেখিতেন, তাহার বিষয় বলিতেছি :—

"Those who know that in the constant exercise of generous instincts lies the principal source of true happiness, personal and social will appreciate what domestic life means." এই চিন্তাশীল পণ্ডিত আরও বলিয়াছেন—'Humanity should never have known the full strength and clearness given to our highest affections by concentration on a worthy object (had it not taken mates)." ইদানীন্তন কালের লেখকদের পুস্তকাদি পাঠ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়—বিবাহ কত দরকার—How intoxicating indeed how penetrating—like a precious wine is that love which is the sexually transformed by the magic of the will into the emotional and spiritual! And what a loss on the merest grounds of prudence and the economy of pleasure is its un-bridled waste along physical channels! So nothing is so much to be dreaded between lovers as just this—the vulgarisation of love and this is the rock upon which marriage so often splits. চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিতেছেন—In future the highest social unit will be recognised to be the pair fused in love so that all human potentialities are theirs as well as the highest potentialities which only perfect love can originate. অন্যত্র বলিয়াছেন—"The married ascetic Tolstoy was of opinion that the highest human being completely inhibits his sex desires and lives celebate life" Ascetics seldom have much knowledge of human physiology and it seems to me that with all this fine and religious fervour, they often lack mysticism necessary for the full realisation of the meaning and potentialities of the new creation resulting from man's and woman's highest union. Doubtless if for an hour we were to take place of the individual chemical atoms of oxygen or of Hydrogen, we could have no inkling of the physical properties of water-drop they together form. And by analogy, the ascetic can have no knowledge of wonders of a true marriage union and of its higher potentialities and relation-ship with the Eternal. Those ascetics who recommend only self-control as a remedy for the mastery of sexual instinct, even when such control becomes merely obstructive to life, are like the physician who tried to drive the fever out of his patient, it was nothing to him that the sick man died of the cure.

বিনয়। যাহাই বল ভাই! বিবাহে অনেক বিপদ—সংযম অভাবে তোমার Ideal কাজ করে না এবং সমস্ত পরকাল ঝরঝরে হয়ে যায়।

শ্রী। সকল দিকে দেখা চাই—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অজেয় সৈন্তের কথা ভাব। সে সৈন্ত না সংগ্রহ করিলে অজেয় অজ্ঞাত পরমেশ্বরকে পরাজয় করিয়া রাজস্য় যজ্ঞের অধিকারী হওয়া যায় না। ইংরেজ লেখক বলিতেছেন—

To me today is essentially a part of my life ever-lasting. I cannot separate time and eternity—this world and the next, as religious people often seem able to do ; to me this body is a tool in the service of my immortal soul. It seems to me that orthodox religious people are too ready to separate this world and the next, to act unreasonably to trust to Eternity or the hereafter, to put all right. I do not think that is the way God wills us to work out his plans now that He is giving us knowledge to do better."

এইখানে সেই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি বাক্য তোমাকে স্মরণ করিতে বলি—

নতং বিদাথ যইমা জজনান্যদ্ যুষ্মাকং অন্তরং বভূব।
নীহারেন প্রাবৃতাজল্প্যা চাসু তৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি॥

অপিচ আরও বলিতেছেন—

'It has happened many times in hnman history that individuals have not only been able to conquer this natural craving (to unite with a mate) for a matee, but have set celebacy as a higher ideal in its most-beutiful expression and sublimest manifestations ; the celebate ideal has proclaimed a world-wide love in place of narrrower human love of home and children. Many Saints and Sages, reformers and dogmatists have modelled their lives on this ideal. But such individuals cannot be taken as the standard of the race, for they are branches which may flower but never fruit in a bodily form.

পরি। তা হলে চৈতন্যদেব বা অন্য সন্ন্যাসীগণের সম্বন্ধে মনস্বী ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন তাহাত অনেক সত্য। তাঁহার কথা—"সংসার ক্ষণস্থায়ী সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া অলীক নহে। পরলোকের সহিত ইহলোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যে জীবন পাইয়াছ তাহার যদি সদ্ব্যবহার না কর তবে পর জীবনে শ্রেয়োলাভের আশা বড় কম! এখন প্রশ্ন যাঁহারা উদাসীন (ascetic) তাঁহারা জীবনের সদ্ব্যবহার করেন কিনা ? উদাসীনগণ জীবনের ব্যবহারই করিল না—সদ্ব্যবহার ত দূরের কথা। যদি এইরূপ বল যে তাঁহারা সমুদয় জীবন ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবনের সদ্ব্যবহার করে, তবে তার উত্তর এই যে, ঈশ্বর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য পদার্থ। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কৌপীন পরিয়া জড়পিণ্ডের মত বসিয়া থাকিলেই ঈশ্বর পাইলে বা সমাধি পাইলে তাহা বুদ্ধিমান বিশ্বাস করে না। যদি বিষ্ণুকে জানিতে চাও তবে বসুপুত্র মেধাতিথির উপদেশ অনুসারে কার্য্য কর—"বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানিপস্পশে।" আরও অনেক কথা বটব্যাল মহাশয় বলিয়াছেন। তাঁহার লেখাগুলি পড়িতে পার।

শ্রী। শ্রীগৌরাঙ্গদেব বা ঈশ্বরাবতার শঙ্করাচার্য্যের বিনয় এই সাধারণ Ideal চিন্তার মধ্যে আনিও না। এসম্বন্ধে অনেক কথা—ধর্ম্মালোচনার সময় আসিবে। তবে তোমাকে এইটি চিন্তা করিতে বলি যে আর্য্যপিতামহগণ আর্য্য ব্রহ্মর্ষিগণ যাঁহারা ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ফল গৃহস্থের পরম আদর্শ ছিলেন। শাস্ত্র প্রণেতা কোন ঋষিই অবিবাহিত ছিলেন না। অঙ্গহীন সৈন্য লইয়া গোলোক জয় করা যায় না—অঙ্গহীন সেনাপতি লইয়া ধর্ম্মরাজ্যে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান হয় না।

"The modern small-moulded ascetic endeavours to grow spiritnally by destroying his physical instincts instead by uniting them (শক্তি সামঞ্জস্যের কথা ভাব) But I would proclaim that we are set in this world so to mould matter that it m·y express our spirits, that it is persumptuus to profess to fight the immemorial laws of our physical being and that he who does so, loses unconsciously the finest flux in which wonderous new creatures take their rise.

মুখোপাধ্যায় মহাশয় নূতন কিছু বলিতেছেন না। তিনি ভারতের সাধনার কি Ideal ছিল তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। প্রশ্নের অবধি নাই। আজ পর্য্যন্ত তর্কের শেষ হয় নাই। অতএব ভাই! শেষ পর্য্যন্ত শুনে নেওয়া যাক্। ক্রমশঃ

মহাত্মা গান্ধী ও ভারতের স্বরাজ

শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বরাজ-সংগ্রামের প্রথম স্তরে বিজয়ী হইয়াছেন, তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্ম্মীদেরে কারামুক্ত করিয়া তাঁহার সহিত ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি মীমাংসার প্রস্তাব করিয়াছেন, অতঃপর ব্রিটিশ মন্ত্রিবর্গ তাঁহাকে বিলাতে লইয়া গিয়া ভারতবাসীকে স্বরাজদানের ব্যবস্থা করিবেন। অনেকে মনে করেন আমাদের স্বরাজ হাতে আসিল বলিয়া। মহাত্মাজির অসাধারণ ত্যাগবল ও কর্ম্মশক্তির প্রশংসা আমরা আর কি করিব, জগতের শ্রেষ্ঠ মণীষীরাই বলিতেছেন, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে তিনি নূতন প্রাণযজ্ঞের উদ্বোধন আরম্ভ করিয়াছেন, সকলের অন্তরে স্বরাজ লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়াছেন, তাঁহার উদ্ভাবিত অভিনব নীতি অনুসারে মানব সেবা-ব্রতের দীক্ষা গ্রহণের জন্য পৃথিবীর চারিদিক্ হইতে ভক্তেরা তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিতেছেন, ইহাতে কোন্ বুদ্ধিমান ভারতবাসীর প্রাণে যুগপৎ আনন্দ, গৌরব ও তৎপ্রতি ভক্তির উদ্রেক্ না হয়? তাঁহার চেষ্টাসাফল্যে হয়ত অচিরে স্বরাজের এক নূতন স্তর ভারতবাসী লাভ করিবেন। কিন্তু এদিকে হিন্দু-সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেরূপ গড়াইতেছে তাহা ভাবিলে আমাদের সমস্ত আশা ভরসা শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। স্বরাজ পাওয়ার জন্য কি হিন্দুরা প্রস্তুত হইতেছে? যাহার ফলে তাহারা রাজ্যসম্পদ্ স্বাধীনতা সমস্তই হারাইয়াছে সেই বহু-যুগের পুঞ্জীকৃত পাপরাশি কি ক্ষালিত হইয়াছে? না ক্ষালন করিতে তাহারা প্রস্তুত? মহাত্মাজি বিরাট হিন্দু-সমাজকে তজ্জন্য কি ভাবে প্রস্তুত করিতেছেন তাহার কথা পরে চিন্তা করিব। প্রথমতঃ আমাদের অধঃপাতের মূল কারণ কি তাহাই দেখিবার চেষ্টা করি।

এই প্রকৃতিরাজ্যের কুত্রাপি বিনা কারণে একগাছি তৃণও নড়ে না, একটি পাতাও ঝড়ে না। আমরা আজ যে অবস্থা ভোগ করিতেছি তাহাও বিনা কারণে নহে, তাহার পশ্চাতে আমাদের

অতীত ও বর্ত্তমান কর্ম্মরাশি ফলদাতারূপে দাঁড়াইয়া আছে। ভবিষ্যতে যাহা ভোগ করিব তাহারও অনেকটা ঐ অতীত ও বর্ত্তমান কর্ম্মসূত্রই যোগাইয়া দিবে। সাত হাজার মাইল দূর হইতে মুষ্টিমেয় ইংরাজ আসিয়া ভারতের ৩৩ কোটী লোককে যে আজ নাকে ধরিয়া চালাইতেছেন তাহারও মূল আমাদের কর্ম্মসূত্র। আত্মকর্ম্মের ফলে কেহ নিজের সর্ব্বস্ব হারায়, কেহ অপরের সাম্রাজ্য অধিকার ও তাহার উপর প্রভুত্ব খ্যাপন করে। এই জন্যই কর্ম্মের বিচার; সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম নির্ণয়।

সুকর্ম্মে অভ্যুত্থান, কুকর্ম্মে পতন, ইহা বুঝিতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। স্বাধীনতা বলবীর্য্য ঐশ্বর্য্য, কিম্বা যশঃসম্মান সমস্তেরই মূল সুকর্ম্মের সাধনা। সাধনাবলে সমস্তই আসে, সাধনা-হীন হইলে সমস্তই চলিয়া যায়। দেবাদিদেব শিব সাধনা আরম্ভ করিলেন; শক্তিকে লাভ করিলেন; ক্রমে ঋদ্ধি সিদ্ধি জ্ঞান ঐশ্বর্য্য বলবিক্রম সবই তাঁহার গৃহে আসিল। মহাবল পাশবশক্তি দিব্য-শক্তির পদানত হইল। অতঃপর ঐশ্বর্য্যনেত্রী লক্ষ্মীর ঘরে জন্মিল কাম। কাম শিবকে সাধনাচ্যুত করিতে চাহিল। শিব দিব্যজ্যোতিবলে কামকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার দশদিক পূর্ণ বিপুল ঐশ্বর্য্য অটুট রহিল। ইহা অমূলক আখ্যায়িকা নহে, প্রত্যেক সাধনাশীল ব্যক্তির ও জাতির জীবনে প্রমাণীকৃত সত্য। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক জাতিতে যেখানেই শক্তিসম্পদ সেখানেই তাহার মূলে শিবের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী সর্ব্বদুঃখ যন্ত্রণায় বা সর্ব্বসুখময় প্রলোভনে অবিচলিত সাধককে দেখিতে পাই। অর্থ হইতে ভোগপিপাসা, তাহা হইতে কামোপভোগ, তাহা হইতে পতন,—দেখিতে দেখিতে সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত, এ চিত্র প্রতিনিয়ত সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। মহর্ষিগণ এই অত্যাহিত নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক লোক যাহাতে সাধনাশীল হয় তাহারই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যতদিন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেই সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন ততদিন তাঁহাদের সংসার শৌর্য্য-বীর্য্য-ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইতেছিল।

ক্ষত্রিয়গণ যখন ভোগলোলুপ হন তখনই তাঁহাদের পতনের সূচনা। সেইরূপ পতিত ভ্রষ্টাচারী রাজন্যবর্গকে আত্মকর্ত্তব্যে অবহিত করিবার জন্য প্রথমতঃ ভগবান পরশুরামের, তারপর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। বৈশ্যশক্তি বরাবর রাজশক্তির পদানুসরণ করে, ফলে বৈশ্যদের পতনও ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে রাজন্যবর্গের প্ররোচনায় কতিপয় ব্রাহ্মণও ভোগ লোলুপ হইয়া পতিত হন। ঐ সমস্ত পতিত রাজা, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ মিলিয়া ধর্ম্মের নামে নানা পাপ-স্রোত প্রবাহিত করেন। তাঁহাদের ধ্বংসের জন্য আসিলেন বুদ্ধদেব। সর্ব্বজীবে দয়া, সমভাব ও অহিংসা মন্ত্রের দ্বারা উচ্চ নীচ ভেদ, বর্ণভেদে ধর্ম্ম ও আচারভেদ ইত্যাদি তুলিয়া দিয়া সকলকে একধর্ম্মী একাচারী করাই তাঁহার ব্রত হইল। ব্রাহ্মণ্যশক্তি রাজশক্তি ও বৈশ্যশক্তি বিনষ্ট হইল। পূর্ব্বে রাজধানীর ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও কতিপয় ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচারী হইলেও পল্লীসমাজ তাহা হইতে দূরে ছিল। কিন্তু বৌদ্ধাচার সমগ্র সমাজকে অনাচারে ও পাপাচারে ডুবাইয়া ফেলিল। তখন ভগবান শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য আসিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। অসংখ্য ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী দণ্ডী সন্ন্যাসী ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া আবার সেই ত্যাগ, সংযম ও সাধনার মন্ত্রে ভারতবাসীকে উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন। আবার রাজস্থানের ঘরে ঘরে অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন ত্যাগশীল ক্ষত্রিয়দের আবির্ভাব হইল। সহস্রাধিক বৎসর পরে ক্ষত্রিয় রাজারা আবার মোহাচ্ছন্ন হইয়া ভ্রাতৃরক্তে স্বীয় ভোগলালসাতৃপ্তি আরম্ভ করিল। এবার লালসার মাত্রা এত বাড়িয়াছিল যে নিজেদের

শক্তিতে কুলাইল না বলিয়া বিদেশী বিজাতিকে ডাকিয়া আনিল।* আজ পর্য্যন্ত তাহারই জের চলিতেছে।

যুগযুগান্ত ধরিয়া কিরূপ কর্ম্মের ফলে ভারতে রাষ্ট্রশক্তির পুনঃ পুনঃ পতন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্যশক্তির ও কতিপয় ব্রাহ্মণেরও পতন ঘটিয়াছিল অতি সংক্ষেপে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে অনুমিত হয় পূর্ব্বে রাষ্ট্রশক্তি সমাজ শক্তির উপর হস্তক্ষেপ করিত না। রাষ্ট্র ও সমাজ দুইটি স্বতন্ত্র শক্তি ছিল। এই দুই শক্তিরই নিয়ামক ছিলেন ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত রাষ্ট্রীয় নেতৃগণ ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত শাসন অগ্রাহ্য করিয়া পতিত ও শ্রীভ্রষ্ট হইলেও ব্রাহ্মণ ও প্রজাসাধারণ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে চলিবার ফলে সুদীর্ঘকাল আত্মস্থ ছিলেন। অধ্যাত্ম-সাধনায় জ্ঞানচর্চ্চায় সঙ্গীত ও বিবিধ কলাবিদ্যায় কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি আর্থিক ব্যবস্থায় সমাজ-শক্তি ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছিল, বিজয়ী মুসলমান বাদসাহেরা এদেশের রাজন্যবর্গকে বিধ্বস্ত করেন, উঁহাদের রাজত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু এদেশের সমুন্নত সমাজশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হন। সামাজিক ও পারিবারিক সর্ব্ববিষয়ে তাঁহারা যথাশক্তি হিন্দুর রীতিনীতি অনুসরণ করিয়াই চলিতে লাগিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত বাদসাহ আকবর হিন্দুর ধর্ম্ম ও রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণেরই চেষ্টা করিলেন। বহু মনীষী মুসলমান হিন্দু যোগীদের নিকট সাধনার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। বেদান্তবিহিত সাধনায় সিদ্ধ সা কলন্দর মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষেরা সুফি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া মুসলমান-সমাজকে এক বৈশিষ্ট্য দান করিয়া গিয়াছেন। বহু মুসলমান নবাব ও জমিদার যে কালীসাধক ও হরিভক্ত হইয়াছিলেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

চট্টগ্রাম সম্বন্ধে লেখকের যে অভিজ্ঞতা আছে তাহার কিঞ্চিৎ এস্থলে উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চট্টগ্রামে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৬৫ পঁয়ষট্টির উপর। মুসলমানেরা সংখ্যাধিক বলিয়া ৩০ বৎসর পূর্ব্বেও কোন মুসলমান হিন্দুকে তুচ্ছ করিতে বা হিন্দুর দেববিগ্রহাদির প্রতি তাচ্ছীল্য প্রকাশ করিতে দেখি নাই, শুনিও নাই। উচ্চপদস্থ মুসলমানেরা হিন্দুর বেশভূষা আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলিতেই আনন্দ বোধ করিতেন। সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ ইরাদতুল্লা ১৯০২ কি ৩ ইংরাজী সনে সাতকানিয়ার মুন্সেফ ছিলেন। তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখি তাঁহার সমস্ত আসবাবপত্র হিন্দুপরিবারের মতন। তিনি বিলাত ফেরতা ব্যারিষ্টার, অথচ ধুতি কামিজ ও চাদরই তাঁহার পোষাক ছিল; সাধারণতঃ কোর্টেও সেই পোষাকেই বসিতেন। তাঁহার ঘরের এদিক্ ওদিক দেখিতে দেখিতে বলিলাম,—"দু'একটা জিনিষের অভাব দেখ্‌ছি।" তিনি একটু চকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী'? আমি বলিলাম—একজোড়া কোশাকুশি, নামাবলী ও রুদ্রাক্ষ বা তুলসীমালা।" তিনি হাসিয়া বলিলেন,—আপনি বোধ হয় আমাদের বাড়ীর খবর জানেন না, আমাদের বাড়ীর আচার ব্যবহার সমস্তই উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু পরিবারের মত। চীনা বা কাচের বাসন আমরা ব্যবহার করি না; পিড়িতে বসিয়া কাঁসের থালায় আহার করাই নিয়ম; পুরুষ পরম্পরা আমাদের কেহই গোমাংস খায় না, বিধবারা বিশুদ্ধ নিরামিষাহারী। আমাদের বাড়ীতে বিধবা বিবাহ হয় নাই, বালবিধবারও না।"—অথচ

* শঙ্করাচার্য্য মঠের ইতিবৃত্ত অনুসারে বর্ত্তমান সময়ের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই আদি শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব। তদনুসারে শঙ্কর অভ্যুদয়ের এক সহস্র পরে মহম্মদঘোরীর আগমন।

তাঁহারা উচ্চবংশীয় মুসলমান। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামের কোন বাজারে গো-মাংস বিক্রয় হইতে দেখি নাই। কোর্ব্বাণি ও মেজবান উপলক্ষ্যে ধনী মুসলমানেরা গো-হত্যা করিতেন, কিন্তু সংগোপনে, হিন্দুর দৃষ্টিগোচর যেন না হয় এমন ভাবে। কেন? হিন্দুর ভয়ে কি? কখনো না। হিন্দুর প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধায়। তখন মুসলমানেরা দৈহিক ও আর্থিক বলে হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর বলবান ছিলেন। চট্টগ্রাম সহরের প্রতি পল্লীতে বহু ধনী সদাগর ছিলেন। পল্লীগ্রামে শক্তিশালী জমিদারের সংখ্যাও হিন্দু জমিদার অপেক্ষা কম ছিল না। ২০ বৎসর পূর্ব্বেও দারোগা শ্রীযুক্ত রাহাতালী চৌধুরী পটীয়ায় এক কালীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শুধু মুসলমানেরা নহেন, পর্ত্তুগীজ অধিবাসীরাও হিন্দুর অনুকরণ করিয়া চলিতেন, অনেক পর্ত্তুগীজ খৃষ্টান হিন্দুর ন্যায় পোষাক পরিতেন, আহারাদি করিতেন, হিন্দু দেবতাদির পূজা দিতেন। কেন? বিজাতি বিধর্ম্মীকে আপনার ধর্ম্মগ্রহণের জন্য হিন্দু কখনো ত কোনরূপ প্রলোভন দেন নাই, নানারূপ কাল্পনিক বর্ণনায় কাহাকেও বুঝাইতেও যান নাই যে তাঁহার ধর্ম্ম অন্যের ধর্ম্ম হইতে উদার ও শ্রেষ্ঠ; বরং হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অপরেরা যেন জানিতে না পারে সর্ব্বদা সেই চেষ্টাই ত করিয়া আসিতেছেন। তথাপি বিজাতি বিধর্ম্মীরা হিন্দুর কাছে আসিলেই তাঁহার ভক্ত হইতেন কেন? হিন্দু তখন আত্মস্থ ছিলেন, তাঁহার বিশুদ্ধ প্রভাবের নিকট সকলেই অবনত হইয়া পড়িতেন। মহতের পূজা মানব-প্রকৃতির বিশিষ্ট ধর্ম্ম। আর আজ আত্মজ্ঞানবিমূঢ় হিন্দুসন্তান দলে দলে যখন খৃষ্টান ও মুসলমানের অনুকরণ করে, তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজনে পরিতৃপ্তি বোধ করে তখন উঁহারা কেন হিন্দুকে শ্রদ্ধা করিবেন? তাই হিন্দু আজ সর্ব্বত্র ঘৃণার্হ, সর্ব্বপ্রকার নির্য্যাতনই তাহার প্রাপ্য। শক্তিসাধনায় সমুন্নত হইয়া অন্যের শ্রদ্ধাকর্ষণ দূরে থাকুক নিজের জীবন ধারণই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে, আত্মদেবতার সম্মানরক্ষায়ও আজ সে অসমর্থ।

হিন্দুর নাই কি? কবিত্বে ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে হিন্দু-সন্তান পৃথিবীজোড়া খ্যাতিলাভ করিতেছেন, বিদ্যাবুদ্ধির প্রাখর্য্যে ও কর্ম্মপটুতায় প্রাদেশিক গভর্ণরের ভারতীয় আইনসদস্যের, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির, বিভাগীয় কমিশনারের, জেলার জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন, সমৃদ্ধ রাজা মহারাজা জমিদার কতই আছেন, বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার ডাক্তার কবিরাজের ত সংখ্যাই নাই; সদাগরী মহাজনী প্রভৃতি ব্যবসায়েও বিপুল অর্থশালী অগণিত হিন্দু রহিয়াছেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে মল্লযুদ্ধে অস্ত্রধারণে হিন্দুরা কি কাহারো পশ্চাতে? অথচ তাঁহারা জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না কেন? দেহ আছে, সাজসজ্জা আছে, সবই আছে, নাই কেবল প্রাণ!

মহাত্মাজি জমিদারদের উপদেশ দেন, তাঁহারা যেন মনে করেন যে তাঁহারা প্রজাদের অভিভাবক এবং যে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহাদের হাতে আছে সেগুলি প্রজার ও সাধারণের মঙ্গলকার্য্যের জন্য ন্যস্ত। ইহা শুনিয়া পূর্ব্বতন জমিদারদের দিকে তাকাইলে চোখে জল আসে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও জমিদার বাড়ীর পরিচয় পাওয়া যাইত বাড়ীর সুন্দর বিষ্ণুমণ্ডপ চণ্ডীমণ্ডপ, বড় বড় ধানের গোলা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাধুসন্ন্যাসী অতিথি ও প্রজাদের থাকিবার বড় বড় ঘর ও বড় বড় দীঘি পুকুর দেখিয়া। বাল্যকাল হইতে একজন জমিদারকে বিশেষভাবে জানিতাম। তিনি ৺শ্যামাপূজার পর জমিদারীতে চলিয়া যাইতেন, ৬।৭ মাস সেখানে প্রজাদেরে লইয়া থাকিতেন।

কোন প্রজা খাজনা দিত, কোন প্রজা টাকা ধার লইত, কেহ ধার শোধ দিত, কেহ অভাব জানাইয়া রেহাই পাইত। মনে হইত প্রজাকে লইয়া তিনি, তাঁহাকে লইয়া প্রজারা। কত প্রজা খাজনা দিত না, ঋণ শোধ করিতে পারিত না, কিন্তু তজ্জন্য তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে কোর্টে নালিশ করিয়া তাহাদের ভিটাবাটী উৎখাত করিতেন না। তাঁহার ভদ্রাসনই হউক, কাচারী বাড়ীই হউক, নিত্য সাধুসন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আশ্রমস্বরূপ ছিল। প্রজারা ও অন্যান্য লোকেরা তাঁহাদেরে ঘেড়িয়া বসিত, কত সৎপ্রসঙ্গ শুনিত, কত উপদেশ পাইত, সঙ্গীত ও কীর্ত্তন শ্রবণে কত আনন্দলাভ করিত। শুধু কি প্রজারা? দেশের জনসাধারণই তাঁহাকে অভিভাবক ও অভাবে আশ্রয়দাতা মনে করিত। এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অভিভাকত্ব আর কি হইতে পারে? এইরূপে তিনি দানধর্ম্মে পরোপকারে প্রজা-পালনে সারাজীবন সগৌরবে কাটাইয়া গিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের এইরূপ শ্রদ্ধাপূত অভিভাবকত্বের অধিকার তিনিও তৎসমসাময়িক জমিদারেরা পুরুষপরম্পরাগত সাধনার ধারা অনুসরণ করিয়াই পাইতেন। আজ তাঁহার উত্তরাধিকারীরা কোথায় গড়াইতেছেন, কে তাহার সন্ধান লয়? জমিদারীর ও প্রজাবর্গের ভালমন্দের বা ভদ্রাসনেব চিরাগত দানধর্ম্ম নিত্যনৈমিত্তিক সদনুষ্ঠান ও অতিথি অভ্যাগতের সেবার কোন সম্পর্ক তাঁহারা রাখেন না। নাগরিক ইয়ারদের সঙ্গে বিলাসব্যসনে ডুবিয়া আছেন। সুতরাং প্রজারা ও দেশের জনসাধারণ তাঁহাদেরে আপনার জন ভাবে না, শ্রদ্ধা করে না, আপদ্‌স্বরূপই বুঝে। সম্মানের কত উচ্চাসন হইতে অবজ্ঞার ও অশ্রদ্ধার কত নিম্নস্তরে গড়াইয়া পড়িয়াছেন এই সংজ্ঞা যাঁহাদের নাই। গান্ধীজির দু'টি মধুর উপদেশে কি তাঁহাদের চৈতন্য হইবে? ইঁহাদের প্রাণদেবতা কোন্ পথে চলিয়া গিয়াছেন সেই পথ ধরিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার উপায় অবলম্বন যতদিন না করিবেন ততদিন অন্য কোন চেষ্টা সফল হইবে না।

যেমন জমিদারদেরে তেমনই উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিমাত্রকেই পশ্চিমের হাওয়ায় উড়াইয়া কোথায় ফেলিয়া দিতেছে তাহার সন্ধানই নাই। পল্লীগ্রামে যাহারা রহিয়াছে তাহারাও ঐ সমস্ত দেশ ও সমাজ-ত্যাগীদের দৃষ্টান্তে মোহান্ধ; তাহাদের মধ্যেও সমাজে সংহতিরক্ষার কোন চেষ্টা নাই; উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারেরই রাজত্ব। ধর্ম্ম নাই, সত্য নাই, পরস্পরের মধ্যে প্রেমবন্ধন নাই; নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি ও পরনির্য্যাতনেই ইঁহাদের পুরুষার্থ। চট্টগ্রামে যাহা দেখিতেছি অন্যত্রও তাহাই ঘটিতেছ, বরং তদপেক্ষা অধিক বলিয়া সংবাদ আসে। তাই গভীর সন্দেহপূর্ণ জিজ্ঞাসা—ইহারা কোন্ সাধনাবলে স্বরাজ পাইবে? এবং সেই স্বরাজের স্বরূপ কি হইবে?

তবে কি আমরা মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ফলে প্রকৃত স্বরাজ পাইব না? ইহার উত্তরের জন্য যেদিকে তাকাই, সেই দিক্ হইতেই হতাশার তপ্তশ্বাসে বুক ভাঙ্গিয়া যায়। যে সমস্ত পাপের ফলে আমরা আত্মহারা হইয়াছি সেই সমস্ত পাপক্ষালনের এবং স্বধর্ম্ম-সাধনের দ্বারা সংযম ও ত্যাগবল লাভ করতঃ সমাজকে সুদৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কোন উপায় কি মহাত্মাজি অবলম্বন করিয়াছেন? বরং পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল তাঁহার গত ১০।১১ বৎসরের আন্দোলনে তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনো তাঁহার আন্দোলন হিন্দুসমাজ-ধ্বংসের খাণ্ডবানলেই ফুৎকার দিতেছে। তিনি যে অসাধারণ ত্যাগী সংযমী ও শক্তিশালী সাধক তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার ফলেই ত তাঁহার আন্দোলন এতটা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু আন্দোলনের প্রাবল্য দেখিয়া স্বরাজ লাভের জন্য দেশ প্রস্তুত হইয়াছে বলা যায় না। ১৯২১ ইংরাজী সনের সেই ভয়ঙ্কর আন্দোলনের মধ্যে

চৌরীচোরার ব্যাপারে মহাত্মাজি দেখিতে পাইলেন যে দেশ তখনও প্রস্তুত হইয়াছিল না। স্বীকার করিলেন যে তিনি হিমালয়ের ন্যায় বিরাট ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এইক্ষণ তিনি যদি বুঝিয়া থাকেন যে দেশ প্রস্তুত হইয়াছে তবে প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবী হউন, তাহা হইলে এই আন্দোলন বন্ধ করিবার সময় তাঁহাকে বলিতে হইবে, মহাসাগরের ন্যায় অসীম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তখন দেখিতে পাইবেন শত শত চৌরীচোরা ইহার ভিতরে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। তাঁহার এবারকার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হয় তিনি যেন স্থির করিয়াছেন যে—লোকে ভ্রম করুক, বিপন্ন হউক, বিফল হউক, তথাপি এই স্বরাজ সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুক, ভ্রম করিতে করিতেই শিক্ষা হইবে।'—তাঁহার এই নীতি আমরা সমর্থন করিতে পারিতাম যদি কর্ম্মপদ্ধতি স্বধর্ম্মানুযায়ী হইত। 'স্বধর্ম্ম' 'স্বধর্ম্ম' বারম্বার কেন বলিতেছি? স্বধর্ম্ম না হইলে কোন জাতি বাঁচিতে পারে না, উন্নত হইতে পারে না। আমাদের স্মরণ হয় গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারত-প্রত্যাগমনের প্রাক্‌কালে বলিয়াছিলেন,—'স্বধর্ম্ম যে জানে না স্বদেশসেবার মর্ম্মও সে বুঝে না।' এক্ষণ তিনি হয়ত মনে করেন যে স্বধর্ম্ম ও শাস্ত্রকে এবং স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের সাধনার ধারাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াও তিনি ত্যাগের ও সংযমের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু অবশিষ্ট ৩৩ কোটীর কথা কি? তিনি হয়ত মনে করেন যে প্রয়োজনানুসারে প্রত্যেক নরনারীই তাঁহার ন্যায় ভোগমোহমুক্ত কর্ম্মী হইবে। হয়ত ইহাও তাঁহার প্রবল বিশ্বাস যে কংগ্রেস ও সত্যাগ্রহে যাঁহারা যোগ দিয়াছেন উঁহারা তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতেছেন বা চলিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কার্য্যতঃ কি দেখি? দু'একজন চেষ্টা করেন না এমন নহে, কিন্তু তিনি যতটা আশা করেন ততটা নহে। ১৯২১ ইংরেজী সন হইতে দেখিয়া আসিতেছি অনেকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া স্বরাজ-আন্দোলনে যোগ দেন কোন না কোন ভোগ-লালসাতৃপ্তির উপায় প্রশস্ত করিবার জন্য। কয়েকদিন না যাইতেই ঐ সমস্ত ভেক "মিটিকা কাপড়া"র ন্যায় আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রকৃতির কংগ্রেস কর্ম্মীদের দ্বারা দেশের জাগ্রত শক্তি পুনঃ পুনঃ ব্যাহত হইতেছে। যাঁহারা ঐরূপ স্বার্থপর ছদ্মবেশী তাঁহাদেরে নেতৃত্বে বরণ করিয়া দেশ যে অধঃপাতে যাইতেছে তাহা নিঃসন্দেহ।

স্বার্থপরতার পর বুদ্ধিভ্রম। যাঁহারা ইন্দ্রিয় মন-বুদ্ধিকে জয় করিতে পারেন নাই ঐ সমস্তের মোহজালে তাঁহাদের সর্ব্বদা পরাভবের আশঙ্কা রহিয়াছে। কারণ, ইন্দ্রিয়াদি উঁহাদেরে কখন কিরূপে ফাঁকি দেয় তাহা তাঁহারা বুঝিতেই পারেন না। তেমন অসম্যকদর্শী মানব বিদ্যাবুদ্ধিতে অর্থ-সম্পদে বা কর্ম্মকুশলতায় যতই শক্তিশালী হউন, তিনি জাতির নেতা হইতে পারেন না, ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকও হইতে পারেন না। কেহ হয়ত মনে করেন যে তিনি যে যে ভাবকে সত্য দয়া ও ধর্ম্ম মনে করেন তাহাই যথার্থ, এবং তদনুসারে জগদ্বাসীকে অনুপ্রাণিত করাই মহৎ কার্য্য। ইহা তাঁহার সুবুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু তেমন সুবুদ্ধি লইয়াও অনেকে মারাত্মক ভ্রম করেন, ভাল করিতে গিয়াও মন্দ করেন। আধুনিক সংস্কারকদের অধিকাংশেরই জীবনীপাঠে জানা যায়, শৈশবে নানা প্রলোভনে পড়িয়া তাঁহারা স্বধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তৎপর ইহার কিছু উহার কিছু আপাত মনোমুগ্ধকর উপদেশ শুনিয়া মনের আবেগে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অগ্নি সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাবে শুধু তাহার রূপে মুগ্ধ কতকগুলি কীট যেমন তাহাতে

ঝাপাইয়া প্রাণত্যাগ করে এই সমস্ত সংস্কারকদের গতিও তেমন হইয়া থাকে। হিন্দুর ধর্ম্ম বহুব্যাপক—আধ্যাত্মিক সাধনা, পারিবারিক প্রথা, সমাজ-নীতি, অর্থ-নীতি, আহার বিহার প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক যাবতীয় অনুষ্ঠানই হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত। দেহের এক অংশ বিষাক্ত হইয়া যেমন দহীর নিপাত ঘটাইতে পারে তেমনই ধর্ম্মের এক অঙ্গ কলুষিত হইলেও অপর সমস্তকে সমূলে বিনাশ করিতে পারে, যদি সূচনাতেই তাহার প্রতীকার করা না হয়। সম্যক্ জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে সংস্কারক হওয়া যে কত দোষাবহ তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বঙ্গদেশে কিছুদিন ব্রাহ্মরা খুব প্রবল হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা হিন্দু-সমাজের এক একটা প্রথাকে বিকটভাবে চিত্রিত করিয়া হিন্দুযুবকদেরে বিভ্রান্ত করিতেন। তাঁহারা একাদশীর উপবাসকে ব্যাখ্যা করিতেন, 'ধর্ম্মের নামে বিধবানির্য্যাতনের জন্য উদ্ভাবিত ঘোর অত্যাচার।' উপন্যাস রচিত হইতে লাগিল,—"এক অপূর্ব্ব সুন্দরী বালবিধবা প্রবল জ্বরের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাঁদিতেছিল—'জল, জল, বুক ফেটে যায়, মা জল, বাবা জল,—'একফোঁটা জল দাও প্রাণ যায়।'—ব্রাহ্মণ শ্বশুর গর্জ্জিয়া উঠিল—"কি বল্লি হতভাগিনী! বিধবা হয়ে একাদশীতে জল খেতে চাস?—বালিকা 'জল জল' করিয়াই প্রাণত্যাগ করিল!" এক বিখ্যাত ব্রাহ্ম বক্তৃতা দিতেছিলেন—"ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান সাধনা না কি প্রাণায়াম। নাক মুখ বন্ধ ক'রে শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ ক'রে থাক্‌তে হবে! বাপ্‌রে ঈশ্বর লাভের কি অদ্ভুত উপায়! আপনারা (শ্রোতৃগণ) একবার শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করে বসুন, ঈশ্বর প্রাপ্তিও হাতে হাতে ঘটে যাবে। ওটা রাক্ষস্! রাক্ষস!!"—এরূপ প্রচারের ফলে কত হিন্দুযুবক যে স্বধর্ম্মে আস্থা হারাইয়াছেন, এবং নানা রূপে স্বীয় ধর্ম্ম ও সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন কে তাহার হিসাব করে। আর আজ একাদশীর উপবাসের ও প্রাণায়ামের প্রশংসা জগন্ময়। ব্রাহ্ম সংস্কারকদের সেই সত্য জ্ঞানকে কুশিক্ষাজনিত বুদ্ধিভ্রংশতার ফল বলিলে এইক্ষণ বোধ হয় অপরাধী হইতে হইবে না।

অন্যের কথা কি, বিরাট পুরুষ বুদ্ধদেবের সংস্কার ভারতে টিকিল না কেন? তাঁহার ত্যাগ, সংযম ও সাধনা অসাধারণ। তাঁহার অন্তর মানবের দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়া বিগলিত হইল, রাজ্য ঐশ্বর্য্য তাঁহার নিকট ভস্মস্তূপের ন্যায় প্রতীত হইল; তিনি সন্ন্যাসী হইলেন; মনে করিলেন বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস পরম ধর্ম্ম, তদ্দ্বারা পরিনির্ব্বাণ লাভই মানবের কর্ত্তব্য, অতএব সকল মানবকে ইহজন্মেই তজ্জন্য প্রস্তুত করা উচিত। মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কাহাকেও দুঃখ দেওয়া বা হনন করা পাপ; বেদের 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি' 'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু' ইত্যাদি বাক্যই সার সত্য; মানবমাত্রেই সমান, কেহ উচ্চ কেহ নীচ এই ভাব দূষণীয় ও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। মানবমাত্রেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান, মানসিক শান্তি, দৈহিক সুখস্বাস্থ্য সমান ভাবে ভোগ করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। মানবতার আদর্শকে এমন সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না। কিন্তু ত্রিকালদর্শী মহর্ষিরা ইহাকে সম্যক্‌দৃষ্টির ফল বলেন না। তাঁহারা বলেন, ইহা অকাল বৈরাগ্য, আশ্রমবিরুদ্ধ সন্ন্যাস ও তজ্জনিত একদেশদর্শী জ্ঞানের ফল। তদ্দ্বারা ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লব যতদূর হওয়ার হইল, অবশেষে ভারতবাসী বুঝিতে পারিলেন যে কর্ম্মভূমি ভারতে একধর্ম্ম একচার চলিতে পারে না, বা তদুপযোগী সময় এখনো আসে নাই, অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

আবশ্যক। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতক্ষেত্র হইতে বিদূরিত হইল। সংবাদপত্রাদিতে দেখি এইক্ষণ ভারতের বাহিরে চীন জাপান ব্রহ্মা ও ভারত-দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি রাজ্যে ৫০ কোটী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর বাস। জানি না বুদ্ধদেব যেমন চাহিয়াছিলেন তেমন বৌদ্ধ কয়জন আছেন। থাকুন বা নাইই থাকুন, বুঝিতে হইবে যেসব রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত আছে সেইসব রাজ্যের লোকের জন্য তাহাই প্রশস্ত।

বুদ্ধদেবের ন্যায় মহাপুরুষের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মান্দোলন যদি ভারতের প্রভূত ক্ষতি করিয়া অবশেষে বিলুপ্ত হইতে পারে তবে অন্যান্য সাধারণ সংস্কারকদের আন্দোলনের পরিণাম সম্বন্ধে না বলিলেই চলে। বিশুদ্ধ সত্য যাহার ভিত্তি তাহা কখনো বিলুপ্ত হইতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণাম দেখিয়া কেহ যদি সিদ্ধান্ত করেন যে তাহার মূলে অবশ্যই কোন ভুল ছিল তবে বোধ হয় তিনি অপরাধী হইবেন না। ইউরোপের অসাধারণ দার্শনিক মণীষী প্লেটো বলিয়াছিলেন— 'কাহারো বিদ্যাবুদ্ধি বিচক্ষণতা অনেক বেশী হইতে পারে, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু তৎপ্রচারদ্বারা জাতির চিরাগত ধর্ম্মসংস্কার ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারেন না। উহা মহাপাপ কার্য্য। নরঘাতক ব্যক্তি-বিশেষকে হত্যা করে, ঐরূপ ধর্ম্মদ্রোহী সমস্ত জাতিকেই হত্যা করে। তেমন মহাপাপীর প্রাণদণ্ডই ব্যবস্থা।'—ইউরোপীয়েরা স্বাধীন বলিয়া গর্ব্ব করেন, কিন্তু জাতীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কথাটি কহিবার স্বাধীনতা কাহারো নাই। ভারতবর্ষও যতদিন আত্মস্থ ছিলেন ততদিন এখানেও কেহ ভাবাবেগে বিচলিত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতেন না। শূদ্রক ব্রাহ্মণের ন্যায় তপশ্চরণ করিতেছিল বলিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে নিহত করিলেন। মানবধ্বংসের আশঙ্কায় অর্জ্জুন ভীত হইয়া সন্ন্যাসী হইতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শাসন করিলেন,—"বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস তোমার ধর্ম্ম নহে, ওসব প্রজ্ঞাবাদ তোমাতে শোভা পায় না, তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মই তোমাকে পালন করিতে হইবে, না করিলে লোকসংস্থিতি বিপর্য্যস্ত হইবে।"—অর্জ্জুন আত্মস্থ হইলেন। ভারতবর্ষ ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লব হইতে রক্ষা পাইল। পরবর্ত্তী যুগে ক্ষত্রিয়সন্তান শাক্যসিংহকে বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের পথ হইতে তেমনভাবে শাসন করিয়া কেহ নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, ভারতবর্ষ মহাবিপ্লবে ডুবিল। আজও ভারত আত্মহারা, সুতরাং এখানে যাহার মাথায় যে খেয়াল চাপে তাহার তদনুসারে চলিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার, শক্তিশালী ও স্বাধীন করিবার জন্য সত্যই যাঁহাদের প্রাণ কাঁদে তাঁহাদের প্রত্যেক পদক্ষেপে দেখিতে হইবে আজ যাহা করিতে উদ্যত দু'দিন পরে তাহার ফল কি দাঁড়াইবে।

এইক্ষণ গান্ধীজি কি ভাবে হিন্দুসমাজকে স্বরাজলাভের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব। তিনি বলেন, অস্পৃশ্যতা হিন্দুসমাজের অতি জঘণ্য কলঙ্ক, তাহা যতদিন দূর না হইবে ততদিন হিন্দুরা স্বরাজলাভের উপযোগী হইবে না। তাই অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনকে তিনি স্বরাজ আন্দোলনের একটি অঙ্গ করিয়াছেন। ক্রমে বিধবা-বিবাহ ও যুবতী-বিবাহ প্রচলন এবং বাল্য-বিবাহ রহিতের ব্যাপারও যোগ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে গুরু ও শ্রাদ্ধের অনাবশ্যকতাও ঘোষণা করেন। এই সমস্তের আন্দোলন তুলিয়া তিনি ভ্রম করিয়াছেন কি না এবং ভ্রম করিলে আমাদের তাহা দেখাইয়া দেওয়া উচিত কি না প্রথমতঃ তাহাই বিচার্য্য। গান্ধীজি আমাদের শ্রদ্ধার ও

গৌরবের পাত্র অতএব তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ ঘটিলেও তাহা দেখাইয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে অন্যায়. এরূপ বিচার আমরা সঙ্গত মনে করি না। বিশেষতঃ কোন কোন বিষয়ে যে তাঁহার মারাত্মক ভ্রম ঘটে তাহা তিনি পরে নিজেই স্বীকার করেন।

ব্যক্তিগত আহার্য্য নির্ব্বাচন কত ক্ষুদ্র বিষয়। স্বল্পব্যয়ে কোন্ আহার্য্য দেহরক্ষার্থ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপযোগী হইবে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়াও তিনি তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই, অবশেষে একটি নির্ব্বাচন করিয়া এমনই রুগ্ন হইয়া পড়িলেন যে তিনি তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। বলিলেন,—"আমার ভ্রম হইয়াছে, এতৎসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণই আমার কর্ত্তব্য ছিল। আমার সঙ্গে সঙ্গে অপর যাঁহারা এই আহার আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিব, আমি অন্ধ হইয়া অন্ধের পরিচালনা করিতেছিলাম।"—অথচ স্পৃশ্যাস্পৃশ্যবিচার, বিবাহের কালনিরূপণ, বিধবা-বিবাহের অবৈধতা ও অনুপকারিতা, শ্রাদ্ধবাদ. গুরুবাদ প্রভৃতি যেই সমস্ত বিষয়ের সহিত জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, প্রাণী তত্ত্ব,ভূতত্ত্ব আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তত্ত্ব, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জড়িত আছে, যাহার কোনটা সম্বন্ধেই তিনি কোন অনুসন্ধান করেন নাই, ফলাফলও পরীক্ষা করেন নাই (অন্ততঃ তাঁহার জীবনী-পাঠে আমরা জানিতে পারি নাই) অথচ সেই সমস্ত অতিশয় জটিল ও তাঁহার অনধিগম্য বিষয়ে তিনি অনায়াসে তাঁহার সিদ্ধান্তানুসারে সংস্কার চালাইতে ইতস্ততঃ করেন না। এই সমস্তের কুফল হাতে হাতে পাওয়া যায় নাই, আহার্য্য নির্ব্বাচনের ফলের ন্যায় কাহারো দেহপাতের আশঙ্কাও উপস্থিত করে নাই, অধিকন্তু এই সমস্ত সাধনাহীন অসংযত প্রাকৃত জনসাধারণের পক্ষে লোভনীয়, সুতরাং তিনি বাধাও পাইবেন না, ভ্রম স্বীকার করিতেও বাধ্য হইবেন না। কিন্তু সমাজের বিজ্ঞ চিন্তাশীল লোকেরা কি দেখিতেছেন ?

অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনকে মহাত্মা গান্ধী হিন্দুদের স্বরাজ প্রাপ্তির পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম বলিয়া অবিরাম ঘোষণা করেন। তাঁহার মতে সকল মানবই সমান, সুতরাং কেহ উচ্চ কেহ নীচ, কেহ স্পৃশ্য কেহ অস্পৃশ্য এরূপ বিচার নীতিবর্জ্জিত।

'ভগবান সর্ব্বভূতেই সমান'—এ তত্ত্ব ভারতের মহর্ষিরা বহুযুগ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন ; সুতরাং ইহা নূতন কথা নহে। আবার সেই মহর্ষিরাই মানুষের মধ্যে বর্ণভেদও দেখিতে পাইয়াছেন। বর্ণভেদ অনুসারে অধিকারভেদ কর্ম্মভেদ, এবং তাহা হইতে আচারভেদ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই হইয়াছে, বলপূর্ব্বক একে অন্যের উপর কিছুই চাপায় নাই। স্পৃশ্যাস্পৃশ্যবিচার সকলের মঙ্গলের জন্যই ব্যবস্থিত। পূজাসন্ধ্যারত ব্রাহ্মণ মলিন দুর্গন্ধময় মুচিমেথরাদির সঙ্গে গলাগলি করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিশিতে হইলে যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজন উহারা যদি তেমন ভাবে থাকিতে যায় তবে তাহাদের জীবিকাই চলিবে না। ইন্দ্রিয়সংযম আহার্য্যবিচারাদি সম্বন্ধেও ব্রাহ্মণের ও তাহাদের মধ্যে পার্থক্য অনেক, অথচ ব্রাহ্মণ এবং মেথরাদির একস্থানে বাসও করিতে হইবে। এতদবস্থায় সর্ব্বোচ্চ আদর্শকে অব্যাহত রাখার এবং অনুন্নত লোকদেরে বিশুদ্ধ পথে আকর্ষণ করার জন্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার একটি বিশেষ উপায়। অবশ্য তাহার যে অপব্যবহার হইতেছে না এমনও নহে, এজগতে ভগবদ্দত্ত কোন্ বস্তুর অপব্যবহার হয় না ? ঐ সমস্ত অপব্যবহার অবিচার অত্যাচার দূরীকরণের চেষ্টাও আজ নূতন নহে। মহর্ষিরা যাহা করিয়াছেন তাহা

নাইই বলিলাম—বুদ্ধদেবের চেষ্টার ত তুলনাই নাই, শ্রীচৈতন্যদেব কবীর নানক দাদু প্রভৃতিও কম করেন নাই! তারপর ভারতের সমস্ত উচ্চ স্তরগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া সমভূমিতে পরিণত করিবার জন্য বৃটিশ শাসনের বিশাল রোলার বিগত ১৭৫ বৎসর যাবৎ অবিরাম চলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ আর্য্যসমাজ রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি তাহার যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। কিন্তু সেই চিরদুর্গত মুচি-মেথর ডোম পাঞ্চিয়াদের মধ্য হইতে কে কয়টিকে তুলিয়াছেন দেখাইতে পারেন কি? কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সৎশূদ্র প্রভৃতি উচ্চ শিখরগুলিকে ছিন্নভিন্ন করত নিম্নস্তরে ডুবাইয়া দেওয়াই ত কাজ দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজের পুঁথিপত্রে ঘোষিত মূল নীতি সাম্য, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের খ্যাত-নামা বৈদ্যেরা নিম্নস্তরের অন্ত্যজদের কথা দূরে থাকুক, কোন কায়স্থের সঙ্গেও সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া জানি না। কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া ব্রাহ্মণ বংশজের সহিত যথেষ্ট উৎকোচ দিয়াও সম্বন্ধ করিতে কোন আপত্তি নাই। ইহাই বর্ত্তমান যুগের সত্যনিষ্ঠা ও সাম্যনীতি।

তারপর পূর্ব্বতন যুগের ও বর্ত্তমান যুগের কার্য্যপ্রণালীর পার্থক্য দেখুন,—বুদ্ধ চৈতন্য নানক কবীর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদেরে উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে মানবের চরম লক্ষ্য ভগবৎপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিতেন, যে পথে বিরোধের স্থান নাই। বর্ত্তমান নেতৃগণ দেখাইতেছেন বৈষয়িক সুখ সম্পদের পথ, যাহা ঈর্ষা-হিংসা দ্বেষ-সমাকুল। বুদ্ধ প্রভৃতির সংস্কার অযোগ্যের দুরাকাঙ্ক্ষায় ফুৎকার দিত না, অন্যের প্রতি ভোগলালসা-জনিত হিংসাদ্বেষও জাগাইয়া তুলিত না, সকলেই বুঝিত উন্নতি নিজের সাধনা-সাপেক্ষ। বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে অযোগ্যদের আস্ফালনই আকাশ ডিঙ্গাইতেছে। অনুন্নত শ্রেণীর নব্যভাবাপন্ন লোকেরা মনে করিতেছে উচ্চশ্রেণীতে যাহারা আছে তাহাদেরে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহাদের মাথায় চড়িয়া বসাই উন্নতি। এজন্য এক একটা নিম্নশ্রেণী স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর সৃষ্টি করিয়া অন্যান্যের সহিত রেষারেষি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেকেই উচ্চশ্রেণীসমূহের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে। পারে ত এই মুহূর্ত্তেই উহাদেরে নিষ্পেষিত করে। ইহার মধ্যে মহাত্মাজির অহিংসানীতির কোন চিহ্ন আছে কি? হিন্দুসমাজে এমন ভয়ঙ্কর আত্মদ্রোহের দৃষ্টান্ত অতীত সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাণেতিহাসে খুঁজিয়া পাইবেন না।

গান্ধীজি বলেন—দরিদ্রনারায়ণদের জন্য তাঁহার স্বরাজ-সাধনা। দরিদ্র নারায়ণেরা এই ভাবের যোগ্যতা লইয়াই স্বরাজ সম্ভোগ করিবে? বিগত ১১।১২ বৎসরের আন্দোলনের ফলে কয়টি অস্পৃশ্য লোক উপকৃত হইয়াছে? তাহাদের কয়জন কংগ্রেসে বা সত্যাগ্রহে যোগ দিয়াছে? কয়জন অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন চাহে? ১৯২১ ইংরাজী সনে গান্ধীজির ভক্ত এক ব্রাহ্মণবংশজ প্রফেসার একজন ইংরাজ মিশনারীকে ও কতকগুলি মেথরকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের চূড়ান্ত আদর্শ স্থাপন। সকলেরই একই পংক্তিতে বসিবার ব্যবস্থা করা হয়। সকলে যখন বসিয়া গেলেন তখন প্রায় ১৫।১৬ জন মেথর উঠিয়া স্বতন্ত্র স্থানে বসিল, এবং বলিল "ঐ পঙ্ক্তিতে যিনি পরিবেশন করিবেন তিনি আমাদেরে পরিবেশন করিতে পারিবেন না—উও সব্ হাম্‌সে বহুৎ নীচা।"—উক্ত প্রফেসার, মিশনারী ও ৫।৬ জনমাত্র মেথর ঐ পংক্তিতে রহিল। ইহাতে কে উঠিল কে পড়িল বা কাহার বংশোদ্ধারের পথ কতটুকু পরিষ্কার হইয়া রহিল পাঠকগণ চিন্তা করুন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয়জি প্রণব-মন্ত্র দিয়া সমস্ত অন্ত্যজ জাতীয় লোকদেরে একটানেই উপরে তুলিতে চাহিলেন। কৈ, এখন তাঁহার সাড়াশব্দও নাই কেন? একটি অন্ত্যজও তাঁহার প্রদর্শিত যজ্ঞ ও হোম করে বা প্রণব সাধনা করে ইহা দেখাইতে পারিবেন কি?

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের কাজ যতদূর হউক, স্বরাজের কাজ এই আন্দোলনের দ্বারা কিরূপ অগ্রসর হইতেছে, মহাত্মাজির "ইয়ং ইণ্ডিয়া" হইতেই তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি:—দাক্ষিণাত্যের কোয়ম্বটুর জেলায় কুগালুর নামক গ্রাম। তাহার অধিবাসীরা সকলেই কৃষিজীবী, সকলেই গোঁড়া হিন্দু। এই গ্রামের এক অংশে অস্পৃশ্য পল্লদের বাস, পল্লেরা ঐ সমস্ত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের জমিতে চাষ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, অর্থাৎ ভারতের সর্ব্বত্র নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা উচ্চ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যে ভাবে সৌহৃদ্য রক্ষা করত তাঁহাদেরই সাহায্য ও সহানুভূতি লইয়া চলে এখানেও তাহাই। ঐ গ্রামে কৃষ্ণকান্ত স্থবনগাউণ্ডার নামক এক ব্যক্তি গান্ধীজির ভক্ত আছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী, গত ৬ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তথাকার তালুকা কংগ্রেস কমিটীতে কখনো প্রেসিডেণ্ট, কখনো সেক্রেটারীরূপে কাজ করিতেছেন, বহু স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহপূর্ব্বক খাদি প্রচারের, বিদেশীবস্ত্র ও মদ্যাদি বর্জ্জনের কাজ বিশেষ সফলতার সহিত চালাইয়া আসিতেছেন। এইক্ষণ অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের খেয়াল স্থবনগাউণ্ডারের মাথায় চাপিয়াছে। একদিন তাঁহার বাগান-বাড়ীর কূপ হইতে কয়েকজন পল্লকে জল নিতে বলিলেন, উহারা জল নেওয়ার পর তিনি ঐ কূপে স্নান করিলেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন দাক্ষিণাত্যে উচ্চ শ্রেণীর কূপ হইতে অন্ত্যজ-দের জল তুলিবার অধিকার নাই। অতঃপর ঐ ব্যাপার লইয়া উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা স্থবনগাউণ্ডারকে সমাজচ্যুত করিয়াছেন, তাঁহার বাড়ীর অন্য লোকেরও উচ্চ শ্রেণীর কূপ স্পর্শ করিবার উপায় নাই। ঐ তালুকার সমস্ত লোক তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছে, ৪টি মাত্র যুবক তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন বলিয়া ঐ বিবরণে দেখা যায়, সম্ভবতঃ তাহাও মৌখিক! ফলে তাঁহার দেশ-সেবার সমস্ত কর্ম্ম পণ্ড হইয়াছে, তাঁহার গৃহস্থালীর কাজও অচল হইয়াছে।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ত হইলই না, অধিকন্তু সমস্ত গ্রামবাসী মিলিয়া যে বিদেশী বস্ত্র, মদ গাঁজা প্রভৃতি বর্জ্জনের ও খদ্দর প্রচলনের কাজ করিতেছিলেন তাহাও বন্ধ হইল, গ্রামের শান্তি এবং সংহতি ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার পথে চলিল। তথাপি গান্ধীজি স্থবনগাউণ্ডারকে উৎসাহ দিয়াছেন তিনি যেন অচল অটল থাকিয়া ত্যাগবলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। স্থবনগাউণ্ডার হয়ত মনে করিতেছেন সমগ্র সমাজকে ত্যাগ করার মতন বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলে তিনি সমাজ-সংস্কারে আত্মত্যাগী বীর বা দ্বিতীয় গান্ধী বলিয়া কীর্ত্তিত হইবেন।

গান্ধীজি উপদেশ দেন, ইদানীং পূর্ণ জ্ঞানী গুরু মিলে না সাধারণ গুরুর নিকট দীক্ষা লওয়ার প্রয়োজন নাই; দেশ-সেবার কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলে অর্থাৎ তাঁহার নীতি অনুসরণ করিলে যদি পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনেরা বাধা দেন তাহা অগ্রাহ্য করিলে যুবক ও বালকদের কোন দোষ হইবে না। এইরূপ উপদেশের ফল কি দাঁড়াইয়াছে? বহু যুবক ও বালকের মধ্য হইতে পিতৃমাতৃ গুরুভক্তি উঠিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যাপূজা দেবসেবা নাই; স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার; মহাত্মাজির নীতি অনুসরণের নামে ব্যভিচারের স্রোত চলিতেছে। দেশসেবায় মহাপ্রাণ বীর বলিয়া কীর্ত্তিত হওয়ার প্রলোভনে একদল লোক অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, বিধবা-বিবাহ ও

যুবতী-বিবাহ প্রচলন ইত্যাদি লইয়া সমগ্র সনাতনপন্থী হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে।

ইংরাজের কবল হইতে স্বরাজ আয়ত্ত করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায় যে ভারতবাসী সকল শ্রেণীর সঙ্ঘশক্তি ইহা সকলেই বুঝেন। গান্ধীজিই বারম্বার বলেন, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ যতদিন থাকিবে ততদিন ভারতবাসীর স্বরাজলাভ অত্যন্ত দুষ্কর হইবে। তাই হিন্দু মুসলমানের বিরোধ মীমাংসার জন্য তাঁহার কত ব্যাকুলতা। অথচ আমরা দেখিতেছি হিন্দু মুসলমানের বিরোধ অতি অকিঞ্চিৎকর। পল্লীগ্রামে আসিয়া দেখুন সহস্র সহস্র হিন্দু মুসলমান কেমন শান্তিপ্রীতির সহিত বাস করিতেছে। এখানে কোন মুসলমান হিন্দুর স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারে আপত্তি করে না, হিন্দুর ঘরে ঢুকিয়া খাওয়ার আব্দার করে না, শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি শুনিয়া ধর্ম্ম গেল বলিয়া হিন্দুর গলায় ছুরি বসাইতেও দৌড়ে না। কিন্তু মহাত্মাজির তথাকথিত হিন্দুভক্তের দল অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন ও বিধবা বিবাহাদি প্রচলন লইয়া নিজেরা যে সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে এক সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে, হিন্দুর ঘরে ঘরে আত্মদ্রোহের দাবানল জ্বালাইতেছে, হিন্দুসমাজের মজ্জাকে শতধা খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিতেছে, তাহা কত সর্ব্বনাশকর, ভাবিতেও অন্তর কাঁপিয়া উঠে। ভয়ব্যাকুল অন্তর জিজ্ঞাসা করে, এইভাবে হিন্দুসমাজকে বিপ্লবে নিমজ্জিত করাই কি তাহাকে স্বরাজপ্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত করা? এই ভীষণ অন্তর্বিপ্লব অচিরে নিবারিত না হইলে তাহাদের স্বরাজপ্রাপ্তি দূরে থাকুক্ অস্তিত্বই রক্ষা পাইবে কি না চিন্তা করুন।

দিগ্‌দর্শন

"হিন্দু সমাজের সংস্কার দরকার তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু তাহার পথ ঠিক করা আগে প্রয়োজন। সেটা নারী-জাগরণ, বাল্যবিবাহনিষেধকারী আইন প্রণয়ন বা বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলন করিলেই হইবে না। সংস্কার মানে কেবল পদার্থান্তর প্রাপ্তিই নহে। স্ব-স্বরূপ রক্ষা করিয়াও একটা সংস্কার পাওয়া যায়। সোণাকে লোহা করার যে সংস্কার তাহা প্রার্থনীয় নহে পরন্তু লোহাকে সোণার সংসর্গে আনিয়া তাহাকে সোণা করিবার সংস্কারই প্রার্থনীয়। হিন্দু-নারীর সতীত্ব রক্ষা করিবার ক্ষমতা পুরুষের যাহাতে আইসে সেইরূপ ধর্ম্ম, নীতি ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার চেষ্টা করাই প্রকৃত সংস্কার। কিন্তু বাস্তবিকই সে সংস্কারপথে বাধা আছে। স্বার্থপর ও কপট পুরুষ কিছুতেই নিজ শক্তিমত্তার উদ্দাম ভাব পরিত্যাগ করিতে রাজী নহেন। হীন শক্তি নারীর সে ক্ষমতা নাই যে তিনি পুরুষ-সংস্কার করিতে পারেন। অক্ষমের লক্ষণই হইতেছে "যা করেন হরি!" বলিয়া গোলে হরিবোল দিয়া উদ্দাম নৃত্য করা। আজ ভারতে সেই ভাব চলিয়াছে। প্রবল জাতির নৃশংস অত্যাচারে এক সময় দশপ্রহরণ-ধারিণী মহাশক্তির বা অস্ত্রধারী সাধাদেবতার পূজাকে যে নিয়মে নিরস্ত্রধারী দেবতার আরাধনায় ও কবিতারসে অবনত

করা হইয়াছিল, আজ ঠিক সেই নিয়মে জগন্মাতার অংশরূপা নারীগণ পুরুষের ঘোরতর অত্যাচার হইতে বাঁচিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে বাধ্য হইতেছেন।(১) এই উৎসন্নের পথ পুরুষ বন্ধ না করিলে কাহারও সাধ্য নাই যে সেই সৃষ্টির সার—মানবের সার—সতীত্ব রক্ষা করে। যে জাতি তাহা রক্ষা করিতে পারে তাদের সতীত্বের ও বিবাহের আদর্শের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাদের মতে তারা রক্ষা করিবার বা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু তাহাতে তোমার মতের সতীত্ব পাওয়া যাইবে না। সতীত্ব গেলে বর্ণসঙ্কর বিস্তারে আর্য্য সভ্যতার ধারা চলিয়া যাইবে। তাই ভগবান বর্ণসঙ্কর বর্ণসঙ্কর করিয়া গীতায় এত চীৎকার করিয়াছেন। সোণার তারটি হারাইলে লোহাতে যতই শৌর্য্য, বীর্য্য, শঠতা কাপট্য প্রভৃতির আবরণ দাও, এই লক্ষ লক্ষ বৎসরের সঞ্চিত অপার অত্যাচারের ভার ঝুলিবে না। তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গ্রীস্, রোম মিশর প্রভৃতি জাতির সমাজ ও সভ্যতার ন্যায় কোথায় অনন্তে মিশিয়া যাইবে। ভারত সন্তান! পিছনে ফিরুন, তাকিয়ে দেখুন—যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা আর ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিবেন না। তাহাকে উজ্জীবিত করুন চৈতন্য শক্তির উন্মুখী করুন। নূতন কিছু করিবার নাই। ঋষিগণ এমন কিছু বাকী রাখিয়া যান নাই, যাহা এই উৎসন্নমুখী ক্ষীণ মস্তিষ্কের দ্বারা আবিষ্কৃত করিবার সম্ভাবনা আছে। সেই চির পূজ্য ঋষিদের কথা উপলব্ধি করিয়া দেশের অজ্ঞান দূর করুন। তাঁহাদের বিধি ও শাসনের সনাতনত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহারই প্রচারে বদ্ধপরিকর হউন। ষোড়শ বিকার—সাত প্রকার বিকৃতি—তারপর সতী বা পরা প্রকৃতি। তার উপর পুরুষ—ইহা উপলব্ধি করুন। দেখিতে পাইবেন। আর পুরুষও বলিবেন—পত্নী গৃহলক্ষ্মী, পত্নী সর্ব্বকার্য্যের মূল, পত্নী চিরসঙ্গিনী, পত্নী জগজ্জননী—কৃতধিয়ো পুরুষের হৃদয়ের বৃদ্ধি। সতীত্ব রক্ষার মহিমায় হিন্দু কোথায় উঠিয়াছিল। তপশ্চরণে প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হউক—পুরুষ নীতি ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য অবলম্বন করুণ। তখন নারী সীতার মত বলিবেন—

যদিত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্॥

এই আর্য্যাবর্ত্ত ভোগ ভূমি নহে। ইহা কর্ম্মভূমি। হিন্দুগণ চিরদিন কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন। ভোগে জীবনের উদ্দেশ্য নিবদ্ধ করেন নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন:—

ব্রাহ্মণঞ্চ কুমারীঞ্চ শক্তিমগ্নিং শ্রুতিঞ্চগাং।
নিত্যমিচ্ছন্তি তে দেবাঃ যষ্টুং কর্ম্মভূমিষু॥ (মৎস্যসূক্ত)

কুমারীকে রক্ষা করিবার মত চরিত্রবান ও ন্যায় এবং ধর্ম্মপরায়ণ হউন। প্রয়োজনাভাবে তখন আর নারী জাগরণ প্রভৃতি মহা আপদের তাড়নায় হিন্দু সমাজ কাঁপিবে না। দেবাসুর যুদ্ধ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। দেবতা প্রায়ই প্রথমে অসুর দ্বারা পরাজিত হইয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মকে ধরিয়া পুনরায় অসুর ধ্বংসকারী শক্তিলাভে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করিয়াছেন। সেই নারায়ণের

(১) চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ইতিহাস ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ইতিহাস পাঠ করিলে "গোলে হরি বোলের" উদ্ভব বুঝিতে পারা যায়। প্রাণের ভয়ে অনেকেই তখন শক্তির উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বসন্ত রায় নিজে শাক্তর পূজা ছাড়িয়া "বৈষ্ণব ঠাকুর" হইয়াছিলেন। গোবিন্দ দাস তাঁদেরই ভয়ে প্রতিপালিত—বৈষ্ণব-পদ-কর্ত্তা হইয়াছিলেন।

শরণাপন্ন হইবার মত চরিত্রবল—আত্মিকবল লাভ করিতে সচেষ্ট হওয়াই এখন আমাদের পথ। নারায়ণের শরণাপন্ন দুর্ব্বল হইতে পারে না। সে শরণাগতি কাপট্য মাত্র—প্রাণের ভয় মাত্র। ধর্ম্মের ফল কখনই বীর্য্যহীনতা লাভ নহে। ধর্ম্মের চেয়ে বল নাই ইহা শাস্ত্রবাক্য—তবে যে ধর্ম্ম-শিক্ষা হীনবল আনে তাহা মিথ্যা ধর্ম্ম – তাহা ধর্ম্মের ভাণ মাত্র ইহা নিশ্চয়। —দর্শক।

ছোটকথা

বীজ ছোট হইলেই যে গাছও ছোট হইবে—এমন কোন কথা নাই। বটের বীজ ছোটই হয়। সুক্ষণে কি কুক্ষণে—এমন একটা ছোটকথা কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া যায়—যার জন্য জীবনের সুচিন্তিত ধারাও বিপরীত পথে অবাধে বহিয়া যায়। ছোট বা ক্ষুদ্র বলিয়া ঘৃণা করিও না—ক্ষুদ্রই মহতের বীজ।

অতি ক্ষুদ্র বীজকণা ধূলিরাশির ভিতর আত্মগোপন করিয়া কত পদাঘাত সহিয়া যায়। একদিন ভগবানের করুণা ধারার মত বর্ষার বারিধারা আসিয়া সেই পদদলিত উপেক্ষিত বীজকণার মস্তকে বর্ষিত হয়, বীজকণা দীর্ঘদিনের মলিন ধূলিরাশির মধ্য হইতে নিজের স্বরূপ প্রকটিত করিয়া অনন্ত আকাশের তলে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। ভিতরে চৈতন্য থাকিলে—একদিন না একদিন অবসর পাইলে সে জাগে। অপেক্ষা থাকে তার—একটা ক্ষুদ্র আহ্বানধ্বনি। তা'—সে বড় কথায় হউক বা ছোট কথায় হউক। আমাদের এই ছোট কথা সকলের কাণে না হউক, কাহারও না কাহারও প্রাণে পৌঁছিতে পারে তাই ইহার অবতারণা।—

আপন-পর

আমার কবে এমন সুদিন হবে--যেদিন আমি আপনাকে আপন বলিয়া চিনিতে পারিব। আপন বলি কাহাকে ?—যা'র মন্দ বলিয়া কোন পদার্থ নাই—সবই ভাল। আর—পর বলি কাহাকে ? যা'র ভাল বলিয়া কোন পদার্থ নাই—সবই মন্দ। আমি আমাকে আপন করিয়াছি—তাই আমার এই কুৎসিৎ কদাকার মূর্ত্তি— ইহাও কত সুন্দর, ইহার তুলনা নাই। তাই এই মূর্ত্তির সেবাকরি—কত না যত্ন করি, কত না সাজাই,—আর মানায়ও কতসুন্দর, এত সুন্দর ভাবে আর কাহাকেও ত মানায় না ! আমার বুদ্ধি বিবেচনা ?—সে কথা আর তুল না। আমার অবস্থা কি ছিল,—আর কি হইয়াছে,—কিন্তু বুদ্ধি আমার ঠিক্‌ই আছে। কত লোকে কত ভুল করে,—আমার কিন্তু ভুল-চুক্ নাই সব ঠিক্। যদি বল বুদ্ধির দোষেই আমার আজ এত দুঃখ এত কষ্ট,—সেটা তোমার বুঝিবার ভুল। হতভাগা বিধাতাই যত নষ্টের মূল, সে কখনও কাহাকে ভাল দেখিতে চায় না। তাহা না হইলে আমায় পায় কে ? কেন এমন হয় জান ? আমি আমাকে আপন করিয়াছি, তাই আমি সর্ব্বগুণের আধার। আমার স্ত্রীপুত্র পরিবার চাকর বাকর- সব আমার—নির্দ্দোষ।

আপনের বিপরীত পর। পরের কোন গুণই থাকিতে পারে না, তার এমনই দুরদৃষ্ট যে, ভাল বলিয়া কোন্ পদার্থ তাহার কোষ্ঠিতে লেখা নাই। থাকিতেও পারে না, কেন না আমি থাকিতে সে কি কখনও ভাল হইতে পারে? আমি না থাকিলে সে কেন—সকলেই ভাল হইত। পরের বুদ্ধি বিবেচনা স্ত্রীপুত্র পরিবার ধনদৌলত—সব মন্দ—সব মিথ্যা। যদি কোন দিন আমার মুখে পরের প্রশংসা শুনিয়া থাক তো সে তাহার গুণের জন্য নয়—আমার উদারতার জন্য।

যাহারা নিজের দেশের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মকর্ম্ম, বেশভূষা, রীতিনীতি, হাব ভাব, হাসি কান্না, চলন বলন,—মায় মরণের পরেও মৃতদেহের দাহটা পর্য্যন্ত বিদেশী প্রথায় করিয়া প্রেতাত্মাকে কৃতার্থ করিতে চায়,—তাহারা নিজের দেশটাকে কত খানি আপন করিয়াছে—বলিয়া দিতে পার কি?— ইতি, রাখাল।

অজ্ঞতার অভিযান—হিন্দুর আচারে নিন্দা

বিলাতের মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান নামক পত্রিকা খানির বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে—দরদ বুঝিয়া লিখে বলিয়া তাহার নাম। কয়েক দিন পূর্ব্বে ইদানীং পরিচিত 'মাদার ইণ্ডিয়া' নামক অপূর্ব্ব নামীয় পুস্তকের প্রতিষ্ঠা-বতী লেখিকা কুমারী মেয়োর নব প্রকাশিত ঐ নামের দ্বিতীয় আর এক পুস্তক লইয়া একটা প্রবন্ধ এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। মেয়োর পুস্তক লইয়া হক্ না-হক্ অনেক আলোচনা নানা পত্রিকাতে হইয়াছে; লোকে অবিচারে তাহা গ্রহণ করিয়াছে। মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের অঙ্কে স্থান পাইয়া ঐ পুস্তকের মাহাত্ম্য যে আরও কীর্ত্তিত হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। দুঃখের বিষয় এই সকল অপকীর্ত্তির চমকে আমাদের দেশীয় শিক্ষিত লোক-দিগের চক্ষুই অধিক ঝল্সিয়া যায়। অনেকে এই সকল গরল নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করিয়া আসিতেছেন, অনেকে মত্ত হইয়া ইহার সহিত তালে পা ফেলিয়া নৃত্য করিয়া চলিয়াছেন; ধুরন্ধর দেশহিতৈষী ও দেশ-নায়কগণ উহার বাক্য বেদ-প্রমাণ্য বলিয়া ধরিয়া সমাজ ও জাতি-ধ্বংসের নব নব পথ আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছেন। যে দুই চারি খানি পুস্তক পুস্তিকা ইহার প্রতিবাদ স্বরূপে লিখা হইয়াছে, তাহার অনেকেতেই তেমন দৃঢ়তার অভাব, আত্মশক্তির অন্তঃদৃষ্টি নাই—পরের মুখের দিকে চাহিয়া লেখা; কোনও কোনও খানি বা কেবল মাত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থের কামনায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের ফলও তেমনই হইয়াছে—লোকের মনের উপরে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহা পারিলে মিস্ মেয়ে পুনরায় তাহার পুস্তকের এই পরিশিষ্ট লিখিতে সাহস ও অবকাশ পাইত না। মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের ন্যায় পত্রিকাও তাহার সমর্থনে আসিয়া দাঁড়াইত না। তাহা বলিয়া এ বিষয়ে প্রকৃত দৃষ্টি-সম্পন্ন লোকের অভাব এখনও এদেশে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সম্প্রতি এক কপোত-বাহী ডাকে মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের সম্পাদককে এইরূপ এক ব্যক্তি এক খানি পত্র

পাঠাইয়াছেন ; তাহার এক খণ্ড আমাদের হস্তে পড়িয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্ম তাহার ভাবান্তর করিয়া দিলাম—

সম্পাদক মহাশয়—আপনার মত উদার সহানুভূতি-শীলের হাতে সম্প্রতি মিস্ মেয়োর মাদারইণ্ডিয়া দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তক সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পড়িয়া মনে সন্তাপ পাইতেছি। অদ্যকার এই আত্মপক্ষ-সমর্থনে অসমর্থ পতিত ভারতের শত্রুগণ অনভিজ্ঞ হইয়াও ভারতবাসীর যে দুঃখ দুর্দ্দশা ও অত্যাচারের কাহিনী বলিয়া বেড়ায়, তাহাতে আপনার করুণ-হৃদয় বিগলিত হওয়া স্বাভাবিক। এই দয়ায় অভিভূত হইয়াই বোধ হয় আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে বাস্তবিক চন্দ্রলোকবাসী জীবের ন্যায়ই আপনারাও হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে উদার, উচ্চ, সাধারণ বুদ্ধির অতীত, আত্মার তৃপ্তিকারী সত্যনীতি সমূহ কেবল মাত্র সনাতন হিন্দু-শাস্ত্রে স্বভাবতঃ উৎপন্ন ও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা একবার দেখিলে, প্রবল অহঙ্কারের বন্যায় উদ্বেলিত-চিত্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর সকলেই নিঃসঙ্কোচে উহার প্রশংসা করিবেন। আর যিনি পক্ষপাত-শূন্য গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া বিনম্র ভাবে সেই চিরাগত চিরস্থায়ী শাস্ত্ররূপী শাশ্বত সত্য ও পবিত্রতার উৎসের সম্মুখীন হইবেন বা উহার স্বরূপ কিছুমাত্র বুঝিতে যাইবেন, তিনিও তাহা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। অজ্ঞতা-জনিত আত্মম্ভরিতা বশে লোকে অজ্ঞের ন্যায়ই সেই অসীম জ্ঞান ও সত্যের ভাণ্ডারকে তুচ্ছ করিতে পারে—উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে—গালিগালাজ করিতে পারে ; কিন্তু সৌভাগ্যবশে যদি কখনও এই আত্মম্ভরীর দল একবার দূর হইতেও সেই অতি উচ্চ ও উন্নতকরী—সত্য, মঙ্গল, পবিত্রতা ও জ্ঞানের আশ্রয়ের দর্শন লাভ করিতে পারে, তবে তাহার মস্তক শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে নত হইয়া পড়িবে। ফরাসী চিন্তাবীর ভিক্টর কুঁজে হিন্দু দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ইহার নিদর্শন—The Upanishads contain truth so profound, contrasting so favourably with the result of European genius, that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East and to see this the Native land of the highest philosopy—অর্থাৎ হিন্দুর উপনিষদ শাস্ত্রে এমন উচ্চ তত্ত্ব সমূহ রহিয়াছে এবং তাহা পাশ্চাত্য মনীষা-প্রসূত বিবিধ তত্ত্বের তুলনাতে এমন মহান্ যে, প্রতীচ্যের এই জ্ঞানভাণ্ডার এবং শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তত্ত্বের জন্মভূমি ভারতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমাদিগকে আপনিই নত-জানু হইয়া পড়িতে হয়।

ভারতবাসী হউক্ বা বিদেশীয় হউক্ আজ যে লোকের কাছে হিন্দু শাস্ত্রের এত অশ্রদ্ধা দেখা যাইতেছে, তাহার কারণ একমাত্র এই অজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতা। এই অজ্ঞতার পরিমাণ যত গভীর, দৃঢ়-মূল সত্যের প্রতিকূলে ইহাদের বাগাড়ম্বরও তত অধিক ; আর এই আত্মম্ভরিতার মূল যত শক্ত, সত্য ও পূত-চিত্ততার বিরুদ্ধে ইহাদের বিদ্বেষ তত প্রবল।

আপনি হয়ত বলিবেন—যে আক্রমণ মিস্ মেয়োর পুস্তকে করা হইয়াছে, তাহা হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধে নহে—হিন্দুর আচারের প্রতি। আমরা বলি, এরূপ পার্থক্যের বাস্তবিক ভেদ-গত কোনও ভিত্তি নাই। আর যদি তাহাই হয়, তবে একমাত্র সঙ্গত ও সরল পথ এই যে—ব্রিটিশ রাজসরকার এই তথা কথিত বাল্যবিবাহাদি হিন্দু শাস্ত্রের বিধি সমূহ নির্দ্ধারণ করুন এবং আইন করিয়া তাহা সমাজে প্রয়োগ করুন। নিতান্ত বিমূঢ়-চিত্ত না হইলে কেহ কখনও শাস্ত্র মানিতে আপত্তি তুলিতে

পারে না। অবশ্যই যে সকল অবান্তর ও অনিষ্টকর বিষয় শাস্ত্রদেহে-গণ্ডবৎ আসিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া সংস্কারের নামে শাস্ত্রমূলে কুঠারাঘাত করিলে চলিবে না। বাস্তবিক যে শাস্ত্রের বিধান সমূহ এত কাল ধরিয়া এমন মহৎ মঙ্গল সাধন করিয়াছে, তাহাতে এখন কতকগুলি পরদেশীয় বিজাতীয় অবান্তর ভাব আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাতে প্রকৃত শাস্ত্র প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া শাস্ত্রবিধানের বিরুদ্ধে এত দীর্ঘ কাল ধরিয়া নিন্দাবাদ চালান নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য হইতেছে।

আপনি লিখিয়াছেন—ভারতীয় লোকেরা এক্ষণে এ সমস্ত বুঝে এবং সেজন্য লজ্জা বোধ করে—**'India knows this and feels shame !'** ভারতবাসীদিগের মধ্যে যাহার কেবলমাত্র নামে ভারতবাসী কিন্তু কার্য্যতঃ অজ্ঞতা ও অবিবেচনার বশে পাশ্চাত্যদিগ অপেক্ষাও হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি অধিক ঘৃণা পোষণ করে, তাহারা লজ্জায় তাহাদের হীন মস্তক আরও অবনত করিবে কি না জানি না। কিন্তু আমিও ভারতবাসী এবং হিন্দু। সেই চিরন্তন সত্যের সনাতন আধার হিন্দু শাস্ত্রের সহিত আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, এবং তার জয় গান করিতে আমি পরম গৌরব বোধ করিয়া থাকি। সেই হিন্দুশাস্ত্রের ভিত্তিতে সে সকল হিন্দু আচার প্রতিষ্ঠিত, তাহা অমর ঋষিদিগের হস্ত-বিন্যস্ত অতি চমৎকার কার্য্য। সেই নিঃস্বার্থ ঋষি-দৃষ্টি সর্ব্বপ্রকার নীচ প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত থাকাতে, এই প্রভূত রহস্যপূর্ণ বিশ্বের গভীর রহস্য সমূহ উদ্ঘাটন করিতে পারিত। ভাবতবাসীকে ধিক্—সত্য সত্যই সে সমুদয় লোককে ধিক্—যাহারা তাহাদের অজ্ঞতার গভীর দুর্গ মধ্যে সুরক্ষিত হইয়া এমন বিষয়ের উপর বিষ-বাণ নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছে, যাহার বিষয়ে তাহারা কিছুই জানে না। আর তাহাদিগকেও ধিক্ যাহারা হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ভাবে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া, হিন্দু শাস্ত্রেতে কেবল দোষই দেখিতে পায়। আর সে বিদেশীয় লোকদিগকেও ধিক্—যাহারা কেবল বৃথা গর্ব্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া এত কাল ধরিয়া সেই মহান্ কল্যাণনিদান হিন্দুশাস্ত্র সমূহের মনোমদ শক্তির প্রতিরোধ করিয়া চলিয়াছে।

আমি এ স্থলে হিন্দুত্বের ওকালতী করিতে বসি নাই। কেবল এই কথাই বলিতে চাই যে, আপনি যেমন মিস্ মেয়োর স্বপক্ষে দণ্ডায়মানা হইয়াছেন, তেমন সত্যের অনুরোধ যেন ইহা করিতেও প্রস্তুত হন যে, যদি কোনও হিন্দু এ বিষয়ে কোনও প্রবন্ধাদি লিখে, তবে তাহাও যেন আপনার পত্রিকাতে প্রকাশিত করেন—এ স্থলে হিন্দু বলিতে আমরা সেই সকল বিজাতীয় ভাবাপন্ন—নামে মাত্র—হিন্দুকে বুঝি না, যাহারা কেবল অজ্ঞতা ও বিজাতীয় ভাবে মত্ত হইয়াই চলিয়াছে; পরন্তু সেই লোককেই বুঝি—যাহারা শত শত বৎসর ধরিয়া নীরব ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হিন্দুত্বের প্রাণবস্তুকে হনন করিতেছে যে শিক্ষা তাহার কুহকময় প্রভাবে গা ঢালিয়া দিয়া আপন অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া বসে নাই। অন্যের গায়ে কর্দ্দম নিক্ষেপ করিয়া নীচাশয় ব্যক্তিরাই আনন্দ পায়। কিন্তু ভদ্র যাহাদের প্রকৃতি তাহারা ইহাতে অন্তরে আঘাত বোধ করে।

হিন্দুর সমুদয় সমাজ-ব্যবস্থাটাই যৌন-সম্বন্ধের সংযমরূপী দৃঢ় প্রস্তরের দ্বারা গ্রথিত। বর্ত্তমান সভ্যতার কাছে ত সতীত্ব একটা ঘোর তিরস্কার ও অভিশাপের বিষয়। অবাধ যৌন সম্বন্ধের যথেচ্ছাচারের দ্বারা আধুনিক সভ্য লোকেরা সমাজকে যে জঘন্য ভয়াবহ পদার্থে পরিণত করিয়াছে, তাহার বর্ণনা অসাধ্য। গৌরীদান বা যৌবনোদ্ভবের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়ার যে ব্যবস্থা

হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা আত্ম-সংযম রূপ পরম ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; এবং ইহাতে হিন্দু ঋষিদিগের অসীম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তাহাই হাজার হাজার বৎসরের নানারূপ দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যেও এই জাতিকে রক্ষা করিয়াছে।

গৌরীদানকে অপ-নামে "চাইল্ড মেরেজ" বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে গৌরীদান কতখানি কল্যাণকর বা অনিষ্টজনক এই প্রশ্নের কোনও সঙ্গত আলোচনা বর্ত্তমান এই জড়বাদ-প্রধান সভ্যতার দিনে পাওয়া কঠিন। সে আলোচনা করিতে গেলে আপনিই এমন সব সূক্ষ্ম প্রশ্ন উঠিবে যাহা বর্ত্তমান এই জড়বাদীদিগের মস্তিষ্কে স্থান পাইতে পারে না। সত্য কি—কেমন করিয়া তাহা প্রমাণিত হয়—মনোবৃত্তির প্রকৃতি কিরূপ—এবং আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানের স্বরূপ কি ও সীমা কতদূর—এই সকল প্রশ্নের সম্যক সমাধান পাইলে পর মাত্র কেহ কোনও বিষয়ে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ-যোগ্য কোনও সিদ্ধান্ত করিতে যাইতে পারেন। হিন্দু ঋষিগণ জানিতেন যে স্থূল-তত্ত্বের প্রকৃতি-নির্ণয় সূক্ষ্ম তত্ত্বের নিশ্চয়ের উপরই নির্ভর করে। অতএব কি চিকিৎসা, কি সমাজ ব্যবস্থা—কোনও বিষয়ের আলোচনাতেই তাহারা সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ না করিয়া ছাড়েন নাই। সেই সত্যের সন্ধান কেবল সেই জ্ঞানী ব্যক্তিরাই পাইতে পারেন, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে বৃথা গর্ব্ব বা আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করিয়া বিনম্র ভাবে তাহার অনুসন্ধানে রত থাকেন। আজকাল লোকের বুদ্ধি-শক্তি সেই সত্য রাজ্যের দুর্গম জটিল পথে চলিতে অক্ষম। কাজেই এই অধোগতির দিনে ইহারা কেবলমাত্র সাধারণ গণা হিসাবের তালিকা (statistics) লইয়াই বিচার করিয়া থাকে—প্রকৃত জ্ঞানদৃষ্টি-বিহীন ইহাদের বুদ্ধির দৌড় ইহা হইতে অধিক দূর যায় না!

এইরূপ অনিশ্চিত অঙ্কপাত লইয়া বিচার করিতে গিয়াও মিস্ মেয়োর চিন্তা বিস্তর ভ্রান্তি করিয়া বসিয়াছে। আমরা এদেশের লোক, এবং এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ ভাবে সকল জানি। আমরাই বুঝি তিনি নিজ উত্তেজনা ও বিকট কল্পনাবশে এদেশের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা কত বিকৃত, অযথার্থ, অসার ও মিথ্যা। লণ্ডন টাইমসের মত সংবাদপত্রও ইদানীং একটী প্রবন্ধে একথা লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—মেয়োর চিত্র বিষম অতিরঞ্জিত। তাহার অঙ্কিত সমাজ এতকাল থাকিতে পারিত না অনেক পূর্ব্বেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। ভারত কিন্তু এত কালও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই।

আমরা এতদ্ সঙ্গে ভারতের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত এম্-ডি মহাশয়ের লিখিত একটি প্রবন্ধ (ইতিপূর্ব্বে ভারতের সাধনায় প্রকাশিত) প্রেরণ করিতেছি; সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা মিস্ মেয়োর অসংলগ্ন বিবরণের একখানি পূর্ণ জবাব। আমি আশাকরি আপনি এই সময়োপযোগী পুস্তিকাখানি যথোচিত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন; এবং ইহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সমালোচনা করিয়া ইহাকে আপনার পত্রিকাতে প্রকাশিত করিবেন এতকাল বিনা প্রমাণে সকলেই ধরিয়া লইয়াছেন যে ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী লোকের বিশেষ শারিরীক সহ্যশক্তি আছে। এই ধারণা কিরূপ অমূলক ও মিথ্যা তাহা এই প্রবন্ধদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। যদি ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীর শারিরীক সহ্যশক্তির অভাব তাহাদের সামাজিক আচার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে তাহাদের আচার ব্যবহার যে অত্যন্ত ঘৃণিত ও ভারতবাসীর আচার ব্যবহারের তুলনায় অতীব নিন্দনীয়, সে বিষয় আর সন্দেহ থাকে না। উক্ত

গ্রন্থকারের আর একখানি পুস্তিকাও এ সঙ্গে যাইতেছে—উহা আয়ুর্ব্বেদের প্রতি পাশ্চাত্যের অযথা নিন্দাবাদের প্রতিবাদে লিখিত (ভারতের সাধনায় প্রকাশিত)। তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে হিন্দুর শাস্ত্র আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতেও কত শ্রেষ্ঠ। হিন্দুর সামাজিক আচারেব প্রতি কোনওরূপ আক্রমণের প্রকৃত বিচার করিতে গেলে একটী গুরুতর প্রশ্ন বাহির হইয়া পড়ে—হিন্দুশাস্ত্র পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন, কি নহে? যে আচার হিন্দু শাস্ত্রের বহির্ভূত তাহা অবৈধ। হিন্দু শাস্ত্রই হিন্দু আচারের স্থিতি ও পরিচালক। এতদুভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ লক্ষিত হইলে, আচারের মধ্যে যে সকল মিথ্যা আবর্জ্জনা ও অনিষ্টকর বিষয় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহা ছাটিয়া ফেলিয়া উহাকে শাস্ত্রের অনুযায়ী করিয়া লইলেই চলিতে পারে—শাস্ত্রই তাহাদের যাহা কিছু প্রমাণ। ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান যে অযথা বিনিন্দিত ও পদ-দলিত ও আত্ম-সংরক্ষণে অসমর্থ হিন্দুজাতির প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন, সেই হিন্দুজাতির প্রতি ন্যায়-বিচারের দিকে দৃষ্টি করিয়া এ দ্বিতীয় প্রবন্ধটীও আপনার পত্রিকাতে স্থান দিবেন। অধিকন্তু বাস্তবিক চিত্তের উন্নয়নকারী হিন্দু শাস্ত্র বিষয়ে অন্যান্য প্রবন্ধও আপনি লিখিতে আমন্ত্রণ করিলে প্রেরিত হইবে।

সত্যের নামে ও সদভিপ্রায়ে লিখিত হইয়াছে বলিয়া মিস মেয়ো পতিত হিন্দু জাতির উপরে তাহার এই লজ্জাস্কর আক্রমণ করিয়াছেন। 'চাইল্ড ম্যারেজ' বা শিশু-বিবাহ বলিয়া তিনি যে এত কথা বলিয়াছেন, তাহা কেবল হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত নহে, মুসলমানের মধ্যেও তাহার প্রচলন আছে। তবে তিনি মুসলমানের প্রতি তার লেখনীর এই কালিমা লেপন করিতে বিরত হইয়াছেন কেন? তিনি কি সত্যই কোনও সত্যের অনুসন্ধানে ফিরিতেছেন—না অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহেন? তিনি কি বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে এতই অজ্ঞ? অথবা তিনি কি সেই সত্য ও সদভিপ্রায় বলিয়াই উহা নীরবে উপেক্ষা করিয়া যাইতেছেন? আমরা এই কথার উত্তর চাই।

অদ্যকার এই জড়বাদের প্রভাবের দিনে প্রকৃত বিচার চাহিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই আমি যুক্তির পথ ছাড়িয়া মিস্‌মেয়ো ও তাহার সমর্থক-মণ্ডলীর অবলম্বিত পথই অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলাম। আজ কালের প্রকাশিত সংবাদপত্রাদিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণামের যেরূপ পরিচয় দেওয়া হয় তাহা আমার একবারে অজানা নহে। তাহাতে ত মনে হয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতি ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণই বিপরীত। মিস্ মেয়ো ভারতের সভ্যতার বিকৃত চিত্র শত শত পৃষ্ঠায় অঙ্কিত করিয়ানে। আমি বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত পাশ্চাত্য সাহিত্যের আধারে কয়েকটী পংক্তিতে মাত্র বর্ত্তমান সভ্যতার একটী নিরপেক্ষ চিত্র দিতে চাই। আপনারা নিজে এবং আপনাদের সুবিবেচক পাঠকগণ এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয় তাহা যেন নিজেই বিবেচনা করিয়া দেখেন।

ইউরোপে ১৯১৪—১৯১৮ পর্য্যন্ত যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার যৎ কিঞ্চিৎ সংঘর্ষণে পাশ্চাত্য সমাজ-সংস্থা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। * লক্ষ লক্ষ লোক যাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া

* Millions who came back from the war lost their morals (Rev. Evans.)—Britain has become obsessed with sex (Thomson).—Chastity has been replaced by unrestrained sexual

আসিয়াছে, তাহারা চরিত্র খোয়াইয়া নীতি-বিহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে— এখন বৃটনবাসীদের যৌন চিন্তাই অধিকার করিয়াছে—সতীত্বকে দূর করিয়া আজ অবাধ যৌন-সম্বন্ধ মাথায় করিয়া লইয়াছে— এক্ষণে আমোদ বলিতে লোকে একটী বিষয়ই বুঝে, তাহা সেই চিরপরিচিত ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি—নিয়ম ও সংযমকে একবারে অবজ্ঞা করিয়া লোকে এক্ষণে পাপ কার্য্যকেই দেবাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে—তাহারা এখন এই পাপ কার্য্যকে দেবাসনে অধিষ্ঠান করিতে ও চরম উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষ সমর্থন করিতেই শিখিয়াছে—এবং সর্ব্বপ্রকার নীতিকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য লোকে ঘোর বেগে ছুটিয়াছে—পরীক্ষা মূলক বিবাহ (Trial-marriage), সঙ্গ-বিবাহ (Companion-marriage), অবিবাহিতা মাতা (Unmarried mother), অযাচিত সন্তান (unwanted baby), শিশু-চাষ (baby-farming) যৌন-পীড়ন (sexual molestation), পুরুষের সঙ্গে বাস (living with a man), বিশেষ বিশেষ অবস্থা (certain condition), বিশেষ বিশেষ অস্ত্রপ্রয়োগ (certain operation)— এইরূপ নূতন নূতন কথা ইংরেজী ভাষাতে সঞ্চার হইয়াছে। ইহারা উচ্চ স্বরে কেবল সমাজের ধ্বংস এবং দৈহিক কাম প্রবৃত্তির অর্চ্চনা মাত্র ঘোষণা করিতেছে। ব্যভিচারের দোষদৃষ্টি করিবার শক্তির অভাব, যুবক যুবতীর সাপ্তাহিক যৌন-মিলন, বালিকার নিজ আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক যৌন-উপদ্রব, অবিবাহিতা মাতার প্রসূত সন্তান-হননের অপরাধের প্রতি সহানুভূতি-পূর্ণ সমর্থন, এবং সর্ব্বদাই তাহাদের দণ্ড হইতে অব্যাহতি দান, অবৈধ জন্মের অতি-বৃদ্ধি (৫ জনের ভিতর ১ জন), অবৈধ সন্তান কারাগারে প্রসূত হইবে বলিয়া বিচারপতি দিগের অতিমাত্র দুর্ভাবনা, কোন সন্তান উৎপন্ন হইবে না এই চুক্তিতে বিবাহ, নগ্ন দেহের উপর বিতৃষ্ণা বর্ব্বরতার অকাট্য লক্ষণ, এই ধারণা —এই সমুদয় নিশ্চয় ভাবে নির্দ্দেশ করে যে, সমাজ এখন কামোন্মত্ত হইয়া চলিয়াছে। এমন অবস্থায় ইহা আদৌ আশ্চর্য্য নহে যে কোন কোন বিবেকী পুরুষ অন্তর হইতে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সভ্যতা দ্রুত গতিতে আশু ধ্বংসের পথে ছুটিয়াছে ও উহা পরিণামে বিষফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে— এমন পাপের বিষ ছড়াইতেছে যে তাহা হইতে আর উদ্ধার নাই।

আমি হিন্দু গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু যে অবস্থাতে লালিত পালিত হইয়াছি তাহা সম্পূর্ণরূপেই বিজাতীয় ভাবে পরিপূরিত—তাহা হিন্দুত্বের মহান পবিত্র ভাবকে উৎপাটিত করিয়া

license (**H. G. Wells**)—the only amusement that now appeals to the people is the one simple old amusement of sex (**Evelyn Waugh**)—With an utter contempt for discipline and self-restraint, people have learnt to apotheocsize crime (**Thompson**)—To excuse the wildest license (**Thompson**)—Are rushing head-long towards moral bankruptcy (**Rev. Eans**)—Inability to see anything wrong in adultery (**Dr. Ingram**) -Sexual molestation of the child by its own relatives (**Sir George Newman**)—The sweeping on-rush of illegitimacy (**1 in 5**)—Magistrial anxiety to save an illegitimate the stigma of being born in prison (**Sir Earnest Wild**)—Marriage with a condition that no child should be born (**Canon Ellisen**)— Repugnance to nudity is the surst sign of barbarity (**Helborn**)—Modern civilisation is rushing rapidly towads a collapse (**Prof. Russel Smith**)—modern civilisation is turning out an unmitigated curse (**Thompson**). etc etc.

ফেলে। তাহাতে আবার বিজাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি আরও বিপথে চালিত করে। কিন্তু শ্রীভগবানের অপার অনুগ্রহে বিজাতীর ভাব বর্জ্জন করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের আদর করিতে শিখি ও ভগবৎ-কৃপা-জনিত প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা সূক্ষ্ম-তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। এই হিন্দু-ধর্ম্মের মহান্ ও আত্ম-উন্নতিকারক সত্য—যাহা জগতে অতুল্য ও যাহার নিন্দা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও বাস্তবিক নিন্দা করিয়া উঠা যায় না, ও যাহাকে আমি অতুল্য বলিয়া জানি ও অনুভব করি, সেই অতুলনীয়, অনিন্দিত সত্যের যথাসাধ্য পক্ষসমর্থন করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও আনন্দের বিষয়, সংশয় নাই। আর এতদ্সঙ্গে বর্ত্তমান সভ্যতার যে সঠিক চিত্র সতর্কতার সহিত এখানে দেওয়া হইল তাহা যদি কিছুমাত্র বিশ্বসনীয় হয় (আমার কোনও রূপ ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকিলে, অবশ্যই আমি তাহার সংশোধন-প্রার্থী) তাহা হইলে প্রত্যেক সৎ ও সত্য-প্রিয় লোককে জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে, দৃঢ় ভাবে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে এই মহাবিপদগামী সর্ব্বনাশের অবস্থা হইতে মানব-জাতিকে উদ্ধার করিতে, এবং পক্ষান্তরে প্রাচীন সভ্যতার সেই অনুপম, অতি উচ্চ ও পবিত্র নিকেতন স্বরূপ ভারতীয় সভ্যতার রক্ষার জন্য নিজ নিজ শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে; এবং উহার মহান ভিত্তি চূর্ণ করিবার জন্য যে সকল অনাস্থা-সম্পন্ন আত্মসুখ-পরবশ লোকের দ্বারা অধর্ম্ম ও দুর্নীতির পরবশে কদর্য্য ইন্দ্রিয় সুখের কুৎসিৎ আগার সমূহ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা বন্ধ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ ও আলোচনা সাপেক্ষ—'ভারতের সাধনা'র ইহা এক বিশেষ লক্ষ্য। আলোচনা-কারীগণ যথাসম্ভব অবান্তর কথা পরিত্যাগ করিবেন, এই অনুরোধ—ভাঃ সঃ]

অপুনরুক্তি

বৈশাখ মাসের "ভারতের সাধনায়" ভার্গব মহাশয় "তর্কাবতরণ" করিয়া পুনরায় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে সুশ্রুতের মুদ্রিত পুস্তকে "উনষোড়শ" পাঠ যুক্তিসিদ্ধ। আমার উপর দোষারোপ করিয়াছেন যে "স্বমত পোষণার্থ শাস্ত্রের অংশালোচনায় সত্য কিরূপে অপলাপ প্রাপ্ত হয়" তাহা এই আলোচনায় জানা গেল।

পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে পৌষ সংখ্যায় আমি সুশ্রুতের অধ্যায় পরম্পরার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে সুশ্রুতের মতের পূর্ব্বাপর প্রাসঙ্গিক বিচার করিয়া সুশ্রুতের পাঠ "উনদ্বাদশ" হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। আমার মনে হয় আমার বিচার প্রণালীতে আমার 'স্বমত' মনে করিবার কোনই অবসর মূল প্রবন্ধে দিই নাই। আমি পুনরায় জানাইতেছি আমার মত কি

তাহা জানিবার বা ভাবিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। বিচারণীয় বিষয় হইতেছে—সুশ্রুতের মতে "উনষোড়শ বর্ষায়াম্" পাঠ সঙ্গত কি না? মূল প্রবন্ধের ভিতর সুশ্রুতের "অংশালোচনার" দোষারোপ যাহাতে না হয় তাহার জন্য প্রাসঙ্গিক সমস্ত কথারই অবতরণ করিয়াছি। এখন দেখা যাক্ "সত্যের অপলাপ" হইয়াছে কোথায়?

মূল প্রবন্ধের প্রতিবাদে "ভার্গব" মহাশয় যে সকল সুশ্রুতারিক্ত কথা মাঘ মাসের পত্রিকায় আলোচনা করেন, তাহারই উত্তরে চৈত্র মাসে "কল্পনা" শীর্ষক প্রবন্ধে আমায় কয়েকটী কথার অবতারণা করিতে হয়। তাহাতে সুশ্রুতের মতের স্বতন্ত্র মর্য্যাদা লঙ্ঘিত করা হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ পৌষের মূল প্রবন্ধের আলোচনায় সুশ্রুত-মতের কোনও সিদ্ধান্তের খণ্ডন "ভার্গব" মহাশয় মাঘ মাসে করেন নাই।

বৈশাখ মাসে "ভার্গব" মহাশয় "সমত্বাগত বীর্য্যৌ তৌ" হইতে "উনষোড়শ বর্ষায়াম্" পাঠ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা সুশ্রুত "শাস্ত্রের অংশালোচনা" এবং "স্বমত পোষণার্থ।" পৌষমাসে আমার মূল প্রবন্ধে এ বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট ও পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এবং সুশ্রুতের অন্যান্য প্রসঙ্গোক্ত যুক্তির সহিত তাহার কোনও বিরোধ নাই। তাহারও পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

দুইটী বিষয়ের প্রতি প্রণিধান করিলেই বুঝা যায় যে তিনি যে যুক্তি ধরিয়া আছেন তাহা টিকে না।

১। তিনি লিখিয়াছেন "পুরুষ পঁচিশ ও নারী ১৬ ইহারা সমত্বাগতবীর্য্য যুগ্ম।" এই "যুগ্ম" কথাটী কল্পনা মাত্র। সুশ্রুতের বক্তব্য এই যে পুরুষ পঁচিশ কিন্তু নারী ষোলয় ইহারা প্রমাণ বীর্য্য পরিমাণ সম্পন্ন বলিয়া কুশলী। ভিষক জানিবেন। "তু" ভেদ বিকল্প জ্ঞাপক কাজেই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের ভাষার ওজন ঠিক রাখিতে গেলে "তৌ" পদে দ্বিবচন ব্যবহার হইতে "যুগ্মত্ব" অনুমান একেবারেই কাল্পনিক। এই কাল্পনিক যুক্তি বলেই সুশ্রুতের ঘাড়ে ষোড়শীর সঙ্গমযোগ্যতা চাপাইয়া "উনষোড়শ বর্ষায়াম্" পাঠ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—তাহা জানিয়াই মূল প্রবন্ধে "সমত্বাগত বীর্য্যৌ তৌ" পদের প্রকৃত অর্থ দিয়াছি।

২। তিনি লিখিয়াছেন "পঁচিশ বৎসরের পুরুষকে ১২ বৎসরের নারীকে ভবিষ্যতে পুত্র লাভের জন্য গ্রহণ করাইবে বটে, কিন্তু মনে রেখো উনষোড়শ বর্ষের নারী ও অপ্রাপ্তপঞ্চবিংশতি পুরুষের সংযোগে যে গর্ভ হয় তাহার বিপদ আছে।" "কিন্তু মনে রেখো" সুশ্রুতের প্রসঙ্গে নাই, এবং যে যে স্থানে থাকিবার কথা তাহার কোথাও নাই। ভার্গব মহাশয় স্বীকারই করিতেছেন যে "উনষোড়শ" পাঠ রাখিতে গেলে "কিন্তু মনে রেখো"র আবশ্যকতা আছে। কাজেই সুশ্রুতের ১২ বৎসরের বিবাহ বিধানটীর কোনই সার্থকতা লক্ষিত হয় না। মনে রাখিতে হইবে যে সুশ্রুত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের গ্রন্থ। দুইটী পাশাপাশি আনুক্রমিক বচনে বিধানকে দৃঢ় না করিয়া কেবল একটী ব্যতিরেক বুদ্ধি ও কার্য্যাকার্য্য সংশয় আনা যদি সুশ্রুতের উদ্দেশ্য ধরা যায় তবেই "কিন্তু মনে রেখো" অনুমানিক সন্নিবেশ কল্পনা করিয়া "উনষোড়শ" পাঠ সমর্থন করা যায়। সুশ্রুতের ন্যায় বৈজ্ঞানিকের প্রতি এতটা অশ্রদ্ধা আমার পক্ষে অসম্ভব।

এখন দেখা যাইতেছে প্রথম ভ্রমটী "তু" বা কিন্তু শব্দের বিবেচনার অভাবে আর দ্বিতীয়

ভ্রমটী "কিন্তু" ভাবের অনস্তিত্বে "কিন্তু" বিচারে অবতরণে। এই দুইটী ভ্রম ধরিলে "তর্কাবতরণে"র সমস্ত যুক্তিই ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

এবারও সুশ্রুতাতিরিক্ত অন্যান্য শাস্ত্রের বিষয় তিনি অবতরণ করিয়াছেন বলিয়া আমায় আরও কয়েকটী উক্তি সুশ্রুত হইতেই উদ্ধৃত করিতে হইল।

প্রথম। তিনি কুমারী জীবনের বৎসরের পর বৎসরে কি কি সূক্ষ্ম ভাব জাগ্রত হয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। গৃহ্যসূত্রে ও স্মৃতিসংহিতায় তাহার যথেষ্ট উত্তর আছে। সুশ্রুতের বচন বিচারে ইহার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নাই। শারীর স্থানের ১ম অধ্যায়ে ৫ম বচনে আছে—

"ভূতগ্রাম ব্যতীত অপর কোনও বিষয়ের চিন্তা চিকিৎস. শাস্ত্রে প্রয়োজনীয় নহে। এই নিমিত্ত ভূত সমূহই আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের চিন্তনীয় বিষয়। প্রকৃতি হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তৎসমুদয়কেই ভূতগ্রাম বলে। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় (কার্য্য) এই উভয়ই ভৌতিক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে জানিবে।"

দ্বিতীয়। তিনি লিখিয়াছেন "দ্বাদশ বর্ষে আর্ত্তবের উদ্ভব হয়—একথা সুশ্রুতের, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। তা'হলে নারী একাদশ পর্য্যন্ত আর্ত্তবহীন।" সুশ্রুত প্রাকৃতিক ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভৌতিক জগতের বিজ্ঞান গ্রন্থ। ইহাতে স্থির বিশ্বাস রাখিয়া শারীর স্থানের ৩য় অধ্যায়ে গর্ব্ভাবক্রান্তি প্রকরণের ৩য় ও ৪র্থ বচনের উল্লিখিত বিষয় প্রণিধান করিলে বোঝা যায় যে "অদৃষ্টার্ত্তবাকেও ঋতুমতী" বলিয়া জানিবে কখন?

তৃতীয়। গর্ভের অবিধেয়তার প্রসঙ্গ কোথায় হওয়া উচিত—তাহার বিচার বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। তবে সূত্রস্থানের ১৫শ অধ্যায়ে দোষধাতুমলক্ষয়বৃদ্ধিবিজ্ঞানীয় মধ্যায়ং বিচারে অতি মৈথুনের ফল যথায় দেওয়া হইয়াছে তথায় অকালে গর্ভধারণের কোনই উল্লেখ নাই। অথচ ১৫শ প্রকরণে (বা বচনে) গর্ত্তক্ষয়ের লক্ষণ ও প্রতীকারের বিষয় বর্ণিত আছে এবং ১৮শ প্রকরণে গর্ভের অতিবৃদ্ধির লক্ষণও দেওয়া হইয়াছে। এতদতিরিক্ত নিদান স্থানের ৮ম অধ্যায়ে মূঢ় গর্ত্ত নিদান ব্যাখ্যাত। মূঢ় গর্ত্তরোগের উৎপত্তির কারণে বয়সাল্পতা নিবন্ধন কোনও কারণ বর্ণিত হয় নাই। ১০ম প্রকরণে গর্ত্ত বিনষ্ট হইবার যে যে কারণ দেখান হইয়াছে তাহাতেও বয়সাল্পতা রূপ কোনও কারণের উল্লেখ নাই। কাজেই দ্বাদশের প্রসঙ্গ স্থলে দ্বাদশের পূর্ব্বের অযোগ্যতাই একমাত্র প্রাসঙ্গিক।

এখন পাঠকগণই সমস্ত আলোচনা পড়িয়া বিচার করুন "সত্যের অপলাপের" কোনও চেষ্টা আমি করিতেছি কিনা? সুশ্রুত শাস্ত্রের "অংশালোচনাই" বা করিতেছি কিনা? আর এ বিষয়ে আমার কোনও "স্বমত পোষণে"র কোনও হেতু আছে কিনা? আর সর্ব্বোপরি "ঊনষোড়শ" পাঠ সমর্থন করা যায় কিনা?—শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ।

প্রাপ্তপত্র—মহাপ্রয়াণ

বেনারস সংস্কৃত কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক স্বনামখ্যাত লক্ষণশাস্ত্রী দ্রাবিড় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। অধ্যয়ন অধ্যাপনাদিও সঙ্গে সঙ্গেই করিয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে

একপ্রাণ ছিলেন। পণ্ডিত অনেকেই আছেন, আরো অনেকেই হইবেন, কিন্তু ইঁহাদের ভিতর যে লোকোত্তর ঐশ্বর্য্য ছিল তাহাই দুর্লভ। এজন্য যতই দিন যাইতেছে ততই ইঁহাদের অভাব প্রাণে অধিকতর আঘাত দিতেছে!

অনেকের ধারণা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কেবল গোঁড়ামিই করেন, সমাজের ভালমন্দের কথা ভাবেন না, ইহা যে ভ্রমাত্মক তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুএকটি কথা বলিতেছি। ভাটপাড়ায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনের সময় তাহাদের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। ন্যায়াচার্য্য মহাশয় সেই সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ও বিশিষ্ট সদস্যরূপে উপস্থিত ছিলেন।

দেখিলাম, ন্যায়াচার্য্য অগ্নিহোত্রী ও স্বপাকী। আহারের ব্যবস্থা মধ্যাহ্নে এক পোয়া আতপ চাউলের অন্ন, কাঁচাকলাসিদ্ধ, কিঞ্চিৎ ঘৃত ও দুগ্ধ। এই আহার অথচ কি সুন্দর শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি, গৌরবর্ণ, বিভূতিভূষিত বিস্তৃত ললাট। আলাপ করিতে বসিয়া দেখিলাম তাঁহার দৃষ্টি ও চিন্তা সর্ব্বদা অন্তর্মুখী। স্বল্পভাষী, শাস্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যায় দৃঢ়চেতা; শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথে চলাই যেন তাঁহার একমাত্র ব্রত। সেই সভায় উত্থাপিত বিচ্ছিন্ন হিন্দু-সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার কত আগ্রহ। কাশীর ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর অধিবেশনের সময়েও তাঁহার সেই ধ্যান সেই চেষ্টা। সেই প্রথম হইতে তাঁহাকে যতবার দেখিয়াছি, ততবারই মনে হইয়াছে 'ভারতে মহর্ষিকল্প ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।' মনে হইয়াছে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে সর্ব্বভূতে দ্বেষরহিত, নিরহঙ্কার, সতত সন্তুষ্ট, যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়, অনপেক্ষ শুচি, স্থিরমতি ইত্যাদি তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের যে সমস্ত লক্ষণ বলিয়াছিলেন বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য তাহারাই একটা দৃষ্টান্ত স্থল। মনে করিতাম এই ঘোর বিপ্লবের মধ্যে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানহারা লোকসমাজ তাঁহাকে দেখিয়া বিশুদ্ধ সত্যের সন্ধান পাইবে এবং আত্মস্থ হইবে। তাঁহার অকাল তিরোধানের সংবাদ শুনিয়া মনে হইতেছে সেদিন বুঝি অনেক দূরে।

লক্ষণশাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত যিনি একবার আলাপ করিয়াছেন, তিনিই উঁহার শান্তসুধীর সদানন্দ ভাব, হৃদয়ভরা প্রেম ও মধুর সম্ভাষণ জীবনে ভুলিতে পারিবেন না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরক্ষার জন্য তিনি কিরূপ জ্ঞানী ও একনিষ্ঠ কর্ম্মী ছিলেন তাঁহার সরকারী কর্ম্মত্যাগ, অবশেষে মহামহোপাধ্যায় উপাধি ত্যাগ, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার বিরাট শিবকুমার ভবন ও তথায় শতাধিক ব্রহ্মচারী ছাত্রের শিক্ষা ও আহার্য্য-ব্যবস্থা এবং কাশীর সাঙ্গ বেদবিদ্যালয় চিরকাল তাহার সাক্ষ্য দিবে। ভাট-পাড়ায় উত্থাপিত হিন্দু-সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়াও তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই বটে, কারণ তাঁহার অন্যান্য সহকর্ম্মী ও অর্থদাতাদের মতানুযায়ী তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে, কিন্তু সেই সময় হইতে সমগ্র ভারতের হিন্দুসমাজকে দৃঢ় সঙ্ঘ-বদ্ধ করিবার তীব্র বাসনা যে তাঁহার প্রাণে জাগিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। তাহারই ফল বারাণসীধামে নিখিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর এবং তৎপর দুইবৎসরের (প্রয়াগ এবং জলগাঁও নগরের) বর্ণাশ্রম-সঙ্ঘের অধিবেশন। এই সঙ্ঘকে প্রকৃত কার্য্যকরী করিবার জন্য গত দুই বৎসর উত্তর ও পশ্চিম ভারতের নানা স্থানে তিনি অশ্রান্ত খাটিয়াছিলেন এবং খাটিয়া খাটিয়া তাঁহার সুন্দর সুঠাম দেহকে রুগ্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজের কি ছিলেন, তজ্জন্য কি করিতেছিলেন

তাহা বিস্তৃতভাবে দেখাইবার উপকরণ আমাদের হাতে নাই। হিন্দু-সমাজ ধ্বংসের চিত্রে তিনি অন্তরে যে তীব্র জ্বালা অনুভব করিতেছিলেন জলগাঁও নগরের মহাসম্মিলনীতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তাঁহার দুই চক্ষের দর দর বিগলিত অশ্রুধারাই তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিল। হিন্দুসমাজের দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া—"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কেবল গোঁড়ামী করেন, কোন কাজ করেন না"—ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণা নব্য শিক্ষিতদের মন হইতে বিদূরিত করিতে পারে এমন কোন সংবাদপত্র ইদানীং দেশে নাই। কে কোথায় আইন-লঙ্ঘন করিয়া কারাগারে গেল বা অনাহারে রহিল, তাহার কত রকমের চিত্র, কত রকমের কাহিনী প্রত্যহ সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়—অমুক নেতা অমুক জায়গায় যাইতেছেন, অমুক বক্তা অমুক জায়গার বক্তৃতা দিলেন, অমনি তাহাদের চিত্র প্রকাশিত হইয়া যায়,—তাঁহারাই যেন দেশের সর্ব্বস্ব! আর এতবড় জ্ঞানী পণ্ডিত ও ত্যাগীকর্ম্মী পুরুষের নামোল্লেখও অধিকাংশ সংবাদপত্রে দেখা যায় না। ইঁহাদের আজন্ম সাধনা ও ত্যাগ যেন দেশের ও জাতির কোন কাজেই লাগে নাই।

এমন দুইটি দুর্লভ আদর্শ ব্রাহ্মণের একই সময়ে অকাল বিয়োগ হিন্দুসমাজের যে কত দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহা প্রাণে অনুভব করিতেছি, কিন্তু ব্যক্ত করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। অর্থশালী নিষ্ঠাবান হিন্দুদের নিকট আমাদের প্রার্থনা, ইঁহাদের সচিত্র জীবনী দেশের বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করুন। শত শত সভা ও বক্তৃতা অপেক্ষা তাহার ফল বহুব্যাপী হইবে।—শ্রীকালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

মাস-পঞ্জি—আষাঢ়, ১৩৩৮

কলিকাতা হইতে করাচী পর্য্যন্ত মটর-যানের রাস্তার আয়োজন হইতেছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজন্যবর্গ নিখিল-ভারত-ফেডারেসন্ স্কীম্ সমর্থন করিতেছেন—বর্ম্মিংহাম সহরে ভয়ানক ঝটিকাবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে।—'এম্প্রেস্ ব্রিটেন' নামক ইংলণ্ডের নূতন যুদ্ধ জাহাজ আটলাণ্টিক উত্তরণে প্রাধান্য দেখাইয়াছে—পাতিয়ালার মহারাজা ফেডারেসন্ স্কীমের প্রতিবাদ করিয়া এক বিবৃতি করিয়াছেন—ব্রহ্মের বিদ্রোহী দল একখানি গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে—সীমান্ত প্রদেশের নেতা আবদুল গফুর খাঁ বলিতেছেন যে শীঘ্রই আবার সিভিল ডিসওবিডেন্স্ আন্দোলন আরম্ভ হইবে—স্পেনের নব গভর্ণমেণ্ট রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মপন্থীদিগের নির্য্যাতন করিতেছেন—কামেত পাহাড়ের যাত্রীদল মিঃ এফ, এস্, স্মীথের অধীনে যাত্রাপথে অগ্রসর হইতেছেন—চট্টগ্রামে উৎপীড়ন-নীতিআরও দুইমাস কাল বলবৎ রহিল—কলিকাতার চীপ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ রক্স্বার্গ সুদীর্ঘ ছুটিতে স্বদেশ যাত্রা করিলেন—বিগত ১লা জুন তারিখ পর্য্যন্ত এ বৎসর এদেশে ২২টী দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে—এংগ্লো ইণ্ডিয়ান দিগকে লইয়া এদেশে একটী সৈনিকদল গঠনের প্রস্তাব চলিতেছে—টুকিও সহরে আবার ভূমিকম্প হইয়া গেল—পুলিশের অসাবধানতা-হেতু সীমান্ত প্রদেশে অপরাধ বৃদ্ধি পাইতেছে—অষ্ট্রিয়াতে অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত, ইংলণ্ড তাহার সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান—প্রধান

মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডন্যাল ও পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ হেণ্ডারসন জুলাই মাসে বার্লিনে গেলেন—অধ্যাপক হার বোয়ারের অধীনে চারিজন যাত্রী কাঞ্চনঝঙ্ঘা উল্লঙ্ঘন উদ্দেশ্যে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন—আগামী ১৯৩২ সনের হেমন্তে ভারতে সামরিক বিদ্যালয় খোলা হইবে—বিলাতের প্রিমিটিফ্ মেথডিষ্ট কন্‌ফারেন্স ভারতে স্বায়ত্ত-শাসনের সমর্থন করিয়াছেন—প্রেগের সংবাদে প্রকাশ এক বিরাটায়তনের শ্বেতাঙ্গ দাস-ব্যবসায় ধরা পরিয়াছে—জারমেনীয় অর্থ-সঙ্কট লইয়া ওয়াসিংটনে এক বৈঠক বসিয়াছে—পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটী মহিলা ছাত্রী বন-ভাত করিতে গিয়া গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিতা হইয়াছেন—বোম্বাইর ধর্ম্মঘটকারী ছাত্রগণ দলে দলে স্কুল কলেজে প্রবেশ করিতেছে—যুক্ত প্রদেশে কৃষাণ সমস্যা গুরুতর হইয়াছে—মহাত্মা গান্ধী গোল-টেবিল-সভাতে যোগ দান করিবেন কি না, এ বিষয়ে পার্লেমেণ্ট সভাতে প্রশ্ন উঠিয়াছে—কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি বিলাতী কাপড় বর্জ্জন সম্বন্ধে যে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফলাফলের তদন্ত ভারতগভর্ণমেণ্ট করিতেছেন—বিকানীরের মহারাজা পাতিয়ালার ফেডারেসন্ স্কীমে আপত্তির নিন্দা করিতেছেন—অর্থ সঙ্কটের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ষ্টেট্-ব্রড-কাষ্টিং-সার্ভিস বন্ধ করিয়া দিবেন—রাজসাহী বিভাগে বঙ্গীয় সরকার ১১৭০০০ টাকা ধার দিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে - ভাওয়ালপুরের নবাব ফেডারেসন্ স্কীমের পরিবর্ত্তে ভারতীয় জাতি সঙ্ঘ বা লীগ-অব-ন্যাশন্ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন—স্যর সি, ভি, রমন আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিতেছেন—প্রিন্স অব ওয়েলস্ মহোদয়ের ৩৭শ জন্ম-তিথি-উৎসব সমাহিত হইল—(৯ই) ডিয়োক অব ইয়র্ক ভারতের পুলিশ বিভাগের বিস্তর প্রশংসা করিলেন—স্যর জন সাইমন উদার নীতিক দল পরিত্যাগ করিলেন বলিয়া প্রকাশ—প্যারিস সহরে ফরাসী ও জারম্যান রাজনীতিজ্ঞ দিগের এক বৈঠক বসিতেছে—ফরিদপুরে জাতীয় মুসলমান দিগের এক কনফারেন্স হইল, ডাঃ আনসরী তাহার সভাপতির ভাষণে বলেন, মুসলমান যুবকগণ যেন জাতীয় আন্দোলনে পশ্চাতে পড়িয়া না থাকেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ লক্ষ টাকার অনটন—স্যর বি, এল, মিত্র লণ্ডনে পৌছিয়াছেন—স্পেনে সোভিয়েট্ বিপাব্লিক্ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে—কামাত পাহাড়ের ২৪,৪৪৭ ফুট পর্য্যন্ত দেখা হইল—ডাঃ আনসরী কলিকাতা টাউন হলের সভায় বঙ্গীয় জাতীয় মুসলমানদিগের অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করেন—বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স নামক ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় জোর করিয়া বলিতেছেন যে, বাঙ্গলাতে একদল সশস্ত্র পুলিস রাখার আবশ্যক—একখানি আমেরিকান বিমান পোত সাত দিনে পৃথিবী ভ্রমণ করিবে বলিয়া বাহির হইয়াছে—ভারত সরকার হইতে নিযুক্ত ভারতীয় শ্রমসমস্যা বিষয়ক তদন্তের বিবরণ প্রকাশিত—ভারতীয় ষ্টেট্ রেলওয়ে সমূহে গত এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত মোট তিন কোটি টাকার উপর ঘাটতি পড়িয়াছে—ক্ষতি পূরণের টাকার দরুণ ফরাসী জারম্যানীর নিকট যুদ্ধ জাহাজ দাবী করিতেছেন—উত্তর শ্যাম দেশে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে—স্যর জন সাইমন লিবারেল দল পরিত্যাগ করিবার জন্য কমন্স সভাতে মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ কর্ত্তৃক তীব্র তিরস্কার লাভ করিয়াছেন।—মহাত্মা গান্ধীর গোলটেবিলে যাওয়া এখনও নিঃসন্দেহ নহে।

ভারতের সাধনা

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

দ্বিতীয় বর্ষ] শ্রাবণ—১৩৩৮ [দশম সংখ্যা

সাধনারপথে

স্বরাজ্য ও সাধনা

আজ স্বরাজ্যসাধনা ভারতীয় অন্তরের প্রধান বস্তু। ভারত তাহার অসাধারণ সভ্যতা বা মানব-প্রকর্ষের সম্পদ বক্ষে লইয়া যুগ যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কালবশে আজ সে পতিত, দলিত ও পরপীড়িত—অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এজন্যই তাহার বর্ত্তমান যত দুঃখ দৈন্য ও দুর্দ্দশা—তাহার অনন্যসাধারণ সভ্যতা-সম্পদেও নানা গ্লানি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, স্বতঃ প্রকাশিত জ্যোতিতে কালিমা পড়িয়াছে, তেজ ও উদ্যমে অলসতার কর্দ্দম লাগিয়াছে, যশ-সৌরভ দুরাচারের ধূলিআচ্ছাদিত। আজ সে শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে হইবে,—ধূলিরাশি অবসারিত করিয়া পবিত্র হইতে হইবে, রাহুগ্রাস হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বপ্রভার দীপ্তিমান হইতে হইবে, সকল প্রকার কালিমা ধুইয়া ফেলিয়া, সকল অনর্থের আধার স্বরূপ পাপসম্বন্ধ ত্যাগ করতঃ কৃতকার্য্য হইয়া ভারতের স্বকীয় সাধনার লক্ষ্য নিত্য সত্যলোক প্রাপ্ত হইতে হইবে।

যাঁহারা মানবীয় ধর্ম্মে বিশ্বাসবান্—মানবের চরম লক্ষ্য ও গতিতে শ্রদ্ধা রাখেন ও গৌরব বোধ করেন, তাঁহারা ইহাতে উৎসাহিত হইবেন—শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে উৎফুল্ল হইয়া ইহার সহায়তা দানে তৎপর হইবেন।

পতিত হইলেও ভারত কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। যুগে যুগে নিত্য নূতন ভাবে মুক্তির সাধনা সে করিয়াছে। সত্যলোকের লক্ষ্যে চলিয়াছে। সে সাধনা কখনও বিলীন হইয়া যায় নাই।

অন্তর ও বাহির এই দুই প্রকারে ভারতের সাধনা প্রসার লাভ করিয়াছে। এবং ইহাদের সমীকরণের ব্যাঘাতেই সময় সময় তাহার পতন ঘটিয়াছে। অদ্যকার ভারত এইরূপ পতনের গভীর গহ্বরে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই অধঃপতন হইতে উত্থানের একপ্রকার চেষ্টা আজ অর্দ্ধ শতাব্দী যাবত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে অনেক মহাপুরুষ দেশপ্রেমিক বলিয়া ভারতবাসীর অন্তরে পূজার্হ হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বহির্দৃষ্টিতে মাত্র সেই সাধনায় সিদ্ধির পথ খুঁজিতেছিলেন। আজ এক মহাত্মা সেই বহির্রাজ্যের মুক্তিচেষ্টার সহিত কালোপযোগী আন্তরিক সাধনার পথ প্রদর্শন করিতে যাইয়া, ভারতের স্বরাজ্যসাধনার এক মহান্ পরিচ্ছেদের সূচনা করিয়াছেন। এবং তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র তাহাতে যে বল-সঞ্চার করিয়াছে তাহাতে অসম্ভাবিত ফললাভ হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে স্বরাজ্যলাভের যে জাতীয় সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাতে অন্তঃশক্তির বলে বহির্রাজ্যের শ্রেয়লাভ-চেষ্টাই দিন দিন প্রতিভাত হইয়া আসিতেছে। আজ সে সংগ্রামের একটী বিশেষ পর্ব্ব পরিসমাপ্ত হইয়াছে। মহাত্মা ও লর্ড আরউইনের মধ্যে যে চুক্তি সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহাতেই এই পর্ব্বের পরিসমাপ্তি ধরিতে হইবে। অতঃপর মহাত্মা লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যাইয়া কি করিয়া আসিবেন, তাহা দ্বারাই পরের ফলের বিচার হইবে। মোটের উপরে অন্তঃশক্তি বলেই ভারতের স্বরাজ্য সাধনায় প্রকৃত সিদ্ধিলাভ হইবে; মহাত্মা নিজেই বলিয়াছেন যে, এ সকল বাহিরের কৃত্রিম ঘটা দ্বারা স্বরাজ পাওয়া যাইবে না। আমাদের বহুদোষ ও দুর্ব্বলতা দূর করিয়া আন্তরিক শক্তিতে দৃঢ় হইতে পারিলেই বাস্তবিক স্বরাজ লাভ সহজ ও শীঘ্র হইবে।

জাতীয় পতাকা

কয়েক বৎসর হইল ভারতের জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেস ভারতে জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার প্রতীক রূপে এক জাতীয় পতাকা গ্রহণ করেন। সে পতাকার সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া বহুস্থানে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে অনেক লোক প্রহার, পীড়ন ও কারাবরণ সহ্য করিয়াছেন! আবার অনেকস্থলে বিদেশীয় রাজসরকার সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রতিবৎসর কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় প্রারম্ভিক প্রধান অনুষ্ঠান রূপে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়, জাতীয় কর্ম্মিবৃন্দ তাহার কাছে মস্তক অবনত করিয়া সামরিক প্রণালীতে সে উৎসব সম্পাদন করেন। রাজসরকার তাহাতে বাধা দেয় না। এই-রূপে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী, সভা সমিতির অধিবেশন, কনফারেন্স প্রভৃতির অঙ্গীয় কার্য্যরূপে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়া থাকে। এবং বৎসরের একদিন 'জাতীয় পতাকা দিবস' বলিয়া জাতীয় কর্ম্মিমণ্ডলে পূজা ও সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছে। অন্য দিকে ভারতের রাষ্ট্র-সংস্থা যখন বৃটিশ রাষ্ট্রশক্তি হইতে ক্রমশঃ স্বাতন্ত্র্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে তখন ভারতের জাতীয় পতাকার স্বাতন্ত্র্য বৃটিশ রাষ্ট্রনীতির চক্ষে স্বীকৃত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নহে—কালে হয়ত বৃটিশ রাজশক্তিকে তাহার আপন 'ইউনিয়ন জেকের' ন্যায় অপরাপর স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতকার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় পতাকাকেও সম্মান দেখাইতে হইবে।

সম্প্রতি ভারতের জাতীয় পতাকার রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া, উহাকে নূতন বর্ণে চিহ্নিত করা হইয়াছে। পতাকার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ত্রিবর্ণ ভারতের অধিবাসীদিগের প্রধান ও অপ্রধান বিভিন্ন জাতিকে বুঝাইত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য স্বীকৃত হয় ও সাম্প্রদায়িকতার দোষ প্রশ্রয় পায় বলিয়া প্রথম হইতেই আপত্তি উঠিয়াছিল। এ সাম্প্রদায়িকতার বিষকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য—সময়ে অসময়ে উহার অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিবার নিমিত্ত—অদ্যকার ভারতে অনেক আয়োজন উদ্যোগ ও ব্যবস্থাই রহিয়াছে—জাতীয় পতাকা আবার তাহাতে নূতন ইন্ধন যোগাইতে যায় কেন? এই আপত্তি। কংগ্রেসের পরিচালকগণের নিকট এই আপত্তি গ্রাহ্য হয়। ফলে নূতন জাতীয় পতাকার স্বরূপ কিরূপ হওয়া উচিত তাহা লইয়া অনেকের চিন্তাশক্তির পরিচালনা হইয়াছে। যাঁহারা ভারতের সাধনা বা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তির লক্ষ্যে ভারতের জাতীয় পতাকার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা যে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসকার্য্যকরী সমিতি সেই মতই গ্রহণ করিয়াছেন—নূতন জাতীয় পতাকায় সর্ব্বোপরি যে গৈরিক রং এর স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ভারতের চিরন্তন সাধনার লক্ষ্যে দৃষ্টি আছে এরূপ বলা যাইতে পারে। ছত্রপতি শিবাজীর গৈরিক পতাকা ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে জাতির অসাধারণ অভ্যুদয়ের সহিত ঐশ্বর্য্য ও ত্যাগের অপূর্ব্ব সমীকরণ সম্পাদিত হইয়াছিল। নব্য ভারতের নূতন পতাকা জাতীয় চরিত্রে ত্যাগ, উৎসাহ ও ঐক্য তুল্যরূপে সূচিত করিতে চাহে। ভারতের ভাবী অভ্যুদয়ের উহা চিরাগত সাধন। বর্ত্তমান পতাকার ত্রিবর্ণ তাহাই নির্দ্দেশ করিবে। আর তাহাতে চরকার চিত্র অঙ্কিত হওয়ায় লোক চরিত্রে সরল সহজ জীবন যাপন ও প্রতি ঘরে অদৈন্যের ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে।

কিন্তু তবুও এ চিত্র আদর্শ মাত্র—ভারতের ভাবী অভ্যুদয়ের ন্যায় এই পতাকাও এক্ষণে ভারতীয় রাষ্ট্র প্রকৃতির কিঞ্চিত ইঙ্গিত করিতেছে মাত্র। প্রকৃত পতাকার স্বরূপ এখনও প্রকাশ পায় নাই—পাইতে পারে না। বাস্তবে সে স্বরূপের প্রকাশ—আদর্শে নহে। আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে পতাকার ন্যায় এমন যন্ত্র আর হয় না—কত জাতি ও ব্যক্তির জীবনব্যাপী কল্পনা পতাকার রূপে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে—কত মহান স্বপন বাস্তবে গিয়া পরিণত হইয়াছে—কত মহামনের বীরপ্রতিভা এই পতাকাতে গিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে! অদ্যকার ভারতে ক্ষীণ দৃষ্টিতে অস্পষ্ট ভাবে কেহ কেহ উহার স্বরূপ দেখিতেছেন মাত্র। কিন্তু অনেকের কাছেই উহা ঘোর কুজ্ঝটিকার আবরণে আবৃত—তমসার অন্ধকারে লুকাইত। ক্ষণিক উত্তেজনা ও গৌরব বোধে অনেকে উহাতে উদ্দীপিত হইয়াছেন মাত্র এবং তাহাতেই এক্ষণে উহার যাহা কিছু সার্থকতা। কিন্তু তাহাতেও অনৈক্যের অভাব নাই, আত্মবিরোধ সে উত্তেজনার আশ্রয় লইতেছে। দলাদলি স্থান পাইয়াছে। প্রকৃত জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইলে, তার রং বদলাইয়া যাইবে—এভাব তিরোহিত হইবে। উত্তেজনার স্থান উদ্বোধিতায় গ্রহণ করিবে, দলাদলি স্থান পাইবে না, এক স্থানে দুই জন নেতা গিয়া দুইটী পতাকার খুঁটি ধরিয়া তাহা উত্তোলনের তুচ্ছ গৌরবকেই নিঃশ্রেয়স মনে করিয়া অধীর হইবেন না। অনৈক্য ডুবিয়া যাইবে—সে পতাকার সম্মান রক্ষণে জাতির আর সমুদয় বিচার তিরোহিত হইবে—জাতীয় শক্তি একাগ্র মুখে তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইবে—বিনা বিচারে সহস্র প্রাণ মুহূর্ত্তে তাহার পদে গিয়া সমর্পিত হইবে—তবেই জাতীয় পতাকার স্বরূপ প্রকাশ পাইবে।

মহাত্মা ও গোল টেবিল

দিল্লীতে গান্ধী-আরউইন্ সংলাপের ফলে মহাত্মা গান্ধীর বিলাত গমনও গোল টেবিলের বৈঠকে যোগদান করা এক প্রকার অবধারিত হইয়া গিয়াছে। যদিও এই ব্যাপারে সকল শ্রেণীর লোকের সমান মন উঠে নাই। এবং বিভিন্ন লোকে এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করে। যাহারা শান্তিকামী বা শান্তিপ্রিয় তাহারা ইহাতে বহুকাল ধরিয়া চলিত দেশব্যাপী একটী অশান্তি—উৎপীড়ন অত্যাচারাদির অবসান হইল ভাবিয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকিবেন। বিষয়ী ও ব্যবসায়ীগণ দেশে শান্তি স্থাপিত হইল বলিয়া, বিষয় কর্ম্মে লাভবান হইবে ভাবিয়া, উৎফুল্ল হইতেছেন। চরমে শান্তির সংরক্ষক ও শান্তির জন্য দায়ী এবং শান্তিতে লাভবান রাজশক্তির পরিচালকগণও এই ভাবেই প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। বড় লাট লর্ড আরউইন এই মনোবৃত্তির পরিচয় দান করিয়াছেন। ইংলণ্ডের আভ্যন্তরিক অবস্থা ও বর্ত্তমান জগতের পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থাতে তীক্ষ্ণধী ইংরেজ রাজপুরুষগণ যে শান্তির লক্ষ্যেই চলিতে চাহেন, তাহা সহজেই ধরা যায়। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন যে যাহাতে আর অশান্তির সংগ্রাম বাঁধিয়া না উঠে তাহাই তাঁহার লক্ষ্য থাকিবে। মহাত্মা যে চরমে শান্তিকামী ও মীমাংসা চাহেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

কিন্তু যে সকল ইংরেজ রাজপুরুষ ও রাজকর্ম্মচারী রাষ্ট্রশক্তির প্রভূত্বগৌরবে মাত্র অভ্যস্ত, ভারতকে নিঃস্ব ও পদানত রাখিয়া চিরতরে আপন সম্পদ বল ক্ষমতা ও প্রভুত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখা মাত্র যাহাদিগের কর্ম্মনীতি, তাহারা যে এরূপ সন্ধিসর্ত্তে বা শান্তির সম্ভাবনায় সন্তোষ লাভ করিবেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। বিলাতে সাক্ষাৎ ভাবে ও এদেশে পরোক্ষে একদল ইংরেজ এ বিষয়ে এইরূপ মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিতেছেন। দীল্লির সন্ধি-সর্ত্ত অমান্য করিতেছেন বলিয়া বিভিন্ন প্রদেশের রাজকর্ম্মচারীগণের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ শুনা যাইতেছে এবং মহাত্মাজী তাহাতে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া তার প্রতীকার প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাহা না হইলে বিলাতে গমন বা গোলটেবিলে যোগদান কিছুই হইবে না বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলে নব লাট লর্ড ওয়েলিংডন ও মহাত্মাতে পুনঃ বারংবার সাক্ষাৎকার হইয়াছে; এবং সন্ধি সর্ত্ত রক্ষার পক্ষে মহাত্মাজী কোনও নিশ্চয় বাক্য পাইয়া থাকিবেন, যাহাতে মহাত্মার বিলাতগমন ও গোলটেবিলের সভায় যোগদান পুনঃ নিশ্চয়ীকৃত হইয়া থাকিবে। ইহাতেও প্রধান রাজসকার ও মহাত্মাজীর শান্তিপ্রিয়তার পুনঃ আর এক নিদর্শন পাওয়া গেল।

কিন্তু প্রভুত্ব-গরিমায়-গর্ব্বিত ও রাজগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছুক ইংরেজ রাজপুরুষগণ ব্যতীতও আর একদল লোক আছেন, যাহারা এই মহাত্মা ও গোলটেবিলের পরিচ্ছেদকে আশা ও উৎসাহের সহিত দেখিতে পারিতেছে না—ইহাদের আশঙ্কা মহাত্মা ভারতের যে ভাবের প্রতীক, ও ভারতীয় যে শক্তি-সম্পদের অধিকারী, তাহা গোলটেবিলের গোলমালের বাজারে বিনা মূলে বিকাইয়া না যায়! কারণ তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে হইলে গোলটেবিলকেই ভারতে মহাত্মার নিকট আসিতে হইত, তাঁহাকে গোলটেবিলে যাইবার প্রয়োজন ছিল না। যে ভারতীয় সম্পদের কিঞ্চিন্মাত্র আভাস দেখাইয়া তিনি আজ সমুদয় জগতের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন—প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তিকেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই যাহার নিকট কথঞ্চিৎও অবনত হইতে হইয়াছে, সেই ভাব

তিনি আপন অনন্যসাধারণ চরিত্রে যতদূর অধিগত করিয়াছেন, তাহা অদ্যকার তাঁহার এই পতিত ও মোহাচ্ছন্ন দেশবাসীর হৃদয়ে এখনও কতখানি জাগরিত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন, তাহাও সন্দেহ হয়। তদভাবে সহস্র গোলটেবিলের সহস্র দানে ভারতের কিছু আসিবে যাইবে না—বর্ত্তমান এই দুরদৃষ্টের ব্যতিক্রম বড় কিছু হইবে না। আজ তাহা করিতে পারিলে, জাতীয় শক্তির প্রধান অধিষ্ঠান কংগ্রেসকে এত পঙ্গু হইয়া যে দানের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইত না! আরও ভয়—দীর্ঘ জীবনের তপস্যা বলে সুদীর্ঘ রজনী অন্তে যে সূর্য্য ভারতীয় আকাশে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে তাহা অসময়ে পশ্চিমাকাশের কুঁয়াশায় গিয়া অস্তমিত হইয়া না যায়।

আজ সমুদয় জগতে এক মাত্র মহাত্মা। তাঁহার কথায় পৃথিবীর লোক বিস্মিত হইতে পারে — কিন্তু ইহার তাঁহার অনুবর্ত্তন করিবে কি:না সন্দেহ। আজ সংসারে সর্ব্বত্র বিশ্বহিতের নামে যে স্বার্থপরতা চলিতেছে, সভ্যতার নামে যে ব্যভিচার চলিয়াছে উন্নতির নামে যে বিনাশের উত্তেজনা হইতেছে, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার বলিয়া যে পরপীড়ন ও পরনিষ্কাসন প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে লোকের এত দূর চেতনার উদ্রেক হইবে কি না যাহাতে মহাত্মার বাণী সকলে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কার্য্যতঃ তাহার প্রয়োগ করিবে। যদি তাহা হয় তবে জগৎ ধন্য হইবে—ভূপৃষ্ঠ স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে—ভারতের বাণী জগতের উদ্ধার সাধন করিবে। কিন্তু অদ্যকার পৃথিবীর অবস্থাতে তাহার কতখানি প্রত্যাশা করা যায় তাহাই ভাবিতে হইতেছে।

বঙ্গে প্লাবন

সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি ভারতের এক শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু কতকগুলি দৈবপীড়নে ইহাকে অসাধারণ ভাবেই মধ্যে মধ্যে বিধ্বস্ত হইতে হয়—জলপ্লাবন তাহার মধ্যে একটী। প্রায় প্রতিবৎসর বাঙ্গলার কোন না কোন স্থান বর্ষার বন্যায় ভাসিয়া যায়। জগতের দুইটী বিশাল জলাধার বা বৃষ্টিপাতের স্থান—হিমালয় ও বিন্ধ্য হইতে বিপুলায়তনে জলপ্রবাহ সমুদয় বাঙ্গালাতে আসিয়া পড়ে। বাঙ্গলার সমতলে তাহার বেগ-সম্বরণের নিমিত্ত স্বাভাবিক প্রণালী নির্দ্দিষ্ট ছিল; জালের ন্যায় বিস্তৃত তাহার অসংখ্য নদনদী সমূহে তাহার ব্যবস্থা ছিল। প্রকৃতি বাঙ্গলাকে জলসম্ভার দান করিয়া আপনিই তাহা হইতে রক্ষার বিধান করিতেন। এরূপ প্লাবন ও ধ্বংসের কথা পূর্ব্বে শুনা যাইত না।

প্রকৃতি যেখানে ধ্বংসের লক্ষ্যেও চলে, সে ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে রক্ষার বিধান করিবার শক্তি মনুষ্যকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার প্লাবনরূপী এই প্রতি নিয়ত সংঘটিত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার কোনও উপায়ই উদ্ভাবিত হয় নাই। সেদিকে চেষ্টাও নাই, যেন বঙ্গদেশ ধ্বংস পাইবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। শাস্ত্রের কথা—লোকের পাপে দেশের নিগ্রহ বাড়ে। সেজন্যই কি দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও লোকের উৎপীড়ন লুট হত্যা দাঙ্গা প্রভৃতি নূতন নূতন বিপদ বাঙ্গলার উপর দিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে! এবং সেই পাপপ্রবৃত্তি বশেই কি এ সকলের প্রতীকার করে সকল প্রকার ঔদাসীন্য!

বাঙ্গলাকে স্বভাবের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোনও উপায় অবলম্বিত না হইয়া থাকিলেও সেই নিগ্রহ বৃদ্ধি করিবার পক্ষে কিন্তু কৃত্রিম উপায়ের অভাব হয় নাই। এই যুগের দুইটী প্রধান জনহিতকর (?) বিষয় রেলপথ ও সিঞ্চন বিভাগের কার্য্য (Irrigation). এই দুই কার্য্য দ্বারাই বাঙ্গলার এই প্লাবনরূপী নিগ্রহ কত দূর বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। রেল পথ আজকাল দেশের প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। উচ্চ ভূমি খণ্ডে ইহার প্রসারে দেশের সাধারণ অবস্থার তেমন পরিবর্ত্তন কিছু হয় না। কিন্তু বাঙ্গলার নিম্ন ভূমিতে খাল বিল নালা ও নদী বাধিয়া যে সকল উচ্চ রেলের রাস্তা সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকল গুলিদ্বারাই বাঙ্গলার উপর দিয়া প্রবাহিত বিশাল জলরাশির গতি অবরোধ করা হইয়াছে। তাহাতে বর্ত্তমান কালের এই বন্যা ও জল প্লাবন কত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের স্থায়ী প্লাবন-প্লাবিত স্থান গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার কালে কি রাজসরকার কি রেলকোম্পানী কেহই এইদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন নাই। আজ লক্ষ লক্ষ লোক সে অনবধানতার পাপের ফল ভোগিতেছে।

সিঞ্চনের কাজ বঙ্গদেশে সুপরিচিত না থাকিলেও—উহার সুফল কিন্তু না পাইলেও– ভারতের কয়েকটী বৃহৎ সিঞ্চন কার্য্যের বিষময় ফল বাঙ্গলাকে বৎসর বৎসর ভুগিতে হয়।—যাহারা গঙ্গা ও যমুনার বৃহৎ বৃহৎ সিঞ্চন কার্য্যগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন, তাহারা জানেন স্বভাবতঃ বাঙ্গলার প্রাপ্য কত বৃহৎ জলরাশি ঐ সিঞ্চনপ্রণালী দ্বারা অন্যত্র চলিয়া যায়। ফলে বাঙ্গলার স্বভাবজাত নদ নদী নালা ও খাল সমূহ মজিয়া যাইতেছে। পয়ঃপ্রণালী সমূহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফলে যে বাঙ্গলা ম্যালেরিয়ার স্থায়ী আবাস ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এ অভিযোগে নূতনত্ব কিছুই নাই। কিন্তু এই জল-রাহিত্য বাঙ্গলার কপালগুণে তাহার জলপ্লাবনেরও কারণ হইয়াছে। কারণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিঞ্চন-প্রণালীগুলি কেবল শুষ্ক কালের জন্য খোলা থাকে। বর্ষার সময় ঐ ঐ প্রদেশে তাহাদের প্রয়োজন থাকে না; কাজেই কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ফল বাঙ্গলার পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর অনিষ্টজনক হইয়া থাকে—শুষ্ক কালে জল প্রবাহ না পাওয়াতেই বাঙ্গলার নদ নদী আদি বুজিয়া বা মরিয়া ভরাট হইয়া গিয়াছে; আর তাহার উপর বর্ষার সময় অত্যধিক জল প্রবাহ আসিয়া পড়াতে নিয়মিত রূপে জল সরিয়া যাইতে পারে না। ফলে প্রতিবৎসরের এই অত্যধিক প্লাবন বাঙ্গলাকে প্রতিনিয়ত পীড়ন করিতেছে।

বন্যা ও সেবাব্রত

বাঙ্গলার কর্ম্মন্যতা আজ নানা দিকে সেবাব্রতে উন্মুখীন। বাঙ্গালীর জীবনপথ আজ নানা প্রকার সঙ্কটে আকীর্ণ। দৈন্য ও দুর্ভিক্ষ, কলেরা বসন্ত ও ম্যালেরিয়া রোগ একালে বাঙ্গালীকে স্থায়ী রূপেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর বন্যা ও জল কষ্ট বাঙ্গলাকে বৎসর বৎসর উৎপীড়িত করে। এমতবস্থার বাঙ্গলার কোমলপ্রাণ যে আর্ত্তের দৈন্য স্বদেশীয়ের দুঃখ মোচনে অগ্রণী হইবে, তাহাতে আশ্চার্য্য কিছুই নহে। 'জীবেদয়া' এ কালধর্ম্ম একালে বাঙ্গলাতেই প্রথমে

প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল। তার পর স্বামী বিবেকানন্দ 'দরিদ্র নারায়ণের সেবা' এই পরম ধর্ম্ম নব্য বাঙ্গলার উদীয়মান প্রাণে জাগরিত করিয়া দেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুগের শ্রেষ্ঠ দান পরমহংস রামকৃষ্ণের অমৃত বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে ধর্ম্মপ্রাণযুবকগণ সে প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিলেন। বিবেকানন্দের অসাধারণ দেশভক্তি ও মানবপ্রেমে উদ্বোধিত হইয়া তাহারা আর্ত্তের সেবাকে আপন ধর্ম্মজীবনের কর্ম্মস্বরূপে বাছিয়া লইল। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মণিকাঞ্চন সংযোগ হইল। ভারতের চিরাগত শিক্ষা নিষ্কামকর্ম্ম এ যুগে নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। দেখিতে দেখিতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও লোকপ্রিয়তা সমুদয় ভারতে বিস্তার লাভ করিল—আসমুদ্র হিমাচল সর্ব্বত্র রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম সমূহ জালের ন্যায় বেষ্টিত করিয়া ফেলিল—ভারত ছাড়িয়া অন্যত্রও তাহা প্রসার লাভ করিল।

ক্রমে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুকরণে আরও অনেক সেবামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া সংগঠিত হইয়া থাকিলেও, জন-সেবাকে ইহারা তাহাদের কর্ম্মের অঙ্গীয় করিয়া লইয়াছেন। কোনও কোনও সঙ্ঘ বা সমিতি কেবলমাত্র এই সেবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ এমন বহু সমিতিকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখা যায়। পল্লীতে পল্লীতে নূতন নূতন সমিতির উদ্ভব হইতেছে। স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা, এমন কি বারবণিতাগণও এই সেবা সমিতি গঠন হইতে বঞ্চিত থাকে নাই। বৈজ্ঞানিক তাঁহার বিজ্ঞান শালাকে সেবার ভাণ্ডার পরিণত করিয়াছেন —শিল্পী তাঁহার শিল্পযন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন সেবাদল গঠন করিয়াছেন, জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসও তাহার উচ্চ নাম ও খ্যাতিকে এই সেবার সম্মান হইতে বঞ্চিত দেখিতে পারেন নাই। এমন কি আজন্ম ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থে নিযুক্ত বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ও উদ্যোগী সভা-সমিতি সঙ্ঘ প্রভৃতি সকলই এই সেবা কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন এবং আপন আপন নামে সেবাব্রতের বিজ্ঞাপন-দান, পতাকা-উত্তোলন, শোভাযাত্রাদি করিয়া দানসংগ্রহ করিতেছেন। সহর, পল্লী, নগর বাজার সর্ব্বত্র আজ ইহাদের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায় যে, যেই কাজেই ব্যাপৃত থাকুন না কেন, এইরূপ সেবাধর্ম্মে কোনও 'কার্য্য' দেখাইতে না পারিলে আজ কাল নিজ লোকপ্রিয়তার হানি ঘটে। এবং তাহা করিতে পারিলে উহা বৃদ্ধি পায়। রামকৃষ্ণ মিশনের লোকপ্রিয়তা বা কৃতকার্য্যতা দেখিয়া ইহাদের মনে এইরূপ ভাব ও কর্ম্ম-প্রবণতা জাগরিত হওয়া অসম্ভব নহে।

সে যাহাই হউক সেবা সর্ব্বপ্রকারেই আদরণীয় ও সম্মানর্হ। কেবল আধুনিক মনোবৃত্তির নানা দোষ তাহাতে আসিয়া না স্পর্শে ইহাই বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় সেবা লইয়াও দলাদলীর ও ঈর্ষার প্রতিষ্ঠা হয়—সাধারণ সংবাদপত্রে তাহা লইয়া কুৎসা, নিন্দা ও বিবাদ চলে। দেশের প্রসিদ্ধ ও খ্যাতনামা ব্যক্তিরাই তাহা করিয়া থাকেন। আবার এই সকল সেবা-কার্য্যের মধ্যে প্রকৃত জনসেবার ভাব (public spirit) কতখানি তাহাও বুঝিয়া দেখিবার বিষয়—প্রায় সকল সংস্কারইত শুনা যায় যে অর্থ বা রুটীর জন্য কর্ম্মীগণ কর্ম্ম করিতে আইসে—অনেক স্থানে সংগৃহীত অর্থের হিসাব মিল পাওয়া যায় না। আবার সেবার্থে সংগৃহীত অর্থ অন্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে খরচ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু দোষ প্রদর্শনই এই আলোচনার উদ্দেশ্য নহে। দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের দৃষ্টি দেশের এই দৈন্য ও দুর্দ্দশার উপরে পড়িয়াছে। ইহার দূরীকরণের নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করা যায়—যে সকল কর্ম্মী সম্প্রদায় এজন্য ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সুশৃঙ্খল কর্ম্মপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইলে, সকলে এক সঙ্গে সুগঠিত ও সম্বদ্ধ ভাবে কার্য্য করিলে, ইহার উদ্দেশ্য সকল প্রকারেই সুসাধিত হইতে পারে। কারণ কেবল অর্থই কর্ম্মশক্তির সমুদয় অঙ্গ নহে; গঠন-শক্তি জন-বল ও অর্থবলের ন্যায় তুল্যরূপেই আবশ্যক। আর সে সংগঠনের মূলে এমন কোনও সরস নীতি থাকা আবশ্যক যাহাতে সে কর্ম্মশক্তিকে সবল ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়া চালাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আদি সেবামণ্ডল রামকৃষ্ণ মিশনের মূলে সেরূপ এক নীতি বা শক্তি ছিল বলিয়াই আজ উহা বর্ত্তমান জগতের সেবা কার্য্যে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছে। আজ বাঙ্গলাতে যে সকল সেবামণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে, তাহারা যদি সকলে সমবেত হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রমুখ করিয়া সকলে সুগঠিত ভাবে কার্য্যতৎপর থাকেন, তবে দেশমধ্যে একটী অসাধারণ শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ দ্বেষ বা মনোমালিন্যেরও কোন অবসর থাকে না।

আর এই সেবার কার্য্য দেশের উপস্থিত দুর্দ্দশার দূরীকরণে নিবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না। এরূপ করিলে এই দুর্দ্দশার উপসম হইবে না, এ কার্য্যেরও শেষ হইবে না। এই দুর্দ্দশার নিদান কি তাহা স্থির করিয়া তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থায় উদ্যোগী থাকাও এই সেবারই অঙ্গীর কার্য্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই যে বৎসরের পর বৎসর বাঙ্গলাদেশ বন্যার পীড়নে বিধ্বস্ত হইতেছে তাহার মূল কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা দূরীকরণ করিবার জন্য এই সেবাব্রতীদিগের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উদ্যোগী থাকিতে পারেন। আজ দেশের অতি বড় খ্যাতনামা ব্যক্তিগণও এই সেবার কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। তাঁহারা চেষ্টা করিলে এ দিকে অনেক কার্য্যই হইতে পারে। কথায় বলে—রোগের প্রতিকার অপেক্ষা রোগ না হইতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ।



যোগক্ষেম

রায় বাহাদুর—শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায়, বি-এ

কিছুকাল পূর্ব্বে 'ধর্ম্মপদ' নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধনীতিগ্রন্থের নিম্নলিখিত শ্লোকে 'যোগক্খেম' (সংস্কৃত-যোগক্ষেম) শব্দটি দেখিতে পাই :—

তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দল্‌হপরক্কমা।
ফুসন্তি ধীরা নিব্‌বাণং যোগক্খেমং অনুত্তরং ॥"

২ অপ্‌পমাদবগ্‌গো—৩।

সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য ইহার এইরূপ সংস্কৃত রূপান্তর করিয়াছেন :—

"সাততিকা ধ্যায়িনস্তে নিত্যং দৃঢ় পরাক্রমাঃ।
ধীরাঃ স্পৃশন্তি নির্ব্বাণং যোগক্ষেমমনুত্তরম্ ॥"

শ্লোকটির বাঙ্গলা অনুবাদ এইরূপ দাঁড়ায় :—যে ধীরব্যক্তিগণ সতত ধ্যানশীল ও নিত্য দৃঢ়পরাক্রম বা অধ্যবসায়বিশিষ্ট, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগক্ষেমরূপ নির্ব্বাণকে প্রাপ্ত হন। ধর্ম্মপদের প্রসিদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ 'যোগক্ষেম' শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—যোগ অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ বন্ধন হইতে ক্ষেম অর্থাৎ অভয় বা মুক্তি। শব্দটীর মোটামোটী অর্থ দাঁড়ায়—বন্ধন হইতে মুক্তি।

এই শ্লোকটি পড়িয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ২২ শ্লোকটির কথা মনে পড়িল, এবং এই শ্লোকের 'তে ঝায়িনো সাততিকা' ও গীতার শ্লোকের 'তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং' এই কথাগুলির ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করিলাম, এবং আমার মনে হইল গীতার শ্লোকটিতেও 'যোগক্ষেম' শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে। শ্লোকটি এই :—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"

শ্লোকটির আক্ষরিক অনুবাদ এইরূপ :—যাহারা অনন্য ও ধ্যানপরায়ণ হইয়া আমাকে উপাসনা করে, সেই নিত্য যুক্ত পুরুষদিগের যোগক্ষেম আমি বহন করি।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকেও 'যোগক্ষেম' শব্দটি দৃষ্ট হয় যথা :—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥"

উভয়স্থলেই আচার্য্য শঙ্কর শব্দটির এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—যোগ—অপ্রাপ্তবস্তুপ্রাপ্তি, এবং ক্ষেম—তদ্রক্ষণ। আমি গীতার যতগুলি ভাষাটীকা দেখিয়াছি তাহার সকলগুলিতেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোকে 'যোগক্ষেম' শব্দের এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে। নবমাধ্যায়ের শ্লোকেও আচার্য্য তিলক ও মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারই ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। কেবল 'আর্য্য মিশন' হইতে প্রকাশিত পকেট গীতায় শব্দটির এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে, যথা যোগ—সমাধি

এবং ক্ষেম = মোক্ষ, এবং আচার্য্য শ্রীধর স্বামী তাঁহার প্রসিদ্ধ টীকায় উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যোগং ধনাদিলাভম্। ক্ষেমঞ্চ তৎপালনম্। মোক্ষং বা।" এস্থলে আচার্য্য 'ক্ষেম' এই শব্দের 'মোক্ষ' এই দ্বিতীয় অর্থ প্রস্তাব করিলেন, কিম্বা সমগ্র 'যোগক্ষেম' শব্দটির 'মোক্ষ' অর্থ তাঁহার অভিপ্রেত—স্পষ্ট বুঝা যায় না। আমার বিশ্বাস সমগ্র শব্দটিই তাঁহার লক্ষিত, নতুবা 'আমি তাহাদের ধনাদিলাভ ও মোক্ষ বহন করি' এরূপ বলিলে দুইটি অতিবিরুদ্ধভাবের একত্র যোজনা করা হয়। যাহা হউক, 'যোগক্ষেম' শব্দটির প্রচলিত অর্থের এইস্থলে সঙ্গতি সম্বন্ধে শ্রীধর স্বামীর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল ইহা স্পষ্ট।

'যোগক্ষেম' শব্দটির আচার্য্য শঙ্কর-গৃহীত অর্থ উহার একটি প্রসিদ্ধ অর্থ সন্দেহ নাই। আচার্য্য তিলক 'শাশ্বত কোষ' হইতে শব্দটির 'সাংসারিক নিত্য নির্ব্বাহ' এই অর্থ উদ্ধার করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির প্রথম অধ্যায়ের ১০০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—"অলব্ধলাভো যোগঃ স্যাৎ ক্ষেমো-লব্ধস্য পালনম্।" 'শব্দকল্পদ্রুমে'ও এই অর্থই দৃষ্ট হয়, এবং মনু, বৃহদঙ্গিরা, ভট্টিকাব্য ও প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব হইতে এইরূপ প্রয়োগের উদাহরণ উহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে শব্দটির প্রাকৃতরূপ আমরা দেখিতে পাই :—"অবুত্তাও মে জননীয়ে জোগক্খেমং বহেস্স্"। ৪—৪। এস্থলেও শব্দটি প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর-ধৃত অর্থটি প্রসিদ্ধ হইলেও গীতার নবম অধ্যায়ের শ্লোকটিতে উহা অসঙ্গত হয়, আমার এই ধারণা জন্মে। সন্দেহনিরসনার্থে আমি স্বামিপাদ আরণ্য মহাশয়ের নিকট পত্র লিখি, এবং তিনি আমাকে জানান যে বৌদ্ধ ত্রিপিটক গ্রন্থে বহুস্থলে 'যোগক্ষেম' শব্দটি 'নির্ব্বাণ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; তিনি কয়েকটি স্থল উল্লেখ করেন, এবং এই মত প্রকাশ করেন যে, হয়ত প্রাচীন কালে শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হইত। বৌদ্ধশাস্ত্রে 'যোগক্ষেম' শব্দ 'পরমা-শান্তি' 'অচল প্রতিষ্ঠা' অর্থে ব্যবহৃত হয়।" *

'যোগ' শব্দের অর্থ কোন কিছুর সহিত যুক্ত হওয়া, যোগ সংসারের সহিত হইতে পারে, পরমাত্মার সহিতও হইতে পারে। সংসারের সহিত হইলে 'যোগ' শব্দে বন্ধনই বুঝাইবে, পর-মাত্মার সহিত হইলে উহার অর্থ মোক্ষ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।১৬।৩৫ শ্লোকে 'যোগ' শব্দ টীকাকার শ্রীধরস্বামীর মতে 'মোক্ষ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং ঐ গ্রন্থের ১০।৮৪।৩৬ শ্লোকে 'যোগ শব্দের অর্থ তাঁহার মতে 'মোক্ষের উপায়'। ধর্ম্মপদে 'সঞ্ঞোজন' (সংস্কৃত = সংযোজন) শব্দ বন্ধন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (তণ্হাবগ্গো—৯)। ঐ গ্রন্থের ব্রাহ্মণবগ্গের ৩, ১৫, ও ২০ শ্লোকে 'বিসংযুক্ত (সংস্কৃত = বিসংযুক্ত) শব্দ 'পাশ বা বন্ধন মুক্ত' অর্থে ব্যবহৃত। 'ক্ষেম' শব্দের একটি প্রসিদ্ধ অর্থ 'মোক্ষ' ; শ্রীধর স্বামীর মতে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৬।১০ শ্লোকে শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বুদ্ধ ঘোষের কথিত চতুর্ব্বিধ বন্ধন কি আমরা জানিনা, কিন্তু যোগ বা সংসাররূপ বন্ধন হইতে ক্ষেম বা মোক্ষ 'যোগক্ষেম' শব্দের এই অর্থ গ্রহণে কোন বাধা নাই। আবার, যোগ অর্থে

* 'প্রবাসী' ২৭ ভাগ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যার ১৫ পৃষ্ঠায় পরলোক গত পণ্ডিত প্রবর মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লিখিত 'নির্ব্বাণতত্ত্ব' নামক পরম উপাদেয় প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে :—"বহুস্থলে নির্ব্বাণকে 'যোগক্ষেম' বলা হইয়াছে। (মজ্ঝিমা নিকায়—১।১৬৩, ১৬৭, ৪৭৭ ইত্যাদি ; অঙ্গুত্তর নিকায়—২।৭৪৭, ২৪৮ ; সংযুক্ত নিকায়—২।১৯৫ ইত্যাদি।

প্রাপ্ত বস্তুও হয়, এবং 'প্রাপ্ত বস্তু সকলের মধ্যে যাহা ক্ষেম অর্থাৎ শুভ বা মঙ্গলকর', 'যোগক্ষেম' শব্দের এরূপ অর্থেও হইতে পারে।

এক্ষণে, গীতার নবম অধ্যায়ে 'যোগক্ষেম' শব্দটি 'মোক্ষ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি। ব্যাখ্যান সম্পর্কে উপক্রম, উপসংহার ও প্রকরণাদির বিচার একটি সাধারণ নিয়ম। নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি এই :—

"ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥"

অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি এই :—

"মন্মনা ভবমদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥"

অতএব, অশুভ হইতে মোক্ষলাভের সাধনবর্ণন, এবং সাধকের গতি নির্দ্দেশই এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য, উপক্রম উপসংহার বিচারে ইহাই সিদ্ধ হয়।

আলোচ্য শ্লোকের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি শ্লোক এই :—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্র লোক—
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণপুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥"

ইহাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে যাহারা বেদত্রয়ানুযায়ী যজ্ঞাদি সকামকর্ম্ম করে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়, এবং তথায় ভোগাদি দ্বারা পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে; তাহাদের গমনাগমন রুদ্ধ হয় না; এককথায় বলিতে গেলে এই শ্লোকে সকাম বৈদিক কর্ম্মিগণের আত্মার গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আলোচ্য শ্লোকের ঠিক পরের দুইটি শ্লোক এই :—

"যে হপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপিমামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥
অহংহিসর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেবচ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥"

অর্থাৎ, যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারাও অবিধি পূর্ব্বক আমারই উপাসনা করে, যেহেতু আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু, কিন্তু তাহারা তত্ত্বতঃ আমাকে জানে না বলিয়া পুনরাবৃত্ত হয়। এস্থলে অন্যদেবোপাসকগণের গতি কথিত হইল।

এই আত্মার গতিবোধক দুই জোড়া শ্লোকের মাঝখানে নিষ্কাম, নিত্যাভিযুক্ত

ভগবদুপাসকগণের আত্মার গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না এইরূপ উক্ত হইয়াছে মনে করাই স্বাভাবিক; তাহাদের সাংসারিক নিত্যনির্ব্বাহের প্রস্তাব এস্থলে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। প্রকৃতপক্ষে এই পাঁচটি শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, ঠিকপরবর্ত্তী শ্লোকে তাহারই সার সংগ্রহ করিয়া বলা হইতেছে :—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃণ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥"

অর্থাৎ, দেবযাজিগণ দেবলোক, পিতৃযাজিগণ পিতৃলোক, ভূতযাজিগণ ভূতসমূহ এবং আমার উপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়। এই 'মদ্‌যাজিগণ'ই আলোচ্য শ্লোকের নিত্যাভিযুক্ত ভগবদু-পাসকগণ। তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহাই 'যোগক্ষেমং বহাম্যহং' এই কথাগুলির তাৎপর্য্য। অতএব, এস্থলে 'যোগক্ষেম' শব্দের 'মোক্ষ' অর্থই সঙ্গত—প্রচলিত অর্থগ্রহণ অসঙ্গত, এবং উহাতে ভগবানে 'বৈষম্য নৈঘৃণ্য' অর্থাৎ পক্ষপাত দোষ স্পর্শ করে কিনা সুধী পাঠক বিচার করিবেন। এই অসঙ্গতিই শ্রীধরস্বামীর দ্বিধাবোধের কারণ হইয়া থাকিবে।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে 'নির্যোগক্ষেম' শব্দের শঙ্কর-গৃহীত অর্থগ্রহণে এতটা অসঙ্গতি না হইলেও, আমার বিশ্বাস উহার 'বন্ধমোক্ষের অতীত', কিম্বা 'নিঃশেষে বন্ধনমুক্ত' এইরূপ অর্থই আধকতর সঙ্গত হয়।

গীতা রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর সন্নিকট বলিয়া ভারতীয় পণ্ডিতগণ মধ্যে অনেকে অনুমান করেন। ঐ কালেই 'পালি' ভাষা ভারতের অংশ বিশেষের প্রচলিত ভাষা ছিল। এই পালি ভাষা 'প্রাকৃত' ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের অধিকতর নিকটবর্ত্তী। গীতার রচনাকাল এবং ত্রিপিটকরচনাকাল মধ্যে ব্যবধানও অতি সঙ্কীর্ণ। সুতরাং গীতাতে এবং ত্রিপিটকে 'যোগক্ষেম' শব্দটি তুল্যার্থে ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক। আচার্য্য শঙ্করের স্থিতিকাল ইহার বহুপরবর্ত্তী।

আমরা প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে কয়েকটি স্থলে শব্দটির ব্যবহার পাইয়াছি। কোন কোন স্থলে উহা প্রচলিত অর্থে এবং কোন কোন স্থলে 'মোক্ষ' বা নিঃশ্রেয়স' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্লীর ২।৫১ মন্ত্রে 'যোগক্ষেম' শব্দটির প্রথম দেখা পাই, যথা :—

"য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিভি পাদয়োঃ" ইত্যাদি। ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর শব্দটির প্রচলিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। যে যোগক্ষেমরূপব্রহ্ম প্রাণ 'যোগক্ষেম ইতি প্রাণা পানয়োঃ' ইহার অর্থ করিয়াছেন—পানে প্রতিষ্ঠিত এইরূপে উপাসনা করিবে। বার্ত্তিককারসুরেশ্বরাচার্য্য এবং বার্ত্তিকের টীকাকার আনন্দগিরি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যের দীপিকাকার আনন্দ গিরিও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যের দীপিকাকার শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন যে যোগক্ষেমোদ্ভূত আনন্দরূপ ব্রহ্ম প্রাণা পানে প্রতিষ্ঠিত এইরূপে উপাসনা করিবে। ইহাদের ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে হয়।

ইহার পর মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৭৪ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত দেখিতে পাই :—

'যোগক্ষেমোহিরাষ্ট্রস্ত রাজন্যায়ত্ত উচ্যতে।
যোগক্ষেমোহি রাজ্ঞো হি সমায়ত্তঃপুরোহিতে॥

অর্থাৎ রাজ্যের যোগক্ষেম রাজন্ত বা ক্ষত্রিয়ের আয়ত্ত বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু রাজার যোগক্ষেম পুরোহিত বা ব্রাহ্মণেরই সম্যক্ আয়ত্ত। এস্থলে প্রথম ছত্রে 'যোগক্ষেম' বিত্তাদিঅর্জ্জন ও তদ্রক্ষণ এবং দ্বিতীয় ছত্রে নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ অর্থে ব্যবহৃত; কারণ, এই অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—

"তপোমন্ত্রবলং নিত্যং ব্রাহ্মণেষু প্রতিষ্ঠিতম।
অস্ত্রবাহুবলং নিত্যং ক্ষত্রিয়েষু প্রতিষ্ঠিতম্॥"

তপোমন্ত্রবল ব্রাহ্মণে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজাকে মোক্ষের সাধনারূঢ় করিতে তিনিই সমর্থ।

শব্দটি শান্তিপর্ব্বের ৩৪৮ অধ্যায়ের ৭২ শ্লোকেও ব্যবহৃত হইয়াছে :—

"মনীষিণো হি যে কেচিৎ যতয়ো মোক্ষধর্ম্মিণঃ।
তেষাং বিচ্ছিন্নতৃষ্ণাণাং যোগক্ষেমবহো হরিঃ॥"

এ স্থলে শব্দটি মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স অর্থে ব্যবহৃত, কারণ তৃষ্ণানাশ মোক্ষের প্রধান সাধন—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৪।২৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী 'যোগক্ষেম' শব্দটি দুইবার ব্যবহার করিয়াছেন :—

"তথাপি যোগক্ষেমার্থং দেবতাপেক্ষেতি চেতদ আহন নঃ পুর ইতি। পুরঃ পত্তনানি। জনপদা দেশাঃ। অস্মাকং যোগক্ষেমহেতুবর্নশৈলাদয় এবেতি ভাবঃ।" এখানে শব্দটি প্রচলিত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। অথবা ইহার অর্থ সাধারণভাবে 'পুরুষার্থ'ও হইতে পারে।

আবার ভাগবতের ৫।১৯।১৪ শ্লোকের টীকায়ও শ্রীধর শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন :—

"যথা ঐহিকামুষ্মিককামেষু লম্পটো মূর্খঃ সুতাদিষু যোগক্ষেমং চিন্তয়ন্ কুৎসিতস্য কলেবরস্য অত্যয়াৎ মৃত্যোঃ শঙ্কেত" ইত্যাদি। এ স্থলে শব্দটি নিঃশ্রেয়স অর্থে ব্যবহৃত।

উপরে 'যোগক্ষেম' শব্দটির যতগুলি প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে সকলগুলি আলোচনা করিয়া আমার মনে হয় শব্দটির সাধারণ অর্থ পুরুষার্থ বা নিঃশ্রেয়স হইতে পারে। ইহা ইংরাজীতে ব্যবহৃত লাটিন Summum Bonum এর তুল্যার্থবোধক। গতানুগতিক বিষয়ী ব্যক্তির নিঃশ্রেয়স পুত্রবিত্তাদি অর্জ্জন ও তদ্রক্ষণ; পারমার্থিক ব্যক্তির নিঃশ্রেয়স সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি ও পরমানন্দলাভ।

গীতার নবম অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে 'যোগক্ষেম' শব্দের প্রচলিত অর্থগ্রহণের ফল বড়ই বিষময় হইয়াছে। লোকের ধারণা হইয়াছে যে ভগবদ্ভজন করিলে আর শরীর যাত্রানির্ব্বাহের কোনরূপ প্রয়াস করিতে হইবে না, ভক্তপক্ষপাতী হরিই সে ভার লইবেন। এই ব্যাখ্যা সাধকগণকে অজগর-বৃত্তিগ্রহণে উৎসাহিত করিয়াছে এবং 'ভক্তমাল' আদিগ্রন্থে এবং লোকমুখে ভগবানের ভক্তপক্ষপাতিতার বহু কাহিনী রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। ফলে এমনও দেখা যায় পরিবারের একমাত্র প্রতিপালক নিজের এবং পরিবারবর্গের পালনপক্ষে সকল প্রযত্ন ত্যাগ করিয়া সারা ক্ষণ মালা হাতে বসিয়া থাকেন। এই ভক্তগণ ভুলিয়া যান যে গীতার তৃতীয়াধ্যায়ের নবম শ্লোকে অর্জ্জুনের ন্যায় আত্মসমর্পণকারী ভক্তকেও ভগবান বলিতেছেন :—

"শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধেদকর্ম্মণঃ।"

আপাত দৃষ্টিতে কোন ভক্তের সাংসারিক নিত্যনির্ব্বাহ অনায়াসে সিদ্ধ হইতেছে মনে হইলেও প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে উহাও কোনরূপ প্রযত্নেরই ফল।

সন্ন্যাসগ্রহণের পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায় শরীরযাত্রানির্ব্বাহের চিন্তা। অতএব সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ যে আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা লুফিয়া লইবেন ইহা স্বাভাবিক।

শাস্ত্র মানিব কেন?

(সত্য-শাস্ত্র-বিজ্ঞান-বিচার সমন্বয়)

সমানং ত্রিষু কালেষু সর্ব্বাবস্থাসু শাশ্বতম্।
সনাতনং মতং সত্যং চীয়তে নাপচীয়তে॥
সত্যমেব পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্।
সত্যং বিজয়তে লোকং সত্যরূপো জনার্দ্দনঃ॥

১ম অধ্যায়—শাস্ত্রই একমাত্র সদুত্তর।

১। **অহঙ্কার জন্য প্রশ্ন।**—আজকাল কি কিশোর কি যুবা কি প্রবীণ সকলের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়—শাস্ত্র মানিব কেন? চৈতন্য-বিপ্লুতিকারক অজ্ঞান-প্রভব অহঙ্কারের এই বিজ্‌ম্ভণে সভ্য জগৎ মুখরিত পরিব্যাপ্ত ও বিক্ষুব্ধ। আপামর সাধারণের নির্ব্বিশেষ হৃদয়মন্দিরই এই দুর্ভেদ্য অহঙ্কারের নিত্যলীলাভূমি। শিশু বলে, কুমার ও পৌগণ্ড এই অহং বুলি স্পষ্ট বলিতে পারে না—তাই মুখে বলে না। কিন্তু তাহাদেরও অন্তরে অন্তরে সেই দুর্দ্দম্য জগদ্ব্যাপী অহং বিদ্যুদ্বাহ পয়োধর-বক্ষে বিদ্যুৎসৌদামিনীর ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে।

এই কলিকালে যে দিকে তাকাও আজন্ম মরণাবধি সকলেরই একই বুলি—শাস্ত্র মানিব কেন? আমার কি নিজের বিচার নাই? আমার কি নিজের বুদ্ধি নাই? বাক্‌শক্তিহীন শিশু—বলিবে কেমন করিয়া? তথাপি অস্পষ্ট ভাষায় সুস্পষ্ট আচরণে তাহারাও আপনাদিগকে অহং-পূজাপরায়ণবলিয়া ঘোষণা করিতে পশ্চাৎপদ নহে। মায়াস্পৃষ্ট জগতে অহংপূজার বিরামও নাই বিশ্রামও নাই। অহংই সকল দেবতার দেবতাস্থানীয়। জীবমাত্রেই সেই অহংদেবের অহৈতুকী সেবায় কায়মনোবাক্যে নিত্য নিযুক্ত।

সর্ব্বদেবময়ো হ্যহম্॥ ১॥

২। **বিচারাভিমান।**—মুখবন্ধ দেখিয়াই সকলে মনে করিবেন—এঃ শাস্ত্রান্ধ গোঁড়ার এ কথায় আর কর্ণপাত করিবারই প্রয়োজন নাই। বিচারই মনুষ্যের একমাত্র ধন। বিচারই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। বিচারহীনতাই পশুর পশুত্ব। এই বিচারধন বিসর্জ্জন দিয়া পশুত্ব অবলম্বনে পশুজীবন পোষণ করিবার প্রয়োজন কি? যদিও স্বীকার করা যায়—শাস্ত্র না মানিলে জীবের

কল্যাণ হয় না, তথাপি পশু হইয়া কল্যাণলাভের অপেক্ষা মনুষ্য থাকিয়া অকল্যাণ-সংগ্রহই বাঞ্ছনীয় এ বিষয়ে আর সংশয় কি? আর যদি শাস্ত্র মানিয়া কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণ হয় তাহা হইলে শাস্ত্র মান্ত করার ন্যায় নির্বুদ্ধিতা ও অপরাধ আর কিছুই নাই।

৩। **শাস্ত্র ভগবদাদেশ**।—শাস্ত্র মানিব কেন? এই প্রশ্নের যাহা সদুত্তর তাহা ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনে সভ্য সমাজের নিকট উপস্থিত করিবার উপায়ই নাই। শাস্ত্র ভগবানের আদেশ। তুচ্ছ মনুষ্যবিচারের উপর নির্ভর করিয়া ভগবদাদেশের উল্লঙ্ঘন করিতে নাই, নিত্যসত্যের অপলাপ করিতে নাই নিজের একমাত্র কল্যাণের পথ অবরুদ্ধ করিতে নাই।

শ্রুতিস্মৃতি মমৈবাজ্ঞে উল্লঙ্ঘ্যে নৈব কর্হিচিৎ।
আজ্ঞালঙ্ঘী মমদ্বেষী মদ্ভক্তোপিহ্যবৈষ্ণবঃ॥ ২॥

শ্রীভগবান বলিতেছেন—শ্রুতি (বেদ) ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করা উচিৎ নহে। আমার আজ্ঞা যে লঙ্ঘন করে সে আমার দ্বেষী (শত্রু)। সে আমার ভক্ত হইলেও অবৈষ্ণব (আমার নিজ জন নহে)।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ৩॥

যে শাস্ত্রের নিয়ম ত্যাগ করিয়া আপনার বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তাহার সিদ্ধিলাভ হয় না ও ইহকালেও সুখ হয় না পরকালেও গতি হয় না।

৪। **অহঙ্কারাৎ বিপরীৎ বুদ্ধি**।—অহঙ্কার হইতেই সংসারের উৎপত্তি—জীবের অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য বন্ধন। অহঙ্কারই মিথ্যা ও অধর্ম্মকে প্রসব করে। অহঙ্কারই ভ্রমের জনক। সেই ভ্রম হইতেই সংসারে বিপরীত বুদ্ধির উৎপত্তি। কাযেই জীব হিতকে অহিত বলিয়া মনে করে ও অহিতকে হিত বলিয়া মানে। অহঙ্কারস্পৃষ্ট কল্যাণই লোকপ্রসিদ্ধ হৈমপাষাণপাত্র, (সোণার পাথর বাটি,) গন্ধর্ব্বনগর, বন্ধ্যাপুত্র, মায়ামরীচিকা। অহঙ্কারাবৃত চিত্তে কোনও বস্তু স্বরূপে অবভাসিত হয় না অর্থাৎ সকল বস্তুই বিকৃত দেখায়। সদ্‌গুরুর কৃপা বিনা চিত্তের অহঙ্কারোদ্ভূত তীব্র অহঙ্কার দূরীভূত হয় না।

অহঙ্কারাদ্ ভবেন্মোহঃ সংসারস্তৎসমুদ্ভবঃ।
অহঙ্কারবিহীনানাং ন মোহো ন চ সংসৃতিঃ॥ ৪॥
অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং সম্বদ্ধং চানৃতেন হি।
মূলং ধর্ম্মবিনাশস্য প্রথমং স্যাদহঙ্কৃতিঃ॥ ৫॥

অহঙ্কার হইতে মোহ ও মোহ হইতেই সংসার। অহঙ্কারবিহীন পুরুষের মোহও নাই সংসারও নাই। এই বিশ্ব অহঙ্কারাবৃত অতএব মিথ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট। ধর্ম্মনাশের আদি কারণই অহঙ্কার।

সংসার-নিবৃত্তিমার্গ-প্রবৃত্তিঃ কদাপি ন জায়তে। তস্মাদনিষ্টমেব ইষ্টমেব ভাতি। ইষ্টমেব অনিষ্টমিব ভাতি। অনাদিসংসারবিপরীত ভ্রমাৎ॥ ৬॥

যাহাতে সংসার নিবৃত্ত হয় যাহাতে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে বিষয়ে মনুষ্যের কখনই প্রবৃত্তি হয় না। অতএব অনিষ্ট ইষ্ট বলিয়া প্রতীত হয় ও ইষ্টই অনিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। ইহার কারণ অনাদি সংসারের বিপরীত ভ্রম।

হিতাহিতং ন জানাতি নৈহিকং পারলৌকিকম্।
তৃষ্ণানীহার-নষ্টাক্ষো ন জানাতি বয়োগতম্ ॥ ৭ ॥

মায়াবিমোহিত জীব হিত ও অহিত চিনিতে পারে না। কি ঐহিক কি পারলৌকিক, হিতাহিত জ্ঞান তাহার আদৌ নাই। কেননা সে বিষয়তৃষ্ণায় নষ্টবুদ্ধি হইয়াছে। এই দুর্ল্লভজীবন চলিয়া যাইতেছে তাহাও সে বুঝিতে পারে না।

ঘনো যদার্কপ্রভবো বিদীর্য্যতে চক্ষুস্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা।
যদহঙ্কার উপাধিরাত্মনো জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ ॥ ৮ ॥

মেঘ সূর্য্য হইতেই উৎপন্ন হয়। সেই মেঘই আত্মপ্রভব সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আবার যখন সেই মেঘ বায়ুদ্বারা বিদীর্ণ হয় তখনই তেজের আধার চক্ষুঃ তাহার স্বরূপ সূর্য্যকে দেখিতে সমর্থ হয়। সেইরূপ আত্মার উপাধি অহঙ্কার, আত্মাকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। প্রকৃত জ্ঞানেচ্ছারূপ বায়ুর দ্বারা যখন সেই মেঘরূপী অহঙ্কার দুরীভূত হয় তখনই জীবাত্মা পরমাত্মাকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করিতে থাকে।

অহঙ্কারনিষ্ঠো বিমোঘো হি বোধো ভবেৎ সর্ব্বধর্ম্মো বিমোঘো বিমোঘঃ।
অহঙ্কারনিষ্ঠা বিমোঘা হি ভক্তিঃ—অহঙ্কারমুক্তো জনো বন্ধমুক্তঃ ॥ ৯ ॥

যতই জ্ঞান হউক না কেন অহঙ্কার দূর না হইলে একেবারেই ব্যর্থ। অহঙ্কার যুক্ত সকল ধর্ম্মই ব্যর্থের ব্যর্থ তস্য ব্যর্থ। এমন কি অহঙ্কারযুক্ত ভক্তিও একবারে ব্যর্থ। যিনি অহঙ্কার হইতে মুক্ত তিনিই ভববন্ধন হইতে মুক্ত।

যথা জাতান্ধস্য রূপজ্ঞানং ন বিদ্যতে তথা—
গুরূপদেশেন বিনা কল্পকোটিভিস্তত্ত্বজ্ঞানং ন বিদ্যতে ॥ ১০ ॥

যেমন জন্মান্ধের রূপজ্ঞান হয় না সেইরূপ বিষয়ান্ধ জীবের গুরূপদেশ ভিন্ন কোটিকল্পেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না।

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ১১ ॥

যাঁহার ভগবানে ও গুরুতে অচলা ভক্তি সেই মহাত্মারই হৃদয়ে শাস্ত্রের অর্থসকল প্রকাশ পায়।

৫। **নাস্তিকতা চরম পাপ।**—অহঙ্কারবশে নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিয়া শাস্ত্রবাক্যে অনাদরই সকল সর্ব্বনাশের মূল।

শ্রৌতে স্মার্ত্তে চ বিশ্বাসঃ আস্তিক্যং চাভিধীয়তে ॥ ১২ ॥

বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্রে অবিচলিত বিশ্বাসই আস্তিক্য। বেদ ও স্মৃতি-শাস্ত্র অভ্রান্ত নহে, ভ্রান্ত-বিজ্ঞানের ন্যায় প্রাণসাপেক্ষ, এইরূপ মতাবলম্বিকে নাস্তিক বলে। এক কথায় শাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া মানিতে না চাওয়াই নাস্তিকতা।

পাতকেষু পরং জ্ঞেয়ং পাতকং নাস্তিকগ্রহঃ ॥ ১৩ ॥

যত পাপ আছে তাহাদের মধ্যে নাস্তিকতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপ। নাস্তিকতার তুল্য আর পাপ নাই।

উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতং চৈব পৌরুষং দ্বিবিধং মতম্।
তত্রোচ্ছাস্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতম্॥ ১৪॥

পুরুষকার দুইপ্রকার—উচ্ছাস্ত্র পুরুষকার ও শাস্ত্রিত পুরুষকার। যাহা দ্বারা পরিচালিত তাহাই শাস্ত্রিত। আর যাহা শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া স্বৈরবর্ত্তী তাহাকেই উচ্ছাস্ত্র বলে—উদ্‌গতং (বহির্গতং) শাস্ত্রাৎ ইতি উচ্ছাস্ত্রম্—এই দুইটীর মধ্যে উচ্ছাস্ত্র পুরুষকার কেবল অনর্থই ঘটোয়—আর শাস্ত্রিত পুরুষকার পরমার্থ প্রদান করে (সকল প্রকার কল্যাণ প্রদান করে)।

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥ ১৫॥
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥ ১৬॥

হে সুব্রত! ভূতগণের শরীরে যে রোগ উৎপন্ন হয়, সেই রোগের দ্রব্যই, সেই রোগোৎপাদক বস্তু কি চিকিৎসিত হইলে, গুণান্তরিত হইয়া, সেই রোগই নাশ করে না? সেইরূপ মনুষ্যের সকল কার্য্যই সংসারবন্ধনের কারণ। তথাপি সেই সকল কার্য্যই সংসার নাশ করে (কল্পন্তে), যদি পরব্রহ্মে অর্পিত হয়। [হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যে বলে—সমে সাম্যং। ইহা একেবারে বিপরীত।]

সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারকম্।
বিপরীতং সদা কল্পো বিপরীতপ্রশান্তয়ে॥ ১৭॥

সকল সময়ে সকল বস্তুর তুল্যগুণবস্তু, তাহার গুণ বৃদ্ধি করে, বিপরীত বস্তু তাহার গুণ নাশ করে। কেবল সেই তুল্যগুণ বস্তু গুণান্তরিত হইলে তাহার গুণ বৃদ্ধি না করিয়া নাশ করে। যে পুরুষকার সংসারবন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করে, সেই উচ্ছাস্ত্র পুরুষকারই যখন চিকিৎসিত হইয়া অহঙ্কার-বিবর্জ্জিত ও ভগবৎপাদাশ্রিত হয়, তখন সেই শাস্ত্রিত পুরুষকার অচিরেই সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া মনুষ্যকে মোক্ষ প্রদান করে।

প্রসঙ্গমজরং পাশং আত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥ ১৮॥

অত্যাসক্তিই আত্মার জরারহিত অভেদ্য বন্ধন, ইহা জ্ঞানিগণ জানেন। কিন্তু সেই অত্যাশক্তিই সাধুগণে হইলে মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। অত্যাশক্তিই সংসারবন্ধন ও সংসারমুক্তি এই উভয়েরই কারণ। বিষয়ে অত্যাসক্তি সংসারবন্ধন সর্জন করে ও তাহাকে অভেদ্য করে। সাধু-পাদপদ্মে অত্যাসক্তি মুক্তির অব্যর্থ কারণ।

৬। বিচারপ্রাণ শাস্ত্র।—ন্যায়শাস্ত্র যাহার শীর্ষদেশ, উপনিষৎ যাহার প্রাণ, পুরাণ যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সে শাস্ত্র যে বিচারেই অধিষ্ঠিত তাহাও কি কাহাকে বলিতে হয়?

প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাং উপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে পরীক্ষিতা॥ ১৯॥

ন্যায়শাস্ত্রই সকল জ্ঞানের প্রদীপস্বরূপ, অহঙ্কারোদ্ভূত তমঃ দূর করিয়া উহাই বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ

করে। উহাই সকল কর্ম্মের উপায়, সকল ধর্ম্মের আশ্রয় ও জ্ঞানের উদ্দেশে পরীক্ষক অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের পরীক্ষা উহার দ্বারাই হয়।

তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ ॥ ২০ ॥

বস্তুর স্বরূপজ্ঞান হইতেই যাহা নিশ্চিত শ্রেয়ঃ তাহার অত্যন্ত প্রাপ্তি ঘটে। তত্ত্ব বলিতে সেই বস্তুর ভাব বুঝায় (তৎ+ত্ব) তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি। তত্ত্বজ্ঞানাভাবে মোক্ষ হইতে পারে না।

মিথ্যাজ্ঞানাপায়াৎ অপবর্গঃ ২১ ॥

বস্তুর স্বরূপজ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলে। তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত মিথ্যাজ্ঞান। বস্তুকে প্রকৃতভাবে না দেখিয়া বিকৃতভাবে দেখাকে মিথ্যাজ্ঞান বলে। এই মিথ্যাজ্ঞানই মোহ বা অজ্ঞান। মিথ্যা-জ্ঞান বিদূরিত হইলে মোক্ষলাভ হয়।

ঋতে জ্ঞানান্নমুক্তিঃ ॥ ২২ ॥

শ্রুতি বলিতেছেন জ্ঞানভিন্ন মুক্তিলাভ হয় না। যতক্ষণ জীবের অজ্ঞান থাকে ততক্ষণ তাহার অজ্ঞানপ্রভব সংসার বন্ধন থাকিবেই।

আত্মানমেবাত্মতয়াইবিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।

জ্ঞানেন সম্যক্ পুনরেব লীয়তে রজ্জ্বামহের্ভোগ-ভবাভবৌ যথা ॥ ২৩ ॥

যাহারা আত্মাকে আত্মা বলিয়া জানে না, যাহারা অনাত্ম দেহকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদের এই দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞান হইতে এই মায়ার সংসার (প্রপঞ্চিতম্) উৎপন্ন। এই অজ্ঞানোদ্ভব প্রপঞ্চ (সংসার) পুনরায় জ্ঞানের দ্বারা লয় হয় ও সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ লয় হয়। যথা রজ্জুতে সর্পের (অহেঃ) দেহ (ভোগ) একবার জন্মায় (ভবঃ) ও একবার লোপ পায় (অভবঃ)। যেমন অস্পষ্ট আলোকে রজ্জুখণ্ড দেখিলে তাহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। পুনরায় স্পষ্ট আলোকে উহাকে রজ্জু বলিয়াই বুঝা যায়। রজ্জুখণ্ড সর্প নহে। পূর্ণ অন্ধকারে (পূর্ণঅজ্ঞানে) কিংবা পূর্ণ আলোকে (পূর্ণ জ্ঞানে) উহাকে সর্পভ্রম হয় না। কেবল অস্পষ্ট আলোকই (বিকৃত জ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান উহাকে সর্পাকারে পরিণত করে।

বিদ্যা দিবা প্রকাশত্বাৎ অবিদ্যা রাত্রিরুচ্যতে।

বিদ্যাভ্যাসে প্রমাদো যঃ স দিবাস্বাপ উচ্যতে ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানই দিবা কেন না, সকল বস্তুকেই প্রকাশ করিতে পারে। অজ্ঞানই রাত্রি কেন না, সকল বস্তুকেই তমসাচ্ছন্ন করে। জ্ঞানাভ্যাসের ত্রুটিকেই দিবানিদ্রা বলে। জ্ঞানীই জাগ্রত ও অজ্ঞান পুরুষই চিরসুপ্ত।

অবিদ্যা সংসৃতের্হেতুর্বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা।

তস্মাৎ যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ ॥ ২৫ ॥

অজ্ঞান সংসারের কারণ। জ্ঞানেই সংসারের নিবৃত্তি। অতএব মুমুক্ষু নরগণ সর্ব্বদাই জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ॥ ২৬ ॥

জ্ঞানের তুল্য পবিত্রবস্তু আর কিছুই নাই। একমাত্র জ্ঞানই মনের ময়লা দূর করিয়া মনুষ্যকে পবিত্র করিতে পারে।

জ্ঞানী প্রিয়তমোঽতো মে জ্ঞানেনাসৌ বিভর্ত্তি মাম্ ॥ ২৭ ॥

অতএব জ্ঞানী আমার প্রিয়তম। তিনি জ্ঞানের দ্বারা আমাকে (শ্রীভগবানকে) ধারণ করেন।

সকৃজ্ জ্ঞানেন মুক্তিঃ স্যাৎ।
সম্যক্ জ্ঞানে স্বয়ং গুরুঃ ॥ ২৮ ॥

একবারমাত্র জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ হয়। সম্যক্ জ্ঞান হইলে তিনি স্বয়ং গুরু—তিনি অপরের অজ্ঞান দূর করিয়া তাহাকে মুক্তি দিতে সমর্থ।

একান্তভক্তিঃ শ্রীনাথে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
বিবেকী বিচরেদেকো জ্ঞাতা ব্রহ্মশরীরধৃক্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবানে একান্ত ভক্তিকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলে। তাহা হইতেই হিতাহিত বিবেক ও পরে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানীপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্। ব্রহ্মরূপী জ্ঞানী একা (নিঃস্পৃহ হইয়া) বিচরণ করেন।

জ্ঞমনো নাশমভ্যেতি মনোজ্ঞস্য হি শৃঙ্খলা ॥ ৩০ ॥

জ্ঞানীর মন একেবারে নাশ হয়। তাঁহার মনের কর্তৃত্ব অভিমানাদি নষ্ট হইয়া তিনি সংসারবন্ধন হইতে উন্মুক্ত হন। যে মনের অনুসরণ করে (মনোজ্ঞ) তাহারই সংসারবন্ধন অভেদ্য হয়।

সর্ব্বভূত-সুহৃচ্ছান্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ ॥ ৩১ ॥

সকল ভূতের সুহৃৎ ও জিতেন্দ্রিয় হইলে, জ্ঞান বিজ্ঞানে আরূঢ় হইবে। বিশ্ব ব্রহ্মময় দেখিবে। কাযেই আর সংসারে বিপন্ন হইবে না (মুক্ত হইবে)

ধনবৃদ্ধা বয়োবৃদ্ধা বিদ্যাবৃদ্ধাস্তথৈব চ।
তে সর্ব্বে জ্ঞানবৃদ্ধস্য কিঙ্করাঃ শিষ্যকিঙ্করাঃ ॥ ৩২ ॥

যাহারা ধন বয়স ও বিদ্যাতে বৃদ্ধ, তাহারা জ্ঞানবৃদ্ধের দাসের দাসের দাস।

জ্ঞানশৌচং পরিত্যজ্য বাহ্যে যো রমতে নরঃ।
স মূঢ়ঃ কাঞ্চনং ত্যক্ত্বা লোষ্ট্রং গৃহ্ণাতি মোহতঃ ॥ ৩৩ ॥

যে ব্যক্তি জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে পবিত্র করিবার চেষ্টা না করিয়া বাহ্য বিষয়ে আনন্দ করে সে মূঢ়। সে মোহবশতঃই হস্তস্থ কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া সযতনে লোষ্ট্র সংগ্রহ করে। এই বিচার কি? প্রমাণ কাহাকে বলে? সূক্ষ্মদৃষ্টি ও স্থূলদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য কি? এই সকল কথার অবতারণা পরে করা যাইবে। এক্ষণে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট যে, বিচারের ভাণকে বিচার বলে না। শাস্ত্রানুগত শাস্ত্রনিষ্ঠিত বিচারই বিচার (ঊহ)। শাস্ত্রবিরহিত, শাস্ত্রপ্রতিকূল বিচার, বিচারই নহে, বিচারাভাস মাত্র (অপোহ)। আস্তিক্যের দ্বারা অহঙ্কার বিদূরিত হইলেই বিচারের শক্তি জন্মে। অন্যথা নহে।

আর্য্যং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রবিরোধিনা।
যঃ তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥ ৩৪ ॥

ঋষিদের ধর্ম্মোপদেশ, যে বেদ ও শাস্ত্রের অবিরোধি তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করে সেই ধর্ম্ম জানিতে পারে। অপরে পারে না।

৭। আত্মাশ্রয় দোষ।—শাস্ত্র মানিব কেন? হিন্দুর পক্ষে যাহা একমাত্র সদুত্তর তাহার আভাসের লবলেশমাত্র ভয়ে ভয়ে দিলাম। হিন্দুমাত্রেই জানেন, শাস্ত্র মানিব কেন—এই প্রশ্নের সদুত্তর দানে কেবল শাস্ত্রই সমর্থ। অন্য উপায়ে এই প্রশ্নের সদুত্তর মিলিতে পারে না। যাহার বুদ্ধি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা গঠিত হয় নাই তাহাকে অকৃতবুদ্ধি বলে। তাহার বুদ্ধিও নাই বিচারও নাই।

নববিজ্ঞানমানিগণ তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিবেন—যে শাস্ত্র নিজেকেই নিজের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সে শাস্ত্র ইতরেতরাশ্রয়দোষের (১) সন্ধানই পায় নাই। আত্মাশ্রয়দুষ্ট সেই শাস্ত্র যে একেবারে হেয় সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। শাস্ত্রের দোহাই দিলে অন্যান্যাশ্রয়রূপ (১) অনিষ্ট-প্রসঙ্গ দুর্ণিবার, এই আপাতদুর্লঙ্ঘ্য আক্ষেপের বিস্পষ্টিমদুত্তর পরে মিলিবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্তই বক্তব্য যে শাস্ত্র দিয়া শাস্ত্র প্রমাণ হয় না—বলা সহজ, বুঝা মোটেই সহজ নহে।

কার্য্যং বৈ কারণাদ্ভিন্নং নোৎপন্নং হি কদাচন ॥ ৩৫ ॥

কারণ হইতে কার্য্যকখনই ভিন্ন হয় না। যাহা কারণে নাই তাহা কার্য্যে কখনই থাকিতে পারে না। যাহা কার্য্যে আছে তাহা কারণেই আছে।

যথাগ্নির্দারুমধ্যস্থো নোত্তিষ্ঠেৎ মথনং বিনা ॥ ৩৬ ॥

যথা অগ্নি কাষ্ঠমধ্যে থাকিয়াও ঘর্ষণ বিনা উৎপন্ন হয় না। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয় বলিয়া, আপাতনিরগ্নি শীতল কাষ্ঠের মধ্যেও অগ্নি আছে, এই অনুমান অপরিহার্য্য।

কার্য্যকারণ-বস্ত্বৈক্য-দর্শনং পটতন্তুবৎ।

অবস্তুত্বাৎ বিকল্পস্য ভাবাদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥

কার্য্য কারণ ও বস্তুর একতা দর্শন, কার্য্য কারণ ও বস্তু এই তিনই প্রকৃত এক, ইহাদের ভেদ নাই, এই জ্ঞানকেই ভাবাদ্বৈত বলে। এই একতা কি রকম? পটতন্তুবৎ—বস্ত্র ও তাহার সূত্রের ন্যায়। এই একতার কারণ কি? ভেদের (বিকল্পস্য) মিথ্যাত্বই এই একতার কারণ। প্রকৃত অভেদই এই আপাত ভেদ বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র। মান (প্রমাণ) দ্বারা মেয় বিষয় (যাহা প্রমাণ করিতে হইবে) কি করিয়া সিদ্ধ হয়। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। এই মান বেদমতে আত্মসাপেক্ষ তার্কিকমতে নিরপেক্ষ।

মানানাং স্ববিষয়াবভাসকত্বং আত্মসাপেক্ষম্ ॥ ৩৮ ॥

প্রমাণ করিবার বিষয় প্রমাণেরই অন্তর্গত ইহাই বৈদিক মত।

নব্যতর্কশাস্ত্রের বিচারবলে ব্যক্তিবিশেষের মর্ত্ত্যত্ব প্রতিপাদন কি আত্মাশ্রয়দোষ দুষ্ট নহে। সকল মনুষ্যই মরণশীল। সক্রেটিস্ মনুষ্য। অতএব সক্রেটিস্ মরণশীল। ইহাই নবতর্ক-শাস্ত্রের নির্দ্দোষ বিচার। যখন সকল মনুষ্যই মরণশীল বলা হইল, তখন সক্রেটিস্ মরণশীল ইহা ধরিয়াই লওয়া হইল। কেন না সক্রেটিস্ মরণধর্ম্মা না হইলে সকল মনুষ্যই মরণধর্ম্মা হইতে পারিত না। অতএব সক্রেটিস্ মরণশীল এই প্রতিপাদ্য বিষয়, সকল মনুষ্যই মরণশীল এই প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভূত। কাযেই প্রতিজ্ঞারই একদেশমাত্র প্রমাণ হইল। ইহাও স্বরূপতঃ আত্মাশ্রয়দোষ।

1. Petitio Principii.

অ্যারিষ্টট্‌লও বলিয়াছেন যাহা আদিতে নাই তাহা অন্তে নাই (১)। কাযেই সিদ্ধান্ত নিত্যই প্রতিজ্ঞৈকদেশসংস্থিত।

৮। **শাস্ত্রদোহাই উন্মত্ত প্রলাপ।**—অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে শাস্ত্রকেই শাস্ত্রের প্রমাণ স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া হিন্দুশাস্ত্র কোনও অমার্জ্জনীয় দোষে লিপ্ত হন নাই ও যাহারা আত্মাশ্রয়দোষ, অন্যোন্যাশ্রয়দোষ (২) বলিয়া কথায় কথায় চীৎকার করে তাহারা কেবল টীয়াপাখির ন্যায় 'রাধাকৃষ্ণ পড়ে' মাত্র। জ্ঞানপূর্ব্বক কিছুই বলে না। প্রকৃত হিন্দু আজকাল বড়ই বিরল। যাহারা আচার ভ্রষ্ট হইলেও হিন্দুত্বের গন্ধ যাহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করে নাই, যাহারা কালের বিচিত্র দুর্দ্দম্য গতিতে হিন্দুত্বের প্রায় সমস্ত পরিচয় হারাইয়াও হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাস একেবারে হারাইতে পারে নাই, সেই সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে কথঞ্চিৎ বিশ্বাসবান্ আস্তিক হিন্দুর কাছেই আমরা হিন্দুশাস্ত্রের ঘুণাক্ষরে পরিচয় দিতে সাহসী হইয়াছি। যাঁহারা নিজেদের হিন্দু নাম ঘোষণা করিতে সর্ব্বদাই তৎপর কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে অবিশ্বাসও দ্বেষই যাঁহাদের হিন্দুত্বের একমাত্র পরিচয়, সেই বিচারধ্বজী, উন্মুক্তবন্ধন, সভ্যতার পরপারে উন্নীত, হিন্দুমনীষিগণের কথা আমরা বলিতে সাহসও করি না। তাঁহাদের কাছে শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া দূরে থাকুক, শাস্ত্রের নামোল্লেখ পর্য্যন্তও উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া প্রতিভাত হয়। আজকাল সভ্যসমাজ সনাতন সত্যশাস্ত্রের মর্য্যাদা দিতে জানে না বলিয়া যে অসত্য শাস্ত্রের মর্য্যাদাজ্ঞানে বঞ্চিত একথা কেহ কখনও যেন মনে না করেন।

৯। **অসত্যশাস্ত্রের মর্য্যাদা।**—যে শাস্ত্র আজ যাহা বলে আজই তাহা উল্টায়—দ্বিতীয় ভানূদয়ের অপেক্ষা রাখে না, যে শাস্ত্র সত্যের গৌরবরক্ষার ছলে সত্যকেই পদদলিত করিয়া মিথ্যাকে মাথায় করিয়া সাবধানে ও সপ্রশ্রয়ে বহন করে, যে শাস্ত্র নিজের ধৃষ্টতাবলে মিথ্যাকে সত্যাকারে পরিণত করিয়া উন্নতিচ্ছলে সদাই পরিবর্ত্তনশীল—সেই শাস্ত্রের যদি মর্য্যাদা রাখিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে বিপরীতবুদ্ধিপ্রণোদিত নব্যবিচারধুরন্ধরগণ অবিচারে সেই অনিত্য শাস্ত্রের নিত্যমর্য্যাদা দিতে ব্যাকুল বিহ্বল ও বিপ্লুত। কিন্তু যে শাস্ত্র এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারের পরিবর্ত্তনসন্ততির মধ্যে অটল অচল বিকারহীন ও সনাতন, যে শাস্ত্র বিতথোন্নতিবিদ্বিষ্ট ও অসত্যের মর্য্যাদাবিচ্যুত অহং মদোদ্ধত অভিমানবিঘূর্ণিত, সভ্যসমাজ সেই শাস্ত্রের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে সক্ষম নহেন।

ধন্য সভ্যবুদ্ধির বৈপরীত্য! সত্যই সত্যের আদর জানে ও মিথ্যাই মিথ্যার আদর দিতে পারে। মিথ্যা সততই সত্য-বিদ্বিষ্ট ও সত্য নিত্যই মিথ্যা-বিচ্যুত। অসত্যপরিপুষ্ট হৃদয়ে অসত্য-প্রীতিই স্থান পায়, সত্য স্থান পায় না। অতএব সনাতন সত্যশাস্ত্রের অনাদর ও অসত্য অনিয়ত-স্বরূপ নব্যশাস্ত্রের আদর—এতদুভয়ই মিথ্যা-পরিপুষ্ট হৃদয়ের সহজবৃত্তি।

সত্যং নিরাশ্রয়ং নিত্যং দয়া চ বিধবা মতা।
নাথহীনঃ সদা ধর্ম্ম সারল্যং মৃত্যুনিশ্চয়ম্॥ ২৯॥

কলিকালে সত্য নিরাশ্রয় হইবে, দয়া বিধবা ও ধর্ম্ম সর্ব্বদাই নাথহীন হইবে। সরলতা মৃত্যুপাশে পরিণত হইবে। কাযেই এই কলিকালে অসদুপদেশই আদৃত, সদুপদেশই নিন্দিত।

(১) Sec. 33. (২) Petitio Principii.

জনো জনস্তাদিশতেঽসতীং মতিং
যয়া প্রপদ্যেত দুরত্যয়ং তমঃ।
ত্বং ত্বব্যয়ং জ্ঞানমমোঘমঞ্জসা
প্রপদ্যতে যেন নরো নিজং পদম্ ॥ ৪০ ॥

সংসারী মনুষ্যই সংসারী জীবকে অসন্মতি দেয় ও নিজ চিত্তবৃত্তির অনুকূলতার কারণ সংসারী জীব সেই অসদুপদেশ সাদরে গ্রহণ করতঃ দুরতিক্রম অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। হে ভগবন্ তুমি কিন্তু মুক্তিকামী মনুষ্যকে অব্যয় অমোঘ জ্ঞান দাও। যাহার দ্বারা তৎক্ষণাৎ (অঞ্জসা) সেই মুক্তিকামী মনুষ্য নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হয় (সংসারী জনঃ মুমুক্ষুর্ণরঃ)।

নিশামুখেষু খদ্যোতা স্তমসা ভান্তি নো গ্রহাঃ।
যথা পাপেন পাখণ্ডা নহি বেদাঃ কলৌ যুগে ॥ ৪১ ॥

প্রদোষকালের অন্ধকারে খদ্যোতগণ শোভা পায়, গ্রহগণ প্রকাশ পায় না। সেইরূপ কলিযুগে পাখণ্ডগণই পাপবশে শোভা পায়, বেদ শোভা পান না।

১০। **বিজ্ঞান-ব্যুৎপত্তি ও পসার।**—শাস্ত্র বলিলে পাছে সনাতন শাস্ত্রের ভ্রম হয়, সেই ভয়ে সভ্য সমাজ শাস্ত্রনাম দূরতঃ বর্জ্জন করিয়া শাস্ত্রের বিজ্ঞান আখ্যা দিয়াছেন। অজ্ঞানজন্য নামটীও অজ্ঞান জনকের ঠিক অনুরূপই হইয়াছে। বিজ্ঞান (বি+জ্ঞা+অন) শব্দের শক্যার্থ দুইটী, বিশিষ্টজ্ঞান ও বিকৃতজ্ঞান। বিশিষ্টজ্ঞান-বিভ্রম বিকৃতজ্ঞানই নববিজ্ঞান। বিশিষ্টজ্ঞান বলিয়া যাহাকে ভ্রম হয় কিন্তু সত্য সত্যই যাহা বিকৃত জ্ঞান তাহাকে বিজ্ঞান বলে। দৈব দুর্বিপাকে এই বিশিষ্টজ্ঞান-বিভ্রম বিজ্ঞানেরই এখন একচেটিয়া পসার।

যথা দেশং যথাকালং যাবদ্দৈবোপপাদিতম্। ৪২ ॥

যে রকম দেশ, যে প্রকার কাল ও যে রকম অদৃষ্ট সেই রকম কর্ত্তব্যবোধে, শাস্ত্র মানিব কেন এই প্রশ্নের সদুত্তর বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া ঘোর অনিচ্ছায় কদুত্তর দানে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম। সুধীগণ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন ইহাই ভরসা।

১১। **বিচারের উৎকট রব।**—বিচার-বিচার-বিচার—এই সন্নাদের উল্বণ ঘাত প্রতিঘাতে সভ্যজগৎ সদা সর্ব্বত্র আপূরিত স্তব্ধ ও বিক্ষুব্ধ! কি কিশোর কি কিশোরী, কি বালক কি বালিকা, কি যুবা কিযুবতী, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি উপাধিগ্রস্ত কি অনুপাধিক, আপামর সকলের কণ্ঠে সমস্বরে তাররবে ঐ একই কথা—বিচারই সব, শাস্ত্র কিছুই নহে।

বিষং নাস্তি কিমু তত্র ফটাটোপো ভয়ঙ্করঃ ॥ ৪৩ ॥

বিষ নাই তাহাতে তি? ভয়ঙ্কর ফণাবিস্তারের ত অভাব নাই। কথায় বলে বিষ নাই কুলাপানা চক্র। যেখানে যতই বিচারের অভাব সেখানে ততই বিচার বিচার রব—বিচারের অভিমান। কিশোর কিশোরী বালক বালিকারা যে একেবারেই বিচার-বর্জ্জিত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এখন দেখা যাউক যাহাদের কাছে বিচারের আশা করা যায় তাহাদেরই বিচারের দৌড় কতটুকু।

১২। **বিচারাভিমানের স্বরূপ।**—মনুষ্য মাত্রেই দেহের সহিত আজীবন ঘর করিয়া

---

1. Science

থাকে। দেহের সহিত তাহার যেরূপ ঘনিষ্ঠ ও নিত্য সম্বন্ধ, এরূপ আর কোনও বস্তুর সহিত নাই। অতএব দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে মনুষ্যমাত্রেই নিঃসন্দেহ প্রাজ্ঞ ও সুপণ্ডিত, এ কথা বলাই অকিঞ্চিৎকর—বিচারধ্বজী, অভ্রান্তধী পুরুষের ত কথাই নাই। কিন্তু আমরা এই পার্থিব জগতে কি দেখিতে পাই? যে সকল অকুণ্ঠবুদ্ধি পুরুষ ঋষিবুদ্ধির অগম্য দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে কদাচ কুণ্ঠাবোধ করে না, সেই অকুণ্ঠবুদ্ধি, অভ্রান্তধী, অব্যাহতমতি পুরুষের অনিরুদ্ধ-ধিষণাই নিত্য পরিচিত, স্থূলাৎ স্থূলতর তত্ত্বের নিকট লাঞ্ছিত, পরাহত ও নির্জ্জিত! দেহের উপর ব্যাধির ছায়াপাতের আশঙ্কামাত্রেই যে পুরুষ ভয়বিহ্বলিত নেত্রে বিক্ষিপ্ত চিত্তে, সু-ই হউক আর কু ই হউক, চিকিৎসকের পাদকমলে শরণাপন্ন হয়, সেই পুরুষের মুখে বিচারাভিমানের বৃথাভিব্যক্তি শ্রবণ করিলে যুগপৎ বিস্ময় ও লজ্জায় অভিভূত হইতে হয়।

অহো! নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ ॥ ৪৪ ॥

হায়! হায়! মানুষের কি বিড়ম্বনা।

১৩। ভিষক্‌পাদাশ্রয় ব্যাধি।—শরীরের যত প্রকার ব্যাধি আছে সেই সকল প্রকার ব্যাধির অপেক্ষা ভিষক্‌পাদাশ্রয়রূপ মানসিক ব্যাধিই উৎকট। শুধু অসুখ করিলেই ডাক্তার ডাকিতে হইবে এমত নহে। ডাক্তারের হাতে ক্ষতি হইতেছে তথাপি, এমনই বিচারবর্জ্জিত, অসহায় ও অনাথ, সেই ডাক্তারকেই ডাকিতে হইবে, গত্যন্তর নাই। এমনও দেখা যায় চিকিৎসকের যমদূত বলিয়া খ্যাতি আছে, তথাপি সেই চিকিৎসকের হাতে জীবন সমর্পণ করিয়াই ধন্য।

অহো চিত্রং অহো চিত্রং গতির্ধাতুর্দুর্বিজ্ঞেয়া ॥ ৪৫ ॥

কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! বিধাতার কার্য্য দুর্বিজ্ঞেয়।

১৪। ভিষক্‌পাদাশ্রয় বর্জ্জন।—উত্তরে বলা যাইতে পারে—সবাই ত আর ডাক্তার নয়. তবে ডাক্তার না ডাকিয়া আর উপায় কি? সত্য। কিন্তু ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে, যে মানুষ সামান্য দৈহিক ব্যাধির উপায় করিতে পারে না, সেই মানুষই নিজের বুদ্ধিতে ভবব্যাধির উপায় করিতে নিত্য উদ্‌যুক্ত, ব্যগ্র ও ব্যাকুল? যে পুরুষ প্রকৃতই বিচারবান্ তাহার বুদ্ধি ভবব্যাধির চিকিৎসাতেই ক্ষুন্ন হয়, শারীরব্যাধির চিকিৎসায় নহে। আমরা সেই রকম এক পুরুষকে জানি। তরুণ বয়সে ডাক্তারের চিকিৎসায়—ডাক্তারের প্রমাদেই ইঁহার শিশুর মৃত্যু হয়। তখন তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—কি! অন্য লোক আসিয়া আমার ছেলে মারিল? এবার আমিই আমার ছেলে মারিব, ডাক্তারের হাতে দিব না। সেই অবধি তিনি আর ডাক্তার ডাকেন নাই। কত সুকঠিন পীড়া তাঁহার সংসারে হইয়াছে। তিনি সকল ক্ষেত্রেই নিজে চিকিৎসা করিয়াছেন ও এখনও করেন।

১৫। চিকিৎসকের দুর্দ্দশা।—শুধু অচিকিৎসই যে ভিষক্‌পাদাব্জ সংশ্রয়ে কালাতিপাত করে—এমত নহে। যিনি স্বয়ং চিকিৎসক, রোগ প্রশমন করাই যাঁহার জীবনের বৃত্তি, নিজের দেহে কি নিজের গৃহে একটু কঠিন পীড়া হইলে তিনিও অন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

পরোপদেশে বিস্পষ্টং শিষ্টাঃ সর্ব্বে ভবন্তি হি।
বিপ্লবন্তি বিশেষেণ স্বকার্য্যে সমুপস্থিতে ॥ ৪৬ ॥

পরকে উপদেশ দিবার সময় সকলেই নিঃসন্দেহ পণ্ডিত হয়। কিন্তু নিজের কার্য্য উপস্থিত হইলে সেই বুদ্ধির বিপ্লব হয় না, সেই বুদ্ধি দেহ ছাড়িয়া প্রাণভয়ে পলায় না, ইহা দেখাই যায় না।

১৬। **সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে কি স্থূলবস্তু দেখা যায়?**—দেহ-সেবায় মানব বিচার যেরূপ লব্ধপ্রসর অন্য সমস্ত বিষয়েই তদ্রূপ। তুচ্ছ পণ্য ব্যবহার করিতে হইবে তদভিজ্ঞের শরণ লও। গৃহনির্ম্মাণ করিতে হইবে এঞ্জিনীয়ারের শরণ লও। আবার—এঞ্জিনীয়ার নিজেও পারিবেন না, কাজেই আর্কিটেক্‌টেরও শরণ লও। বাড়ীর নক্সা করিতে হইবে ড্রাফট্‌সম্যানের শরণ লও। পতিত ভূমিতে সহর নির্ম্মাণ করিতে হইবে টাউনপ্ল্যানিং এক্সপার্টের শরণ লও (১)। মোকদ্দমা করিতে হইবে উকীলের শরণ লও।

বিপ্লুতিস্ত্বিশেষেণ স্বকার্য্যে সমুপস্থিতে॥ ৪৭॥

নিজের কার্য্য উপস্থিত হইলেই হইল। বাচ, বিচার নাই (অবিশেষেণ) বুদ্ধি-বিপ্লব ঘটবেই; বুদ্ধি লোপ পাইবেই।

অলীক বিচারের অলীক রবোচ্ছ্বয়ের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র একই শব্দ—শরণং শরণং—ত্রাহি মাং ত্রাহি মাং। এমন কি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে চিরাধীত বিষয় অধিকার করিবার সামর্থ্যও নাই, সাহসও নাই, ভরসাও নাই। কেবল নোটবুকই ভরসা, আখেরের নিদান।

তৃতীয়োত্তারণে যত্নঃ কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।
অনুত্তারস্য সাফল্যং তচ্চাপি পরিহীয়তে॥

সযতনে প্রাণপণে সুদীর্ঘকাল পড়িয়াও পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীবদ্ধ হওয়ার অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে? হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়া, ইহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য্য। অথবা ইহাই বা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

সূক্ষ্মাবগাহিনী বুদ্ধিঃ কথং স্থূলে প্রবর্ত্ততে॥ ৪৮॥

যে বুদ্ধি সূক্ষ্মতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে সততই অপ্রতিহত সেই বুদ্ধি স্থূলতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে কিরূপ সমর্থ হইবে? যে চালনী সূক্ষ্মবস্তু চালনে সমর্থ, সেই চালনীই কি স্থূলবস্তু চালন করিতে পারে? যে লেখনী সূক্ষ্মাক্ষর লিখিতে সমর্থ, সেই সূক্ষ্ম লেখনীই কি স্থূলাক্ষর লিখিতে পারে? যে সূত্র দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তু বন্ধন করা যায়, সেই সূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা কি ভারবান্ বস্তুর বন্ধন সম্ভবে?

১৭। **নববিজ্ঞানের অবতারণা।**—বিচারভক্তের বিচারালম্বনের কিঞ্চিন্মাত্র নিদর্শন দেওয়া গেল। যে ব্যক্তি স্ব-বিচার সযতনে তুলিয়া রাখিয়া অবিচারে আইনষ্টাইনের কথা মানিবার জন্য ছট্‌ফট্ করে, যে ব্যক্তি প্ল্যাঙ্ক্, হাইজেনবের্ক, হালডেন্, টমসন্ প্রভৃতির নামে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সাবধানে বিচার বর্জ্জনপূর্ব্বক অসত্যকে সত্য বলিয়া কীর্ত্তন করিতে ব্যগ্র, অথচ বেদব্যাস গৌতম কনাদ মনু প্রভৃতি অসভ্য নাম শ্রবণে যাহার চিত্ত উদ্বেল বিচারগ্রস্ত, সে বিচারভক্ত কি বিচারভাক্ত সুধীগণই বিচার করিবেন।

সভ্য জগৎ আপনাকে বিচারপরায়ণ বলিয়া উদ্‌ঘোষণ করিতে সদাই ব্যস্ত। পরায়ণ শব্দের অর্থ দুইটী:—

---

(১) Commercial training. Engineers. Architect. Draftsman. Townplanning expert

পরং (উৎকৃষ্টং) অয়নং (গমনং) ইতি পরায়ণং,
পলায়নং ইতি যাবৎ র-লয়োরৈক্যত্বাৎ। বিচারঃ
পরায়ণং (পরমাশ্রয়ঃ) যস্য স বিচারপরায়ণঃ।
বিচারাৎ পরায়ণং (পলায়নং) যস্য স বিচারপরায়ণঃ ॥ ৫০ ॥

অতএব বিচারপরায়ণ শব্দে - বিচার যাহার একমাত্র আশ্রয় ও বিচার হইতে যে সদাই পলায়ন করে—এই উভয় অর্থই বুঝায়। এই উভয়াত্মক বিচারপরায়ণত্বই সভ্যতার ভূষণ সন্দেহ নাই।

এক্ষণে যে নব বিজ্ঞানের মিথ্যা গৌরবে, অবিচারে বিচারবান্ সভ্য জগৎ মিথ্যা গৌরবান্বিত, যে নববিজ্ঞানের অন্ধাভিমানে সভ্য জগতের নিকট সনাতন শাস্ত্রের সনাতন সত্যও অনাদৃত অবধীরিত ও তিরস্কৃত, যে অশাশ্বত বিজ্ঞানের অনিত্য চাক্‌চিক্যে সনাতন শাস্ত্রের নিত্য সৌন্দর্য্যও পরিভূত, সেই অশেষ-শেমুষীমোষ, সেই প্রকৃত জ্ঞান-বিধ্বংসি নববিজ্ঞানের কথা এখন বলা যাউক্।

১৮। পারদ হইতে সুবর্ণোৎপত্তি।—এই অসভ্য ভারতবর্ষে আবহমানকাল হইতে প্রসিদ্ধি আছে পারদ হইতে সুবর্ণ করা যায়। রসায়ন বিজ্ঞানে অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য যুক্তির দ্বারা নিঃসংশয় ও স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে—পদার্থ সকলের মূল ভিন্ন ভিন্ন—যে পদার্থ যাহা সেই পদার্থ তাহাই, অন্য পদার্থ নহে—একমূল পদার্থ হইতে অন্য মূল পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। সুবর্ণ, রজত, পারদ, তাম্র, লৌহ প্রভৃতি সব ভিন্ন ভিন্ন। পারদ হইতে সুবর্ণ হইতেই পারে না। সুবর্ণ হইতে পারদ হইতেই পারে না। সেইরূপ সুবর্ণ কখনও রজতাদিরূপ পরিগ্রহ করে না, রজতও কখন সুবর্ণাদিরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না। পুনশ্চ পারদের সহিত সুবর্ণাদির রূপ-বিনিময় প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ ও তাম্রাদির সহিত সুবর্ণাদির রূপ বিনিময় তমসাচ্ছন্ন চিত্তের মনোবিকার মাত্র।

১৯। জগৎ ভেদাভেদময়।—অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত রসায়নের দুষ্টতর্ক-পুষ্ট বিচারে বিচারবান্ হইয়া সভ্যজগৎ অসভ্য ভারতের অন্ধবিশ্বাসের মাত্রায় অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ে অভিভূত। অসভ্য ভারতের অসভ্যতার মাত্রা দেখিয়া সভ্যজগৎ বহুকষ্টেও হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। মিথ্যা রসায়ন বিজ্ঞান জানে না যে—এই জগৎ ভেদাভেদময়। যেখানেই ভেদ আছে সেইখানেই ভেদ নাই। আর যেখানেই অভেদ আছে সেইখানেই অভেদ নাই।

একোহং বহুস্যাম্। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৫১ ॥

আমি একাই বহু হইয়াছি। এই জগতে নানা নাই। এই ভেদপূর্ণ বিচিত্র জগৎ সেই একই পরব্রহ্মের বিভিন্ন মূর্ত্তিমাত্র। অতএব এই পরিদৃশ্যমান ভেদের ভিতর সেই অভিন্ন পরব্রহ্মই নিজ-স্বরূপে বিদ্যমান। সুবর্ণ, রজত পারদ, তাম্র, লৌহ প্রভৃতি দেখিতে যতই বিভিন্ন হউক না কেন স্বরূপতঃ তাহারা অভিন্ন। মূলপদার্থের মৌলিকত্ব, নাস্তিকবিচারের মিথ্যাকল্পনাপ্রসূত।

২০। রসায়নের অসত্যনিষ্ঠা।—অসত্য-প্রতিষ্ঠিত রসায়নবিজ্ঞান মূলপদার্থের অমৌলিকত্ব অল্পদিনেই অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু গভীর নাস্তিকতার দুর্ভেদ্য তমঃ তাহার লোচন পিহিত করিয়া দিয়াছিল। বীরের ন্যায় রসায়ন বিজ্ঞান চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অসত্যকে সত্য ও সত্যকে অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে অনন্ত-তৎপর রহিল। কিন্তু—

কালাধীনং জগৎসর্ব্বং গতিস্তস্য দুরত্যয়া। ৫২ ॥

এই জগতে সকল বস্তুই কালরূপী ভগবানের সম্পূর্ণ পরাধীন। তাঁহার গতি অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই। সকলেই কালবশে পরিচালিত। কাহারও কোনও স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য নাই। সেই কালচক্রের করালগতিতে অসত্য রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রায় দেড়শত বৎসরের অখিল বীরপ্রযত্নই ব্যর্থ হইয়া গেল।

২১। মূলপদার্থের অমৌলিকত্ব।—বীরমানী অসত্য-ভূষণ রসায়ন মানিতে বাধ্য হইল—পারদ হইতে স্বর্ণ হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে। একে একে রসায়ন বিজ্ঞানের প্রায় সকল তত্ত্বের অসারত্ব প্রতিপন্ন হইল। যে ৯২ মূলপদার্থকে ১৫০ বৎসর যাবৎ পুত্রপ্রেম-নির্ব্বিশেষে বক্ষে ধারণ করিয়া আসিতেছিল, অকস্মাৎ তাহাদিগকে বিসর্জ্জন দিয়া মূলপদার্থ দুইটী—হিলিয়ম ও হাইড্রোজেন—ইহাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ৯২ মূলপদার্থের স্থানে দুইটী মূলপদার্থ হইল, তাহাতেও নিস্তার নাই। পরিশেষে সকল মূলপদার্থই এক হাইড্রোজেনের বিকারমাত্র—ইহাই দাঁড়াইল। স্বর্ণ, রজত, পারদ প্রভৃতির চিরন্তন মৌলিক পার্থক্য দেড়শত বৎসর পরে কালস্রোতে ভাসিয়া গেল—নিন্দিত, তিরস্কৃত ও অবধীরিত সনাতন শাস্ত্রের সনাতন সত্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

একোঽহং বহুস্যাম্। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৫৩ ॥

—আমি একাই বহু হইয়াছি। এই জগতে নানা কিছুই নাই।

ভেদদৃষ্টিরবিদ্যেয়ং সর্ব্বথা তাং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

—এই ভেদ দৃষ্টিই অবিদ্যা (অজ্ঞান)। সকল প্রকারে ভেদদৃষ্টি একেবারে ত্যাগ কবিবে।

সমস্তং খল্বিদং ব্রহ্ম সর্ব্বমাত্মেদমাততম্ ॥ ৫৫ ॥

— এই দৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময়। পরমাত্মা সর্ব্বত্র বিরাজমান।

জগৎ দেখিতে বিচিত্র। কিন্তু এই বহু ও নানার মধ্যে সে একই নিত্য স্ফুরিত হইতেছে! আবার সেই একের মধ্যেই বহুত্ব ও নানাত্ব বিরাজমান। একই বহু ও বহুই এক—ইহাই জগতের বৈশিষ্ট্য। একই পদার্থ হইতে সকল মূলপদার্থই উদ্ভূত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৈচিত্র্যপ্রিয় জগতের এমনই বৈচিত্র্যপ্রীতি যে যাহারা এতদিন স্বতন্ত্র মূলপদার্থ বলিয়া গণ্য ছিল তাহাদের মধ্যেও অনেকগুলি মূল পদার্থই বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণ-ঘটিত,—ইহাই দেখিতে পাওয়া গেল। তিন প্রকার পদার্থের সংমিশ্রণে মূলপদার্থ অক্সিজেন উৎপন্ন। সেইরূপ মৌলিক নাইট্রোজেন বস্তুদ্বয়ের সংমিশ্রণজাত, মৌলিক দস্তা, রঙ্গ (রাং) সীসক ও পারদ যথাক্রমে ৭, ১১, ৬ ও ৬ প্রকার বিভিন্ন বস্তু-সংমিশ্রণ-সম্ভূত। এই মিশ্রপদার্থই মূলপদার্থের ন্যায় প্রতীত হয়। ইহারা প্রকৃত মূলপদার্থ নহে (১)। এই নিরবধি বৈচিত্র্য-প্রীতির বশে হাইড্রোজেনের চারিটী পরমাণুর গুরুত্ব হাইড্রোজেনের চারিটী পরমাণুর গুরুত্বের সমান হয় না! হাইড্রোজেনের চারিটী পরমাণুতে হিলিয়ামের একটী পরমাণু হয়। হাইড্রোজেন পরমাণুর গুরুত্ব ১ ধরিয়া লইলে হিলিয়াম পরমাণুর গুরুত্ব ৪ না হইয়া ৩'৯৭ হয়।

---

1. Identity of elements and mixture.

২২। উন্নতির নব্যসৃষ্টি।—নববিজ্ঞানের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই আমূল পরিবর্ত্তন নিত্য পরিলক্ষিত। এই আমূল পরিবর্ত্তনকেই নববিজ্ঞানমানিগণ উন্নতিনামে নির্দ্দেশ করেন, এবং একই বিজ্ঞানের ক্রম-বিকাশ নামে অভিহিত করেন। তত্ত্বসমবায় পরিত্যাগ সত্ত্বেও বস্তুর নিত্যের ন্যায় এই উন্নতি ও ক্রমবিকাশ নববিজ্ঞানের নব্যসৃষ্টি। কথায় বলে খোলও গেল, নল্‌চেও গেল, কিন্তু যেমন হুকা তেমনি রহিল। ইহাও বরং সম্ভব হইতে পারে। খোল নল্‌চের বদলে নূতন খোল নল্‌চে না দিয়া অপর বস্তু দিলেও সেই হুকা থাকে, ইহাই নববিজ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা অপূর্ব্ব ও অপরূপ সৃষ্টি। নববিজ্ঞান দেড়শত বৎসর যাবৎ কোলাহল করিল, ৯২ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থে যে না বিশ্বাস করে সে অসভ্য। ১৫০ বৎসর পরে সেই নববিজ্ঞান নিজেই বলিতে লাগিল, সেই ৯২ মূলপদার্থ একই মূলপদার্থ হাইড্রোজেনের উপাদানে গঠিত, তথাপি প্রত্যেকটী পদার্থই যেমন ভিন্ন মূলপদার্থ তেমনই রহিল। একাধারে একই সঙ্গে এই দুইটী কথার একত্র সমাবেশ অসত্যভূষণ উন্নতিপ্রবণ নববিজ্ঞানেই সম্ভব। এইরূপ মূলপদার্থ ও মিশ্রপদার্থের সাম্য এক অপূর্ব্ব বস্তু—নববিজ্ঞানের নব্যবিকাশের সাক্ষ্য দিতেছে।

(ক্রমশঃ)

কবীরের দোঁহা

অষ্ট-বিকার—আশা (৭)।

আসা এক জো নামকী, দূজী আস নিরাস।
পানী মাহীঁ ঘর করৈ, লোভী মরৈ পিয়াস ॥ ৭ ॥
প্রকৃত আশ আশা নামের, অন্য আশা নিরাশা সে।
সাগর মাঝে আবাস বেঁধে, মরা যেমন ঘোর পিয়াসে ॥ ৭ ॥

আসা এক জোনামকী, দূজী আস নিবারি।
দূজী আস মারসী, জোঁ চৌপড় কী সার ॥ ৮ ॥
প্রকৃত আশ আশা নামের, পরিহর আশা আর।
অন্য আশা মারবে তোমায়, যেমন মারে ঘুঁটীর সার ॥ ৮ ॥

কবীর জোগী জগত-গুরু, তজৈ জগত কী আস।
জো জগকী আসা করৈ, তো জগত গুরু বহু দাস ॥ ৯
যোগী জগৎ গুরু কবীর! ত্যাগ করে এ জগৎ আশ।
জগতের আশ যে রাখে তার, গুরুজগৎ আর সে দাস ॥ ৯

বহুত পসরা জনি করৈ, কর থোরে কী আস।
বহুত পসারা জিন কিয়া, তেই গায়ে নিরাস ॥ ১০ ॥

আশার প্রসার করো না খুব, হৃদে রাখ অল্প আশা।
যে করেছে আশার প্রসার, সেই পেয়েছে ঘোর নিরাশা ॥ ১০ ॥

আসাকা ইন্ধন করুঁ, মনসা করুঁ ভভূত।
জোগী ফিরী ফেরী করুঁ, যোঁ বনি আবৈ সূত ॥ ১১ ॥

সমিধ করি মনের আশা, আকাঙ্ক্ষারে ভস্মরাশি!
যোগী হ'য়ে পুষ্‌লে এদের, পুত্র হয়ে জুটবে আসি ॥ ১১ ॥

—শিবপ্রসাদ।

ছোট কথা

তুমি কবে এমন হবে ?

এমনই বর্ষাকাল। বিদেশে কর্ম্মবশে পরবাসে অলসভাবে শোওয়া বসার মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় কত কি চিন্তা করিতেছি, কোন চিন্তার সীমা নাই, পার নাই, মীমাংসা নাই,—এ সকলের কোন সম্ভাবনাও নাই, যেন কর্ম্মময় মনুষ্য জীবন—পরিশ্রমই সার।

বিছানায় বালিশের পাশে, আজ কয়দিনের তুলিয়া আনা গন্ধরাজ ফুলটা পড়িয়া পড়িয়া শুকাইয়া আসিতেছিল। যেদিন তাহাকে বাগানের গাছের কোল হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল—সেদিন তাহার কতরূপ, কত সৌন্দর্য্য, কত গন্ধ। আজ কয়দিনই কাটিয়া গিয়াছে,—এখন আর তাহার সে রূপ নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই,—সবই ক্ষয়রোগগ্রস্ত রোগীর মত ধীরে ধীরে মরণ-পথের যাত্রী। কেবল গন্ধটুক্ তাহার এখনও বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া ঘরটীকে আমোদিত করিতেছে।

কথা সকলেই কয়—কি জড় কি চেতন। বাহিরের কথা কানে শোনে,—অন্তরের কথা মনে শোনে। সেই মরণম্লান গন্ধরাজ অস্পষ্ট ভাষায় সুস্পষ্ট ভাবে—আমার প্রাণের ভিতর বলিল,—তুমি কবে এমন হবে ? এমনই করিয়া মরণের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পরের তৃপ্তির জন্য তিলে তিলে নিজেকে বিলাইয়া দিবে ? জান তো—সারা বছরের সর্ব্বস্ব মন্থনের ফলে প্রাণের হাসির মত গাছের গায়ে আমি ফুটিয়া উঠিয়াছিলাম। গাছ জানিত—তাহার জন্য আমি নই. আর আমিও জানিতাম—আমার জন্য আমি নই। আমরা সদাই ভাবিতাম—অনুক্ষণ প্রতীক্ষায় কাটাইতাম,—কে কখন আমায় তুলিয়া লইয়া গিয়া— সুগন্ধে অন্তরের অন্তরতম ঠাকুরকে পরিতৃপ্ত করিবে,—অথবা শ্রীভগবানের চরণে অঞ্জলি দিয়া আমাদের সকলের আত্মাকে কৃতার্থ করিবে – আর যাহার আদেশে আমার জন্ম—সংসারে আসা—তার কথা স্মরণ করিবে।

হায়! হায়! যাহার জন্য সব,—তাঁহারই কথা মানুষ ভুলিয়া থাকে। আমার এই অনিন্দ্যসুন্দর শুভ্র রূপ, এই মনোমদ প্রীতিপ্রদ গন্ধ,—আর এ সকলকে ভোগকরিবার জন্য—তোমার ইন্দ্রিয়। এত করিয়া ভালবাসিয়া—যে সব সাজাইয়া বসিয়া থাকে,—তাহার কথা তোমার মনে পড়ে না? তুমি মনে করিও না,—আমিই ভোগ্য আর তুমি ভোক্তা। আমার মত তুমিও ভোগ্য। তুমি কি—কোন দিন ভাবিয়াছ কি? তোমার এই মন, প্রাণ, বুদ্ধি, আত্মা ধর্ম্ম, কর্ম্ম সবই আর এক জনের তৃপ্তির জন্য? তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করিবার জন্য। শ্রীঃ—

স্বাদেশিকতা

শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

জীব জগৎ পরিভ্রমণে আসিয়াছে, পরন্তু কোথা হইতে সে আসিয়াছে তাহা সে জানে না, আত্মপরিচয় সে জানে না; সে কারণ—তাদৃশ পরিচয়ের জন্য—সে জ্ঞানলাভ বিষয়ে ব্যস্ত হইয়াছে—জগতে যাহা কিছু দেখিতেছে তাহা কারণ-ফল ভাবিয়া তদীয় কারণ নির্দ্দেশের জন্য সে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। জগতের জ্ঞানলাভ এবং তাহার নিজ সত্তার জ্ঞানলাভ—ইহাই হইয়াছে তাহার অনুসন্ধানের বিষয়।

নিজ সত্তা সম্বন্ধে তাহার অবগতি নাই, যাহা প্রত্যক্ষ দেখিবে তাহাই সে বিশ্বাস করিতে পারে, অপ্রত্যক্ষ বিষয় বলিয়া বিদিত তাহার উৎপত্তির কারণ আত্মার সহিত তাহার পরিচয় নাই, সুতরাং তদীয় সত্তাবিষয়ে সে সন্দিহান হইয়াছে—সে ভাবিতেছে আত্মা মন প্রভৃতির কোন বাস্তব সত্তা নাই, উহারা দেহোদ্ভব শক্তিবিশেষ মাত্র এবং উহাদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সে ভাবিতেছে যে, উহারা কাল্পনিক উৎপত্তি এবং দেহের অবসানে উহাদের অস্তিত্ব নাই! সে কারণ দেহকে আত্মস্বরূপ ভাবিয়া জীব দেহাত্মবাদী হইয়াছে, দেহের আবাসভূমিকে সে স্বদেশ বলিয়া ভাবিতেছে, স্বদেশের প্রতি তাহার অত্যধিক প্রীতি ও ভক্তি হইয়াছে এবং ভক্তিভরে সে বলিতেছে—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। সঙ্গই ভালবাসার কারণ হয়, স্বদেশের সঙ্গ হেতু জীব স্বদেশপ্রিয় হইয়াছে, স্বদেশস্থিত স্বজনগণকে সে আত্মীয় বলিয়া ভাবিতেছে; পরন্তু এ ভালবাসা চিরস্থায়ী হয় না, জীব জ্ঞানপিপাসু বলিয়া জ্ঞানলাভের জন্য তাহার পরদেশে গতি হয়, পরদেশের নূতন দৃশ্য, নূতন নীতি ও ব্যবহার দেখিয়া সে আকৃষ্ট হয়, তখন স্বদেশ আর তাহার প্রিয়বস্তু নহে, সে পরদেশে বসতির জন্য চেষ্টিত হয়, পরন্তু পরদেশ তাহাকে গ্রহণ করিবে না, সে কারণ পরদেশের নীতি ও ব্যবস্থা অনুসারে সে স্বদেশের সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে!

ইহা কলিকাল, কলির জীব অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানে "অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা"—সে কারণ অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ভাবিয়া অধর্ম্মনীতি সংগ্রহের জন্য জীব প্রবাসে গতিশীল

হইয়াছিল, এক্ষণে প্রবাস-প্রত্যাগত জীব স্বদেশে আসিয়াছে। প্রত্যাগত হইয়া বহুদেশ পরিভ্রমণ ফলে সে জ্ঞানিপদবাচ্য হইয়াছে, সে কারণ স্বদেশে আসিয়া সে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হয়,—যে স্বদেশনেতা বলিয়া পরিগণিত হয়। ঈদৃশ দেশনেতার ভক্ত বহুজন হয় দেশবাসিগণ দলে দলে সমবেত হইয়া নেতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ইহাদের অধর্ম্মপ্রিয় বলা হইতেছে, কারণ ইহারা ধর্ম্মস্বরূপ আত্মার অধীনত্ব স্বীকার করেনা, ইহারা ইন্দ্রিয়প্রবণ—ইন্দ্রিয়গণ যাহা বলিবে তাহাই ইহারা করিতে প্রস্তুত হয়, এবং শাস্ত্র বলিতেছে যে ইন্দ্রিয়গণই অধর্ম্মের স্বরূপ; সুতরাং ইন্দ্রিয়সেবীকেই অধর্ম্মপন্থী বলা হয়।

অধর্ম্মাশ্রয়ে ইহারা কি করিতেছে ?—ইহারা স্বাধীনতা পরিহার করিয়া পরাধীনতা স্বীকার করিয়াছে, আত্মভূমি পরিহার করিয়া পরভূমিতে পরসঙ্গে বাসের ইহাদের চেষ্টা হইয়াছে, বিদেশী আচার, বিদেশললনা এবং বিদেশী শিক্ষা ইহাদের সমাদরের বস্তু হইয়াছে, সুতরাং স্বদেশসম্পর্ক ইহারা জঘন্য সম্বন্ধ বলিয়া পরিহার করিয়া থাকে।

বিদেশী শিক্ষায় ইহারা ইন্দ্রিয়-সম্পর্ককে সারধর্ম্ম বলিয়া জানে, ইন্দ্রিয়কে আত্মস্বরূপ ভাবিয়া ইন্দ্রিয়-সেবায় ইহারা স্বাধীনতার বিকাশ বলিয়া বুঝিয়া থাকে এবং খাও দাও মজা কর (eat drink and be merry), ইহাই সুখজীবন যাপনের সারসত্ব বলিয়া ভাবিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সেবায় রত বলিয়া ইহারা ইন্দ্রিয় সুখকর কদর্য্য আচার অবলম্বনে থাকে; তন্নিরোধক ব্যবহারকে ইহারা অধর্ম্মাচার বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে এবং বলিয়া থাকে যে, ধর্ম্মকর্ম্ম পরে হইবে, এক্ষণে শরীর ও সত্তা রক্ষণোদ্দেশ্যে বাহ্যসুখসমৃদ্ধি সংগ্রহের জন্য যত্নবান্ হওয়া উচিত। জীব বিদেশজাত ললনার অতিশয় ভক্ত, সে শিক্ষিতা নারী বলিয়া পরিচিতা হয়, সুতরাং জীবের সহচারিণী হইয়া ইন্দ্রিয়ের সাহায্যকারিণী হইবে বলিয়া সে সমাদৃতা হয়; পরন্তু শিক্ষিতা কি বিষয়ে ?—বেশভূষার পারিপাট্যসাধনে এবং বাহ্যবিষয়ের অভিজ্ঞতালাভে সে শিক্ষিতা হইয়াছে। জীব স্বয়ং ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলিয়া সে ললনার বাহ্যরূপ দর্শনে মুগ্ধ হয়, স্বদেশের শ্যামাঙ্গীর রূপ তাহার পছন্দ হয় না, শ্বেতকৃষ্ণ বর্ণাভা শ্বেতাঙ্গীরূপ তাহার প্রিয়দর্শন হয়।

এমত কলির জীব স্বদেশ পরিহার করিয়া বিদেশে গিয়া বসতির মনস্থ করিল। পরন্তু বিদেশে তাহার স্থান হইল না, ময়ূরের ন্যায় শোভনরূপবিশিষ্ট বিদেশিগণ তাহাকে সে দেশে স্থান দিল না। অনুকরণপ্রিয় স্বদেশী জীব ময়ূররূপ বিদেশীর পুচ্ছ ধারণের দ্বারা বিদেশীবৎ শোভন হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হইল না. বিদেশিগণ সংগৃহীত পুচ্ছ অপহরণ করিয়া তাহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিল, তখন জীব স্বদেশে আসিয়া স্বদেশকে বিদেশের আকারে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টিত হইল। সে অর্থের মহিমা বুঝিয়াছে, সুতরাং বিদেশিগণের সঞ্চিত অর্থ নিজায়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টিত হইল, শস্যশ্যামলা স্বদেশভূমি সঞ্জাত শস্যাদির বিনিময়ে সে বিদেশীয়গণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিল; তাহার ফলে মাতৃভূমি ধনশূন্যা হইতে লাগিল। ধনশূন্য ধনভাণ্ডার জঘন্য বিলাসদ্রব্যের দ্বারা পরিপূরিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে ভারতে শস্যাল্পতা হইল, শস্যের অভাব হেতু প্রজাগণ ক্ষুধাপ্রপীড়িত হইল। যাঁহারা অর্থসঞ্চয়ী তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের যৎকিঞ্চিৎ ভাগ নিজ নিজ জীবিকানির্ব্বাহের জন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল। তাদৃশ অর্থের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইতেও লাগিল; পরন্তু স্বদেশের সাধারণ প্রজা

অর্থের অভাবহেতু ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পাইতে লাগিল। ইহাই অর্থপ্রাচুর্য্যের ফল, কথায় বলে অর্থ অনর্থের মূল, তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল।

দেশমাতা বলিতেছেন,—বৎস জীব, তুমি আমাকে বিদেশী অর্থসম্ভার বা বিলাসদ্রব্যের দ্বারা পরিপুষ্ট করিতে পারিবে না, পরন্তু আমার সেবক হইলে আমিই তোমাকে পরিপুষ্ট করিব। আমার নাম ভারত, সমগ্র পৃথিবীকেও ভারত বলা হয়, সে কারণ আমার সেবায় নিযুক্ত থাকিলে কেবল ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র পৃথিবী পুষ্ট হইবে। কৃষিকার্য্যে নিরত থাক, দেখিবে—কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যে ভূমি পরিপূরিত হইবে ; তাদৃশ উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কিয়দংশ নিজ আহারের সংস্থান-স্বরূপে রাখিয়া অবশিষ্টাংশ জনসাধারণের পরিপুষ্টির জন্য ব্যবসায়ে নিয়োগ করা যাইতে পারে। শস্যের বিনিময়ে অর্থসঞ্চয় না করিয়া এক প্রকার শস্যের বিনিময়ে অন্য প্রকার শস্য সঞ্চয় করা যাইতে পারে। রাজাকে করপ্রদানের জন্য শস্যের বিনিময়ে অর্থও বিদেশীয় জনগণের নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং যদি রাজা করস্বরূপে শস্যের অংশ লইতে স্বীকৃত হয়েন তাহা হইলে অর্থসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাই হইবে না।

ইহাই মাতৃনির্দ্দিষ্ট প্রকৃত অহিংসাবৃত্তি—ইহার দ্বারা প্রজাগণমধ্যে পরস্পর সহানুভূতি বর্ত্তমান থাকিবে, নচেৎ অপরের প্রভুত্ব অপহরণ করিয়া নিজে প্রভুত্ব করিবার চেষ্টায় অহিংসাবৃত্তির প্রতিষ্ঠা হয় না ; কল, কব্‌জা প্রস্তুত করিয়া অল্পসংখ্যক শ্রমজীবী নিয়োগ করিয়া অধিকাংশ শ্রমজীবিকে কর্ম্মশূন্য করিয়া তাহাদের স্ত্রী বকানির্ব্বাহের সাহায্য করা হয় না ; অর্থসংগ্রহের দ্বারা কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অধিকতর ধনাঢ্য করিয়া দেশের সর্ব্বসাধারণের উপকার হইবে না ; মাতৃধনে অবজ্ঞারদ্বার মাতৃপূজা হইবে না, তদ্দ্বারা মাতার অনুগ্রহও লভ্য হইবে না ; কৃষিকর্ম্মের দ্বারা মাতৃসঙ্গ রাখিয়া মাতৃভক্ত হও, অচিরে দেখিবে ধরণী শস্যপূর্ণা হইবে, মাতা উৎফুল্লনেত্রে তোমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবেন এবং তাদৃশ দৃষ্টির দ্বারা তুমি হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে সক্ষম হইবে।

সতর্ক দৃষ্টি

--"আমাদের এই জাতিভেদ প্রথা পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজে দেখা যায় না। এবং তন্নিমিত্ত সকলেই ইহা অতীব দোষণীয় বলিয়া থাকেন এবং ইহা আমাদের বহুকাল ধরিয়া রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার কারণ বলিয়া অনেকের ধারণা। কিন্তু যেমন এক দিকে দেখি যে আমরা বিদ্যায় বুদ্ধিতে অন্য কোন সভ্য জাতির তুলনায় হীন নহি, তথাপি বহু শতাব্দি ধরিয়া আমরা পরাধীন,—এরূপ সভ্যজগতে আর কোথাও দেখা যায় না—আবার আর এক দিকে দেখিলেও ইহাও অকাট্য সত্য যে, ভারতীয় সভ্যতার মতন এত দীর্ঘস্থায়ী সভ্যতাও পৃথিবীতে কুত্রাপি কখনও দৃষ্ট হয় নাই, এবং এতকাল এতরূপে বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ উত্থান হইতে দেখা যায় নাই—এবং এত অধিক শতাব্দি ধরিয়া কোন সমাজই সভ্যতায় অগ্রণী হইয়া থাকে নাই। সুতরাং শুধু আমাদের পরাধীনতা দেখিয়া যেমন ইহা আমাদের অধঃপতনের কারণ বলা যাইতে পারে তেমনই আবার ইহা

আমাদের বহু বৎসর ধরিয়া সভ্যতার অগ্রণী থাকিবার মূল কারণও আমাদের সভ্যতার সঞ্জীবনী শক্তির মূল উৎস ইহাতে নিহিত আছে তাহাও বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশেও বৌদ্ধযুগে জাতিভেদ প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আবার ইহার স্থাপনা হইয়াছে। যদি জাতিভেদ প্রথা বাস্তবিক অত্যন্ত অনিষ্টকারী হয় এবং ইহা উঠিয়া গেলে--উন্নতির পথ পরিষ্কার হয় গরীবদের ও সাধারণ লোকদিগের সুবিধা হয়, তাহা হইলে ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইত। মুসলমান সভ্যতায় প্রবল বন্যার মুখে সকল সভ্যতাই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কেবল ভারতবর্ষ তাহার প্রবল আক্রমণ সহ্য করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। সুতরাং শুধু আমাদের বহুকালের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার নিমিত্ত জাতিভেদ প্রথাকে দোষনীয় সাব্যস্ত করিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। আমাদের সংস্কারকেরা ও তরুণতরুণীরা যেন এই রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাই জাতিভেদ প্রথার দোষেব অকাট্য প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইতেছেন বলিয়া বোধ হয়। এরূপ ধরিয়া লওয়া ন্যায়শাস্ত্রসম্মত নয়।—

—আজকাল প্রধানতঃ সাম্যবাদের দোহাই দিয়াই জাতিভেদ প্রথাকে দোষাবহ বলা হয় ও তজ্জন্য ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বিকাশের ও উন্নতির প্রতিবন্ধক বলা হয় ও ইহা নীচজাতির প্রতি ঘোর অত্যাচার বলা হয়। এখন প্রথমে দেখা যাউক এই সাম্যবাদটার প্রকৃত অর্থই বা কি ও ইহা সর্ব্বস্থলেই প্রযোজ্য কি না ও ইহার প্রয়োগ কোন কোন স্থলে সীমাবদ্ধ করিতে হয় কি না এবং কেনই বা এইরূপ সীমাবদ্ধ করিতে হয়। সাম্যবাদের মানে কি সকলেই সমহারে একই জিনিষ খাইবে, একই রকম কর্ম্ম করিবে, একই রকম কাপড় চোপড় পরিবে, একই রকম বাড়ীতে থাকিবে? তাহা তো নয়। যাঁহারা সর্ব্ব-অধিক পরিমাণে সাম্যবাদের প্রয়োগ করিতে চাহেন—রুষিয়ার তুল্যাধিকারবাদীরা—তাঁহারাও "সকলের সমান আয় থাকা উচিৎ" ইহার উর্দ্ধে যাইতে চেষ্টাও করেন নাই এবং এই মতবাদ কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া দেখিলেন তাহাতে সমাজ বা রাজত্ব অচল হয়—গুণ ও ক্ষমতার তারতম্যের নিমিত্ত আয়ের পার্থক্যও অবশ্যম্ভাবী হয়। সংসারে অনভিজ্ঞ তরুণ তরুণীদের কাছে এই সহজ কথাটীও একটু বুঝানো আবশ্যক। যদি রাস্তায় বাহির হইয়া যত লোক দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে একশ জনকে তাহাদিগকে মাসিক ৫০ টাকা করিয়া পাইবে তাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং ২ বিঘা জমি দেওয়া যায় তাহা হইলে কেহ বা সেই টাকায় ভাল আহার পরিচ্ছদাদি করিবে—কেহ বা তাহা হইতে নানান বীজাদি কিনিয়া নানাবিধ প্রয়োজনীয় শস্যাদি উৎপাদন করিবে—কেহ গান-বাজনার চর্চ্চা করিবে কেহ বা পুস্তকা'দ কিনিবে। কেহ বা কেবলমাত্র সঞ্চয় করিবে—কেহ বা বিবাহ করিবে—এক বৎসব যাইতে না যাইতেই তাহাদের ভিতর আয়ের অনেক পার্থক্য দাঁড়াইয়া যাইবে। সকলের একই আয় থাকা নিয়মটি প্রবর্ত্তিত রাখিতে হইলে যে পরিশ্রম করিয়া উহা বাড়াইল তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অন্য অপরিশ্রমী লোকদিগকে দিতে হয়। তাহা করিলে সে আর পুনরায় ওরূপ পরিশ্রম করিতে চাহিবে না—তাহাতে লোকদিগের শ্রম-পরাঙ্মুখতা বাড়াইবে।—উদ্ভাবনী শক্তির হ্রাস হইবে—দেশের ঘোর অমঙ্গল সাধিত হইবে।"—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি-এ, এটর্ণী-এট-ল।

(ক্রমশঃ)

ভিক্ষুকের ঝুলি

(ত্রিদণ্ডী ভার্গব)

মুখোপাধ্যায়। শরীর ও সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা কিরূপ বুঝিয়াছ বল দেখি?

শ্রীশঙ্কর। সৃষ্টির পর ব্যক্তিগত উৎকর্ষলাভ এবং ব্যক্তিগত উৎকর্ষলাভে সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টি-লাভ হইয়া থাকে। সেই সমাজের Equilibrium লাভ করিলে শারীরিক ধর্ম্মের সামঞ্জস্য লাভে সমাজ-শরীরে সামঞ্জস্য আইসে। সেই সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য উচ্চ নীতি ও ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। উচ্চ নীতি ও জ্ঞানের আধার প্রকৃতি—প্রকৃতির আইন গুলি ধরিয়া তাহার সম্পূর্ণ অনুগমন করিতে পারিলেই অবিরোধের সহিত ক্রমোন্নতিলাভ করা যায়। প্রকৃতির আইন যত অমান্য করা যায় ততই বিরোধ শক্তির উদ্ভবে উভয় পক্ষেই শক্তির ক্ষয় এবং তৎফলে দুঃখ ও কষ্টের বৃদ্ধি হয়। মানুষ এতদ্‌সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অপরাধী এবং তার দুঃখ কষ্টও তাই সর্ব্ব জীব অপেক্ষা অধিক।

মানুষ কেন সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখভাক্

মু। নীতি ও জ্ঞান-বিচার কাহার ধর্ম্ম?

শ্রী। মানব মনের। মন শরীরের পরিচালক।

মু। মনে কি কি আছে?

শ্রী। বিষয় গ্রহণ (perception)ও বিষয় বিচার (thought), ইচ্ছা (volition) এবং সুখানুভব (feeling)।

মু। তা হলে মনের তিনটা অংশ। সেই তিন অংশই আর্য্যমতে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এবং এই তিনের সমাবেশ চিত্ত নামে অভিহিত। আমি এখানে মনকে শাস্ত্রোক্ত তিন ভাগে না বলিয়া তোমার ইংরাজী মতেই "মন" বলিব। এখন মনের ধর্ম্ম কি তাহা বল।

মন কি

শ্রী। জাগ্রত অবস্থায় মনের তিনটি ভাব দেখা যায়। যথা Self-existence বা অবস্থিতির ভাব, Activity বা একটা ছুটাছুটির ভাব, আর Inactivity বা এলিয়ে পড়ার ভাব।

মু। তা ছাড়া আর একটা ভাব আছে তাহা অনুভূ'ত বা feeling, কেমন নয়?

শ্রী। আজ্ঞা হ্যাঁ।

মু। অনুভূতি self-existence—ভাবের সহিত জড়িত, কাজেই তাহার চিন্তা পৃথক আমরা করিতে পারি না। তুমি রাত্রে অতি সুখে নিদ্রা ভোগ করিয়া প্রাতঃকালে উঠিয়াই যে ভাবে নিজ সত্ত্বা উপলব্ধি কর তাহাই সত্ত্ব, তার পর কার্য্যে প্রবৃত্তি রজ, এবং মনের যে অবসন্ন ভাব তাহাই তম নামে অভিহিত। প্রথমে যে স্বপ্রকাশ ভাব আইসে সেই সঙ্গে তুমি অজ্ঞাতে ভাব, "আহা! আমি আছি—কি আনন্দে নিদ্রা যাইতেছিলাম"। এই ভাবই আনন্দ; ইহা প্রকাশ ভাবের উচ্চাঙ্গ। মনের Equilibrium রাখিতে

ধর্ম্মজ্ঞান কি

গেলে এই তিনটিকে খুব সাবধানে লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয়। নতুবা সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া মানস শরীরে যুদ্ধ ও জয়-পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সেই সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য আইন চাই। আর্য্যমতে সেই Legislationএর নাম সাধন-পথ। সেই পথের মাপ কাঠিটি ধর্ম্ম-জ্ঞান। সেই জ্ঞান যার যেরূপ তার পথও তদ্রূপ হইয়া থাকে। এখন সেই পুরাতন কালের সমাজে লোকের কিরূপ জ্ঞান ছিল তাহা ভাবিলেই তাহাদের সাধন পথের একটা উপলব্ধি আসিবে।

শ্রী। আর্য্য পিতামহগণ প্রকৃতির Legislation দেখিয়া চলিতেন এবং সেই Legislation দেখিয়া যতদূর সম্ভব শরীর ও মন উভয় ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রাখিতেন—তাঁহাদের সীমাবদ্ধ কোন আদর্শ ছিল না।

মু। কি জন্য এরূপ শাস্তি চাহিতেন?

শ্রী। পরমেশ্বরের অভিপ্রেত সৃষ্টিকার্য্য সুরক্ষিত করিতে ও তাহার ফলে নিজেদের দুঃখ কষ্ট রোগ প্রভৃতি যতদূর সম্ভব নিবারণ করিতে।

মু। অর্থাৎ যতটা সম্ভব পরমেশ্বরের Penal codeর অবমাননায় যাতে জেলে না যেতে হয় তাহাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল—কেমন, না? তাহা হইলে বুঝিতে পারিলে যে পিতামহগণের পরমেশ্বরের অতি-বিশ্বাসী ally হইবার ভাবনা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা ছিল না। "কস্মৈ দেবায" ভাবে এক অসীম আদর্শের পিছনে ছুটিয়া অসীম উন্নতি লাভ করিতেন।

শ্রী। কেন মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা?

মু। "মুক্তি" বড় কথা। উহার স্বরূপ কি—তাহা কি বুঝিয়াছ, বল দেখি?

শ্রী। "মুক্তি" মানে পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া—যা ছিলাম তাই হওয়া—"তত্ত্বমসি" উপলব্ধি করা। স্বারূপ্য, সাযুজ্য সামীপ ও সালোক্য প্রভৃতি মুক্তির নানা পর্য্যায়।

মুক্তি কি

মু। অনেক বড় বড় কথা ত বলিলে। কিন্তু শ্রুতির বচন মনে কর—সেখানে তোমার কথিত মুক্তির কোন উল্লেখ নাই। বেদের সার গায়ত্রীত—তাহাতেও তোমার উক্ত মুক্তির কথার লেশ নাই। এমন কি ভক্তরাজ প্রহ্লাদও তোমার ঐরূপ মুক্তির কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কাজেই আর্য্য ঋষিগণের "মুক্তি" রূপ কোন কামনা ছিল না। তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমানের সর্ব্বশক্তিশালী ally হইবার জন্য জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতেন। সেই উৎকর্ষ লাভের চেষ্টাই ব্রাহ্মণের সাধন-পথ। এবং সেই পথ ধর্ম্মরূপ রক্ষী দ্বারা সুচারু রূপে পরিরক্ষিত। মনের ধর্ম্ম সত্ত্ব রজ ও তম। কিন্তু আবার সত্ত্ব-ধর্ম্মই ইহাদের মূল এবং স্বাভাবিক। ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারা বিষয় গ্রহণে বিকৃত হইয়া মন রজোগুণ প্রাপ্ত হয়। তমোগুণে মন এলিয়ে পড়ে—কর্ম্ম চেষ্টা শিথিল হইয়া যায়। এখন দেখ বাহ্য বিষয় গ্রহণে মানুষের কি কি উপায় আছে।

শ্রী। পঞ্চজ্ঞান ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়।

মু। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের সামঞ্জস্য সাধনের কথা শরীর-সমাজ রক্ষার আইন প্রতিপালনে কতক কতক সংবদ্ধ—তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রধানতঃ আমরা এখন জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটির বিষয় আলোচনা করিব। চক্ষুর বিষয় আলো অর্থাৎ তেজ—কর্ণের বিষয় শব্দ অর্থাৎ ব্যোম বা আকাশ—ত্বকের বিষয় বাতাস বা স্পর্শ—নাসিকার বিষয় গন্ধ অর্থাৎ ক্ষিতি—জীহ্বার বিষয় রস বা

অপ্ জল্। এই পঞ্চ বিষয়ের সূক্ষ্মাংশ জ্ঞানেন্দ্রিয় পথে সূক্ষ্ম পদার্থ মন গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বিষয়

এই পথ পাঁচটি এমন সুনিয়মে স্পষ্ট যে একটি পথ দিয়া অন্য একটি বিষয় কিছুতেই গৃহীত হয় না। তুমি বাগবাজারের রসগোল্লা বা ভীমনাগের সন্দেশ চক্ষে ধরিলে চক্ষুর তাহাতে সুবিধা হয় না এবং তাহার বিষয়ও মন গ্রহণ করিতে পারে না। আবার জিহ্বার কাছে ধরিবামাত্র তাহা মন গ্রহণ করে ও জিহ্বাতে রসসঞ্চার হয়। তদ্রূপ সুন্দর কীর্ত্তন-গান মুখের নিকট করিলে মুখ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না—অথচ কাণের কাছে কীর্ত্তন গেলে মন তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া গিয়া বিষয় ভোগ করে। এইরূপ অন্যান্য তিন ইন্দ্রিয়ও তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ে প্রযোজ্য।

শ্রী। মন কি তবে মানবশরীরে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান?

মু। সেই ইক্ষুরসের মত সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত শুক্রধাতুর কথা মনে কর। অসীম স্নায়ুমণ্ডলীর কথা মনে কর। মন সেই শুক্র ধাতুকে আধার করিয়া মানব শরীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে। যেমন স্নায়ু-যন্ত্রের প্রধান প্রধান কেন্দ্র আছে—যথা মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড ও তন্মধ্যস্থ

মনের ব্যাপকতা

এক একটি গ্রন্থি, তেমনি মনেরও একটা কেন্দ্র আছে। যোগীগণ তাহাকে মনশ্চক্র বলেন। তাহার অবস্থিতি যোগশাস্ত্র বা তন্ত্রে দেখিতে পাইবে।

শ্রী। তাদের নামান্তরই কি যোগশাস্ত্র মতে—সহস্রার ও ষট্চক্র? দ্বিদল চক্রেই ত মনের স্থান।

মু। হ্যাঁ, মোটামুটি তাই ধরে নাও। তোমার বুদ্ধি আছে দেখছি। আবার স্মরণ করাইয়া দিই—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে উপস্থ-সংযমের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় যে মন, তাহার কত নিকট

কামিনী ত্যাগের মূল কোথায়

সম্বন্ধ, তাহা এখন কিছু বুঝিতে পারা যাইতেছে। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিতেছি—কেন না, এই তত্ত্বের পরিণাম চিন্তাতেই celebate—* জীবনের প্রথম বীজ বপন। ইহাতেই "কিং ত্যজনীয়া কণকঞ্চ কান্তা।" এই শিক্ষার প্রাদুর্ভাব। এই চিন্তার ফলেই "ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবঃ নতু মানুষঃ"—এই তন্ত্রবাক্যের প্রচার।

শ্রী। আবার তন্ত্রের কথা এর ভিতর কেন আনিতেছেন? তন্ত্র ত সভ্য জাতির শাস্ত্র

তন্ত্র

নহে। তন্ত্রধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের নিকৃষ্ট ভাব মাত্র। চীন তিব্বত প্রভৃতি দেশের বিষয় ভাবিলে ইহা বোঝা যায়।

মু। সবটিই ভুল ধারণা। বেদ যেমন অনাদি, তন্ত্রও সেইরূপ অনাদি। বেদ ঈশ্বর লইয়া নির্ব্বাক, তন্ত্র 'ভক্তি' 'ভক্তি' রবে চীৎকার করিয়া উন্মাদিনী। বেদ পুরুষ, তন্ত্র নারী। অধঃপতিত তন্ত্রাচার দেখিয়া ভুল করিও না। এ বিষয় যতটুকু সম্ভব আমরা ক্রমে ক্রমে আলোচনা করিব। এখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি লইয়া আমরা মনের সামঞ্জস্যের বিষয় ভাবিব।

এই ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি সংযত ভাবে ভোগ করিবার জন্যই প্রথম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর

* কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী।

নিয়মাবলী পড়িলেই তুমি এই কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে। ব্রহ্মচারী সর্ব্বত্র থাকে না। এই অধঃপতিত সময়ে সেই জন্য পুষ্কর, কাশী, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, উচ্ছিক্ষেত্র, দ্রাবিড়, রামেশ্বর ও নেপাল প্রভৃতি স্থান ভিন্ন ব্রহ্মচারী হয় না—এ কথা শাস্ত্রের বাক্য। সেই climate (জলবায়ু) ও সংসর্গের কথা ভাব। প্রকৃতি ব্রহ্মচারীর এই সংযমের সাহায্য জন্য, যেখানে নিজে এই সংযমের সহায়ের জন্য বিরাট আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই স্থানেই ব্রাহ্মণ—বালকের ব্রহ্মচর্য্য-আয়োজনের বিধি। চক্ষু মুদ্রিত করিলে বা কর্ণের ভিতর আঙ্গুল পুরিয়া দিলে, নাক দুটাকে টিপিয়া ধরিলে বা উপস্থাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়কে লেংওটা দ্বারা চাপিয়া রাখিলে—মনের স্বাভাবিক শক্তি অর্থাৎ বিষয় গ্রহণের যে ঈশ্বরদত্ত প্রবৃত্তি তাহার উৎকর্ষ সাধন পক্ষে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। প্রত্যেক জিনিষের উৎকর্ষ (culture) চাই। আজকাল রক্ত মূত্র পূরীষ প্রভৃতির culture জন্য মহারথীগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আর কেবল মানসিক প্রবৃত্তিগুলির culture-এর বেলা নেংটী, কুম্ভক, মুদ্রা ইত্যাদির প্রাধান্য দিতে ব্যস্ত। ব্রাহ্মণ সবই রেখেছিলেন—তবে ধ্বংসের নামে তাঁহারা ভয় পাইতেন। কেননা সমস্ত সৃষ্টিটাতেই তাঁহারা আনন্দের বিষয় দেখিতেন। বুড়ী ধরেছিলেন—কে তাকে চোর করিবে বল। সেই অপূর্ব্ব শ্রুতিমন্ত্র মনে কর যে—"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বোর্গাবো ভবন্তু নঃ।" যে ব্রাহ্মণ এই শ্রুতিবাক্য ধরিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে কাজেই মনের প্রবৃত্তিনিরোধচেষ্টা অপ্রাকৃত ছিল—সে দিকে তাঁহারা ভাবিতেই অবসর পান নাই। এইটি বুঝিলেই আর্য-ধর্ম্ম কি ও ব্রাহ্মণ কেন ভূদেব তাহা বুঝিতে পারিবে।

ব্রহ্মচারী ও তার স্থান

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে ধ্বংস নাই

শ্রী। এ সব নূতন কথা বলিতেছেন। যোগশাস্ত্র একটা দর্শন। যোগের সংজ্ঞাই চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ। এই যোগ-সাধনের জন্যই হিন্দু জাতি এত পূজ্য।

মু। ক্রমে ক্রমে, বাপু। চিত্তবৃত্তিনিরোধ কেন দরকার হইল তাহাই আগে ভাবা প্রয়োজন। যাহার প্রয়োজন আছে তাহারই জন্য আয়োজন; যদি প্রয়োজন না থাকে, তবে কোন আয়োজনই চিন্তায় আসে না। এখন ভাব দেখি—সেই বেদবাক্য যাহাতে বলা হইয়াছে—ঈশ্বর যে প্রাণ বা জীবন দিয়াছেন তাহার উৎকর্ষণ সাধন আনন্দে জীবন কাটাইতে চেষ্টা কর—প্রাণের বিস্তার করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ কর, ইত্যাদি। এখন উৎকর্ষ সাধনের কি পথ—চিত্তবৃত্তি নিরোধ সেই পথ, না সামঞ্জস্য রাখিয়া চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন বা culture সেই পথ? এই দুটির মধ্যে কোনটি স্বাভাবিক ও কোনটি অস্বাভাবিক—তাহাই মানুষের বিবেচ্য। ভাবিয়া দেখ—মানুষ শুধু চিত্তবৃত্তি লইয়া সৃষ্ট নহে। তাহার শরীর আছে, মন আছে ও মনের অতীত একটা চৈতন্য শক্তি আছে। এই সবগুলি লইয়া একটি মানব। এখন যদি পাটা খোঁড়া করিয়া দাও—চক্ষুটা বন্ধ করিয়া দাও—কাণটায় মাটি পূরিয়া দাও—উপস্থটা কেটে দাও—তবে সেই মানুষটি ত অসম্পূর্ণ হইয়া গেল। শক্তির culture অভাবে সে ক্ষীণবল হইয়া পড়িল! কেমন করে সে বলবান হইবে—কেমন করে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" তত্ত্বকে গ্রহণ করিবে?

বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ ও নিরোধের পার্থক্য

শ্রী। কেন, শক্তির ত নাশ হইতেছে না—বাহ্য বিষয় হইতে অন্তর ও সূক্ষ্ম বিষয়ে যোগীর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইয়া থাকে—সেই রুদ্ধ শক্তি অজেয় হইয়া পড়ে।

মু। ঠিক তাই কি? বালককে যদি শারীরিক ব্যায়াম করা বন্ধ করিয়া দাও তবে তার যেমন culture না হওয়ার ফলে দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভাবী. তদ্রূপ মানসিক বৃত্তিগুলির culture না করিলে, মন দুর্ব্বল হইবে তাহার বিষয় আর তর্কের দরকার থাকে না। যে বৃত্তিগুলিকে বিধিমত culture করিয়া ব্রাহ্মণমানব প্রস্তুত হয়, সেই বৃত্তিকে বিষয়ের সাহায্যে পুষ্টি লাভ করিতে না দিলে যে মানব তৈরী হয়, তাহার সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এক সম্পূর্ণ শক্তিলাভে মহাবীর—অন্য তাহার বিপরীত আচরণে ক্ষীণবল। এক প্রাকৃতিক শক্তি-সঙ্ঘের ally—অন্য তাহার শত্রু। এক প্রকৃতিদেবীর বরাভয় লাভে স্বাধীন—অন্য তাঁহার অসি-মুণ্ডের অধিকারের গণ্ডীতে পতিত। কাজেই 'মুক্তি' মুক্তি, 'রক্ষা কর রক্ষা কর' ইত্যাদি আর্ত্তনাদ। মা মুণ্ডমালিনী— অসুরনাশিনী।

ব্রাহ্মণ ও অন্য সাধকে তফাৎ

শ্রী। যোগী প্রকৃতিকে উল্‌টে দিয়েছেন ও দিতে পারেন। আপনার কথিত ব্রাহ্মণ কি তা পারেন?

মু। বিশ্বামিত্র এ বিষয়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। তিনি যোগ ও তপস্যা প্রভাবে সৃষ্টি উল্‌টে দিয়াছিলেন। নূতন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আর ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ প্রকৃতির বরাভয় লাভে বিশ্বামিত্রের পক্ষে যম সদৃশ ছিলেন। বিশ্বামিত্র পরাজিত ও বহু চেষ্টায় শেষে ব্রাহ্মণ শক্তি লাভ করিয়া "গায়ত্রী মন্ত্র" উপলব্ধি করেন। এই একটা দৃষ্টান্তেই তুমি উভয় পথের তারতম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। কিন্তু সাবধান – "স্ববৃত্তিস্থ" "স্বধর্ম্ম" এই কথাগুলি ভুলিও না। এগুলি ছাড়িলে পুরাণ বা ইতিহাসের কোন তত্ত্বই তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে না—পরন্তু সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা আসিয়া পড়িবে।

শ্রী। ইদানীন্তন কালেও ত সমাধি-সম্পন্ন যোগীদের অসম্ভব ক্ষমতার কথা শোনা যায়। সে দিনও ধরুন—ভূ-কৈলাসের রাজবাড়ীতে সুন্দর বন হইতে যে সাধুকে আনা হয় তাহার বিষয় ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। সেই সাধু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ছিলেন—তাঁহার দেহ কাটা হয়, আগুণে পোড়ান হয়, তথাপি তাঁহার চেতনা দেহে আইসে নাই। শেষে নাকের নিকট "ক্লোরাফারম" ধরিলে তিনি চক্ষু মেলিয়া বলেন—"আমি তোমাদের কি করিয়াছিলাম।" এই বলিয়া তিনি শরীর রক্ষা করেন। কি অসম্ভব যোগশক্তি! ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ রণজিৎ সিংহের গুরু হরিদাস সাধুর অসম্ভব যোগশক্তির কথা কে না জানে? সেই সাধুকে বাক্সে পুরিয়া মাটির নীচে পুতিয়া দেওয়া হয়। সেই মাটীতে যবের চাষ করা হয়। ছয় মাস পরে মাটীর নিম্ন হইতে সাধুকে বাহির করা হয় ও দেখা যায় - তিনি জীবিত। কত সাধু মহাত্মা জলে ভাসেন—উড়ে যান—মনের কথা বলেন, সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করেন—যা ইচ্ছা তাই করিতে পারেন। আপনার ব্রাহ্মণ কি এ সব করিতে পারেন?

কৈলাশের সাধু ও হরিদাস সাধু

মু। ব্রাহ্মণ উক্তরূপ বিষয়ে কি করিয়াছেন তাহা বলিবার পূর্ব্বে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—বল দেখি ঐরূপ মানব সৃষ্টি ও সমাজ-অঙ্গের কি উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন?

শ্রী। কেন—মনুষ্যজীবনের যা শ্রেষ্ঠ জিনিষ তাহাই তাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন—মুক্তি-লাভ করিয়াছেন।

মু। ঐ আবার মুক্তির কথা আনিতেছ। মুক্তি কি তাহা ত এখন বুঝা যায় নাই। সেটা

ক্রমে আসিবে। ঐরূপ শ্রেষ্ঠত্ব-লাভ প্রাকৃতিক নিয়মে বাঞ্ছনীয় কিনা তাহাই ভাবিবার বিষয়।

সিদ্ধাই ও ব্রাহ্মণত্বে তফাৎ কি

ধর সকলেই যদি সুন্দর বনের সাধু হয় বা হরিদাস সাধু হয় তবে সৃষ্টির উপায়—সৃষ্টির উৎকর্ষের উপায় কি? বিশেষতঃ ঐ সাধুত্ব ব্যক্তিগত স্বার্থে নিবদ্ধ—বিশাল সৃষ্ট পদার্থের সহিত তার কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও চলে। ব্রাহ্মণ ঠিক তার বিপরীত। সৃষ্টির উন্নতি—সর্ব্বত্র সমত্ব—সর্বেন্দ্রিয়ের পূর্ণত্ব এবং তাহার ফলে যোগীশ্বরের মস্তকের মণি। তোমার উল্লিখিত অষ্ট-সিদ্ধি তাহার পদানত। বলে, 'আমাকে নাও' আমাকে নাও'—আর ব্রাহ্মণ চেয়েও দেখেন না। ব্রাহ্মণে ও যোগীতে এই পার্থক্য। এক শক্তি-জ্ঞানে বিভোর —অন্য শক্তিজ্ঞান-হীন। অথচ শক্তির উপর যে বীজশক্তি—তাহার অপ্রতিদ্বন্দী ঈশ্বর। তোমাকে এই অধঃপতিত কালেও আদিশূরের রাজসভার বিষয় চিন্তা করিতে বলি। কনৌজ-রাজ

আদিশূর ও পঞ্চব্রাহ্মণ

পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দেন। ব্রাহ্মণগণ নাগরী জুতা, ফতুয়া, উষ্ণীষ ও পত্নীসহ গো গাড়ীতে আদিশূরের সভায় উপস্থিত হয়েন। পান খাওয়া মুখ ও পত্নী সঙ্গে দেখে সভাসদ্‌গণ তাহাদেরে অবহেলা করেন। মহারাজার নিকট সংবাদ গেলে তিনিও দুঃখিত হয়েন। ব্রাহ্মণগণ অবহেলার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে আদিশূরের অবজ্ঞার ভাব আসিয়াছে। তখন তাঁহারা আশীর্ব্বাদকল্পে যে জল গণ্ডুষ :হস্তে ধরিয়াছিলেন তাহা একটা শুষ্ক কাষ্ঠে নিক্ষেপ করিয়া দেন। শুষ্ককাষ্ঠ বৃক্ষে সঞ্জীবিত হইয়া পড়িল দেখিয়া সভাসদ্‌গণ মহারাণীর নিকট সংবাদ দেন এবং রাণী স্বয়ং আসিয়া ব্রাহ্মণগণের অভ্যর্থনা করেন। ইহা ইতিহাসের কথা। কই এখানেও ত ব্রাহ্মণের সমাধি প্রভৃতি যোগবিভূতির কথা নাই। যোগ বিভূতি ত ব্রাহ্মণের

শব্দ-শক্তি

"সার্টিফিকেট" (certificate) ছিল না। ব্রাহ্মণের বাক্যই শক্তি— আকাশ পঞ্চভূতের শেষ ভূত—তারপর বা তাহা জড়বস্তুর অতীত— চৈতন্য রাজ্য। আবার এই আকাশে পঞ্চীকরণ নিয়মে অপর অধস্তন চারি তন্মাত্রার বীজ বর্ত্তমান। কাজেই শব্দ সম্রাট-তন্মাত্র—অন্যান্য ইন্দ্রিয় বিষয়ের কর্ত্তা। পরব্যোম কর্ত্তাকে নাচান আর অমনি "ননাদ ঢক্কাং নব পঞ্চবারং"—চৌদ্দ স্বররূপ সৃষ্টি আরম্ভ হয়। বৈষ্ণবের বিরজার এ পারে আকাশই শেষ বস্তু। ভূত জগতে বাক্য শক্তিই শেস শক্তি, তার উপর যাবার যো নাই। মধ্যে বিরজা নদী—a difficult gap—একটা বড় রকমের ফাঁক। মানবের যে বিভূতির কথা বলিলে তাহা সীমাবদ্ধ জিনিষ। 'ন হ্যাদি মধ্যান্তমজস্য যস্য, বিদ্মো বয়ং সর্ব্বগতস্য

ভগবান কি

ধাতুঃ। নচ স্বরূপং ন পরং স্বভাবং ন চৈব সারং পরমেশ্বরস্য॥ কলা মুহূর্ত্তাদিময়শ্চ কালো ন যদ্বিভূতে পরিণাম হেতু। অজন্মনাশস্য সমস্ত মূর্ত্তে রনামরূপস্য সনাতনস্য॥" যে ভগবানের আদি মধ্য বা অন্তের কোন খবর আমরা জানিনা, যিনি সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট এবং যিনি ধাতা, যাঁহার স্বরূপ, পরস্বভাব বা শক্তির বিষয় আমরা জানি না, কলা মুহূর্ত্ত বা কাল যাঁহার বিভূতির পরিমাণ করিতে অক্ষম, যাঁর জন্ম বা নাশ নাই, যিনি সর্ব্বস্বরূপ ও যাঁহাকে কোন নাম দিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না—সেই ভগবানের একটু অষ্টসিদ্ধি লইয়া তুমি বড়মানুষী দেখাবে, কি ভুল বল দেখি! ব্রাহ্মণ এত বোকা ছিল না। চুষী কাটি দেখাইয়া ছেলে ভোলান যায় বটে, কিন্তু মানুষ ভুলান যায় না। তাঁহারা উপহাস করিয়া বলিয়া উঠেন—

"অমন কত মণি পড়ে আছে আমার চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।"

শ্রী। তবে কি আপনি বলিতে চাহেন যোগ-সাধন ও বিভূত্যাদি অগ্রাহ্য করিতে হইবে। এত দর্শন, এত শাস্ত্র সব ভুলে যেতে হবে!

মু। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ঐরূপ কোন অবহেলা বা নিন্দার কথা নাই। আমরা ব্রাহ্মণ ও তাহার সাধনার পথের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই

প্রবন্ধে কাহারও নিন্দাবাদ নাই

যে—ব্রাহ্মণের সাধনার পথ তোমার কথিত মত যোগ-সাধন ছিল না। ঐরূপ সাধনার উৎপত্তি কখন কিরূপে হইল, তাহা পরে আলোচনা করিও। এখন মূল বিষয়ের আলোচনা করা যাক্।

বিষয় হইতে মনকে সংযত করিতে ব্রাহ্মণেয় কতকগুলি বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। তাহার মধ্যে কোথাও হঠযোগ সাধনার ব্যবস্থা নাই। ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ। আবার ইহাও বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা পালন করিয়া আচরণ

ব্রাহ্মণের সাধনপথ

করিতে হয়। সে সব কথা গ্রন্থাদিতে দেখিয়া লইও। এইরূপ বিধি-ব্যবস্থা মানিয়া চলিলে ক্রমে ক্রমে রজ ও তম ধর্ম্মের উপর সত্যের আধিপত্য স্থাপিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ তন্মাত্র গ্রহণে আর মনকে সত্ব ভাব হইতে বিচলিত করিতে পারে না। সত্বে প্রতিষ্ঠা হইলেই মন স্ব স্বভাবে বসিয়া পড়ে। চিত্ত-গগণে কি ভাসে—তাহা সেই ব্রাহ্মণই জানেন—তখন অভাব নাই—তার পূরণের রাজসিক চেষ্টা নাই—অথচ কাজের শেষ নাই। নারদ দেবর্ষি—অথচ তাঁর একটুও ছুটী নাই—বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইলেন তবুও রাম লক্ষণকে লইয়া তাড়কা নিধনে ব্যস্ত।

ব্রাহ্মণ ভূদেব

ঈশ্বরের কাজ নাই—অথচ তিনি সর্ব্বদা কর্ম্মে ব্যস্ত—। ব্রাহ্মণ সেই কর্ম্মময়ের প্রতিমূর্ত্তি। স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব। ব্রাহ্মণ ভূদেব।

বিনয়, পরিমল ও শ্রীশঙ্কর কুটির ছাড়িয়া আজ যাবার সময় বিশেষ কিছু ভাবিতে লাগিলেন।

পরি। ভাই! লোকটি মুক্তির কথায় চটে লাল। অথচ দেখ যদি মুক্তি না চাই, তবে এত সাধনা কেন করি—তা ত বুঝি না। এত সাধু এত পণ্ডিতের কথা শুনিয়া আসিতেছি, সকলেই মুক্তি মুক্তি করিয়া উন্মাদ—ইনি এত বড় কি জ্ঞানী যে, মুক্তিকে অগ্রাহ্য করিতে বলেন। মুক্তি নিঃশ্রেয়স—তাহা চায় না এ আবার একটা কথা! ত্রিতাপে জ্বলিয়া মানব অতিষ্ঠ—আর উনি ব্রাহ্মণ চাহেন।

বিনয়। আবার দেখ—পতঞ্জলি ঋষিও ওঁর ব্রাহ্মণ নহেন! অষ্টসিদ্ধি ওঁর কাছে নাচ-দুয়ারের জিনিষ। কি দাম্ভিক বল দেখি! নূতন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন। যে যোগ শক্তির বলে বাঘ ভালুক বশে আসে—সে শক্তি ওঁর কাছে নগণ্য!

শ্রী। মুক্তির চেষ্টা কিসের জন্য—বাঁধা থাকলে তাই খুলিতে চেষ্টা করা হয়। যদি বাঁধা না থাকে তবে খুলিবার বিষয় চিন্তার সম্পূর্ণ অস্তিত্বাভাব। সেই বাঁধনটাই দেহ ও তাহার বিষয়। দেহ থাকিলেই তার বিষয় সংসর্গ অনিবার্য্য। সৃষ্টিই বাহ্য ও অন্তর লইয়া গঠিত। একটি ছাড়িলে আর একটিও থাকে না। বাহ্য ত্যাগ করিলে কর্ম্মহীন জড়পিণ্ড—অথচ কর্ম্মই সৃষ্টির

মুক্তিকামী কে? ব্রাহ্মণ মুক্তিকামী কিনা?

উদ্দেশ্য। সাংখ্যের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিতাপ এই শরীর ও মন আর মনের বিষয় লইয়া। যদি শরীর ও মনের বিষয়গুলি কোন তাপ না দেয় অর্থাৎ বন্ধনের জ্বালা না দেয়, তবে মুক্তির

কথা আসে কি করে? প্রকৃতির বিষয়গুলি আয়ত্তাধীনে আসিলে—প্রকৃতির প্রত্যেক শক্তিগুলিকে পরম সখা করিতে পারিলে—ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা হইলে—পড়ে যাবার অর্থাৎ জন্ম জরা মরণের চিন্তার অভাব হইয়া পড়ে। অজের জন্ম মরণে যদি আনন্দ হয়—তাঁর জন্ম মরণ যদি লীলা খেলা হয়—আর যদি প্রকৃতি-লীলাকে আনন্দোচ্ছাস বল—তবে ভাই মুক্তির কথা কোথায় থাকে ভাব দেখি। ব্রাহ্মণ অজের প্রতিমূর্ত্তি—ব্রাহ্মণ ভূদেব—ব্রাহ্মণ শরীরধারী অজ—শাশ্বত। তাঁর ইচ্ছা ঈশ্বরেচ্ছা—তাঁর বাক্য ঈশ্বরবাক্য—তাঁর বাক্য সর্ব্বশক্তির বীজ—তাঁর আশীর্ব্বাদ বা তাঁর অভিশাপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ। তাই ব্রাহ্মণের স্থান এত উচ্চে—তাই হিন্দু ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ করে পাগল। ভগবান স্বয়ং ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"সত্বং যস্য প্রিয়ামূর্ত্তি ব্রাহ্মণাস্ত্বিষ্টদেবতাঃ।" ব্রাহ্মণ ভগবানেরও ইষ্টদেবতা। আর যে বাঘ ভালুক বশের কথা বলিলে—তাহা ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল না।

সিদ্ধাই ও শ্যামাকান্ত

শ্যামাকান্ত অনেক বাঘ বশ করিয়াছিলেন ইহা দেখিয়াছ – তিনি শারীরিক বল ও কৌশলে সে বশ্যতা আনিতেন। সিদ্ধাই শক্তিও সেই সার্কাস খেলা মাত্র। শ্যামাকান্ত শরীর নিয়ে করেছিলেন—আর সিদ্ধাই মনেরদ্বারা ঘটে। দুইই মোটা জিনিষ—স্থূল জগতের। চৈতন্যজগতের ঢের নিম্নে। বিরোধ-শক্তির অনুভূতি না হইলে তাহাকে বশে আনিবার কোন কৌশলের আয়োজন করিতে হয় না। প্রকৃতিবদ্ধ সৌহৃদ্য ব্রাহ্মণ কর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় মার্গভ্রষ্ট হবার চিন্তায় চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। আর্য্যগণ বাঘ ভালুককে ঘরের পোষা পশুগণের মত প্রতিপালন করিতেন। আশ্রমের বিবরণ পড়িলেই তাহা দেখিতে পাইবে।

পরি। আমি কিছুই বুঝিলাম না। ওরূপ ব্রাহ্মণ একটা কল্পনা মাত্র।

শ্রী। তুমি ভুল বুঝিতেছ। তোমার সবিকল্প বা নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ যেমন একটা Ideal—মায়াচ্ছেদ করিয়া "সোহং" যেমন একটা Ideal—মুক্তির পর নিত্যলীলা প্রভৃতি যেরূপ একটা Ideal, তদ্রূপ এই ব্রাহ্মণত্ব একটা Ideal। তফাৎ—পূর্ব্বোক্ত তিন পথ কেবল স্বার্থে আবদ্ধ, আমি ও তুমিতে নিবদ্ধ, চতুর্থটি সমষ্টি স্বার্থে নিবদ্ধ ও আমিত্বের সম্পূর্ণ তুমিত্বে পরিণতি। সে

ব্রাহ্মণে ও সমাধিপ্রাপ্ত যোগীতে তফাৎ

Ideal এখন আর দেখা যায় না—কেন না এখন ঘোর কলি কাল, আর সেই পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—সেই পুরাকালের অব্যভিচারিণী বৃত্তি-সংযুক্ত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ভূদেব ব্রাহ্মণও আর দেখা যায় না। তবে ব্রাহ্মণ নাই একথা বিশ্বাস করি না। ব্রাহ্মণ যে দিন একবারে যাবে সে দিন আর্য্য ধর্ম্ম—মানব ধর্ম্ম—একবারে লোপ পাবে। মানবও পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই বেদোক্ত ধর্ম্মপথ—সেই পথের শাখা প্রশাখাই তোমার সাম্প্রদায়িকতার মূল জানিবে।

বিনয়। আচ্ছা, তন্ত্রও ত ওঁর মতে অনাদি। তবে তন্ত্রের ব্যভিচারগুলিও ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি না কি?

শ্রী। তন্ত্রের কথা এখন আলোচনা হয় নাই। অবশ্য সে বিষয়ে কথা উঠিবে। তবে আমি এইটুকু বুঝিয়াছি যে বেদ যেমন ঈশ্বর লইয়া নির্ব্বাক—সতী স্ত্রী যেমন স্বামীর নাম মুখে আনে না—তন্ত্র তেমনি মা মা করে চীৎকার করিয়া উন্মাদিনী। তন্ত্র-তত্ত্ব গভীর—তুমি যা দেখছ তা অঙ্গ—তন্ত্রের অধঃপতিত চিত্র দেখিতেছ। তন্ত্রের পঞ্চমকার সাধন-পথ।

তন্ত্র ও তাহার অধঃপতন
গৌরাঙ্গ ধর্ম্ম প্রচার

তার বিকার ও অধঃপতন—নরকের সোজা পথ। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক ইতিহাস পড়িলে দেখিতে পাইবে—কি বিভৎস্য ব্যাপার চলিয়াছিল। পতিতোদ্ধারকল্পে সেই কাঙ্গাল একটা নূতন পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন—সে পথের ব্যবস্থা হইল—"বল হরিবোল—মাগুর মাছের ঝোল—যুবতীর কোল।" যখন দেখিল মধুর ভাবের সাধনা ভেসে যায়—এখন উপায়—তখন যুবতীর কোল ও হরিবোল এই ঔষধের ব্যবস্থা হইল। সেই স্রোত চলিতে চলিতে এখন কত ব্যভিচারই আসিয়া পড়িয়াছে। এখন তীক্ষ্ণধার অসিদ্বারা আবার পাষণ্ড দলন দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

বিনয়। সে দিকের বাতাসও যেন বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। কতদূর কি দাঁড়ায় দেখা যাক্।

শ্রী। আশা ভরসা খুব কম। আর্য্য-বংশধরগণ Powerful race ছিলেন। সে power প্রতিষ্ঠিত না হলে মানুষ তৈরী হয় না। মানুষ তৈরী না হলে কেবল দাস-আমি দাস আমি ভাবিতে ভাবিতে শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়। তেলাপোকাকে কাঁচপোকায় যখন ধরে সে তার ভয়ে কাঁচপোকা ভাবিতে ভাবিতে কাঁচপোকা হইয়া যায়। দাস-আমিও শেষে দাস বা শূদ্র হইয়া পড়ে। ভারতের অধঃপতনের ইতিহাস বুদ্ধির সহিত তত্ত্বানুসন্ধান-প্রবৃত্তি লইয়া পড়িলে দেখিতে পাইবে—এই দাস বা হীনবীর্য্য ভাব কি করে বঙ্গবাসীকে আজ হীনবীর্য্য জাতি করিয়া ফেলিয়াছে। এবং কি করে তাদের আলস্যপরায়ণ তাকিয়ার সহচর বৈষ্ণব-কীর্ত্তনের আদিরসে বিভোর করিয়াছে।

আর্য্যের শক্তি ও তাহার
মূল সূত্র

পরি। তবে কি তুমি বলিতে চাও শূদ্রের উন্নতি নাই?

শ্রী। আছে বৈ কি—শূদ্র-ধর্ম্ম প্রতিপালনে তার শূদ্র-পথে উন্নতি। কিন্তু সবাই শূদ্র হইলে তার পরিণামে সেই চতুরঙ্গ বর্ণাশ্রম-গঠিত অপূর্ব্ব শক্তি-সম্পন্ন জাতির ধ্বংস। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য আমি কাঙ্গাল—আমি দাস—আমি কৃপার্থী ইত্যাদি অশ্রদ্ধেয় কার্পণ্য-দোষে দুষ্ট ছিলেন না। ফলে অজেয় জাতি ও সমাজ প্রস্তুত হইয়াছিল। আমরা এক দিকে জাতীয়তার জন্য ছুটাছুটি করিতেছি—আর অন্য দিকে মনকে বলছি—আয় কৌপীন পরি—যুদ্ধের ভয়ে কাছা খুলে ছুটি—আয় সকলে কাঙ্গাল হয়ে যাই—আয় রাসলীলা করি—আয় গুহ্য সখী-সাধন বা কান্তা-সাধন করি। বলি শ্রীকৃষ্ণ যদি ঈশ্বরাবতার ব্রহ্মই হয়েন। তবে তাঁর কাঙ্গাল ভাব বা রাসলীলাটাই কি পূর্ণত্ব। আর তাঁর অপ্রতিদ্বন্দী যুদ্ধশক্তি—অদ্বিতীয় জ্ঞানশক্তি—অতুল্য কর্ম্মশক্তি—এগুলো কিছু নয়? কি ভুল! এই rickety মানুষ লইয়া কি ষোল হাজার গোপিনীর মনস্তুষ্টি করা সম্ভব! একটা গোপিনীকে সঙ্গে নিতে যে মানুষ ভীত ত্রস্ত ও সন্ন্যাস-রোগ-গ্রস্ত—তার সাধ্য কি রাসলীলা! কাজেই রাসের নামে তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। যে ব্রাহ্মণের নিত্যপাঠ মন্ত্র—"ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতি ভৃগোঃ পরিকীর্ত্তনেন—বীর্য্যং বিবর্দ্ধতি বশিষ্ঠ নমো ন তেন—সংগ্রামজিৎভবতি চৈব রঘুং নমস্য," সে ব্রাহ্মণ যদি ভাবে আমি দাস—আমি কাঙ্গাল—তবে তাহার অধঃপতন কতদূর তাহা ভাবিয়া দেখ।

জাতির অধঃপতনের কারণ

বিনয়। পার্থ সারথিকে এখন সম্মুখে রাখিয়া চলিবার কথাও বলা হইতেছে।

শ্রী। কিছু আশাপ্রদ বটে। প্রাতে, দিবসে ও সন্ধ্যায় স্ত্রী সংসর্গ যেরূপ প্রাণহানিকর বিষ

—তদ্রূপ জীবনের দিবাভাগে অর্থাৎ তম ও রজ এমন কি সত্বস্থিত হইয়াও—রাসলীলা লইয়া নাড়াচাড়া করিলে বিষ সেবনে মৃত্যু অনিবার্য্য। ওরে ভাই! রাসলীলা বলছে কে—আর শুন্‌ছে কে—তাই ভাব না! বলেছেন শুকদেব গোস্বামী—যাঁর স্ত্রীপুরুষ জ্ঞান নাই, আর শ্রোতা কে না—পরীক্ষিৎ রাজা, যিনি মৃত্যুর কবলে। একটা machine gun তোর বুকের উপর ধরে থাকলে তুই কি ইতর চিন্তা আর করিতে অবসর পাস! সহজাত প্রবল ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মার্থে প্রয়োগের উৎসাহ পাইলে মানুষের মন আপনা হইতে ছুটিয়া যায়। মনে হয়—বড় ভালগো বড় ভাল। যেমন গাঁজা খোর—

অসময়ের ও অনধিকারীর ধর্ম্মচর্চ্চার কুফল

যদি কেহ তাকে বলে—ওরে গাঁজা খেলে স্বর্গে যাওয়া যায়—গাঁজা শুদ্ধ করে খাবি আয়। আর যাবে কোথা—অমনি ছুটিয়া গাঁজা শুদ্ধিকরণ সেবন—মস্তকঘূর্ণন ও পতন। সেইরূপ আদিরসে ধর্ম্মের ছোপ লাগাইলে লোক আপনা হতেই দলে দলে ছুটে যায়। "যুবতীর কোল—মাগুর মাছের ঝোল" বড় রুচিকর। তাই 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত" আজ ভারতের ধর্ম্মরাজ্যে একছত্র রাজা—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত আজ কেন একছত্র রাজা

"We force our roses before their season
To bloom & blossom for us to wear ;
And there we wonder and ask the reason
Why perfect buds are so few & rare."

'গুপ্তে রাখিহ—কাহাঁ না করিও প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস॥" (চৈঃ চঃ)

যাইবে দক্ষিণে—থাকিবি পশ্চিমে—
বলিবি পূরব মুখে—
গোপন সে রীতি—গোপনে রাখিবি—
থাকবি মনের সুখে॥ (চণ্ডীদাস)

—কৃষ্ণপ্রেম ঢাক বাঁজাইয়া বিলাইবার জিনিষ নহে।

(ক্রমশঃ)

মহাত্মা গান্ধী ও ভারতের স্বরাজ (২)

শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

এই প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশ সমাপ্ত হওয়ার পর মহাত্মা গান্ধীর "Substance not shadow" (সারবস্তু চাহি, ছায়া নহে) প্রবন্ধটি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহা পড়িয়া আমরা একটু আশান্বিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন"—কংগ্রেসের কার্য্যকারিণী সমিতিতে আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, যদি সকল সম্প্রদায় একমত না হয় তবে গোল টেবিলদ্বারা স্বরাজ প্রাপ্তির আশা বৃথা। অতএব কংগ্রেসের কর্ত্তব্য, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের হিতকামী কর্ম্মিগণ কংগ্রেসকে যেন নিজের মনে করেন, তেমন ব্যবস্থার দ্বারা কংগ্রেসকে সুদৃঢ় করা। যতদিন তাহা না করা হয় ততদিন বিলাতের গোল টেবিলে যোগ না দেওয়াই ভাল। সেখানে না গেলে বুঝা যাইবে যে আমরা একমত হই নাই। একমত না হইতে পারিলে বুঝা উচিত স্বরাজ দাবী করিবার শক্তিও আমাদের হয় নাই। পূর্ণ স্বরাজ বলিতে আমরা কি বুঝি এবং কি চাহি তাহাই দেখিতে হইবে। স্বরাজের তাৎপর্য্য যদি এই হয় যে জনসাধারণের মধ্যে এমন জ্ঞান ও শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে যদ্বারা তাহারা নিজের স্বার্থ বুঝে, এবং তৎসংরক্ষণের জন্য সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান হইতে পারে এবং যদি তদ্বারাই সকলের মধ্যে সম্প্রীতি, বাহিরের ও অন্তরের বিদ্রোহ হইতে মুক্তি ও আর্থিক অবস্থার ক্রমোন্নতি চাহি, তা'হলে রাষ্ট্রীয় শক্তি হাতে না পাইলেও রাজপুরুষদের সঙ্গে এমন ভাবে কাজ করিতে পারি যাহাতে আমাদের লক্ষ্য সুসিদ্ধ হয়। বাহ্যিক কৃত্রিম ঘটা দেখাইয়া স্বরাজ কাড়িয়া আনিবার চেষ্টা নিরর্থক।"

এই সন্ধিক্ষণে এমন নির্ঘাত সত্য কথা মহাত্মা ব্যতীত আর কে বলিতে পারেন? যে জন্য আমাদের এত মর্ম্মন্তুদ বেদনা, মহাত্মাজির অন্তরেও তাহার আঘাত লাগিয়াছে। ভারতবর্ষ যে স্বরাজ লাভের জন্য প্রস্তুত হয় নাই তাহা তিনি বুঝিয়াছেন, এবং তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তাই বলিয়াছি যে একটু আশান্বিত হইয়াছি। মহাত্মাজির প্রাণ যে সত্যমূলক কাজ চাহে তাহার আভাস পাওয়া গেল, হয়ত একদিন তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে। কিন্তু আনন্দে উৎফুল্ল হইতে পারি নাই। কারণ, কংগ্রেসের কার্য্যকারিণী সমিতি এখনও তজ্জন্য প্রস্তুত নহেন, মহাত্মাজির বর্ণিত 'বাহ্যিক কৃত্রিম ঘটার' মোহ কাটাইয়া যথার্থ কাজ করিবার লোক যে বিরল। সর্ব্বোপরি দুর্ভাগ্যের বিষয় মহাত্মাজির পদস্খলন। ১৯২৪ ইংরাজী সনে ইয়ারেয়েদা ভবন হইতে বাহির হওয়ার পর তিনি দুইটি ঘোষণা করিয়াছিলেন,—(১ম) তাঁহার অন্তর্দেবতার নির্দ্দেশ অতিক্রম করিবেন না, নেতৃপদে অধিষ্ঠিত যে ব্যক্তি তেমন করেন তাঁহার হাতে দেশ প্রবল ঝটিকার মধ্যে নঙ্গরহীন অর্ণব-পোতের ন্যায় বিপন্ন হয়। (২য়)—অগ্নিপরীক্ষার দ্বারা তাঁহার সহকর্ম্মী নির্ব্বাচন করিবেন। কার্য্যকালে ইহার কোনটাই তিনি রক্ষা করিলেন না। স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহেরু প্রভৃতির মমতায় আকৃষ্ট হইয়া কংগ্রেস সম্বন্ধীয় ব্যাপারের খাস খাস মোক্তারনামা উঁহাদের দিয়া বসিলেন। তখনই আমরা বলিয়াছিলাম তাঁহার জীবনে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ভুল হইল। ফলে নিজের সর্ব্বস্ব

হাতে লইয়া তাঁহার আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন এমন বহু একনিষ্ঠ কর্ম্মী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। সেই সময় হইতে কংগ্রেস একটা ক্ষুদ্র দলের ক্রীড়াপুতুল হইয়াছে। দেশের প্রতিহাজার লোকের মধ্যে গড়ে একজনের ইহার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি আছে কি না সন্দেহ। মহাত্মাজির সংশ্রব না থাকিলে এই কংগ্রেসের অস্তিত্বই থাকিত না। এক্ষণে অর্থবলে সংবাদপত্র প্রচার এবং সভা-সমিতি করিয়া—মহাত্মাজি যাহাকে বাহ্যিক কৃত্রিম ঘটা বলিয়াছেন যথাসম্ভব—তাহাই করা হইতেছে। এবারও তিনি সেই কৃত্রিম আবরণ দূর করিয়া সারবস্তুর সন্ধান করিতে চাহিলে কংগ্রেস কমিটীর সদস্যেরা তাঁহাকে বাধা দিয়াছেন, তিনিও 'তথাস্তু' করিয়াছেন। তাঁহার অজুহাত—'আমার গণতান্ত্রিক প্রকৃতিই আমাকে আমার মতের ঘোর বিরুদ্ধে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে বাধ্য করিয়াছে।' এই স্থলে জিজ্ঞাস্য, ইহা কি তাঁহার অন্তর্দেবতার নির্দ্দেশ অতিক্রম ও সত্যচ্যুতি নহে? আত্মদেবতা বড়, না ভ্রমাত্মক গণতন্ত্র বড়? গণতন্ত্রকে সত্যনিষ্ঠ করিতে হইবে, না সত্যাগ্রহী গণতন্ত্রের হাতে আত্মসমর্পণ করিবেন? বিপথগামীকে সৎপথে আনিবার ইহাই কি প্রকৃষ্ট উপায়? এই সব গুরুতর প্রশ্নের বিচার পাঠকগণই করুন, আমরা আপাততঃ তাহাতে প্রবৃত্ত না হইয়া এইমাত্র বলিতে চাহি যে মহাত্মাজি যদি অবিচলিত থাকিতেন তবে ১৯২৪ সনে স্বর্গগত চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি একদিন না হয় দু'দিন পরে নিজেদের ভ্রম বুঝিয়া অবশ্যই ফিরিতেন, এবং আজ ভারতবর্ষকে স্বরাজের পথে অনেকদূর অগ্রসর দেখিতাম। এবারও তিনি যে ভাবে দেশকে প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, গোল টেবিলে যোগ দেওয়ার পরিবর্ত্তে অবিলম্বে সেইভাবে কার্য্যারম্ভ করিলে সত্যই আমাদের স্বরাজ দ্রুতগতিতে আসিয়া পড়িত। আমাদের মনে হয় ভারতের কুগ্রহ এখনো দূর হয় নাই। নতুবা মহাত্মাজির মতন এতবড় শক্তিশালী মহাপুরুষের এইরূপ পুনঃ পুনঃ পদস্খলন ঘটিতেছে কেন?

সে যাহৌক্ কংগ্রেস এখনও দেশের সকল সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হইতে পারে নাই এবং সকল সম্প্রদায়ের আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্যে পরিপুষ্ট নহে, ইহা স্বীকার করিয়া মহাত্মাজি যে কংগ্রেস নেতৃগণের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়কে কংগ্রেসভুক্ত করতঃ তাহাকে সুদৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, ইহাতেই আমরা আশান্বিত হইয়াছি। কংগ্রেসকে দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রথম ও প্রধান উপায় ছিন্নভিন্ন হিন্দুসমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। মুসলমানেরা সঙ্ঘবদ্ধ আছেন। হিন্দুসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ঐক্যবন্ধন অত্যল্প ক্ষণেই হইয়া যাইবে। হিন্দু-মুসলমান একতাবদ্ধ হইলে ভারতের স্বরাজ আসিতে বেশী ক্ষণ লাগিবে না। স্বরাজের অন্তরায় সম্বন্ধে মহাত্মাজি বলিতেছেন, জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত স্বার্থজ্ঞানের এবং স্বার্থসংরক্ষণে শক্তির অভাব, পরস্পরে মনোমালিন্য, বহিঃশত্রুর ও অন্তঃশত্রুর আক্রমণ এবং লোকের আর্থিক দুরবস্থা। মানবের প্রকৃত স্বার্থ কি? ভারতবাসী প্রজাসাধারণ সেই স্বার্থবুদ্ধি ও তৎসংরক্ষণশক্তি কিরূপে হারাইয়াছে, পরস্পরে সম্প্রীতিই বা নাই কেন, শত্রুরা কোন্ সূত্রে আসিল, দৈন্য দুঃখে দেশ কেন ডুবিল, এই সমস্তের মূল কারণ জানিতে না পারিলে জনসাধারণ আত্মশক্তি পুনরায়ত্তের উপায় কিরূপে নির্দ্ধারণ করিবে? দ্বিতীয় কথা—প্রজাসাধারণের ভিতরে আত্মশক্তি জাগ্রত করিবেন কে? যিনি সেই কার্য্যে ব্রতী হইবেন তাঁহারই যদি আত্মানাত্মজ্ঞান না জন্মিয়া থাকে, সারা জীবন কাটাইয়া অবশেষে বলিতে বাধ্য হন,—"আমি অন্ধ

হইয়া অন্ধদেরে পরিচালন করিতেছিলাম,—তখন উপায় কি হইবে? তৃতীয় কথা—পাশ্চাত্য নীতি অনুসারে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে তাহা কি বিশুদ্ধ? কয়েক বৎসর পরে পরে ভোটদানের অধিকার লাভই কি প্রকৃত স্বরাজ লাভ? জনসাধারণের ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত ব্রিটিশ মন্ত্রিবর্গ জনসাধারণের অধিকার খর্ব্ব করিবার জন্য কি ১০ বৎসরে ২৫০০০ পঁচিশ হাজার আইন পাশ করেন নাই? পরন্তু ভোট সংগ্রহের নীতি কোথাও যে সত্য-মূলক এসংবাদ আমরা পাই নাই। সর্ব্বত্রই দেখিতেছি অর্থবলে এবং নানা কলুষিত উপায়েই ভোট সংগৃহীত হয়। যাহার মূলে ভুল, তাহা কি কখনো প্রকৃত মঙ্গলবিধান করিতে পারে?

'স্বরাজ' শব্দটি রাজনীতিতে প্রথম ব্যবহার করিয়াছেন, আমাদের স্মরণ হয় মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক। 'স্বরাজ', 'স্বারাজ্যসিদ্ধি' প্রভৃতি যোগশাস্ত্রের কথা। দেবাদিদেব শিব প্রাগুক্ত যে ভাবে সাধনা করিয়া পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিয়াছেন, বৈষয়িক স্বরাজই হউক, আধ্যাত্মিক স্বরাজই হউক, স্বরাজকামী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই ভাবে সাধনা করিতে হইবে। মুখ্য কার্য্য স্বীয় শক্তির সাধনা, পরকীয় শক্তির নহে। স্বধর্মই তাহার মূল ভিত্তি। মহাত্মা গান্ধী জাতির বৈষয়িক স্বরাজলাভ সম্বন্ধে প্রকৃত স্বার্থবোধ ও আত্মসংরক্ষণ শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশদভাবে বুঝিবার জন্য আমরা আধ্যাত্মিক সাধনার দু'একটি কথা বলিব। স্ব—জীবাত্মা, অর্থ প্রয়োজন। জীবাত্মার প্রকৃত প্রয়োজন পরমাত্মার সহিত সংযোগ লাভ অর্থাৎ বিশুদ্ধ স্বাধীন পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি। জীবের আত্ম-সংরক্ষণের শক্তির অভাব কখন হয়? যখন আত্মা ধর্ম্ম ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়াদির মোহে আচ্ছন্ন হয়, তখন মনবুদ্ধি অহঙ্কারাদি অন্তঃশত্রুরূপে, কামাদি বহিঃ শত্রুরূপে, অনাত্ম দেহকে নির্য্যাতিত করে। উহাদের সংঘর্ষে আত্মার দৈন্য উপস্থিত হয়। দীন আত্মা দীন দেহই লাভ করে,—পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে না—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। যেমন ব্যক্তির তেমনই জাতির। জাতির প্রকৃত স্বার্থ আত্মস্থ থাকিয়া পূর্ণ স্বরাজলাভ। যে দিন হইতে জাতির শক্তিশালী লোকেরা আত্মবৈশিষ্ট্য ভুলিয়া ভোগলালসায় মগ্ন হইয়াছেন সেই দিন হইতে জাতি শক্তিহীন হইতে আরম্ভ করিয়াছে, আর এইক্ষণ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র বিপন্ন, বহিঃশত্রুকে বাধা দেওয়ার বা অন্তঃশত্রুকে বশে রাখার শক্তি নাই। শক্তিহীনদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা অন্তর্দাহ মনোমালিন্য প্রভৃতি যেমন ঘটিবার তেমনই ঘটিতেছে। সুতরাং অপরেরা আসিয়া যে যেরূপে পারে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে। আমরা দীনাতিদীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া প্রথমতঃ জগদ্বাসীর নিকট হেয় হইতেছি, তৎপর মৃত্যুর গ্রাসে আত্মাহুতি দিতেছি।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ যেমন ভারতের বহুল ক্ষতি করিয়াছে, পাশ্চাত্যের ডেমক্রেসী বা শোভিয়েটিজমের অনুকরণে যাঁহারা ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারাও অধঃপাতের আর এক স্তর কাটিবেন। তদ্দ্বারা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে তাঁহারা প্রকৃত আত্ম-চৈতন্যের উদ্বোধন করিতে পারিবেন না। বাহ্যিক আপাতমনোরম কৃত্রিম ঘটা জমাইয়া হয়ত কতকগুলি লোককে বিচলিত ও বিপথগামী করিবেন, ফলে দেশ অধিকতর বিপন্ন হইবে। মদ গাঁজা প্রভৃতি ত ভয়ঙ্কর নেশা, চা কিম্বা বিড়ি সিগারেটের সামান্য নেশাও যে একবার ধরিয়াছে নিজের নানারূপ ক্ষতিকর জানিয়াও সে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। তেমনই পাশ্চাত্য সভ্যতা, ডেমক্রেসী শোভিয়েটিজম্ প্রভৃতির ভয়ঙ্কর নেশা যাঁহাদের ভিতর একবার প্রবেশ করিয়াছে

তাঁহাদের পক্ষে উহার মোহত্যাগ একরূপ অসম্ভব। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির মোহ হইতে মনের মোহই যে অধিকতর প্রবল। এই জন্যই বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতৃগণ পাশ্চাত্য-নীতি ত্যাগ করিয়া ভারতের আত্মনীতি অনুসারে চলিতে পারেন না। ভারতের স্বরাজ আন্দোলনও তাই এত ঘুরপাক খাইতেছে। ভারতের জনসাধারণকে যাঁহারা আত্মচৈতন্যদানে প্রবুদ্ধ করিতে চাহেন সর্ব্বাগ্রে তাঁহারাই আত্মসাধনায় সুসিদ্ধ হউন। স্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্যান্ সাধয়েৎ ? এক অন্ধ কখনো অপর অন্ধকে চালাইতে পারে না। আমাদের এক পদস্থ বন্ধুকে সাপে কাটিয়াছিল, প্রায় ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দেশীয় প্রথামতে চিকিৎসা চলে, মৃত্যুর কোন আশঙ্কা ছিল না, তৎপর এক বড় ডাক্তার আসিয়া ষ্ট্রীকনিয়ার ইন্‌জেক্‌সন দিলেন। তাহাতেই বন্ধুটি অল্পক্ষণের মধ্যে মারা যান। তেমনই ভারতবাসীর প্রাণবল এখনও যেটুকু আছে তাহার উপর ঐ ভাবে পাশ্চাত্য হলাহল প্রয়োগ দ্বারা যেন তাহাকে নিঃশেষ করা না হয় তাহাই সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে। শোভিয়েটিজম্ পাশ্চাত্য জগতের পক্ষে মঙ্গলকর হইতে পারে, আমাদের পক্ষে হলাহল। কেউটে সাপের বিষ তাহার প্রাণবল, কিন্তু মানুষের সাংঘাতিক প্রাণনাশক।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজশক্তি স্বতন্ত্র ছিল। জনসাধারণের পূর্ণ স্বরাজের যে লক্ষণ মহাত্মাজি বলিতেছেন আমাদের সমাজের তাহাই ছিল। এজন্য রাষ্ট্রশক্তির অধঃপাত ঘটিলেও সমাজের আত্মসংরক্ষণে ও উন্নতিসাধনে বাধা পড়ে নাই। মহাত্মাজি এইক্ষণ রাষ্ট্রশক্তি হাতে না পাইলেও জনসাধারণকে জাগ্রত করিয়া যে পূর্ণ স্বরাজ আয়ত্ত করিবার কথা কহিতেছেন, আমাদের মনে হয় সম্ভবতঃ সেই প্রাচীন সমাজ-শক্তির কথাই তাঁহার মনে পড়িয়াছে। অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন একদিকে রাষ্ট্রশক্তির, অন্যদিকে সমাজ শক্তির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে নানা বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। এইক্ষণ রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজশক্তি কোনটিকেই উদ্বেলিত না করিয়া সমাজশক্তির উদ্বোধনই যদি আরম্ভ করেন তবে ভারতের স্বরাজ যে অতি দ্রুতগতিতে প্রত্যাগমন করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কংগ্রেস অফিস হইতে তাহার ব্যবস্থা-নির্দ্ধারণ ও সমাজের সংশ্রবহীন কংগ্রেস নেতৃগণকে কর্ম্মকর্ত্তা মনোনীত করিতে থাকিলে 'হোয়াইট হল হইতে ভারত' শাসনের প্রণালী উদ্ভাবন এবং বিলাতী ষ্টীল ফ্রেমের উপর তৎসমস্তের পরিচালন কার্য্য করার মতন সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও বিপরীত ফলপ্রদই হইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসাধারণ যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, যাহাতে সকলে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ থাকে তেমন বিশুদ্ধ জাতীয় ব্যবস্থা করিতে হইলে নেতৃগণকে সর্ব্বাগ্রে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে হইবে। ধর্ম্ম বলিতে হিন্দুরা কি বুঝেন পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। আধ্যাত্মিক সাধনা হইতে নিত্য নৈমিত্তিক উৎসব, আহার-বিহারের নিয়ম, পারিবারিক যাবতীয় প্রথা পর্য্যন্ত সমস্তই হিন্দুর ধর্ম্ম। যাঁহারা তৎসমস্ত বিশুদ্ধ ভাবে প্রতিপালন করেন সমাজ তাঁহাদেরই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বলে, এবং তাঁহাদের অনুসরণ করে। তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে স্বীয় পল্লীভবনে গিয়া কৌলিক প্রথানুযায়ী যাবতীয় কার্য্য সুসম্পাদন করা। তদপেক্ষা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের ও সকলকে সন্তুষ্ট রাখিবার বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠকর উপায় আর কিছু আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যে পথ দিয়া আমাদের সমাজ-স্বরাজ চলিয়া গিয়াছে সেই পথ ধরিয়াই তাহার সন্ধান করিতে হইবে, তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে—নান্যঃ পন্থাঃ। তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

এই জন্যই আমরা পুনঃ পুনঃ নেতৃগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, সর্ব্বাগ্রে সমাজকে আত্মস্থ ও সুব্যবস্থিত করুন। সমাজ সুস্থ হইলে নিজেদের ভিতর মনোমালিন্য থাকিবে না, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইবে, রাষ্ট্রশক্তি তাহার নিকট অবনত হইয়া পড়িবে, রাষ্ট্রীয় কঠোর বন্ধনও তখন বর্ষান্তে শিলাগাত্রের শুষ্ক শৈবালবৎ খসিয়া পড়িবে।

দরিদ্রনারায়ণের সেবা, দরিদ্রনারায়ণের স্বরাজ ইত্যাদি :কথা ইদানীং নেতৃগণের মুখে খুব বেশী বেশী শুনিতেছি। দরিদ্রনারায়ণদের সেবা যতরূপে পারেন করুন। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া দিয়া পরস্পরের মধ্যে বিরোধ-সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই ত দেখিতে পাই না। তাঁহারা দেখাইতে চাহেন যে এদেশের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই নিম্নশ্রেণীর লোকদের দুর্গতির কারণ; উঁহারাই ইহাদের চাপিয়া রাখিয়াছেন, ইহাদের খাটাইয়া নিষ্পেষিত করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেন। নতুবা ইহারাও বড় বড় জমিদার, হাকিম, উকিল, ব্যরিষ্টার প্রভৃতি হইতে পারিত। নিম্নশ্রেণীর কৃষক ও শ্রমজীবী প্রভৃতির নাম করিতেই নেতৃগণের অন্তর যেন করুণায় গলিয়া যায়—('নিম্ন শ্রেণী' বলিয়াও বোধ হয় তাঁহাদের কাছে মহাপাপ করিতেছি), আর উচ্চ শ্রেণীর দিকে তাকাইতে তাঁহাদের অন্তর রোষে ঘৃণায় উদ্বেজিত হইয়া উঠে! নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই যেন দেশের সর্ব্বস্ব, উচ্চশ্রেণীর লোকেরা দেশের ও জাতির কিছুই নহে, শত্রু বা আবর্জ্জনা বিশেষ, এই মুহূর্ত্তে উহাদের তাড়াইতে পারিলেই যেন দেশ রক্ষা পায়। এইরূপ উত্তেজনার ফলে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে কি নৃশংস মূর্ত্তি ধরিতেছে গত বৎসর মৈমনসিং অঞ্চলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পদস্থ সঙ্গতিশালী লোকের মূর্খ অকর্ম্মণ্য পুত্রকেও যদি কেহ ক্রমাগত বুঝাইতে থাকেন,—'তোর পিতা তোকে আদর করেন না, তিনি তোর উন্নতির চেষ্টা করেন নাই, তাঁর অনাদর ও তাচ্ছিল্যেই তোর এই দুর্গতি'—হতভাগ্য পুত্রের তেমন ধারণা করিয়া লইতেও বিলম্ব হয় না, অমনি সে পিতার সোণার সংসারে আগুণ দিতে আরম্ভ করে, এমন কি পিতাকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

ঐ শ্রেণীর নেতারা দরিদ্রদের জন্য কখন কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাহা জানি না, অনেকের বাড়ীতে যে দরিদ্রলোকদের প্রবেশেরই অধিকার নাই তাহা জানি, অনেক নেতা যে দরিদ্রদের ভিটায় পুকুর দিয়া নিজেদেরে নেতৃত্বের সোপান গড়েন তাহাও জানি। সেই সব কাহিনী প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, ভারতের উচ্চ শ্রেণী রক্ষার কি কোন প্রয়োজন নাই? ভারতের উচ্চ শ্রেণী বলিতে ধনী জমিদার বা ব্যবসায়ী বুঝায় না, সে সব ব্যক্তিগত সাধনার ফল। ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার যে কোন শ্রেণীর লোকই হইতে পারেন, এবং হইতেছেন। যে পুরুষ পরম্পরাগত সাধনার ফলে উচ্চকুলে জন্মলাভ ঘটে তাহা সকলের পক্ষে সুলভ নহে। যুগযুগান্তের সাধনার বলেই হিন্দুসমাজের উচ্চ শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাই সত্য দয়া ক্ষমা এবং গুরুজনে ও দেবদ্বিজে ভক্তি, গো-সেবা, অতিথি সেবা, ত্যাগ, সংযম, পরোপকার প্রভৃতির উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তদ্দ্বারা সমস্ত নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও নানারূপে উপকৃত। তাহার উচ্ছেদই কি বাঞ্ছনীয়? উচ্চ শ্রেণী না থাকিলে এই সমস্ত নেতার উদ্ভব কোথায় হইত? উচ্চ শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষদের চিরাগত উচ্চ আদর্শের ধারা রক্ষায় অসমর্থ হইয়া নানা ব্যভিচারে লিপ্ত, সমাজ ধ্বংসের ও জাতির অধঃপাতের কারণ, তাঁহারাই এইক্ষণে উচ্চ বর্ণের বিদ্রোহী, তাঁহারাই

বর্ণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণ সমূহকে উত্তেজিত করিতেছেন। ‘ইংরাজেরা এদেশে তাঁহাদের রাজত্বের ভিত্তি পত্তনের সময় হইতে দেড়শত বৎসর পর্য্যন্ত এই উচ্চ শ্রেণী হইতেই সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের শাসনযন্ত্রের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আর আজ বিকট সাম্য-নীতির ধূয়া ধরিয়া তাঁহারাও ইহার মূলোচ্ছেদের সহায় হইয়াছেন। তাঁহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যখন যে নীতি উপযোগী হইবে মনে করেন তখন তাহারই অবলম্বন, তাঁহাদের পক্ষে রাজনীতির হিসাবে নিন্দনীয় না হইতে পারে, কিন্তু এদেশের উচ্চশ্রেণীরাই যাঁহারা দেশের নেতৃত্ব করিতে ব্যস্ত, তাঁহাদের পক্ষে স্ব-শ্রেণীর প্রতি এইরূপ বিদ্বেষবুদ্ধি কি নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে? বিধাতার কি ভয়ঙ্কর অভিশাপ! অথবা বলিব—সূক্ষ্ম বিচার—উচ্চ শ্রেণীর নেতৃগণের পাপের দণ্ড। ভারতের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা আজ কতরূপে বিপন্ন, কয়জন তাহা চিন্তা করেন? কিছুদিন পূর্ব্বে একটি সরল প্রাণ শ্রমজীবী বলিল,—‘বাবু, আমি দেখ্‌ছি আমরা ভাল আছি, আপনাদেরই বিপদ্‌। আমাদের চাষ বাস আছে, কুলিগিরি আছে, নৌকা-সাম্পানের মাঝিগিরি আছে, জাহাজের খালাসীগিরি আছে, ছুতার মিস্ত্রির ও রাজের কাজ আছে,—যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে গিয়া ভাত কাপড় যোগাড় করতে পারি। আপনাদের কলমের পেশা না থাক্‌লেই ত আপনারা মাটী।’—কথাটি যে কত সত্য, জানি না দরিদ্রনারায়ণদের কয়জন ভক্ত তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন। হিন্দু প্রথানুসারে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর ব্যবসায়ে হাত দিতে পারিত না, মুসলমান সম্রাটেরাও তাহাই যথাযথ রক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরাজের নীতি সে বাধা উঠাইয়া দিয়াছে, সুতরাং যত নিম্নশ্রেণীর দিকে যাওয়া যায় ততই সেই শ্রেণীর লোকেরা যে কোন ব্যবসায়ে হাত দিতে পারে।*

যে দু’একটি ‘কলমের পেশা’ ছাড়া ইদানীং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের গত্যন্তর নাই, রাজপুরুষেরা তাহাও তাঁহাদের সাময়িক নীতির চাল অনুসারে অনেক স্থলে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদেরে ভাগবাটোয়ারা করিয়া দিতেছেন। এইক্ষণে উচ্চ শ্রেণীরলোকদের গতি কি হইবে তাহা দেখিবার ও তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিবার কেহই নাই। পাশ্চাত্য নীতির সেবকেরা হয়ত বলিবেন—উচ্চ বলিয়া কাহারো থাকিবার প্রয়োজন নাই, সকলেই সমান হোক্‌। শাসক ও সংস্কারকের দল যেভাবে অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে আমাদের সকলেরই সমান হওয়ার বড় বেশী বাকি নাই, কিন্তু কোথায় গিয়া সমান হইতেছি জ্ঞানী পাঠক তাহা চিন্তা করুন। পরন্তু যাঁহারা উচ্চশ্রেণীকে ধ্বংস করিতে ব্যগ্র তাঁহারা একবার পৃথিবীর চারিদিকে, অতীত যুগযুগান্তের দিকে তাকাইবেন। উচ্চশ্রেণীসমূহ ধ্বংস হইবেই, না নূতনভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে, তাহা সমাজের মঙ্গলের জন্যও হইতে পারে, উৎপাতের জন্যও হইতে পারে। উচ্চশ্রেণীর আত্মশক্তি এবং শাসনকর্ত্তাদের পরিচালন ব্যবস্থার উপরই তাহা নির্ভর করিবে।

নিম্নশ্রেণীর উন্নতি সাধনের প্রয়োজন নাই, এমন কথা আমরা কখনো বলি না। যথেষ্ট আছে। তবে বর্ত্তমান অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনের আন্দোলন যে ভাবে গড়াইতেছে তদ্বারা যে নিম্নশ্রেণীর কোনরূপ উন্নতি বা উপকার হইবে, বা তাহার দ্বারা সমগ্র জাতির কল্যাণ হইবে এমন প্রমাণ পাইতেছি না। একটা ক্ষুদ্রলোক যাহা কার্য্যতঃ দেখাইয়াছে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

* এই নীতির যাথার্থতা আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

চট্টগ্রামের সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ছেলে হাড়ী ডোম প্রভৃতি মৎস্যজীবী। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। ঐ ব্যক্তি তাহাদের প্রত্যেক অঞ্চলের সর্দ্দারদের সহিত একত্রিত হয়, অনেক পল্লীর অবস্থা স্বয়ং দেখিয়া আসে। তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভাব কি, তদ্দূরীকরণ ও উন্নতি সাধনের উপায় কি তৎসম্বন্ধে তাহাদের সহিত আলোচনা করে। তাহারা দেখাইল যে যেই সময় হইতে ধনী মুসলমানেরা তাহাদের টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহাদের ব্যবসায়ে হাত দিয়াছে, তাহাদের চাকর করিয়া নিজেরা ব্যবসা চালাইতেছে, সেই সময় হইতে তাহাদের দুরবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। এইক্ষণে তাহাদের প্রধান অভাব অর্থের। ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা প্রত্যহ টাকা প্রতি দুই পয়সা সুদ দিয়াও টাকা কর্জ্জ করে। টাকা প্রতি মাসিক সুদ এক আনা দুই আনা ত সাধারণ, চারি আনাও আছে। সুতরাং সে দেখিল তাহাদের এই অর্থসঙ্কট দূর করাই প্রধান কাজ। তাহাদের চরিত্র সংশোধন মদ্যপান নিবারণ, তাহাদের ধর্ম্মভাব, পবিত্রতা পরিষ্কার পরিচ্ছনতার ভাব উন্মেষের চেষ্টা চলিতেছে। অনেকে বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে, অনেক পল্লীতে হরিমন্দির উঠিতেছে, ৺শিব-মন্দির এবং কালীমন্দিরও কোন কোন পল্লীতে উঠিয়াছে। তাহারা বলে তাহাদের দোষ দুর্ব্বলতা আট আনা পরিমাণ দূর হইয়াছে। কি হইতেছে না হইতেছে সর্ব্বসাক্ষী কালই তাহার প্রমাণ দিবেন। তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে চেষ্টা সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত কেহ ইহাদের উচ্চ শ্রেণীর বিদ্রোহী করিতে পারে নাই। সর্ব্বত্র উচ্চ শ্রেণীর সহৃদয় ব্যক্তিরা এই ভাবে নিম্নশ্রেণীর অভাব দূরীকরণ ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিলেই তাহাদের প্রকৃত উপকার করা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বর্ণভেদ, বর্ণভেদে ব্যবসায় ভেদ এবং তদনুসারে আচার ব্যবহারের বিভিন্ন প্রথা কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া ভারতবাসীকে শান্তি ও সুশৃঙ্খলার সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছে, নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও তাহাতে কত উপকৃত, ইহা বুঝিতে ভুল করিয়া ইংরাজ শাসন কর্ত্তারা যেমন একদিকে তাঁহাদের ভিত্তি উচ্ছেদের জন্য বলসেভিজম্ ডাকিয়া আনিতেছেন, তেমনই পাশ্চাত্য মোহাচ্ছন্ন ভারতীয়েরা নিজেদের ধ্বংসের জন্য যথেচ্ছাচারের স্রোত কাটিতেছেন। প্রাণে বড় আশা জাগিয়াছিল মহাত্মা গান্ধী এই স্রোতে বাধা দিবেন, কিন্তু প্রত্যেক সন্ধিক্ষণে তিনি যেমনভাবে পদস্খলিত হইতেছেন তাহা দেখিয়া হতাশ হইয়াছি। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর সনাতন পন্থীদের নির্ম্মম ঔদাস্য আমাদের হৃদপিণ্ড যেন ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। অনেকের দিকে তাকাইয়া যে দৃশ্য দেখি তাহাতে বলিতে হয়—ইহাদের দৈহিক মানসিক আর্থিক সমস্ত শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ তাঁহাদের মাতৃদেবী যে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, চিকিৎসা নাই, শুশ্রূষা নাই, সুপথ্য নাই শৃগাল কুকুর মিলিয়া তাঁহাকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে না,—এমনই মোহাচ্ছন্ন। আমাদের এক বন্ধু বলিলেন,—এক জমিদার পরিবারের একভাই সনাতনপন্থী, আর এক ভাই নব্য পন্থী। নব্য পন্থী নব্য সংস্কারকদের সাহায্য কল্পে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন, আর সনাতন পন্থী মহাশয় স্বধর্ম্ম ও স্বজাতিকে এই ভয়ঙ্কর বিপ্লব হইতে রক্ষার জন্য এক শত টাকাও ব্যয় করেন নাই। আর এক সনাতন পন্থীর পুত্র এক একবার কাউন্সিলের মেম্বর নির্ব্বাচনের সময় লক্ষাধিক টাকা উড়াইয়া দেন, অথচ জাতির ও ধর্ম্মের কোন একটা স্থায়ী কাজে তাহার দশমাংশও পাওয়া যায় না। তবে কি সনাতন পন্থার অর্থ ঔদাস্য এবং

হৃদয়হীনতা? সনাতন পন্থীদের এই মারাত্মক ব্যাধি দূর করিতে হইবে, নতুবা তাঁহাদের বিলোপ অনিবার্য্য। শুধু তাঁহাদের ধ্বংস হইবে এমন নহে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ও সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহারাই তাহার ধ্বংসের কারণ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের অকর্ম্মণ্যতার ও মনুষ্যত্ব হীনতার কলঙ্ক জগতে চিরস্থায়ী হইবে।

দিগ্‌দর্শন

যুব-আন্দোলন

গত তিন চারি বৎসর হইতে ভারতের শিক্ষিত যুবকরা "যুব-আন্দোলন" নামে একটা কুজ্ঝটিকার আমদানি করিয়াছে। ইউরোপের মহা সমরের পর ইউরোপের সর্ব্বত্র এই আন্দোলনের একটা আবশ্যকতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সমরলিপ্ত সকল রাষ্ট্রেই প্রত্যেক দেশের যুব সম্প্রদায় সমরাঙ্গনে জীবনাহুতি দেওয়ার পর তত্তৎ দেশের যুবক যুবতীদের মনে প্রশ্ন জাগে; কেন এই যুদ্ধ, কেন এই লোকক্ষয়, কেন এই মানুষ লইয়া খেলা—কেন দেশের তরুণরা দেশের তথা-কথিত জননায়কদের কথায় মানুষে মানুষে এত হিংসা দ্বেষ পোষণ করিবে—ইহাতে কোন্ লাভ হয়, সভ্যতার কোন্ বিশেষত্বের উন্মেষ হয়,—যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে জগতে এই ভীষণ লোক-ক্ষয়ের মূলকারণকে উন্মূলিত করা আবশ্যক।

ইউরোপ খণ্ডের বহু বহু চিন্তাশীল রাজনীতিক, সমাজতত্ত্ববিদ্, জননায়ক এই সকল স্বতঃস্ফূর্ত্ত গতিকে অব্যাহত রাখাই রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর মনে করিয়াছেন। যে স্বার্থসংঘাতে ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রলোভনে যে সকল দলপতি গতযুদ্ধের প্ররোচক ছিল, তাহারা স্পষ্টই বুঝিয়াছিল যে এতবড় মহাযুদ্ধের পরিণামে কোনও স্থায়ী ফল ফলে নাই! যুবক যুবতীদের মনে যে সকল প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহার উত্তরে ঐ সকল দলপতিদের আবাল্যলব্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডারে এমন কোনও খাদ্য নাই যে ঐ জ্ঞানের ক্ষুধা তৃপ্ত করিতে পারে, তাহাদের অভিজ্ঞতায় এমন কোনও কার্য্যপ্রণালীর ধারা নির্দ্দেশ নাই যে ঐ সমস্যা সমাধানের পথ দেখাইতে পারে, আবার তাহাদের জাতিগত বা রাষ্ট্রগত জীবনাদর্শে এমন কোনও উদার সহানুভূতি নাই যে এতবড় বেদনার প্রলেপের কার্য্য করিতে পারে। কাজেই তাহাদের একমাত্র অবলম্বনীয় দাঁড়াইয়াছে যুব-আন্দোলনের গতিকে অব্যাহত রাখা। তাহাতে যুবক যুবতী একটা নূতনত্বের মোহে মুগ্ধ থাকে, একটা কর্ম্মধারায় ব্যাপৃত থাকে, নিজেদের স্বাচ্ছন্দ-সঞ্জাত ভাব ও চিন্তার কর্ম্মে একটা সুশৃঙ্খলিত ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা রক্ষা করে, কোনও সমাজ ধ্বংসকর বিপ্লবের সূচনা করে না, এবং মাৎস্য-ন্যায় হইতে সাধারণ জনমণ্ডলী রক্ষা পায়। ইউরোপ খণ্ডে যুব-আন্দোলনের কার্য্যকারণ তত্ত্বের ভিতর যে কয়টী শক্তি আছে তাহারই আলোচনা দ্বারা এই কয়েকটী লক্ষণ বুঝা যায়।

কিন্তু ইউরোপ খণ্ড হইতে জাহাজ এদেশে আসে। সেই জাহাজে কেবল শিল্পসম্ভার আসে না। মানুষও আসে, বইও আসে ভাবও আসে, চিন্তাও আসে। পয়সা হইলে ইউরোপের

বিলাস সস্তায় কিনি, সেটা দোষের হইলেও বিলাস-দোষ ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু ভাব-বিলাসী ইউরোপের যে কোনও ভাবকে লইয়া মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে যে খেলা করি তাহা যে কেবল দোষের তাহা নহে, তাহার সর্ব্বভুক্ দখল-ক্ষুধায় জাতির ও সমাজের চিরসঞ্চিত অমূল্য ভাবরত্ন-ভাণ্ডার যে স্থানচ্যুত হইতে বসিয়াছে। যুব-আন্দোলনের আবশ্যকতা ইউরোপে থাকিতে পারে, এই ভারতে তাহার আবশ্যকতা কি? সে কথার যতপ্রকার কৈফিয়ৎ আছে তাহা লইয়া অযথা কালি কলম খরচ করিব না। মোটের উপর মটর গাড়ী, রেশমী মোজা, জর্ম্মাণ বিয়ার ও ফরাসী মদ্যের যে আবশ্যকতা, এই যুব-আন্দোলনের ও সেই আবশ্যকতা। কিন্তু যখন বস্তু বিচার করিতে বসিয়াছি তখন আসল বস্তুটা কি ও তাহার রূপ কি তাহা দেখা যাক্।

যুব-আন্দোলনের ভিতর একটা নিত্য সত্য আছে তাহা প্রথমেই স্বীকার করিতে হইবে। সে নিত্য সত্য অত্যন্ত পরিচিত ও যুগযুগান্তের মানবেতিহাসের অভিজ্ঞতা। নচিকেতার প্রার্থনায়, একলব্যের গুরুদক্ষিণায়, ধ্রুবের তপস্যায়, প্রহ্লাদের বিপদ বরণে, বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগে, নিমাইসন্ন্যাসে সেই যুবশক্তি জাগ্রত ও দেদীপ্যমান। জগতের আধি ব্যাধির পীড়াবোধ, মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের প্রতিকার বাসনা, দারিদ্র্যের, দুঃখের ও শোকের জড়তার অপনোদন চেষ্টা, বুভুক্ষা, রোগ ও মূর্খতার বিরুদ্ধে অভিযান যদি জাতি ও সমাজের ভিতর না থাকে, আর জাতির ও সমাজের যুবকদের প্রাণে যদি তাহার তরঙ্গ না উঠে, তবে সে জাতি ও সমাজ মৃত বা মৃতপ্রায় ধরিতে হইবে এবং ধরণীর পৃষ্ঠ হইতে অতি শীঘ্রই সে জাতি ও সমাজ নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবেই যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিতে হইবে যে নবীনে ও প্রবীণে, অর্ব্বাচীনে ও প্রাচীনে নূতনে ও পুরাতনে একটা অতি স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণকর দ্বন্দ্ব চিরকাল চলিতেছে ও চলিবে। বৃক্ষের কাণ্ড দাঁড়াইয়া থাকে, লতার দেহটী অবশিষ্ট থাকে; নতুবা রসসঞ্চারের আগম নির্গমের পথ থাকে না, কিন্তু সর্ব্বদাই নববসন্ত সমাগমে—

পুরাণ পত্রাপগমাদনন্তরং
লতেব সন্নদ্ধ মনোজ্ঞ পল্লবা।

কিন্তু বর্ত্তমান যুব-আন্দোলনে ঐ নিত্য সত্যাতিরিক্ত কতকগুলি লক্ষণ পরিস্ফুট। আর সেটা একেবারে নিছক আমদানি করা নকলনবিশী। বৃদ্ধেরা প্রাচীন প্রথাকে আকড়াইয়া ধরিতে চায়, সুতরাং প্রথাটীকে নির্ব্বিচারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেল। বর্ত্তমান জীবন যাত্রায় দরিদ্রের গ্রাসাচ্ছাদন বঞ্চিত করিয়া ধনীর ধনসঞ্চয় হইতেছে সুতরাং ধনী মাত্রই সমাজ শত্রু। রাষ্ট্র শক্তি মাত্রই স্বার্থ সংবদ্ধ ধনগর্ব্ব পদগর্ব্ব ও ক্ষমতাগর্ব্বের ষড়যন্ত্র বলিয়া ইহারা বিশ্বাস করে, কাজেই পৃথিবীতে নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থা আবশ্যক। আবার দেখা যায় যে অনেকেই বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন পৃথিবী গড়িবার সমস্ত স্বপ্ন বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মের নামে, শান্তির নামে বর্ত্তমানের অন্যায় অবিচারের সঙ্গে আপোষ করিয়া ফেলে—সুতরাং ধর্ম্ম ও শান্তি মানবতার শত্রু।

ইউরোপের বর্ত্তমান সমাজ সংগঠিত শৃঙ্খলায় এই বিদ্রোহের কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু ভারতের পরাধীনতার মূলে কি সামাজিক প্রথা আছে? ভারতের দারিদ্র্যের মূলে কি ধনীর ধন-লিপ্সাই আছে? ভারতের রাষ্ট্রশক্তির পিছনে কি দেশের গর্ব্বের ষড়যন্ত্রই আছে? না ভারতের ধর্ম্ম ও শান্তি-প্রিয়তাই কি ভারতের স্বচ্ছন্দ জীবন গতির অন্তরায়? হোমিওপ্যাথি ঔষধের লক্ষণ পরিচয়

পড়িলে অনভিজ্ঞ পাঠক যেমন মনে করিয়া লয় যে তাহার শরীরে সেই সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান, আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত যুবক মণ্ডলী ইউরোপের যুব আন্দোলনের তত্ত্বকথা পড়িয়া ভাবিতে শিখিয়াছে যে আমাদের দেশের সমস্ত আধি ব্যাধির মূলে আছে হয় আমাদের সামাজিক-প্রথা, নয় ধনীর নির্ম্মম লোভ, নয় রাষ্ট্রের সহকারী ষড়যন্ত্র, কিম্বা ধর্ম্ম বিশ্বাস বা শান্তিপ্রিয়তা। আমরা একথা একেবারেই বলিতে চাহি না যে দেশের যুবক দেশের সামাজিক কুপ্রথা দূর করিতে চাহিবে না, বা ধনীর লোভকে দমন করিতে পারিবে না, বা রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার চাহিবে না, বা ধর্ম্মবিশ্বাস ও শান্তিপ্রিয়তার ভিতর তামসিকতা ও জড়তার বিরুদ্ধে অভিযান করিবে না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে ইউরোপকে ঢালিয়া সাজিবার আয়োজন হইতেছে বলিয়াই যে ভারতকে ঢালিয়া সাজিবার আয়োজন করিতে হইবে—এই নকলনবিশী রোগ কোথা হইতে আসিল—আর আসিলই বা কেন ?

অনেক ইংরাজী শিক্ষিত প্রায়ই প্রশ্ন করেন যে ভারতের সমাজ ব্যবস্থা, ভারতের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও ভারতীয় জনগণের শান্তিপ্রিয়তা ভারতের এই সর্ব্বহারা হাহাকার, সর্ব্বনিঃস্বতার হুতাশ ও আষ্টেপৃষ্ঠে নাগপাশ বন্ধন হইতে ভারতবাসী কোটি কোটি লোককে রক্ষা করিতে পারে নাই ত! আমাদের যুবক যুবতীরা এই প্রশ্নের কঠোর ভিত্তিকে চরম সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে, এবং সেই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত বর্ত্তমানের বিরুদ্ধে এক দুঃসাহসিক অভিযান করিবার আয়োজন করিতে চায়। কাজেই ইউরোপের যুব-আন্দোলনের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি এদেশেও প্রযোজ্য বলিয়া তাহারা ধরিয়া লইয়াছে।

আমরা আমার স্বদেশীয় তরুণ তরুণীদের দেশসেবার প্রবৃত্তির দোষ দিতেছি না, তাহাদের কর্ম্মপ্রবণতার নিন্দা করিতে চাহিতেছি না, তাহাদের জীবন সর্ব্বস্ব পণের ভিতর ঠেকিয়া শিখিবার অভিজ্ঞতা লাভের বাধা দেওয়া শুধু যে অন্যায় তাহা নহে অধর্ম্ম বলিয়াই বিশ্বাস করি; আর জাতির কর্ম্মক্ষয়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যে সকল নবীন হৃদয় উন্মুখ তাহাদের অবদানের সমালোচনা করাও ধৃষ্টতা বলিয়া মনে করি। কিন্তু প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে, বিচার বিবেচনার আসরে কর্ম্মপদ্ধতির উপায় চিন্তনে ভাবনার মৌলিক অবলম্বন লইয়াই পরীক্ষা করিতে হয়। যুবশক্তি যখন হিমালয়ের অভ্রংলিহ চূড়ায় বসিয়া তাহারও উর্দ্ধে কি আছে তাহা দেখিতে চায়, মহাসাগরের দিগন্ত বেলায় উর্ম্মি-সংঘাতে অবিচলিত থাকিতে চায়, রত্নাকরের অতল তলে কোন রত্ন লুক্কায়িত আছে তাহা আহরণ করিতে চায়, মৃত্যুকে জীবনের শেষ যবনিকাপতন নহে বলিয়া পরপারের সহিত সম্বন্ধ বাঁধিতে চায়, তখন সেই যুবশক্তিকে প্রণাম করিয়া বলি—এস অমৃতস্য পুত্রাঃ। বল

সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্য মুক্ত স্বভাববান্।

ভারতের যুবক! বাঙ্গলার যুবক! ভাঙ্গিতে চাও? সত্যই কি ভাঙ্গিতে চাও? নিজের অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে না। আমরা জানি ভাঙ্গিতে চাও না। এই ভারতের শিক্ষার প্রধান ভিত্তি স্বাধ্যায় প্রবচন। সেই স্বাধ্যায় প্রবচনের প্রথম শিক্ষা নেদং যদিদমুপাসতে। প্রকৃত শিক্ষার সোপানই হইল বহিরঙ্গ জগৎকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শেষ করা। যাহা কিছু দেখিতেছ, আস্বাদন করিতেছ, শ্রবণ করিতেছ, ঘ্রাণ করিতেছ, স্পর্শ করিতেছ তৎসমুদয়ই কিছু নয় কিছু নয় করিতে করিতে তবে সেই সমস্ত রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের ভিতর সত্যবস্তুকে ধরা

যায়। এইরূপ করিয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া গড়িতে চাও কি? অমৃতসন্ধানীর ভাঙ্গা গড়া ইহাই। কিন্তু তোমরা কি চাহিতেছ? একই ফর্দ্দে লিখিতেছ তোমরা—**votaries of Freedom and Truth in the widest spheres of culture. patriotism and social welfare** (সাধনা দেশচর্য্যা ও সামাজিক মঙ্গলের বিস্তৃততম পরিধির ভিতর তোমরা স্বাধীনতার ও সত্যের উপাসক)—আর সঙ্গে সঙ্গে চাই **the right of women students to join the Institute** (ছাত্রীদের ইন্‌ষ্টিউটের সভ্য হইবার অধিকার)। কোন Instituteএ? যথায় সন্ধ্যার পর গান গল্প, নাচ রঙ্গ চলে, আর কে পুলিস স্থপারিণ্টেডেণ্ট হইবে, কে ডেপুটী হইবে কে মুন্সেফ হইবে তাহার ফন্দি চলে। কাজেই ভাঙ্গাগড়া যে কিছুই চাও না তাহা অস্বীকার করিয়া আত্মপ্রতারণা করিও না।

Radical socio-economic change মৌলিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন চাও বলিয়া আস্ফালন যতই করিতেছ ততই ধরা পড়িয়া যাইতেছ যে "কর্ম্ম বৈচিত্র্যাৎ প্রধান চেষ্টা গর্ভদাস বৎ।" ভূলোক বাসী রজঃ প্রধান; তাহাদের বিচিত্র কর্ম্মচেষ্টা পুরুষের সন্তোষ বিধান জন্য যেমন গর্ভাদাস (যে দাস রূপেই জন্মগ্রহণ করে এবং সংস্কার বশতঃই দাস) প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য কর্ম্ম বৈচিত্র্য চেষ্টা করে। যে পুরুষ জাহাজ জাহাজ বোঝাই করিয়া তোমার নয়ন দুয়ারে মার্কস্, লেনিন, রুসো, রাসেল যোগাইতেছে তাহারই মনোরঞ্জনের জন্য তোমার সকল আস্ফালন গর্ভদাসের চেষ্টা মাত্র।

যদি সত্য মুক্তিবাদীর চরম সন্ধানে আস্থা থাকিত তবে তোমার মধ্যে প্রথম ও প্রধান ভাবে জাগ্রত দেখিতাম যে তোমরা মান—সাম্যবাদ আজ ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান মনীষীদের মানিত আলেয়া মাত্র। সত্যই যদি স্বাধীনতা ও সত্যের প্রকৃত উপাসক হইতে তবে বুঝিতে যে একমাত্র স্বাধীনতার অভাবেই আজ ইউরোপের তথা কথিত স্বাধীনদেশ সকলের দেশে দেশে বিশ লক্ষ তিরিশ লক্ষ লোকের বেকার অবস্থা। আর মৈত্রীর দিগন্ত প্রদাহ জ্বলিয়া লুভেন ভস্মীভূত, লুসিটেনিয়া অর্ণবমগ্ন, বেলজিয়ম শ্মশান, ফ্রান্সের আঙ্গুর উপত্যকা বিপর্য্যস্ত, জর্ম্মাণীর মুকুট ধূলালুণ্ঠিত, সপরিবার জারের রক্তে নরশার্দ্দুলের জিঘাংসার তৃপ্তি। কাজেই আধুনিক দুইজন চিন্তাশীল লেখক বলেন—**The most significant aspect of our civilisation, psychologically fluoroscoped is pretence. Pretence is the key to modern civilisation * * * which means that our civilisation is psychoneurotic** অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষণীয় দিকটাকে যদি মনোরাজ্যে একটী ছাঁচে দেখিতে হয় তবে তাহা ছলনা। একমাত্র ছলনাই আধুনিক সভ্যতার চাবিকাটি—তাহার নির্গলিতার্থ এই যে ঐ সভ্যতা বহির্লক্ষণ শূন্য একটা মানসিক ব্যাধি। এ সকল তথ্য তোমাদের গুরুঠাকুরদেরও অত্যল্প লোকের বুঝিবার শক্তি আছে, কাজেই তোমরা বুঝিবে কি করিয়া?

যদি ভারতের যুবশক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতা ও সত্যের উপাসক হইয়া থাকে তবে আমরা তাহাদের একটা নিতান্ত আধুনিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বাধীন ভাবে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ভাবিতে বলি। ভারতের স্বনামখ্যাত রাজনৈতিক শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্যারী নগরীতে ভারতের হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সভাপতি ছিলেন তথাকার "আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক আফিসের পরিচালক" আলবার্ট টমাস। সভাপতি উপসংহারে স্বাভাবিক ভদ্রোচিত ভব্যতা রক্ষা করিয়া

বক্তার সুখ্যাতি করেন। তথাপি একটী কথা বলিতে ছাড়েন নাই—"ঠিক যে সময়ে আমাদের কেহ কেহ (ইউরোপের অনেক মনীষীই) গণতন্ত্রের প্রতি সন্দিহান, ঠিক যে সময়ে লোকে অনুমান করিতেছে যে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে হারাইয়া আসিতেছে, ঠিক সেই সময়েই গণতন্ত্রের গ্রহরাজি চীনের ও ভারতের জনগণমনে উদয় হইতেছে।" আমরা চীনের কথা বলিতে পারি না। কিন্তু ভারতের গত ৫০ বৎসরের ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, বিলাতী লাট বেলাটের পুরাণো কোট প্যাণ্ট এ দেশে খুব বিকাইয়াছে। সাহেবদের দেখা তেবাষ্টে চলচ্চিত্র এ দেশে আসিয়া নূতন দরে পয়সা আদায় করে। পার্লেমেণ্টের ৪০ বৎসরের পূর্ব্বেকার নেতাদিগের বুকনি শোনাইয়া পার্ণেলী নকলে স্বরাজীদল গঠিত হয়। টলষ্টয়ের ও থরোর অসহযোগ সংগ্রাম এখানে জমিয়া উঠে। ৫০ বৎসরের আগেকার বিলাতী ফ্যাসন লইয়া এখানে বিবাহ আইন রচনা হয়। এই সমস্ত আমদানি সংস্কার মুক্ত হইয়া ভাঙ্গাগড়ার কথা কহিতে হয়। নতুবা মনুর আসনে রাম শ্যামকে বসাইলে, দধীচির আসনে জেলবাসীকে বসাইলে, বা শঙ্করাচার্য্যের আসনে বাঁধন হারা নারীকে বসাইলে স্বাধীনতা ও সত্যের উপাসক হওয়া যায় না।

ইউরোপের যে যুগে যুব আন্দোলন জাগিয়াছে সেই যুগের বার্ত্তা ইহাই যে রাষ্ট্র-বহির্ভূত স্বাধীন চিন্তা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাই প্রকৃত গণতন্ত্রের স্থায়ীভিত্তি। ফলেটের "নিউষ্টেট," এ ডি লিগুসের "গণতন্ত্রের মৌলিক উপাদান," হবসনের "সামাজিক বিজ্ঞানে স্বাধীন চিন্তা" এই তত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছে। ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রের অনপেক্ষতা ও স্বাতন্ত্র্যই সেই সিদ্ধান্তের সত্যতা যুগযুগান্ত ধরিয়া ঘোষণা করিয়াছে। যত ইংরাজী শিখিয়া আমরা রাষ্ট্রশক্তিকে সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছি, ততই আমরা পরাধীনতার এক একটী শৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়াছি। ইহাই হইল ভারতের পরাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস—সমাজতত্ত্বের মৌলিক সিদ্ধান্তানুযায়ী সত্য ইতিহাস, আধুনিকতম চিন্তাধারার প্রামাণিক উদাহরণ সম্বলিত ইতিহাস, ইউরোপের পক্ষে যে ইতিহাস আজ গড়িতে হইবে, যাহা এখনও সেখানে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, যাহার জন্য জর্ম্মাণ মনীষী স্বীকার করেন যে "আমরা গভীর গহ্বরের ধারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি" সেই ইতিহাস। ভারতের সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম্মবিশ্বাস বা শান্তিপ্রিয়তা ভারতের পরাধীনতার কারণ নহে। প্রধান কারণ—"আপন সন্তান করিছে অপমান, সে যে আমার জননীরে!"

স্বীকার করি "সব ভাঙ্গা" "সবহারা' দের কথাটা ভাল লাগিবে না। কিন্তু যাহারা একমাত্র যুক্তিকে আশ্রয় করে তাহাদের দুইটা প্রধান লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনা বিচার করিতে বলি। রাবণ সীতাকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মনাশ করিতে পারেন নাই। তাহারও কারণ আছে। ভগবান হৃদ্দেশেই বাস করেন। বিশ্ববিজয়ের বহির্ম্মুখীন জয় মানুষের আত্মা লাভ বোধ করে না বলিয়া গিজনীর মামুদ কাঁদিতে কাঁদিতে অশান্তিতে জীবন বিসর্জ্জন করে। আর রাবণ সীতা দেবীর নিকট পরাস্ত হইয়া মৃত্যুকে বরণ করে। আবার দেখ জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে চারি বৎসর বন্দিনী করিয়া রাখিয়া অপেক্ষা করেন। নূরজাহানের হৃদয়ের জন্য সমস্ত সাম্রাজ্য জাহাঙ্গীর তাহার পদতলে দিলেন। তথাপি বন্দিনী নূরজাহান সম্রাজ্ঞী নূরজাহান অপেক্ষা শতগুণে গরীয়সী। কেন জান? ঐ ভগবানকে হারাইল বলিয়া।

মনে রাখিও আমাদের মনিব প্রভুরা ভারতের হৃদয়কে কিছুতেই জয় করিতে পারিতেছে

না। এই সেদিন লাট মেষ্টন গান্ধীমহাত্মাকে অনুরোধ করিয়াছেন—তুমি যদি ভারতের সনাতনী হিন্দুদের সংস্কার করিয়া তুলিতে পার তবেই তোমার বচনচাতুর্য্যের সুখ্যাতি করিতে পারি আর তোমার অতীত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারি। বিজয়ীর অনন্তক্ষুধা—ধর্ম্মবিশ্বাস, সমাজ ও শান্তিপ্রিয়তা আমার অনুবর্ত্তী হউক। বোধ হয় সকল জাতির পতনাভ্যুদয়ের ইতিহাসের মূলে এই একই বুভুক্ষা, একই তৃষ্ণা, একই আকাঙ্ক্ষা, আদান প্রদানে, ভাব বিনিময়ে, সহযোগিতা সহকারিতায় পারস্পরিক সেব্য সেবকের ভাবে যে সভ্যতার স্থায়িত্ব ও মানবতার অবিনশ্বরত্ব তাহা ভুলাইয়া দেয়। সেই ভ্রান্তির জন্য মানবেতিহাসে কতবার ঘটিয়াছে—cultural conquest—মনোভাবের পরাজয়।

দুঃখ এই যে ভারতের যুবকরা এ সকল কথা ভাবিবার আবশ্যকতাও স্বীকার করে না। ইং ১৯২৮ সালের ১৪ই ও ১৫ই অক্টোবর মতিহারীতে বিহারী যুবকদের এক সভায় সাধু ভাস্বানী অন্যান্য দেশের যুব আন্দোলনের সহিত ভারতের যুব-আন্দোলনের পার্থক্য কোথায় থাকা উচিত তাহা বুঝাইয়া দেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে রুসে যুব-শক্তি যৌবনে মানসিক শিক্ষা লইয়া ব্যাপৃত, ইটালির যুবশক্তি ব্যক্তিকে দেশসেবক করিলেই সন্তুষ্ট, জর্ম্মানির যুবশক্তি যুবককে উড়ো পাখী করিতে চায়, কিন্তু মনে রাখিও রুসে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছে, রুস জর্ম্মাণিকে শিখাইয়াছে "I say unto you—God is dead! আমরা বলিতেছি ভগবান মরিয়াছেন; ইতালি যুদ্ধের জন্য সজ্যবদ্ধ আর জার্ম্মাণিতে cult of the nude উলঙ্গ থাকার প্রবৃত্তি বাড়িয়াছে। তাই সাধু ভাস্বানী বলেন ভারতের যুবশক্তিকে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানে প্রভেদ মানিতে পারে না ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতি হারাইতে পারে না, আর নারীকে সৃষ্টিরক্ষিণী শক্তি মনে করিয়া শক্তির উপাসক ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। স্বাধীনতা শক্তির সন্তান।

প্রকৃতই ভারতের যুব-আন্দোলনের যদি কোনও অর্থ থাকে তবে এই শক্তির আবাহনে কর্ণপাত করা। এই শক্তির রূপ ত্রিবিধ। সা প্রভাবোৎসাহ মন্ত্রজ ভেদাৎ ত্রিবিধা। তত্র প্রভুত্বে সাধকত্বাৎ কোষদণ্ডৌ প্রভুশক্তিঃ। বিক্রমেণ স্বশক্ত্যা বিস্ফূরণ মুৎসাহ শক্তিঃ। সন্ধ্যাদীনাং সামাদীনাঞ্চ যথাবস্থানং মন্ত্রশক্তিঃ।

এখন কোষদণ্ড আমাদের হাতে নাই। প্রভুশক্তি হারাইয়াছি বলিয়া উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রশক্তিকেও মাত্র কোষ দণ্ডের প্রাপ্তির লোভে বিসর্জ্জন দিতে হইবে এ কোন কথা? কথাটা আরও একটু স্পষ্ট চাই।

বিক্রমের দ্বারা স্বশক্তি স্ফূরণই উৎসাহ শক্তি। স্বশক্তি—স্বপ্রতিষ্ঠ না হইলে থাকে না। আবার স্বধর্ম্ম ও স্বাজাত্য রক্ষা না করিলে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়াও চলে না। এ গুলা মানব সমাজের বীজগত ধর্ম্ম বা গুণ। তর্ক আরম্ভ করা চলে কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া মানব সাধারণের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে একই-সত্য পাইতে হয় যে স্বধর্ম্মশ্রদ্ধা ও স্বাজাত্যবোধ স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার বা স্বশক্তি স্ফূরণের একমাত্র উপায়। আধুনিক যুগে মুসোলিনি একজন প্রকৃতই স্বশক্তি বা উৎসাহশক্তির প্রধান উদাহরণ। তাহার আত্মজীবনীতে দেখি জন্মভূমি প্রেডাপিও সম্বন্ধে তাঁহার কি শ্রদ্ধা! পাহাড়গুলি ভগ্নদুর্গের প্রাচীরগুলি প্রাচীন পুরুষত্বের নিদর্শন বলিয়া তাঁহার কি পূজা! তাঁহার ১২৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বপুরুষ জিওভানি মুসোলিনির সমরায়োজনের প্রতি তিনি কি নত! তাঁহার

নিজের বেহালাপ্রিয়তার জন্য তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁহার কোন পিতামহ লণ্ডনে সঙ্গীত রচনা করিতেন তাঁহার কাছে ঋণী স্বীকার করেন। আবার যখনই তিনি বলিয়াছেন—আমি একখানি বড় কেতাব পড়িয়াছি তাহা জীবন—আমি একজন মহৎ শিক্ষক পাইয়াছি তাহা অভিজ্ঞতা, তখনই লিখিয়াছেন—আমি আমার দেশের পুরাতন ও আধুনিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া পড়িয়াছি। আমাদের জাতীয় জীবন ও জাতীয় চরিত্রের গভীরতম মূলের শেষ অনুসন্ধানের জন্য তাহা করিয়াছি। ভারতের যুবক বুঝিবে কি উৎসাহ শক্তি কি করিয়া অর্জ্জন করিতে হয়?

তাহার পর মন্ত্র শক্তি। সন্ধ্যাদীনাং সামাদীনাং যথাবস্থানং দ্বারা মন্ত্রশক্তি রক্ষা করিতে হয়। ইহার বোধ জন্য ভারতের ইংরাজী শিক্ষার একটু খানি ইতিহাস আবশ্যক। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে ইংরাজ নিরপেক্ষ থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ইংরাজী শিক্ষার প্রথম সাধারণ প্রবর্ত্তন হয় ইং ১৮১৫ সালে। ইংরাজী শিক্ষায় মদিরোন্মত্ত প্রথম যুবক দল শিককাবাব খাইয়া লোকের বাড়ী গোহাড় ফেলিত, প্রকাশ্যে মদ খাইত। ইংরাজ রাজপুরুষ তাহা প্রশ্রয় দেন নাই। তাহার বিরুদ্ধে দেশের নিজস্ব শক্তি জাগরিত হইয়া নিরক্ষর রামকৃষ্ণ দেবের অত্যদ্ভুত সাধনা বলে বিবেকানন্দ স্বামীর বজ্রবাণী আনয়ন করে, বঙ্কিমের সুধারাপূত সাহিত্য সাধনা যথাবস্থানকে রক্ষা করে তৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ, ভাস্করানন্দ প্রভৃতির তপোবল যথাবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাকে আবার ফিরাইয়া আনে। বিদেশীর সহিত সন্ধি ও সামদানাদি দ্বারা, ভারতের পারম্পর্য্য ধারা গৃহে, সমাজে আচারে, ব্যবহারে, মন্দিরে, নদীতটে, পিতৃপিতামহের পুণ্য প্রভাবকে যথাবস্থান দান করে। প্রভুশক্তি হারাইয়াও ভারতের এই স্বপ্রতিষ্ঠ থাকা ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করা একটা মানব সমাজের অভূতপূর্ব্ব অবদান! পৃথিবী এই পুনর্জাগরণের বার্ত্তায় অনবহিত ছিল না। বিখ্যাত ফরাসী পর্য্যটক পিয়ের লোতি ইংরাজ বর্জ্জিত ভারতের অনুভূতি লাভ করিতে ত্রিবাঙ্কুরের মন্দির সান্নিধ্যে ও কাশীধামের সন্ধ্যারতির শব্দতরঙ্গে মানবতার এক অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিতে পান। ইউরোপ প্রত্যাগত জাপানী অভিজাত ওকাকুরা প্রচার করেন—এসিয়া এক অদ্বৈত ভূখণ্ড। তিনি ভুবন ভ্রমিয়া শেষে প্রচার করেন—the scorching drought of modern vulgarity is pa·ching the throat of life and art জীবন ও কলার প্রাণশক্তি যে আধুনিকতার দিগ্‌দাহী শুষ্কতায় রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া আসিল। তাই তিনি বলেন—ওগো ভারত, তোমার গৃহস্থিত তৈজস পত্রে থালা, বাটি, কোশা, কুশী শাক ঘণ্টার ভিতর আর তোমার exquisite home life পরমচারু গৃহ জীবনের ভিতর যে তোমার চরম কলা রহিয়াছে। শুন ভারত, পারম্পর্য্য ছাড়িলে, তোমার জাতীয়তার সারবস্তু ধর্ম্ম যে উষর হইয়া যাইবে। ইহাই হইল ভারতের যথাবস্থানের মন্ত্রশক্তি।

আর ভারতের যুবক মনে রাখিও কেবলমাত্র উৎসাহ শক্তি ও মন্ত্রশক্তি বলে ভারত প্রথম স্বদেশকে চিনিয়াছিল। স্বদেশ—স্বধর্ম্ম—স্বাজাত্য—তিনে এক—একে তিন। আমরা তিলক অরবিন্দ ব্রহ্মবান্ধবের ধারায় ইহাই শিখিয়াছি—তখনকার প্রত্যেক যুবকই তাহা শিখিয়াছিল। আজ স্বধর্ম্মবিদ্বেষ ও স্বজাতিদ্রোহিতা করিয়া কোন যুব-আন্দোলন করিতেছ? আমাদের দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। কিন্তু জীবনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যে শক্তির অনুরণন ধ্বনিত হইতেছে, স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম ও স্বাজাত্যের ভিতর দিয়া ভারতের যে অতীতের সহিত একত্বানুভবে আমরা আজও মনে করি "এ দেহে যে সে বিলাস ক'রে গেছে" তাহাকে—সেই শাশ্বত সনাতনকে—কাহার হাতে দিয়া যাইব—তাহারই জন্য হৃদয়ে একটা সুর সর্ব্বদাই জাগে—

কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব?

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ ও আলোচনা সাপেক্ষ—'ভারতের সাধনা'র ইহা এক বিশেষ লক্ষ্য আলোচনা-কারীগণ যথাসম্ভব অবান্তর কথা পরিত্যাগ করিবেন, এই অনুরোধ—ভাঃ সঃ]

প্রতিবাদে সমর্থন।—বাস্তব, দেশাচার ও শাস্ত্রের অনুশাসন ঃ—

পৌষ সংখ্যা ভারতের সাধনায় ডাক্তার সরসীলাল সরকার মহাশয় "সমাজের বাস্তবচিত্র ও তাহা হইতে শিক্ষা" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, চৈত্র সংখ্যা ভারতের সাধনায় 'আলোচনা" নামক প্রবন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

আলোচনা হইবে এই উদ্দেশ্যেই সরসীবাবু তাঁহার বাস্তব ঘটনার অভিজ্ঞতাটি—পত্রস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু আলোচনার প্রকারভেদ আছে! এই প্রকার ভেদের জন্যই যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারা এক পক্ষ অন্য পক্ষের বক্তব্যটি ঠিক ভাবে ধরিতে পারেন না, সুতরাং কোন মীমাংসা হয় না, এবং আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। ধর্ম্ম বা সমাজতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনাতেই বিশেষ করিয়া এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়।

দেখা যায় ধর্ম্ম বা সমাজতত্ত্ব লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে একদল প্রধানতঃ ভাবের দিক দিয়া বিচার করেন, যুক্তি বা প্রমাণের দিক দিয়া যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন মনে করেন না। ঘটনাবলী সংগ্রহের পরিশ্রম করিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টা দেখা যায় না, তাঁহারা নিজের মনের মধ্যে কতকগুলি সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখেন এবং সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেহ কোন তর্ক তুলিলে বিশেষ বিরক্ত হন। তাঁহারা নিজেদের আদর্শ হিন্দু ও সমাজ-প্রেমিক এবং বিরোধী পক্ষকে অহিন্দু ও সমাজদ্রোহী বলিয়া প্রথম হইতেই স্থির নিশ্চয় করিয়া রাখেন, সুতরাং অপর পক্ষের যুক্তি গুলির ভিতরেও যে ভাবিয়া দেখিবার কিছু আছে ইহা মনেই করিতে পারেন না। সেই যুক্তিগুলিকে তাঁহারা কাল্পনিক বর্ণনা বা পাশ্চাত্যের প্রভাবিত মনোভাব মাত্র বলিয়া দুই এক কথাতেই উড়াইয়া দিতে চান।

ইঁহাদের মধ্যে অনেকে "শাস্ত্রের অনুজ্ঞা' ও "ঋষিবাক্য" এই কথা দুটির উপর বিশেষ করিয়া জোর দেন এবং প্রাচীন প্রথা মাত্রকেই অতিশয় শ্রদ্ধা করেন। "শাস্ত্রের অনুজ্ঞা" ও "ঋষিবাক্য" নামে প্রচলিত যে কোন অনুশাসনই হউক না কেন, সে গুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে বিচার করিতে যাওয়াটাই সাধারণ মানুষের পক্ষে বাতুলতা বলিয়া মনে করেন।

অপর পক্ষ :—ইঁহারাও নিজেদের হিন্দু ও সমাজহিতৈষী বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বাস্তব ঘটনা হইতে কতকগুলি ব্যাপার লইয়া সেইগুলি হিতকর অথবা অহিতকর—ইহা বিচারের জন্য সাধারণের সম্মুখে স্থাপিত করেন। ঐ ঘটনাগুলির মূলে যে সকল সামাজিক প্রথা আছে সে প্রথাগুলি শাস্ত্রসঙ্গত অথবা নয়, তাঁহাদের প্রশ্ন সে দিক দিয়া নয়, প্রথাগুলি বর্ত্তমান সময়ে সমাজের পক্ষে হিতকর অথবা অনিষ্টকর ইহাই তাঁহাদের প্রশ্ন। এক্ষেত্রে, প্রথাটি শাস্ত্রসঙ্গত অথবা অশাস্ত্রীয়

কিম্বা প্রথাটির দ্বারা সমাজের ভাল হইতেছে বা মন্দ হইতেছে এই দুই দিক দিয়া বিচার চলিতে পারে। কিন্তু একজন যদি বলেন "এই প্রথাটি সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর" এবং অপর পক্ষ যদি বলেন "ইহা প্রথা নয় শাস্ত্রের অনুজ্ঞা" তাহা হইলে বিচার চলিতেই পারে না।

কেবল "শাস্ত্রের অনুজ্ঞা"র দিক দিয়াই যদি বিচার করা যায় তাহা হইলে দেখি সে বিচার খুব সহজ নয়। হিন্দু সমাজ বলিতে কেবলমাত্র বাংলা দেশ বুঝায় না, আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত আসমুদ্র হিমাচল—আমাদের এই হিন্দুস্থান। এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন আচার অবলম্বী বহু দেশবাসী বহু সম্প্রদায় আছে, যাহারা প্রত্যেকেই আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া জানে ও মানে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা ও লোকাচার, এবং অনেক সময় সেই প্রথা ও লোকাচারকেই দুর্লঙ্ঘ্য শাস্ত্রীয় অনুশাসন বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। বাংলা দেশেই কোন কোন স্থানে বিধবার নির্জ্জলা একাদশী প্রথা আছে, কিন্তু সর্ব্বত্র নাই। এমন কি বিক্রমপুর—প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলীর বাসস্থানেও এই নির্জ্জলা একাদশী প্রথা নাই। সেই সব স্থানের বিধবাগণ একাদশীতে ফল, দুগ্ধ ও ছানা প্রভৃতি আহার করেন, তাঁহারা ইহা শাস্ত্র বিগর্হিত মনে করেন না। কিন্তু আবার এই বাংলা দেশেই কতকগুলি স্থানে এই প্রথা এত দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত এবং শাস্ত্রের বিধান বলিয়া ইহা এত নিষ্ঠার সহিত মানা হয় (যদিও কোন কোন স্থানে এখন কিছু শিথিল হইয়াছে) যে, বিধবা যদি অতি শিশু হয় কি অতি বৃদ্ধা হয় তাহাকে নির্জ্জলা একাদশী করিতে হইবেই। এমন কি, একাদশী তিথিতে কোন বিধবার মৃত্যু হইলে মৃত্যুকালে তাহার মুখে জল না দিয়া তাহার কাণে জল দেওয়া হইত। বিধবার চিতা পর্য্যন্ত জল দিয়া ধৌত করা হইত না। অবশ্য এ নিয়ম কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের জন্য। এই নিয়ম এত কঠোর যে কলেরা রোগে তৃষ্ণার্ত্তা রোগীণীর মুখে কেহ জলবিন্দু দিতে সাহস করিত না এবং এখনও অনেক স্থলে করে না। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবনী পাঠে জানা যায় যে, মহারাণীর একবার জ্বর বিকার হয়, একাদশী তিথিতে মহারাণী তৃষ্ণায় ছট্‌ফট করিতেছেন দেখিয়া এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করা হইয়াছিল, তাহাতে কতকগুলি পণ্ডিত "এরূপ আতুর অবস্থায় জল দিলে দোষ নাই" বলিয়া বিধান দিয়াছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠাবতী মহারাণী জলগ্রহণ করেন নাই এবং সুস্থা হইয়া বিধানদাতা পণ্ডিতগণের রাজবাড়ীতে প্রবেশ নিষেধের আদেশ দেন।—সুতরাং রাজসাহী জেলায় বিধবার একাদশীতে জলপান কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। আমি রাজসাহীতে অবস্থান কালে একটি বালিকা বিধবা একাদশীর দিন মাটীতে পড়িয়া ছটফট্ করিতেছে এবং তাহার নিরুপায় জননী শীতল জলে গামছা ভিজাইয়া মেয়ের হাত পা প্রভৃতি মুছাইয়া দিতেছেন ইহা স্বচক্ষেই দেখিয়াছি। কিন্তু উড়িষ্যা বা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, কিম্বা মারাঠী ও মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ গণের মধ্যে, কোন স্থানেই নির্জ্জলা একাদশী প্রথা নাই। মাদ্রাজী ও মারাঠী ব্রাহ্মণগণ—মৎস্য মাংসভোজী বলিয়া বাঙ্গালীদের ঘৃণা করেন এমন কি অনেক ব্রাহ্মণ বিধবা বাঙ্গালীর বাড়ী বেড়াইতে আসিলে বাড়ী ফিরিয়া রাত্রিকালেও স্নান করিয়া শুদ্ধ হন ইহা আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই জানি। ইহারা সর্ব্ববিষয়ে নিজেদের বিশুদ্ধ হিন্দু এবং বাঙ্গালীদের অনাচারী বলিয়া মনে করেন, চৌকা প্রভৃতির নিয়ম বিশেষভাবে মানিয়া চলেন কিন্তু বিধবার নির্জ্জলা একাদশী তাঁহাদের শাস্ত্রে নাই। একাদশীর দিন বিধবাগণ তিথুর বা পানিকলের আটায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি এবং ফল ও দুগ্ধ

আহার করেন, ইহাকে "ফলাহার কি চিজ্" বলা হয়। আমার এক পূজনীয়া আত্মীয়া জব্বলপুরে থাকিতেন, তাঁহার প্রতিবেশিনী দুইজন ব্রাহ্মণ পরিবারস্থ বিধবার সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল. তাঁহারা তাঁহকে নির্জ্জলা একাদশী করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন ও বলিতেন, "আম্মা, আপানার এইরূপ উপবাস অশাস্ত্রীয়! হরিবাসর দিনে শ্রীহরির প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দমনে হরিভজন করিবেন ইহাই শাস্ত্রের বিধান, এরূপ অযথা আত্মনিগ্রহ শাস্ত্রের বিধান নয়। বিশেষ আপনি গৃহী ও একমাত্র পুত্রের জননী, সন্তানের গৃহে থাকিয়া এইরূপ নির্জ্জলা উপবাস করিয়া কেন আপনার পুত্রের অকল্যাণ করেন?"

একাদশীর ন্যায় আরও অনেক প্রথা দেশভেদে বিভিন্ন ভাবে প্রচলিত। উচ্চবর্ণের হিন্দু-বিধবাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই. কিন্তু অন্যান্য বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন স্থানে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে এবং কোথাও বা নাই। বাংলা দেশে নবশাখ শ্রেণীতে এমন কি নম শূদ্রের মধ্যেও বিধবা বিবাহ নাই, কিন্তু বেহার প্রভৃতি স্থানে কুর্ম্মী কাহার প্রভৃতি জল আচরণীয় জাতির মধ্যেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বেহারের কোথায়ও বা অত্যধিক অবরোধ ও অবগুণ্ঠন প্রথা কোথায় ও বা কেবল অবগুণ্ঠন প্রথা-আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেক অবগুণ্ঠনবতী দলবদ্ধ হইয়া পথ দিয়া গান গাহিয়া যান আবার পথে কোন পুরুষ সম্মুখে পড়িলে অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে তীব্রস্বরে "হঠ্ যাও' বলিয়া তিরস্কার করেন, ইহাতে তাঁহাদের দোষ হয় না। কিন্তু মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজে হিন্দু মেয়েদের অবরোধ নাই এবং অবগুণ্ঠনও নাই, বরং 'সোহাগিণ' বা সধবা রমণীর মাথায় ঘোমটা দেওয়া বিশেষ দোষের কথা, কেননা স্বামীই যাহার রক্ষাকর্ত্তা স্বরূপ আছেন সে কেন নিজেকে অন্যের দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবগুণ্ঠন দিবে? অতএব দেখা যাইতেছে বীরের জাতির মধ্যে অবগুণ্ঠন ও অবরোধের বিশেষ আদর নাই।

এইরূপ অনেক প্রথা ও দেশাচার যে ক্রমশঃ শাস্ত্রের অনুশাসনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে ইহাতে ভুল নাই। বিশাল শাস্ত্র সমুদ্রে পরস্পর বিরোধ অনুশাসনেরও অভাব নাই এবং প্রত্যেক দেশপ্রচলিত প্রথাকে দেশবাসীগণ শাস্ত্রের অনুশাসন বলিয়া সমর্থন করে। এককালে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া সমুদ্রযাত্রা লইয়া অনেক গোলমাল হইয়াছে, কিন্তু জগন্নাথ দর্শনের জন্য সমুদ্র যাত্রা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ছিল না। ইহার এই তাৎপর্য্য হইতে পারে যে জগন্নাথ দর্শন পুণ্যকার্য্য, সুতরাং সেরূপ কার্য্যের জন্য সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ নয়। এই তাৎপর্য্য অনুসারে বিলাসিতার জন্য ধনী ও রাজাদিগের সমুদ্র-যাত্রা নিশ্চয়ই দোষণীয় হইতে পারে কিন্তু দেশের উপর ভালবাসার জন্য যাঁহারা বিদেশে জ্ঞান আহরণ করিতে যান তাঁহাদের সমুদ্রযাত্রাও পুণ্যকার্য্যের জন্য বলিয়াই ধরিতে হইবে।

আগে সতীদাহ প্রথা ছিল, এই প্রথা যখন উঠাইয়া দিবার জন্য আন্দোলন হয় তখন হিন্দুদের মধ্যেই দুইদল হইয়াছিলেন, অর্থাৎ যাঁহারা ইহার পক্ষে ছিলেন তাঁহারা নিজেদের হিন্দু বলিয়াছিলেন এবং যাঁহারা ইহার বিপক্ষে ছিলেন তাহারাও নিজেদের হিন্দু বলিয়াছিলেন। পক্ষের লোকেদের যুক্তি এই যে, 'এই প্রথা শাস্ত্রের অনুমোদিত, সুতরাং উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। উঠাইয়া দিলে কেবল যে শাস্ত্রের অমর্য্যাদা হয় তাহা নয়, যে সকল পতিব্রতা স্বামীর চিতায় জীবন আহুতি দিবার জন্য ব্যগ্র তাঁহাদের আদর্শে সঙ্কল্পিত কার্য্যে বাধা

দেওয়া হয়, অতএব যাঁহারা আইন করিয়া এই প্রথা বন্ধ করিতে চাহিতেছেন তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ও সতীধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোর অন্যায় করিতেছেন।" আর বিপক্ষগণ বাস্তবিক যাহা ঘটিতেছে সেই সকল দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, "যে সকল নারীগণের জীবন এই সামাজিক প্রথানুসারে আহুতি দেওয়া হইতেছে বাস্তবপক্ষে তাঁহারা যে সর্ব্বত্রই স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করিতেছেন তাহা নহে, অনেকস্থলে তাঁহাদের বলপূর্ব্বক বা পাকে প্রকারে পুড়াইয়া মারা হইতেছে। সুতরাং এইরূপ নিষ্ঠুর প্রথা সমাজের পক্ষে হিতকর নয়ই বরং দারুণ কলঙ্ক স্বরূপ। অবশ্য সামাজিক বিধানগুলির আপনা হইতে পরিবর্ত্তন হওয়াই ভাল এবং ইহাতে আইনের সাহায্য না লওয়াই ভাল, বিশেষতঃ বিদেশী রাজার নিকট হইতে; কিন্তু আপনা হইতে পরিবর্ত্তনের জন্য জনমতের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন আসা প্রয়োজন, কিন্তু যদি একপক্ষ এই পরিবর্ত্তনে দৃঢ়রূপে বাধা দেন তখন কাযেই আইনের সাহায্য লওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কেননা এরূপ ভীষণ অনিষ্টকর প্রথার জন্য ধীরে সুস্থে অপেক্ষা করা চলে না।" যাহা হউক এই বাস্তববাদীদের চেষ্টায় প্রথাটী উঠিয়া গেল, আর এখন কি হিন্দু সমাজে এমন কেহ আছেন যিনি মনে করেন যে সতীদাহ প্রথা উঠিয়া যাওয়াতে হিন্দু সমাজের দারুণ ক্ষতি হইয়াছে, অথবা যাঁহারা চাহেন যে আবার সতীদাহ প্রথা প্রচলিত হউক!

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন সরদা বিল পাশ হয় তখনও "ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল" বলিয়া ভীষণ চিৎকার উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বহুসংখ্যকের মতে বিলটি পাশ হইয়া গিয়াছে এবং এই বহুসংখ্যকগণ নিজেদের হিন্দু বলিয়াই জানেন ও মানেন!

এখন প্রশ্ন এই যে, বাস্তবিকই কি এইরূপ কতকগুলি সামাজিক নিয়ম বা প্রথার উপরেই হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে? প্রথাগুলি বন্ধ হইলে বা পরিবর্ত্তিত হইলেই হিন্দুধর্ম্মের বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে? প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে যুগে যুগে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া হিন্দু সভ্যতার সাধনা বিকাশের পথে চলিয়াছে এবং যুগে যুগে নব নব ভাবে বিকশিত হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্ম ভারতের এই সাধনার প্রাণ, আর যুগধর্ম্ম তাহার এক একটা রূপ। যুগধর্ম্ম পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংঘাতে যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, পারিপার্শ্বিকের সহিত আপনাকে খাপ খাওয়াইবার জন্য যুগে যুগে নিজের রূপের পরিবর্ত্তন করিতেছে ও বিভিন্ন ভাবে বিকাশ হইতেছে। ঘটনার প্রভাবে ও যুগধর্ম্মের ভিতর প্রাণশক্তির বিকাশের তারতম্যে কখনও বা তাহার ভালর দিকে অর্থাৎ প্রকৃত বিকাশের দিকে কখনও বা মন্দর দিকে পরিবর্ত্তন হইতেছে। এক সময়ে যাহা প্রাণের বিকাশের সহায়ক ছিল হয়তো অন্য সময়ে তাহাই প্রাণের বিকাশের বাধা স্বরূপ হইল। যদি এমন ঘটে তখন যুগানুসারে আপনা হইতেই একটা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা উপস্থিত হয়। এইরূপে সনাতন ও যুগধর্ম্ম উভয়ের মিলনে গঠিত এই মহান্ হিন্দুধর্ম্ম যুগে যুগে নানা পরিবর্ত্তন, উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া নানারূপে আপনাকে বিকাশ করিয়া আসিতেছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। এই ভারতবর্ষ এককালে হিন্দু সভ্যতার ক্ষেত্র ছিল, পরে তাহা মুসলমানের শাসনের অধীন হইল। ভারতবর্ষের এই পরাধীনতার সহিত হিন্দুজাতির ক্লৈব্য যে জড়িত রহিয়াছে ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। হিন্দুজাতির শাস্ত্রানুশাসনের বন্ধনের জড়ত্বও কতকটা এই পরাধীনতার হেতুস্বরূপ কি না, এবং কতটা হেতুস্বরূপ আমাদের এই বর্ত্তমান যুগের যুগ

—সমস্যার সময়ে অতীতের সেই অভিজ্ঞতা একটি ভাবিয়াদেখিবার বিষয়—যেন জাতি একবার যে ভুল করিয়াছে এখনও সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়া সমাজের ও জাতির ক্ষতি না করে।

বাংলা দেশে একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, মহারাজা লক্ষ্মণ সেনকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়াছিলেন, "শাস্ত্রে আছে যবনগণ বঙ্গদেশ অধিকার করিবে।" এই কথায় বিশ্বাস করিয়া লক্ষ্মণ সেন শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া পিছনের দুয়ার দিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। এই কিম্বদন্তীর কতটা সত্য তাহা আমরা জানি না, কিন্তু শাস্ত্র নির্দ্দেশের উপর ভক্তি কিরূপ জড়ত্ব আনিতে পারে এই কিম্বদন্তী হইতে তাহা অনেকটা বুঝা যায়। এই ঘটনাটি সত্য বলিয়া লইলে এ ক্ষেত্রে শাস্ত্রবাক্য অবশ্য সফল হইয়াছে অর্থাৎ "যবনগণ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছে"। কিন্তু যথার্থ শাস্ত্রের নির্দ্দেশ আমাদের পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে বলে না, বরং বলে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" লক্ষ্মণ সেন যুদ্ধ করিলে শাস্ত্রবাক্য সফল নাও হইতে পারিত, এবং যদি সফলও হইত বীরের মত যুদ্ধ করিয়া মরিবার গৌরব হইতে তিনি নিজে বঞ্চিত হইতেন না এবং তাঁহার এই প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় আচরণের দৃষ্টান্ত হইতে বঙ্গদেশও বঞ্চিত হইত না।

আমি ইহার আগে বলেছি "শাস্ত্রানুশাসনের বন্ধন" একথাটি অনেকের কাছে হয়তো শ্রুতিকটু হইতে পারে, কিন্তু যাহা কিছু আমাদের দুর্ব্বলতার পরিপোষক হয় সেইটাই আমাদের বন্ধন। আমরা যখন শাস্ত্র লঙ্ঘনের ভয়ে তৃষ্ণায় কাতরকে জল দিতে সাহস করি না তখন আমরা শাস্ত্রকে মানি না, আমরা তখন মানি আমাদের অন্তর্নিহিত ভীরুতা আর দুর্ব্বলতাকে ; আর ভয়ের উপাসনা আর ধর্ম্মের উপাসনা এক নয়, বরং একটি আর একটির বিপরীত। চির প্রচলিত প্রথা অনুবর্ত্তন করিয়া চলায় কোন ও বিপদ নাই,—নিন্দার ভাজন হইতে হয় না, বরং ধার্ম্মিক নাম লাভ হয় ; পরিশ্রম নাই , কেন না স্বাধীনভাবে চিন্তা বা বিচার করিয়া দেখিতে হয় না, গতানুগতিকতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া যাইলেই হইল। বিদ্রোহ করিবার মত বা যুদ্ধ করিবার মত সাহসের দরকার নাই এবং লোকনিন্দা ও বিরুদ্ধতাকে অগ্রাহ্য করিবার মত মনোবলেরও প্রয়োজন নাই। তাহা ছাড়া যখন আমাদের আত্মসমর্থনের পক্ষে আরও একটি বিশেষ যুক্তি রহিয়াছে। আলোচনা-লেখক মহাশয় যেমন বলিয়াছেন. "পৃথিবীর কোনও সমাজ আজিও মরধামে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া মানব মানবীর দুঃখ ঘুচাইতে পারে নাই বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কাযেই হিন্দুসমাজ যদি না পারিয়া থাকে সামাজিক হিসাবে লজ্জার কথা কিছুই নাই।" সুতরাং লজ্জার বালাইও যখন নাই তখন নিশ্চেষ্টতারূপ পরম শান্তি উপভোগের পথে তো কোন বাধাই নাই।

শাস্ত্র মানিয়া চলার আরও বিশেষ সুবিধা এই যে যাহা মানিয়া চলিতেছি তাহা যথার্থই শাস্ত্রসঙ্গত কিম্বা শাস্ত্রবিগর্হিত ইহা প্রমাণ করিবার জন্যও কোন কষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় না, ইহা "শাস্ত্রের অনুজ্ঞা" বা "বেদের অনুজ্ঞা" বলিলেই যথেষ্ট হয়, সেই অনুজ্ঞাটি শাস্ত্র জলধির মধ্যে কোথায় আছে এবং তাহার যথার্থ ভাবার্থ কি তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বা বিচার করিবার প্রয়োজন হয় না। সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা সাধারণের নাই কাযেই "ঋষিবাক্য" এই নাম দিয়া যাহা তাহাদের নিকট প্রচার করা হয় তাহাই তাহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য। তাহার পর একই শ্লোক লইয়া যাহার যেমন মত তিনি সেইরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এবং করিয়াও থাকেন। আবার শ্লোক পাঠের শুদ্ধি ও অশুদ্ধিতেও গুরুতর ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। যেমন সতীদাহের

ব্যবস্থায় "অগ্রে" কি "অগ্নে" হইবে এই'র' ফলা ও 'ন' ফলার পার্থক্যের জন্য অসংখ্য রমণীকে পুড়িয়া মরিতে হইয়াছে। কিন্তু সেটী যথার্থ"র" ফলা কি "ন" ফলা আজিও স্থির হয় নাই এবং স্থির হইবার কোন সম্ভাবনা বা উপায়ও নাই।

তারপর "শাস্ত্র" এই শব্দে অনেক কিছু বুঝায়, বেদ উপনিষদ হইতে পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি যত কিছু গ্রন্থ—সাধারণ ভাবে সমস্তই "শাস্ত্র "এই আখ্যার অন্তর্ভূক্ত। বেদেরও উপনিষৎ ও কর্ম্মকাণ্ড রূপ দুটি বিভাগ আছে। হিন্দু সমাজের কালানুযায়ীসামাজিক নিয়ম ও হিন্দুর উপনিষদোক্ত সত্য সমূহ (যাহা সকল দেশে সকল কালের মানবমাত্রেরই পক্ষে পরম সত্য) এই উভয়কে যদি একই "শাস্ত্র-" আখ্যায় অভিহিত করি তাহা হইলে তাহা ঠিক বলা হয় না। সমাজের নিয়ম যে কালে কালে কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা রামায়ণ মহাভারত হইতে আলোচনা আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পরবর্ত্তী যুগের গ্রন্থকার গণের লিখিত গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। দেখিতে পাই, এককালে জাবালার পুত্র সত্যকাম ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।—শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার। (ক্রমশঃ)

গর্ভাধানের বয়স

গর্ভাধানের বয়স দ্বাদশ কিংবা ষোড়শ ইহা লইয়া কিছুদিন ধরিয়া বাদ প্রতিবাদ চলিয়া আসিতেছে। সুশ্রুত উনদ্বাদশ কি উনষোড়শ বলিয়াছেন, ইহা লইয়াই তর্কের উৎপত্তি। শ্রীযুক্ত ভার্গব তাঁহার নাতিক্ষুদ্র প্রবন্ধে সুশ্রুত যে ষোড়শ বর্ষের গর্ভাধানের বিধি দিয়াছেন, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ ও শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় 'উনদ্বাদশ বর্ষ' পাঠকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সুশ্রুতের কয়েকটি বচনাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে শ্রীযুক্ত ভার্গবানুমোদিত 'উনষোড়শ বর্ষ' পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আমরা পক্ষপাতবিহীন হইয়া সাধারণ ভাবে বিচার করিলেও ইহার সত্যতা বুঝিতে পারি।

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন যে 'রজস্বলা হইলেই তাহার রত্যনুরাগ আপনা হইতেই হইয়া থাকে' ও রজোদর্শনের চতুর্থদিনে স্ত্রীলোক মাত্রেরই ভর্ত্তৃ-সংসর্গ বিধেয়; এই দুইটি কথাই সুশ্রুত সম্মত, কিন্তু দ্বাদশবর্ষীয়া রজস্বলা বালিকারই যে ভর্ত্তৃসংসর্গ বিধেয় এমন কথা সুশ্রুত কোথাও বলেন নাই। তারপর রত্যনুরাগ হইলেই স্বামিগমন করিতে হইবে একথারও কোন অর্থ হয় না। দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার রত্যনুরাগ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু সেই অপুষ্ট শোণিতা বালিকার স্বামিগমন কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালকেরও রত্যনুরাগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই অনুরাগকে প্রশ্রয় দিয়া তাহার স্ত্রী-সহবাসের অনুমোদন কিছুতেহ করা যায় না। যৌবনের আরম্ভ এক কথা, তাহার পূর্ণ বিকাশ অন্যকথা দ্বাদশ-বর্ষ বয়সে বালিকার যৌবনোদ্গম হয়, কিন্তু তাহার বিকাশ হয় বিলম্বে। ইহা সাধারণ কথা। যাঁহারা তর্কই করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্যবস্থা স্বতন্ত্র, কিন্তু সুশ্রুত যে অসঙ্গত কথা বলিতে পারেন না এ বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনি তল্লিখিত ষোড়শ-বর্ষই স্ত্রীলোকের গর্ভাধনের বয়স বলিয়া মানিয়া লইবেন. তাহাতে সন্দেহ নাই।—শাণ্ডিল্য—

পুস্তক পরিচয়।—Michael Madhusudan and Dina Bandhu Mittra. **A compilation of two lectures and an excellent Appreciation with uncommon insight into the writings of the Bengali poets** : By *Sj. Mohendra Nath Dutt*, **brother of the great Swami Vivekananda, no less great in scholarly and cultual attainment as well as in saintly habititudes of life. The treatment is simple although holding within its compass the classical literature of Homer as also the** ***Koviwalas and Taryawalas*** of mediaeval Bengal in their references to the renaissance of Bengali literature. The picture drawn of the Bengal Soci ty of the time as also the character-paintings are remarkable. The booklet will be of equal use to the lovers of literature as also to the advanced students going up for the M. A. Examination in Bengli and other literary subjects in general. We recommend in this connection a puplic notice of the other published books of the auther – Dissertation on Painting, Reflection on Women Metaphysics, Energy, etc. to be had of 30, Cornwallis Street, Calcutta

Universal Religion—by Yogiraja's Disciple *Maitreyai* : A Comparative study of theology comprising the Faiths of our Forefathers, in the light of modern history, philosophy and science. A fairly big valume of over three hundred pages comprising material of immence value to satisfy both scholarly and spiritualistic thirst of mind. To be had of Buddha Gya Math, Benares city.

মাস-পঞ্জি— শ্রাবণ, ১৩৩৮

মহাত্মা গান্ধী সিমলাতে হোম সেক্রেটারীর সহিত সুদীর্ঘকাল আলাপ ব্যবহারের পর ভাইসরয় সহ সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন—মিঃ এম,এম, এনী বাঙ্গালার কংগ্রেস-কলহের মিমাংসা তদন্তে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন (১লা)—সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার পক্ষে কংগ্রেসের মন্তব্যের প্রতিবাদে সিন্ধুবাসী হিন্দুগণ আপত্তি তুলিয়াছেন—ব্রিটনবাসী কংগ্রেসপক্ষ মহাত্মা গান্ধীকে তথায় কোনও অভিনন্দন দিতে প্রস্তুত নহেন—বিখ্যাত ইংরেজ ব্যবসায়ী স্যর ভিকটর সেস্থন চিরতরে ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন—বিলাতী কহিনুর বিখ্যাত 'ক্যানিং জুয়েল' দশ হাজার পাউণ্ডে বিক্রীত হইল—ফরাসী গভর্ণমেণ্ট জারমানিকে ১০০০ ০০০ ০০০ পাউণ্ড ঋণ দিতে প্রস্তুত—বিগত কয়েক মাসের মধ্যে পাঞ্জাবে ৩৬ জন হিন্দু কুসীদজীবি মহাজনের হত্যা হইয়াছে—বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার এক অধিবেশন হইল (৩রা)—যে দুইজন পাঞ্জাবী মুসলমান কলেজ ষ্ট্রীট হত্যা ব্যাপারে আসামী বলিয়া ধরা পড়ে বিচারে তাহাদিগের ফাঁসীর হুকুম হইল (৪ঠা)—ব্যবস্থাপক সভার মতে গোল টেবিল বৈঠকে আরও অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী প্রতিনিধি যাওয়া উচিত ছিল—মিসেস বেরিং নাম্নিকা একজন প্রসিদ্ধ বিমান চারিণী নিজ পোতে ভ্রমনকালে পতনে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে—ব্রহ্মদেশে বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি চলিতেছে—প্রসিদ্ধ সমাজসাম্যবাদী শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায় ভারতীয় রাজসরকার কর্ত্তৃক বোম্বাইতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন—মহাত্মা গান্ধী ও ভাইসরয়ের পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ হইতেছে—ভারতীয় ষ্টেট

রেলওয়ে সমূহে ভারতীয় কর্ম্মচারিগণকে সরাইয়া এংগ্লোইণ্ডিয়ান নিযুক্ত করা হইতেছে বলিয়া কমন্স সভায় কথা উঠিয়াছে—প্যালেষ্টাইনের কৃষক দিগকে ঋণ দিবার জন্য ইংলণ্ডে আয়োজন হইতেছে—পুণা ফারগুসন কলেজ পরিদর্শন কালে একজন সশস্ত্র ছাত্র বোম্বাই লাট স্যর আরনেষ্ট হট্‌সনের উপর গুলি বর্ষন করে (৬ই)—মহাত্মা গান্ধীর সিমলা গমনে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা —পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সিমলাতে সরকার পক্ষের সংকারে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন—বুসাবলের নিকট দুইজন সামরিক কর্ম্মচারীকে পাঞ্জাব মেলে হত্যা করা হইয়াছে—চট্টগ্রাম অস্ত্র লুণ্ঠন ব্যাপারের মামলায় এ যাবত ৩১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে—লর্ড ইঞ্চকেপ বিলাতে লর্ড আরউইনের ভারতসম্বন্ধে মনোবৃত্তি তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন—চব্বিশপরগণার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ মি এম আর গারলিক বিচারাদালতে এক যুবকের গুলিতে হত হইলেন (১১ই) —যুবকও নিজ গুলিতে মৃত (১১ই)—সুরতে গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব আদায় লইয়া গান্ধী-আরউইন সন্ধি-সর্ত্ত লঙ্ঘন করিতেছেন বলিয়া মহাত্মা তীব্র মত প্রকাশ করিয়াছেন—বালি পুলের শেষ জল-স্তম্ভটি স্থাপন করা হইল (১২)—মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভা প্রস্তাব করিয়াছেন যে অচিরে মাদ্রাজী যুবক দিগকে লইয়া ১০টী সৈনিক দল গঠন করা হউক—কাশ্মীর রাজ্যে মুসলমান সমস্যা লইয়া এক গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে—বাঙ্গালাতে পুলিশ শক্তি বর্দ্ধনের প্রস্তাব—যুক্তপ্রদেশে কৃষাণ সমস্যা—সিন্দু হায়দরাবাদে সর্দ্দার আইন ভঙ্গ লইয়া কয়েকটী মোকদ্দমা উপস্থিত —স্বরাজ গভর্ণমেণ্টের সময় সরকারী কর্ম্মচারীদিগের বেতন সম্বন্ধে মহাত্মা আপন মতে দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছেন—উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র ভীষণ জলপ্লাবন উপস্থিত (২০)—কমন্স সভায় ভারত গভর্ণমেনটের তীব্র সমালোচনা হইয়াছে—সেণ্ট বার্ণার্ড নামক খৃষ্টান সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় হিমালয়ের উপর কোনও স্থানে একটী মঠ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন—মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই গমন করিয়াছেন—মিঃ শকতওয়ালা কংগ্রেসকার্য্যপদ্ধতিকে চতুরতা ও ধূর্ত্ততার ক্রিয়া বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন—স্যর চারু চন্দ্র ঘোষ অস্থায়ী ভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচার পতি নিযুক্ত হইয়াছেন—কাশ্মিররাজ্যের মুসলেম গোলযোগ লইয়া সমগ্র ভারতের মুসলমান পক্ষে কাশ্মীর রাজের নিকট একটী ডেপুটেসনে যাইতে চাহে, রাজা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন—মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস দলের গোলটেবিলে যোগ দান লইয়া পুন আপত্তি উঠিয়াছে দীল্লির সর্ত্ত অমান্য করিয়া সরকার পক্ষ দোষ করিয়াছেন, বলিয়া ইহাদের এই আপত্তি। যদিও মহাত্মা বলিতেছেন যে, এখনও গোল টেবিলে যাওয়ার পথ খোলা হইতে পারে—The wav is still open for a resumptions of the negotiation relating to his visit to Ergland (২৯শে)—কংগ্রেস প্রথম দাবী করিয়াছিলেন যে সরকার দীল্লির সন্ধির সর্ত্ত ভাঙ্গিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন সালিসী মধ্যস্থতার তাহার বিচার হউক পরে দাবী করিয়াছেন যে কোনও নিরপেক্ষ সরকারী কর্ম্মচারী তদন্ত করিলেই হইবে—কানপুরের ষড় যন্ত্র মামলার সহিত শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায়ের বিচার ব্যবস্থা হইল—স্পেনের হৃত-রাজ্য রাজা এলফনজো ষ্টকহলমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—মহাত্মা গান্ধী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটী বিস্তৃত চার্জ্জ সিট্ প্রস্তুত করিয়াছেন (৩১শে)।

ভারতের সাধনা

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

দ্বিতীয় বর্ষ] ভাদ্র—১৩৩৮ [একাদশ সংখ্যা

সাধনার পথে

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধনা

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাধনাগত পার্থক্য বিস্তর। প্রাচ্য—প্রাচীন, পুরাতন, পূর্ব্বদেশীয়, পূর্ব্বকালীন; মানব সাধনার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ তার আদর্শ ও প্রধান প্রতীক। প্রতীচ্য—পশ্চিমদেশজাত, আধুনিক, অর্ব্বাচীন, নবীন; মানব সাধনার দৃষ্টিতে ও বর্ত্তমান জগতের উপর আধিপত্য দেখিয়া বিচার করিলে ইংলণ্ডই তাহার আদর্শ।

বিধাতার বিচিত্র বিধানে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে সংযোগ ঘটিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাধনার মধ্যে তাহাতেই যে সংঘর্ষ ঘটিয়াছে, এমন আর কিছুতে নহে। এই সংঘর্ষের পরিণাম ভবিষ্যৎ মানবের সৃষ্টি।

সংঘর্ষ বাড়িয়া উঠিয়াছে প্রধানতঃ দুই দিক হইতে—প্রজ্ঞা মনীষা বা জ্ঞানসম্পদের দৃষ্টিতে ও রাষ্ট্রশক্তি বাণিজ্য শক্তি বা অর্থসম্পদের দিক দিয়া।

আগন্তুক ইংরেজেরা প্রথমতঃ অর্থাহরণের জন্যই মাত্র ভারতে আসিয়াছিল; কিন্তু তাহার আনুসঙ্গিক ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের দিকেও তাহাদের নজর না পড়িয়া পরে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতাতে তাহাদের গবেষণা আগারের (এশিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল) প্রতিষ্ঠা ও তৎকালে কয়েকজন ইংরেজ মনীষির (উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি) আগমন তাহার সহায়ক হয়। ইঁহাদের বার্ত্তাবাহী আর কয়েকজন মনস্বী দ্বারা তখন প্রাচীন ভারতের জ্ঞানগরিমার ছটা

আধুনিক ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু ইংলণ্ডের বাহিরে ইউরোপীয় অন্যান্য রাজ্যসমূহে তাহার যেরূপ সমাদর হয়, প্রভুত্বাভিমানী ইংরেজের দেশে সেরূপ হয় না। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রশক্তিতে বলীয়ান ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা ভারতে যে শিক্ষা ও শাসননীতি পরিচালন করিতে থাকেন তাহাতে ভারতীয়ের মনোবৃত্তি দিন দিন পাশ্চাত্যের ভাবে অভিভূত ও তাহাদের স্বকীয় সাধনা শক্তি ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। আজ সে পতন ও পরাজয় কত গভীর তাহা ভাবিয়াও স্থির করা কঠিন !

কিন্তু ইহারই মধ্যে যুগানুকূল ভারতীয় সাধনায় প্রকৃত সিদ্ধ ভারতের একজন পরাভূত ও প্রচ্ছন্ন ভারতের বিজয় পতাকা পাশ্চাত্যের আর এক প্রদেশে গিয়া উড্ডীন করিয়া আসিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার বাণী কেহ উপেক্ষা করিতে পারে নাই, উহা আজ অনেকেরই হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সাক্ষাতে অনুবর্ত্তন না করিলেও ভারতীয় সাধনার বিভূতি ও মহিমা আর কেহ অমান্য করিতে পারে না। এইরূপে একদিকে প্রাচ্যের জয়পতাকা প্রতীচ্যের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। শত শত সৈনিকের আবশ্যক যাঁহারা তার গৌরব রক্ষা করিবে।

রাষ্ট্রনীতি বাণিজ্যশক্তি ও অর্থ-বলে ভারত ইংলণ্ডের নিকটে অষ্টশূল জন্তুবিশেষেরই কবলে। ইহা হইতে উদ্ধারের কোনও উপায় আছে বলিয়াই কেহ মনে করিতে পারিত না। কিন্তু এখানেও বিধাতার চক্র ঘুরিয়াছে। ভারতের সত্য সাধনার আজীবন সাধক—আর একজন তাঁহার বজ্রকঠিন জীবন-অস্ত্র লইয়া তাহারই পথ নির্দ্দেশ করিয়া চলিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী পতিত ও নির্য্যাতিত ভারতের বিজয়কেতন আধুনিক জগতের সর্ব্বপ্রকার বিভবমণ্ডিত বক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যক্রম ও জীবনপ্রণালী অদ্যকার জগতের প্রধান অনুধাবনের বিষয়। দেখিয়া চমৎকার ও হৃতবুদ্ধিতা আইসে। তাঁহাকে বুঝিলে ভারতকে বুঝিতে হয়, ভারতকে বুঝিলে তাহার কাছে পরাজয় অবশ্যই আইসে। জগতের সকল প্রকার অস্ত্রের বিরুদ্ধে ভারতের নিজস্ব অস্ত্র আছে। আজ তাহা দ্বারা মহাত্মা সকল বিজয়ীকে পরাহত করিতে চলিয়াছেন। ৫।

মহাত্মার অভিযান—ডাণ্ডী ও লণ্ডন

ডাণ্ডীর সমুদ্রতীর যাত্রার ন্যায় মহাত্মা গান্ধীর বিলাত যাত্রাকে অভিযান পর্য্যায়েই ফেলিতে হয়। সেবারের আক্রমণ ছিল ইংরেজ রাজসরকারের সুরক্ষিত লবণের গোলার উপলক্ষ্যে; এবারের আক্রমণ ইংরেজের রাজবুদ্ধি, পাশ্চাত্যের মনোবৃত্তি ও জগতবাসীর সৎ মতির উপরে। ডাণ্ডীর লবণরাশি অধিকার করাই মহাত্মার উদ্দেশ্য ছিল না—তাহা হয়ও নাই। কিন্তু তাহাতে সুদৃঢ় ইংরেজরাজের ভিত্তি টলিয়াছিল, সমুদয় ভারতব্যাপী বন্দী সৈনিকের ছাউনী পড়িয়াছিল।

সে আক্রমণ ছিল বীর সৈনিকের প্রথম উপক্রম। সুদীর্ঘ যাত্রার ক্লেশ, লোকের কোলাহল ও অবশেষে রাজপুরুষদিগের হাতে নির্য্যাতন। কিন্তু তার পরোক্ষ ফল ফলিয়াছে—ভাবনার অতীত। জগতের আর কোনও সামরিক অভিযানের ওরূপ ফল হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

মহাত্মা বিলাত যাত্রা করিয়াছেন ইংরাজ রাজসরকারের সহিত চুক্তি বা সন্ধির ফলে। প্রথম ডাণ্ডী যাত্রার সহিত এ যাত্রার সম্বন্ধ আছে। দুই যাত্রাতেই মহাত্মা নিজে তুল্যরূপে আগ্রহশীল। যাত্রার কঠোরতা ছিল, প্রতি পদে উদ্বেগ ছিল। এবার রাজপুতানা জাহাজে হাসিয়া খেলিয়া কুকুর বিড়ালকে আদর করিয়া ও কৌতুক করিতে করিতে গিয়া লণ্ডন সহরে বিপুল সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছেন। কিন্তু যে গোলটেবিল মীমাংসার বৈঠকে তিনি আমন্ত্রিত হইয়াছেন, তাহার কার্য্যফল সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস নাই। তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন—'The horizon is as black as it possibly could be. There is every chance of my returning empty-handed—পারিপার্শ্বিক অবস্থা বড়ই আঁধারে ঘেরা, রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসার আশঙ্কাই অধিক।' কিন্তু তা বলিয়া এ যাত্রা বিফল হইবে অনুমান করা সঙ্গত নয়।

গোলটেবিলে গোল।

মহাত্মা ইতিমধ্যে গোলটেবিল বৈঠকের যে দুই একটী উপসমিতিতে যোগদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সরল সহজ ও কার্য্যোপযোগী ব্যবহার দেখিয়া অনেকেই মোহিত হইয়াছেন—শত্রুপক্ষ আশঙ্কিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে বিলাতের মন্ত্রী পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া গিয়াছে। ভারতের ভাগ্যবিধাতৃ নবমন্ত্রী কহিয়া বেড়াইতেছিলেন যে—'ক্রিয়াত্মকভাবে সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে, ভাবপ্রবণতায় চলিবে না'। ঐ উক্তিতে মহাত্মার আদর্শবাদের উপর অস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু মহাত্মা গিয়া কি করিলেন? প্রথম বৈঠকেই গিয়া বলিলেন—এ কি দেখিতেছি? এ যে কার্য্য না করিবার জন্যই সকল ব্যবস্থা! কোনও কাজ করিতে হইলে কি এমন অনিশ্চয়তার ভাবে এত বিলম্ব ও শৈথিল্যের সহিত চলিতে হয়!

যাহারা এ দেশের রাজসরকার কর্ত্তৃক আবহমানকাল প্রবর্ত্তিত অনুসন্ধান 'কমিশন' প্রভৃতি বৈঠক ও মীমাংসা সমিতির বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাহাদিগকে এইরূপ অনিশ্চয়তা, বিলম্ব ও শৈথিল্যের কথা নূতন করিয়া বুঝাইতে হয় না। তাহার ফল কিভাবে কি হয়, তাহাও অজ্ঞাত থাকে না।

আর একটী বিষয়ও সাধারণের অপরিজ্ঞাত নহে—কিন্তু তাহা মহাত্মার মুখে সময় ও

অবস্থানুসারে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোলটেবিলে উপস্থিত ভারতীয় সদস্যগণ যে কেহই ভারতীয় জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নহে, ভারতীয় জনমত বাহনেরও অধিকার তাহাদের নাই, তাহারা সকলেই ইংরাজ রাজসরকারের মনোনীত লোক—এই গোড়ার কথাটী তিনি সুস্পষ্টভাবে পার্লামেণ্টের সভ্যমণ্ডলীর সমক্ষে বলিয়াছেন। শুনিয়া সকলেরই নীরব ও মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

এইরূপ গোলাবর্ষণের ফলাফল সম্বন্ধে কিছু বলা এখনও চলে না। সত্য ও ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হইতে পারে। কিন্তু তাহা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আর ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞদিগের গায়ের চামড়া নাকি খুবই পুরু।

জন্মাষ্টমী

ঘোর বরষার ঘন মেঘরাশির মধ্য হইতে বজ্রাগ্নির প্রচণ্ড জ্যোতি প্রকাশ পায়, গভীর শৈলগহনের সুকঠিন প্রস্তররাশি ভেদ করিয়া নির্ঝরিণীর পূত ক্ষরণ দেখা যায়, প্রখর মরুকান্তারের অনলরাশির মধ্যে সুশীতল জল-বাহি পান্থ-পাদপের সৃষ্টি হয়। জাগতিক ব্যাপারের অতি ক্ষুদ্র অংশে এই যে সকল অঘটন ঘটে মানবের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি বিচার তাহার কুলকিনারা করিতে পায় না। মানবিক ব্যাপারে যাহা অহরহ ঘটে তাহাতেই তাহা বুঝিবার অবকাশ ঘটে।

মানবের ভাগ্যাকাশে যে সময় সময় ঐরূপই তমসার ঘনঘটা নিবিড়তর হইয়া উঠে, পাষাণ-প্রাচীরের কঠিন নিগড় লোক ও সমাজ ব্যবহারে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হয়। জাতি ও ভ্রাতৃ-দ্রোহের প্রবল অনলে সংসারকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে—মানুষ অন্ধকারে বিহ্বল হয়. বিভীষিকা বিচলিত হয়, পাষাণ চাপে অধীর হইয়া পড়ে, কারা-পীড়নে রুদ্ধশ্বাস হইয়া থাকে, দারুণ :তাপে প্রাণ ছটফট করে, দেহ থর থর কাঁপে—দুর্দ্দশার সীমা দেখা যায় না, আর উপায় থাকে না, আশার লেশমাত্র নাই—তখন তাহারই মধ্যে আলোক জ্বলিয়া উঠে। আবার পথ দেখা যায়, পাষাণ চাপ অপসারিত হয়, কারার শৃঙ্খল শিথীল হয়, দুঃখ ভয় বিভীষিকা সমুদয় অপসারিত হয়—জগজ্জন আবার সুস্থ, সবল ও মুক্ত হইয়া চলে।

কিন্তু কেমন করিয়া সে ঘোর তমসায় আলোকজ্যোতি ফুটিয়া উঠে—ঘন ঘোর মেঘে বিদ্যুল্লতা প্রকাশ পায়, পাষাণে সলিল বহে, অগ্নিতে শৈত্য প্রকাশ পায়? সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতাগণ কেমন করিয়া অব্যবস্থা হইতে ব্যবস্থার সৃজন হইল তাহা বলিতে গিয়া ভগবদিচ্ছার পরিকল্পনা করিয়াছেন। অতি-প্রাকৃতের দূরতর ভূমিতে সে মহদিচ্ছার স্থান। হিন্দু সাধনার দৃষ্টিতে তাহা আরও অনেক নিকটে। মানবের ইচ্ছায় ভগবদিচ্ছারই প্রতিচ্ছায়া রহিয়াছে। সর্ব্বজগৎময় তাঁহারই ইচ্ছার ক্রীড়া তরঙ্গ চলে। তাঁর গ্রহণ, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ শক্তিও

সে ক্রীড়া তরঙ্গের ঘটে ঘটে বিদ্যমান। তাই ভারতীয় সাধনার ভূমিতে সৃষ্টির প্রথম স্তরে রহিয়াছে ঘোর তপস্যা। এই তপস্যা দ্বারা অব্যবস্থ ব্যবস্থায় আসিয়াছে, অঘটন ঘটনায় পরিণত হইয়াছে—আদি দেব ব্রহ্মার তপস্যা, প্রজাপতি দক্ষের তপস্যা, নবসৃষ্টিকামী বিশ্বামিত্রের তপস্যা! তপস্যা-স্তব-স্তুতি—হিন্দু সাধনার ইহারা অমোঘ যন্ত্র। অতি প্রাকৃতের সহিত প্রাকৃতের সম্বন্ধ সংস্থাপনার অসাধারণ সাধন।

অতীতের কোন্ এক যুগে ঘোর তমসার অন্ধকার জগৎ জুড়িয়া বসিয়াছিল! যুগে যুগে তাহা হয়। পাপের স্রোত প্রবলবেগে বহিতেছিল। অত্যাচার উৎপীড়নে সৎপুরুষ ও সাধ্বী নারীর প্রাণ অতীষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল—পর্ব্বতপ্রমাণ পাষাণ বুক জুড়িয়া চাপিয়া রহিয়াছিল, হস্তপদ লৌহ-শৃঙ্খলে আঁটা—চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে কারার লৌহ বেড়া। সশস্ত্র কংস চরেরা সদা প্রাণ হননে উদ্যত! উপস্থিত দবকীবসু পিতৃমাতৃকুল—মৃত্যুর কবলে শায়িত—ভবিষ্যৎ বংশধরগণেরও নিস্তার নাই—একে একে সকলকে বিনষ্ট করা হইয়াছে—আরও হইবে। তখন দেবতার আসন টলিয়াছিল, বিশ্বপ্রকৃতি কম্পিত হইয়াছিল, তরুলতা সাড়া দিয়াছিল—ঘোর তপস্যা চলিয়াছিল। দেবতারা স্তুতি-গান করিয়াছিলেন, কারারুদ্ধ নরনারীর উচ্চ স্তব উঠিয়াছিল। ভগবদিচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল—চিরদুরিতরূপী কংসের নিধনকল্পে কারাবাসের অধিষ্ঠানের মধ্যেই কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন—সেই জন্মাষ্টমী!

জন্মাষ্টমী হিন্দু ভুলে নাই—ভুলিতে পারে না। তাই সে মরিয়াও বাঁচিয়া আছে ও বাঁচিয়া থাকিবে। জন্মাষ্টমী যুগে যুগে হইয়াছে, যুগে যুগে হইবে। হিন্দু সে যুগকে বৎসরে পরিণত করিয়া ঘরে ঘরে তাহা পালন করে।

জগত্তত্ত্বের চরম সত্য লইয়া হিন্দুর সাধনা। কৃষ্ণতত্ত্ব তাহাই। মানুষকে সংসারে চলিতে চলিতে যখন যে অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতে হয়, তাহার চরম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় কৃষ্ণচরিত্রের স্তরে স্তরে; আর মনুষ্য-জীবনের যখন যে অবস্থায় যত রকমের সমস্যা উঠিতে পারে, তাহার চরম মীমাংসা রহিয়াছে তাহার শিক্ষায়- গীতায়। তাই তত্ত্বের অনুশীলনরত ভারতবর্ষ শ্রীকৃষ্ণকে এমন আপন করিয়া লইয়াছে। পরিপূর্ণ ভারত এক কৃষ্ণেতেই প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে। বাল্য ও কৈশোরের অসাধারণ ক্রীড়াকৌতুক, যৌবনের অরাতিনিধন ও নানাবিধ অভিযান, প্রৌঢ়ের পরিণতকালে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে মহাভারতের সংযোজনা—ধর্ম্মরাজ্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও যুগে যুগে তাহা প্রতিষ্ঠার আশ্বাসবাণী দান—এ সমুদয় একে একে ধরিলে মানবীয় পরিপূর্ণতার আর বাকি কিছু থাকে না। ভারত তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিল সেজন্যই বিভিন্ন লোকে নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ ও আরাধ্য বলিয়া পূজা করে—কৃষ্ণজয়ন্তী ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হয় এই কারণে। কেবল ভারতে যাহা আছে সমুদয় জগতে তাহাই হইতে পারে।

জন্মাষ্টমী অতীতের ঘটনা নয়—বর্ত্তমানে উদ্দীপনাদায়ক ও ভবিষ্যতের পরিচালক। রাম-কৃষ্ণকে অতীতের ঘটনাজালে নিবদ্ধ করিয়া রাখিও না—তবে তাঁহাদের আরাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ঐতিহাসিকের গবেষণা বা প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে তাহার সার্থকতা নাই—অতীত ঘটনারাশির মধ্যে ফেলিয়া মৃত শবের ন্যায় তাঁহাদের পশ্চাতে রাখিয়া টানিয়া লইয়া চলিলে চলিবে না—কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বদাই তোমার অগ্রে এবং এই বলেই জন্মাষ্টমীর ব্রত উদ্‌যাপনের সার্থকতা।

সারা নিশিদিন জাগিয়া উপবাসে দেহ মন ও প্রাণ সংযত করিয়া প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাক—ঘোর নিশার গভীর আধারে কবে তোমার সমুদয় আশা আকাঙ্ক্ষা সফল করিতে কৃষ্ণজ্যোতি প্রকাশ পাইবে—তোমার সমুদয় অনার্য্য ভাব ও ক্লৈব্য ধ্বংস করিয়া দিয়া কুরুক্ষেত্রের মহা আহবে বিজয় কেতন উড্ডীন করিয়া দিতে—তোমার বিজয় অভিযানের মহারথের সারথীরূপে কার্য্য করিতে !

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম আজ লোক চক্ষে বড় বড়। চাটিগাঁকে লোকে এক নিরীহ জনতার বাসভূমি বলিয়া জানিত। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ও খৃষ্টান একস্থানে সকল বহু জাতির বাস চট্টগ্রামে যেমন এমন আর অন্যত্র দেখা যায় না। ইহারা সকলেই পরস্পর প্রীতির ভাবে বাস করিত। প্রকৃতির রম্যভূমি চট্টলদেশ জন-সাম্যেরও স্থান বটে। এই বহু আন্দোলনের দিনে চট্টগ্রাম এযাবত তেমন প্রকাশ লাভ করেন নাই।

যেদিন চট্টগ্রামে আরমারী রেইড্ বা নিশিতে অস্ত্র লুণ্ঠনের সংবাদ প্রকাশিত হয়, সেদিন সকলেই অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়াছিল আজও সে ধাঁধা সকলের মিটে নাই। রাজসরকার তাহার প্রতিকার করিতে যাইয়া সামরিক আয়োজন করিলেন নাগরিক জনসাধারণের উপরে সামরিক আইন জারি হইল। অন্যথা উৎপীড়ন কম হইল না। কিন্তু হিংসাতে হিংসা বৃদ্ধি পায় আর হিংসাবাদী বিপ্লব-পন্থীরা তাহাতে সুবিধা পায়। তাই পুলিশের নায়ক খাঁন বাহাদুর আসাদুল্লা বিপ্লবীর হাতে নিহত হইয়া চট্টগ্রাম দুর্দ্দশার স্রোত আরও শত দ্বারে খুলিয়া দিয়াছেন। পরদিন সকাল হইতে সহস্র সহস্র লোক দা, কুড়াল, সাবল ও লাঠী ও হাতুড়ী ইত্যাদি সহ সহরে আসিয়া জমাট হইল ও হিন্দু দোকানদারদের দোকান ভাঙ্গিয়া জিনিষপত্র টাকাকড়ি সোণারূপা অলঙ্কারাদি লইয়া গেল। অনেক দোকানের জিনিষপত্রাদি বাহির করিয়া ঘরে আগুন দিয়াছে। কয়টী দোকান একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। বহু লক্ষ টাকা এইরূপে নষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনেক স্থানে ভদ্রলোকের বাড়ীতেও লুট চলিয়াছে ও অনেকে নিতান্ত জঘন্যরূপে প্রহৃত ও নির্য্যাতিত হইয়াছেন। মহিলা ও বালিকারা তাহাতে অব্যাহতি পায় নাই। কেবল মাত্র সংবাদ পত্রে পড়িয়া এই ভীষণ অবস্থার বাস্তবিক বর্ণনা করিতে পারা যায় না। যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ও ভুক্তভোগী তাহারাই ইহার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী দিতে পারেন।

এই যে চিত্র তাহা কেবলমাত্র এই পরাধীন ভারতের—বিশেষ করিয়া হিন্দুদিগের - নিতান্ত উপায় হীনতার ও সঙ্কটের কথাই স্পষ্ট বলিয়া দেয়। আজ চট্টগ্রামে যে অবস্থা বাঙ্গলার প্রত্যেক পল্লীতে তাহা যে কোনও সময় ঘটিতে পারে। ইহা হইতে ভীষণতর অরাজকতা আর কি হইতে

পারে। ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের বিস্পষ্ট বর্ণনায় এদেশের অরাজকতায় সময়ে বর্গীর হাঙ্গামার এক বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু বর্গীর অত্যাচার প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাদিগেরই সহ্য করিতে হইত; হিন্দু প্রজার উপরে অত্যাচার হইবে এই আশঙ্কায় মুসলমান শাসনকর্ত্তারাই গিয়া চৌথ দিয়া অত্যাচারীকে ঠাণ্ডা করিতেন—প্রজার উপর অত্যাচার হইতে দিতেন না। নাদির সাহ, চঙ্গিস খাঁ প্রভৃতির লুটতরাজের কথা শুনা যায়; কিন্তু তাহা যুগ যুগান্তে একবার হইয়াছে। কিন্তু চট্টগ্রামে যাহা হইয়া গেল, কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকা ও কিশোরগঞ্জে তাহাই হইয়া গিয়াছে। প্রতি ঘরে প্রত্যহ তাহা হইতে পারে। এ আতঙ্কের কাহিনী ও ত্রাসের কথা প্রায় প্রত্যহই শুনা যইতেছে।

অবশ্য এজন্য ইংরেজ রাজসরকারকেই প্রধানতঃ দায়ী করিতে হয়। রাজ শক্তি কি বাস্তবিকই এত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে যে দিনে দুপ্রহরে সহরের প্রকাশ্য রাজপথে গ্রামবাসী সাধারণ জনতা ও গুণ্ডাদিগের অত্যাচার নিবরাণ করিতে পারিল না! বিশেষ তখন পুলিশ ও সামরিক আয়োজন অতিরিক্ত ভাবেই সহরে বিদ্যমান!

এই সময়েই বিলাতে গোলটেবিলের দরবারে ইংরেজ রাজপুরুষেরা ভারতের ভাবী শাসন সংস্কার ব্যবস্থা কবিতে বসিয়াছেন! বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থা দেশ শাসনে কতদূর সক্ষম বা অক্ষম এ বিচার সে দরবারে সর্ব্বাগ্রে হওয়া আবশ্যক। জানিনা দেশের পঙ্গু প্রতিনিধিগণ সে বিচারের প্রার্থী হইবেন কিনা?

কিন্তু শাসন কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে একটি যুক্তি থাকিতে পারে—হিন্দুগণ একালে জাতীয় আন্দোলনে অগ্রণী। তাহাদিগের মধ্য হইতেই প্রধানতঃ বিপ্লব পন্থীরও সৃষ্টি হইয়াছে। সরকার তাহা দমন করিতে নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। মুসলমানকে বিপক্ষ করিয়া তাহা সংসাধন করিবার একটা নীতি আছে। পরিণাম যাহাই হউক উপস্থিত ফল তাহাতে দেখা যায়। ইতিপূর্ব্বে যে যে স্থানে এরূপ দাঙ্গা লুণ্ঠনাদি হইয়াছে তাহাতে ঐরূপ আভাস পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম ব্যাপারের তদন্তে যাহারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহাদিগের কথায়ও এরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কেহ কেহ অতি তীব্র ভাষাতে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, গুণ্ডাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ঐরূপ কথা প্রকাশ করিয়া দিতেছে! সরকারী পুলিশ কর্ম্মচারীগণ ঐ দাঙ্গা ও লুট কারীগণের সাহায্যই করিয়াছিল, তাহাতে বাধা দেয় নাই—এইরূপ! আজ দেশের লোকের মধ্যে সর্ব্বত্র এই ধারণা বদ্ধমূল। কিন্তু ইহাই কি ভারতে বৃটিশ রাজত্বের প্রকৃত অবস্থা!

বিপরীত পন্থী

দেশ আজি শান্ত নীতি বশে স্বাধীনতা অর্জ্জনে অগ্রসর হইতেছে। ভারতের প্রকৃতি উহাই ; ভারতের সাধনার বৈশিষ্ট্যও তাহা। অহিংসা ও বিনা রক্তপাতে একমাত্র ভারতেই বিপ্লব সম্ভবপর। অহিংসা মন্ত্রের সাধক মহাত্মা গান্ধী সেই মহা বিপ্লব যজ্ঞের ঋত্বিকরূপে আজ জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান। ভারতের অন্তরাত্মা তাঁহাকে এই প্রেরণা দান করিয়াছে। আজ সমগ্র ভারত তাহার সঙ্গ ধরিয়া চলিয়াছে। সমগ্র জগত এই অহিংস্র সংগ্রামের পরিণাম দেখিবার জন্য সসম্ভ্রম প্রতীক্ষা করিতেছে। আজ যাহারা বিপরীত পথে চলিয়া হিংসা-নীতির কোনও রূপ প্রশ্রয় দিয়া চলিতেছেন, তাহারা যে কেবল মাত্র ভারতের স্বাধীনতার পথের পরিপন্থী তাহা নহে, জগতের মানবজাতিরও শত্রু। এ বিষয়ে চট্টগ্রামের অত্যাচার কারী ও হত্যাকারী উভয়েই এক শ্রেণীর অন্তঃভু'ক্ত।

যাঁহারা অহিংসাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা অহিংসা নীতিতেই বিশ্বাসবান। এই অহিংসা সংগ্রামের দ্বারাই এমন ফল অর্জ্জন করা যাইতে পারে যাহা সহস্র হিংস্র সংগ্রামের দ্বারা কেহ কখনও লাভ করিতে পারে না। ভারতবর্ষ চিরকাল পৃথিবীর মানবকে নানা বিষয় শিক্ষা দিয়াছে। এই যুগেও ভারতের কাছে জগতের শিক্ষা করিবার অনেক রহিয়াছে। এই অহিংসা বাণী জগতের শিক্ষার জন্যই আসিয়াছে। চতুর্দ্দিকে জড়বাদী বিজ্ঞান ও ভোগ লালসায় উন্মত্ত মানবের মনে যে হিংসা বিদ্বেষ ও পরস্পরের ধ্বংসের ভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে ভারতের এই বাণী শুনিবার নিমিত্ত জগতবাসীর একান্ত আবশ্যকতাই রহিয়াছে। জগতের লোক ধীরে ধীরে এই দিকে কর্ণপাত করিতেছে। যদি বর্ত্তমান ধ্বংসোন্মুখী মানব সমাজের কল্যাণ বিধাতার ইচ্ছাতে থাকিয়া থাকে তবে সকলেই এই বাণীকে বরণ করিয়া লইবে। মতিবিভ্রান্ত ও মদোন্মত্ত ব্যক্তিরাই এই কল্যাণ বাণীর বিপরীত পথে চলিতে চাহে। আজ ভারতে যে দুই হিংসানীতির সমর্থন ও প্ররোচনাদাতা দুই বিপরীত পন্থীর উল্লেখ করা গেল, ইহাদের একের সুমতি হইলেই অপরেরও দুর্ম্মতি ফিরিয়া যায়। আজ এক-চতুর্থ শতাব্দি যাবত যে হিংসা নীতি ইহাদের পরস্পরের হিংসাকে বৃদ্ধি করিয়াই চলিয়াছে, তাহাদের এক পক্ষের বিরতি ঘটিলে অপরেরও কল্যাণ সঙ্গে সঙ্গে আইসে। বিপরীত পন্থীর কার্য্যগতি এইরূপেই চলে !

শাস্ত্র মানিব কেন ?

(সত্য-শাস্ত্র-বিজ্ঞান-বিচার সমন্বয়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পদার্থ বিজ্ঞানের সত্যভ্রংশ

২৩। **পদার্থ ও তেজোবিপর্য্যয়**—নটরাজ নববিজ্ঞানের নাট্যলীলার ক্রমবিকাশ এক অপূর্ব্ব বুদ্ধিসম্মোহনকরী অঘটনঘটন পটীয়সী শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জগৎ একই মূলপদার্থে গঠিত (২১প')। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইল—পদার্থও (Matte) "তড়িৎশক্তির" (Electricity) বিজ্‌ম্ভন মাত্র (Electrons and Protons)। অমনি পদার্থ বিজ্ঞানে সিদ্ধান্ত হইল পদার্থ নাই জগৎ তেজের (Energy) বিকাশ মাত্র। তাহার পর দেখা গেল এই তেজ ঠিক সূক্ষ্ম দ্রব্যাণুর (Particles) ন্যায় আচরণ করে। তখন ঠিক হইল পদার্থও আছে তেজও আছে। সেই পদার্থ কখনও তেজ হয় কখনও পদার্থই থাকে, আর সেই তেজ কখনও পদার্থের ন্যায় কখনও তেজের ন্যায় আচরণ করে। বুদ্ধিহত হইয়া নববিজ্ঞান যখন যেমন সুবিধা তখন তেমনই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—পদার্থ আছে, পদার্থ নাই তেজ আছে তেজ ও পদার্থ পরস্পর রূপ-বিনিময় করে, তেজ ও পদার্থ এক, তেজ ও পদার্থ ভিন্ন।

২৪। **নব ও নব্যনববিজ্ঞান**।—ক্রমবিকাশের অনুসারে নববিজ্ঞানকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—নববিজ্ঞান (খৃষ্টাব্দ ১৬৫০—১৯০০) ও নব্যনববিজ্ঞান (১৯০০—১৯৩০)। সামান্যতঃ নববিজ্ঞান বলিতে নববিজ্ঞান ও নব্যনববিজ্ঞান দুইই বুঝায়। কেবল নব ও নব্যনবে ভেদ করিতে হইলে নববিজ্ঞান ও নব্যনববিজ্ঞান বিশেষ অর্থবোধক হইবে। শক্তি (Force) ও অন্যোন্যাকর্ষণ (Gravitation) নববিজ্ঞানের ভিত্তি। গতিবিজ্ঞান, (Dynamics) স্থিতিবিজ্ঞান, (Statics) জলবিজ্ঞান (Hydrostatics) সমস্তই উহাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। নব্যনববিজ্ঞান নববিজ্ঞানের ভিত্তিই উড়াইয়া দিল। নব্যনববিজ্ঞান প্রমাণ করিল—শক্তি নাই, অন্যোন্যাকর্ষণ নাই। নিরাধার নববিজ্ঞান আধারহীন হইয়াও স্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিল ও নবের সহিত নব্যনবের বিরোধ মিটিয়া গেল। নবসৃষ্ট উন্নতির (২২প') অপার ও অপরূপ শক্তিতে নব্যনববিজ্ঞান সমুন্নত নববিজ্ঞানের রূপ ধারণ করিল!

২৫। **আলোকের স্বরূপ কি ?**—নববিজ্ঞান মতে আলোক হইতে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম পদার্থকণই সেই আলোকের প্রকাশরূপে প্রতিভাত হয় (Corpuscular Theory)। নববিজ্ঞানের শেষদশায় এইমত পরিত্যক্ত হইল। তাহার পরিবর্ত্তে স্থির হইল যে ঈথার (Ether) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে তাহার কম্পনে তরঙ্গ উত্থিত হয়। সেই তরঙ্গই (Wave theory) আলোকের প্রকাশরূপ পরিণত হয়। নব্যনববিজ্ঞানে প্রমাণ হইল পরিত্যক্ত মত ও নব প্রসক্তমত এই উভয় মতই সত্য—আলোক কম্পনও বটে পদার্থের সূক্ষ্মকণও বটে। একই সঙ্গে আলোক

সূক্ষ্মপদার্থকণ ও কম্পনের ন্যায় আচরণ করে। আবার আলোক এক সময় সূক্ষ্মপদার্থকণবৎ আচরণ করে ও অপর সময় কম্পনবৎ আচরণ করে। কখন কি ভাবে আচরণ করিবে তাহার কিছু নিশ্চয় নাই। একই বস্তু একই সঙ্গে কি করিয়া পদার্থ হয় ও পদার্থ হয় না, নব্যনববিজ্ঞান এই নব্যকূটের মীমাংসার প্রয়োজনই বুঝিতে পারিল না।

২৬। **ঈথারের স্বরূপ কি?**—যে ঈথারের কম্পনে আলোকের বিকাশ হয় সেই ঈথারের স্বরূপ কি? নববিজ্ঞানের শেষ দশায় ইহার স্বরূপ—ভারহীন চঞ্চল পদার্থ (Imponderable fluid) বিশেষ। নববিজ্ঞানের মতে পদার্থমাত্রেরই ভার আছে। অতএব ভারহীন ভারবান পদার্থ নববিজ্ঞানের এক অতীন্দ্রিয় ও অপরূপ সৃষ্টি।

বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্ ॥৫৩॥

ক্ষুধার্ত্তব্যক্তি কোন্ পাপ করে না? গরজ বড় বালাই। যে ক্ষুধায় প্রপীড়িত, আকাঙ্ক্ষায় যাহার হৃদয় নির্ভিন্ন, সে করে না এমন কাযই নাই। তাই ভারহীন ভারবিশিষ্ট পদার্থই নববিজ্ঞানের শেষ দশায় তাহার আশ্রয়তরি হইয়া দাঁড়াইল।

অকৃত্যং মন্যতে কৃত্যং সুগমঞ্চ সুদুর্গমম্।
অসত্যং মন্যতে সত্যং বাসনাপ্রেরিতো জনঃ ॥ ৫৪ ॥

যে জন বাসনাদ্বারা পরিচালিত হয়, সে বাসনাবশে অকার্য্যকে কার্য্য মনে করে, সুগমকে অত্যন্ত দুর্গম মনে করে ও অসত্যকে সত্য মনে করে। বাসনার তাড়নায় সত্যাসত্য ও কৃত্যাকৃত্য বিপর্য্যাস নিত্যই ঘটিয়া থাকে।

নব্যনববিজ্ঞান আবার নববিজ্ঞান অপেক্ষাও বাহাদুর। নব্যনবমতে ঈথার একবার ইস্পাৎ ও প্ল্যাটিনাম্ অপেক্ষাও ঘন (solid) ও দৃঢ়, একবার ফেনবৎ ঘন দ্রব্য (Jelly-like) পদার্থ, একবার বায়ু অপেক্ষাও লঘু, একবার স্থানমাত্র। লৌহাপেক্ষা দৃঢ় ও কঠিন পদার্থ হইতে বায়ু অপেক্ষাও লঘুরূপ যে বস্তু ধারণ করিতে পারে তাহার অকার্য্য কিছুই নাই।

অমূলমেতৎ বহুরূপরূপিতম্ ॥ ৫৫ ॥

ইহা অপ্রকৃত ও মিথ্যা, অতএব বহু আকারে আকারিত হইয়াছে। কাযেই ঈথার সুদৃঢ় ও ঘন পদার্থ হইতে পরিশেষে কল্পনায় পরিণত হইয়াছে।

২৭। **মাত্রা ও সম্পৃক্ত মত কি?**—দুইটী মতের জন্য নব্যনববিজ্ঞানের একচেটে পসার। সেই দুইটীর নাম—প্ল্যাঙ্কের মাত্রামত (quantum theory) ও আইনষ্টাইনের সম্পৃক্ত (relativity theory) মত। এই দুইটী মতের জন্যই নববিজ্ঞান স্থানভ্রষ্ট ও নব্যনবজগৎ মদোন্মত্ত। কথায় বলে—

ভরতেন সমো রাজা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥

ভরতের সমান রাজা ছিলও না হইবেও না– এখন যে নাই ইহা বলাই বাহুল্য। নব্যনববিজ্ঞানের এই মতদ্বয়ের তুল্য কোনও মত হয় না, হবে না, হতে পারে না। মত দুইটীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই—

তেজোবিকিরণ (radiation) অসন্তত (discontinuous) বা সান্তর, অর্থাৎ তৈলধারাবৎ

উহা সন্তত (continuous) বা নিরন্তর নহে। তেজের আধার একবার তেজোবিকিরণ বা বিক্ষেপ করে, আর একবার করে না। তেজের আধার হইতে প্রত্যেক স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে তেজ বিকীর্ণ হয়। তেজোবিকিরণ যখন একস্থানে বন্ধ থাকে তখন অন্যস্থানে হয়। এই প্রকারে তেজোবিকিরণ সান্তর বা অসন্তত হইয়াও নিরন্তর বা সন্তত বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র, বাস্তবিক উহা নিরন্তর নহে। তেজোবিকিরণ কার্য্যের মাত্রা (quantum of action) সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় সমান (constant)। ইহাকেই প্ল্যাঙ্কের মাত্রামত বলে।

স্থান ও কালের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। অথচ কালস্থান নামক এক বস্তু আছে, যাহার কাল এক অঙ্গ স্থান আর এক অঙ্গ। কালের মাত্রা এক ও স্থানের মাত্রা তিন। অতএব কালস্থান চতুর্মাত্রক (dimensional)। আমাদের প্রায় সমস্ত জ্ঞানই সম্পৃক্ত (relative)। প্রায় কোনও জ্ঞানই কেবল (absolute) নহে, অর্থাৎ একের সম্পর্কেই অপরের জ্ঞান হয়। যথা—রাম যাইতেছে বলিলে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান সম্বন্ধেই তাহার গতি বুঝিতে হইবে। ইহাই আইনষ্টাইনের বিশেষ ও সামান্যসম্পৃক্ত মত।

২৮। **মাত্রা ও সম্পৃক্ত মতের দোষ**।—দুঃখের বিষয় এই মত দুইটী অত্যল্পকালেই কালবিদ্রুত হইবার উপক্রম হইয়াছে :

উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ ॥ ৫৭ ॥

দরিদ্রদিগের মনোরথ মনেই উঠে ও তৎক্ষণাৎ মনেই বিলীন হয়। সত্যধনে বঞ্চিত নব্যনববিজ্ঞানমানিদের দশাও ঠিক তদনুরূপ। নব্যনবমতদ্বয় বাহির হইতে না হইতেই উহাদের অসারতা প্রতিপন্ন হইতে লাগিল।

প্ল্যাঙ্ক নিজেই তাঁহার মাত্রামত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"আমার মাত্রামত পূর্ব্বমত অপেক্ষা সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ নহে। পদার্থবিজ্ঞানের স্থানে স্থানে আমার মতের অপেক্ষা পূর্ব্বমত শ্রেষ্ঠ। শুধু তাহাই নহে। আমার মত সেই সেই স্থানে সত্যবিরুদ্ধ।"

বিজ্ঞানবিৎ বরের মতে আইনষ্টাইনের মত কেবল স্থূলতত্ত্বের বিষয় প্রযোজ্য, সূক্ষ্মতত্ত্বের বিষয় নহে। প্ল্যাঙ্ক বলেন তাঁহার মাত্রামত ও আইনষ্টাইনের সম্পৃক্তমত বিষয়বিশেষে বিরুদ্ধ। জীনস্ বলেন আইন ষ্টাইন্ বহুমাত্রক বস্তুকে চতুর্মাত্রক কল্পনা করিয়া প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। এডিংটন্ বলেন আইনষ্টাইনের মতানুসরণ করিলে জগতকে সত্যভাবে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার সারতত্ত্ব একেবারেই দেখা যায় না।

আইনষ্টাইনের মত যে কাল্পনিক, নববিজ্ঞানমানিগণেরও মানিতে হইয়াছে। উহা যে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার ঘোর বিকারপ্রসূত তাহা হিন্দু- মাত্রই শুনিবামাত্র বুঝিতে পারেন (এখানে আমরা বিলাতী হিন্দুর কথা বলিতেছি না)। শুধু কালক্রমে ঘটনা হইতে পারে না। তৎ সঙ্গে সঙ্গে স্থানের প্রয়োজন। কালস্থান ভিন্ন কোনও ঘটনার উৎপত্তি অসম্ভব। কিন্তু তজ্জন্যই কাল ও স্থান এক বস্তু, দুই বস্তু নহে, বলিয়া গ্রহণ করা কিরূপ সঙ্গত তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে ও কাল যেরূপ ঘটনার অঙ্গ, মাত্রাদিও সেইরূপ ঘটনার অঙ্গ। তবে দেশকাল মাত্রা প্রভৃতির একটী কৃশরা(খিচুড়ি) প্রস্তুত করা হইল না কেন?

বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ লাগ্রাঁজস্ (Lagrange) আইন্‌ষ্টাইনের প্রায় ১৫০ বৎসরপূর্ব্বে, স্থানের তিন মাত্রা ও কালের একমাত্রা সর্ব্বশুদ্ধ চারি মাত্রার কথা স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আইন্‌ষ্টাইনের ন্যায় তিনি কাল-স্থানের কুশরালুব্ধ হইয়া প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটান নাই। কাল ও স্থান যুগপৎ কার্য্যসহায়ক হইলেও প্রকৃতই ভিন্ন, তাহা লাগ্রাঁজেসের বুঝিতে বাকি ছিল না। লিন্‌চ্ সত্যই বলিয়াছেন কাল-স্থান নামক অঙ্গীর কল্পনা নিরর্থক অসঙ্গতিপূর্ণ। কাল ও স্থান এক হইতে পারে না। আইনষ্টাইনের প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে রীম্যান ন মাত্রার (n-dimension) স্থানের কথা লিখিয়াছেন। ফরাসী গণিতজ্ঞগণ তাঁহাদের সহজ বিস্পষ্টিমত্তা ও সত্যপরায়ণতার বশে পুনঃ পুনঃ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে দেশ সর্ব্বদাই ত্রিমাত্রক আছে ও ত্রিমাত্রক থাকিবে, অধিক মাত্রার দেশ কাল্পনিক মাত্র, ও বীজগণিতের সহিত ঐক্য রাখিবার জন্যই কল্পিত হইয়াছে। র‍্যীমান গাউস ও সোফাসলীরও ন-মাত্রার স্থানের বিষয় নিরর্থক ধাঁধা ছিল না।

২৯। পৃথিবীর বয়ঃক্রম।—নববিজ্ঞানের অহঙ্কার দুর্দ্দম্য। ইহার মধ্যেই নববিজ্ঞানের অসারত্ব যথেষ্ঠ প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু অসারত্বের ভূরি প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও—কি তাহারই বশে নব বিজ্ঞান জ্যোতিষ শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সদাই সাহসী! দৈবদুর্ব্বিপাকে কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীগুলি এমনই বিপন্ন হইয়া পড়ে যে হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য।

আজ প্রায় ৫০ বৎসর হইল টমসন্ (লর্ড কেলভিন) ফতোয়া বাহির করিলেন—পৃথিবীর যে ভাবে উত্তাপ হ্রাস হইতেছে তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে পৃথিবীর প্রলয়কাল উপস্থিত, জীবগণের মৃত্যু আসন্ন, আর ৪০০০ বৎসরের অধিক পৃথিবীতে মনুষ্য বাসই করিতে পারিবে না। এই স্বদুর্বিজ্ঞেয় জগতের তিনি যে কণার লবলেশ মাত্রও জানিতে পারেন নাই নাই, অবধি শূন্য বিচারাভিমানে তিনি স্বয়ং বিস্মৃত হইলেন বটে, কিন্তু দৈব তাহা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তজ্জন্যই মাত্র ২০ বৎসর যাইতে না যাইতেই টমসনের অপরিচ্ছিন্ন অহঙ্কারের বিষম পরিচ্ছেদ ঘটিল।

টমসনের ভবিষ্যৎ বাণীর আন্দাজ ২০ বৎসর পরেই রেডিয়মের কার্য্য-দ্বারা প্রমাণ হইল যে ৪০০০ বৎসর পরে পৃথিবীর প্রলয় হইবে না, অন্ততঃ দেড় লক্ষকোটী বৎসরও পৃথিবী থাকিবে। ইহারও কয়েকবৎসর মাত্র পরে পদার্থও তেজের রূপ বিনিময় বাহির হইল ও তখন পৃথিবীর স্থায়িত্ব আরও শতগুণ বাড়িয়া গেল। অর্থাৎ ৩০।৪০ বৎসরের ভিতরেই টম্‌সনের ৪০০০ বৎসর ১৫০ লক্ষকোটী বৎসরে পরিণত হইল (৪লক্ষ লক্ষ গুণ বৃদ্ধি হইল)!

৩০। লক্ষণাভাব দোষ।—নববিজ্ঞান ও নব্যনববিজ্ঞান যে ব্যোমমার্গ-প্রতিষ্ঠিত গন্ধর্ব্বনগর মাত্র, তৎপ্রযুক্ত বিশেষ শব্দগুলির লক্ষণাপ্রবৃত্তিই (২) তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন। প্রত্যেক বিজ্ঞানের আদিতেই সেই বিজ্ঞানপ্রযুক্ত বিশেষ বিশেষ শব্দের নিঃসন্দিগ্ধ লক্ষণ (definition) সন্নিবেশই সেই বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব। কেননা সেই সেই বস্তুগুলির উপরই সেই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ও তাহাদেব অর্থ সম্পূর্ণ নিরূপণ না হইলে সেই বিজ্ঞানের যুক্তি প্রমাদদিগ্ধ হইবেই।

২। Absence of definition

মানাধীনামেয়সিদ্ধিঃ মানসিদ্ধিশ্চ লক্ষণাৎ। ৫৮॥

যে বস্তু প্রমাণ করিতে হইবে (মেয়), তাহার সিদ্ধি প্রমাণের (মানের) অধীন। আর সেই প্রমাণের (মানের) সিদ্ধি লক্ষণ হইতেই হয়। নব ও নব্যনববিজ্ঞান এই সামান্য বচনও জানে না। অথবা নিজের অসারতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই সামান্য বচনও উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

নববিজ্ঞানের সকল মতই নব্যনববিজ্ঞানে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। শক্তি (Force) নাই, অন্যোন্যাকর্ষণ (gravition) নাই, পদার্থ (matter) নাই, তেজই (energy) একমাত্র বস্তু ইত্যাদি অনেক কথাই নব্যনববিজ্ঞান ১৯২০ সালের পূর্ব্বেই নিঃসন্দিগ্ধ প্রতিপন্ন করিয়াছে। অতএব স্থূলবুদ্ধিতে ইহাই মনে করা উচিত, যে ১৯২০ সালের পর, মিথ্যা নববিজ্ঞানমত পরিহার পূর্ব্বক, সত্য নব্যনবমত অবলম্বনে পদার্থবিজ্ঞান লিখিত হইবে। একথা দূরে থাকুক, দশবৎসর পরে আজও কলিকাতা মহানগরীতে, কি ইঙ্গরাজী কি দেশী পুস্তকালয়ে, শতচেষ্টা সত্ত্বেও একখানি পদার্থবিজ্ঞানের পুস্তক মিলিল না, যাহা নব্য নবমতে লিখিত। অধিকন্তু প্রখ্যাতনামা লেখক ও পুস্তকপ্রকাশকগণকে বুঝান গেল না যে বিরুদ্ধ নব্য নবমতের আবির্ভাবে পদার্থ বিজ্ঞানকে নূতন মতানুসরণ করিয়া লিখার প্রয়োজন। নতুবা পদার্থবিজ্ঞান, নববিজ্ঞানের মুণ্ড ও নব্যনববিজ্ঞানের হস্তপদাদি যুক্ত হইয়া কলির শরভরূপ পরিগ্রহ করিবে। আজ কাল কার পদার্থবিজ্ঞান এক অপরূপ বুদ্ধিবিভ্রামক গ্রন্থ। উহাতে প্রথমে যে যে বস্তু সত্য বলিয়া শিখান হইয়াছে পরে সেই সেই বস্তু মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পদার্থবিজ্ঞানের মিথ্যাত্যাগে এই ঘোর অনিচ্ছা কেন? মিথ্যা প্রেম পদার্থ বিজ্ঞানের হৃদয়ে এরূপ দুর্ণিবার অধিকার লাভ করিয়াছে কেন? পদার্থ বিজ্ঞানই তাহার উত্তর দিতে সক্ষম।

শক্তি নাই। অথচ পদার্থবিজ্ঞানে গুরুত্বের (mass) লক্ষণ (definition) এই—পদার্থের যে গুণে পদার্থকে নাড়িতে গেলে, কিংবা উহার গতি পরিবর্ত্তন করিতে গেলে, শক্তির (force) প্রয়োজন হয় তাহাকে গুরুত্ব (mass) বলে। শক্তি নাই, অন্যোন্যাকর্ষণ (gravitation) নাই। অথচ পৃথিবী পদার্থকে যে শক্তির সহিত আকর্ষণ করে তাহাকে সেই পদার্থের ভার (weight) বলে। শক্তি নাই কিন্তু অপাসন (repulsive force) শক্তি আছে। পদার্থের গুরুত্ব বলিলে বুঝায় যে উহাকে চালিত করিতে তেজের (Energy) প্রয়োজন হয় (শক্তির নহে)। অথচ তেজ ও গুরুত্ব এক ও তেজ কল্পনামাত্র।

সার উইলিয়ম ব্র্যাগের মত বড়ই চমৎকার। সত্য সত্যই কলির শরভরূপী নব্যপদার্থ-বিজ্ঞান, নববিজ্ঞানমত ও নব্যনববিজ্ঞানমত, উভয়েরই উপাসনা করিতে ব্যস্ত। ব্র্যাগ বলেন নব্যনববিজ্ঞানমত পরিবৃত্তি সহ। তাঁহার মতে নব্যনববিজ্ঞানমত কলির কুম্ভকর্ণ—একদিন ঘুমায় ও একদিন জাগে। নব্যনবমতের ঘুমাইবার দিনে নবমত জাগে ও নব্যনবমতের জাগিবার দিনে নবমত সুখে নিদ্রা যায়। এক কথায় নব্যনবমত ও নবমতসম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইলেও এখন দুইটীই চলে। কি মনে যে দুইটী বিরুদ্ধ ও বিপর্য্যস্ত মতকেই সত্য বলিয়া সমকালে আদর করা যায় তাহা যাহারা করিতে পারে তাহারাই জানে। ইহাকেই বলে সত্যের আদর।

ষষ্ঠ অধ্যায়—গণিত-বিজ্ঞানে অত্যাগ্রহ (গণিত°)

৩১। **গণিত বিজ্ঞান।**—পদার্থ বিজ্ঞানের অসারত্ব অতি সংক্ষেপে প্রতিপন্ন হইল। পদার্থ বিজ্ঞানের মূল গণিত-বিজ্ঞান। এমন কি পদার্থবিজ্ঞানকে গণিত-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জীন্‌স্ বলেন, বিজ্ঞানাঙ্কিত যাবতীয় চিত্রই গণিত-বিজ্ঞানের চিত্র ভিন্ন কিছুই নহে। এখন গণিত-বিজ্ঞান-প্রমাণ-প্রসর প্রদর্শন করা যাইতেছে। গণিত-বিজ্ঞানের অসারতা প্রতিপাদন করা কঠিন। ইহাতে গণিতের সারত্বের পরিচয় হয় না, কেবল বিচারপরায়ণ সভ্যজগতের অসারত্বই প্রমাণিত হয় মাত্র। গণিতের কথা তুলিলেই বিচারবান্ সভ্য জগৎ অবিচারে আতঙ্কে পলায়ন করেন। কাযে কাযেই বিচারবান্ সভ্য- জগতের নিকট গণিতের অসারতা প্রতিপন্ন করা সুকঠিন। তথাপি দুই এক সুগম কথায় গণিতের অসারতা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

৩২। **গণিত প্রমাণের দোষ।**—গণিত বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় লক্ষণপরাঙ্মুখ। এক স্থানে যাহা অস্বীকৃত হইয়াছে, অপর স্থানে তাহারই অবলম্বনে প্রমাণ করা হইয়াছে। ইহার কয়েকটী নিদর্শন ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইউক্লিডের জ্যামিতি (Euclid's Geometry) ২০০০ বৎসর যাবৎ জগতে একাধিপত্য করিয়া আসিয়া এখন অনাদৃত ও ত্যক্তপ্রায়। অবিজ্ঞাত বস্তু দ্বারা অবিজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান কদাচ সম্ভবে না, একথাও ইউক্লিড বিস্মৃত হইয়াছিলেন। নতুবা প্রথম প্রতিজ্ঞার প্রমাণেই দুইটী অবিজ্ঞাত বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহা দ্বারা অবিজ্ঞাত প্রতিজ্ঞা প্রমাণের চেষ্টা করিতেন না। প্রথমে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা কোনও রেখাদির সাহায্য ব্যতিরেকে প্রমাণ করিয়া সেই প্রতিপন্ন প্রতিজ্ঞাগণের সাহায্যে অন্য প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করা ইউক্লিডের উচিত ছিল। তাহা হইলে তাঁহার প্রমাণ নির্দ্দোষ হইত। সুপ্রসিদ্ধ বাইনোমিয়াল থিয়োরেমের (Binomial Theorem) প্রমাণও আত্মাশ্রয়দোষ-দুষ্ট। সমগ্র গণিত-বিজ্ঞান যোগ ও বিয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংখ্যারই যোগ বিয়োগ হইতে পারে। কাল্পনিক সংখ্যার যোগ বিয়োগের অর্থ কি? গণিতে প্রায়ই অকারণ ধরিয়া লওয়া হয় যে নিয়ম একবার খাটে সে নিয়ম সর্ব্বত্রই খাটে। এই যুক্তি ভ্রান্ত ইহা সহজেই বুঝা যায় ও ইহার দোষ অনেকবার ধরা পড়িয়াছে।

৩৩। **গণিত প্রমাণের শিথিলতা।**—গণিতপ্রমাণ সাধারণ চক্ষে সুশ্লিষ্ট ও দোষবিবর্জ্জিত প্রতীত হইলেও অনেক সময়েই যে প্রকৃত ভ্রান্ত তাহা গণিতজ্ঞগণের পরস্পর বিবাদ হইতে সুস্পষ্ট দেখা যায়। নিউটনের (Sir Isaas Newton) অভ্রান্ত গণিত প্রমাণের ভুল বেরনুই (James Bernoulli) দেখাইয়াছেন। তথাপি নিউটন তাঁহার ভ্রম স্বীকার করেন না ও কাযেই বিচারবান্ সভ্য জগতের চক্ষে সেই ভ্রান্ত প্রমাণই অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য রহিল। কিন্তু পরে নিউটন যখন চুপি চুপি নিজের ভ্রম সংশোধন করেন, তখনই সভ্য জগৎ বুঝিতে পারিল নিউটনের অকাট্য গণিত প্রমাণ তাঁহাদের চক্ষেই অকাট্য ছিল, প্রকৃত অকাট্য ছিল না। র্যীমানের (Riemann) এক প্রতিজ্ঞার প্রমাণ সম্বন্ধে ওয়াইয়েরষ্ট্রাস (Weierstrass) আপত্তি করেন। তখন প্রধান প্রধান গণিতজ্ঞগণ দুই দল বাঁধিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অনেক বর্ষব্যাপি যুদ্ধের পর র্যীমানেরই জয়লাভ হইল। টম্‌সন্ Thomson (Lord Kelvin) (কেল্‌ভিন্) গণিতজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার "ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক্ ল" (Electro magnetic Law) উদ্ধার করেন।

তখন গণিতজ্ঞগণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। কিন্তু অল্পদিনেই প্রমাণ হইল তাঁহার গণিতজাল প্রকৃত সত্য উদ্ধার করিতে না পারিয়া ভ্রমাত্মক সত্যেরই উদ্ধার করিয়াছে। হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌সের (Helmholtz) গণিতসিদ্ধ অনেক মতই গণিতের অকাট্য প্রমাণ সত্বেও পরে অসিদ্ধ হইয়াছে।

গণিতের এক বিশেষ গুণ আছে যে যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহাই প্রথমে ধরিয়া লইয়া, পরে তাহাই প্রমাণ করে। গণিতের বিশেষ চর্চ্চা থাকিলেও ইহা ধরা সহজ হয় না। সকল গণিতজ্ঞই এই ভ্রমে পতিত হন। গণিতের নাম শুনিলে যাঁহাদের ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হয় তাঁহারা যে "পরমুখস্বাদু" হইবেন ইহা বলাই অকিঞ্চিৎকর। গণিত প্রমাণের শিথিলতায় দৌরাত্ম্যে কোসি (Cauchy) ও গাউস্ (Gauss) গণিতে নির্দ্দোষ প্রমাণের বিশেষ আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অদ্বিতীয় গণিতজ্ঞ লাপ্ল্যাসও (Laplace) তাঁহার অতুল্য মেকানীক সেলেস্ত (Mecanique Celeste) নামক গ্রন্থেও এই প্রমাণ-শিথিলতা দোষ পরিহার করিতে পারেন নাই। গণিত-সভায় যুবক কোসি (Cauchy) যখন গণিতে অকাট্য যুক্তির প্রয়োজন নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে লাপ্ল্যাসের Laplace চৈতন্যোদয় হইল—তিনিও ত তাঁহার মেকানীক সেলেস্ত গ্রন্থে এই ভুল করিয়াছেন। লাপ্ল্যাসের মুখ শুকাইয়া গেল। যতই তিনি প্রবন্ধ শুনিতে লাগিলেন ততই তিনি অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিলেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে লাপ্ল্যাস্ ভয়ে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সভা হইতে পলায়নপূর্ব্বক নিজ গৃহে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তিনদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি সকল প্রমাণগুলিই কোসি প্রদর্শিত দোষদুষ্ট কি না তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। দৈবাৎ তাঁহার সকল প্রমাণই ঠিক হইয়াছিল। তখন আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তিন দিন পরে দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসে গণিতের অকাট্য প্রমাণ যে কিরূপ কাট্য তাহার শত শত নিদর্শন সকল দিকেই বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গণিতের ভ্রমপ্রমাদ- সঙ্কুলতা, বিচারবান্ সভ্য জগতের অবিচারিত দৃষ্টিপথে পড়ে না বলিয়াই বিচারবান্ সভ্য জগৎ অবিচারে গণিতের প্রমাণ বলিয়া কলরব করিতে থাকেন।

গণিতজ্ঞ য্যাকোবি (Jacobi) বলেন গণিতের প্রমাণ দুই প্রকারে ভ্রান্ত—যে গুলি অতি সংক্ষিপ্ত ও যেগুলি অতি বিস্তারিত। এডিংটন্ বলেন, গণিতজ্ঞ কখনই মনে করেন না যে গণিতশাস্ত্র নির্ভুল নির্দ্দোষ ও অকাট্য। পদার্থবিজ্ঞানের ন্যায় গণিতবিজ্ঞানের যুক্তি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গেরগণ (Gergonne) বলেন, গণিতের প্রতিপাদ্য বিষয় অবিচারিত-জ্ঞান (intuition) দ্বারা পূর্ব্ব হইতে জানা না থাকিলে গণিতের প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয় কিছুতেই বুঝা যায় না। লিন্‌চ্ (Col Arthur Lynch) বলেন, গণিতের সত্য প্রায়ই অবিচারিত জ্ঞান দ্বারা লাভ করিয়া, পরে অনুকূল যুক্তি জুটাইয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হয় ও সেই যুক্তি দ্বারা সেই সত্যে উপপন্ন হওয়া যায় ইহাই দেখান হয় মাত্র।

৭ম অধ্যায়—অপর বিজ্ঞানে সত্যভ্রংশ (অপর°)

৩৪। **জীবন বিজ্ঞান**।—গণিতবিজ্ঞান নববিজ্ঞানের শীর্ষদেশ, পদার্থবিজ্ঞান তাহার হৃদ্দেশ ও রসায়ন তাহার ফুপ্‌ফুস্। ইহাদেরই যখন এই দশা তখন অন্য নববিজ্ঞানের কথা

বলিবার প্রয়োজনই নাই। তথাপি উহাদের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া নববিজ্ঞানে সত্যভ্রংশের কথা উপসংহার করিব।

জীবন-বিজ্ঞানবলে জীবাণু (Living cells) নিম্ন স্তর হইতে অবিরত উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া মনুষ্যাদির সৃষ্টি করিয়াছে। এই ক্রমোন্নতির নাম এভোলিউসন (Evolution (e—out, volvere—to roll lit. un-rolling or opening) কিন্তু এভোলিউসন শব্দের অর্থ ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি নহে। ক্রমবিকাশ শব্দে অন্তর্নিহিত গুণের মূর্ত্তিপরিগ্রহ বুঝায়। ক্রমোন্নতি শব্দে, অন্তর্নিহিত গুণ ভিন্ন অন্যগুণের আবির্ভাব বুঝায়। ক্রমোন্নতিমতই জীবন-বিজ্ঞানের প্রাণ। কাযেই ক্রমবিকাশ নামক ক্রমোন্নতি মতের মিথ্যাতেই উৎপত্তি। অতএব জীবন-বিজ্ঞানের মিথ্যাতেই উৎপত্তি মিথ্যাতেই স্থিতি ও মিথ্যাতেই লয় ইহা কি আর বলিতে হইবে? বানর হইতে মনুষ্য উদ্ভূত। একথা বানরেই বলিতে পারে। বা নরঃ বানরঃ। যাহাকে মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হয় তাহাকে বানর বলে। বানরে যে গুণ নাই মনুষ্যে সে গুণ আছে ইহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। এই গুণ আসিল কোথা হইতে? অ্যারিষ্টটল (Aristotle) বলিয়াছেন যাহা আদিতে নাই তাহা অন্তে থাকিতে পারে না।

কার্য্যং যৎ কারণাৎ ভিন্নং নোৎপন্নং হি কদাচন। ৫৯॥

যে কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন সে কার্য্য কখনও হয়ও নাই হইবেও না। ক্রমোন্নতিমত সম্বন্ধে অধিক বলা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। ক্রমোন্নতি সকলেরই মূল। তবে জীবন উৎপন্ন হইল কিরূপে? ইহা যে অজ্ঞাত তাহা সকলেই অঙ্গীকার করেন। হ্যালডেন বলেন জীবন বিজ্ঞানের মত যে মিথ্যাময় সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই। এডিংটন বলেন ক্রমোন্নতিমত সম্পূর্ণ একদেশদর্শী। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাবনতিও বিরাজমান। অহল্যা পাষাণী হইয়াছিলেন। কুবেরের পুত্রদ্বয় নলকুবর ও মণিগ্রীব যমলার্জ্জুন হইয়াছিলেন।

৩৫। **চিকিৎসা বিজ্ঞান**—জীবন বিজ্ঞান মিথ্যাময়, চিকিৎসাবিজ্ঞান মিথ্যার রাজা। মৃতদেহ যে জীবন্তদেহের আকারমাত্র, অবিকৃত বুদ্ধিতে এই জ্ঞান সহজেই উদিত হয়। কিন্তু শত শত বৎসরেও চিকিসা-বিজ্ঞানের ঘটে এ জ্ঞান ঘটিল না। অধিকন্তু নরদেহ যে ভেক মূষিক, বিড়াল শশকাদির দেহ হইতে পৃথক্ ইহাও চিকিৎসাবিজ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। এক্স্-রের (Xray) আবির্ভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানমতের বিষম বৈষম্য প্রকট হইতে লাগিল। তথাপি চিকিৎসা বিজ্ঞানের চক্ষু ফুটিল না।

লক্ষ লক্ষ মড়া কাটিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান উদরের স্বরূপ নিঃসন্দিগ্ধ ঠিক করিল। উদরের (stomach) স্বরূপ অন্যপ্রকার বলিলে চিকিৎসা বিজ্ঞান হাঁসিয়াই পাগল হইত। কিন্তু যখন একস্-রে দেখাইয়া দিল যে তাহার চিরন্তন নিঃসন্দিগ্ধ নির্ণয়ই অলীক ও মিথ্যাময় তখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সকল হাঁসিই উড়িয়া গেল, নীরবে এক্স-রের সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইল। শরীরের প্রায় প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই একই দশা। মনে হয় তাহার সিদ্ধান্ত যেন মিথ্যাত্বসিদ্ধি করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই মিথ্যাত্বসিদ্ধি, অষ্টসিদ্ধির বহির্ভূত এক নূতন নবম সিদ্ধি। অন্ত্রের (Intestines) জলৌকাগতি (Peristalsis) সর্ব্বদাই অনুলোমক, প্রতিলোমক হইলেই প্রাণনাশ করে।

একস-রে (x-ray) দেখাইল ইহার ঠিক বিপরীতই সত্য—প্রতিলোমক জলৌকসগতিই প্রাণরক্ষা করে। সাক্ষীগোপাল বন্নসাচয়ের (Sympathetic nervous system) যে কোনও ক্রিয়া আছে তাহা পূর্ব্বে স্বীকার করা হইত না। কিন্তু এখন হৃৎপিণ্ড, ক্লোম, (Lungs) পরিপাক বৃক্ক (Kidney) প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান প্রধান কার্য্য এই সাক্ষী গোপালের দ্বারা পরিচালিত হয় ইহা এক বাক্যে স্বীকৃত।

অস্রুতিগ্রন্থিগুলি (Ductless glands) ভগবানের এক বিষম কেলেঙ্কারী। বিনা প্রয়োজনে মনুষ্যদেহে অতগুলি অস্রুতি গ্রন্থির সন্নিবেশ লক্ষ্যহীনতার ও নির্বুদ্ধিতার পরম পরিচয়।

কুতোঽবোধস্য প্রমাদভীতিঃ। ৬০ ॥

নির্বোধের নাই প্রমাদের ভয়। বেহায়া ও নির্লজ্জ চিকিৎসাবিজ্ঞান, যে মুখে শ্রীভগবানকে মূর্খের সর্দ্দার বলিয়া এতদিন খ্যাপন করিয়া আসিয়াছে, সেই মুখেই অম্লানবদনে অনুতাপগন্ধবর্জ্জিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে যাতীয় শারিরীক ক্রিয়াই এই অস্রুতিগ্রন্থির কার্য্য। এমন কি মনুষ্যের বিদ্যা তেজ চরিত্র প্রভৃতিও ইহাদের দ্বারা গঠিত হয়।

যে মুখে বলেছি মাগো চ্যাঙমুড়ি কানি।
সে মুখে বলিব আজি জয় মা ব্রহ্মাণী ॥

৩৬। **অর্থ বিজ্ঞান** (Economics)।—প্রাচুর্য্য ও প্রয়োজন বিধিই (Law of Snpply and Demand) অর্থবিজ্ঞানের প্রাণ। প্রচুর পরিমাণে বস্তু উৎপন্ন হইলেই সেই বস্তু সস্তা হয় ও কম উৎপন্ন হইলেই উহা মহার্ঘ্য হয়, ইহা কেবল স্থূল দৃষ্টির কথা। শত শত কারণে এই নিয়মের লঙ্ঘন হয় তাহা বুঝা আদৌ কঠিন নহে। এই নিয়ম অকাট্য বলিয়া ঘোষণা করা অন্ধ কূপমণ্ডুকবৃত্তিরই পরিচায়ক। এই নিয়ম যে এখন আদৌ খাটে না তাহা আজকাল সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় এখন সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে উৎপন্নবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও লোকের পক্ষে সেই দ্রব্যের হ্রাস হইতেছে। ইহা কেমনে হইতে পারে? যাহা অর্থবিজ্ঞানের স্থূল মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই তাহা ব্যবসায়িগণ সহজেই বুঝিতে পারিয়াছে। যখনই কোনও দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে তৎক্ষণাৎ ব্যবসায়িরা সেই বস্তু প্রচুর পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলে। কাযেই সেই জিনিষ আরও মহার্ঘ্য হইয়া উঠে। ধর্ম্মাধর্ম্মের অভাবে প্রাচুর্য্য ও প্রয়োজন বিধি যে অসম্ভব ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

অষ্টম অধ্যায়—সত্যভ্রংশ স্বীকার ও কারণ

৩৭। **নববিজ্ঞানে দোষ স্বীকার**।—সংক্ষেপাৎ সংক্ষেপে নববিজ্ঞানেরসত্যভ্রংশ প্রতিপন্ন করা হইল। এক্ষণে জীন্‌স প্রভৃতি প্রখ্যাত নববিজ্ঞানবিদ্‌গণের স্বমুখোক্তিদ্বারা নববিজ্ঞানের স্বরূপ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

জীন্‌স বলেন—পদার্থের আচরণের সহিত নববিজ্ঞানের সম্বন্ধ, স্বরূপের সহিত নহে। নববিজ্ঞানাঙ্কিত প্রকৃতির চিত্রমাত্রেই গণিতাঙ্কিত চিত্র। এই গণিতাঙ্কিত চিত্র যে কেবল কাল্পনিক চিত্রমাত্র তাহা প্রায় সকল বিজ্ঞানবেত্তাই স্বীকার করেন। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার

করেন যে নববিজ্ঞান প্রকৃত তথ্যের সন্ধানই পায় নাই। নববিজ্ঞানের প্রত্যেক কথা ও প্রত্যেক মতই একেবারে কাল্পনিক ও অনিশ্চিত।

প্ল্যাঙ্ক বলেন—গণিতবিজ্ঞানের পরমোত্তম কল্পনাও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় দ্বারা প্রমাণিত না হইলে একেবারে অসার ও হেয়। ইহা আদৌ বিচিত্র নহে যে একদিন এমন কোনও অচিন্তিত ঘটনা বাহির হইবে যাহাতে নববিজ্ঞানের সকল যুক্তিই পরাহত হইবে। আমার মনে হয় জ্ঞানের অনেক নূতন তথ্য বাহির হইবে ও কয়েকটী মত এখন পরিত্যক্ত হইলেও পুনর্গৃহীত হইবে। পদার্থ বিজ্ঞানের অর্থাৎ গণিত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সত্যতাবিষয়ে সকল সময়েই সন্দেহ থাকিয়া যায়।

হিন্দুশাস্ত্র বলেন—

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং চ যৎ ॥ ৬১ ॥

সাত্ত্বিক জ্ঞানই কেবল অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ। রাজসিক জ্ঞান বৈকল্পিক অর্থাৎ সন্দিগ্ধ। অতএব রাজসিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সন্দিগ্ধ হইবেই হইবে। প্ল্যাঙ্কও প্রাণ ভরিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

এই সিদ্ধান্ত যতক্ষণ না বাহ্য বা স্থূল জগতের প্রমাণের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় ততক্ষণ ইহাকে বিশ্বাস করা যায় না।

হিন্দু শাস্ত্রমতে—

প্রয়োগ নৈকষেণৈব শশ্বৎ কার্য্যং পরীক্ষণম্ ॥ ৬২ ॥

প্রয়োগই কার্য্যরূপ স্ুবর্ণের কষ্টিপাথর। এই প্রয়োগরূপ কষ্টিপাথরে কার্য্যের সর্ব্বদাই পরীক্ষা করিতে হয়।

সহস্রেণাপি হেতূনাং নাস্বষ্ঠাদির্বিরেচয়েৎ।
আগমে নতু মতিমানবতিষ্ঠেতহেতুষু ॥ ৬৩ ॥

সহস্র সহস্র হেতু দ্বারা প্রমাণ হয় যে আকনাদি বিরেচক। তাই বলিয়া আকনাদি বিরেচক হয় না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপ্তবাক্যেই নির্ভর করে বিচারে করে না।

স্থূল জগতের সহিত পদে পদে ঐক্য না রাখিয়া চলিলে পদার্থবিজ্ঞানবুদ্বুদ অচিরেই স্ফুটিত হইবে সংশয় নাই।

রাসেল বলেন—সনাতন সত্যের প্রতিষ্ঠা নববিজ্ঞানের লক্ষ্য নহে। বিচারশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণশক্তির হ্রাস হয়। (এই কূট হইতেই বৈজ্ঞানিক বিচারের স্বরূপ স্পষ্টই বুঝা যায়)।

টমসন্ বলেন—নববিজ্ঞান সনাতন সত্যের ধারই ধারে না। জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইল, উহার অন্ত কিরূপে হইবে, উহার উদ্দেশ্য কি—এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নববিজ্ঞান প্রয়োজনই মনে করে না। সত্যসাগরে কেবল একপ্রকার জাল নিক্ষেপ করিয়া সত্য ভেদের উদ্ধারই নববিজ্ঞানের একমাত্র কার্য্য। সকল রত্নরাজি উদ্ধার উহার লক্ষ্য নহে। নববিজ্ঞানের জ্ঞান আংশিক ও সত্যবিচ্যুত। নববিজ্ঞানের, সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে তাহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন।

হ্যাল্ডেন বলেন— দর্শনবিচ্যুত বিজ্ঞান মনুষ্যকে ভ্রান্তপথেই চালিত করে। বিজ্ঞানমত সদাই পরিবর্ত্তনশীল—পুরুষানুক্রমে এমন কি বৎসর বৎসর নূতন হয়। আইনষ্টাইনের মত আংশিকও সত্য হইলে তাঁহার পূর্ব্বে, পদার্থ বিজ্ঞান যাহা যাহা বলিয়াছে তাহার প্রত্যেকটীই মিথ্যা। এই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দেও পদার্থবিজ্ঞানে যাহা যাহা বলিতেছে সেগুলিও যে সেইরূপ অলীক তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বিজ্ঞানমত সমূহের মধ্যে যে মতগুলি অত্যাদৃত তাহাদের অধিকাংশই এত মিথ্যাজড়িত যে তাহাদের কল্পনাই বলা উচিত। জীবনবিজ্ঞানমতও যে সেইরূপ মিথ্যাময় সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই।

অ্যালেকজান্ডার বলেন—এডিংটন প্রভৃতি কতিপয় বিজ্ঞানবিদের মতে সকল সত্যের ভিতর পরিণামে মন ও ঈশ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ- ভাবে জানা যায়। বাহ্যজগৎ সেইভাবে জানা যায় না। কেবল গণিতের সাহায্যে পরোক্ষভাবে বুঝা যায় মাত্র।

এডিংটন বলেন—কে বলিতে পারে আরও ত্রিশ বৎসর পরে নব্যনববিজ্ঞানের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া নববিজ্ঞানের মতই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে না? আমাদের বুদ্ধি ভ্রমপ্রবণ। তৎকৃত বিচার নির্ভুল হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক জগতে সকল সত্য স্থান পায় নাই পদার্থ বিজ্ঞান নিজের অসম্পূর্ণতা নিজে স্পষ্টই স্বীকার করে ও সেই অসম্পূর্ণতা পরিহারার্থ সকলকে আমন্ত্রণ করে। বৈজ্ঞানিক বিচারে ঈশ্বর সদাচারে (Ethical code) পরিণত হন। ইহাতেই বৈজ্ঞানিক বিচারের স্বরূপ বুঝা যায়। পরমাণু ও ইলেক্টন প্রকৃত আছে কি না এ কথা পদার্থবিদের মনে ঠাঁইই পায় না। তিনি বলেন ইহারা আছে। ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। বরং উষ্ট্রেরও সূচিরন্ধ্র মধ্য দিয়া গতি সম্ভবে, তথাপি নববিজ্ঞানবেত্তার পক্ষে দ্বারের ভিতরঃ দিয়া প্রবেশলাভ করা সম্ভব নহে। গণিত ও বিজ্ঞান দ্বারা প্রকৃত তথ্য বাহির করা যায় না। অনুভূত ধর্ম্মের দ্বারা যায়।

নববিজ্ঞানবিদ্‌গণের স্বীকারোক্তি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় তাঁহারা প্রকৃত তথ্যের প্রকৃত সন্ধান পান নাই। গভীর মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার সান্দ্রতমোভেদি তড়িৎ প্রকাশে ক্ষণে ক্ষণে এইমাত্র জ্ঞান হইতেছে পথ ভ্রষ্ট ও স্খলিতপদ হইয়াছেন। এই পথভ্রংশ ও পদস্খলন কেন হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না (ইহার কারণ পরেদেওয়া যাইবে)। কখনও কখনও বুঝিতেছেন যে গণিতাদি দ্বারা মিথ্যাপসরণ পূর্ব্বক সত্য প্রতিপাদন অসম্ভব। আবার অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া এ জ্ঞানও স্থির হইতেছে না। তবে কেবল অনুভব বিনা জ্ঞান সিদ্ধ হয় না এইটুকুই অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছেন।

হিন্দুশাস্ত্র বিশেষ করিয়া জানেন যে, অনুভব ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞান হয় না।

অনুভূতিঃ প্রমাপ্রাণোঽপ্রমানুভূতি বর্জ্জিতা। ৬৪ ॥

অনুভবই প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের প্রাণ। অপ্রমা অনুভববর্জ্জিত। অনুভববিচ্যুত জ্ঞান ব্যর্থ। তাই নিজের অনুপম ভাষায় বলিয়াছেন—

অনুভূতিং বিনামূঢ় বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিত-শাখাগ্র-ফলাস্বাদন-মোদবৎ ॥ ৬৫ ॥

যে মূঢ় সে ভগবানকে অনুভব না করিয়াই বৃথা ভগবান্ ভগবান্ বলিয়া আনন্দ করে। সে আনন্দ কিরূপ? সরোবরতীরস্থ আম্রবৃক্ষের জলবিম্বিত শাখাগ্রে বিদ্যমান আম্রফলাস্বাদনের আনন্দোপভোগের ন্যায়। অনুভবই একমাত্র জ্ঞান। অনুভবের এমনই অপূর্ব্ব অপার মহিমা যে অনুভবী পুরুষের কৃপায় হয় না এমন জিনিষই নাই।

যস্যানুভবপর্য্যন্তা বুদ্ধিস্তত্ত্বে প্রবর্ত্ততে।
তদ্দৃষ্টিগোচরাঃ সর্ব্বেমুচ্যন্তে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ৬৬ ॥
খেচরা ভূচরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্-দৃষ্টিগোচরাঃ।
সদ্যএব বিমুচ্যন্তে কোটি-জন্মার্জ্জিতৈরঘৈঃ ॥ ৬৭ ॥

যাঁহার তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত, যিনি সর্ব্বদাই শ্রীভগবানকে অনুভব করেন, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি যাহার উপর পড়ে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। কি খেচর কি ভূচর জন্তু তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িলেই কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়।

৩৮। **উন্নতির অপরূপ ভাণ**।—কালচক্রের অপ্রতিহত গতিতে নববিজ্ঞানবিদ্‌গণ অহংপুষ্টদৃষ্টি সত্ত্বেও দেখিতে পাইলেন, অহংপুষ্ট বিজ্ঞানাসন সত্যবাতে টলটলায়মান, পতনোন্মুখ।

অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ। ৬৮ ॥

অগ্নি ইচ্ছা করিয়া স্পর্শ কর, কি অনিচ্ছায় স্পর্শ কর তাহার দহন কার্য্য করিবেই। কাযেই নববিজ্ঞানবিদ্‌গণকে নববিজ্ঞানের অশেষ দোষ অঙ্গীকার করিতেই হইল। কিন্তু রজগুণে তাঁহাদের দৃষ্টি এমনইপিহিত ওচিত্ত এমনই বিভ্রান্ত, যে যতই তাঁহাদের মত প্রমাদসঙ্কুল প্রতিপন্ন হইতে লাগিল ততই তাঁহারা লজ্জায় মস্তক অবনত না করিয়া দর্প ভরে নববিজ্ঞান সদাই উন্নতিপ্রবণ বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই মহান্ধ চিত্তবৃত্তি বড়ই অপরূপ। যাহার রূপ অপগত হইয়াছে, যাহার আকৃতি নাই, তাহাই অপরূপ। ভ্রমে উন্নতিজ্ঞান ও সত্যে উন্নতির অভাবজ্ঞান, নববিজ্ঞাত অহঙ্কারের অপরূপ কল্পনাতীত সৃষ্টি! নববিজ্ঞান এখনও এই সামান্য কথা লিখিতে পারে নাই যে পরিবর্ত্তনরাহিত্যই সত্যের লক্ষণ।

সমানং ত্রিষু কালেষু সর্ব্বাবস্থাসু শাশ্বতম্।
সনাতনং মতং সত্যং চীয়তে নাপচীয়তে ॥ ৬৯ ॥

যাহা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানেই সমান (পরিবর্ত্তন রহিত) যাহা সকল অবস্থায় নিত্য, যাহা সনাতন অর্থাৎ আদ্যন্তহীন ও চিরস্থায়ী তাহাকেই সত্য বলে। সত্যের ক্ষয়ও হয় না বৃদ্ধিও হয় না। সত্য সনাতন, নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। মিথ্যা ক্ষণিক, অনিত্য ও পরিবর্ত্তনসঙ্কুল। ইহাই সত্য মিথ্যার পরিচ্ছেদ। এই চিরপ্রসিদ্ধ সত্যমিথ্যাব্যাবৃত্তির বিপর্য্যয়, নববিজ্ঞানের দুর্দ্দম্য অহঙ্কারপ্রসূত। কালবশে ইহাও বিধ্বস্ত হইবে সংশয় নাই।

নববিজ্ঞান একবার যদি অহঙ্কারপ্রভব স্থূলবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসরণ করে তাহা হইলে তাহাকে আর ভ্রমপ্রমাদের বড়াই করিয়া হেয় হইতেও হেয় হইতে হয় না। সূক্ষ্মবুদ্ধি অপাসনের জন্যই নববিজ্ঞানের বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ইহা পরে আরও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইবে।

অধোধঃ পশ্যতঃ কস্য মাহাত্ম্যং নোপচীয়তে।
উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্বএব দরিদ্রতি ॥ ৬৯ ॥

নিম্নদিকে দেখিলে কাহার না মহিমা বাড়ে। আর উপরদিকে দেখিলে কে না ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হইয়া যায়? অহঙ্কার পুষ্টির নিমিত্ত যে একদিগ্‌দর্শী হইতে হয় নববিজ্ঞান তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভ্রম করাই উন্নতির লক্ষণ। নববিজ্ঞানের এই অপরূপ মতের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র বিচারের উপর নির্ভর করা অসঙ্গত হইয়াছে। কেন না নব্যযুগ নববিজ্ঞানের সকল কথায় যেরূপ বিচার-পলায়ন, হিন্দুশাস্ত্রের সকল বিষয়েই তদ্রূপ বিচারপরায়ণ। অতএব সদ্বিচারের প্রতিস্থাপন জন্য নববিজ্ঞানের মতদেওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত ছিল। এই দোষ পরিহারোদ্দেশে নব্যযুগের বিচারতরি, অর্থাৎ বিচাররহিত নববিজ্ঞানবিন্যস্ত আশ্রয় করা গেল। হ্যালডেন স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন নববিজ্ঞান মিথ্যা, উন্নতিপ্রবণ নহে। যদি আইনষ্টাইনের মতে কিছু সত্যও থাকে তবে তৎপূর্ব্বে পদার্থ-বিজ্ঞানকৃত প্রত্যেক উক্তিই যে মিথ্যা তাহার সন্দেহ নাই। সেই রকম আইনষ্টাইন ও নব্যনববিজ্ঞানের প্রত্যেক উক্তিই যে মিথ্যা তাহা সহজেই অনুমিত হয়। রাসেল বলেন - প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞান বিধ্বস্ত হইয়াছে, উন্নতির চরমে উন্নীত হয় নাই।

৩৯। **দোষ প্রদর্শনে অত্যুক্তি শঙ্কা**।—নববিজ্ঞানের যেরূপ ভূরি ভূরি দোষ প্রদর্শন করা হইল ইহা স্থূল দৃষ্টিতে পাঠ করিলে মনে সহজ শঙ্কা উদিত হইবে সত্যই কি নববিজ্ঞান এতই দোষের আকর? আচ্ছা যদি তাহাই হইল: তবে এত ভূরি ভূরি আবিষ্কার হইল কিরূপে? নববিজ্ঞান কত সময় কত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে মিলিল কিরূপে? পূর্ব্বলিখিত বিষয়গুলি সাবধানে অনুধাবন করিলে এরূপ শঙ্কা মনে স্থান পায় না। কিন্তু স্থূলদৃষ্টিতে এই সকল শঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া গেল। নববিজ্ঞান ও নব্যনববিজ্ঞানের পরস্পর বিরোধ ও উভয়েরই অপূর্ব্ব তত্ত্বআবিষ্কার ইহার প্রকৃষ্ট উত্তর। অন্যোন্যাকর্ষণ মত অনুসারে অদৃশ্য তারা ও ধূমকেতু গণনা করিয়া বলা হইয়াছে। অথচ সেই অন্যোন্যাকর্ষণ নাই বলিয়া এখন স্থিরীকৃত হইয়াছে। মূল পদার্থের অমৌলিকত্ব সত্ত্বেও মৌলিক রসায়ন-বিজ্ঞান কত নূতন কথাই না বাহির করিয়াছে। মূল পদার্থের পরমাণু হয়। মিশ্র পদার্থের পরমাণু হয় না। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, সীসক, পারদ প্রভৃতি সকলেই মিশ্র পদার্থ (২১প)। তথাপি উহাদের মূল পদার্থ-জ্ঞানে যে পরমাণুর ভার নির্ণীত হইয়াছিল তাহাই মিশ্র পদার্থ হইয়াও ঠিক রহিল। গণিতশাস্ত্রের যুক্তিও আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাই বলিয়া কি সেই ভ্রান্ত গণিত কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই?

৪০। **সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রয়োজন**।—সত্যসেবী ব্যক্তিমাত্রেরই মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হইবে নববিজ্ঞান সত্যবঞ্চিত কেন? নববিজ্ঞানের অসারত্বের কারণ কি? যিনি হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তাঁহার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর। কি গণিতবিজ্ঞান কি পদার্থ-বিজ্ঞান কি রসায়নবিজ্ঞান সকলই স্থূলপ্রমাণমূলক। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ভিন্ন অতীন্দ্রিয় বিষয়ের নববিজ্ঞান ধারই ধারে না। অথচ নববিজ্ঞান স্থূলতত্ত্ব হইতে সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ করিতে সততই উৎসুক। সূক্ষ্মতত্ত্বাবগাহন করিতে যে সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন, নববিজ্ঞানের অহঙ্কারোদ্ভূত স্থূলবুদ্ধিতে

এই স্থূলকথাও স্থান পাইল না। স্থূলবুদ্ধিতে সূক্ষ্মতত্ত্বের নিরূপণ করিতে যাইয়া নববিজ্ঞান পদে পদে বিপন্ন। স্থূলবুদ্ধিতে হৃদস্থ পদার্থও নাই বলিয়া মনে হয়।

যথাঽবুধো জলং হিত্বা প্রতিচ্ছন্নং তদুদ্ভবৈঃ।
অভ্যেতি মৃগতৃষ্ণাং বৈ তদ্বৎ ত্বাহং পরাঙ্‌মুখঃ॥৭০॥

যদ্রূপ অজ্ঞান মনুষ্য তৃণাচ্ছাদিত জলকে তদুৎপন্ন তৃণমাত্রজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া, আপাতপ্রতীত কিন্তু মিথ্যা মৃগতৃষ্ণার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সতত ধাবিত হয়, তদ্রূপ আমি মঙ্গলময় তোমাকে অবিদ্যমান জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া সংসাররূপ মিথ্যা মৃগতৃষ্ণার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছি। সূক্ষ্ম বুদ্ধিই তৃণাচ্ছাদিত জলাশয়—স্থূলচক্ষে তৃণমাত্র দেখায় কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে উহাই নির্ম্মল সুশীতল জলের একমাত্র আধার বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ স্থূলবুদ্ধিই মৃগতৃষ্ণা—প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে বিশাল নির্ম্মল জলাশয়ও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে মিথ্যা মায়ামাত্র বলিয়া প্রতীত হয়।

মোহবশতঃ সূক্ষ্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ স্থূলবুদ্ধির অনুসরণে নববিজ্ঞানের মতি স্থির নাই—যখন যাহা সুবিধা হইয়াছে তখন তাহারই শরণ লইয়াছে। এই তাৎকালিক বুদ্ধির আশ্রয়ে সত্যকে পদদলিত করিয়া নববিজ্ঞান বিপর্য্যাস সাগরে নিমগ্ন।

নানারূপাত্মনো বুদ্ধিঃ স্বৈরিণীব গুণান্বিতা।
তন্নিষ্ঠামগতস্যেহ কিমসৎ কর্ম্মভির্ভবেৎ॥ ৭১ ॥

মনুষ্যের বুদ্ধি সেচ্ছাচারিণী স্ত্রীর ন্যায় ইচ্ছানুসারে নানারূপ ধরে। কখন্ কোন্ জিনিষকে যে কি ভাবে উপস্থিত করে কে বলিতে পারে? এই বুদ্ধির উপর যে নির্ভর করে তাহার বেশ্যাসক্ত পুরুষের ন্যায় নানাদশাই হইয়া থাকে। এই স্বৈরবর্ত্তিনী উৎপথগামিনী স্থূলবুদ্ধিকে যদি সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিতই করা না হইল তবে অসৎকর্ম্মের দ্বারা আর কি ফললাভ হইতে পারে?

৪১। **স্থূল ও সূক্ষ্ম বিপ্লব**।—নববিজ্ঞান স্থূলবুদ্ধিপ্রসূত। কাযেই পদে পদে উৎপথগত ও বিপর্য্যস্ত। গণিতবিজ্ঞান প্রভৃতি যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা সকলেই জানেন ও প্ল্যাঙ্ক এডিংটন টমসন প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। তথাপি স্থূল ও সূক্ষ্মের বিভেদ নববিজ্ঞানকেও প্রকারান্তরে মানিতে হইয়াছে।

জীনস্ বলেন—জাগতিক কার্য্যকে দুইভাগে বিভাগ করা যায়—স্থূল (Large scale-phenomena) ও সূক্ষ্ম (Small scale) পদার্থ (Matter) ও তেজোবিকিরণ (Radiation) উভয়েই যুগপৎ পদার্থকণ (Particle) ও কম্পনরূপ (Waves)। স্থূলক্রিয়া সম্বন্ধে উভয়ই পদার্থকণ ও সূক্ষ্মক্রিয়া সম্বন্ধে উভয়ই কম্পনমাত্র। বস্তুর স্বরূপ, এই সূক্ষ্মক্রিয়ার ভিতর প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ত্তমান। কাযেই বস্তুর স্বরূপ জানিতে হইলে সূক্ষ্মক্রিয়ারই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এডিংটন বলেন—মাত্রামত (Quantum theory) ও সম্পৃক্তমত (Relativity theory) হইতে দেখা যায় যে পদার্থের বহীরাজ্যের সম্বন্ধ অপেক্ষা মনোরাজ্যের সম্বন্ধ অনেক অধিক।

প্ল্যাঙ্ক বলেন—জগৎ ত্রিবিধ. স্থূল বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বৈজ্ঞানিক বা পদার্থবিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তব বা সত্য। যাহা আমাদের চক্ষুরাদির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বুঝা যায় তাহাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা স্থূলজগৎ। যাহা কাল্পনিক, যাহার অস্তিত্ব গণিত শাস্ত্রে আছে, তাহাই পদার্থবিজ্ঞানসম্মত

বৈজ্ঞানিক জগৎ। যাহা অতীন্দ্রিয়, যাহা স্থূলজগৎ হইতে ভিন্ন তাহাই বাস্তব বা সত্য। উহা পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষভাবে নহে। এই অতীন্দ্রিয় জগতই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত তথ্যোদ্ঘাটনই পদার্থবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও তাহার সকল সিদ্ধান্তই সত্য বা অতীন্দ্রিয় জগতের ভিত্তির উপরই এ যাবৎ অধিষ্ঠিত ও ভবিষ্যতে সর্ব্বদাই অধিষ্ঠিত থাকিবে ইহাতে সংশয় নাই। বৈজ্ঞানিক জগৎ স্থূলদৃষ্টিবিশিষ্ট মনের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া সদাই পরিবর্ত্তনশীল। পদার্থবিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ততই স্থূল জগৎ হইতে অপসৃত হইয়া সত্যজগতের ক্রোড়ে বিশ্রামলাভের দিকে ধাবিত হইতেছে। সত্যজগতের অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধ। স্থান বিশেষে, চরম স্থূলজ্ঞান হইতেও অতীন্দ্রিয় সত্যই পরম আদরের ধন ইহাই নববিজ্ঞানের বিশিষ্ট শিক্ষা।

তথাপি সূক্ষ্মতত্ত্বের বিদ্বেষই নববিজ্ঞানের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। এই বিচিত্র বিদ্বেষ বশতঃই নববিজ্ঞান নিত্যই স্খলিতপদ ও উদ্ভ্রান্ত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি?

শাস্ত্রোৎকর্ষ

৪২। **প্ল্যাঙ্ক কথিত সত্যজগৎ কি?**—প্ল্যাঙ্কের মতে পদার্থবিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ততই স্থূল জগৎ হইতে অপসৃত হইয়া সত্যজগতের ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই সত্যজগৎই যে সনাতন হিন্দুশাস্ত্রোপবর্ণিত জগৎ তাহার আভাসমাত্র এইবার দেওয়া যাইতেছে। আভাসমাত্র দিবার কারণ কি?

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যম্ স্বল্পশ্চকালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যম্ হংসো যথা দোহনমম্বুমিশ্রম্॥ ৭২॥

শাস্ত্র অনন্ত। তাহার মধ্যে প্রত্যেকের জ্ঞাতব্য বিষয়ও অনেক। কিন্তু জানিবার সময় অত্যন্ত অল্প। তাহাও আবার পদে পদে বিঘ্নোপদ্রুত। যাহা প্রত্যেকের পক্ষে সারভূত তাহারই নিত্যচর্চ্চা বা উপাসনা কর্ত্তব্য। যেরূপ হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জলত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধই গ্রহণ করে। এই অনন্ত:শাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন করাই দুঃসাধ্য। সম্যক্ বিবৃতির ত কথাই নাই। এখানে বাধ্য হইয়া সেই দিগ্‌দর্শনের ছায়ার লেশমাত্র অবলম্বনে হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব্বতোমুখ উৎকর্ষ প্রতিপাদন করা যাইবে। যাহা বলিবার আছে তাহার মাত্র দু একটী কথা অসম্যক্ ভাবে বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে। নাস্তিকতার বন্যায় পাশ্চাত্য জগৎ একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। তথাপি প্ল্যাঙ্ক এডিংটন টমসন্ জীন্‌স প্রভৃতি নববিজ্ঞানে উচ্চাসনসংস্থিত কয়েকটী মনীষী মানিতে বাধ্য হইয়াছেন —স্থূলজগৎ সত্য নহে ও অসত্য বৈজ্ঞানিক জগৎ ভিন্ন সত্য ও বাস্তব জগৎ আছে। ভগবান্‌কে একেবারে উড়াইতে পারেন নাই বলিয়া নাস্তিক বিজ্ঞানমানিগণ এই বিজ্ঞানধুরন্ধরগণকে উড়াইয়া দিতে চাহেন। কিন্তু এই অজ্ঞানে জ্ঞানমানিগণও অস্বীকার করিতে পারেন না যে ইহারাই বিজ্ঞান-বিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব ইহাদের বিজ্ঞান বিষয়ে মত, ঘোর ভগবদ্‌বিদ্বিষ্ট নাস্তিকদলও উপেক্ষা করিতে সাহসী নহেন।

প্ল্যাঙ্ক, আইনষ্টাইন প্রভৃতির লেখা পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহারা নরপতঙ্গবিশেষ। পতঙ্গ যেমন আলোকাকৃষ্ট হইয়া সেই আলোকের আবেষ্টনের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে থাকে, ও

আবেষ্টনের জ্ঞানাভাবে তাহার ভিতর দিয়া প্রবেশলাভে অসমর্থ হইয়া অনবরত তাহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ প্ল্যাঙ্ক প্রভৃতি নরপতঙ্গগণও সত্যালোকাকৃষ্ট হইয়া সত্যালোকের সূক্ষ্মাবরণের জ্ঞানাভাবে সত্যস্বরূপোপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ সত্যস্বরূপোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন।

৪৩। **দেশকালমাত্রাদি দ্রব্যের গুণকারক**।—দেশকাল পাত্রভেদে ব্যবস্থাভেদ—একথা হিন্দু মাত্রেই আবহমানকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছেন। উহাদের মধ্যে কালই সর্ব্বপ্রধান।

জন্যানাং জনকঃ কালঃ জগতামাশ্রয়ো মতঃ।
পরাপরত্বধীহেতুঃ ক্ষণাদিঃ স্যাদুপাধিতঃ ॥ ৭৩ ॥
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং নিমেষতঃ।
কালশব্দেন নির্দ্দিষ্টো হ্যখণ্ডানন্দ-অব্যয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

কালই সৃষ্টপদার্থের জনক ও সর্ব্বজগতের আশ্রয়। এই কাল হইতেই পূর্ব্বাপর জ্ঞান হয়। এই কালই উপাধিক্রমে ক্ষণ মুহূর্ত্ত হোরা প্রহর প্রভৃতি রূপে কল্পিত হয়। যিনি সংহর্ত্তা যিনি ভূতাদির পরিণামকারক তিনিই কাল। মনুষ্য দেবতাদির কোন্ কথা, স্বয়ং ব্রহ্মাকেও নিমেষের মধ্যে সংহার করেন বলিয়া, সেই আদি অন্ত ও নাশহীন পরমেশ্বরই কাল নামে অভিহিত হন।

কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ৭৫ ॥

কাল ভূতগণকে পরিণামের পথে অগ্রসর করিয়া দেন ও অন্তে সংহার করেন। জগৎ সুপ্ত হইলে জাগরিত থাকেন। এই কাল অতিক্রম করা যায় না।

মাত্রা-কাল-ক্রিয়া-ভূমি-র্দেহদোষ-গুণান্তরম্।
আশ্রিত্য বর্ত্ততে দ্রব্যং স্বগুণে চ হিতাহিতে ॥ ৭৬ ॥

দ্রব্যের গুণ মাত্রা কাল স্থান প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

মাত্রাদির উপর দ্রব্যের গুণ নির্ভর করে শুনিয়া নববিজ্ঞানমানিগণ চিরকালই হাঁসিয়াছেন ও ভারতকে অসভ্যতার চরম সীমায় উপনীত বলিয়া স্থির করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কালের দুরতিক্রমদৌরাত্ম্যে অসভ্যতার মুকুট আজ সভ্যজগতের শীর্ষদেশই শোভা করিতেছে। যথা—

মণির্লুঠতি পাদেষু কাচোমুকুটশোভনঃ।
মোহাচ্চ বিভ্রমেচ্চিত্তং কাচঃ কাচো-মণির্মণিঃ ॥ ৭৭ ॥

মণি সকলের পায়ে লুটাইতেছে। কাচ রাজমুকুটে শোভা পাইতেছে। যে মূঢ় যে অন্ধ সে ইহা দেখিয়াই মনে করে কাচই ভাল, মণি কিছুই নহে। তাই বলিয়া কি তাহার ভ্রান্ত মত সত্য হইবে? কাচ রাজমুকুটেও কাচই থাকিবে। মণি পাদতলেও মূল্যবান্ মণি। নববিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে সেই চিরপরিচিত কাচমণিসম্বন্ধ। নববিজ্ঞান রাজশীর্ষেশোভা পাইয়াও ঐকদেশিক সত্য। হিন্দুশাস্ত্র পদতলে দলিত হইয়াও সনাতন সত্যের আধার। পুনশ্চ—

কাকস্য চঞ্চুর্যদি-হেমযুক্তা মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ ॥ ৭৮ ॥

যদি কাকের চঞ্চু স্বর্ণমণ্ডিত হয় তাহার চরণদ্বয় মাণিক্যযুক্ত হয়, তাহার প্রত্যেক পালকে যদি শ্রেষ্ঠ মুক্তাগণ বিরাজমান থাকে তথাপি সেই কাক মূল্যবান্ ভূষণে আপাদমণ্ডিত হইয়াও কাকত্ব ত্যাগ করিয়া রাজহংস হইতে পারে না।

নববিজ্ঞান বলে সুবর্ণ রজত পারদ প্রভৃতি সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে সুবর্ণ রজত ও পারদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহাদের গুণ সদা সর্ব্বত্রই অপরিবর্ত্তনীয়—একই থাকে মাত্রাদির উপর নির্ভর করা একেবারে অসম্ভব—বাতুলের কথা। নববিজ্ঞানের এই আত্মমোহসম্ভূত আত্মগরিমা আজ ব্রহ্মাদির সংহর্ত্তা কালের করালবশে বিধ্বস্ত। শ্রেষ্ঠ নববিজ্ঞান আজ নব্যনববিজ্ঞানের তাড়নায় পদতলে লুণ্ঠিত। পদদলিত সনাতন হিন্দুশাস্ত্রই আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিল।

কাল ও স্থানের উপর বস্তুর স্বরূপ নির্ভর করে। আইনষ্টাইনের সম্পৃক্তমতই তাহার প্রমাণ। সম্পৃক্ত মতে সকল বস্তুই কাল-স্থানের বিকাশ মাত্র: উহাদের মধ্যে কালই প্রধান—প্রাণস্বরূপ। অ্যালেক জ্যাণ্ডর বলেন—কালই দেশের মন ও দেশই কালের দেহ। প্লাঙ্কব্য বলেন পদার্থের গুণভেদ তাহার মাত্রাভেদের উপরই নির্ভর করে এই মত উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাভ করিতেছে। পদার্থের স্বরূপ তাহা গতির উপরও নির্ভর করে। ফিটস্‌জেরাল্ড দেখাইয়াছেন গতিশীল পদার্থমাত্রেই গতির দিকে ছোট হইয়া যায় ও সেই পদার্থের আকৃতি ও পরিমাণ উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

চিনি বাতাসা ও মিছরি রসায়ন মতে একই বস্তু, কোনও ভেদ নাই। তথাপি তাহাদের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন। বাতাসা চিবাইয়া খাইয়া তৎক্ষণাৎ জল খাইলে এক প্রকার কার্য্য হয়। মুখে বাতাসা ও জল একসঙ্গে দিয়া খাইলে আর এক প্রকার ফল। বাতাসা জলে ডুবাইয়াই খাইলে ফল তৃতীয় প্রকার হয়। আর বাতাসা ভিজাইয়া খাইলে ফল একেবারে ভিন্ন হয়। ইহা কে না জানে? তথাপি পরের মুখে ঝাল খাওয়া রোগ বড় বিষম।

স্বাদু পরমুখস্বাদু তিক্তং পরমুখেন হ।
স্বয়ং ন স্বদতে কিঞ্চিৎ ইয়ং পরাণুগান্ধতা ॥ ৭৯ ॥

মিষ্ট কেন? পরে বলে। তিক্ত কেন? অপরে বলে। নিজের মুখে স্বাদ নাই। ইহাকেই বলে বিচিত্র অন্ধানুকরণ বৃত্তি।

(ক্রমশঃ)

পল্লী-রাষ্ট্র

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

বিশ্ব-ভুবনে পল্লীর মহনীয় দান তাহার সমাজ-বিন্যাস। অধুনাতন মানব-সমাজে রাষ্ট্র লইয়া যে সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে, পল্লী-সমাজে তাহার সমস্তই সমাধান হইয়াছিল। পল্লী-পঞ্চক বা পঞ্চায়ৎ স্বায়ত্ত-শাসন প্রণালীর চরমতম বিকাশ। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষত রাখিয়া এবং তাহার

সহিত সমাজ ব্যবস্থার একটা নিগূঢ় সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিবার ব্যবস্থা আর কোন সমাজতন্ত্রে বা রাষ্ট্রতন্ত্রে পারিয়াছে বলিয়া প্রকাশ নাই।—আধুনিক জগতের যে সব জাতি রাষ্ট্র ব্যাপারে খুব পারদর্শিতা দেখাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে রাষ্ট্র ও সমাজ, ব্যষ্টি ও সমষ্টি একটা সঙ্গতি পূর্ণ অবস্থা লাভ করিতে পারে নাই। এই সামঞ্জস্য পূর্ণ সঙ্গতির জন্য য়ুরোপীয় জাতিকে বিব্রত হইয়া উঠিতে হইয়াছে।—যাউক, এখানে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনীতির বিফলতার পরিচয় দিতেছি না; বলিতেছি পল্লী-রাষ্ট্রের কথা।

রাষ্ট্র বলিতে বুঝায়—যাহা রাজা ও রাজ্য লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ রাষ্ট্রকে কখন অখণ্ড করিয়া দেখে নাই। রাষ্ট্র সমগ্র মানবতার একটা অংশ। রাজ্য ও রাজার প্রয়োজনীয়ত্ব আছে; কিন্তু তাহা সকলকে ছাপাইয়া নহে, সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া। রাষ্ট্র—শাসন মূলক; আর কিছু নহে। আর্য্য চিন্তায় নৃপতিকে নারায়ণ বলা হইলেও, শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদার অর্ঘ্য নিবেদন করা হইলেও রাজা মাত্র রাষ্ট্রপতি। জাতীয় জীবনের একমাত্র নিয়ামক নহেন। রাজকর্ত্তব্য —মাত্র শাসন ও পালন লইয়া।

সমাজ-জীবন কিন্তু বহু ভঙ্গিম।—ধর্ম্ম শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং গৃহ—মানবতার নানাদিক রহিয়াছে।—প্রত্যেক বিভাগে শাসন-দণ্ডের প্রভাব রহিলে মানব জাতির ব্যক্তিত্ব স্ফূর্ত্তি পায় না, মনুষ্যত্ব ব্যহত হইয়া পড়ে। দণ্ডের ভয়ে জীবন যাপন করিলে জীবন পশু জীবনে পরিণত হয়। যে সব জাতির মধ্যে সহজ স্বভাবকে বিকশিত না করিয়া, মানবের নিজস্ব কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে না জাগ্রত করিয়া রাষ্ট্রকেই গরিষ্ঠ করা হইয়াছে, আইন ও শাসন ব্যবস্থাকেই বড় করিয়া দেখা হইয়াছে, সেখানে সাধারণতঃ মানব প্রকৃতি পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে।—এ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক্ রোম ও বর্ত্তমান য়ুরোপ জলন্ত দৃষ্টান্ত।

ব্যক্তির—অন্তর্য্যামীরূপে যে ভগবান জীবনে জীবনে রাহিয়াছেন, তাঁহাকেই জাগ্রত করিয়া তোলা—মানব কর্ত্তব্য। অন্ততঃ ভারতীয় সভ্যতার ইহাই পরমতম আদর্শ। এই আদর্শকে ব্যক্তি জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে মানবের যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহাকে—অনুশীলিত হইবার অবকাশ দিতে হয়। রাষ্ট্রকে বড় করিয়া ধরিলে, দণ্ডকে—প্রধান করিয়া ধরিলে এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের উন্মেষের পথে একান্তই বাধা ঘটে। এই জন্যই ভারতীয় জীবন রাষ্ট্র মূলক নহে—সমাজ প্রধান। ঠিক সমাজ প্রধানও নহে, গৃহ-প্রতিষ্ঠ। এ কথা পরে বলিব।

রাষ্ট্র ব্যক্তিত্ব উন্মেষের বিঘ্ন। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনা করেন মাত্র কয়েক জন ব্যক্তি।—এবং তাঁহাদের সেই পরিচালম বহু মানবের মাথায় চাপাইয়া দেওয়া হয়। তাই—ঐ মুষ্টিমেয়ের ইচ্ছা সমষ্টিকে প্রবুদ্ধ করিতে পারে না বা মনুষ্যত্ব দান করিতেও সক্ষম হয় না। তাই—অত বড় স্বদেশ প্রেমিক পাশ্চাত্য জাতিকেও বিগত মহাসমরে সৈন্য সংগ্রহের জন্য বাধ্যতা মূলক আইন (Conscription) চালাইতে হইয়াছিল। আর এক দিয়া রাষ্ট্রের ব্যর্থতা দেখিতে পাইতেছি, তাহা ব্যাপকতা।

রাষ্ট্র একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। তাহা প্রতি মানবের নিগূঢ় সম্পর্কে আসিতে পারে না। কাছে বসাইয়া নিকটে আনিয়া প্রত্যেক মানবটিকে কর্ত্তব্য প্রবুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না।—এই কারণেও—রাষ্ট্রশক্তি ব্যক্তি মানবের চরিত্র উন্মেষের পক্ষে বিঘ্নজনক। এবং রাষ্ট্রই যেখানে বরেণ্য

সেখানে ব্যক্তির ইচ্ছার, বুদ্ধির, আকাঙ্ক্ষার ঠাঁই নাই। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতন্ত্রই হউক অথবা রাজ-তন্ত্রই হউক—ব্যাপকতা রহিবার জন্য জাতির সর্ব্বদেহ ও মনের উপযোগী হয় না।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সমূহে রাজাকে বাদ দিয়া—গণ মূলক শাসন প্রণালী পরিচালিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এবং গণের—সম্মতি (ভোট) লইয়া সেই শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থাও হইতেছে।—য়ুরোপের—রাশিয়া প্রদেশ আবার অরাজক তন্ত্রের চরমে উঠিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু গণ কোথাও তাহার প্রকৃত অধিকার পাইতেছে না। কেন পাইতেছে না, তাহা—বক্ষ্যমান আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। তথাপি—ইহাই বলিতে হইতেছে যে রাষ্ট্র প্রধান্যই ইহার মূলীভূত কারণ।

মানবের প্রকৃত প্রতিষ্ঠান ভূমি—গৃহে।—যেখানে জন্মলাভ করে, স্নেহে ও সমাদরে সম্বর্দ্ধিত হয়, যেখানে শেষ নিশ্বাস ফেলিয়া—মানব ইহকালের কর্ত্তব্য শেষ করে। যে গৃহের সুখ শান্ত,—ঐশ্বর্য্য স্বাচ্ছন্দ প্রভৃতির জন্যই মানবের জীবন প্রচেষ্টা, সেই গৃহকে কেন্দ্র না করিলে একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক কৃত্রিমতার সৃষ্টি করা হয়। সেই জন্যই রাষ্ট্রীয় মানব আজ ছন্নছাড়া হইতেছে। রাষ্ট্রের মাঝে ঐশ্বর্য্য ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্রীভূত দেখিয়া মানব শুধু জিঘাংসু হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্র প্রধান য়ুরোপে এই অবস্থা বিকটভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পল্লী-রাষ্ট্রের কথা ভাবিতে গিয়া এই যে চারিদিক দেখিতেছি, তাহার কারণ চতুর্দ্দিক দেখিয়া, সমস্ত অবস্থা ও ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঠিক বুঝিতে পারিব পল্লীরাষ্ট্রের শোভনীয়তা ও মহনীয়তা কি ও কেমন ?

পল্লী সভ্যতায় শুধু নহে ভারতের মর্ম্মবস্তুতে রহিয়াছে—গৃহ। গৃহকে অবলম্বন করিয়াই—ভারত সভ্যতা স্তরে স্তরে বিকাশ পাইয়া তাহার শেষ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। 'যথা মাতরম্ আশ্রিত্য সর্ব্বে জীবতি জন্তবঃ।' ইহা ভারত জীবনেরই সার কথা।—গার্হস্থ্য জীবনকে আশ্রয় করিয়াই জীবনত্রয় গঠিত ও রক্ষিত হয়। গার্হস্থ্য জীবনের মহিমা ও গরিমা অপরিমেয়। গৃহই সমগ্র সমাজ জীবনের কেন্দ্র।—সেই জন্যই আমাদের পল্লীরাষ্ট্র অনেকটা গৃহানুগ। অন্ধকার সুবৃহৎ রাষ্ট্রযন্ত্র দেখিয়া পল্লী রাষ্ট্র গুলিকে যেন কতকটা অর্দ্ধাঙ্গ—অপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ উহা দৃষ্টিহীনতারই ফল।

পল্লীরাষ্ট্র গৃহানুগ।—ইহা বলিয়াছি। অর্থাৎ গৃহ শাসন যেমন চলে, পল্লীরাষ্ট্রও ঠিক তদ্রূপ পরিচালিত হয়।—শাসন বলিলাম, কিন্তু শুধু শাসন নহে—পালনও। আদরে স্নেহে একের কর্ত্তৃত্ব চলে—গৃহে। পল্লী রাষ্ট্রের উহাই অবলম্বন।—এখানে আদর ও স্নেহই সমাজ পরিচালনের একমাত্র নিয়ামক। শাসন যাহা, তাহাও স্নেহ আপ্লুত।—পিতার কাছে সন্তান যে শাসন পায়।

রাষ্ট্র কথাটা বারম্বার ব্যবহার করিতেছি। রাষ্ট্র কিন্তু ভারত সভ্যতার বিশিষ্ট বস্তু নহে। রাষ্ট্র রাজাকে লইয়া।—আমার কর্ত্তব্য—গৃহে, রাজার কর্ত্তব্য রাষ্ট্রে! আমার কাছে গৃহের যে মর্য্যাদা ও মূল্য ; রাজার কাছে রাষ্ট্রেরও তাহাই।—বিশেষ করিয়া গৃহই যখন জাতীয় জীবনের নিয়ামক ; তখন রাষ্ট্রকে বিশিষ্টতা দান করিবার হেতুমাত্র নাই। আমি আমার মানব কর্ত্তব্য প্রতিপালন করি গৃহের প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া ; নৃপতি তাহাই করেন—সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়া। কাজেই এ দেশে মর্য্যাদা পাইয়াছে—গৃহ।

গৃহই মানবিকতার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান ভূমি।—আর এই গৃহই ত সব। গৃহ অশোভন অসংস্কৃত, ব্রত ভ্রষ্ট হইলে রাষ্ট্র বা সমাজ অচল হয়। ইউরোপীয় রাষ্ট্র নায়কগণ আজিকার মানুষ গুলিকে সুগঠিত নাগরিক করিতে চাহিতেছেন—ইহা যেন কতকটা গৃহি মানব করিবার চেষ্টারই অনুরূপ প্রচেষ্টা। নাগরিক মানব অপেক্ষা গৃহি মানব গঠনের প্রচেষ্টাই যথার্থ চেষ্টা হইত—নিজস্বতায় যে পরিপূর্ণ, সেই বাহিরেও পরিণত। গৃহের মানবই বাহিরের মানব। তাহা ছাড়া স্নেহ প্রেম, কর্ত্তব্য, উন্নতি, ঐশ্বর্য্য—যাহা কিছু এই গৃহকেই অবলম্বন করিয়া। ব্যক্তিগত জীবনই জীবন। অন্য জীবন—সে রাজ জীবনই হউক, আর নাগরিক জীবনই হউক, তাহা এক স্তই কৃত্রিম। সেই জন্যই ভারতের জীবন পদ্ধতি গৃহের মাঝেই সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া ধীরে ধীরে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে চাহিয়াছে। পল্লীরাষ্ট্রের আলোচনা করিতে গিয়া সেই গৃহরাষ্ট্রেরই পরিচয় লইব।

রাষ্ট্র ও গৃহ

যে সূতিকা গৃহের মৃত্তিকাতলে মানব ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার বাঁধন ও আকর্ষণ সুনিবিড়। এই জন্যই মানুষ আমরণ গৃহিজীব। এই গৃহ সংস্থানকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার আশা উল্লাস হর্ষ বেদনা—জীবন প্রচেষ্টার প্রতিটি পাদক্ষেপ নিয়মিত হয়। প্রতিদিন সহস্র কাজে যে মানুষকে আমরা বাহিরে দেখি, সে মানুষ সেই গৃহেরই মানুষ। সেই ছোটখাট সুখ দুঃখ সমন্বিত, সেই পরিমিত আশা উল্লাসে উদ্দীপিত। বাহিরে দেখি যে তাহাও একান্ত বাহিরের জন্য নহে, গৃহের জন্যই। প্রভাতের পথচারী মানুষকে দিনান্তের অবসানে তাহার গৃহ কক্ষেই উপবিষ্ট দেখি। তাই সহস্র ভাবে ও ভঙ্গিতে বুঝিতে পারি মানুষ বাহিরের নহে—একান্ত ভাবেই ঘরের।

গৃহের মাঝেই মানুষের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাই। বাহিরে যে মানুষ বাহির হইয়া আসে, সে মানুষ সজ্জিত, আবরিত; সে মানুষ একান্ত কৃত্রিম। এই বাহিরের মানুষকে খাঁটী মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুলকেই স্বীকার করা হয়। সে কথা যাউক, এই বাহিরের মানুষই প্রকৃত মানব। তাই গৃহের প্রতি ভারত সভ্যতার এমন সস্নেহ দৃষ্টি।

জাতি বা সমাজ একটা গৌণ বস্তু। মুখ্য বিষয় হইতেছে ব্যক্তি—এক একটি মানব। যত কিছু প্রচেষ্টা, যত কিছু কল্যাণ, যত কিছু উন্নতি অভ্যুদয় তাহা এই ব্যক্তির জন্য। সমষ্টির উপর অত্যধিক দৃষ্টি দিয়া যদি ব্যষ্টি মানব অবহেলিত হয়, তাহা হইলে মানব সভ্যতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। নব্য জাগতিক রাষ্ট্র নীতিতে ব্যষ্টি মানব একান্ত ভাবে অবহেলিত হইতেছে।

দশজনে মিলিয়া দশজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান, ইহাই ত রাষ্ট্রের মূল কথা। এই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পর্য্যায়ে দেশ জয় হইতে শিক্ষা শিল্প পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে। কিন্তু আসি। পড়ে না ব্যষ্টি মানব গুলি। কারণ মূল উদ্দেশ্য ত এককে গঠন করা নহে, দেশের সম্মিলিত একককে—অর্থাৎ রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধি করিয়া তোলা। এই ব্যবস্থায় ভাল মন্দ কতখানি হইয়াছে, তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিব না; এই পর্য্যন্ত বলিব এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি একান্ত ভাবেই অবহেলিত হইয়াছে।

গৃহানুগ সভ্যতা কিন্তু ব্যক্তিকেই বড় করিয়া ধরিয়াছে। তাই দশজন মিলিয়া কাজ করিবার প্রচেষ্টা গৃহরাষ্ট্রে তেমন উজ্জ্বল নহে। পরন্তু একের কর্ত্তব্য সাধনই গৃহ তান্ত্রিকতার পরম উদ্দেশ্য ছিল। শাসনের রক্ত আঁখি দেখাইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিয়োজিত করিলে মানবতা পঙ্গু হইয়া পড়ে। প্রত্যেক মানুষকে তাহার নিজস্বতায় প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নহে. একান্ত নিজস্বতায়—আপনার প্রবুদ্ধ কর্ত্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া যে কর্ম্ম, যে আচরণ যে মানসিকতা, তাহাই যথার্থ মানবিকতা। সমাজের বা রাষ্ট্রের যদি কোন প্রয়োজন থাকে, তবে এই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বকে প্রবুদ্ধ করা।

ভারতবর্ষের সভ্যতা চাহিয়াছে—মানুষকে। তাই গৃহপ্রতিষ্ঠানই এখানকার শ্রেষ্ঠ অনুশীলন ক্ষেত্র। এখানে মানব কর্ত্তব্য বাহিরে নাই, গৃহে। ভারতের গৃহি মানবকে প্রতিদিন জীবন যাত্রার প্রাক্কালে স্মরণ করিতে হয়—অহং দেব ন চান্যোস্মি। আবার প্রতি গৃহিকে পঞ্চযজ্ঞ করিতে হয়। পঞ্চযজ্ঞ—ব্যক্তি কর্ত্তব্যের সহিত—বৃহৎ কর্ত্তব্যের সমাবেশ। একের প্রয়োজনের সহিত দশের আবশ্যকতার সম্মিলন। সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রতি মানবের কর্ত্তব্যকে জাতীয় কর্ত্তব্য করিয়া তোলাই পঞ্চযজ্ঞের সুমহান উদ্দেশ্য। আমি আমার গৃহিজীবনের কর্ত্তব্য পালন করিলেই যুগপৎ সমাজ কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইয়া যায়।

রাষ্ট্র এই জন্যই এখানে স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই, করিবার আবশ্যকতাই নাই। মানুষকে অপ্রবুদ্ধ রাখিয়া বাহিরে একটা ঘটাঘটি করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। এরূপ অনর্থক সমারোহে মনুষ্যত্বের অকল্যাণ ঘটে। পল্লী রাষ্ট্রের গঠন ও পরিচালন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় ইহা স্মরণ রাখা উচিত। রাষ্ট্র অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই রাষ্ট্রসংস্থা এখানে গড়িয়া উঠে নাই। অন্য আর ইহার কারণ নাই।

ভারতের সভ্যতা মানুষকে মানুষ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাই গৃহের মাঝেই তাহার সমাজনীত, রাষ্ট্রনীতি সবই বিকাশ পাইয়াছে। গৃহের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই। যেটুকু হইয়াছে তাহার নাম সমাজরাষ্ট্র নহে। সমাজও সমষ্টিপ্রধান, আবার রাষ্ট্রও সংহতি মূলক। রাষ্ট্র ও সমাজ কিন্তু এক নহে। এখানে সমাজ ও রাষ্ট্রেরও পরিচয় লইতে হয়।

রাষ্ট্র প্রধানতঃ--শাসন মূলক। রাজ্য ও রাজা লইয়া তাহার কথা। সমাজ কিন্তু একটা সুবৃহৎ গৃহ প্রতিষ্ঠান। সমাজ সংঘ—Organisation অরগ্যানিজেসন নহে, পরন্তু উহা অরগ্যানিজিম্। জীবনযাত্রা যেমন সহজ ভাবে চলে, সমাজও ঠিক সেইরূপ একান্ত স্বাভাবিক ভাবে পরিচালিত হয়। এবং প্রতি মানবের প্রতি লক্ষ্য রাখাই উহার গতিবিধি।

বলিলাম সমাজ অরগ্যানিজেসন নহে। সমাজ গৃহের মতই স্বাভাবিক প্রেরণায় গড়িয়া উঠে। ঘর ও বাহির লইয়া মনুষ্যের সম্পূর্ণতা। মনুষ্যচিত্ত গৃহকেও চায়, বাহিরকেও চায়। নিজকেও কামনা করে, অপরকেও প্রার্থনা করে। সমাজ এই বাহিরের প্রার্থনা। গৃহে যাহা আত্মানুগ হইয়া আছে, বাহিরে তাহা বিশ্বানুগ হইয়া দেখা দিয়াছে। কাজেই ভারতীয় সমাজ জীবন গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মতই পরিচালিত হয়।

সমাজ—রাষ্ট্র নহে। রাষ্ট্রের মহিমা আছে। আবার উহার সঙ্গে একটা আতঙ্কও আছে। বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রের দৃষ্টি একান্ত সুপরিচিত নহে। সমাজের মানুষ গুলির সাথে রাষ্ট্র নায়কগণের

একটা ঘনিষ্ট যোগ না থাকায় রাষ্ট্রশাসন সমাজশাসনের মত স্বস্থ এবং সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলপ্রদ হয় না। যাহাকে বলে 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অনেক সময়ই তাহাই হইয়া বসে। অন্ততঃ বর্ত্তমানের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ ব্যাপার।

বাহিরেরও একটা আকর্ষণ আছে। উহা ঘরের মায়ার মত প্রবল ও প্রদীপ্ত। কিন্তু আগে নহে, পরে। ঘরে স্বগঠিত হইয়া বাহিরে আসিতে হয়। তাই ভারতীয় সভ্যতায় সমাজ ব্যবস্থা অপেক্ষা গার্হস্থ্য ব্যবস্থায় এত নীতি নিয়ম। গৃহ একটা পরীক্ষাগার। সেখানে শাসনের ভয় নাই, লজ্জার সঙ্কোচ নাই, বিনিময়ের অত্যধিক তাড়না নাই। ঘরে মানুষ যাহা করে, করিতে শিখে, তাহা তাহার প্রস্ফুটিত স্বভাবের প্রেরণা বসেই। এই স্বগঠিত ঘরের মানুষ যখন বাহিরের টানে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার জন্য সমাজকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। সে মানুষ সমাজের ভার না হইয়া সম্পদ হইয়া দাঁড়ায়।

সংহতি মানব ও ব্যষ্টি মানবের মধ্যে একটা সঙ্গতিপূর্ণ সম্বন্ধ চাই। বাহির ও ভিতরে নাড়ীর যোগ চায়। গৃহ যেমন, সমাজকে ঠিক তদ্রূপ করা প্রয়োজন। নহিলে কৃত্রিমতার পেষণে মনুষ্যত্বের উন্মেষের ব্যাঘাত ঘটে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা কতকটা কৃত্রিম বলিয়া ভারতের জীবন ক্ষেত্রে উহাকে কখন প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। রাজা রাষ্ট্রপতি; তাঁহার কর্ত্তব্য রাষ্ট্রের সহিত সমস্ত প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করা। আর কিছু নহে। সমাজ যখন তাঁহাকে আহ্বান করিবে তখনই তিনি সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন।

রাজার ভয় প্রজার পক্ষে সম্পূর্ণ কল্যাণের নহে। প্রজাসঙ্ঘের একটা নিজস্ব সম্মতি, স্বকীয় স্বেচ্ছার প্রেরণা প্রয়োজন। এই জন্য গৃহের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়াই মানবকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হয়। গৃহ, গোষ্ঠী, সমাজ—ইহাই ক্রম ! এবং প্রত্যেকেরই একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে। রাজকর্ত্তব্যও অবহেলিত ও উপেক্ষার নহে। রাজা—সমাজ, গোষ্ঠী, ব্যক্তি প্রভৃতির উপর প্রভুত্ব করেন না প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য পালন করিল কিনা, ইহাই লক্ষ্য করিয়া তৎপ্রতিকারে মনোনিবেশ করেন। ইউরোপের রাষ্ট্রপতি এবং ভারতবর্ষের নৃপতি এক নহে।

এখানে য়ুরোপীয় রাষ্ট্র ও ভারতীয় রাজন্য প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। য়ুরোপের রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে প্রয়োজনের তাড়নায়। আহার্য্যের আহরণের জন্য যে দল বা সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই য়ুরোপীয় রাষ্ট্র। ভারতীয় রাজপ্রকৃতিতে যে মহিমা আছে, তাহা য়ুরোপের রাষ্ট্রপতি, রাজা বা গণনায়ক অপেক্ষা সমধিক মহিমাময়। য়ুরোপে রাজা একটা দলের প্রয়োজন কেন্দ্র। যখন যেমন আবশ্যক হয় এবং যখন যে দল প্রাধান্য লাভ করে, তখন সেই দলের হাতেই রাজা ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র। সামাজিক পর্য্যায়ে রাজার একটা স্থির আসন নাই।

ভারতের ব্যবস্থা অন্যবিধ। নৃপতি এখানকার জাতীয় জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও তাঁহার প্রয়োজন একান্ত অপরিহার্য্য। চাতুর্ব্বর্ণ্য ভারতীয় সমাজের সমাজ-বিন্যাস প্রণালী। এই বিন্যাস ব্যাপারে ক্ষত্রিয়ের যে প্রয়োজনীয়তা, তাহা কখনই অবহেলা করিবার নহে। সেই জন্য রাজপ্রয়োজন ও রাজ কর্ত্তব্যকে এখানে সসম্মানে ঠাঁই দেওয়া হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও ক্ষত্রিয় শক্তি

য়ুরোপের রাষ্ট্রশক্তির মত সর্ব্বব্যাপক নহে। তাহার কর্ত্তব্য খণ্ড, অংশ, তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। এই সীমার বাহিরে রাজহস্ত ও রাজচক্ষু প্রসারিত হইতে পারিবে না।

রাষ্ট্রনীতি—এই জন্যই এখানে সর্ব্বব্যাপক নহে। সমাজে, গোষ্ঠীতে তাহার একটা অধিকার থাকিলেও তাহা ব্যক্তিমানব ও সামাজিক মানবের কর্ত্তব্য ও স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাহত করে নাই। এই জন্যই দেখিতে পাই ভারতের গৃহগুলি এক একটি স্বতন্ত্র স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠান। ভারতের সমাজ আত্মশাসন নিয়ন্ত্রিত এবং পল্লীগুলি আত্মপ্রতিষ্ঠ। আবার ইহা অরাজকতন্ত্রও নহে। পরন্তু স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠ ও রাজানুগ।

কোন এক ক্ষেত্রে শক্তিকে সঞ্চিত করিয়া ও তাহাকে প্রচণ্ড করিয়া জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া ভারতীয় রীতি নহে। ভারতে কর্ত্তব্যভেদ আছে। রাজকর্ত্তব্য এক গৃহি-জীবনের কর্ত্তব্য অন্যবিধ। রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজা তাঁহার কর্ত্তব্যটুকুই মাত্র করিবেন। অপর পক্ষে গৃহীও করিবেন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট করণীয়। কেহ কাহারও অধিকারে বঞ্চিত নহে। আবার প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ এবং দেহবিধির মত প্রত্যেকটিই সম্বন্ধযুক্ত। রাজা তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে ব্যভিচারী হইলে একজন দীনতম অখ্যাত প্রজাও রাজসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অকুতোভয়ে নরপতির অপরাধের ঘোষণা করিয়া তাহার প্রতীকার প্রার্থনা করেন। ব্রাহ্মণের শিশুপুত্র মরিলে সেই অকাল মৃত্যুর জন্য ব্রাহ্মণ এমনইভাবে মহারাজ রামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অপর পক্ষে শ্রীরামচন্দ্রও তপস্বী শূদ্রের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান না বুঝিলে পল্লীরাষ্ট্রকে ঠিকমত বোঝা যাইবে না। সেই জন্যই সর্ব্বাগ্রে সমাজ বিন্যাসকে বুঝিতে চাহিতেছি। বর্ণাশ্রম অনুশাসিত সমাজ কোথাও বিশ্লিষ্ট নহে, পরন্তু একান্তভাবেই সংশ্লিষ্ট। যাহাকে বলে অরগ্যানিজম্ (Organism) তাহারই রীতিতে বর্ণাশ্রম সমাজ সংগঠিত ও পরিচালিত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—স্বতন্ত্র হইলেও এক। আবার এক হইয়াও বিভিন্ন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কর্ম্মে ব্রতী হইতে পারিবেন না। আবার ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অধিকারী হইবার অনধিকারী। এইরূপ প্রত্যেক বর্ণ সম্বন্ধেই একই রীতি।

ইহা পার্থক্যের কথা। সংশ্লেষের কথাও কহিতেছি। এই যে বর্ণ-বিভাগ, ইহা প্রত্যেকটি —প্রত্যেকের জন্য। ব্রাহ্মণ্যের রক্ষা করিতেছেন ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণ তাঁহার তপঃ শক্তির দ্বারা ধীযুক্ত ও শ্রীযুক্ত করিতেন বৈশ্যের কর্ত্তব্য সমাজের ধন-সংস্থান। সমগ্র জাতীয় জীবনকে সুস্থির ভাবে জীবন পথে অগ্রসর হইতে ধনের যাহা আবশ্যকতা, বৈশ্যই তাহার উৎপাদক। বৈশ্য বিত্ত স্রষ্টা, কিন্তু ধনী (Capitalist) নহেন। পরন্তু বৈশ্য শক্তি ধন সংরক্ষক আজিকার দিনে যাহাকে ব্যাঙ্ক (Bank) বলে, তাহাই। শূদ্র সমাজ সেবক। সমগ্রের কর্ত্তব্যের সাহায্যকারী।

শূদ্র কথাটার উপর একটা হীনতা ভাব আছে। শূদ্র কর্ম্ম ও শূদ্র ধর্ম্ম হীনতা ব্যঞ্জক নহে। ইহার একটা নিজস্ব মহিমা ও প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে। এখানে উহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন শুধু বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিতে ইহাই বলিতেছি শূদ্র-কর্ত্তব্য সেবা হইলেও তাহা ব্রাহ্মণ-কর্ত্তব্য হইতে ন্যূন্য নহে। এ সম্বন্ধে আর্য্য শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলেই এই কথার যথার্থতা বোঝা যাইবে।

বর্ণাশ্রম সমাজ রাষ্ট্র কর্ত্তব্যকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে নাই। উহা সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট।

একটা পল্লীর সমাজ জীবন বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত। এবং উহাতে চাতুর্ব্বর্ণেরই কর্ত্তব্য রহিয়াছে। কাজেই রাষ্ট্রের যাহা প্রধান কর্ত্তব্য, সেই শাসন ও পালন পল্লী সমাজেই প্রতিপালিত হইত। আধুনিক দিনের মানব সঙ্ঘকে যেমন সর্ব্বভাবে রাষ্ট্র সঙ্ঘের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, পল্লী সমাজে তেমন কথা ছিল না। এবং কখনও থাকিবেনা। যতদিন ভারতবর্ষীয় সমাজ বর্ণাশ্রম পন্থী থাকিবে, তত দিন ভারতের পল্লী গুলি নিজস্বতাতেই পরিপূর্ণ থাকিবে। কারণ ভারতের ব্যষ্টি কর্ত্তব্য ও সমষ্টি কর্ত্তব্য কখনও পৃথক নহে। এখানে নিজ কর্ত্তব্য, পারিবারিক প্রয়োজনীয়তা ঠিক মত প্রতিপালিত হইলেই বৃহত্তর কর্ত্তব্য সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালিত হয়।

একটা দৃষ্টান্ত লইব এবং খুব ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত। ভারতীয় গৃহস্থের দৈনিক আহার্য্য লইবার জন্য যে রন্ধন করিতে হয়, তাহার নাম পাক যজ্ঞ। কোন গৃহস্থকেই শুধু নিজের জন্য পাক করিতে নাই, পাক করিতে হয় নিজের জন্য ত বটেই সঙ্গে সঙ্গে অতিথি সজ্জন প্রভৃতির জন্য, এমন কি কীটপতঙ্গের জন্যও বটে। আর্য্য গৃহস্থের যে পঞ্চযজ্ঞ বা পঞ্চ কর্ত্তব্য বিহিত আছে, তাহাতে ব্যক্তির অতিক্ষুদ্র স্বার্থের সহিত বৃহত্তর কর্ত্তব্যও সাধিত হইয়া যায়।

পল্লী সমাজ নিজস্ব কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া পরিচালিত হয়। এখন একটা কূপ বা পুষ্করিণীর জন্য ক্ষুদ্র গ্রাম অথবা বৃহৎ নগর প্রত্যেকের অধিবাসীকে রাষ্ট্র কর্ত্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু পল্লী রাষ্ট্রের এরূপ ব্যবস্থা নহে। জলাশয় প্রতিষ্ঠা করা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করা পথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া প্রভৃতি সামাজিক কর্ত্তব্য ব্যক্তি কর্ত্তব্যেরই অঙ্গীভূত। সমাজের ক'জ মানব ধর্ম্ম বোধে একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই এইগুলি করিত। যে ব্রাহ্মণ ক্রিয়া কর্ম্মশীল হইতেন, ব্রাহ্মণ্য কর্ত্তব্য অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্রতী রহিতেন—গ্রাম্য বিত্তশালী সেই ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়া তাঁহার নিশ্চিন্ত জীবন যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। এই দানের পিছনে কোন বাধ্য বাধ্যকতা ছিলনা, রাজা কুশাসক ছিলনা, কর্ত্তব্য বুদ্ধিই ছিল একমাত্র নিয়ামক।

রাষ্ট্র জীবনে আছে পরবশতা। রাষ্ট্র স্ব জাতি পরিচালিতই হউক অথবা বিজাতি পরিচালিতই হউক, জীবন ব্যপারে রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দিলে স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করাই হইয়া থাকে। কারণ —কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রত্যেকের অন্তঃকরণকে উদ্বুদ্ধ না করিলে প্রকৃত স্বাধীনতার উন্মেষ হয় না। রাষ্ট্রকে গৃহাভিমুখী করিলে স্বাধীনতা পরিস্ফুটনের সুবিধা হয়। প্রত্যেক অন্তরাত্মা জাগরিত হইয়া উঠিলেই তবে জাতীয় জীবনের সম্পূর্ণতা ঘটে। এবং এই সম্পূর্ণতার সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটে—সমগ্র মানব জীবনকে গৃহাভিমুখী করিলে।*

---

* লেখকের "পল্লী-রাষ্ট্র" গ্রন্থের এক অধ্যায়।

কবীরের দোঁহা

অষ্ট বিকার—তৃষ্ণা

কবীর সে ধন সঞ্চিয়ে, জো আগে কো হোয়
সীস চঢ়ায়ে গাঠরী, জাতন দেখা কোয় ॥ ১ ॥

কবীর কর তেমন পুঁজি, সঙ্গে নিতে পারবে যায়।
মাথার উপর পুঁটলি ক'রে, যায় না দেখা কেউ ত যায় ॥ ১ ॥

ত্রিস্না কেরি বিসেষতা, কহঁ লগি করৌঁ বখান।
দেঁহ মরৈ ইন্দ্রী মরৈ, ত্রিস্না মরিন নিদান ॥ ২ ॥

আর কত বা ব'লব বল, তৃষ্ণার দোষ যে সব কত।
ইন্দ্রিয় যার দেহ ঘুচে, তৃষ্ণা নহে দূরীভূত ॥ ২ ॥

ত্রিস্না অগ্নি প্রলয়াকিয়া, তৃপ্ত ন কবহূঁ হোয়।
সুর নর মুনি ঔ রকঁ সর, ভস্ম করত হৈ সোয় ॥ ৩ ॥

তৃষ্ণা অনল প্রলয় করে, তৃপ্ত নহে কদাচন।
সুর, মুনি নর কি দরিদ্র, ভস্ম করে অনুক্ষণ ॥ ৩ ॥

নামহি ছোটা জানিকৈ, দুনিয়া আগেদীন।
জীবন কো রাজা করৈ, তৃস্নাকে আধীন ॥ ৪ ॥

নাম কে ভেবে তুচ্ছ অতি, ধরার কাছে হয় দীন।
রাজা আপন জীবন করে, আকাঙ্ক্ষার পায় লীন ॥ ৪ ॥

—শিব প্রসাদ।

ভিক্ষুকের ঝুলি

(ত্রিদণ্ডী ভার্গব)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরি। ব্রাহ্মণ পরমেশ্বরের Powerful ally হইতেন! অথচ সমস্ত যোগ শাস্ত্রই দেখিতেছি প্রকৃতির বিরোধে যুদ্ধমাত্র। শঙ্করের সন্ন্যাসধর্ম্মও তাহাই। সেদিন দিগ্‌গজ এক মহাপণ্ডিতও বলিয়াছেন :—

"বলিয়াছি প্রকৃতির প্রতিকূলে গমন আমাদের ধর্ম্মসাধনা। এই প্রতিকূলে গমন যে কত কঠিন তাহাও বলিয়াছি, এই কঠিনতাবশতঃই সমাজে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়। প্রধান পুরুষগণের পদস্খলন দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইলে অনাচারের প্রসার হয়, প্রকৃতির পরিবর্ত্তন তাহার অনুকূল হইয়া থাকে।"

মুখোয্যা মহাশয়ের উপদেশের ভাব হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ।

শ্রী। প্রথমতঃ তোমাকে বলি যে হিন্দুধর্ম্মের উক্তরূপ ব্যাখ্যা যে পণ্ডিত করেন তাঁহার পাণ্ডিত্য তোমার শত্রুগণ লাভ করুক। তুমি ওরূপ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থান করিও। ঐরূপ পণ্ডিতের ঘোরতর অত্যাচারেই আজ ব্রহ্মর্ষি-দেশ ব্রাহ্মণহীন প্রায়। ব্রাহ্মণ না বুঝিলে ব্রাহ্মণে ভক্তি হয় না—ব্রাহ্মণে ভক্তি না হইলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণত্ব শব্দজালে আবদ্ধ নহে। তাহা শাস্ত্রার্থবোধ ও অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত। "শাস্ত্রাণ্যধিত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ। যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।" ওরূপ "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" তত্ত্বের মত পণ্ডিত ও মূর্খের সমাবেশ বুঝিবার সময় আসিয়াছে। আচ্ছা বল দেখি ভাই! সকল কাজই কি তুমি নিজ ইচ্ছায় করিতে পার? সকল চিন্তাই কি তোমার ইচ্ছামত তোমার মনে উদয় হয়?

পণ্ডিত ও মূর্খ একত্র সমাবেশ "অচিন্ত্য ভেদাভেদ"

দৈব অদৃষ্ট ও পুরুষকার

পরি। না; অনেক সময় আমার শক্তির অতিরিক্ত শক্তির দ্বারা কার্য্য ঘটে এবং চিন্তাও আসে। তাকে আমরা অদৃষ্ট শক্তিবলে শান্তি আনি।

শ্রী। এই সমষ্টিজগৎ প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত অর্থাৎ সমষ্টি জগতের আইনে পরিচালিত। মানুষ সেই সমষ্টিজগতের এক অংশে অবস্থিত। কাজেই সে জগতের নিয়মে আবদ্ধ। মানুষ জীবরাজ কেন না সে প্রকৃতির নিয়মে আবদ্ধ হইলেও তাহার নিজ গণ্ডীর মধ্যে—অর্থাৎ ব্যষ্টিতে তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্ম্মচেষ্টা বর্ত্তমান। মানুষের এই স্বাধীন ইচ্ছা বা কর্ম্মচেষ্টা কিন্তু সমষ্টি বিশ্বের সাহায্য ব্যতীত ফলদায়ক নহে। সমষ্টি বিশ্বের বিষয় গ্রহণ না করিলে অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্ট পদার্থের সহিত মানুষের সংযোগ না হইলে কোন ইচ্ছা বা কার্য্যই সাধিত হয় না। অবশ্য মন, অহংকার, মেধা, মনীষা, স্মৃতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি যে সকল পদার্থ তাহা ঈশ্বরদত্ত সম্পত্তি—তাহা সমষ্টি জগৎ হইতে মানুষ পায় নাই।

দৈব ও পুরুষকার

কিন্তু যদি সংযোগের বাহ্য বিষয় না থাকে তবে উক্ত ঈশ্বরদত্ত দ্রব্যগুলি লইয়া আমরা কি করিব? মন আছে কি মনন করিব, অহংকার আছে কাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া অহঙ্কারের বোধ করিব, মেধা আছে কি ধরিয়া রাখিব। বৃত্তিগুলি আছে কিন্তু কিসে তাদের প্রয়োগ করিব! কাজেই যা কিছু সম্পত্তি ভগবান মানুষকে অতিরিক্ত ভাবে দিয়াছেন তাহার ব্যবহার করিতে হইলেই সমষ্টিতে সংযোগ অনিবার্য্য। যদি সমষ্টিতে সংযোগ না কর তবে তাহাতে "মরচা" ধরিয়া অকার্য্যকর হইয়া উঠিবে। তাদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও তারা অবাঞ্ছনীয় ও হেয়তম হইতে বাধ্য হয়। সৃষ্টির উদ্দেশ্য কখনই এরূপ নহে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জগৎ একটি সংসারের অবিভাজ্য অঙ্গমাত্র।

তুমি নিজ জীবনের ঘটনাবলী অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে তোমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে বটে কিন্তু তাহার বিকাশ বা পরিচালনা করিতে গেলে তাহার উপকরণ বাহিরে। অর্থাৎ তোমার ক্ষুদ্র ইচ্ছাটুকু আর একটা মহান্ ইচ্ছার অধীন। সেই মহান্ ইচ্ছা বা সমষ্টি তোমাকে যেমন উপকরণ যোগান তোমার ক্ষুদ্র ইচ্ছা ঠিক তদনুরূপ চলিতে বাধ্য। তার বাহিরে যাইতে অক্ষম। কখন তুমি যাহা ইচ্ছাকর ঠিক তদনুরূপ কার্য্য আচরিত হয়, আবার কখনও বা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ পদ দলিত করিয়া আর একটা কার ইচ্ছায় অন্যরূপ কার্য্য ঘটিয়া যায়। এই যে অধিকতর বলবতী ইচ্ছা ইনিই সমষ্টির "আইন"—আর যে টি অপেক্ষাকৃত বলহীন তিনিই তোমায় "আইন"। প্রথমটি অদৃষ্ট বা কপাল বা দৈব—দ্বিতীয়টি দৃষ্ট বা পুরুষকার। অদৃষ্ট ও দৃষ্ট বাদটি সোজা নহে। ব্রাহ্মণ বুঝিয়া থাকেন যে প্রকৃতির বা সমষ্টির ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে গতিপণ্ড মাত্র, তাই তিনি সমষ্টির আইন গুলি দিব্য চক্ষে দেখিয়া লইয়া, নিজ স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্ম্মচেষ্টা ঠিক তাহার অনুকূলে পরিচালিত করেন। অদৃষ্টের কোলে শায়িত করিয়া—পুরুষকারকে দৈবের কৃপার অধীনে পরিচালিত করিয়া—কার্য্যে সুফল লাভ করেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে প্রকৃতির প্রতিকূলে কোন আচরণ নাই। তোমার জ্ঞান বা তোমার স্বেচ্ছাকৃত কার্য্য যখন প্রকৃতির অনুগামী তখন তাহা প্রকৃতির সহায়ক এবং তখনই তাহার সার্থকতা, অন্যথা তার বিপরীত ফল। বিরোধ জন্য প্রকৃতির শক্তিহানি—তোমারও কর্ম্মপণ্ড। সুতরাং যাহা প্রকৃতির আইনের অনুগ তাহাই তোমার সম্বন্ধে "সৎ" অন্যথা অসৎ। ব্রাহ্মণ সতের ভক্ত তাই তিনি অপরিসীম শক্তিশালী ও ঈশ্বরের বলবান ally।

পুরুষকার দৈবের অঙ্কশায়ী

সৎ ও অসৎ

বিনয়। এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা বলিবার আছে। তবে আমি এতদিনে গেটের উক্তির কিছু মর্ম্মবোধ করিতেছি। গেটে বলিয়াছেন :—

'Tis thus at the roaring loom of time I ply,
And weave for God the Garment thou seest him by.

শ্রী। তোমরা গায়ত্রী পাঠ কর—তাহাতে এই তত্ত্ব অতি সহজে লিপিবদ্ধ দেখিবে। "পতিরিব জায়ামভিনোন্মেতু ধর্ত্তা দিবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ" প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যেও এই তত্ত্ব।

অদৃষ্ট, পুরুষকার প্রভৃতি তত্ত্ব অতি জটিল। পূর্ব্বজন্ম ঐ তত্ত্বের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত তাহা সময়মত পরে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বুঝিবার চেষ্টা করা যাইবে। আগে মোটা জিনিষ গুলি বুঝিয়া লওয়া যাক্। হিন্দুর কথা "ন চ দৈবাৎ পরং বলং" এক কথায় বুঝা যায় না।

একটা গ্রন্থে লেখা যায় না। সে অদৃষ্টবাদ কাপুরুষের নহে—সে অদৃষ্ট বাদে জড়ত্ব আনে না। বেদোক্ত মায়াবাদ যেরূপ বিকৃত ভাবে প্রচারিত হইয়া জাতিকে ক্রম নিম্নে চালিত করিয়াছে, আর্য্যগণের এই অদৃষ্টবাদ না বুঝার ফলে তেমনই অলস ও ব্যসনপরায়ণ জাতি প্রস্তুত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

মহাত্মাজীর অভিযান

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ

মহাত্মা গান্ধী ১২ই ভাদ্র ১৩৩৮, ইংরাজী ২৯শে আগষ্ট ১৯৩১, ১টা ৩০ মিনিটের সময় রাজপুতানা জাহাজে বিশাল বারিধির বীচিবল্লরী ভেদ করিয়া বিলাতের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পোতারোহণকালে জনতার মনে আশা ও নৈরাশ্যের ঘাতপ্রতিঘাত হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ একদিকে স্বার্থপরতা, অপর দিকে নৈরাশ্য ও দুর্ব্বলতা—এই উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের ভাগ্যাকাশের অবস্থা বিষয়ে ভারতচিত্ত দোদুল্যমান। তবে মানুষ তাহার কার্য্য করিয়া যায়—ফলদাতা বিধাতা স্বয়ং ভগবান্। তাই গীতার বাক্য স্মরণপূর্ব্বক 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন'—গমনের পূর্ব্বে মহাত্মাজী বোম্বায়েতে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—আমি বিধাতার উপর সম্পূর্ণ আস্থাবান। তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে পর পর ঘটনার এইরূপ অভিব্যক্তি হইতেছে। যাঁহার ভগবানের উপর বিশ্বাস আছে তিনিই সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারেন। যে দুর্ব্বল, অসহায় এবং রিক্তহস্ত, তাঁহাকে ভগবান্ রক্ষা করিবেন—এ ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল। দীনভাব ও বিনয়নম্রতাই সিদ্ধির আবাসস্থল। অহিংসার শক্তি অসীম ইহার প্রতিকূলে যত বড় শক্তিই থাকুক না কেন ইহা তাহার সমস্তকেই পরাজিত করিতে সমর্থ।

মহাত্মাজীর আমেদাবাদ বিদ্যাপীঠে ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যাকালে সান্ধ্য উপাসনার শেষে বিলাতী বর্জ্জন প্রসঙ্গে জনমণ্ডলী সকাশে পূর্ব্বোক্ত কথাই অভিব্যক্তি করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"বড়লাটের পত্রে ভগবানের হাত রহিয়াছে।—আমার অভিমত এই যে, লণ্ডনের দিকে কেহ যেন না তাকায়। মনে রাখিবেন আত্মশক্তিই আমাদের ভাগ্য নির্ণয় করিবে। লণ্ডনে যাইয়া যুক্তিতর্কে কিছুই হইবে না, সর্ব্বদা আত্মশক্তির উপর নির্ভর রাখিবেন; তাহাতে গভীর অন্ধকার ঘুচিয়া যাইবে। প্রকৃত পথে চলুন, কল্যাণ হইবে।

মহাত্মাজীর উপরিউক্ত বাক্যসমূহ হইতে বেশ বুঝা যায় তিনি বুদ্ধির আলোকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই সব কিছু বলেন ও করেন এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসে প্রদীপ্ত হইয়া তিনি জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অগ্রসর হন।

দুর্ব্বলতা—আত্ম-অবিশ্বাস যে আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে, আমরা যে নিজস্বতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেছি না এবং নির্ভরশীলতার অভাবেই যে আমরা অহরহঃ চিন্তাকে

উদ্বেজিত রহিয়াছি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই আমরা দুর্দ্দান্ত আসুর প্রকৃতির নিকট একান্ত অসমর্থ ক্লীব হইয়া পড়িয়াছি। মহাত্মাজীর উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিলে আমরা বহির্মুখিতার স্বর্ণ মৃগের লুব্ধ আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিয়া আত্মশক্তির আনুগত্য করিতে পারিব। মনে রাখিতে হইবে বহির্মুখিতায় রহিয়াছে মরণ ও আত্মশক্তিতে রহিয়াছে অমৃতজীবন।

মহাত্মাজীর ন্যায় কোন ব্যক্তিই গ্রেট ব্রিটেনের সহিত ভারতের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত এইরূপ গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য লইয়া বিলাত যাত্রা করেন নাই। তিনি কোনরূপ আশার আলোক দেখিতে না পাইলেও তাঁহার যাওয়া কর্ত্তব্য, ইহা মনে করিয়াই তিনি বাহির হইয়াছেন। তিনি বলিয়াও গিয়াছেন—তিনি পঙ্গু ভারতের এক পঙ্গু প্রতিনিধি! তবে যিনি অসহায়ের সহায় তিনিই তাঁহার সহায় হইবেন। বিশেষতঃ যাহাকে দেশের লোক পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করে—যাহার উপর তাহারা কর্ত্তব্যভার সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে একমাত্র প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতেছেন সেই কর্ত্তব্যের ভার তিনি তাঁহার স্কন্ধ হইতে নিক্ষেপ করিতে পারেন না। তাই তিনি নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যে আশায় বুক বাঁধিয়া অকূল সাগরে পাড়ি দিয়াছেন।

মহাত্মাজীর লণ্ডন বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্য যাত্রায় এ দেশ ও সে দেশে একটা আনন্দ-গুঞ্জন শুনা যাইতেছে। ভারতসরকার যে তাঁহার সহিত শেষ মুহূর্ত্তে আপোষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে সরকার ভালই করিয়াছেন। বিশেষতঃ সরকারের আপোষ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। কারণ কংগ্রেস যোগদান করে নাই বলিয়াই গত গোলটেবিল বৈঠক ফলদায়ক হয় নাই—ইহা সরকার বুঝিয়াছিলেন।

এক্ষণে মহাত্মাজী সমগ্র জাতির প্রতিনিধিরূপে যাইতেছেন, এ কথাটি বৃটিশ সরকারের এবং গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিদিগের স্মরণ রাখা উচিত। তিনি তথায় জাতির ন্যায্য দাবীর কথা জানাইতে যাইতেছেন। কেবল বৈঠক নহে, সমগ্র জাতির দরবারে সেই দাবী উত্থাপিত হইবে। এখন যদি বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ প্রতিনিধিরা ভারতের সেই দাবীর মর্য্যাদা রক্ষা করেন তবেই বৈঠক সফল হইবে এবং উভয় জাতির মধ্যে সম্মানজনক আপোষ সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হইবে। বৃটিশ রাজনীতিকগণের ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার সময় সমুপস্থিত। সেই পরীক্ষায় যদি তাঁহারা উত্তীর্ণ হন, তবেই তাঁহাদের দূরদর্শিতা ও রাজনীতিকতার সার্থকতা উপলব্ধি করিবার সুযোগ হইবে। নচেৎ যে অবস্থার উদ্ভব হইবে তাহা কল্পনা করিতেও আশঙ্কা হয়।

ভারতের ভাগ্য রচনার জন্য মহাত্মাজী বিলাতে যাইতেছেন। কিন্তু মহাতাত্মাজীর কথা ভারতবাসীদিগের ভাবিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে আত্মশক্তির সুপ্রতিষ্ঠার নামই নব্যভারতের অভ্যুদয়। মানুষ আপনার ভাগ্য আপনিই গড়িয়া তোলে, আবার মানব আপনার দুর্বুদ্ধিতেই আপনার ললাটে বজ্র হানিয়া থাকে।

কিন্তু সিদ্ধির মূলে রহিয়াছে সদিচ্ছা। যখনই এই সদিচ্ছার বীজ মানব সভ্যতার প্রতিষ্ঠাভূমিতে রোপিত হয় তখনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার এই সদিচ্ছার আচার্য্য হইতেছে ভারতবর্ষ। যে জ্ঞানে, যে ধ্যানে, যে কর্ম্মে ও যে ব্রতে মানবের অন্তরে সদিচ্ছার উদ্রেক হয়, তাহা ভারতেরই সিদ্ধিসম্পদ। সেই সদিচ্ছার মূর্ত্তি প্রতীক হইতেছেন মহাত্মাগান্ধী—তাই জগৎ

সভায় তাহার আহ্বান। সেই জন্যই তাঁহাকে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নানা ঘটনা সংস্থানের অভ্যন্তর দিয়া ভারতের বাহিরে যাইতে হইতেছে।

আজ মহাত্মাগান্ধী ব্যতীত যখন রাষ্ট্রসম্মেলন সার্থক হইতে চাহিতেছে না, তখন মনে হয়, এমন একদিন আসিবে যখন ভারতের মন্ত্র, ভারতের ধ্যান, ভারতের জ্ঞান, ভারতের বুদ্ধি এবং ভারতের প্রজ্ঞা জগতের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইবে।

ভারবর্ষ হইতে যদি জগৎ দীক্ষা গ্রহণ না করে তবে বিশ্বমানবের সম্মুখে যে সব উৎকট সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে তাহার সমাধান ত হইবেই না, বরং মানব সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে। এক্ষণে ভারতবাসীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য উদ্যোগী হইতে হইবে এবং তাহার জন্য মহাত্মাজীর আদর্শ ও আদেশ যথা সম্ভব গ্রহণ ও প্রতি পালন করিতে হইবে। এস্থলে মহাত্মাজীর সম্বন্ধে ইউনিটি পত্রিকার মিঃ হোম্‌স্ যাহা লিখিয়াছেন তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। তিনি তাহার পত্রিকার পরিশেষ অংশে বলিয়াছেন—"তিনি শুধু ভারতের নহেন, কিন্তু সমগ্র জগতের মহাত্মা। আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করি এবং তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপনে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিব। তিনি আজ যেমন ভারতের মুক্তিব্রতের সাধক। সেইরূপ বিশ্বজগতের অধ্যাত্ম শক্তির অভিভাবক স্বরূপ।"

ভারতবাসীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লাভের জন্যই যদি মহাত্মাজীর অভিযান হইত, তাহা হইলে তদভিযানে বিশ্বমানবের উৎফুল্ল হইবার কোন হেতুই রহিতনা। তাঁহার অভিযান পীড়িত বিশ্বমানবতার মুক্তি সাধনা। তাই তাঁহার অভিযানে বিশ্ববাসীর হিয়া আনন্দে উথলিয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে যাহারা অনুকরণ করিতে চাহেন তাঁহারা অধ্যাপক রাসেল্ স্মিথের—'Modern civilization is running towards a callapse'—এই কথা মনে কারিবেন। নব্য য়ুরোপ যে ঋণজর্জ্জর ও অভাবদুর্ভর জীবন যাপন করিয়া অন্তর্জলীর দিকে অগ্রসর হইতেছে তজ্জন্যই মহাত্মাজী স্বরাজকামী জাতিকে আত্মশক্তিপরায়ণ ও ঋতঋদ্ধ হইতে বলিয়াছেন। মহাত্মাজীর অভিযান জয়যুক্ত হউক—'শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ'।

দিগ্‌দর্শন

হিন্দুর কুৎসা

শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

কোন কোন ইংরাজ লেখক কয়েকদিনের জন্য ভারতের দু'চারটি নগরে ঘুরিয়া ইংরাজদের ক্লাবে ও হোটেলে ভারতবাসীর সম্বন্ধে গল্প শুনিয়া ভারত সম্বন্ধে প্রকাণ্ড অভিজ্ঞ হইয়া যান এবং ভারতবাসীর যথেষ্ট নিন্দা কুৎসা করিয়া গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। কেহ কোন ধর্ম্ম গ্রন্থের দু'চার পাত অনুবাদ পড়িয়া, কেহ বা অন্যের সমালোচনা পড়িয়া হিন্দুর ধর্ম্ম নিরেট পৌত্তলিকতা ও ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ ভূতের গল্প বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সেগুলির উপর বিলাতী সংবাদপত্র সমূহ আবার টীকা টিপ্পনি ঝাড়িতে থাকেন। হিন্দুর ধর্ম্ম ও আচার পদ্ধতির মর্ম্ম ও গুরুত্ব না বুঝিয়া, এমন কি বুঝিবার চেষ্টাও না করিয়া, ইংরাজ লেখকেরা ও সংবাদপত্রসমূহ কেন তাহার বিরুদ্ধে উৎকট সমালোচনা করেন, পূর্ব্বে এদেশের লোকেরা বুঝিতে পারিতেন না। অনেকে মনে করিতেন যে উঁহাদের উচ্চ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গবেষণার ও ভূয়োদর্শনের ফলে যাহা সত্য বলিয়া বুঝেন তাহাই তাহারা প্রকাশ করেন। তেমন মনে করিবার আরো কারণ এই যে ঐ সমস্ত লেখক ও সমালোচকেরা দেখাইয়া থাকেন যে তাঁহারা অতিশয় উদার, হিন্দুর পরম হিতৈষী, হিন্দুর সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্যই তাঁহাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা। তাঁহারা যে ভয়ঙ্কর ছদ্মবেশী স্বার্থপর—আমাদের প্রতি তাঁহাদের উদারতা ও হিতৈষণার উক্তিগুলি যে নিতান্ত ছলচাতুরী ক্রমে ভালরূপেই প্রকাশ পাইতেছে। মহামনা সারজন উড্রফ্ প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের অনেকেরই মুখোস খুলিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দুদেরে সর্ব্বপ্রকারে হেয় প্রতিপন্ন করিতে পারিলে এবং ইংরাজী রীতি নীতির দাসানুদাস্ করাইতে পারিলে তাহাদের উপর ব্রিটিশ আধিপত্য ষোলকলায় পূর্ণ হইবে, এবং তাহা চিরস্থায়ী করিয়া জগদ্বাসীর নিকট বাহবা লইবার পক্ষে নৈতিক যুক্তিও পাওয়া যাইবে,—ইহাই হিন্দুর বিরুদ্ধে ঐরূপ অযথা কুৎসা প্রচারের উদ্দেশ্য বলিযা এইক্ষণ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

লণ্ডনের "ল্যান্সেট" নামক চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক বিখ্যাত পত্রিকার ঐরূপ এক উৎকট সমালোচনার অকাট্য যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়াছেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত। তাঁহার সেই প্রবন্ধ "Infant mortality and Hindu Customs" বিগত ১৯শে, ২৩শে ও ২৪শে জুনের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এদেশের যাঁহারা পাশ্চাত্য লেখকদের ভেল্কীতে অস্থির হইয়া থাকেন, তাঁহাদের উচিত এই প্রবন্ধটি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়া দেখা। ল্যান্সেট পত্রিকা মিস মেও লিখিত হিন্দুর কুৎসাপূর্ণ "মাদার ইণ্ডিয়া" গ্রন্থের প্রশংসা ত খুবই করিয়াছেন, 'হিবার্ট জার্ণেলে" মিস্ ইলিনর রথবোন নাম্নী আর এক রমণী মিস্ মেওর ঘৃণিত পুস্তকের প্রশংসা কীর্ত্তন করত যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তদুপলক্ষেও হিন্দুর আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে আর এক পালা গাহিয়াছেন।

ডাক্তার নলিনীরঞ্জন প্রমাণ করিয়াছেন যে হিন্দুর অল্পায়ুত্ব বা তাহার শিশু মৃত্যুর আধিক্যের জন্য তাহার কোন সামাজিক প্রথা দায়ী নহে, বরং সামাজিক প্রথাই তাহাকে নানা

ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ১৯২৫ ইংরাজী সনে আমেরিকার মিসিসিপি নদীর জলস্রোত তীর অতিক্রম করত বহুগ্রাম প্লাবিত করিয়াছিল। তথাকার গবর্ণমেণ্ট ঐ অঞ্চলের অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য খাদ্যদ্রব্যাদি অসংখ্য ষ্টীমলঞ্চ, বোট প্রভৃতির দ্বারা সরবরাহ করিয়াও ক্ষান্ত ছিলেন না, শ্রেণীবদ্ধ এরোপ্লেন পাঠাইয়া তাহা হইতে লোকালয়ের উপর টিনভরা খাদ্যদ্রব্য ছড়াইবার ব্যবস্থা করেন, সেগুলি অভাবগ্রস্তদের হাতে পড়িবে না জলে ও জঙ্গলে পড়িবে সে হিসাব তাঁহারা করিয়াছিলেন না। তথাপি খাদ্যসারের অভাবে ঐ অঞ্চলের লোকদের মধ্যে পেল্লগ্রা নামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। একবার মাত্র জলপ্লাবনের ও তদানুসঙ্গিক সামান্য খাদ্যাভাবের ফলে ভারতের কুত্রাপি তেমন ভাবে লোকেব স্বাস্থ্যভঙ্গের কথা কেহ শুনিয়াছেন কি? যদি ঐরূপ অল্পাহারের দরুণ আমেরিকানদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, এবং স্বাস্থ্যনষ্টের জন্য সামাজিক প্রথাকেই দায়ী করিতে হয়, তবে আমেরিকার সমাজপ্রথা ভারতীয় সমাজপ্রথা অপেক্ষা বহুগুণ হীন বলিতে হইবে। তেমনই ইউরোপীয়ানদের স্বাস্থ্য। মহাযুদ্ধের অল্প কয়েক বৎসর আহার্য্য তালিকা একটু সংক্ষেপ করা হইয়াছিল বলিয়া ইউরোপীয়দের মজ্জা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, অনেকের যক্ষ্মারোগ দেখা দিয়াছে। অথচ ভারতবাসীরা জন্মাবধি দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবনজনিত অভাবের ভিতর দিয়াই চলিতেছে। নিরপেক্ষ লোকেরা এইজন্য ভারতবাসীর অভাবসহিষ্ণুতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারিবেন না।

যদি সামাজিক প্রথাই শিশুমৃত্যুর কারণ হয়, তবে জাপানে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা অতি কম, ইংলণ্ডে প্রতি হাজার প্রসূত শিশুর ৭০টি মারা পড়ে, সুতরাং ইংলণ্ডবাসীর উচিত অবিলম্বে জাপানিদের প্রথা অবলম্বন করা। ডাক্তার নলিনীরঞ্জন গত বৎসর মধ্যবিত্ত, অর্থাৎ যাঁহাদের বার্ষিক আয় গড়ে ২৫০০৲ এবং যাঁহারা দেশীয় প্রাচীন প্রথানুসারে প্রসবের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তেমন পরিবার সমূহের ৮০০ শত প্রসবের হিসাব লইয়া দেখিয়াছেন, মাত্র ২৩টি শিশু অর্থাৎ প্রতি হাজারে ২৭·৮৫ মারা পড়িয়াছে; আর ইংলণ্ডবাসীর আয় ভারতবাসীর ১৬ গুণ, অথচ সেখানে শিশু মৃত্যুর হার হাজারে ৭০· যদি সামাজিক প্রথাকেই শিশুমৃত্যুর জন্য দায়ী করিতে হয়, তবে হিন্দুর সমাজপ্রথা ইংলণ্ডের সমজেপ্রথা অপেক্ষা বহুগুণ শ্রেষ্ঠ।

মান্দ্রাজের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় তথাকার ৪টি নগরের ১,৮৩,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৭৩০০ প্রসব হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যাহাদের বার্ষিক আয় ২৫ টাকা ও তন্ন্যূন তাহাদের মধ্যে হাজারে ১২০টি, যাহাদের ২৫ হইতে ৫০৲ তাহাদের হাজারে ১০৫ এবং যাহাদের আয় পঞ্চাশের অধিক তাহাদের হাজারে ৮৪টি শিশু মারা পড়িয়াছে। ইহাতে স্পষ্টরূপেই বুঝা যায় যে অন্নাভাবই শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ।

যদি কুসংস্কারমূলক সামাজিক প্রথাই হিন্দুদের শিশুমৃত্যুর কারণ হইত, তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকপ্রাপ্তির ফলে যতই আমাদের প্রাচীন প্রথাসমূহ শিথিল হইতেছে ততই শিশু মৃত্যুর হার বাড়িতেছে কেন? পাশ্চাত্য ডাক্তারেরা আর একটা অপরাধ চাপাইয়া থাকেন এদেশের অশিক্ষিতা দাইদের উপর। যুক্তপ্রদেশের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় সহরের উপর যেখানে শিক্ষিতা ধাত্রীরা প্রসব করাইয়া থাকেন সেখানে হাজারে ২৪৪টি মারা পড়ে; আর পল্লী গ্রামে যেখানে অশিক্ষিতা দাইয়েরা প্রসব করায় সেখানে মারা পড়ে ১৫০টি অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক।

ভারতবর্ষে লোকের অকালমৃত্যুর বা শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ অর্থাভাব, তৎপর ম্যালেরিয়া। কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের রিপোর্টে দেখা যায় জন্মাবধি স্নায়ু ও মজ্জাগত দুর্ব্বলতা ও ফুস্‌ফুস্ সম্বন্ধীয় রোগেই শতকরা ৪৭টি মৃত্যু ঘটে। ইহার মূল কারণ সেই অর্থাভাব। অর্থাভাবে দরিদ্রলোকেরা অতি কদর্য্যভাবে সহরের সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস করে. তাহাতেই তাহারা নানা প্রকার ফুস্‌ফুসের রোগে আক্রান্ত হয়। এদেশের অত্যধিক শিশুমৃত্যুর কারণ যে দরিদ্রতা একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। তারপর আমাদের যেই সামাজিক প্রথাসমূহকে ইউরোপীয়েরা এত নিন্দা করেন তাহাই আমাদের জাতিকে এত দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যেও আশ্চর্য্যরূপে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের ন্যায় দুরবস্থাপন্ন হইলে পাশ্চাত্য জাতিরা কোন্ কালে ভূপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। আমাদের দেশে শিশুদের তেল মাখাইয়া কয়েক ঘণ্টা রৌদ্রে রাখার যে নিয়ম আছে তদ্বারা তাহাদের রক্ত সতেজ এবং দুর্ব্বল অস্থি সমূহ সবল হয়। পাশ্চাত্য মতের অনুমোদিত নহে বলিয়া এই প্রথা প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে; ইংরাজী শিক্ষিত অধিকাংশ লোকই ত তেলের পরিবর্ত্তে সাবান মাখিয়া থাকেন। এদেশের আর একটি প্রচলিত নিয়ম দুধ ভালরূপে আওটাইয়া খাওয়া। তাহাতে শিশুদের পক্কাশয়ের অসুখ খুব কম হয়। আমাদের পর্দ্দাপ্রথা ও বাল্যবিবাহ প্রথাকে ইউরোপীয় সমালোচকেরা কত নিন্দা করেন, কিন্তু উহাই অদ্যাবধি আমাদের দেশকে উৎকট ফেরঙ্গ ব্যাধি (উপদংশ) হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা করিয়াছে। কে বলে বাল্যবিবাহের ফলে সন্তান দুর্ব্বল হয়? বাল্যবিবাহজাত সন্তানেরাই এক সময়ে আমাদের জাতিকে শৌর্য্যবীর্য্যশালী করিতেন। পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশে যতদিন দুগ্ধ ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যাদিতে ভেজাল প্রবেশ করে নাই, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দুরন্ত রোগ প্রবেশ করে নাই, ততদিন এই পর্দ্দা ও বাল্যবিবাহ প্রসূত সুন্দর সুঠাম সন্তানদের দেখিয়া পাশ্চাত্যবাসীরা বিমোহিত হইত। ডাক্তার ম্যাক্‌কেরিসন বলিয়াছেন, পঞ্জাবের ও ভারতের পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর ও সুগঠিত! দেশের প্রথাই যদি মানুষকে কুৎসিৎ ও স্বল্পায়ু করে তবে ইহারা কিরূপে এত সুন্দর ও সুগঠিত হয় এপ্রশ্নের উত্তর কোন পাশ্চাত্য সমালোচক দিতে পারেন না।

প্রত্যহ স্নান, নিম প্রভৃতির ক্ষুদ্র শাখা দ্বারা দন্তধাবন, আহারের সময় হস্তপদাদি প্রক্ষালন, অন্তরে বাহিরে শুচি থাকিবার জন্য বিবিধ সদাচার পালন, বিশুদ্ধ আহার নির্ব্বাচন এবং রজস্বলা, গর্ভবস্থা ও বিরুদ্ধ তিথিযোগ বর্জ্জনপূর্ব্বক স্ত্রীসহবাসের নিয়মরক্ষা প্রভৃতি ঘোরতর দুরবস্থার ভিতরেও এজাতিকে রক্ষা করিতেছে, পাশ্চাত্য সংঘর্ষে আর্থিক দুরবস্থার চরমসীমায় পঁহুছিলেও তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদের বাল্যবিবাহ ও পর্দ্দাপ্রথার দোষপ্রদর্শন করিতে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা পঞ্চমুখ, খৃষ্টানদের ত সে সব বালাই নাই, কিন্তু কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের রিপোর্টে দেখা যায় যক্ষারোগের প্রকোপ তাহাদের মধ্যেই বেশী।

প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার

সন	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান
১৯২৬	২৫	৩৩	৩৭
১৯২৭	২৭	৩৬	৪৪

সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় "ল্যান্সেট' পত্রিকার যে সংখ্যায় ভারতবাসীর বিরুদ্ধে মিস্ মেওর কুৎসা কীর্ত্তন সমর্থন করা হইয়াছে সেই সংখ্যাতেই বার্লিনের সংবাদ দাতার পত্রে দেখা যায় তথায় যে পরিমাণ জীবিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই পরিমাণ ভ্রূণহত্যা হইয়াছে !! শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ভ্রূণহত্যাই নিয়ম! প্রথমতঃ তাহারা অতি জঘন্য গর্ভাবরোধক যন্ত্রাদি (contraceptives) দ্বারা গর্ভরোধের চেষ্টা করে, তৎস্বত্তেও যদি গর্ভ হয় তখন তাহা ঔষধাদি দ্বারা নষ্ট করা হয়। জীবিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় ভাগ্যবশতঃ। এই যাহাদের চরিত্র, যাহারা এমনই ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য, কামোন্মত্ততায় আত্মহারা যাহারা ভ্রূণহত্যা ও অবিবাহিতা কুমারীর সন্তানোৎপাদন সমর্থনে লজ্জাবোধ করে না, তাহারা আসে পূণ্যভূমি ভারতকে সভ্যতা শিক্ষা দিতে, মানবজীবনের পবিত্রতার মর্ম্ম বুঝাইতে ! ভগবন্! এমন সভ্যতার কবল হইতে আমাদেরে রক্ষা কর।

অবশেষে ডাক্তার নলিনীরঞ্জন পাশ্চাত্যজগতে সুবিখ্যাত সার জর্জ্জ বার্ডউডের ভারতবর্ষ, হিন্দুজাতি ও তাহার বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতি অগাধ ভক্তির কথা তুলিয়া আশা করিতেছেন আত্মম্ভরিতা, জাতীয় মোহান্ধতা ও ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব যাঁহার প্রজ্ঞাদৃষ্টি হরণ করে নাই, যাঁহার অন্তর সত্যচ্যুত হয় নাই, তিনি যে কোন দেশে যে কোন জাতিতে জন্মগ্রহণ করুন না কেন অবিনশ্বর পরমানন্দদায়ক সত্যপূর্ণ হিন্দু শাস্ত্রের নিকট মস্তক অবনত করিবেনই।

এ হেন অবস্থাতেও মিথ্যা রটনায় সিদ্ধহস্তা লজ্জাহীনা মিস্ মেও "মাদার ইণ্ডিয়া—২য় খণ্ড" বাহির করিয়াছে। সহবাস সম্মতির আইন প্রণয়নের সময় ব্রিটনের ভারতীয় মানসপুত্রেরা যে সমস্ত বিলাতী ঢেকুর উদ্গার করিয়াছে মিস্ মেও সেই সমস্তকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দু জাতির বাল্য-বিবাহের দোষ কীর্ত্তন করিয়াছে !

জীবন রস

ঋগ্বেদের ঋষিরা আকাশ, বাতাস, ঊষা, নক্ত, গো বনস্পতি—এ সমস্তের ভিতরেই একটা মধুধারা ক্ষরিয়া যাইতেছে দেখিয়াছিলেন। বিশ্বভুবনে ওতপ্রোত এই যে মাধ্বী-ধারা, এটা বোধ হয় চিরন্তন। যে কেহ সেই মাধ্বী ধারার সত্য পরিচয় পাইয়াছে, এবং তাঁর সাথে আপন কেন্দ্রের সজীব সংযোগ রাখিতে পারিয়াছে, সেই এই চিরন্তর প্রবাহ হইতে দূরে সরিয়া যায় নাই, তাকে রসসঞ্চারহীন মরুর মাঝে মরীচিকার পিছু পিছু ধাবমান হইতে হয় নাই। তার যাত্রার পথে তপ্ত শৈলস্তূপের ভিতরেও স্নিগ্ধ অনাবিল রসের ঝরণা ঝরিয়া গিয়াছে, দাবানলের জ্বালা-বেষ্টনীর মধ্যেও শান্তি-ঘেরা ও তৃপ্তিতে ভরা কোনও এক মন্দির-দুয়ার চির-অবারিত হইয়া রহিয়াছে। সে বিষের ভিতরেও অমৃতের সন্ধান পাইবে। এই যে বিশ্বে ওতপ্রোত মধু বা সোম বা রস-বস্তুটিকে চিনিবার ও পাইবার ফন্দি, সেইটাকেই ঋষিরা সাধন বলিয়া গিয়াছেন। শুধু সাধন বলি কেন, ইহাই জীবন। আমরা অমৃতের অন্বেষণ হইতে শেষকালে বিমুখ হইয়া যেটাকে জীবন বলিতেছি সেটা যে সত্যকার জীবন নয়। যেটা দুই চারি দিন পরে মৃত্যুর হাতে আমাদের সঁপিয়া দেয়, আমাদের সকলসত্তা মৃত্যুর মধ্যে নাকচ করিয়া দেয়, সে জীবন ত মরণেরই কিঙ্কর, আজ্ঞাবহ ক্রীতদাস! আমরা তাই যেন মরণের জন্যই দুই চারি দিন বাঁচিয়া

রহিতেছি! যে দুই চারি দিন বাঁচিয়া থাকি, সে দুই চারিদিনও যদি শেষের সেই দিনকে অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারিতাম, তার ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিতে না হইত, তবেও না হয় মনে করা চলিত যে, দু'দিনের জন্য হউক আর দশ দিনের জন্যই হউক, আমাদের ভাগ্যে সত্যাকার জীবন-মদিরার একটা আস্বাদ পাওয়া ঘটিয়াছে। তা হ'ক্‌ না সে আস্বাদ তপ্ত, হ'ক্‌ না সেটা উগ্র! কিন্তু কার্য্যতঃ দেখি, যে দু' দশ দিন আমরা বাঁচি সে দু' দশ দিন আমাদের রোগে, শোকে, ভয়ে, দুঃখে, দৈন্যে, অবসাদে সেই মরণের জন্যই পঁয়তারা ভাঁজিতে কাটিয়া যায়। অতএব যে চিরন্তর মাধ্বী ধারার সুসমাচার ঋগ্বেদের ঋষিরা আমাদের শুনাইতেছেন, সে ধারার মুখগুলি আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র কি যেন একটা পাষাণে চাপা রহিয়া গিয়াছে। সে পাষাণের চাপ সরাইয়া সেই স্রোতগুলিকে আমাদের ভিতরে ও বাহিরে বহতা করিয়া লওয়ার সে ফিকির, তা আমরা শিখি নাই। আমাদের এই সভ্যতা ও কাল্‌চার আমাদের সে ফিকির শিখাইতেছে ন। আমরা সত্যকার জীবন নিজেদের ভিতরে পোষণ করিতেছি না। মৃত্যুকেই পোষণ করিতেছি।

— শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়।

"যোগক্ষেম"

(ভারতের সাধনা—শ্রাবণ সংখ্যা ৫৮৫—৫৯০ পৃষ্ঠা)

উক্ত প্রবন্ধ এ তত্ত্ব জানবার বুঝবার সুযোগ দিয়াছে। সুতরাং উক্ত প্রবন্ধলেখক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

গীতার উক্তিটী এই :—"যারা অনন্য ও ধ্যানপরায়ণ হ'য়ে আমার উপাসনা করে সেই নিত্যযুক্ত পুরুষদের যোগক্ষেম আমি বহন করি।" অর্থাৎ পরমাত্মাই যাঁদের ধ্যান-জ্ঞান, তাঁরা পরমাত্মার বিশেষ অনুগ্রহভাজন হন। তাই তিনি স্বয়ং তাঁদের যোগক্ষেম বহন করেন। তা হ'লে ইহা বুঝা সহজ সাধ্য যে নিত্যযুক্তদেরও কিছু না কিছুর অভাব বা অপূর্ণতা থেকে যায়। আর সেই অভাব বা অপূর্ণতার জন্যে পরমাত্মারও নিশ্চিন্ত থাকবার যো নাই।

পরমাত্মা অসীম ও পূর্ণ। জীব সসীম ও অপূর্ণ। পূর্ণত্বের সহিত অবাধে সংযোগ থাকা সত্ত্বেও জীবের সসীমত্ব সহ অপূর্ণতা 'যোগক্ষেম' অর্জ্জনে অক্ষম। তাই পরমপুরুষকেই তা যোগান দিতে হয়। তা হ'লে এমন কোন অভাব বা অপূর্ণতা যা জীবের মোচন করা সাধ্যাতীত উহাই যোগক্ষেম।

সুন্দরবনের সমুদ্র সন্নিকটস্থ যে কোন ক্ষুদ্র নদীর গতি নিবিষ্ট চিত্তে অনুসরণ ক'রলে ইহা উপলব্ধি করা সহজসাধ্য যে (১) সেই ক্ষীণ নদী সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত থাকায় জোয়ার ভাঁটায় প্রভাবে উহা স্ফীত বা ক্ষীণ হয়; ও (২) উহা ভাঁটার প্রভাবে ক্ষীণতর হ'লেও জলধির সূক্ষ্মতম

প্রবাহ সেই নদীতে অবিরাম বহমান থাকে। নিত্যযুক্ত জীব সমুদ্র সন্নিকটস্থ ক্ষুদ্র নদী সদৃশ। তাই তাঁর চিন্তার বা ধারণার প্রবাহে জোয়ার-ভাটা খেলা অনিবার্য্য। তাঁর নিত্যযুক্ততা কিন্তু তাঁকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করায় যে তাঁর ধারণার ধারায় এক সূক্ষ্মতম প্রবাহ সতত বহমান থাকে। তিনি আরো মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেন যে সেই প্রবাহই তাঁকে সমাধিতে গতি করায়। এই প্রবাহই কালক্রমে নিত্যমুক্ত জীবের মোক্ষের বা নির্ব্বাণ লাভের কারণ হয়। সুতরাং পরমাত্মার সূক্ষ্মতম পূর্ণত্বের প্রবাহ (under current) যা নিত্যযুক্ত জীবে প্রবাহিত থাকে উহাই যোগক্ষেম। যিনি শান্তং শিবং সুন্দরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং যড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নং ও সচ্চিদানন্দময়ং তিনি যে হৃদয়ে প্রবাহাকারে বিরাজিত, বাহ্যিক সাজসজ্জায় বিভূষিত হ'য়ে বাসনা ও ভাবনার ঝুলি-গুলি তাঁকে সম্বল ক'রতে হয় না। যাঁরা অন্ততঃ কিছু কালের জন্যেও প্রকৃত নিত্যযুক্ত থাকতে সক্ষম হন, তাঁরা ভালই অবগত হন যে, যে জীব তাঁর চিন্তায় থাকেন—তা কিন্তু আপনার মা বা বাবা বা প্রাণসখা ভাবে তিনিও সেই নিত্যযুক্ত জীবের সকল অভাব নিঃসন্দেহ মোচন করেন। বাসনাযুক্ত হ'য়ে অথচ জাগতিক করণীয় কর্ম্ম বর্জ্জন করে নিত্যযুক্ততা হওয়া কিন্তু কিছুতেই সম্ভব নয়।

গীতায় যাবতীয় উক্তি সেকালের। সেকালের ভাব ও ভাষা একালে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। সেকালের লোক বা অভিধান একালে নাই। সুতরাং একালের লোক বা অভিধান সেকালের তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসুদেরকে প্রায়শঃ বিকৃত কর্ম্ম সাধায়। একালের জীব সাধারণতঃ অর্থকরী বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে বা নামকেনা ব্যবস্থার জন্য এক এক জন দুর্য্যোধন বা স্বার্থান্ধ ধৃতরাষ্ট্র। সেকালের তত্ত্ব অনুভূতি ক'রতে সাধ পোষণ ক'রলে জীবের নিতান্ত আবশ্যক "আমি তোমার শিশু" এই ধরণের নরম বুদ্ধি সম্পন্ন ছোট-খাট অর্জ্জুণ হওয়া। তবেই আত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ সেই আর্ত্ত জীবের সূক্ষ্মদেহ রথের চালক হ'য়ে সেই সেই তত্ত্ব অভিনব ভাবে নিঃসন্দেহ শিক্ষা প্রদান করেন। তা আবার অপার স্নেহ পরবশ হ'য়ে—যা একালের ভাষ্যে বা টিপ্পনীতে পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

বিরাট প্রকৃতিই বিরাট চিত্রগুপ্ত। এই চিত্রগুপ্তের বিধান জীবের যাবতীয় কর্ম্মাকর্ম্মের চিত্র ফটো নেগেটিভের মত গোপনে তুলে লওয়া ও সেই সেই চিত্রগুলির গ্রামফনের রেকর্ড হওয়া। বিরাট প্রকৃতির ধারণাগম্য মূর্ত্তি-শ্রীশ্রীকালী। এই মূর্ত্তি নর কর ও মুণ্ড মালা দ্বারা শোভিত। মস্তকের সহায়তায় হস্ত দ্বারা যে কোন কর্ম্ম সাধিত হয়। ক্ষুদ্র মূর্ত্তিতে জীবের কর্ম্মাকর্ম্ম অঙ্কন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই জন্য শ্রীশ্রীকালী মূর্ত্তিতে কেবল মাত্র নর কর ও মুণ্ড মালা রক্ষিত! কোনও কর্ম্মের দাগ ধুয়ে মুছে ফেলা বিরাটের বিধান নয়। সুতরাং সেকালের চিত্র সমূহ একালেও বিদ্যমান। সেকালের তত্ত্ব একালে জানবার বুঝবার আবশ্যক হ'লে নিতান্ত বিধেয়—'আমি-আমার' বুদ্ধিকে অন্ততঃ বার আনা মাত্রায় "আমি তোমারে" পরিণত করা। তবে দেহস্থিত সূক্ষ্ম দেহ সুগঠিত ও আত্মা বিকশিত হয়। তবেই দিব্য শ্রবণ ও দর্শণ উন্মেষিত হয়। তবেই সেকালের তত্ত্ব সমূহ একালে অনুভূত হয়। তবেই গীতা, চণ্ডী, ভাগবৎ ও উপনিষদ্ সুখপাঠ্য ও সুবোধ্য হয়। আর তা না ক'রে পুস্তক পাঠ বিদ্যা-বুদ্ধি কথার হাফ আখড়াই লড়াইয়ে পর্য্যবসিত হয়। ফলে 'আমি-আমার' বুদ্ধি 'আমি-তোমার' না হ'য়ে মহাপুরুষ হয়। সুতরাং মানব জন্মের অমূল্যত্ব 'আমি-তোমার' বুদ্ধি সম্পন্ন না হওয়াতে দেহান্তে সেই জীবকে সংশোধক বা নরক রাজ্যে যেতে হয়। —ওপারের কথার লেখক।

শিক্ষা-সমস্যায়

(ভারতীয় সাধনা-মূলক শিক্ষাপরিষদ্)

জাতীয় সাধনা মূলক শিক্ষা-পদ্ধতির একটী ক্রিয়াত্মক পরিকল্পনা বা স্কীম্ শিক্ষা পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। প্রায় পঁচিশ বৎসরেরর অভিজ্ঞতা নানা প্রকার অনুসন্ধান, মতসংগ্রহ ও পর্য্যালোচনার ফল বলিয়া ইহাকে ধরা যাইতে পারে। এদেশে জাতীয় শিক্ষার প্রচেষ্টা আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। দেশের জাতীয় সাধনা বা কালচারের ভিত্তি এ কালের প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও আরও যাইতেছে। দেশের অনেক মহাপুরুষই আবার তাহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি দেশীয় সাধনায় বিশ্বাসবান ব্যক্তিগণ এ যাবত স্থানে স্থানে জাতীয় সাধনা মূলক শিক্ষা স্থিরতর রাখিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, আশ্রম, গুলকুল ও বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি সংস্থাপিত করিয়াছেন। একালে ইহাদের কার্য্যপ্রণালী বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। এবং ব্যাপক ভাবেও এইরূপ শিক্ষাপদ্ধতির উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। ভারতীয় সাধনামূলক শিক্ষাপরিষদ্ ইহার যৎসামান্য সূচনা করিয়াছেন মাত্র।

উক্ত পরিষদের মৌলিক লক্ষ্যেই ভারতের সাধনা পত্রিকার প্রবর্ত্তন হয়। এবং আজ দুই বৎসর কাল এরূপ শিক্ষার বিষয়ে অনেক আলোচনা ও শিক্ষাপরিষদ সম্বন্ধীয় প্রায় সকল বিষয়ের বিবৃতি এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষা-সমস্যার গুরুত্ব, প্রচলিত শিক্ষার শোচনীয় ফল এবং তাহার প্রতিকারে কিরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক, ভারতীয় সাধনার প্রকৃতি কি এবং ঐ সাধনা ও শিক্ষার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ—বিশেষ করিয়া ভারতীয় সাধনার মূলে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা পদ্ধতিতেই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্যকরূপে সংসাধিত হইতে পার এবং ঐ সাধনাকে মূল করিয়া এদেশে এক্ষণে কিরূপ শিক্ষা প্রণালী, শিক্ষালয়ের গঠন-বিধি, পাঠ বিধি, শিক্ষণীয় বিষয় (অর্থকরী ও কার্য্যকরী ইত্যাদি সহ) কিরূপ হওয়া উচিত—এবং বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে যে বিভিন্ন জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহ সংগঠিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহাদের সকলকে লইয়া একটি শিক্ষ-সঙ্ঘ সংগঠন করিয়া, অথবা তাহাদিগের পরস্পর পরস্পরের সহযোগে ও সাহচর্য্যে দেশ মধ্যে একটি বৃহৎ জাতীয় শিক্ষায়তন কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্ন পরিষদ তুলিয়াছেন এবং তাহার অনেকের বিষয়ে পর্য্যাপ্ত আলোচনা ও সমাধান ভারতের সাধনাতে প্রকাশিত হইয়াছে। সে আলোচনার সাক্ষাৎ সমর্থন আমরা দেশবাসীগণ হইতে অনেক পাইয়াছি এরূপ বলিতে পারি না, তবে তাহার প্রতিবাদ বা বাধা মোটেই পাই নাই—শিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে দ্বিধা মত কাহারও নাই। তবে তাহাতে উৎসাহ ও উদ্যোগের অভাব খুবই আছে—ইহা জাতীয় শক্তির পরীক্ষা মাত্র!

শিক্ষা-সঙ্কট অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। প্রচলিত উচ্চ শিক্ষার প্রবর্ত্তন দ্বারা এ দেশীয় জাতীয় সাধনার মুণ্ডচ্ছেদ সংসাধিত হইয়াছে—প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জনও এই শিক্ষাগণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি নিম্ন বা প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি প্রচলিত হইতে যাইতেছে, তাহাতে জাতীয় সাধনামূলক সুশিক্ষার মূলোচ্ছেদনেরও ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। বিষয়টী আরও বিশদরূপে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়

যে এযাবৎ দেশের নিম্ন শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, কতক পরিমাণে ভারতীয় সাধনার অনুযায়ী ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। কারণ উহা দেশের বিদেশীয় রাষ্ট্রশক্তির স্বেচ্ছানুযায়ী নিয়মে হইতেছিল—বিশিষ্ট লোকদিগের লিখিত পুস্তকাদি পাঠের দ্বারা উহা পরিচালিত হইত—প্রাচীন ধারা ও সাধারণ রীতি উহাতে একেবারে প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। সম্প্রতি রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে যাইতেছে, তাহাতে দল বা সম্প্রদায় বিশেষের হাতে শিক্ষা প্রভৃতি জাতীয় গঠন মূলক বিষয় সমূহ আসিয়া পড়িয়াছে। বঙ্গদেশে বিশেষ করিয়া এই প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব ও বিরোধ অতিশয় প্রবল। যে প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এক সম্প্রদায়ের নির্দ্ধারিত ভাব ও নিয়ম দ্বারা অপর সম্প্রদায়ের সর্ব্বসাধারণ বালকবালিকার শিক্ষাকার্য্য পরিচালিত হইতে বাধ্য। দেখা যায় যে, বাঙ্গলার হিন্দু সমাজে একালে ভারতীয় সাধনার ভাব যেমন প্রবল এমন আর কোথাও নহে। আর সে শক্তিবলেই বাঙ্গলার হিন্দু সমাজে এযুগে অনেক মনস্বী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক শক্তি ভারতের অগ্রদূত ও চালকের কার্য্য করিয়াছে বলিয়া কথিত হয়। আজ বাঙ্গালী সকল দিকেই বিব্রত ও নিপীড়িত; তাহার উপরে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহার জাতীয় সাধনা শক্তি বিলুপ্ত হইলে বাঙ্গালী হিন্দুকে সম্পূর্ণ রূপেই শক্তিহীন অসার পদার্থে পরিণত হইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে যে বিরোধী দল বিজাতীয় ভাবে প্রভাবিত মাত্র হইয়া হিন্দুসাধনার বিরোধ করিতে যাইতেছেন তাহারও ইহাতে নিজেরা প্রকৃত কোনও লাভ করিয়া উঠিতে পারিবেন না। কারণ হিন্দু সাধনা ভারত বর্ষেরই সাধনা—ভারতের জল, বায়ু মৃত্তিকার সহিত তাহার অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ। ভারতবাসী মাত্রেই তাহার অধিকারী ও প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষে তাহার দ্বারা প্রভাবিত। ভারতের চিরাগত ভাবপরম্পরা কিম্বদন্তী আদি দ্বারা হিন্দু জনসাধারণের সহিত তাহারা সমভাবেই অনুপ্রাণিত —কোনও বিদেশীয় ভাব দ্বারা তাহারা সেরূপ হইতে পারে না। শিক্ষা কার্য্যে উহা ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাবের প্রবর্ত্তন করিতে গেলে মানব প্রকৃতির উপর ঘোর অত্যাচার করা হয়—প্রকৃত শিক্ষার ফলও তাহাতে বিপরীত ফলিবে।

সাধারণ ভাবে জাতীর সাধনামূলক শিক্ষার বিষয়ে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা দেশের বর্ত্তমান এই বিশেষ অবস্থার দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করিলে, সর্ব্বসাধারণ লোকের মধ্যই এই জাতীয় সাধনামূলক শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করার আবশ্যকতা আরও অধিক অনুভূত হইবে। কি ভাবে ও কোথায় এক্ষণে এই শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ করা যায়, সেই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। এজন্য পাঠকগণ ভারতের সাধনার বিশেষ বিশেষ নিবন্ধ সকল দেখিতে পারেন। (১)

বিশেষ কয়েকটী বিষয়ের পুনঃ উল্লেখ করিয়া আমরা এস্থলে দেশের ও বর্ত্তমান কালের অবস্থা এবং ভারতীয় সাধনার মৌলিক প্রকৃতির লক্ষ্যে শিক্ষার যে ক্রমনির্দ্দেশ ও পাঠবিধি পরিষদের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত করিলাম। আশা করি দেশের জনসাধারণ এতদ্প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহার অনুধাবনে রত হইবেন ও এইজন্য কোনও ক্রিয়াত্মক উপায় সত্বর অবলম্বন করিবেন।—

(১) শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় সাধনার সম্বন্ধ অতি সুস্পষ্ট। ভারতীয় সাধনার দুইটী মৌলিক নীতি তাহাতে সর্ব্বকালেই প্রযুজ্য—(১) ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন ও (২) গুরু সঙ্গে বাস <u>প্রাথমিক শিক্ষা</u>

---

(১) ভারতের সাধনা ১৩৩৬—৩৭ ও ১৩৩৭—৩৮।

সর্ব্বসাধারণ বালক বালিকাগণের জন্য সার্ব্বজনীন করিতে হইবে। অর্থকরী ও কার্য্যকরী শিক্ষার সবিশেষ প্রচলন করিতে হইবে—সমুদায় মধ্যমিক শিক্ষার কালটি (বর্ত্তমান মেট্রিকুলেশন ও ইন্টার-মিডিয়েটের তুল্য) প্রধানতঃ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য ও নানাবিধ হস্তকরী বা ট্যকনিক্যাল বিষয়ের শিক্ষায় নিয়োজিত থাকিবে। এবং অধিকাংশ লোকই যাহাতে এই শিক্ষা কালের অন্তে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে দক্ষতা ও আর্থিক সম্পদ্ লাভের বিশেষ যোগ্যতা লইয়া বাহির হইয়া সংসার ও সমাজের কাজে লাগিতে পারে তাহাই প্রধানতঃ দেখিতে হইবে।—উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিলেও অধিকারী অনধিকারী নির্ব্বিশেষে সকলের তাহাতে প্রবেশ করা উচিত নহে ; বিশেষ মেধাবী ছাত্রগণ যাহারা মৌলিক উচ্চ গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া সমাজের উন্নতি ও নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবন দ্বারা মানব জাতির উন্নতি করিতে পারিবেন তাহাদিগেরই এই ক্ষেত্রে যাওয়া কর্ত্তব্য ; অন্যথা সর্ব্বসাধারণের বর্ত্তমান বি-এ, এম-এ এর উচ্চতম পরীক্ষার জন্য শিক্ষামন্দিরে ভির বাড়াইয়া শক্তির অপচয় ও উপযুক্ত লোকের মর্য্যাদার হানি হইতেছে। উচ্চ শিক্ষা সম্পূর্ণ-রূপেই গবেষণা বা Researchর দ্বারা হওয়া কর্ত্তব্য। লোকশিক্ষক ও সমাজশিক্ষকগণ তাহাতে নিয়োজিত থাকিবেন।—জনশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। নিরক্ষর লোকের মধ্যেও যাহাতে দেশপরিচয়, কৃষি, অর্থনীতিও স্বাস্থ্যের জ্ঞান জগতের সাধরণ অবস্থা ও সাময়িক সমাচার ও লোকের কর্ম্মধারা, ব্যবহার শাস্ত্র বা আইনের মোটামোটি বিবরণ, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সাধারণ বিষয়-বোধ প্রচারিত হইতে পারে, কথকতা, বক্তৃতা, পটপ্রদর্শন, সরল সাহিত্যের প্রচলনাদি বিভিন্ন উপায় দ্বারা তাহা করিতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষার জন্য সমুচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষ বালিকা মাত্রেরই জন্য সার্ব্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। বালিকাদিগের সংস্কৃত কিছু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক—দেবনাগর অক্ষর পরিচয় প্রাথমিক অবস্থাতে হওয়া উচিত। স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থায় সর্ব্বোপরি ভারতীয় ধর্ম্ম সাধনায় বিশ্বাস, নারীত্বের মর্য্যাদাবোধ, আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ মাতার ধর্ম্ম বিশেষরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। বিবাহিতা দিগের জন্য অন্তঃপুরে উচ্চতর শিক্ষা ও অবিবাহিতা ও বিধবাদিগের জন্য আশ্রমশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রস্তাবিত সাধনামূলক আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতি পুরুষ দিগের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, অচিরে স্ত্রীদিগের এই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গ্রামে গ্রামে এই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রতি জেলাতে অন্ততঃ একটী আদর্শ আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারে। উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতি প্রদেশে একটী উচ্চ আদর্শ পুস্তকালয় বা অনুবেশনালয় (Research Institution সংস্থাপিত হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রথমতঃ বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রচলিত শিক্ষাসংস্থা (বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড ইত্যাদি) গুলির সহিত সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া এক্ষণে সহজে কোনও বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিতে পারে কি না এই সন্দেহে, যে স্থানে যেরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতে পারে, সেখানে সেইরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে; একশ্রেণীর বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতে পারে যেখানে প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড ইত্যাদির সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না। কোনও কোনও বিদ্যালয় মুখ্যতঃ ভারতীয় সাধনার ভাবে সংস্থাপিত হইবে কিন্তু ইহাদের ছাত্রগণ কোন বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা আশ্রমের মূল শিক্ষণীয় বিষয়ের অতিরিক্ত বিশ্ব-

বিষ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির জন্য বিশেষরূপে শিক্ষা লাভ করিয়া পরীক্ষাদি দিতে পারিবে। আর যে সকল বিষ্যালয় সম্পূর্ণরূপেই প্রচলিত নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে যদি, স্থানভেদে ও ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টাতে ভারতীয় সাধনার ভাব প্রবিষ্ট করান যায়, তবে তাহাও অবহেলা করা উচিত হইবে না। এবং যদি কোনও স্থানে ঐরূপ বিদ্যালয় নূতন সংস্থাপন করা অবশ্যক বোধ হয়, তবে তাহাও করিতে হইবে।

সর্ব্বোপরি জাতির প্রকৃত এই সংগঠনমূলক কার্য্য সফল করিয়া তুলিতে হইলে জাতীয় সাধনার ভাবে নূতন উদ্দীপনা আবশ্যক। এবং তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতিকে বিশেষভাবে সম্বদ্ধ হইয়া অর্থ ও সামর্থ্য সঞ্চয় করিতে হইবে। জাতির সে সঙ্কটকাল উপস্থিত তাহা উপলব্ধি করিলে ইহার আবশ্যকতা বিষয়ে আর সংশয় থাকিতে পারে না।

পাঠবিধি

প্রাথমিক শিক্ষা।

স্থান—পল্লী পাঠশালা বা বালক বালিকাগণের স্বগৃহ।

শিক্ষাকাল :—৪ বৎসর (৬।৭।৮—১০।১১।১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত)।

শিক্ষা-প্রণালী :—শিক্ষণীয় বিষয় অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে। বালক বালিকাগণের যাহার যেমন শক্তি সে অনুসারে বিষয় অনুযায়ী ছোট ছোট শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, যেন কাহারও শক্তির অতিরিক্ত কোনও বিষয় শিক্ষার বিষয়ে না আইসে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সকল বিষয়ই আমোদজনকভাবে, প্রীতিপ্রদ প্রতি-যোগিতার দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে।

বিষয়

প্রথম মান—প্রথম ছয় মাস।

অক্ষর পরিচয় ও লিখন (কেবল মাতৃভাষা) ; সরল শব্দবোধ ও শব্দ পাঠ (মুখে মুখে) ; ৫০ পর্য্যন্ত গণনা (কড়ি, শলা, কাঠী ইত্যাদির সাহায্যে) ; গল্প ও পৌরাণিকী কাহিনী (শুনান মাত্র) ; স্তোত্র পাঠ ও ভক্তি শিক্ষা (নমস্কার, প্রণতি ইত্যাদির ব্যবহার দ্বারা) ; গৃহবস্তু ও গৃহ-পশু ইত্যাদির নাম ও সাধারণ জ্ঞান ; নিজ বংশাবলীর পরিচয় ; প্রকৃত বিষয়ের অনুকরণে খেলা—ঘরকন্না শিক্ষা, নৌ-চালনা, গাড়ী চালনা, মটর চালনা ইত্যাদি (ক্রীড়াচ্ছলে) ; শরীর-পালন সম্বন্ধে কতকগুলি অতি প্রাথমিক ভাব দেওয়া (গল্প ও ছবি ইত্যাদির দ্বারা) ; দৌড়াদৌড়ি, খেলা ইত্যাদি।

প্রথম মান—পরবর্ত্তী ছয় মাস।

প্রথম পাঠ বর্ণ-পরিচয়—বর্ণ ও অক্ষর শিক্ষা ; লিখন ও পাঠ ; সরল শব্দবোধ ও শব্দ পাঠ, ১০০ পর্য্যন্ত গণনা ; সহজ কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি (বালপাঠ্য কোনও ছড়ার বহি বা সংগ্রহ

পুস্তক হইতে); গল্প ও কাহিনী (বলিয়া শুনান); স্তোত্র পাঠ, আবৃত্তি; ভজন প্রণামাদি শিক্ষা; বস্তুজ্ঞান—গৃহ-পশু ইত্যাদি সাধারণ বিষয়; শরীর পালন সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান; ব্যায়াম, ক্রীড়া, দৌড়াদৌড়ি; প্রকৃত বিষয়ানুক্রমে খেলা—বাজার করা. দোকান করা, পোষ্টাফিস্ রচনা ইত্যাদি।

মান—একবর্ষ কাল।

সংযুক্ত অক্ষর:—বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ বা তজ্জাতীয় কোনও পুস্তক; সুন্দর লিখন প্রণালী; গল্প ও পৌরাণিকী কাহিনী (বালক বালিকাদিগকে বলা ও তাহাদিগের নিকট হইতে শুনা); সুন্দর ও সরল কবিতা ও স্তোত্র আবৃত্তি (ধর্ম্মবিষয়ক, নৈতিক ও জাতীয়); চিত্রপুস্তক (সরল ও প্রাথমিক (ম্যাকমিলনের ড্রইংবুক জাতীয়); সহজ যোগ ও বিয়োগ ও নামতা—১০ ঘর পর্য্যন্ত; বস্তুজ্ঞান (১) গৃহে যে সকল বস্তু আছে তাহার পরিচয় ও ব্যবহার জ্ঞান এবং (২) গৃহপালিত পশু ও সচরাচর দৃষ্ট পক্ষীর নাম, বর্ণনাদি; শরীর পালন সম্বন্ধীয় সাধারণ নীতি ও ও কর্ত্তব্যতাবোধ; খেলারূপে—বস্তুনির্ম্মাণ, পরিমাপ ইত্যাদি; ব্যায়াম ও ক্রীড়া; নিয়ম—এক আধটী সময়ানুক্রমিক নিয়ম পালন—পাঠ আরম্ভের পূর্ব্বে স্তোত্র পাঠ, পাঠ অন্তে স্তোত্র পাঠ ইত্যাদি।

তৃতীয় মান—এক বর্ষকাল।

বাঙ্গলা ভাষা—একখানি গদ্য পুস্তক (শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ স্থানীয়); একখানি কবিতার বহি (পদ্যমালা বা অন্য ঐরূপ পুস্তক একখানি); হস্তাক্ষর; চিত্র অঙ্কন (ম্যাকমিলনের ড্রইংবুক II বা অন্য এরূপ কোনও); কাগজ কাটা, কাগজ মোড়ান, মাটী দ্বারা কোনও বস্তু নির্ম্মাণ ইত্যাদি; রামায়ণের সরল কথা; সহজ যোগ-বিয়োগ-গুণন-ভাগ চারি নিয়মের অঙ্ক, নামতা ২০ ঘর পর্য্যন্ত, ধারাপাত ও শুভঙ্করী; প্রাথমিক ভূ-পরিচয় (মৌখিক ও মানচিত্র দৃষ্টে মাত্র); নিজ গ্রামের বিবরণ, নিজ গ্রামে বা পল্লীতে যে যে বস্তু পাওয়া যায়, যে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, হাট বাজার দরদস্তুর, বিক্রী কিনির সহজ সহজ বিষয়; কতকগুলি স্বাভাবিক পদার্থ—(জড় জগতের ভূ-তত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্বের) বৃক্ষ, নদী, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদির সহজ ও আমোদজনক বিবরণ; শরীর পালন ও গৃহ ও বাড়ীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা; ব্যায়াম ও ক্রীড়া; কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পালন (বিদ্যালয়ে ও গৃহে)।

চতুর্থ মান—এক বর্ষকাল।

বাঙ্গলা ভাষা—এক বা দুইখানি গদ্য পুস্তক, কবিতা পুস্তক ও প্রাথমিক বাঙ্গলা ব্যাকরণ (মুখে মুখে); গণিত—মিশ্র চারি নিয়ম, লঘূকরণ শুভঙ্করী সমাপ্ত ও সরল পরিমিতি; শিশুপাঠ্য মহাভারত; ভারতবর্ষের সহজ ইতিহাস; সরল ভূগোল; নিজ জেলা ও নিজ প্রদেশের বিভিন্ন জেলার বিশেষ বিবরণ; হস্তাক্ষর ও চিত্র, কাগজ ও কাপড় দ্বারা বিবিধ বস্তুনির্ম্মাণ, পীচ-বোর্ড ও

ইষ্টক দ্বারা বস্ত্র নির্ম্মাণ ; নিজ জেলা ও দেশে প্রাপ্ত বস্তু বাজার ও ব্যবসা বাণিজ্যের সহজ সহজ বিষয় ; শরীর পালন, শরীরতত্ত্ব ও খাদ্য ; রোগ ও তাহার প্রতীকারকল্পে কতকগুলি সহজ সহজ নিয়ম ও মুষ্টিযোগ ; জড় জগত ও প্রাণী জগতের সাধারণ কথা ; ব্যায়াম ও ক্রীড়া ; কতকগুলি নিয়ম পালন (বিদ্যালয় ও গৃহে) ; সামাজিকতা ও নাগরিকতার সরল কথা ; গ্রাম্য পঞ্চায়ত।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত।

মাধ্যমিক শিক্ষা :—আশ্রম-শিক্ষা ও আশ্রম-জীবন।

শিক্ষাকাল :—বিদ্যালয় ৬ বৎসর (১০।১১।১২—১৬।১৭।১৮ পর্য্যন্ত। মহাবিদ্যালয় ২ বৎসর (১৬।১৭।১৮—১৮।১৯।২০ পর্য্যন্ত)।

(ক) আশ্রম জীবন :—আশ্রমের নিয়মানুসারে স্নান, ভোজন, ব্যায়াম, উপাসনা, যম, নিয়ম, আসনাদি ও নিদ্রা, উত্থান প্রভৃতি অবশ্য পালনীয় বিষয়।

(খ) আশ্রম শিক্ষা :—পাঠ, আবৃত্তি, বিতর্ক, সামাজিক সম্মিলন, উৎসবাদি, আলোচনা, প্রসঙ্গ, অভিনয়, স্তোত্র, সঙ্গীত ও কবিতা প্রভৃতির প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি।

(ক) আশ্রম জীবন

১২শ বর্ষের অনধিক বয়ঃক্রমের কুমারগণকে আশ্রমে গ্রহণ করা হইবে ; সাধারণতঃ গুরুকুল পল্লী পাঠশালা বা ভারতীয় সাধনামূলক শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বালকগণকেই আশ্রমে ভর্ত্তি করা হইবে ; বাহিরের বা অন্য কোনও বিদ্যালয়ের বালকদিগকে গ্রহণকালে, কতক সময় তাহাদিগকে আশ্রমে রাখিয়া পাঠক্রম ও চরিত্রের তত্ত্বাবধানান্তে আশ্রমে ভর্ত্তি করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার পর আশ্রমের কার্য্য-বর্ষ আরম্ভ হইবে।

অভিভাবকগণ কুমারগণকে আশ্রমে প্রেরণ করিবার সময় আশ্রমজীবনের উপযোগী কতিপয় নূতন দ্রব্য—যেমন একটী ঘটী, একটী বাটী, দুইখানি লালপেড়ে স্বদেশী ধুতি, ছোট বড় দুইটী জামা, গরম জামা একটী, একখানি মোটা চাদর, একখানি গরম গাত্রবস্ত্র বা র‍্যাপার, একখানি বড় গামছা, একখানি কম্বল ও একখানি শতরঞ্চি ও আবশ্যকীয় কতক পুস্তক, কাগজ, কলম, পেন্সিল আদি দিয়া পাঠাইবেন। তারপর আর কোনও দ্রব্য বা পুস্তকাদি অভিভাবকগণকে দিতে হইবে না।

অভিভাবকগণ আশ্রম খরচের নিমিত্ত প্রতি কুমারের প্রতি মাসিক অগ্রিম—বিদ্যালয়ের প্রথম তিন বর্ষের জন্য ১৫৲ ও দ্বিতীয় তিন বর্ষের জন্য ২০৲ ও মহাবিদ্যালয়ের জন্য ২৫৲ টাকা করিয়া পাঠাইবেন। ভর্ত্তি হইবার সময় প্রথম প্রবেশ শুল্করূপে ১৫৲ অতিরিক্ত দিতে হইবে। দেশবাসীর বদান্যতা ও উদ্যোগে শিক্ষা-পরিষদের হাতে উপযুক্তরূপ অর্থ সঞ্চয় হইলে ক্রমে এই খরচ কমাইয়া, যাহাতে আশ্রমশিক্ষা বিনাশুল্কে হইতে পারে, তাহাই লক্ষ্য থাকিবে।

প্রতিবর্ষে শারদীয়া দুর্গোৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া আশ্রমের শিক্ষা বিভাগ ১॥ মাসকাল বন্ধ থাকিবে। এই সময় অভিভাবকগণ ইচ্ছা করিলে বালকগণকে নিজ খরচে স্বগৃহে লইয়া যাইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত চৈত্র ও বৈশাখ মাসে আশ্রম শিক্ষা তিন সপ্তাহের নিমিত্ত বন্ধ থাকিবে, তখন আশ্রম কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতে বালকগণকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন শিক্ষা বা আচার্য্যগণের তত্ত্বাবধানে দর্শনোপযোগী বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হইবে। এই পর্য্যটন শিক্ষার অঙ্গীয় বলিয়া গণ্য করা হইবে।

প্রতি বৎসর শারদীয়া ৺পূজার পূর্ব্বে এক মাসকাল আশ্রমের বালকগণের পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের পাঠ ও ব্রতাদি নিয়মের পর্য্যালোচনা, পরীক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় উপযুক্তরূপে গৃহীত হইবে এবং বালকগণের পাঠ-মানে উন্নয়ন, পুরস্কার বিতরণাদি ও নিদর্শন পত্র দিয়া, আশ্রমবাসীগণ পূজার অবকাশ গ্রহণ করিবে।

একজন আচার্য্যের তত্ত্বাবধানে ও অধ্যক্ষতায় আশ্রমের যাবতীয় কার্য্য পরিচালিত হইবে। আচার্য্য অন্যান্য সকল উপাধ্যায় বা শিক্ষকগণকে লইয়া একটী আশ্রমসমিতি গঠন করিয়া, প্রধান পরিষদের সাধারণ নিয়মের অনুকূল আশ্রম নিয়মাদি প্রয়োগ করিয়া আশ্রমকার্য্য পরিচালন করিবেন।

সাধারণতঃ আশ্রমের দিনচর্য্যা এইরূপে চলিবে :—

১। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ পঞ্জিকায় লিখিত সূর্য্যোদয়ের দুই দণ্ডকাল পূর্ব্বে সকলে শয্যাত্যাগ করিবে। শয্যাত্যাগকালে শয্যাবস্ত্রাদি সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে রাখিতে আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট সুপ্রভাত মন্ত্র বা অন্য কোনও মন্ত্র স্মরণ বা পাঠ করিবে।

২। শয্যাত্যাগের পর মলমূত্র ত্যাগ, শৌচাদি ক্রিয়া, দন্তধাবন ও মুখপ্রক্ষালন করিবে। এবং স্নান কার্য্য সমাপন করিবে।

৩। তৎপর সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া অঙ্গচালনা করিবে।

৪। তৎপর সামান্য জলযোগ করিবে—আদা নুন ও ছোলা ও তৎসঙ্গে কিছু মিষ্টান্ন, লাড্ডু বা অন্য কিছু। অনুমান বেলা ৭টা সময়।

৫। তৎপর দুই ঘণ্টাকাল আচার্য্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ শিক্ষা করিবে (৭—৯টা)।

৬। তৎপর এক ঘণ্টাকাল কোনও শিল্প বা কৃষি (কার্য্যশালা ও বাগান বা মাঠে) শিক্ষা করিবে। (৯—১০টা)

৭। ১০—১০॥টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম (আর যাহারা পূর্ব্বে স্নান না করিয়া থাকে তাহাদিগের স্নান।)

৮। মধ্যাহ্নে ভোজন ; সকলে একত্র হইয়া উপবেশন ও আচার্য্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ইষ্টদেবতাকে নিবেদনপূর্ব্বক অন্ন গ্রহণ—সাদাভাত, ডাল, তরকারী, ঝোল, দই ও শর্কর। (১০॥—১১॥টা)

৯। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম।

১০। ১২টা হইতে ৪ পর্য্যন্ত পাঠ।

১১। ৪-১৫ মিনিটে বৈকালিক জলযোগ—মুড়ি, চিড়া ভাজা, নারিকেল, গুড়, আদি।

১২। ৪॥টা হইতে ৫॥টা ক্রীড়া ও ব্যায়াম ও ভ্রমণাদি ও কৃষিক্ষেত্রে মনোনিবেশ।

১৩। সূর্য্যাস্তকালে অঙ্গ ধৌতাদি ও তদন্তে

১৪। সান্ধ্য সম্মিলন—বিভিন্ন শ্রেণীর বালকগণ বিভিন্ন ভবনে আপন আপন অধ্যক্ষগণের তত্ত্বাবধানে বসিয়া স্তোত্র পাঠ ও সঙ্গীতাদি শিক্ষা (৮॥টা পর্য্যন্ত)।

১৫। ৮॥টা—৯টা রাত্রের আহার—রুটী বা খেচরান্ন, ভাজা, ডালনা, অম্বল, দুগ্ধ ও মিষ্টি।

১৬। ৯-১০টা পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর আলোচনা, বিতর্ক আদি—সম্মিলনী।

১৭। ১০টাতে শয়ন—ইষ্টদেব নাম গ্রহণপূর্ব্বক।

প্রতি সপ্তাহে একদিন অনধ্যায় থাকিবে এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দিন দুপ্রহরের পর অধিষ্ঠাতাগণ নিজ নিজ তত্ত্বাবধানাধীন বালকগণের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকদিনের পাঠ, হস্তকরী কার্য্য, শারীরিক উন্নতি ইত্যাদির পরীক্ষাপূর্ব্বক তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রক্ষা করিবেন। (প্রত্যেক বালকের সম্বন্ধে একটী করিয়া বিবরণ থাকিবে)। ঐ দিন পূর্ব্বাহ্নে বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বালকগণের ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতের বিতর্ক ও কথোপকথনের চর্চ্চা হইবে। সায়াহ্নে বালকগণ কার্য্যকরী শিক্ষায় মনোনিবেশ করিবেন। ছুটীর দিন বালকগণ স্বাধীনভাবে ভ্রমণ, ক্রীড়া ও অন্য কার্য্যাদি করিবে।

(খ) আশ্রমশিক্ষা।—পাঠবিধি।

প্রথম বর্ষ।

বাঙ্গলা: গদ্য-সংগ্রহ প্রথম পুস্তক, পদ্য-সংগ্রহ প্রথম পুস্তক, বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও রচনা

সংস্কৃত: সহজ সংস্কৃত শিক্ষা; উপক্রমণিকা ব্যাকরণ বা অন্য কোন পুস্তক।

অঙ্ক: গণিত ল, সা. গু; গ, সা, গু; ভগ্নাংশ সহজ চারি নিয়ম; পরিমিতি।

ইতিহাস: সরল বাঙ্গলার ইতিহাস।

ভূগোল: ভূগোল পরিচয়, বঙ্গদেশ।

চিত্র: কোনও পুস্তক।

বস্তুজ্ঞান: বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ পদার্থের বর্ণনা (নূতন পুস্তক করিতে হইবে)।

বাগান রচনা (হস্তকরী শিক্ষার) বিবিধ ফুল, ফল ইত্যাদি। চরকা, সূতা।

শরীর পালন—একখানি পুস্তক।

ব্যায়াম ও ক্রীড়া।

দ্বিতীয় বর্ষ।

বাঙ্গলা: সাহিত্য সংগ্রহ—গদ্য ২য় পুস্তক, পদ্য ২য় পুস্তক।

জীবন-চরিত—১ খানি।

ব্যাকরণ ও রচনা।

সংস্কৃত : সহজ সংস্কৃত শিক্ষা (পুস্তক করিতে হইবে)। সংস্কৃত পাঠ—প্রথম ভাগ (সংগ্রহ) সংস্কৃত ব্যাকরণ ১ খানা (ভাল করিয়া আংশিক)।

ইতিহাস : ভারতবর্ষের ইতিহাস।

ভূগোল : ভারতবর্ষ।

গণিত : পাটিগণিত—ঐকিক নিয়ম ; ত্রৈরাশিক। বীজগণিত (প্রাথমিক) ; রৈখিক জ্যামিতি ও পরিমিতি—সার্ভেয়িং।

চিত্রকলা : ড্রইংবুক ৫ম মান।

ইংরেজী : Writing Copy Book. Spelling Book. সহজ ইংরেজী শিক্ষা (নূতন পুস্তক প্রস্তুত করিতে হইবে)।

শরীর পালন ও শরীর জ্ঞান : সহজ অঙ্গবিদ্যা (anatomy)।

বস্তুজ্ঞান—বিজ্ঞান পাঠ (নূতন পুস্তক)।

বাগান রচনা—নানা প্রকার ফুল, ফল, শস্যাদি।

ব্যবহারিক ও বাণিজ্যক জ্ঞান।

তৃতীয় বর্ষ।

বাঙ্গলা সাহিত্য : গদ্য সংগ্রহ—তৃতীয় পুস্তক ; পদ্য-সংগ্রহ—তৃতীয় পুস্তক ; জীবনচরিত ১ খানা ; ব্যাকরণ ও রচনা।

সংস্কৃত : সংস্কৃত পাঠ, ২য় ভাগ ; সহজ সংস্কৃত শিক্ষা ; ব্যাকরণ।

গণিত : পাটীগণিত দশমিক ; বর্গমূল ; বীজগণিত ; জ্যামিতি, পরিমিতি ও সার্ভেয়িং।

ইতিহাস : হিন্দু সময়ে ভারতের ইতিহাস (বিস্তৃত)।

ভূগোল : এশিয়া ও ইউরোপ ; ভারত মহাসাগর বাণিজ্যের বিবরণসহ। স্থানীয় জলবায়ু, রাজনৈতিক অবস্থা, স্থানীয় অবস্থা অক্ষরেখাদির বিবরণ।

ইংরেজী : সহজ ইংরেজী শিক্ষা ; Reader No. II. Translation ও Word Book.

বিজ্ঞান প্রবেশ : একখানি ভাল বহি বা সংগ্রহ।

কার্য্য শিক্ষা : দর্জ্জির কাজ, বেতের কাজ, সূত্রধরের কাজ, মাটির বাসন ইত্যাদির মধ্যে একটী বা দুইটী।

চিকিৎসা বিষয়ক : প্রাথমিক পুস্তক, আকস্মিক ব্যাপারে প্রাথমিক সাহায্যকরণ, পরিচর্য্যা ; শরীর পালন ও শরীর বিজ্ঞান।

চতুর্থ বর্ষ।

বাঙ্গলা সাহিত্য : গদ্য সংগ্রহ ৪র্থ পুস্তক, পদ্য সংগ্রহ ৪র্থ পুস্তক ; প্রবন্ধমালা (সামাজিক, পারিবারিক—সংগ্রহ করিতে হইবে) ; জীবনচরিত ; ব্যাকরণ ও রচনা।

সংস্কৃত : সংস্কৃত পাঠ, তৃতীয় ভাগ ; ব্যাকরণ. রচনা, অনুবাদ ইত্যাদি ; সহজ সংস্কৃত শিক্ষা।

গণিত : পাটীগণিত উন্নত ও শেষ অংশ ; বীজগণিত ; জ্যামিতি পরিমিতি ও সার্ভেয়িং।

ইতিহাস : মুসলমান ও ইংরেজ শাসনকালের ভারত ইতিহাস। ইংলণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। শাসনতন্ত্র ও নাগরিক বিদ্যা (সরল ও সংক্ষিপ্ত)।

ভূগোল : আমেরিকা ও আফ্রিকা—আটলান্টিক, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ (বিশেষ বিবরণ) বাণিজ্যক, প্রাকৃতিক, বায়বীয় ও সাধারণ বিবরণ সহ।

সমাজ ও রাষ্ট্রতত্ত্ব—নাগরিক বিদ্যা (Civics, Law মৌলিক)।

ইংরেজী : Reader III. Grammar, Translation, Composition. বিশুদ্ধ ইংরেজী শিক্ষা (Idiom ও অন্যান্য ইংরেজী ভাষার বিশেষত্ব সহ সহজে ও শীঘ্র ইংরেজী শিক্ষার উপায়)।

বিজ্ঞান : বিজ্ঞান-প্রবেশ ; কৃষিতত্ত্ব।

হস্তকরী বিদ্যা ও কার্য্যকরী শিক্ষা : দর্জ্জির, বেতের, সূতা বয়ন, মাটী কাম—বিশেষ কোনও একটী।

চিকিৎসা বিষয়ক প্রাথমিক পুস্তক : দ্রব্যগুণ ঔষধ প্রয়োগ, পরিচর্য্যা।

পরীক্ষা বর্ষ।—৯ম ও ১০ম শ্রেণী। দুই বৎসরকাল।

বিষয়

I. সনাতন গুরুকুল পরীক্ষা।—

অনিবার্য্য বিষয়।—(ক) সংস্কৃত : ১ম পত্র—সাহিত্য ও ব্যাকরণ—হিতোপদেশ, নীতিশতক, গীতা-সংগ্রহ, রামায়ণ ও মহাভারত হইতে সংগৃহীত অংশ, ব্যাকরণ কৌমুদী, লঘু কৌমুদী হইতে স্থানে স্থানে সহায়তা।

২য় পত্র—রচনা ও অনুবাদ : আপ্তে কৃত ও অন্য রচনা গ্রন্থ।

(খ) বাঙ্গলা—১ম পত্র : গদ্য সাহিত্য ও ব্যাকরণ : কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ বা তজ্জাতীয়।

২য় পত্র : পদ্য সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র—মেঘনাদ বধ, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি হইতে।

৩য় পত্র : রচনা ও অনুবাদ : বাঙ্গলা সাহিত্যের উপর সমালোচনা ; সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ইত্যাদি।

(গ) ইংরেজী—Calcutta University Course : ১ম পত্র—Prose Course & Grammar. ২য় পত্র—Poetry & Composition. ৩য় পত্র—Essays & Unseen passges.

(ঘ) বিজ্ঞান—১ম পত্র : বিজ্ঞানের ভূমিকা : বিজ্ঞান পরিভাষা—প্রকৃতি ও বস্তু ; বিজ্ঞান ও দর্শন এবং অন্যান্য শাস্ত্র—বিভিন্ন বিজ্ঞান-বিভাগ বা শ্রেণী—বিভিন্ন বিজ্ঞানের অন্তর্গত

সাধারণ বিষয় সমূহের পরিভাষা ও সাধারণ সংক্ষিপ্ত সরল বিবরণ (ভৌতিক, রাসায়নিক, শারীর-বিজ্ঞান, মানব বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান, বনস্পতি বিজ্ঞান ইত্যাদি।)

২য় পত্র : ভৌতিক বিজ্ঞান—সাধারণ জ্ঞান।

৩য় পত্র : রসায়ন বিজ্ঞান—সাধারণ জ্ঞান।

(ঙ) হস্তকরী বিদ্যা—কৃষি, বয়ন, সূত্রধরের কার্য্য ও মুদ্রণযন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে একটী।

বৈকল্পিক বিষয়।—(যে কোনও দুইটী)।—(ক) ১ম পত্র : বীজগণিত ও অঙ্ক গণিত (Matric Course পর্য্যন্ত)। ২য় পত্র : রেখা গণিত ও পরিমিতি।

(খ) ইতিহাস ও নাগরিক শাস্ত্র—১ম পত্র : ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ইতিহাস। ২য় পত্র : ইংলণ্ডের সাধারণ সরল বিবরণ, ব্রিটিশ শাসননীতি, নাগরিক শাস্ত্র, বর্ত্তমান রাজনীতি।

(গ) ভূগোল—১ম পত্র : সমগ্র পৃথিবীর ভূগোল তত্ত্ব। ২য় পত্র : প্রাকৃতিক বাণিজ্যক, গণিত ও জ্যোতিষ সম্পর্কীয় ভূগোলের বিশেষ জ্ঞান।

(ঘ) হিন্দী ও পালিভাষা : ১ম পত্র—ঐ ভাষা শিক্ষার পাঠ্য পুস্তক : সহজ হিন্দী শিক্ষা : সহজ পালিভাষা।

(চ) চিকিৎসা শাস্ত্র : ১ম পত্র— আয়ুর্ব্বেদের কতিপয় বিষয়। ২য় পত্র—পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের কতিপয় বিষয়।

(ছ) পৌরহিত্য ও যাজনিকতা : ১ম পত্র— কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধীয় সংহিতা গ্রন্থ। ২য় পত্র—পুরোহিত তন্ত্র।

II. বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার সাধারণ পাঠ্য

অতিরিক্ত—সংস্কৃত, বিজ্ঞান ও একটী হস্তকরী বিষয়।

মহাবিদ্যালয়—পরীক্ষা বর্ষ।

১১ শ ও ১২ শ বর্ষ—শিক্ষাকাল দুই বৎসর।

অনিবার্য্য :—(১) সংস্কৃত বা বাঙ্গলা সাহিত্য ; (২) ইংরাজী সাহিত্য (Intermediate course) ; (৩) তর্ক শাস্ত্র বা ন্যায় শাস্ত্র (বিজ্ঞানের মূল নীতি সহ ; হস্তকরী বিদ্যা ১টী ;

বৈকল্পিক :—(১) অঙ্ক শাস্ত্র ; (২) ভৌতিক বিজ্ঞান ; (৩) রসায়ন বিজ্ঞান ; (৪) বনস্পতি শাস্ত্র ; (৫) শরীর বিজ্ঞান ; আয়ুর্ব্বেদ ও বর্ত্তমান চিকিৎসা শাস্ত্র ; (৬) মনোবিজ্ঞান ; (৭) সমাজ বিজ্ঞান ; (৮) বাণিজ্য তন্ত্র , (৯) অর্থশাস্ত্র ; (১০) ব্যবহারিক শাস্ত্র (Law) ও নাগরিক শাস্ত্র ; (civics) (১১) একটী বৈদিশিক ভাষা—German বা French.

ইহাদের মধ্যে যে কোন ২টী। (বিশেষ বিবরণ পরে নির্দ্ধারিত হইবে)।

II. বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয়ের Intermediate পরীক্ষা। ও তৎসহ এদতিরিক্ত একটী অনিবার্য্য বিষয় ও একটী বৈকল্পিক বিষয়।

উচ্চশিক্ষা।

গবেষণা মন্দির— অন্তিম উপাধি ও কৃতিত্ব লাভ।

নিম্নলিখিত বিষয়ের যে কোনও একটীর চূড়ান্ত পর্য্যালোচনা।

১। সংস্কৃত বাঙ্গালা বা ইংরেজী সাহিত্য এবং তৎসহ আর একটী বৈদেশিক বা ভারতীয় ভাষা—তুলনাত্মক ভাষাতত্ব ইত্যাদি।

২। দর্শন শাস্ত্র—ভারতীয় ও পাশ্চাত্য।

৩। ইতিহাস অর্থশাস্ত্র ও রাজনীতি।

৪। স্বাধীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত এবং তৎসহ প্রাচীন জগতের সাধারণ বিবরণ।

৫। বর্ত্তমান জগৎ—সাহিত্যক ও বৈজ্ঞানিক দিগ্‌দর্শন : সাংবাদিক তত্ব।

৬। ধর্ম্মতত্ব—জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনাত্মক পর্য্যালোচনা সহ।

৭। আয়ুর্ব্বেদ ও চিকিৎসা শাস্ত্র।

৮। জড়-বিজ্ঞান ও যন্ত্র-বিজ্ঞান, কলা ইত্যাদি।

৯। গণিত শাস্ত্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা।

১০। শাস্ত্রালোচনা—পৌরোহিত্য বা যাজনিকতা : বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, হিন্দুধর্ম্মের সাধনতত্ত ; যোগ, উপাসনা ইত্যাদি।

বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক দেশীয় ও বিদেশীয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষায়তনের সর্ব্বোচ্চ বিভাগের পাঠ্য পুস্তকাদির বিশেষ পরীক্ষণ দ্বারা নির্ব্বাচন করিতে হইবে। বিদ্যার্থীগণ বিভিন্ন স্থানের শিক্ষায়তান ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ও আচার্য্যগণের নিকট হইতে যাহাতে সাহায্য পাইতে পারেন, পরিষদ্ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ও যথাসম্ভব আপন গবেষণা মন্দিরে পুস্তক ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিতে যত্নশীল থাকিবেন। একদিনে এই সকল কার্য্য না হইয়া উঠিলেও, কালে হইবে, এ আশা করা যায়।

শিক্ষার্থীগণের দক্ষতা মৌলিক গবেষণামূলক কার্য্য (পুস্তক বা নিবন্ধ আকারে) দ্বারা নির্ণিত হইবে।

যাহাতে যাবতীয় গবেষণাব কার্য্য ভারতীয় সাধনা-মূলক কার্য্য ও আদর্শের লক্ষ্যে হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

মন্তব্য।—সম্যক্ আলোচনা ও অভিজ্ঞতার ফলে আবশ্যক পরিবর্ত্তন সম্ভবপর।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ ও আলোচনা সাপেক্ষ—'ভারতের সাধনা'র ইহা এক বিশেষ লক্ষ্য। আলোচনা-কারীগণ যথাসম্ভব অবান্তর কথা পরিত্যাগ করিবেন, এই অনুরোধ—ভাঃ সঃ]

প্রতিবাদে সমর্থন।—বাস্তব, দেশাচার ও শাস্ত্রের অনুশাসন ঃ—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাজকুমারীগণের স্বয়ম্বরপ্রথা বালিকা বিবাহের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী সুভদ্রা বা দ্রৌপদী প্রভৃতি কাহারও অল্প বয়সে বিবাহ হয় নাই, ইঁহারা বিবাহের পূর্ব্বে সকলেই যে রীতিমত সুশিক্ষিতা ও ব্যবহার শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তরাও বিবাহের সময় খুব অল্পবয়স্কা ছিলেন না কেননা বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার সন্তান সম্ভাবনা হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত আছে। মহাভারতের সময়ে সম্ভ্রান্ত বংশেও ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের নিয়ম ছিল, এখন সে সমস্ত নিয়মের কথা আমরা ভাবিতেই পারি না। "গৌরীদান" যাহার নাম লইয়া হইয়াছে সেই হিমালয় দুহিতা গৌরী বহু তপস্যার পর মহাদেবকে স্বামীরূপে পাইয়াছিলেন, সুতরাং বিবাহের সময় তিনি নিশ্চয়ই অষ্টম বা নবম বর্ষীয়া ছিলেন না। রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষীগণও কেহই বালিকা বয়সে বিবাহিতা হন নাই। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে মৃচ্ছকটিক অভিজ্ঞান শকুন্তল প্রভৃতিতে সমাজের যে সমস্ত চিত্র আছে তাহাতেও অষ্টম বা নবম বর্ষীয়া কন্যার বিবাহের উল্লেখ কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের বাংলা দেশেই এক সময়ে কৌলিন্য প্রথার জন্য অনেক কুলীন কুমারী আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়াছেন, কাহারও বা বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ হইয়াছে, ইহাতে শাস্ত্র লঙ্ঘন হইতেছে বলিয়া কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

কোন্ সময় হইতে এবং কোন্ প্রয়োজনে অল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহ সামাজিক নীতি বলিয়া দৃঢ় রূপে গ্রহণ করা হইল তাহা বলা সুকঠিন। সম্ভবতঃ বাংলা দেশে মুসলমান অধিকারের সময়েই এই প্রথা ও অবরোধ প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। রাজ জাতির অনুকরণ হিসাবে অবরোধ প্রথার প্রচলন হইয়াছিল অথবা কন্যাকে বিজেতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিজিত জাতির মধ্যে শিশুবিবাহ ও অবরোধ এবং অবগুণ্ঠনের প্রচলন হইয়াছিল কেহ কেহ এইরূপও অনুমান করেন। আমরা দেখিতে পাই শিশুবিবাহ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেই খুব বেশী প্রচলিত। উচ্চবর্ণের মধ্যে আগে যাহা ছিল এখন তাহা হইতে অনেক কমিয়া আসিতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষত্রিয় পরিবারের ও রাজবংশে শিশুবিবাহ প্রায়ই দেখা যায় না, বরং জন্মপত্রিকা মিলাইবার জন্য কন্যা কোন কোন সময় বর অপেক্ষা কিছু বেশী বয়সেরও হইয়া যায়।

শিশু-বিবাহ যখন প্রচলিত হইয়াছিল তখন সমাজের কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেই ইহা নিশ্চয় প্রচলিত হইয়াছিল। যখন জর হয় তখন রোগীকে ঔষধ সেবন করিতে হয়, কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন এখনও আর ঔষধ সেবন করা প্রয়োজন কিনা তাহা বিচার করার দরকার হয়। "শিশুবিবাহই পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণের একমাত্র শুদ্ধ বীজ" আলোচনা-লেখকের ইহাই অভিমত। এটি একটি সিদ্ধান্ত, কিন্তু প্রত্যেক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেই দুই-দিক বিচার করিবার আছে, একটি সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে ও আর একটি বিপক্ষে।

ইহার পক্ষের যুক্তিগুলি সম্ভবতঃ এইরূপ ;—এক পরিবারের কন্যাকে অন্য পরিবারভুক্তা করিয়া লইতে হইলে অল্পবয়সে তাহাকে মাতৃঅঙ্কচ্যুতা করিয়া লইয়া যাওয়াই ভাল, তাহা হইলে সে অন্যপরিবারের সহিত ঠিক ঠিক মিশ খাইয়া যাইবে। অল্পবয়সে বিবাহ দিলে তাহার আর কুপথে যাইবার ভয় থাকে না। অধিক বয়স্কা কন্যার স্বয়ং পতি মনোনয়ন অপেক্ষা শিশুবয়সে পিতা মাতার নির্ব্বাচিত স্বামীর হস্তে অর্পিত হওয়াই তাহার পক্ষে ভাল। ইত্যাদি—

অপর পক্ষ বলিতে পারেন, শিশু বয়সে বিবাহ দিলেই যে সে অন্য পরিবারের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র প্রমাণিত হয় না। শিশুকাল জীবনের একটি সুখময় কাল। শিশুদের শৈশব ক্রীড়ার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের মধ্য দিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবন সতেজভাবে গঠিত হয়। যে চঞ্চলা বালিকা মায়ের ভালবাসায় পিতার আদরে ভাইবোনগণের স্নেহময় সাহচর্য্যে খেলাধুলার মধ্য দিয়াই সহজ ভাবে পারিবারিক জীবনে আত্মত্যাগের শিক্ষা-লাভ করিত, মায়ের কাছে যাহার ক্ষণে ক্ষণে শত আবদার শত অভিমান, তাহাকে যদি মায়ের কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূরূপে অন্য পরিবারের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বধূজীবন তাহার পক্ষে এক বিষম শাস্তিস্বরূপ হয়। অত্যন্ত স্নেহময়ী শাশুড়ী ভিন্ন অন্য শাশুড়ী বধূর শিশুসুলভ চপলতা সর্ব্বদা মার্জ্জনা করিতে পারেন না। সে যে বধূ এইটিই তিনি বেশী করিয়া মনে করেন, বধূ হইলেও সে যে বালিকা মাত্রই একথা তাঁহার সব সময় স্মরণ থাকে না এবং থাকিতেও পারে না। তাহার ফলে একের পক্ষে যে গুলি শিক্ষাদান অপরের নিকট তাহাই নির্য্যাতন স্বরূপ হয়। সে কালের বধূনির্য্যাতনের কাহিনী অনেক শুনিতে পাওয়া যায়, এখনও যে সে নির্য্যাতন একেবারেই নাই তাহা নয়। অবশ্য অনেক উদারহৃদয়া শাশুড়ী বধূকে মেয়ের মত ভালবাসিতেন, কিন্তু সে ভালবাসা বা না বাসা বধূর ভাগ্য ও শাশুড়ীর মেজাজের উপর নির্ভর করে, বিবাহ প্রথার উপর নির্ভর করে না। ইহাতে বালিকা বধূরা—শিশুসুলভ সহজ ভাব ভুলিয়া গিয়া পরাধীনের যাহা ধর্ম্ম—মিথ্যাচার, বঞ্চনা, তোষামদ,—শাশুড়ীর মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহার নিকট অন্যের নামে নিন্দা—এই সকল শিক্ষা করে। যায়ে যায়ে ও ননদে ও ভ্রাতৃবধূতে হিংসার ভাব যে না হয় তাহা নয়। মোটের উপর অল্পবয়সে বিবাহের জন্য শ্বশুর বাড়ীর উপর যে আত্মীয়তাবোধ বধূর খুবই বেশী হয়—তাহা নহে। তবে আগে অন্নবস্ত্রের কষ্ট বেশী ছিল না এজন্য অকাল মৃত্যু কম ছিল, সুতরাং বালিকা কালে বিবাহ হইলেও বালবৈধব্য এত বেশী ছিল না। আর একান্নবর্ত্তী পরিবারে কেহ ভাল কেহ মন্দ এইরূপ মিলিয়া মিশিয়া একরূপ চলিয়া যাইত। কিন্তু বধূরা বধূজীবন হইতে যে দাসসুলভ মনোভাবে অভ্যস্ত হইত, পারিবারিক জীবন

হইতে এইরূপেই দাসসুলভ মনোভাব গড়িয়া উঠে। আর এইরকম জাতি যে দাসসুলভ মনোভাব সম্পন্ন হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?*

'অল্পবয়সে বিবাহ দিলে মেয়েরা কুপথে যাইতে পারিবে না,' এই যুক্তিতে প্রকারান্তরে ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে অল্পবয়সে বিবাহ না দিলে মেয়েদের কুপথে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে। —এই সিদ্ধান্তে হিন্দু জাতি যে রমণীর উপর বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন – এরূপ প্রমাণ হয় না বরং তাহার বিপরীতই প্রমাণ হয়।

পুরুষেরা মেয়েদের মুখে দেবী বলিয়া স্তুতি করেন ; কিন্তু মনে মনে যে তাহার ঠিক বিপরীত ভাবেন তাহা তাহাদের অনেক আচরণে এবং সময়ে সময়ে কথাতেও প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাঁহাদের বিধানগুলি এই মনোভাব সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া সাক্ষ্য দেয়। তাঁহারা যে অল্পবয়সেই এমন কি শিশুবয়সেই বালিকাকে বিবাহ দিয়া নিরাপদ হইতে চাহেন, বিধবাদিগকে স্বামীর চিতায় দগ্ধ করিয়া নিরাপদ হইতে চাহেন, এবং যদি বা দগ্ধ না করা যায় তাহা হইলে তাঁহাদের বৈধব্যের কঠোর নিয়মের মধ্যে শৃঙ্খলিত রাখিয়া নিরাপদ হইতে চাহেন—এই সকলের মূলে সেই একই মনোভাব রহিয়াছে, সে মনোভাব মেয়েদের প্রতি একটা ঘোর অবিশ্বাস। এই অবিশ্বাসের কারণ সম্বন্ধে হয়তো একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিবেন যে এস্থলে তাঁহারা নিজের উপর অবিশ্বাসই অন্যের উপর প্রযুক্ত (projection) করেন। – যাঁহারা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ৫০ বা ৬০ বৎসরেও দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার বিবাহ করা নিজেদের পক্ষে কোন দোষের বলিয়া মনে করেন না, যাঁহারা যথেচ্ছাচারের পথে সর্ব্বদা নিরঙ্কুশ ভাবে বিচরণ করেন তাঁহারাই যে বালবিধবা কন্যা বা পুত্রবধুর নিকট অধিক করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের দাবী করিবেন মনস্তত্ত্বের মতে ইহাই স্বাভাবিক। আমি এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি যে, শাস্ত্রে আছে "বিধবা যদি মস্তক মুণ্ডন না করে তবে তাহার কেশরাশি তাহার পরলোকগত স্বামীকে বন্ধন করিয়া নরকে নিক্ষেপ করে, এবং বিধবা যদি খট্টাঙ্গে শয়ন করেন, তবে স্বামীর ঊর্দ্ধলোক হইতে পতন হয়।"

অল্পবয়সে বিবাহের একটি বিশেষ কুফল এই যে ইহাতে বালিকা বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আজকাল উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এত বেশী শিশু-বিবাহ নাই কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীতে এখনও ইহা পূর্ণিমাত্রায় প্রচলিত রহিয়াছে। বেহার প্রভৃতি স্থানে শিশু বিবাহের প্রচলন খুবই আছে কিন্তু বিধবা হইলে তাহাদের আবার বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের বাংলা দেশে খুব নিম্ন-শ্রেণীতেও বিধবাবিবাহের প্রচলন নাই বলিলেই হয়। আমি কিছুদিন আরামবাগে ছিলাম, সেখানে গৌরীদান অপেক্ষায় পুণ্যময় বিবাহ দেখিয়াছি। সেখানে একাদশ তিলি প্রভৃতি নবশাখ শ্রেণীতে বিবাহের বয়স ৩।৪ হইতে ঊর্দ্ধসংখ্যা পাঁচ বা ছয়। সেই সকল সমাজে বালিকাদের মধ্যে ৮।৯ বৎসরের বিধবার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এই সব বিধবারা ভবিষ্যতে কি ভাবে দিন যাপন

* এই দাসসুলভ মনোভাব সম্বন্ধে 'ভারতের সাধনা"র প্রথম সংখ্যার ৬১ পৃষ্ঠায় একজন লিখিয়াছেন :— "হিন্দুদিগের দাস মনোবৃত্তির তলায় তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষা, ঐচিন্তার মূলে স্বাধীন চিন্তার স্থান নাই, এবং ভক্তি শ্রদ্ধা অতিরিক্ত স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের দৃষ্টান্তে এখন শ্রদ্ধাভক্তির ভাব বাড়ান অপেক্ষা স্বাধীন চিন্তার ভাব বৃদ্ধি করা উচিত। অতিরিক্ত শ্রদ্ধাভক্তির ভাব হিন্দুদিগের জড়ত্বের কারণ।"

করিবে সমাজের লোকের কি তাহা অনুসন্ধান করিবার বিষয় নয়? গৌরীদানের ফলে বিধবা হইয়াছে, এখন ব্রহ্মচর্য্য করুক' বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকাই কি যথেষ্ট? তাহারা অন্নবস্ত্রের অভাবে সহরে গিয়া ঝি শ্রেণীভুক্ত হউক অথবা মুসলমান কর্তৃক নির্য্যাতিতা ও জাতিভ্রষ্টা হউক এ সকল বিষয়ের কোন প্রতীকারই কি সমাজের কর্ত্তব্য নয়?

যদি কোন স্ত্রীলোক নির্য্যাতিতা হয়, তবে তাহার নিজের কোন দোষ না থাকা সত্বেও সমাজে আর তাহার স্থান হইবে না, এবং পুরুষ যতই দোষ করুণ না কেন সমাজ তাঁহাকে কখনই ত্যাগ করিবে না। ইহার ফলে সমাজ-ত্যক্তাকে বাধ্য হইয়া কুলত্যাগিনী হইতে হয়, না হয় মুসলমান ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। হিন্দু সমাজে যাহার আশ্রয় নাই মুসলমান সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদা হাত বাড়াইয়াই আছে।

নির্ম্মল শৈশবে ও বাল্যকালে শিশুকে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ রূপ বন্ধনের মধ্যে আনিয়া ফেলিলে তাহা ব্রহ্মচর্য্যের সুতরাং তাহাদের চরিত্রের দিক দিয়াও হানিকর। ইহা ভিন্ন অসম বয়সের বিবাহে শিশু বালিকার উপর দারুণ অত্যাচার ঘটিবার সম্ভাবনাও থাকে; ইহাও শিশু বিবাহের আর একটি দোষ।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, শিশু বয়সের বিবাহের ফলে, যত অল্প বয়সে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সেই অনুপাতে—প্রসূতি ও শিশুর মৃত্যু সংখ্যা তত অধিক। গত সর্দ্দার বিলের সময় এবিষয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সেই তালিকায় বিবরণ সংগ্রহ দ্বারা যাহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে তাহার দ্বারা জানা যায় মোটের উপর ১১ বৎসর বয়স হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের মধ্যে যত কম বয়সে সন্তান জন্মিয়াছে শিশু ও প্রসূতির মৃত্যু সেই অনুপাতে অধিক হইয়াছে। অনেক স্থলে মাতা ও সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই বটে কিন্তু চিররুগ্ন হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ঘটনা এই যে হিন্দুর সংখ্যা বৎসর বৎসর অনবচ্ছিন্ন ভাবে হ্রাস পাইতেছে ও মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। ১৮৭০ সালের প্রথম সেনসাস রিপোর্টে দেখা যায় যে বাংলা দেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান প্রায় ৪০ লক্ষ কম ছিল আর এখন শতকরা ৪৫ জন হিন্দু—ও ৫৫ জন মুসলমান দাঁড়াইয়াছে। আর এইরূপ যদি চলিতেই থাকে তবে শাস্ত্র থাকিলেও আর কিছুদিন পরে এ শাস্ত্র যাহারা মানিবে সেই হিন্দু আর বাংলা দেশে থাকিবে না।

সমাজ কখনও বিশৃঙ্খল ভাবে চলিতে পারে না সেজন্য কতকগুলি সামাজিক অনুশাসন প্রয়োজন কিন্তু সেই অনুশাসনগুলি যখন দৃঢ় সংস্কার রূপে পরিণত হইয়া যায়, গতানুগতিকতার বন্ধন সমাজের লোকমতকে যখন এমনই জড়ভাবাপন্ন করে যে উপস্থিত সময়ে পুরাতন অনুশাসন-গুলি সমাজের পক্ষে যথার্থ হিতকর হইতেছে কিনা সে বিষয়ে বিচার করিয়া দেখিবার সাহস পর্য্যন্ত জনসমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যায়, তখনই যে সমাজের চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। যে দিন "শাস্ত্রের অনুজ্ঞা" এই কথাটির নিকটেই মানুষ একেবারে আত্মসমর্পণ করে সেদিন মানুষের পক্ষে সুদিন নয়—পরম দুর্দ্দিন। সে সময় মানুষ আর মানুষ থাক না অনুশাসন-চালিত পুত্তলিকামাত্রে পরিণত হয়। আর সেই সময়ই মানুষ এমন অমানুষ হয় যে ধর্ম্মের নাম লইয়া যত কিছুই অধর্ম্ম আচরণ হউক না মানুষ তাহার প্রতিবাদ করিতেও সাহসী হয় না।

এইরূপ অবস্থাকে শাস্ত্রের উপর প্রকৃত ভক্তি বলা যায় না, বরং উদ্যত শাসন দণ্ডভীতি বলা যাইতে পারে।

কিন্তু মানুষ মানুষ, সেই জন্য একদল মানুষ মানুষের এই ভয় কাটাইবার সাধনায় আত্মোৎসর্গ করিয়া চিরকালই মানব জাতির কলঙ্ক মোচন করিয়া আসিতেছে। তাহারা সমাজকে ভয় করে না. সমাজকে ভালবাসে, কাজেই সমাজের পক্ষে যাহা মন্দ তাহা তাহারা দূর করিবার জন্য সমাজের অঙ্গে আঘাত দিয়াও থাকে, এবং নিজেও হাসিমুখে নিন্দা নির্য্যাতন ও সমাজদ্রোহীতার কলঙ্ক মাথায় করিয়া লয়। গীতা বলিয়াছে,—

"নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোধয়তি মারুতঃ।

—ইহাই মানুষের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের স্বরূপ এবং ইহাই মানুষের মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্মত্ব। হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম কেবল হিন্দুকে নয় মানুষ মাত্রকেই শিক্ষা দিতেছে "ত্বমসি নিরঞ্জন"। হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম কতগুলি অনুজ্ঞা বা অনুশাসনের সমষ্টি মাত্র নয়. পাপভীতি বা পুণ্যের প্রলোভনের গণ্ডিতেও ইহা আবদ্ধ নয়, বরং যত কিছু ভয় অথবা প্রলোভন যাহা কিছু আসক্তি বা সংস্কারের বন্ধন মানুষ যে বীর্য্যের পথে ও সংগ্রামের পথে চলিয়া জয় করিতে পারিবে সেই পথের পথ প্রদর্শক। এবং সনাতন ধর্ম্ম নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে মোহাভিভূত মানবকে এই বলিয়া নিয়ত প্রবুদ্ধ করিতেছেন 'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরাণ নিবোধতঃ"—উঠ জাগো নিজ শ্রেষ্ঠত্বকে অবগত হও ও প্রাপ্ত হও।" "তুমি পরন্তপ"—পরম তপস্যার অধিকারী "ক্ষুদ্রং হৃদয়ং দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ ধনঞ্জয়"—ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে উত্থিত হও। মানবের জীবনের সাধনার পথ—তাহা লোক প্রতিষ্ঠার পথ নয়, লোকানুমোদিত গতানুবর্ত্তনের সহজ পথ নয়,—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

মানুষ স্রষ্টা,—পুরাতন ধ্বংশের মধ্যেই নূতন সৃষ্টির অভ্যুদয় হয়। জীবন অর্থ গতিপ্রবাহ, আবদ্ধ সলিল রাশি নয়। যুগে যুগে নূতন পথ নূতন মত নূতন নিয়ম নূতন অনুশাসনের সৃষ্টি হয় ও লয় পায়। সে গুলি কালপ্রবাহে তরঙ্গের উত্থান ও পতন মাত্র, কিন্তু প্রবাহ,—সে চির-গতিশীল হইয়াও চির সনাতন। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সেই চির প্রবাহিত সর্ব্বকলুষনাশী জীবন প্রবাহ। জগৎকে তাহা সঞ্জীবিত করিতেছে। যুগে যুগে ইহাতে যুগধর্ম্মে নানা ভাবে নানা সাধনার উদয় ও বিলয় হইয়াছে, যুগে যুগে সমাজরক্ষার জন্য নানা ভাবে স্মৃতির অনুশাসন রক্ষিত হইয়াছে, হিন্দু জানে সেই অনুশাসনই হিন্দুধর্ম্ম নয়, অথবা সেই যুগানুযায়ী সাধনাই হিন্দু ধর্ম্ম নয়। হিন্দু জানে সে এক মহাবিকাশ পথের পথিক এবং ভারতের সাধনার অর্থ সেই বিকাশের পথেই চলা। "হে পরন্তপ, হে বীর, এই বিকাশের পথের যাহা কিছু বাধা, তাহাই তোমাকে যুদ্ধ করিয়া জয় করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই তোমার সাধনা।" "অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়" এই প্রার্থনা—অসতের বাধা কাটাইয়া সতের পথে, অন্ধকারের বাধা কাটাইয়া জ্যোতির পথে, মৃত্যুকে জয় করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্তির পথে—চলিবার জন্য শক্তি প্রার্থনা উপনিষদেরই বাণী ও ইহাই মানবজাতির চিরন্তন প্রার্থনা। মানব সাধনার পথের চির পথিক, মানববিকাশের বাধার সংগ্রামে চির যোদ্ধা, আর এই সাধনাই একাধারে সাধনা ও সিদ্ধি।

বেদান্ত দর্শন বলেন "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ব্রহ্মত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, জীবনের সাধনায় এই 'ব্রহ্মত্ব'কে বিকাশ করিয়া তোলাই হিন্দুধর্ম্মের সাধনা। পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশের সিদ্ধান্তে যে সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ও তাহা হইতে যে সকল নূতন দর্শনের অভিব্যক্তি হইতেছে সে সমস্ত বেদান্ত দর্শনের এই সত্যকেই মানিয়া লইতেছে। মানুষের অন্তরস্থিত এই ব্রহ্মত্বের একটি বাণী থাকে ; সেই বাণী মানুষের অন্তরের বিকাশের সহিত ক্রমশঃ তাহার নিকট পরিস্ফুট হয়, উপনিষদের ঋষিগণ সেই বাণী উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রের অনুশাসন ও সমস্ত লোকাচারের অনুশাসন অপেক্ষা এই অন্তরস্থিত ব্রহ্মের নিদেশবাণী মানুষের পক্ষে একেবারে অলঙ্ঘ্য এবং সেই অন্তরের আদেশই চরম আদেশ, শ্রীমদ্ভগবত গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মানব জাতিকে এই কথাই বুঝাইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনকে পরম পূজ্য পিতামহের সহিত এবং ব্রাহ্মণ ও গুরু দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, এ স্থলে এই গুরুহত্যা ও ব্রাহ্মণ হত্যার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় অনুশাসন কি "গৌরীদানের" শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞা অপেক্ষা অনেক অধিক বলবৎ নয়? কিন্তু সে সকল উপেক্ষা করিয়া শ্রীভগবান অর্জ্জুনের সম্মুখে তাঁহার অন্তরস্থিত ব্রহ্মের এই চরম আদেশের দিকটাই পরিস্ফুট ভাবে ধরিয়াছিলেন। অর্জ্জুন এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে শাস্ত্রের দিক দিয়া এবং নিজের ব্যবহারিক বুদ্ধির দিক্ দিয়া অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া ছিলেন, কিন্তু সেই সমস্তের মূলে যে তাঁহার অহংজাত দুর্ব্বলতা রহিয়াছে সেই দুর্ব্বলতাই প্রকৃতপক্ষেতাঁহাকে তাঁহার অন্তরস্থিত ব্রহ্মত্বের অনুভূতির দিক দিয়া এই সংগ্রামরূপ ব্যাপারটি গ্রহণের পক্ষে বাধা দিতেছিল। শ্রীভগবান সেই জন্য অর্জ্জুনের কথার উত্তরে প্রথমেই বলিয়াছিলেন—"তোমার এ গুলি ক্লৈব্য,সেইজন্য তুমি মুখে পণ্ডিতের মত কথা বলিতেছ।" অর্থাৎ তোমার এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি এ কেবল তোমার ক্লৈব্যেরই ছদ্মরূপ মাত্র। আমাদের এই বাংলাদেশেও যাঁহারা শাস্ত্রের উপর নিজেদের দৃঢ়শ্রদ্ধা দেখাইয়া দেশের মধ্যে যাহাতে লোকাচার ও শাস্ত্রবহির্ভূত কায না হয় তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, এবং চেষ্টা সফল হইতেছে না দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহাদের নিকটআমার সানুনয় নিবেদন এই যে অর্জ্জুনের যেরূপ দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের পক্ষেও সেরূপ দুর্ব্বলতা ঘটিবার কি সম্ভাবনা নাই? আর তাঁহাদের উপদেশ গুলি কার্য্যক্ষেত্রে যথার্থ ভাল কি মন্দ তাহা বাস্তবের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত নয় কি ?

শ্রীসরলাবালা সরকার।

পুস্তক পরিচয়।—(১) মহাভারত। শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত ; কিশোর সাহিত্যে সুপরিত লেখকের তরুণ বয়স্ক বালক বালিকাদিগের উপযোগী করিয়া লিখিত এই মহাভারতে কুরুপাণ্ডব বৃত্তান্ত সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা একেবারে 'হাল্‌কা' করেন নাই বলিয়াযুক্তি দেখাইয়াছেন, আজকাল কথা বা হাল্‌কা ভাষার প্রতিই অনেকের আসক্তি। সাহিত্যে—বিশেষতঃ শৈশব শিক্ষায় উহা প্রচলিত হইলে শিক্ষার বীজে হাল্‌কা ভাব বা লঘুতা প্রবেশ করে—তদ্দ্বারা শিক্ষার্থীর চরিত্রও লঘু হইয়া থাকে। অধিকন্তু হাল্‌কা ভাষায় লিখিত হইলে—মহচ্চরিত্র গুলিও হাল্‌কা হইয়া পড়ে এবং তাহার গুরুত্ব হ্রাস পায়। লেখকের উক্তি এই পুস্তকের সমর্থন করে।

প্রাপ্ত পত্র।—

গত বৈশাখ মাসের 'ভারতে সাধনা' নামক মাসিক পত্রিকায় "সন্ধ্যোপাসনা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—"চৈতন্যদেব বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণসন্তান হইয়াও কায়স্থকে গুরু করিয়াছিলেন।" এ কথা অমূলক এবং অপ্রতিষ্ঠ বলিয়াই আমাদের মনে হয়। অবশ্য ইহা সত্য যে, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কোন কুলজীতেই শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু ঈশ্বর পুরীর নাম পাওয়া যায় না। আর তিনি যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র অথবা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহারও প্রমাণাভাব। এ নিমিত্ত তিনি ঐ সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ইহা একপ্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত। তাহা বলিয়া তিনি কায়স্থ ছিলেন, এ মীমাংসারও কোন মূল্য নাই। পুরী, গিরি, ভারতী প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতিকে শিষ্য করা ইহাদের নিয়মবহির্ভূত। ঈশ্বর পুরী যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কায়স্থ বংশোদ্ভব নহেন ইহা তাঁহার 'পুরী' উপাধিই দেখাইয়া দিতেছে। শ্রীচৈতন্য-দেবের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে কোন কোন কায়স্থ গুরুবৃত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কখনও কোন কায়স্থ গুরুবৃত্তিক ছিলেন, ইহার দৃষ্টান্ত কেহই দেখাইতে পারিবেন না। অতএব শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু কায়স্থ ছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা।

পক্ষান্তরে 'আলোচনা'র সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় 'নদের নিমাই' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"সেই সময়ে শ্রীপাঠ নবদ্বীরে কুমারহট্ট (বর্ত্তমান হালিসহর) নিবাসী বৈদ্যবংশীয় প্রভুপাদ ঈশ্বর পুরী নামক জনৈক প্রেমবিহ্বল বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি মাধবেন্দ্রপুরী নামক জনৈক মহাপুরুষের শিষ্য।" ইত্যাদি। এখানে তিনি ঈশ্বর পুরীকে বৈদ্যবংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। যোগেন্দ্র বাবুর এই মত আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কারণ ঈশ্বর পুরী ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ না হইলে, বৈদ্য ভিন্ন হইবার উপায় নাই।

* * * * * *

যাহা হউক, ঈশ্বর পুরী যখন রাঢ়ী, বারেন্দ্র বা বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন না, যখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতীর পুরী সম্প্রদায় ভুক্ত হইবার নিয়ম নাই, এবং যখন তিনি তাঁহার বাসভূমি হালি সহরে বৈদ্যবংশীয় বলিয়াই প্রসিদ্ধ, তখন তিনি যে বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব শ্রীচৈতন্য বৈদ্যকুলজ ঈশ্বর পুরীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করায় তাঁহার উপযুক্ত কার্য্যই করা হইয়াছে এবং ঐ কার্য্যে কিছুমাত্র দোষের আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আশাকরি লেখক অতঃপর এ বিষয়ে ধীরভাবে চিন্তা করিয়া আপনার ভ্রান্তি অপনোদন পূর্ব্বক আমাদের মতের সমর্থন করিবেন।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন শর্ম্মা।

মন্তব্য।— কোনও সাম্প্রদায়িক মত পোষণ বা প্রতিপাদন করা ভারতের সাধনার লক্ষ্যে নাই। মূল প্রবন্ধে লেখকের উক্তিতে এইরূপ কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। প্রাপ্ত পত্রের বক্তব্য সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা গেল। সাম্প্রদায়িক বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার জন্য আজ কাল পত্রিকার অভাব নাই, তাহাতে ইহাদের বিস্তারিত আলোচনা হইতে পারে। আমরা এ বিষয়ে ব্রাহ্মণসমাজ-পত্রিকা, বৈদ্যপত্রিকা বা কায়স্থ সভার পত্রিকাদির মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। মৌলিক প্রবন্ধ-লেখকের কিছু বক্তব্য থাকিলে তাহা একবার প্রকাশ করিব মাত্র।

ভা-স

মাস-পঞ্জি—ভাদ্র, ১৩৩৮

ভাইসরয় লর্ড ওয়েলিংডন কলিকাতা আসিয়া একদিন পরেই সিমলাতে ফিরিয়া গিয়াছেন—মহাত্মা গান্ধীর সহিত পুনঃ সিমলাতে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইতেছে (১লা)—কাশ্মীরে হিন্দুদিগের রক্ষার জন্য সনাতন ধর্ম্ম সভা আবেদন করিয়াছেন—ব্রিটনে এবার যে বর্ষাপাত হইতেছে তেমন নাকি শত বৎসরের মধ্যে হয় নাই—ইতালীর পোপ ও মোসলিনীতে বিবাদ আপোষমীমাংসায় মিটিবার সম্ভাবনা—ঢাকা বিভাগের কমিশনারের উপর টাঙ্গাইল ভ্রমণকালে গুলি বর্ষণ হয়—পাতিয়ালার মহারাজা এই গোলটেবিলে যাইতেছেন না, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী যাইবেন—জাপান-সম্রাট চীনের বন্যা পীড়িতদিগের সাহায্যকল্পে ১০ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছেন—বিলাতে শ্রমিক রাজ পক্ষের পতন ঘটিল (৮ই)—তাহার স্থানে জাতীয় রাজসরকার বা ন্যাসানালগভর্ণমেণ্ট নামে নূতন দলের আবির্ভাব হইয়াছে—বিলাতীমন্ত্রীদলপরিবর্ত্তনে তথায় ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠকের কোনও ব্যতিক্রম ঘটিবে না বলিয়া সরকার মত প্রকাশ করিয়াছেন—ভারতমন্ত্রী বেন্ রাজকার্য্য পরিচালন-সমিতি হইতে অপসৃত হইলেন, তৎ স্থানে স্যর সেমুয়েল হোর ভারত সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন—কানপুরের মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায়ের জামিন জন্য আবেদন অগ্রাহ্য করা হইল—মহাত্মা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই গোল টেবিলে যাইবেন কি না—ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহার চার্জ্জসীটের জবাব দিয়াছেন (১০ই)—মহাত্মা আজ গোলটেবিলে যাওয়াই শেষ নির্দ্ধারন করিলেন (১১ই)—অদ্য বোম্বাই হইতে অপরাহ্নকালে তিনি রাজপুতনা নামক জাহাজে বিলাত যাত্রা করিলেন—নিখিল ভারত পতাকা-উৎসবের দিন (১২ই)—চীনের জলপ্লাবনে প্রায় ২৫ হাজার লোকের প্রাণ হানি ঘটিয়াছে—চট্টগ্রামের পুলিশ ইন্‌সপেক্টার খাঁ বাহাদুর আসানুল্লা এক যুবকের গুলিতে নিহত (১৩ই)—চট্টগ্রামে ভীষণ দাঙ্গা, লুট—অরাজকতা উপস্থিত—ভারত গভর্ণমেণ্ট নূতন ঋণের জন্য 'ট্রেজারী বণ্ড' বিলি করিতে আরম্ভ করিলেন (১৩ই)—বার্লিনে বহুকাল পরে অর্থ বিনিময় কার্য্য পুনঃ আরম্ভ হইল (১৭ই)—মহাত্মা গান্ধী এডেন বন্দরে ভারতবাসীগণকর্ত্তৃক সভ্যর্থিত হইলেন এবং নগদ ৪০০০ হাজার টাকার একটী তোড়া উপহার পাইলেন (১৯)—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন-গুপ্ত পুনঃ কলিকাতা করপরেসনে প্রবেশপ্রার্থী—হাল হিসাব প্রকাশ, ভারতের ঋণের জন্য বার্ষিক সুদ দিতে হয় দুই শত কোটী টাকা—কোয়েটাতে ভূকম্পন হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে—আসামের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সর্দ্দার বিবাহ আইনের প্রতিবাদ করিয়া সভা করিতেছেন—এসেম্বলী সভাতে সংবাদ পত্র নিপীড়নমূলক নূতন আইন পাশ হইতে চলিল (২৭শে)—ঐ দিনউক্ত সভাতে সুপ্রসিদ্ধ সংবাদিক মিঃ কেশব চন্দ্র রায় হঠাৎ পড়িয়া মারা গেলেন—রাজা ও রাজপুত্র বিলাতেরাজ্যের খরচ সংক্ষেপ-প্রচেষ্টাতে সাগ্রহে যোগদান করিয়াছেন ও নিজ নিজ ব্যয়ের জন্য গৃহীত অর্থের অনেক অংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন—বিলাতী বাৎসরিক বাজেটে বহু টাকার অনাটন দেখা যায়, সেজন্য করবৃদ্ধিরও আয়োজন হইতেছে—বিস্তর বর্ষাপাতের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইলেন (২৫শে)—বর্ম্মাতে পুনঃ ডাকাতি আরম্ভ হইয়াছে—মধ্য ইউরোপে ফেসিষ্ট দলের প্রভাব বৃদ্ধিতে গোলযোগের সম্ভাবনা—কৌন্সীল্ অব ষ্টেটের সেপ্টেম্বরের বৈঠক আরম্ভ হইল (২৭শে)—মহাত্মা গান্ধী ফেডারেল ষ্ট্রাকচার সব কমিটির নিকট কংগ্রেসের দাবীর কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি করিয়াছেন (২৯শে)—মহাত্মা সবকমিটির কার্য্যতৎপরতায় অনিশ্চয়তার ভাব দেখিয়া বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন (৩১শে)।

ভারতের সাধনা

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

দ্বিতীয় বর্ষ] আশ্বিন—১৩৩৮ [দ্বাদশ সংখ্যা

সাধনার পথে

পূজা আসিতেছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় পূজা এবারও আসিবে। আসিয়া চলিয়া যাইবে এবং আবার আসিবে।

বাঙ্গলার সাধনা—দুর্গাপূজা

পূজা—দুর্গা পূজা—একালের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠান। কেবল বাঙ্গালাতে নহে, সমুদায় ভারতবর্ষে এমন আর একটী অনুষ্ঠান নাই, পৃথিবীর আর কুত্রাপি এমন আর আছে কি না সন্দেহ। দুর্গাপূজা একালে প্রাচীন কালের অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞ, মহাসত্রাদির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

দুর্গাপূজা কেবল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নহে—উৎসবও বটে। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে দেশ ভরিয়া যায়। ইহাই সাধারণ অনুভূতি ও ধারণা।

দুর্গাপূজা কেবল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুসরণ নহে—উহাকে এক জাতীয় মহোৎসব বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। সমগ্র দেশের উপর প্রতি বৎসর আসিয়া এমন একটী সার্ব্বজনিক ধাক্কা দিয়া যায় একালে এমন আর একটী ব্যাপার নাই। কেবল বাঙ্গালার বিভিন্ন জাতির মধ্যে নহে, সমগ্র ভারতের উপরে উহার প্রভাব বিস্তর। বিদেশীয় রাজ সরকার ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রেও উহার প্রভাব পড়িয়াছে। আধুনিক ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা ও রাজকার্য্য প্রায় সমুদায় ইহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—পূজা সকলেরই সময়-সীমা নিরোপনকারক। ইহার পরিবর্ত্তে আর একটী করা সুকঠিন।

পরোক্ষে নানাদিকে দুর্গাপূজার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়া থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে উহা পূজা ও আরাধনা। একালে বাঙ্গালী জাতি তাহাতে এক বিশেষ অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে ও স্বকীয় বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছে। মাতৃরূপে ঈশ্বরত্বের আরোপ একমাত্র হিন্দুই করিতে পারিয়াছে। দেবত্বের এমন সান্নিধ্যলাভ আর কিছুতেই হইতে পারে না। দুর্গাপূজা মাতৃরূপে আবদ্ধ শক্তির আরাধনা। ভারতের সাধনার ধারায় এই শক্তিপূজার এক বিশেষ ক্রম রহিয়াছে। আদিম বৈদিক ঋষিদিগের দৃষ্টিতে যিনি জগৎ শক্তির আধারস্বরূপ শব্দ বা বাগদেবতা রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন—ওঙ্কার নাদে যিনি সর্ব্বত্র ঝঙ্কারিত—সৃষ্টি স্থিতির আধারভূতা, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে মহাশক্তির প্রকাশিকা রূপে জানান দিয়াছিলেন—নতুবা কে কি জানিতে পারে?

—"আমিই রুদ্রগণ বসুগণ আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণের সহিত গমন করি। আমিই মিত্র বরুণ অগ্নি ইন্দ্র অশ্বিনীদ্বয় সোম ত্বষ্টা পূষা ও ভগকে শক্তি সম্পন্ন করি। আমিই বিশ্বের সাম্রাজ্ঞী। আমিই ব্রহ্মকে জানি। আমার শক্তি ব্যতীত কোন বস্তু অসম্ভব এবং জগতের কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন হয় না। আমিই মানবের অমঙ্গলনাশিনী ও অসুরসংহারিণী। আমিই রুদ্রের ধনু বিস্তির্ণ করিয়া দিই। আমিই সকল বস্তুর স্থিতি মধ্যে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে বিরাজমানা এবং আমি পৃথিবী ও আকাশ হইতেও মহত্তর"—দেবী সূক্ত (ঋগ্বেদ ১।১২৫)।

উপনিষদের পরিণত আধ্যাত্মিক বিচারে তিনিই সর্ব্বশক্তির মূলীভূতা মহাশক্তিরূপে আরও উপলব্ধ হইয়াছিলেন। 'হৈমবতী উমা' রূপে প্রকট হইয়াছিলেন। দেবতারা তাহার সন্ধান পাইল না। তাঁহার শক্তিতেই দেবগণ দেবাসুরসংগ্রামে মহিমান্বিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মের সেই প্রকাশ বিদ্যুৎপ্রকাশ চক্ষুর নিমেষের ন্যায় ইন্দ্রদেব সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাতে প্রকট দেখিয়া ও তাঁহার পরিচয় পাইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া ছিলেন (কেনোপনিষৎ ১৪।২৯

প্রচলিত শক্তির উপাসনা পুরাণের মৌলিক বিধানে বিহিত। এক্ষণে হৈমবতী উমা হিমাচলের কন্যা বা হিমাচল বাসিনী দেবী ভগবতী বলিয়া পূজিতা হইতেছেন। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কন্যারূপে সম্বর্দ্ধিতা ও মাতৃরূপে পূজিতা হইতেছেন। দেবতা ও ঋষিদিগের দুজ্ঞেয় মহাশক্তির সন্নিধান লাভের এখানেই পরাকাষ্ঠা। হিন্দু তাহার উপাসনা পদ্ধতিতে সুদীর্ঘ সাধন লব্ধ অপূর্ব্ব সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছে। নিতান্ত দুর্দ্দিনেও তাঁহাকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ও আপন ব্যবহারিক জীবনে সমভাবে চিরতরে সুদৃঢ় করিয়া রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে।

আজ ভারতের বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত। দিনের পর দিন দুর্দ্দশা কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতের দুরপনেয় দুঃখের বার্ত্তা বহন করিয়া চলিয়াছে। ঘোর তমসা ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। অন্নের অভাবে জাতির দেহ শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইয়া পড়িয়াছে, বলবীর্য্যের অভাবে তেজ ও সাহসহীন—অবিদ্যার প্রভাবে মন অজ্ঞান ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। উৎপীড়ন ও অত্যাচারের তাণ্ডব লীলা সর্ব্বত্র বাড়িয়া চলিয়াছে।

ঘোর দুর্দ্দিনেই দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করিতে হয়—শ্রীরামচন্দ্রের আবাহন, সুরথ-সমাধির আরাধনা, গোপীগণের কাত্যায়ণী পূজন—এ সমুদায়ই মর্ম্মন্তুদ দুঃখের প্রেরণা, ব্যথার তাড়নায়। দুর্দ্দশার প্রতিকার কল্পেই বরাভয়দায়িনী সর্ব্বমঙ্গলা দুর্গতিহারিণী শ্রীদুর্গার আবাহন করিতে হয়—

সঙ্গে সর্ব্বজ্ঞানের উৎসস্বরূপা দেবী সরস্বতী, অন্নের ভাণ্ডার দায়িত্রী লক্ষ্মী, বলবীর্যের অবতার দেবসৈনিক কার্ত্তিকেয় এবং সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ। তবেই দুর্গাপূজার সার্থকতা! তাহাকে আবাহন করিতে হয়, পূজা করিতে হয়। জীবনে ব্যবহারে ও ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।

বাঙ্গালী কবে দুর্গাপূজাকে জাতীয় জীবনের এরূপ অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে তাহা ঐতিহাসিকের আলোচনার বিষয়। বর্ত্তমান সময়ে পূজার এই আড়ম্বরবহুল অবস্থা দেখিয়া তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বিজাতীয় প্রভাব বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়—বর্ত্তমান এই পূজার পরিবর্ত্তনে। পূজায় প্রতি লোকের আর সে আন্তরিক টান নাই। উপযুক্ত নিষ্ঠা, নিয়মিত সংযম, বিধিবদ্ধ পূজা প্রণালী লোপ পাইয়াছে বলিলেও চলে—বাহিরের আড়ম্বর ও ভোগবিলাস একালে ভারতীয় জীবনকে সর্ব্বপ্রকারই গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। পূজাবিধি ও ধর্ম্মাচরণ তাহা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে নাই। ফলে পূজায় শুভ্র পূত দ্রব্যাদির স্থানে বৈদেশিক চাকচিক্যময় সাজসজ্জা প্রবেশ করিয়াছে। হোম মন্ত্র ও চণ্ডী পাঠের স্থানে নাচগান যাত্রার আসর জুড়িয়া বসিয়াছে, প্রসাদ বিতরণ—নরনারায়ণের সেবার স্থানে পরপদ সেবা, বিজাতীয় আমন্ত্রণ, পাণ ভোজ প্রবেশ লাভ করিয়া কৃত্রিম সামাজিকতার সৃষ্টি করিয়াছে। পূজার স্বর্ণ প্রতিমা বিজাতীয় বেশভূষায় আচ্ছাদিত কাঠাম-কঙ্কাল শবে পরিণত হইয়াছে!

কিন্তু দুর্গাপূজা কখনও ভোগবিলাস বা ধনসম্পদ-ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি নহে—দুর্দ্দশায় কাতর দুঃখক্লিষ্টের মর্ম্মন্তুদ কাতর আকাঙ্ক্ষার উহা পরম কল্যাণকর আশ্রয়। ভারতবাসী যুগে যুগে তাহা নানা আকার করিয়া আসিয়াছে। ঘোর তমসাচ্ছন্ন মধ্য যুগের বর্ব্বরতা ও অমানুষিক অত্যাচার যখন সমুদয় পৃথিবীকে উৎপাটিত করিয়া জ্ঞানগরিমার সুখ-শয্যায় শায়িত ভারতের মেরুদণ্ডে আসিয়া আঘাত প্রদান করিল তখন সেই পরপীড়নভারে অবনত দুর্দ্দশায়-আচ্ছন্ন ভারত শ্রীরাম-সুরথের আরাধিতা দুর্গতিহারিণীকে ভুলে নাই। আর্য্যসাধনার লীলাভূমি ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ যখন লণ্ডভণ্ড ও মহাত্রাসে উদ্‌ব্যস্ত—বৌদ্ধ ভাবে স্থবির মগধের শির চূর্ণ বিচূর্ণ—ভারতের প্রতিভা তখন প্রধানভাবে বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তখনই একদিকে যেমন নানা কারুশিল্পে ও বাণিজ্যে বঙ্গের প্রতিষ্ঠা চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করে, অপর দিকে জ্ঞান গরিমার ভূমিতেও বঙ্গের অপূর্ব্ব উন্মেষ দেখা যায়। সুমধুর কবিত্ব, প্রেম ও ভক্তির রস এই সময়েই বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিতে থাকে; আবার গভীর পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তির অপূর্ব্ব উৎকর্ষলাভ এই সময়েই বাঙ্গালাতে হইযাছিল; পতিতউদ্ধারিণী দুর্গতিনাশিনী শ্রীদুর্গার আরাধনার এই নূতন ভাব ও রূপ তখনই বঙ্গে বিকাশ লাভ করে—বাঙ্গালার ঘরে ঘরে দুর্গাপূজা আরম্ভ হয়। আজও তাহার বিরাম হয় নাই। একান্ত অন্তরের প্রীতির সহিতই বঙ্গে দুর্গা-পূজা অনুষ্ঠিত হইত; আজিও জাতির অন্তরে তার লেশ পাওয়া যায়। এখনও এই মহাশক্তির অন্তর্নিহিত বলেই যে এইজাতি জীবিত রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নবযুগের বাঙ্গালায় মহামায়ের মহাপূজার আর এক নূতন রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। স্বদেশ ও স্বজাতির বহুকালের পুঞ্জীভূত দুঃখ রাশির মধ্যে নবীন বাঙ্গালার ঋষি মায়ের রূপ দেখিতে পাইলেন—দেখিয়া মস্তক অবনত করিলেন—**বন্দেমাতরম্** বলিয়া।

'বন্দে মাতরম্' কথার কথা নহে—গান নহে। উহা মন্ত্র—সত্য সত্যই মন্ত্র। মন্ত্রশক্তির পরীক্ষা হয়। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রশক্তির পরীক্ষার স্থল বর্ত্তমান ভারত ও ভবিষ্যৎ জগৎ—সে পরীক্ষার সূচনা দেখা দিয়াছে।

মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের দেবতা দেশমাতৃকা বঙ্গভূমি—ভাবময়ী হিমালয় দুহিতার প্রতীক—প্রকৃত রূপময়ী হিমালয়ের আত্মজা বাঙ্গালার এই ভৌতিক মা-টী। ঋষি তাহাতেই দেখিতে পাইলেন—"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী, কমলা কমল দল বিহারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িণী।"

এযুগের উপাস্য যে স্বদেশ—সমুদয় পৃথিবীর লোক তাহার সাক্ষী। এ নীতির বলে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের লোকেরা মধ্য যুগ হইতে আপন আপন জাতি(Nationality গড়িয়া তুলিয়াছে। অপর সকল দেশের লোকও সেই আদর্শে চলিয়াছে। কিন্তু ইহাদের নিকট স্বদেশ—Motherland—ভৌগলিক মৃত্তিকা-সংস্থান মাত্র—নিজ করতলগত ভোগের সামগ্রী। কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিতে স্বদেশ দেশমাতৃকা—আদ্যাশক্তি মহামায়েরই প্রতীক। "সমুদ্র বসনে দেবি পর্ব্বত স্তনমণ্ডলে, বিষ্ণু পত্নী নমস্তভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে"—সে মহাশক্তির প্রতীক বলিয়াই হিন্দু ভক্তিপূত অন্তরে জন্মভূমির প্রতি সদা সসম্মানে চলিবে। বাঙ্গালী সে পূজার অপূর্ব্ব দীক্ষা লাভ করিয়াছে ও দেশবাসীকে তাহা শিক্ষা দিয়াছে।

ভারতবাসী আজ স্বদেশসেবা বা দেশ মাতৃকার পূজায় রত হইয়াছে। এই নূতন আলোকে—ঋষি বঙ্কিমের প্রভাবে—বাঙ্গালার দুর্গাপূজার যে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে—বলিতে ইচ্ছা হয়, এই ভাব না আসিলে পাশ্চাত্যের বাত্যা-বিক্ষুব্ধ নবীন বাঙ্গালার মন হইতে দুর্গা-পূজার মাহাত্ম্য আজ একেবারেই তিরোহিত হইত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতের স্বদেশ-প্রেমিকতা বা স্বরাজ-সিদ্ধি কোন সাময়িক উত্তেজনা বা খেয়ালের বিষয় নয়—ভারতীয় সাধনার সহিত উহার নিগূঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান—প্রকৃত পক্ষেই উহা মহাশক্তি মহামায়েরই উপাসনা। তাই আনন্দমঠের দেশসেবক যখন দেশের জন্য "জীবন সর্ব্বস্ব" পণ করিলেন, ভারতীয় সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষ তখন 'জীবন তুচ্ছ' বলিয়া 'ভক্তিকেই' দেশ-পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এ ভক্তি প্রেম, বীর্য্য ও সত্যানুরাগ মিশ্রিত অপূর্ব্ব শক্তির আধার। এই জন্য চাই ঘোর তপস্যা। আজ দেশের অন্তরে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে বৈদেশিক ও বিজাতীয় ভাবস্পর্শে যে বিকৃত উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে,—তাহাতে সে দেশভক্তি—সে তপস্যা—ডুবিয়া না যায়!

মুদ্রা যন্ত্রে বেড়ী

আবার একটী আইন পাশ হইল যাহাতে মুদ্রা যন্ত্র, সংবাদপত্র বা জনমত ও সর্ব্বসাধারণ ভাব প্রকাশের উপর কঠোর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। আইনকর্ত্তাদিগের যুক্তি—সংবাদ পত্রের প্ররোচনায় দেশের বিপ্লববাদী দিগের কৃত হত্যার সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। হিসাব দেখাইয়াছেন—গত তিন বৎসরের প্রথম বৎসর সমগ্র ভারতে ১৮টী রাজ নৈতিক হত্যা বা তাহার প্রচেষ্টা হইয়াছে, পরের বৎসর ৬৩টী এবং এবৎসর শেষ না হইতেই তাহা ১১৭টীতে উঠিয়াছে। আর সরকার পক্ষ একখানি পুস্তিকা ছাপাইয়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের মধ্যে বিবরণ করিয়াছেন—তাহাতে ৬৮ খানি সংবাদ পত্রের লিখিত প্রবন্ধ বা প্রবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে উহাতে হত্যার প্ররোচনা আছে।

রাজনৈতিক কর্ত্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত সরকারের বুদ্ধিতে যখন যাহা আইসে, তাহারা করিবেন। তাহাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কাহারও নাই। কিন্তু তাহার ন্যায়ান্যায় দেখিবার অধিকার সকলেরই আছে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষে এক্ষণে হাজার হাজার সংবাদপত্র চলে। এক মাত্র বাঙ্গালা দেশেই প্রায় দুই হাজার পত্রিকা আছে। তাহার মধ্যে মাত্র ৬৮ খানার মতামত দেখিয়া সমগ্র সংবাদ পত্র মণ্ডলীকে শৃঙ্খলিত করা সঙ্গত নহে। যে যে সংবাদ পত্রের লেখা বা তাহার অনুবাদ গভর্ণমেণ্টের হেতুবাদ-পুস্তিকাতে স্থান পাইয়াছে, তাহার সমুদয়ই দেশীয় লোকের পরিচালিত পত্রিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে। অথচ বিদেশীয় বা ইংরেজপরিচালিত এদেশীয় অনেক পত্রিকাতে অনেক কথা থাকে যাহা প্রচণ্ড হিংসা নীতির সমর্থক। একজন সুনিপুণ সংবাদপত্রপাঠক বলিলেন, তিনি হিজলীর হত্যা ব্যাপার শোচনীয় ঘটনার আভাস একখানি সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজের কাগজ হইতে পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। আর একখানি ঐরূপ পত্রিকাতে এদেশীয় আন্দোলন কারী দিগকে প্রকাশ্য রাস্তাতে আলোক স্তম্ভের গায়ে ফাঁসী রজ্জুদ্বারা ঝুলাইয়া মারিবার উপদেশ ছিল। ইহাদের কাহারও নাম পুস্তিকাতে নাই। আইনে তাহাদিগকে পাইবেও না। এরূপ একখানি সংবাদ পত্রের সাময়িক সম্পাদক এই প্রেস আইনের সমর্থন করিয়াও আসিয়াছেন। আর বাঙ্গালার একজন সাংবাদিক যিনি কেবল অসামান্য সাংবাদিকতার প্রতিভা বলেই অতি সামান্য অবস্থা হইতে উঠিয়া সমগ্র ভারতের সাংবাদিক গণের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন—বিশ্ব বিশ্রুত রয়টারের সমকক্ষ ভারতের এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সরকারী ও বেসরকারী সকলের সম্মানাঢ়্য মাননী কে-সি রায় এই আইনের পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদ করিতে গিয়া ব্যবস্থাপক সভার মধ্যেই অকস্মাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হন। গভর্ণমেণ্ট নীতির বিশেষ সমর্থনকারী ও নিরপেক্ষ অনেক সভ্য স্যার হরি সিং গৌর, সর্দ্দার শান্ত সিং, ডাঃ জিয়াউদ্দিন, স্যার আবদার রহীম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই আইন পাশ হইয়া গিয়াছে।

হিংসা মূলক বিপ্লব আজ ভারতের রাষ্ট্রনীতির ঘোর বিরোধী। সাধারণতঃ এদেশীয় সাংবাদিকগণ আজ অন্তরের সহিতই অহিংস নীতিকে বরণ করিয়া লইয়াছেন. ভারতীয় সাধনার গতি ও প্রকৃতি তাহাই। একদিকে বিপ্লবপন্থীগণ ও অপর দিকে শাসন কর্ত্তৃপক্ষ, উভয়েই এই নীতির পরিপন্থী। এবং তাহাতেই একে অপরের দুর্নীতির সহায়ক হইয়া চলিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের

প্রদত্ত হত্যা তালিকায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়—আর এক একটী হত্যার জন্য দেশের দোষী নির্দ্দোষী নির্ব্বিশেষে জনতার উপরে কি অত্যাচার চলে তাহার হিসাব কেহ লিখিয়া রাখে না। গত মাসে চট্টগ্রামে যে অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহা উহার নমুনা মাত্র। কোনওরূপ আইন করিয়া তাহা রোধ করিবার উপায় নাই।

হিজলী

চট্টগ্রামের হিন্দুগণের উৎপীড়ন ও লুটতরাজের পরই হিজলীর বন্দীনিবাসে গুলিবর্ষণ ও তাহাতে দুইটী উচ্চ হৃদয় হিন্দু যুবকের প্রাণনাশ ও বহু বন্দী আহত হওয়ার ব্যাপারটা বাঙ্গলারে মর্ম্মে আর একটী প্রচণ্ড আঘাত দিয়া গিয়াছে। এরূপ বিষয়ে আর কোনও নূতন মন্তব্য প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা হয় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে কাঁপিতে কাঁপিতে যাইয়া কলিকাতা গড়ের মাঠে অকটারলোনী মনুমেণ্টের নীচে যে মর্ম্ম বেদনা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি :—

"প্রথমেই ব'লে রাখা ভাল, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্ম্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে। কর্ত্তৃপক্ষদের কৃত কোনো অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাইনে। এই যে হিজলীর গুলি চালানো ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা-কিছু আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।

এত বড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তি, জনক; কিন্তু যখন ডাক পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক এল :সেই পীড়িতদের কাছ থেকে রক্ষকনামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েচে।

যখন দেখা যায় জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতেই হবে যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েচে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দ্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্ব্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাদের উপরে সেই সব শাসনকর্ত্তা এবং তাদেরই আত্মীয় কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

এই সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই ব'লে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন

আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্ব্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করানো রাজার পক্ষে কঠিন না হ'তে পারে। কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি? একথা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, প্রজার অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের পরেই অবশেষে বিদেশী শসেনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমি আজ উগ্র উত্তেজনা বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাইনে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এই কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতই আপন কলঙ্কলাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধরে আছে তত ঊর্দ্ধে আমাদের ধিক্কারবাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছিতেই পারবে না। একথাও মনে রাখতেই হবে যে, আমরা নিজের চিত্তে সেই গম্ভীর শান্তি যেন রক্ষা করি যাতে ক'রে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করবার স্থৈর্য্য আমাদের থাকে, এবং আমাদের নির্য্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর কঠিনতার দুঃখ স্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিনতর দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'তে পারি।

উপসংহারে শোকতপ্ত পরিবারদের নিকট আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাই যে একদা সম্পূর্ণ অবসান হলেও দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে পুণ্যশিখায় উজ্জ্বল দীপ্তি দান করবে।"

হিজলীর রাজবন্দীগণ ঘটনার পর এই মর্ম্মের এক আবেদন বাঙ্গলার গবর্ণরের নিকট করিয়াছেন—গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে রাজবন্দীগণের ব্যারকের মধ্যে তাহাদিগের শয়ন গৃহে, ভোজনগৃহে ও হাঁসপাতালে গুলি বর্ষণ করা হইয়াছিল। তাহার ফলে দুইজন বন্দীর মৃত্যু হইয়াছে ও বিশ জন আহত হইয়াছে। বিনা কারণে পূর্ব্ব হইতে পরামর্শ এবং অন্যায় রূপে এই গুলি বর্ষণ হইয়াছে। এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিদ্বেষমূলক এবং কল্পিত কথায় পরিপূর্ণ। এই ঘটনার তদন্তের জন্য বেসরকারী তদন্ত সমিতি নিযুক্ত হইলে বন্দীরা তাহার নিকট উক্ত বিবরণ যে মিথ্যা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে পারিবে।

উচ্চতর শাসন কর্ত্তৃপক্ষের নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচারে সত্য ঘটনা প্রকাশিত হউক ইহাই বাঞ্ছনীয়।

বাঙ্গলার কংগ্রেস বিবাদ

বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতাদিগের মধ্যে বিবাদ ও দলাদলি অনেক দিন ধরিয়া বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক রচনা করিতেছিল। পর-প্রদেশীয় নেতৃবৃন্দের নিকট অনেক তিরস্কার ও অপমান

ইহাদের সহ্য করিতে হইয়াছিল। মৌলিক কোনও নীতি লক্ষ্যে ইহাদের মতভেদ ও বিবাদ হইয়া থাকিলে, তাহা সমর্থন করা যায়; কোনওরূপ ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থের জন্য এ দলাদলি হইয়া থাকিলে তাহার অপেক্ষা জঘন্য ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে না। বহুদিন চলিয়া আসার পরে এই বিবাদের অবসান ঘটিয়াছে। বাহিরে শত অপমান ও নিন্দা যাহা করিতে পারে নাই হিজলীর রাজনৈতিক বন্দীদের প্রাণ দানে তাহা হইয়াছে। কংগ্রেসের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এই ঘটনাকে উল্লেখ করিয়া তাহার কংগ্রেস-অধ্যক্ষতা ত্যাগ করিয়াছেন ও কংগ্রেসের অধীনে কোনও পদই গ্রহণ না করিয়াই স্বদেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে থাকিবেন এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—তাহার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বপক্ষীয় ব্যক্তিগণও স্ব স্বপদ ত্যাগ করিয়াছেন। এই পদ লইয়াই যদি সকল গোলমাল হইয়া থাকে, তবে এ বিবাদের বিরাম হইবে। কিন্তু স্বদেশ সেবার কার্য্যেতে এক দল কেবল সরিয়া থাকিলে, দলাদলির বীজ থাকিয়াই যাইবে। একার্য্যে মিলনই আবশ্যক কোনওরূপ পার্থক্য নহে।

শাস্ত্র মানিব কেন ?

(সত্য-শাস্ত্র-বিজ্ঞান-বিচার সমন্বয়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪৪। **ব্রহ্মময় তেজোময় জগৎ।**—হিন্দুশাস্ত্র বলেন এই দৃশ্যমান জগৎ পরব্রহ্মের বিকাশ মাত্র।

সুবর্ণাৎজায়মানস্য সুবর্ণত্বং চ শাশ্বতম্।
ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বং চ তথা ভবেৎ ॥ ৮০ ॥

সুবর্ণ হইতে নানাপ্রকার ভূষণ হয়। সেই ভূষণ সুবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে—সুবর্ণের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিপরিগ্রহমাত্র। সেইরূপ এই জগৎ পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল পরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিমাত্র।

যথা তরঙ্গ কল্লোলৈর্জলমেব স্ফুরত্যলম্।
ঘটনাম্না যথা পৃথ্বী পটনাম্না হি তন্তবঃ॥
জগন্নাম্না চিদাভাতি সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম্॥ ৮১ ॥

যেমন তরঙ্গ জলের বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, যেমন মৃত্তিকাই ঘটনামে ও তন্তু সকল পটনামে পরিচিত হয়, তেমনই সেই চিৎস্বরূপ ভগবানই জগৎ নামে পরিচিত। এই জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান সেই সমস্তই পরব্রহ্মের মূর্ত্তিমাত্র।

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ॥ ৮২ ॥

এই বিশ্ব সেই পরমাত্মা ভিন্ন কিছুই নহে। তিনিই প্রভু ঈশ্বর ও বিশ্বাত্মা। তিনি নিজেই নিজেকে সর্জন করেন, নিজেই নিজকে ত্রাণ করেন, তিনি নিজেই নিজের চুরি করেন। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টরক্ষক ও রক্ষিত, তথা অপহর্ত্তা ও অপহৃত সকলই এক, পরমাত্মার রূপান্তর মাত্র।

স সর্ব্বনামা স চ বিশ্বরূপোনিষেধ নির্বাণ সুখানুভূতি ॥৮৩॥

এই জগতে প্রত্যেক বস্তুতে তিনি নানারূপে বিদ্যমান। তিনিই সকল বস্তুর নাম ও রূপ ধরিয়াছেন। অথচ তিনি কিছুই নহেন, এমনই তাঁহার মায়া। নেতি নেতি (ইহা নহে ইহা নহে) বলিতে বলিতে যখন সকল নিষেধই বিলয় প্রাপ্ত হয় (নিষেধ নির্বাণ), যখন বাক্য মন হার মানে, সেই অবস্থায় যাঁহাকে সুখে অনুভব করা যায় সেই বস্তুই তিনি।

নববিজ্ঞান এ সব তথ্যের সন্ধানই পায় নাই। তবে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাতেই দেখিতে পাইয়াছে জগতে একটী মাত্র পদার্থই আছে। ইহাকে কখন হাইড্রোজেন কখনও তড়িৎ-শক্তি কখনও তেজ বলিয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্র বলেন ভর্গো বা তেজ হইতেই জগৎ সৃষ্ট। যখন এই জগৎ পরব্রহ্মের বিকাশমাত্র তখন এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়। হিন্দুশাস্ত্র স্পষ্টতর ইহা বলিয়াছেন।

সূর্য্যাদ্ভবন্তি ভূতানি সূর্য্যেণ পালিতানি তু।
সূর্য্যে লয়ং প্রাপ্নুবন্তি যঃ সূর্য্যঃ সোহমেব চ ॥ ৮৪ ॥
উদয়ে সৃষ্টিকর্ত্তাসৌ মধ্যাহ্নে তু মহেশ্বরঃ।
অস্তমানে স্বয়ং বিষ্ণুর্ব্রহ্মরূপো দিবাকরঃ ॥ ৮৫ ॥

সূর্য্য হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়। সূর্য্যের দ্বারা পালিত হয়। সূর্য্যেই সংহার প্রাপ্ত হয়। যিনি সূর্য্য তিনিই আমি পরব্রহ্ম। উদয়কালে তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, মধ্যাহ্নে তিনিই মহেশ্বর, ও অস্তকালে তিনিই বিষ্ণু। সূর্য্যই ব্রহ্মরূপ।

নব্যনববিজ্ঞান এ বিষয়ে অপার সংশয়সাগরে নিমগ্ন। তথাপি তাহার মতে জাগতিক তেজোবিকিরণই সৃষ্টির কারণ।

৪৫। **মনোময় জগৎ**।—হিন্দুশাস্ত্র বলেন মন হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

মন এব জগৎসর্ব্বং মন এব হি জীবকঃ।
মন এব হি কালশ্চ মনোহঙ্কার এব চ ॥৮৬॥
মন এব হি সংসারো মন এব মলং তথা।
মন এব মহদ্দুঃখং মন এব মহারিপুঃ ॥৮৭ ॥
মনসা ভাব্যমানো হি দেহতাং যাতি দেহকঃ।
দেহ বাসনয়া মুক্তো দেহধর্ম্মৈর্ন-লিপ্যতে ॥৮৮ ॥
মনঃ সৃজতি কর্ম্মাণি মনো লিপ্যতি পাতকৈঃ।
মনশ্চেদুন্মনীভূয়াৎ ন পুণ্যং ন চ পাতকম্ ॥ ৮৯ ॥

মনই সমস্ত জগৎ, মনই জীব, মনই কাল ও মনই অহঙ্কার। মনই সংসার, মনই পাপ, মনই মহৎ দুঃখ ও মনই মহাশত্রু। মনের দ্বারা ভাবিতে ভাবিতে দেহী দেহত্ব প্রাপ্ত হয়। দেহের বাসনা ত্যাগ করিলে দেহী দেহধর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ কর্ম্মের ফলভাগী হয় না। মনই কর্ম্ম সর্জন করে, মনই পাপে লিপ্ত হয়। কাযেই মন যদি উন্মনীভূত হয়, অর্থাৎ মন যদি দেহচিন্তা ও বাসনা ত্যাগ করিয়া আত্মাতে সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে পুণ্যও থাকে না পাপও থাকে না।

জীন্স্ বলেন—মনই জগৎ সর্জন করিয়াছে বলিলে পদার্থ-বিদ্যার অনেক কূটতত্ত্বের শঙ্কা সমাধান হয়। তাহা হইলে বুঝা যায়, কিরূপে ঈথার স্বয়ং জাগতিক সকল কার্য্যের আধার হইয়াও গণিতের কল্পনামাত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে ও ভর্গঃ জগতের একমাত্র মূলপদার্থ হইয়াও গণিত-কল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। সেইরূপ ইলেক্ট্রন চিন্তাপ্রসূত ও কালই চিন্তাকার্য্য বলিলে প্রকৃত তথ্যের সন্নিকট হওয়া যায়। আমাদের সন্দেহ হয় ব্যাপক মনই (পরমাত্মা বলিতে নাই) জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে ও জগৎকে পরিচালিত করিতেছে। এডিংটনও অস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন মন হইতেই জগৎসৃষ্ট। লাইবনিট্‌স্ বলেন পদার্থ আত্মার নিবাসভূমি।

৪৬। **মায়াময় জগৎ**।—হিন্দুশাস্ত্র বলেন জগৎ মায়ার রচনা। এই সংসার মায়াময়। মায়ার স্বরূপ বৈপরীত্য।

যুগপৎ বিপরীতত্বং মায়ায়া একলক্ষণম্ ॥ ৯০ ॥

একই সঙ্গে দুইটি একেবারে বিপরীত বস্তুর সম্ভাবনাকেই মায়া বলে। ইহাই মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। অবাঙ্মনসগোচরম্।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥ ৯১ ॥

যাহা হইতে বাক্য ও মন বিফলকাম হইয়া ফিরিয়া আসে, অর্থাৎ যাহা বাক্য ও মন ধারণা করিতে অক্ষম। মনুষ্যের বুদ্ধি যাহা ধারণা করিতে পারে তাহা মায়া নহে। যাহা ভাল তাহাই মন্দ, যাহাই জ্ঞান তাহাই অজ্ঞান. যাহাই কঠিন তাহাই কোমল, ইহাই মায়ার কার্য্য। ইহাই শাস্ত্র স্থানে স্থানে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এই অচিন্ত্য মায়া বশেই যিনিই বিদ্যা তিনিই অবিদ্যা—যিনি ভাবকারিণী তিনিই অভাবকারিণী—যিনিই লক্ষ্মী তিনিই অলক্ষ্মী—বস্তুর নাশ হইলেও নাশ হয় না—জ্ঞানী ও মূঢ় সমান—জড় ও ত্রিগুণাতীত সমান—দিবা ও রাত্র এক—জীব সুখের জন্য লালায়িত বলিয়াই সুখ চাহে না—ও আপনই পব হয় ও পরই আপন হয়। তজ্জন্যই শাস্ত্র বলেন—

নিদানভূতা বিশ্বস্য বিদ্যাঽবিদ্যেতি গীয়তে।
ভাবাভাব স্বরূপা সা জগদ্ধেতু সনাতনী ॥ ৯২ ॥

সেই নিত্যা জগদম্বাই জগতের কারণ। তিনিই বিশ্বের আদি কারণ। তিনিই বিদ্যা ও তিনিই অবিদ্যা। তিনিই ভাব ও তিনিই অভাব।

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথাঽলক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে ॥ ৯৩ ॥

সেই আদ্যা প্রকৃতিই লক্ষ্মী। আবাব তিনিই অলক্ষ্মী। মনুষ্যের উন্নতির কালে (ভবকালে) তিনিই লক্ষ্মী ও কল্যাণবৃদ্ধি করেন। নাশকালে (অভাবে) তিনিই অলক্ষ্মী হইয়া বিনাশরূপিনী হন।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ৯৪ ॥

উহা পূর্ণ ও ইহাও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে শূন্য না থাকিয়া পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ ॥ ৯৫ ॥

এই জগতে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা মূঢ় ও অজ্ঞান আর এই জগতে যিনি বুদ্ধির পরপারে উপনীত—এই দুইজনেরই অবস্থা এক। ইহারা দুইজনেই সুখপ্রাপ্ত হন। যাহারা এই দুইজন হইতেই পৃথক, যাহারা সম্পূর্ণ জ্ঞানী কি সম্পূর্ণ অজ্ঞান নহে তাহারাই কষ্ট পায়।

দ্বাবেব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুতৌ।
যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ ॥ ৯৬ ॥

দুইজনে চিন্তামুক্ত হইয়া পরমানন্দ সাগরে ভাসিতে থাকেন—যিনি বিমূঢ় অতএব জড় ও বালস্বভাব আর যিনি ত্রিগুণাতীত।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৯৭॥

যাহা সকল জীবের পক্ষে রাত্রি সংযমী পুরুষ তাহাতেই জাগিয়া থাকেন আর যে বিষয়ে সকল জীবই জাগ্রত জ্ঞানী মুনির তাহাই রাত্র। যাহাই বাসনাবদ্ধ জীবের রাত্র তাহাই সংযমী পুরুষের দিবা, আর যাহাই বাসনাবদ্ধ জীবের দিন তাহাই সংযমী মুনির রাত্র।

সুখাসুধ্যাননিরতা জনা মায়াবিমোহিতাঃ।
যথার্থ সুখহেতুং তং ন ধ্যায়ন্তি হৃদীশ্বরম্॥ ৯৮॥

জনগণ অনুক্ষণ সুখচেষ্টায় ব্যাকুল। তথাপি মায়ায় বিমোহিত হইয়া দুঃখকেই সুখ মনে করে ও সুখকেই দুঃখ মনে করে। অতএব যথার্থ সুখের একমাত্র কারণ ভগবান্‌কে ধ্যান করে না। অথচ শ্রীভগবান্ জীবের সুখলভ্য হইয়া তাহার নিজের হৃদয়মন্দিরেই বাস করিতেছেন

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরং আত্মানমেব চ।
আত্মা পুনর্বহির্মৃগ্য অহোঽজ্ঞ জনতাঽজ্ঞতা॥ ৯৯॥

হে ভগবন্! তুমি জীবের আত্মা। কিন্তু জীব তোমাকেই পর মনে করে। আর যে পর তাহাকেই জীব আপন মনে করে। এই ভ্রান্তিবশে জীব স্বহৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত ভগবান্‌কে বাহিরে খুঁজে। অজ্ঞজনের অজ্ঞানই ধন্য!

জগৎ মায়াময়। বৈপরীত্যই উহার প্রাণ। স্থূলধী বৈজ্ঞানিকগণ সূক্ষ্মবুদ্ধি পরাঙ্মুখ হইয়া ইহা দেখিয়াও দেখিলেন না। তাই বৈজ্ঞানিকগণ যখন যাহা সুবিধা পাইয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন। এই মায়ার সন্ধান পাইলে তাহাদের সকল ধাঁধাই কাটিয়া যাইত—সত্যের সূক্ষ্মাবরণ বিদূরিত হইত ও বৈজ্ঞানিক পতঙ্গ সত্যালোকে প্রবেশ লাভ করিয়া মনের সকল অন্ধকার দূর করিতে পারিত। এই মায়ার সন্ধান নাপাইয়া বৈজ্ঞানিকগণকে বলিতে হইয়াছে—ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থ আছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মূল পদার্থ নাই, সব পদার্থই হাইড্রোজেনের উপাদানে গঠিত। মূল কথা পদার্থের দূরে থাকুক, পদার্থের অস্তিত্বই নাই কেন না দ্রব্যাণু পদার্থ কম্পন মাত্র। অথচ পদার্থ ও কম্পন ভিন্ন পদার্থ একবার দ্রব্যাণু হয় ও একবার কম্পন হয়। পদার্থ ও তেজোবিকিরণ এক। পদার্থ তত্ত্বানুসন্ধান করিলে অপরিপাটির চরম লক্ষিত হয়। কিন্তু এই চরম অপরিপাটীরই একটি নিজস্ব পরিপাটি আছে। ইত্যাদি।

মনে মনে সন্দেহ উদিত হইতে পারে জগৎ মায়াময়, যুগপৎ বিপরীতত্বই মায়ার স্বরূপ ইহা জানিয়াই বা লাভ কি? যদি স্বীকার করা যায় ইহাতে কোন লাভ নাই, তথাপি যে সত্যের আদর নবজ্ঞানে সর্ব্বত্র বিঘুষ্ট, সেই সত্যও ত জানা যাইবে? ইহাই পরম লাভ। হিন্দুশাস্ত্রে একবাক্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে অজ্ঞানই সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ ও জ্ঞানই সেই পাশচ্ছেদনের একমাত্র অসি। কাযেই জ্ঞানই যে একমাত্র বাঞ্ছিতব্য তাহাতে আর সংশয় কি? জ্ঞানাভাবে এই অতুলা হিন্দুশাস্ত্র সনাতন সত্যের আকর হইয়াও অবোধ্য বৈপরীত্যের আধার বলিয়া প্রতীত হয়।

হিন্দুশাস্ত্র বলেন, মনুষ্যের ত কোন্ কথা, জীবমাত্রের চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে। অথচ সেই হিন্দুশাস্ত্র বলেন চণ্ডালাদি বর্ণবাহ্য অস্পৃশ্য জাতির কথা দূরে থাকুক ব্রাহ্মণ জাতিকেও স্পর্শ করিতে নাই।

প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ভূমৌ আশ্বচাণ্ডাল গোখরম্॥ ১০০॥

কুক্কুর চণ্ডাল গর্দ্দভ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জীবকে ভূমিতে নিপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। অথচ শাস্ত্র সেই সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন হে নর সঙ্গভয়ে সদাই ভীত ও ব্যস্ত হইও।

আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ শয়নাৎ সহ ভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তি হি পাপানি তৈল বিন্দুরিবাম্ভসা॥ ১০১॥

কাহারও সহিত আলাপ করিলে তাহার পাপ তৎক্ষণাৎ আসিয়া আক্রমণ করে ও শরীরে বিশেষ প্রবেশলাভ করে। সেইরূপ কাহারও গাত্রস্পর্শ করিলে পাপ হয়, একসঙ্গে শয়ন করিলে পাপস্পর্শ করে ও একসঙ্গে ভোজন করিলে পাপবিদ্ধ হইতে হয়। যেমন তৈল জলের সহিত স্বভাবতঃ মিশে না। তথাপি অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিতে করিতে তৈল তাহার প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়। মনুষ্য আপনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেব কোনও প্রকারে সঙ্গ করিলে লাভবান্ হয় ও অপকৃষ্ট লোকের সঙ্গদোষে তাহার নিজ প্রকৃতিই দূষিত হয়।

সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্ত্যেব হি জীবিনাম্।
তস্মাৎ সতাং হি সংসর্গং সন্তো বাঞ্ছন্তি সন্ততম্॥ ১০২॥

কি মনুষ্য, কি পশু সকল প্রাণীরই সঙ্গগুণেই গুণ ও দোষ সমুৎপন্ন হয়। অতএব সৎপ্রকৃতি পুরুষ সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গ কামনা করেন।

অহং মুনীনাং বচনং শৃণোমি শৃণোতি রাজন্ স গবাশ বাক্যম্।
ন তস্য দোষো ন মদ্গুণো বা সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি॥ ১০৩॥

সঙ্গগুণ এমনই প্রবল যে পশুপ্রকৃতিও তাহার বেগ সহ্য করিতে পারে না; মনুষ্যের ত কথাই নাই। একটি টিয়াপাখী মুনিদিগের সঙ্গ করিয়া ভগবদ্ গুণ কীর্ত্তন শিখে। আর একটি টিয়াপাখী কসাই সঙ্গবশে ধর মার কাট বলিতে শিখে। দ্বিতীয় শুকপক্ষীর পাষণ্ডপ্রকৃতি দেখিয়া রাজা তাহার নিধনাজ্ঞা দিলে প্রথম শুকপাখী বলিতেছে—হে রাজন্ আমি অহরহঃ মুনিদিগের বচন শুনি আর ঐ পক্ষী নিত্য কসাইয়ের কথা শুনে। ইহাতে তাহারও দোষ নাই, আমারও গুণ নাই। সংসর্গ হইতেই দোষগুণ উৎপন্ন হয়।

সঙ্গবেগ জীবমাত্রেরই সর্ব্বদা অসহ্য। মানুষের কথা দূরে থাকুক পশুপক্ষীর প্রকৃতিও সম্পূর্ণ সঙ্গপরতন্ত্র। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ সঙ্গবিভাবিত স্বরূপে অবস্থিত। এমন কি স্বয়ং ভগবানও স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ করিলে সঙ্গের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন না। উদ্দেশ্য মহৎ হইতে মহীয়ান্ হইলেও, সঙ্গপ্রভাব সর্ব্বত্র অপরিহার্য্য। তজ্জন্য স্বয়ং ভগবান্, ভরতরাজরূপে অবতীর্ণ হইয়া হরিণশিশুর প্রতি দয়া করিতে যাইয়াই মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অহং পুরা ভরতো নাম রাজা বিমুক্ত-দৃষ্ট-শ্রুত-সঙ্গবন্ধঃ।
ব্যাসক্তচিত্তোপি তথাহপ্রমেয়ে মৃগোভবং মৃগসঙ্গাদ্ধতার্থঃ॥১০৪॥

সা মাং স্মৃতির্মৃগদেহেঽপি বীর কৃষ্ণার্চ্চনপ্রভবা নো জহাতি।
অথো অহং জনসংগাদসংগো বিশঙ্কমানোঽবিবৃতশ্চরামি ॥ ১০৫

হে রহূগণ আমি সেই জগৎ বিশ্রুত ভরতরাজা। আমি দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের আসক্তিজনিত বন্ধন হইতে বিমুক্ত ও অপ্রমেয় ঈশ্বরে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত হইয়াও সেই অপ্রমেয় ঈশ্বরের দুর্ব্বিজ্ঞেয় মায়াবশে মৃগসঙ্গে বিনষ্ট পরমার্থ হইয়া মৃগ হইয়াছিলাম। হে বীব কৃষ্ণার্চ্চন প্রভাবে আমার স্মৃতি মৃগদেহেও বিনষ্ট হয় নাই। মৃগরূপ ত্যাগ কবিয়া এই ব্রাহ্মণদেহে যে সে স্মৃতি ত্যাগ কবে নাই ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি জীবন্মুক্ত নির্হেতুক একান্ত ভক্ত হইয়াও অল্পদিনের সঙ্গবশে সমস্ত হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। অতএব এই ব্রাহ্মণ জন্মে সেই কথা অনুক্ষণ স্মবণ করিয়া আমি মনুষ্যমাত্রেরই সঙ্গ হইতে ভীত ও চকিত হইয়া একাকী আত্মগোপন করিয়া বিচবণ কবি।

* সঙ্গেব শক্তি অপরিসীম। সঙ্গ কবিতে পাবে না এমন কার্য্যই নাই। সঙ্গেব অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তির প্রভাবে ঘোর পাপিষ্ঠও সাধুত্তম হয় ও পবম সাধুও স্খলিতপদ হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন। সঙ্গেব অপ্রতিহত প্রভাব জগতে ভেরীঘোষে বিঘোষিত কবিবাব নিমিত্তই ভগবদবতাব ভরতরাজা স্বয়ং মৃগসঙ্গে মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জীবমাত্রেবই কল্যাণ কামনায় নিজ কল্যাণ স্বেচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়া সাক্ষাদ্ ভগবন্মূর্ত্তি ভবতবাজা জীবকে ইহাই শিক্ষা দিলেন—জীব সাবধান! সাবধান! সঙ্গাপেক্ষা প্রবল কিছুই নাই। অসৎসঙ্গে অবতাব পুরুষেবও বক্ষা নাই। অতএব তুমি সৎসঙ্গ করিতে সদাই ব্যস্ত থাকিও ও অসৎসঙ্গকে জন্ম জন্মান্তবনির্ণাশিবিষজ্ঞানে সদাই সাবধানে বর্জ্জন করিও।

হিন্দুশাস্ত্রই মায়ার প্রকৃত মর্য্যাদা দিতে জানেন সেই জন্যই হিন্দুশাস্ত্র সর্ব্বত্র বৈপরীত্যময় হিন্দুশাস্ত্র একস্থানে যাহা বলিয়াছেন, অপরস্থানে ঠিক তাহার বিপরীত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে মায়ার স্বরূপ বৈপরীত্যেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। নতুবা যে অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য কলির জীবের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বুদ্ধিতে স্থান পায় তাহাও এই গভীব দুববগাহন শাস্ত্রপ্রণতাব বুদ্ধিব অগম্য, ইহা কেবল বাতুল প্রকৃতিই প্রতিপন্ন করিতে চাহে।

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ ১০৬ ॥

বিচারে কখনও সংশয় যায় না। বেদ পুরাণাদি সবই ভিন্ন ভিন্ন। এমন মুনিই নাই যাঁহাব মত অন্য মুনির মত হইতে ভিন্ন নহে। ধর্ম্মেব প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানীব হৃদয়কন্দরেই নিহিত ও লুক্কায়িত আছে। জ্ঞানীপুরুষ যে মার্গ অনুসবণ করেন তাহাই প্রকৃত মার্গ। ধর্ম্মের স্থূলতত্ত্ব শাস্ত্রপাঠে জানা যায়, সূক্ষ্মতত্ত্ব জানা যায় না। বৈপরীত্যসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক ধর্ম্মেব প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ধাব করা উন্মুক্তমায়াবরণ অনুভবী পুরুষ ভিন্ন কাহারও কার্য্য নহে।

হিন্দুশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট জ্ঞানার্জ্জনের উপায়েও মায়ার ছায়াপাত স্পষ্টই লক্ষিত হয়। জ্ঞানার্জ্জনের উপায় - ছোট হওয়া, জ্ঞান করা নহে।

জ্ঞানং তদেতদমলং দুরবাপমাহ
নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায়।
একান্তিনাং ভগবতস্তদকিঞ্চনানাং
পাদারবিন্দ রজসাপ্লুত দেহিনাং স্যাৎ ॥ ১০৭ ॥

এই অমল জ্ঞান দুষ্প্রাপ্য। নরগণের একমাত্র বন্ধু নারায়ণ, নারদকে নরগণের একমাত্র বন্ধু জ্ঞানে এই অলভ্য জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। এই অলভ্য জ্ঞানও সুলভে লাভ করা যায়, যদি নরগণ ভগবানের একান্ত ও অকিঞ্চন ভক্তগণের পাদারবিন্দরজে আপনাদিগকে আপ্লুত করেন। অহঙ্কারই জ্ঞানের একমাত্র প্রত্যবায়। যাঁহারা সেই অহঙ্কার বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া একেবারে অকিঞ্চন ও নিরভিমান হইয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীভগবানের পাদকমলে একনিষ্ঠ ভক্ত হইতে পারিয়াছেন। সেই অকিঞ্চন একান্ত ভক্তগণের শ্রীচরণে যাঁহারা আপনাদের অভিমান সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের চরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ধন্য হইতে পারিয়াছেন কেবল তাঁহাদেরই এই অমল-জ্ঞান অলভ্য হইয়াও সুলভ।

মায়ার বৈপরীত্য মনুষ্য জীবনে ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত। একটু দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেই অতি সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুধা হইলে ভোজনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শরীরের জন্য যত খানি প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত মাত্রায় সর্ব্বদাই ভোজন করিতে হয় যাহাতে অতিরিক্তাংশ মলরূপে ত্যাগ করিয়া দেহ স্বস্থ থাকিতে পাবে। একই সঙ্গে গ্রহণ ও ত্যাগ কর্ত্তব্য। সেইরূপ শরীরে যতখানি জল প্রয়োজন তাহাপেক্ষা অধিক জলপান করিতে হয়, যাহাতে অতিরিক্ত জল মূত্ররূপে বিসর্জ্জন করিয়া শরীর প্রকৃতিস্থ হইতে পারে। জীবন বড়ই প্রিয় ও মৃত্যু ভয়ঙ্কর। তথাপি কে না প্রত্যহ সেই নিদ্রারূপ মৃত্যুর জন্য লালায়িত হয়? সেইরূপ চলা ফেরা বসা দাঁড়ান সমস্তই বিপরীতগুণসম্পন্ন। এই মায়াময় সংসারে মনুষ্যজীবনের প্রত্যেক ঘটনায় মায়ার বৈপরীত্য ক্রীড়া করিতেছে।

৪৭। **নববিজ্ঞানে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ।**—নববিজ্ঞান বলে কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নিত্য। অতএব ভগবান নাই কিংবা থাকিলেও তিনি অশক্ত—ঢোঁড়া। এই কার্য্য কারণ সম্বন্ধের নিত্যত্বই নাস্তিকতার মূল। এই নিত্য সম্বন্ধের আশ্রয়েই নাস্তিকগণ বলে—নির্দ্দিষ্ট কারণে যখন সকল অবস্থাতেই নির্দ্দিষ্ট ফল, তখন ভগবান্ কিছুই করিতে পারেন না। যদি বল ভগবান্‌ইত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন। নাস্তিক বলিবে—তাহাতেই বা ক্ষতি কি? একবার সে সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া সম্বন্ধের নিত্যত্বের অনুরোধে তিনি ত আর উল্টাইতে পারিবেন না। একথা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক বুঝা যায়। কিন্তু নিত্যত্বের অনুরোধে নাস্তিকগণ কোন্ যুক্তি বলে ভগবান্‌কে উড়াইয়া দেয় ইহা বুঝা অবিকৃত বুদ্ধির কর্ম্ম নহে।

মূর্খত্বং নিতরাং শ্রেয়ঃ স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী ॥১০৮॥

স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর—সর্ব্বনাশের আকর। তাহার অপেক্ষা মূর্খত্ব লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ।

বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং নিহনিষ্যতি ॥ ১০৯ ॥

যিনি অল্পবেদজ্ঞ—অর্থাৎ যিনি চতুর্ব্বেদ ও উপনিষদ্‌সমূহ আদ্যোপান্ত সম্যক্ পাঠ করিয়াছেন কিন্তু

পুরাণ ও ইতিহাস পাঠ করেন নাই—বেদ তাহাকে ভয় করেন কেন না তিনি বেদের অর্থ সম্যক্ পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই ও কদর্থ করিয়া বেদকে বিপন্ন করিয়া তুলিবেন।

ধর্ম্মের এই ঘোর দুর্দ্দিনে উর্জ্জিত নাস্তিকতার অপ্রতিহত অভ্যুদয়ে, নাস্তিক চূড়ামণিগণ অপরিচ্ছিন্ন বিমুখতাসত্বেও না মানিয়া পারিল না—জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। তবে নববৈজ্ঞানিকগণ একবাক্যে বলিবার চেষ্টা করেন যে সৃষ্টিকর্ত্তা থাকিলেও এখন আর তাহার কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব কি করিয়া বিনষ্ট হইল তাহা নববৈজ্ঞানিকগণ ভাবিবারই অবসর পান না। সামান্ত বুদ্ধিতে ইহাই বুঝা যায়—আপন ইচ্ছায় ত্যাগ না করিলে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব নষ্ট হইতে পারে না, কেননা কর্ত্তা কাহারও পরতন্ত্র নহেন।

শ্রীভগবানের অশেষ কৃপাকটাক্ষে, কার্য্যকারণের নিত্যসম্বন্ধরূপ নাস্তিকতার মূলে, আজ নব্যনববিজ্ঞান বিষম কুঠারাঘাত করিয়াছে। প্ল্যাঙ্কের মাত্রামতের (Planck's quantum theory) ফলে আজ সেই নিত্যসম্বন্ধ, চিরকালের সিংহাসনচ্যুত হইয়া নব্যনববিজ্ঞানের দ্বারে ভিখারী। নব্যনববিজ্ঞানের অলিতে গলিতেও আজ এই নাস্তিক ধুরন্ধর স্থান পাইতেছে না। নব্যনববিজ্ঞান একবাক্যে স্থির করিয়াছে—কার্য্যকারণের নিত্য সম্বন্ধ নাই একই কারণ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হয় ও কখন কোন্ কার্য্য হইবে তাহারও স্থিরতা) Eddington Nature of the world and Nature) নাই।

যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের নিত্যত্বালম্বনে অন্ধ নাস্তিকগণ তাহাদের দুর্দ্দম্য নাস্তিক্য বিঘোষণের অবসর পাইয়াছিল, সেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধের নিত্যত্বের মূল উচ্ছিন্ন করিয়াও নব্যনববিজ্ঞান ক্ষান্ত হইল না। কোনও অদৃষ্ট কারণই কার্য্যকারণসম্বন্ধের অনিত্যত্ব ঘটাইতেছে ইহাও মানিতে বাধ্য হইয়াছে। ঈশ্বর আছেন, তাঁহার ইচ্ছায়ই জগৎ পরিচালিত হইতেছে, তাঁহার স্থূল ইচ্ছাই জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম ও তাঁহার বিশেষ ইচ্ছাই এই নিত্য প্রাকৃতিক নিয়মের অনিত্যত্ব ঘটাইতেছে—এই সব সত্য হইলেও নব্যনববিজ্ঞানের মানিতে নাই, তাই স্পষ্টাক্ষরে মানিতে পারে না। কিন্তু নব্যনববিজ্ঞানের কথার ইহা ভিন্ন আর অর্থই হয় না।

কার্য্যকারণসম্বন্ধের নিত্যত্ব উড়াইয়া দিয়াও নব্যনববিজ্ঞানের ভিতরে ভিতরে সেই নিত্যত্বের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াই গেল। প্ল্যাঙ্ক বলেন যে আমাদের যদি হাত থাকিত ত আমরা অনিত্যত্ব পরিহার করিয়াই কার্য্যকারণসম্বন্ধের নিত্যত্বই বাছিয়া লইতাম। এডিংটনও এই কথাই বলেন। এখন দেখা যাক্ হিন্দুশাস্ত্র কার্য্যকারণ সম্বন্ধে কি বলেন।

৪৮। **হিন্দুশাস্ত্রে কার্য্যকরণ সম্বন্ধ।**—হিন্দুশাস্ত্র জানেন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য ও ভগবদিচ্ছায় অনিত্য।

কারণেন বিনা কার্য্যং নোদেতি। ১১০ ॥

কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না।

কারণাচ্চ সদোৎপত্তিঃ নিরোধস্ত্বহ্যকারণঃ।
কালগত্যা যথাতীতঃ স্যাদেব কারণং বিনা ॥ ১১১ ॥

কারণ হইতেই সর্ব্বদা কার্য্যের উৎপত্তি হয়। কার্য্যের নিবৃত্তি কিন্তু অকারণ অর্থাৎ কারণ বিনাই হয়।

যথা কারণ ব্যতিরেকে কালগতিতেই বর্ত্তমান অতীত নামে অভিহিত হয়। জগতে যখন যাহা ঘটে তাহার কারণ থাকিবেই। সে কারণ অনেক সময়ই বুঝা যায় না। তাই বলিয়া অকারণে কোনও বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য। কিন্তু মায়াবশে নিত্য হইয়াও অনিত্য। নিত্য কার্য্যকারণ সম্বন্ধকেই প্রাকৃতিক নিয়ম বলে। ঈশ্বরেচ্ছায় এই নিত্য নিয়মই অনিত্য হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

মদ্ভয়াদ্ বাতি বাতোয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি-র্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ॥ ১১২॥

আমারই ভয়ে আমারই শাসনে আমারই আজ্ঞায় পবন বায়ু দেন, সূর্য্য উত্তাপ দেন, ইন্দ্র বৃষ্টি দেন, অগ্নি দহন করেন ও যম জীবগণকে দণ্ডিত করেন। ইহাই নিত্য নিয়ম। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে পারেন না (মদ্ভয়াৎ)। শ্রীভগবানের ইচ্ছাধীন হইয়াও ইঁহাদের সততই কার্য্য করিতে হয়। এই কারণেই অগ্নির দাহিকাশক্তি আছেও বটে নাইও বটে। সামান্যতঃ অগ্নির দাহিকাশক্তি থাকে। কেননা ইহাই শ্রীভগবানের সামান্য আজ্ঞা। কখন কখন শ্রীভগবান সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে চাহেন। তখন অগ্নির দাহিকাশক্তি থাকে না। সকল প্রাকৃতিক নিয়মের ইহাই স্বরূপ—খাটে খাটে না, হয় হয় না, নিয়তানিয়ত। বায়ু সূর্য্য প্রভৃতির ন্যায় সকল বস্তুর স্বরূপই নিয়তানিয়ত।

বিষায়তেঽমৃতং ক্কত্র বিষং চাপ্যমৃতায়তে।
বিষত্বং অমৃতত্বং চ জায়তে হীশ্বরেচ্ছয়া॥ ১১৩॥
ঈশ্বরস্য বশে সর্ব্বং চরাচরমিদং জগৎ।
কটাক্ষেণ বিভোস্তস্য স্বরূপেণাধিতিষ্ঠতি॥ ১১৪॥

স্থান বিশেষে অমৃতই বিষবৎ আচরণ করে ও বিষই অমৃতবৎ আচরণ করে। বিষের বিষত্ব ও অমৃতের অমৃতত্ব ঈশ্বরেচ্ছাতেই সাধিত হয়। এই চরাচর জগৎ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বশে। সেই পরমেশ্বরের কটাক্ষবশেই বস্তুমাত্র স্বরূপে অধিষ্ঠিত। শ্রীভগবান বিষকে বিষরূপে ও অমৃতকে অমৃতরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। কাযেই বিষ, বিষই থাকে ও অমৃত অমৃতই থাকে। বিষ কখনও অমৃত হয় না ও অমৃত কখনও বিষ হয় না। কেবল ভগবদিচ্ছায় বিষ ও অমৃত অন্যথা আচরণ করে মাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক বস্তুই সামান্যতঃ একরূপ আচরণ করে ও ভগবদিচ্ছায় অন্যথা আচরণ করে। ইহাই বস্তুর স্বরূপ।

মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভীভবতি বন্ধনে॥ ১১৫॥

গোদোহনকালে বাছুরকে তাহারই মাতার পায়ে বাঁধা হয়। তখন মাতৃ- জঙ্ঘাই সেই বৎসকে বাঁধিবার জন্য স্তম্ভরূপে কল্পিত হয় মাত্র। মাতৃজঙ্ঘা, জঙ্ঘাই থাকে স্তম্ভ হয় না। তথাপি কালবশে স্তম্ভের ন্যায় আচরণ করে।

এই স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় ঈশ্বরের বশে ও সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টিতেই স্বরূপে অধিষ্ঠিত। এক কথায় প্রত্যেক বস্তুর ভগবদিচ্ছায় উৎপত্তি, ভগবদিচ্ছায়

স্থিতি ও ভগবদিচ্ছায় লয় হয়। তাহার কার্য্যও একমাত্র ভগবদিচ্ছার উপর নির্ভর করে। শ্রীভগবান্ সর্ব্বকারণকারণ। সেই আদিকারণ হইতেই সামান্যকারণ অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মরূপকার্য্য উৎপন্ন হয়। পুনশ্চ সেই সামান্যকারণ বা প্রাকৃতিক নিয়ম হইতেই প্রাকৃতিক কার্য্যের উৎপত্তি। এই প্রাকৃতিক কার্য্য সামান্যকারণবশে সামান্যভাবে নিত্য ও আদিকারণবশে অনিত্য। এক কথায় কার্য্যকারণসম্বন্ধ স্থূলতঃ নিত্য সূক্ষ্মতঃ অনিত্য।

৪৯। জীব স্বতন্ত্র কি পরতন্ত্র।—ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, আদি কারণ। সৃষ্ট জীব তাঁহার কার্য্য। কার্য্য কারণসম্বন্ধের নিত্যত্ব হইতে জীবের স্বাতন্ত্র্যাভাব বা পারতন্ত্র্য স্পষ্টই সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর স্বতন্ত্র—জীব পরতন্ত্র। জীব সকল বিষয়ে সকল সময়ে সকল প্রকারে ঈশ্বরের পরতন্ত্র। তাহার স্বাতন্ত্র্যের গন্ধমাত্রও নাই। ইহাই শাস্ত্রে সর্ব্বত্র বিঘুষ্ট।

যথা দারুময়ী নারী যথা যন্ত্রময়োমৃগঃ।
এবং ভূতানি মঘবন্ ঈশতন্ত্রানি বিদ্ধি ভোঃ॥ ১১৬॥

বৃত্রাসুর বলিতেছেন—হে ইন্দ্র জানিও যেরূপ কাঠের পুতুল, যেরূপ পাশবদ্ধ মৃগ, তদ্রূপ সৃষ্ট পদার্থমাত্রই ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বশে।

বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণং তূলং রজাংসি চ।
সংযোজ্যাক্ষিপ্যতে ভূয়ঃতথা ভূতানি ভূতকৃৎ॥ ১১৭॥
লোকাঃ সপালা যস্যেমে শ্বসন্তি বিবশা বশে।
দ্বিজা ইব শিচাবদ্ধা স কাল ইহ কারণম্॥ ১১৮॥

বায়ু যেমন মেঘসমূহ, তৃণ তূলা ও ধূলিসমূহকে একত্রিত করে ও পুনরায় দূরে নিক্ষেপ করে, সৃষ্টিকর্ত্তাও সেইরূপ ভূতগণকে একত্র করিয়া পৃথক করেন। সামান্য ভূতগণের কোন্ কথা দিক্‌পালগণসহ সমস্ত জগতই জালবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় যাঁহার বশে বিবশ হইয়া জীবন যাপন করে, সেই ভগবানই সমস্ত কার্য্যের কারণ।

যুযুৎসতাং কুত্রচিদাততায়িনাং
জয়ঃ সদৈকত্র ন বৈ পরাত্মনা
বিনৈকমুৎপত্তিলয় স্থিতীশ্বরং
সর্ব্বজ্ঞমাদ্যং পুরুষং সনাতনম্॥ ১১৯॥

অস্ত্রশস্ত্রধারী যোদ্ধাগণের মধ্যে বিজয় সর্ব্বদা একপক্ষেই হয় না। সামান্যতঃ প্রবল পক্ষের জয় ও দুর্ব্বলপক্ষের পরাজয় হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা হয় না। কখনও কখনও দুর্ব্বলপক্ষেরও জয়লাভ হইয়া থাকে ও প্রবল পক্ষই পরাজিত হয়। ইহার কারণ এই যে উভয় পক্ষই ঈশ্বরের অধীন ও তাঁহার ইচ্ছাতেই জয় পরাজয় হয়। পরতন্ত্র জগতের বৃত্তি, কখনই একমুখী হইতে পারেনা। মায়াবশেও জয় পরাজয়ের বিপর্য্যাস ঘটিবেই। বলা বাহুল্য যে সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, আদি ও সনাতন পুরুষ সেই বিপর্য্যাস নিয়মের অধীন নহেন। তিনি পরমেশ্বর ও স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁহার জয় সর্ব্বত্র।

কার্য্যকারণসম্বন্ধ নিত্য ও অনিত্য। এই কার্য্যকারণসম্বন্ধের নিত্যত্ব হইতে জীবের

অচিৎবৎ পারতন্ত্র্য যেরূপ সিদ্ধ হয়, অনিত্যত্ব হইতে জীবের স্বাতন্ত্র্যও ঠিক সেইরূপ প্রতিপন্ন হয়। মায়ার প্রভাবে এই সম্পূর্ণ পরতন্ত্র জীবও স্বতন্ত্র—পারতন্ত্র্যের ও স্বাতন্ত্র্যের এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। শাস্ত্র ইহা ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১২০ ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসসি শাশ্বত ॥ ১২১ ॥

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর অন্তর্যামিভাবে সকল ভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সকল ভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় চালিত করিতেছেন। হে ভারত কায়মনে বাক্যে তাঁহারই শরণ লও। তাঁহার কৃপায় পরম শান্তি পাইবে ও নিত্যধামে যাইতে পারিবে। যদি জীব সম্পূর্ণ পরাধীন হইত তাহা হইলে 'শরণ লও' এই কথা নিরর্থক হইত। যন্ত্রারূঢ় ও শরণং গচ্ছ একই সঙ্গে বলিয়া শ্রীভগবান্ মায়ার স্বরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যুগপৎ বিপরীতত্বম্। মনুষ্যমাত্রেই সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা শ্রীভগবানের অচিৎবৎ পরতন্ত্র সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় মনে রাখিয়া তাঁহারই মায়ার মর্য্যাদা দিবার জন্য স্বতন্ত্রবৎ প্রাণপণে সকল কার্য্যই করিতে হয়। এইরূপ করিলে পারতন্ত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য উভয়েরই মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। পুনশ্চ পারতন্ত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে নিরভিমান কর্ত্তৃত্বের উদয়ে তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মী নহেন—তিনি কর্ম্ম করেন কিন্তু ফলভাগী হন না।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১২২ ॥

যিনি পরব্রহ্মের উপর কর্ম্মভার ন্যস্ত করিয়া আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক নিঃসঙ্গভাবে কর্ম্ম করেন তিনি কদাচ পাপে লিপ্ত হন না—কর্ম্ম করিয়াও ফলভোগী হন না। যেমন পদ্মপত্র জলের ভিতর সমস্ত ক্ষণ থাকিলেও তাহার গায়ে জল লাগে না। সংসারী মনুষ্য পদ্মপত্রের ন্যায় পারতন্ত্র্য সাগরে অবস্থিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবে ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধিস্তস্য ন লিপ্যতে।
কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতো বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১২৩ ॥

যাঁহার অহঙ্কার নাই, যাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই তাঁহার বুদ্ধি সেই কর্ম্মের ফলে লিপ্ত হয় না। তিনি কর্ম্ম করুন বা নাই করুন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলে।

৫০। **কর্ম্মফল অপ্রতিক্রিয়।**—মনুষ্য সর্ব্বদাই কর্ম্ম কর্ম্ম করিবার জন্য ব্যস্ত। কর্ম্মই মনুষ্যের প্রাণ।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ ॥ ১২৪ ॥

কেহ ক্ষণমাত্রও কদাচ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহাকেই পুরুষকার বা পৌরুষ বলে। পুরুষস্য কারঃ (কর্ম্ম) ইতি পুরুষকারঃ। পুরুষস্য ইদং ইতি পৌরুষম্। মনুষ্যকৃত কর্ম্মমাত্রেরই ফল আছে। এই কর্ম্মফল ভোগ করিলেই ক্ষয় হইয়া যায়, ভোগ বিনা ক্ষয় হয় না।

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥ ১২৫॥

কৃতকর্ম্ম শুভই হউক বা অশুভই হউক—অর্থাৎ পুণ্যই হউক আর পাপই হউক—নিঃসন্দেহ ভোগ করিতেই হইবে। সৃষ্টি কোটি কোটি বার নাশ হইবে তথাপি অভুক্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইবে না।

এই কর্ম্মফলকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। ভুক্ত ও অভুক্ত বা ভোগ্য। জন্মজন্মান্তর-র্জ্জিত কর্ম্মফলই অভুক্ত বা ভোগ্য কর্ম্মফল। এই অভুক্ত কর্ম্মফল দ্বিবিধ—সঞ্চিত ও প্রারব্ধ। মনুষ্য জন্মজন্মান্তরে যত কর্ম্মরাশি সঞ্চয় করে তত ভোগ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে অতএব জন্মকালে সঞ্চিত কর্ম্মফলরাশির কণামাত্র গ্রহণ করিয়া জীব জন্ম পরিগ্রহ করে। সঞ্চিত কর্ম্মফলরাশির এই কণাকেই প্রারব্ধ কহে।

এই প্রারব্ধবশেই জীবের জন্ম হয়। যদি শ্রীভগবানের অশেষ কৃপায় দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায় তাহা হইলে সেই পুরুষ মুক্তিলাভ করে, কেন না সঞ্চিত কর্ম্মাভাবে তাহার আর পুনরায় প্রারব্ধ ভোগের অবসরই হইতে পারে না।

লব্ধা নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত।
যথা যোনি যথা বীজং স্বভাবেন বলীয়সা॥ ১২৬॥

জীব অব্যক্ত নিমিত্তবশে, অর্থাৎ প্রারব্ধরূপ জীবের অপরিজ্ঞাত কারণবশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ব্যক্ত হয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া অব্যক্ত হয়। বলবান্ পারব্ধ (স্বভাব) কর্ত্তৃক অবশে পরিচালিত হইয়া যাহাতে তাহার প্রারব্ধ সম্যক্ ভোগ হইয়া ক্ষয় হয় সেইরূপ পিতা (বীজ) ও মাতা (যোনি) আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করে। পুনশ্চ

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মনৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মনৈবাভিপদ্যতে॥ ১২৭॥

জীব কর্ম্মবশেই জন্মগ্রহণ করে ও কর্ম্মবশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুখ দুঃখ ভয় ও কল্যাণ একমাত্র কর্ম্মবশেই প্রাপ্ত হয়। তাহারঅন্যথা হয় না।

যে কর্ম্ম ফলপ্রসবোন্মুখ, যাহা ফল দিতে বসিয়াছে, যাহার ভোগ বিশেষ করিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহাকেই প্রারব্ধ বলে। প্র (প্রকর্ষেণ) আরব্ধং ইতি প্রারব্ধম্। অতএব এই প্রারব্ধ (কর্ম্মফল) সঞ্চিত হইতেও কোটিগুণ অনিবার্য্য। এই প্রারব্ধকেই শাস্ত্রে উৎসৃষ্টবাণ, অদৃষ্ট, ভাগ্য, দৈব, কাল, স্বভাব ও প্রকৃতি নামে অভিহিত করে। বাণত্যাগ করিলে পরে ফিরান যায় না। অনিবার্য্য বলিয়া প্রারব্ধকে উৎসৃষ্ট বাণ বলে। দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া সেই প্রারব্ধই সঞ্চিত হইতে ভাগ করিয়া ভোগের জন্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভাগ্য। কালবশে ফলপ্রসব করে বলিয়া প্রারব্ধকেই কাল বলিয়া থাকে। প্রারব্ধবশে জীব চালিত হয় বলিয়া প্রারব্ধই স্বভাব বা প্রকৃতি।

জ্ঞানোদয়াৎ পুরারব্ধং কর্ম্ম জ্ঞানান্ন নশ্যতি।
অদত্বা স্বফলং লক্ষ্যমুদ্দিশ্যোৎসৃষ্ট বাণবৎ ১২৮॥

জীবের জ্ঞান হইলেই জীব মুক্ত হয় কিন্তু তথাপি সেই দেহের প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না। সেই দেহের

ক্ষয়ের সহিত প্রারব্ধভোগ হইয়া ক্ষয় হইয়া যায় আর জ্ঞানদ্বারা সঞ্চিত নাশ হয়। অতএব দেহান্তে সকল কর্ম্মের নাশ দ্বারা জীব মুক্ত হয়। জ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধ নাশ হয় না কেন? উৎসৃষ্ট বাণ যেমন তাহার লক্ষ্যকে ভেদ করিবেই উৎসৃষ্ট বাণের ফল যেমন অপরিহার্য্য, তদ্বৎ উৎসৃষ্ট বাণরূপ প্রারব্ধ, ভোগ বিনা জ্ঞানেও ক্ষয় হয় না।

নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোয়ং অদৃষ্টপরমো জনঃ ॥ ১২৯ ॥

মনুষ্যমাত্রেই অদৃষ্টের সম্পূর্ণ বশে ও অদৃষ্টেই তাহার অবস্থিতি।

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন চ বিদ্যা ন পৌরুষম্ ॥ ১৩০ ॥

ভাগ্যই সর্ব্বত্র ফলে বিদ্যা কি পৌরুষ ফলে না।

স্বমেব কর্ম্ম দৈবাখ্যং বিদ্ধি দেহান্তরার্জিতম্ ॥ ১৩১ ॥

নিজের দেহান্তরার্জ্জিত কর্ম্মের নামই দৈব।

কালেন দৈবযুক্তেন বিদ্রাবিতমিদং জগৎ
প্রতিক্রিয়া ন যস্যেহ কুতশ্চিৎ কর্হিচিৎ কদা ॥ ১৩২ ॥

দৈবযুক্ত কাল দ্বারা এই জগৎ পরিচালিত। কোনও উপায়ে কোনও প্রকারে ও কোনও সময়ে উহার প্রতিকার হয় না।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহশ্চ নিরর্থকঃ
দুগ্ধসিক্তোপ্যথো নিম্বঃ কটুরেব যথাতথম্ ১৩৩

জীবগণ তাহাদের স্বভাব ছাড়ে না। তাহারা সর্ব্বদাই নিজ স্বভাব দ্বারা পরিচালিত। অতএব নিগ্রহ করা কি উপদেশ দেওয়া সমস্তই বৃথা। নিম দুগ্ধে যতই ভিজাও না কেন, যেমন কটু তেমনই থাকে।

জড় নববিজ্ঞানের জড়েই প্রীতি, চেতনে নহে। কাযেই জড় নববিজ্ঞান চেতনসম্বন্ধ-পরাঙ্মুখ। যেখানে চেতনের সম্বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছে, সেখানেও চেতনের চৈতন্যাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জড়াংশ গ্রহণ করিয়া জড় নববিজ্ঞান নিজের জড়ত্বেরই পরিচয় দিয়াছে। জীবন্ত প্রাণীর জীবন্ত কর্ম্ম জড় নববিজ্ঞানের বিষবৎ পরিহার্য্য। অতএব কর্ম্মফল প্রভৃতির কথা নব-বিজ্ঞানে থাকিতেই পারে না। তথাপি জড়জগতের প্রমাণ দ্বারা কর্ম্মফল প্রভৃতির যথাসম্ভব সমর্থন করা যাইতেছে।

পদার্থের নাশ নাই, (Conservation of matter) গুরুত্বের নাশ নাই (Conservation of mass) ও তেজের নাশ নাই (Conservation of energy)। এক কথায় বস্তুর নিত্যত্বই নববিজ্ঞানের প্রাণ। নব্যনববিজ্ঞান পদার্থ ও গুরুত্ব ভাল করিয়া স্বীকার করে না বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত তিনটী নিয়ম না মানিয়া জগতের মূলাধার তেজ, অবিনাশি এই মাত্র মানে। অবিনাশিত্ব উভয়েরই গতি। জড়জগৎ মাত্রই যখন অবিনাশী তখন কর্ম্ম বিনাশী কিরূপে হইবে? পুনশ্চ কর্ম্ম যখন অবিনাশী তখন অভুক্ত কর্ম্ম যে সঞ্চিত হইয়া তোলা থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদি বল কর্ম্ম অভুক্ত থাকে না, এই জীবনেই সকল কর্ম্ম ভোগ হইয়া যায়। ইহা মানা যায় না।

কেন না ইহার মিথ্যাত্ব সকল সময়েই দৃষ্টিগোচর হয়। সঞ্চিত কর্ম্ম অবিনাশী। অতএব তাহার ভোগের জন্য পুনর্দেহধারণ অবশ্যম্ভাবী।

যথাযোনি যথাবীজং স্বভাবেন বলীয়সা ।। ১২৬ ॥

জীব বলবৎ প্রারব্ধবশে প্রারব্ধভোগের অনুকূল বংশে জন্ম পরিগ্রহ করে।

৫১। প্রারব্ধনাশ ও জ্যোতিষ।—প্রারব্ধ বা অদৃষ্ট বা ভাগ্য বা দৈব সর্ব্বথা অপ্রতিহার্য্য হইলেও মায়াবশে উহা প্রতীকার্য্য, অর্থাৎ ভগবদিচ্ছায় উহা সহজেই কাটান যায়।

দৈবং পুরুষকারেণ শূরা ঘ্নন্তি সদোদ্যমাঃ ॥ ১৩৪ ॥

শূরগণ পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে নাশ করে। যাহারা সর্ব্বদাই উদ্যমশীল যাহাদের শাস্ত্রিত পুরুষকার কিছুতেই ব্যাহত হয় না তাহাদেরই শূর বলে। উচ্ছাস্ত্র পুরুষকারের আশ্রয়ে মনুষ্য শূর না হইয়া মূর্খ ও নাস্তিক হয়।

প্রতিকূলং তথা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে।
মঙ্গলাচার যুক্তানাং নিত্যং উত্থানশীলিনাম্॥ ১৩৫ ॥

প্রতিকূল দৈবও পৌরুষের দ্বারা বিনষ্ট হয়। যাঁহারা সদাচারযুক্ত, যাঁহারা জীবের মঙ্গল ভিন্ন আর কিছু চাহেন না ও সেই সঙ্গে সঙ্গেই সদাই কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করেন তাঁহাদেরই প্রতিকূল দৈব বিনষ্ট হয়। অন্য কাহারও নহে।

যদ্যপ্যত্র তু নিশ্চয়েন কথিতং নানাবিধং দুস্ফলম।
খেটানাংতথাপ্যুশন্তি মুনয়ো নানা প্রতিকারকম॥
দেব ব্রাহ্মণ পূজনেন গুরুবাক্ সম্পাদনেনান্বহম।
সৎসঙ্গেন হুতেন দানবসুনা দুষ্টং ফলং নোভবেৎ ॥১৩৬॥

যদিও জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহগণের (খেটানাং) নানাবিধ দুষ্ফল নিঃসন্দেহে কথিত হইল তথাপি মুনিগণ (সই নানাবিধ দুষ্ফলের) নানা প্রতীকার বলেন। সদা সর্ব্বক্ষণ (অন্বহং) দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা, গুরুবাক্য প্রতিপালন, সাধুসঙ্গ, হোম ও অর্থদানের দ্বারা জ্যোতিষকথিত দুষ্টফল বিনষ্ট হয়।

শ্রীহরি নিজেই সকল কর্ম্মের ফল দান করেন। তাঁহার ইচ্ছা বিনা কখনই কোন ফল হইতে পারে না। অতএব নিজের ও অপরের কল্যাণের জন্য যাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে প্রযত্নবান্ তাঁহারাই শ্রীহরির কৃপায় দৈবকে নাশ করিতে পারেন। কাযেই দৈব অপ্রতিহার্য্যও বটে, প্রতিকার্য্যও বটে। শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাকটাক্ষ বিনা প্রারব্ধ কখনও নাশ হয় না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

যস্মৈদত্তং চ যজ্জ্ঞানং জ্ঞানদাতা হরিঃ স্বয়ম
জ্ঞানেন তেন স স্তৌতি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ ১৩৭

শ্রীহরি যাহাকে যে জ্ঞান দিয়াছেন, কেন না শ্রীহরি ভিন্ন কেহই জ্ঞান দিতে পারেন না, সেই জ্ঞানের সাহায্যেই সে শ্রীহরির স্তব করে। জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী। তিনি জ্ঞান দেখেন না মনের ভাব দেখেন।

সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
অহং যোগস্য সাংখ্যস্য ধর্ম্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ১৩৮ ॥

ব্রহ্মবিদ্‌জ্ঞানিগণের সকল সিদ্ধির যোগের জ্ঞানের ও ধর্ম্মের আমিই একমাত্র হেতু একমাত্র কর্ত্তা ও একমাত্র প্রভু।

প্রারব্ধের অপ্রতিহার্য্যতাই জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল। এই জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে মনুষ্যজীবনের ভবিতব্যতার নির্ণয় হয়।

সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ। ১৩৯ ॥

জ্যোতিষ শাস্ত্র সাক্ষাৎ ফলবৎ। চন্দ্রসূর্য্য উহার সত্যত্বের সাক্ষী। অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রের দ্বারাই জ্যোতিষের ফল জানা যায়। প্রত্যক্ষফলদ জ্যোতিষ শাস্ত্রের সত্যতা অহংমদোদ্ধত পুরুষের নিকট প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখানে দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া দিগ্‌দর্শনমাত্র করা গেল। প্ল্যাঙ্ক বলিয়াছেন মনুষ্য জীবনে ভবিষ্যৎ বলা একেবারে অসম্ভব। তাহা যে একেবারে মিথ্যা তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সেই দিগ্‌দর্শনমাত্রের সাবধানে বিচার করিলে প্ল্যাঙ্কোক্তির মিথ্যাত্ব সহজেই অনুমিত হইবে।

৫২। **সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ**।—নববিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ অঙ্গীকারই করে না। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিষয়ই স্বল্প ও পরোক্ষ বিষয়ই অধিক।

প্রত্যক্ষং স্বল্পমেবস্যাৎ অপ্রত্যক্ষমনল্পকম্।
ইন্দ্রিয়াণি পরোক্ষাণি লভেরন্নাগমাদিভিঃ॥ ১৪০ ॥

প্রত্যক্ষ অল্পই হয়। অপ্রত্যক্ষ অধিক। যে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় সেই ইন্দ্রিয়গণই অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ। পরোক্ষ বিষয়ের উপলব্ধি আগম (শাস্ত্র) অনুমান ও যুক্তিদ্বারা হইয়া থাকে। নববিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরোক্ষ মানিতেই চাহেন না। তথাপি তাঁহাদিগকে অবিচারিতজ্ঞানের (Intuition) অস্তিত্ব মানিতে হইয়াছে। অবিচারিতজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নহে তর্কগ্রাহ্যও নহে। এই তর্কবিরহিত অবিচারিত জ্ঞানের উপরই বৈজ্ঞানিক জগতের আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত, বিচার ও তর্কের উপর নহে। টমসন্ ইহাকে ভগবদ্দত্ত (Inspired) জ্ঞান পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। G. P. Thomson—The Atom. অবিচারিত জ্ঞান স্বীকার করিয়া নববিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরোক্ষভাবে সূক্ষ্মতত্ত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন।

সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষপ্রমাণ শুনিলেই নববিজ্ঞানের অপূর্ব্ব সৃষ্টির কথা মনে পড়ে। যে বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে সেই অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ কিরূপে হইতে পারে ? অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মতত্ত্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণও একটী মায়ার বৈপরীত্য। ইহা কেবল শ্রীভগবানের কৃপাতেই সম্ভব হইতে পারে। এই সূক্ষ্মতত্ত্ব শ্রীহরি সূক্ষ্মভাবেই জানেন। কাযেই স্থূলদৃষ্টিতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

শ্রীগুরুং পরতত্ত্বাখ্যং ভাস্বন্তং চক্ষুরগ্রতঃ।
ভাগ্যহীনা ন পশ্যন্তি অন্ধাঃ সূর্য্যমিবোদিতম্॥ ১৪১ ॥

শ্রীগুরুই পরমতত্ত্ব। তিনি চক্ষুর অগ্রে দেদীপ্যমান। অতএব চক্ষুষ্মান্ লোকমাত্রেই ঘোর

অন্ধকারেও তাঁহাকে দেখিতে পান। কিন্তু যাহারা ভাগ্যহীন তাহারা আদৌ তাঁহাকে দেখিতে পান না। যথা অন্ধ সূর্য্য উদিত হইলেও দেখিতে পায় না।

উলূকস্য যথা ভানুরন্ধকারঃ প্রতীয়তে।
স্বপ্রকাশে পরানন্দে তমো মূঢ়স্য জায়তে ॥ ১৪২ ॥

পেচকের সূর্য্যই অন্ধকার বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ অহঙ্কারবিমূঢ় নরপেচকের স্বয়ং প্রকাশমান পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীভগবান্‌ই নাই বলিয়া মনে হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সংপ্রযুক্তম্ ॥ ১৪৩ ॥

আমার পুণ্যলীলাকথা শ্রবণ ও পুনঃ পুনঃ কথন দ্বারা (মৎপুণ্য) ঐ বাসনামলিন মন (আত্মা) যেমন যেমন মার্জ্জিত হইতে থাকে তেমনই তেমনই তাহার সূক্ষ্মদৃষ্টি হইতে থাকে। যেমন চক্ষু অঞ্জন সংযোগে উত্তরোত্তর ভাল দেখিতে থাকে। শ্রীভগবানের পুণ্যগাথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও কথন দ্বারা মনের ময়লা যতই কাটিতে থাকে ততই নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মবস্তু প্রত্যক্ষ দেখিতে সক্ষম হয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে অতীন্দ্রিয় বিষয় কিছুই নাই। যাহাকে সামান্যতঃ অতীন্দ্রিয় বিষয় বলা যায় তাহা কেবল অমার্জ্জিত ইন্দ্রিয়েরই অগম্য। মার্জ্জিত ইন্দ্রিয় সেই অতীন্দ্রিয় বিষয় সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে। হাত পা বাঁধা থাকিলে চলা ফেরা করা যায় না। সেই বন্ধনাবস্থায় গতিশক্তি অতীন্দ্রিয়। কিন্তু বন্ধন খুলিয়া দিলেই গতিশক্তি আপনা হইতেই আসে। কেননা বন্ধনাবস্থাতেও গতিশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, কেবল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ছিল না। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর উড়িবার শক্তি নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু পিঞ্জরের বাহিরে আসিলেই সে উড়িতে পারে। চক্ষু সকল বস্তুই দেখিতে পায়। তাহার দৃষ্টি নষ্ট হইলে সে কিছুই দেখিতে পায় না। তখন সেই নষ্টদৃষ্টি চক্ষুর কাছে সহজ দর্শন শক্তিই অতীন্দ্রিয় হইয়া পড়ে। আবার যদি ভগবৎ কৃপায় সেই চক্ষুই দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে পারে তাহা হইলে দর্শনকার্য্য আর অতীন্দ্রিয় থাকে না। পুনরায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সহজ হয়।

যথা হি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং তমো নিহন্যাৎ নতু সদ্বিধত্তে।
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী চেৎ হন্যাৎ তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ ॥ ১৪৪ ॥

যেমন সূর্য্যের উদয়ই নরচক্ষুর অন্ধকার নিশ্চয় নাশ করে মাত্র, অসৎবস্তুকে সৎ করিতে পারে না, অর্থাৎ সূর্য্যালোকে যেমন বিদ্যমান বস্তুই দেখিতে পাওয়া যায়, অবিদ্যমান বস্তু বিদ্যমান বলিয়া প্রতীত হয় না, সেইরূপ সম্যগ্‌দর্শন যদি নিপুণ ও আস্তিকতানিবন্ধন সৎ হয়, তাহা হইলে সেই নিপুণ আস্তিক-দৃষ্টিই পুরুষের বুদ্ধির অন্ধকারাবরণ বিদূরিত করে। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন—

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ১৪৫ ॥

তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি। আমার ঐশ্বরিক বিভূতি দেখ। এই দিব্য চক্ষু কি? দিবি (স্বরূপে) ভবং ইতি দিব্যং (স্বরূপাবস্থিতম্) যে চক্ষু নিজ স্বরূপে অবস্থিত, যে চক্ষুর অহঙ্কারাবরণ উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহাকেই দিব্যচক্ষু বলে। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন আমি তোমায় দিব্যচক্ষু

দিতেছি অর্থাৎ আমি তোমার অহঙ্কার নাশ করিয়া তোমার চক্ষুকে স্বরূপাবস্থিত করিতেছি তাহা হইলেই তুমি স্বরূপপ্রাপ্ত চক্ষুর দ্বারা আমার স্বরূপ দেখিতে পাইবে। সূর্য্যই চক্ষুর স্বরূপ। অহঙ্কার-মেঘই তাহার আবরণ। ভগবৎকৃপা-বায়ু দ্বারা এই অহঙ্কাররূপ মেঘাবরণ বিনষ্ট হইলে চক্ষুঃ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য মনুষ্যকে সর্ব্বপ্রথমেই সর্ব্বতোভাবে অহঙ্কার বর্জ্জন করিতে হয়। অপাস্তাহঙ্কৃতি চিত্তই সত্যের চরণে ঔদ্ধত্য ত্যাগ করিয়া সত্যের নিষ্কপট আদর করিয়াই ধন্য। নিরস্তাভিমান দৃষ্টিতেই বস্তু স্বরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু বিষয়বাসনা থাকিতে দুর্জ্জয় অহঙ্কার কিছুতেই বিদূরিত হয় না। বিষয়বাসনা ও অহঙ্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির জন্য সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবানের পাদকমলে শরণাগতি কায়মনোবাক্যে বিধেয়। কি অহঙ্কারবর্জ্জন কি বাসনাত্যাগ কি শরণাগতি সকলই জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য। অতএব শ্রীভগবানের নির্হেতুক কৃপাই একমাত্র ভরসা। এই অহৈতুকী কৃপায় প্রাণভরিয়া বিশ্বাস করিয়া মনুষ্যের যথাসাধ্য অহঙ্কারবর্জ্জন, বাসনাত্যাগ, সত্যের আদর ও শরণাগতির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। তবেই সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভবে। তজ্জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অধীত্য চতুরো বেদান্ দর্পাপহতচেতনঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্বীপাকরসং যথা ॥ ১৪৬ ॥

সমগ্র বেদশাস্ত্র সম্যক্ অধিগত করিয়াও অহঙ্কারবিমূঢ় জন ভগবান্‌কে জানিতে পারে না—যেমন তাড়ু রসে ডুবিয়া থাকিয়াও সেই রসাস্বাদগ্রহণে বঞ্চিত।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ১৪৭ ॥

যদি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয় তবে প্রথমে স্বীয় অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর চরণে শরণাপন্ন হও। তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া নিত্য তাঁহার চরণসেবা কর। তাহার পর তাঁহাকে বিশেষ করিয়া প্রশ্ন কর। তখন সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীপুরুষ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিবেন। তখনই তুমি প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিবে। অন্যথা তাঁহার উপদেশ তোমার অহঙ্কারমলিন চিত্তে প্রতিফলিত হইবে না।

বাসনানুদয়ো ভোগ্যে বৈরাগ্যস্য পরাবধিঃ।
অহং ভাবোদয়াভাবো বোধস্য পরমাবধিঃ ॥ ১৪৮ ॥

ভোগ্যবিষয়ে বাসনার উদয় না হওয়াই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। অহঙ্কারের উদয়ের অভাবেই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা।

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরাং অতিতরন্ত্যথ দেবমায়াম্
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগাল ভক্ষ্যে ॥ ১৪৯ ॥

যাঁহাদের উপর সেই অনন্ত ভগবান্ অনন্ত নির্হেতুক কৃপা করেন যাঁহারা কায়মনোবাক্যে (সর্ব্বাত্মনা)

অকপট ভাবে (নির্ব্যলীকং) তাঁহার চরণে আশ্রিত, তাঁহারাই দুস্তর দেবমায়া অতিক্রম করিতে পারেন। আর যাহারা কুকুর (শ্ব) ও শৃগালাদির ভক্ষ্য এই ঘৃণিতদেহে আমি ও আমার জ্ঞান করে সেই ঘৃণিতজনগণ তাঁহার দয়ালাভে বঞ্চিত হইয়া কখনই মায়া অতিক্রম করিতে পারে না।

যে পুনঃ সর্বভাবেন প্রপন্নাঃ পরমেশ্বরম্।
তে হি জানন্ত্যযত্নেন শিবং পরমকারণম্॥ ১৫০ ॥

যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বরের শরণাগত হন তাঁহারাই বিনা আয়াসে সেই পরম কারণ শিবকে জানিতে পারেন। কেন না স্বয়ং ভগবানই তাঁহাদের দুর্লভ জ্ঞান দেন।

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ ১৫১ ॥

ব্রহ্মা বলিতেছেন হে দেব! যে নর তোমার চরণকমলদ্বয়ের প্রসাদের কণা মাত্রের দ্বারা অনুগৃহীত, সেই নরই তোমার মহিমার স্বরূপ (তত্ত্বং) জানিতে পারে। আর কেহই চিরকাল অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারে না।

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরম॥ ১৫২ ॥

ব্রহ্মা বলিতেছেন হে প্রভো যাহারা তোমাকে জানিতে পারে মনে করে তাহারা জানুক। অধিক আর কি বলিব তোমার লীলা আমার মনের দেহের, বাক্যেরও অগোচর।

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরু ভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেৎ গুণকর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাৎ যথামল দৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ॥ ১৫৩ ॥

যখন পদ্মনাভ শ্রীভগবানের চরণের কৃপায় (এষণয়া) প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হয় ও মন (চেতঃ) ত্রিগুণজাত কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন মল বিদূরিত করিতে পারে তখন সেই বিশুদ্ধ মনে সাক্ষাৎ পরমাত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি হয়। যেমন চক্ষুর দৃষ্টি প্রসন্ন হইলে সূর্য্যের প্রকাশ হয়।

তত্ত্বজ্ঞানোপলব্ধির একমাত্র বাধা অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার বিনষ্ট হইলেই জীব ও ভগবানের ব্যবধান বিনষ্ট হয়। তখন জীব কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হয়। তখনই শ্রীভগবান্ আপনা হইতেই মায়া কাটাইয়া তাঁহার অবাঙ্মনসগোচর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করান।

মনুষ্যদৃষ্টির বিষয়ীভূত সূক্ষ্মাভাস বস্তু দেখিতেও মনুষ্যকে নিরভিমান হইয়া কাচাদির শরণ লইতে হয় তখন অবাঙ্মনসগোচর সূক্ষ্মতত্ত্ব দর্শন করিতে বিচারাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই সূক্ষ্মতত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তার পাদকমলে শরণ লইতে হইবে ইহা আর বিচিত্র কি?

যদি বল শ্রীভগবানের কৃপা হইলেই বা অতীন্দ্রিয় বিষয় কিরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে? যাহা ইন্দ্রিয় ধারণা করিতে পারে না তাহা ধারণা করিতে পারাই শ্রীভগবানের মায়ার

কার্য্য, ও তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তির পরিচায়ক। শ্রীহরির কৃপা ভিন্ন মায়া বুঝা যায় না। তথাপি এই প্রহেলিকার যাহাতে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারে তাহার দু'একটী দৃষ্টান্ত দিব। বন্দুকের গুলি অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। তাহার জীবনহরণশক্তি নাই। কিন্তু বারুদের সাহায্যে সেই তুচ্ছ সীসককণ অচিরেই মত্তহস্তিরও প্রাণনাশ করিতে পারে। এই শক্তি সীসককণের নাই কিন্তু বারুদ তাহাকে দিতে পারে। সেইরূপ যে সকল বস্তু চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ সাহায্যে চক্ষু সে সকল বস্তুও সহজে দেখিতে পায়। যদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বারুদ কাচ প্রভৃতির দ্রব্যান্তরকে এই প্রকার নূতন শক্তিসম্পন্ন করিবার শক্তি থাকে তবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা স্থূল ইন্দ্রিয়কে সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন করিতে পারিবেন ইহা হইতে বিস্পষ্ট আর কি হইতে পারে?

নিরস্তাভিমান দীনহীন সাধুদিগের জীবনে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রত্যক্ষানুভূতি সদা সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। এই সব প্রত্যক্ষ ঘটনাকে লীলাময় ভগবানের লীলা বলে। এই লীলাই শাস্ত্রে সর্ব্বত্র বিবৃত হইয়াছে। এই ঘোর কলিতে কত লীলাই না নিত্য অহরহঃ এখনও হইতেছে তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে? কিন্তু এখন এই সর্ব্বপাপপ্রশমনী ভববন্ধনিকৃন্তনী ভগবল্লীলা শুনিবারই লোক পাওয়া যায় না, ইহাই ভারতের নিদারুণ দুর্ভাগ্য। অধিকন্তু অধিকাংশ লোকই শ্রীভগবানের পুণ্যপবিত্র লীলাকেই, আপন দুর্দ্দম্য অহঙ্কার ও বিপরীত-বুদ্ধিবশে, গেঁজেলি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে, ইহাপেক্ষা ভারতের চরম দুরদৃষ্টের আর কি পরিচয় হইতে পারে?

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু পাপপ্রবৃত্তি কোটি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হয় না। অনুক্ষণ শ্রীহরির গুণগানই পাপপ্রবৃত্তি নির্ম্মূল করিবার একমাত্র উপায়।

নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতং
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।
তৎকর্ম্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে
গু'ণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥ ১৫৪ ॥

(বিষ্ণুদূতগণ যমদূতহাত হইতে অজামিলকে উদ্ধার করিলে যমদূতগণের প্রশ্নের উত্তরে যম বলেন) শাস্ত্রকথিত প্রায়শ্চিত্ত (নিষ্কৃতং) সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও (কৃতেঽপি) একান্ত হয় না অর্থাৎ সম্যক্ ফলদায়ক হয় না। কেন না মন পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়। সেই কর্ম্ম নিশ্চয় বিনাশেচ্ছুগণের (নির্হারমভীপ্সতাং) শ্রীহরির গুণানুবাদই একমাত্র উপায়। যেহেতু এই গুণানুবাদ দ্বারাই সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয় ও রজস্তমোগুণের নাশ হয়। সাধুমুখে অনুক্ষণ ভগবদ্গুণগান শ্রবণ ও কীর্ত্তন ভিন্ন পাপ প্রবৃত্তি একেবারে উন্মূলিত করিবার উপায়ান্তর নাই।

সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং যথা তমোর্কোঽভ্রমিবাতি বাতঃ ॥১৫৫

অনন্ত দয়ার আধার শ্রীভগবান্, তাঁহার মাহাত্ম্য (অনুভাব) শ্রবণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া কীর্ত্তন করিলে, নরগণের হৃদয়ে স্বয়ং প্রবেশ করিয়া তাহাদের পাপ নিঃশেষে উন্মূলন করেন। যেমন সূর্য্য নিঃশেষে অন্ধকার বিনাশ করেন ও অতিশয় প্রবল বায়ু তৎক্ষণাৎ মেঘ বিদূরিত করে।

ভগবদ্গুণগানের অনন্যসাধারণ পাপনির্হরণশক্তি আছে বলিয়াই নববিজ্ঞান সর্ব্বাগ্রে

ভগবদ্‌গুণগান শ্রবণই অসভ্যতার একমাত্র লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে ও হতভাগ্য ভারতবাসীও ভেড়ার ন্যায় অবিচারে বিচারবান্ হইয়া সেই কথার অন্ধানুবর্ত্তনে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছে। তন্নিমিত্তই আজ ভারতাজির, বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ হইয়াও, অধর্ম্মের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। এই অধর্ম্মবন্যার ফলেই, মুহুর্মুহু বন্যা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ অন্নাভাব মহামারী প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রবে, আজ সোণার ভারত ক্ষণে ক্ষণে উপদ্রুত।

অধর্ম্মমূলং বৈগুণ্যং বায়্বাদীনাং প্রজায়তে।
অধর্ম্মাদ্ধি ভবেচ্ছোকো জনানাং নান্যথা ক্বচিৎ॥ ১৫৬॥
অধর্ম্মাভিভবাৎদেশে বিকৃতিং যান্তি সর্ব্বথা।
ঋতুর্বৃষ্টি স্তথা বায়ুঃ ভূমি রোষধিরেব চ॥ ১৫৭॥

অধর্ম্ম হইতেই বায়ু প্রভৃতি বিপরীত গুণসম্পন্ন হইয়া উঠে। অধর্ম্ম হইতেই মনুষ্যাদির দুঃখ উপস্থিত হয়। অধর্ম্ম বিনা মনুষ্যের কখনই কোনও দুঃখ হয় না। যখন দেশ অধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হয় তখনই ঋতু বৃষ্টি বায়ু ভূমি ও ওষধি প্রভৃতি সকল বস্তুই সকল প্রকারে বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। তখনই অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ঝড় প্রভৃতি আসিয়া সেই অধর্ম্মপরায়ণ দেশকে ধ্বংস করিতে থাকে। মহামারী ও নানাবিধ রোগ তখন সেই ধ্বংসকার্য্যের সহায়ক হয়। অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলে সমস্ত জগতের সকল দুঃখ এখনই দূরীভূত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিপরীত বুদ্ধির প্রভাবে, জগৎ এই শাস্ত্রনির্ণীত ধর্ম্মপথ বর্জ্জন করিয়া, অধর্ম্মপথে দুঃখোপশমনের নানাবিধ চেষ্টা করতঃ দুঃখসাগরে আরও অধিকতর নিমগ্ন হইতেছে।

ভগবদ্‌গুণগান শ্রবণের ঘোর অনিচ্ছাবশতঃই সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হতভাগ্য ভারতবাসীর নিকট উপস্থিত করিবার উপায় নাই। অতএব বাধ্য হইয়াই প্রকৃত প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া বিচাররূপ প্রমাণাভাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কেননা শাস্ত্র আজ্ঞা করিয়াছেন—

নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্‌ব্রূয়াৎ ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ॥ ১৫৮॥

জিজ্ঞাসা না করিলে কাহাকেও বলিবে না। অন্যায়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেও কাহাকেও বলিবে না। মেধাবী পুরুষ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও জড়ের ন্যায় লোকে আচরণ করিবেন।

ভগবল্লীলা শ্রবণে অভিলাষ থাকিলেই এখনও যে কত লীলা শ্রবণপথগোচর হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

৫৩। আপ্তবাক্যই একমাত্র প্রমাণ।—নববিজ্ঞান কেবল জড় স্থূলজগৎ লইয়াই ব্যস্ত। তথাপি সংশয়সাগরে সদাই বিপর্য্যস্ত। বস্তু আছে বস্তু নাই, সেই বস্তু অপর বস্তু হইতে পৃথক্ ও তাহারই তুল্য, সকল প্রকার উক্তিই একই সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে করিয়াও পরিত্রাণ নাই। যদি আপাত সূক্ষ্মবস্তু ছাড়িয়া প্রকৃত সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসরণ করিতে হইত তাহা হইলে নববিজ্ঞানের কি দশা হইত কে বলিতে পারে? স্থূলদৃষ্টিতে স্থূলবস্তু দেখা যায় সূক্ষ্মদৃষ্টি ভিন্ন সূক্ষ্ম বস্তুর উপলব্ধি ইহতেই পারে না। মনুষ্যের এই সূক্ষ্মদৃষ্টি কিরূপে হইতে পারে? তাহার দিগ্‌দর্শন পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। শাস্ত্রবিশ্বাসই এই সূক্ষ্মদৃষ্টির আদি কারণ। শাস্ত্রচক্ষুতে চক্ষুষ্মান্ না হইলে

মনুষ্যের সূক্ষ্মদর্শনশক্তি উপচিত হয় না। যখন আপ্তবাক্যের অনুসন্ধানে মনুষ্যের বুদ্ধিবিকাশ হয় তখনই অহঙ্কার মেঘ বিদূরিত হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়।

শাস্ত্র কি? আপ্তবাক্য কাহাকে বলে? অভ্রান্তবাক্য ভিন্ন ভ্রান্তি দূর হওয়া অসম্ভব ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। অভ্রান্তপুরুষ ভিন্ন বাক্য কখন অভ্রান্ত হইতেই পারে না। ভ্রান্তপুরুষের বাক্য অকস্মাৎ অভ্রান্ত বা সত্য হইতে পারে। কিন্তু তাহার সত্যত্ব নির্ভরাযোগ্য। সত্যপুরুষের বাক্য সর্ব্বদাই সত্য। তাঁহার বাক্যই একমাত্র প্রমাণ। সেই প্রকৃষ্টপ্রমাণের অভাবেই চক্ষুরাদির প্রমাণ গ্রাহ্য। নতুবা চক্ষুরাদির প্রমাণ সদাই অগ্রাহ্য ও পরিত্যজ্য। কেননা চক্ষুরাদির প্রমাণ সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ—সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। সত্যপুরুষকেই আপ্ত বা আপ্তপুরুষ বলে। আপ্তপুরুষের বাক্যই শাস্ত্রনামে অভিহিত। যিনি ভগবৎকৃপায় অপ্রতিহত অমল জ্ঞান পাইয়াছেন সেই সত্যপুরুষকেই আপ্ত বলে। আপ্তবাক্যই আগম বা শাস্ত্র।

আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষং অনুমানং চ যুক্তিকম্।
চতুর্বিধা পরীক্ষা স্যাৎ আপ্তবাক্যমসংশয়ম ॥ ১৫৯ ॥
আপ্তবক্ত্রাগতং শাস্ত্রং আগমশ্চাভিধীয়তে।
আগম প্রতিমো নৈব তত্ত্বনির্ণায়কঃ ক্বচিৎ ॥ ১৬০ ॥
আপ্তাঃ সত্যাঃ সদামুক্তা রজসস্তমসস্তথা।
জ্ঞানং অব্যাহতং তেষাং ত্রিকালমমলং সদা ॥ ১৬১ ॥
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ।
অপ্রতিষ্ঠিততর্কেণ কস্তীর্ণঃ সংশয়াম্বুধিম্ ॥ ১৬২ ॥
অতীন্দ্রিয়ান সংবেদ্যান্ ভাবান্ যে দিব্যচক্ষুষা।
পশ্যন্তি বচনং তেষাং নানুমানেন বাধ্যতে ॥ ১৬৩ ॥

বস্তুর পরীক্ষা চারিপ্রকার—আপ্তবাক্য প্রত্যক্ষ অনুমান ও যুক্তি। তাহাদের মধ্যে আপ্তবাক্যই নিঃসন্দিগ্ধ। অন্য প্রমাণে সংশয় থাকিয়াই যায়। আপ্তমুখাগত শাস্ত্রকে আগম বলে। আগমের তুল্য স্বরূপ নির্ণয় করিবার অন্য কিছুই নাই। সত্যপুরুষকেই আপ্তপুরুষ বলে। মিথ্যা সম্বন্ধাভাবে তাঁহাদের মনে মিথ্যা স্থান পায় না। অতএব তাঁহারা রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব হইতে উন্মুক্ত। কাযেই তাঁহাদের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের জ্ঞান সদাই অপ্রতিহত ও নির্ম্মল। যে সকল বস্তু অচিন্ত্য, মন যাহাদের ধারণা করিতে অক্ষম, তাহাদের বিষয়ে তর্ক করা অনুচিত। কেননা তাহারা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। যে তর্কের মূলে আপ্তবাক্য নাই, সেই অনাপ্তলম্বন তর্কের দ্বারা কে কবে সংশয়সাগর পার হইয়াছে? যাঁহারা দিব্য স্ব স্বরূপাবস্থিত চক্ষুর দ্বারা অতীন্দ্রিয় ও দুর্ব্বিজ্ঞেয় বস্তুও দেখিতে পান তাঁহাদের কথা বিচার ও তর্কের অধীন নহে।

তজ্জন্যই প্ল্যাঙ্ক অকপটে বলিয়াছেন পদার্থবিজ্ঞানের সত্যতা বিষয়ে সকল সময়েই সন্দেহ থাকিয়া যায় (১)। রাসেল বলিয়াছেন (২)—বিচারশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণ শক্তির হ্রাস

(১) The Uniouse in the Light of Modern Physies, by Dr. Max Planck.
(২) Relativity by Bertrand Russell.

হয়। এডিংটন বলিয়াছেন—গণিত ও বিজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত তথ্য বাহির করা যায় না (৩)। জীনস বলিয়াছেন—নববিজ্ঞানের প্রত্যেক কথাই কাল্পনিক ও অনিশ্চিত, (৪) ও হ্যাল্‌ডেন্ বলিয়াছেন এই জগতের বিচিত্রতা বড়ই বিষম, অপরূপ ওকল্পনাতীত (৫)।

এখন বুঝা যাইতেছে শাস্ত্রই শাস্ত্রের একমাত্র প্রমাণ কেন, শাস্ত্র মানিব কেন এই প্রশ্নের সদুত্তর একমাত্র শাস্ত্রই দিতে পারে কেন। অপ্রতিষ্ঠিত তর্কের বলে সংশয়াম্বুধি পার হইবার চেষ্টা বাতুল মাত্র।

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈবলাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলে নাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥ ১৬৪॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহার কোন বিষয়ে বিস্ময় হয় না, যিনি পরিপূর্ণকাম, যিনি নিজলাভতুষ্ট ও প্রশান্ত, অতএব যাঁহার কোনও বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকে না কেবল

রক্ষাপেক্ষামপেক্ষতে। ১৬৫॥

জীব কবে রক্ষা কর বলিয়া শরণ লইবে তাহারই অপেক্ষা করেন, যিনি জীবের একমাত্র কল্যাণ-সাধনেই সদাই উদ্‌যুক্ত, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় জগদীশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া যে অন্যত্র শরণ লয় সে নিতান্তই বালিশ, তাহার জ্ঞানের অঙ্কুর পর্য্যন্তও নাই, সে সত্যসত্যই কুক্কুর-পুচ্ছাশ্রয়ে সমুদ্র পার হইতে ব্রতী হইয়াছে।

৫৪। **শাস্ত্র মানিব কেন প্রশ্নের সদুত্তর**।—মানিয়া লওয়া মনুষ্যচিত্তের স্বাভাবিকী বৃত্তি। যতই বুদ্ধিমান্ লোক হউক না কেন প্রায় সমস্ত বিষয়ই অবিচারে মানিয়া লয়। স্বল্প বিষয়ই স্বয়ং বুঝিতে পারে ও বুঝিয়া অনুষ্ঠান করে। ইহার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করা চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। কেননা পদে পদে নিত্য ইহার প্রমাণ সকলেই পায়। তথাপি দুএকটী প্রমাণ দেওয়া গেল। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নিত্য কি অনিত্য জগতে কে প্রমাণ করিতে পারে? অথচ কার্য্য কারণ সম্বন্ধের নিত্যত্ব কে মানিয়া লয় না? কোন্ ব্যক্তি চিকিৎসকের কথা মানিয়া লয় না? ইঞ্জিনিয়ারের কথা অবিচারে গ্রহণ করে না? নববিজ্ঞানের তত্ত্বকথা অবিচারে অঙ্গীকার করে না? মাত্রামত, সম্প্‌ক্রমত প্রভৃতি কয়জনে বুঝিবার কল্পনাও করেন? কেহ্ কিছুই বুঝে না। কাহার ও কিছু বুঝিবার চেষ্টাও নাই, সাহসও নাই, ভরসাও নাই। মানিয়া লওয়াই জীবনের একমাত্র ব্রত। কেবল সনাতন শাস্ত্রের সনাতন সত্যের কথা হইলেই, মানিব কেন? মানিব কেন? বলিয়া চীৎকার ধ্বনিতে কলির জীব চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলে।

এই ঘোর বৈষম্যের কারণ কি? কেনই বা মনুষ্য সকল দিকে সকল সময়ে বিচারকে সযতনে শিকায় তুলিয়া রাখে ও কেবল সনাতন সত্যের বেলায় সেই লুক্কায়িত বিচারকে শিক্যা হইতে তাড়াতাড়ি নামাইয়া বিচারের ভাণ করিতে বসে? বিজ্ঞান ও শাস্ত্র এই দুইটী শব্দের ব্যুৎপত্তিতেই ইহার নিগূঢ় কারণ নিহিত আছে। বিজ্ঞান শব্দের ব্যুৎপন্নার্থ বিশিষ্টজ্ঞান-বিভ্রম বিপরীত জ্ঞান ও যাহা শাসন করে তাহাকে শাস্ত্র বলে। অনাদি সংসারের বিপরীতভ্রমজনিত বিপরীত-

(৩) Science and Religious Howe.

(৪) The Mysleries of universe. Sir Jame Jeans.

(৫) Conclusious of Modern Science. Wallir Grierson.

বুদ্ধির কাছে বিশিষ্ট-জ্ঞান-বিভ্রম বিপরীত জ্ঞানই রোচক। কাযেই তাহা অবিচারে গ্রহণ করিতে আর বাধা কি? অজিতেন্দ্রিয় উচ্ছৃঙ্খল মনুষ্যের কাছে শাসন বড়ই ভীষণ। তাই শাস্ত্রের নামে তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়। তখন শাস্ত্রকে দূর করিবার জন্য বিচার প্রভৃতি যতগুলি তোলা অস্ত্র আছে সকল গুলিরই প্রয়োগ করিতে ছাড়ে না। উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিমাত্রেই শাসনের আতঙ্কে বিচারপরায়ণ হইয়া উঠে।

এই জন্যই ত্রিকালদর্শী শাস্ত্র বলিয়াছেন কলিকালে মনুষ্য বিপরীত বুদ্ধবশে অমৃতকে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া বিষসেবনে উন্মত্ত হইবে।

রত্ন বুদ্ধ্যা ভস্মরাশিং কুরুতে সঞ্চয়ং জনঃ।
অমৃতং চ পরিত্যজ্য বিষং নিত্যং নিষেবতে ॥ ১৬৬ ॥

কলিকালে মনুষ্যের কি বিপরীত বুদ্ধি হইবে! ভস্মরাশিকে রত্নরাজি বলিয়া সাদরে সঞ্চয় করিবে অমৃত পরিত্যাগ করিয়া নিত্য আনন্দে বিষভক্ষণ করিবে।

সংপ্রাপ্য ভারতে জন্ম সৎকর্ম্মসু পরাঙ্মুখঃ।
পীযূষ কলসং হিত্বা বিষভাণ্ডং স ইচ্ছতি ॥ ১৬৭ ॥

এই ভারতবর্ষ বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গনভূমি (ভারতাজিরম্) বিশেষ ভাগ্যোদয়ে এই ভারতাজিরে জন্মলাভ করিয়া সংপ্রাপ্য ভারতে জন্ম) যে লোক সৎকর্ম্মে পরাঙ্মুখ হয় সে অমৃত কলস ত্যাগ করিয়া বিষভাণ্ডের জন্য লালায়িত হয়।

সৎকর্ম্ম কি? মনুষ্য কেনই বা এই সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে? এই জীবনের উদ্দেশ্য কি? নিঃশ্রেয়স কাহাকে বলে? প্রশ্নগুলি আপাত ভিন্ন হইলেও প্রকৃতই এক। যাহার জন্য মনুষ্য এই ধরাধামে আসিয়াছে তাহাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য পরিপালনই একমাত্র সৎকর্ম্ম। তাহাই পরম নিঃশ্রেয়স্কর। এখন দেখা যাউক, মনুষ্য কোন্ উদ্দেশ্যে এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়াঽনুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ ১৬৮ ॥

মনুষ্যদেহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (আদ্যং) অনায়াসলব্ধ প্রতীতির জন্য সুলভ। মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া দেবাদিরও দুর্ল্লভ। এই মানবদেহই সংসারোত্তারণক্ষম (সুকল্পং) তরি। গুরু এই তরির কর্ণধার। আমার কৃপাবায়ু দ্বারা এই তরি চালিত। এত আয়োজনেও যে মানব ভবসমুদ্র পার হইতে পারে না সে আত্মঘাতী।

যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম।
গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ ॥ ১৬৯ ॥

মনুষ্য জন্ম পাইয়া, অর্থাৎ মুক্তির দ্বার খুলা পাইয়া, সংসার পিঞ্জরে (য গৃহেষু) পক্ষীর ন্যায় আসক্ত হইয়া বাস করে, অর্থাৎ সংসারপিঞ্জর হইতে উড়িয়া পলাইতে চাহে না, সে আরূঢ়চ্যুত বলিয়া

জ্ঞানিগণের নিকট বিদিত। অর্থাৎ সংসার হইতে বৈকুণ্ঠের দ্বার পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া সে পাপবশে বৈকুণ্ঠপ্রবেশপরাঙ্মুখ হইয়া পুনরায় সংসারে পতিত হইয়াছে জানিও।

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিনাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥ ১৭০ ॥

বুদ্ধিমানের বুদ্ধি ইহাকেই বলে। জ্ঞানীর জ্ঞান ইহাকেই বলে যে তাহারই প্রেরণায় মিথ্যা মর্ত্তদেহ দ্বারা সত্য ও মৃত্যুরহিত আমাকে লাভ করে।

পূর্ব্বযোনি সহস্রাণি দৃষ্টান্যেব ততো ময়া।
আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ ॥ ১৭১ ॥
জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মাপায়ৌ পুনঃ পুনঃ।
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেহং বিশ্বেশ্বরপদংশ্রয়ে ॥ ১৭২ ॥

জীব মাতৃজঠরে বাস করিয়া অনুক্ষণ এই অনুশোচনা ও সঙ্কল্প করে। আমি পূর্ব্বে সহস্র সহস্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতএব আমি নানাপ্রকার আহার ভোজন করিয়াছি ও নানাপ্রকার স্তন পান করিয়াছি। আমি জন্মিয়াছি মরিয়াছি ও পুনঃ পুনঃ আমার জন্মমৃত্যু হইয়াছে। অতএব আমি কতই না দুঃখভোগ করিয়াছি। এইবার যদি মাতৃযোনি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি তবে সংসার ভোগ নিবৃত্তির জন্য বিশ্বেশ্বরের পাদকমল আশ্রয় করিবই করিব।

জঠরস্থ জীবের এই নিরন্তর সঙ্কল্পও মায়াবশে ব্যর্থ হইয়া যায়। মাতৃযোনি হইতে বিনির্গত হইবামাত্রই জীব জঠরস্থ সকল সঙ্কল্পই ভুলিয়া যায় ও কি অমূল্যনিধি হারাইলাম বলিয়া অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। দুরতিক্রম মায়ার প্রভাবে সেই অধীরতাও অল্পক্ষণে নিবৃত্ত হয়। তখন হইতেই জীব সত্যরূপী ভগবান্‌কে ভুলিয়া মিথ্যাধিষ্ঠিত সংসারের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় ও সত্যের অনাদর ও মিথ্যার আদর করিতে শিখে। তখন হইতে জীবের আর মনে থাকে না।

সত্যমেব পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্।
সত্যমেব পরা বেদাঃ ওঙ্কারং সত্যমেব চ ॥ ১৭৩ ॥
সত্যমূলং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম।
ন হি সত্যমতিক্রম্য বিদ্যতে কিঞ্চিদুত্তমম্ ॥ ১৭৪ ॥
সত্যহীনা বৃথাপূজা সত্যহীনো বৃথাজপঃ।
সত্যহীনা ক্রিয়া মোঘাঃ সত্যাৎ পরতরং নহি ॥ ১৭৫ ॥
ন হি সত্যা পরোধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্।
সত্যং বিজয়তে লোকং সত্যরূপো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৭৬ ॥

সত্যই পরমব্রহ্ম, সত্যই অনন্তজ্ঞান। সত্যই বেদ ও সত্যই ওঙ্কার। এই জগতের মূলই সত্য। সমস্ত বস্তুই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্য অপেক্ষা কোনও জিনিষ কখনও উত্তম হইতে পারে না। সত্যহীন পূজা বৃথা সত্যহীন জপ ব্যর্থ, সত্যহীন ক্রিয়া নিষ্ফল, সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই ও

কিছুই হইতে পারে না। সত্য পালনই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, মিথ্যাই চরম পাপ, সত্যই জগৎ জয় করে কেননা, সত্যই জনার্দ্দন।

মনুষ্য সহজবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বিচার শিকায় করতঃ মানিয়া মানিয়াই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য। তখন কাহাকে মানিব কাহাকে মানিব না এইটুকুও বিচারপূর্ব্বক করিলে ভাল হয়। এর ওর তার কথার চেয়ে নববিজ্ঞানের কথা শুনা ভাল তাহাতে আর সংশয় কি? নববিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে কাহাকে মানা উচিত?

নববিজ্ঞান সর্ব্বদাই ভ্রমাত্মক। ভ্রমই উহার প্রাণ, পরিবর্ত্তনই উহার প্রকৃতি। মিথ্যাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া মিথ্যা হইতে মিথ্যান্তর পরিগ্রহই উহার স্বভাব। মিথ্যামার্গানুসরণরূপ উন্নতির বড়াই করাই উহার বৈচিত্র্য। সূক্ষ্মদৃষ্টি সভয়ে পরিহার পূর্ব্বক সত্যবিদ্বেষই উহার বৈশিষ্ট্য। হিন্দুশাস্ত্রের নিত্যত্বই প্রাণ, নিত্যত্বই ধন ও নিত্যত্বই জ্ঞান। হিন্দুশাস্ত্র জানেন নিত্য বা সনাতন বস্তু পরিবর্ত্তনবিরহিত। পরিবর্ত্তন নিত্য মিথ্যাশ্রিত। মিথ্যা না হইলে কখনও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় না। নিত্যত্বই সত্যের স্বরূপ। সত্য নিত্য ও মিথ্যা অনিত্য। সূক্ষ্মই সত্যের প্রাণ স্থূলই মিথ্যার জীবন। হিন্দুশাস্ত্র সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা অনুস্যূত ও পরিব্যাপ্ত। অতএব সনাতন হিন্দুশাস্ত্র সনাতন সত্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত, অলীক বৈচিত্র্যবিবর্জ্জিত ও জীবমাত্রের নিঃশ্রেয়স্ক।

এ কথাও যে চেষ্টা করিয়া হিন্দুসন্তানকে বুঝাইতে হইতেছে ইহাপেক্ষা ভারতের দুরদৃষ্ট আর কি হইতে পারে? অহংমূল সংসার। হতভাগ্য হিন্দুদিগের সেই অপরিহার্য্য অহঙ্কার আজ কোথায় লুকাইল?

ধন্যো বৈদেশিকো মোহো ধন্যা জাতি র্বিনির্জ্জিতা।
বিবেকবর্জ্জিতা বুদ্ধি র্ভিদ্যতে পরসংশ্রয়া ॥ ১৭৭ ॥
উত্তমশ্চাধমো জ্ঞেয়ো বিদেশে হীয়তে যদি।
অধমশ্চোত্তমো গণ্যো বিদেশে স্তূয়তেঽপি চেৎ ॥ ১৭৮ ॥

ধন্য বিদেশের মোহ। সেই জাতিই ধন্য যে বিজেতার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করে ও বিজেতৃসংশ্রয়ে যাহার বুদ্ধি ভিন্ন হইয়া হিতাহিত বিবেক একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছে। উত্তমবস্তু বিদেশে নিন্দিত হইলেই অধম বলিয়া গণ্য ও অধমবস্তু বিদেশে প্রশংসিত হইলেই উত্তম বলিয়া স্বীকৃত—ইহাই মোহের মাত্রা। সেই দুর্ভেদ্য মোহবশে অন্ধানুকরণ বৃত্তিই আজ হিন্দুদিগের সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে।

মৃষানুকরণং জ্ঞানং মৃষানুকরণং ধনম্।
মৃষানুকরণং ধর্ম্ম স্তদ্বিনা নাস্তি কিঞ্চন ॥ ১৭৯ ॥
ধিগ্‌দেশং চ পরাধীনং ধিগ্‌বৃত্তিং চানুকারিণীম।
ধিগবিবেকপরিত্যাগং ধিঙমোহং চাপ্যধীনতাম্ ॥১৮০ ॥

মিথ্যানুকরণই জ্ঞান মিথ্যানুকরণই ধন মিথ্যানুকরণই ধর্ম্ম, মিথ্যানুকরণ ভিন্ন জীবনে আর কিছুই নাই। পরাধীন দেশকে ধিক্! অনুকরণবৃত্তিকে ধিক্! বিবেক পরিত্যাগকে ধিক্! মোহ ও অধীনতাকে ধিক্।

সত্যমূল, নিয়তস্বরূপ, নিঃশ্রেয়স্কর সনাতন হিন্দুশাস্ত্র ও অসত্যনিষ্ঠিত অনিয়তস্বরূপ পরিবর্ত্তনপ্রবণ নববিজ্ঞান—এই দুইটীর মধ্যে কাহাকে মানা উচিত? অবিকৃত বুদ্ধিই ইহার উত্তর দিতে পারে।

শিবস্বরূপী শিবভাবিতানাং হরিস্বরূপী হরিভাবিতানাং।
সঙ্কল্পপূর্ব্বাত্মকমূর্ত্তিহেতুং বরং বরেণ্যং শরণং প্রপদ্যে॥ ১৮১॥

যাঁহারা শ্রীভগবানকে শিবভাবে দেখিতে চান সেই শিবভাবিত নরগণের কাছে যিনি শিবরূপী হরিভাবিত নরগণের কাছে যিনি হরিরূপী, যাঁহার রূপ সঙ্কল্পের অনুরূপ সেই শ্রেষ্ঠ বরণীয় পুরুষের পাদকমলে আমি শরণ গ্রহণ করি।

তদ্বার্ত্তা সুখতো ব্রবীমি যদহং সাস্তু স্তুতিস্তে মম।
যদ্‌ভুঞ্জে মম তন্নিবেদনমথো যদ্ যামি সা প্রেষ্যতা॥ ১৮২॥
যচ্ছান্তঃ স্বপিমি তদঙ্ঘ্রিযুগলে দণ্ডপ্রণামোহস্তু মে।
স্বামি যচ্চ করোমি তেন ভগবান্ বিশ্বেশ্বরঃ প্রীয়তাম॥ ১৮৩॥

হে স্বামিন্ আমি যাহাই মনের সুখে বলি তাহাই তোমার কথা বলিয়াঅঙ্গীকার কর। তাহাই তোমার স্তুতি হউক। আমি যাহা ভোজনকরি তাহাই তোমার নিবেদিত অন্ন বলিয়া অঙ্গীকৃত হউক। আমি যে যাতায়াত করি তাহা তোমারই কার্য্যে যাতায়াত করি বলিয়া মনে কর। আমি যখন শান্ত হইয়া নিদ্রা যাই তখন তোমাকেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি বলিয়া ধরিয়া লও। আমি যখন যাহা করি তাহাতেই ভগবান্ বিশ্বেশ্বর প্রীত হউন।

গ্রাম্যপ্রাথমিকশিক্ষাবিল ও বাঙ্গলার হিন্দুজাতি

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, কাব্যতীর্থ

কাল্‌চার (Culture) এবং সিভিলিজেসন্ (Civilization এই দুইটি বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ আজকাল সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই দুইটি শব্দ অনেকে একার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু মনে হয় দুইটি শব্দ একার্থ বোধক নহে। কালচার (Culture) অর্থে সাধনাজনিত সভ্যতা বলা যাইতে পারে। মানুষ পুরুষানুক্রমিক সাধনার দ্বারা যে উৎকর্ষ লাভ করে তাহাই কাল্‌চার (Culture) নামে অভিহিত। প্রত্যেক জাতিই পুরুষপরম্পরাক্রমে এক একটি পদ্ধতি ও সাধনার ধারা অবলম্বনে জাতীয় জীবনে কতকগুলি বিশেষ গুণের উৎকর্ষ সাধন করিয়া আসিতেছে। এই জন্যই বিভিন্ন জাতির সভ্যতার মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ পরিলক্ষিত হয়; এই সকল বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক জাতি আপন আপন সভ্যতা (Civilization) ফুটাইয়া তোলে।

মানুষ যেমন তাহার ছায়াকে পরিত্যাগ করিতে পারেনা, সেইরূপ জাতীয় বৈশিষ্ট্যও সেই জাতীয় লোক সহজে ছাড়িতে পারে না। কাজেই মনে হয় ভারতবাসী যতই পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হউক না কেন, তাহার সেই পাশ্চাত্য ভাব তাহার অস্থিমজ্জার সহিত সম্পূর্ণরূপে গ্রথিত হইয়া থাকে না। তাই ভারতবাসী ইংরাজীভাব গ্রহণ ও অনুকরণ করিয়া না ইংরাজ না ভারতবাসী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইংরাজেরা এই বিষয়টি বেশ বুঝেন। এই জন্য দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকিয়াও তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয় ভাবধারা হইতে রেখামাত্রও বিচ্যুত হইতে চাহেন না। তাঁহারা মনে করেন, যদি ভারতবাসীর মত তাঁহারা বিজাতীয় ভাবের অনুকরণপ্রিয় হয়েন, তাহা হইলে পিতৃপুরুষের সাধনালব্ধ যে সকল গুণে তাঁহারা জগতে বরেণ্য হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সকল গুণের মালিন্য ও দৌর্ব্বল্যহেতু তাঁহারা ভারতবাসীর ন্যায় কিম্ভূতকিমাকার জাতিতে পরিণত হইবেন ও অল্পকাল মধ্যে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত স্মাটস্ সাহেবের বন্ধুত্ব ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন স্মাটস্ সাহেব সেনাপতির কার্য্য করিতেন তখন তথায় মহাত্মাজী তুমুল অসহযোগ আন্দোলন উত্থাপিত করেন। সেই সময়ে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎকালে সেনাপতি স্মাটস্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'আমরা এসিয়াবাসীদিগের সহিত যে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি, তাহার কারণ এশিয়ার সহিত য়ুরোপের সভ্যতার বিরোধ।

ভারতবাসীরা তাহাদের জাতীয় সভ্যতাকে বিদেশীয় সভ্যতার পদতলে বিকাইবার উপক্রম করিয়াছে। তাহারা এক্ষণে গীতার মহাবাণী ভুলিয়া গিয়াছে,

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

তাহারা বিলাতী শিক্ষার নেশায় ও পরাধীনতার কশাঘাতে জাতীয় ভাব বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে। তাহারা বিস্মৃত হইয়াছে যে বিজয়ী রোমকদিগের পদতলে বৃটনগণ আপনাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিকাইয়া দিয়াছিল বলিয়াই তাহারা দুর্ব্বল ও অত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল এবং অবশেষে অ্যাঙ্গল্স্ (Angles) ও স্যাক্সনদিগকে (Saxons) ডাকিয়া নিজ বাসভূমে প্রবাসী হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল।

ইংরেজগণ বৃটনদের এই দুর্দ্দশার কথা স্মরণ রাখিয়াই ভারতবর্ষ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন করেন্। শিক্ষাপ্রচলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মেকলে ট্রেভিলিয়ান প্রভৃতি ইংরাজগণের অভিমত হইতে বেশ বুঝা যায় যে, রোমকদিগের নিকট বৃটনদের ন্যায় ভারতবাসীরাও ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন ও ইংরাজের সভ্যতার অনুকরণের ফলে ইংরাজদিগের দাস হইয়া যাইবে। ইংরাজীবিদ্যা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধই হইয়াছে। শিক্ষিত ভারতবাসী এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে দেশের প্রাচীন ভাবধারার সহিত—প্রাচীন সাধনালব্ধ সভ্যতার সহিত—কোন সংশ্রব রাখিতে যেন অগৌরব মনে করেন। এই জন্য ঐ সকল ফেরঙ্গভাবেভাবিত ও ফেরঙ্গভাষায়শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশের সমস্ত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, আচার ব্যবহার, সমস্তই বর্জ্জন পূর্ব্বক পাশ্চাত্য মতবাদ সমূহ (Isms) এদেশে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। এই কারণেই দেখা যায় তাঁহাদের স্বদেশভক্তি, তাঁহাদের সমাজসংস্কার, এমন কি তাঁহাদের জাতীয় পতাকা পর্য্যন্ত য়ুরোপের অন্ধ অনুকরণ মাত্র।

প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের সভ্যতার বিষয় ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় যে উভয় দেশের সভ্যতা বিভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের যাহা কিছু কার্য্য—জাতীয়, সামাজিক বা রাজনীতিক—তাহাদের মূল ভিত্তি হইতেছে ধর্ম্ম; আর য়ুরোপের ঐ সকলের বুনিয়াদ হইতেছে দেশাত্মবোধ। স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার পার্থক্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—প্রাচ্যের গভীর ও পাশ্চাত্যের অদম্য কার্য্যকারিতা—একের অন্তর্মুখী অপরের বহির্মুখী চেষ্টা—একের মুক্তি-প্রিয়তা অপরের স্বাধীনতা—একের ত্যাগ অপরের ভোগ—জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ঐহিক কল্যাণলাভে একের নিরুৎসাহতা ও নিত্যসুখে সন্দিহান, অপরের ঐহিক সুখ লাভের অদম্য উৎসাহ।·········ঋষিপ্রদত্ত ধর্ম্ম' সর্ব্বদা সম্মুখে মনে রাখিতে হইবে—যেন পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট না হই। ভারতীয় ধর্ম্ম বিষয়ে এদেশের আধুনিক শিক্ষিত দল অজ্ঞ বলিয়াই এই ধর্ম্মের বুনিয়াদটিকে ভাঙ্গিয়া উহা দেশাত্মবোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু বিলাতী দেশসেবাকে ধর্ম্মের স্থলে বসাইলে ভারতের অবস্থা যে কি হইবে, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এই ভাবটি লক্ষ্য করিয়াই মহাত্মাজী এক স্থলে বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন—'আমরা যে স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছি তাহাতে অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীগণের পক্ষে তাহাদের যুগযুগান্তর-ব্যাপিণী-সাধনা-লব্ধ বিকাশ সাধনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে এবং তাহা হইলেই তাহারা পুরুষ পরম্পরাগত ভাবধারা অনুসারে ও স্বাভাবিক প্রবণতায় তাঁহাদের গভীর সভ্যতাকে সহজে গঠিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে।

ভারত ও য়ুরোপের আদর্শ বিভিন্নমুখী। ইউরোপীয় 'নিট্‌সে' প্রভৃতি মনীষিগণের মতে

সৃষ্টির ক্রমবিকাশানুসারে মানুষই সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ। তাঁহারা বলেন মানুষের মধ্যে যখন পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয় ভোগের ও মনোবুদ্ধির ক্রিয়া রহিয়াছে, তখন মানুষ অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধমানব। এই অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধমানবের দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতির যথাসম্ভব বিকাশ ও ভোগই য়ুরোপের আদর্শ এবং এই আদর্শে উপনীত হওয়াই শিক্ষার চরম লক্ষ্য। ভারতের মতে অর্দ্ধ মানুষ ও অর্দ্ধ পশুবিশিষ্ট মানব তাহার পশুত্ব ছাড়া যখন দেবত্ব লাভ করে তখন সে 'মনহুঁষ' হইয়া যায় এবং অবশেষে ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া দিব্য জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দময় জীবন লাভ করিতে পারে। ইহাই ভারতীয় সাধনায় আদর্শ এবং এই আদর্শে উপনীত হইবার অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করাই ভারতের জাতীয় প্রকৃতির উপযোগী শিক্ষা। কারণ জাতীয় সাধনা ও আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে কোন শিক্ষাপদ্ধতিই উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

ভারতবর্ষে এক্ষণে যে সকল জাতি বাস করে, তন্মধ্যে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। তাহাদের সংখ্যা মোটামুটি আটকোটি। তদ্ভিন্ন খৃষ্টান ও য়িহুদী জাতি বাদে অন্যান্য যে সকল সম্প্রদায় ভারতে বিদ্যমান রহিয়াছে—যথা শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী প্রভৃতি—তাহাদিগকে হিন্দুর মধ্যে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহার কারণ কর্ম্ম ও পরজন্ম বাদের প্রতি বিশ্বাস হিন্দুর ন্যায় ঐ সকল সম্প্রদায়ের আছে। এইজন্য হিন্দু ও মুসলমানের (হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ২৪ কোটি) সমস্যা সমাধানই ভারতীয় কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। কারণ হিন্দু মুসলমানের সমস্যার সমাধানের উপরই ভারতের রাজনীতিক অগ্রগতি নির্ভর করিতেছে এবং তৎসমাধানকল্পেই এখন মহাত্মা গান্ধী আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ এতদূর পরাকাষ্ঠা লাভ করে নাই। তখন হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি থাকিয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবে জীবন যাপন করিত। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বহ্নি সাময়িক-ভাবে জ্বলিয়া উঠিলেও তাহা উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যস্থতায় সহজেই নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত। সুতরাং পূর্ব্বেকার সাময়িক বিদ্বেষ ভাব ধর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না।

কিন্তু বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময় হইতেই এই বিদ্বেষ বহ্নি ভীষণ আকার ধারণ করে এবং এক্ষণে তাহা ভীষণতম হইয়া সমগ্র ভারতকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছে। মুসলমানগণ মনে করেন যে যখন ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ¾ অংশ, তখন মুসলমানদের রাজনৈতিক হিসাবে এমন কতকগুলি ক্ষেমবন্ধন (Safeguards) থাকিবে যদ্বারা হিন্দুগণ ভারতে মুসলমানদিগকে কোন ক্রমে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে না পারেন। সংখ্যাল্প মুসলমান সম্প্রদায়ের এই স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তজ্জন্য তাঁহারা কংগ্রেসের নিকট মিষ্টার জিন্নার ১৪ দফা দাবী উত্থাপিত করিয়াছেন। তাহার ফলেই বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের সমস্যা মীমাংসিত হইতে পারে নাই এবং গোলটেবিল বৈঠক আপনার নামের সার্থকতা লাভ করিয়া হট্টগোলে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে পুনরায় যে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন হইতেছে তাহার সাফল্যও হিন্দুমুসলমান সমস্যার উপর নির্ভর করিতেছে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ সমূহ অপেক্ষা বঙ্গদেশের ও পাঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আরও জটিলতর। বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের এই সংঘর্ষ বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময় হইতে আরম্ভ

হয়। বঙ্গব্যবচ্ছেদের উদ্দেশ্যই ছিল বাঙ্গালার হিন্দু জাতিকে খাট করিয়া রাখা। বাঙ্গালার হিন্দুর বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা সরকারের রাজনীতিক চাতুরী সহজেই ধরিতে শিখিয়াছিল। তাই বঙ্গের হিন্দুজাতি বঙ্গব্যবচ্ছেদের অন্তরালে যে বিশেষ রাজনৈতিক চাতুর্য্য রহিয়াছে তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া তুমুল আন্দোলন উত্থাপিত করে এবং এই আন্দোলনের ফলেই সমগ্র ভারতে একটা জাগ্রত সচেতন ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ভারত তখন হইতেই রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাইয়া পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপনে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গলার হিন্দুদিগের আন্দোলন রোধ করিবার জন্যই মনে হয় ভারত সরকার ও বঙ্গীয় সরকার মুসলমানদের দাবী পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। একদিকে মুসলমানদিগের দাবী, অন্যদিকে বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালীর অব্যাহত ভাবে কার্য্য করিবার অসুবিধা—এই দ্বিবিধ কারণে বাঙ্গলার হিন্দুগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেনা। এক্ষণে বাঙ্গলার হিন্দুগণ যে ক্রমশঃ মরণের পথের পথিক হইতে চলিয়াছে তাহা কেবল অনুমানের বিষয় নহে, স্পষ্টতঃ দেখাই যাইতেছে।

কিন্তু এখানেই তাহাদের দুর্দ্দশার শেষ হয় নাই। শিক্ষা ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা বিলখানি পাশ করাইয়া সরকার মৃতকল্প হিন্দুজাতির প্রাণে আর একটি বিষম আঘাত করিয়াছেন। প্রাথমিক বিলখানির পাশের সময় হিন্দু সদস্যগণ বিলের প্রতিবাদকল্পে কাউন্সিল গৃহ হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু মনে হয় তাঁহাদের প্রতিবাদের মূলে ছিল রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যা—শিক্ষাগত কোনও মৌলিক দৃষ্টি নয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ইহা দ্বারা Culture বা সাধনাজনিত সভ্যতা হিসাবে হিন্দু জাতির কতখানি ক্ষতি হইতে যাইতেছে তাহাই এস্থলে প্রধান ভাবিবার বিষয় এবং এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

গ্রাম্য প্রাথমিক বিল (Rural Primary Education Bill) সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে ১৯১৯ সাল হইতে সরকার কি প্রকার ইহার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া আসিতেছিলেন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাষ এস্থলে দেওয়া আবশ্যক। ১৯১৯ সালের প্রাথমিক শিক্ষাবিধি ১৯২১ সালে সংশোধিত করা হয়। এই সংশোধিত বিধিমতে মিউনিসিপালিটির উপর প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল—সেই ক্ষমতা ইউনিয়ন বোর্ডের উপরও দেওয়া হইল। কিন্তু তদ্দ্বারা পল্লী-অঞ্চল প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উপকৃত হয় নাই। তাহার কারণ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অর্থাভাব ও তাহাদের জোর পূর্ব্বক শিক্ষা প্রচালনের স্বাভাবিক অনিচ্ছা। অনন্তর ১৯২৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা হয় ও সেই আলোচনার ফলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচালনের জন্য শিক্ষা-কর ধার্য্য ও বিশেষ জেলা-স্কুল-বোর্ড গঠিত হইবে। তদনুযায়ী বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব লিণ্ডসে মহোদয় নানাস্থানে সভা করিয়া ও জেলা সমূহের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণের সহিত পরামর্শ লইয়া ১৯২৭ সালে গ্রাম্য প্রাথমিক বিলের একটি খসড়া (Draft) তৈয়ারী করেন। উক্ত সনের জুলাই মাসে শিক্ষা বিভাগীয় মন্ত্রী ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগষ্ট মাসের অধিবেশনে ঐ বিলখানি পেশ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু ঐ বিলখানি সভায় উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে মন্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে অনাস্থা-জ্ঞাপক ভোটের ফলে অন্যান্য মন্ত্রীগণের সহিত তাঁহাকেও মন্ত্রীপদ ত্যাগ করিতে হয়।

উক্ত বৎসরের অক্টোবর মাসে নবাব মশরফ হোসেন সাহেব শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীপদে এবং ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে ষ্টেপল্‌টন্ সাহেব উক্ত বিভাগের ডাইরেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। ডাইরেক্টর মহোদয় একখানি বিজ্ঞাপন প্রচারের দ্বারা শিক্ষা বিভাগীয় পরিদর্শকগণকে (School Inspectors) আদেশ করেন যে তাঁহারা যেন স্কুল পরিদর্শনকালে তৎ তৎ স্থানের প্রধান প্রধান শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা বিলের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ও তৎশিক্ষার উন্নতিকল্পে করস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। উক্ত বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেপল্‌টন্ সাহেব "Promotion of Primary Education in Bengal" ও মশরফ হোসেন সাহেব "Promotion of Primary Education among the Moslems of Bengal" নামে দুইখানি পুস্তক ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া গ্রামে গ্রামে বিতরণ করেন। তদনুসারে স্থানে স্থানে সভা বসিয়াছিল এবং করের পক্ষেও বিপক্ষে অনেক মন্তব্যও প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসে মশরফ হোসেন সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় বিলখানি পেশ করেন এবং ব্যবস্থাপক সভার সম্মতিক্রমে উহা ৩২ জন সদস্যযুক্ত একটি সিলেক্ট (Select Committee) কমিটিতে প্রদত্ত হয়। কিন্তু সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পূর্ব্বেই উক্ত মন্ত্রী মহাশয়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা-জ্ঞাপক ভোট ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হওয়ায় এবং উক্ত বৎসরের এপ্রিল মাসে গভর্ণর কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক সভা রহিত হওয়ায় সিলেক্ট কমিটি কর্ত্তৃক সংশোধিত প্রাথমিক শিক্ষা বিলখানির আলোচনা স্থগিত হইয়া যায়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পুনঃ নির্ব্বাচনের পরেও মন্ত্রী নির্ব্বাচনে কয়েক মাস বিলম্ব হয়। সুতরাং ১৯২৯ সনের ৫ই আগষ্ট তারিখে ঐ সংশোধিত বিলখানি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিবার ভার বঙ্গীয়শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মাননীয় ম্যাক্ আলপিন্ মহোদয়ের উপর পতিত হয়। তিনি ১৯২৮ সালের নির্ব্বাচিত কমিটির (Select Committee) মন্তব্য সমূহের উপর ভিত্তি করিয়া এবং সরকারের অভিমতানুযায়ী কতকাংশ পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া বিলের খস্‌ড়া তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ঐ খসড়াখানি পুনরায় ৪৫ জন সদস্যযুক্ত আর একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয় এবং ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ইত্যবসরে শ্রীযুক্ত নাজিমুদ্দিন সাহেব শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন এবং তিনি ১৯২৯ সালের প্রাথমিক বিল সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন ও তৎসঙ্গে উক্ত বিলখানির মূল বিষয়গুলি সিলেক্ট কমিটি কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হওয়ার দরুণ তাহা প্রত্যাহার করিবার জন্য আর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং উক্ত প্রত্যাহার প্রস্তাব কিঞ্চিৎ অধিক ভোটের জোরে গৃহীত হইয়া যায়।

মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত (প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে) আর একটি নূতন বিল পেশ করিবার অভিমত জ্ঞাপন করেন।

উক্ত সনেই মন্ত্রী মহোদয় বিলের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য এবং বিলের পক্ষে সমর্থন লাভের জন্য চট্টগ্রাম, ফেণি, নোয়াখালি, ফরিদপুর, যশোহর, বরিশাল, ঢাকা ও মৈমনসিং অঞ্চলসমূহে পরিভ্রমণ করেন। পরিভ্রমণের ফলে উক্ত বিল সম্বন্ধে নানাবিধ তীব্র আলোচনা হইয়াছিল।

১৯৩০ সালের ১৩ই আগষ্ট ১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা বিলখানি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিবার জন্য মন্ত্রী মহাশয় অনুমতি প্রাপ্ত হন। উক্ত বিল সম্বন্ধে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সাধারণ মতামত সংগ্রহের জন্য ও সিলেক্ট কমিটিতে পুনরায় প্রেরণের জন্য উক্ত বিলখানি স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব সভাতে উথাপন করা হয়। উক্ত প্রস্তাব সরকার কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইলে হিন্দু মন্ত্রী কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় মহাশয় প্রতিবাদকল্পে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ঐ বৎসরের ২৫শে আগষ্ট যখন উক্ত বিল সম্বন্ধে সভায় আলোচনা হইতে থাকে তখন অধিকাংশ হিন্দু সদস্য সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। উক্ত দিবসে আর একটি অত্যাবশ্যক প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করা হয়। মৌলভী আবদুল করিম সাহেব প্রস্তাব করেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারণের জন্য বে-সরকারী সদস্যবহুল একটি কমিটি গঠিত হউক। কিন্তু সরকার তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। যাহা হউক ১৯৩০ সালের ২৬শে আগষ্ট উক্ত বিলখানি বিনা বাধায় পাশ হইয়া যায়। ৪০ জন হিন্দু সদস্য প্রতিবাদ স্বরূপ উক্ত দিন সভায় অনুপস্থিত ছিলেন।

এই পর্য্যন্ত গেল প্রাথমিক শিক্ষা বিলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এক্ষণে বিলের প্রধান প্রধান বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

প্রাইমারী শিক্ষাবিলে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত সাধারণতঃ অন্যূন ৬ বৎসর হইতে অনধিক ১১ বৎসর পর্য্যন্ত ২৭ লক্ষ বালকের ও দশ লক্ষ বালিকার শিক্ষার বিষয়ে স্কীম দেওয়া হইয়াছে। ৬০টী ছাত্র সমেত এক একটি স্কুল বাৎসরিক ৪২০ টাকা খরচে চালান হইবে; তন্মধ্যে একজন থাকিবে ১৫৲ টাকা বেতনের বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত (Trained) শিক্ষক ও অন্য জন হইবে ১১৲ টাকা বেতন সাধারণ শিক্ষিত শিক্ষক। প্রত্যেক দুই বর্গ মাইলে একটি করিয়া স্কুল থাকিবে যাহাতে প্রত্যেক বালক বা বালিকা তাহার বাড়ীর এক মাইলের মধ্যে স্কুল পাইতে পারে। তিন শিক্ষকযুক্ত এক একটী স্কুলের বার্ষিক ব্যয় ৬৩০৲ দুই শিক্ষকযুক্ত স্কুলের ব্যয় ৪২০৲ ও এক শিক্ষকযুক্ত স্কুলের খরচ ১৫০৲ টাকা ধরিয়া লইলে বঙ্গদেশে মোটামুটি প্রাইমারী বিদ্যালয়ের বার্ষিক ব্যয় এক কোটী ২২½ লক্ষ টাকা লাগিলে। এতদ্ব্যতীত ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল বোর্ডের (District School Board) জন্য, বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ও অন্যান্য বাবদে অতিরিক্ত খরচ আছে। অতএব প্রাথমিক শিক্ষা বিলের স্কীম অনুযায়ী মোটামুটি এক কোটী বত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় আবশ্যক হইবে। ইহাই মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেবের খরচ সম্বন্ধে অভিমত। কি প্রকারে এই অর্থ পাওয়া যাইবে, তৎ সম্পর্কে সরকারের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"At present Rs. 22 lakhs is the contribution made from provincial revenue to primary Education in rural areas. It is proposed to continue this contribution. A cess 1¼ times the road and public works cess, is proposed to be levied in the same manner as that cess and the proceeds are expected to amount to Rupees one crore. In addition, certain taxation is proposed on persons in rural areas who are engaged in trade, business or professional activities.

"This tax is provided for in clause 34 of the Bill and is estimated to realise approximately 10 lakhs of rupees annually. Further it is proposed to meet the cost of the Inspecting staff and the training of teachers from the provincial budget, so that none of the expenditure under this head will have to be met from the new taxation."

ইহা ছাড়াও সরকার ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতার দ্বারা ও স্থানে স্থানে সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া, শিক্ষা ব্যাপারে উৎসাহজনক কার্য্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

উক্ত ব্যয় সম্বন্ধে সরকারের প্রস্তাব হইতে ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যদি সরকার জমির উপর নির্দ্ধারিত শিক্ষাকর বাবদ প্রতি টাকায় পাঁচ পয়সা আদায় করিয়া বাঙ্গলা দেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাথমিক শিক্ষার অনুরূপ টাকা মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা উচিত। কারণ যদি মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করা না হয়, তবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে ৬০ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে তাহা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে না। যাহারা গ্রাজুয়েট (Graduate) তাহারা সম্ভবতঃ ১৫৲ টাকায় বা ১১৲ টাকায় শিক্ষকতার কার্য্য করিতে রাজি হইবে না। সুতরাং যদি মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবহেলা করা হয়, তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষার স্কীম শিক্ষকের অভাব বশতঃই কার্য্যে পরিণত হইবে না।

প্রাথমিক ব্যয় বাবদ এই নূতন কর ধার্য্য ও শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষা ব্যাপারে এত তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

যখন দেখা যাইতেছে যে অচিরে ভারত শাসন ব্যাপারে অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইবার সম্ভাবনা, তখন মনে হয় এই বিলখানি শীঘ্র পাশ করাইবার ততটা প্রয়োজন ছিল না। যদি গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিষয়ে ১৭০ বৎসর শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে পারিয়া থাকেন—যাহার ফলে বর্ত্তমানে শতকরা ৯৩ জন লোক নিরক্ষর—তাহা হইলে সরকার আরও কয়েক বৎসর এবিষয়ে অপেক্ষা করিতেও পারিতেন। এই বিলের প্রতিবাদকল্পে মিঃ ফজলুল হক্ যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :—"আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাস করি না যে, সরকার সত্যসত্যই বাঙ্গলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যখন সরকারের প্রচুর টাকা ছিল, তখন তাহা করা হয় নাই কেন? আজ বাঙ্গলা যখন অর্থশূন্য, তখন কেন সরকারী মহলে ঘুম ভাঙ্গিল? আজ এই শিক্ষার নামে নূতন কর স্থাপনের অর্থ বাঙ্গলার কৃষককুলের উচ্ছেদ।"

প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনের জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কমিটি এবং কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি (Central Committee) নামে একটি পৃথক নিছক পরামর্শ সভা থাকিবে। পরামর্শ সভায় নিম্নলিখিত ভাবে সদস্য গৃহীত হইবে :—(১) শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর (Ex-officio) (২) প্রত্যেক বিভাগের জেলাবোর্ড কমিটি হইতে নির্ব্বাচিত ২ জন করিয়া ১০ জন সদস্য (৩) লোকাল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত ৫ জন সদস্য, তন্মধ্যে অনুন্নত শ্রেণী হইতে দুইজন ও শিক্ষা ব্যাপারে অভিজ্ঞ অন্য তিনজন প্রতিনিধি হইবে। ইহা ছাড়া

সরকারের হাতে প্রেসিডেণ্ট মনোনয়নের ও উক্ত সভায় কার্য্য নির্ব্বাহ প্রণালীর ভার থাকিবে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে পরামর্শ কমিটিতে সরকারের মনের মত লোকই বেশী থাকিবে।

ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল বোর্ডেও (District School Board) সরকারের প্রভাব অক্ষুন্ন থাকিবে। স্কুল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা জেলার মহকুমার সংখ্যা অনুসারে কম বেশী হইবে। নিম্নলিখিত ভাবে District School Board গঠিত হইবে :—

ক। সরকারী :—

(১) জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট।

(২) মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সকল।

(৩) জেলার স্কুল ইন্সপেক্টর।

খ। বে-সরকারী :—(Ex-Officio) :—

(১) ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান।

(২) লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান।

গ। বে-সরকারী মনোনীত (Elected) :—

(১) ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সদস্যগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রত্যেক মহকুমা হইতে একজন কিন্তু উক্ত সংখ্যা দুইয়ের কম হইবে না।

(২) মহকুমার অন্তর্গত ইউনিয়ন বোর্ড সমূহের মেম্বরগণ দ্বারা মনোনীত প্রত্যেক মহকুমা হইতে একজন সদস্য। কিন্তু এই সদস্য সংখ্যাও দুইয়ের কম হইবে না।

(৩) প্রাইমেরী স্কুলের শিক্ষকগণের দ্বারা মনোনীত একজন প্রাইমেরী স্কুলের শিক্ষক।

ঘ। বে-সরকারী (Nominated বা সরকারী নির্ব্বাচিত) :—

(১) প্রত্যেক মহকুমা হইতে সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত এক একজন সদস্য, যদিও এই সদস্য সংখ্যা দুইয়ের কম হইবে না।

বাহির হইতে দেখা যায় District School Boardএর সদস্য সংখ্যা অধিকাংশই বে সরকারী। কিন্তু বে-সরকারী সদস্য সমূহের সুবিধা ব্যর্থ হইয়াছে যখন সরকার সরকারী কর্ম্মচারীর মধ্য হইতে President মনোনয়নের ভার স্বহস্তে রাখিয়াছেন। মনে হয় উক্ত সভার President জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটই হইবেন। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, প্রেসিডেণ্ট সরকারী সদস্যগণের সমর্থনে সভার কার্য্য তদনুকূল করিয়া লইতে পারিবেন। ফলতঃ দেখা যাইতেছে সরকারের মুষ্টির মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।

এতকাল পর্য্যন্ত বে-সরকারী চেয়ারম্যানের অধীনে District Board চালিত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে যখন জাতীয় শিক্ষার আবশ্যকতা ও বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষার দোষ লোকে অনুভব করিতেছে,তখন সাধারণের হাত হইতে সরকারের হস্তে শিক্ষার বন্দোবস্ত হস্তান্তরিত হইলে শিক্ষাব্যাপারে সাধারণে তত আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিবে না। আমরা বুঝিতে পারি না বাঙ্গলার District Board সকল প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় দেশীয় লোক কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রাইমারী শিক্ষা ব্যাপারকে সরকারের হস্তে তুলিয়া দিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মৌলভী আবদুল করিমের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারণের জন্য বে-সরকারী সদস্য বহুল কমিটির প্রস্তাব সরকার নাকচ করিয়া দিয়াছেন। সরকার দুই ধারার ১৪ ক্লজ (clause) ও ৬৫ ধারার সি-ক্লজ (C-clause) অনুযায়ী পুস্তক নির্ব্বাচনের ভার স্বহস্তে রাখিয়াছেন।

এক্ষণে জাতীয় কৃষ্টির (Culture) দিক হইতে প্রাথমিক বিলের বিষয়গুলি ভাবিয়া দেখা যাউক। এই বিষয়টি আলোচনার পূর্ব্বে বিলটি তাড়াতাড়ি পাশ করাইবার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। ৪৮ জন হিন্দু সদস্য প্রতিবাদ স্বরূপ যখন সভায় অনুপস্থিত ছিলেন, তখন তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে ব্যবস্থাপক সভায় কোনও বিল সরকারী ভোটের সাহায্যে সত্বর পাশ করাইয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। হিন্দু সদস্যগণ যখন সমগ্র ভাবে ইহার বিরোধী তখন শুধু সরকারী ও মুসলমান সদস্যগণের ভোটে এই রকম কোনও বিলকে পাশ করান মানে ভেদ বুদ্ধির সহায়তা করা। এই প্রকার ভেদ বুদ্ধির ফলেই ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গলায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা এত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগের সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে কেন এত তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করিলেন,এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সহজেই বুঝিতে পারেন। হিন্দু জাতি দীর্ঘকাল যাবৎ পরাধীন থাকিলেও মুসলমান আমলে আপনার জাতীয় বৈশিষ্ট রক্ষা করিয়া, শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম্ম বিষয়ক ব্যাপারে স্বাধীন ভাবে চলিয়া পরাধীনতার যন্ত্রণা বর্ত্তমান কালের ন্যায় তীব্র ভাবে অনুভব করে নাই। এই জন্যই মনে হয় এই জাতি অন্যান্য প্রাচীন জাতিসমূহের ন্যায়—যথা প্রাচীন মিশর ব্যাবলিয়ক, রোম গ্রীক্ প্রভৃতি—ধরাতল হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হয় নাই। ইংরেজ জাতি যখন এদেশে আসিলেন তখন হিন্দুদিগের উপর তাহাদের নজর পড়িল। হিন্দুজাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারা রুদ্ধ করিতে না পারিলে এই জাতিকে রোমকর্ত্তৃক শাসিত বৃটন্‌দের ন্যায় চির-ক্রীতদাসরূপে রাখা যাইবেনা ইহা মনে করিয়াই বোধ হয় ইংরাজশাসকগণ এদেশে রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা বিস্তারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বলা যাইতে পারে ভারতের পরাজয় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীক্ষেত্রে নির্ণীত হয় নাই—তাহার প্রকৃত পরাজয় হইয়াছে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন দেশীয় ভাষায় শিক্ষার পরিবর্ত্তে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল তখন। এই প্রকারে তদবধি ইংরেজ সরকার শিক্ষাব্যাপারে, ধর্ম্মব্যাপারে ও সমাজবিষয়ে ক্রমে ক্রমে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। যতদূর মনে হয় একম্বিধ হস্তক্ষেপই ভারতে সিপাহীবিদ্রোহের অন্যতম কারণ। সেইজন্যই মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের রাজ্য ভার গ্রহণের সময় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ভারতীয় জাতির সমাজ ও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইবেনা। কিন্তু শিক্ষাব্যাপারে সরকার বাধা প্রাপ্ত না হইয়া বরং দেশীয় লোককর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্তই হইয়াছিলেন। তাহার কারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ইংরাজী শিখিয়া পয়সার মুখ দেখিতে লাগিলেন এবং আত্মবিক্রয় করিয়া আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ ইংরেজীভাবাপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন ও তৎসঙ্গে স্ব স্ব সমাজের ও ধর্ম্মের কল্পিত ত্রুটির দিকটা দেখিতে লাগিলেন। ফলে ধর্ম্ম বিষয়ে ও সমাজ বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের শ্লথভাব আসিল এবং তাঁহারা ভারতীয় ধর্ম্ম, সমাজ, আচার ব্যবহার

রীতি নীতি সমস্তকেই বর্ব্বরোচিত মনে করিলেন। এই প্রকারে সরকার প্রবর্ত্তিত শিক্ষার ফলে জাতীয়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সাম্প্রদায়িক বিবিধ প্রকারের বিদ্বেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—যে বিদ্বেষবহ্নিতে পুড়িয়া ভারতের নানাজাতি এক্ষণে ধ্বংসের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাঙ্গালাভাষাভাষী স্থানসমূহকে লইয়া—যথা সিলেট, শিলচর, গোয়ালপাড়া, ও বালেশ্বরের কতকাংশ ও মালভূম প্রভৃতি—যদি বাঙ্গলাদেশ পুনঃ গঠিত হয় এবং তাহা হওয়াও ন্যায় সঙ্গত এবং তজ্জন্য অনেক আন্দোলনও চলিয়াছে—তাহা হইলে বাঙ্গলার মুসলমানসংখ্যা হিন্দুদিগের সংখ্যার প্রায় সমান হইয়া যায়। বিশেষতঃ বাঙ্গলার বাহিরে বঙ্গভাষাভাষী লোকদিগের অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসিগণ সরকারী চাকুরী বিষয়ে, তুল্য অধিকার প্রাপ্তি বিষয়ে ও শিক্ষা ব্যাপারে যে যে অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহার প্রতীকারও সহজসাধ্য হইতে পারে। কিন্তু সরকার ভাষাহিসাবে দেশগঠনে সহজে রাজি হইতেছেন না। এক্ষণে এতদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলাদেশে মুসলমানদিগের সংখ্যাগরিষ্ঠতাহেতু মুসলমানগণ, কাউন্সিল (Council), মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, লোকালবোর্ড, য়ুনিয়ান্‌বোর্ড প্রভৃতিতে তাহাদের সদস্য সংখ্যা হিন্দুগণের সদস্য সংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি করাইয়া লইয়াছে। শিক্ষাবিভাগেও তাহাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে—যথা মুসলমানদিগের শিক্ষার উন্নতির জন্য একজন Assistant Director রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন শিক্ষাব্যাপারে, বিশেষবৃত্তি, বিশেষ অধিকারও যথেষ্ট আছে। তাহা ছাড়াও সরকারী চাকুরী বিষয়ে তাহাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ অধিকার প্রাপ্তির জন্যও যে তাহাদের চেষ্টা না আছে এমত নহে। এই সকল দাবী যদি উপযুক্ততার দিক দিয়া করা হইত তাহা হইলে কাহারও বিশেষ আপত্তি থাকিত না। দেশের উন্নতির প্রকৃত পরিপন্থী বলিয়াই এই সকল দাবীতে অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া কাড়াকাড়ি ভাগাভাগি বাস্তবিকই দেশের পক্ষে অকল্যাণকর।

বর্ত্তমান প্রাইমারী শিক্ষাব্যাপারে যে প্রকারে Central Committee ও District School Board গঠিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হইলে শিক্ষার কার্য্যে অনেক বিশৃঙ্খলা ও বাধার সৃষ্টি হইবে। উক্ত কমিটি বা জেলা বোর্ডে হিন্দুর সদস্য সংখ্যা ও প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা খুব অল্প হইবে এবং মুসলমানগণ উক্ত শিক্ষাবিষয়ে (স্বার্থের দিক দিয়া, দেশের দিক দিয়া নহে) তাহাদের সাম্প্রদায়িক দাবী উত্থাপন করিবে। ফলে একদিকে মুসলমানদের প্রাধান্য বশতঃ ও অন্যদিকে সরকারের প্রভাবও পুস্তক নির্ব্বাচনের ভার স্বহস্তে রাখার দরুণ হিন্দুদিগের সাধনামূলক (cultural) শিক্ষার পথে অনেক বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং মনে হয় দুই চাপে হিন্দু সাধনার ধারা অচিরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

প্রাইমারী শিক্ষা ব্যাপারেও যে সরকারের চাতুরী না আছে এমন মনে হয় না:—শৈশবকালে যে শিক্ষার বীজ বালকের অন্তরে বপন করা হয় তাহাই অধিকাংশ স্থলে পরবর্ত্তীকালে তাহার মনোবৃত্তি গড়িয়া তোলে। এরূপ ক্ষেত্রে শিশুগণের শিক্ষার উপর জাতীয় প্রভাব থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং সরকারেরও এ হিসাবে শিক্ষার ভার দেশীয়

লোকদিগের উপর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে ভিন্নপথ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। এই ভিন্ন পথ অবলম্বন বিষয়েও সরকার এক বিশেষ চতুরতা দেখাইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট এ ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ না করিয়া দেশীয় একদল লোকের দ্বারা তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করাইবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন। সরকার সুকৌশলে যে প্রাইমারী শিক্ষার ভার পরোক্ষভাবে নিজ হাতেই রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন তাহা বুঝিতে বোধ হয় কাহারও বাকী নাই। মুসলমানদের মধ্যেও যে অনেকে সরকারের এই চতুরতা না বুঝিয়াছেন এমত নহে। তবে মুসলমান নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেক সময় অন্ধ হইয়া থাকেন এবং কেহ কেহ হিন্দুদিগের প্রতি অযথা বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন। তাহাদের মধ্যে অনেকে যে কাল্পনিক বিভীষিকা দেখিয়া থাকেন তাহা মুসলমান নেতাদিগের কাহারও কাহারও বক্তৃতা হইতে বেশ বুঝা যায়। মিষ্টার জিন্নার ১৪ দফা বাঁধন-কষণের দাবীর কারণ অনুসন্ধান করিলেও উক্ত বিষয়ে যথার্থ্য প্রমাণিত হইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে হিন্দুর জাতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য—মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের জাতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য হইতে পৃথক্। হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম জন্মান্তর বাদ প্রভৃতি জাতীয় সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলমান ও খৃষ্টানগণ তাহা মানে না। কিন্তু এই সকল মতবাদ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারত ভূমিতে চলিত ও সংবর্দ্ধিত হইয়া হিন্দুর জীবনপ্রণালী সংগঠন করিয়া আসিয়াছে আর তাহাই হিন্দুর জাতীয় জীবনের ধাতসহ হওয়ায় হিন্দুজাতির প্রাণের পরিপোষণ করিয়া আসিতেছে ও হিন্দুর চিত্তে শান্তি দান করিয়া থাকে। উহাই ভারতীয় উচ্চনৈতিক জীবনের পক্ষেও ভাইটামিনের (vitamin) কাজ করিয়া আসিতেছে। আধুনিক উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাতে তাহার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা পূর্ব্বেই হইয়াছিল এক্ষণে প্রাথমিক শিক্ষাবিলের অনুযায়ী যদি শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয় তাহা হইলে তাহার মূলোচ্ছেদনে বাঙ্গালী হিন্দুজাতি কৃষ্টির দিক দিয়া যে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা একবার হিন্দুগণ ভাবিয়া দেখুন।

হিন্দু চিরকালই শান্তি ও মিলনের প্রার্থী। হিন্দুগণ বিরোধ অপেক্ষা মিলনকেই জীবনের বরণীয় বস্তু মনে করিলেও দুর্ব্বলতার দিক দিয়া মিলনকে তাহারা অধঃপতনের কারণ মনে করে। মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাবেদীতে যে মিলন তাহাই সত্য ও মহনীয়। স্বাদেশিকতার ঐক্যও তাহাদের বরণীয় বস্তু। এই উভয় প্রকার মিলনের দিকেই হিন্দুগণ তাকাইয়া আছে। তাই তাহারা চৌদ্দটি সর্ত্ত দেখিয়া ও আলিভাইয়ের উষ্মা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হয়। তাহাদের ব্যথিত হইবার কারণ মুসলমানদের চৌদ্দটি সর্ত্ত পরিপূর্ণ করিতে হইলে হিন্দুদিগকে অনেক কিছু ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং ইহাতে তাহাদের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত দারুণ ভাবে আহত হইবে। তাই হিন্দুজাতির পক্ষে মিঃ জিন্নার চৌদ্দটি সর্ত্ত কড়ায় গণ্ডায় প্রতিপালন করিয়া মিলন অপেক্ষা অ-মিলনই মনুষ্যত্বব্যঞ্জক। নব্য ভারত যে স্বাধীনতা পাইতে যাইতেছে তাহার নাম স্বরাজ হইলেও উহা মিলিত স্বরাজ হইবে বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানগণের দান অপেক্ষা দাবীর আকাঙ্ক্ষা অধিক হওয়া কতটা দেশের পক্ষে ও সম্প্রদায়ের পক্ষে কল্যাণকর, তাহা তাহাদের সমাজপতিগণ ভাবিয়া দেখুন্।

হিন্দুদিগেরও কর্ত্তব্য পথ ভাবিয়া দেখা উচিত। যদি এখনও হিন্দুগণ সংঘবদ্ধ ভাবে

কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় ভাবধারার সহায়ক ভাবে পরিচালিত করিবার জন্য তদনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িতে চেষ্টা না করে কিংবা এতদ্বিষয়ে যাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন তাঁহাদের সাহায্য না করে তাহা হইলে মনে হয় ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালী হিন্দুজাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এখনও সময় থাকিতে হিন্দুদিগের সতর্ক হওয়া এবং তাহাদের মনে রাখা উচিত—'অল্পানামপি বস্তুনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা' এবং তৎসঙ্গে তাহারা যেন ইহাও স্মরণ করে যে, হিন্দু-জাতির কি সঙ্কটকাল উপস্থিত এবং বঙ্গের প্রাইমারী শিক্ষা বিল হিন্দুর সঙ্কটকে আরও কত খানি বৃদ্ধি করিতে যাইতেছে। এ সময় হিন্দুকে বাস্তবিকই আত্মস্থ হইতে হইবে। জাতির সত্যকার সাধন দৃষ্টি উন্মীলিত করিবার উপায় দেখিতে হইবে। সত্যকার শক্তির উৎসের রুদ্ধ মুখগুলি উন্মোচিত করিতে হইবে। সেই উপায় শিক্ষা। আজ কোথায় সেই উপায়ের সাধনে জাতীয় শক্তি-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে ; তাহা না করিয়া সেই সাধনকেই আরও অবরুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। হিন্দু কি ইহাতে নীরবই থাকিবে !

বৈষ্ণবকবিতা ও রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সাহা, এম, এ

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবকবিতাশীর্ষক একটী কবিতা আছে। কবিতাটী অতিশয় মধুর এবং সুন্দর। কবি ইহাতে বৈষ্ণব কবিতার উৎপত্তি ও তত্ত্ব সম্বন্ধে একটী মত প্রকাশ করিয়াছেন। মতটী মোটেই সমীচীন নহে। ইহাতে বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে অর্দ্ধসত্য, অ-সত্য, এবং সত্যাভাস আছে। খানিক মনোহর কল্পনা আছে। বৈষ্ণব কবিতার মূলতত্ত্বের কোনো আভাস নাই। বৈষ্ণব কবিতাকে নিগূঢ়-রত্নাসন হইতে টানিয়া আনিয়া প্রাকৃত কবিতার সাধারণ ভূমিতে স্থাপন করা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকার কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমিতির পক্ষ হইতে বিশেষ আপত্তি জানাইয়াছে। এ বিষয়ে রবিবাবুকে পত্র লেখা হয়। রবিবাবু সে পত্রের কোন উত্তর দেন নাই। সে জন্য অনেক পরিতাপও প্রকাশ করা হইয়াছে। পত্র লেখাটাই অসঙ্গত হইয়াছিল। রবিবাবু উত্তর না দিয়া ঠিকই করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। কোন প্রকার জবাবদিহি করিতে তিনি বাধ্য নন।

উল্লিখিত কবিতার প্রকাশিত মতটী যে সত্য নহে ইহা বুঝিয়া দেখা সকলেরি আবশ্যক। কবি এই কবিতায় বিলাতী চিন্তার ভ্রান্তধারা অনুকরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—শ্রীরাধা প্রাকৃত নায়কগণের—এই পৃথিবীর প্রেমপিপাসিনী সুন্দরীবৃন্দের—একখানি মনোরম আদর্শ প্রতিমা। এই ধরণীর নবীন রূপসী কিশোরীগণের রূপলাবণ্য ভাব রাগাদি অণুপরমাণু ক্রমে আহরণ করিয়া কবিগণ শ্রীরাধা-চরিত্রটী নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সমুদয় ব্যাপার জাগতিক

নরনারীর প্রেমব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কবিগণ ধীরে ধীরে রচনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা উপন্যাস। নিত্য শুদ্ধ বাস্তব বিষয় নহে। এই কথাগুলি তিনি এমন করিয়া রুক্ষ ভাবে বলেন নাই। কবিতার ভাবে ভাষায় কোমল করিয়া কমনীয় করিয়া বলিয়াছেন।

এই প্রেমগীতিহার গাঁথা হয়
নর-নারীমিলনমেলায়। * *

আবার,

এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্তদীনতীব্রব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
থালি হ'তে !

অধ্যাত্মবিষয়ে এবং সাধারণ মনস্তত্ত্ববিষয়েও এই প্রকার ক্রমবিবর্ত্তবাদ বা ইভোলিউশন-থিওরি প্রয়োগ করার একটা পদ্ধতি ইয়ুরোপে এক সময়ে খুব চলিয়াছিল। এখন তাহার অযৌক্তিকতা নানাপ্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণ সাংসারিক বিষয় কল্পনায় সংশোধিত ও রঞ্জিত করিয়া উজ্জ্বলভাবভূমিতে উন্নীত করিয়া চিরস্থায়ী করিয়া রাখার যে মানসব্যাপার—তাহার ইংরেজী নাম আইডিয়ালিজেশন। রবিবাবুর মতে শ্রীরাধা এই প্রকার কল্পনার রাগ-রঞ্জিতা ভাববিলাসিনী রমণী। এই সব কথার একটী মোহিনী শক্তি আছে। ইহাতে সাধারণ চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এই চিন্তাপ্রণালী সনাতনধর্ম্মবিষয়ে বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মব্যাপারে নিতান্তই অপ্রযোজ্য। যে কোন অধ্যাত্ম বিষয়ে ইহা প্রয়োগ করিতে গেলেই ভ্রমের পর ভ্রমের খেলা আরম্ভ হইবে। ইন্‌ডাকৃশন, ইভোলিউশন, আইডিয়ালিজেশন প্রভৃতি চিরপরিবর্ত্তনময় দেশকালানুগত প্রাপাঞ্চিক বিষয় সমূহেই কেবল প্রয়োগযোগ্য। যাহা অপার্থিব, গুণাতীত, নিত্য, সত্য, চিন্ময় সেই সকল বিষয়ে এই সব বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক বিচার প্রণালী প্রয়োগ করিতে যাওয়া নিতান্ত অসঙ্গত।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা নিত্য সত্য সনাতন

ইহা প্রপঞ্চাতীত। দৃশ্যমান বিশ্ব-সংসার শ্রীকৃষ্ণধামের তুলনায় ছায়ামরীচিকা মাত্র। সংসারিক ব্যাপার সমূহের এবং মানবজীবনের রূপরসের সার সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণলীলা রচিত হয় নাই। কৃষ্ণলীলার একটী সুদূরতম প্রতিবিম্বানুবিম্ব এই জগৎপ্রপঞ্চ। মানবীর রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া তদনুকরণে কবিগণ শ্রীরাধার রূপমাধুর্য্য রচনা করেন নাই। শ্রীরাধা অপরিসীমরূপ-সুষমায় নিত্য কাল বিদ্যমান আছেন বলিয়াই পৃথিবীতে অগণিত রূপসী রূপরসবিলাস লইয়া বিচরণ করিতেছে। শ্রীরাধার অনন্তসৌন্দর্য্যসিন্ধুর তরঙ্গাবলীর ক্ষীণতম ছায়াপ্রতিবিম্ব এই রমণীয়া রমণীগণ। যাহা সত্য রবিবাবু তাহার উল্টা কথাটী বলিয়াছেন। ঋষিগণ, রসিকগণ, অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শী ভাবুক ও কবিগণ তাহাদের জীবন ব্যাপী যোগ তপস্যা এবং ভক্তিসাধনার ফলে শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে এই সব নিগূঢ়তত্ত্ব যুগে যুগে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত বিজ্ঞজনানুভবসিদ্ধ অধ্যাত্মদর্শনানুমোদিত অপরোক্ষপ্রমাণিত বিষয়। তুচ্ছ কবি কল্পনা ইহার কাছে সূর্য্যকিরণাহত কুয়াশাবিন্দুবৎ মুহূর্ত্তে মিলাইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্। অনন্ত-

জ্ঞানবিদ্যাভক্তিসাধনা-সিদ্ধ গোস্বামিগণ সমস্ত শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া এই সিদ্ধান্তকৌস্তভ উদ্ধার করিয়াছেন। এই কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধা।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব-কান্তি সম্মোহিনী পরা।

শ্রীভগবানের রূপলীলারসবিলাসমাধুর্য্যের যে অসীম প্রকাশপরম্পরা তাহা যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না, বুঝিতে পারেন না,ধারণামাত্র করিতে পারেন না—তাঁহারাই কৃষ্ণলীলার সম্পর্কে নানা প্রকার বালকভাবায়মানা কল্পনার আশ্রয় লইয়া থাকেন।

কৃষ্ণলীলার অধ্যাত্মবিজ্ঞানানুমোদিত সাধন-বিধান আছে। সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে সাধকগণ কৃষ্ণলীলা দর্শন করিতে পারেন। এবং দেহান্তে কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ করিতে পারেন। যুগে যুগে এই লীলা ঋষিগণ, সাধুগণ এবং ভক্তিযোগিগণ দর্শন করিয়াছেন। বর্ণনা করিয়াছেন। প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতে শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাশক্তিতে শত সহস্র ভক্ত কৃষ্ণলীলা অনুভব করিয়াছেন, প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন এবং অবশেষে ইহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। রূপসনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণ এই লীলা সাধনার শুধু সিদ্ধশিক্ষক নহেন, ইহার অধিদেবতা স্বরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গ মূলতত্ত্বকেন্দ্র। শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শ্রীস্বরূপ দামোদর রায়রামানন্দ এবং গোস্বামিগণ এই মহীয়সী লীলা সাধনার সমুজ্জ্বল রসপরিবেশ। তারপর সহস্র সহস্র ভক্তিভাবোদ্দীপিত নির্ম্মলপ্রাণ রসিক ভক্তগণ। ইহাদের কাছে কৃষ্ণলীলা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহাদের কেহ কেহ পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এবং পরে আরও কয়েকজন পদকর্ত্তার আবির্ভাব হইয়াছিল। মোটামুটিভাবে খৃষ্টীয় ১৫৫০ হইতে ১৬৫০ সন পর্য্যন্ত বৈষ্ণব কবিতার যুগ। জয়দেব চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এই তিন জন মহাপ্রভুর পূর্ব্বগামী মহাজন। ইহারা কেহই আপন আপন প্রেয়সীর রূপের চর্চ্চা করিয়া শ্রীরাধার রূপের ছবি আঁকেন নাই। জয়দেবের পদ্মাবতী, চণ্ডীদাসের রামীরজকিনী, এবং বিদ্যাপতির লছিমাদেবী এই প্রকার দুই চারিটী উদাহরণ ব্যতীত বৈষ্ণব-কবিগণের অনেকেই আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। রমণীরূপানুশীলন তাঁহারা করেন নাই। তাঁহারা হয় স্বচক্ষেই শ্রীরাধা-রূপের কোন না কোন প্রকাশ দর্শন করিয়াছিলেন, নতুবা যাঁহারা গোস্বামিগণের মত শ্রীরাধাকে নিয়তই দর্শন করিতেন এবং দর্শন করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে রাধা-রূপ ধ্যান করিয়া পদরচনা করিয়াছেন। আমরা যে এইসব কবিতার রাধারূপবর্ণনায় প্রাকৃত কিশোরীগণের ছায়াছবি দেখিতে পাই—তাহার এক কারণ আমাদের চিত্ত উহা ছাড়া আর কিছু জানে না। ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি। দ্বিতীয় কারণ—চিন্ময় রূপমাধুর্য্য ও অপ্রাকৃত ভাব সৌন্দর্য্য বর্ণনার পৃথক কোন ভাষা নাই। প্রাকৃত বিষয় বর্ণনারও যে ভাষা অপ্রাকৃত বিষয়ের জন্যও তাই। বৈষ্ণব কবিগণ যাহা বলেন আমরা তাহা যথাযথভাবে বুঝিতে পারি না। অবিকল একরূপ একখানি সোনার প্রতিমা আর একখানি মাটীর প্রতিমার যে বর্ণনা হইবে তাহাতে বিশেষ কোন ভেদ থাকিবে না। কারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্তই একপ্রকার। কেবল উপাদানের পার্থক্য। অথচ কি সাংঘাতিক পার্থক্য। বৈষ্ণব কবিগণ অপ্রাকৃত রূপ, রস ও ভাবেরই বর্ণনা করেন। আমরা

দেখি প্রাকৃত রূপ, রস ও ভাব। কারণ আমাদের বিদ্যা ঐ পর্য্যন্ত। কাজেই আমরা মনে করি মানবীর ভাব-রূপ চুরি করিয়া এই কবিগণ রাধা চিত্র রচনা করিয়াছেন। সাধকগণ ইহা শুনিয়া হাস্য করেন। চৈতন্যচরিতামৃতের আদির চতুর্থে এবং মধ্যের অষ্টমে যে রাধা-রূপের বর্ণনা আছে তাহা পাঠ করিলেই নারীরূপের কবি কল্পনা এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এবং রবিবাবুর অভিমতের একান্ত নিরর্থকতাও বোধগম্য হয়।

আমাদের আলোচ্য কবিতাটীর প্রথমকার কয়েকটী লাইন পড়িয়াই স্পষ্ট বোঝা যায় যে কবিবর বৈষ্ণব শাস্ত্রের বিশেষ কিছু না জানিয়াই "বৈষ্ণব কবিতা" সম্বন্ধে "কবিতা" লিখিয়াছেন। শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ? এই কবিতার আরম্ভ। বৈষ্ণবের গান—অর্থাৎ গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিগণের রচিত পদাবলী—মোটেই বৈকুণ্ঠের জন্য নয়। ইহা গোলোক, গোকুল বা বৃন্দাবন বিষয়িনী। বৈকুণ্ঠ নারায়ণের ধাম। "নারায়ণ এবং লক্ষ্মী" সেখানে ঐশ্বর্য্যের ব্যাপার। আনন্দ-চিন্ময়রস প্রতিভাবিতা ব্রজকিশোরীগণের সহিত কৃষ্ণের প্রেমমাধুর্য্য-সুষমাময়ী বিরহমিলনলীলা বৈকুণ্ঠের ব্যাপার নহে। সে যে বৈকুণ্ঠ! সেখানে বিরহোৎকুণ্ঠা—"একতিল শতযুগ দরশনে মানি", বাসকসজ্জা, নিশিজাগরণ, অসহ্য উদ্বেগ, অভিসারাদি নাই। দ্বিতীয় লাইনে আছে—পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান। ইহা কৃষ্ণলীলার কোনো বিষয়পর্য্যায় বা ভাব-পর্য্যায় নহে। ইহা বৈষ্ণবপরিভাষা-সঙ্গত নহে।

প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব। এই একটী ক্রম। আবার রূঢ় ও অধিরূঢ়, মোদন ও মাদন। আবার উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি। আবার সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা।

ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম প্রভৃতি বিংশতি অলঙ্কার। অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা—নায়িকার এই অষ্টাবস্থা। ইত্যাদি অসংখ্য ক্রম ও পর্য্যায়ের পরিভাষা আছে। রবি-বাবুর কবিতার প্রারম্ভেই আছে—

পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা।

ইহা নিতান্ত এলোমেলো কথা। একটু পরই বলিয়াছেন—এ কি শুধু দেবতার ?—কৃষ্ণলীলার সহিত দেবতার বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নাই। স্বর্গ ও দেবতা প্রকৃতিরাজ্যের অন্তর্গত। কৃষ্ণলীলা প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত। কৃষ্ণলীলার সহিত দেব জীবনের কোনো সম্বন্ধ থাকিলে—স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ব্রজের গোপবালক ও গোবৎসগণকে হরণ করিয়া অমন করিয়া অপদস্থ হইতেন না। কৃষ্ণলীলা মাধুর্য্যলীলা এবং সেইজন্যই অবিকল নর-লীলা। কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহার স্বরূপ।—পরং ব্রহ্ম পরং ধাম। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যং। তিনি সম্পূর্ণরূপে মানুষ। অতি গহন গভীর রহস্য। বেদ প্রকাশক ব্রহ্মা—সৃষ্টি রহস্যে যাঁহার পরিপূর্ণ অধিকার তিনিও ইহা বুঝিতে পারিলেন না। বিমোহিত হইলেন। তাঁহার মোহ যখন অপনোদিত হইল—তখন তিনি কৃষ্ণকে স্তব করিতে প্রথমেই বলিলেন—

নৌমীড্য তেহভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছল সন্মুখায়।
বণ্যস্রজে কবলবেত্র বিষাণ বেণু—
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়।

ব্রহ্মা দেখিলেন নিখিল দেব-ঋষি-মুনিগণের একমাত্র উপাস্য কৃষ্ণ—একটী গোপবালক। নীল মেঘের মত রং। পীতবসন। গুঞ্জামালা গলায়। শিরে ময়ূরপুচ্ছের মুকুট। বেত্রশিঙ্গাবেণু প্রভৃতি তাঁহার প্রিয় ব্যবহারের দ্রব্য। তিনি দধি মাখাইয়া অন্ন খাইতেছেন। কৃষ্ণলীলা নরলীলা। অথচ দেবগণের দুরধিগম্য, নরলীলা। কিন্তু অপ্রাকৃত। মানবের সাধনার বিষয়। তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ।

এই কবিতায় রবিবাবু শ্রীরাধা সম্বন্ধে তত্ত্ববিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন। অথচ রাধাই রবিবাবুর কাব্য জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দরজা হইতে বাহির করিয়া দিয়া তিনি শ্রীমতীকে জানালা দিয়া ঘরে আনিয়াছেন। শতাধিক কবিতা বিশ্লেষণ করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়া দেখানো যায়। একি কৌতুক নিত্য নূতন ওগো কৌতুকময়ি! কবিতাটী একটী উদাহরণ। জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্র রূপিণী! (চিত্রা) কবিতাটীর শ্রীরাধা ছাড়া আর কোনো অর্থ হয় না। আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার—কবিতার অর্থ আমি সব পরিত্যাগ করিয়া নিকুঞ্জ বনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর সেবা গ্রহণ করিতে চাই। অসংখ্য উদাহরণ আছে। এখানে একটী কবিতার কথা বিশেষ করিয়া বলিব। কবিতাটীর নাম মানস-সুন্দরী।

অধ্যাত্ম রাজ্যে অরূপ আর রূপ লইয়াই যত গোলমাল। সাকার ও নিরাকারের ভেদ অতি গুরুতর বিষয়। সাকার ও নিরাকারের সামঞ্জস্য সাধন যাহারা করিয়াছেন—তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে ভগবৎ-তত্ত্ব যথাসম্ভব বুঝিয়াছেন। রূপ পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মের অন্ততঃ অর্দ্ধেক পরিত্যক্ত হয়। রূপই স্বরূপ। প্রকৃত জগতে রূপ স্বরূপের বহিরাবরণ এবং নশ্বর। চিন্ময় রাজ্যে রূপ ও স্বরূপে ভেদ নাই। কারণ সেখানে সজাতীয় বিজাতীয় স্বগতাদি ভেদ নাই। ভগবানের রূপ অস্বীকার করার কোনো দার্শনিক হেতু নাই। আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি।

শ্রীকৃষ্ণ পর-তত্ত্ব। জ্ঞান যোগ ও ভক্তির সাধনানুসারে তিনি ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান—এই তিন রূপে প্রকাশিত হন। ভগবান রূপমাধুর্য্যবান। যিনি বিভু, ব্রহ্ম, অনন্ত অপরিমেয় শক্তি। যাঁহাতে চন্দ্র-সূর্য্য নক্ষত্র বিদ্যুদগ্নি বিলীন হইয়া যায়, তিনি বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং। শ্যামং শান্তংত্রিভঙ্গং। ফুল্লেন্দীবর কান্তিমিন্দুবদনং—প্রভৃতি রূপে মূর্ত্ত হন কেমন করিয়া ইহাই সংশয়। শ্রীরাধা কৃষ্ণের আনন্দরসময়ী পরা শক্তি। তিনি আবার গোরোচনা গৌরী নবীনা কিশোরী—চম্পক বরণী বয়সে তরুণী হাসিতে অমিয় ধারা। ইন্দ্রজালক কুসুম সায়ক কুহকী ভেলী বরনারী—ইত্যাদি কেমন করিয়া হন। ইহা এক নিদারুণ সমস্যা।

রবিবাবুর মানসসুন্দরী কবিতায় এই প্রকার একটী সমস্যার সমাধানের চেষ্টা আছে। শক্তি ও ভাবের রূপ গ্রহণ সমস্যা। কবি নিজের কবিত্বশক্তি—অর্থাৎ তাঁহার কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে' সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। শক্তি সম্পূর্ণরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া কবির সম্মুখে আসিয়াছেন।

এস তুমি প্রিয়ে,
আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা কল্পনা লতা। * * আনন্দ আভায়
বড় বড় দুটী চক্ষু পল্লবপ্রচ্ছায়
রেখো মোর মুখপানে। * তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরায় অস্থির
এক বালকের সনে কি খেলা খেলাতে সখি!

এ পর্য্যন্ত কল্পনাময়ী কবিতাই চলিতেছে। অমূর্ত্ত শক্তিকে কবি কল্পনা বলে প্রত্যক্ষমূর্ত্তিমতী করিয়া আনিয়া কাছে বসাইয়াছেন। প্রেম সম্ভাষণ করিতেছেন। অত্যন্ত মনোরম পার্সনিফিকেশন। তারপর উপরে দার্শনিক চিন্তারাজ্যে—অর্থাৎ নিবিড়তর ভাব-রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

মানসী রূপিনী ওগো, বাসনাবাসিনী,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কি গো মূর্ত্তিমতী হ'য়ে,
জন্মিবে মানবগৃহে নারী রূপ লয়ে,
অনিন্দ্য সুন্দরী!

এই আলোক-বসনা এখন বিশ্বময় বিরাজ করেন। সন্ধ্যার কনকবর্ণে, উষার গলিত-স্বর্ণে, পূর্ণ তটিনীর জলে এবং বসন্ত বাতাসে ইনি অনুভূয়মানা। ইনি পূর্ণিমা রাতে নির্জ্জন গগনে বিরহশয়ন বিছাইয়া থাকেন। গভীর-অরণ্য-ছায়ায় উদাসিনী হইয়া বসিয়া থাকেন। বিকালে বকুলতলায় আলোছায়া দিয়া বসন বয়ন করেন। করুণ কপোতকণ্ঠে মূলতান গান করেন।—এই যে অন্তহীন ভাব-রূপময়ী—ইনিই কিন্তু বৈষ্ণবের শ্রীরাধার একাঙ্গিনী বিভূতি।

প্রতিবিম্বং হি রাধায়াঃ শ্রীমূর্ত্তের্ব্রজকাননং। * *
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্ বিদিক্ষুস্ফুরন্তী। গোবিন্দলীলামৃত।
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে
তুমি চঞ্চল-গামিনী!

ইনিই কবির অন্তর্যামিনী কাব্যাধিষ্ঠাত্রী। আমার মাঝারে কে গো সে—কোন বিরহিনী নারী!

অযুত আলোকে ঝলসিছ নীলগগনে!
সেই তুমি,
মূর্ত্তিতে দিবে কি ধরা? এই মর্ত্ত্য ভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে,
সর্ব্ব ঠাঁই হ'তে, সর্ব্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি?

এই প্রশ্নের তাৎপর্য্য কি? নিরাকারবাদের দিক হইতে বিচার করিলে এ প্রশ্ন একেবারে অসঙ্গত। কিংবা নিতান্তই কবিতা। জ্ঞান ও নহে। তত্ত্বও নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনে ইহা কেবলি কবিতা নহে। তেমনি গীতাঞ্জলির—

সুন্দর! তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।
অরুণ-বরণ পারিজাত লয়ে' হাতে।

প্রভৃতি কথাও সাময়িক কবিত্বের খেয়ালে বলা হয় নাই। বরাবর একটী চিন্তা ধারাই চলিয়াছে।

বিশ্বব্যাপিয়া সকল আলোকে, সকল সুষমায়, সকল মাধুর্য্যে, সকল সুকুমাররূপে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী-রূপিণী যিনি বিরাজ করিতেছেন, যিনি কবির হৃদয়-কমলে আসন করিয়া তাঁহার কাব্যের সকল রমণীয় রস এবং সুবিমলভাব সমূহ প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে বৃন্তহীন পুষ্পসম' ফুটাইয়া তুলিতেছেন—তিনি কি কেবলি ভাবময়ী—রূপময়ী মূর্ত্তিময়ী নন্? ইহাই কবির আন্তরিক প্রশ্ন। অতি সুগভীর জিজ্ঞাসা। রূপজিজ্ঞাসা এবং মূর্ত্তিজিজ্ঞাসা। ইহার উত্তর স্ফুটভাষায় প্রদত্ত না হইলেও অস্পষ্ট নহে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ছত্রে ছত্রে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে—যে আনন্দসৌন্দর্য্যশক্তি মূর্ত্তিমতী। শুধু ভাবময়ী নন। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে কবির হৃদয় অমূর্ত্তভাব লইয়া সন্তুষ্ট নয়। কাব্য-পথে কল্পনামূর্ত্তি গড়িয়া কবি তৃপ্তিলাভ করিলেন না। তাই—পরিপূর্ণ দেহ, মঞ্জরিত বল্লরীর মত—ইত্যাদি বলিয়া আবার বলিতেছেন—সেই তুমি মূর্ত্তিতে দিবে কি ধরা? কবির অন্তরতম প্রদেশে এই ধারণা জাগিয়াছে যে অমূর্ত্তরূপমাধুর্য্যের পশ্চাতে নিশ্চয়ই মূর্ত্তরূপমাধুরী আছে। অনন্ত সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে এক চিরসুন্দরী অনাদিকাল বিদ্যমান আছে। যত রমণীয়তা সমস্তই কোন অমৃতময়ী রমণীর নিত্য ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণার অভিব্যক্তিই মানসসুন্দরী কবিতার প্রধান বিষয়। বৈষ্ণব কবিতা-নামক কবিতার কবি যে অনুচিত ও অতাত্ত্বিক অভিমতটী প্রকাশ করিয়াছিলেন, মানসসুন্দরী কবিতার অনেক পরিমাণে তাহার সংশোধনের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন।—কবির 'কবিতা কল্পনা লতা'—ধরণীর একধারে ধরিবে সে একখানি মধুর মূরতি—যদি সম্ভব হয়, তবে শ্রীরাধা মূর্ত্তিমতী নিত্য প্রেম-মাধুরীময়ী হইবেন—ইহাতে বিস্ময়ের কিছু থাকা উচিত নয়। এখানে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে—'আজন্ম-সাধন ধন সুন্দরী আমার—কবিতা কল্পনালতা'—আর 'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা'—শেষ পর্য্যন্ত একই তত্ত্ব। রবিবাবুর কাব্য জীবনে যে এই দুই এক তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি কোন আবরণ রাখেন নাই। গ্রীক পুরাণের কেলিয়োপি, ক্লিও, ইরাতো, পলিহিম্নিয়া, থ্যালিয়া প্রভৃতি কাব্য নাটকাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণকে এই রাধা তত্ত্বেরই অন্তর্গত করিয়া বুঝিলেই ঠিক বোঝা হইবে।

নারীগণের রূপলাবণ্য বিন্দু বিন্দু করিয়া মধুমক্ষিকার মত আহরণ করিয়া কবিগণ রাধারূপ এবং রাধাচরিত্র রচনা করেন নাই। ইহা আমরা এইরূপে বুঝিতে পারি। রাধা তিলোত্তমা-সজাতীয়া কোনো রূপসৃষ্টি নয়। ইনি অনাদি হ্লাদিনী-তত্ত্ব এবং মনোরমা মূর্ত্তিমতীরূপে

ঋষিগণের ও ভক্তগণের শত সহস্র বার যুগে যুগে প্রত্যক্ষীভূতা। নিখিল রমণীবৃন্দের, সুরকন্যাগণের, অপ্সরঃকিন্নরীগণের এবং সকলের আরাধ্যা লক্ষ্মীগণের—সকল রূপমাধুর্য্যাদি—শ্রীরাধারূপের প্রতিবিম্বানুবিম্ব। "উর্ব্বশী" কবিতায় কবি যে বিশ্ববাঞ্ছিতা মহীয়সী রূপসীকে ধ্যান করিয়াছেন এবং স্তব করিয়াছেন, তিনিও রাধারি বিভাব-বিশেষ—একটী এস্‌পেক্‌ট্‌।

মুনিগণ ধ্যান ভাঙি, দেয় পদে তপস্থার ফল।
তোমারি কটাক্ষ-পাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল।

*　　*　　*

বিকশিত বিশ্ব বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার।

কারণ কৃষ্ণই বিশ্বের বাঞ্ছিত সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। আবার কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে।

সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনীপরা।

কবি মানসসুন্দরী কবিতার শেষের দিকে আবার একটী তত্ত্ববিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন।

কার এত দিব্য-জ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্ব্ব জন্মে নারী-রূপে ছিলে কিনা তুমি
আমারি জীবন-বনে।

নারী-রূপে সংসারে জন্ম গ্রহণের একমাত্র কারণ কর্ম্মফল। অবতার পুরুষের আবির্ভাব ভিন্ন জন্ম মাত্রই অবশং প্রকৃতের্বশাৎ।

কিয়ে মানুষ পশু পাখী জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন।
কামকামা গতাগতিং লভন্তে।

সুতরাং বাসনাবাসিনী আলোকবসনা কবিতা কল্পনালতা কখনো কবির প্রেয়সী নারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন না, ইহা বুঝিতে 'দিব্য জ্ঞানের' আবশ্যক নাই। 'নিশ্চয় প্রমাণ' সম্মুখেই বিদ্যমান। কিন্তু এখানেও আমরা তাৎপর্য্য যাহা পাইতেছি তাহা আমাদের ঈপ্সিত সিদ্ধান্তের একান্ত অনুকূল।

মিলনে আছিল বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই। বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।

তাহা হইলে কবি স্বীকার করিতেছেন—যিনি তাঁহার প্রেয়সী নারীরূপে সংসারসঙ্গিনী হইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই আবার বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীও হইতে পারেন।

গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতা-রূপে হয়েছ উদয়।

তাহা হইলে দেখিতেছি অরূপ ও রূপ, অমূর্ত্ত ও মূর্ত্ত, নিরাকার ও সাকারের সমস্যা-জাল

ছিন্ন করিয়া কবি সামঞ্জস্যের ভূমিতে উঠিতেছেন। অরূপ নয় রূপই সত্য। রূপই নিত্য। অধ্যাত্মজীবনে রূপের আবশ্যকতাই সমধিক। অরূপ অবাঞ্ছনীয় এবং ক্লেশকর।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হিগতি দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।

Beauty is Truth—ইহা সত্য এবং হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। কিন্তু—

Truth is Beauty—that is all—
Ye know on earth and all ye need to know.

তত্ত্ব যে রূপবান—ইহাও জানা সর্ব্বোপরি আবশ্যক।

কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার।
হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি?
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান
বিরহ তাপিত?—হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?

কবির এই সমস্ত কথা যে অ-সত্য বা অর্দ্ধ-সত্য—ইহা আমরা এখন কবির নিজের কথাতে বুঝিতে পারিতেছি। কোনো রমণীর অশ্রুপূর্ণ নয়ন দেখিয়া বৈষ্ণব কবি রাধিকার অশ্রু-নয়ন কল্পনা করেন নাই। রাধিকার অশ্রু-নয়ন দেখিয়াই তিনি সংসারের নারীগণের অশ্রুনয়নের অর্থ বুঝিয়াছিলেন।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।

'গৃহের বনিতা' হইয়া তিনি যদি 'বিশ্বের কবিতা' হইতে পারেন, তখন 'মহাভাব-স্বরূপিণী' রাধা ঠাকুরাণী—বিশ্বের নারী হইতে পারিবেন না কেন?

কবি এই কবিতায় নায়ক-নায়িকা বা স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ-ভাবের নেশাটী অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাহাতে কবিতার আর্টের দিক দিয়া বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় নাই কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়া বেশ হানি হইয়াছে।

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে। স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যভূমি
করিছ বিহার। * * *
নগ্ন বিদ্যুতের আলো নয়নেতে হানি
চকিতে চমকি চলি যাও।

তাহার সঙ্গে—পরশে পরশে দোঁহে
করি বিনিময়, মরিব মধুর মোহে
দেহের দুয়ারে। * * গৃহমাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।

এই অর্দ্ধাঙ্গিনী পত্নীভাবটী নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক ও অদার্শনিক। বৈষ্ণবচিন্তাবিরুদ্ধ তো নিশ্চয়। বিশ্বের কবিতা আর গৃহের বনিতা, ইহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ ভাব। কিন্তু এই প্রায় অশোভন ভাবটী পরে কবি সংশোধন করিয়াছেন। আবেদন নামক কবিতায় তিনি যে সৌন্দর্য্যাধিশ্বরীর বাগানের মালীর পদ প্রার্থনা করিয়াছেন—'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর'—তাহা এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ভাব। এখানে কবি স্বামী হইয়া বিশ্বসৌন্দর্য্যরূপিণীকে প্রেয়সীরূপে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন—কিন্তু এর পর কবি ক্রমশঃ রসতত্ত্বের উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিয়া নিজেই বিশ্বপ্রেমসৌন্দর্য্যনায়কের প্রেয়সীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। জীবনদেবতা-কবিতা।

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ
যা কিছু আছিল মোর ?
যত শোভা যত গান যত প্রাণ,
জাগরণ ঘুমঘোর,
শিথিল হয়েছে বাহু-বন্ধন,
মদিরা বিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসার নিশা
আজি কি হয়েছে ভোর ?
আমার ভূষণবিহীন মলিন বেশে ভিখারিণীর সাজে
তোমার দাঁড়াব বাম পাশে,
তখন লতার মত কাঁপব আমি গর্ব্বে সুখে লাজে
সকল বিশ্বের সকাশে। (প্রচ্ছন্ন)

কেবলমাত্র বৈষ্ণব কবিতা নামক কবিতা পড়িয়াই—বৈষ্ণবগণের অত বিচলিত হওয়া উচিত ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বৃন্দাবনে শ্রীরাধাই অধীশ্বরী এবং নিয়ত শ্যামেরই বাঁশী বাজে।

(১)

ওগো শোন কে বাজায়।
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশীর তানে ভেসে যায়।

* * *

যমুনারি কলতান
কাণে আসে কাঁদে প্রাণ,
আকাশে অই মধুর বিধু কাহার গানে হেসে চায়

(২)

ওগো কে যায় বাঁশরী বাজায়ে।
আমার ঘরে কেহ নাই যে।
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে।
তার আকুল পরাণ বিরহের গান
বাঁশী বুঝি গেল জানায়ে।

* * *

(৩)

সুখে শিহরে সকল বনরাজি।
উঠে মোহন বাঁশরী বাজি।

* * *

(৪)

অই বাঁশীস্বর তার, আসে বারবার,
সেই শুধু কেন আসে না ?

* * *

(৫)

মম হৃদয় শয়ন মাঝে
শুন মধুর মুরলী বাজে।

* * *

(৬)

এক পলক তুঁহু দূর না যাওসি,
বিজন নিকুঞ্জে বাঁশী বাজাওসি।

* * *

(৭)

অই বুঝি বাঁশী বাজে,
বনমাঝে, কি মনোমাঝে।

* * *

(৮)

বাজিবে যদি, বাঁশী বাজিবে,
হৃদয়-রাজ হৃদে রাজিবে।

রবীন্দ্রকাব্যের অধিকাংশই বৃন্দাবনের বনশোভা, ব্রজের রসসুষমা আর গোকুলের আনন্দ মেলা। সমস্ত কাব্য বেণু-গীত মুখরিত। ইহা যে লক্ষ্য করে নাই রবীন্দ্রকাব্য পাঠ তার নিষ্ফল হইয়াছে। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো আলোচনা করা যাইবে।

দিগ্‌দর্শন

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

মিসেস্ মিথান চোকসী, এম-এ, জনৈক পার্শী মহিলা, "ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকদিগের কলেজ সম্বন্ধে ধারনা" নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "আজকাল বিদেশী সামগ্রী অবিচারে গ্রহণের একেবারে বিরুদ্ধে না হইলেও শ্রেষ্ঠ ও অধিকতম বিবেচক ছাত্রীরা উহাকে সঙ্কটময় বলিয়া মনে করে। কি ইউরোপীয় আর কি ভারতবাসী, অধিকাংশ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন, অনেক সময় অসহনীয় ও আক্রমণের মত মনে হইলেও, অতীতকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার অত্যধিক মোহে খ্যাতনামা বাঙ্গালীরা যখন বাঙ্গালীভাব ছাড়িয়া ইংরাজী ভাবে এমন কি স্বপ্ন দেখার গর্ব্বও করিতেন, তাহা অপেক্ষা ইহা বহু পরিমাণে হিতকর।"

কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম বলিয়া অতি ক্ষীণ মনে পড়ে, দিন কতক পূর্ব্বে এমনই একটা উক্তির বিরুদ্ধে কেহ একজন প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক কি পূর্ব্বে আমাদের এ মনোবৃত্তি ছিল না? যদি তাহা না থাকিবে, তবে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল কি বৃথাই লিখিয়াছিলেন,—

"আমরা সাহেবী ধরণে হাসি,
আমরা বিলাতী ধরণে কাশি,
পা ফাঁক ক'রে সিগারেট খেতে বড়ই ভালবাসি।"

তবে শুধু বাঙ্গালার ঘাড়েই বা এ দোষ চাপাই কেন? এ মনোভাব কি সমস্ত ভারতবর্ষেরই ছিল না—কিম্বা এখনও নাই? পাঞ্জাবে দেখুন এ মনোভাব কি ভীষণ ভাবে কাজ করিতেছে;

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, সীমান্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, গুজরাট—কোথায় এ মনোভাব ভারত-বাসীর মজ্জার ভিতরে প্রবেশ করে নাই? তবে বাঙ্গালা যদি দেশের আদালতে এ অপরাধে প্রথম অপরাধী বলিয়া একান্তই সাব্যস্ত হয়, তবে তাহার পক্ষে ওকালতী করিয়া জোর গলায় এ কথা বলা চলে, সে যেমন একদিকে অতীত কালের প্রথম অপরাধী, তেমনি সে অন্যদিকে বর্ত্তমানকালে স্বদেশনিষ্ঠার প্রথম উপাসক।

এমন কি বিশ বৎসর পূর্ব্বেও সমস্ত ভারতবর্ষে নেতাদের কি মনোভাব ছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়।

"In India the West has for a long time cast an ever-lengthening shadow upon national life.......Educated men who aspired to be leaders of society and thought twenty years ago, ostentatiously cast aside their Indian character. In dress, in manner in forms of thought and expression. in literary and artistic activities, in fact in almost all aspects of national life, the attempt was to westernise. The cultural traditions of the past were completely fargotten".

* * *

"Without being consciously aware of it, our thought is dominated by the West. Hating it with all our heart we may not yet get away from it."—Mr. K. M. Panikkar M. A. (oxon). (১)

অর্থাৎ—বহুদিন হইতে প্রতীচি ভারতের জাতীয় জীবনের উপর তাহার চিরদীর্ঘায়মান ছায়াপাত করিয়া আসিতেছে।......বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজ ও চিন্তাধারার মুখপাত্রস্বরূপ হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখিতেন, তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের ভারতীয়ত্ব পরিহার করিতেন। পোষাকে, রীতিনীতিতে, চিন্তার গতিতে, ভাবপ্রকাশে, সাহিত্যও কলাবিস্তায়,—সত্য কথা বলিতেগেলে, জাতীয় জীবনের প্রতি অবস্থানেই পাশ্চাত্যভাব গ্রহণের চেষ্টা করা হইত। অতীতের সংস্কৃতিগত কিম্বদন্তী একেবারে বিস্মৃতিসাগরে সমর্পণ করা হইয়াছিল।

* * *

আমাদের চিন্তাধারা প্রতীচির শাসনাধীনে, অথচ আমাদের বিবেক তাহা বুঝিতে পারে না। যতই আমরা মনে প্রাণে ঘৃণা করি না কেন, ইহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি না।"

শ্রীযুক্ত পানিকর মহাশয় বিশ বৎসর পূর্ব্বের সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছেন, আজকালকার নেতাদের,—শুধু নেতা কেন, প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণ সম্বন্ধেও সে কথা সমানই ভাবে খাটে। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, শিখ নাই; সকলেই সমান ভাবেই জড়িত। পার্শীরা আবার আরও অধিক জড়িত;

(১) The Heart of Aryavarta by Lord Ronaldshay, page ix.

এখানে কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিতে পারেন,—এই যে মনোভাব, যাহার জন্য যাহা কিছু পাশ্চাত্য সে সমস্তকেই মন্দ ভাবিতে হইবে, তাহাই যে ঠিক তাহার প্রমাণ কি ? পাশ্চাত্যভাব মন্দ কেন ? তাহার উত্তরে এ কথা বলা যাইতে পারে, পাশ্চাত্যভাব মাত্রেই যে মন্দ, এ কথা কেহই বলিবেনা, বলিতে পারে না। পাশ্চাত্যের সবই যদি মন্দ হইত, তবে সে মন্দ হইতে নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এমন এক জাতির উত্থান কখনই সম্ভবপর হইত না। পাশ্চাত্যভাব মাত্রেই মন্দ নহে, এবং এই মনোভাব পাশ্চাত্য-বিদ্বেষও নহে। তবে ইহা কি তাহা বুঝিতে হইলে, গলদ কোথায়, তাহাই প্রথমে জানা আবশ্যক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রভেদ কোন খানে ও কোন্ প্রভেদ, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের মডার্ণরিভিউ পত্রিকায় "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রভেদ" সম্বন্ধে এই লেখা আছে,—

"The East" asks Mrs. Adams Beck in her story of Oriental Philosophy, "haughty, aristocratic, spiritual and other-worldly, leisured, tolerant of all faiths and philosophies moving on vast spiritu l orbits about the central sun ; the West, eager, hurried, worldly, absorbed in practical and temporary affairs, opinionanoyed, contemptuous of other peoples and faiths, money-loving less for money's sake than its tastes and younger, infinitely younger in tastes and psychic development than the East—what point of fusion can there be between the philosophies of these two divergent branches of the same great root ?

ইহার ভাবার্থ এই,—

"প্রাচ্য দর্শনের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে গিয়া মিসেস এ্যাডামস্ বেক এই প্রশ্ন করিয়াছেন, প্রাচী, উদ্ধত, অভিজাত গর্ব্বে গর্ব্বিত, আধ্যাত্মিক, পরলোকপ্রাণ, কর্ম্মশূন্য, সর্ব্বমত ও সর্ব্বদর্শন-সহিষ্ণু ; প্রাচীকেন্দ্রস্থিত মুক্তিকে আবেষ্টন করিয়া বিশাল আধ্যাত্মিক কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিতেছে ; আর প্রতীচি—অধীর ত্বরাপর, সংসারাসক্ত, ব্যবহারিক ও অনিত্য ব্যাপারে তন্ময় স্বমতে অত্যাসক্ত, অপর জাতি ও অপর ধর্ম্মে ঘৃণাময়, অর্থের জন্য তত না হইলেও তাহার অনুরাগের জন্য অর্থপ্রিয় ও তরুণ, রুচি ও মানসিক বিকাশে প্রাচীর তুলনায় যথেষ্ট নবীন। এক বৃহৎ মূলের এই দুই দূরাপসারী শাখার মানসিক স্থৈর্য্যের মধ্যে ঐক্যের উপাদান কি থাকিতে পারে ?"

এমনই প্রতীচির এক প্রধানতম অংশ গ্রেটব্রিটেন। সেই গ্রেটব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে কি প্রভেদ, সে সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কি বলিয়াছেন দেখা যাক। রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে দাশ মহাশয়ের উক্তির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এই ;—

* * *

"India's policy is pre-eminently spiritual. So far as we can see. We do not discern any common spiritual factor between India and Great Britain. The British are materialistic ; we are not and we do not want to be. We

believe above all in spiritual integrity ; the British as a race are scarcely responsive to spiritual realities, where is the common interest ? And without a common interest, what is the use of any federation ?

It is theoretically possible that that interest may grow in future, the British may one day incline to spirituality. But are they making any sincere attempt to reach that consummation ? Do they believe in the supremacy of the spiritual vision ? Unless they change their individual and national outlook fundamentally, India can never sympathize with the prevailing trend of thought and outlook of the British people.

তাঁহার প্রসিদ্ধ ফরিদপুর বক্তৃতা সম্বন্ধে যে বহু আলোচনা হইয়াছিল, তাহার সমালোচনা গত (১৯২৯) সালের জানুয়ারী মাসের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

ভারতের পদ্ধতি প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক। যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, ভারত ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে এমন কোন ধর্ম্মনীতি নজরে আসে না, যাহা দুই দেশেই এক। তথাকার লোকেরা জড়বাদী; আমরা তাহা নহি; হইতেও চাহি না, সর্ব্বোপরি আমরা আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও পূর্ণতায় বিশ্বাস করি; ব্রিটেনের লোকেরা জাতিগত ভাবে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে প্রায় সাড়াই দেয় না। তবে সাধারণ স্বার্থ কোথায়? আর সাধারণ স্বার্থ ব্যতীত কোনরূপ মিলনের আবশ্যকতাই বা কি?

কল্পনায় ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে সে স্বার্থ ভবিষ্যতে উদ্‌বুদ্ধ হওয়া সম্ভব—একদিন ব্রিটেনের লোকেরা আধ্যাত্মিকতার দিকে চলিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহার পরিণতির দিকে অগ্রসর হইবার প্রকৃত চেষ্টা তাহারা কিছু করিতেছে কি? তাহারা আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্যে কি আস্থাবান? যদি তাহারা তাহাদের ঐ জাতীয় ও ব্যক্তিগত আদর্শের আমূল পরিবর্ত্তন না করে, তবে ভারত কখনই তাহাদের বর্ত্তমান চিন্তাধারার সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে পারে না।

* * * * *

অতএব প্রভেদ যে কোথায়, তাহা দেখা গেল। এই প্রভেদ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোভাবে, তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্যের বিপরীত ভাবের মধ্যে নিহিত। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় বলেন,—

আমাদের দেশে ও য়ুরোপে মুখ্য প্রভেদ এই যে, আমাদের জীবন অন্তর্মুখী, ইউরোপের জীবন বহির্ম্মুখী। আমরা ভাবকে আশ্রয় করিয়া পাপপুণ্য ইত্যাদি বিচার করি, য়ুরোপ কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া পাপপুণ্য ইত্যাদি বিচার করে। আমরা ভগবানকে অন্তর্য্যামি ও আত্মস্থ বুঝিয়া অন্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ করি, য়ুরোপ ভগবানকে জগতের রাজা বুঝিয়া বাহিরে তাঁহাকে দেখে ও উপাসনা করে।

পাপপুণ্য সম্বন্ধেও সেই ক্রম লক্ষিত হয়। আমরা অন্তরের ভাব দেখি। নিন্দিত কর্ম্মের মধ্যে পবিত্র ভাব, বাহ্যিক পুণ্যের মধ্যে পাপীষ্ঠের স্বার্থ লুক্কায়িত থাকিতে পারে; পাপ পুণ্য—সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্ম, কর্ম্ম আবরণ মাত্র। ইহা আমরা জানি; সামাজিক সুশৃঙ্খলার জন্য আমরা

বাহ্যিক পাপপুণ্যকে কর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া মান্য করি, কিন্তু অন্তরের ভাবই আমাদের আদরণীয়। * * * পাশ্চাত্য বুদ্ধি এই তত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ; যে জড়বৎ আচরণ করে, তাহাকে জড় বুঝে, যে উন্মত্তবৎ আচরণ করে, তাহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বুঝে, যে পিশাচবৎ আচরণ করে, তাহাকে ঘৃণ্য অনাচারী পিশাচ বুঝে। কেননা যাহাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই, তাহারা অন্তরের ভাব দেখিতে অসমর্থ। (১)

* * * * *

শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় আরও বলেন,—

আর্য্যজ্ঞান, আর্য্যশিক্ষা, আর্য্যআদর্শ, জড়জ্ঞানবাদী রাজসিক ভোগপরায়ণ পাশ্চাত্যজাতির জ্ঞান, শিক্ষা ও আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। য়ুরোপীয়দের মতে স্বার্থ ও সুখান্বেষণের অভাবে কর্ম্ম অনাচরণীয়, বিদ্বেষের অভাবে বিরোধ ও যুদ্ধ অসম্ভব। হয় সকাম কর্ম্ম করিতে হয়, নচেৎ কামনাহীন সন্ন্যাসী হইয়া বসিতে হয়, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। জীবিকার্থ সংঘর্ষে জগৎ গঠিত, জগতের ক্রমোন্নতি সাধিত, ইহাই তাঁহাদের বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। (১)

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচ্য জীবন পাশ্চাত্য জীবন হইতে বিভিন্ন,—বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। সুতরাং আজ যদি এক সভ্যতার উপযোগী ক্ষেত্রের উপর অপর সভ্যতারূপ সৌধ নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া যায়, তবে সে হর্ম্ম্যে বাস করিয়া শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া জাতীয় জীবন যাত্রা সুশৃঙ্খলায় কখনই নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তাই ইউরোপীয় মনীষীরা আমাদের পাশ্চাত্য ভাবাশ্রয়কে ভীতির চক্ষে দেখেন, এবং প্রাচ্য জ্ঞানীরা নিষেধ বাক্যের দ্বারা বারবার সতর্ক করেন।

প্রাচ্যও পাশ্চাত্য সভ্যতার কিম্ভূত কিমাকার মিলনের ফল অতি জাজ্জ্বল্যভাবে অধিকাংশ দেশীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের ফলে তাহাদের অনেকেই মনে করেন তাঁহাদের সংস্কৃতিরও পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া কর্ত্তব্য, অথবা ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহারা স্বতঃই এক শ্রেণীর জীব হইতে অন্য শ্রেণীর জীবে পরিণত হইয়াগিয়াছেন; সুতরাং পাশ্চাত্য সংস্কৃতিই এখন তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ও পরিণতি। কিন্তু বংশপরম্পরার্জ্জিত সংস্কার কখনই একেবারে মুছিয়া ফেলা যায় না,—যাইবার নয়। অতএব তাঁহারা না দেশীয়, না ইউরোপীয়—দুইয়ের অপরূপ মিলনের দৃষ্টান্ত হইয়া রহিয়াগিয়াছেন। অতএব ভারতীয় আমরা আমাদিগের কাছে ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন ও তাহার প্রসারই জাতীয় জীবনের সার্থকতা। এ সম্বন্ধে দ্বাদশ নিখিল ভারতীয় হিন্দুমহাসভার সভাপতিরূপে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন,—

"হিন্দু সমাজের নিজেকে উন্নত ও শক্তিশালী করিবার এ চেষ্টা সমগ্র জাতিকে উন্নত ও শক্তিশালী করিবার বৃহত্তর চেষ্টার একটা দিক মাত্র।" ইহার পর তিনি ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন গৌরবের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, "এই সভ্যতার ধারাকে চির প্রবহমান রাখা হিন্দুরই কর্ত্তব্য কারণ হিন্দুই বিশেষ করিয়া এই সভ্যতার উত্তরাধিকারী, হিন্দু সমাজই সেই সভ্যতার প্রধান অবলম্বন।"

(১) ধর্ম্ম ও জাতীয়তা ৬৭ পৃষ্ঠা।

হিন্দু মহাসভার সভাপতির আসন হইতে মান্যবর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহার সামান্য পরিবর্তন করিয়া "হিন্দুর" স্থানে "ভারতবাসী" শব্দ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতির অভিভাষণে উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আর একস্থানে বলিয়াছেন,—

"Layalty to India implies devoted service to India in a comprehensive sense and living according to the ideals of Indian Culture and Spirituality. (1)

অর্থাৎ—

"ভারতের প্রতি অনুরাগ বলিতে, ব্যাপকভাবে ভারতের সেবা এবং ভারতীয় সভ্যতা ও পারমার্থিক আদর্শ অনুসারে জীবন যাপনই বুঝায়।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"It is peculiarly our duty and our right to keep whatever of permanent value has come down from our past and to extend the bounds of Indian thought and culture. For, whatever friend or foe may say, we are not a decadent people. We mean to live, we will live, we can live, and we will yet give to the world what God intended that we should. Men of non-Indian culture may care—and sincerely care—for Indian culture as something ancillary —but with us, our heritage is that in which our being is rooted, it is the core of our collective and individual life.

"We may assimilate the best that is in non-Indian cultures and faiths, but the essence of our individual and collective personality must necessarily be Indian. Others may think that we are mistaken in holding that Indian culture and spirituality are not inferior to any other that exists; but we stick to our opinion."

"অতীত কাল হইতে চিরস্থায়ী যাহা কিছু পুরুষানুক্রমে আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার সংরক্ষণ, এবং ভারতীয় সভ্যতা ও চিন্তা ধারার প্রসার, ইহাই আমাদের অনন্য সাধারণ কর্তব্য ও অধিকার। কেন না, শত্রু অথবা মিত্রপক্ষ যাহাই বলুন, আমরা ধ্বংসোন্মুখ জাতি নহি। আমরা জীবন্ত থাকিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আমরা জীবন্ত থাকিবই; আমরা নিজেরা সজীবও থাকিতে পারি, এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতকে এমন জিনিষ দিতে পারি, যাহা আমাদের দেওয়াই ভগবানের অভিপ্রেত। অধীন ভাবিয়া ভারতীয় সভ্যতাকে বিদেশীয় সভ্যতা যত্ন—এমন কি প্রকৃত যত্ন—করিতে পারে; কিন্তু আমাদের কাছে,—যে জন্মগত অধিকারে আমাদের অস্তিত্বের মূল নিবদ্ধ,—তাহা, আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের মর্মস্থল।"

---

(1) Presidential Address of the 12th. session of the Hindu Mohasabha, met at Surat; copied from Modern Review. April, 1929. p. 467.

অন্যত্র,—

"বিদেশীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে যাহা কিছু উৎকর্ষ তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্যে অপরিহার্য্যরূপে ভারতীয় হইতেই হইবে। অপরাপর সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা ভারতীয় সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতা কোন মতে নিকৃষ্ট নহে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখি বলিয়া অপরে আমাদের ভ্রান্ত মনে করিতে পারে, কিন্তু তথাপি আমরা আমাদেরই মত বহাল রাখিব।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—উপাদান যেথান হইতেই আসুক, বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া যাহা দাঁড়াইবে, তাহা ভারতীয়ই হইতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন,—

"বীজ ভূমিতে রোপিত হইল। মৃত্তিকা, বায়ু ও জল তাহার চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। সেই বীজটী কি মৃত্তিকা, বায়ু বা জলের মধ্যে কোন একটীতে পরিণত হইয়া থাকে? না। সেই বীজ হইতে ক্ষুদ্র বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, ইহা ক্রমে আপনার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এবং মৃত্তিকা, বায়ু ও জলকে ভিতরে গ্রহণ করিয়া সেই সকল উপাদান দ্বারা স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিবর্দ্ধিত করিয়া বৃক্ষাকারে পরিণত হয় (১)।"

শ্রীশিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ প্রণালী—যাহা ভারতের সাধনার এক বিশেষ লক্ষ্য—সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচনা সাপেক্ষ]

জাবাল সত্যকামের উপাখ্যান

শ্রাবণের ভারতের সাধনার ৬৩৮ পৃষ্ঠায় "শ্রীযুক্তা সরসীবালা সরকার" লেখিকার এই নামের অব্যহিত উপরেই লিখিত হইয়াছে, "দেখিতে পাই, এককালে জবালার পুত্র সত্যকাম ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।"

নিম্নরেখ বাক্যটী পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। লেখিকা কি বলিতে চাহেন? জবালা কি ব্রাহ্মণী ছিলেন না? তাহার পর মনে হইল লেখিকা সম্ভবতঃ ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ খণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত মূল আখ্যায়িকা পাঠ না করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "কথা ও কাহিনীর" ব্রাহ্মণ শীর্ষক কবিতাটী পাঠ করিয়া এইরূপ অপরূপ উক্তি করিয়াছেন, আখ্যায়িকাটী এই:—

বিধবা জবালার পুত্র সত্যকাম উপনয়নের বয়স প্রাপ্ত হইলে মাতাকে বলিল, "মা আমি ব্রহ্মচর্য্য করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করি।" তৎকালে ব্রাহ্মণপুত্র মাত্রই এই প্রকারে গুরুগৃহে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া যথারীতি অধ্যয়ন ও বাস করিত।

---

(১) চিকাগো বক্তৃতা, ৪র্থ সংস্করণ, ৪৩ পৃষ্ঠা।

সত্যকামও ব্রাহ্মণের পুত্র ছিল, নচেৎ তাহার উল্লিখিত প্রকার প্রবৃত্তি হইত না। উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইলেই গুরুর নিকট গোত্র বলিতে হয়। সে কথাও বালক জানে। সে তাহার মাতাকে বলিল, "আমার কি গোত্র বল।" মাতা বলিলেন, "বৎস, আমি তোমার গোত্র জানি না। ইহার কারণ "বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে। সাহমেতন্ন বেদ যদ্ গোত্র-স্ত্বমসি" অর্থাৎ আমি বহু গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতে করিতে ও অতিথি, অভ্যাগত, আত্মীয় ও ছাত্রাদির পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকিয়া যৌবনে তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম। তাহার পর তোমার পিতার মৃত্যু হয়—গোত্রের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।" ইহার পর বালক সত্যকাম গুরু গৌতমকে এই কথাই বলেন। বালক নিজের গোত্র না জানিয়াও মিথ্যা করিয়া একটা গোত্রের নাম করিতে পারিত। তাহা না করিয়া সত্য কথা বলাতেই মহর্ষি গৌতম সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ পুত্র জানিয়া উপনীত করেন।

সত্যকাম যে ব্রাহ্মণ পুত্র নহেন এ কথা কোথাও লিখিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মণ" শীর্ষক কবিতা পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি মূল উপনিষদ্ বোধ হয় পাঠ করেন নাই, অথবা উহার টীকা বা ভাষ্য পাঠ করেন নাই, নিজেই হয়তো উহার মনগড়া একটা অর্থ করিয়াছেন অথবা কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিতের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া তাহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন। আমি যে ব্যাখ্যা করিলাম ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুযায়ী। রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত পংক্তিটীর নিম্নলিখিত প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যৌবনে দারিদ্র দুঃখে বহু পরিচর্য্যা করি পেয়েছিনু তোরে, জন্মেছিস ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে, গোত্র তব নাহি জানি তাত!" সোজা কথায়, রবীন্দ্রনাথ জবালানন্দন সত্যকামকে বেশ্যাপুত্র বলিয়াছেন! রবীন্দ্রনাথ শঙ্করাচার্য্যকে না মানিতে পারেন; কিন্তু সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ তাঁহাকে মানিতেই হইবে। তাহা যদি তিনি মানেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিব, তিনি উল্লিখিত বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা ব্যাকরণবিরুদ্ধ ও সমগ্র উপনিষৎ সাহিত্যের তাৎপর্য্যেরও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। "বহু অহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে।" "যৌবনে দারিদ্র দুঃখে বহুচারিণী ভর্ত্তৃহীনা আমার গর্ভে তুমি জন্মলাভ করিয়াছ"—এ অর্থ এস্থলে কিরূপে হইবে? "বহু" শব্দ এস্থলে "চরন্তী" ক্রিয়ার বিশেষণ—ইহার অর্থ "বহু পরিমাণে পরিশ্রমশালিনী"—"বহু লোকের অঙ্কশায়িনী" নহে। "বহু লোকের পরিচর্য্যা করিয়াছি" এ অর্থ ধরিলেও জবালাকে বেশ্যা বলা চলে না। যদি কোনও রমণী বহু রোগীর পরিচর্য্যা করেন তাহা হইলে কি তাহাকে ঐ রোগীগণের অঙ্কশায়িনী বলিতে হইবে? ব্যাকরণের যাহাদের অতি সাধারণ জ্ঞান আছে তাঁহারাও বলিবেন যে, "বহু" শব্দ এস্থলে "বহুলোক" না বুঝাইয়া "বহু পরিমাণে" বুঝাইবে। ইহা ছাড়া "দারিদ্র দুঃখে" ও ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে" এগুলি রবীন্দ্রনাথের মৌলিক উদ্ভাবনা। মূল আখ্যায়িকায় এ সকল নাই। তোমরা বলিবে "নিরংকুশাঃ কবয়ঃ" হাঁ, সে কথা সত্য; বিশেষতঃ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মুণ্ডপাতকালে সে কথা আরও সত্য।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ মহাশয় তাঁহার ছান্দোগ্য উপনিষদের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের এ ভ্রান্তি অথবা যথেচ্ছাচার অনেক দিন পূর্ব্বেই দেখাইয়া দিয়াছেন। হয়তো উক্ত ভূমিকাটী এ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তিনি যদি

এখনও তাঁহার "ব্রাহ্মণ" কবিতাটী পরিবর্ত্তিত করেন, তাহা হইলে তাঁহার মহত্ত্বই বর্দ্ধিত হইবে। ম্যাথু আর্ণল্ডএর হাতে পড়িয়া কবি Wordsworthএর যেরূপ মূল্য বাড়িয়াছিল, আমাদের মনে হয়, যদি রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির সেইরূপ একটা judicious সংস্করণ হয় তাহা হইলে তাঁহার মূল্য বাড়িতে পারে।

লেখিকার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তিনি স্ত্রীলোক—মাতৃস্বরূপা, তাঁহাকে অপ্রিয় কথা বলিতে চাহি না, বিশেষতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু। তবে তাঁহার নিবন্ধ পড়িতে পড়িতে স্থানে স্থানে মনে হইয়াছে যে উহা ছাপাইতে পাঠাইবার পূর্ব্বে কোনও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখাইলে ভাল করিতেন। তিনি "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"—এই কথাটী যে স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন সে স্থলে উহার অপপ্রয়োগ হইয়াছে। উপনিষদে আত্মা ও বল শব্দ প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। লেখিকা লিখিয়াছেন—যাহাদের চেষ্টায় সরদা বিল পাশ হইয়াছে তাঁহারা নিজেদেরকে হিন্দু বলিয়া মানেন। এ কথা সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে—ইহাদের অধিকাংশই ব্রাহ্ম ও আর্য্য-সমাজী। ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজী নিজেদেরকে অহিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিতেন। হিন্দু সভার উৎপত্তির পর হইতে তাঁহারা নিজেদেরকে হিন্দু বলিয়া পরিচিত করিতেছেন। এখনও তাঁহারা সকল সময়ে হিন্দু নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন না। লেখিকার মনে থাকিতে পারে কলিকাতা সিটী কলেজ হোষ্টেলে সরস্বতী পূজা লইয়া কিছুকাল পূর্ব্বে একটা গোলমাল হইয়াছিল। ঐ সময়ের ব্রাহ্ম পত্রিকাগুলি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ব্রাহ্মগণ ঐ সময়ে "হিন্দু" শব্দ ব্রাহ্ম ব্যতীত হিন্দু এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করা যায় যে ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজী নিজেদেরকে হিন্দু বলিয়া থাকেন বলুন; তাহাতে আপত্তি নাই। সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম আমেরিকায় ভারতবাসী মুসলমানগণও হিন্দু নামে পরিচিত। সেখানে হিন্দু শব্দের অর্থ "ভারতবাসী"। হিন্দুধর্ম্ম যাহাকে বলা হয় তাহা স্বতন্ত্র জিনিস। অশাস্ত্রীয় আচার ব্যবহারে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা, শারীরিক অবনতি ও মানসিক অশুদ্ধিই বর্দ্ধিত হয়। সর্দ্দা আইন সমষ্টিভাবে আমাদের সমাজকে অশাস্ত্রীয় আচার অবলম্বনে বাধ্য করিতেছে। ব্যক্তিভাবে কেহ অনাচার করিলে অক্ষম, অজ্ঞ অথবা অনাচারী বলিয়া সমাজ তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, কিন্তু সর্দ্দা আইনের সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না; সুতরাং "ধর্ম্ম গেল ধর্ম্ম গেল" বলিয়া চিৎকার করা ভিন্ন আমাদের আর কি উপায় আছে? নিজেকে হিন্দু বলিলে যদি হিন্দু হইত তাহা হইলে আজ জগতের অনেক ক্রিশ্চিয়ান ও মুসলমানও হিন্দু। হিন্দুধর্ম্ম অর্থে বর্ণাশ্রম ও শাস্ত্রসংগত আচার ব্যবহারের প্রতিপালন—কেবলমাত্র মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজা নহে। লেখিকা যাহা-দিগকে হিন্দু বলিতে চাহেন সেই জহরলাল ও হরবিলাস সর্দ্দা প্রভৃতিতে হিন্দুত্বের কি লক্ষণ আছে জানিতে পারি কি?

শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়, এম. এ.

সুশ্রুতে গর্ভাধানের বয়স।

সুশ্রুতের মতে গর্ভাধানের ন্যূনতম বয়স কি হওয়া উচিত তাহাই লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদের নিতান্ত ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সুশ্রুতে "ঊনদ্বাদশ বর্ষায়াং" ও ঊনষোড়শবর্ষায়াং"—এই দুইটী পরস্পর

বিরোধিপাঠের মধ্যে"উনদ্বাদশবর্ষায়াং"এই পাঠটী যে সমীচীন ইহা শেঠ মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতের প্রতিবাদ "ভার্গব" নামধারী লেখক করেন। ভার্গব মহাশয়ের আপত্তির উত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার মর্ম্ম এই :—

(১) সুশ্রুত অনুসারে দ্বাদশ বর্ষে বালিকা রজস্বলা হইয়া থাকে ;

(২) রজস্বলা মাত্রেরই ঋতুর চতুর্থ দিবসে রাত্রিতে স্বামি-সহবাস বিধেয়। ইহাও সুশ্রুত স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন ;

(৩) সুতরাং দ্বাদশবর্ষেই অর্থাৎ রজস্বলা হইবার পরই বালিকা স্বামি সাহচর্য্যের উপযুক্তা বলিয়া বিবেচিত হয়। অতএব "উনদ্বাদশবর্ষায়াং" এই পাঠটীই সুশ্রুতের অভিমত।

সুশ্রুতের মত যুক্তিসংগত অথবা অযৌক্তিক ইহা আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। যাঁহার ইচ্ছা তিনি সুশ্রুতকে মানিতে পারেন, আর যাঁহার সে ইচ্ছা হইবে না, তিনি সুশ্রুতকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু নিজেদের অভিরুচি অনুসারে কোনও স্বকপোলকল্পিত পাঠ সুশ্রুতের স্কন্ধে চাপান চলে না।

শ্রাবণ সংখ্যার ভারতের সাধনায় "শাণ্ডিল্য" নামক অন্য একজন লেখক পুনরায় আমাদের আলোচ্য বিষয়রূপ নিস্তরঙ্গ জলরাশির উপর আর একটা আপত্তির লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার এই আপত্তি কোনও প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠাপিত নহে, কেবল মাত্র সংবেদন অর্থাৎ sentiment এর উপর তিনি এই আপত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আমি যে সকল কথা বলিয়াছি তাহা সুশ্রুতসম্মত, একথা শাণ্ডিল্য মহাশয় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তবুও তিনি বলিতেছেন, "দ্বাদশবর্ষীয়া রজস্বলা বালিকারই ভর্ত্তৃসংসর্গ-বিধেয় এমন কথা সুশ্রুত কোথাও বলেন নাই"। সুশ্রুত যখন রজস্বলা মাত্রেরই ঋতুর চতুর্থরাত্রে ভর্ত্তৃসংসর্গ বিধেয় বলিয়াছেন, তখন দ্বাদশবর্ষীয়া রজস্বলার স্বামিসহবাস ও বিধেয় বলিয়াছেন। দ্বাদশ বর্ষীয়ার বিধেয়, এয়োদশ বর্ষীয়ার বিধেয়, চতুর্দ্দশবর্ষীয়ার বিধেয়—এই প্রকার বৎসর ধরিয়া বিধেয় বলিবার কোনও আবশ্যকতা নাই; রজস্বলা মাত্রেরই বিধেয় এই কথাই যথেষ্ট। দ্বাদশবর্ষীয়ার সম্বন্ধে কোনও নিষেধ সুশ্রুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবুও কি "উনদ্বাদশবর্ষায়ং এই পাঠ ভুল বলিতে হইবে? দিবসে সূর্য্য উঠে না একথা যিনি বলেন তাঁহার সহিত আর কি প্রকারে বিচার চলিবে? সুশ্রুতের মত কি তাহা আমরা দেখাইলাম। তাঁহার মত সঙ্গত কি অসঙ্গত সে বিচার আমরা করি নাই। তবুও যদি সে বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বলি, আয়ুর্ব্বেদের যে যে গ্রন্থে এই সম্বন্ধে আলোচনা আছে সেই সকলের প্রত্যেক গ্রন্থেই সুশ্রুতের মত সমর্থিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ভাব প্রকাশ' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে :—

(ক) "নারী ঋতুমতী পুংসা সংগচ্ছেৎতু সুতার্থিণী"—ইহার অর্থ নারী ঋতুমতী হইলেই সুতার্থিণী হইয়া স্বামী সহবাস করিবে। (ভাব প্রকাশের মতেও দ্বাদশবর্ষে নারী রজস্বলা হইয়া থাকে। আজকাল অবশ্য সকল ক্ষেত্রে ঐ বয়স ঠিক থাকে না। তাহাতে কিছু যায় আসেনা রজস্বলা হইবার পরই স্বামি সহবাস বিধেয়, তৎপূর্ব্বে নহে।)

(খ) "সেব্যমানা যথা বিধি বালা বর্দ্ধয়তে বলম্।
তরুণী হ্রাসয়েচ্ছক্তিং প্রৌঢ়োদ্ভাবয়তে জরাম্ ॥"

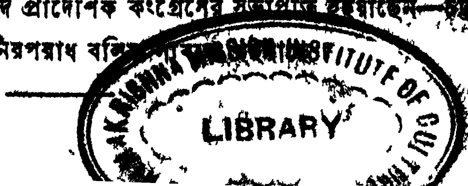
ইহার অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে অসংখ্য প্রমাণ উত্থাপিত করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গের আলোচনায় উহাদের উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। এই সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য Sociologist দের মতও বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না। প্রমাণ প্রয়োগ সহ বিচারের আমরা পক্ষপাতী। Sentimentএর উপর নির্ভর করিয়া বিচার হয় না।

সুশ্রুত অসংগত কথা বলিতে পারেন না, এ বিশ্বাস শাণ্ডিল্য মহাশয়ের যতটা আছে, আমাদেরও ততটা বা ততোধিক আছে—তবে শাণ্ডিল্য মহাশয় যাহাকে অসংগত মনে করেন, সুশ্রুত তাহাকে অসংগত মনে করেন না, ইহা সুশ্রুতের বাক্য হইতে ও সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে প্রমাণ করা যায়। শাণ্ডিল্য মহাশয়ের যদি এ বিষয়ে এখনও আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে একটা বিদ্বৎসভা আহ্বান করিয়া প্রকাশ্যভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। আমরা প্রস্তুত আছি।

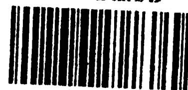
কবিরাজ—শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ, (টি, পল্)
সাংখ্যতীর্থ জ্যোতিভূর্ষণ রসাচার্য্য।

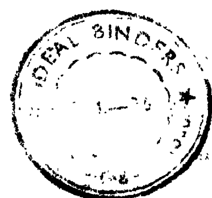
মাসপঞ্জি—আশ্বিন, ১৩৩৮।

হিজলীর অবরুদ্ধ রাজবন্দীদিগের উপর গুলিবর্ষণ ও হত্যা লইয়া বঙ্গদেশে তীব্র বিক্ষোভ উপস্থিত—বাঙ্গলার বাহিরে তাহার বিষয়ে বড় সাড়া শুনা যায় না—মহাত্মা গান্ধীর দ্বাষষ্টিতম জন্মোৎসব সমগ্রভারতে ও বিশেষকরিয়া বিলাতেও সম্যক সম্মানের সহিত সমাহিত হইল (২রা)—বিলাতে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে উপস্থিত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মত প্রকাশ করিয়াছেন যে—যদি এ কনফারেন্সে কোনও ফল না হয় তবে ইংরেজবিদ্বেষ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাইবে। If the conference fails bitterness and hate of everything English will follw (৬)—ভারত সরকার সংবাদ পত্রের নিয়ন্ত্রণ কল্পে নূতন আইন করিতে যাইতেছেন, প্রতিবাদকল্পে ১৩ই আশ্বিন বুধবার এজন্য সমগ্র ভারতব্যাপী সাংবাদিকগণ হরতাল করিলেন—বিলাতে আরউইনগান্ধী চুক্তি উল্লেখ করিয়া পার্লেমেণ্ট সভাতে লর্ড বর্ণহাম বলিতেছেন যে, তাহার লর্ড আরউইনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, তাঁহার উচ্চমন ও অধ্যাত্মদৃষ্টি সম্মানের যোগ্য, কিন্তু রাজনীতিতে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সমকক্ষ হইবার মোটেই যোগ্য নহেন—প্রেস-আইন এসেম্ব্লী সভাতে পাশ হইয়া গেল—কলিকাতাতে বঙ্গীয় ছাত্র সম্মিলনের এক অধিবেশন হইল, মাদ্রাজ প্রদেশের উদীয়মান নেতা শীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি অধ্যক্ষতা করিয়াছেন—মুসলমান ছাত্রগণেরও এক সম্মিলনী হইল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচেয়ারম্যান ডাঃ সরওয়ার্দ্দী তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন—কলিকাতা উল্টাডিঙ্গিতে এক সান্ধ্য ডাকাতি হয় মহিলা নেতৃ বিমল প্রতিভা তাহাতে আসামী বলিয়া ধৃতা হইয়াছেন—বঙ্গী কংগ্রেস কলহের মীমাংসা হইয়াছে, হিজলীর ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু [illegible] পদ ত্যাগ করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন—[illegible] আসানুল্লা হত্যার আসামী জুরির বিচারে নিরপরাধ ব[illegible]




LIBRARY




IDEAL BINDERS